শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ড

(ডঃ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির গদ্যরচনা সংকলন)

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচাবীজিব আজীবন অন্তবঙ্গ সুহৃদ্,

কল্যাণী সন্ত আশ্রমেব উদাবদৃষ্টি সম্পন্ন সন্তপ্রবব,

'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকাব সম্পাদক,

নিম্বার্ক সম্প্রদায়াচার্য

শ্রীমৎ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারীজির পুণ্য স্মৃতিতে

'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ড'

উৎসর্গীকৃত হইল।

মঙ্গলাচরণ

'ম'

মহোদ্ধারণ-পাদাব্জ-মহেন্দ্রভক্তিসংযুতম্।
মহাপ্রভুক্ত-সন্মার্গপ্রচারাচার-বিশ্রুতম্।।১।।
মাধবারাধননিষ্ঠং মহামহবিধায়িনম্।
মহানামরসে মগ্নং মহামহিমশালিনম্।।২।।
মহাভাগবতং মুক্তং মানদামানিনং মুনিম্।
মহা-বাগ্মি-কবি-জ্ঞানি-মায়াজয়ি-মহাজনম্।।৩।।
মেদিনী-জীব-সন্মিত্রং মধুরামৃতভাষিণম্।
মৃত্যুঞ্জয়ং মুকুন্দাপ্তি-প্রমোদোৎফুল্লবিগ্রহম্।।৪।।
মহান্তং মঙ্গলং মূর্তং নমামি মন্ত্রদায়িনম্।
মহানামব্রতাচার্য-ব্রহ্মচারিবরং মুদা।।

।শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ বিরচিত।।

জয় জগদ্বন্ধু হরি

কৃপার ধারা

'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী'র ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থখানির সংকলক শ্রীমান্ বন্ধুগৌরবের "সংকলকের নিবেদন"-এর শেষের কথাটি দিয়ে শুরু করছি—"মধুর তোমার শেষ যে না পাই।" মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জ্ঞানরাশি সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশি সদৃশ, গভীরতাও তদ্রূপ অপরিমেয়। সীমাহীনকে সীমার ভিতর আনার দুরূহ প্রয়াসে অমিত স্নেহভাজন শ্রীমান্ বন্ধুগৌরব বহুলাংশেই কৃতকার্য ও সার্থক। শ্রীমানের একক প্রচেষ্টায় সাগরসেচা মণিমুক্তার মত এই গ্রন্থরাজ 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (২য় খণ্ড)'। প্রবন্ধগুলির প্রতি চোখ বুলালে শুধু অবাক্ ও বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয় এই ভেবে যে, এত বৈচিত্র্যময় বিষয়ের উপর এমন সাবলীল বিচবণ কী করে সম্ভব! তবে অসম্ভবও সম্ভব হয় যখন লেখক ঐশী শক্তির সাথে যুক্ত হন বা তাঁর সমস্ত জ্ঞানরাশি সাধনালব্ধ বা কৃপালব্ধ হয়।

পরিশেষে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণাম্বুজে প্রার্থনা জানাই—তাঁর কৃপার ধারা শতধারায় বর্ষিত হোক শ্রীমান্ বন্ধুগৌরবের উপর এবং আমরা তাঁর লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধাবলী আস্বাদন করে শুধুই বলি—

"মধুর তোমার শেষ যে না পাই।"

জয় জগদ্বন্ধু

সংকলকের নিবেদন

প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপায় ও শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে আমাদের বহু ঈপ্সিত 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। ১ম খণ্ডটি প্রকাশের বছরেই নিঃশেষিত হওয়ায় তাহা যে সুধী পাঠক-সমাজে আদৃত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ১ম খণ্ড প্রকাশের সাথে সাথে ২য় খণ্ডটি প্রকাশেব জন্য পাঠক-সমাজের আকুল আগ্রহ প্রকট হইতেছিল। তাঁহাদের উৎসাহ এই ২য় খণ্ড প্রকাশে প্রেরণাস্বরূপ হইয়াছে। এই ২য় খণ্ডের বিষয়বস্তুগুলির সংকলন ও অক্ষর বিন্যাস ১ম খণ্ডের সহিত একই সাথে চলিতেছিল। ক্রমশঃই নব নব আবিষ্কৃত প্রবন্ধ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় গ্রন্থের কলেবর বাড়িতে থাকে, ফলে ইহা প্রকাশে এক বৎসরকাল বিলম্ব হইল। এই খণ্ডেও ১ম খণ্ডের ন্যায় ৮টি প্রধান বিভাগে প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত রহিয়াছে, তৎসহ একটি অধ্যায়ে বিবিধ গ্রন্থের উপর গ্রন্থকারের লিখিত ভূমিকা, আশীর্বচন, শুভেচ্ছা-বাণী এবং সর্বশেষ অধ্যায়টিতে কতিপয় ইংরাজী রচনার সংকলন রহিয়াছে। ১ম খণ্ড অপেক্ষা এই ২য় খণ্ডটি কলেবরে দুই শতাধিক পৃষ্ঠা বেশী হইল। ১ম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের ক্ষেত্রেও আরও বিশেষভাবে বক্তব্য এই যে—ইহাতে সংকলিত রচনাগুলি সবই প্রবন্ধ-ধর্মাবলম্বী নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ সহ ছোট বড় বিবিধ গদ্য রচনার সংকলন হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, সুধী পাঠক-সমাজ গ্রন্থটির 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' এই নামকরণকে পূর্ববৎ অনুমোদন পূর্বক সানন্দে পাঠ করিবেন। এই খণ্ডে বহু বিচিত্র ধরণের রচনায় শ্রীমন্‌মহানামব্রতজিকে আমরা অনেক নূতন রূপে পাইব। ১ম খণ্ডে মহানামব্রতজির প্রজ্ঞার অতলান্তিক গভীরতা দেখিয়াছি, এই ২য় খণ্ডে দেখিব তাঁহার বৈদগ্ধ্যের হিমালয়-সদৃশ ব্যাপকতা। যে সকল গুরুতর গম্ভীর বিষয় তিনি স্বচ্ছন্দে অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছেন তাহা একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব!

সংকলিত প্রবন্ধগুলি শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির জীবনব্যাপী সারস্বত সাধনার সুপরিপক্ক ফল। ইহাতে যেমন আছে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের প্রারম্ভলগ্নে সম্পাদিত ১৯৩০-এ 'আঙ্গিনা' পত্রিকায় 'জন্মরহস্য' নামক প্রথম দীর্ঘ রচনা—তেমনই আছে জীবন-সায়াহ্নে ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়- রচিত 'চেতনার আরোহিণী' ও 'যোগের কথা' গ্রন্থদ্বয়ের উপর লিখিত অসাধারণ দুইটি ব্যক্তিগত পত্রপ্রবন্ধ— যাহার আবেদন সর্বজনীন। ইহাতে আছে দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে বিরাট ভাবে নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে ডঃ. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত আশীর্বচন এবং ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সনাতন ধর্মসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ—যা তখনকার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ছিন্নমূল অসহায় সর্বস্বান্ত হিন্দু-সমাজের কাছে ছিল অস্তিত্ব রক্ষার্থে রক্ষাকবচ। আছে গ্রন্থাকারের আমেরিকা-জীবনের অনেক অজানা তথ্য ও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজির অফুরন্ত কৃপার ধারার কথা। এইরূপ বহু বিচিত্র বৈভবপূর্ণ রচনার এক অভিনব সমাহার এই ২য় খণ্ডটি। বলা বাহুল্য, প্রথম খণ্ডের মত ২য় খণ্ডটিও পাঠের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর স্বয়ং-সম্পূর্ণ রচনাসমূহে সমৃদ্ধ।

শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির রচনার মধ্যে যেমন থাকে অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গীসহ সত্য সনাতন ধর্মের আধারে রচিত ক্ষুরধার যুক্তির ভিত্তি, তেমনই থাকে রসমাধুর্যে ভরা অনাবিল প্রসাদগুণের মণিকাঞ্চন যোগ। সামান্য ছোট্ট একটি শুভেচ্ছাবাণীও যে অধ্যাত্ম-সাহিত্যের কোন্

উত্তুঙ্গ ভূমিতে পৌঁছিতে পারে, আছে তাঁহার অজস্র দৃষ্টান্ত। সেই কারণে রসিক ও ভাবুক উভয়ের কাছেই তাঁহার প্রতিটি রচনা সমান লৌল্য সৃষ্টি করিয়া আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। তাই এ অধম সংকলকও লোভবশতঃ এযাবৎ প্রাপ্ত শ্রীগুরুদেবের প্রবন্ধাদি রচনা সম্পদ্গুলি সবই প্রকাশ করিয়াছে—আপন ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচার ও বাছাই করিবার প্রচেষ্টা করে নাই। কেবলমাত্র যথাযথভাবে দুই মলাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লুপ্তপ্রায় শ্রীগুরুদেবের সাহিত্য-রত্নসমূহকে রত্নপেটিকায় সংরক্ষিত করিয়া শিষ্যের কর্তব্য করিয়াছে মাত্র। পাঠকগণ আনন্দ পাইলে এবং উপকৃত হইলে সে কৃতিত্বের দাবীদার একজনই—তিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম গ্রন্থকার ভাগবত-গঙ্গোত্রী শ্রীমন্‌মহানামব্রতজি স্বয়ং। তবুও সর্বদা একটি ভীতি ও সংশয় মনে জাগে, জানি না, শ্রীগুরুদেব অলক্ষ্যে থাকিয়া আমা-হেন অযোগ্যজনের এই দুঃসাহসিক প্রয়াস অনুমোদন করিলেন কিনা। অথবা হয়তো সূক্ষ্মদেহে তিনি এই গ্রন্থরত্ন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে স্মিত হাসিতেছেন। তবে যাহাই হউক, আমার একমাত্র ভরসা, সহৃদয় অদোষদর্শী মহানামপ্রেমী উদার পাঠক-সমাজ। তাঁহাদের নিকট আমার এই প্রচেষ্টা ১ম খণ্ডের মত সমাদরণীয় হইলে—তাহা হইবে আমার 'জীবনের শ্রেষ্ঠ পূজা'।

প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকারের ভাষা যেমনটি মুদ্রিত বা পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই যথাযথরূপে রাখা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সাধুভাষার রচনায় পূর্ববঙ্গীয় বা চলিত ভাষা মিশ্রিত আছে—আমরা গ্রন্থকারের ভাষাই যথাসম্ভব রাখিয়াছি। বেশীর ভাগ রচনা পত্রিকা বা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে—কিছু রচনা পাইয়াছি খসড়া বা পাণ্ডুলিপি আকারে, কখনও বা অন্যের হস্তাক্ষরে। আবার কিছু মনে হইয়াছে অসম্পূর্ণ, কিছু শিরোনাম-বিহীন। ঐ সকল রচনাও যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখিয়াই উপস্থাপনযোগ্য করিয়া প্রকাশ করা হইল। আশাকরি, ভাবগ্রাহী পাঠকের প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিতে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না। বানানবিধিতে আমরা ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- অনুমোদিত আধুনিক বানান বিধিই অনুসরণ করিয়াছি। রচনাগুলির প্রকাশক সংস্থা, গ্রন্থনাম বা পত্রিকা এবং প্রকাশকাল যতটুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, রচনা আরম্ভের পৃষ্ঠার নীচে পাদটীকায় তারকা (*) চিহ্ন দিয়া তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আগামীতে আরও তথ্য পাইলে তাহাও পাদটীকায় সংযোজিত হইবে। আমাদের ইচ্ছা রহিল, আগামী সংস্করণে গ্রন্থশেষে তথ্যপঞ্জীর একটি নির্ঘণ্ট অন্তর্ভুক্ত করার। সুধী পাঠকবৃন্দের প্রতি নিবেদন ঃ সম্পাদনের কাজে যদি কোন অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেন কিংবা যদি রচনাগুলি সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য জ্ঞাত থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানাইলে সানন্দে তাহা পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করিব।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন প্রসঙ্গে এই খণ্ডের ক্ষেত্রেও একইভাবে সর্বাগ্রে নিম্বার্ক সম্প্রদায়াচার্য পরম পূজনীয় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারজির কথা বলিতেই হয়। কেননা তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের শেষ নাই। তিনি তাঁহার ত্রৈমাসিক 'সুদর্শন'-এ মহানামব্রতজির প্রবন্ধসাহিত্য সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় ধর্মসাহিত্য-জগতে মহানামব্রতজিকে পরিচিত করান। 'শ্রীসুদর্শন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হইলেও এই খণ্ডেও কতিপয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই খণ্ডটি ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারজির পুণ্য স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হইল। সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও পরবর্তীকালে তৎপুত্র শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের সম্পাদনায় দৈনিক 'যুগান্তর'

সংকলকের নিবেদন

পত্রিকা ও ইংরাজী *'Amrita Bazar Patrika'*-তে প্রতি দোলপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমীতে বহু বৎসর যাবৎ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মন্দিরে যতগুলি রচনা সংগৃহীত ছিল কেবলমাত্র তাহাই এই সংকলনে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে অজস্র ধর্মীয়, সাহিত্য ও সামাজিক পত্র-পত্রিকায় শ্রীগুরুদেবের বিভিন্ন প্রবন্ধ বচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ আমাদের মহানাম অঙ্গনের সংগ্রহে ছিল—বাকী অংশ ইদানীং কালে সংগৃহীত। শ্রীগুরুদেবের আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার সম্পাদনায় মহানাম সম্প্রদায় শ্রীঅঙ্গন-প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'আঙ্গিনা' এবং প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী-প্রবর্তিত ত্রৈমাসিক 'সংকর্যণ' ও 'প্রাণগৌর' পত্রিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি এই খণ্ডের অন্যতম উপাদান। শ্রীচৈতন্য বিসার্চ ইনস্টিটিউট ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সৌজন্যেও আমরা কিছু রচনা পাইয়াছি। মহানাম সম্প্রদায়- প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে তাহার প্রকাশন-সংস্থা 'শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-প্রকাশিত শ্রীগুরুদেবের সম্পাদিত মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলীর ভূমিকাগুলি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থে লিখিত শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির ভূমিকাদি যাহা বর্তমানে অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য, তাহাও একটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই খণ্ডটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে মহানামব্রতজির রচনা আস্বাদন-পিপাসু পাঠকবৃন্দ উক্ত মূল গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন এবং সংগ্রহ করিয়া পড়িতে উৎসুক হইবেন। কৃতজ্ঞতা জানাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কেও। আমেরিকা-প্রত্যাগত মহানামব্রতজির তৎকালীন বহু সংবাদ ও সারগর্ভ ভাযণ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছিল—যাহার কয়েকটি ভাযণ এই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ভক্তবর শ্রীমৎ বঙ্কিমচন্দ্র সেন সহ কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীশক্তিপদ রায় ও সহকর্মী কুমারী রোমি সাহার অবদান স্মরণ করি। যে-সকল অঙ্কিত চিত্র সংযোজিত হইয়াছে, সেই শিল্পীদের নিকটেও আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলীর প্রণয়নে যাঁহাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রেরণাস্বরূপ পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি ও মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক পূজ্যপাদ দাদাজীবন শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারীজি। গ্রন্থ প্রকাশনকার্যে যাহা কিছু পরামর্শ সবই শ্রীগুরুদেবের বর্তমান প্রতিনিধিস্বরূপ তিনিই দিয়াছেন। বাংলাদেশ মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী, সহঃ-সভাপতি শ্রীমৎ সন্তবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ হরিপ্রিয় (হরিবোল) ব্রহ্মচারী, সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুপ্রীতম ব্রহ্মচারী ও উভয় দেশের অন্যান্য ব্রহ্মচারী দাদাগণ, মহানাম সেবক সংঘ ও শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীবিকাশকুমার রুদ্র, শ্রীগুরুদেবের স্নেহধন্যা শ্রীমতী গীতা গুহ, শ্রীগুরুদেবের সেবাধন্য শ্রীমৎ তাপসবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ভক্তি সেনগুপ্ত, সিলেটের গুরুভ্রাতা শ্রীমনোজবিকাশ দেবরায়, শ্রীমঙ্গলের ডাঃ শ্রীবরুণচন্দ্র রায় ও লেখক শ্রীনৃপেন্দ্রলাল দাস, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট গুরুভগিনী শ্রীমতী ইতিরানী পোদ্দারসহ প্রাণের গুরুভাই-ভগিনীগণ, কলকাতা চৌরঙ্গী রোডস্থিত শাস্ত্র-ধর্ম-প্রচার সভার 'ভারতাজির' ও *'Truth'* সম্পাদক শ্রীজয়নারায়ণ সেন সহ স্বধর্মনিষ্ঠ সভ্যগণ, বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও শ্রীগুরুদেবের চিরকালের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীঅরবিন্দভাবাশ্রিত বেদজ্ঞ লেখক শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, আমাদের পাবলিকেশন ট্রাস্টের সম্পাদক ড. উৎপল সাহা, প্রাক্তন সম্পাদকদ্বয় শ্রীনন্দগোপাল সাহা ও শ্রীসমরেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী (যুগ্ম সম্পাদক,

মহানাম অঙ্গন পত্রিকা), শ্রীজ্যোতির্ময় গুহ ও শ্রীজয়দেব দে প্রমুখ ট্রাস্টীবৃন্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগুরুদেবের সহপাঠী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দের পুত্র শ্রীচৈতন্যময় নন্দ সহ ভ্রাতৃগণ, হাইকোর্টের আইনজ্ঞ ড. হরেকৃষ্ণ সাহারায়, শ্রীগুরুদেবের চিকিৎসাধন্য প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ সূর্যপদ দে, তেঘরিয়া শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দিরের শ্রীমতী সবিতা দাস ও শ্রীহরিপদ ভৌমিক, শ্রীমৎ বন্ধুকিশোর ব্রহ্মচারীজির প্রিয় শিষ্য শ্রীননীগোপাল বণিক (আগরতলা), লণ্ডন-নিবাসী শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস, করিমগঞ্জের অধ্যাপক ডঃ সুখেন্দুশেখর দত্ত, শ্রীনীলরতন বিশ্বাস ও অধ্যাপক শ্রীগণেশচন্দ্র সাহা প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণ, গড়িয়া পরমার্থ সাধক সংঘের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণু পুরীজি, রাণাঘাট শ্রীকৃষ্ণ কুটীরের ব্রহ্মচারিণী গীতা দেবী, আদ্যাপীঠের পণ্ডিতপ্রবর দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ দামোদর আশ্রম, নবতীর্থ এবং মণিকুন্তলা উচ্চবিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারিণী দীপাদেবী, ঠাকুর শ্রীসীতারামদাসের স্নেহধন্য মহামিলন মঠাধ্যক্ষ কিংকর বিঠ্‌ঠল রামানুজদাসজি ও অধ্যাপক কিংকর সামানন্দজি, সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারী দাসজি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সম্পাদক তথা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজজি, বরাহনগর পাঠবাড়ীর শ্রীমৎ মাধবানন্দ দাসজি, রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীজি, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের শিষ্য ও শ্যামনগর অবন্তীপুর সিদ্ধাশ্রমের কুলপতি শ্রীমৎ রাঙ্গাঠাকুর, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত শ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহাবাজজি, ভাবত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ (দিলীপ) মহারাজজি ও শ্রীমৎ স্বামী যুক্তানন্দজি প্রমুখ সাধুসন্তপ্রবর এবং মহানামপ্রেমী অগণন বিদ্বজ্জন— ইঁহাদের সকলের নিকট হতে লাভ করিয়াছি এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশে প্রেরণা, শুভেচ্ছা ও উপদেশ। তাঁহাদের সকলকে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ প্রণতি।

প্রবন্ধাবলীর উপকরণ সংকলনে যাঁহাদের মুক্ত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— শ্রীমৎ সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী (প্রাচীন 'আঙ্গিনা' পত্রিকা সংরক্ষক), ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারজির স্নেহধন্য শ্রীঅর্ণব বর্ধন, প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোব গোস্বামীর পুত্র প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিনোদকিশোর গোস্বামী, 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী ঋতানন্দ মহারাজ, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের কর্ণধার শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ, মহেশ পাবলিকেশন (বর্তমান গিরিজা লাইব্রেরী)-এর প্রকাশক শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্তী, আদ্যাপীঠ বালিকা আশ্রমের অধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী ঁবেলাদেবীর সহকর্মী ব্রহ্মচারিণী সেবা দেবী, 'আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা'-র কর্মাধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী দুর্গাদেবী, ব্রহ্মচারিণী কল্পনাদেবী ও ব্রহ্মচারিণী শুভ্রাদেবী, শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীজির শিষ্য কালনার শ্রীমৎ কেশব ব্রহ্মচারীজি, স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজজির ভ্রাতা শ্রীসমীরকুমার ভট্টাচার্য ('পাঁচ সিকে পাঁচ আনা'), দেওঘর দেবসংঘাচার্য শ্রীমৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীজি ('দিব্যদর্শন'), যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম- আশ্রিত অধ্যাপক ড. পুলিনরঞ্জন দাস, শ্রীঅভয়জীর স্নেহধন্যা মা পরিপূর্ণাদেবী, বরাহনগর পাঠবাড়ীর অশ্রিত শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান- গবেষক ঁসুকুমার মজুমদার, শ্রীনবদ্বীপবাসী ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র বর্ধমান উইমেনস্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগারিক, রাঁচীর 'গীতামৃত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধুসেবিকা সংঘের অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা ড. উজ্জ্বলা কুণ্ডু, হালিশহর শ্রীনিগমানন্দজির আশ্রমের মোহন্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতীজি ও স্বামী বিমলানন্দজি ('আর্যদর্পণ') প্রমুখ। সকলের

নাম এস্থলে দেওয়া বাহুল্য হইবে মনে করি। প্রবন্ধের নীচে পাদটীকায় যথাসম্ভব রচনাগুলির উৎস গ্রন্থ বা প্রত্রিকার নামসহ প্রকাশক, সম্পাদক, স্থান ও প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে।

ইতোমধ্যে যে-সকল সহৃদয় শ্রীমহানামব্রত-অনুরাগী আমাদের ছাড়িয়া নিত্যলোকে গমন করিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমরা বহুলাংশে ঋণী, তাঁহারা আমাদের চির-স্মরণীয়। সর্বাগ্রে স্মরণ করি মহানাম সম্প্রদায়ের প্রয়াত সভাপতি শ্রীমৎ বন্ধুদাস ব্রহ্মচারীজিকে যিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকুমাব ব্রহ্মচারীজির সহিত মহানাম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে প্রকাশিত 'মহাউদ্ধাবণ গ্রন্থাবলী' প্রকাশের সেবায় প্রধান সহায় ছিলেন। আদ্যাপীঠের সরস্বতীকল্প ব্রহ্মবাদিনী ৺বেলাদেবীর কথা মনে পড়ে, যিনি বলিতেন ঃ "বাংলা সাহিত্য-জগৎ যেমন সবই রবীন্দ্র-উচ্ছিষ্ট—বাংলা ধর্মসাহিত্য-জগৎও তেমনি সবই মহানামব্রত -উচ্ছিষ্ট। মহানামজি আমাদের নূতন করিয়া ধর্মকথা বলিবার বা লিখিবার জন্য কিছু বাকী রাখিয়া যান নাই।" স্মরণ করি সেই মনস্বী মরমীয়া সাধক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে যিনি নিজেকে 'মহানাম-কৃপাপ্রার্থী' মনে করিতেন। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ভারতবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ 'পদ্মশ্রী' ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে, যিনি জীবনের শেষ ভূমিকাটি লিখিয়াছেন এই প্রবন্ধাবলীর ১ম খণ্ডে এবং আমাদের প্রথম শ্রীমহানামব্রত স্মারক বক্তৃতাটি দিয়াছেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এ ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ। ইহা ছাড়াও স্মরণীয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাব ন্যায়াধ্যাপক প্রভুপাদ শ্রীমৎ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীগুরুদেবের গ্রন্থপ্রচারে উৎসাহদাতা আজীবন পরহিতব্রতী সবার বন্ধু অধ্যাপক ৺কালিপদ চক্রবর্তী, শ্রীমৎ যোগীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য গুপ্তসাধক ৺দিলীপকুমার সিংহ (জঙ্গীপুর), মহানাম সেবক সংঘের প্রাক্তন সভাপতি ৺শিবপ্রসাদ বসু, ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের প্রাণপুরুষ ডাঃ ৺কুসুমলাল রায়, বার্ণপুরেব পরম ভাগবতপ্রবর শ্রীমৎ পূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ ও আসানসোল-বার্ণপুর মহানাম সেবক সংঘের প্রাক্তন সম্পাদক আমাদের ট্রাস্টী ৺নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, আজীবন শ্রীগুরুদেবের গ্রন্থসেবক ট্রাস্টী ৺বিপ্লবচন্দ্র সাহা, 'বর্তমান' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক ৺পবিত্রকুমার ঘোষ, যিনি শ্রীমন্‌মহানামজির প্রসঙ্গ ও বহু প্রবন্ধ তাঁহাদের কাগজে সাহসের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলাদেশ মহানাম সেবক সংঘের সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র সংস্কৃতিবিদ্ ৺মানসকুমার ঘোষ, শ্রীমহানামব্রতজির আদরের 'ধলু' পণ্ডিত ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতা প্রচার সমিতির অধ্যক্ষ মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ দেবানন্দ সরস্বতীজি প্রমুখ। প্রত্যেকের আত্মিক কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাই।

প্রবন্ধাবলীর প্রুফ দেখায় ও প্রেস কপি প্রস্তুতিতে যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীধাম নবদ্বীপের ধর্মপ্রাণ সংস্কৃতাধ্যাপক ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বাশ্রমে রাইটার্স বিল্ডিং-এ অর্থবিভাগের সহঃ সচিব শ্রীগুরুদেবের বহু কর্মযজ্ঞের সাথী ও বহু গ্রন্থের লেখক শ্রীমৎ জগদানন্দ ভারতী, শ্রীগোপিকাচরণ সিংহ, ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুধামে শ্রীমৎ হরিমঙ্গল্ ব্রহ্মচারীজি, শ্রীমৎ জগত্তারণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ অশোক দাস, শ্রীমান্ অসিত দাস, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীসব্যসাচী ঘোষ (বিষ্ণু), শ্রীমতী সুস্মিতা গুহ, কুমারী ইন্দুলেখা গুহ, শ্রীদিলীপ সিন্‌হা, শ্রীঅমল সাহা (শিবু), শ্রীমান্ প্রমোদ দাস, শ্রীমান্ দেবোত্তম রায় এবং কামিনীসুন্দরী মাতৃনিবাসের গুরুভগিনীগণ। শ্রীগুরুদেবের কয়েকটি ভাগবতীয় ভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন শ্রীমান্ বুধাদিত্য খান, শ্রীকুমুদরঞ্জন দেবনাথ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজি ইঁহাদের সকলের পরিশ্রমে রূপ পাইয়াছে এই প্রবন্ধাবলীর ২য় খণ্ডটি।

সংকলকের নিবেদন

এই প্রবন্ধাবলীর একটি সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনা করিয়াছেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের পূজ্য সন্ন্যাসীগণেরও শিক্ষাগুরু, সর্বজনশ্রদ্ধেয় বেদান্তবিদ্ ও গবেষক-অধ্যাপক শ্রীসীতানাথ গোস্বামী। অকৃতদার সীতানাথবাবুর আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়, তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভ্রাতা শ্রীযাদবাচার্যের বংশধর এবং ধামেশ্বর মহাপ্রভুর অন্যতম সেবাধিকারী। প্রাক্‌কথন রচনা করিয়াছেন নামাচার্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাধন্য ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের আদর্শে গঠিত ধন্যজীবন, একচক্রাধামের মোহন্ত শ্রীমৎ শ্রীজীবশরণ দাসজি। শ্রীশ্রীনিতাই-নিষ্ঠায়, শ্রীধাম সংস্কারে, গৌড়ীয় শ্রীপাট সমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও সারস্বত গবেষণাকার্যে তাঁহার অবিস্মরণীয় অবদান বৈষ্ণব-জগতের অনুসরণীয়। মুখবন্ধ রচনা করিয়াছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড করুণাসিন্ধু দাস। বর্তমান কালের প্রবাদপ্রতিম সংস্কৃতজ্ঞ ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আদর্শানুসারী ও বিশেষ স্নেহ-প্রীতিধন্য বীরভূমের কৃতী সন্তান করুণাসিন্ধুবাবু সংস্কৃত-জগতে ও শিক্ষা-প্রশাসনে বিশেষ সম্মানীয় ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির সারস্বত সাধনারও অনুরাগী। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থশেষে কতিপয় বিদ্বজ্জনের প্রেরিত কিছু স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের কিয়দংশ সংযোজিত করা হইল। আমরা তাঁহাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ সশ্রদ্ধ প্রণতি। শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট সকলের সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন প্রার্থনা করি।

প্রবন্ধাবলীর এই ২য় খণ্ডটির মুদ্রণে আনুকূল্য করিয়াছেন লেকটাউনস্থিত শ্রীগুরু-করুণাধন্য ভক্তবর গুরুভ্রাতা শ্রীরণজিৎকুমার সাহা ও তাঁহার সেবাপ্রাণা ধর্মপত্নী শ্রীমতী আলো সাহা। মহানাম অঙ্গনের রথ উৎসবে শ্রীজগন্নাথদেবের 'মাসির বাড়ী' বলিয়া খ্যাত 'মহানাম ভিলা'র রণজিৎ দাদা তাঁহার পূজ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় ৺প্রহ্লাদচন্দ্র সাহা ও মাতৃদেবী স্বর্গীয়া ৺যোগমায়া সাহার সাধনোচিত ধামে পূত আত্মার পরা-শান্তি কামনায় এই ঋষি-তর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীপ্রভুর ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদভাজন তো হইলেনই, আমাদেরও অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন করিলেন।

এই প্রবন্ধাবলীর মুদ্রণকার্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, আই-প্রেস ও আর্ট এণ্ড রিয়ালিটির কর্ণধার শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্ত শ্রীদেবজ্যোতি (বাবুল) রায়, অপারেটর শ্রীতরুণ দাস ও ডিজাইনার শ্রীসাধন দাসকে।

পরিশেষে বলি ঃ বর্তমান অস্থিরতার যুগে 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' পাঠের মাধ্যমে মানুষে মানুষে গড়িয়া উঠুক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। জাতিতে জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়ে ও দেশে দেশে গড়িয়া উঠুক মানবতার ভিত্তিতে সংহতি। সত্য সনাতনধর্মের জয় হউক—সকলে সুখে সুন্দর ও আলোকময় জীবনের অধিকারী হউন—হিংসায় উন্মত্ত ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ গড়িয়া উঠুক। শ্রীমন্‌মহানামব্রতজির বাঙ্ময়ী মূর্তি এই 'প্রবন্ধাবলী' ঘরে ঘরে সমাদৃত হইয়া স্ব-মহিমায় বিরাজ করুন।

হে গুরুদেব! "মধুর তোমার শেষ যে না পাই।" হে পাঠকগণ! "আনন্দে করুন পান সুধা নিরবধি।" জয় জগদ্বন্ধু। জয়তু মহানামব্রতঃ।

ভূমিকা

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী যে একজন প্রতিভাধর মনস্বী পুরুষ এ কথা বহু আগে থেকেই শুনতাম। তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থ হাতে আসেনি। প্রায় ৫ বছর আগে তাঁর এক শিষ্য আমাকে দু'টি বই দিলেন—'*Vaisnava Vedanta*' এবং 'বেদ-বেদান্ত' গ্রন্থের দু'টি খণ্ড। পড়ে অভিভূত হলাম। তা শতবর্ষ স্মরণিকাতে প্রকাশিতও হ'ল।

তখন তাঁর বেদ-বেদান্তশাস্ত্রের প্রাবীণ্য জেনেছিলাম। সম্প্রতি শ্রীমান্ বন্ধুগৌরব তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডটি দিয়ে গেলেন। এর পত্রসংখ্যা পাঁচ শতেরও বেশী। এতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার তথা বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় পেলাম। বেদ আলোচনার পরেই তন্ত্র, তন্ত্রবিজ্ঞান, শক্তিবাদ, দুর্গা, সরস্বতী, রামচরিতমানস ও মহাভারতের আলোচনার পরেই তাঁর প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম মাধুর্য ও লীলামৃতে প্রবেশ দেখি। তারপর পাই গীতা ও ভাগবত শাস্ত্রের বিস্তৃত মনন। নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁর প্রাণে মনে দোলা লাগিয়েছেন। তার থেকেও বেশী আন্দোলিত যেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহগাথায়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কদাচিৎ স্বনামে উল্লিখিত করেছেন; পাঠকের সুবিধার্থে কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি মেশানো মধুমাখা প্রিয়াজী নাম পাঠককে বিচলিত করে। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও মহাপ্রভু" (৩৭৩পৃ.) প্রবন্ধটি অসাধারণ। রায় রামানন্দ তো বললেনই—"ইঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।" (চৈঃ চঃ ২/৮/৯৭)

শ্রীরাধাই তো ভগবানের আরাধনায় সকলের উপরে, আর সে-জন্যই ভগবান্ তাঁকে নিয়েই রাসস্থলী ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীরাধা তো অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণই, তাঁর দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হয় না।

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।।" (চৈঃ চঃ ১/৪/৮৫)

এই কৃষ্ণপ্রেমের মাধুরী সম্মুখে প্রকাশ করেছেন স্বয়ং গৌরহরি তাঁর দুই শিষ্য স্বরূপ-রাম রায়ের কাছে—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।।" (চৈঃ চঃ ২/২/৪৩)

"কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।" (তত্রৈব ৪৮)

কবিরাজ গোস্বামী এর পরে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আরও মর্মস্পর্শী--

"বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।।

এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।।" (তত্রৈব ৫১)

এই অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট শ্রীরাধা কত জ্বালা সয়েছেন, বিরহে কাতর হয়েছেন। আর প্রিয়াজী রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে তো আরও জ্বালা সইবেন। তিনি হলেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তাই তো এবার মহানাম এগিয়ে এসেছেন প্রিয়াজীর বিরহতাপের গভীরতা বোঝাতে। কৃষ্ণ রাসস্থলী ছেড়ে চলে গেলেন। গোপীগণের এত আনন্দ চিরতরে শেষ। রাধাও তো বিরহের জ্বালা সয়েছেন কিন্তু প্রিয়াজীর জ্বালা, পরীক্ষা, সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। কৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন— আবার আসব। এটা তো চরম সান্ত্বনার বাক্য যে, দেখা হবে। দেখা হয়েওছিল তিনবার—কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণে, প্রভাসে যজ্ঞানুষ্ঠানে ও ব্রজপুরীতে পুনরাগমনকালে দন্তবক্র নিধনের পরে। প্রিয়াজীর কাছে মহাপ্রভু করতে পারেন, ঐ মন্দিরে যে অন্নভোগ দেওয়া তাতে একটি থালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকেই এমন কোনও কথা তো দেন নি বরং তিনি দৃঢ়ভাবেই জানতেন যে, আর দেখা হবে না ঐ সন্ন্যাসী পরম প্রিয়ের সঙ্গে। তবুও তিনি অবিচলিত। গৌরসুন্দর ছাড়া তাঁর কাছে সবই অসুন্দর। শ্রীরাধা জানতেন যে, তাঁর প্রাণকৃষ্ণ তো সুখেই আছেন। প্রিয়জন সুখে থাকার কথা জানলে তাঁর বিরহ সহ্য করা সহজ হয়। প্রিয়াজী কিন্তু জানতেন যে, তাঁর প্রাণসর্বস্ব শ্রীচৈতন্য তো কঠোর সন্ন্যাসী, তেলও মাখেন না, অর্ধাহার করেন, কলার শরলায় শুয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁর দুঃখ অপরিসীম।

এর পরে মহানাম দুঃখ করেছেন এবং বহু প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রিয়াজীর প্রতি একটু অবহেলাই করা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণ রামসীতার মতো গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি (৩৭৩ পৃ.)। নবদ্বীপে কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া তেমন বিস্মৃত বা উপেক্ষিত নন। একথা ঠিক যে, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলিত বিগ্রহ বা পাশাপাশি দু'টি বিগ্রহ শ্রীশ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে দেখা যায় না। তার একটি কারণ আছে। বর্তমানে পূজিত বিগ্রহটি স্বয়ং মহাপ্রভু নবীন ভাস্করকে দিয়ে নিম কাঠ থেকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন যাতে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর বিরহ জ্বালা এই বিগ্রহদর্শনে কিছুটা প্রশমিত করতে পারেন। ঐ মন্দিরে যে অন্নভোগ দেওয়া হয় তাতে একটি থালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকেই নিবেদিত করা হয়। জন্ম থেকে বাল্যকাল ও প্রথম যৌবন আমার নবদ্বীপে মন্দিরের সন্নিকটেই কেটেছে। সেখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ফটো নিয়ে হাওদায় বাদ্যসহ নগর পরিক্রমার ব্যবস্থা বহু বছর ধরেই দেখেছি। সঙ্গে সংকীর্তন তো থাকতই। ব্যাণ্ডের সঙ্গে গাওয়া হত—

"দোলে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সোনার নদীয়ায়।
আবেশে বিভোর হিয়া দু'টি প্রেমের মদিরায়।।" ইত্যাদি

শিশুকাল থেকে মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়ে প্রতিদিন মহাপ্রভুকে প্রণাম করতাম এবং তার ঠিক্

পরেই হাত জোড়া করে বলতাম—

"নবকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বিষ্ণুপ্রিয়াং বরাননাম্।
সনাতনসুতাং বন্দে পরমানন্দরূপিণীম্।।"

এই প্রণাম মন্ত্র নবদ্বীপবাসীরা আজও বলেন। মহাপ্রভুর মন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত হন তাঁরা জপ করেন— "ওঁ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভায় নমঃ"। সুতরাং নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াকে উপেক্ষিতা বলা বোধ হয় সঙ্গত হবে না—তবে সাধারণভাবে জনসমাজে ও ভক্ত সমাজে তিনি ততটা সমাদর, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে আরাধিতা হন না, একথা অস্বীকারের উপায় নেই।

"রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ" (৩২৪পৃ.) অতি অসাধারণ। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা..." শ্লোকটি তো বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছি, তার অনেক ব্যাখ্যাও শুনেছি। নিজেও কখনও তার ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু মহানাম যেভাবে তার ব্যাখ্যা করলেন তা আক্ষরিক ব্যাখ্যা নয় কিন্তু অনুভূতির আলোকে প্রদীপ্ত। এই ব্যাখ্যার একটু অংশ উদ্ধৃত করছি, যেহেতু আমার ভাষা এত মার্মিক হবে না। "শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত রস। তিনি নিজেকে আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক। আর যখন নিজেকে পৃথক্ করিয়া পরম আরাধিকা রাধিকার সঙ্গে একই তনু হইয়া নিজেকে আস্বাদন করেন তখন তিনি রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তিনি অনাদিকাল এইরূপ স্বমাধুর্য আস্বাদনে নিমগ্ন। তাঁহাকে নিজ ঘরের লোক, অতি নিজজন করিয়া পাইলাম মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্বে হোলি লীলার দিন...." (৩২৭ পৃ.)। রসিকশেখরেব অভিপ্রায়ের সঙ্গে সূর্যদেবের সাধের তুলনাটিও বড় অপূর্ব (৩২৬ পৃ.), কল্পনামাধুর্যে বিমণ্ডিত।

মহাপ্রভুর মধ্যে যে বিরহ-ক্রন্দন পাই তা তো শ্রীরাধার বিরহভাবেই। বিরহের সমাপ্তি মিলনে—এ কথা ঠিক কিন্তু সেই মিলন কি বাহ্য অথবা আন্তর? বিরহের দুঃসহ আর্তির মধ্যেই তো ভাবগত মিলন আছে; আর তাতেই আনন্দ তাতেই জীবন এবং তাতেই এই অন্বেষণের সার্থকতা। এই ভাবনাকেই যেন অনুভূতির দ্বারা প্রকট করা হয়েছে "গীতা ও ভাগবতের পৌর্বাপর্য" প্রবন্ধে। বিশেষতঃ প্রবন্ধের অন্তে (১৬৬ পৃষ্ঠাতে)। এখানেই ব্রহ্মচারিজী বললেন— "এই রহস্য বিস্তার করিতে অনেক কথার প্রয়োজন। এখন আর বলিব না...।" আমরাও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।

বহুমুখী প্রতিভা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রভাব ছিল মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মের পরম বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যের আবির্ভাবের কালে দেশ ছিল বহুধা বিভক্ত। নানাবিধ সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও ভেদবুদ্ধিতে সমাজের সর্বত্র এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের আগমনে জীবনের সর্বাত্মক অগ্রগতি ঐ কালখণ্ডকে বিশেষভাবে মণ্ডিত করেছিল আর তার প্রভাব আমরা আজও অনুভব করছি। জাতিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে সিংহদ্বার তখন নানা কারণে উন্মুক্ত হয়ে সমাজের সর্বনাশ ক'রে চলেছিল তার একমুখী গতিকে চৈতন্যদেব পরিবর্তিত করে দিলেন। যে দ্বার ছিল বহির্গমনের তা হল এবার প্রবেশের। তাই অনেক মহামনীষীকেও আমরা পেলাম

অন্য ধর্মীয়গণের মধ্য থেকে। শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ, শ্রীরূপ-সনাতনের মতো বৈষ্ণব-রত্নকে চৈতন্যই খুঁজে এনেছিলেন। মহাপ্রভুর অবদানকে ভাবজগৎ ছাড়াও অন্যত্র প্রসারিত করেছিলেন বৈষ্ণব-তিলকেরা, তা একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে মহানামের লেখনীতে। শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের কৃষ্টিজগৎকেও বিরাট্‌ভাবে পরিপুষ্ট করেছিলেন চৈতন্যদেব। (৩৫০ পৃ.)।

"হিন্দুধর্মে নারীর স্থান" (৫৬৮) প্রবন্ধটি স্বাধীনচিন্তায় সমৃদ্ধ। অঙ্কশাস্ত্রে বামপার্শ্বে স্থিতা সংখ্যা অধিক গুণবতী, মহামূল্যান্বিতা; তেমনই বামস্থানে সমাসীনা মাতা অধিক পূজ্যা। সঙ্গীতশাস্ত্রের কড়ি ও কোমলের দৃষ্টান্ত, রামায়ণের সীতার মহিমা, মহাভারতে দ্রৌপদীর তেজোদৃপ্ত উক্তি, বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ীর অমৃতত্বস্পৃহা ইত্যাদি বহু সমুজ্জ্বল স্মরণ এই প্রবন্ধকে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ একথা তো শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর কড়চায় পেয়েছি। তার মধ্যে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" শ্লোকটির ভাবগাম্ভীর্য যে-কোন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ভাগবত পাঠের প্রভাবে এই তত্ত্বের সন্ধান মেলেনি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু শতাব্দী। আবার মনের মধ্যে এ প্রশ্নও জাগত যে গৌর-নিতাই কি একসঙ্গে একমূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারেন না? তারই উত্তর রয়েছে দু'টি প্রবন্ধে "জয়তু জগদ্বন্ধুসুন্দরঃ" (৪১৫ পৃ.) ও "জগার নাম লবি" (৪৮০ পৃ.)। শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রভু জগদ্বন্ধুর বিষয়ে লেখার সময়ে যেন এক ঐশী শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে যেতেন, বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তার পরিচয় মেলে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নাম-মাত্র শ্রবণে আজ মানুষের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ৪০ বৎসর পরে একজন বাঙালী ভারততত্ত্ববিদ্ যিনি ঐ Parliament of Religions-এ আহূত হয়ে ভাষণ দানে সকলকে চমৎকৃত করেন। "শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড" এর ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় আমার একটি বড় প্রাপ্তি হয়েছে যে, মহানামের জ্ঞানের এক কণা যা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার আস্বাদন লাভ করতে পেরে ধন্য হয়েছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু শাস্ত্রের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই মহামানব বৈষ্ণবসুলভ বিনয় নিয়েই জীবনে চলেছেন ব'লে শুনেছি এবং একবার সাক্ষাৎকারের সময়েও দূর থেকে তাই দেখেছি।

এই গ্রন্থের প্রচার যত অধিক হবে ততই মানুষের মনে সদ্বৃত্তির সঞ্চার হবে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মপ্রবণতাও বাড়বে। ওঁ শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরায় নমঃ।

প্রাক্‌কথন

শ্রীগুরু-নিতাই

মৃণ্ময় প্রদীপের ক্ষীণ আলোক কি নির্ণয় করতে পারে চিন্ময় সহস্রাংশুর অযুত সামর্থ্য? কে জানে—খদ্যোতের কতটুকু অধিকার, সুধাকরের সুধাস্বাদনে! তবুও "....বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে আশ...", অবশ্য এর মূলে রয়েছে গুরুগোবিন্দের একান্ত অনুগৃহীত সমপ্রাণ বন্ধুগৌরবজীর অনুজ্ঞা।

অনুগত আর অনুরক্তজনেরা মিলে সুচিহ্নিত সাধকজন শ্রীমৎ মহানামব্রতজীর বহুবাঞ্ছিত রচনাসম্ভারকে উপস্থাপিত করতে চলেছেন অগ্রাহী সামাজিকদের আস্বাদনার্থে। রসিক, ভাবুক, গবেষক হতে কৌতূহলী সাধারণ পাঠক-সমাজ অবধি আশা করি, সকলেই এ সংবাদে পুলকিত! অনুভবের নিধি হাতে পাবেন জেনে স্ফূর্ত আনন্দিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চিহ্নিত চরণানুচর মহানামব্রতজীর জীবন—একান্তই কৃপা-নির্দিষ্ট। ভগবানের করুণার সাথে ভক্তের সাধনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে সেই স্মরণীয় জীবনে। কথা দিয়ে সে জীবনকে বোঝানো যাবে না, মন দিয়ে তা মাপা যাবে না "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে বন্ধুহরির কৃপাপূত সে জীবন সকলকে নিয়েই পূর্ণ। যে সব মানুষ সেই অমর্ত্য জীবনের আশে পাশে বেড়ে উঠেছেন, তাঁরাও মহানামব্রতজীর স্বভাবসৌরভে ভরপুর হয়েছেন, পেয়েছেন পূর্ণতার পথ। তাঁদের সবাইকে পূর্ণতা দিয়েও মহানামব্রতজী এতটুকুও ঊন হন নাই। পূর্ণই থেকে গিয়েছেন, আরও অনেককে পূর্ণতা দিতে—"...পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

মহানামব্রতজীর যে মহত্তম বৈশিষ্ট্য মনটি কেড়ে নেয়, তা হ'ল তাঁর অসাম্প্রদায়িক সমঞ্জস মনোভাব। তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব, অনুপমা তিতিক্ষা, নিখিল-কল্যাণচেতনা, জীবনব্যাপী সারাসারবিবেকচাতুর্য, নিরন্তর নিত্যানন্দতন্ময়তা, ভাগবতী বাণী প্রচারে অনন্যমমতা, সতত বিষ্ণু-বৈষ্ণব কথালোচনে অসমোর্দ্ধ প্রয়াস, তাঁর নিরলস পঠন-পাঠনে অপার অনুরাগ স্বতঃই আমাদের অভিভূত করে। শাস্ত্রজ্ঞান ও পরমার্থবোধের মহাসম্মিলনে, তাঁর মঙ্গলচরিত আমাদের দিশারী—একথা বলতেই হয়। শুধু পরমার্থপ্রসঙ্গ কেন, সব দিকেই তাঁর সচেতনতা ছড়িয়ে ছিল। তাঁর লেখাগুলিই এ কথার সযৌক্তিক অকাট্য প্রমাণ। মহাজনের কলম—"স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্তি।।"—তাঁর জীবন-খাতার প্রতি পাতায় মূর্তিমন্ত।

একটি মানুষ তার সীমিত একটি জীবনে যে কত দিকে এগিয়ে যেতে পারে, একান্ত আন্তরিকতার সাথে, আর পরিণামে গৌরবান্বিত হতে পারে ষোল আনার সার্থকতায়, ইদানীংকালে তার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ শ্রীমৎ মহানামব্রতজী। একটি অবিস্মরণীয় সচেতন জীবন। এহেন অলোক-জীবনের কাছ থেকে আমরা কী পেতে পারি? নিয়ন্তা তো আপন কৃপাশক্তির এই প্রকাশক-স্বরূপকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের সমাজে, নিশ্চয়ই আমাদের

সর্বথা শুভের জন্য। আর ইনিই বা আমাদের কথা ভেবে, আমাদের শাশ্বত মঙ্গলের তরে কী দিয়ে গেলেন? তার সার্থক সমুত্তর পাব আমরা এই সাহিত্যসম্পুটে—'মহানামব্রত-প্রবন্ধাবলী'তে।

মহাজনের মুখের কথা—"কানু ছাড়া গীত নাই"—এ অনুভব দীপ্ত হয়েছে মহানামব্রতজীর অমর্ত্য ভাগবত-জীবনে। সেই অনুভবের আলোতেই, শ্রীগুরুকরুণাবলে মহানামব্রতজী দু'নয়ন মেলে প্রত্যক্ষ করেছেন জগৎজোড়া বিশ্বম্ভরের লীলাবৈচিত্র্য। আলোচ্য বিষয় যাই হোক না কেন, কোনওটিতেই তিনি পিছিয়ে নেই। কিছুতেই অনীহা নাই তাঁর। তাই তাঁর প্রবন্ধাবলীর (২য় খণ্ড) গহনে যেমন রয়েছে বেদ-বেদান্তের গূঢ়গম্ভীর রহস্যভেদ, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন আচার্যগণের মতবাদের তাৎপর্য-আলোচনা। বৈদিক সংহিতা, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের আলোয় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যান, উপনিষদ্ প্রসঙ্গ, শংকর ও রামানুজ দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব, পরিণামে অপরোক্ষ অনুভূতির প্রতিষ্ঠা। আগম, নিগম, তন্ত্রাদিতে তাঁর সুষমা গতি। পরম পুরুষার্থলাভের সাধন-আরাধনে তিনি প্রবীণ। দৈবীশক্তি যেমন সর্বভূতে চেতনাময়ী, আচার্য মহানামব্রতের চিন্তাধারা তদ্রূপ সকল শাস্ত্রসাগরেই অবাধ বিচরণশীল। সমন্বয়সাধনে তিনি প্রবাদপুরুষ। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, নাদতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব, অক্ষরতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, পারমাণবিকতত্ত্ব, সকল তত্ত্বই—শরণাগতি ও সংহতিপথে মিলিত হয়েছে তাঁর হৃদয়কন্দরে। যোগমার্গের ষট্‌চক্রকথাও তাঁর আলোচনায় স্ফূর্ত।

পরম বৈষ্ণব মহানামব্রতজীর বিভাবন ও লেখনে শক্তিবাদও সশ্রদ্ধ উচ্চারিত। বিষ্ণুচক্র শালগ্রামের স্নানকালে যে শ্রৌতমন্ত্রটি আবৃত্ত হয়, তার অংশবিশেষ—".....স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্।" অর্থাৎ সেই পুরুষ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যেপেও অতিরিক্ত হয়ে বিরাজমান। "বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলত্বাৎ"—ব্যাপনশীলতাই বিষ্ণুর স্বভাবধর্ম। দৃশ্যাদৃশ্য যা কিছু, সকলের মাঝেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়েও pervade করে আছেন বা অতিরিক্ত হয়ে আছেন অর্থাৎ ঠাঁই দিতে পারেন বা দিতে চাইছেন আরও অনেককে। নিজের আনন্দ তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন সবার মাঝে, সবার বেদনাকে নিজের বলে মানছেন। এ হেন বিষ্ণুর যিনি উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব। আর সেই উদার মহান্ বৈষ্ণবের মানসমন্দিরেই বিষ্ণুর আসন। তাই বৈষ্ণব কাকেও ছেড়ে নাই। কেউই তাঁর অনাদরের পাত্র নন। এ ছবির আয়তক্ষেত্রই মহানামব্রতজীর মনের মণিকোঠা। সেখানে এই ভাবেরই বিথার। বিভিন্ন দেবদেবীর প্রসঙ্গেও তাঁর যত গবেষণা, ততই সার্থক সমাধান। গোস্বামী তুলসীদাসজীর অমর কৃতি শ্রীরামচরিতমানস হতে, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, নানাগ্রন্থের আলোচনায় ধুরন্ধর মহানামব্রতজী মেলে ধরেছেন তাঁর অনুসন্ধিৎসু অন্তরকে, এই প্রবন্ধাবলীর প্রতিপাতে, যা মনকে টেনে রাখে। জন্মাষ্টমীর বিষয়ে নাতিদীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। তার মাঝে এ দুটি পংক্তিই কিনে নেয় অন্তরকে—"....এই কল্যাণময়ী জন্মাষ্টমীর বার্তা শুনাইতে আসিয়াছিলেন নদীয়ার প্রেমের দেবতা। কাঁদিয়াছিলেন তিনি গলদশ্রুধারে জীবের দুয়ারে।

আজ জন্মাষ্টমীর দিনে সেই নদীয়ার কান্নার রোল আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করুক— তবেই মহাদুর্যোগের অবসান ঘটিবে.....।" এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বহু প্রবন্ধই তন্মনা মহানামব্রতজীর লেখনে প্রকাশিত।

তিনি যে বিষয়গুলি রূপকমুখে আমাদের জানিয়েছেন, তার অনেকখানিই অজ্ঞাতপূর্ব। "দেশ" পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেনের "নাম মাধুরী"-র ভূমিকা, ভগবল্লীলাচিন্তামণি, হরিভক্তিবিলাস ও শ্যামসুন্দর নাটকের ভূমিকা, গোপীগীত, ব্রজগীতিকা, বিরহি-মাধব—প্রতিটির সারগর্ভ সরস স্বরূপকথনে আমাদের অন্তর বলাহিত হয়। "নাম মাধুরী"-র ভূমিকায় 'অহল্যা' নামের বিশ্লেষণে এবং রাবণের সীতা চুরি-বিষয়ে মহানামব্রতজীর সারস্বত সন্ধান অনাস্বাদিতপূর্ব অলোক-ভাবময়, অভিনব। সহস্রবিশেষণে বিশেষিত করলেও এর সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তবে লাভ এই হবে—মহানামব্রতের এ সকল সাহিত্যকৃতির মাঝেই আমরা তাঁকে খুঁজে পাব, অজানাকে জানার সাথে সাথে আমরা, যিনি জানালেন তাঁরও করুণাধনে ধন্য হব—মহানামব্রতজীর কলমে "বাচ্যবাচকয়োঃ সমান-রস-স্থিতিঃ"।

এ প্রবন্ধাবলী- ২য় খণ্ডের মাঝে বহু-বিষয়ক বহুতর প্রসঙ্গ সমাহৃত। এগুলি সুজনের বিবেককে আরও পরিপুষ্ট করবে, বোধ করি। পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করে সকলকে উপস্থাপিত করতে গেলে অপর একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। অতএব সে চেষ্টা হতে নিবৃত্ত থাকলাম। পরিশেষে পূজ্যচরণ ব্রহ্মচারীজীর, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবদর্শনের উপরে লিখিত প্রবন্ধগুলি স্মরণ করছি। এগুলি প্রণিধানের সামর্থ্য আমার নাই, কেবল প্রণতি নিবেদন। এব মাঝে বহু লেখার নতুন ও যুগোপযোগী আস্বাদন। 'শ্রীগৌরসুন্দর ও মানবসভ্যতা', 'শ্রীচৈতন্য ও বর্তমান যুগসমস্যা', 'একপ্রাণতার যাদুকর শ্রীগৌরাঙ্গ', 'শ্রীচৈতন্য ও সমন্বয় চেতনা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সবারই পড়া প্রয়োজন, যাতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাবো আমরা। যুগের যিনি কল্যাণকেন্দ্র, যুগের মানুষের পরিচয় হবে, তাঁর সাথে।

বিশেষতঃ কতকগুলি প্রবন্ধ এই সম্পুটকে সাতিশয় অলঙ্কৃত তথা গৌরবান্বিত করেছে। এ পর্যায়ে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে"—প্রবন্ধটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। মুখ্যতঃ যদিও এটি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি একটি প্রতিবাদ-পত্র—তথাপি সপ্রমাণ-সত্যপ্রকাশে, মহদনুভূতি ও সঠিক বিচারের আলোয় তা শিক্ষণীয় ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের প্রতি যিনি সন্দিহান, প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিও তিনি আস্থাহীন—এ সত্যটি সপ্রমাণ বিবৃত করেছেন প্রাবন্ধিক মহোদয়। রক্ষা করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে। এই অনধিকারচর্চাকে একান্তই অনাদর করেছেন তিনি,—"তাঁহাকে অস্বীকার করার মত সাহস, আপনারা কোন্ তপস্যাবলে লাভ করিলেন?" তবে "মর্মে কুঠারাঘাত"ও আদৌ তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারে নাই। পরিশেষে—সত্যসংকল্প ব্রহ্মচারিজীর সুবিবেচিত মন্তব্যেই আলোচনার যথাযথ উপসংহার—"... এমন পবিত্র বস্তু লইয়া এমন বিদ্রূপও এদেশে

চলে! ...ভাবিলাম আরবের কিংবা জেরুজালেমের আচার্যদের লইয়া এরূপ ব্যঙ্গচিত্র করিলে পত্রিকা আপিসে নিশ্চয়ই হামলা হইত।"

এ পর্যায়ে "কেশব কাশ্মিরী" প্রসঙ্গে আলোচনাটিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-পাঠে আন্তর ব্যথাতুর লেখক, এই সারগর্ভ আলোচনায়, বিবাদকে পরিহার করে সঠিক তথ্যপ্রকাশের পাশাপাশি আমাদের পরমার্থ-পথও নির্দেশ করেছেন। অসামঞ্জস্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সামঞ্জস্য প্রাবন্ধিক, যুক্তিসহ প্রমাণপথে আমাদের পরমা গতিনির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি তাঁর রচনা-চাতুরী! মূল সিদ্ধান্ত হতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটেনি তাঁর কথা প্রসঙ্গে। "মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ।" যে-কোন কথাই তিনি বলেছেন প্রতিটিই শাস্ত্রমূলা। দীর্ঘতর আলোচনায় তিনি অবাধে শাস্ত্রমর্ম বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু তা এতটুকুও অপ্রিয় হয়নি—পরিবেশন-চাতুর্যে, তাঁর মত পুণ্যব্রত ঋষিকল্পজনের কলমে বা মননে! সুতরাং মর্মাহতও নিশ্চয়ই কেউ হন নাই। এক্ষেত্রেও তিনি ভক্তমাল-খ্যাত নাভাজীকে সতত স্মরণে রেখেছেন। কৌতূহলীজন এ প্রবন্ধপাঠে পূজ্যচরণ ব্রহ্মচারীজীর সারাসার বিবেক- চাতুর্য বিষয়ে, অবহিত হবেন—আশা করি।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে, ৪ এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত সনাতন ধর্মসম্মেলনে প্রাবন্ধিক ব্রহ্মচারীজী মহারাজ মাননীয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ইষ্টদেবের জয় দিয়ে তাঁর ভাষণের শুভারম্ভ ছিল—"একই সাথে বলো সবে, একই সাথে চলো। সবার অন্তর জানি, সবে বাসো ভালো।।" এই সনাতন শ্রৌত আদর্শেই, তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে। জাতীয় জীবনের তথা সমষ্টি মঙ্গলের সাথে সাথে এই সমারোহে, তিনি ব্যষ্টিকল্যাণের কথা, নাগরিকদের আত্মোন্নতির কথাও বলেছেন, বলেছেন প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে মৈত্রী, কারুণ্য, মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরে অনুরাগের আবশ্যকতার প্রসঙ্গ। তিনি চেয়েছেন—আমরা জীবনে পূর্ণতা লাভ করি। এক একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ (TOTAL MAN) হয়ে সমাজকে, কল্যাণে উত্তরিত করি। উদার মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মনুষ্যত্বলাভের পথে দেবতাত্মা হই ও আদর্শবান আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। সুদীর্ঘ বিশ্লেষণে শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ এত বাস্তব, নিশ্চিত ও সুস্থ জীবনলাভের, তথা ব্যষ্টিকল্যাণ ও সমষ্টিমঙ্গলের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা—জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়নির্বিশেষে যে-কোনও সুবুদ্ধিজনের জীবাতু বলে গণ্য হতে পারবে। তাঁর কোনও কোনও শিক্ষামূলক কথার এক বিশেষ বুদ্ধিপ্রসূত দিক রয়েছে। যেমন—হিন্দু ধর্মের সাধারণ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গের মূল তিনি নির্ণয় করেছেন ছয়টি "গ" কারে— গাভী, গঙ্গা, গয়া, গীতা, গুরু ও গোবিন্দ। তবে, তাঁর চরম আদর্শ—মনুষ্যত্ব লাভ। অন্য নয়।

আমাদের দীর্ঘ জীবনের স্বকৃত ভুলের দিকে, ইদানীংকালে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জাতিভেদ আর বর্ণভেদ যে এক নয়, যুক্তি ও দৃষ্টান্তমূলে, তা তিনিই আমাদের জানালেন। তাঁর এই ভাষণে—জীবনের, সমাজের বা রাষ্ট্রের সকল

দিকই পরিস্ফুট! ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির কথাও বাদ দেননি তিনি। তবে সর্বোপরি মানবধর্মের আদর্শকেই প্রাত্যহিক জীবনে সর্বোত্তম স্থান দিতে হবে। ছোট-বড় ভুলে গিয়ে সবাইকে একান্ত নিজজন বলে মানা চাই-ই। "হিংসা-বিদ্বেষশূন্য হয়ে সংহতিবদ্ধ হব"—এই তাঁর সার কথা।

এই প্রবন্ধপুটের আর একটি সুচিহ্নিত অক্ষর-সম্পদ্—"হিন্দুধর্মে নারীর স্থান" শীর্ষক প্রসঙ্গটি। অঙ্কশাস্ত্র অবলম্বনে, বামভাগে বিরাজিতা মায়ের, অপার গৌরবের কথা জেনে, বুকটি ভরে গেল। শাস্ত্রমূর্তি লেখক মহোদয় শাস্ত্রমর্ম নিষ্কাসন করে, বিবিধ উদাহরণ সহযোগে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচ্যের এই সংস্থিতির মূলে রয়েছে শাব্দপ্রমাণ তথা সহৃদয়জনের অনুভব-প্রমাণ। রামায়ণ ও মহাভারত হতে গৃহীত সীতা ও দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ আমাদের নিবিড়ভাবে আপ্লুত করে। মরমীজনের হৃদয় সরস হয়, নয়ন হয় সজল। গীতা ও ভাগবতের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন সুরগুরুকল্প ব্রহ্মচারীজী মহারাজ। বলেছেন—উভয়ভারতী হতে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা। ছুঁয়েছেন—সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেশান্ত, কস্তুরবা গান্ধী, বাসন্তীদেবী সবারই জীবনকে। এঁদের সামর্থ্য, প্রেরণা, ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রবলের সাহচর্যেই পূর্ণ হয়েছেন সন্নিহিত জনেরা।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে এল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলাধৃত পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গ। পিতৃবিয়োগের পর বিশ্বম্ভরের বিবাহ স্থির হতে চলেছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন "কথো দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন। গৃহস্থ হইলাঙ এবে চাহি গৃহধর্ম।। গৃহিণী বিহীন গৃহধর্ম না হয় শোভন। এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন।।" এ প্রসঙ্গকে প্রামাণিকতা দিতে উদ্ধৃত হয়েছে রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্বের" একটি শ্লোক—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।"

অর্থাৎ মাত্র "গৃহ"কেই গৃহ বলে অভিহিত করা যাবে না। গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ। (কেননা) তারই সাহচর্যে পুরুষের যাবতীয় পুরুষার্থের সম্যক্ বিকাশ ঘটে।

এখানেও গৃহিণীরই মুখ্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে, সনাতন শ্রৌতশাস্ত্রের মধ্যমণি বেদের REFERENCE ও দিয়েছেন পূজনীয় ব্রহ্মচারীজী। পরিশেষে তিনি অন্ধকবি মিলটনের কথা তুলেছেন। আলোচিত হয়েছে সতীকুলমূর্দ্ধন্যা সাবিত্রীর, মৃতপতিকে বাঁচানোর প্রসঙ্গ। বিশেষতঃ তাঁর অপার মনোবলের কথা।

ভাবলে স্তব্ধ হতে হয়, আপন প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে, লোকে-বেদে যা কিছু হয়েছে, সবই একস্থানে গুছিয়ে দিয়েছেন প্রবন্ধকার। ধন্য ধন্য তাঁর অনুসন্ধিৎসা আর সর্বাতিশায়ী প্রজ্ঞান-গৌরব।

শ্রীমৎ মহানামব্রতজীর এই রচনা-মালার মাঝে তাঁর উপদেশগুচ্ছ (আচার্যের বাণী)

কে নায়কমণি (LOCKET) বলে মনে হয়, আমার। প্রথমে সার্থক মানবজীবন—মানবধর্মের নিয়ত অনুশীলনে। পরে বহুবাঞ্ছিত সুর-মুনিগণকাম্য ভাগবতজীবন। তখনই মানুষ একাধারে মানবপ্রেম ও ভগবতপ্রেমে বিহ্বল হয়। নিজে এই চরম অবস্থা লাভ করার পর মানুষের চিত্তে একান্ত সমষ্টিমঙ্গলের বাসনা জাগবে। বিশ্বের মঙ্গলে উদ্বুদ্ধ হবে সে, এই-ই "মহাউদ্ধারণ"। সংসারের যাবতীয় কর্মপ্রবাহই, অন্তিমে যেন মিলিত হয় তাঁর করুণা সাগরে মনে হবে। সবই তাঁর সেবা এ বোধ যেন থাকে, আমাদের। মনে পড়লো একটি শ্লোক—

"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরঃ পুনঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ!, তদস্তু তব সেবনম্।।"

অপরাধবোধ অন্তরে জাগলেই, ক্ষমা প্রার্থী হতে হবে—অনিন্দুক ও সংযমী না হলে আত্মিক মঙ্গল নাই—একথা একান্তই নির্বিকল্প। এ তো গেল সর্বজনীন উপদেশ। শিষ্য-সন্তানদের প্রতি তাঁর কওয়া কথার মাধুর্য তথা গূঢ়ত্ব বলে বোঝাবার নয়! একান্তই অনুশীলন তথা অনুভবের নিধি!!

মহানামব্রতজীর প্রাণকোটিপ্রিয় সর্বস্বধন, বন্ধুসুন্দরের বিষয়েও এই প্রবন্ধাবলীতে বহুতর সরস ভাবগম্ভীর রচনা নিবেদিত হয়েছেন। বিবিধ বিষয় আলোচনাতেও তিনি সিদ্ধজন। হেথা সেথা অনুষ্ঠিত বহু বহু সভা-সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন তা সুখশ্রাব্য ও সহৃদয়ের সঞ্জীবনরসায়নীভূত। দেশের মহামানবদের বিষয়েও তাঁর অনুভূতি সর্বথা স্মরণীয়।

বন্ধুসুন্দরের হাতে গড়া মানুষ তথা মহানামব্রতজীর একান্তজন—নামময় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আস্বাদনকালে কীর্তনমুখে বলেছেন—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—গ্রন্থরূপে শচীসুত।" মহানামব্রতের এ প্রবন্ধাবলীও, তাঁর বাঙ্‌ময় মূরতি—তাঁর অক্ষরস্বরূপ। সপরিজন সাবরণ—তাঁর চরণে আমার বার বার প্রণাম। ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন।

মুখবন্ধ

বাংলার মনন-উৎকর্ষ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, সংস্কৃতির বহু বিচিত্র ধারায় অদ্যাবধি উৎসারিত হয়ে আমাদের মনোভূমিকে সৃষ্টিশীল রেখেছে। কাব্যে কোমলধী, তর্কে কর্কশধী, তন্ত্রে যন্ত্রিতধী বঙ্গমনীষা আপন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে নব নব উন্মেষ ও বোধিবিকাশে কতদূর অগ্রসর হতে পারে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বিপুল শাস্ত্র-সাহিত্য রচনায়, ঊনিশ-বিশ শতকে রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ হয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের লেখায় তার অজস্র প্রমাণ ছড়ানো। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পথ ধরে গোস্বামীদের যট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত একদা বৈষ্ণব ভাবনাদর্শে দেশকে আহ্লাদিত করেছিল। রামমোহন, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বেদ-বেদান্ত নতুনকালে নতুন মাত্রা পায়। কোন কিছুকে নস্যাৎ করে নয়, সব কিছুতে ভূমানন্দের প্রকাশ অনুধাবন করে 'আনন্দ আছে নিখিলে' এই উপলব্ধিতে উত্তরণের আস্থা এঁদের বিশিষ্ট করেছে। আচার-প্রচারের সংকীর্ণতায় নয়, সর্বজনীন, সর্বাত্মক মানবকল্যাণে তার সার্থকতা। জীবনাচরণে, ব্যাখ্যায়, ভাষ্যে এই উজ্জ্বল আদর্শকে যাঁরা মূর্ত করেছেন, তাঁরা মানবসমাজের মার্গপ্রদর্শক আচার্য, গুরু এবং পিতা। উপনিষদ্ বুঝি তাঁদেরকেই সম্বোধন করে বলেছে—"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ইতি।"

বিশ শতকে বাঙালীর উদার ধর্মভাবনা ও অধ্যাত্মদর্শন পর্যালোচনার জগতে শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি উজ্জ্বল নাম। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী মননের আলোয় তিনি বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ, শক্তিবাদ, ইত্যাদি যেমন, তেমনি সাহিত্যিক রসনিষ্পত্তি, বিজ্ঞানের সীমা এবং শ্রীঅরবিন্দ, নিগমানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, দিলীপকুমার রায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সমেত সমকালীন নানা বিজ্ঞজন-এর সারস্বত কৃতিত্ব সম্বন্ধে ছোট-বড় বহু প্রবন্ধ লিখে আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় শাস্ত্র অভিনব তাৎপর্যলাভ করেছে। যেমন আকাশে মেঘগর্জনের দ-দ-দ শব্দের অর্থ করে উপনিষদ্ জানিয়েছিল—দেবতাদের জন্য দম, মানুষদের জন্য দান আর অসুরদের জন্য দয়ার কথা আছে তাতে। মহানামব্রতজী বললেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই খানিকটা দেবতার ভাব, খানিকটা মানবীয় ভাব, খানিকটা আসুরিক ভাব। দেবতার ভাবকে বলা হইয়াছে, কাম ত্যাগ করিয়া দান্ত হও। মানবীয় ভাবকে বলা হইয়াছে লোভ ত্যাগ করিয়া দান কর। আসুরিক ভাবকে বলা হইয়াছে, ক্রোধ ত্যাগ করিয়া দয়া কর। .... সৃষ্টিকর্তা আমাদিগকে বলিতেছেন—"দ-দ-দ' ইতি দাম্যত.দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি।" না জেনে, ন বুঝে শাস্ত্রকথা প্রসঙ্গ বলা তিনি অনুমোদন করেননি। তাঁর মন্তব্য—"আমরা কিছু জানি না বলিয়া যে কোন কথাই বেদে আছে বলিয়া চালাইয়া দিতে পারি। ....সমালোচনা করার লোকও নাই।"

শ্রীঅরবিন্দের ঋষিদৃষ্টিকে শ্রদ্ধায় সম্মানে মহানামব্রতজী অভিবাদন জানিয়েছেন। "দেশের কোটি কোটি ভাইবোন যাহারা অনাহারে মরিতেছে, কষ্টে দুঃখে কোনমতে বাঁচিতেছে তাহাদিগের

সেবা করাই হইল ধর্মকার্য। ... ইহাই তাঁহার প্রথম সংকল্প। ... ভারত বলিতে ঋষিবর কতগুলি মাঠ-ঘাট বন পর্বত নদনদী বুঝিতেন না। ভারত একটি জীবন্ত সত্তা, ভারত তাঁহার জননী, পূজার পাত্রী, ভক্তির পাত্রী। ... বিশ্বাস করিতেন যে মাকে মুক্ত করিবার, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল তাঁহার আছে। জ্ঞানের বল। ... এই তেজোবলে ভারত উদ্ধার তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। ... তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ... ঋষিবর বিশ্বাস করিতেন যে অহংসর্বস্ব মানুষ পশুর স্তরে, আর অহংশূন্য মানুষ দেবভূমিতে। ক্রমোন্নতির ধারা হইতেছে মানবের মধ্যে শ্বাপদের বা বন-মানুষের প্রকৃতিকে ক্ষয় করিয়া উঠিয়া চলা। দেবত্বে পৌঁছিয়া দিব্যজীবন লাভ করাই সাধনার পরিপূর্ণতা।"'

বঙ্গভূমিতে সমন্বয়ের সংস্কৃতির ঐতিহ্য মহানামব্রতজীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। "বাংলা ছিল হিন্দু ও মুসলমানের মিলনভূমি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্বে এই দুই জাতিতে ছিল সংঘাত। মহাপ্রভু মিলন ঘটালেন। সেই ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমকে প্রবাহিত করে চলছিল। তারপর একালে পাক শাসন। ... কিন্তু বাঙালী মুসলমান তা মেনে নেয়নি। ওরা ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনে শহীদ হয় মাতৃভাষার জন্যে। ... সেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি ও মিলন....।"

নানান দর্শনের মধ্যেও এই সমন্বয়সূত্র সন্ধানেই ব্রতী ছিলেন মহানামব্রতজী। 'সকল দর্শনই একটা মহাসত্যকে বহু দিক্ হইতে দেখিতেছে।" বিবেকানন্দের চল্লিশ বছর পর তিনি শিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে বলেন—"অন্যান্য ধর্মেরও মূলতত্ত্ব এক। হিন্দুধর্মের মূল কথা অহিংসা, অচৌর্য, শৌচ, সংযম ও সত্য। ইসলামধর্মের মূলকথা একেশ্বরবাদ ও নৈতিক জীবনকে উন্নীত করা। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা ঈশ্বর লইয়া তর্ক ত্যাগ করা। নৈতিক জীবনে উন্নীত হইয়া বুদ্ধত্ব (Enlightened Stage) বা মহামানবত্ব লাভ করা—আমি এশিয়ার এই তিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বলিয়াছি। তাই আমি সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি। হিন্দুধর্মের একটি শাখা বৈষ্ণব ধর্ম। তার মধ্যে একটি শাখা গৌড়ীয় সম্প্রদায়। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্রশাখা মহানাম সম্প্রদায়। আমি এই শাখার একটি পত্র। আমার সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইলেও তার বাণী বিশ্বজনীন। ....তাই আমি সকল বক্তৃতার শেষে বলিতাম—

"The whole world our family, the sky our canopy,
Nature our bed, Earth our world-mother,
All beings brothers,
Hari-purusha Jagatbandhu over our head."

অর্থাৎ 'ভিন্ন ঘাট, এক জলাশয়।' 'মহানামব্রত প্রবন্ধাবলী'র সারস্বত সরোবরে পুণ্যস্নান এমনিভাবে আমাদের মানস উত্তরণ ঘটায়। প্রসাদ, মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণে এ রচনা সর্বথা মনোগ্রাহী। 'স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারম্ অস্য রসিকা যথেপ্সিতম্।'

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ড

সূচীপত্র

বেদ-বেদান্ত ও দর্শন

তন্ত্র ও মাতৃসাধনা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব দর্শন

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ও পরিকর

বিবিধ

বিষয়	পৃষ্ঠা

মহাজীবন স্মরণে

বিষয়	পৃষ্ঠা

ভূমিকা ও শুভেচ্ছাবাণী

ইংরাজী রচনা বিভাগ / English Section

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী

(২য় খণ্ড)

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ড

বেদ-বেদান্ত ও দর্শন

বেদ প্রসঙ্গ

আমরা ছেলেবেলায় যখন অঙ্ক শিখতে আরম্ভ করি তখন আমরা বলি একে চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ। আকাশে চন্দ্র একটা। পাখীর দুইটা পাখা বা মাসের মধ্যে শুক্ল পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ দুইটা পক্ষ। আমাদের দুইটা চর্ম চক্ষু। দেবতাগণের তিনটা চক্ষু। কপালের মধ্যে একটা চক্ষু—জ্ঞান-চক্ষু। সেই চক্ষু আমাদেরও আছে, এখনও ফোটেনি। আর বেদ চারখানা।

বেদ মনুষ্যকৃত নহে। বেদের এক নাম শ্রুতি। বেদের আর এক নাম দৈবীবাক্। উহা দেবতাদের বা ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের বুদ্ধিশক্তির মূলে আর একটি শক্তি আছে তাহার নাম বোধি। এই বোধিশক্তি যাঁহাদের উত্তমরূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহাদের আমরা বলি ঋষি। দৈবীবাক্ ঋষিদের কর্ণে শ্রুত হয়। ইহাই বেদ। ঋষিরা কখনও নিজেদের মন্ত্রকৃৎ বা মন্ত্রনির্মাতা বলেন নাই। এই জন্য বেদ কোন পুরুষকৃত নহে, উহা অপৌরুষেয়।

হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্মেও বেদ আছে, তাহার অন্য নাম। বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, মুসলমানদের কোরান, খৃষ্টানদের বাইবেল— ইহারাও তাঁহাদের কাছে বেদ। এইসব গ্রন্থ ঈশ্বরকৃত বা ঈশ্বর-ভাবে বিভাবিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের মুখোদ্গীর্ণ। বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের লোকেরা তাঁহাদের বেদ (ত্রিপিটক, কোরান, বাইবেল) সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে এবং তাঁহাদের উহা নিয়মিত পড়ানো হয়। আমাদের হিন্দুদের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের বেদ পড়াবার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের চরম। মুসলমানরা এই দেশে পাঁচশো বছর রাজত্ব করিয়াছে, কয়েক লক্ষ লোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতিটাকে জয় করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরেজ জাতি আড়াই-শ' বছরেই আমাদের সংস্কৃতিটাকে জয় করিয়াছে। আমরা এখন বাবা না বলিয়া father বলি, স্ত্রী না বলিয়া wife বলি, ছেলেপিলেদের ইংরেজ পোশাকে সাজাইয়া গর্ব

---

* *'সনাতনী'। শ্রীমৎ বাণ্ডা ঠাকুর প্রবর্তিত অমৃত সংঘের মাসিক মুখপত্র। অবন্তীপুর, শ্যামনগর। ১৪০৯/২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ২০০২। সম্পাদক - শ্রীসুজন চন্দ।*

অনুভব করি। আগে আমরা কোন কিছু লিখিবার পূর্বে 'নমঃ গণেশায়' বা 'কালীমাতা সহায়'— এই রকম একটা না একটা কিছু লিখিতাম, এখন লিখি না। শুনিতাম কোন কিছু লিখিলে নম্বর কাটা যাইবে। তবুও ইংরেজরা তাহাদের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের বাইবেল পড়াইয়াছে। পরীক্ষায় বাইবেলে দশ নম্বর থাকিত। ইহা ঐচ্ছিক হইলেও আমরা অনেকেই নম্বর পাইবার লোভে পড়িয়াছি। আমরা আমাদের বেদ হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছি যে কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনে অধঃপতনের ইহা একটি প্রধান কারণ। যত জন যত উৎসব অনুষ্ঠান করেন সকলেই সপ্তাহে একটা দিন অন্ততঃ বেদ শিক্ষা করুন, আর সকলকে শিক্ষিত করুন। ইহাতে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি হইবে।

আমাদের বৈদিক সাহিত্য অনেক বিরাট্। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। আমরা কিছু জানি না বলিয়া যে-কোন কথাই বেদে আছে বলিয়া চালাইয়া দিতে পারি। শনিপূজা সন্তোষীমার পূজাও চলিয়া যায়। সমালোচনা করার লোকও নাই।

নূতন দেবতা প্রবেশ করুক তাহাতে বেশী কিছু মনে করি না, কিন্তু সর্বজন-পূজিত দেবতারা যে সরিয়া যাইতেছে তাহা বেশী দুঃখের। কালীমাতা বৈদিক দেবতা কিনা ইহা লইয়া অনেক গবেষণা আছে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মা কালীর পূজা হিন্দুরা করিয়া আসিতেছে। ইহারা দিনে দিনে সরিয়া যাইতেছে। ❒

'জয় জগদ্বন্ধু'

"দ - দ - দ"

প্রজাপতির তিন পুত্র। দেবতা, মানুষ ও অসুর। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে পরপর তিন পুত্রই পিতার নিকট আসিলেন।

প্রথমে দেবতাপুত্র বলিলেন, "পিতঃ! কিছু উপদেশ দিন।" প্রজাপতি বলিলেন, 'দ'। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বুঝিলে তো কী বলিলাম?" দেবপুত্র বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি। আপনি আমাকে বলিলেন 'দাম্যত'— দান্ত শান্ত হও।" পিতা বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ।"

তৎপর মনুয্যপুত্র আসিয়া বলিলেন, "পিতঃ! কিছু উপদেশ দিন।" প্রজাপতি বলিলেন, 'দ'। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বুঝিলে তো কী বলিলাম?" মনুয্যপুত্র বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি। আপনি আমাকে বলিলেন 'দত্ত'—দান কর।" পিতা বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ।"

সর্বশেষ অসুরপুত্র আসিয়া বলিলেন, "পিতঃ! কিছু উপদেশ দিন।" প্রজাপতি বলিলেন, 'দ'। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বুঝিলে তো কী বলিলাম?" অসুরপুত্র বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি। আপনি আমাকে বলিলেন, 'দয়ধ্বং' দয়া কর।" পিতা বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ।"

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে খানিকটা দেবতার ভাব, খানিকটা মানবীয় ভাব ও খানিকটা আসুরিক ভাব। দেবতার ভাবকে বলা হইয়াছে কাম ত্যাগ করিয়া দান্ত হও। মানবীয় ভাবকে

* *বার্তা, জলপাইগুড়ি। সম্পাদক—শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।*

বলা হইয়াছে লোভ ত্যাগ করিয়া দান কর। আসুরিক ভাবকে বলা হইয়াছে ক্রোধ ত্যাগ করিয়া দয়া কর।

এখনও যখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তখন তাকাইয়া দেখিবেন—'দ - দ- দ' এই তিনটি অক্ষর তাহাতে দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্তা আমাদিগকে বলিতেছেন—

"দ-দ-দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি।
তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।।" ❏

(শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পঞ্চমাধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অবলম্বনে লিখিত।)

বেদের প্রাচীনতা

ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে একটি সূক্তে দেবতা সরস্বতী, ঋষি বশিষ্ঠ।

"একা চেতৎ সবস্বতী নদীনাং শুচির্যতী।
গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।।" (ঋ. ৭/৯৫/২)

নদী সকলের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী ইহা জানেন। সরস্বতী অর্থাৎ পুণ্যতোয়া নদী, যে-নদী গিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত গিয়াছে। এই কথা বেদমন্ত্রে আছে। বর্তমানে সরস্বতী নদী বাজস্থানের বিকানীর অঞ্চলে মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন্ প্রাচীন যুগে সরস্বতী সমুদ্র পর্যন্ত ছিল তাহা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কেট্‌কার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি পুরাতত্ত্বের বিবিধ দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ৭৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সরস্বতী মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রের বিদ্যমানতা খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে সাত হাজাব বৎসব পূর্বে ছিল। বশিষ্ঠ ঋষির নিকট ঐ মন্ত্র কখন মূর্ত হইয়াছিল তাহা আমরা কেহ জানি না। পরম পণ্ডিত *Rigvedic India* গ্রন্থের লেখক অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ৮ পৃষ্ঠায় কেট্‌কার মহোদয়ের এ সিদ্ধান্ত বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার *The Orion* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যখন সূর্য মহাবিষুব সংক্রান্তিতে মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট অবস্থিত আর্দ্রা নক্ষত্রে অবস্থান করিত সেই সময় ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত প্রকট হইয়াছিল। এই সময় ঘটিত মোটামুটিভাবে ৪০০০ হইতে ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত।

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জেকবি (H. Jacobi) পূর্বোক্ত তিলক মহোদয়ের সঙ্গে কোন আলোচনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তথ্যের গবেষণা করিয়াছেন। আশ্চর্যরূপে দুইজনেই (তিলক ও জেকবি) একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাঁহারা উভয়েই বলেন — সংহিতার কাল বসন্তকালীন বিষুব সংক্রান্তি মৃগশিরা (Orion) নক্ষত্রে হইয়াছিল এবং গণনা করিলে তাঁহার কাল ৪৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পাওয়া যায়।

আর একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ড. বুলার তিলক ও জেকবির সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — অধ্যাপক জেকবি ও তিলকের সিদ্ধান্তকে আমি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি না। মৃগশিরা নক্ষত্রের যে প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন আমি তাহা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

Indian Antiquary পুস্তক মতে খৃঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসর ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বয়স (248 পৃষ্ঠা)। তাহার অনেক পূর্বে বেদসংহিতাব মন্ত্রের প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে নিত্যগ্রন্থ ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য বেদের কাল আলোচনার কোন কথাই উঠে না। যাঁহারা মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক কোন যুগে বেদ ঋষিগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল — তাঁহাদের জন্য বেদের কাল বিচার। আজ হইতে অন্তত ১০ হাজার বৎসর পূর্বে বেদের প্রকাশ ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদসংহিতাকে যাঁরা অপৌরুষেয় ভাবেন তাঁদের পক্ষেও ব্রাহ্মণগুলি, আরণ্যকসমূহ ও উপনিষদ্ সমূহকে অপৌরুষেয় ভাবা কঠিন। এসব একই সময়ের নহে। ❑

বেদের অগ্নিসূক্ত

মন্ত্রস্য অয়মারম্ভঃ

বেদের শেষাংশ বা মুখ্যাংশ উপনিষদ্। উপনিষদে স্থাপিত হইয়াছে ব্রহ্মতত্ত্ব। বেদান্ত উপনিষদের সংক্ষিপ্তসার। বেদান্তে উপাস্য ব্রহ্ম। বেদ-সংহিতা দেববাদী। বেদান্ত ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবাদের সাধনা ধ্যান। দেববাদের সাধনা যজ্ঞ। যজ্ঞ আর যাগ একই শব্দ। যাগ আর যোগও খুব নিকটবর্তী শব্দ। বেদসংহিতায় যাগের কথা ও বেদান্তে যোগের কথা। যাগ বা যজ্ঞ বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রধান। যোগ মানস আত্মিক নিবিষ্টতা প্রধান। বেদান্তের সূত্রগুলি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সূত্রে চতুর্থ বা শেষপাদে সাধনা ও উপাসনার কথা আছে। এখন সংহিতার সাধনার কথা অনুধাবনীয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রথম ঋক্—

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।। ১।।

মন্ত্রটির দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। মন্ত্রটির ছন্দ গায়ত্রী। তিন পাদ। প্রত্যেক পাদে ৮ টি অক্ষর। যজ্ঞে অত্যাবশ্যক বস্তু অগ্নি। মন্ত্রটি অগ্নির স্তব। যজ্ঞ বলিতে কী বুঝি তাহা সর্বাগ্রে আলোচ্য। অগ্নিতে ঘৃত-আহুতি দান হইল যজ্ঞের বাহিরের দৃষ্ট রূপ। দেবতার উদ্দেশ্যে এই আহুতি। ঘৃত শব্দের অর্থ অনির্বাণ বলেন—'জ্যোতির ধারা'। ঘৃ ধাতুর অর্থ দীপ্ত হওয়া। যজ্ঞ কর্ম করার ফল কী? গীতা বলেন—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।"

** 'দিবা দর্শন'। বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত দেবসংঘের মুখপত্র। সম্পাদক ঃ শ্রীমৎ সৌমোন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ৪৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। (চৈত্র ১৪০২) দেওঘর।*

যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্ধনা কর। দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। (৩/১১)

দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য ত্যাগ বা দ্রব্য উৎসর্গ তাহার ফল দেবতাদের সঙ্গে সাযুজ্য। এই সাযুজ্য ঘটিলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। শ্রেয়টি কী? বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দের একাকারতা। মন্ত্রটিতে বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা বলিতেছেন—আমি অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি যজ্ঞে পুরোহিত, অগ্নি হোতা, অগ্নি দীপ্তিমান্। অগ্নি যজ্ঞে ঋত্বিক্, অগ্নি রত্নধারী, উৎকৃষ্ট রত্নদাতা। অগ্নি যজ্ঞে দিব্য ঋত্বিক্। ঋতুর রহস্যজ্ঞান না থাকিলে তিনি ঋত্বিক্ হইতে পারেন না। ঋতু শব্দটি উপলক্ষণ—ঋতু বলিতে বর্ষাদি ঋতু, অগ্রহায়ণ প্রভৃতি মাস, পূর্ণিমা-অমাবস্যাদি তিথি, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র—যজ্ঞের কাল বুঝায়। যিনি ঋতুর তত্ত্ব জানেন গীতার ভাষায় তিনি অহোরাত্রবিদ্ অহর্বিদ্। কোন্ সময় কোন্ যজ্ঞ কোন্ ভাবে হইবে ইহা যিনি জানেন তিনি ঋত্বিক্। অগ্নি ঋত্বিক্। নিজেই নিজের যজ্ঞ করেন। বস্তুতঃ যজ্ঞ আমি কবি না, আমার মধ্য দিয়া তিনিই আহুতি দেন। তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে জাগে আকৃতি। আকৃতির ফলে আসে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আমাকে প্রবর্তিত করে যজ্ঞকর্মে। যজ্ঞ হয় ভিতরে ও বাহিরে। বাহিরের যজ্ঞ যজ্ঞবেদীতে। অন্তরের যজ্ঞ হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যাহা প্রয়োজন তন্মধ্যে পুরোহিত সর্বপ্রধান। পুরঃ অর্থাৎ অগ্রভাগে সম্মুখে যিনি। স্থাপিত অগ্নি আর অগ্রণী কেমন যেন একই কথা। সকলের অগ্রণী অগ্রে গমনকারী সম্মুখে সংস্থাপিত অগ্নি। অগ্নি আমাদের দেওয়া দ্রব্য দেবতাদের নিকট লইয়া যান। আমরা দেই ঘৃতাহুতি। ঘৃত হইল দুগ্ধের নির্যাস। দুগ্ধ হইল সত্ত্বগুণ, তাই শুভ্র। গাভী কালো হউক, লাল হউক দুগ্ধ কিন্তু শুভ্রই। আমরা লোক ভালই হই আর মন্দই হই—আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ আছেই—না থাকিলে সত্তাই থাকিত না। কবিত্ব থাকিলেই কবিতা হয়। সত্ত্বগুণ থাকিলেই সত্তাটা বজায় থাকে। দুগ্ধ ঘনীভূত হইলে দধি। তাপ দিয়া সকল মলিনতা নিঃশেষ করিয়া দিলে হয় ঘৃত। ঘৃত শুদ্ধ সত্ত্বের প্রতীক। ঘৃত আমাদের নির্মল আনন্দ চেতনা। তাহা আমরা দেই দেবতাদের উৎসর্গ করিয়া। তারপর অগ্নি কেবল তাহা দেবতাদের হাতে পৌঁছাইয়া দেন না, অগ্নি দেবতাদেরও পুরোহিত কিনা—তাই দেবতারা যাহা আমাদিগকে প্রদান করেন তাহাও লইয়া আসেন আমাদের সমীপে। দেবতারা দেন তাঁহাদের শুভ আশীর্বাদ—কল্যাণময় প্রসাদ। সেই প্রসাদে "সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" দুঃখের নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ পদবাচ্য। যজ্ঞে প্রয়োজন সমিধের। সমিধ্ টুকরা কাঠ এক বিঘৎ লম্বা বুড়া আঙ্গুলের মত মোটা। পলাশ, অশ্বত্থ অথবা যজ্ঞডুমুর গাছের কাঠ। ইহা হইল যজ্ঞবেদীর যজ্ঞের সমিধ; আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে যজ্ঞ তাহার সমিধ্ হইল চিত্তের লালসা। পরম দেবতাকে পাইবার জন্য তীব্র লৌল্য বা লোলুপতা। এই লোলুপতা জাগিলেই সাধ জাগে ভাবময়ের আনন্দ-সেবায় জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া রাখিবার। সমিদ্ধ অগ্নি হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তোলেন উষার আলো। উষার আলো একটা সংকেত। কিসের সঙ্কেত? এখনই সূর্য উদিত হইয়া আলোকের প্লাবন আনিবেন। সেই প্লাবনের সংকেত। মন্ত্রে আছে 'অগ্নিমীলে'। ঈড় ধাতুর কার্যটি হইল ঈডন বা ঈলন। ঈড়ন তিন প্রকার—বাক্য দ্বারা স্তবন, ঘৃত দ্বারা বর্ধন ও নমঃ দ্বারা পূজন।

ঈলিত অগ্নি পবমান সোমের সহায়তায় চিত্তে আনন্দের ধারা আনিয়া দেন। ঈলনের পর অগ্নির আধান। আধান পদে স্থাপন বুঝায়। যিনি ছিলেন অন্তরে ঘুমন্ত তাঁহাকে চেতনার পুরোভাগে সংস্থাপন। অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা। তাই অগ্নি জীবনযজ্ঞে পুরোহিত। আমার ঊর্ধ্বমুখী যাত্রাপথে তিনি দিশারী। অগ্নি সর্বদাই ঊর্ধ্বশিখ। তাঁহাকে পুরোভাগে রাখি দিশারী রূপে, তাই তিনি পুরোহিত। তিনি আমাদের আত্মজ্যোতিঃকে বিশ্বজ্যোতিঃতে পরিণত করিবার জন্য ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন।

যজ্ঞ শুধু বাহিরের অনুষ্ঠান নহে। বাহির ভিতর দুই অনুষ্ঠান যুগপৎ চলে। যজ্ঞ অন্তরে বিদ্যার সাধনাও। তাহার মূলে থাকে 'ধী'। ধী দেবতার আশীর্বাদ। দেবতা বরেণ্য। আমাদের শুধু তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যখন আমরা তাঁহাকে অন্তর দিয়া বরণ করি—তিনি হইয়া উঠেন আনন্দে উচ্ছল। যজ্ঞের ফলে আমাদের হয় দেবজন্ম। তিনি তখন গীতার ভাষায় বীজপ্রদ পিতা। তিনি পিতা হইয়া জন্ম দেন। হোতা হইয়া পরিপালন করেন। পরিপালন করেন রত্ন দ্বারা। রত্ন হইল অমৃত-চেতনার দীপ্তি (অনির্বাণ)।

উপনিষদের ভাষায় রত্ন 'প্রজ্ঞা-ঘনতা', দর্শনের ভাষায় 'মুক্তি', আর বৈষ্ণবের ভাষায় 'প্রেমভক্তি'। অগ্নির এক নাম পাবক। এই অগ্নিমন্ত্র স্মরণ মনন করিয়া আমরা পাবক হই। অন্তর বাহির পবিত্র হয়। "ইন্ধনকে আত্মসাৎ করে অগ্নি তাকে অগ্নিময় করে তোলেন যেমন মানুষের মধ্যে উদ্দীপ্ত চেতনা মানুষকে দেবত্বে রূপান্তরিত করে ধরে।" ('বেদমন্ত্র-মঞ্জরী' পৃঃ ১৬) তেমন পাবকের আমরাও পাবকত্ব লাভ করি।

দ্বিতীয় মন্ত্র

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি।। ২।।

অগ্নিদেবকে পূজা করা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহা নূতন কথা নহে। আমরা তো আধুনিক, যাঁহারা প্রাচীন ঋষি তাঁহারাও এইভাবে পূজা করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিদেব পূজ্য দেবগণকে এই যজ্ঞস্থলে সম্যক্‌ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। অগ্নি একজন অভিনব পূজ্যদেবতা। তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি অন্যান্য পূজ্য দেবতাগণকে তৎসহ লইয়া আসেন। সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিলে ফলতঃ অন্যান্য দেবগণকে পূজা করা হয়।

এই আধুনিক ও প্রাচীন কতকাল পূর্বে তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পূর্বের 'বেদ কত প্রাচীন' প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

চিন্তা করিলে দেখা যায় যাঁহারা ছয় সাত-হাজার বছরের পুরাতন ঋষি তাঁহারাও নিজেদের আধুনিক বলিয়াছেন। ইহাতে অগ্নিপূজা যে কত প্রাচীন তাহা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। ঋষি মধুচ্ছন্দা বলিতেছেন—আমরা যে অগ্নিকে অর্চনা করিতেছি ইহা প্রাচীন ধারা অনুসারেই।

তৃতীয় মন্ত্র

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ। পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্।। ৩।।

অগ্নি 'রত্নধাতমম্' এই কথা প্রথম মন্ত্রে বলিয়াছেন। সেই কথাকেই আরও স্পষ্ট

করিতেছেন এই মন্ত্রে।

'অগ্নিনা'—অগ্নি পূজা দ্বারা অথবা অগ্নির কৃপায় সাধক রয়ি অর্থাৎ সর্ববিধ ধন—লৌকিক ধন এবং আত্মিক ধন পাইয়া থাকে। সেই ধন কীরূপ তাহা বলিতেছেন—এমন ধন যাহা 'দিবে দিবে' 'পোযম্' অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই বর্ধমান। অগ্নির কৃপালব্ধ ধন কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। স্বর্গীয় যে আনন্দ-ধন তাহা অক্ষয়। কেবল অক্ষয় নহে দিনে দিনে বর্ধমান, প্রতিদিনই বাড়িতে থাকে। সেই ধন আর দুইটি বিশেষণ দিয়া বলিতেছেন—'যশসম্' ও 'বীরবত্তমম্'। যশোদায়ক। অগ্নি যে অন্নদ বলদ ইহা পরবর্তী মন্ত্রে বলিবেন। অগ্নি অন্নদাতা বলদাতা যশোদাতা। 'বীরবত্তমম্'—অত্যন্ত বিশিষ্ট প্রেরণাদায়ক, কল্যাণময় কর্মে অত্যন্ত উৎসাহদায়ক।

চতুর্থ মন্ত্র

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং। বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।। ৪।।

অধ্বর অর্থ পবিত্র যজ্ঞ—হিংসাহীন যজ্ঞ। হিংসাযুক্ত যজ্ঞ নিন্দিত। হে অগ্নে! যে-যজ্ঞ হিংসাশূন্য, শুধু মনুষ্যের কল্যাণার্থ অনুষ্ঠিত, সেই যজ্ঞই দেবতা-সকলের প্রতি গমন করে অর্থাৎ দেবগণকে প্রসন্ন করে। ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল যে, যে-যজ্ঞের উদ্দেশ্য অপরের ক্ষতিসাধন, তাহাতে অগ্নি অবস্থান হয় না, তাহা সর্বজন-নিন্দিত কার্য। পূর্ব মন্ত্রে যে বলা হইযাছে তোমার দত্ত ধন দিনে দিনে বর্ধনশীল যশোদায়ক, নিন্দিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানলব্ধ ধন সেই রূপ হয় না।

পঞ্চম মন্ত্র

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ। সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ।। ৫।।

অগ্নিদেবতা সকল দেবগণের আহ্বানকারী। তিনি কবিক্রতু। ক্রতু শব্দের অর্থ যজ্ঞ—ব্যাপক অর্থে সংকল্পিত কর্ম। কবিক্রতু—কবির মত যাহার কর্ম-সংকলন। কবি অর্থ ক্রান্তদর্শী সাধক। সর্বজ্ঞ সাধকের মত কর্ম-সংকল্প যাঁহার—Macdonell সাহেব বলেন— 'having the knowledge of a sage'।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন— 'sacrificial will'।

অগ্নি পরমেশ্বরের তপঃশক্তি—যে-তপঃশক্তি আমাদের সংকল্পের পরিচালক। অগ্নিকে বলা হইয়াছে সত্য, যাহা সর্বদা বিদ্যমান। সৎ—অস্তিরূপে যাহার স্থিতি চিরন্তন তিনি সত্য। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সত্য শব্দের অর্থ বলিয়াছেন তিনটি অক্ষর লইয়া—'স' অর্থ অমৃত, 'ত' অর্থ মর্ত্য, ঊর্ধ্বের অমৃত ও নিম্নের মর্ত্যকে যাহা নিয়মবদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে তাই যম্ বা 'য'। অগ্নি এই সত্যের মূর্তি।

অগ্নির আর একটি বিশেষণ 'চিত্রশ্রবঃ'। শ্রব শব্দের অর্থ গুণরাশি। চিত্র অর্থ বিচিত্র। চিত্রাণি আশ্চর্যময়ানি শ্রবাংসি গুণরাশয়ঃ যস্য সঃ চিত্রশ্রবঃ। 'দেব'—যিনি সর্বদা দেদীপ্যমান। এবম্ভূত যে অগ্নিদেব তিনি দেবগণসহ 'আগমৎ'—আগচ্ছতু। এই সকল গুণশালী অগ্নিদেবতাকে

আবাহন করিতেছি।

ষষ্ঠ মন্ত্র

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ।। ৬।।

হে অগ্নে! 'দাশুষে' তোমাকে অর্ঘ্য প্রদানকারী, আত্মনিবেদনকারী সাধকের জন্য তুমি 'যৎ ভদ্রং তৎ করিষ্যসি' যাহা কল্যাণময় তাহাই তুমি কর। তাহা 'তব ইৎ এব' তোমার যোগ্য (অপর কেহ কল্যাণযোগ্য কিছু করিতে সক্ষম নহে।) 'এতৎ সত্য'—ইহা সত্য—ইহাতে কোন সংশয়াবকাশ নাই। একমাত্র তুমিই মানবের কল্যাণ বিধানকারী।

সপ্তম মন্ত্র

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে। দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি।। ৭।।

হে অগ্নি! আমরা তোমার অর্চনাকারিগণ নিজেদের অশেষ দোষাবহ জানিয়া মানস ধ্যানে তোমার অগ্রে প্রণত হইয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম 'এমসি'। (উপ-আ-ইমসি)

অষ্টম মন্ত্র

রাজন্তমধ্বরাণাং। গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।। ৮।।

হে অগ্নি! তুমি হিংসারহিত যজ্ঞকর্মে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, সম্পদে বিপদে দেদীপ্যমান। তুমি ঋতের রক্ষক। নিখিল বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারক তুমি নিত্য বর্ধিষ্ণু সত্যস্বরূপ পরম ঈশ্বর। এইজন্য তোমাকে ভজনা করি।

নবম মন্ত্র

স নঃ পিতেব সূনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।। ৯।।

অগ্নি দেবতার স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞান হৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে জাগ্রত হইলে ভক্ত-সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—হে অগ্নি! কল্যাণময় জীবন-যাপনের জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাক। পিতা যেমন পুত্রের স্বচ্ছন্দগম্য, পরম মঙ্গল লাভের জন্য, আমাদের পরম স্বস্তি লাভের জন্য, অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার প্রকৃত অস্তিত্ব যাহাতে শোভমান হয় সেইজন্য তুমি আমাদের নিকটে এস। পিতার মত যেন সহজে তোমাকে পাই।

এই অগ্নিসূক্তের ইংরাজী অনুবাদ—

1. I adore the Flame, the vicar, the divine Ritwik of the Sacrifice, the Summoner who most founds the ecstasy.
2. The Flame adorable by the ancient sages is adorable too by the new. He brings here Gods.
3. By the Flame one enjoys a treasure that verily increases day by day. glorious, most full of hero-power.
4. O flame! the pilgrim sacrifice on every side of which thou art with the environing being. that truly goes among the Gods.

listenings, may become a God with the Gods.

6. O Flame! the happy goods which thou shalt create for the giver is that truth and verily thine, O Angiras!
7. To thee, O Flame! we day by day, in the night and in the light, come carrying by our thought the obeisance.
8. To thee reignest over our pilgrim-sacrifices, luminous guardian to the Truth, increasing in thy own home.
9. Therefore, He of easy access to us as father unto his son, cling to us for our happy state.

এই অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দের *Hymns to the Mystic Fire* গ্রন্থের (পৃষ্ঠা 39-40)।

অগ্নি সূক্তের ভাব অবলম্বনে কবিতা—

পূত যজ্ঞবেদী অগ্রে যাঁর স্থিতি অগ্নিদেবে স্তুতি করি।
পুরোহিত তিনি সর্বভাবে যিনি পুরী সংরক্ষণকারী।।
যজ্ঞের সাধক পালক রক্ষক ঋত্বিক্ দেবতা হোতা।
শ্রেষ্ঠধনে ধনী দাতা-শিরোমণি রতন-মণি প্রদাতা।।
সুপ্রাচীন যুগে ঋষিগণ মুখে যিনি নিত্য আরাধিত।
সেই ঋষিধারা ধরি চলি মোরা নবগণ নন্দিত।।
যজমানজনে পূর্ণ কর ধনে যাহা নিয়ত বৃদ্ধিরত।।
দেববৃন্দ লয়ে এস এ আলয়ে নিবেদি সুস্বাগত।।
তুমি যোগ্য যাহে অন্য কেহ তাহে সাধিতে কি শক্তিমান্।
আলোকে আঁধারে নিজজনে ধরে আছ চির বর্তমান।।
পিতৃঅঙ্ক পাশে পুত্র যথা আসে সহজগম্য থাক।
পরম কল্যাণ শুভ অনুধ্যানে সদা প্রণোদিত রাখ।।

সূক্তের নবম বা শেষ মন্ত্রে দেখিলাম মধুচ্ছন্দা ঋষি অগ্নিদেবতাকে বলিতেছেন—হে দেব! আমাদের মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের নিকট বাস কর। কীভাবে? পুত্রের পিতা যেরূপ অনায়াসে অভিগম্য। এই পারিবারিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর। এই সম্পর্কেই ভালবাসা হয়। সম্বন্ধের সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হইলে সেই ভালবাসাকে বলে রতি। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি। এই পাঁচ রতির কথা বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শান্তরতি শব্দ যদি বা আছে তথাপি শান্তকে আচার্যেরা রতি বলিতে চাহেন না। কারণ শান্ত রতিতে হৃদয়ের ভাব হয় না। ভগবান্ সৃষ্টিকর্তা, জীব আমি সৃষ্ট—এই ভাবনায় ভালবাসা রূপায়িত হয় না।

চিত্তে রতি জন্মিলেই রসের আস্বাদন হয়। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, বেদে

শুধু যাগযজ্ঞের কথা আছে আর আছে শুষ্ক জ্ঞানের কথা। বেদের সংহিতা পাঠ করিলেই এই ধারণা দূর হইয়া যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্র যাহা যাহা বলিয়াছে প্রত্যেক ভাবেরই প্রসঙ্গ বেদশাস্ত্রে বিদ্যমান আছে।

দাস্যরতি—মহর্ষি বশিষ্ঠ ইন্দ্র ও বরুণকে বলিতেছেন—

"অরং দাস্যে ন মীড়ুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েঽনাগাঃ।"

আমি নিষ্পাপ হইয়া জগতের নেতা ও কামনাসমূহের বর্ষয়িতা বরুণদেবকে পর্যাপ্ত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত করিব—যেমন দাস তার প্রভুকে করে।

একই অগ্নিতে একাধিক ভাব। ত্রিত ঋষি অগ্নিদেবতাকে বলিতেছেন— অগ্নিকে পিতা ও পরমাত্মীয় মনে করি। অগ্নি ভ্রাতা ও চিরকালের বন্ধু।

অঙ্গিরস শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি ইন্দ্রকে বলেন (৮/৯২/২ মন্ত্রে)—

"ত্বমস্মাকং তব স্মসি।"

তুমি আমাদের আমরা তোমার।

পতি-পত্নীভাব ঃ দীর্ঘতমাঃর অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি বলিতেছেন—যেমন পত্নী, পতির আহ্বান শুনিয়া আনন্দ বর্দ্ধনার্থ গতিতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়—সেইরূপ আমার দেবতা আমার স্তোত্র শুনিয়া আমাদের আনন্দ বর্ধনার্থ শীঘ্র গতিত্রে আগমন করুক।

ঋষি অপালা ৮/৯১ সূক্তে শেষ মন্ত্রে নিজের কথা নিজেই বলিয়াছেন—ইন্দ্র আমাকে সূর্যের মত রূপ দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

দুষ্ট চর্মরোগগ্রস্তা পতি-পরিত্যক্তা যুবতী অপালা আপন বধূ-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়া ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলেন। ইন্দ্র অপালার মুখ হইতে সোমরস পান করিয়াছিলেন। ইহা কান্তারসের একটি উৎকৃষ্ট রূপ।

বেদমন্ত্রে সখ্যরসের কথাই অধিক। শ্রীঅনির্বাণ বলেন—"সখ্যরতিই হইল মূলভাব। তাহা হইতে অন্যান্য ভাবের বিস্তার।" বৈষ্ণবের ভাষায় ভাটায় দাস্য, উজানে বাৎসল্য আর গভীরে মাধুর্য।

বেদে যে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রধানতঃ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া,
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।।"

একটি বৃক্ষে দুইটি সোনার পাখী, তাহাদের সম্বন্ধ সখ্য। ইহারই অনুবাদ শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত একটি গানে।

"জীবাত্মা পরমাত্মা দু'টি সোনার পাখী মুখোমুখি।
আনন্দে অমৃত ফল একে খায় আনে দেখে সুখী।।"

অনেক ঋষিই উপাস্যকে সখা মনে করিতেন। বৃহস্পতি-অপত্য শংযু ঋষি ৬/৪৫/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন।

"ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা"

সেই যুবা ইন্দ্র আমাদের সখা।
কণ্ব গোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি ৮/৪৫/১, ২, ৩ মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"যেযাম্ ইন্দ্রো যুবা সখা"
সেই যুবা ইন্দ্র আমাদের সখা!

বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি ৫/৪৫/৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন—"সখায়মগ্নিয়ম্। গাং ন দোহ সে হুবে।" সখা অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি দোহনার্থ গাভীকে যেমন গোপালক আহ্বান করে।

ঋষি কুৎস আঙ্গিরস প্রত্যেক মন্ত্রের শেযে (১/১০১/১-৭) ধুযার মত বলিয়াছেন—"মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।"

ইন্দ্রকে মরুদ্গণের সাথে আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।
গৃৎসমদ ঋষি ২/১৮/৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন— "ন ম ইন্দ্রেণ সখ্যং বিযোযৎ"—ঋষি আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ইন্দ্রের সহিত আমাদের সখ্য যেন কখনও না যায় যেন সততই, বর্তমান থাকে।
দেবাতিথি ঋষি ৮/৪/৭ মন্ত্রে বলিতেছেন—"মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।"

হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। সেই কারণেই বোধহয় ঋষিরা সতত ইন্দ্রের সখ্য যেন বর্তমান থাকে—এই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আরাধ্য-আরাধকের মধ্যে সখ্যভাবেব দৃষ্টান্ত বহু।

স্বামী বিদ্যারণ্যজী বলেন, বৈদিক ধর্মকে ভাগবত ধর্ম বলা যায়। কেননা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যে-ধর্মে উপাস্য পরম দেবতা ভগবান্ উহাই ভাগবত ধর্ম। বৈদিক দেবোপাসনা বস্তুতঃ ভগবানেরই উপাসনা। অতএব বৈদিক ধর্মকে ভাগবত ধর্ম বলা যায়।

প্রথম অগ্নিসূক্তের নবম মন্ত্রের 'পিতেব সূনবে" উপলক্ষ করিয়া দেখানো হইল যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাগবতীয় এই সকল রসের উপাসনা বীজাকারে বেদেই বিদ্যমান আছে।

ইহার পর প্রতিপন্ন করা যায় ভাগবতীয় উপাসনায় যে কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, সখ্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অঙ্গের যে প্রধান স্থান তাহাও বীজাকারে ঋষিগণের উপাসনায় দৃষ্ট হয়। এই কথা প্রসঙ্গাধীনে আলোচনীয়।

অগ্নিদেবতা

অগ্নির এক নাম স্বর্বিদ্। যিনি আমাদের স্বর্কে পাইয়ে দেন। এই স্বর্ বৃহৎ।

অগ্নির অমৃতত্ব ঃ বিজর বিমৃত্যু হওয়া মানুষের পুরুষার্থ। তাহার সিদ্ধি অগ্নির সাযুজ্যে। তাই মর্ত্যে তিনি অমৃতজ্যোতি। কালদৃষ্টিতে তিনি নিত্য। সংহিতায় অগ্নি স্বধাবান্। আপনাতে আপনি থাকা। অগ্নি বিদ্বান্। তিনি জানেন। কী জানেন? জানেন পথের খবর, ঋতের ছন্দ। তিনি সত্যস্বরূপ। তিনি ঋত্বিক্ ঋতুপতি। কারণ, তিনি জানেন ঋতুর তত্ত্ব। তিনি বিশ্বদেবা,

সব জানেন। আমরা মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছু জানি না। অগ্নি সব জানেন। অগ্নি জাতবেদা — অগ্নি নিজে বলিয়াছেন, আমি জন্ম হইতেই জাতবেদাঃ। দেবলোকে পিতৃলোকে মর্তলোকে যাহা কিছু জাত — তাহাকে যিনি জানেন — তিনি জাতবেদা। অগ্নি নিত্য জাগ্রত। সাধনার প্রারম্ভে অগ্নি — অন্তে সোম। দেবতা জাগিয়া আছেন দুই প্রান্তেই।

অগ্নি কবি। বেদে পরম দেবতার একটি সংজ্ঞা কবি। এই জগৎ তাঁহার অজর অমর কাব্য। কবির্মনীষী। ক্রান্তদর্শী, দৃষ্টি চলে অনেক দূরে। কবি সঙ্গে ঋষি বিপ্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কবি — আমাদের হৃদয়ের আকুতিতে যিনি চঞ্চল, বাক্ যাহার সম্পৎ — তিনি কবি, বাক্ অগ্নেয়ী। এই জন্য অগ্নি বিশেষ করিয়া কবি। অগ্নি কবিক্রতু। আমাদের চরম লক্ষ ফুটিয়া উঠে তাঁহার প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় এষণা। এই তাঁহার ক্রতুর স্বরূপ।

অগ্নি সোম্য আনন্দ। অন্তরিক্ষে যে আনন্দ ধীরোদ্ধত দ্যুলোক তাই ধীরোদাত্ত। কথাও ধীরললিত।

অগ্নির মদমত্ততা বোঝাইতে অগ্নিমন্ত্র। অগ্নি স্বধাবান, প্রবক্তা, মন্ত্র ও কবিক্রতু।

সত্যচৈতন্য আনন্দ শান্তি। বিশ্বাতীতের সত্য বিশ্বে ঋতছন্দে লীলায়িত।

সত্য ও ঋত — সৃষ্টির আদিতে যুগনদ্ধ। মূলে তপঃশক্তি। অগ্নি ঋতবিৎ সত্য। ঋতু বিশ্বের ছন্দোময় বিধান। ঋত ছন্দ আমাদের বাঁচাইবে অবীরতা হইতে, মনের দুর্দশা দারিদ্র্য হইতে, ক্ষুধার অত্যাচার হইতে। ❑

বেদ

"বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ"। ঋঃ ২/১/১৬

বীরের মত আমরা বৃহৎকে অখণ্ড অনন্ত ভূমা ব্রহ্মকে যেন বাঙ্ময় করিতে পারি। আমাদের জীবন যেন হয় বৃহৎ-ব্রহ্মের উদাত্ত ঘোষণা 'Voice of the Vast'।

বাক্ বৃহতী বাচস্পতি বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি — ইহারা সমার্থক। বৃহস্পতি Master of the INSPIRED WORD। চিৎ শক্তির বিস্ফারণের তিনি অধীশ্বর। তিনি বৃহস্পতি বাচস্পতি ব্রহ্মণস্পতি।

"ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্,
সমূঢ়মস্য পাংশুরে।।" ১/২২/১৭

সূর্যদেব — উদয় গিরি, অন্তরিক্ষ ও অস্তগিরি — এই তিন স্থানে পদবিক্ষেপ করেন কিন্তু ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত করেন। ইহার অর্থ কী? নিউটন মনে করিতেন আলোক খুব সূক্ষ্ম রেণু (করপাদেন)-এর মত বেগে ছুটিয়া আসে। উহারা যেন আলোর দানা।

Lorenz বলেন, করপাদেন বা ইলেকট্রনগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে এটমের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে সাগরে ঝাপাইয়া পড়ে।

সূর্য মণ্ডল হইতে সংখ্যাতীত Charged Particle তাড়িতের প্রবাহ একটানা জিনিষ নহে। তাহারা যেন একটা বিপুল সেনার অভিযান। এই Charged Particle গুলির সমন্তাৎ

প্রবাহ বুঝাইবার জন্য বেদমন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পদ 'তস্য পাংশুরে' —এই ধূলি বিশিষ্ট পদে জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছেন। বিজ্ঞানের Atomic Structure of Radiation ছাড়া আর কী যে 'পাংশুরে' শব্দটি বুঝাইতে পারে তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমার মনে হয় ঐ 'পাংশুরে' শব্দের ইঙ্গিত দ্বারা ঋষিরা আমাদের তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ আপ্ত বাক্য দ্বারা Radiation Theory-র কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। *('বেদ ও বিজ্ঞান' পৃ. ১৩৮। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ)*

অদিতি — অনন্তভাবে অনুভবকে দেখ, পাবে অদিতি। পর্দা দিয়া অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া লও — পাবে দিতি।

দিতির পুত্র — দৈত্য।
অভেদ দৃষ্টিতে অখণ্ড দৃষ্টিতে — দেবতা।
ভেদ দৃষ্টিতে খণ্ডিত দৃষ্টিতে — দৈত্য।
দেবতার নানাত্বের পিছনে একত্ব।

দেবতারা সত্য সত্য আলাদা আলাদা অনেক — একথা বেদ কখনও বলিতে চাহেন নাই। ইন্দ্র বায়ু অগ্নি সোম সকলেই সর্বব্যাপী অনন্ত বস্তু। এই কথা পুনঃপুনঃ বেদে আছে। কাজেই দেবগণ সব অদিতির সন্তান।

পুরুষ সূক্ত

আমরা চলতি কথায় যাকে বলি পরমেশ্বর, উপনিষদ্-গাভীর ভাষায় বলেন ভগবান্ — বেদ সংহিতায় তাহারই নাম 'পুরুষ'। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত পুরুষ সূক্ত। এই সূক্তটি অতি মূল্যবান বলিয়া চারিবেদেই ইহার স্থান সম মর্যাদায়। একমাত্র সাবিত্রী গায়ত্রীই চারিবেদে দৃষ্ট হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের মতই সর্বাতিশায়ী প্রয়োজনীয় বলিয়া পুরুষ সূক্তটি চারিবেদে দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদের ১০/৯০ সূক্ত পুরুষ সূক্ত — ইহা বলিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায় ১-১৬ মন্ত্র পুরুষ সূক্ত। সামবেদের ৬১৭-৬২১ মন্ত্র পুরুষ সূক্তের প্রথমাংশ। অথর্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ১ম অনুবাক্ ৬ সূক্ত অবিকল পুরুষ সূক্ত।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন —

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ।।" ১০/৪২

ভাষ্যকার মহীধর বলেন — সর্ববেদান্তবেদ্য পরমাত্মা নিজের মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাট্ দেহ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী দেবতারূপ জীব হইয়াছেন।

প্রথম মন্ত্র 'সহস্রশীর্ষা'। অসংখ্য যাঁর মস্তক, চক্ষু ও চরণ — তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্বপ্রকারে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি দশাঙ্গুলি-পরিমিত হৃদয়প্রদেশে অন্তর্যামী পুরুষ রূপে অবস্থান করেন। এখানে সহস্র পদ বহুত্ববাদী। ভূমি শব্দে পঞ্চভূতকে বুঝাইতেছে। সেই সমগ্র জগৎ সেই পুরুষের মহিমা অর্থাৎ বিভূতি। পুরুষ ইহা হইতে অনেক অধিক। সমগ্র প্রাণী- জগৎ তাঁহার এক চতুর্থাংশ। ইহা পরিবর্তনশীল; অবশিষ্ট তিন ভাগ বিনাশরহিত। তাহা তাহার

স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত। এই ত্রিপাদ পুরুষ ব্রহ্মরূপ। এই জগতের গুণদোষ দ্বারা তিনি অস্পৃষ্ট। তিনি দেব তির্যক চেতন অচেতন নানারূপে ব্যাপ্ত।

সেই আদি পুরুষ হইতে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন। সেই বিরাট্ পুরুষ দেব, তির্যক্ ও মনুষ্যাদি হইয়াছেন। তারপর তিনি পঞ্চভূত ও জীবগণের শরীর সৃষ্টি করেন। এই মর্তলোক ও অমৃতলোক দুইই তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি। দশ শব্দটি পূর্ণতা জ্ঞাপক। তিনি এখানেও পূর্ণ ওখানেও পূর্ণ। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্।" তিনি অমৃতের মধ্যেই থাকেন। মর্ত্য ভূমিতেও ছড়াইয়া পড়েন। তিনিই সব কিছু। তিনি জগতে Immanent, আবার জগদতীত ভূমিতে Transcendent। বিশ্বগ ও বিশ্বাতিগ। এই সৃষ্টিসংসার মধ্যে তিনি নিরন্তর অনুস্যূত থাকিয়াও তদতিরিক্ত হইয়া বিরাজমান আছেন। মৃণ্ময় জগতে একাকার হইয়াও তিনি তাঁহার চিন্ময় অমৃতময় সত্তা হাবান না। দশাঙ্গুলি অর্থাৎ পূর্ণরূপেই ঊর্ধ্বে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত।

বেদে সোমের তিনটি সংজ্ঞা — অন্ধ সোম, পবমান সোম ও ইন্দু।

অন্ধ সোম — পাতালে, নাড়ীর নীচে — অন্ধ (ভোগবতী) পবমান সোম — উত্তর বাহিনী, ভাগীরথী। ইন্দু — আকাশগঙ্গা — শিবের শিরে।

ভোগবতী ধারাকে নিপীড়ন করিয়া উত্তর-বাহিনী করিতে হইবে ব্রহ্মচর্য দ্বারা।

সামবেদ

গান গাহিতে যে মন্ত্রগুলি সহজ সুন্দর তাহাই সামবেদে গ্রহণ করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য এই মন্ত্র সমূহের আধিযাজ্ঞিক ও আধিদৈবিক ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। আচার্য মহীধর শুক্ল যজুর্বেদের কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ সামবেদকে উচ্চ আসন দিয়াছেন একথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার কারণ মনে হয়, সামবেদ সঙ্গীতময়। প্রসঙ্গত সামগানের কথা কিছু বলিব।

বৈদিক গানে তিনটি স্বর — উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত। পাণিনি শিক্ষায় বলা হইয়াছে যে, 'এই বৈদিক উদাত্তাদি তিন স্বর হইতে পরবর্তীকালে মার্গসঙ্গীত লৌকিক সংগীতের সাতটি স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

"উচ্চৌ নিযাদৌ গান্ধারৌ, নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেযাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়া, যড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।।"

অনুদাত্ত হইতে ঋযভ ও ধৈবত, উদাত্ত হইতে নিযাদ ও গান্ধার এবং স্বরিত হইতে যড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনুদাত্তের নাম মন্দ্র অর্থাৎ খাদ।

উদাত্ত তার বা চড়া এবং স্বরিত সমতারক্ষক মধ্য স্বর। 'ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমশ্চ'। উরঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে ইহাদের উৎপত্তি স্থান। তেষু মন্দ্রমুরসি বর্ততে। উত্তমং শিরসি বর্ততে।

সামবেদকে বৈদিক সঙ্গীত গ্রন্থ বলা চলে। এই বেদকে সাধারণতঃ পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক

দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্বার্চিক আবার গ্রামে গেয় ও অরণ্যে গেয় দুই গানাংশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

উত্তরার্চিকের দুই ভাগ — ঊহ ও ঊহ্য। ইহা রহস্য গান। এই দুইটি সকলে করিতে পারিত না। একমাত্র উপনিষদের রহস্যবেত্তা সাধকরাই ঐ গানের অধিকারী ছিলেন। গ্রামে গেয় গান গ্রামাঞ্চলে সাধারণের জন্য নির্বাচিত ছিল। সকলেই প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিত। অরণ্যে গেয় গান নিরালায় নিভৃতে সাধারণতঃ জনবিহীন অরণ্য প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত। ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে সুর যোজনা করিয়া সামবেদের সৃষ্টি। ইহাই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল উৎসভূমি।

বৈদিক যজ্ঞে প্রধানতঃ চারিজন পুরোহিত থাকে ঃ হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা।

ঋগ্বেদের পুরোহিতকে হোতা বলে। তিনি যজ্ঞে ঋঙ্‌মন্ত্র উচ্চারণ করেন। যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু। যিনি যজ্ঞের যাবতীয় ক্রিয়া সাধন করেন তিনি অধ্বর্যু। সামবেদের পুরোহিত উদ্‌গাতা। তিনি সামমন্ত্র গান করিয়া দেবতার স্তব করেন। ব্রহ্মা তিন বেদেই বিশেষ পারঙ্গম। তিনি যজ্ঞের সারথি।

সুতরাং উদ্‌গাতৃ পুরোহিতেরাই আসলে সামগ বা সামগানকারী। হোত্রী পুরোহিতরা কেবল মন্ত্র পাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন একটি স্বরের সাহায্য নিয়া। কিন্তু উদ্‌গাতা বিভিন্ন স্বর প্রয়োগ করিয়া ঋক্‌মন্ত্র গান করিতেন। এইগুলিই আসলে সামগান বা বৈদিক গান। ইহা মার্গ সঙ্গীত হইতে পৃথক্।

মার্গ অর্থ মার্গিত অর্থাৎ অন্বেষিত বা দৃষ্ট। 'মার্গিতঃ অন্বেষিতো দৃষ্টঃ।' ইহা হইতে বোঝা যায় প্রাচীন আচার্যগণ বৈদিক গানের মাল-মশলা লইয়া মার্গগান সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সামগানের সাত স্বর এবং মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের সাত স্বর পরস্পর ভিন্ন। দু'টি সঙ্গীতের ধারা সমান্তরাল সরল রেখার মত ছিল। শিক্ষাগ্রন্থে নারদ বেণু ও বীণা, বৈদিক ও লৌকিক দুই গানের স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্যমূলক যোগসূত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষাকার নারদ সর্বপ্রথম এই দুইটি ধারার মধ্যে একটি মিতালী (মাতলী) পাঠাইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সমন্বয় দেখাইলেন।

> "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমস্বরঃ।
> যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয় ঋষভঃ স্মৃতঃ।।
> চতুর্থ ষড়্‌জ ইত্যাহু পঞ্চমে ধৈবতো ভবেৎ।
> ষষ্ঠ নিষাদো বিজ্ঞেয়ো, সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।।"

সামগানের যেটি প্রথম স্বর — তার কম্পনসংখ্যা ও সব স্থানের সঙ্গে লৌকিক গানের মধ্যমের মিল আছে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্টের সঙ্গে গান্ধার ঋষভ ধৈবত নিষাদ ও পঞ্চমের ঐক্য আছে।

ইহা ঋগ্বেদের ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণও দেখাইয়াছেন — নারদ ও সায়ণের মধ্যে পার্থক্য এই, নারদ লৌকিক রীতির অনুসরণে আরোহী ভাবাপন্ন (upward) স্বরের গতি দেখাইয়াছেন। সায়ণ বৈদিক রীতি অনুসারে অবরোহ ভাবাপন্ন (onward) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক স্বরের গতি উচ্চ হইতে নিম্নে descending, লৌকিক গতি তদ্‌বিপরীত ascending।

দেবতা কয়জন?

বৈদিক বাঙ্ময়ে দেবতা এক। বিশ্বভাবনায় তিনি সৎ, বিশ্বোত্তীর্ণরূপে তিনি তৎ। তৎরূপের পূর্বাবস্থা অসৎ। নাসদীয় সূক্ত — না অসৎ ছিল, না সৎ ছিল। তখন না ছিল কোন লোক (রজঃ), না ছিল পরম ব্যোম। চেতনা এখানে উজান বহিয়া চলিতেছে। ছয়টি রকমে মহাভূতি সে পার হইল। এরপর পরম ব্যোমের অক্ষর শূন্যতা। অসৎকল্প অনির্বচনীয়তা। সৎ নাই, অসৎ নাই, রাত্রি নাই, দিন নাই, মৃত্যু নাই, অমৃত নাই। অন্ধকারকে নিগৃহীত করিয়া রহিয়াছে এক তরঙ্গাকার। এক সুগহন সমীরের অনুভব। সে কী?

কে তা জেনেছে? কেই বা তার কথা বলবে? সে কী! কে তাকে জেনেছে? প্রচেতনা নাই। তবুও কেন যেন জলের মত সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। বাতাস নাই অথচ আত্মস্থ সে। যেন নিঃশ্বাস ফেলেন। পরব্যোম বুঝি আছে। সেখানে কেউ বুঝি চাহিয়া চাহিয়া কিছু দেখিতেছে।

কিন্তু জানছে কিনা জানছে না কোথা হতে কী এল? কে করল? না, কেউ করে নাই। ভাবনা যেন অন্ধকারে হারাইয়া গেল। জানা গেল সকল জানা ফুরাইয়া যায় যখন সেই জানাই পরম জানা এবং পরম পাওয়া। দেব স্বরূপত এক। বিভূতিতে বহু। এই বহুর সংখ্যা কত?

বৃহদারণ্যক উপনিষদে শাকল্যের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনা ঃ শাকল্যের প্রশ্ন—দেবতা ক'জন? যাজ্ঞবাল্ক্যের উত্তর — তিন হাজার তিন শত তিন। তারপর পরপর প্রশ্ন — ঠিক করিয়া বলুন ক'জন — কমাতে কমাতে একজন। যে দেবতা হলেন ঘ্রাণ, তাকে ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন ত্যদ্। এই ত্যদ্-এর জপ হইল নেতি নেতি নেতি নেতি। ইহা মননের ফল।

মনন যখন মনীযায় স্থিত হয় তখন দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য।

দেবতাবোধের প্রথম ভূমি 'একো দেবঃ।'

একক জানি দেবতা বলে, পুরুষবিধ বলে।

"মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।

বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ।।" ঋগ্‌বেদ ১০/৫১/১

এক দেবতা আমার আরাধ্য ইষ্ট। অন্যান্য দেবতা তাঁরই বিভূতি। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে কতিপয় মন্ত্রে গৃৎসমদ বলিতেছেন— ঋষি গৃৎসমদ অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন — হে অগ্নি, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মণস্পতি, তুমি মিত্র, বরুণ, তুমি অর্ধর্মা।

দশম মণ্ডলে একটি সূক্তে উৎসুক জিজ্ঞাসা—কয়টি সূর্য, কয়টি উষা, কয়জন শ্রুপতি? রহস্য করিয়া বলছি না, জানবার জন্য বলছি। জবাব (৮ম মণ্ডলে ৮/৫৮/২)—"এক এবাগ্নির্বহুধা

সমিদ্ধঃ।"

দেবতা অধিদৈবত দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বিস্ময়। ব্রহ্ম যখন মন্ত্র-চৈতন্য তখন তাহার একটি কাজ দেবতাকে বৃহৎ করে। (যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং- ২/১২/১৪) দেবতার বৃহৎ হওয়া অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে বিস্ফারণ হওয়া।

চেতনার বিস্ফারণে অবিদ্যার অন্ধকার বিলোপ হয়। ঊর্ধ্বস্রোতা মনের লক্ষ্য ব্রহ্ম। ৯/৯৭/৩৪ ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্। চিৎ শক্তির বিস্ফুরণেব যিনি আধার তিনি ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতি বা বাচস্পতি।

বৃহ্ — ব্রাহ্মণের আদিরূপ। বৃহৎ শব্দগুচ্ছ আছে ঋতং বৃহৎ।

বৃহ্ আর বৃহৎ-এর দৃষ্টির একটু প্রভেদ আছে।

বৃহ্-এর অনুভব প্রত্যক্। বৃহতের অনুভব পরাক্।

বৃহৎ হইল বৃহ্-এর অধিদৈবত রূপ।

বৃহ্ ও ব্রহ্ম বৃহৎ ব্রহ্ম।

বৃহ যাজ্ঞিকদের, বৃহৎ তপস্বিদের নারদের। ভাযায় মন্ত্রবিৎ-এর ব্রহ্ম ও আত্মবিদের ব্রহ্ম এক নয়; তফাৎটুকু বুঝানো হয়েছে — শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা।

ঋক্ সংহিতায় ব্রহ্ম ও বাকের একই ব্যঞ্জনা। সংহিতায এই বাক্যের নাম একবাদী বাক্ বা ওম্।

"বিশ্বামিত্রস্য বক্ষতি ব্রহ্মোদং ভাবতং জনম্" ৩/৫৩/১২ এই বাক্যে ব্রহ্ম বলিতে ব্রহ্মের মন্ত্রশক্তি।

আদিবাক্ ত্বষ্টার মত তক্ষণ করিয়া অক্ষরের জীবনকে সম্ভব করেন।

"গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।

অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্।।" ১/১৬৪/৪১

একপদী বাক্‌ই ওম্।

সংহিতা বলেন বাক্ চারি প্রকার। এর মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা বলেন। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী। মানুষ আমরা যা বলি তা বৈখরী। পরা পশ্যন্তী ভূমিকায় যে ওম্ তাহা আমরা মানবেরা উচ্চারণ পারি না। আমরা বৈখরী রূপেই বলি ওম্।

ঋগ্বেদে বাচস্পতিই বিশ্বকর্মা।

১০/৮১/৭ যার মধ্যে সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা যেমন দিব্য বাচস্পতি তেমনি মানুষের মধ্যে বাচস্পতি হলেন ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, যাঁহার কাছে 'উশতী সুবাসাঃ' জায়ার মত বাক্ তাঁহার তনুখানি মেলিয়া ধরেন। (ঋঃ ১০/৭১/৪)

অনেকের ভ্রান্তধারণা আছে — বেদে শুধু দেবতাদেরই কথা আছে দেবী নাম দেখা যায় না। ইহা ঠিক নহে। এতক্ষণ বাক্ দেবীর কথা বলিলাম। তা ছাড়া আছে উষা দেবী অদিতি দেবী। সিন্ধু নদীকেও দেবী বলা হইত (ঋঃ ১০/৫/২-১৬)। সরস্বতী আগে ছিল নদীর নাম। পরে তিনি দেবী হইয়াছেন। ভারতী ইলা ইঁহারাও দেবী। গায়ত্রী ঋষির কথা পরে বলিব। ব্রহ্মজ্ঞ

অনেক নারী ছিলেন। তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য কাত্যায়নী, মৈত্রেয়ী ও গার্গী।

উপনিষদে হৈমবতী উমা মূর্ত ব্রহ্মজ্ঞান। অনেক ঋষির মাতৃনামে পরিচয় আছে। গর্ভাধানকে ঋষিরা যজ্ঞরূপে গণ্য করিতেন। সুপ্রজননের আর এক নাম পুত্রমন্থ। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫/৮)।

বেদে অবৈদিক ধারা

গীতায় শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে বলিয়াছেন বেদান্তকৃৎ ও বেদবিদ্। আবার তিনি দুই-তিনটি শ্লোকে বেদের নিন্দা করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন বুঝিতাম না। এখন একটু একটু বুঝিতেছি। মনে হয় বেদের মধ্যে যে অবৈদিক ধারাটি তাকেই নিন্দা করিয়াছেন ; অবৈদিক ধারার মধ্যে যারা তারা নিজেদের অবৈদিক বলিতেন না বা মনে করিতেন না। তারা নিজেদের বেদপন্থী মনে করিতেন। সেই কৃত্রিম বেদপন্থীদের কথা মনে করিয়াই বলিয়াছেন — অর্জুন, ওরা যাকে বেদ বেদ করিয়া রটনা করে তাহা প্রকৃত বেদ নয় — তাহা ত্রিগুণ-বিষয়ক। তুমি ঐ কৃত্রিম বেদধারা হইতে সরিয়া পড়। ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে উঠ। তবেই প্রকৃত বেদ বুঝিবে।

বৈদিক বাঙ্ময়ে মাতৃপূজা

বহু মাতৃশক্তির নাম গুণকীর্তন ও পূজার্চনার বিধান সংহিতায় দৃষ্ট হয়। তথাপি অনেকে মনে করেন বেদে মাতৃশক্তি পূজার্চনার কথা নাই।

অগস্ত্য ঋষি বলেন দেবী সবস্বতী জীবের অহং কেন্দ্রিক চেতনাকে করেন বিশ্ববিধৃতা, প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বভূত চেতনায়। প্রিয় সত্যের প্রেয় শ্রীদেবী মহী। শক্তিতে তিনি উচ্ছল। আহুতিদাতাকে করেন তিনি কৃপা সিঞ্চিত। ইলাদেবী দিব্য শ্রুতি। তিনি সাধিকাকে করেন বীরের মত শক্তিমান্, তিনি অপরাজিতা। তাই সাধিকাও হয় অপরাজেয়।

বেদে শক্তিবাদ

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সরস্বতী, ইলা ও ভারতী দেবী সিদ্ধ করেন। এই দেবীত্রয় স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী রাখুন আমাদের কুশলে এবং করুন রক্ষা আমাদের অনবদ্য আশা আশ্রয়কে।

সর্বোপরি দেবীসূক্ত তো আছেই। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। তিনি মন্ত্রের দেবতার সঙ্গে একীভূত। এই মন্ত্র এত মূল্যবান যে চণ্ডীর শেষের দিকে যখন মেধা ঋষির উপদেশে সুরথ ও সমাধি মায়ের পূজা করিলেন তখন তাঁহাদের জপ্যমন্ত্র ছিল দেবী সূক্ত "দেবীসূক্তং পরং জপন্"।

উষাদেবীর কথা। সাধকের মনে জ্ঞানের আলোর স্থায়ী সম্পাতই উষার আগমন। দেবী উষার সঙ্গে সূর্যের অর্থাৎ সত্যের সম্পর্ক অতি নিকট। তাহার সঙ্গে বরুণের যিনি বিশ্বচেতনার প্রবর্তক — তাহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। উষা দেবীকে প্রকৃত পক্ষে লাভ করেন কে? দিব্য কর্মী যার অবতরণ হইয়াছে সোম সুধাধারায়, ভক্তি ও প্রেম যাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়াছে

তিনিই উযাদেবীকে প্রাপ্ত হন ১/৯১/১১। ঋষি বশিষ্ঠ বলেন— "বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ" ঋঃ (৭/৮১/৪) আমরা হব মায়ের কাছে ছেলের মতন।

ভারতে যে শক্তিপূজা প্রচলিত আছে এবং তন্ত্রে যাহার প্রত্যক্ষ দর্শন মিলে ও ক্রিয়া প্রণালী বিধৃত আছে তাহার মূল উৎস সংহিতায়।

উযা মায়ের ধ্যানে ব্যক্তিমানব বিশ্বমানব হইয়া যায়। এই মহাশক্তির পুরাণস্বরূপই ঋৎ-চিৎ।

তিনি সর্বরূপা। সকল সাধনার আদিপীঠই বেদ। মায়ের মত উঁচু নীচু সকলের প্রতি তাঁহার সমান কৃপা। মাতঃ! তোমার প্রকাশে পণ্ডিত মূর্খ কেহই হয় না বিমুখ। এই জাতীয় সহস্র মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়।

শ্রীঅনির্বাণ বলেন — বেদের ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা উষার বর্ণনায় চরম উৎকর্যতা লাভ করিয়াছে। উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন, অগ্নির মাতা।

জননী, আয়া, জায়া, সহোদরা—নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি উষার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন।

জ্যোতিরেষণার যখন উষা উর্বশী বৃহদ্দিবা যার জন্য পুরূরবার নিয়ত কান্না। এই মার অন্তে সেই উষাই মাতা বৃহদ্দিবা। বৃহদ্দিবা বৃহতের আলো। বৈদান্তিক যাহাকে বলেন — ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপিণী মা দুর্গা। মেনকার কন্যা, শিবজায়া, গণেশজননী।

শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া লিখিয়াছেন "যঃ কৃষ্ণঃ স এব দুর্গা, সা এব কৃষ্ণঃ।" পরমতত্ত্বের লিঙ্গভেদ নাই। তাহা হইলে কৃষ্ণ পরতত্ত্ব, দুর্গা পরতত্ত্ব, শিব পরতত্ত্ব এই সব কথার পার্থক্য কী? চণ্ডীতে ঋষির মহামায়া "হরেঃ শক্তিঃ"। শক্তি-শক্তিমানে যে ভেদ নাই—ইহা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে হয় না — এতই সহজ কথা। পরমতত্ত্ব কালের আবর্তনের উর্ধ্বে। তাহা হইলে শক্তিবাদের কথা বেদে নাই একথা কি বলা চলে?

অচেতন বস্তুতে দেবতা-ভাবনা

অচেতন বস্তুতে দেবতা-ভাবনা সংহিতায় দেখা যায়। যে-সকল বস্তু প্রাণহীন অথবা মনুয্যেতর জীব তাহাদিগকে দেবতা ভাবনা করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে ঋষি-মুখে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। স্বরূপ চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা অতি কঠিন। এই জন্য প্রতীক দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে। ব্রহ্মই সব, অতএব সকল বস্তু তাহার প্রতীক হইতে পারে।

কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

১) অশ্ব। অশ্বমেধের অশ্ব দিব্য অশ্ব। দীর্ঘতমার দুইটি সূক্তে তার স্তুতি আছে। ১/১৬২-১৬৩।

অশ্ব সমুদ্রজাত। ইন্দ্র ইহাতে অধিষ্ঠিত। পৃথিবীর একটি প্রাণী হয়েও অশ্ব দেবতা।

২) পাখি। ঋষি গৃৎসমদ। দুইটি সূক্তে (২/৪২-৪৩) দুইটি ছোট পাখীর গান। ঋষির চিত্ত যেন আনন্দে বিগলিত, ওরা সুমঙ্গল ভদ্রবাদী। ওদের গান যেন সামগান।

৩) নৃতর প্রাণী মণ্ডূক (ব্যাঙ)। ঋষি বশিষ্ঠের মণ্ডূক স্তুতিতে (৭/১০৩) ব্যাঙের স্তুতি।

বৎসরের একটি দিন যেদিন প্রথম বর্ষা নামে, কানায় কানায় ভরা সরোবরের দিকে ব্যাঙগুলি নাচিয়া চলে। ওদের মধ্যে আকুলতা আছে, তৃষ্ণা আছে। ওরা অনর্গল ডাকতে ডাকতে এ ওর দিকে ছোটে। এ ওকে জড়াইয়া ধরিয়া লাফাইয়া উঠে। বছরে একটা দিন যেদিন প্রথম বর্ষা নামিল, বর্ষার এই দিনটি আমাদের কাছেও অক্ষয় হইয়া আছে। গুরুপূর্ণিমায় অম্বুবাচীতে। এই বর্ষা দেবতার দান। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন অতুল চম্পটী, আমি তাহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়াছি বর্ষা নামিলেই খালি গায়ে খালি মাথায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতে বলিতেন, এই যে দেবতার দান মাথা পাতিয়া বিশ্ব প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেকটি মানুষের উচিত ইহা সাদরে গ্রহণ করা। বর্ষা হইতেই নববর্ষ। বর্ষের প্রথম বলিয়া নাম বর্ষা। আমরা এখন যেমন করি ১লা বৈশাখ, ১লা জানুয়ারী। ব্রহ্মজ্ঞানীরা মণ্ডূক। কেননা তাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত ও প্রমুদিত মত্ত। মণ্ডূকের ডাক যেন বর্ষাবন্তে ঋষির বেদ-স্বাধ্যায়।

৪) অক্ষ। পাশা খেলার গুটি। ঋক্ সংহিতায় অক্ষসূক্ত বিখ্যাত। ঋষি কবষ ১০ম মণ্ডলের একটি উপমণ্ডল, অক্ষ-সূক্তটি উপমণ্ডলের একেবারে শেষে। অক্ষ-সূক্তটি ঋষির আত্মবিলাপ মনে হয়। জুয়া খেলার প্রতি আসক্তি, ফলে তার সুখের সংসারে আগুন লাগিযাছে। শেষে সবিতার কৃপার সুমতির উদয় হওয়ায় জুয়া খেলা ছাড়িয়া চাষবাষে মন দিয়াছে।

৫) গ্রাবা। সোম ছেঁচিবার পাথর। ঋষি অর্বুদ। ঋঃ ১০/৯৪ মন্ত্রে তাব স্তুতি আছে। সবিতার প্রেরণায় ভোরের অন্ধকার হইতে আলোর প্রকাশ। আর গ্রাবার নিপীড়নে অন্ধ সোমের পবমান হইতে ইন্দু হওয়া একই ব্যাপার। এই পাথরের অত্রি কেউ তাদের বিদীর্ণ করিতে পারে না। পাথরের নিপীড়নে আনন্দের ভোগবতী ধারার অলকানন্দার উজানধারায় রূপান্তরিত করা।

৬) উদূখল-মুষল। (ঋঃ ১/২৮) অন্ধ সোমের সাধন হয় উদূখল-মুষল দিয়ে। ঋষি শুনঃশেপঃ। সোমকে বলা হইয়াছে উদূখল-সূত। যজ্ঞে উদূখল-মুষল দিয়া পুরোডাশের জন্য ধান কোটা হয়। আর সোমকে ছেঁচা হয়,

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যোনি উদূখল ও শিশ্ন মুষল। একটি মেয়েকে এখানে আনিয়া শুনঃশেপ বলিতেছেন — সবনের সময় একটা নারী একবার অপচ্যুত আর একবার উপচ্যুত হইয়া তাহার শক্তির প্রকাশ করিতেছে। অপচ্যুত হইল উদূখল হইতে মুষলটি তুলে নেওয়া আর উপচ্যুত হইল আবার তাহাকে নামাইয়া আনা। এই নারীটি দেব জননী অদিতি। কোন কোন স্থলে মুষলের উঠা-নামাকে বলা হইয়াছে সার্পরাজ্ঞীর অপানন ও প্রাণন (ঋঃ ১০/১৮৯/২

৭) নদী। নদীর মধ্যে দুইটি। শতদ্রু পরবর্তীতে বিপাশা। শতদ্রু নদী সূর্য রশ্মির প্রতীক।

৮) অরণ্যানী। আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্যের যোগ প্রসিদ্ধ। যাহা আজও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। অরণ্য কাহাকেও মারে না। যদি কেহ আসিয়া ঝাপাইয়া না পড়ে। তার স্বাদু ফল খায় মানুষ। যেমন খুশী তার কোলে আশ্রয় লয়।

৯) শ্রদ্ধা। সংহিতায় শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। দ্রব্যযজ্ঞই হউক আর জ্ঞান যজ্ঞই হউক দুয়ের ভিত্তিই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার জন্ম কাম হইতে। এই কাম হৃদয়ের আকুতি। এই কাম দেব কামের, দিব্য কাম। শ্রদ্ধাতেই সাধনার আরম্ভ। আদৌ শ্রদ্ধা। হৃদয়ের আকুতি দিয়া শ্রদ্ধার উপাসনা যে করে সে-ই আলোর সন্ধান পায়। ❑

গায়ত্রী মন্ত্র

"ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।"

গায়ত্রী মন্ত্রে প্রথম তিনটি ব্যাহৃতি। আসল মন্ত্রে দশটি শব্দ আছে।

১। তৎ—সেই
২। সবিতুঃ—সবিতা, সম্ভজনীয়
৩। বরেণ্যং—বরণীয়
৪। ভর্গঃ—জ্যোতিঃ
৫। দেবস্য—দেবতার
৬। ধীমহি—ধ্যান করি
৭। ধিয়ঃ—বুদ্ধিসমূহেব
৮। যঃ—যিনি
৯। নঃ—আমাদের
১০। প্রচোদয়াৎ—প্রণোদিত করেন।

"যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ প্রণোদিত করেন সেই সবিতা দেবতার ববণীয় জ্যোতিঃ ধ্যান করি।" এই মন্ত্রের ভাষ্য করিয়াছেন আচার্য শংকর। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রামানুজও। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ দর্শন করে। তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী শংকর এই মন্ত্রে ব্রহ্মই দর্শন করিয়াছেন।

(১) তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। প্রমাণ, "ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" গীতা ১৭/২৩

(২) সবিতুঃ—সবিতার। যিনি বিশ্ব প্রসব করেন, তাহার। শঙ্কর বলেন, এই পদে ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তিহীন। জগৎপ্রসব করা ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত। যেমন রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্প অধ্যস্ত হইয়াছে। অন্ধকারে সর্প দর্শন হয়। আলো আসিলে সর্প থাকে না। সর্প যখন দৃষ্ট হয় তখনও নাই। আগেও ছিল না, পরেও থাকিবে না। ত্রিকালেই সর্পের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সর্প মিথ্যা, মায়া-বিজৃম্ভনম্ অত্র। প্রকৃত জ্ঞান উদয় হইলে দেখা যায় রজ্জুই ছিল। আমার জ্ঞান হওয়ার পূর্বেই ছিল, জ্ঞান হওয়ার পরেও আছে। সুতরাং অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং জগৎ-প্রসবিতা সবিতুঃ পদে ব্রহ্মই লক্ষীভূত।

(৩) বরেণ্যম্ শব্দের অর্থ সর্বতোভাবে যিনি ভজনীয়, অর্থাৎ সর্বারাধ্য তিনি পরব্রহ্মই। তিনি আর কে হইবেন? সুতরাং বরেণ্যম্ শব্দেও ব্রহ্মই লক্ষীভূত।

(৪) ভর্গঃ শব্দ ভ্রস্‌জ ধাতু হইতে। ভ্রস্‌জ ধাতু অর্থ পাক করা। পাক কার্যের দ্বারা বস্তু ধ্বংস

হইয়া যায়। যিনি অবিদ্যাকে ধ্বংস করেন তিনি ভর্গঃ। সুতরাং ভর্গঃ অর্থ ব্রহ্ম। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সর্প জ্ঞান যেমন আলো আসিলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ অবিদ্যা-বিনাশকারী ভর্গঃ পদে ব্রহ্মই লক্ষীভূত। 'দেবস্য' অর্থ—দেদীপ্যমান। পরম উজ্জ্বল। শ্রুতি বলিয়াছেন 'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি', তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ।

"জ্যোতিযামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।।"

সুতরাং দেবস্য পদে সর্বদা সর্বতোভাবে জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহা হইতে বিশ্বজগৎ ও অগণিত সৌর-মণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাষিত, তিনি পরব্রহ্মই। সুতরাং দেবস্য পদে পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়া দেয়।

ধীমহি—ধ্যান করি, ধ্যায়েম।

নঃ—আমাদের, সকল বিশ্বজীবের, নিখিল বিশ্বের।

ধিয়ঃ—কর্মোদ্যম, বুদ্ধিসমূহ, সকল চিন্তার মূল।

প্রচোদয়াৎ—যিনি অন্তর্যামীরূপে পরিচালনা করেন।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোঃ।" বৃহদারণ্যক শ্রুতি।

"যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি।"

যিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন তিনি পরব্রহ্মই। সুতরাং 'প্রচোদয়াৎ' কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মই বোঝা গেল। সায়ণ এই মন্ত্রের চার রকম অর্থ করিয়াছেন। সবিতা—সূর্যমণ্ডল, সূর্যের ভর্গ, অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলকে আমরা মনের মধ্যে ধ্যান করি। যিনি আমাদের সর্বকর্মে প্রেরণ করেন সেই সবিতা সূর্য। তাঁহাকে আমরা চিত্তের মধ্যে ধ্যান করি। সবিতা বলিতে সাধারণতঃ সূর্যকে বুঝায়, গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে যে সবিতুঃ শব্দ আছে উহার অর্থ অতি ব্যাপক, অতি গূঢ়। ঋক্ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্ত সবিতা দেবতার। তাঁহার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—সবিতা দ্রষ্টা ও প্রেরণাদাতা। সবিতা দিব্য জ্ঞানের উৎস 'Source of Divine Knowledge'। সবিতা অন্তর্লোকের দ্রষ্টা, সমস্ত জ্ঞানদাতা সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা। বিশ্বে উভয় জীবনের অসীম মঙ্গলদাতা ও সুখদাতা। সবিতা স্বীয় শক্তিতে ও মহিমায় আমাদের পার্থিব জগৎ সমূহের স্থিরত্ব রক্ষা করেন, জ্যোতির দিব্য সূর্যালোকে সবিতার একাংশের মহত্ত্ব ব্যক্ত। সবিতা নিখিল সৃষ্টির একমাত্র কর্তা।

প্রথম মণ্ডলের ১/৩৫/২ মন্ত্রে সবিতার কথা বলিয়াছেন—

"আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।" ঋ.

সূর্য বহিরাকাশের, সবিতা অন্তরাকাশের সূর্য, যার বিশিষ্ট নাম সবিতা, সকলের সর্বান্তর আত্মা। সবিতার বরেণ্য বিশেষণটি আলোচনা করিলে সবিতার রহস্য বিশেষভাবে ভেদ হইতে পারে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ শ্রদ্ধয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্যতে।।"

বহিরাকাশের সূর্যমণ্ডলের অন্তঃস্থ পুরুষ তিনি সবিতা। আমরা নিত্য যে সূর্য দেখি তাহা অপেক্ষা গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতার পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সূর্য একটি জ্যোতির পিণ্ড। আর সবিতা জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ—

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।"
"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।" কঠ ২/২/১৫

উবটের মতে, সবিতা সর্বের প্রসবিতা, আদিত্যের অন্তর পুরুষ। বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্ম। মহীধর মতে, সবিতা প্রেরক অন্তর্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্ম। সায়ণ মতে, সবিতা সর্বান্তর্যামী, প্রেরক, অন্তর্দ্রষ্টা পরমেশ্বর। দৃশ্য সূর্যমণ্ডল সবিতার বিভূতির কলামাত্র। সবিতার সত্তায় অসংখ্য সূর্যমণ্ডল সত্তাবান্। সবিতা সূর্যের সূর্য। অসংখ্য সৌরমণ্ডল সবিতাকে পরিক্রমণ করে। সবিতুর্ভর্গঃ—এই যে ষষ্ঠী বিভক্তি ইহার কোন অর্থ নাই। যেমন ইংরেজী লেখা হয় His Excellency—গভর্ণরকে যদি লিখি তবে এই His-এর অর্থ তিনিই। তাঁহার মর্যাদাই তিনি। আচার্য শঙ্কর বলেন, রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ। রাহু একটি মাথাই মাত্র। রাহুর শির অর্থ রাহুই। সেইরূপ সবিতাই ভর্গঃ। সবটাই জ্যোতিঃস্বরূপ।

মূল গায়ত্রী মন্ত্র

"তৎ সবিতুর্ বরেণ্যম্, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।"

মন্ত্রে দশটি পদ। 'তৎ' শব্দে ব্রহ্ম। গীতা বলেন—"ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (১৭/২৩) ওঁ, তৎ ও সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের বাচক। তৎ শব্দটি ভর্গের বিশেষণ। অথবা সমানাধিকরণ। অর্থাৎ তৎ-ই ভর্গঃ ভর্গ-ই তৎ। অর্থাৎ ব্রহ্মই ভর্গ। ভর্গই ব্রহ্ম।

শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"তৎ-শব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।"

আবার তৎ-পদকে সবিতুঃ সঙ্গে যুক্ত করা যায়। তস্য সবিতুঃ তৎ সবিতুঃ। অর্থ হইবে—সেই শ্রুতিশাস্ত্রে বিখ্যাত সবিতৃ দেবতার।

সবিতা—সূর্য। কিন্তু সূর্য বহিরাকাশে। সবিতা অন্তরাকাশে। বাহিরের সূর্য আমাদের সকলেরই পরিচিত। অন্তরাকাশের সবিতা—সর্বান্তর আত্মা। বহিরাকাশে সূর্যমণ্ডলের অন্তরস্থ (যে-পুরুষ সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ) সেই পুরুষ সকল মানুষের হৃদয়াকাশে জীবাত্মা হইয়া বাস করেন। বাহিরের সূর্য তেজোময় জ্যোতির্ময় পিণ্ড। আর অন্তরাকাশের সূর্য জ্যোতির জ্যোতিঃ। "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।" (গীতা ১৩/১৮) "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" (কঠ, ২/২/১৫) (শ্বেত, ৩/১৪) (মুণ্ডক, ২/২/১০)

বেদ-ভাষ্যকার উবটের মতে সবিতা সর্বের প্রসবদাতা। ❑

ঋগ্বেদ সংহিতা ও সাত্বত সংহিতা

সাত্বত সংহিতা ভাগবতের আর এক নাম। সাত্বত শব্দের অর্থ ভক্ত। ভাগবত প্রধানতঃ ভক্তদের গ্রন্থ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ধ্যান ও তপস্যার কথা থাকিলেও ভাগবত মুখ্যত ভগবানের কথা। ভগবানের কথা ভাগবত। ভাগবতে ভগবানের পরিচয় পরিষ্কার। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" মূলতঃ ভাগবত কৃষ্ণকথাময়। বেদ সংহিতায় এই কৃষ্ণকথা কিছু পাওয়া যায় কিনা বা কতটুকু তাঁর আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই আলোচনার বিষয়।

দ্বাদশটি স্কন্ধময় ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যায় ১০ম স্কন্ধ। এই ১০ম স্কন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয় রাসলীলা। এই রাসলীলা পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত। তাঁহার নাম রাস পঞ্চাধ্যায়। এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা মাধুর্যের লীলা বর্ণিত আছে। এই বর্ণনার শেষ শ্লোকে গ্রন্থের বক্তা শুকদেব বলিয়াছেন—এই বিষ্ণুর লীলা-ক্রীড়াসকল যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন ও বর্ণন করেন, তিনি পরা ভক্তি লাভ করেন। তাহার হৃদ্‌রোগ দূর হইয়া যায়।

এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা ক্রীড়া বা বিষ্ণুর ক্রীড়াময় লীলা অভিন্ন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু একই। বেদ সংহিতায় বিষ্ণুর কথা অনেক আছে। সুতরাং বেদে কৃষ্ণকথা আছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর কোন ভক্তকে শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"গৌণ মুখ্যা বৃত্তি বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে।।"

এই কথা পড়িয়া প্রথমে আশ্চর্যান্বিত হই। বেদে কৃষ্ণ কথা কই? কিন্তু আমরা যখন বুঝিলাম বিষ্ণু আর কৃষ্ণ একই তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। তবে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, কেবল কৃষ্ণকথা বলাই বেদের প্রতিজ্ঞা—এই কথাটি কী করিয়া ঠিক হয় তাহা চিন্তার বিষয়।

বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রমুখ প্রায় চব্বিশজন দেবতার কথা আছে। তবে বেদ শুধু কৃষ্ণকথাই বলিয়াছেন ইহা কীরূপে হয়? বেদ যত দেবতাদেরই নাম করুন দেবতা যে একজন তাহা বহু প্রকারে বলিয়াছেন। একং সৎ, একং তৎ, মহদ্দেবানামসুরত্বম্ একম্, এই কথাটি জোর দিয়া বলিয়াছেন সেই একই বহু নাম। বিপ্রেরা তাঁহাকে বহু নামে ডাকেন। ইহা খুব দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন। সে একটি সদ্‌বস্তুর তপঃশক্তি ও জ্যোতিঃ অগ্নি, তাঁহার ঐশ্বর্যময় পরাক্রম শক্তি ও রাজোচিত মহিমায় ইন্দ্র। বিশ্ব-আবরিকা মহাশক্তি বরুণ। এইরূপ সমস্ত দেবতাগণই পরম সত্তার এক একটি অংশ প্রকাশ। মূল হইলেন বিষ্ণু। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

ঋক্‌সংহিতায় বিষ্ণুসূক্তের সংখ্যা খুব কম। মাত্র তিনটি। তাছাড়া অন্য দেবতার সূক্তমধ্যে কয়েক স্থানে বিষ্ণু দেবতার কথা দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের দেবতা বিষ্ণু, ঋষি দীর্ঘতমা। ইহাতে মাত্র দুইটি মন্ত্র। পরবর্তী ১৫৫ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্রের দেবতা বিষ্ণু। ১৫৬ সূক্তের দেবতাও বিষ্ণু, দুইটি মন্ত্র, ঋষি দীর্ঘতমাঃ। ইহা ছাড়া প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্ত, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি, দেবতা অশ্বিদ্বয়। এই সূক্তে ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ মন্ত্রে বিষ্ণুর মহিমা আম্নাত হইয়াছে। এই কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

দীর্ঘতমাঃ ঋষি বিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ঋ. ১/১৫৪/৫ মন্ত্রে—

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।"

চেতনার ঊর্ধ্বায়ন ও দিব্য রূপান্তরের প্রতীক হই মধু। পঞ্চামৃতের চতুর্থ অমৃত মধু, বৈদিক ঋষিদের কাছে এই মধু হ'ল স্বর্গের পীযূষধারা—"দিবঃ পীযূষমুত্তমম্" "মধুমত্তমম্' (ঋ. ৯/৫১/২)। সমস্ত জ্ঞান ও সাধনার যে ঘনীভূত রূপ, যে অন্তরতম তত্ত্ব তাহাকে ঋষিরা বলেছেন 'মধুবিদ্যা'। দিব্য আনন্দের দেবতা হলেন সোম। এই সোম দেবতার প্রসাদ যে অমরত্ব তাকেই বলা হয়েছে মধুচেতনা। সাধকের জীবনে এবং তাহার সাধনায় এই দিব্য আনন্দ এই মধু চেতনাই অন্তর্গূঢ় হইয়া রহিয়াছে। বেদে সোমকে বলা হইয়াছে তাই 'মধ্বদ'। উপনিষদে এই মধ্বদ হ'লেন জীবের জীবাত্মা, মানুষের অন্তরতম চৈত্যপুরুষ, যিনি মধুস্বাদী 'পিপ্পলাদ'—"য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ" (কঠোপনিষদ্, ২/১/৫)। পরম বিষ্ণুকে তাই বলা হইয়াছে, তিনি "মাধবো........." (অনুশাসন পর্ব, ১৪৯/৩১)।

বস্তুত ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪টি এবং বেদের অন্যত্রও এই সোম, এই মধুচেতনা, এই দিব্য আনন্দেরই আরাধনা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও দিয়াছেন এই মধুবিদ্যার ইঙ্গিত—

"এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু।.....
এই ধর্ম সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই ধর্মের মধু।"....
"এই সত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই সত্যের মধু।"....
"এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু এবং এই সর্বভূত মানবজাতির মধু।"...

"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু।"...
"অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু।...
"ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু।"...(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৫/১, ১১-১৩)

এই দ্যুলোক ও ভূলোকের পরিমণ্ডলে যত দেবগণ তাঁরা সকলেই এই দিব্য আনন্দ বহন করিয়া চলেন। সব কিছুকে মধুময় অমৃতময় করে ধরেন। গৌতম ঋষির সেই বিখ্যাত মন্ত্র—

"মধু বাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।
মধু নক্তমুতোষসো। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।" (ঋ. ১/৯০/৬-৮)

এই বাতাস মধুময়, বিপুল সত্যের সাধকের কাছে মধু ক্ষরণ করে। মধুময় এই শ্যাম বনানী। মধুময় হোক আমাদের রাত্রি ও উষা। এই পার্থিব লোক মধুময়। এই দ্যুলোক আমাদের পিতা, তিনি মধুময়। মধুমান্ বনস্পতি। মধুমান্ সূর্য। মধুমতী হোক যত ধেনু, অর্থাৎ আমাদের চেতনা অমৃতময় হোক।

"ঋষির প্রার্থনায় এই যে বাতাস সিন্ধু বনস্পতি সূর্য পৃথিবী, এ যেমন বাইরে তেমনি ভিতরেও, একই সঙ্গে অধিভূত ও অধ্যাত্ম।" ('বেদমন্ত্র-মঞ্জরী', ১৯৩ পৃষ্ঠা)

বেদে ইন্দ্র দেবরাজ। ইন্দ্রের সূক্ত সবচেয়ে বেশী। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেন্দ্র, গোকুলের রাজা। বৈদিক সমর-দেবতা ইন্দ্রের বীরত্ব কৃষ্ণের গোকুলের প্রথম জীবনের সঙ্গে মিশিয়াছে। সংহিতায় অসুর-দৈত্য বধের জন্য ইন্দ্র বিখ্যাত। ইন্দ্র যত বিখ্যাত তত একই গোকুলে কৃষ্ণ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অঘাসুর-বকাসুর বধ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইন্দ্র বধ করিয়াছেন বৃত্রকে। কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন প্রলম্বাসুরকে। ইন্দ্র কালোপম সত্য বিনাশ করিয়া সত্য সুন্দর গতি মুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করিয়া যমুনার জল পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। যমুনার জল পরিশুদ্ধ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রের স্বরূপটি মিশিয়া গিয়াছে কৃষ্ণের প্রথম জীবনে। বেদে ইন্দ্র বিষ্ণু একই। তাই বৈষ্ণবেরা বলেন—

"বিষ্ণুদ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুরে সংহার।"

অতএব কংস ও শিশুপাল বধের ক্ষেত্রে বিষ্ণুই সেই ভূমিকা পালন করিয়া নররূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের বিশেষ কাজটি করিয়াছেন। গৌড়ীয় দার্শনিকেরা বলেন—কৃষ্ণের প্রধান কাজ হইল রসাস্বাদন।

"প্রেম-রস নির্যাস করিতে আস্বাদন।"

তাঁর নিজের ভিতরেই যে অনন্ত রস আছে, তা নিজে নিজেই অনুভব করা যায় না। নিজের রসস্বরূপতা বুঝিবার জন্য আরও একটি সত্তার প্রয়োজন। সেই রস-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ব্রজের রমণীদের মধ্যে। আর রসিক হিসাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন সেই রস-সত্তা আস্বাদনের জন্য।

এইভাবে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করার জন্য দার্শনিকরা তাঁদের বিচার আরম্ভ করেছেন একেবারে উপনিষদের বাক্য-মহাবাক্য থেকে। 'রসো বৈ সঃ'—এই সব কথা তো আছেই, রসিকজনেরা যুক্তি দিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের পংক্তি উদ্ধার করে বলেন--পরম পুরুষ তাঁর জ্যোতির্লোকে একা একা বসে আর সুখ পাচ্ছিলেন না। কারণ, একা একা কি সুখ পাওয়া যায়?—"স বৈ নৈব রেমে, যস্মাদ্ একাকী ন রমতে।" তিনি তাই আপন স্বরূপস্থিত রস আস্বাদনের জন্য অদ্বৈত সত্তা পরিত্যাগ করে দুই হলেন, স্বামী হলেন, স্ত্রী হলেন ইত্যাদি।

কৃষ্ণের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বৈত রসাস্বাদনের ভূমিকাও ম্লান হয়ে গেছে। দার্শনিকেরা বলেছেন—স্বামী-স্ত্রীর নিয়ম আছে, এক-পত্নীকতার মধ্যে যে ব্রত আছে, তা কখন-ও পরম ঈশ্বরকে তৃপ্তি দিতে পারে না।... ❑

বেদান্ত

বেদান্ত দর্শনের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। ইহা মহামতি বাদরায়ণ বিরচিত। চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ। মোট ষোলটি পাদ। ইহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ। ইহার ভিত্তি কয়েকখানি সুপ্রাচীন উপনিষদ্।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বত্রিশটি সূত্র। প্রথম সূত্র **'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।'** অর্থ, আসুন সবচেয়ে যিনি বড়, তাঁর কথা আলোচনা করি — তাঁহাকে জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করি।

সর্বাপেক্ষা বড় কে? দ্বিতীয় সূত্র **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** — বলেন, যাহা হইতে এই বিশ্বসংসার জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিত আছে এবং যাহার অভিমুখে ছুটিতেছে, যেখানে গিয়া স্থিরতা লাভ করিবে পূর্ণতা লাভ করিবে — তিনিই সবচেয়ে বড়। তিনি ব্রহ্ম। -

তাঁহার কথা আমরা কী করিয়া জানিব? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। মন-বুদ্ধির বিচার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। তৃতীয় সূত্র তাই বলিয়াছেন — "তাঁহাকে জানা যাবে শুধু 'শ্রুতি' দ্বারা। 'শ্রুতি' অর্থ উপনিষদ্। উপনিষদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (প্রত্যক্ষ) বা বুদ্ধিগ্রাহ্য (পরোক্ষ) নহে। ঐ জ্ঞান-দ্রষ্টা ঋষি বলেন, অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ। এইজন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ।

কেহ যদি বলেন, বিভিন্ন শ্রুতির বিভিন্ন মত। সুতরাং শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব কী করিয়া জানা যাবে? চতুর্থ সূত্র তার উত্তরে বলেন, শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সমন্বয় আছে, কোন বিরোধিতা নেই। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন (১।২।১৫) — সকল বেদ একজনের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন — "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।"

যদি কেহ বলেন, ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ নহেন। কারণ, সাংখ্যদর্শন স্থাপন করিয়াছেন যে, মূলা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তার উত্তর দিয়াছেন পঞ্চম সূত্র—যিনি জগৎকারণ, তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন — 'ঈক্ষণ' করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্' (৬।২।২)। ঐতরেয় শ্রুতি বলেন, 'স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি' (১।১।১-৮)। সুতরাং জগৎকর্তা যিনি তিনি ঈক্ষণকারী। ঈক্ষণ করিতে লাগে চেতনা। অচেতন বস্তু ঈক্ষণ করিতে পারে না। সাংখ্যের যে মূল প্রকৃতি তিনি অচেতনা। সুতরাং অচেতনা প্রকৃতি জগৎ-কারণ হইতে পারে না।

যদি কেহ বলেন, শ্রুতির ঐ ঈক্ষণ শব্দ মুখ্যার্থে অর্থাৎ ইচ্ছা করা অর্থে গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থে করা যায়। তদুত্তরে ষষ্ঠ সূত্র জানাইতেছেন যে, জগৎকর্তা যে শুধু ঈক্ষণ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি যে চৈতন্যময় আত্মা একথাও বলিয়াছেন — "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্।" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭)

সপ্তমসূত্র **'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ'** বলেন — ব্রহ্ম যে চৈতন্যময় আত্মা, তিনি ঈক্ষণ কর্তা তাহাই নহে, তাহাতে যে নিষ্ঠ হয় তাহার মোক্ষলাভ হয় একথাও জানাইয়াছেন ছান্দোগ্য শ্রুতি "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে" (৬।১।৪)। ভগবদ্গীতাও বলেন — "তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" (১৮।৬২)।

অষ্টম সূত্রে বলেন যে, ব্রহ্মই জগৎকারণ ইহাতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু শ্রুতিতে সর্বত্রই ব্রহ্মকে বড় বলা হইয়াছে, কোথাও তার সম্বন্ধে কোন হেয় উক্তি অর্থাৎ তিনি কোন

বস্তু অপেক্ষা ছোট এমন কথা নাই। তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই — ব্রহ্ম অসমোর্দ্ধ।

নবম সূত্র **'প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ'** বলেন যে, চৈতন্যময় ব্রহ্ম জগৎকারণ না হইয়া অচেতনা প্রকৃতি কারণ হইলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যই নষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ছান্দোগ্য (৬।১।২-৪) 'সদেব সৌম্যেদমগ্রে' অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু হইতে জগৎ সৃষ্ট। তাঁহাকে জানিলে অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। এই বস্তু চৈতন্যময় সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নহেন।

দশম সূত্র **'স্বাপ্যয়াৎ'** বলেন যে, ছান্দোগ্য শ্রুতি (৬।৮।১) মন্ত্রে "স্বপিতি হ্যপীতো ভবতি" জানাইয়াছেন — সুষুপ্তিকালে জীব মূল কারণে লীন হয়। সুষুপ্তিতে জীব চৈতন্যময় আত্মাতেই লীন হয়, অচেতনা প্রকৃতিতে নহে।

একাদশ সূত্র 'গতিসামান্যাৎ' জানাইযাছেন সকল শ্রুতি বাক্যই একসুরে বলেন যে, ব্রহ্মই জগৎকারণ।

দ্বাদশ সূত্র **'শ্রুতত্বাচ্চ'** বলেন, সকল শ্রুতিই এই কথা বলেন যে, জগৎকারণ পরম সৎ-স্বরূপ এবং চিৎ-স্বরূপ। তাঁহার সত্তা শাশ্বত ও চৈতন্য অনন্ত। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম। অচেতনা প্রকৃতি নহেন।

ত্রয়োদশ সূত্র বলেন, তিনি শুধু সৎ ও চিৎ নহেন, তিনি আনন্দময় 'আনন্দময়ঃ'— তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

কেহ যদি বলেন, আনন্দময় কথায় বুঝায় তিনি আনন্দের বিকার। তদুত্তরে চতুর্দশ সূত্র — ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে হয় নই, প্রাচুর্যার্থে হইয়াছে। আনন্দময় অর্থ আনন্দপ্রচুর — আনন্দঘন।

তিনি যে আনন্দঘন, নিজের আনন্দে অপরকে আনন্দপূর্ণ করেন একথা তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' ২।৭।১ মন্ত্রে। এ কথা পঞ্চদশ সূত্র 'তদ্ধেতুব্য-পদেশাৎ' সূত্রে জানাইলেন।

ষোড়শ সূত্র মন্ত্র 'মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে' বলেন যে, বেদমন্ত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগন্মূল এই কথা বহুবার বলিয়াছেন তৈত্তিরীয় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ।

ষোড়শ সূত্র পর্যন্ত অচেতনা প্রকৃতিকে পূর্বপক্ষ করিয়া ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ ইহা বলা হইয়াছে। সপ্তদশ সূত্র হইতে জীবাত্মাকে পূর্বপক্ষ করিয়া পরমাত্মা ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ কারণ হইতে পারে না। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, জীব তাহাকে পাইয়া আনন্দী হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ছাড়া জীব পূর্ণ নহে।

অষ্টাদশ সূত্র বলিয়াছেন জীবাত্মা-পরমাত্মা এই ভেদ স্পষ্ট। সুতরাং পরমাত্মাই জগৎ-কারণ, জীবাত্মা নহে।

ঊনবিংশ সূত্র বলেন, তিনি কামনা করিয়া সকল সৃজন করিয়াছিলেন। 'সর্বম্ অসৃজত'

— ইহা জীবাত্মা কখনও পারে না।

৫-১২ সূত্র জানাইয়াছেন—

পরব্রহ্মাই জগতের কারণ। এই সৃষ্টিকার্যে তাঁহার ঈক্ষণ প্রয়োজন। ঈক্ষণকারী পুরুষ নিশ্চয়ই চৈতন্য বিশিষ্ট। সাংখ্য দর্শনের মতে, জগৎকারণ মূলা প্রকৃতি। তাহা ঠিক নহে। কারণ সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন। জগৎকর্তা চিৎস্বরূপ।

১৩-২০ সূত্র জানাইয়াছেন—

পরব্রহ্ম আনন্দঘন সত্তা। তিনি শুধু আনন্দঘন নহেন, আনন্দ-প্রচুর। তাহাতে আনন্দ অপর্যাপ্ত। অর্থাৎ প্রকৃতি বা অণুচিৎ জীব — কেহই আনন্দঘন নহেন। আনন্দহীন জীবকে তিনি আনন্দঘন করেন। এইজন্য তাহারা জগৎকর্তা নহে। সত্তা, চেতনা ও আনন্দ — সৎ-চিৎ-আনন্দ পরব্রহ্ম থেকে পৃথক্ কিছু নহে। ইহা তাঁহার স্বরূপভূত। শুধু কামনা দ্বারা (কামাৎ) তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়।

২১-২২ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন — পরব্রহ্ম নিখিল বিশ্বের আত্মান্তর্যামী। বিরাট সূর্য হইতে ক্ষুদ্র অণু পর্যন্ত সকল বস্তুর অন্তরতম রূপে তিনিই বিরাজমান।

২৩-২৪ সূত্র জানাইয়াছেন — শ্রুতিতে অনেক সময় পরব্রহ্মকে আকাশ ও প্রাণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার ব্যাপকতা ও অন্তরচারিতা প্রকাশের জন্য। যিনি অন্তর হইতে আত্মাকে পরিচালনা করেন তিনি আত্মার আত্মা পরমাত্মা।

২৫-২৮ সূত্র জানাইয়াছেন — পরব্রহ্মকে স্থানে স্থানে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই নিখিল বিশ্বের সৃজন-রক্ষণে তাঁহার একপাদ মাত্র জ্যোতির বিভূতি। আর তিনপাদ জগদতীত সত্তা। তিনি বিশ্বগ ও বিশ্বাতিগ। অনন্ত আকাশে যে জ্যোতি প্রত্যেক জীবের অন্তরেও সেই জ্যোতি।

২৯-৩২ সূত্র জানাইয়াছেন — পরব্রহ্ম অনন্ত বিশ্বের প্রাণস্বরূপ। যখন কোন জীব পরব্রহ্মের সহিত একাত্মতানুভব করেন তখন তিনিও নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই জন্য ব্রহ্ম বস্তুকে ধ্যান করিবার তিন প্রকার প্রণালী আছে —

(১) আত্মারূপে (২) জগৎপ্রাণরূপে ও (৩) স্বয়ংরূপে। ❑

ব্রহ্মসূত্র পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র বলিতে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্যন্ত পাঁচশত পঞ্চান্নটি সূত্রকে বুঝায়। ব্রহ্মসূত্রেরই চলিত নাম বেদান্তসূত্র। ব্রহ্মসূত্র ও বেদান্ত দুইটি শব্দই গীতায় পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।" "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।" ১৩/৪ ও ১৫/১৫ গীতায় উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় ব্রহ্মসূত্রসমূহ গীতা হইতে প্রাচীন। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে। মহাভারতের যুগেও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের

প্রচার ও প্রভাব ছিল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতে বৈদিক যুগ ৬০০০—৪০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ব্রহ্মসূত্র বৈদিক যুগের সৃষ্টি।

বেদান্তের আর এক নাম উত্তর মীমাংসা। উত্তর অর্থ শেষ চরম। পূর্বমীমাংসার পরবর্তী। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি গভীরতম বিষয়ের চরমতম বিচার আছে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন তখন ভারতীয় ঋষিরা পরম তত্ত্বের চরম মীমাংসা করিয়াছেন। বেদান্ত ভারতের আত্মা, জাতির প্রাণের মূলাধার।

এই সূত্রগুলির লেখক বাদরায়ণ। চলিত ঐতিহ্য মতে বেদব্যাস। বেদব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি এই মতে অনেকের বিশ্বাস, কারণ ভাগবতে বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবকে বাদরায়ণি বলা হইয়াছে। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে দুইটি সূত্রে বাদরায়ণ নাম আছে—তিনি যেন তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ ভাবে।

"তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।" (১/৩/২৬) অর্থাৎ বাদরায়ণের মতে দেবতাদিগেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার আছে।

"ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি।" (১/৩/৩৩) অর্থাৎ আদিত্য প্রভৃতি কেবল জ্যোতিঃপিণ্ড নহেন, ঐ নামে চেতন দেবতাও আছেন।

মনে হয় সূত্রকার বাদরায়ণের মত দ্বারা নিজপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে নিজের ঐরূপ উদ্ধৃতি প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বেদব্যাস সম্বন্ধে কথিত আছে তিনি বেদ বিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তুকে অথর্ববেদ উপদেশ করেন। তারপর ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। বাদরায়ণ নামের মত আরও সাত জন পূর্বাচার্যের নাম সূত্রকার সূত্রমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি, ঔডুলোমি, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি ও আত্রেয়। ইঁহারা সূত্রকারের পূর্ববর্তী বৈদান্তিক। ইঁহাদের মতামত পড়িলে কে কোন্ ধারায় তাহা খানিকটা অনুমান করা যায়।

যেমন, বৈদান্তিক কাশকৃৎস্ন। তাঁর কথা ১/৪/২২ সূত্রে আছে। সূত্রটি এইরূপ—

"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ।"

অর্থাৎ আচার্য কাশকৃৎস্ন বলেন, পরমাগ্রহ জীব ভাবে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী।

আচার্য আশ্মরথ্যের নাম আছে ১/২/২৯ সূত্রে—"অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ।" অর্থাৎ আচার্য আশ্মরথ্য বলেন যে যদিও ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও মহান্ তথাপি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের প্রাদেশ প্রমাণ হৃদয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। পরবর্তী কালে আচার্য রামানুজ সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

আচার্য ঔডুলোমির নাম আছে ১/৪/২১ ব্রহ্মসূত্রে। "উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাৎ ঔডুলোমিঃ।"

** 'উজ্জীবন'। ২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৮৬) খড়দহ শ্রীবলরাম ধর্মসোপান হইতে শ্রীসম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীমৎ নৃসিংহ রামানুজদাস।*

অর্থাৎ দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের ঐরূপ ভাব ব্রহ্মভাব হয়। জীবাত্মা যখন মুক্ত তখন পরমাত্মা ভাব প্রাপ্ত হয়। জীবন বদ্ধাবস্থায় ভেদবিশিষ্ট। মুক্তাবস্থায় অভিন্ন। ব্রহ্মাবস্থায় ভিন্ন। ইহাতে মনে হয়, ঔডুলোমি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। পরবর্তী কালে নিম্বার্কাচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভেদাভেদবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

বহু মতবাদের মধ্যে সূত্রকার নিজে কোন্ মতবাদী তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পরবর্তী আচার্যপাদগণ সকলেই সূত্রকারকে সত্যবাদী জানিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যকে প্রপঞ্চিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করিয়া বেদান্তসাগরের মধ্যে কদলীবৃক্ষের এক টুকরা ক্ষুদ্র খণ্ড ভাসাইতেছি। বড় বড় জাহাজগুলির ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলিতে পারিব এই ভরসা।

কোনও কালে যোল অঙ্কটি ছিল পূর্ণতার জ্ঞাপক। চন্দ্রের যোলকলা। বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ ষোড়শকল। ষোড়শী বলিলে বুঝায় পূর্ণ যৌবনা। এক সময় ছিল যোল আনায় এক টাকা। লোকটি চৌকোশ বা স্কোয়ার বলিলে সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী বুঝায়। ঐরূপ চারিটি স্কোয়ারে ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের চারিটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ।

"প্রথমাধ্যায়ে—সর্বেযাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ।
দ্বিতীয়ে—সর্বশাস্ত্রাবিরোধঃ।
তৃতীয়ে—ব্রহ্মাপ্তি-সাধনানি।
চতুর্থে—তদাপ্তিফলমিতি।
অধিকারী—নিষ্কামধর্ম-নির্মলচিত্ত-সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শমদমাদিসম্পন্নঃ।
সম্বন্ধঃ—বাচ্যবাচকভাবঃ।
বিষয়ঃ—বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দ-পুরুযোত্তমঃ।
প্রয়োজনম্—অশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরঃ তৎসাক্ষাৎকারঃ।"

বেদের শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্ বা শ্রুতি। শ্রুতিবাক্যের মীমাংসার জন্য ব্রহ্মসূত্র। সকল শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে। ইহা জানানো প্রথম অধ্যায়ের বিষয়। যেখানে যেখানে শ্রুতিবাক্যে আপাত বিরোধিতা আছে মনে হয় সেখানে সেখানে যে বিরোধিতা নাই তাহা স্থাপন করার নাম অবিরোধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইহাই আলোচ্য বিষয়। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফলের কথা বলা হইয়াছে। গ্রন্থের লক্ষ্য বস্তু—সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন—সর্বপ্রকার দোষশূন্য হইয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ। এই কার্যে অধিকারী—নিষ্কাম ধর্মাচরণশীল নির্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গে লালসাযুক্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংযমী ব্যক্তি।

সূত্রকারের নিজের কথা কী তাহা অনুধাবন করা দুরূহ হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। কতিপয় সূত্রাবলম্বনে সাধারণভাবে কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সূত্রকারের মতে বেদ নিত্য। "অতএব চ নিত্যত্বম্" (১/৩/২৮) সূত্রে তাহা স্পষ্ট। তর্কবিচার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেৎ, এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" (২/১/১১-১২) সূত্রে তাহা প্রকাশিত। শাস্ত্রগম্য ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। ইহা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১/১/৩) — এই সূত্রে সুব্যক্ত। তিনি অন্য প্রমাণের অগোচর

এবং অব্যক্ত "তদব্যক্তমাহ" (৩/২/২২) হইলেও আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (৩/২/২৩)। সংরাধন পদে উপাসনা বুঝায়। তাঁহার প্রীতি সম্পাদক আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। ব্রহ্মেতে নিষ্ঠা সম্পন্ন হইলে মোক্ষ লাভ হয়, ইহা "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (১/১/৭) সূত্রে সুপরিব্যক্ত। পরব্রহ্ম সৎস্বরূপ, "স্বাপ্যয়াৎ" (১/১/১০) এই সূত্রে তাহা জানা যায়। সূত্রের অর্থ— সুষুপ্তি অবস্থায় জীব 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎকারণে লীন হয়। সৎপদবাচ্য পরব্রহ্ম বুঝা গেল।

পরব্রহ্ম চিৎস্বরূপ। ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১/১/৫) এই সূত্র দ্বারা। তিনি ঈক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিৎস্বরূপ ইহা বুঝা যায়। চেতনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই ঈক্ষণ সম্ভব। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। অচেতন বস্তুর ইচ্ছা থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দময়। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১/১/১৩) সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত। তাহাতে আনন্দের প্রাচুর্য আছে—ইহা "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ" (১/১/১৩) এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। পরব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১/১/২) সূত্রে তাহা উল্লিখিত। পরব্রহ্মের সৃষ্টি কার্য করিতে কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। দুধের যেমন দধি হইতে কাহারও সহায়তা লাগে না তদ্রূপ। একথা—"উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন ক্ষীরবৎ হি" (২/১/২৪) সূত্রে সুপরিব্যক্ত। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ—উভয়ই। ১/৪/২৩ সূত্রে তাহা ব্যক্ত। সূত্র যথা—

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" (১/৪/২৩) ব্রহ্ম নিজেই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১/৪/২৬) এই সূত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারীরূপে জগদতীত রহিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। তবে সৃষ্টি করেন কেন? "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।" (২/১/৩২) প্রয়োজন নহে, লীলার জন্য—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" (২/১/৩৩)।

সৃষ্ট জগতের ঘৃণা বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা ব্রহ্মাকে স্পর্শ করে না। "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।" (২/১/৩৪) এই সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট। তিনি সর্ব জীব ও জগতের অন্তর্যামী। অন্তরে থাকিয়া সব সংযমন করেন।

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ।" (১/১/২০)

বিশ্ব সংসারের যাবতীয় বস্তুকে তিনি অন্তরতম প্রদেশে থাকিয়া পরিচলনা করেন। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে সূত্রকারের অভিপ্রায় ৩/২/২৭ সূত্রে জানা যায়—

"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ।"

অর্থাৎ শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাচক ও ভেদবাচক উভয় প্রকার বাক্য আছে। সামঞ্জস্যের জন্য 'অহিকুণ্ডলবৎ' দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। তাৎপর্য এই যে, সর্প যদি কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে তাহা হইলেও সে তো সর্পই। সর্পাংশে একই। আবার সর্প দীর্ঘাকার, কুণ্ডলী বলয়াকার। সর্পাকারে ফণার প্রকাশ আছে, কুণ্ডলী আকারে নাই। সুতরাং ভেদবিশিষ্ট।

জীব অণুপরিমিত, বিভু নহে। এই বিষয়ে সূত্রকারের অভিমত—

"ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ।" (২/৩/২১)

জীব অণু নহে, বিভু—কারণ, আত্মা বিভু এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। এই পূর্বপক্ষের উত্তর দিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—আত্মা যে বিভু ইহা পরমাত্মা সম্বন্ধে, জীবাত্মা সম্বন্ধে নহে। জীবাত্মা অণুই। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম চিদংশে অভিন্ন, উভয়েই চৈতন্যময়। আর অণুত্ব বিভূত্ব বিচারে ভিন্ন। জীব অণু পরিমিত। ব্রহ্ম ভূমা অপরিমিত।

সূর্য ও সূর্যালোকে যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ সম্বন্ধ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে। এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নোক্ত সূত্রে (৩/২/২৮)—

"প্রকাশাশ্রয়বৎ বা তেজস্ত্বাৎ।"

প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের মত। প্রকাশ যেমন সূর্যের কিরণ, আর প্রকাশাশ্রয় সূর্য।

ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ, এই তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে ২/৩/৪৩ সূত্রে, যথা—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।।"

সূত্রের তাৎপর্য ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধের কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। সত্য কথা এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম অংশী। আবার অভেদের উল্লেখ আছে অথর্ববেদে "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা" ইত্যাদি বাক্যে মানুষকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল—কোন বিষয়ে ভেদ, কোনও বিষয়ে অভেদ। ইহাই জীব-ব্রহ্মের যথার্থ সম্বন্ধ।

দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় তিনটি—ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব। একটু নিবিষ্টভাবে সূত্রগুলি আলোচনা করিলে ঐ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে সূত্রকারের কী অভিমত তাহা অতি সংক্ষেপে এখানে বলা হইল। ❐

শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনে ঈশ্বর তত্ত্ব

আচার্য শঙ্কর মতে—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদরহিত পরব্রহ্মই পরম তত্ত্ব। তিনি নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার। তিনি সর্বময় সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তা (তাহার ব্যক্তিত্ব বা personality নাই)। শঙ্করের এই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ নহেন। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ নহে। যেহেতু সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার মায়িক। ব্রহ্ম মায়াতীত। জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। মায়াবশতঃ জীব নিজেকে পৃথক্ মনে করে। জ্ঞানদ্বারা মায়ার আবরণ কাটিয়া গেলেই সে জানিতে পারে যে সে ব্রহ্মই। বেদের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যও এই কথা বলিয়াছেন।

এই কথা শঙ্কর মতে পারমার্থিক সত্য। ইহা ছাড়া আর একটি সত্য আছে ব্যাবহারিক। ব্যাবহারিক সত্যে ঈশ্বর আছেন, সৃষ্ট্যাদি কার্যে আছেন। মায়ারহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর সগুণ সবিশেষ। তিনি সৃষ্টিকর্তা কর্মফলদাতা।

শঙ্কর আবার বলেন, সৃষ্ট্যাদির কর্তা কর্মফলদাতা একজন ভগবান্ আছেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ ভগবান্ যদি পূর্ণতম হন আপ্তকাম হন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আর যদি পূর্ণতম না হন তাহা হইলে অপূর্ণ ভগবানে আর জীবে পার্থক্য থাকে না।

শঙ্করের এই যুক্তি হইতে মনে হয় তিনি ঈশ্বর মানেন না। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শঙ্কর বলেন, ঈশ্বরকে যুক্তি দ্বারা মানা যায় না। তবে মানি কেন? বেদ বলিয়াছেন, ঋষিরা বলিয়াছেন। বেদবাক্য ও বিদ্বদনুভূতি ঈশ্বরসত্তার প্রমাণ।

নিরুপাধি পরব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদির কর্তা নহেন। সোপাধিক ঈশ্বর তিনি সৃষ্ট্যাদির কর্তা। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হন। তখন ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টাদি করেন। বৈষ্ণবাচার্যেরা শঙ্করের সঙ্গে একমত নহেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম মায়াতীত সুতরাং মায়া তাঁহাকে আবরণ করিতে পারেন না। মায়োপাধি ব্রহ্ম ঈশ্বর ইহা কাল্পনিক। বৈষ্ণবাচার্যেরা মায়া মানেন। তাঁহারা বলেন মায়া দ্বারা উপাধিযুক্ত হয় জীব। জীব মায়ার আবরণে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া—দেহকেই আত্মা মনে করে। এই জন্য জীব দেহাত্মবাদী হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। শুধু জ্ঞান দ্বারা এই দুঃখ যায় না। একমাত্র ভক্তির উদয় হইলে মায়ার আবরণ কাটিলে সে যে ঈশ্বরের দাস এই অনুভূতি জাগে। দাস-ভাবে সেবা দ্বারা তার দুঃখ দূর হয় ও মুক্তিলাভ হয়। জীব ব্রহ্ম নহে। জীব মায়াবশ। ব্রহ্ম মায়াতীত।

পণ্ডিতগণ তিন প্রকার ভেদের কথা বলিয়াছেন। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। একটি ·গরু ও ঘোড়ায় যে ভেদ তাহা সজাতীয়। একটা গরু ও মানুষে যে ভেদ তাহা বিজাতীয়। একটা গরুর হাত পা চোখ কানের মধ্যে যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ।

আচার্য শঙ্কর বলেন ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ কোনটিই নাই। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এবং 'একরসম্'। রামানুজাচার্য মতে ব্রহ্মে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই বটে কিন্তু স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে। স্বগত-ভেদ বিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। তাহাতে দুইটি ভেদ জীব ও জগৎ—চিৎ ও অচিৎ। চিজ্জড় বিশিষ্ট ব্রহ্ম। তিনিই ঈশ্বর। পরমেশ্বরই বিষ্ণু।

ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য আর ঈশ্বর ব্যাবহারিক সত্য। মায়াবৃত ব্রহ্মই ঈশ্বর। শঙ্করের এই সব সিদ্ধান্ত রামানুজ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, ও সব মায়াবাদীদের কল্পনা মাত্র। ঈশ্বর সবিশেষ; চিৎ এবং জড় তাঁর দুই বিশেষ। ঈশ্বর সগুণ—তিনি অনেক কল্যাণ গুণের খনি। তাঁহাতে গুণ নাই অর্থ অগুণ নাই।

প্রত্যেকটি জীব ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। তাঁহারই পরম চৈতন্যের অংশ কণা। "মমৈবাংশো-জীবলোকে"—গীতা এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, বেদান্ত সূত্রই বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"; বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয় যাহা হইতে তিনিই ঈশ্বর। জীবের ব্যক্তিত্ব সসীম ক্ষুদ্র। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অসীম অনন্ত। ঈশ্বর উত্তম পুরুষ, পূর্ণ চৈতন্য; জীব অণুচৈতন্য, ক্ষুদ্র পুরুষ। ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক। শ্রীবিষ্ণুর সেবা দ্বারাই জীবের ক্ষুদ্র জীবনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি। জীব তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে সাধনা দ্বারা। তিনি জীবের দিকে আগাইয়া আসিবেন করুণা দ্বারা। সাধনায় ও করুণায় জীবের ঈশ্বরপ্রাপ্তি। শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। জীবের ঈশ্বরপ্রাপ্তি অর্থ তৎসহ সাযুজ্যের অনুভব।

রামানুজ সাযুজ্য মুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিলে পাপ হয়। জীবের মুক্তি অর্থ সাযুজ্য নহে; সালোক্য, সার্ষ্টি, সমীপ্য ও স্বারূপ্য এই চারি প্রকার। জীব নানাভাবে ঈশ্বরকে পায় কিন্তু কখনও ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে চায় না। কখনও

হইতেও পারে না। অণুচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে পৌঁছিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। বস্তুর যেমন বিশেষণ—গুণ, বিশেষ্যের যেমন গুণপ্রকাশক বিশেষণ, সেইরূপ চিৎ জড় দুইটিই বিশেষণ রূপে ব্রহ্মকে বিশেষিত করেন। এইজন্য ঈশ্বরের স্বরূপই চিজ্জড়াত্মক। জীব আমরা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে যুক্ত আছি। অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া ভুলিয়া যাই। তাই অশেষ প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইলেই তিনি অসীম করুণাশক্তিতে জীবকে নিকটে টানিয়া লন। ঈশ্বর শুধু সৃষ্টিকর্তা নহেন—তিনি কৃপাময় দয়াময় ক্ষমাময়ও বটেন। করুণাশক্তি বশে তিনি জীবের অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজ লীলাধামে লইয়া যান। নিজ পার্যদত্ব দান করেন।

বৈষ্ণবাচার্যরা প্রায় সকলেই রামানুজের মত গ্রহণ করিয়াছেন অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া। নিম্বার্ক মতে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। মধ্বাচার্য মতে জীব ও ঈশ্বর সর্বদাই ভেদ-বিশিষ্ট। স্রষ্টা ও সৃষ্ট কখনও এক হইতে পারে না।

শঙ্কর বলেন, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য অনুসারে জীব ব্রহ্ম অভিন্ন। বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন, ঐটি মহাবাক্য নয়, বেদের একদেশ মাত্র। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ মধ্বাচার্য বলেন—"ব্রাহ্মণো রাজা ইতিবৎ"। এক ব্রাহ্মণ রাজার নিকট প্রচুর ধন পাইয়াছে দেখিয়া লোকে বলে "বামুন ঠাকুর তো রাজা হয়ে গেছেন।" মধ্ব বলেন—জীব যদি বলে আমি ব্রহ্ম—রাজা তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন—"ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতিবাদিনম্।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর মতে জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। একই সময় ভেদাভেদ যুক্তিবিচারে সিদ্ধ নয় এই জন্য অচিন্ত্য। অচিন্ত্য অর্থ কেবল চিন্তার অতীত নহে, অচিন্ত্য অর্থ যুক্তিরাজ্যের অতীত, রসের রাজ্যে এই ভেদাভেদ সম্ভব। জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভেদ বিশিষ্ট। রসের অনুভূতিতে ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে একত্বানুভূতি হয়। রামানুজ মধ্ব ইঁহাদের ঈশ্বর বিষ্ণু নারায়ণ। শ্রীজীবের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। অনন্ত রসের সিন্ধু। জীবের সঙ্গে তাঁহার রসের সম্বন্ধ হয়। তিনি পুত্র হন, সখা হন, প্রাণবল্লভ হন। যখন প্রাণবল্লভ তখন অভিন্ন মননে একাত্মতা হয়। লৌকিকে যে-প্রকার পতিপত্নীর গভীর মিলনে প্রায় একাত্মতার অনুভূতি হয়—আবার সেবার জন্য পৃথক্ত্ব জাগে। অপ্রাকৃত লীলারসের আস্বাদনে সেইরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের একাত্মতা অভিন্নতা অনুভূত হয়। এই একত্ব ও পৃথক্ত্ব অচিন্ত্যভাবে মিলিত হইয়া আছে।

শঙ্কর মতে শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা—'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। ভক্তি সাধনের আনুষঙ্গিক মাত্র। বৈষ্ণবাচার্যদের মতে শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়—জ্ঞান সঙ্গে সাহায্যকারী হয় কিছুদিন। যখন ভক্তি ভক্তিতে উন্নীত হয় তখন জ্ঞান ভক্তিপথের বাধক হয়। শ্রীজীব মতে ভক্তির গাঢ়তায় জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় তাহা শুদ্ধাভক্তিতে পরিণত হয়। শুদ্ধাভক্তি আরও গাঢ়ত্ব লাভ করিয়া প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। প্রেমভক্তি আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন 'প্রণয়' ভূমিতে পৌঁছায় তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন মনন হয়। ইহা সকলই অপরোক্ষ অনুভূতিবেদ্য। বিচার ভূমিকায় ইহার অবস্থিতি নাই। অখিল রসামৃত মূর্তি ইহাই শ্রীজীব গোস্বামীর মতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ। তিনি শুধু ঈশ্বর নহেন, তিনি রসিকশেখর। □

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যালোকে ব্রহ্মসূত্র

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্যন্ত ৫৫৮টি সূত্রের নাম ব্রহ্মসূত্র। স্কন্দ পুরাণে কথিত আছে যে দ্বাপর যুগে ভগবান্ পুরুষোত্তম "অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নরূপে বেদশাস্ত্রকে চারি ভাগে বিভাগ করেন এবং বেদার্থ নির্ণায়ক (তদর্থনির্ণেত্রাং) চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্র সকল আবিষ্কার করেন (আবিশ্চকার)।

সূত্র সমূহ চারিটি অধ্যায়ে ও ২০৮টি অধিকরণে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রুতি বাক্যের সমাধান রহিয়াছে—তাই অধ্যায়ের নাম 'সমন্বয়।' দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'অবিরোধ।' শ্রুতিমন্ত্রে বিরোধিতা নাই। ক্বচিৎ স্ববিরোধিতা দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহা আপাত, যথার্থ নহে, সকল বিরোধিভাবের ব্রহ্মেই সমাধান। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'সাধন'। ইহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বর্ণিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'ফল'। ইহাতে কথিত সাধন লব্ধ সাধ্য বা প্রাপ্ত ফলের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় সমন্বয় ও অবিরোধ—ব্রহ্মতত্ত্বটি স্থাপিত হইয়াছে। শেষে দুই অধ্যায় ঐ তত্ত্ব সাধ্যসাধন উপায়-উপেয়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শনের যত ভাষ্য আছে তন্মধ্যে গোবিন্দভাষ্যই সর্বাপেক্ষা নবীন। ভারতীয় দার্শনিকতার ইহা সর্বশেষ ফল। বাঙ্গালীর দার্শনিকতার ইহা বিরাট্ কীর্তিস্তম্ভ। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ইহাই সাম্প্রদায়িক ভাষ্য। ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব, একদিকে প্রাচীন ভাষ্যকার শ্রীমন্-মধ্বাচার্য ও অপরদিকে দার্শনিক-সম্রাট্ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই দুইজনের আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দার্শনিক রাজ্যে 'নবীন' হইয়া লাভ আছে। প্রাচীনদের বিপদ্ এড়াইয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবার সুযোগ থাকে।

ব্রহ্মসূত্রে প্রাচীন ভাষ্যকারেরা প্রথম চারিটি সূত্রের (চতুঃসূত্রী) ব্যাখ্যানেই মুখ্য বক্তব্য বিষয়গুলি খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া প্রায় শেষ করিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্য মতে প্রথম একাদশটি সূত্রে সমগ্র গ্রন্থের নিষ্কর্ষ রহিয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থকে "শেষগ্রন্থোঽয়ম্ অতিবিস্তারকারী" বলিয়াছেন।

(১) অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। (২) জন্মাদ্যস্য যতঃ। (৩) শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। (৪) তত্তু সমন্বয়াৎ। (৫) ঈক্ষতের্নাশব্দম্। (৬) গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ। (৭) তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ। (৮) হেয়ত্বাবচনাচ্চ। (৯) স্বাপ্যয়াৎ। (১০) গতিসামান্যাৎ। (১১) শ্রুতত্বাচ্চ।

আমরা শ্রীগোবিন্দভাষ্যালোকে এই সূত্রগণের স্বরূপ দর্শনে প্রয়াসী। শ্রীগৌর-গোবিন্দ-পদারবিন্দসেবী ভক্তবৃন্দের কৃপাই এই যাত্রাপথে সম্বল।

ভাষ্যপ্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা। ভূমিকার মুখবন্ধে দুইটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্।
গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ।। ১।।
সূত্রাংশুভিস্তমাংসি ব্যুদস্য বস্তূনি যঃ পরীক্ষয়তে।
স জয়তি সাত্যবতেয়ো হরিরনুবৃত্তো নতপ্রেষ্ঠঃ।। ২।।"

** 'সংকর্ষণ'। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৩৫৮ (নভেম্বর ১৯৫২) হইতে পরপর ৩টি সংখ্যায় প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা নাম পরিবর্তিত হইয়া 'প্রাণগৌর' নামে প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১৩৬২ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা হতে ১৩৬৪ চৈত্র (বর্ষ ১ম সংখ্যা) পর্যন্ত ৮ টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।*

প্রথম শ্লোকে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য পরম দেবতাকে নমস্কার করিয়াছেন। সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বিভু শিবাদি দেবগণ কর্তৃক স্তুত, বিগ্রহবান, সর্বকারণ-কারণ, ভ্রমাদি দোষ রহিত, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করি। শ্লোকে 'ভজদ্রূপম্' বিশেষণটি রহস্যপূর্ণ। ভাষ্যকার নিজেই সূক্ষ্মা নাম্নী টীকায় তিন-চার প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। (১) ভজদ্রূপম্—ভজন্তো ভক্তা নিত্যমুক্তাদয়ো রূপাণি মূর্তয়ঃ যস্যেতি তন্নিত্যসাহিত্য-দ্যোতনাৎ বিচিত্রম্ অনন্তলীলমিত্যর্থঃ। (২) ভজতাং রূপাণি যস্মাদিতি, স্বসংকল্পেনৈব পার্ষদতনুপ্রদমিতি চ। (৩) ভজৎ সেবমানো রূপঃ তন্নামা মহত্তমো যমিতি দ্বিতীয়ান্তান্যপদার্থো বহুব্রীহিঃ। (৪) ভজন্তি রূপাণি যমিতি বা সৌন্দর্য-সেবিতমিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয় শ্লোকে প্রণাম করা হইয়াছে সূত্রকর্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে । যিনি ব্রহ্মসূত্ররূপ কিরণ সম্পাতে অজ্ঞানতান্ধকার বিদূরিত করতঃ বস্তুতত্ত্ব প্রদর্শন করাইয়াছেন সেই ভক্তাতিপ্রিয় (নতপ্রেষ্ঠঃ) ব্যাপী (অনুবৃত্তঃ) সত্যবতী-তনয় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরির জয় হউক। শ্লোকে 'হরি' শব্দটি শ্লিষ্ট। 'হরি' পদদ্বারা তিনি হরির অবতার একথাও বলা হইয়াছে আবার "হরি-র্বাতার্কচন্দ্রেন্দ্রযমোপেন্দ্রমরীচয় ইত্যমরঃ" এই অভিধান বলে 'হরি' শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে চন্দ্র বা সূর্য বলা হইয়াছে। চন্দ্রসূর্য না হইলে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া অন্ধকার ঘুচাইলেন কী প্রকারে?

ভাষ্য-ভূমিকা

দুইটি প্রণামে মঙ্গলাচরণ শেষ করিয়া ভাষ্যভূমিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পরম চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রণীত হইয়াছে তাহা প্রপঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় অসিদ্ধান্তকে পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাঁহারা তত্ত্বানভিজ্ঞ তাঁহারা বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা ভ্রান্তমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, কর্মই নিখিল পুরুষার্থের হেতু (কর্মণঃ নিখিল-পুমর্থহেতুত্বম্)। বিষ্ণু কর্মের অঙ্গস্বরূপ (বিষ্ণোস্তু কর্মাঙ্গত্বম্), কর্মের ফল স্বর্গসুখ ইত্যাদি নিত্যবস্তু (স্বর্গাদেঃ কর্মফলস্য নিত্যত্বম্), জীব এবং প্রকৃতি স্বয়ং কর্তা (জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বয়ং কর্তৃত্বম্), পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীবপদবাচ্য (পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণঃ এবং জীবত্বম্), জীবই চিন্মাত্র ব্রহ্মাত্মক এই জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের সংসার-নিবৃত্তি (চিন্মাত্র ব্রহ্মাত্মকত্বধী-মাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতিবিনিবৃত্তিঃ)। এই সকল ভ্রান্ত মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া যাহা যথার্থ শ্রুতিসিদ্ধান্ত তাহাই মহামতি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

১। পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য-সর্বকর্তৃত্ব-সার্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদি-ধর্মকবিজ্ঞান-স্বরূপত্বং নিরূপ্যতে।

পূর্বমীমাংসাকারের মতে যজ্ঞই কর্ম এবং কর্মই পরমত্ব নিখিল পুরুষার্থের হেতু। দ্রব্য ও দেবতা কর্মের দুই অঙ্গ। কুশ-ঘৃতাদি যজ্ঞের দ্রব্যরূপ অঙ্গ। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা যজ্ঞের দেবতারূপ অঙ্গ। এই মত ভ্রান্ত। ব্রহ্মসূত্র এইমত খণ্ডন করিয়া স্থাপন করিবেন যে বিষ্ণু পরম-পুরুষ। তিনি

স্বতন্ত্র পুরুষ (কাহারও অঙ্গ নহেন), তাঁহাতে সর্ব কর্তৃত্ব আছে, তিনি সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞান-ঘন ও জীবের পরম অনুসন্ধেয় বস্তু।

* * *

স্বতন্ত্র তিনি, পরতন্ত্র নহেন, অন্যের উপর নির্ভরশীল নহেন—শ্রীমদ্ভাগবত পরমপুরুষকে স্বরাট্ বলিয়াছেন। স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ পদের তাৎপর্য একই। স্বয়ং রাজতে ইতি স্বরাট্ তিনি স্বয়ংই বিরাজমান। তিনি সর্বজ্ঞ। ভাগবত বলিয়াছেন, "অর্থেযু অভিজ্ঞঃ"—সমগ্র বস্তুর রহস্যের তিনি বেত্তা। তিনি জড় নহেন, পূর্ণ চৈতন্যঘন। সৃষ্ট্যাদি সকল কর্মের কর্তৃত্ব তাঁহাতেই আছেঃ—

তথাহি "ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।"

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই পাঁচটি নিত্যবস্তু। (ক) ঈশ্বর ও জীব দুইয়ে সাদৃশ্য অনেক বৈসাদৃশ্যও বিরাট্। সাদৃশ্য এই যে, দুইই চৈতন্য স্বরূপ, দুইই নিত্য, জ্ঞানাদিগুণ (আত্মধর্ম) দু'য়েতেই আছে, উভয়েই অস্মদর্থ আছে। অর্থাৎ অহং পদে উভয়কেই বুঝায়। কেবল বিরাট্ ব্যবধান এই যে, জীব অণু ও ঈশ্বর বিভু। ঈশ্বর সূর্য, জীব কিরণকণা।

পূর্বে বলা হইল ঈশ্বর শুদ্ধ চৈতন্যঘন (Pure Consciousness), পরে বলা হইল তাহাতে অস্মদর্থ আছে—অর্থাৎ তাহাতে অহং প্রত্যয় আছে। তিনি (self-conscious being)। সংশয় জাগিতে পারে শুদ্ধ জ্ঞানের আবার জ্ঞাতৃত্ব হয় কী করিয়া? উত্তরে গোবিন্দভাষ্য বলেন, "জ্ঞানস্য জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্"—প্রকাশের স্বপ্রকাশত্বের মত জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বে কোন বিরোধের অবকাশ নাই। যাহা প্রকাশস্বরূপ, যাহা দ্বারা অন্য বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই নিজেকে নিজে প্রকাশিত করিয়া ফেলে। অন্যকে প্রকাশ করিবে আর আপনাকে প্রকাশ করিবে না ইহা কখনও হয়? প্রদীপ যেমন গৃহস্থ সকল বস্তুকে দেখায় ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও দেখাইয়া দেয়। তদ্রূপ স্ব-পর প্রকাশকত্বই চৈতন্যময় আত্মার স্বভাব। নিজের দ্বারা নিজে প্রকাশিত হন। আমাদের যে বস্তু-জ্ঞান হয় সে বস্তুকে জানিতে পারি কেননা, জ্ঞান সেই বস্তুর উপর আলোক-সম্পাত করে। জ্ঞান যখন অন্য বস্তুর উপর আলোক দেয় তখন সে নিজের উপরেও আলোক দিয়া থাকে।

নিজ দ্বারা নিজে প্রকাশিত হইলেই তাহা অহম্প্রত্যয়াস্পদ হইবে। কাজেই শুদ্ধ চৈতন্যের সর্বজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ হইতে বাধা তো নাইই বরং না হইয়াই পারে না।

শুদ্ধ চৈতন্যবাদীরা ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব ও অস্মদর্থত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আপনাকে খানিকটা সীমাবদ্ধ না করিলে তিনি সর্বজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ হইতে পারেন না। এই মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ঈশ্বর। গোবিন্দভাষ্যমতে ব্রহ্মই ঈশ্বর, ঈশ্বরই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব (সর্বজ্ঞত্ব সর্বকর্তৃত্বও অস্মদর্থত্ব); অহাই বলিয়াছেন—

১। **ঈশ্বর**। "ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ সর্বজ্ঞঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশ-নিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি।"

ঈশ্বর স্বতন্ত্র, আপনার স্বরূপশক্তিতে স্থিত। তিনি জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহা

নিয়মন (control) করেন। প্রবেশ ও নিয়মন দ্বারা তিনি জগৎ সৃজন ও পরিচালন করেন এবং তাহা দ্বারাই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। এই সব কার্যে তাঁহার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না। অদ্বৈতবাদমতে নির্গুণ ব্রহ্মে জগৎ নিয়মন এবং জীবের ভোগাপবর্গ বিধান কার্য সম্ভবে না। তিনি ইহা করিলে বিকারী হইয়া পড়েন। তাহার স্বয়ং সম্পূর্ণতায় হানি ঘটে। গোবিন্দভাষ্যমতে—তিনি স্বতন্ত্র, অবিকারী, স্বরূপ শক্তিতে স্থিত থাকিয়াই জগদ্ব্যাপারকার্য করিতে পারেন। অচিন্ত্য শক্তি বলে ইহা সম্ভব হয়।

"একোঽপি বহু ভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতেঃ বিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গঃ একরসঃ প্রজহাতি চিৎসুখং স্বরূপম্।"

তিনি এক, কিন্তু তাহার ভাব (aspect) বহু। এই বহুভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অভিন্নতা (individuality) নষ্ট হয় না। অদ্বৈতবাদমতে বহুভাব মায়ার কার্য। তিনি একত্বেই স্থিত। বহুত্ব আরোপ করিলে তাঁহার অখণ্ডত্ব নষ্ট হয়। গোবিন্দভাষ্যমতে বহুত্বের অভিব্যক্তিতে একত্বের ক্ষুণ্ণতা হয় না বরং উজ্জ্বলতাই প্রকটিত হয়।

স্বানুভূতি। ঈশ্বরের অনুভব হয়। এই অনুভবকে বিদ্বৎপ্রতীতি বা অপরোক্ষ বলে। তাঁহাকে বহুগুণবিশিষ্ট ও দেহদেহী বিশিষ্টরূপেই এই অনুভূতি হয়। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের অনুভূতি হয় না। কারণ অনুভূতিই ব্রহ্ম। অনুভূতির আবার অনুভূতি কী? অনুভূতি হইতে গেলেই অনুভবিতা ও অনুভূত বস্তু থাকা চাই। ব্রহ্মানুভূতিতে ঐ সব দ্রষ্টা-দৃশ্য লয় হইয়া যায়। সেই অনুভবে গুণ-গুণিভাব বা দেহ-দেহিভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। গুণবিশিষ্ট বা দেহবিশিষ্টের অনুভব নিম্নস্তরের। অদ্বৈতমতে ব্যক্ত বস্তুতেই গুণ-গুণী দেহ-দেহী আছে। ব্রহ্ম অব্যক্ত, কাজেই তাহাতে ঐসব বিশিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা নাই। গোবিন্দভাষ্য মতেও কিন্তু ব্রহ্ম অব্যক্ত। অদ্বৈতবাদীর প্রশ্ন হইবে, অব্যক্ত হইলে তুমি তাহাকে জান কীরূপে? গোবিন্দভাষ্যের উত্তর "অব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গঃ।" তিনি অব্যক্ত হইলেও তাঁহার চিন্ময়ীশক্তির বৃত্তি ভক্তি তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়া দেয়। ইহাতে অন্য প্রকাশকত্ব বিধায় স্বপ্রকাশকত্বের হানি হয় না। কারণ ভক্তি তাঁহারই চিদ্‌বৃত্তি, অন্যবস্তু নহে।

আপত্তি উঠিতে পারে, ভক্তি আছে ভক্তের হৃদয়ে—তাহা দ্বারা যদি তিনি ব্যক্ত হইলেন তবে তো তিনি জীবদ্বারা প্রকাশযোগ্য হইয়া পড়িলেন! উত্তরে বলিতেছেন—না তাহা নহে। ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ে থাকিলেও উহা ভক্তের সম্পত্তি নহে। উহা তিনি স্বয়ংই পরমানুগ্রহ করিয়া দান করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়া বস্তুদ্বারাই তাঁহার প্রকাশ। কাজেই, অন্যপ্রকাশত্বরূপ দোষ স্পর্শ করিল না। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা। কেবল ভক্তের হৃদয়-ঘটীতে পুরিয়া ঢালা মাত্র।

তিনি একরসঃ (Homogenous, One Essence in & out)। একরস যিনি তিনি দান করিবেন কীরূপে? উত্তর—তিনি একরস থাকিয়াও স্বরূপভূত চিদানন্দ জীবকে বিতরণ করিতে পারেন। এই পরম বস্তুটি জীবহৃদয়ে দিয়া তাহাকে ভক্ত করিয়া তাহার ভক্তিদ্বারে আপন অনন্ত কল্যাণ গুণবিশিষ্ট ও চিন্ময় দেহদেহিবিশিষ্ট নিগূঢ়তম স্বরূপটি প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

২। **জীব**। "জীবাত্মানস্ত্বনেকাবস্থাঃ বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধঃ তৎ সাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপতদ্‌গুণাবরণরূপ-দ্বিবিধ-বন্ধবিনিবৃত্তি—স্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ।।"

জীব বহু ও নানা অবস্থাপন্ন। মুখ্যতঃ জীব দ্বিবিধ অবস্থায় স্থিত—বদ্ধ ও মুক্ত। অদ্বৈতমতে

জীবতত্ত্ব কোন আলাদা তত্ত্ব নয়। মায়াভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব। পরমার্থতঃ সে সর্বদাই মুক্ত। আপনাকে বদ্ধ জানিয়া সে ভ্রান্তিতে পড়ে। বদ্ধাবস্থা যথার্থ নহে। গোবিন্দভাষ্যমতে দুই অবস্থাই যথার্থ। ঈশ্বর-বহির্মুখ হইলে জীবন বদ্ধ দশাগ্রস্ত হয়। পুনঃ ঈশ্বর-উম্মুখী হইলে মুক্ত হয়। মুক্ত জীব ঈশ্বর-দর্শন পায়। মায়ার দুইটি আবরণ। একটি আবরণ কাটিয়া গেলে 'ঈশ্বর আছেন' এই বুদ্ধি হয়, অপর আবরণ কাটিলে তিনি যে অশেষ কল্যাণ-গুণময় ও চিন্ময় অপ্রাকৃত দেহধারী— ইহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

৩। **প্রকৃতি**। "প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা
তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী।"

সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। তমঃ বা মায়া এই প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন নাম। আবরণ করে এই অর্থ লইয়া তমঃ নাম। বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করে এই অর্থে মায়া (মিমাতে) নাম। প্রকৃতি স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ঈক্ষণ দ্বারা সামর্থ্যবতী হইলে মহদাদিক্রমে পরিণত হইয়া বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃজন করেন।

৪। **কাল**। "কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।"

কাল একপ্রকার জড়দ্রব্য বিশেষ। ইহা প্রলয় ও সৃষ্টি নিমিত্তভূত নিয়ত চক্রবৎ পরিবর্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যুগপৎ চির ক্ষিপ্র ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুভূত দ্রব্য।

শ্রুতি প্রমাণ

কথিত পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরাদি পদার্থচতুষ্টয় নিত্য। (কেবল কর্ম নিত্য নহে) এ বিষয় কতিপয় শ্রুতি প্রমাণ দেখানো যাইতেছে। শ্বেতাশ্বতর ৬/১৩ মন্ত্র—

(ক) "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।"

অনুবাদ। যিনি নিত্যের নিত্য অর্থাৎ নিত্যতা সম্পাদক, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ), এবং এক হইয়াও বহুর কামভোগ বিধান করেন, সাংখ্য যোগলভ্য সেই সর্বকারণ দেবকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া অবিদ্যা ও তৎকার্যরূপ সমস্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হয়। (দুর্গাচরণ)

চুলিকোপনিষদের পঞ্চম মন্ত্র প্রমাণ দিতেছেন—

"গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী।
অসিতা সিতরক্তা চ সর্বকামদুঘা বিভোঃ।।"

বিশ্ববিধাতার একটি গাভী। তাহার নিনাদ নাই, তিনি বিশ্বজগতের প্রসবিত্রী, সর্বকামদাত্রী— অসিত, সিত এবং রক্ত এই তিনটি তাহার বর্ণ। এই গাভীই প্রকৃতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬।২।১ মন্ত্র প্রমাণ দিতেছেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ," আদিতে এক সদ্বস্তুই ছিলেন।

নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সকলই তাঁহার অধীন। তাই বলিয়াছেন "জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ।" জীব প্রভৃতি নিত্যবস্তু সকল ঈশ্বরের আশ্রিত তিনি পরমাশ্রয়। এ বিষয় শ্রুতি প্রমাণ দিতেছেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬।১৬ মন্ত্র—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।।"

তিনি বিশ্বকর্তা বিশ্ববিদ্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং আত্মাও বটেন। সর্ব কারণও বটেন এবং চেতন, কালের প্রবর্তক, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকন্তু, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর এবং সংসার স্থিতি মোক্ষপ্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত। (দুর্গাচরণ)

সূক্ষ্মা টীকাতে—ভাল্ববেয় শ্রুতি হইতে আর একটি প্রমাণ তোলা হইয়াছে—

"অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি।
অথ যান্যনিত্যানি প্রাণঃ শ্রদ্ধাভূতানি ভৌতিকানি ইতি।
যানি হ বা উৎপত্তিমন্তি তান্যনিত্যানি। যানি হ বা
অনুৎপত্তিমন্তি তানি নিত্যানি। ন হ্যেতানি
কদা নোৎপদ্যন্তে নো বিলীয়ন্তে পুরুষঃ প্রকৃতি-
রাত্মা কাল ইত্যেষা" শ্রুতিঃ।

৫। "কর্মাকর্ম চ জড়-অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি"। কর্ম জড়বস্তু। অদৃষ্ট কর্মেরই এক নাম। কর্ম অনাদি। কিন্তু অবিনাশী নহে। জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম ইহাদের প্রত্যেকেরই শক্তি আছে। এই শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। মূল শক্তিমান্ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় ও একমাত্র শক্তির আধার। অতএব সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু এই অদ্বৈতপর শ্রুতিরও সঙ্গতি হইল। (একং শক্তিমৎ ব্রহ্মেতি অদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিঃ) যেহেতু জীব প্রকৃতি কালাদির শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি, অতএব এক ব্রহ্মই আছেন এইরূপ বলার কোনই অসঙ্গতি হইতেছে না। এই সকল কথা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

অতঃপর ভাষ্যকার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য এই কথা তুলিয়াছেন। গরুড় পুরাণের ও শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ শ্লোক উল্লেখ করিয়া বিষয়টি স্থাপন করিয়াছেন। এই আলোচনার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এক, শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যপাদেরা যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখেন নাই তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম ভাষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই ব্যাখ্যা-টীকাদি রচনা করিয়াছেন—এই কথা জানানো।

দ্বিতীয়—এই গোবিন্দভাষ্যই হউক বা পূর্ববর্তী পরবর্তী অপর কোন ভাষ্যই হউক, স্বয়ং সূত্রকার-কৃত ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে তাহার তত্ত্বে অর্থে ভাবে সুসঙ্গতি থাকিতেই হইবে। না থাকিলে বুঝিতে হইবে ভাষ্য নির্দোষ হয় নাই—এই কথা জানাইয়া দেওয়া।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

শাস্ত্র প্রারম্ভে চারিটি অনুবন্ধ আলোচনা করিবার নীতি প্রচলিত আছে। গোবিন্দভাষ্যও সেই শিষ্টাচার অনুসরণ করিতেছেন। অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন এই চারিটিকে অনুবন্ধ কহে।

(ক) **অধিকারী—**এই শাস্ত্র পাঠে অধিকারী কে? তাহাই বলিতেছেন, "নিষ্কামধর্মনির্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শাস্ত্যাদিমান্ অধিকারী।" নিষ্কাম ধর্মাচরণের ফলে চিত্ত যাহাদের নির্মল হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গে লুব্ধচিত্ত, সতত শ্রদ্ধালু, শমদমাদি গুণসম্পন্ন তাঁহারাই এই শাস্ত্র আলোচনার অধিকারী।

(খ) **সম্বন্ধ—**এই গ্রন্থের সঙ্গে পরমবস্তুর সম্বন্ধ কী? উত্তর বলিতেছেন "সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ।" বাচ্য ব্রহ্ম ও বাচক শাস্ত্র ইহাই শাস্ত্র ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ।

(গ) **বিষয়—**গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কে বা কী? উত্তর বলিতেছেন, "বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।।" নিরবদ্য ও বিশুদ্ধ অনন্ত গুণখনি, অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, লীলাপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবস্তু।

(ঘ) **প্রয়োজন—**ঐ বস্তু লইয়া এই শাস্ত্র আলোচনা করার প্রয়োজনটা কী? তাহা বলিতেছেন—"প্রয়োজনং ত্বশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকারঃ।" অশেষ দোষ বিনাশ পূর্বক সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভই পরম প্রয়োজন।

পঞ্চাঙ্গ ন্যায়

এক একটি অধিকরণ বা topic-কে ন্যায় বলে। শাস্ত্রে ন্যায়ের পাঁচটি অঙ্গ ঃ বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি।

(ক) বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। "বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যম্।"

(খ) একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানার্থ বিমর্শের নাম **সংশয়**। "সংশয় একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধ-নানার্থবিমর্শঃ।"

(গ) প্রতিকূল সিদ্ধান্তই **পূর্বপক্ষ**। "প্রতিকূলোঽর্থঃ পূর্বপক্ষঃ।"

(ঘ) **সিদ্ধান্ত**। প্রামাণিক রূপে সংস্থাপিত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। "প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।"

(ঙ) **সঙ্গতি**। পূর্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধই সঙ্গতি। "সঙ্গতিঃ পূর্বোত্তরয়োরর্থাবিরোধঃ।"

সঙ্গতি-ভেদ

শাস্ত্রলোচনায় মুখ্যতঃ তিন প্রকার সঙ্গতি (consistency) লক্ষ্য রাখিবার নীতি আছে।

শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি। নিখিল শাস্ত্রে "সপরিকরং ব্রহ্মৈব বিচার্যম্" ইহাই শাস্ত্রসঙ্গতি। সমগ্র শাস্ত্রের বিচারের বিষয় হইল ব্রহ্মতত্ত্ব। কোন সময় কোন আলোচনা অবান্তর হইলে অসঙ্গতি দোষ হইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যেও এরূপ সঙ্গতি প্রয়োজন। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'সাধন'। সকল সূত্রের ব্যাখ্যানই ঐ বিষয়ের অনুকূল হইবে। তবেই সঙ্গতি রক্ষা। যে পাদের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় সেই পাদের সকল সূত্রগুলিই সেই তাৎপর্যানুকূলে ব্যাখ্যাত হইবে। নতুবা পাদসঙ্গতি রহিবে না।

ইহা ছাড়া, অধিকরণ-সঙ্গতিও লক্ষণীয়। কতিপয় সূত্র লইয়া একটি অধিকরণ। প্রথমপাদে ৩১টি সূত্র ও একাদশটি অধিকরণ আছে। এক অধিকরণ শেষ করিয়া অন্য অধিকরণে প্রবেশকালে কতিপয় যোগাযোগ বিধি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছয় প্রকার গৌণ সঙ্গতি অবলম্বনে ইহা সমাহিত হইয়া থাকে। আক্ষেপ (objection), দৃষ্টান্ত (illustration), প্রতিদৃষ্টান্ত (counter illustration),—প্রসঙ্গ (incidental illustration), উপোদ্‌ঘাত (introduction) ও অপবাদ (exception)–এই সকল সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইলে গ্রন্থরহস্য সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এ তাবৎ ভাষ্যভূমিকা পরিসমাপ্ত হইল। অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসারূপ "জিজ্ঞাসাধিকরণ" আরম্ভ।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনে চারিটি অধ্যায় ও ষোলটি পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ব্রহ্মলিঙ্গক বাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন। এই পাদে একত্রিশটি সূত্র আছে। সূত্রগুলি একাদশটি অধিকরণে বিভক্ত (একত্রিংশৎ সূত্রস্যৈকাদশাধিকরণস্য প্রথম-পাদস্য ব্যাখ্যানমারভতে—সূক্ষ্মা টীকা) প্রথম অধিকরণের নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ। এক বা একাধিক সূত্র লইয়া একটি অধিকরণ হয়। এই অধিকরণে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই একটিমাত্র সূত্র।

বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটি বস্তু লইয়া একটি অধিকরণ হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। 'জিজ্ঞাসা' শব্দটির ধাতু প্রত্যয় গত অর্থ হইল জানিবার ইচ্ছা (জ্ঞাতুমিচ্ছা)। এই ইচ্ছা কথাটির তাৎপর্যও কিঞ্চিৎ প্রণিধানের বিষয়। ইংরেজী ভাষায় wish এবং will এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই ইচ্ছা wish অর্থে প্রযুক্ত নহে, ইহা will, বা আরও ঠিক করিয়া বলিলে active will বুঝাইবে। ইহা বাসনা নহে, এষণা। এই ইচ্ছা বা এষণার মধ্যে জানিবার জন্য একটি প্রবল চেষ্টাও লুক্কায়িত আছে. এই চেষ্টা কায়িক নহে, ইহা মুখ্যতঃ মানসিক। ব্রহ্ম কী বস্তু জানিবার জন্য মনের যে একান্ত আগ্রহ বা অনুসন্ধান তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই অনুসন্ধানের মূর্তরূপ চতুর্লক্ষণী ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বলিতে যোগরূঢ় অর্থে বেদান্ত-দর্শনই বুঝাইবে।

ব্রহ্মবিষয়ক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন—বেদান্তানুশীলন অত্যাবশ্যক—ইহাই জিজ্ঞাসাধিকরণের 'বিষয়'। এই প্রয়োজনের বোধ চিত্তে জাগে শ্রুতিবাক্য হইতে। এই সংসারে সকলেই সুখ কামনা করে। 'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মা ভূৎ'—আমার সুখ হউক, দুঃখ যেন না হয়—প্রত্যেক

জীব প্রত্যহই নিজেকে নিজে এই আশীর্বাদ করে। কিন্তু প্রতি নিয়ত এত কামনা করিয়াও জীবের ভাগ্যে যথাকাঙ্ক্ষিত সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। কেন যে ঘটে না, কী হইলে যে সুখ হইবে মানুষ জানিতে চাহে। শ্রুতিমাতা জীবের ঐ চিরন্তনী আকুতির উত্তর দিয়া রাখিয়াছে—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং বিজিজ্ঞাসস্ব।" (ছান্দোগ্য ৭/১৫/১)—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ পাখীর সুখ নাই। সীমাহীন অন্তহীন মুক্তাকাশে উড়িয়া বেড়াইতেই তাহার সুখ। অসীম অনন্তই ভূমা। সীমাবদ্ধতায় সুখ নাই। অসীম তাই সুখের আকর। অতএব সুখান্বেষী জীব যদি সুখ চায়, তবে ভূমাকে জানিতেই হইবে। সুতরাং সুখাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই ভূমা বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের মধ্যে সুখানুসন্ধান ছাড়া সত্যানুসন্ধানপরা অপর একটি বৃত্তি আছে। মানুষ তাহার আবেষ্টনীকে জানিতে ইচ্ছা করে, পারিপার্শ্বিক বস্তুজাত সম্বন্ধে সত্য কী তাহা বুঝিয়া লইবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ মানবমনে বিরাজমান। কিন্তু জাগতিক বস্তু সমূহের সংখ্যা এতই অধিক ও তাহাদের সম্বন্ধ এতই জটিলতাপূর্ণ যে, তাহা সম্যগ্‌ভাবে জানা একরূপ অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু হতাশ হইয়াও মানুষের ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না। কী উপায়ে আমরা সব কিছু জানিতে পারি শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৩/৪/৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিতেছেন, "ওগো মৈত্রেয়ী! একমাত্র আত্মাই দর্শনীয় শ্রবণীয় মননীয় ও অনুসন্ধানীয়। কারণ, আত্মার দর্শন-শ্রবণাদি হইলে সংসারে যাহা কিছু আছে সবই বিদিত হওয়া যায়।" সংসারে অনেক কিছু জানিবার প্রয়োজন। এই একটি বস্তু জানিলেই সকল বস্তু জানা হইয়া যাইবে, কাজেই এই বিশেষ বস্তুটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা একান্তই প্রয়োজন। কি সত্যৈষণা কি সুখৈষণা দুই পথ দিয়া শ্রুতিবোধিত পথে অগ্রসর হইয়া আমরা স্থির করিলাম যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বেদান্তানুশীলন প্রয়োজন। এইটি হইল এই অধিকরণের 'বিষয়'।

ঋগ্বেদ অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে অন্যরূপ একটি সংবাদ লইয়া আসিল। 'অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্'— আমরা সোমরস পান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি, আলোর (সত্যের) সন্ধান পাইয়াছি, দেবতাগণকে জানিয়াছি। অপর একটি মন্ত্রে পাইলাম "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।"—যে-ব্যক্তি চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করেন তাহার শুভফল হইল অক্ষয় ও অনন্তকাল স্থায়ী। এই সকল মন্ত্র হইতে মনে হয় যে বেদজ্ঞান লাভ করিলে, তদনুযায়ী যজ্ঞাদি যাজন ও সোমরস পানাদি করিলে অক্ষয় অমৃতত্ব লাভ করা যায়। তাহাই যদি হইল তাহা হইলে বেদান্ত অনুশীলনের কী প্রয়োজন?' "একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধ-নানার্থঃ বিমর্শঃ" হইল সংশয়ের লক্ষণ। একই বিষয়ে বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রকারের পরামর্শ শুনিলে চিত্তের যে দোদুল্যমান অবস্থা হয় তাহার নাম সংশয়।

অমৃতত্ব জীবের প্রয়োজন ইহা স্থির, তাহার লাভের দ্বিবিধ উপায় শ্রুতিগোচর হইতেছে। এক হইল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বেদান্তচর্চা, অপর হইল বেদজ্ঞান ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম-

জিজ্ঞাসা। মনে সংশয় জাগিতেছে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু যার ধর্ম-জিজ্ঞাসা আয়ত্ত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি বেদজ্ঞ হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহার আর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কী প্রয়োজন থাকিতে পারে? অধীতবেদস্য পুংসঃ ধর্মজ্ঞস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তা ন যুক্তা বেতি? এই হইল 'সংশয়'। চিত্তের এইরূপ সংশয়ান্বিত অবস্থায় পূর্বপক্ষীর সুযোগ হইল। প্রতিকূলোঽর্থঃ পূর্বপক্ষঃ। বিরুদ্ধপক্ষই পূর্বপক্ষ। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে আর কিছু প্রয়োজন থাকে না। এই হইল 'পূর্বপক্ষ'।

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাসদেব প্রারব্ধ শাস্ত্রে প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন।—ইতি পূর্বস্মিন্ পক্ষে প্রাপ্তে ভগবান্ বাদরায়ণো ব্যাসঃ প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্যাদিমং সূত্রমিদমবতারয়তি—

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ।। ১।।

এইটি হইল 'সিদ্ধান্ত' সূত্র। "প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ"—প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত বিষয়ই সিদ্ধান্ত। প্রমাণটি অতঃ শব্দের আড়ালে লুক্কায়িত আছে। সূত্রে চারিটি শব্দ আছে। অথ, অতঃ, ব্রহ্ম ও জিজ্ঞাসা। ইহাদের সঙ্গে 'যুক্তা' এই শব্দটি যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "যুক্তেত্যক্ষরযোজনা"—(ভাষ্যকার) অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য অব্যবহিত পরবর্তী। অতঃ শব্দের অর্থ হেতুভাব অর্থাৎ 'অতএব' (অথাতঃ শব্দাবত্রানন্তর্যহেতুভাবয়োঃ) সূত্রের অর্থ দাঁড়াইল—অতএব ইহার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত।

ইহার পর বলিতে কিসের পর বুঝাইবে? ভাষ্যকার বলিতেছেন—"বিধিনাধীত-বেদস্য আপাততোঽধিগত-তদর্থস্য. আশ্রমসত্যাদিভিশ্চ বিমৃষ্টসত্ত্বস্য লব্ধতত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গস্যাথ তৎ-প্রসঙ্গানন্তরম্।"

যে-ব্যক্তি বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছে ফলে বেদার্থের আপাত বোধ জন্মিয়াছে, আশ্রমোচিত কর্তব্যকর্ম পালন দ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তারপর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করিয়াছে—সেই ব্যক্তি ঐ সঙ্গ লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে। অথ শব্দটিতে এতখানি অর্থ বুঝাইতেছে।

বিধিপূর্বক বেদপাঠ করিবার ফলে বেদের আক্ষরিক অর্থের আপাত বোধ জন্মিবে এই বোধলাভ পর্যন্তই ব্রহ্মচর্যাশ্রমীর কর্তব্য। তৎপর গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য কর্মগুলি যথাযথ পালন করিবার ফলে শুভ কর্মদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। রজঃতমঃ গুণ অনেকাংশে কাটিয়া যাইবে। এই সময় যদি তাহার ভাগ্যে কোন ব্রহ্মজ্ঞের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাঁহার সঙ্গসুখ ও উপদেশ প্রাপ্তি সৌভাগ্য উদিত হন তাহা হইলে সেইসব উপদেশ শ্রবণের পর (অথ) বেদান্তানুশীলন কর্তব্য। কেন কী কারণে এ-হেন ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্তব্য বলিলেন, তাহাই অতঃ শব্দটির আড়ালে লুকানো আছে। সেই লুকানো কথাটি ভাষ্যকার টানিয়া বাহির করিতেছেন।

"কাম্যকর্মাণি পরিমিতানিত্যফলানি ব্রহ্মস্বরূপং তু জ্ঞানলভ্যম্ অক্ষয়-অনন্ত-চিৎসুখং নিত্যজ্ঞানাদিগুণকং নিত্যসুখহেতুরিতি প্রত্যয়াৎ কাম্যকর্মপ্রহাণপুরঃসরং চতুর্লক্ষণ্যাঃ জিজ্ঞাসা যুক্তা ইত্যর্থঃ।"

প্রথমে শাস্ত্রপাঠ, দ্বিতীয়ে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আশ্রমোচিত কর্তব্য পালনের ফলে পঠিত-বস্তু বোধগম্য করিবার মত কতকটা যোগ্যতা লাভ। তৃতীয়ে মহৎ সঙ্গ ফলে অনুভব হইতে থাকে যে কাম্যকর্ম সকলের ফল পরিমিত ও অনিত্য। অতএব তাহা লইয়া ভুলিয়া থাকা বৃথা। যাহা অপরিমিত বা অসীম এবং নিত্য এমন বস্তু না হইলে সুখৈষণা ও সত্যৈষণার চরম তৃপ্তি ঘটিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই অক্ষয় অনন্ত চিৎসুখ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যসুখের হেতু। মহৎ সঙ্গে এই জ্ঞানের উদয় হইলে কাম্যকর্ম সকল পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার লালসা জন্মিবে তখনই বেদান্তানুশীলন যুক্তিযুক্ত।

"যে-পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উত্তর দিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে যুক্তিযুক্ত এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল। এখন এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গতি দেখানো প্রয়োজন। সিদ্ধান্তটি স্থাপিত হইয়াছে যখন যুক্তি-বিচার দ্বারা তখন তাহাতে শাস্ত্রানুমোদন প্রদর্শন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পুনরায় পূর্বপক্ষ তুলিতেছেন।

"ননু অধীতাদ্বেদাদেব তত্তদবগতিঃ স্যাদধ্যয়নস্যার্থাববোধপর্যন্তত্বাৎ ততস্তৎপ্রহাণে তদুপাসনে চ ধীঃ প্রবর্ততে কিমনয়া চতুর্লক্ষণ্যা"—কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে, কারণ বেদেই তো ব্রহ্মের কথা আছে। সেই কথা পাঠ করিলেই ব্রহ্মের কথা জানা হইল। বেদাধ্যয়ন বলিতে নিশ্চয়ই তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা বুঝায় না, অর্থবোধ পূর্বক পাঠই পাঠ। সুতরাং বেদপাঠ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর বেদান্তসূত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কী থাকিতে পারে? কাম্য কর্ম ত্যাগের ইচ্ছা ও ব্রহ্ম উপাসনার ইচ্ছা বেদপাঠ হইতেই হৃদয়ে জাগিবে, অতএব বেদান্তানুশীলনের কোন উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। এই পূর্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন—"উচ্যতে—আপাততঃ প্রতীতাদর্থাদবাস্তবাদপি সংশয়বিপর্যয়াভ্যাং ধীঃ বিভ্রংশতে। সোপপত্তিকয়া তয়া তু অধীতয়া তাবতিবর্ত্য পরমার্থে তস্মিন্নসৌ স্থিরীভবতীত্যাবশ্যকং তদধ্যয়নম্' 'বেদপাঠ করিলেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে একথা ঠিক বটে। কিন্তু কেবলমাত্র বেদপাঠ দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয় তাহাতে সকল সংশয় সকল ভ্রম নিরাকৃত হয় না। চিত্তে নানা প্রকারের সংশয় ও ভ্রমজ্ঞান উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই সংশয় ও ভ্রান্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিচার-যুক্তিপূর্ণ বেদান্ত অধ্যয়নের একান্ত প্রয়োজন। বেদান্তবিচারের ফলে সংশয়-বিপর্যয় কাটিয়া যায়। পরমার্থ বাস্তব বস্তুর প্রতি চিত্ত স্থির হয়। অতএব বেদাধ্যয়ন অত্যাবশ্যকই। ধর্মজ্ঞের পক্ষেও।

পূর্বে সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইয়াছে যে আশ্রমোচিত কর্তব্য পালনে চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার যোগ্য হইবে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেবলমাত্র বেদাক্ষরের জ্ঞান হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয় না। অতএব পরম্পরা সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধি যথার্থ জ্ঞানলাভের পক্ষে কারণ হইয়া থাকে। এই সকল কথা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত করিয়া শাস্ত্রসঙ্গতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। তাই শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত করা হইতেছে—বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৪/৪/২২) বলিতেছেন,—

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেনেতি"—ব্রহ্মানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান তপস্যা ও উপবাস দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন।

শুধু অক্ষরজ্ঞানই যে ব্রহ্মজ্ঞান নহে, ব্রহ্মজ্ঞানে যে আরও অনেক কিছু প্রয়োজন তাহা মুণ্ডকোপনিষদের ৩/১/৫ মন্ত্র দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্"—আত্মাকে পাওয়া যাইবে সত্য দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য দ্বারা ও সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা। মনুস্মৃতিতে আছে "জপ্যেনৈব চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্যাদন্যন্নবা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।।" ব্রহ্মবেত্তা জপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য কর্তব্য কিছু অনুষ্ঠান করুন বা না করুন সকলের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন যিনি তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ।

পূর্বে সিদ্ধান্তপক্ষে আরও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিদ্ মহাজনের সঙ্গ অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ এই যে, এমন যে নারদ দেবর্ষি তিনিও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সনৎকুমারাদির সঙ্গে ও প্রসঙ্গে। শ্রীগীতাতেও কথিত হইয়াছে—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।" প্রণাম, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বাবা ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিবে। যিনি জ্ঞানী এবং সত্যদ্রষ্টা তিনিই ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন।

কাম্যকর্মের ফল যে পরিমিত ও নশ্বর তাহাও শ্রুতি-প্রামাণ্য বলেই স্থাপিত।

"তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"...ছান্দোগ্য ৮/১/৬। কর্ম দ্বারা অর্জিত যে বস্তু তাহা নিশ্চয়ই নাশপ্রাপ্ত হইবে। তদ্রূপ যজ্ঞাদি শুভকর্মের পুণ্য দ্বারা অর্জিত যাহা তাহাও বিনাশশীল হইবে।

ব্রহ্ম যে একমাত্র জ্ঞানগম্য, কর্ম দ্বারা লভ্য নহে তৎসম্বন্ধে মুণ্ডকশ্রুতি প্রমাণার্থে উপস্থাপিত হইতেছে। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।" ১/২/১২

কর্ম দ্বারা অর্জিত জগতের সকল বস্তু পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ সকল বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহা অনিত্য তাহা দ্বারা কিছুতেই নিত্যবস্তু লভ্য হইতে পারে না। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবে।

ব্রহ্মবস্তু যে অক্ষয় অনন্ত সুখ-স্বরূপ তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (২/১/১)। ঋষিগণ ব্রহ্মবস্তুকে সত্য জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দ-স্বরূপ' বলিয়া জানিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা মানুষের হৃদয়ে যে স্বাভাবিক আনন্দৈষণা রহিয়াছে তাহার পরা তৃপ্তি যে ব্রহ্মেতে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অধ্যাহার করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—

"ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"
"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।" (৬/৮)

তাঁহার (ব্রহ্মের) প্রাকৃত দেহরূপ কার্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়রূপ কারণ নাই। তাহার সমানও *কেহ নাই, তাহাপেক্ষা বড়ও কেহ নাই।* তাহাতে বহুবিধ *পরাশক্তি* (অপ্রাকৃত *জগদতীত শক্তি*), আছে। তাহার জ্ঞান, কর্ম-ক্রিয়া, বল সকলই স্বাভাবিক। 'অগ্ন্যুষ্ণতাবদস্য নৈসর্গিকী শক্তিরস্তি।'

অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে। অগ্নির থাকা (সত্তা) ও দগ্ধ করা (ক্রিয়া) যেমন দুইটি কার্য নহে সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের জ্ঞান, জ্ঞানের বল, জ্ঞানের ক্রিয়া কিছুই তাহা হইতে ভিন্ন নহে। অতএব জ্ঞানৈষণাব পরা তৃপ্তি যে ব্রহ্মেতেই তাহাতে আর সন্দেহাবসর কোথায়?

ব্রহ্মই যে সকলের আশ্রয় ও সুহৃৎ (প্রিয়) শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে প্রমাণিত করিতেছেন।

"সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিযবিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং সুহৃদ্।।" ৩/১৭

তিনি আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্জিত অথচ সকল ইন্দ্রিয় শক্তির হেতু, তিনি সকলের প্রভু, নিয়ন্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং প্রিয়জন।

ব্রহ্ম যে অনুভব গ্রাহ্য (ভাবগ্রাহ্য) এবং কল্যাণস্বরূপ (শিব) তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদন কবিতেছেন।

"ভাবগ্রাহ্যমনীডাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্।।" ৫/১৪

যিনি অনুভবগম্য বিভু, সৃজন-সংহননের কারণ, কল্যাণস্বরূপ, যিনি সকল ব্যষ্টি সৃষ্টিব কারণ, দিব্য জ্যোতির্ময় ক্রীড়াশীল সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি গুণময় দেহ ত্যাগ করেন (সিদ্ধ দেহ লাভ করেন)।

ব্রহ্মের অসীম আনন্দদাতৃত্ব গোপালতাপনী শ্রুতিদ্বাবা স্থাপন করিতেছেন—

"তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীবাস্তেযাং সুখং
শাশ্বতং নেতরেষাম্।" (যেহনুভবন্তি পাঠান্তরম্) পূর্বতাপনী-৫

নিত্যলীলাপীঠে এবং হৃদয়পীঠে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভজন করিয়া ধীরব্যক্তি যে শাশ্বত শান্তি লাভ করেন অপর কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল যে, ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে অনেক কথাই শাস্ত্রে আছে। কিন্তু শাস্ত্রপাঠ করিলেই ঐ সব বিষয়ের অনুভব হয় না কেবল অক্ষর জ্ঞান জন্মে মাত্র। অতএব প্রথমে শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অক্ষর জ্ঞান লাভ, দ্বিতীয়ে আশ্রমোচিত কর্তব্য পালন দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ, তৃতীয়ে মহতের সঙ্গ দ্বারা কৃপা লাভ, এই তিন লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বেদান্তানুশীলন করিলে ব্রহ্মানুভব সম্ভব হইতে পারে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ অভিজ্ঞ মহৎকৃপালব্ধ ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত। জিজ্ঞাসাধিকরণের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। ভাষ্যকারের ভাষায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই,—

"সাঙ্গং সশিরস্কং চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎসঙ্গেন নিত্যানিত্য-বিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো নিত্যবিশেষাবগতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং প্রবর্ততে ইতি।"

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গের সহিত সমস্ত উপনিষদ্‌গণের (সশিরস্কম্) সহিত সমগ্র বেদ অধীত হইলে বেদার্থের আপাত অধিগম হইবে। তৎপর তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গ ফলে জগতের অনিত্যতা ও ব্রহ্মবস্তুর নিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। তখন অনিত্য বস্তুর

প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলে নিত্যবস্তুর বিশেষাবগতির নিমিত্ত চতুর্লক্ষণী বেদান্তানুশীলন করণীয়।

নিত্যবস্তু নির্বিশেষ, তাহার আবার বিশেষাবগতি কী? এইরূপ আশঙ্কায় উত্তর দিতেছেন— নিত্যবস্তু নির্বিশেষ মাত্র নহে। তাহাতে অপ্রাকৃত বিশিষ্টতা আছে। তাহার অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, নাম, ধাম ও পরিকর এই বিশিষ্টতার আপাদক। এই সকল চিন্ময় বিশেষ দ্বারা তিনি বিশেষিত।

অপর একটি আলোচনীয় বিষয় এই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বে মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কর্মকাণ্ডের জ্ঞান আবশ্যক কিনা। ঐ জ্ঞান যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহা কেহ কেহ মনে করিলেও ভাষ্যকার বলদেব সেরূপ মনে করেন না। কেননা, ইহা নিয়তই দেখা যায় যে কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ হইয়াও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় আগ্রহহীন, পক্ষান্তরে কর্মকাণ্ডে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। কাজেই কর্মকাণ্ডের জ্ঞান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে অব্যভিচারী কারণ একথা বলা যায় না। একমাত্র তত্ত্ববিৎ সঙ্গই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পক্ষে অব্যভিচারী পূর্ববর্তী কারণ। তত্ত্বজ্ঞের কৃপাসঙ্গ হইলেই কর্মকাণ্ডে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরও ব্রহ্মানুশীলনাগ্রহ জাগ্রত হইতে পারে। আর ঐটি না হইলে কর্মকাণ্ডে সুনিপুণ ব্যক্তিরও চিত্তে ব্রহ্মানুশীলন-লালসা প্রকটিত হইবে না। অতএব 'অথ' শব্দের অর্থ হইল 'তত্ত্ববিৎ সৎ-প্রসঙ্গানন্তর'।

আচার্য শঙ্কর মতে অথ শব্দের অর্থ নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটি বস্তু প্রাপ্তির পর। বলদেব ইহা ঠিক মনে করেন না। কেননা, ঐ চারিটি বস্তু তত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তির সঙ্গলাভের পূর্বে সুদুর্লভ। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ইত্যাদি গুণসমূহ ইচ্ছামাত্রেই জন্মে না। একমাত্র তত্ত্ববিৎসঙ্গ ফলেই ঐ সকল গুণের অধিকারী হওয়া যায়। অন্যথায় নহে।

কোন কোন আচার্য বলেন, অথ শব্দের অনন্তর অর্থ স্বীকার, পরে কিসের অনন্তর তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব করা অসমীচীন বা নিরর্থক। কেননা, এই অথ শব্দের অর্থ অনন্তরই নহে। উহা একটি মঙ্গল বাচক শব্দ মাত্র। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য সূত্রকার ঐ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রবাক্য আছে,—প্রণব ও অথ শব্দ সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল। ঐ জন্যই উহারা মাঙ্গলিক শব্দ। ভাষ্যকার বলদেব মতে একথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তিনি বলেন, 'ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণম্' ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রবাক্য বলে সূত্রকার ব্যাসদেব নারায়ণের অবতার। ভগবানের আবার বিঘ্ন কী? কোন্ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনি মঙ্গলাচরণ করিবেন? বিঘ্ন যাঁর নাই তাঁর আবার বিঘ্নবিনাশ কী? তবে অথ শব্দ যে মাঙ্গলিক তাহাতে সন্দেহ নাই। 'অনন্তর' এই অর্থবোধ জন্মাইয়াও অথ শব্দ অধিকন্তু শঙ্খধ্বনির মত মঙ্গলাধায়ক হইবে। (তথাপি মঙ্গলাত্মকত্বাৎ তস্মাৎ কম্বুস্বনাদিবৎ তৎ সম্ভবেৎ) এই মঙ্গলধ্বনি লোকসংগ্রহ রূপ শুভ কার্যের সাধক হইবে (তেনৈব লোকোঽপি সংগৃহীতঃ)।

এই প্রকারে জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যুক্ততা স্থাপিত হইলে প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্ম বস্তুটি কী এই প্রশ্নই উদিত হইবে। সেই হেতু, অতঃপর পরব্রহ্ম নিরূপণাত্মক জন্মাদ্যধিকরণ আলোচনীয়।

* * *

জন্মাদ্যস্যাধিকরণ

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যুক্তি-যুক্ততা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্ম বস্তুটি

কী তাহা লক্ষণ পূর্বক নির্ণয় করা প্রয়োজন বিধায় 'জন্মাদ্যস্য' অধিকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। এই অধিকরণ আরম্ভ করিবার পক্ষে বিশেষ হেতু হইল—সংশয়। সংশয়ের বিষয় হইতেছে ব্রহ্ম শব্দটির বৃত্তি লইয়া। ব্রহ্মশব্দে জীব বুঝাইবে কিংবা সর্বেশ্বর ভগবান্ বুঝাইবে এই সংশয়। (জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম জীবঃ সর্বেশ্বরো বা?) এইরূপ অদ্ভুত সংশয় চিত্তে জাগে কেন? জাগিবার পক্ষে কতিপয় যোগ্য কারণ রহিয়াছে।

১। ছান্দোগ্য শ্রুতির "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" এই মন্ত্রে ভূমা শব্দের বাচ্য কে তাহা সুষ্ঠুরূপে বোধগম্য হইতেছে না। কারণ, ঐ মন্ত্রের পূর্ববর্তী মন্ত্রে প্রাণের মহিমা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। "প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি" ইত্যাদি। এই হেতু ভূমা শব্দেও প্রাণ বা প্রাণবিশিষ্ট জীব বুঝাইবে এইরূপ আশঙ্কাই হয়। (পূর্বত্র ভূম-শব্দেন চ জীবমভ্যুপেত্য ব্রহ্মশব্দেনাপি তমেবাহ প্রাক্প্রাণপ্রক্রিয়া .....তস্যৈব প্রত্যয়ত্বাৎ।)

২। বৃহদারণ্যক শ্রুতিব 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের আত্মা শব্দের বাচ্য কে তাহাও সুস্পষ্টরূপে অধিগত হইতেছে না। কাবণ, ঐ মন্ত্রের পূর্ববর্তী মন্ত্রে পতিপত্নী প্রভৃতির প্রীতিবিষয়ক প্রসঙ্গ রহিয়াছে। "ন বা অবে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি" ইত্যাদি। এই হেতু আত্মা শব্দেও পতিপত্নীর মত জীবই বোধ্য, এইরূপ আশঙ্কা জাগে। (প্রাক্-পতিজায়াদি প্রীতিসংসূচনয়া তস্যৈব প্রত্যয়ত্বাৎ)।

৩। ব্রহ্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ একাধিক। ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ বুঝায়, ব্রাহ্মণ জাতি বুঝায়, জীব বুঝায়, পদ্মযোনি ব্রহ্মা বুঝায়, শব্দরাশি বেদ বুঝায়। (বৃহজ্জাতিজীবকমলাসন-শব্দরাশিষ্বিতি) সুতরাং "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রেব ব্রহ্ম পদে কী বুঝাইবে এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নহে।

৪। তৈত্তিরীয় শ্রুতির মন্ত্র "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।" যাহা হইতে ভূতগণেব উৎপত্তি ইত্যাদি হয় তিনি ব্রহ্ম—এই বাক্যেও জীবগণের অদৃষ্ট শক্তিদ্বারা ভূতগণের উৎপত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে। (অদৃষ্ট দ্বারা ভূতোৎপত্ত্যাদি হেতুত্বসম্ভবাৎ জীবঃ স্যাৎ) অতএব সংশয় অমূলক নহে।

৫। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।।"

উপরোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২/৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যিনি 'বিজ্ঞান'কে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন তিনি কখনও বিচলিত হয়েন না। তাঁহার সকল পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়। সর্ব কামনার বস্তু তিনি লাভ করেন। এই বাক্যেও বিজ্ঞান ব্রহ্ম এস্থলে বিজ্ঞান পদে জীব চৈতন্য বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে মন্ত্রার্থের এইরূপ সঙ্গতি হইবে—শরীরে বিদ্যমান জীবাত্মরূপী বিজ্ঞানস্বরূপ বিজ্ঞাতাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌রূপে যিনি বিবেচনা পূর্বক পরিজ্ঞাত হয়েন তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেন।(শরীরে বিদ্যমানং বিজ্ঞানং জীবরূপং ব্রহ্ম চেদ্বেদ প্রকৃতিতো বিবিচ্য জানাতি তর্হি সর্বান্

কামান্ অশ্নুতে।)

উপরোক্ত পঞ্চবিধ কারণে সংশয়াবকাশ হওয়ায় ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ নির্ণয়াত্মক পরবর্তী জন্মাদ্যস্যাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—

জন্মাদ্যস্য যতঃ।। ১/১/২

জন্ম-আদি-অস্য-যতঃ। অস্য জগতঃ এই জগতের জন্ম আদি যতঃ—যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। 'জন্ম আদিঃ যস্য' এই ব্যাসবাক্যে জন্মাদি শব্দটি বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি সমাসে অন্যপদ প্রধান। কাজেই জন্ম ও আদি এই দুইয়ের কাহাকেও না বুঝাইয়া জন্মাদি পদে স্থিতি এবং ভঙ্গকেই বুঝানো উচিত, কিন্তু ঐ পদে স্থিতি এবং ভঙ্গ এই দুইকেই মাত্র না বুঝাইয়া জন্ম স্থিতি ভঙ্গ এই তিনকেই বুঝাইবে। এইরূপ শক্তিবিশিষ্ট বহুব্রীহিকে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন রামাদি বলিতে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন এই তিনজনকে না বুঝাইয়া রাম সহিত তিনজনকে অর্থাৎ চারিজনকেই বুঝায়।

অস্য জগতঃ। জগৎ বলিতে চতুর্দশভুবনাত্মক বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যন্ত অগণিত প্রকারের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বযুক্ত নানাবিধ কর্ম ফলায়তন জীবসকল অচিন্ত্য অতি বিচিত্র রচন এই বিশ্বজগৎ বুঝাইবে। (অস্য চতুর্দশভুবনাত্মকস্য বিরিঞ্চ্যাদিস্থাববানন্ত-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃযুক্তস্য নানাবিধ-কর্মফলায়তনস্য জীবাতর্ক্যাতিবিচিত্ররচনস্য বিশ্বস্য)।

যতঃ বলিতে যাহা হইতে—যে অবিচিন্ত্যশক্তি স্বয়ং কর্তা নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পরাৎপর পুরুষ হইতে (যতো যস্মাৎ পরাৎ বা অবিচিন্ত্যশক্তিকাৎ স্বয়ং কর্ত্রাদিরূপাৎ উপাদানরূপাচ্চ) এবম্ভূত জগতের জন্ম-স্থিতি ও ভঙ্গ হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই জিজ্ঞাসার বিষয় বিজিজ্ঞাস্য।

ভূমা শব্দ এবং আত্মা শব্দের অর্থই হইল ব্যাপনশীল। সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপ্তিগুণবিশিষ্ট বস্তুই ব্রহ্ম। ভূমা ও আত্ম শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরব্রহ্ম শ্রীভগবানেই (ভূমাত্মশব্দৌ ব্যাপ্তিগুণযোগেন ভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ .....) এই বিষয় ভূমাধিকরণে 'ভূমাসম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ' সূত্রে (১/৩/৮) বলা হইয়াছে যে শ্রীবিষ্ণুই ভূমা, প্রাণসচিব, জীব ভূমাপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ বলিয়াছেন বিপুলসুখস্বরূপ ও সর্বোপরি বর্তমান বলিয়া (বিপুলসুখরূপত্বশ্রবণাৎ সর্বেষাম্ উপর্যুপদেশাচ্চ)। বাক্যান্বয়াধিকরণে 'বাক্যান্বয়াৎ' (১/৪/১৯) সূত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আত্মশব্দ দ্বারা পরমাত্মৈবোপদিশ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তঃ জীবঃ। ব্রহ্মশব্দেও পরব্রহ্মই বুঝাইবে ব্রহ্মে সীমাহীন গুণসমূহের আতিশয্যবশতঃ (নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ)। "কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণাঃ"—এই শ্রুতিনির্বচন অনুসারে সমস্ত শ্রেষ্ঠগুণের সমাবেশ যাহাতে তিনিই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মপদে মুখ্যার্থে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইবে। তবে গৌণার্থে অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারে। যেমন রাজা বলিতে রাজ্যপালক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বুঝাইলেও কখনও রাজকর্মচারীকেও রাজা বলা হয় তদ্রূপ (তদ্‌গুণাংশযোগাৎ ভাক্ত এব রাজাদিবৎ) গৌণার্থে ব্রহ্মপদে যেখানে ব্রহ্মের অংশপ্রকাশ আছে তাহাকেও বুঝাইয়া থাকে।

ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব পরমকল্যাণ লাভার্থ ব্রহ্মবস্তুই অনুসন্ধান করিবেন, কেননা ব্রহ্মই স্বাশ্রিতজনের প্রতি বাৎসল্যের সমুদ্র স্বরূপ (স এবং স্বাশ্রিতবাৎসল্যনীরধিস্তাপত্রয়বিপ্লুষ্যমাণৈর্জীবৈঃ

নিঃশ্রেয়সায় জিজ্ঞাস্যঃ)। অতএব ব্রহ্মপদে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই লক্ষ্য। একমাত্র তিনিই জিজ্ঞাসার কর্মভূতঃ অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য বস্তু (স এব জিজ্ঞাসাকর্মভূতঃ)।

জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ জ্ঞানেচ্ছা—জানিবাব ইচ্ছা (জিজ্ঞাসা চ জ্ঞানেচ্ছৈব)। জ্ঞান দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শ্রুতির ভাষায় ইহাদিগকে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পরোক্ষ জ্ঞানই ক্রমে অপরোক্ষজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দিয়া চরম সমাপ্তি আনে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত'·(৪/৪/২) অর্থাৎ আগে জানিবে, জানিতে জানিতে জ্ঞাতবিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা হইবে—তখনই হইল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বা অপরোক্ষ অনুভূতি হইল উপেয়; বিজ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞান হইল উপায়। পরমেব প্রাপকং পূর্বস্তু দ্বারমিতি।

পূর্ব কথিত "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" (তৈত্তিরীয় ২/৬) ইত্যাদি মন্ত্রে বিজ্ঞানপদে জীবাত্মার জ্ঞানই লক্ষীভূত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে জীবের স্বরূপজ্ঞান লাভ নিতান্তই উপযোগী (জীবস্বরূপ জ্ঞানমিহোপযোগীতি) সুতরাং 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলায় জীবই ব্রহ্ম এরূপ বুঝাইতে পারে না। জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু তাহা বেদান্ত দর্শনের বহু সূত্রেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ১/১/১৬
ভেদব্যপদেশাচ্চ। ১/১/১৭
মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ। ১/৩/২
আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ। ৭/৩/৪১
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ। ৪/৪/২১"

'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ও 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' এই সূত্রদ্বয় আনন্দময়াধিকরণে পর পর বিদ্যমান। সূত্রদ্বয়ের প্রতিপাদ্য এই যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে বর্ণিত বস্তু পরব্রহ্মই, জীব নহে। কেননা, জীব ও ব্রহ্ম চিরকালই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ব্যপদিষ্ট আছেন। মুক্তাবস্থাতেও জীব ব্রহ্ম নহে (মোক্ষেঽপি তয়োর্দ্বৈতনিরূপণাৎ) কেননা, মুক্তজীবের আনন্দ ভোগের কথা বলা হইয়াছে "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" সহব্রহ্মণা বাক্যে বুঝা যায় যে জীব ব্রহ্ম হয় না। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্বই থাকে। জীবব্রহ্মের অনুগত হইয়া তৎসহ আনন্দ ভোগ করে মাত্র।

'মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ'—সূত্রটি দ্যুভ্বাদ্যধিকরণের অন্তর্গত। সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, দ্যু ভূ প্রভৃতি শব্দ পরব্রহ্মের বাচক, জীব বা প্রকৃতির নহে। মুক্তোপসৃপ্য সূত্রে বলা হইয়াছে যে "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।। (মুণ্ডকশ্রুতি ৩/১/৩) মন্ত্রে স্বর্ণবর্ণ উজ্জ্বল জগৎকর্তা ঈশ্বর পুরুষ ব্রহ্মযোনি—পরব্রহ্মরূপ হরিই যে মুক্তজীবের প্রাপ্য বস্তু, এই কথা বলা হইয়াছে। প্রাপ্য ও প্রাপকের ভেদ সুস্পষ্টই। আর মুক্ত হইয়া জীব ব্রহ্ম হয়, একথা বলা হয় নাই। ব্রহ্মের পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়, এই কথাই মন্ত্রে আছে। ইহা দ্বারা অভিন্নতার উপপত্তি হয় না।

"আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ" সূত্রটি অর্থান্তরত্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত। সূত্রের স্থাপনীয়

বিষয় এই যে ছান্দোগ্য শ্রুতির "আকাশো বৈ নাম-নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" (৮/১৪) মন্ত্রে আকাশ পদে ব্রহ্মই বুঝাইবে, মুক্তজীব নহে।

* * *

"ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ" সূত্রটি জগদ্ব্যাপারবর্জ্যাধিকরণের অন্তর্গত। সূত্রে ব্রহ্ম ও জীবের সাদৃশ্য স্বীকৃত হইয়াছে কেবল আস্বাদন-বিষয়ে। জগদ্ব্যাপারাদি সৃজন পালন সংহনন কার্যে বৈসাদৃশ্যই।

উক্ত সূত্রসমূহে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এমন সুস্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে যে, মুক্ত অবস্থাতেও জীব যে ব্রহ্ম হইতে পরম ভিন্ন তাহাতে আর সন্দেহাবকাশ থাকে না (মোক্ষেঽপি তয়োর্দ্বৈতনিরূপণাৎ)।

শাস্ত্রে কোনও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে কতকগুলি সঙ্কেত লক্ষ্য করিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। এই ছয়টি (উপক্রম ও উপসংহারকে একটি ধরিয়া) চিহ্ন দ্বারা মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয় অনুধাবন করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির দুইটি বিখ্যাত মন্ত্র অবলম্বনে উক্ত চিহ্নগুলি প্রয়োগ করতঃ জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদন করা যাইতেছে।

> "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।
> সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।" শ্বেতাঃ ৪/৬-৭

মন্ত্রদ্বয়ের মর্মার্থ ঃ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুইটি পক্ষী পরস্পর সখা, সহযোগে তুল্যভাবে একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে একটি পক্ষী সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিতেছে, অপরটি ফলভুক্ না হইয়া উজ্জ্বলভাবে অবস্থান করিতেছে। একই বৃক্ষে বাস করিয়া একজন আপন অযোগ্যতা (অনীশা) বশতঃ মায়ামগ্ন হইয়া অশেষ শোক ভোগ করিতেছে। যখন সে আপনা হইতে ভিন্ন 'ঈশ'-কে দেখে (সেব্য-সেবক ভাবে) তাঁহার মহিমাতেই নিজেকে মহিমান্বিত মনে করে, তখন তাহার সকল শোক দূরীভূত হইয়া যায়। এই মন্ত্রদ্বয়ের হার্দ শাস্ত্রীয় প্রণালীতে অনুধাবন করা যাইতেছে।

১। উপক্রম—দুইটি পাখী (দ্বা সুপর্ণেতি উপক্রমঃ)।
উপসংহার—অন্য ঈশ্বর রূপ পাখী। (অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ।)

২। অভ্যাস—'অন্য' শব্দটির ত্রিরুক্তি, (তয়োরন্যঃ, অনশ্নন্নন্যঃ, অন্যমীশম্)।

৩। অপূর্বতা—ঈশ ও অনীশের ভেদ শাস্ত্রবিনা অপরিজ্ঞানে (ঈশ্বরসম্বন্ধিভেদস্য. শাস্ত্রং বিনা অপ্রাপ্তেরপূর্বতা।)

৪। ফল—বীতশোক হয়। (বীতশোক ইতি ফলম্।)

৫। অর্থবাদ—তাহার মহিমা অবগত হয়। (অস্য মহিমাবগত্যর্থবাদঃ প্রশংসা।)

৬। উপপত্তি (ভেদযুক্তি)—ভোক্তার মালিন্য অ-ভোক্তার ঔজ্জ্বল্য, (ভুঞ্জানস্যাপি মালিন্যমভুঞ্জানস্যাপি দীপ্তিঃ ইত্যুপপত্তিঃ।)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির উপরোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালী প্রয়োগে দেখা গেল যে, শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ শিক্ষাতেই পর্যবসান। এই প্রণালী অন্য শ্রুতিতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (এবমন্যত্রাপ্যেতানি মৃগ্যানি)

পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলিতেছে—শাস্ত্র এমন কথা বলিবে যাহা অন্য প্রকারে জানা যায় না এবং যাহা জানায় বিশেষ কোন লাভ আছে। জীব আর ব্রহ্ম দুই পৃথক্ বস্তু ইহা প্রত্যেকেই সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারে, আর ইহা জানিয়াও বিশেষ কিছু লাভ নাই। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, কেননা ইহা নূতন সংবাদ ও ইহা জানায় যথেষ্ট লাভ আছে। (ননু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্যাৎ তাদৃশমদ্বৈতং তস্য গোচরঃ) পূর্বপক্ষীব আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতেছে—পূর্বপক্ষের যুক্তিতে কোন সারবত্তা নাই। কেননা, শ্রুতি বহু মন্ত্রেই সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বৈত ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহার ফলও জানাইয়া দিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ১/৬ মন্ত্রে আছে—

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।"

জগতেব সর্ব কর্মের প্রেরক ঈশ্বর হইতে জীব যখন নিজেকে পৃথক্ বলিয়া জানে তখনই সে কৃতার্থ হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে। অর্থাৎ আমার কর্মের প্রেরক আমি নই, সে পরম প্রভুই—এই বোধ জাগিলেই জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়। এই মন্ত্রে ভেদের কথা ও ভেদজ্ঞান লাভের ফলের কথা নিঃসংশয়িত ভাবেই উক্ত আছে।

জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা সকলেব সামান্যতঃ জানা থাকিলেও তদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞান কাহারও নাই। জীব ও ঈশ্বর যে একেবারেই বিপরীত ভাবাপন্ন—জীব অণু, ঈশ্বর বিভু জীব নিয়ম্য, ঈশ্বর নিয়ামক, জীব পাপকর্মা, ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ—জীব আর ঈশ্বর যে এইরূপ "বিরুদ্ধধর্মা-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগী" তাহা শাস্ত্র না জানাইয়া দিলে জানা যাইবে না। অতএব ভেদের সংবাদে অভিনবত্বও আছে, ফলবত্ত্বও আছে, ফলের কথা তুলিলে বরং অদ্বৈতই অফল। কারণ অদ্বৈতবাদীরাই মোক্ষে কোন ফল স্বীকার করে না। কারণ, মোক্ষে কোনও প্রকার ফলভোগ থাকিলে বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হয়। বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেই নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত রাখা যায় না। কৈবল্যে কেবল ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন আর কিছু স্বীকার করিলে কৈবল্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ('ন খলু কেবলাদ্বৈতিনো মোক্ষে কিঞ্চিৎ ফলমাত্মনি স্বীকুর্বন্তি, তৎস্বীকারে তস্য বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ ততশ্চ কৈবল্যক্ষতিঃ।')

পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতই অজ্ঞাত বস্তু। অতএব শাস্ত্র অজ্ঞাত বস্তুর কথাই বলিবেন। পূর্বপক্ষী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদীর মত অদ্বৈত ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য। কাজেই শ্রুতির কোন মন্ত্রদ্বারা অদ্বৈত প্রতিপাদিত হইতে পারে না। পারিলে অবাচ্যত্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। যদি বল শ্রুতি বাচ্যার্থ দ্বারা অদ্বৈত প্রতিপাদন করিবে না; লক্ষ্যার্থ দ্বারা বুঝাইবে তদুত্তরে বলি—যাহা একেবারেই শব্দের অবাচ্য সে বিষয়ে লক্ষ্যার্থও অচল। ('ন চ উপনিষন্মাত্র-গম্যত্বাদ্ দ্বৈতমজ্ঞাতমিতি শক্যং বক্তুং ব্রহ্মাত্মকস্য তদ্ গম্যত্বেঽবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ। লক্ষণা-বিশেষস্তু ন স্যাৎ সর্বশব্দাবাচ্যে তস্যাযোগাৎ') অতএব অদ্বৈত শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহে। তবে অদ্বৈত যে

অজ্ঞাত একথা যথার্থই। এই অজ্ঞাতত্বের কারণ হইল বস্তুর একান্ত অসত্তা। শশশৃঙ্গের কথা কেহই জানে না। ইহা সকলেরই অজ্ঞাত এইজন্য যে, ঐ বস্তুর সত্তার একান্তই অসদ্ভাব ('তস্মাৎ খপুষ্পাদিবদসত্তাদেবাজ্ঞাতং তৎ পর্যবস্যতীতি ভাবঃ'—সূক্ষ্মা টীকা)

অদ্বৈতকে যে একেবারে খপুষ্পতুল্য বলা হইল—যে সকল অদ্বৈত-বোধক শ্রুতি আছে (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি) তাহাদের কী গতি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে—শাস্ত্রে 'শাস্ত্রদৃষ্টি' নামে একটা দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রকাশভঙ্গী আছে। সেইটি বুঝা প্রয়োজন। যে বস্তু যাহার আয়ত্ত, শাস্ত্র তাহাকে তৎস্বরূপে উপদেশ করিয়া থাকেন—ইহাকেই শাস্ত্রদৃষ্টি বলে। (শাস্ত্রং খলু যদ্বৃত্তির্যদায়ত্তা তং তাদ্রূপ্যেণ উপদিশতি।) বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গ 'প্রাণায়ত্তবৃত্তিক' বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়াছেন। কৌষিতকী শ্রুতিতে ইন্দ্র নিজের সত্তার 'ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতা' জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন রাজাকে সংস্কার করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিতেন, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাসস্ব"— আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ অমৃত, অতএব আমার উপাসনা কর। ঐরূপ না বলিলে প্রতিদিন আপনার ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতা বুঝিতেন না। ('অন্যথা স্বং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকমসৌ ন বিদ্যাদিতি।') বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (১/৫৪) বামদেব নিজ স্বরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন। 'অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ' আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্যে প্রতিষ্ঠিত আছি। এই প্রকারে বামদেব স্বকীয় বৃত্তির হেতুভূত ব্রহ্মনির্দেশ সহকারে আপনাকে মনু-সূর্য বলিয়া ব্যপদেশ করিয়াছেন। ('স্ববৃত্তিহেতুং ব্রহ্ম নির্দিশ্য তদেকার্থত্বেন মন্বাদীন্ বামদেবো ব্যপদিশতি।') ছান্দোগ্যশ্রুতির 'প্রাণ' কৌষিতকী শ্রুতির ইন্দ্রের উক্তি ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির বামদেবের উক্তি 'শাস্ত্রদৃষ্টি'র দৃষ্টান্ত। এই 'শাস্ত্রদৃষ্টি' দ্বারা অদ্বৈতবোধক শ্রুতির সমন্বয় করিতে হইবে। (যানি চ তদদ্বৈতবোধকানি বাক্যানি ক্বচিদীক্ষ্যন্তে তানি তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্তদ্ব্যাপ্যত্বাদিভিঃ শাস্ত্রকৃতৈব সঙ্গময়িষ্যন্তে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ইত্যুপরিষ্টাৎ।) এই বিষয় ইন্দ্র প্রতর্দনাধিকারে (১/১/২৮—৩১) সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। পুরাণাদি ও স্মৃতি শাস্ত্রও 'তদ্ব্যাপ্যস্য তাদ্রূপ্যম্' এই শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা অদ্বৈতবোধক বাক্যের সমাধান করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (১/৯/৬৯) আছে—

> "যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
> স ত্বম্ এব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্বগতির্ভবান্।।"

হে দেব! এই যে দেবগণ আপনার নিকট সমাগত হইলেন ইঁহারা সত্যই জগৎ স্রষ্টা এবং আপনা হইতে অভিন্ন যেহেতু আপনি সর্বময়। এস্থলে তদ্ব্যাপ্যতা বশতঃ দেবগণ তদভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। গীতায় যেমন অর্জুন বলিয়াছেন, "সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ"। এতদ্ভিন্ন, লৌকিক ও দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় আপাততঃ অদ্বৈত-বোধক একত্বাদি শব্দ অবস্থাভেদে নানা অর্থে গৃহীত হয়। গাবঃ সায়ং একতাং যান্তি, গোসকল সায়ংকালে একতা প্রাপ্ত হয়। এই বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে অনেক সংখ্যক গো মিলিয়া মিশিয়া একটি মাত্র হইয়া পড়ে। এই বাক্যের অর্থ হইল এই যে, দিনের বেলায় গোগণ স্বাধীন ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাঠে মাঠে বিচরণ করে আর সন্ধ্যার সময় সব একস্থানে আসে। এস্থলে স্থানের ঐক্যেই গাভীগণের

একত্ব। দুই পক্ষে বিবাদ হইতেছে। এক পক্ষের লোকদের একত্রিত করিয়া বলা হইল। ইহারা সব এক। এই স্থলে এক অর্থ ইহাদের মতি এক। এই একত্ব মত্যৈক্যে। ('লোকেঽপি স্থানমত্যৈক্যাদৈক্যং বদন্তি।') এই প্রকারে বিবিধভাবে জীবব্রহ্মের একত্ববোধক শ্রুতি সমূহের স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকারের সমাধান শাস্ত্রকার করিয়া আসিতেছেন।

অতএব, জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ এই তিনের পরম হেতুভূত পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম—জন্মাদ্যধিকরণে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। প্রথম জিজ্ঞাসাধিকরণে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে দ্বিতীয় জন্মাদ্যধিকরণে সেই ব্রহ্মই লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইল। ইহাই দুইটি অধিকরণের মধ্যে সঙ্গতি। পূর্বপক্ষীর আপত্তি বা আক্ষেপ অবলম্বনে এই সঙ্গতি দেখানো হইয়াছে বলিয়া এই সঙ্গতির নাম আক্ষেপ-সঙ্গতি। সূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ নির্ণয়ে লক্ষণের লক্ষণ-সমাধানও সুষ্ঠু। লক্ষণের লক্ষণ হইল—"অসাধারণধর্ম্মবচনমিতরভেদানুমাপকং লক্ষণম্।" জন্মাদি সূত্রে ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদি কর্তৃত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম জীবে ঐ সৃজনাদি কর্তৃত্বাভাব বশতঃ (তস্য তত্রাসামর্থ্যাৎ) জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদও সূত্রিত হইল। (জীবাদ্ভেদশ্চানুমীয়তে)। অতঃপর এই ব্রহ্মের সংবাদ পাওয়া যাইবে কোথায়, এই রহস্যের অনুসন্ধানপর হইয়া শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ আরম্ভ করিবেন।

* * *

শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ

জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার যুক্ততা বলিয়াছেন। জন্মাদ্যধিকরণে জগজ্জন্মস্থিতি ভঙ্গ কারণীভূত পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন। অনন্তর শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে উপাস্য ব্রহ্মের উপনিষদ্-বেদ্যত্ব স্থাপন করিবেন।

প্রত্যেক অধিকরণ বা ন্যায়ের পাঁচটি অঙ্গ—'যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি।' শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের বিষয়াদি কথিত হইতেছে।

বিষয়—জগৎ জন্মাদিকারণীভূত পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম যে আছেন তাহা এবং তাঁহার সম্বন্ধে আর যাহা জানিবার তাহা আমরা জানিব কী প্রকারে। বস্তুটি যেহেতু চিন্তার অতীত তখন ভাবনা গবেষণা দ্বারা জানিবার কথা নহে। একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্র হইতেই তাহার বিষয় জানিতে হইবে। (অবিচিন্ত্যাৎ বেদান্তৈনৈব বোধ্যো ন তু তর্কৈঃ) গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণে মহিমা কথন প্রসঙ্গে প্রণাম মন্ত্রে "বেদান্তবেদ্যায়" বলিয়াছেন। যথা—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ রূপখানিই সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম কৌশল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—অক্লিষ্টকারিণের বহু হইব এই (বহু স্যামিতি) সংকল্প মাত্রেই যিনি বহুত্ব বিশিষ্ট জগৎ সৃজন করিয়াছেন ('বহুঃ স্যামিতি সংকল্পমাত্রেণ করোতি জগদিত্যক্লিষ্টকারী') এবম্ভূত বেদান্তবেদ্য জগতের গুরুবুদ্ধির সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩/৯/২৬ মন্ত্রে উক্ত আছে "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" আমি সেই উপনিষদ্ বাচ্য পুরুষের বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিতেছি। অতএব পুরুষোত্তম

ফলের সঙ্গে একত্ব সাধনে শ্রুতহানি (অশ্রুত-কল্পনা-প্রসঙ্গাৎ)।

নিখিল জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের জন্মাদির একমাত্র কারণ, নিত্য চিন্ময়কেন্দ্র, অনন্ত কল্যাণগুণখনি, মহালক্ষ্মীর নিবাসভূমি পরব্রহ্ম। তদ্বোধক উপনিষদের বাক্যসমূহের অন্য বোধকতা প্রতিপাদন করা সর্বতোভাবেই অসম্ভব। (ন চ নিখিলজগদুদয়াদি-কারণে নিত্যচিদ্বপুষ্যনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরে শ্রীনিবাসে ব্রহ্মণি ব্যুৎপন্নং শাস্ত্রম্ অন্যপরং শক্যং কর্তুম্) বেদে যে বাক্য যে-বিষয়ে প্রমাণ সে-ই বাক্য সে-ই বিষয়েই প্রমাণ, অন্য বিষয়ে নহে (যৎ প্রমাণং যদ্বিষয়কং তত্তদ্বিষয়মববোধয়তি নান্যৎ), এই নিয়ম না মানিলে নিখিল প্রমাণ-শিরোমণি বেদ শাস্ত্রে মর্যাদার বিপর্যয় ঘটে (অন্যথা নিখিলপ্রমাণমর্যাদাবিপর্যয়ঃ স্যাৎ)। আপত্তিকারী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য জৈমিনির দুইটি মীমাংসা সূত্র তুলিয়াছেন।

১। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্। ১/১/১

২। তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ১/১/২৫

কিন্তু এই সূত্রদ্বয় দ্বারা আপত্তিকারীর মত সমর্থিত হয় না। কারণ ব্রহ্মবোধক বাক্য নিরর্থক একথা জৈমিনি বলিতে পারেন না, কেননা জৈমিনি নিজেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। (ন চ আম্নায়স্য ইত্যাদি ন্যায়েন জৈমিনিনা কর্মপরত্বং তস্য সমর্থিতম্ ইতি বাক্যং তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ)। ব্রহ্মবোধক বাক্য 'অনর্থক' তাহাদিগকে সার্থক করিতে হইলে কর্মপর বাক্যসকলের সঙ্গে একবাক্যতা করিতে হইবে—এমন কথা জৈমিনি বলেন নাই। ঐ সূত্রদ্বয়ের এইরূপ তাৎপর্য নহে।

জৈমিনির হার্দ এই যে, কর্মপ্রকরণেরই কোন কোন বাক্যের ('কর্মপ্রকরণস্থানাং কেযাঞ্চিদ্বাক্যানাং ন তূপনিষদাসাত্যর্থঃ') অনর্থকতা মনে হয়; যেমন 'সোঽরোদীৎ' (তৈত্তিরীয় ১/৫/১) এই সকল আপাত নিরর্থক বাক্যের অর্থ করিতে হইলে বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করা প্রয়োজন। জ্ঞানকাণ্ডের মন্ত্রকে অর্থহীন দেখানো জৈমিনির উদ্দেশ্য নহে। কর্মকাণ্ডের আপাত অর্থহীন বাক্যকে বিধিবাক্যের সহিত জুড়িয়া লইয়া অর্থবান করাই জৈমিনির লক্ষ্য। জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে জৈমিনির কোন কথাই নাই। কর্মকাণ্ড লইয়াই তাঁহার সকল কথা। কাজেই কোন মন্ত্রে আনর্থক্য ও তাহাকে অর্থবান করিবার জন্য 'সমাম্নায়'—এই দুই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইল কর্মকাণ্ডের মধ্যে নির্ণীতসীম।

অতএব পরব্রহ্মপর উপনিষদ্‌ই পরব্রহ্মতত্ত্বকে জ্ঞাপন করিতে পারে—অন্য কোন প্রমাণই পারে না। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য এই সিদ্ধান্তই স্থির রহিল। (ব্রহ্মপরমেব তদিতি স্ফুটম্) পূর্ব অধিকরণের সঙ্গে এই অধিকরণের সঙ্গতি 'আক্ষেপ সঙ্গতি'। (বেদবেদ্যত্বাক্ষিপ্য সমাধানাৎ) ব্রহ্ম বেদবেদ্য কিনা ইত্যাকার অক্ষেপ করিয়া সমাধান করা হইয়াছে।

* * *

জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার যুক্তিযুক্ততা স্থাপন করা হইয়াছে। জন্মাদ্যধিকরণে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিকারণীভূত ইত্যাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ ব্রহ্মের উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর সর্ববেদে ব্রহ্মই আরাধ্য বস্তু ইহাই জানাইবার জন্য সমন্বয়াধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

সমন্বয়াধিকরণ

'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রের দৃঢ়তার জন্য পরবর্তী অধিকরণে ব্রহ্মের সর্ব বেদবেদ্যত্ব বলিতেছেন। (পূর্বার্থদার্ঢ্যায় ব্রহ্মণঃ সর্ববেদবেদ্যত্বমুচ্যতে।) শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বস্তুকে শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে হইবে। এক্ষণে সমন্বয়াধিকরণে বলিবেন যে, সমস্ত শাস্ত্র পরব্রহ্মের কথাই বলিতেছেন। সিদ্ধান্তদ্বয় এক অপরের দৃঢ়তা আপাদক। অধিকরণের বিষয়—ব্রহ্ম সর্ববেদবেদ্য। প্রমাণ গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন "যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।" কঠশ্রুতি বলিয়াছেন (১/২/১৫) "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি। ওমিত্যেতৎ।" সংশয়—সর্ববেদ বিষ্ণুর (ব্রহ্মের) কথাই বলিতেছে কিনা? এইরূপ সংশয় জন্মিবার হেতু আছে। বেদের অধিকাংশ স্থলেই কেবল কর্মের বিধি। অতএব সর্বত্র ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন একথা অযুক্ত। (বেদেষু প্রায়েণ কর্মবিধানদর্শনাৎ অযুক্তং তস্য তৎ) পূর্বপক্ষ বেদশাস্ত্র সামগ্রিকভাবে পরব্রহ্মের কথাই কীর্তন করে এরূপ মনে করা যুক্তিসহ নহে। বেদে যজ্ঞাদি কর্মের কথা কাছে। বহু কর্মাঙ্গের বিষয় আছে. নানাবিধ ইতি-কর্তব্যতার বিধান আছে। বৃষ্টির প্রয়োজন বোধ থাকিলে কারীরী যজ্ঞ করিবে। পুত্রকামনা থাকিলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবে। স্বর্গাকাঙক্ষী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। এই সকল বিধান বেদেই দৃষ্ট হয়। ('বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গাদি-ফলকানি কারীরীপুত্রকাম্যেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনি সাঙ্গানি সেতিকর্তব্যানি বিদধতো বেদা দৃশ্যন্তে')। যজ্ঞাদি কর্মবোধক বেদবাক্য নিজ নিজ অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই সার্থকতা প্রাপ্ত হয় (তে চ প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতিপর্যবসায়িনঃ) যজ্ঞ কর্মের সংবোধন ও সংবিধানেই বেদের প্রমাতার পরিসমাপ্তি ঘটে, ঈশ্বরের কথা বলিবার আর অবকাশ হয় না (বেদাঃ প্রমাণত্বাৎ স্ববিষয়ং কর্মৈব বোধয়েয়ুঃ নেশ্বরম্)। তবে কি বেদে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ কিছুই নাই এমন কথা বলিবে? না; এমন কথা বলিব না। ঈশ্বরের কথা কিছু আছে, এমত মনে হয় (কেবল শব্দাস্তত্র জীবেশপরা হি দৃশ্যন্তে) কিন্তু সেই ঈশ্বর বা দেবতা যজ্ঞের অঙ্গভূত। দ্রব্য ও দেবতা যজ্ঞের দ্বিবিধ অঙ্গ। কুশঘৃতাদি যেমন 'দেবতা' নামক অঙ্গ। (কর্মণো দ্বে অঙ্গে দ্রব্যং দেবতা চেতি। কুশঘৃতাদিবৎ বিষ্ণোঃ কর্মাঙ্গত্বমাহুঃ) এইরূপ যজ্ঞাঙ্গভূতকর্তৃদেবতা রূপে বেদে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে, ঈশ্বরই পর তত্ত্ব—তিনিই সর্বত্র প্রতিপাদ্য বস্তু এই ভাবে নাই ('বিষ্ণু-পরতয়া ন শক্যা নেতুম্') সিদ্ধান্ত।।—এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে সূত্রকার সর্বজ্ঞ শ্রীবাদরায়ণ পরবর্তী সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ।। ১/১/৪

তৎ তু সমন্বয়াৎ। তু কিন্তু সংশয়চ্ছেদী অব্যয় (তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ) তৎ তাহা পরব্রহ্মের সর্ববেদবেদ্যত্ব যুক্তিযুক্ত ইহা। 'কুতঃ' ইহা কীরূপে জানা গেল? উত্তর 'সমন্বয়াৎ' সম্যক্ বিচারণা ফলে। অন্বয় শব্দের অর্থ তাৎপর্য লিঙ্গ (অন্বয়স্তাৎপর্যলিঙ্গম্)। তাৎপর্যলিঙ্গ ছয়টি—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। এই ছয়টিকে "লিঙ্গং তাৎপর্য-নির্ণয়ে" বলা হইয়াছে। অন্বয় অর্থ হইল উক্ত শাস্ত্রতাৎপর্য নির্ণয়ে ষড়্বিধ লিঙ্গের

প্রয়োগ। সমন্বয় অর্থ হইল উহাদিগকে প্রয়োগ করিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্যক্‌রূপে বিচার। (সমন্বয়ত্বং সুবিচারিতত্ত্বম্) বেদ বাক্যের ঐরূপ সমন্বয় করিলে অর্থাৎ সুন্দর রূপে বিচার পূর্বক উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ চিহ্ন দ্বারা শাস্ত্র তাৎপর্য আলোচনা করিলে পরব্রহ্মই যে সর্ববেদ-প্রতিপাদ্য বস্তু তাহা প্রতিপন্ন হয়।

এই কথা ঠিক না হইলে গোপালতাপনী শ্রুতির "যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে" যিনি সর্ববেদে গীত হয়েন এই বাক্যটির সঙ্গতি কী প্রকারে হইতে পারে? (ইতবথা কথং যোঽসাবিত্যাদি শ্রুতিবাক্যোপপত্তিঃ?) কেবল যে গোপালতাপনী শ্রুতিই বলিয়াছেন এমন নহে, গীতায় পুণ্ডরীকাক্ষ স্বয়ং শ্রীমুখেই অর্জুনের প্রতি কহিয়াছেন (১৫/১৫)—

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"

সকল বেদ আমাকেই বলিয়া থাকে। আমি বেদান্তকর্তা ও বেদবেত্তা।

পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।।"

কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যদ্বারা কী ব্যক্ত হয়, দেবতা কাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কী ব্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডে কী উক্ত হয়, তাহা আর কেহই জানে না, কেবল আমি জানি।

পুনশ্চ—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।"

বেদ সকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়া থাকে (মাং যজ্ঞরূপং বিধত্তে) আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করিয়া থাকে (তদ্দেবতারূপং মাম্ অভিধত্তে প্রকাশয়তি) আমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ ও প্রপঞ্চকে মদ্রূপে বলিয়া থাকে (যশ্চ প্রধানমহদাদি-প্রপঞ্চজাতং সর্গে বিকল্প্য পৃথঙ্ নিরূপ্য পুনঃ প্রতিসর্গে মদ্রূপতামাপাদ্য পৃথগ্‌ভাবস্তস্যাপোহ্যতে)।

অতএব সকলই আমি (তৎসর্বমহমেব)। আমি শক্তিমান্ আর সকলই আমার শক্তির অভিব্যক্তরূপ (শক্তিমতো মমৈতদ্রূপত্বাৎ)।

আচার্যেরাও বলেন যে "সাক্ষাৎ-পরম্পরাভ্যাং বেদা ব্রহ্মণি প্রবর্তন্তে" সাক্ষাৎভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে বেদশাস্ত্র পরব্রহ্মের কথাই কীর্তন করেন। জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎভাবেই পরব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ নিরূপণ দ্বারেই ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্তিত (তত্র স্বরূপগুণ-নিরূপণেন জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ।) আর কর্মকাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গভূত যে-সকল কার্য তাহাদের বিধান ও প্রতিপাদন দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বই বিঘোষিত হইয়া থাকে। ('কর্মকাণ্ডে তু জ্ঞানাঙ্গভূত কর্ম প্রতিপাদনেন পরম্পরয়া মন্যন্তে') বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৩/৯/২২ মন্ত্রে "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।"

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" এইরূপ বলিয়াছেন। "সেই ঔপনিষদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি।" "বেদসকল তাহারই বিষয় বলিয়া থাকেন।" "বেদপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকেই অনুভব করিবার চেষ্টা করেন।" এই সকল বেদবাক্যই ব্রহ্মের সর্ববেদ-বেদ্যত্বর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ।

আপত্তিকারী বলিয়াছেন যে, বেদশাস্ত্র কেবল যজ্ঞকর্মাদির অনুষ্ঠানের কথা বলেন এবং

পুত্রকামনা, বৃষ্টিকামনা, স্বর্গকামনা প্রভৃতি লৌকিক নশ্বর কামনা সমূহের তৃপ্তির বিধানই করে। বেদের একটা বিশিষ্ট অংশ যে ঐ সকল বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত একথা ঠিক। কিন্তু ঐরূপ ব্যাপৃত থাকিবার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। শাস্ত্রে রুচিহীন জীবের রুচি উৎপাদনের জন্যই বেদশাস্ত্র কাম্য কার্যাদি বিষয়ে প্রয়াস করিয়াছেন। ('বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফল-কার্যবিধায়িতা তু তেষাং রুচ্যুৎপাদনার্থৈব') কারীরী যজ্ঞে বৃষ্টি হইল, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে পুত্রপ্রাপ্তি ঘটিল—এই সব দেখিতে দেখিতে শাস্ত্রবাক্যে রুচিহীন ব্যক্তির রুচি জন্মিবে। পরে জাতরুচি ব্যক্তি সকল বেদার্থ বিচার করতঃ যাহাতে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক দ্বারা সংসারে বিতৃষ্ণ ও ব্রহ্মলাভের জন্য সতৃষ্ণ হন ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ('বৃষ্ট্যাদিফলদৃষ্ট্যা তেষ্বভিজাতরুচেস্তদর্থান্ বিচারয়তো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকিনো ব্রহ্মতৃষ্ণা-জগদ্বৈতৃষ্ণ্যঞ্চ স্যাদিতি') অতএব সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে সমস্ত বেদশাস্ত্রই ব্রহ্মপর এই সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রহিল। ('সিদ্ধং সর্বেষাং তেষাং ব্রহ্মপরত্বম্') আরও জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে বৈদিক যজ্ঞ কার্যাদি যে বৃষ্টি পুত্র স্বর্গাদি ফলদান করে তাহা সকলের জন্যই করে না। যখন ঐ কার্যের সঙ্গে কার্যকর্তার কাম বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকে তখনই ঐরূপ ফল হয়। প্রবল কামনা লইয়া ঐ সকল যজ্ঞ করিলে কামনানুরূপ ফল লাভ হয়। কিন্তু কামনা শূন্য হইয়া নিষ্কাম ভাবে ঐ সকল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে লৌকিক ফলাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ কামিত এব স্বর্গাদি-ফলত্বেন প্রতীতো ন ত্বকামিতঃ) পরন্তু নিষ্কাম হইয়া ঐ সকল যজ্ঞাদি শুভানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসানুকূল জ্ঞানের উদয় হয়। (কিঞ্চ জ্ঞানোদয়ার্থা বুদ্ধিশুদ্ধিরেব ভবেৎ) কামি ব্যক্তিরই কাম্য কর্ম দ্বারা নশ্বর ফলভোগ হইয়া থাকে। অকামী ব্যক্তির সেই কার্য চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান-লালসা পরিবর্দ্ধিত করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মানন্দ উপভোগে অনুকূলতা করিয়া থাকে।

অন্য আর এক প্রকার সঙ্গতি দেখাইতেছেন। ব্রহ্ম বস্তু চিৎ এবং অচিৎ উভয় শক্তিযুক্ত (চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতং খলু ব্রহ্ম) ইন্দ্রাদি দেবতা পরব্রহ্মেরই শক্তিভূত। তাঁহারই অঙ্গ সদৃশ। এই বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া যজ্ঞাদি করিলে ইন্দ্রাদি যজনে ব্রহ্মার্চনই হইয়া থাকে। (তচ্ছক্তিভূতা ইন্দ্রাদয়ো দেবতাস্তদঙ্গবুদ্ধ্যা ইজ্যন্তে, ব্রহ্মার্চনমেব তদ্‌যজনম্।) তদঙ্গভূত দেবতাগণের অর্চন যখন ব্রহ্মার্চনই তখন সেই অর্চনের ফলে যে চিত্তশুদ্ধি হইবে ইহাতে আর সংশয় কী? (ব্রহ্মাঙ্গভূত-দেবতার্চনং খলু ব্রহ্মার্চনমেব তৎ ফলন্তু চিত্তশুদ্ধিরেব।) সকল যাগযজ্ঞ দ্বারা যদি চিত্তশুদ্ধিই হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রুতি অন্যান্য নশ্বর ফলের কথা বলিলেন কেন? (তর্হি ফলশ্রবণং কথং সঙ্গতম্) এই জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্বেই বলা হইয়াছে। রুচিবিহীন ব্যক্তিদের রুচি উৎপাদনের জন্যই নানাপ্রকার ফলশ্রুতি। ব্রহ্ম বিষয়ে রুচিহীন বিষয়ভোগ বিষয়ে রুচি বিশিষ্ট জীবের জন্যই কাম্যকর্মের বিধান এবং ঐ কর্মও তাহারই জন্য কামনানুরূপ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ঐরূপ ফল লাভে তাহার চিত্তে শাস্ত্রে রুচি জন্মিলে ক্রমে বিষয় বিতৃষ্ণা ও মোক্ষতৃষ্ণাও হইতে পারে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মে রুচি সম্পন্ন সকল দেবতাই ব্রহ্মের অঙ্গভূত এই জ্ঞান সম্পন্ন, অন্য ভোগ কামনাবর্জিত ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক হইয়া থাকে।

এবম্ভূত সুবিচারিতরূপ 'সমন্বয়' (সমন্বয়ত্বং সুবিচারিতত্বম্) দ্বারা সমগ্র বেদ শাস্ত্রে মোক্ষপরত্ব

পরব্রহ্ম উপনিষদ্-বেদান্তবেদ্যবস্তু। উপনিষদ্ হইতেই তাঁহার বিষয় জানিতে হইবে। ইহাই অধিকরণের বিষয়।

ইহ সংশয়ঃ। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪/৫ মন্ত্রে উক্ত আছে "আত্মা বারে মন্তব্যঃ" আত্মাকে মনন করিবে। এখানে আত্মা বলিতে পরমাত্মা বুঝাইতেছে। তাহা হইলে পরমাত্মা মনন করিবার বস্তু। যাহা মননের বস্তু তাহা নিশ্চয়ই যুক্তিতর্কাদিরও বিষয়। উপাস্য ব্রহ্ম অনুমিতির বিষয় কিংবা শব্দব্রহ্মময় উপনিষদ্‌বেদ্য এইরূপ সংশয় জাগে। (উপাস্যো হরিরনুমানেন উপনিষদা বা (বেদ্যঃ)।

পূর্বপক্ষ—ন্যায়দর্শনের দ্রষ্টা ঋষি গৌতম বলেন যে, যেহেতু ব্রহ্ম মননের বিষয়—অতএব তিনি অনুমান-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। "ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি অনুমান প্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যাইবে। শ্রুতি-প্রমাণের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। (অনুমানেনাপি তদ্বোধসিদ্ধৌ কিং শ্রুত্যা?)

সিদ্ধান্ত। উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর দিতে সূত্রকার পরবর্তী সূত্র সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিতেছেন।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ১/১/৩

প্রশ্ন উঠিয়াছেন "ব্রহ্ম কি অনুমেয়?" উত্তর আসিতেছেন—না (অসৌ নানুমেয়ঃ)। কারণ কী? (কুতঃ) উত্তর দিতেছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" উক্ত 'না' কথাটি সূত্রে নেই। অন্য স্থান হইতে আকর্ষণ করিতে হইবে। ১/১/৫ সূত্র হইতেছে "ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই সূত্র হইতে 'ন' কথাটি এখানে টানিয়া আনা হইল অর্থর সঙ্গতি করিবার জন্য (ঈক্ষতের্ নেত্যতে 'ন' ইত্যাকৃষ্যম্।)

শাস্ত্রং যোনিঃ যস্য শাস্ত্রযোনিঃ, তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বম্, তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

শাস্ত্র উপনিষদ্ যোনি বোধহেতু যাহার (উপনিষদ্‌বোধ্যত্বশ্রবণাৎ) ব্রহ্ম অনুমেয় নহেন কেননা বেদান্ত (উপনিষদ্) শাস্ত্রই ব্রহ্মের বোধহেতুরূপে উক্ত হইয়াছেন। কোথায় উক্ত হইয়াছেন? বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ৩/৯/২৬ মন্ত্রে "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" এইস্থলে ব্রহ্মকে ঔপনিষদ পুরুষ বলা হইয়াছে। উপনিযদা প্রতিপাদ্যতে উপনিষদ্ পুরুষ বলা হইয়াছে। উপনিষদা প্রতিপাদ্যতে ঔপনিষদ শৈষিকান্ প্রত্যয়ঃ। যদি ব্রহ্ম উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু (অনুমানাদি) দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেন তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিমন্ত্রোক্ত ব্রহ্মের উপনিষদ্ সমাখ্যার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (অন্যথৈবোপনিষদ্-সমাখ্যাবিরোধঃ)।

ব্রহ্ম যদি উপনিষদ্ ছাড়া আর কোন কিছু দ্বারাই প্রতিপাদিত না হয়েন তাহা হইলে ব্রহ্ম 'মন্তব্য' এই বোধক "আত্মা বারে মন্তব্যঃ" শ্রুতির কী গতি হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর বলিতেছেন—মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারি-তর্কোঽভ্যুপগতঃ। অর্থাৎ 'মন্তব্য' শ্রুতির তাৎপর্য ইহা নহে যে ব্রহ্মবস্তুকে মনন দ্বারা প্রতিপাদন করা যাইবে—উহার তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল মনন বা তর্ক বিচার করা চলিবে। শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মবস্তু তত্ত্ব স্বীকার করিয়া পরে বিচারবুদ্ধি দ্বারা পূর্বাপর ভাবনা করতঃ কোথাও বিরোধের অবকাশ না রাখিয়া কোন্ অর্থটি শাস্ত্রাভিমত তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা চলিবে। পুরাণে উক্ত আছে—

"পূর্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কস্তু বর্জয়েৎ।।" কূর্মপুরাণ।

পূর্বাপর যাহা বলা হইয়াছে ও হইবে সব বিবেচনা করিয়া কোথাও কোন অসঙ্গতি না থাকে এমন ভাবে যে সম্যক্ গবেষণা তাহাই তর্ক। এইরূপ তর্ক স্বীকার্য। মন্তব্য শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য।-গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের যে শুষ্কতর্ক তাহাই বর্জনীয়। কেননা শুষ্কতর্কদ্বারা কোন কিছুরই প্রতিষ্ঠা হয় না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১/১১ সূত্রেই বিশেষভাবে বলিবেন—(বক্ষ্যতে তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি) সেই সূত্রটি হইল—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।।"

সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, তর্ক দ্বারা কখনও প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হয় না। তর্ক দ্বারা মোক্ষের উপায় স্থির করিতে হইলে এমন শতসহস্র মতবাদের উদয় ও খণ্ডন-মণ্ডন উপস্থিত হইবে যে, মোক্ষপ্রাপ্তি আর কোনও দিন হইবার আশা থাকিবে না। তর্কে বুদ্ধির খেলা। যার যত বেশী বুদ্ধি সে তত পরমতে দোষ প্রদর্শন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে। কিন্তু সত্য নির্দ্ধারণ হইবে না। তর্ক-বিচারের যদি কোন মূল্যই না থাকে তবে ন্যায় দর্শনখানি কি ব্যর্থই রহিয়াছে? ইহার উত্তর এই ধূমদর্শনে বহ্নি অনুমানে তর্কের কিছু প্রতিষ্ঠা আছে—(যদ্যপি অর্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।) জাগতিক অনিত্য বিষয়ে তর্কের অনেক মূল্য আছে কিন্তু ব্রহ্মানুসন্ধান বিষয়ে উহার কোনই উপযোগ নাই (ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে) কেননা, ব্রহ্ম অচিন্ত্য বস্তু। অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ নাই (অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ)।

ব্রহ্মবস্তুর বিষয় বেদান্ত হইতে জ্ঞাত হইয়া পরে ধ্যান করিবে (বেদান্তাদ্বিদিত্বাঽসৌ ধ্যেয়ঃ) এই কথা "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ২/১/২৭ সূত্রে বিশেষভাবে বলিবেন। সেখানে বলিবেন যে, যাহা চিন্তার অগোচর তাহা একমাত্র শব্দ দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া থাকে (অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈক-প্রমাণত্বাৎ) একমাত্র শ্রুতির শব্দই ব্রহ্মবস্তুর প্রমাপক (ব্রহ্মপ্রমাপকস্তু শ্রুতিশব্দ এব)।

নিম্নকথিত তথ্যগুলি শ্রুতিপ্রমাণ বলেই জানা যায়; বিচার দ্বারা কোন দিনই জানা যাইত না। (১) শ্রীহরেরাত্মমূর্তিত্ব—শ্রীহরির শ্রীমূর্তিটি আত্মবস্তু অর্থাৎ চিদ্ঘন তিনি চিদাকার বিশিষ্ট, সাকার বা নিরাকার নহেন। (২) অনুভূতেঽনুভবিতৃত্বম্—শ্রীহরি সকল আত্মার সকল অনুভূতির মূল অনুভবিতা। অর্থাৎ শ্রীহরি সর্বজীবের আত্মার আত্মা—আত্মার রসানুভূতির মূল রসানুভবিতা। (৩) স্বাত্মক-ধর্মাধিষ্ঠানশালিত্বম্—শ্রীহরির নিজ আত্মা হইতে অভিন্ন যে ধর্ম তিনি তাহার আশ্রয় স্থান। ধর্ম ও শ্রীহরি অভিন্ন—সকল ধর্মই শ্রীহরিকে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠিত আছে। (৪) জগৎকর্তৃনির্বিকারত্বম্—নিখিল বিশ্বজগতের সর্বময় কর্তা হইয়াও শ্রীহরি সর্বতোভাবে নির্বিকার। এবম্ভূত চিন্ময়মূর্তিক, আত্মার আত্মা, ধর্মের আশ্রয়, নির্বিকার জগৎ কর্তা শ্রীহরিই উপাস্য বিষয় (শ্রূয়মাণরূপতয়া তস্যোপাসনং সিধ্যতি)।

কর্মমীমাংসক আপত্তি তুলিতেছেন। সমস্ত বেদান্ত (উপনিষদ্) বাক্যের প্রয়োগ-যোগ্যতা নাই (প্রয়োগযোগ্যঃ উপদেশার্হঃ) কারণ 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' প্রভৃতি বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যের সিদ্ধার্থজ্ঞাপকতা প্রযুক্ত প্রয়োজনের অভাব হইতেছে (ন খলু তাবৎ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রয়োগযোগ্যঃ সিদ্ধান্তবোধকত্বেন প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' ইত্যাদি-বাক্যবৎ)।

মানুষের জীবন কর্মময়। কর্মের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধন করা। সাধ্য বস্তু লইয়া কর্মের কাজ,

সিদ্ধ বস্তু লইয়া কর্মের কিছু করণীয় নাই। গৃহ একটি সাধ্য বস্তু—কাজেই গৃহ নির্মাণ একটি কর্ম। হিমালয় পর্বত একটি সিদ্ধ বস্তু, তাহা লইয়া কর্মের কিছু করণযোগ্য নাই। সাধনার বস্তু লইয়া কর্মের কাজ দ্বিবিধ। প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। অর্থের প্রয়োজন তাই রাজসভায় যাইতে প্রবৃত্তি। পেটে মন্দাগ্নি হইয়াছে তাই চিকিৎসকের উপদেশ মত জলপানে নিবৃত্তি। ('প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-রূপসাধ্যার্থবোধকানি বাক্যানি প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রয়োগযোগ্যানি দৃষ্টানি—অর্থলিপ্সুঃ নৃপং গচ্ছেৎ মন্দাগ্নির্ন জলং পিবেৎ ইতি।') কোন বাক্যের প্রয়োগযোগ্যতা ইহা হইলেই থাকিবে যদি বাক্যের মধ্যে কোনও কর্ম সাধন করিবার বা কোনও কর্ম হইতে বিরত হইবার উপদেশ থাকে। স্বর্গকামী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে (স্বর্গকামো যজেত), মদ্য পান করিবে না (সুরাং ন পিবেৎ)—এই সকল বৈদিক বাক্যের প্রয়োগযোগ্যতা আছে। প্রবৃত্তিমূলক বাক্যের উদ্দেশ্য ইষ্টলাভ। নিবৃত্তিমূলক বাক্যের উদ্দেশ্য অনিষ্ট পরিহার। ('প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসাধ্যেষ্টাপ্তিপরিহারাত্মকং বাক্যপ্রয়োগ-প্রয়োজনম্') ঐ দুই উদ্দেশ্য বর্জিত কোন বাক্য হইতে পারে না। হইলে সেই সব বাক্যকে প্রয়োজন-শূন্য বলিব। যেমন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা—এই বাক্যে কিছু করিবার উপদেশ নাই, কাজেই ইহা প্রয়োজনশূন্য বাক্য।

মীমাংসকেরা বলেন যে, বেদান্তবাক্যসকলের প্রয়োগযোগ্যতা নাই। কেননা তাহারা প্রয়োজনশূন্য বাক্য। এইরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রয়োজনীয় বাক্য সকল যেরূপ সাধ্য ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারাত্মক, বেদান্তবাক্যসমূহ সেরূপ নহে। বেদান্তবাক্য সিদ্ধার্থবোধক। ব্রহ্ম বস্তু সাধ্য নহে। ইহা চিরসিদ্ধ (ব্রহ্ম খলু পরিনিষ্পন্নং বস্তু)। ব্রহ্মপর শ্রুতিবাক্য 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি কেবল সিদ্ধ বস্তুর সত্তাবিষয়ক কথাই বলিয়াছে; কোন সাধ্য বস্তুর সাধন সম্বন্ধে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক কোন উপদেশ দেয় নাই। অতএব প্রয়োজনশূন্য বিধায় ঐ সকল ব্রহ্মপর বেদান্ত বাক্য প্রয়োগার্হ নহে। (প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ প্রয়োগার্হত্বং নেত্যর্থঃ।)

যদি কেহ ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে ঐ সকল অপর কোন প্রয়োজন বিশিষ্ট বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। (যদি কশ্চিৎ তং প্রযুযুক্ষুর্ভবেৎ তর্হি প্রয়োজনবৎ বাক্যৈকবাক্যতয়া তং প্রযুঞ্জানঃ তস্যাপি তদ্বত্ত্বং ব্রূয়াৎ।) এই হেতু যজ্ঞ বা যজ্ঞের অঙ্গভূত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা বা যজ্ঞের যজমানাদি কোন কিছু প্রতিপাদন দ্বারা প্রয়োজন বিশিষ্ট বেদান্ত বাক্য সকলের সহিত প্রয়োজন-শূন্য বেদান্ত বাক্য সকলের এক-বাক্যতা করিয়া প্রয়োগযোগ্য করিতে হইবে (বিধিবাক্যানাং যৎ ফলবত্ত্বং তদেব বেদান্তবাক্যানামিতি নিষ্কর্ষঃ)।

মহাত্মা জৈমিনিও এই প্রকার কহিয়াছেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অ-তদর্থানাম্"—পূর্বমীমাংসা ১/২/১। আম্নায় অর্থ বেদ। বেদশাস্ত্র কর্মমূলক ক্রিয়াকাণ্ড পূর্ণ। যে-বাক্যে ক্রিয়া নাই—অর্থাৎ যে-বাক্যে কোন বিধিনিষেধ নাই এমন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'—ইত্যাদি প্রকার ব্রহ্মবোধক বাক্য অনর্থক। কেননা ঐ সব বাক্যের ধর্মপ্রবৃত্তি অধর্ম নিবৃত্তিরূপ অর্থপ্রতিপাদকতা নাই। যে-বাক্য অর্থহীন, তাহা অনিত্য ('তস্মাদনিত্যত্বমুচ্যতে')। অতএব 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্য অনিত্য। তবে ক্রিয়াপর বাক্যের সহিত সমুচ্চারণ (সমাম্নায়ঃ) করিয়া ঐ সকল অ-ক্রিয়ার্থক বাক্যের সাফল্য ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে (পূর্ব মীমাংসা ১/১/২৫)—

এই পর্যন্ত গেল পূর্বপক্ষী কর্মমীমাংসকগণের আপত্তি। এই আপত্তি "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রার্থের পরিপন্থী। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র বলিতেছেন যে, বেদান্তের ব্রহ্মপর বাক্য হইতেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে; অন্য কোন পথ নাই। আপত্তিকারী বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবোধক বাক্য সকল একেবারেই অনর্থক ও অনিত্য। তাহাদের সার্থক করিয়া কোন মতে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভাবে ব্রহ্মবোধক শ্রুতি ব্যর্থ—ইহাদিগকে বিধিবোধক বাক্যের পুচ্ছ করিয়া কোনক্রমে জীবন্ত রাখা যায়। এই আপত্তি মানিয়া লইলে ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রের আত্মহত্যা তুল্য হয়। ইহা অনুভব করিয়াই ভাষ্যকার শ্রীবলদেব পূর্বপক্ষের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াই বলিয়াছেন, "মৈবং ভ্রমিতব্যম্।" কর্ম-মীমাংসার যুক্তির ভ্রান্তিজালেতে কেহ যেন পতিত না হয়। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির বোধকতা না থাকিলেই যে কোন বাক্য নিরর্থক হইবে, ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় কথা। "তোমার গৃহে ধন আছে" এই কথা কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শোনে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আশান্বিত হইয়া গৃহের কোথায় ধন আছে তাহা অনুসন্ধানে নিরত হইয়া থাকে। ("যথা 'ত্বদ্‌গৃহে ধনমস্তি' ইত্যাপ্তবাক্যাৎ তৎপ্রাপ্ত্যেকলক্ষণঃ পুমর্থঃ") গৃহে ধন আছে এই লৌকিক বাক্যে যেমন কোন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কথা নাই (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধকতা বিরহেঽপি) তথাপি ইহা পুরুষার্থের জনকভূত হইয়া সার্থক হইতে পারে সেইরূপ—অক্ষয়ানন্দ চিৎস্বরূপ নির্দোষ সর্বসুহৃদ্ আত্মময় পরব্রহ্ম আছেন। আমি জীব যাঁহার অংশ মাত্র (অক্ষয়ানন্দচিদ্রূপং নিরবদ্যং সর্বসুহৃদাত্মপ্রদং মদংশি ব্রহ্মাস্তীতি) এই পরম মূল্যবান বাক্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধকতা না থাকিলেও, বহুপ্রকার কর্মপ্রেরণার জনকীভূত হইয়া ইহা সফল ও সার্থক হইতে পারে।

বিষয়বস্তু পরিনিষ্পন্ন হইলেও বাক্যের ফলবত্ত্ব দৃষ্ট হয়। (পরিনিষ্পন্নবস্তুপরেষ্বপি বাক্যেষু ফলবত্ত্বং দৃষ্টম্) যেমন, 'তোমার পুত্র হইয়াছে' এই বাক্য পরিনিষ্পন্ন-বস্তুপর হইলেও উহা পিতার হর্ষের কারণ হইয়া সফল ও সার্থক হইবে। 'এটি সর্প নহে, রজ্জু' এই বাক্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধকও নহে, পরিনিষ্পন্ন বস্তু-পরও বটে—কিন্তু এই বাক্যে অকারণে ভীত ব্যক্তির ভীতি নিবারণ হইবে। কাজেই সার্থক হইবে। (পুত্রস্তে জাতো, নায়ং সর্পো রজ্জুরেব ইত্যাদিষু স্বরূপ-পরেষু অপি বাক্যেষু হর্ষ-ভয়-নিবৃত্তিরূপ-ফলবত্ত্বং দৃষ্টম্)। সুব্যক্ত-ফল বেদান্তবাক্যের নৈষ্ফল্য বলা নিতান্তই অসঙ্গত। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত আছে (২/১) সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মকে যিনি অবগত হন তিনি সর্বকাম হয়েন ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। আপত্তিকারী বলিয়াছেন, বেদান্তের ব্রহ্মপর বাক্য সকল নিরর্থক, তাহাদিগকে সার্থক করিতে হইবে কর্ম-পর বাক্যের সহিত একবাক্যতা দ্বারা। এই সকল কথা নিতান্তই যুক্তি-বহির্ভূত। বেদে জ্ঞানপ্রকরণ ও কর্মপ্রকরণ (জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড) পরস্পর ভিন্ন বস্তু। এক প্রকরণের বাক্যকে অর্থবন্ত করিতে হইবে আর এক প্রকরণের বাক্যের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া একথা সর্বতোভাবেই অকিঞ্চিৎকর। (ন চ উক্তরীত্যা ক্রিয়াপরতা তস্য শক্যা বক্তুং প্রকরণভেদাৎ)

বেদান্তে কর্ম ও কর্মফলের নিন্দাই দৃষ্ট হয় (কর্ম-তৎ-ফল-বিগানাৎ) সেই বেদান্ত বাক্যের সার্থকতা করিতে হইবে কিনা কর্মফল বিধায়ক বাক্যের সহিত এক বাক্যতা করিয়া—একথা সত্য হওয়া দূরের কথা, কল্পনা হওয়াও অসম্ভব। (তদ্বাক্যৈকবাক্যতা দূরোৎসারিতা)। বেদান্ত-বাক্যের ব্রহ্মপরতাই হইল শ্রুতির হার্দ। তাদৃশ বাক্যকে ব্রহ্মপর স্বীকার না করিয়া, নিন্দনীয় কর্ম

তথা চ নির্গুণ এব বাচ্যঃ ইতি।')

শব্দবাচ্য—শাস্ত্র নিরূপিত ব্রহ্মই নির্গুণ শুদ্ধ ব্রহ্ম এই সিদ্ধান্ত অপর একটি হেতুদ্বারা স্থাপন করিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

স্বাপ্যয়াৎ। ১/১/৯

স্ব অপ্যয়াৎ। স্বস্মিন্ আপনাতে অপ্যয় বিলীন হন বলিয়া। শব্দবাচ্য ব্রহ্ম নির্গুণ কেননা তিনি আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হয়েন। একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মই আপনাতে আপনি অবস্থিত। সগুণ হইলে তাহার অবস্থান অন্য-সাপেক্ষ হয়। একমাত্র নির্গুণেরই অন্যনিরপেক্ষ স্থিতি সম্ভব। অন্যনিরপেক্ষ সত্তা যাঁর, যিনি স্বরাট্, একমাত্র তাঁহারই আপনাতে (স্বস্মিন্) নিমজ্জন (অপ্যয়) সম্ভব।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ৫/১/১ মন্ত্রে উক্ত আছে—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

মন্ত্রটির তাৎপর্য এই যে নিখিল বিশ্বের মূলরূপ ও পূর্ণ প্রকাশরূপও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়। (অদো মূলরূপম্ ইদং প্রকাশরূপম্ উভয়ং পূর্ণম্) রাসলীলায় ও মহিষীবিবাহলীলায় পূর্ণ মূলবস্তু হইতে পূর্ণের প্রাদুর্ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। (রাসাদিষু কর্মসু সমূলরূপাৎ পূর্ণাৎ উদুচ্যতে প্রাদুর্ভবতি) পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণবস্তু গৃহীত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

পূর্ণ মূলরূপ হইতে পূর্ণ প্রকাশরূপ লইয়া গেলে 'অন্যত্র অবিলীন' পূর্ণরূপই অবশেষ থাকে। পূর্ণবস্তু নির্গুণ বলিয়াই আপনাতে আপনি থাকেন। অপূর্ণ বা সগুণ হইলে অন্য বস্তুতে বিলীন হইত (যদিদং গৌণং স্যাত্তর্হি পরস্মিন্ অপি ইয়াৎ ন তু স্বস্মিন্নেব)।

শ্রীহরি যে নির্গুণ একথা পদ্মপুরাণে স্পষ্টোক্তি আছে।

"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃৎ।।"

নির্গুণ পুরুষোত্তম শ্রীহরি সৃষ্টি করিয়া বহু হইয়াছেন। সর্বদোষ শূন্য অনাদিপুরুষ শ্রীহরি আবার আপনাতে সকল আকর্ষণ করতঃ একীভূত হইয়া শয়ন করেন।

শাস্ত্রে সগুণ-বিষয়ক বাক্য দেখিয়া কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হয়েন। তাহাদের ভ্রান্ত মত পরবর্তী সূত্রদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম দ্বিবিধ; সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মই সত্ত্বগুণোপাধি, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও জগৎকারণ। পক্ষান্তরে নির্গুণ ব্রহ্ম সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। সগুণ ব্রহ্মেই বেদের শক্তি। কিন্তু উহার নিগূঢ় তাৎপর্য নির্গুণ ব্রহ্মেই পর্যবসিত। এই মতবাদ ভ্রান্ত। কেন, তাহাই পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন। যত্তু সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিবিধং ব্রহ্ম। তত্রাদ্যং সত্ত্বোপাধি সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি-জগৎকারণম্।

"দ্বিতীয়ঞ্চ সত্তানুভূতিমাত্রং পূর্ণং বিশুদ্ধং, পূর্বত্র বেদানাং শক্তিঃ।
পরত্র তু তাৎপর্যমিত্যাদ্যভিপ্রেতং তদপি নিরস্যতি—"

গতি-সামান্যাৎ।১।১।১০

'গতিঃ অবগতিঃ' জ্ঞান বা অনুভব। 'সামান্যাৎ ঐক্যরূপাৎ'—একই প্রকারের। অর্থাৎ বেদে কোথাও সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই। সকল বেদে সমান ভাবে নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞানঘন সর্বশক্তি পূর্ণ বিশুদ্ধ পরমাত্মা জগতের হেতু, উপাসিত হইলে তিনি মুক্তিদান করিয়া থাকেন। এই অবগতি বা ধী সর্ববেদে সমানভাবে কীর্তিত। সকল বেদেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে (ব্রহ্মণঃ সর্বেষু তত্তয়াভিধানাৎ।) অতএব ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ ভেদ কল্পনামাত্র (সগুণং-নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপতা নাস্তীত্যর্থঃ।)

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—হে ধনঞ্জয়, এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসারে যেমন আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই সেইরূপ আমি ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

অনন্তর পরবর্তী সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্তই আরও সুস্পষ্ট ভাবে বেদের বাক্য প্রমাণদ্বারা দেখাইতেছেন। ('অর্থ স্ফুটমেব নির্গুণস্য বাচ্যত্বমাহ') স্পষ্টাভিধানে নির্গুণ ব্রহ্মেরই বাচ্যত্ব উক্ত হইতেছে।

শ্রুতত্বাচ্চ। ১/১/১১

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে স্পষ্ট ভাবেই উক্ত আছে যে নির্গুণ ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা ও মুক্তিদাতা।

> "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
> কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।" শ্বেতাঃ ৬/১১

ব্রহ্ম এক ক্রীড়াশীল সর্বভূতে নিগূঢ়ভাবে বিরাজমান। প্রাণীমাত্রেরই অন্তর্হৃদয়ে কাষ্ঠে অগ্নির মত গূঢ়ভাবে অবস্থিত। তিনি ধর্মের অধ্যক্ষ, চিৎস্বভাব, শুদ্ধ এবং নির্গুণ।

মন্ত্রে 'নির্গুণ' শব্দটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকায় নির্গুণ ব্রহ্মেরই যে শব্দবাচ্যত্ব ইহাতে আর সংশয়ের অবকাশ রহিল না ('নির্গুণস্য শ্রুত্যুক্তত্বাচ্চ বাচ্য এব সঃ') ফলতঃ সেই ব্রহ্ম শ্রুতিতে উক্ত, অতএব বাচ্য। অবাচ্য বস্তু কখনও শ্রুতির বিষয় হইতে পারে না (ন হ্যশব্দঃ শ্রূয়েত।)

কেহ কেহ বলেন, আমরা নির্গুণ ব্রহ্মকে কেবলমাত্র লক্ষণার্থ দ্বারাই জানি। অভিধার্থে জানি না। নির্গুণ ব্রহ্ম স্রষ্টা হইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টি করিতে হইলে সৃষ্টির কামনা অর্থাৎ সিসৃক্ষা চাইই। নির্গুণ ব্রহ্মেতে কামনা থাকিতে পারে না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম স্রষ্টা হইতে পারে না—এই সকল জল্পনা অলীক। ('যত্তু লক্ষণয়া নির্গুণস্যাবগতিঃ ন ত্বভিধয়া প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাদিতি জল্পন্তি তদসৎ') কারণ, যাহা সকল শব্দের অবাচ্য তাহাতে লক্ষণাও প্রয়োগ হইতে পারে না। ('সর্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাযোগাৎ') অদৃশ্যত্বাদি ধর্মদ্বারা বেদবাক্য সকল যেরূপ পরব্রহ্মের কথা বলেন, নির্গুণত্বাদি ধর্মদ্বারাও সেইরূপেই বলেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের একবিংশতি সূত্রে আছে "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ" সূত্রের অর্থ এই অদৃশ্যত্ব অপ্রাণত্ব অমনত্ব অপাণিপাদত্ব প্রভৃতি ধর্ম পরমাত্মারই। অদৃশত্বাদিগুণ সকল যেমন সূত্রকার ব্রহ্মে প্রবৃত্তির নিমিত্ত মনে করেন,

নির্গুণত্বাদি ধর্মকেও সেইরূপ গুণ মনে করেন (নির্গুণত্বাদেরপ্যদৃশ্যত্বাদেরিব তন্নিমিত্তত্বাৎ, যথাঽদৃশ্যত্বাদীন্ গুণান্ ভগবান্ ব্যাসঃ প্রবৃত্তি নিমিত্তানি মন্যতে তথা।) পূর্ব পক্ষের আশয় এই—লক্ষণা শক্তিদ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাব হেতু অভিধাশক্তি দ্বারা হয় না। এই কথারই উত্তর দিলেন যে নির্গুণত্বাদি ধর্ম সকলই বাক্য প্রবৃত্তির নিমিত্তভূত অতএব অভিধা শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকে।

আপত্তিকারী বলিতেছেন—তোমার কথায় বুঝা গেল যে নির্গুণত্বও ব্রহ্মের একটি গুণ বিশেষ। ইহা দ্বারা বলা হইল যিনি নির্গুণ তিনি গুণবান। এরূপ বিরুদ্ধ কথা কী প্রকারে চালাইতে চাও? (নির্গুণোঽপি গুণবান্ ইতি বিরুদ্ধম্।)

উত্তর দিতেছেন।—হাঁ, নির্গুণই গুণবান্। ইহার মধ্যে একটি রহস্য আছে। সেই রহস্যের অববোধ যদি পূর্বপক্ষীর থাকিত তাহা হইলে আর এত কথা বুঝাইতে হইত না, সেও ঐরূপ ভ্রান্তিজালে পতিত হইত না (রহস্যানববোধাৎ)।

নির্গুণই কিরূপে গুণবান সেই রহস্য বলিতেছেন। গুণ শব্দটি দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গুণ বলিতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণকে বুঝায়। আবার, গুণ বলিতে প্রকৃতির অতীত পুরুষ যে পরব্রহ্ম তাহার স্বরূপানুবন্ধী গুণ সকল বুঝায়। যখন বলা হয় ব্রহ্ম নির্গুণ তখন বুঝিতে হইবে প্রাকৃত গুণ ব্রহ্মে নাই। যখন ব্রহ্মের সত্যত্বাদি নানাবিধ কল্যাণের কথা বলা হয় তখন ঐ সকল গুণ স্বরূপানু-বন্ধী-অপ্রাকৃত গুণগণকে বুঝাইয়া থাকে। ('প্রাকৃতৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধিভিঃ তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা')

যে-সকল গুণ না থাকিলে বস্তুর স্বরূপেরই হানি ঘটে তাহাই স্বরূপানুবন্ধীগুণ। যদি বলা যায়, নীল শিখা বিশিষ্টত্ব অগ্নির ঔপাধিক গুণ। ইন্ধনের উপাধিবশতঃ শিখা নীল হইয়াছে উহা লালও হইতে পারে, অন্য কিছুও হইতে পারে গোলকাদিতে অগ্নি শিখাশূন্যও হইতে পারে। কিন্তু দাহিকাশক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির ঔপাধিক গুণ নহে। উহা স্বরূপানুবন্ধী গুণ, কেননা অগ্নিকে সত্তা বজায় রাখিতে হইবেই, দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। সেইরূপ সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব সর্বশক্তিমত্ত্ব সর্বজ্ঞ বিভূত্ব ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী গুণ। এই সকল গুণ ব্রহ্মের সত্তার সঙ্গে অভিন্ন, অতএব প্রাকৃত গুণ রহিতত্ব ও স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্টত্বই 'নির্গুণো গুণী' কথা দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পুরাণেও কথিত আছে—

> "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।"
> সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ হরীত্যাদিভিঃ।।"

"ঈশ্বরে সত্তাদি প্রাকৃত গুণ নাই" ও "তিনি অপ্রাকৃত গুণগণ-বিশিষ্ট"—রহস্যবেত্তা এই আপাতবিরুদ্ধতায় ভ্রমে পতিত হয়েন না।

শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'অনাম' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মের কোন নামই নাই। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, কোন নামদ্বারাই ব্রহ্মের সমগ্রতা প্রকাশযোগ্য নহে। তিনি অনন্ত বলিয়াই এমন হয় (কার্ৎস্ন্যেনাগোচরতা ত্বানন্ত্যাৎ)—প্রাকৃত বস্তুর প্রকাশক কোন নামই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাকেই গুণের 'অপ্রসিদ্ধি', বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তু হইতে বিলক্ষণ

বিধায় প্রাকৃত প্রকাশক শব্দ বা গুণ ব্রহ্মস্বরূপপ্রকটনে গ্রহণের অযোগ্য। ('অনামাদি-শব্দাস্তু গুণাপ্রসিদ্ধিকার্ৎস্ন্যাগোচরত্বাদিতঃ সঙ্গমনীয়াঃ। তদপ্রসিদ্ধিশ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যেনাগ্রহাৎ') যাহারা বলেন—নির্গুণ অর্থ কোন গুণই নাই ('যস্তু তেষাং স্ফুটার্থং ব্রূতে'), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ('স এবং প্রষ্টব্যঃ') সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তর্যামী, সর্বভূতাধিবাস ইত্যাদি গুণগুলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন কিছু সংবাদ দিতেছে, কি দিতেছে না? (তৈস্তস্য বোধ্রঃ স্যান্নবেতি?) যদি বল হাঁ, ঐ সকল শব্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিতেছে, তবে তো ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য ইহাই স্বীকার করিতেছে। যদি বল, না, ঐ সকল শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন কিছুই জানাইতেছে না, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল ব্যর্থ শব্দগুলি বেদ ব্যবহার করিলেন কেন? (আদ্যে তেঽপি তস্যাখ্যাঃ, অন্ত্যে তু তদারম্ভবৈফল্যাপত্তিরিতি)

অতএব অনন্ত বলিয়াই পরব্রহ্ম সামগ্রিকভাবে শব্দদ্বারা প্রকাশের অতীত বস্তু—অশব্দ শব্দের ইহাই তাৎপর্য—ইহাই আমাদের কথা (অশব্দং ব্রহ্মেতি যৎ প্রতীয়তে তৎ খলু অনন্তস্য তস্য কার্ৎস্ন্যেনাগোচরত্বাদিত্যবোচাম)

"এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সুসূক্ষ্মাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোঽয়মতিবিস্তারকারী।।" ১/১/১১

ভাষ্য সহিত পঞ্চন্যায়ী এই একাদশসূত্রী পাঠ করিলে ব্যক্তিমাত্রই অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। অবশিষ্ট গ্রন্থে এই সকল তত্ত্বকথা অধিকরূপে বিস্তারিত করা হইয়াছে মাত্র। ❐

'উপনিষৎ ও শ্রীকৃষ্ণ'—দু'টি কথা

ভারতীয় দর্শন-ভূমি বহুকাল অনাবাদী। দুই শত বৎসর ধরিয়া এই মাটিতে পরমুখাপেক্ষিতার জল সিঞ্চনে বিদেশীয় দর্শনের 'কলম' জন্মাইবার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আজ আবার যে মাটির যে ফসল তাহার আবাদের দিন আসিয়াছে। তবু বাধা এখনও বহু। জনসাধারণ দার্শনিক ভাবনায় অনভ্যস্ত—অন্ন-বস্ত্র সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। যারা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত চিন্তাশীল, তাঁহাদের বুদ্ধি এখনও পাশ্চাত্ত্য-মোহগ্রস্ত।

একটা জাতির সমষ্টি জীবনের কথাই বল, আর একটা ব্যক্তির ব্যষ্টি জীবনের কথাই বল, বর্দ্ধমান জীবনের ভিত্তি দার্শনিকতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। একদিন ফরাসী জাগিয়াছিল রুসো-ভল্টেয়ারের দর্শনে, জার্মান জাগিয়াছিল কান্ট-হেগেলের দর্শনে, আজ রাশিয়া জাগিতেছে মার্কসের দর্শনে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে, কিন্তু ইহাদের চলার স্বাধীনতা নাই, ইহাদিগকে চালায় মস্তিষ্ক। সেইরূপ একটা রাষ্ট্র, একটা সমাজ, একটা পরিবার, একটা ব্যক্তি যে চলে তাহা ইহাদের চলিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া নহে। ইহাদের পিছনে একটা জীবনছন্দের দর্শন থাকে। কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে ঐ জীবন-দর্শনই প্রকৃত চালকের কর্ম করে। যাহাদের

* *'উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীরণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী। ১ম সং ১৩৫৯। মহাউদ্ধাবণ মঠ। মহানাম সম্প্রদায়।*

সিদ্ধান্তিত হইল (ব্রহ্মণো বেদ্যত্বমুক্তম্)।

* * *

ঈক্ষত্যধিকরণ

পূর্ববর্তী দুইটি অধিকরণে ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিত্ব ও সর্ব বেদবেদ্যত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ঐ দুই অধিকরণের সহিত সমন্বয় উপপত্তির জন্য ব্রহ্মের শব্দের অবাচ্যতা নিরস্ত হইতেছে। (সমন্বয়োপপত্তয়ে ব্রহ্মণোঽবাচ্যত্বং নিরস্যতে) ব্রহ্ম অশব্দ নহেন—শব্দের অবাচ্য নহেন অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দবাচ্যই। ইহাই অধিকরণের বিষয়।

সংশয়—ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য কি অবাচ্য? (অশব্দং শব্দবাচ্যং বা ব্রহ্মেতি?) এইরূপ সংশয় মনে উদিত হইবার কারণ শ্রুতির বাক্য। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২/৪/১ মন্ত্রে কহিয়াছেন,—"যতো বাচো নিবর্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ।" তিনিই ব্রহ্ম যাহাকে না পাইয়া যাহার নিকট হইতে শব্দ মনের সহিত ফিরিয়া আসে। কেন শ্রুতিও ১/৫ মন্ত্রে কহিয়াছেন, "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে"—যিনি আছেন বলিয়া শব্দ উচ্চারিত হয়, অথচ শব্দ দ্বারা যিনি প্রকাশযোগ্য নহেন, তিনিই ব্রহ্ম। (পূর্বপক্ষ) এমতাবস্থায় পূর্বপক্ষ বলিতেছেন, ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য। কারণ, এই মর্মে বহু শ্রুতিবাক্য আছে (শ্রুতিস্বারস্যাৎ) এবং শব্দ বা অন্য কিছু দ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি ঘটে (অন্যথা স্বপ্রকাশতাহানাৎ)। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও মৈত্রেয় ঋষির মুখে উক্ত হইয়াছে।

"যতোঽপ্রাপ্য নিবর্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবা তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।"

যাহাকে পাইয়া বাক্য ও মন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসে, যাহাকে আমি কিংবা অন্য দেবদেবী জানেন না, সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।

সিদ্ধান্ত। এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক পরবর্তী সপ্তসূত্র বিশিষ্ট ঈক্ষত্যধিকরণে ব্রহ্মের শব্দ বাচ্যত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতেছে।

ঈক্ষতে-র্নাশব্দম্। ১/১/৫

যাহাতে প্রবেশ পূর্বক শব্দ যদ্বিষয়ক কিছু বলিতে পারে না তাহাই অশব্দ (নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন্ তদশব্দম্।) ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন (ঈদৃশং ব্রহ্ম ন ভবতি) অতএব ব্রহ্ম শব্দবাচ্যই (শব্দবাচ্যমেব তৎ) কী প্রকারে কী যুক্তি বলে এই তথ্য জানিলে (কুতঃ), উত্তর দিতেছেন 'ঈক্ষতেঃ'। ঈক্ষ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে তিপ্ প্রত্যয় করিয়া ঈক্ষতি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া তদুত্তর পঞ্চমী বিভক্তি। ইহার অর্থ দাঁড়াইল ঈক্ষণ বশতঃ—বেদে তাদৃশ মহাবাক্য সমূহের দর্শন বশতঃ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ৩/৯/২৬ মন্ত্রে ব্রহ্মকে 'ঔপনিষদ' সমাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই ('ঔপনিষদসমাখ্যাদর্শনাৎ') কিংবা শুনিতে পাই (শ্রবণাদীত্যন্যে)। কঠ শ্রুতিও ২/১৫ মন্ত্রে ব্রহ্মের মহিমা নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" সমস্ত

বেদশাস্ত্র যাহাকে ঘোষণা করে।

অবশ্য একথা ঠিক যে শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্ম যে 'অশব্দ' ইহা বলিয়াছেন। তবে অশব্দ শ্রুতির তাৎপর্য ইহা নহে যে, ব্রহ্ম বিষয়ক কোন কিছুই শব্দদ্বারা বলা যায় না। অশব্দশ্রুতির মর্ম এই যে, সামগ্রিক ভাবে সর্বাংশে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য নহেন। (অশব্দস্তু কার্ৎস্ন্যেনাশব্দিতত্বাৎ) যেমন বহু দূরবর্তী সুমেরু পর্বতকে কোন স্থান বিশেষ হইতে বিশেষভাবে দৃষ্ট না হওয়ার জন্য 'পর্বত অদৃষ্ট' এরূপ বলা চলে (দৃষ্টোঽপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাৎ অদৃষ্টঃ কথ্যতে) ইহাতে পর্বত যে একেবারেই দেখা যায় না এমত বুঝায় নাই। সেইরূপ ব্রহ্ম অশব্দ এই কথায় ব্রহ্ম যে একেবারেই শব্দের অগোচর এমন বুঝায় না। সকল শব্দের অবাচ্যতাই বোধগম্য হয়।

"যতো বাচো নিবর্তন্তে" এই মন্ত্রেও বাক্য সেখানে গিয়া কিঞ্চিৎ জানিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে এইরূপই অনুভূত হয়। "দেবদত্ত কাশী হইতে ফিরিয়াছে" বলিলে দেবদত্তের সঙ্গে কাশীনগরীর কোন অংশের অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্রও সংযোগ হইয়াছে এইরূপই প্রতীতি হয়। (দেবদত্তঃ কাশ্যা নিবৃত্ত ইত্যুক্তে কাশীং স্পৃষ্ট্বৈব নিবৃত্ত ইত্যধিগম্যতে। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' ইত্যুক্তে কথঞ্চিৎ গোচরং কৃত্বৈব নিবর্তন্তে ইত্যাদি গম্যতে)।

'যতো বাচো নিবর্তন্তে' শ্রুতির 'যতঃ' শব্দের বিচারে যেমন বাক্য মন তৎ সমীপে গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় এমন বোঝা যায়, 'অপ্রাপ্য' শব্দটি লইয়া আলোচনা করিলেও ঐ প্রকারের অর্থ লাভ হয়। অপ্রাপ্য অর্থ প্রকৃষ্ট ভাবে না পাইয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পাইয়া ফিরিয়া আসে (অপ্রাপ্য ইত্যত্র প্রকর্ষেণ ন, কথঞ্চিল্লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ প্রতীয়তে)।

'যদ্বাচানভ্যুদিতম্' কেন-শ্রুতির এই মন্ত্রাক্ষর লইয়া বিশ্লেষণ করিলেও পূর্ব কথিত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। "অনভ্যুদিতম্" শব্দে সর্বতোভাবে প্রকাশিত নহে, কিঞ্চিৎ প্রকাশিত এইরূপ শব্দবোধই হইয়া থাকে (অভিতো নোদিতং কিয়দুদিতমেবেতি) মন্ত্রাক্ষরের এইপ্রকার অর্থ স্বীকার না করিলে "তদেব ব্রহ্ম" (সেই বস্তুই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্যের নিতান্তই অসঙ্গতি হইয়া উঠে। (অন্যথা যত ইতি অপ্রাপ্যেতি অনভ্যুদিতমিতি, তদেব ব্রহ্মেতি চ ব্যাকুপ্যেৎ)।

আপত্তিকারী একথা বলিয়াছেন যে, বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি ঘটে—একথা বিচারসহ নহে। কেননা ব্রহ্ম বেদেরই আত্মা স্বরূপ, দুই অভিন্ন বস্তু, অতএব বেদের দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ নিজে দ্বারাই নিজের প্রকাশ—ইহাই স্বপ্রকাশতা। অতএব ব্রহ্মের বেদপ্রকাশ্যতা ও স্বপ্রকাশতা এই দুইয়ে কোন বিরোধিতা নাই। (স্বাত্মনা বেদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুধ্যতে) সুতরাং ব্রহ্মের অশব্দতা সাকুল্যে ব্রহ্ম নিরূপণের অযোগ্যতাই বুঝাইবে। অতএব, শ্রুতির শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বাচ্যত্বই সিদ্ধান্ত হইল। (তস্মাৎ তত্র কার্ৎস্ন্যেনাগোচরত্বমেব সাধু-ব্যাখ্যাতম্)

পুনর্বার পূর্বপক্ষী কহিতেছেন—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য এই সিদ্ধান্ত শুনিলাম (শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম স্যাদেতৎ) কিন্তু শব্দ দ্বারা বাচ্য যে ব্রহ্ম তিনি তো পরব্রহ্ম নহেন। তিনি সগুণ ব্রহ্ম মাত্র। বেদবাক্যের প্রকাশযোগ্যতা ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত। কাজেই বেদদ্বারা প্রকাশযোগ্য ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মই। তিনি শুদ্ধ

পূর্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন! সগুণ ব্রহ্ম নিরূপক শ্রুতি অভিধার্থেই সগুণ ব্রহ্ম নিরূপণ করেন কিন্তু শ্রুতিবাক্যের লক্ষণা না করিলে শুধু বাচ্যার্থ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব পরব্রহ্ম বাচ্যার্থে শাস্ত্রের অবাধ্যই থাকিলেন। (বাচ্যত্বেন ঈক্ষিতঃ পুরুষঃ সগুণঃ অস্তু তত্র গৃহীতশক্তয়ো বেদাঃ শুদ্ধে পূর্ণে বাচ্যলক্ষণয়া (পর্যবস্যেয়ুঃ)। এই প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে সূত্রকার পরবর্তী সূত্রদ্বারা উত্তর দিতেছেন। (ইতি চেৎ তত্রাহ)

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।। ১।২।৬

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ ঃ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন, "সৃষ্টির পূর্বে পুরুষবিধ আত্মাই ছিলেন" (আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ)। ঐতরেয় শ্রুতি বলেন "সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। প্রকাশমান অন্য কেহই ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু লোক সৃষ্টি করিবেন"। (আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।) উক্ত উভয় মন্ত্রেই সৃষ্টির পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁহাকে 'আত্মা' বলিয়াছেন। (সৃষ্টেঃ পূর্বস্য পুরুষস্য আত্মশব্দেন অভিধানাৎ আত্মশব্দস্য পূর্ণে ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্ততা প্রাগভানি) আত্মা পদে পরব্রহ্মকেই বুঝায় একথা আমরা পূর্বে জন্মাদ্যধিকরণে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও কহিয়াছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন শব্দদ্বারা তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"শুদ্ধমহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয়-ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে।।"

হে মৈত্রেয়, শুদ্ধ পরমৈশ্বর্যবিশিষ্ট সর্বকারণ-কারণ পরব্রহ্মই ভগবৎ শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিসকল পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মেরই বাচ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (পূর্ণস্য বাচ্যতা)। অব্যাচ্য বস্তু কখনও শব্দবাচ্য নহেন (ন হ্যবাচ্যঃ শব্দিতুং শক্যঃ)।

শব্দবাচ্য ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ নহেন—এই পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর করিয়া স্থাপিত হইতেছে পরবর্তী সূত্রে।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ। ১/১/৭

ব্রহ্ম সগুণ নহেন পূর্ববর্তী সূত্র হইতে 'নহে' [ন] এই সূত্রে ও পরবর্তী চারিটি সূত্রে অধিকৃত হইবে। ব্রহ্ম সগুণ না হইবার পক্ষে কারণ উপন্যাস করিতেছেন—"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।" ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয় এমন উপদেশ শাস্ত্রে আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২/৭ মন্ত্রে কহিতেছেন—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত।"

এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্বে ছিল না (সূক্ষ্মরূপে বিলীন ছিল), পরে ব্রহ্ম হইতে এই স্থূল বিশ্ব উৎপন্ন। ব্রহ্ম স্বয়ংই আত্মাকে স্থূল মহদাদিরূপে প্রকাশ করেন।

এই কথা বলিয়া উক্ত শ্রুতিমন্ত্র আরও জানাইতেছেন, সর্বদ্রষ্টা সর্বভোক্তা স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জীব যখন ঐকান্তিকী ভক্তি করে, তখন সে মুক্তি লাভ করেন। (যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।)

এইরূপে পরব্রহ্মে ভক্তিমান্ (তন্নিষ্ঠস্য) জীবের বিমুক্তিকথন হেতু (মোক্ষোপদেশাৎ) ব্রহ্ম সগুণ নহেন। কেননা, ব্রহ্মের গৌণত্বে তদ্ভক্তের মোক্ষোপদেশ হইত না। (তস্য গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তিঃ ন ভূয়াৎ।) শ্রীমদ্ভাগবতে নির্গুণ পরমাত্মাই মুক্তিহেতুরূপে উক্ত হইয়াছেন।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ।।"

শ্রীহরিই মায়োপাধিবর্জিত অতএব নির্গুণ। তিনিই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ তিনিই সকল জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ, তাঁহাকে ভজনা করিয়া জীব গুণাতীত হইয়া থাকে।

হরি নির্গুণ, এমন কি তাঁহার ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিও নির্গুণ। সগুণের ভজন করিয়া নির্গুণতা প্রাপ্তি কুত্রাপি সম্ভবে না। শব্দবাচ্য বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যে সগুণ নহেন, নির্গুণই, পরবর্তী সূত্রে ইহার অপর কারণ বিন্যাস করিতেছেন—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ। ১/১/৯

হেয়ত্ব অবচনাৎ। শব্দবাচ্য ব্রহ্ম যে—সগুণ বলিয়াছেন বা পরিত্যক্তবৎ, তদপেক্ষা বড় কোনও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণীয় এইরূপ কোন উক্তি শ্রুতিতে নাই (অবচনাৎ)।

শব্দবাচ্য জগৎকর্তা ব্রহ্ম যদি সগুণ হইতেন তাহা হইলে জাগতিক স্ত্রীপুরুষ অন্যান্য দশজনের মতই হইতেন। বেদান্তবাক্য সকল জীবকে সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশকালে জাগতিক বস্তুজাত হেয় বলিয়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সগুণ হইলে তাহাও জাগতিক বস্তুর মত একটা কিছু হইত এবং বেদান্তবাক্যও সগুণ ব্রহ্মের হেয়ত্ব কীর্তন করিতেন ('যদ্যসৌ জগৎকর্তা গৌণঃ স্যাত্তর্হি সাধনোপদেশিযু বেদান্তবাক্যেযু স্ত্রীপুংসাদেরিব হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ') কিন্তু তাহা কোথাও বলেন নাই (ন চৈবম্ অস্তি)।

গুণাতীত হইবার জন্যই মুমুক্ষু ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ব্রহ্ম ভিন্ন সকল সগুণ বস্তুকেই হেয় বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে। (তদ্ভিন্নস্য তু গৌণস্য তদুচ্যতে)। শাস্ত্র হেয়বিষয়ক আলোচনা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" অন্যা শব্দের অর্থ বলিয়াছেন হরিভিন্ন বিষয় (অন্যা হরীতর-বিষয়া বাচঃ)। হরি ভিন্ন অন্য বিষয়ক বাক্যই হেয়, তাহাই পরিত্যক্তব্য।

বিশ্বকর্তৃত্ব হইবার জন্য ব্রহ্মের নির্গুণত্ব হানি হয় না। ব্রহ্মে সৃষ্টিকর্তৃত্ব শুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠই। সত্যত্ব জ্ঞানত্ব অনন্তত্ব বিশিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ থাকেন জগৎকর্তৃত্ব বিশিষ্ট হইয়াও তেমনই নির্গুণ থাকেন। ('কর্তৃত্বঞ্চেদং শুদ্ধনিষ্ঠম্ অতঃ সত্যত্বাদিরিব মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বং বোধ্যং

জীবন-দর্শন নাই, তাহাদের গতিবিধি পাগলের অসম্বন্ধ চাঞ্চল্যের সহিত তুলনীয়। দর্শন হারাইলে জাতির জীবন মরুময় হইয়া উঠে, কল্যাণের পথ সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। ভারতকে জাগিতে হইলে ভারতীয় দর্শনের জাগরণ চাই-ই। হয়তো তত্ত্বজ্ঞ সাধক দার্শনিক হইবেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ থাকিবে সমগ্র সমাজ।

আমরা যখন চলি তখন কেবলই চলি না, একটু থামি একটু চলি। ঘড়ির কাঁটার মত একটু চলি, একটু থামি—এইভাবে অগ্রসর হই। দার্শনিক চিন্তাও সেইরূপ সিদ্ধান্ত ও বিরোধ—এই দুই পায়ে চলে ও সমন্বয়ে একটু থামে। পরে সমন্বয়ই সিদ্ধান্তে দাঁড়ায়, নব বিরোধের উদ্বোধন হয় ও নবীন সমন্বয়ে স্থিতি হয়। দার্শনিকের এই-ই যাত্রাপথ। ভারতীয় প্রাচীন সিদ্ধান্তের সর্বপ্রথমে প্রবল শক্তিশালী বিরোধিতা আসে বৌদ্ধ দর্শন হইতে। ভারতীয় দর্শন হইতে জন্ম লইয়া সে তাহাকেই আক্রমণ করে। এই দুয়ের সংঘর্ষে উদ্ভূত নূতন দর্শনের যুগই ভারতীয় দার্শনিকতার স্বর্ণযুগ। বিরোধী বৌদ্ধ দর্শনকে আত্মসাৎ করিয়া আচার্য শঙ্কর আনিলেন বিরাট্ সমন্বয়, অদ্বৈতবাদের পতাকাতলে। কিছুকাল যাইতে না যাইতে সমন্বয় সিদ্ধান্তে দাঁড়াইল, ক্রমে আবার ঘরের মধ্যেই বিরোধিতা পুঞ্জিত হইতে লাগিল। পুঞ্জিত বিরোধিতা রূপ পাইল রামানুজের শ্রীভাষ্যে। আগে পাছে বহু খণ্ডযুদ্ধ ও সন্ধি। ন্যায়ামৃত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি এক একটি বিরাট্ যুদ্ধক্ষেত্র, পাণিপথ-পলাসী হইতে কোন অংশে ছোট নহে। চিন্তা-রাজ্যে এই যুদ্ধ ও সন্ধিতেই প্রাণবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুদিন যাবৎ ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ ও সন্ধি নাই। তাই বলিয়াছি, জমি অনাবাদী। বিরোধী পক্ষগুলি এ ওর দিকে তাকাইতেছে অসহনীয় উদ্বেগ লইয়া, যুদ্ধও নাই সন্ধিও নাই। আমাদের জীবন-পথ দুঃখময় হইবার ইহা এক গভীরতম কারণ।

ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তারাজ্যে বর্তমানে তিনটি প্রবল বিরোধী ধারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চাহিয়া রহিয়াছে। একটি শঙ্করীয় মায়াবাদ—ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা; একটি মহাপ্রভুর ভাগবতীয় জীবনবাদ—ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য; অপরটি পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ—ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎ সত্য। ইহারা দাঁড়াইয়া আছে বলিয়াই মর্মন্তুদ বেদনা। যুদ্ধ করিলেও ভাল হইত, সন্ধি করিলেও ভাল হইত। দার্শনিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও সন্ধির সমান মূল্য। যুদ্ধ হইলেই সন্ধি অনিবার্য। সন্ধি হইলেই নূতন যুদ্ধের আয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধ ও সন্ধির মাঝেই দার্শনিকের শান্তি। যুদ্ধ, সন্ধি ও শান্তি লইয়াই জীবনের ভাবসঙ্গীতের লয় যতি সোম। ইহাই ব্রহ্মতাল বা জীবনের গতিতাল। সেই তাল কাটিয়া গিয়া প্রতিপদে বিভ্রান্তি দেখা দিতেছিল। এই 'উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি বিরোধিতায় সন্ধি করিয়া, সোমে আসিয়া, সমন্বয়ের সান্ত্বনা আনিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

একই প্রস্থান-ত্রয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে শঙ্করীয় মায়াবাদ ও ভাগবতীয় জীবনবাদ। একই সরলরেখার একই বিন্দুতে দুইটি সরল রেখা দণ্ডায়মান অথচ কোণগুলি সমকোণ হইয়া মিলিয়া যাইতেছে না—ভাবনা রাজ্যে এতদপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা আর ঘটিতে পারে না। এই গ্রন্থে সেই বেদনা নিরাকরণের চেষ্টা হইয়াছে—পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের পটভূমিকা উপেক্ষা না করিয়া। উপনিষদের জ্ঞান-ভাণ্ডার দেখা হইয়াছে দ্রষ্টা শঙ্করের দৃষ্টিকোণে দাঁড়াইয়া। ভাগবতের রসভাণ্ডার আস্বাদিত হইয়াছে রসিক ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের আনুগত্য লইয়া। বস্তুবাদ আলোচিত

হইয়াছে Jeans প্রমুখ মনীষিবর্গের নব বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে। এ যেন লুক্কায়িত স্বর্গলক্ষ্মীর সন্ধানে দেবাসুর মিলিয়া সাগর মন্থন। ফলে, গভীরতম তলদেশে যে সমন্বয়ের অমৃত-প্রবাহ তাহাই ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহা দৈবসম্পদে বলীয়ান্। দেবতাগণের ইহা উপভোগ্য বস্তু। বিরুদ্ধবাদী যদি কেহ বলেন, অমৃত উঠে নাই। না-ই বা উঠিল। দার্শনিকের রাজ্যে ধ্যানই সমাধি, সাধনাই সিদ্ধি, চেষ্টাই কৃতিত্ব।

কেহ যদি বলেন বিষ উঠিয়াছে—অথবা, আরো মন্থন করিয়া বিষই তোলেন—তুলিলেনই বা। এ যে দার্শনিক দেবাদিদেবের ডিস্‌পেনসারী, হেথায় বিষ ও অমৃত কাঁচের আলমারীর কণ্ঠে দুই-ই সযত্নে রক্ষিত রহিবে। এই সন্ধির পরে আবার কেহ যুদ্ধের সাজে সাজুক, আবার যুদ্ধ বাঁধুক—ভারতীয় দার্শনিকতা জীবন্ত হউক, গভীরতম ভূমি হইতে ঋষি-সাধনার সত্য ফুটিয়া উঠুক, সৌরভে অলি ছুটিয়া আসুক—ইহাই তো অন্তরের সাধ।

এই গ্রন্থের মূলে ভাবনা আছে, সাধনা আছে, সর্বোপরি পরম দেবতার করুণা আছে। এই ভাবনা অপরকে ভাবুক করুক। এই সাধনা অপরকে সাধক করুন। ঐ করুণার স্পর্শে সকলে সঞ্জীবিত হউক। ইহাই অন্তরের প্রার্থনা।

গ্রন্থকার নিজেকে গ্রন্থকার মনে করেন না। তিনি মনে করেন, সকলই পরম-দাতার দান—তিনি নিজে সঙ্কলয়িতা মাত্র। সঙ্কলন করিয়া তিনি গ্রন্থ আমার অযোগ্য হস্তে সমর্পণ করেন—সঙ্কলনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকটন করিবার জন্য। আমি কিন্তু কিছুই করি নাই। উদ্যানের পুষ্প মালী চয়ন করিয়াছে। আমি লইয়া তোড়া বাঁধিয়া বহু বাজারের বিপণিতে সাজাইয়াছি মাত্র। তোড়া বাঁধিবার তারটুকু ছাড়া আমার আর কিছু দিবার ছিল না। আমার বিশ্বাস, এই স্তবকগুলির স্তবগাঁথা কেবল স্তাবকেরা নহে, অনুভবী গায়কেরা সবাই গাহিবেন। লক্ষ পথচারীর মধ্যে দু'-পাঁচটি গ্রাহক হয়তো বা যথাযথ অর্ঘ্য দিয়া ঠাকুর-পূজায় অর্ঘ্য দিতে জীবন-কুটীরে লইয়াও যাইবেন।

যাঁহারা জীবন ভরিয়া "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" আবৃত্তি করিয়াছেন, অথচ অদ্বৈতবাদের আচার্য শঙ্করের নামে ভীত হইয়াছেন, তাঁহারা আজ অদ্বৈত ভিত্তিতে ব্রজদুলালকে দেখিয়া নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হইবেন।

যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবানের লীলাকে মায়োপহিত চৈতন্যের প্রকাশ জানিয়া ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের পর্যায়ে স্থান দিয়াছেন—তাঁহারা আজ নিশ্চয়ই স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাকে সর্বতোভাবে পরম পারমার্থিকরূপে উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া "ব্রহ্মণোহপি প্রতিষ্ঠাহম্" মন্ত্রের সার্থকতানুভবনে চমৎকৃত হইবেন।

যাঁহারা প্রেমিক, হৃদয়ে যাঁহাদের প্রেম আছে, অথচ কি উপনিষদের জ্ঞানভাণ্ডারে, কি বিজ্ঞানের বস্তুভাণ্ডারে কোথাও প্রেমের নাম-গন্ধ না দেখিয়া মরমে মরিয়া আছেন, তাঁহারা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগলিত আধারে প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমের বিগ্রহ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই পরম সুখবোধ করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের আদর্শ মানুষটিই যে নিখিল রসের নায়ক, অনন্ত জীবের জীবন-

দোলার মূলে যে তাঁহার হিন্দোলা, এই তত্ত্ব উপনিষদ্-দ্বারে সমর্থিত ও সিদ্ধান্তিত দেখিয়া, সাহিত্য-সম্রাটের উত্তরাধিকারী রসিক সাহিত্যসেবীরা (বিশেষতঃ যারা কৃষ্ণচরিতের আদর্শ মানুষটিকে ভালবাসিয়াছিলেন) নিশ্চয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন।

ভাবীকালের ভারতের যাহারা নাগরিক ও নেতা তাহারা যখন বিদ্যার্থীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউলের আড়ালে দর্শনচর্চা-নিরত, তখনই যদি ভারতীয় ভাবনার, ভারতীয় সাধনার পরম চরম তত্ত্বগুলির সমন্বয় বুদ্ধির মধ্যে অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক ও সুযোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইবেন—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তরণীর কর্ণধারগণও হয়তো বা সোৎসুক দৃষ্টিতে একটিবার এদিকে তাকাইয়া আশায় উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত করিবেন।

নীরব দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যাঁহাদের প্রাণের দেবতা তাঁহারা, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্বে তাঁহারই শ্রীহস্তে উপ্ত একটি স্নেহকরুণার বীজ—'উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ' রূপে ফলপুষ্পে সুশোভিত মহা মহীরূহ আকারে বিরাজমান দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীকণ্ঠোক্ত একটি মহনীয় মহাবাণীর মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব-রহস্য সম্পুটিত দেখিয়া নিশ্চয়ই অনির্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন।

ঈদৃশ দু'পাঁচটি গ্রাহক হয়ত এ পুষ্পগুচ্ছের অনুগ্রাহক হইবেন, এই আশায় বহু বাজারের বিপুল শাস্ত্রভাণ্ডারের পার্শ্বে এ ক্ষুদ্র বিপণি খুলিলাম। পাছে, ক্ষুদ্রতায় ঢাকা পড়ে, এই ভয়ে অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ শ্রীমধুসূদনের সাইন বোর্ডখানি টাঙাইয়া দিলাম। একটি বার নয়ন না দিয়া কোনও পথচারী পাশ কাটাইতে পারিবেন না।

"বংশী-বিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদ্ অরুণ-বিম্ব-ফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ, কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।"
বংশীকর-পীতাম্বর-বারিদ-বরণ। বিম্বাধর-মনোহর-নলিন-নয়ন।।
চন্দ্রমুখ-চিত-সুখ গোপীচিত-চোর। কৃষ্ণ হ'তে পর তত্ত্ব জ্ঞাত নহে মোর।।

মহাউদ্ধারণ মঠ — দীনহীন
কলিকাতা—১১ — মহানামব্রত

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বেদান্ত

রবি কবির নৌকাডুবি - পারমার্থিক কথা সবই*

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। কোন ভক্ত গৃহে আছি। রাত্রে প্রসাদ গ্রহণান্তে নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিতে গিয়াছি। দেখিলাম পার্শ্বে একটা টেবিলের উপর একখানা বই। নামটা 'নৌকাডুবি।' লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নভেল নাটক পড়ি নাই। তবু কেন পড়িবার কৌতূহল জাগিল। রাত্রি

* *'রবি কবির নৌকাডুবি পারমার্থিক কথা সবই' (পুস্তিকা)। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ট্রাস্ট। ১ম সং ১৯৮৯।*

১০টা হইতে ২টা পর্যন্ত বইখানি পড়িয়া শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। ঘুম আসিল না—কেবল ভাবিতে লাগিলাম—নৌকাডুবিতে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রের জীবের সাধন-ভজনের একটি অপূর্ব রূপায়ণ।

কয়েকদিন পর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে সভা। বিরাট্ সভা। অনেক গুণীমানী রবীন্দ্র-প্রেমিকদের সমাবেশ। অনেক বক্তা। আমার বক্তব্য বিষয় 'রবীন্দ্রকাব্যে উপনিষদ্'। আমি নৌকাডুবি বইখানার মধ্যে সেদিন রাতে যাহা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। সুনীতি চাটুজ্জে আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "কবি বাঁচিয়া থাকিলে আপনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেন। নৌকাডুবির মধ্যে আপনি যাহা দেখিয়াছেন আমরা তা দেখি না। আপনি কবির হৃদয়ের গুপ্ত সংবাদ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। আমরা সকলে উল্লসিত।" এই সভাতেই, আজ যিনি আমার পরম বন্ধু সেই শিশির ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বক্তৃতায় তিনিও মুগ্ধ। সেদিনকার বক্তৃতার সারমর্ম—

প্রত্যেক মানুষেরই নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। মায়ার সাগরে আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। ফলে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বামী যে নলিনাক্ষ বা পদ্মপলাশলোচন হরি তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রকৃত স্বামী যে নয় সেই রমেশের হাতে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমরা প্রত্যেকেই কমলা। কৃষ্ণকে ভুলিয়া মিথ্যা রমেশকে আপনজন মনে করিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি। কিন্তু রমেশ জানে আমি তার নিজ জন নই। আমি সংসারকে জড়াইয়া ধরিতে চাই। কিন্তু সংসার আমাকে চায় না। আমার কাজকর্ম, কর্মের ফল সবই সংসার চায় ও লইয়া যায়। কিন্তু আমাকে চায় না।

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।" আমার ফসল সংসার সমাজ নিয়া যায়; কিন্তু আমার স্থান নাই। কত সহস্র লোক জন্মিতেছে মরিতেছে। সংসার কাহারও খোঁজ-খবর নেয় না। যে দানটুকু তার মূল্যবান সেইটুকু শুধু সঞ্চয় করিয়া রাখে।

সংসারকে সত্য বলিয়া আমি তাকে ভালবাসিতে চাই কিন্তু সংসার আমাকে এড়াইয়া চলে। কমলা চায় রমেশের সান্নিধ্য—রমেশ প্রতিনিয়ত কমলা হইতে দূরে থাকে।

অনেক সময় আমাকে লইয়া সংসার লজ্জাস্পদ বা অপমানিত হয়। তাই আমাকে লইয়া দেশে বিদেশে ঘুরে কিন্তু কোথাও রাখিয়া সোয়াস্তি পায় না। কারণ আমি তার পালিত জন। আমার প্রতি তার কর্তব্য আছে। কিন্তু আমার তার প্রতি আপন-করা প্রেম নাই। রমেশ কমলাকে লইয়া কোথায় যাইবে ভাবিতে ভাবিতে গোয়ালন্দ গিয়া পাটনাগামী এক ষ্টীমারে উঠিল।

পথিমধ্যে ষ্টীমারেই চক্রবর্তী খুড়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই খুড়ো সাধিকা কমলার গুরুস্থানীয়। চক্রবর্তী কমলার বেদনা অনুভব করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে সচেষ্ট। কৃষ্ণহারা জীবের দুঃখে সদ্গুরু বিচলিত।

খুড়ো মহাশয়ের কন্যা শৈলজার সঙ্গে কমলার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। শৈলজা ও তার স্বামীর সংসার যেন সাধকের পক্ষে সাধুসঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রিয় গান—

"মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম.
শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,·
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থ নিবাসী জনে।
যদি দেখো পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোঁহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে তার শাসনে।।
মন চল...."

সাধুসঙ্গের ফলে কমলা ক্রমে অনুভব করিতে পারিল যে, কিছু বস্তু হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। শৈলজা ও তার স্বামীর প্রীতিময আচবণ ও দৈনন্দির কাজকর্ম ও ব্যবহার ছিল অতি মধুর। শৈলজার স্বামীসেবা অতি প্রেমময়। এইসব দেখিয়া কমলা বুঝিতে লাগিল পতি-পত্নীর সংসার কত সুখময়, কত সোহাগ সেবাময়। সে নিজে যে এমন একটি বিযয হইতে বঞ্চিতা তা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিল।

সাধু-ভক্তেরা যে কৃষ্ণসেবা করে ও তাহাতে পরমানন্দ লাভ করে—তদ্দর্শনে সাধকের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-লালসা জাগিয়া উঠে। সাধুসঙ্গের এই তো ফল। সাধুসঙ্গের ফলে মানুষ বুঝিতে পারে যে, সংসারটা নশ্বর, অনিত্য, অতি নীরস ও শুষ্ক। শান্তি আছে হরিসেবায় হরিভজনে। সংসারের সঙ্গে মিথ্যা সম্বন্ধ। হরির সঙ্গেই নিত্য সম্বন্ধ। শৈলজার সঙ্গে যদি কমলা ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকে ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপর না পড়িত তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে সাধককে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। রমেশের সাধ্যবস্তু লাভের পথে অক্ষয় যেন এ জাতীয় একটি বাধা। কিন্তু নিষ্ঠাবান সাধকের কাছে কোনো বাধাই বাধা নহে। রমেশের একনিষ্ঠতার কাছে অক্ষয়কে তাই হার মানিতে হইল।

রমেশ একদিন তার এক প্রিয়জনের কাছে এক পত্র লিখিয়াছিল—তাহাতে লেখা ছিল যে, কমলা তার পত্নী নহে। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে কোন অপর ব্যক্তির পত্নীকে বালুচরে পাইয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়া সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে যে, কমলার স্বামী নলিনাক্ষ নামক এক ডাক্তার। সে রংপুরে ডাক্তারী করিত। কিন্তু রংপুরের কোন লোকই তাকে চেনে না। রমেশের পকেট হইতে ঐ চিঠিখানা অতর্কিতে পড়িয়া যায়। কমলা ঐ চিঠি পড়িয়া জানিতে পারে তাহার স্বামী নলিনাক্ষ। 'নলিনাক্ষ' নামটি কমলার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল—এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ হইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। মনে হইল তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল—"শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়। আমি দেখিতেছি সে আছে। আমারই আছে।" (কবির নিজ ভাষায় বলিলাম।)

পূর্বে বলিয়াছি নলিনাক্ষ বলিতে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণকে বোঝায়, ভক্ত সাধক কৃষ্ণ নাম শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। আছেন। নিশ্চয়ই আছেন, তাঁহাকে পাইবই। পাইতেই হইবে বৈষ্ণব কবির ভাষা—"কৃষ্ণকৃপা করিবেন দৃঢ় করি মনে।"

কমলা রমেশের মিথ্যা সংসার ছাড়িয়া পালাইল। কেহ তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। রমেশ ও খুড়োমহাশয়েরা সকলে নানাপ্রকারে তার অনুসন্ধান করিল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কমলার কঠোর সাধনা আরম্ভ হইল। নলিনাক্ষ নলিনাক্ষ জপিতে জপিতে কমলা চলিল। রাত্রি হইল। এক গাছতলায় পড়িয়া রহিল। একটি নৌকা যাইতেছিল, এক বৃদ্ধা মহিলা তাহাকে দেখিয়া নৌকায় তুলিয়া কাশীতে পৌঁছিল।

এই বৃদ্ধা মহিলার নাম নবীনকালী। খুব বড় লোক। স্বামী মুকুন্দবাবুর সঙ্গে সে বাস করে। নবীনকালী কমলাকে চাকরাণী ও রাঁধুনী করিয়া রাখিল। পূর্বের চাকর রাঁধুনী সব বিদায় দিল। কমলা অতি কষ্টে তার কঠোর আচরণ সহ্য করিয়া দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল।

নবীনকালীর স্বামী মুকুন্দবাবু অসুস্থ। তাহাকে দেখাইবার জন্য নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকা হইল। দাসী কমলা দূরে দাঁড়াইয়া তাকে দর্শন করিল। নলিনাক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন কবি—"নলিনাক্ষ আশ্চর্য তরুণ, সুকুমার, যুব বয়সেও যেন শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য তাহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।" বর্ণনায় বুঝা গেল নলিনাক্ষ ঈশ্বর-কোটি থাকের।

কমলা নলিনাক্ষকে দর্শন করিয়া পুলকিতা হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল "আমার মত হতভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মত এমন সৌম্য, নির্মল, প্রসন্নসুন্দর মূর্তি! ওগো ঠাকুর! আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে।" প্রথম ভগবদ্ দর্শনে স্ফূর্তিতে স্বপ্নের মতো আবেশে ভক্ত

মুখনিঃসৃত বাক্য বটে। কমলা আরও বলিল—তোমার শ্রীচরণ দেখিয়া লইতে এইখানে পরের দ্বারে দাসীত্ব লইয়া আবদ্ধ হইয়া আছি। সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তবু জানিতে পারিলে না। ভক্তও বলেন, প্রভু! আমিতো তোমারই তবে সংসার-সমুদ্রে এত ডুবাও কেন?

ডাক্তার মুকুন্দবাবুকে পরামর্শ দিয়াছে স্বাস্থ্য-বদলের জন্য মীরাট যাইতে। নবীনকালী তো কমলাকে সঙ্গে নিবেনই। কিন্তু কমলা কাশী ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে রাজী না। নবীনকালী অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যাইবার সময় তাকে তুলিয়া লইবেন। রেলগাড়ীটা যখন কাশীর গঙ্গা পার হইতে পুলের উপর উঠিল তখন কমলা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গাতীরবর্তী কাশী শহরটা একবার দেখিয়া লইল। ঐ শহরের মধ্যে কোন্‌দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ী তাহা সে কিছুই জানে না। এইজন্য রেলগাড়ীর দ্রুত ধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ী, মন্দিরচূড়া যাহা কিছু তাহার চক্ষে পড়িল সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা নন্দিত করিয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

যে কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছে—জগৎটাই তাহার কাছে কৃষ্ণ-মাধুর্য দ্বারা মণ্ডিত হইয়া ওঠে। কমলা এখনও মহাসাধিকা। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণের বিহারভূমি ব্রজ ছাড়িয়া যাইতে হইলে যেরূপ মহাবেদনা হয়, কমলারও কাশী ছাড়িতে সেইরূপ হইল। এইতো সাধকের সাধনার ফল। ব্রজভূমি ছাড়িতে চান না, দূরে গেলেও মানসে ব্রজবাস করেন।

গাড়ীটা মোগলসরাই পৌঁছিলে উমেশের ডাকে মন্ত্রচালিতের ন্যায় কমলা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হঠাৎ ট্রেন ছাড়িয়া দিল। নবীনকালীর শত চীৎকার ব্যর্থ হইল। গাজীপুর থাকাকালে কমলা উমেশ নামক একটি অনাথ ছেলেকে মাতৃস্নেহ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। তাকে পাইয়া তার আনন্দ হইল। উমেশ কমলাকে লইয়া কাশী ফিরিয়া আসিল। আসিয়া এক বাসায় উঠিল, যেখানে খুড়োমশায় ও তাহার কন্যা শৈল আছে। কমলা আবার গুরুসঙ্গ সৎসঙ্গ পাইল। তাহারা কমলার খোঁজে কাশী আসিয়াছে। কেবল ভক্তই গুরুকে খোঁজে না, গুরুও ভক্তকে খোঁজে। ভক্ত অনুসন্ধান করে সাধুসঙ্গ। সাধুসমাজও অনুসন্ধান করে ভক্তজন। তাপতপ্ত জীবের শান্তিবিধানই সজ্জন-সংঘের কাজ।

কমলা কী করিয়া তাহার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষকে লাভ করিবে এই চিন্তায় চক্রবর্তী ও তাহার কন্যা নানাপ্রকার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একটা সুযোগ উপস্থিত হইল।

শৈলজার মেয়ে উমার সামান্য অসুখ করিল। এই অসুখের চিকিৎসার জন্য তাহারা আবার ডাক্তার নলিনাক্ষকে 'কল্' দিল। আবার কমলার সুযোগ হইল নলিনাক্ষকে দর্শন করিবার। ইহার পর তাহাকে সেবা-বাসনা তাহার চিত্তে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। ইষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার সেবায় লাগিয়া থাকিবার বাসনাই সাধকের প্রকৃত ধর্ম। গুরুতুল্য খুড়া চক্রবর্তী মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কমলাকে নলিনাক্ষের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবার। ভক্ত-ভগবানের মিলন ঘটানোই প্রকৃত গুরুর কার্য।

চক্রবর্তী মহাশয় একদিন ডাক্তার নলিনাক্ষের বাড়ী গেলেন। নলিনাক্ষ বাড়ী ছিলেন না। নানা ছলে বাড়ীর মধ্যে গিয়া তিনি নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমঙ্করীদেবীর সহিত পরিচিত হইলেন ও বেশ আলাপ জমাইলেন। ক্ষেম শব্দের অর্থ মঙ্গল। ক্ষেমঙ্করী মঙ্গলময়ী। তিনি সাক্ষাৎ যোগমায়া দেবী।

একদিন সকালে ক্ষেমঙ্করীদেবী গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। এমন সময় কমলাকে সঙ্গে লইয়া চক্রবর্তী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমঙ্করীদেবীকে বলিলেন, ইনি একটি অসহায়া ব্রাহ্মণ-কন্যা। আপনি একে আশ্রয় দিন।

কমলা পরমা রূপবতী ছিলেন। তাহা রূপ দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী অপলক চাহিয়া রহিলেন ও এমন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যা আশ্রয়হীনা জানিয়া আশ্রয় দিতে রাজী হইলেন ও বাসায় লইয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। সাধক এবার যোগমায়ায় আশ্রয় পাইল ও প্রাণ ভরিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। নিত্যই আড়াল আবডাল হইতে স্বামী-সন্দর্শন করিতে থাকিল।

ইতিমধ্যে নলিনাক্ষকে বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়া তাহার মা হেমনলিনীর সঙ্গে সব বিধিব্যবস্থা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নলিনাক্ষর মনের ভিতরে সেই পত্নী, যাকে হারাইয়াছে—হারাইয়া আকুলি বিকুলি করিতেছে। নিশ্চয় বিশ্বাস তাহাকে সে পাইবে। কেবল ভক্তই ভগবানত্বকে খোঁজে না। ভগবান্‌ও প্রিয় ভক্তের জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

যে হেমনলিনীর সঙ্গে ক্ষেমঙ্করী তার পুত্র নলিনাক্ষের বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় ঠিক করিয়া হাতের অলঙ্কার পরাইয়া পাকা কথা দিয়াছিল—সেই হেমনলিনীর সঙ্গে একসময়ে রমেশের খুব ভালবাসা হইয়াছিল। বিবাহ না হইবাব কারণ এই হেমনলিনী জানিয়াছিলেন যে রমেশ বিবাহিত, তাহার ঘরে কমলা নাম্নী একটি পত্নী আছে।

কমলা যে রমেশের পত্নী নহে, ঝড়ে নৌকাডুবির ফলে অন্য কোন ব্যক্তির পত্নী তাহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়ছিল দৈব দুর্বিপাকে, এইকথা হেমকে জানাইয়া দেওয়া রমেশের একান্ত প্রয়োজন ছিল। রমেশ ঐ মর্মে হেমকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল গাজীপুর হইতে। ঐ পত্র রমেশের পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাই কুড়াইয়া পাইয়াছিল কমলা। লিখিত পত্রখানা যে হারাইয়া গিয়াছে তাহা রমেশ জানিত, আর একখানা পত্র লিখিয়া সে হেমনলিনীর টেবিলের ওপর রাখিয়া যায়। হেম সেই পত্র পড়িয়া তার বাবাকে পড়িতে দেয়। বাবা উহা নলিনাক্ষবাবুকে পড়িতে দেন। ঐ পত্রের মর্ম জানিয়া নলিনী অনুমান করেন যে ঐ কমলাই তাহার পত্নী, বিবাহের রাত্রিতে নৌকাডুবির ফলে যাহাকে হারাইয়াছে।

ঐ কমলাকে সে একদিন পাইবেই ইহা নলিনাক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বলেই সে তাহার মায়ের প্রস্তাবিত বিবাহে একান্ত অনুরোধেও নারাজ হইত। কমলা কোথায় তাহা ভাবিত—কিন্তু সে-ই যে হরিদাসী নামে পরিচারিকা রূপে তার নিজগৃহে বিদ্যমান তাহা সে বুঝিতে পারিত না। তবে তাহার পরিপাটী সেবা দেখিয়া তাহার মন কেমন কেমন করিত।

হরিদাসী নাম্নী কমলার নিভৃত সেবা যে কীরূপ প্রাণস্পর্শী ছিল তাহার কবির নিজ ভাযাতেই বলি।

"সেদিন প্রাতে নলিনাক্ষ তাহার উপাসনার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরটি ধৌত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন। ধূনা জ্বালাইবার জন্য একটি পেতলের ধুনুচি ছিল সেটি আজ সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। শেল্‌ফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির যত্ন-মার্জিত নির্মলতার উপরে মুক্ত দ্বারা দিয়া প্রভাত রৌদ্রে উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দেখিয়া স্নান হইতে সদ্য প্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।"

নলিনাক্ষের মা হেমকে বাসায় ডাকিয়াছে। তাহার মতে সম্বন্ধ প্রায় ঠিক। কমলা তাই মানিয়া হেমকে বলিল—"আমরা দুই বোনে মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাষ্টকের—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্"—এই শেষ শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সে দুঃখ মোর সুখবর্য।।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাঁহে হয় দুঃখী?
মুই তার পায়ে পড়ি, লঞা যাউ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করো তারে সুখী।।
যে গোপী মোরে করে দ্বেষে, কৃষ্ণেরে করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস।।"

কমলাও কি এই কথাই বলে নাই? হেমকে লইয়া নলিনাক্ষ সুখে থাকিবে আর সে তাহার সেবাদাসী হইয়া তাহাদের সেবা করিবে।

দুয়ার বন্ধ করিয়া ধূলায় লুটাইয়া কমলা বলিতে লাগিল—"সমস্তই ছাড়িবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। কেবল সেবা করিবার অধিকারটুকু যেমন করিয়া হউক প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিব। ভগবান্ করুন সেটুকু যেন হাসিমুখে করতে পারি। এর বেশী আর কিছুতেই যেন দৃষ্টি না দেই।"

সে আবার সংকল্প করিয়া কহিল—"আমি কাল হইতে যেন কোন দুঃখকে মনে স্থান না দেই, যেন এক মুহূর্ত মুখ বিরস না করি। যাহা আমার অতীত তাহার জন্য যেন কোন কামনা

মনের মধ্যে না আসে। কেবল সেবা করিব—যতদিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব। আর কিছু চাইব না—চাইব না।"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল"—এই সেই শুদ্ধ গঙ্গাজল।

কমলা শয্যায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের মধ্যে মনের মধ্যে আওড়াইতে লাগিল "আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না।"

ঘুম হইতে উঠিয়া জোড়হাত করিয়া কহিল এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল—"আমি আ-মরণকাল তোমার সেবা করিব আর কিছু চাহিব না, চাহিব না।" আর কিছু চাই না শুধু তোমার সেবা চাই। বৈষ্ণবাচার্যেরা ইহাকেই শুদ্ধ গোপীভাব বলেন।

একদিন খুড়োমহাশয় আসিয়া কমলাকে বলিল, মা কমলা তোমার কোন ভয় নাই। ধর্ম তোমার সহায় আছে।

কমলা সব কথা স্পষ্ট করিয়া না বুঝিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিও না। আমাকে এই ঘরের একটা কোণে থাকিতে দাও। আমার কথা ভুলিয়া যাও।

চক্রবর্তী মহাশয় সুযোগ পাইয়া নলিনাক্ষকে বলিলেন—"আপনি আমার হরিদাসীকে পর মনে করিয়া সঙ্কোচ করিবেন না। এই দুঃখিনীকে আপনাব ঘরে আমি রাখিয়া যাইতেছি—ইহাকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবেন।" গুরু ভগবানের দুয়ারে ভক্তকে সমর্পণ করিলেন। কমলার অন্তরের নিরন্তর ভাবনা—

"এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ,
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান—
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ,
রইব চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে,
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান।
সাহস করে তোমার পদমূলে,
আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে,
ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান।
আপনি যদি আমার হাত ধরে,
কাছে এসে উঠতে বল মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা,
এই নিমিষেই হবে অবসান।"

নলিনাক্ষ ঘরে গিয়ে দেখিল কতগুলি গোলাপ সাজানো আছে। ফুলগুলি যেন কাহার চোখের মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের মত তাহাই হৃদয়ের দ্বারা প্রান্তে নত হইয়া রহিয়াছে। ভক্তসঙ্গে মিলিবার জন্য ভগবানের মনের এক মধুময় অবস্থা। যেন বৃন্দাবনের যোগমায়ায় খেলা। "আমি না জানি না জানে গোপীগণ।"

পরদিন সকালে কমলা দেখিল নলিনাক্ষ উপসনা ঘরে। কমলা উপসনা ঘরের দুয়ারে বসিয়া রহিল। হঠাৎ নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কমলা হাটু গাড়িয়া নলিনাক্ষের পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। অন্তরের চৈতন্য আভা দীপ্ত হইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল "আমি কমলা", নলিনাক্ষ তাব হাত ধরিয়া কহিল—"আমি জানি তুমি আমার কমলা। এসো আমার ঘরে এসো।" ভক্ত-ভগবানের মিলন হইয়া গেল।

হরিদাসী কমলা হইয়া গেল, নাকি কমলাই চিরকালের মত পদ্মপলাশলোচন হরির দাসী হইল। কোন্‌টা তার আসল নাম—হরিদাসী না কমলা? ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন—হরিদাসীকেই এতদিন কমলা সাজাইয়া রাখিযাছিলাম।

বৈষ্ণব-বেদান্তের ইহাই তো মর্মকথা! ❑

'যোগের কথা'—পত্রপ্রবন্ধে একটি অভিব্যক্তি

অশেষ প্রীতিভাজন

ড. শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সমীপেযু—

আপনার যোগশাস্ত্রের উপর নিবন্ধ পাঠ করিলাম। ভালই লাগিল। 'বশীকার বৈরাগ্য' সুদুর্লভ। মনে হয় তাই 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' এই সূত্র করিয়াছেন পতঞ্জলি। 'বা' কথাটি মূল্যবান। শুধু ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে। পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু ক্লেশ আশয় ইত্যাদি দ্বারা অপরামৃষ্ট এক বিশেষ পুরুষ। তাঁহার মধ্যে সর্বজ্ঞত্ব আছে। তিনি সকলের গুরুর গুরু—চরম গুরু। তাঁহার বাচক ওঙ্কার। অর্থ ভাবনা পূর্বক ওঙ্কার জপে একই প্রকার ফল হইবে। এই অংশটি সাধারণের পক্ষে সহজ।

অনেকে মনে করেন যোগ মানেই প্রাণায়াম। পতঞ্জলি ঋষির প্রাণায়ামের সহজ অর্থ আমি বুঝি দক্ষিণ ও বাম নাসিকার শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ফাঁক সময়টা একটু একটু করিয়া বড় করা। ইহার একটু একটু আমরা সকলেই করি। তাহাতে শরীর বেশ শান্ত হয়। ইহা সকলেই করিতে পারে।

পতঞ্জলি 'কৈবল্য' অর্থ বুঝিয়াছেন 'বিবেকখ্যাতি'। পুরুষ আর প্রকৃতি যে একেবারে ভিন্ন এই জ্ঞান লাভ করা। পুরুষ অপরিবর্তনীয়, আর প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা এই বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে। তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে। পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিত হইবে।

** দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠ হইতে আলোচিত 'যোগের কথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে।*

বিভূতি পাদের শেষের দিকে লিখিয়াছেন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি সাম্যে কৈবল্য। ইহা সহজার্থে, আমি বুঝি—প্রকৃতির রজঃ গুণটি দূর হইলেই সত্ত্বগুণের প্রবণতা হয়, তখন তমঃও সরিয়া যায়। পুরুষ তো শুধু সত্ত্বগুণময়। তখন পুরুষ আর প্রকৃতিতে কোনও ভেদ থাকে না, সাম্য হয়ে যায়। পুরুষের যে সত্ত্বগুণ—তাহাকে আমরা বলি 'শুদ্ধ সত্ত্ব'। তাহাতে কোনও দিন রজঃ তমঃ গুণ যুক্ত হইতে পারে না। আর প্রকৃতির যে মলিন সত্ত্ব তাহাতে রজঃ তমঃ গুণ যুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রণব মন্ত্র গভীর ভাবে জপের দ্বারা ইহা সম্ভব মনে হয়। তখন প্রকৃতি-পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সমতা হয়। প্রকৃতি-পুরুষ রাধাকৃষ্ণের মত এক হইয়া যায়। তখন কৈবল্য লাভ হয়। পতঞ্জলি ঋষির এই কথাগুলি সহজবোধ্য। সহজভাবে আমরা বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করিতে পারি।

প্রসঙ্গক্রমে মনে হইতেছে অনেকে শংকরের মায়া ও সাংখ্যের প্রকৃতি এক মনে করেন 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' এই রকম একটা কথাও কোনও শাস্ত্রে আছে। আমার মনে হয় ইহাদের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। শংকরের মায়ার শুধু আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি—অর্থাৎ শংকরের মায়ার মধ্যে রজঃ তমঃ গুণই আছে—সত্ত্বগুণ নাই। আর সাংখ্যের প্রকৃতিতে তিন গুণই আছে। তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে রজঃ তমঃ সরিয়া গেলেই প্রকৃতি পুরুষ সাম্য হইয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।"

এই সাম্যজ্ঞানই কৈবল্য। মায়ার মধ্যে সত্ত্বগুণ না থাকায় ব্রহ্মের সঙ্গে কোন কালেই তার মিলন সম্ভব নয়। আর সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণ থাকায় জপাদির দ্বারা তমোগুণ দূর হইলে পুরুষের সঙ্গে এক হইয়া যায়। আমাদের বৈষ্ণবীয় চিন্তায় আমরা এইরূপ ভাবি। এইসব কথা আপনার গ্রন্থে ব্যাসভাষ্যের সহিত যুক্ত থাকিলে বেশী উপাদেয় হইবে বলিয়া মনে করি।

আমাদের ব্যাসভাষ্য পড়া নাই। আপনি ব্যাস ভাষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভাষ্যাদির জ্ঞান ছাড়া পতঞ্জলির সূত্রের যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাই লইয়া আমি চলি। এই কথাগুলি আপনার গ্রন্থে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রভু জগদ্বন্ধু হরি রায় নামক এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান নামক বৈরাগ্য। ইহা বৈরাগ্যের অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল তাহা পরীক্ষার দ্বারা জানিয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। ইহা বৈরাগের দ্বিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন দেখিবে চিত্ত কোন বিষয়েই অনুরক্ত হয় না বা আকৃষ্টও হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অতি অল্প ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কার মাত্র আছে, তখনই জানিবে—একেন্দ্রিয় নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ক্রমে যখন ঐ ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কারজ্ঞান জন্মিয়াছে এবং বৈরাগ্যও তখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার-জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গলোকের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মলোকের স্পৃহাও থাকিবে না। এই বশীকার জ্ঞান যখন দৃঢ় হয় তখনই অনুসন্ধানদ্বারা গোবিন্দকেই আদিপুরুষ জ্ঞাত হইলে

ঐকান্তিকভাবে চিত্ত তাহাতেই আসক্ত হয় এবং ক্রমে পরিপক্ক দশায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

এই বশীকার বৈরাগ্য মনে হয় শঙ্করাচার্যের 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' ইত্যাদি একই কথা। এইরূপ বৈরাগ্য আচার্য শঙ্করের মত লোকেব পক্ষেই সম্ভব। প্রভু জগদ্বন্ধুব মতে এই বৈরাগ্যের ফলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ হয়—প্রভুর মতে ইহাই জীবেব পুরুষার্থ।

আপনার গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। * আপনার পিতার লেখা প্রবন্ধ দুইটি পড়িলাম। খুব ভাল লাগিল। প্রণামের কথা ও সন্ধ্যারূপ উপাসনার কথা মনোহর। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপিলে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার ভূমিকা লেখার ইচ্ছা রহিল। আপনার পিতার বইখানি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল Undershill-এর *'Mysticism'* বইটি তাঁহার খুব আয়ত্তে আছে। ঐ বই খানি খুবই উত্তম, আমার পডা আছে।

জয় জগদ্বন্ধু।

ভবদীয়—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

তন্ত্র ও মাতৃসাধনা
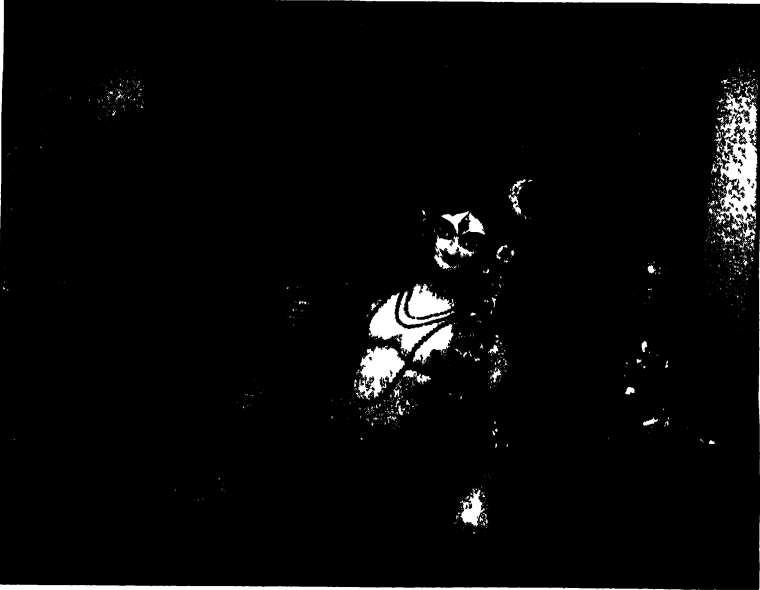
তন্ত্র বিজ্ঞান

পরশুরামকৃত কল্পসূত্রে "ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্।"—১/৪ সূত্র

এই বিশ্বসংসার ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বাত্মক। সাংখ্যদর্শনে যেরূপ ২৫ তত্ত্ব, তন্ত্র দর্শনে ৩৬ তত্ত্ব।

১। **শিব**—সৃষ্টির আদিতে যিনি নিঃস্বরূপে অবস্থিত তিনি শিব। তাঁর ইচ্ছার উদয় হইল "বহু স্যাং প্রজায়েয়" 'আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এই ইচ্ছা শক্তি হইতে আসে জ্ঞান-শক্তি, তাহা হইতে আসে ক্রিয়া-শক্তি। এই তিন যোগের যোগে অর্থ সৃষ্টি ও শব্দ সৃষ্টি। ইচ্ছাশক্তিরূপ উপাধি বিশিষ্ট পরম শিবই শিবতত্ত্ব। উপনিষৎ যাঁহাকে পর-ব্রহ্ম বলিয়াছেন তন্ত্র তাঁহাকেই পরমশিব বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম পরম শিব— নির্গুণ। সৃষ্টির ইচ্ছা জাগিলেই তিনি হন সগুণ—বেদান্তের ঈশ্বর, তন্ত্রের শিব। ইনিই প্রথম তত্ত্ব।

২। **শক্তিতত্ত্ব**—যে ইচ্ছাশক্তির কথা বলা হইল তিনিই শক্তিতত্ত্ব। এই শক্তি শিবনিষ্ঠ অনন্ত শক্তির সমষ্টিভূতা। শক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সামরস্য ভাবাপন্ন শিব-শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত আছেন। প্রত্যেক বস্তুতে স্বপ্রয়োজন সাধিকা শক্তিরূপে শক্তির ও বস্তু স্বরূপে শিবের অধিষ্ঠান। বস্তুতঃ শিবের ধর্মই শক্তি। অগ্নির ধর্ম যেমন দাহিকাশক্তি। শিবের প্রথম স্পন্দনে শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইলে শক্তিতত্ত্ব নামে কথিত হয়।

৩। **সদাশিব**—বিশ্বের সহিত যাঁহার অভিন্ন ভাব তিনি সদাশিব। সদাশিব বিশ্বকে অহং বলিয়া মনে করেন। ঠিক এইরূপ একটি তত্ত্ব উপনিষদ্ স্বীকার করেন নাই। তবে ইহাতে হিরণ্যগর্ভ বা মহাবিষ্ণুর সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

৪। **ঈশ্বরতত্ত্ব**— বিশ্বকে যিনি ইদং বলিয়া মনে করেন তিনি ঈশ্বর। বিশ্বের অহন্তা হইল সদাশিব ও ইদন্তা হইল ঈশ্বর। সদাশিব ও বিশ্ব অভিন্ন। ঈশ্বর ও বিশ্ব ভিন্ন। ভেদপ্রথা প্রবর্তন হইলেই সৃষ্টি, পালন ও সংহারের প্রয়োজন হয়। তখন ঈশ্বর তিন রূপে ক্রিয়াত্রয় সম্পাদন করেন। সুতরাং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র—আলাদা কোন তত্ত্ব নহে। ঈশ্বর-তত্ত্বের তিন ভেদ।

৫। **বিদ্যাতত্ত্ব**—বিদ্যাতত্ত্বে ইদন্তা আর অহন্তা ঐক্যপ্রাপ্ত। আমি জগৎ এই প্রকার যে সদাশিবের বৃত্তি তাহাই বিদ্যাতত্ত্ব। ইনি উপনিষদের উমা হৈমবতী। এই বিদ্যাতত্ত্বের অপর নাম শুদ্ধ বিদ্যা। মল শূন্যা বলিয়া শুদ্ধা। ইনি ব্রহ্মবিদ্যা। ইনি সদাশিবের মহিষী বা শক্তি।

৬। **মায়াতত্ত্ব**—এই জগৎ। ইদং জগৎ। ইহা আমা হইতে ভিন্ন এইরূপ যে ঈশ্বরের বৃত্তি তাহা মায়া। বিদ্যাজন্য হয় অভেদ বুদ্ধি, মায়াজন্য ভেদবুদ্ধি হয়।

৭। **অবিদ্যাতত্ত্ব**— বিদ্যার যেটি আচ্ছাদন শক্তি সেইটি অবিদ্যা। বিদ্যাবিবোধিনী শক্তি

অবিদ্যা। পূর্বে বলিয়াছি—শুদ্ধবিদ্যা বিদ্যাতত্ত্বের অপর নাম, আর অবিদ্যাতত্ত্বের অপর নাম বিদ্যাতত্ত্ব। অবিদ্যাতত্ত্বের অপর নাম বিদ্যাতত্ত্ব—কথাটা শুনিতে কেমন লাগে বটে কিন্তু তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ বিদ্যার বিপরীত বলিয়া বিদ্যাতত্ত্ব নাম। ইহা আসলে অবিদ্যা। কথাটা আরও পরিষ্কার করা যাইতেছে; শিব সর্বজ্ঞ, অতএব সর্বজ্ঞতা শক্তি শিবে আছে। জীব হইল শিবের অংশ; তন্ত্রের ভাষায়—শিবের সঙ্কুচিত অবস্থা। শিবে আছে সর্বজ্ঞতা শক্তি আর তাহা সঙ্কুচিত হইয়া জীবে আছে কিঞ্চিজ্‌জ্ঞতা শক্তি। এই কিঞ্চিজ্‌জ্ঞতা শক্তির নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা শিবভাব অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা আবৃত থাকে। এই জন্য ইহাকে অবিদ্যা শক্তিও বলা হয়।

৮। **কলাতত্ত্ব**—শিবে সর্বশক্তিমত্তা আছে। সেই শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া জীবে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্বশক্তি। এই কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব শক্তিই কলাতত্ত্ব।

৯। **রাগতত্ত্ব**—রাগ শব্দের অর্থ আসক্তি। কোন বিষয় তৃপ্তি অপূর্ণ থাকিলে সেই বিষয় আসক্তি হয়, শিব নিত্যতৃপ্ত। তাঁহার কোন বিষয় আসক্তি নাই। শিবের এই নিত্যতৃপ্ততা শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া জীবে অধিষ্ঠিত হয় অতৃপ্তি বা অপূর্ণ তৃপ্তি রূপে। এই অপূর্ণ তৃপ্তি হেতু জীবের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। ইহাই রাগতত্ত্ব।

১০। **কালতত্ত্ব**—শিব নিত্যবস্তু। তাঁহার নিত্যত্ব শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া যড়্ বিকার যোগে কাল নামে খ্যাত হয়। বিকার ছয় প্রকার—অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে ও নশ্যতি। প্রত্যেক বস্তুর সর্বদাই পরিণাম হইতেছে। অস্তি অর্থ স্বরূপে অবস্থান করা। অবস্থান্তর না হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিলেও তাহাকে সদৃশ পরিণাম কহে। জগতের প্রত্যেক বস্তু এই ছয় প্রকার বিকারের অধীন। এই বলেই লোকব্যবহারে সূর্য-চন্দ্রাদির গতি অনুসারে ত্রুটি লব ঘটিকা দিন মাস বৎসর যুগ মন্বন্তর কল্প প্রভৃতি রূপে বিভক্ত হয়।

১১। **নিয়তিতত্ত্ব**—নিয়তি শব্দের অর্থ নিয়ম। এই কাজের এই ফল ইহার নাম নিয়ম। নিয়মের নামই নিয়তি। শিব কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহেন। শিব সর্বস্বতন্ত্র। শিবের এই স্বতন্ত্রতা শক্তি অবিদ্যা দ্বারা সংকুচিত হইয়া নিয়তি নামে কথিত হয়।

১২। **জীবতত্ত্ব**—জীবাত্মা—সাংখ্যের নাম পুরুষ, গীতার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। শিবের অংশ বলিয়া অপর নাম অণু। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ, সেইরূপ পরমাত্মা শিব হইতে জীবাত্মা আবির্ভূত। জীবাত্মা জন্মমরণ রূপ সংসারাবর্তে ভ্রমণশীল। এই পুরুষ নিয়তি কাল, কলা, রাগ ও অবিদ্যার আশ্রয়।

১৩। **প্রকৃতিতত্ত্ব**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। বুদ্ধিতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি পরবর্তী তত্ত্বগুলি ইহা হইতে অভিব্যক্ত। এই জন্য প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত।

১৪। **মনস্তত্ত্ব**—রজোগুণ প্রধান অন্তঃকরণের নাম মন।

১৫। **বুদ্ধিতত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি।

১৬। **অহংকারতত্ত্ব**—তমোগুণ প্রধান অন্তঃকরণের নাম অহংকার। অহং-এর ক্রিয়া অহঙ্কার।

আমি করি আমি যাই, ইহা আমার ইহা তোমার—এই সব অভিমানের হেতু অহংকার। অহঙ্কারই ভেদবুদ্ধির হেতু। আগে বুদ্ধি, পরে অহংকার, পরে মন এইভাবেও ক্রমনির্দেশ দেখা যায়।

১৭-২১। **পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ** শ্রোত্র—শব্দ গ্রাহক। ত্বক্—স্পর্শ গ্রাহক। চক্ষু—রূপ গ্রাহক। জিহ্বা—রস গ্রাহক। ঘ্রাণ—গন্ধ গ্রাহক।

২২-২৬। **পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়**—বাক্—বাক্যের সাধন।
পাণি—গ্রহণের সাধন। পাদ—গমনের সাধন।
পায়ু—মল বিসর্জনের সাধন। উপস্থ—মৈথুন সাধন।

২৭-৩১। **পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত ঃ** আকাশ—সূক্ষ্ম আকাশ বা আকাশ তন্মাত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়।
স্পর্শতত্ত্ব—বায়ুতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম বায়ু—ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়।
রূপতত্ত্ব—তেজস্তন্মাত্র বা সূক্ষ্মতেজ—চক্ষুর বিষয়।
রসতত্ত্ব—জলতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম জল—রসনার বিষয়।
গন্ধতত্ত্ব—পৃথিবী তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পৃথিবী—ঘ্রাণের বিষয়।

৩১-৩৬। **পঞ্চ মহাভূত**—স্থূলভূত।
আকাশ তত্ত্ব—অবকাশপ্রদ।
বায়ুতত্ত্ব—জীবনীশক্তিপ্রদ।
তেজস্তত্ত্ব—দাহিকা বা পাচিকা শক্তিবিশিষ্ট।
জলতত্ত্ব—দ্রবত্ব তত্ত্বগুণ বিশিষ্ট।
পৃথ্বীতত্ত্ব—আধার শক্তি বিশিষ্ট।

সাংখ্যদর্শনে ২৫ তত্ত্ব। তন্ত্রের ৩৬ তত্ত্ব। তন্ত্রের ১২—৩৬ এই পঁচিশ জীবতত্ত্ব বা পুরুষ হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব পর্যন্ত—সাংখ্যের সঙ্গে একই কথা। সাংখ্য ঈশ্বর মানেন নাই। তাই শিব শক্তি সদাশিব ঈশ্বর বিদ্যা মায়া অবিদ্যা এই সব তত্ত্ব তাহার থাকিবার কথাই নহে। কলা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই তত্ত্ব কয়টি সাংখ্য তাহার পঁচিশের মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে।

তত্ত্ব—তত্ত্ব কথাটি কী—তাহা বলা যাইতেছে। 'তনু বিস্তারে'। এই তন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া তৎ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা সর্বদেশ ও সর্বকাল ব্যাপিয়া আছে তাহার নাম তৎ। ব্রহ্ম সর্বদেশ ও সর্বকাল ব্যাপিয়া আছেন এই জন্য ব্রহ্মের নাম তৎ। তৎ-এর যে ভাব বা ধর্ম তাহার নাম তত্ত্ব। শিব হইতে পৃথিবী ৩৬টি পদার্থ ব্রহ্মের ভাব বা ধর্ম এই জন্য ইহারা তত্ত্ব। তন্ ধাতু ক্ত প্রত্যয় তত। তত-এর সঙ্গে সম্ উপসর্গ দিলে সন্তত। যাহা বহু দেশ ব্যাপিয়া থাকে তাহা তত। যাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল ব্যাপিয়া থাকে তাহা সন্তত। তত্ত্বের লক্ষণ ততত্ব ও সন্ততত্ব।

শিব ও জীব

তন্ত্র প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদী। উপনিষদের মহাবাণী— "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাহার স্বীকৃতি।

পরম তত্ত্ব একটি; দুইটি নহে। তাহা হইতে ৩৬ তত্ত্ব নির্ধারণে শিবতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব দুইটি মানা হইল কী করিয়া এই রূপ প্রশ্ন করিলে তন্ত্রের উত্তর ঃ শিব আর জীব একই। শিবই জীব হইয়াছেন। অভিনয়ে যেমন একজন আর এক জন সাজে। মনে করুন একজন রাজপুত্র একটা ক্ষেপা ফকীরের সাজ নিয়াছে। তখন কী হইলে তাহা সম্ভব হইবে? এমন 'মেক-আপ' দিতে হইবে যাহা হইতে রাজপুত্রকে আর চেনা যাইবে না। একটা ছিন্ন মলিন কাপড়, একটা ছিন্ন মলিন জামা এবং অনুরূপ একটা চাদর দিয়া তাহাকে সাজাইতে হইবে।

শিব যে পোযাক পরিয়া জীব সাজেন তাহার পারিভাষিক নাম কঞ্চুক। তিনটা কঞ্চুকে গা ঢাকা দিয়া শিব জীব সাজেন। আণব কঞ্চুক, মায়িক কঞ্চুক ও কার্ম কঞ্চুক। কঞ্চুক একপ্রকার মল। ময়লা কাপড়ের মত।

শিবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা পূর্ণ। জীবের স্বতন্ত্রতা পরিমিত। এই পরিমিত স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের নাম আণব মল। ভূমা অণু হন যে মল দ্বারা তাহা আণব মল। আণব মলের বৈদান্তিক নাম অবিদ্যা। শিবোঽহং এই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া আণব মল—তাহাকে জীবোঽহং করিয়া ফেলে।

শিব বিশ্ব জগৎ সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মানেন। জীব অগণিত জীবকে নিজ হইতে ভিন্ন দর্শন করে। এই ভেদ জ্ঞান যাহার কাণ্ড তাহার নাম মায়িক মল। শিবের কাছে শুভ অশুভ বলিয়া কিছু নাই। জীব কোন কাজ শুভ জানিয়া করে, কোন কাজ অশুভ জানিয়া করে না। এই শুভাশুভ সংস্কারের যাহা কারণ তাহার নাম কার্ম মল। জীবের যে সুখ-দুঃখ ও জন্ম-মরণ—তাহার হেতু কার্মমল। এই ত্রিবিধ কঞ্চুক বা মল দ্বারা আবৃত হইয়া শিবই জীব হন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ হানি হইল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই আবরণটা শিবকে দেয় কে? 'মেক-আপ্' করে কে? কঞ্চুকটা পরায় মায়া শক্তি। মায়া তো শিবেরই শক্তি। নিজের শক্তি নিজেকে আবৃত করে কী করিয়া? উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত—সূর্যকে আবরণ করে মেঘ, ধূলি, ধূম। সূর্য নিজের কিরণ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মেঘ সৃষ্টি করে, সেই মেঘ তাহাকে ঢাকে। সূর্য নিজ কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে ধূলিময় করে। সেই ধূলা উড়িয়া সূর্যকে ঢাকে। সূর্যের আর অগ্নির তেজ একই তেজ। তেজ একটা বাড়ী পোড়াইয়া বিষম ধূমার সৃষ্টি করে। সেই ধূমা সূর্যকে আবৃত করে। সূর্য নিজের সৃষ্ট বস্তু দ্বারা যেরূপ নিজে আবৃত হন সেইরূপ শিবও মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া জীব হন। এই আবরণটা পারমার্থিক নহে। ঔপাধিক বা ঔপচারিক। "কঞ্চুকিতঃ শিবো জীবঃ, নিষ্কঞ্চুকঃ পরশিবঃ।।"

"স তথা পরিমিতমূর্তিঃ সঙ্কোচিত-সমস্ত-শক্তিরেষ পুমান্
রবিরিব সন্ধ্যারক্তঃ সংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেপ্যপটুঃ।"

সন্ধ্যায় যেমন আরক্ত সূর্য নিজের রশ্মি সংহৃত করেন তখন নিজেকে প্রকাশিত করিতে

তাহার আর শক্তি থাকে না। সেই প্রকার মায়াশক্তি দ্বারা শিবের সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইলে শিবই জীবরূপ ধারণ করে।

বৈষ্ণব মতে জীব ব্রহ্ম-সান্নিধ্য পাইয়াও ব্রহ্ম হইয়া যায় না—তটস্থ শক্তি পৃথক্ থাকিয়া তাহার সেবা করে। তন্ত্র মতে জীবের মুক্তি অর্থ—শিব হইয়া যাওয়া। শিবোঽহং এই জ্ঞানে স্থিত হওয়াই তন্ত্রের মুক্তি। শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের কার্ম মল ও মায়িক মল দূরীভূত হইয়া যায়। বস্তুতে ব্যক্তিতে আমার আমার বুদ্ধি থাকে না। মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি তাহার তিরোহিত হয়। কিন্তু আণব মল সহজে যায় না।

পরম পুরুষার্থ লাভ হইলেই ঐ মল দূর হয় অথবা ঐ মল দূর হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ। বৈষ্ণবদের পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভ। প্রেমে কৃষ্ণসেবা ইহাই তার শেষ প্রাপ্তি। তন্ত্রমতে পরম পুরুষার্থ—শিবোঽহম্ এই অনুভূতি। তন্ত্রে পুরুষার্থের লক্ষণ হইল—

"স্ববিমর্শং পুরুষার্থঃ।"

স্ব অর্থ নিজের, বিমর্শ অর্থ প্রত্যভিজ্ঞা। পরম শিবস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা। স্ব-শব্দের অর্থ আত্মা তাহার প্রত্যভিজ্ঞা অনুভূতি। আমিই সেই শিব এই অনুভব। অবিদ্যার কঞ্চুক দূর হইয়া গেলে শিবত্বরূপ স্বরূপ জীব লাভ করিতে পারে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

কৃপা ভিন্ন উহা লাভ হয় না। আরাধনা ব্যতীত কৃপা লাভ হয় না। সুতরাং আরাধনাই মুক্তির বা পরম পুরুষার্থ লাভের সাধন।

প্রশ্ন হইতে পারে যোগ-সাধন দ্বারা কি মুক্তি লাভ হয় না? যদি হয় তাহা হইলে আরাধনার প্রয়োজন কী? তন্ত্রের উত্তর এই যে, যোগাদি দ্বারা যে মুক্তি হয় তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয়। উপাসনা দ্বারা কৃপা দ্বারা যে মুক্তি তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। উপাসনার প্রধান অর্থ জপ। জপের জন্য প্রয়োজন মন্ত্র। এই জন্য মন্ত্র তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

"মন্ত্রাণামবিচিন্ত্যশক্তিতা।"

মন্ত্র সকল শিবমুখ-নির্গত। তাহার শক্তি অবিচিন্ত্য। এই মন্ত্রের এই শক্তি কেন কীরূপে হইল ইহা লইয়া প্রশ্ন বা তর্ক করিবে না। মন্ত্রের ফল তর্কাতীত। মন্ত্র জ্ঞানাবরক অবিদ্যা নাশে সমর্থ এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

মন্ত্রের সাধনায় দু'টি বস্তুর প্রয়োজন। সম্প্রদায় ও বিশ্বাস। মন্ত্র গুরুমুখাগত। গুরু তাঁহার গুরুর মুখ হইতে পাইয়াছেন—ইহাই সম্প্রদায়। বিশ্বাস অর্থ মন্ত্রের ফলসাধনতা বিষয়ে নিশ্চয়াবধারণ। মন্ত্রের সাধনা করিলে অভিলষিত ফল নিশ্চয়ই হইবে এইমত দৃঢ় অবধারণের নাম বিশ্বাস। আপ্ত-বাক্যই বিশ্বাসযোগ্য। আপ্ত অর্থ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা শূন্য যিনি তিনি আপ্ত। যাঁর বাক্যে ভুল নাই, অনবধানতা নাই, প্রতারণা করিবার ইচ্ছা নাই তিনি আপ্ত। মন্ত্রদাতার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইলে বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। গুরুদেব আপ্ত। তাঁহার গুরুও আপ্ত। পরম্পরা

উপদিষ্ট মন্ত্রের সাধনা করিলে নিশ্চয়ই পুরুষার্থ প্রাপ্তি ঘটে।

সাধকের কতিপয় বিশেষ গুণ বা ধর্ম থাকা প্রয়োজন—

১। ভাবনা দার্ঢ্য। ভাবনার দৃঢ়তা, সুদৃঢ় বিশ্বাস।

২। সর্বদর্শনানিন্দা। কোন শাস্ত্রেরই নিন্দা না করা।

৩। অগণনং কস্যাপি। আমার গুরুপ্রদত্ত পথের বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু বলে তিনি বৃহস্পতি হইলেও তাহার কথা গণনা করিবে না। গ্রাহ্য করিবে না।

৪। সচ্ছিষ্যে রহস্যকথনম্। সৎ শিষ্য ছাড়া কাহাকেও ভজনরহস্য বলিবে না।

৫। সদা বিদ্যানুসংহৃতিঃ। সর্বদা উপাস্য মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিবে। ❐

তন্ত্র

তন্ত্রের গোড়ার কথা

মানুষের জন্মের মূলে জনক-জননী। নিখিল সৃষ্টির মূলে আদি জনক ও আদ্যা জননী, শিব আর শক্তি। শৈব-দর্শনে শিব প্রধান। শক্তি-দর্শনে শক্তিপ্রধান। তন্ত্র শাস্ত্রে দুইই সমান।

শৈব-আগম ও শক্তি-আগম মিলিত হইয়া তন্ত্র-শাস্ত্র। অথবা তন্ত্র-শাস্ত্রে দুইটি ধারা মিলিত শৈব ও শক্তি। শিব ও শক্তি দুই বস্তু যখন স্বীকৃত, তখন মনে হয় তন্ত্র দ্বৈতবাদী। তাহা কিন্তু ঠিক নহে। তন্ত্রে শিব আর শক্তি অভিন্ন। তাহা হইলে কি তন্ত্র অদ্বৈতবাদী? ইহাও ঠিক কথা নহে। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম-সত্য, শক্তি মিথ্যা। তন্ত্রমতে শক্তির বিকাশ জগৎ সত্য।

তন্ত্র তাহা হইলে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদী—'ভেদ-অভেদ'-বাদী? তাহাও ঠিক নহে। কারণ দুইটি বস্তু কোন অংশ ভেদ-বিশিষ্ট, কোন অংশ অভেদ হইলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হয়। যেমন সাগর ও একবিন্দু জল। তাহারা জলাংশে অভিন্ন। পরিমাণে ভিন্ন। সাগর বৃহৎ। বিন্দু-জল ক্ষুদ্র।

শিব-শক্তির সম্বন্ধ এরূপ নহে। কেহ কাহারও অংশ নহে। একই বস্তু। দুই ভূমিকা হইতে দৃশ্যত ভেদ মাত্র।

যখন চলি, তখন কেবলই চলি না। একটু চলি, একটু দাঁড়াই। একটু স্থিতি, একটু গতি। যখন স্থিতি—তখন শিব। যখন গতি—তখন শক্তি। দুই মিলিয়া চলা কর্ম। আরও একটু ভাল করিয়া বলি।

স্থিতি আর গতি দুই আপাতবিরোধী। কিন্তু বাস্তবে নহে। স্থিতি unchangeability, গতি changeability। স্থিতিমান—static, গতিমান—dynamic। একই বস্তু, দুই নয়। স্থিতির দৃষ্টিতে দেখ—শিব। গতির দৃষ্টিতে দেখ—শক্তি। নিষ্ক্রিয়তায় শিব। গতির দৃষ্টিতে দেখ সক্রিয়তায় শক্তি। শিবই সচল হইলে শক্তি। শক্তিই নিশ্চল হইলে শিব। স্থাণু হইলেই শিব, ক্রীড়াময়ী হইলেই শক্তি। শিব শান্ত অচল। শক্তি বেগবতী চলমতি। একই বস্তু দুই দিক্ দিয়া দেখা।

** 'আঙ্গিনা', ৩য় বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংকলন (পৌষ-চৈত্র ১৩৯২)। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৯৩)। 'মহানাম অঙ্গন, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (চৈত্র, ১৩৯৩)। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৯৪)। ঐ, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; (আশ্বিন, ১৩৯৪)।*

আপনি একটি টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া পেন্সিল দিয়া লিখিতেছেন। টেবিলটি অচল, স্থাণু, স্থির, গতিহীন। ইহা আপনি দেখিতেছেন বুঝিতেছেন। আবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া দেখুন—উহার মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন অতি দ্রুতগতিতে অবিশ্রাম চলিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটির ধারা অতি অদ্ভুত। টেবিলটি বস্তুতঃ টেবিলই নয়। অসংখ্য অণু। অণুরও ক্ষুদ্রাংশ পরমাণু। পরমাণুটির মধ্যে অসংখ্যেয় ইলেকট্রিক শক্তি। একটি ইলেকট্রিকের কণা ইলেকট্রন আছে মধ্যস্থলে সূর্যদেবের মত। তার গঠনের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন দুইটি বস্তু আছে। প্রোটনটিকে কেন্দ্র করিয়া ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে। কোনও পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন; যেমন হাইড্রোজেন (Hydrogen)। কোনও পরমাণুতে দুইটি ইলেকট্রন, দুইটি প্রোটন; যেমন হিলিয়াম (Helium)—এইরূপ সাতটি, আটটি, দশটি ও আরো আছে। এই জগতের গ্রহগুলি যেমন ঘুরিতেছে চিরকাল একই কক্ষে—ইলেকট্রনের বেলা তাহা নহে। গ্রহগুলি প্রতি মুহূর্তে তাহাদের ঘুরিবার পথ (orbit)-এ ঘুরিতেছে, কিন্তু পরমাণুর বেলায় প্রত্যেক মুহূর্তে— প্রতেকটি ইলেকট্রন তাহার কক্ষ বদলাইতেছে। অতি দ্রুত বদলাইতেছে। কখন যে বদলাইবে কেহ বলিতে পারে না। যখন বদলাইবে তখন তার বেগ গতিবেগ (speed) কত, তখন অবস্থিতি কোথায় তাহা সঠিক জানা যায় না। এক কক্ষ হইতে আর এক কক্ষে যাইবার সময় তার স্থিতিস্থান ও গতিবেগ দুই নির্দিষ্টরূপে স্থির করা যায় না। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে—মধ্যস্থলে যেন কোথাও থাকে না। speed ঠিক করিতে গেলে position যায়। position ঠিক করিতে গেলে speed-এর খোঁজ পাওয়া যায় না। টেবিলটি সত্য। তাহার মধ্যে দুর্দমনীয় বেগশালী অসংখ্য বৈদ্যুতিক কণাগুলিও সত্য।

স্থির টেবিলটি যেন শিব। ভীষণ বেগশালী বৈদ্যুতিক কণাগুলি যেন শক্তি। শিবও সত্য। শক্তিও সত্য। শিবকে শান্ত রূপ দিয়া শক্তি সত্য। শক্তিকে অন্তরে রাখিয়া শিব সত্য। শবাকার শিব সত্য। বক্ষে নর্তকী কালীও সত্য। কালীকে বক্ষে লইয়া শিব সত্য।

তন্ত্র দ্বৈতবাদী নয়। অদ্বৈতবাদী নয়। দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদীও নয়। তন্ত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তুমি কী বাদী? তন্ত্র বলিবে আমি সত্যবাদী। সত্য কথাটি কী? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে টেবিলটা কোন বস্তু নয়—কেবল শক্তি। Matter আর Energy দুইটি পৃথক্ সত্য নয়। প্রতি মুহূর্তে Matter হইয়া যাইতেছে Energy, আর Energy হইতেছে Matter। শিব শক্তিতে পরিণত হইতেছেন। শক্তি শিবরূপ ধারণ করিতেছেন। শিবই শক্তি। শক্তিই শিব। এ এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় লীলা। চণ্ডীর বাক্যই সত্য।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

আগে বিজ্ঞান বলিত শক্তি (Energy) অচেতন—জড়। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছে বৈদ্যুতিক কণাগুলি জড় কণা নয়—চিৎকণা। শুক্রকীটের মত অণুচৈতন্য। চণ্ডীর বাক্য—"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।" শক্তি চৈতন্যময়ী—সর্বভূতে—সর্বত্র সর্বকালে।

তিনশত বৎসর গবেষণা করিয়া পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আজ তন্ত্রশাস্ত্রের কথাই ঘোষণা করিতেছে। পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক বিজ্ঞান—প্রাচ্যের অতি প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র—উভয় উভয়ের কণ্ঠ ধরিয়া

চলিতেছে, একদিন গিয়া একত্রে পৌঁছাইবে।

তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন তন্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য আধুনিক বিজ্ঞান গলাগলি চলিয়াছে—এ কথা বলিলাম। কিন্তু তন্ত্রের কিছু বিশেষত্ব আছে যাহা বিজ্ঞানের নাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একটি—সত্যকে আবিষ্কার করা। তন্ত্রের উদ্দেশ্য দুইটি—সত্যকে জানিয়া তাহা দ্বারা নিজের ব্যক্তি-জীবনে পূর্ণতা লাভ করা।

অনন্ত বিশ্বময় জড়-চৈতন্যের খেলা চলিতেছে। শিব-শক্তির লীলা চলিতেছে। চলুক—এটা তন্ত্র-সাধকের বড় কথা নহে। তাহার কথা এই যে, ঐ বিশ্বের লীলা আমার দেহের মধ্যে চলিতেছে। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে—তা আছে দেহ-ভাণ্ডে। As above so below.

আমার দেহের মধ্যে শক্তি আছেন। বিশ্বের যিনি মূল শক্তি, তিনিই আছেন 'মূলাধারে'। যিনি শিব তিনিও আছেন। যিনি সহস্র সহস্র ঐশ্বর্যশালী—তিনি আছেন আমার দেহে 'সহস্রারে'। ইঁহাদের মিলন ঘটাইতে হইবে—ইহাই তন্ত্র-সাধকেব সাধনা। পথ খুব দুর্গম। তবে পথের নির্দেশক যাঁহারা তাঁহাদের নির্ণয় বাস্তবতা-ভিত্তিক। কিছু চলিলেই বুঝা যায় যাঁহাদের মিলাইতে চাই—তাঁহারা মিলিবার জন্য আগ্রহশীল, আর আমাকে সহাযতা কবাব জন্য প্রসারিত করুণা হস্ত।

সৃষ্টি-রহস্য

আমি ভারতবাসী। আমি বাঙ্গালী। দুইটি বৈশিষ্ট্যই আছে আমাতে। আগে খাঁটি বাঙ্গালী হইব, তারপর ভারতকে চিনিব, নাকি ভারতকে ভালবাসিযা বাংলার স্থান-স্থিত· পরিণতির অংশীদার হইব? কে আগে? ভাবুন না।

আমি ব্রহ্মাণ্ডে আছি। এই দেহ-ভাণ্ডেও আছি। আগে দেহকে চিনিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে চিনিব অথবা ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অনুধাবন করিয়া পরে দেহভাণ্ডের অনুসন্ধান লইব? ইহা 'পরস্পরার্থম্'।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান খবর ইহার সৃষ্টি-রহস্য। কেহ জানে না। একজন ছাডা আর কেহ জানে না। তবু জানার প্রচেষ্টায় সাধনায় একটি নিরুপম আনন্দ। তাহা ছাড়া যায় না। যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণই সাধনা।

তন্ত্র মতে সৃষ্টির দুইটি স্তর। প্রথমটিকে বলে 'শুদ্ধ'। দ্বিতীয়টিকে বলে 'অশুদ্ধ'। শুদ্ধ সৃষ্টির পাঁচটি কক্ষ— শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধ বিদ্যা। সৃষ্টির আদিতে কিছুই যখন নাই, বেদের ভাষায় "ন সদাসীৎ নাসন্নাসীৎ।" সৎ-অসৎ কিছুই নাই। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। অন্ধকার ঢাকিয়া রাখিয়াছে গাঢ় অন্ধকারকে—তখন কে আছে, কী আছে? আছে চৈতন্যমাত্র। তমঃ-আবৃত চিৎসত্তা। এই চিৎসত্তাই শিব।

শিবের বক্ষে জাগিল আনন্দের স্পন্দন। এই 'স্পন্দন-আত্মিকা' বস্তুই শক্তি। বেদের ভাষায় "স্বধা অধস্তাৎ প্রখ্যাতি পরস্তাৎ।" শিবের অন্তরে জাগিল নিজ সত্তার অনুভূতি। এই "স্ব-সত্তা-অনুভূতি-যুক্ত" শিবই সদাশিব।

সদাশিবের অনুভূতি—"অহম্ ইদম্"। সত্য অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছার স্পন্দন। এই ইচ্ছার স্বগত ভাষা "বহু স্যাম্" ও তৎসহ আত্মসত্তার জ্ঞান। জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত শিবই ঈশ্বর।

তৎপর ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। এই ক্রিয়ার শক্তিই শুদ্ধ বিদ্যা। তখন সত্তার অনুভূতি 'ইদমহম্'। শুদ্ধবিদ্যা দু'টি জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধক।

দু'টি জ্ঞান অহমিদম্ আর ইদমহম্। শুদ্ধ বিদ্যা এই দুইয়ের সমন্বয়কারক।

আমিই জগৎ। জগৎই আমি শিব। এই অর্দ্ধনারীশ্বর হইল শুদ্ধ সৃষ্টি।

তারপর অশুদ্ধ সৃষ্টি। অশুদ্ধ সৃষ্টি আরম্ভ হইল মায়া-স্পর্শ হইতে। মায়া একপ্রকার সংকুচিকা শক্তি। Principle of Limitation. তন্ত্রমতে কঞ্চুক পাঁচটি— কাল, নিয়তি, রজঃ, বিদ্যা ও কলা।

(১) কাল কঞ্চুক— ইহা সীমাবদ্ধ করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— অন্তহীন কাল এই তিনটি কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত হইল। Limitation of unlimited time.

(২) নিয়তি কঞ্চুক— স্থানীয় সীমাবদ্ধতা। অখণ্ড দেশ (Space) তাহা এখান-ওখান সেখান এ-বাড়ি ও-বাড়ি সে-বাড়ি তিন কোঠায় বিভক্ত হইল। Limitation of unlimited space.

(৩) রজঃ কঞ্চুক— তিন প্রকার। অনুরাগ, বিরাগ, ঔদাসীন্য—এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া সকল বস্তু ও ব্যক্তি তিন বিশেষণে বিশেষিত হইল।

কোনও বস্তুর প্রতি আপনি অনুরাগী, কোনও বস্তুর প্রতি বিরাগী, কোনও বস্তুর প্রতি উদাসীন। অনন্ত অগণিত বস্তু বা ব্যক্তি রহিয়াছে। তাহাকে কৃত্রিম তিন ভাগে ভাগ করা হইল।

(৪) অবিদ্যা— জ্ঞানের রাজ্যকে সংকুচিত করিয়া কৃত্রিম তিন ভাগ করে। জ্ঞাতি, অল্পজ্ঞাতি, অজ্ঞাতি।

(৫) কলা— বস্তুর অংশ অনন্ত বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নামে রূপে ভাগ করিল। একই জলকে সাগর, নদী, খাল, পুকুর, ডোবা এই কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করে ফেলা। কলা নামক কঞ্চুকের সংকোচনে শিব হইল জীব ও পুরুষ। আর শক্তি হইল প্রকৃতি।

* * *

যে-পদার্থ প্রলয় পর্যন্ত অবস্থিত থাকে তাহাই 'তত্ত্ব'। এই ছত্রিশটি (৩৬) তন্ত্রের তত্ত্ব। তন্ত্রমতে ৩৬টি তত্ত্ব দেখানো হইল। ইহার মধ্যে 'অবিদ্যা' ও 'মায়া' দুইটি রূপ আছে। অবিদ্যা মায়ারই অন্তর্গত। তবে দুইটিই গণনায় থাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ও মায়া জীব ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান।

নিম্নদিকে শেষ 'ক্ষিতি তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া পরম শিব পর্যন্ত ২৫টি তত্ত্ব কেবলই আরোহণ। সকল তত্ত্বেই অল্পাধিক আবরণভাব থাকিলেও কঞ্চুক আবরণ ভিন্ন ধরণের। ইহা যেন নিম্নস্খলন—নিম্নে অবতরণ। নিয়তি হইতে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বে মায়া, ভেদবুদ্ধি অপসারণ না করিলে, তৎপর বিদ্যাতত্ত্বে না উঠিলে উপায় নাই। বিদ্যাতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষের কঞ্চুকহীন ঐক্য অবস্থা।

শুদ্ধ সৃষ্টির রহস্য বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। শিব—বিশ্ব অতীত, বিকর্তা। যিনি বিশ্বগ, তিনি শক্তি, তিনি সকল, তিনি creative। যিনি বিশ্বাতীত শিব তিনি নিষ্কল। নিষ্কল পরম শিব হইলেন শিবতত্ত্ব। তখন শক্তি হইলেন উন্মনী। উন্মনী শিব তত্ত্বের প্রথম স্পন্দন।

৩৬ তত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। শিবতত্ত্ব ১ ও ২; বিদ্যাতত্ত্ব ৩, ৪, ৫ এবং আত্মতত্ত্ব বাকী ৩১টি। তুরীয় তত্ত্ব সমষ্টি বোধক—এই ৩৬ তত্ত্বের সমষ্টি তত্ত্বাতীত তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে যে শক্তি বিলীন তিনি সরস্বতী তত্ত্ব। 'হংস' তার বাহন। হং = শিব—স-কার শক্তি। হ কার—অহং-এর পর্যায়। স কার ইদং জগৎ পর্যায়। সোঽহং—এই হংসের উল্টা। সোহং—প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের প্রতি সংসরণ করেন। হংস—ব্রহ্ম হইতে প্রপঞ্চের দিকে সংসরণ করেন।

শিবতত্ত্বের মধ্যে অভাবাত্মিক অংশ (negative aspect) শক্তি। অনুভূতির দুইটি বিভাব। অহং ও ইদম্। অহং গ্রাহক। ইদম্—গ্রাহ্য। আত্মা মায়ার মাধ্যমে নিজেকে নিজে জানে। যাকে জানে, সে অনাত্মা। আত্মা অনাত্মাকে জানে। অনাত্মা কিন্তু আত্মাই। মায়া রচিত আত্মাই অনাত্মা। আত্মা যখন স্বয়ং নিজ অভিমুখী, নিজেকে নিজে দেখে তখন আত্মা অহম্। অনন্যমুখং অহম্প্রত্যয়ঃ। মুখ যখন অন্যদিকে নহে, অর্থাৎ নিজের দিকেই মুখ, তখনই আত্মা অহম্।

'যস্তু অন্যোন্মুখঃ স ইদম্প্রত্যয়ঃ'। যখন অন্যদিকে দৃষ্টি, তখনই ইদম্। এই অন্যও আত্মাই। কারণ আত্মা ভিন্ন বস্তু নাই। শুদ্ধ অনুভূতিই আত্ম অনুভূতি।

অহং ও ইদং একই অনুভূতি দুই মুখে। শুদ্ধ অনুভূতি অহম্। অশুদ্ধ অনুভূতি ইদম্।

অশুদ্ধতার কারণ—মায়ার মধ্যস্থতা। পরাসংবিদে অহং ও ইদং একাকার থাকে। শিবতত্ত্বে ইদং বাদ যায়। শুধু অহং থাকে—অহং বিমর্শঃ। ইদং আবার ধীবে ধীরে ব্যক্ত হয়। ক্রমে আবার অহং ও ইদং মিলিত হয়। অহমিদং বিমর্শঃ।

মায়াশক্তি আবার দুইকে পৃথক্ করে। শিব ও শক্তি এই সৃষ্টির বীজ ও গর্ভ। প্রথম প্রকাশকে বলে আভাস। ইহা খানিকটা মায়াবাদের বিবর্তের মত। কিন্তু তন্ত্রে 'আভাস-জগৎ' সত্য। অদ্বৈত-বেদান্তের 'আভাস-জগৎ' মিথ্যা। তন্ত্রে যাহা আভাসবাদ, শঙ্কর-বেদান্তে তাহাই বিবর্তবাদ।

অনুভূতির দুইটি সীমান্ত। এক প্রান্ত 'পূর্ণ', অপর প্রান্ত 'অপূর্ণ'। একদিকে অসীম পূর্ণতার দর্শন, অপরদিকে সসীম অনুভূতি। তন্ত্র মধ্যে As above, so below। "যদিহাস্তি তন্নান্যত্র। যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ"। অন্তরে বাহিরে একই সত্য। অনাদিকাল যাহা ভিতরে ছিল তাহাই বাহিরে ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বে যাহা "পরা দিব্য অনুভূতি", তোমার আমার মধ্যে তাহাই 'আত্ম অনুভূতি'। যাহা পরম পুরুষের পরা অনুভূতিতে বিদ্যমান তাহাই আত্ম অনুভূতিতে বিরাজমান। পরম শিবের পরা সংবিৎ ও জীব আত্মার আত্মসংবিৎ মূলতঃ একই সত্তার পরা-অনুভূতি ও আত্ম-অনুভূতির মিলনীভূত 'অহং ও ইদং'। প্রকাশ আর বিমর্শ।

জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়, দুই-এর মিলন অনুভূতিতে 'আনন্দ'। জ্ঞাতা—চিৎ, জ্ঞেয়—সৎ। মিলনে আনন্দ। আনন্দেই স্বরূপের বিশ্রান্তি। 'পর-শিব' আর 'পরা-শক্তি' পরম আলিঙ্গনে বদ্ধ। এইখানে অহং ও ইদং তত্ত্ব একাকার। স্ত্রী পুরুষ সম্পরিষ্বক্ত এই দৃষ্টান্ত উপনিষদেও দিয়াছেন। আনন্দ অনুভূতি দেশ-কাল অতীত, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্। এখানে পরা আনন্দই 'পর-নাদ'।

তৃতীয় স্তরে ঈশ্বর তত্ত্ব। ইহাতে ইদংকে অহং স্পষ্ট দেখে। চতুর্থ স্তরে সদ্ বিদ্যা বা শুদ্ধ বিদ্যা। এখানে অহং ও ইদং-এর সমানাধিকরণ। শিবতত্ত্বে অহং, শক্তিতত্ত্বে ইদং। ঈশ্বরতত্ত্বে দু'য়ের সমানাধিকরণ। সমন্বয়—Synthesis।

সদ্‌বিদ্যা, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সৃষ্টির মধ্যবর্তী। ইহার পর অহং ইদং দুইভাগ। এই ভাগের হেতু মায়াশক্তি। ইহার পর মায়াশক্তি আসিয়া বিভেদ সৃষ্টি করিল। ভেদের হেতু হইল 'কঞ্চুক'। তারপর আরম্ভ হইল ইদং সংবিদের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য। ছত্রিশটি (৩৬) তত্ত্বের তিনভাগ—Physical, Psychological ও Spiritual—দেহগত, মনোগত ও আত্মগত। শেষের দিকে ২৪ তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে একই। তবে সাংখ্যের মত তন্ত্রের প্রকৃতি এক নহে। পুরুষ বহু, তজ্জন্য প্রকৃতিও বহু।

পুরুষ পঞ্চবিধ কঞ্চুকের অধীন। কঞ্চুকগুলি মূলতঃ মায়াই—ইহাকে কার্যমায়া বলে। কার্যমায়া ও পঞ্চকঞ্চুককে একত্রে যট্ (৬) কঞ্চুক বলে।

চব্বিশ (২৪) প্রকৃতি, পরিণাম, এক পুরুষ ও যট্ কঞ্চুক—এই একত্রিশ (৩১) হইতে দৈহিক, স্থানিক ও মানস রাজ্য সংগঠিত। প্রথম উক্ত পঞ্চতত্ত্ব—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবিদ্যা—ইহারাই শুদ্ধ সৃষ্টি।

শুদ্ধবিদ্যা মায়ার অতীত। শুদ্ধবিদ্যার অর্থ জগৎ শিবপূর্ণ। জগৎকে যে শিবহীন মনে হয় তাহার কারণ কার্যমায়া।

গুরুতত্ত্ব—

শ্রীগুরুর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র তিনটি—শুদ্ধশিব, ঈশ্বর ও সদাশিব। শুদ্ধবিদ্যা তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী মন্ত্র বিদ্যেশ্বর। ঈশ্বরতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা মন্ত্রেশ্বর। সদাশিব তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা মন্ত্র মহেশ্বর। ঈশ্বরতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বিশুদ্ধ 'চিদ্ আত্মিক'। ঐ স্থানে মন্ত্রেশ্বররূপী গুরু ও গুরুশক্তি একাঙ্গ ভাবাপন্ন।

সদাশিব তত্ত্ব ও তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা শ্রীগুরুর মন্ত্র মহেশ্বর রূপে বিরাজ করেন, সেই স্থানের নাম পরব্যোম।

মন্ত্রেশ্বর ভূমিতে ব্রহ্মাদি চিৎ, অচিৎ ও মিশ্র তিন সগুণ ঈশ্বর এবং চিৎ স্বরূপ নির্গুণ সাক্ষীভূত চতুর্থ ঈশ্বর বিরাজ করেন।

মন্ত্র মহেশ্বর ভূমিতে সৎস্বরূপ পঞ্চম ঈশ্বর আছেন। তাহার উপর আনন্দভূমিতে ষষ্ঠ ঈশ্বর আছেন। ষষ্ঠ ঈশ্বর হইলেন পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির একীভূত রূপ।

ঐ আনন্দভূমির অধিষ্ঠাতা আনন্দনাথ হইলেন শ্রীগুরু। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে অনন্ত

আনন্দলোক চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে। ইহার উপরে যাহা, তাহা 'অলখ'। পরব্রহ্মের অসীম অনন্ত অব্যক্ত সত্তা।

*   *   *   *

নাদ—

নাম-রূপাত্মক জগৎ। রূপ-প্রপঞ্চের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ৩৬ (ছত্রিশ) তত্ত্ব প্রসঙ্গে। শিব শক্তি সদাশিব ঈশ্বর শুদ্ধবিদ্যা মায়া নিয়তি কাল রজ বিদ্যা কলা পুরুষ প্রকৃতি মন বুদ্ধি অহংকার পঞ্চ কর্ম-ইন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত—এই ছত্রিশ তত্ত্ব আত্মিক রূপময় জগৎ।

নাদ-প্রপঞ্চের কথা বলা যাইতেছে—

পরমেশ্বর শব্দব্রহ্ম। প্রথম নাদ। বিশ্ব-সংসার শব্দ-প্রভব। শব্দ হইতে জাত। প্রথম শব্দের প্রথম রূপ-পরা। ইহা মূল তত্ত্ব—শিবতত্ত্ব। শব্দের দ্বিতীয় রূপ পশ্যন্তী। ইহা বস্তুতঃ শক্তিরূপা—বিন্দুতত্ত্ব। শব্দের পশ্যন্তী রূপ হইতে সৃজন। আদি নাই, বিন্দু তত্ত্ব।

নাদ বিন্দু হইতে ত্রিবিন্দু বা কামকলা। কামকলাই নিখিল মন্ত্রের বীজ। এই ত্রিবিন্দুরও অপর নাম বীজ। যেমন অণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্বণুক হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে সৃষ্টি। ইহা পরমাণুবাদী বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত। সেইরূপ ত্রিবিন্দু স্বরূপ বীজ হইতে সকল মন্ত্রের সৃষ্টি।

ত্রিবিন্দু একটি সূত্র (Formula) সদৃশ। ইহার অর্থ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র। তিন কোণে চন্দ্র-অগ্নি-সূর্য। এই ত্রিকোণ হইতে সৃষ্টি। ইহাই নিখিল রিশ্বের মহাযোনি।

সূর্যের এক নাম কাম। চন্দ্র ও অগ্নিকে বলে কলা। সুতরাং শব্দ-প্রপঞ্চ একটি বিশাল ত্রিভুজ। ইহার নাম কামকলা।

কামকলা হইতে জন্মেন মাতৃকা। মাতৃকা হইতে বর্ণ-পদ-বাক্য। আদিতে 'অ'-কার অন্তে 'হ'-কার—এই মহামণ্ডলটি মাতৃকা-মণ্ডল। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে 'সৎ', ব্যক্তরূপে 'চিৎ'। প্রকাশরূপে আত্মপ্রকাশরূপী মাতৃকামণ্ডল। "প্রকাশ্যতে সা ইতি প্রত্যবমর্ষণী"।

মাতৃকা বলিতে মা। মা হইলেন 'প্রত্যবমর্ষণকারিণী'। শক্তি প্রকাশ তখনই, নিজেকে প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারে যখন তাহার সহিত মাতৃকা যুক্ত থাকে। যে অনন্ত অখণ্ড মহাসত্য জগৎকে প্রকাশ করিতেছে তাহার স্বরূপভূতা শক্তিই মাতৃকা নামে পরিচিত।

বর্ণমালা—

বর্ণমালাতে যে শব্দব্রহ্মের প্রকাশ তাহার একমাত্র প্রয়োজন অচিৎকে চিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, চিৎকে সৎরূপে ফুটাইয়া তোলা। শব্দশাস্ত্রে আছে—

> "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
> বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।" বাক্যপদীয়

অনাদি অনন্ত 'শব্দ' নামক ব্রহ্ম তত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্তিত হয়। শব্দের অর্থ রূপে বিবর্তন এই কথার তাৎপর্য হইল "জগৎ রচনা।" "রূপেব বিশ্বা ভুবনানি যজ্ঞে।"

বর্ণমাতৃকা সকল শব্দব্রহ্মের অঙ্গ। মাতৃকা সকল স্থূল বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া লোক-মণ্ডলাদি

সৃষ্টি করে।

মাতৃকার 'চিৎরশ্মি' সূক্ষ্ম জগতে সঞ্চরণ করে। কারণ ভূমিতেও ইহাদের অনুভব হয়।

বর্ণের অবতরণ ঘটে। ইহা ঘটে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতে। হয় মানস মাত্রা অবলম্বনে।

বর্ণমালা সত্য সত্যই মালা। ইহাঁর নাম অক্ষমালা। 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত যে ধারা, তা পূর্ণ মালিনীর ধারা। উত্তর মালিনীতে অন্য রূপ আছে। সেখানে বর্ণের প্রথম অক্ষর 'ক' নহে 'ন', শেষ বর্ণ 'ফ'।

উত্তর মালিনী মতে ঃ

'ফ' = পৃথিবী

'দ-ঝ' = জলাদি প্রকৃতি পর্যন্ত তত্ত্ব।

'ছ-অ' = বর্ণ পুরুষ হইতে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বের বাচক।

'ই-ঘ' = শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিবের বাচক।

কোন কোন মতে—

'অ-অঃ' = ষোলটি শিবতত্ত্ব।

'ক-ঙ' = পৃথিবী আদি পঞ্চভূত।

'চ-ঞ' = গন্ধ আদি পঞ্চতন্মাত্র।

'ট-ণ' = পদ আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়।

'ত-ন' = প্রাণ আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

'প-ম' = মন, অহংকার, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও পুরুষের বাচক।

মত বিশেষে—

'অ' = কারের অনুভব স্থান 'হৃদয়'। }
'উ' = কারের অনুভব স্থান 'তালুমধ্য'। } ওঁ
'ম্' = কারের অনুভব স্থান 'ভ্রূ মধ্য'। }

নামের মালা ও "বীজ অক্ষর" সবই বর্ণময়। বর্ণ পঞ্চাশৎ। এই বর্ণমালাগুলি কালীর কণ্ঠে পঞ্চাশ (৫০)টি নরমুণ্ড রূপ প্রতীক বিরাজিত। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ বিশুদ্ধ চক্রের ষোলটি (১৬) দল (পাপড়ি)। এই ষোড়শটি স্বরবর্ণ বিদ্যমান আছে।

'অনাহত' পদ্মের বারটি পাপড়িতে বিদ্যমান আছে— ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ।

'মণিপুর' পদ্মের দশটি পাপড়িতে অবস্থিত—ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ।

'স্বাধিষ্ঠান' পদ্মের ছয়টি পাপড়িতে—ব ভ ম য র ল।

'মূলাধার' পদ্মের চারটি পাপড়িতে—ব শ ষ স।

'আজ্ঞা' চক্রের দুইটি দলে (পাপড়িতে)—হ্ ক্ষ।

সহস্রদল পদ্মের দলগুলিতে সবগুলি বর্ণমালা চক্রাকারে শোভমান আছে। পদ্মটি আছে upside down উল্টামুখে নীচের পদ্মগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া। উপরের দিক্‌টি ব্রহ্মভূমি।

নীচের দিকটি ব্রহ্মাণ্ড।

নিম্নের ছয়টি পদ্মের কারণ—মূলতত্ত্ব সহস্রারে। সহস্রারের সবগুলি বর্ণমালা নীচের পদ্মের সবগুলি দেখিতেছে।

বিশুদ্ধ চক্রের অ আ ষোলটি বর্ণের দিকে সহস্রারের সবগুলি বর্ণমালা নীচের পদ্মের সবগুলি দেখিতেছে।

বিশুদ্ধ চক্রের অ আ ষোলটি বর্ণের দিকে সহস্রারের অ আ ষোলটি বর্ণ তাকাইয়া আছে। তার ফলে বিশুদ্ধ চক্র জীবন্ত। **অনাহত** চক্রের ক খ প্রভৃতি বার (১২)টি বর্ণের দিকে সহস্রারের ঐ বারটি (১২) বর্ণের সঙ্গে সহস্রারের ঐ দশটি বর্ণের দৃষ্টি বিনিময় হইতেছে। **মণিপুর** পদ্মের ড প্রভৃতি দশটি (১০) বর্ণের সঙ্গে সহস্রারের ঐ দশটি বর্ণের দৃষ্টি বিনিময হইতেছে। **স্বাধিষ্ঠান** চক্রের ছয়টি (৬) দলে যে ব ভ প্রভৃতি ছয়টি বর্ণ, তাহাদের সহিত সহস্রারের ঐ ছয়টি বর্ণের আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে। **মূলাধার** পদ্মের চারটি (৪) পাপড়ির ব, শ, য, স-এর সঙ্গে সহস্রারের ঐ বর্ণ চারটির আদান-প্রদান চলিতেছে। আজ্ঞা চক্রের 'হ' আব 'ক্ষ' এর সঙ্গে সহস্রারের ঐ দুইটি বর্ণের পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতেছে।

কুণ্ডলিনী ও বর্ণমালা—

মূলাধার কেন্দ্রে হং বিন্দু ও সঃ বীজ। ইহাতে ধ্যান করিলে নিদ্রিতা শক্তি জাগ্রত হয়। তাহাকে বিন্দুবীজ 'হংসঃ' মধ্যে আশ্রয়ে রাখিতে হয়।

কুণ্ডলিনী সহস্রারে গমন করিলে 'ষট্‌চক্র' ভেদ করিয়া যান। প্রত্যেক চক্রের প্রত্যেক দল হইতে বর্ণ বীজগুলিতে গ্রাস করেন। করিতে করিতে আজ্ঞা চক্রের 'ক্ষ' রূপ মেরুতে শেষ করে।

বর্ণমালার একটি ধ্যান আছে। তাহা নিম্নরূপ—

"সাদীন্ বর্ণান্ গ্রসন্তী প্রতিকমলগতান্ ঊর্দ্ধবক্ত্রেণ দেবী
দষ্ট্বার্ণংশেষমান্তে পুনরপরমুখেনেন্দ্রমুদ্‌গীর্য হার্ণম্।
ভুক্ত্বা ভূয়ো লকারাক্ষরমপি চরমং বর্ণমাস্যেন ধৃত্বা
মালাকারা-ভুজঙ্গী বিলসতি সততং বর্ণমালেয়মুক্তা।।" মুণ্ডমালিনীতন্ত্র

মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখে যাত্রা করেন। স, য, শ, ব, বর্ণবীজ দল হইতে গ্রাস করিয়া স্বাধিষ্ঠান পক্ষে আসেন, সেখানে ল, র, য, ম, ভ, ব গ্রাস করেন। এইরূপে প্রত্যেকটি চক্র হইতে বর্ণবীজ গ্রাস করিতে করিতে আজ্ঞা চক্রে উপনীত হন। তখন বিশুদ্ধের শেষ বর্ণ 'অ' পর্যন্ত গ্রাসিত হইয়াছে। নীচের দিকের মুখ দ্বারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বর্ণবীজ গ্রাস করিতে আজ্ঞাচক্রে উপনীত হন।

* * *

তখন বিশুদ্ধের শেষ বর্ণ 'অ' পর্যন্ত গ্রাসিত হইয়াছে। নীচের দিকের মুখ দ্বারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বর্ণবীজ গ্রাস করিতে করিতে আসিয়াছেন। তখন মুখ ও পুচ্ছরূপ অপর মুখ মিলিত হয়। পুচ্ছরূপ অপর মুখ আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রে ছিল সন্নিবিষ্ট। দুই মুখ একত্র হইলে আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রস্থ

'হং' বীজ গ্রাস করেন।

তখন অপর মুখ দ্বারা 'লং' বীজ ও 'হং' বীজ উদ্‌গীরণ করিয়া আজ্ঞাচক্রে রাখিয়াছেন। আবার 'লং' বীজ গ্রাস করেন। আবার 'হং' বীজ মুখে করিয়া, উভয় মুখের সূত্র একত্র করিয়া 'ক্ষ' রূপ মেরুতে মালা গাঁথা শেষ করেন। তখন ঘর শোভা হয়। ইহা বর্ণমালার আন্তররূপ।

স্বাধিষ্ঠান চক্র—

স্বাধিষ্ঠান চক্রের বর্ণ (রঙ) সিন্দুরের মত লাল। ছয়টি পাপড়ি। জনন যন্ত্রের উপরে স্থান, উপরে নাভি, নীচে মূলাধার, ছয়টি পাপড়িতে ছয়টি বর্ণ বং, ভং, মং, যং, রং, লং। ছয় পাপড়িতে ছয়টি চিত্তবৃত্তির স্থান। প্রত্যয় (credulity), অবিশ্বাস (suspicion), অবজ্ঞা (disdain), মূর্চ্ছা (delution), সর্বনাশ (false knowledge) ও ক্রূরতা (ruthlessness)। বিদ্যুৎবর্ণ অক্ষরগুলির মধ্যে একটি অষ্টদল পদ্ম। মধ্যস্থলে অর্দ্ধ চন্দ্র, এই অংশ শুভ্র। একেবারে কেন্দ্রস্থলে বরুণ বীজ 'বং' উপবিষ্ট আছে একটি মকরের উপরে। বিন্দুর অভ্যন্তরে গরুড়ে স্থিত বিষ্ণু— চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। হলুদবর্ণ বস্ত্র। গলায় বর্ণমালা। বক্ষে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ। বিষ্ণু যৌবন বয়স্ক। লালপদ্মে একটি শক্তি 'রাকিনী'—উপবিষ্টা। শ্যামবর্ণা, চারি হাতে শূল, পদ্ম, ডমরু ও টংক (Battle axe)। ত্রিনয়ন, কুটিল দৃষ্টি যুক্ত। তাকাইতে ভয় হয়। শুভ্র অন্নপ্রিয় তিনি। তাঁর নাসিকা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত।

মণিপুর চক্র—

মণিপুর পদ্ম নাভিমূলে। বর্ষার মেঘের মত, থং বর্ণ। দশটি পাপড়ি। তাতে আছে দশটি বর্ণ ঢং, ডং, ঢং, ণং, তং, দং, ধং, নং, পং, ফং। বর্ণগুলির রঙ উজ্জ্বল নীল। প্রত্যেকের উপরে বিন্দু। মধ্যে ত্রিকোণাকার অগ্নিস্থান—তিনদিকে তিন স্বস্তিক চিহ্ন। ত্রিভুজের মধ্যে অগ্নিবীজ 'রং' অগ্নি-বীজ লোহিত বর্ণ। একটি মেষের উপর উপবিষ্ট, চারি বাহু, বজ্রশক্তি বর অভয়। বহ্নিবীজের ক্রোড়ে রুদ্র। রক্তবর্ণ বৃষের উপর উপবিষ্ট। ভস্ম আচ্ছাদিত দেহ। শক্তি লক্ষ্মী, রক্তবর্ণ পদ্মে উপবিষ্ট। লক্ষ্মী নীলবর্ণা, ত্রিমুখ, তিন চক্ষু, চারিহাত, বজ্রশক্তি বর অভয়। ব্যক্ত ভীষণ দন্ত। রন্ধন করা ডাল, ভাত ও কাঁচা রক্ত মাংস খাইতেছেন। দশটি পাপড়িতে দশটি চিত্তবৃত্তির জন্ম—তৃষ্ণা (desire), সুষুপ্তি (dreamless Sleep), বিষাদ (sadness), কষায় (dullness), মোহ (ignorance), ঘৃণা (aversion), ও ভয় (Fear)।

পদ্মের উপর সূর্য। চন্দ্র হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। সৌর মণ্ডল ভোগ করিতেছে।

অনাহত চক্র—

হৃদয়ে স্থিতি, বন্ধুকপুষ্পের বর্ণ। দ্বাদশটি (১২) উর্দ্ধমূল পাপড়ি তাহাতে বর্ণমালা কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং—প্রত্যেকের উপরে বিন্দু বিন্দু সিন্দুর বর্ণ। চিত্তের বৃত্তি—আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ বিকলতা (langour), অহংকার, বিবেক, লোলতা (covetousness), কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ।

মধ্যে ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল—ধূমবর্ণ, উপরে সূর্যমণ্ডল। উজ্জ্বলতায় দশ কোটি সূর্যমণ্ডল।

মধ্যে বায়ু বীজ (যং) ধূম্রবর্ণ। কালো হরিণে উপবিষ্ট ত্রিকোণ মণ্ডলের বর্ণ বিদ্যুৎতুল্য। ত্রিকোণে শক্তি দেবী মধ্যে নারায়ণ-হিরণ্যগর্ভ—ভিতরে ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী স্বর্ণ বর্ণ দুই হাতে বরাভয়, আর একটি ত্রিনয়নকারিণীশক্তি ডাকিনী। মানুষের হাড়ের মালা গলে। চঞ্চল মদ্যপানরতা দেবী কালরাত্রি।

বিশুদ্ধ চক্র—

বিশুদ্ধ চক্র বা ভাবিত স্থান। বাগ্‌দেবীব বাস, কণ্ঠমূলে, আকাশতত্ত্ব। ধূসব বর্ণ। ষোলটি (১৬) স্বরবর্ণ, বর্ণগুলি লাল। প্রত্যেকেব উপবে বিন্দু। অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অঃ, আঃ প্রত্যেকেব উপরে বিন্দু। সাতটি সঙ্গীতের স্বব—নিযাদ, ঋযভ, গান্ধার, যড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চমবীজ হুঁ, ফট্ স্বাহা।

মধ্যস্থলে গোলাকার আকাশ মণ্ডল। তার মধ্যে শুভ্র চন্দ্রমণ্ডল। তদুপরি 'হুঁ' বীজ, বীজ শুভ্র পোযাক অর্থাৎ আকাশ-পোযাক দিগম্বর, হস্তীপৃষ্টে উপবিষ্ট, চারিবাহু পাশ, অঙ্কুশ, বরও অভয়, ক্রোড়ে সদাশিব, সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসন বলীবর্দের পৃষ্ঠে স্থিত।

[ইহার উপরে তালুমূলে 'ললনা চক্র' নামে আর একটি চক্র আছে, তাহা গুপ্ত।]

আজ্ঞা চক্র—

আজ্ঞা চক্র পরম আকুল চক্র। মুক্ত ত্রিবেণী। তিন নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুম্না। ভ্রূ মধ্যে দুইটি পাপড়ি। রক্তবর্ণ 'হং' 'ফং'। বীজ ওঁ। তিনটি গুণ সত্ত্ব, বজঃ, তমঃ। অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'হাকিনী' শুভ্রবর্ণা। ছয়টি বদন। প্রত্যেক বদনে তিনটি চক্ষু এবং ছয়টি বাহু। শুভ্র পদ্মে উপবিষ্ট। হাতে বরাভয় মুদ্রা, রুদ্রাক্ষের মালা—মানুযেব মাথার খুলি (কপাল), একটি ডমরু ও একখানি গ্রন্থ। ত্রিকোণ মধ্যে তেজোময় প্রণব। পরমেশ্বর হংস রূপ। শক্তি সিদ্ধা কালী—তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। শক্তি 'হাকিনী'।

মানস চক্র—সোম চক্র—

আজ্ঞা চক্রের উপরে আর একটি গুপ্ত চক্র আছে—নাম মানসচক্র। পদ্মের ছয়টি পাপড়ি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ—ইহাদের জ্ঞান। তদুপরি সোমচক্র ১৬টি (ষোলটি) পাপড়ি। ১৬ (ষোল) কল্প ঃ কৃপা মৃদুতা ধৈর্য বৈরাগ্য ধৃতি সম্পৎ হাস্য রোমাঞ্চ বিনয ধ্যান সুস্থিরতা গাম্ভীর্য উদ্যম অক্ষোভ ঔদার্য ও একাগ্রতা।

সহস্রার—

নিরালম্ব পুরীর উপরে 'প্রণব' অগ্নিশিখার মত প্রজ্বলিত। প্রণবের উপরে শ্বেত অর্দ্ধচন্দ্র—নাদ, তদুপরি বিন্দু। একটি শুভ্র পদ্ম—১২ (বারো)টি পাপড়ি। তদুপরি সুধার সাগর। মণি-দীপ, মণি-পীঠ। বিদ্যুল্লেখায় তিনটি বর্ণ, অ, ক, খ। বিদ্যুল্লেখার মধ্যে নাদবিন্দু। নাদবিন্দুর একটি পাদপীঠ। সেখানে বিরাজিত 'আগম' ও 'নিগম'। দুই চরণ—শিব ও শক্তি। তাহার চোখে 'প্রণব' এবং চক্ষুতে ও গলায় কামকলা উজ্জ্বল শুভ্র রক্তিমাভ। উল্টোমুখে ঝুলানো। ইহাই চন্দ্রের মত হইলে নির্বাণ কলা। ইনি ইষ্টদেবতা। ইহাই পরম নিরোধ শক্তি।

পরম নির্বাণ শক্তি ও নির্বাণ কল্প একই শক্তি। তদুপরি বিন্দু ও বিসর্গ—সহস্রার পদ্মে

উহারাই মূল ও আশ্রয়। সকল চক্রের উপরে সহস্রার চক্র। সহস্র তাহার পাপড়ি। মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া রহিয়াছে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে। Head downwards from the Brahma-randhra— অপর শিব ও পরমানন্দ আদ্যাশক্তি বিরাজিত। ইনি দ্রষ্টাশক্তি ও বাচক শক্তি।

পদ্মের পাপড়িতে সকল বর্ণমালাগুলি বিরাজিত। চক্রের উপর দিকটি ব্রহ্মালোক। নীচের দিক্‌টি ব্রহ্মাণ্ড। সহস্রারকে শৈবেরা কহিল 'শিবস্থান'। বৈষ্ণবেরা কহেন পরম-পুরুষের স্থান। শাক্তেরা বলেন 'দেবীস্থান'। কেহ কহেন দেবীস্থান, কেহ বলেন হরি-হর স্থান, কেহ কহেন 'কূলস্থান', কেহ বা বলেন, "পরমশিব অকূল স্থান"।

এই সহস্রার বৈষ্ণবদের 'গোলোকধাম' যাইতে হইলে চিদাকাশ ভেদ করিতে হইবে। শুধু সমাধিতে হইবে না। লৌকিক আকাশ, অন্তরে চিত্তাকাশ তাহার উর্দ্ধে গভীরে চিদাকাশ। তন্ত্র বলেন, নাভিস্থ শক্তি আয়ত্ত না হইলে, চিদাকাশ ভেদ সম্ভব হয় না। নাভি হইতে উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মনাল। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ললিতা। এই সখীর সাহায্য ব্যতীত সহস্রারে প্রবেশ ঘটে না।

বৈষ্ণব সাহিত্যে 'ললিতা'—অষ্টসখীর প্রধানা। তাঁহার আনুগত্য ছাড়া গোলোকের লীলায় প্রবেশ ঘটে না। ঋষি গোপীনাথ কবিরাজ বলেন—ললিতা শ্রীবিদ্যার নামান্তর। আচার্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ, 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' নামক একখানি তন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি ও তান্ত্রিক দৃষ্টি কীভাবে প্রাচীনকালে মিশিয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় 'শ্রীবিদ্যারত্ন-সূত্রে'।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রের একজন সমুদ্রতুল্য লোক ছিলেন। তিনি বলেন— বৈষ্ণবদের শুক-সারী-সংবাদ ব্যাপক। উহা দুইটি পাখির কথাবার্তা মাত্র নহে। দুইটি চিন্তাধারা সাধনা ধারার সমন্বয় সাধনের কথা। শ্রীবিদ্যাগ্রন্থে কদম্ববৃক্ষের তত্ত্ব আছে। পুরাণ সংহিতায়— সুমঙ্গলা শক্তি বা ললিতার কথা আছে।

সুতরাং গোলোকতত্ত্ব ও সহস্রার তত্ত্ব যে একই এই উক্তিতে কেহ হঠাৎ সন্দিহান হইবে না। নৃসিংহ-তাপনী, শ্রীরাম-তাপনী, শ্রীকৃষ্ণ-যামল প্রভৃতি গ্রন্থে দুইটি ধারার সমন্বয়ের সংবাদ আছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলার আস্বাদন করিতে হইলে প্রবেশ করিতে হইবে গোলোকধামে। যাইবার উপায় সখীর আনুগত্য ও নামবীজ।

শিব-শক্তির মিলন আস্বাদন করিতে পৌঁছিতে হইবে সহস্রারে। পৌঁছিবার উপায় সুমঙ্গলা— ললিতাশক্তির আনুগত্য ও মন্ত্রবীজ।

কৃষ্ণের বীজ—ক, ল, ঈ, বিন্দু।

শক্তি বীজ—ক, র, ঈ, বিন্দু।

পণ্ডিতেরা বলেন "রলয়োরভেদঃ" 'র'-আর 'ল' অভেদ। অনেক যে সামঞ্জস্য তাহাতে

সংশয় নাই।

কী করিয়া উচ্চারিত নাম মন্ত্র বীজ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যায়, ঈশ্বরকে দর্শন করায় জীবাত্মার কল্যাণ সাধন করে, তাহার একটু অস্পষ্ট-আভাস দেওয়া হইল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে কুলকুণ্ডলিনী রহস্য জানা কত প্রয়োজন। ঈশ্বর সাক্ষাৎ করিতে হইলে, মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডলিনীতে ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। তন্ত্রের সাধক তাহা জ্ঞাতসারে করেন। বৈষ্ণব সাধক তাহা অজ্ঞাতসারে করেন। আপনি যে অন্নব্যঞ্জন আহার করিলেন উহা কোন ভূমিতে কাহারও চেষ্টায় ধান্যরূপে ছিল, পরে কোথাও তণ্ডুলরূপ ধারণ করিয়াছে—পরে অন্য কাহারও সাধনায় অন্ন-রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্নপ্রসাদ গ্রহণকালে আপনি তাহা জানুন, আর না-ই জানুন, ধান, চাউল, ভাত এই তিন স্তর পার হইয়া আপনার থালায় অন্ন শোভমান। মাঠে লাঙ্গল যন্ত্র। ঘরে ঢেঁকী যন্ত্র, পাকশালে হাঁড়ি যন্ত্র। এই তিন যন্ত্রের সহায়তা ছাড়া আপনার আহার্য অন্ন আসিতে পারে না, সুতরাং যন্ত্রেব রহস্য জানিতে হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্র জপ-সাধনার মন্ত্রে, কীর্তন সাধনায় ও হরিনামে কী প্রকারে ফলোদয় হয় তাহার রহস্য ভেদ করিয়াছে। 'নামব্রহ্ম' বলে সকলেই। তন্ত্রশাস্ত্র রহস্যভেদ করিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়াছে। তন্ত্রের দান অতুলনীয়।

তন্ত্রের শক্তি—

মূলাধার ঃ গন্ধ-তন্মাত্র, পৃথিবী, রসনেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় পদ।

স্বাধিষ্ঠান ঃ রস-তন্মাত্র, অপ্ তত্ত্ব, রসনেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় হস্ত।

মণিপুর ঃ রূপ-তন্মাত্র, তেজ তত্ত্ব, দর্শনেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় পায়ু।

অনাহত ঃ স্পর্শ-তন্মাত্র, বায়ু তত্ত্ব, স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্, কর্মেন্দ্রিয় উপস্থ।

বিশুদ্ধ ঃ শব্দ-তন্মাত্র, আকাশ তত্ত্ব, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় বাক্।

আজ্ঞা ঃ মন, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।

আমরা যে কথা বলি—বর্ণ উচ্চারণ করি মুখ দিয়া, উহা বস্তুতঃ মুখ উচ্চারণ করে না। উচ্চারণ কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রে। সেই উচ্চারণের নাম পশ্যন্তী। আরও তলাইলে জানা যায়, যে উচ্চারণ হয় অনাহত চক্রে তাহার নাম মধ্যমা। আরও গভীরে উহা উচ্চারিত হয় মূলাধারে। সেই উচ্চারণের নাম 'পরা'।

বাক্—যাহা হইতে বাক্য হয়। সেই বাক্ চতুর্বিধ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। পরাশক্তি কুণ্ডলিনী শক্তি। পশ্যন্তীর শক্তি ইচ্ছা (will), মধ্যমায় জ্ঞান শক্তি (knowledge), বৈখরীতে ক্রিয়া (action)।

পরা শব্দ নিষ্পন্দ (motionless), তারই তিনটি প্রকাশ। মূলাধারে পশ্যন্তী, অনাহতে মধ্যমা, বিশুদ্ধতে বৈখরী। প্রথম শক্তি আসে কুণ্ডলিনী হইতে। তাহার শক্তি সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্মতমা। তাহার শক্তি তেজোরূপা। তাহা উদ্গত হইয়া পশ্যন্তী। স্বয়ং প্রকাশ সুষুম্না নাড়ীতে

মধ্যমা নাদরূপী। তাহার বিশুদ্ধিতে বৈখরী।

পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী—এই তিনটি বহির্মুখ। ইহা অবরোহ। পুনঃ বৈখরী হইতে আরোহ। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ—জপ দ্বারা মন্ত্রাক্ষরের বর্ণ আরোহ-অবরোহ করিতে থাকে—তাহাতে শক্তি সঞ্চয়ন হয়।

বর্ণ পরাভূমিতে আরোহণ করিলে পরব্রহ্মের সঙ্গে সাহচর্য হয়। পরা বাক্ আর পরব্রহ্ম একই ভূমি। পরা বাক্ ভূমির অতীতে, বিশ্বের অতীত ভূমি, অক্ষর ব্রহ্মের সহিত তাহার একাত্মতা।

শিব প্রকাশ স্বরূপ, শক্তি বিমর্শ স্বরূপ।

প্রকাশের ৪ অংশ—অম্বিকা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী।

বিমর্শের ৪ অংশ—শান্ত, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া।

অম্বিকা ও শান্তর সাম্যরূপ অবস্থায় শান্ত ভাবাপন্না পরাশক্তি পরা বাক্ নামে অভিহিত। ইহা আত্ম-অঙ্কুরণের অবস্থা। শান্ত হইতে ইচ্ছার উদয়, ইচ্ছাশক্তি বামা শক্তিসঙ্গে তাদাত্ম্যে পশ্যন্তী। জ্ঞানশক্তি জ্যেষ্ঠার সহিত অভিন্নতায় মধ্যমা নামে পরিচিত হয়। ক্রিয়াশক্তি রৌদ্রী-শক্তির সঙ্গে এক হইয়া বৈখরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

চারি প্রকার বাক্—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—মিলিত হইয়া মূল ত্রিকোণ (Original Triangle)।

পরা বাক্—ত্রিকোণের বিন্দু।

পশ্যন্তী—বাম রেখা।

মধ্যমা—সরল অগ্ররেখা (Base)।

বৈখরী—দক্ষিণ রেখা।

মধ্যস্থ মহাবিন্দু অভিন্ন শিব শক্তির আসন।

মধ্যস্থ বিশ্বের হৃদয়—বিশ্বাতীত পরমেশ শিব-শক্তির আবির্ভাব স্থান।

চক্রের তত্ত্ব—

আজ্ঞা চক্র—বোধের ভূমি—মানস কর্তৃত্বের খুঁটি। 'হ', 'ল', 'ক্ষ' মণ্ডল। 'হ' ও 'অ' উভয়েই কণ্ঠ্যবর্ণ। 'অ'-এর বিস্তৃতি রূপে 'হ'। এই হেতু 'হ', 'ল', 'ক্ষ' মণ্ডল হইতে মাতৃকাগণ প্রথমে বিশুদ্ধ চক্রে আসেন। এখানে ষোলটি (১৬) দলে ষোলটি স্বরবর্ণ—ইহাই 'সোম-মণ্ডল'।

সূর্যমণ্ডলের বর্ণ—'ক—ম' একই মণ্ডলের মধ্যে দুই চক্রে বিভক্ত। প্রথমে অনাহত চক্রে দ্বাদশ দলে (পাপড়িতে) 'ক' হইতে 'ঠ' পর্যন্ত চক্ষুরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ধৃত। 'ক—য' ভূতাদির তৈজস্ রূপ। 'চ—ঞ' পর্যন্ত তন্মাত্রাদির তৈজস-রূপ। 'ট—ণ' ত্বক্‌রূপ। 'ধ' বর্ণ চক্ষুরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্ব। বারোটি দলের বর্ণের অনুরূপ ব্যাখ্যা। ❑

শক্তিবাদ

বাংলার বিশেষ সম্পদ্ শক্তির উপাসনা। গৌড়ীয়া বিদ্যা তন্ত্রের আর এক নাম। বর্তমানে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা বা আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আত্মভোলা বাঙালী জাতি নিজ সম্পদ্ সম্বন্ধে যদিও একেবারে উদাসীন, তাহা সত্ত্বেও তন্ত্রের সাধনার ধারা একেবারে মৃত নহে। আমাদের স্মরণ কালের মধ্যেই রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট্ দান। দার্শনিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের মত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত সত্য (experimental truth)। অনুভূতি দুই প্রকার—ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সর্বজনীন অনুভূতি। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা সর্বজনীন তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

শক্তিবাদের প্রথম সিদ্ধান্ত—শক্তি আছে। ইহা সকলের অনুভববেদ্য। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর আছেন ইহা সাধারণের অনুভবের অতীত, যুক্তি তর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে হয়—তীক্ষ্ণতর যুক্তির দ্বারা আবার উহা খণ্ডিতও হইতে পারে। শক্তিবাদ সেরূপ নহে, ইহা অখণ্ডনীয়। শক্তি নাই বলিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শক্তি অস্বীকার করিতেও শক্তির প্রয়োজন। শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে বুদ্ধি শক্তি, বিচার শক্তি, বাক্ শক্তির দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভগবান্ আছেন আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি আছে ইহাতে আপত্তি করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া যে বস্তুর আশ্রয় লইতে হইতেছে তাহাও শক্তি। অতএব উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

শক্তি আছে, ইহা শক্তিবাদের চরম কথা নহে। শক্তিবাদের অন্তরের কথা, একমাত্র শক্তিই আছে, নিখিল বিশ্বে শক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তির সমবায় (conglomeration of energy)। বস্তুমাত্রই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এক একটি বস্তু, শক্তির এক এক ধরনের প্রকাশ। "যা দেবী সর্বভূতেযু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—দেবী মহাশক্তি সর্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা—ইহাই তন্ত্রের মহতী ঘোষণা। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউটন সাহেবের সময় হইতে তিনশত বর্ষের জয়যাত্রার মধ্য দিয়া আজ বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধন্তে পৌঁছিয়াছেন উহা একান্তভাবে তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। পারমাণবিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে বস্তু (matter) সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই যে শক্তির সমবায় উহাতে এখন আর কাহারও সংশয় নাই।

* *'আনন্দবার্তা'। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সংঘের মাসিক মুখপত্র। ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। বারাণসী।*

শক্তিবাদের তৃতীয় কথা, সর্বভূতে অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বচরাচরে একটি মাত্র শক্তিই আছে। বহু যে দেখি—তাপ (heat), আলো (light), বৈদ্যুতিক শক্তি (electricity)—উহা দৃষ্টির ভ্রমবশতঃই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে সবই একই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়। কিছুদিন পূর্বেও পরমাণু (atom) জগতের মূল কারণ—বিজ্ঞানের এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আজ এই মতের পরিবর্তন হইয়াছে। সকল বস্তুই যে এক শক্তির পরিণতি ইহা এখন সর্ববাদি-সম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূলে যে একটি মাত্র শক্তি বিদ্যমান, ইহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকালের গবেষণার পর পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—বিশ্বের মূলে একই শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র বহু পূর্বে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিকগণ আজ শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাদের শাক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি মানিলেই শাক্ত হয় না, শক্তির পূজারী হওয়া চাই। ভারতবর্ষে শক্তির যেরূপ পূজা হয়, পাশ্চাত্ত্যদেশে তদ্রূপ হয় না। কারণ শক্তিবিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে। তন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এবার বৈসাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে, পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান কেন শক্তির পূজারী নয়।

বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্বিতীয়, এ বিষয়ে বিরোধ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শক্তি জড় অর্থাৎ প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কখনও জড় নহে। ইহা সর্বতোভাবে চৈতন্যময়ী "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে"—সর্বভূতে চৈতন্যরূপে বিরাজিতা দেবী মহাশক্তিই।

জড়বস্তু আকারে যতই বড় হউক সম্মানের দাবি করে না। সুবৃহৎ হিমালয় পর্বতের উপর হাঁটিয়া যাইতে কাহারও উদ্বেগ হয় না। কিন্তু চেতনসত্তাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করা যায় না। চেতনা মর্যাদার দাবি রাখে। চৈতন্যময়ী বলিয়া জানিলে পাশ্চাত্ত্যে শক্তিপূজার প্রবর্তন হইতেও পারে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আজ শক্তির কেবল স্বীকৃতিই হয় নাই, উহা চৈতন্যের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এডিংটন্ প্রমুখ বিজ্ঞানী বিশ্বের মূল শক্তিকে মনঃসত্তা (mind stuff) এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্যর জেম্স্ সাহেবের মতে বিশ্বের মূল সত্তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান অনুমিত হয়। নচেৎ এই বৈচিত্র্যময় বিরাট্ সৃষ্টি কখনও এত নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারিত না। তাঁহার মতে এই বিশ্বের কোথাও এতটুকু অঙ্কের ভুল দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করে। আর বিচার শক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল। মূল শক্তি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন (mathematical) বলাতে, শক্তির চৈতন্যসত্তা একপ্রকার স্বীকার করাই হইল। ইহা ছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানের আরও দুই একটি রহস্যের কথা বলিতেছি।

বর্তমান পদার্থ বিদ্যা (Modern Physics)-এর একটি নীতি হইতেছে অনির্দেশ্যবাদ (Law of Indeterminacy)। একটা সৌরজগৎ যেরূপ—মধ্যে সূর্য, চারিপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণের অবস্থিতি—সেইরূপ একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের ন্যায়

ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে। সৌরমণ্ডল ও পরমাণুমণ্ডলের পার্থক্য এই যে, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে পরিক্রমা করে। কিন্তু পরমাণুমণ্ডলের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কক্ষ পরিত্যাগ করে। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া যায়। চলার ভঙ্গী দৌড় নহে, লম্ফন (jump)। লম্ফনের মধ্যে বৈচিত্র্য এই যে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় মাঝখানে কোথাও থামে না। কখন কোন্ ইলেকট্রন এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবে এবং কী তার গতিবেগ (velocity), তাহা নির্ধারণের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাহার স্থিতিস্থান (position) ও গতিবেগ (velocity) এই দুইয়ের একই কালে শুদ্ধ নির্ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইলেও তাহার গতি জানা যায় না। আবার ইলেকট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে জানিলেও সেই মুহূর্তে তাহার স্থিতি নির্ভুলভাবে জানা যায় না। ইহাই হাইজেনবার্গ সাহেবের অনির্দেশ্যবাদ। ইহাতে ইলেকট্রনের স্বাধীনতা অনুমিত হয়।

১৯৪৭ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সাহেব ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরীন স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) বিস্ফোরণ ইত্যাদি হইতে প্রমাণিত করিলেন যে বিজলীবাতির তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেকট্রন তেজ ও উত্তাপের তাড়না ও প্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কক্ষত্যাগ করিয়া যায়।

ইলেকট্রনের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর আভ্যন্তরিণ শক্তির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করেন। কারণ চেতনা ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা সম্ভব নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে উন্নত বিজ্ঞান, চেতনার স্বীকৃতির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। শক্তি যে চেতনাসম্পন্ন ইহা আজ বিজ্ঞানের অনুমিতি। পরীক্ষায় নিরীক্ষায় অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে শক্তি যে চেতনাময়ী ইহা তন্ত্রাচার্যগণের অনুমিতি নহে, অনুভূতি বটে। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া সত্য নহে—তপস্যা দ্বারা উপলব্ধ সত্য।

তবে জড়বস্তুর মাধ্যমে চেতনার অনুসন্ধান দ্বারা চৈতন্যময়ী মহাশক্তির তত্ত্ব উদ্ঘাটন কখনও সম্ভব হইবে না। চেতনার মূর্ত-বিগ্রহস্বরূপিণী শক্তিকে জানিতে হইলে আত্মস্থ হওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেইরূপ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

তন্ত্রের মহাশক্তি এক, অদ্বিতীয় ও চৈতন্যরূপিণী। ইহাই চরম কথা নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম করুণা নিহিত আছে। করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাঁহার কৃপাতেই কেবল জানা যায়। বাহ্য আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহাকরুণাই লুক্কায়িত আছে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা"। যুদ্ধে অসুর-নিধনরূপ কার্যদ্বারা তাঁহার অপরিসীম করুণার পরিমাণ করা যায় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ করাও একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছে,—ইনি মাতৃরূপা। নিখিল বিশ্বের সর্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্যমান—"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" বিশ্বের সকল মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-করুণা একত্র করিলেও দেবী মহামায়ার মাতৃত্বের সমান হয় না।

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই যে, আমাদের সূর্য হইতে বৃহত্তর এক সূর্য কোন্ অজানা কারণে ইহার নিকট দিয়া বেগে চলিয়া যায়। সেই বৃহত্তর সূর্যের

প্রবল আকর্ষণে আমাদের সূর্যের অঙ্গহানি ঘটে। নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় ইহার দেহ হইতে। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়া যায় নাই। সূর্য হইতে বাহির হইয়া এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া ইহারা সূর্যকেই পরিক্রমা করিতেছে। সূর্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্বও মহামায়া হইতে আসিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে স্থিত আছে। আমরা না বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও ধ্বংস হইতে দেয় নাই, ইহা তন্ত্রের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ করুণা দেখা যায় না, হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণে তাহার অনুভব হয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি জড়, তাই উহাকে সংহত বা অধীন (control) করিয়া মানবের সুখ-সুবিধার্থে নিয়োগ করা বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞান শক্তির চৈতন্য স্বরূপে বিশ্বাসী বলিয়া, শক্তিকে অধীন করিয়া নিজ সুখবিধানার্থে প্রয়োগের পক্ষপাতী নহে। চেতন বস্তু অধীন হইতে চাহে না। তাহাকে অধীন করিতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। একটি বালকও যদি বুঝিতে পারে যে তাহাকে অধীন করিয়া যথেচ্ছ চালিত করিবার কেহ চেষ্টা করিতেছে, সে তখন আর উহা অম্লান বদনে মানিয়া লয় না। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যাহা সর্বভূতে বিরাজমান, তাঁহাকে অধীন করিয়া ভোগ করিতে গেলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরূপা দেবীকে জানিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পূজা করিলে, তাঁহার কৃপাতেই বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপ-লাবণ্যবতী মাতৃদেবীর মহাশক্তির কথা শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শক্তি ভোগের বস্তু নহে। তিনি মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্যা। মায়ের আরাধনাতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি দ্বারা সাধক শান্তির অধিকারী হন। পক্ষান্তরে সমাজ দুর্নীতি পরায়ণ হইলে ও শক্তিরূপিণী মা-কে ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে ফল শুভ হয় না। তন্ত্রমতে ইহা আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করিয়া উহা নিজ সুখ ভোগে নিয়োজিত করেন। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ রাবণের আজ্ঞাবহ দাসের মত সেবা করিতেন। কিন্তু আড়ালে তাঁহারা রাবণের বিনাশের জন্য সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন। মানব-সভ্যতা যখন কেবল ভোগোপকরণের সমৃদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদানসকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আসুরিক সভ্যতা যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ধ্বংসের রূপ ও মানবের ধ্বংসমূলক কার্যে উহার নিয়োগ ও প্রস্তুতির প্রয়াস দেখিয়া সারা বিশ্বে আজ ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সমুন্নত ও মানবের কল্যাণকামী কোন বিশ্বমানব-সংস্থার (World board) উপর এই পারমাণবিক শক্তির পরিচালনার ভার ন্যস্ত না হইলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তন্ত্র-বিজ্ঞানের এই অভিমত।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে আসে দুঃখ ও অশান্তি। জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত শক্তিহীন হইয়াছে। তন্ত্রমতে মহাশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের উপায় পূজা। পূজার তত্ত্ব পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। ❑

মা দুর্গা দেবী

বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদের মূল কথা—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

বেদের ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—ঈশ্বর নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা পাইয়াছিলেন ঈশ্বরের নানা শক্তির পরিচয়। সেই সকল শক্তিই হইলেন বেদের দেবতা। ঋষিরা দেবতাদের নামকরণও করিলেন। যেমন, ঈশ্বরেব যে শক্তিতে মেঘ-বৃষ্টি হয় ঋষিরা সেই শক্তিব নাম রাখিলেন ইন্দ্র। এভাবে ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি হইলেন বেদের দেবতা।

বেদের দেবতাদের চেহারা ছিল না। ঋষিরা যজ্ঞ করিতেন এবং স্তব-স্তুতি করিয়া সেই যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করিতেন। দেবতারাও অলক্ষ্যে উপস্থিত হইযা ঋষিদের কল্যাণ সাধন করিতেন। দেবতারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু এক ঈশ্বরের বহু প্রকাশ। অনেক দিন পরে ঋষিদের কাছে আবার প্রতিভাত হইল—

"সত্যং শিবং সুন্দরং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।"

ঈশ্বর ব্রহ্ম। তিনি সত্যস্বরূপ। মঙ্গলময় ও সকল সৌন্দর্যের আধাব। তিনি জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ।

ঋষিরা দ্রষ্টা। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর ঋষি নয়। নিরাকারকে চিন্তা করিতে পারে না সে। তাই, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ভক্ত তৃপ্ত হইলেন না।

ভক্ত চাহিলেন—উপাস্যকে চোখে চোখে রাখিতে, তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে, তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহাকে মনের কথা জানাইতে। তাই—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।।"

অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর রূপ গ্রহণ করিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। বেদে ঈশ্বর বলিয়াছেন—"একোঽহং বহু স্যাম্।" আমি এক। আমি বহু হইয়া থাকি। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ রূপ গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরা নিজেদের রুচি অনুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিলেন। পূজার সৃষ্টি হইল। 'পূজা' কথাটি দ্রাবিড়দের। ইহার অর্থ পুষ্পকর্ম। যেমন বৈদিক যজ্ঞকে বলা হইত পশুকর্ম।

আর্য মনীষার প্রভাবে দ্রাবিড়ী 'পূজা' শব্দটি সংস্কৃতে স্থান পাইল। তখন ইহার অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া দাঁড়াইল এই—ফুল বেলপাতা প্রভৃতি উপকরণ ও উপচার দ্বারা ভগবানের

আবাধনা।

পূজা আমাদেব পৌবাণিক কৃত্য। পূজা বলিলে সাধাবণতঃ মূর্তিপূজাকেই বুঝায়। মূর্তিপূজা অনন্ত অসীম ভগবানেব প্রতীক উপাসনা। দুর্গাপূজাও মূর্তিপূজা—নিবাকাব ঈশ্ববেব সাকাব উপাসনা। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। পুবাণে হইয়াছে তাঁহাব ৰূপাযণ।

জনকল্যাণেব জন্য দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা হিন্দুব জাতীয় পূজা। জাতিব ঐহিক ও পাবত্রিক কল্যাণই দুর্গাপূজাব লক্ষ্য।

দুর্গাপ্রতিমাব লক্ষ্মী ধনেব, সবস্বতী জ্ঞানেব, কার্ত্তিক বীবত্বেব, গণেশ সাফল্যেব প্রতীক। আব দুর্গাব দশটি হাত ও দশটি প্রহবণ অপবিমেয় বলবীর্যেব দ্যোতক। এই সকল গুণেব অধিকাবী হইলেই জাতি সত্যিকাবেব স্বাধীনতা লাভ কবে। সিংহ বশ্যতাব প্রতীক। মহিষাসুব সমস্ত অশুভেব প্রতীক। একটা বলিষ্ঠ জাতি সমস্ত অশুভ দলিত কবিযা পবিপূর্ণতা লাভ কবে। নিখিল বিশ্বে দুর্বলেব স্থান নাই। চাই শক্তি আব শক্তি। এ জন্যই দুর্গাপূজা। দুর্গা অনন্ত শক্তিব প্রতীক, দুর্গাপূজা অনন্ত শক্তিব প্রতীক পূজা।

দুর্গাপূজা মাযেব পূজা—মাতৃভাবে অনন্তেব উপাসনা। দুর্গা মা। তাই মাযেব কাছে সন্তানেব শত আবদাব—"সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে" বলিযা আকুল ক্রন্দন।

দুর্গাপূজা প্রধানতঃ বাঙ্গালী হিন্দুব পূজা। আগমনী গান স্বামী-গৃহবাসিনী কন্যাব জন্য বাঙ্গালী মাযেবই প্রাণেব কথা। যে-সকল জিনিয শবৎকালে বাংলাদেশে পাওযা যায এবং যে-সকল বস্তু বাঙ্গালীব নিত্য প্রযোজনীয সে সমস্তই দুর্গাপূজাব আবশ্যকীয উপকবণ। কলা, কচু, হলুদ, জযন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান, ধান এই নযটি দ্রব্যেব সমন্বযে গঠিত কলা বউটি বাঙ্গালী মনীযাবই নিদর্শন। কলা কচু প্রভৃতি বাঙ্গালী হিন্দুব দৈনন্দিন জীবনেব প্রযোজনীয দ্রব্য।

বাঙ্গালী ক্ষেত খামাবে যাহা ফলায, বাঙ্গালী যাহা পায ও যাহা খায, তাহাই সে নিবেদন কবে তাহাব উপাস্যকে।

"প্রিযজনে যাহা দিতে পাবি তাহা দেই দেবতাবে।"

দুর্গাপূজা হিন্দুব সর্বজনীন পূজা। প্রতিমায সর্বজনীনতা—দুর্গাব সঙ্গে অন্যান্য দেবতাও আছে। মন্ত্রে সর্বজনীনতা—"তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।" হে দেবী! সমস্ত দেবতা সহিত তুমি আমাব পূজামণ্ডপে বিবাজ কব। পূজাব বিধিতে সর্বজনীনতা—দুর্গাব সহিত দুর্গাব বাহন সিংহেব, কার্ত্তিকেব বাহন ময়ূবেব, গণেশেব বাহন ইঁদুবেব, এমন কি মহিযাসুবেবও অর্চনা কবিতে হয। পূজাব অঙ্গীয দ্রব্যাদি আহবণে সর্বজনীনতা—গঙ্গা জল সাগবেব জল যে কেহ আহবণ কবিতে পাবে। অনুষ্ঠানকাবীদেব মধ্যে সর্বজনীনতা—কুম্ভকাব প্রতিমা গড়ে, পুবোহিত পূজা কবেন, নাপিত দর্পণ দেয, মালী ফুল যোগায, বাদ্যকব ঢাক বাজায, ভুঁইমালী পূজাব সময নির্দেশ কবে। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে সর্বজনীনতা—উচ্চ-নীচ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলে একত্র হইযা দাঁড়াইযা মাযেব চবণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিযা ধন্য হয। পূজাব পব বিজযা। বিজয়ায অবাধ মিলন।

দুর্গাপূজাব ঐহিক ফলশ্রুতি তিনটি—শক্তিলাভ, সমত্ব ও বিশ্বমৈত্রী। মাযেব প্রতিমা দর্শন করিয়া এবং পূজাব সর্বজনীনতায উদ্বুদ্ধ হইয়া যে-দিন আমবা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিযা বিশ্বমৈত্রী

প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, সেই দিনই হইবে আমাদের দুর্গাপূজা ও প্রতিমা দর্শন সার্থক। সেই দিনই আমরা হইব—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।"

এই মহামন্ত্র পাঠের অধিকারী। ❑

ভক্ত পায় অমৃত, অসুর পায় মৃত্যু

অসুর শব্দেব প্রাচীন অর্থ ছিল যে প্রাণশক্তি রক্ষা করে বা যাহার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য (অসু—প্রাণ)। তারপর অসুর শব্দের অর্থ হইয়াছিল যাহারা আকার মানে না। অসুর শব্দের শেষ অর্থ সুর-বিরোধী। যে দেব-দেবী কিছুই মানে না অথচ তার মধ্যে প্রাণশক্তির খুব প্রাচুর্য। প্রাণে শক্তি আছে কিন্তু "দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞে" আস্থাহীন। শক্তি আছে কিন্তু অসৎপথে পরিচালিত।

দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির সংঘর্ষ সর্বদাই লাগিয়া আছে। এই সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে আছে। আমাদের বাহিরে সমাজে দেশে রাষ্ট্রের সর্বত্র এই দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলিতেছে। সাধকের সাধনক্ষেত্রেও এই সংগ্রাম বিদ্যমান। এই নিত্য ঘটনারই প্রতীক প্রকাশ দেবাসুর-সংগ্রাম রূপে। আসুরিক সম্পদ্ বলিতে গীতার নির্দেশ—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।"

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতা—এগুলি আসুরিক সম্পদ্। সকল প্রকার কল্যাণের পথেই এই আসুরিক ভাবগুলি অন্তরায়। সমগ্র আসুরিক ভাবগুলির মূর্তি অসুর। ইহার প্রাণশক্তি প্রচুর কিন্তু অসৎপথে চালিত। ইহাকে শুভ পথে আনিবার জন্য মায়ের চেষ্টা। অসুরও মায়েরই সন্তান। মা যে আঘাত করেন অসুরকে তাহার মধ্যে মঙ্গল ইচ্ছা বিদ্যমান।

"চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।"

নিষ্ঠুর ভাবে মা যে অসুর-সন্তানকে আঘাত করেন, তাহার মধ্যেও তাঁহার কৃপা আছে। আঘাত দিয়া শুভবুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা করেন। অথবা তমোময় দানব দেহ নাশ করিয়া আত্মার সত্ত্বভাব জাগাইয়া দেন। যে-সকল অসুর তাঁহার হাতে মৃত্যুবরণ করে; তাহারা পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

অসুরেরা যে পরিমাণ পাপকার্য করে, তাহাদের বিচার যদি যমরাজাব বিধিমত হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোটি কোটি কল্প নরকবাস করিতে হয়। পরন্তু জগজ্জননীর শস্ত্র-স্পর্শে পূত হইয়া তাহারা পরমগতি লাভ করে। মায়ের চিত্তে 'কৃপা' আছে বলিয়াই এতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব হইয়া থাকে।

---

[১] *'মহানাম অঙ্গন'। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৯৫)*

অসুরেরাও মায়ের সন্তান। অসুরের শক্তিও মায়ের শক্তি। কারণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র মা-ই আছেন। বিশ্বের যাহা কিছু সবই তাঁহার প্রকাশ। মায়ের প্রকাশ অশেষ বিধায়, তিনি কখনও সৌম্যা ও রৌদ্রা। কখনও অতি সৌম্যা। কখনও অতি রৌদ্রা। ত্রিজগৎ পালন পোষণ করেন সৌম্যা মূর্তিতে। অসুর ধ্বংস করেন অতি রৌদ্রা স্বরূপে। সৌম্যা মূর্তির হাতে অমৃত। রৌদ্রা মূর্তির হাতে মৃত্যু। যে-যার যোগ্য সে তাহাই পায়। ভক্ত পায় অমৃত। অসুর পায় মৃত্যু। কি আশ্চর্য! মৃত্যু পাইয়াও অসুর মুক্তি লাভ করে!!

সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। পরা বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করিয়া মহামুক্তি বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট, ভয় ভীতি, আপদ্ বিপদ্ সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরম করুণাময়ী মা সন্তানের জন্য কত ব্যস্ত। নিরন্তর অসুর বিনাশ করিয়া সন্তানের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। শ্রীচরণে আশ্রিত সন্তান রক্ষায় চির বিজয়িনী মা দুর্গার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া আমরা প্রার্থনা করি—মা! অসুর বিনাশ কর। আসুরিকতা নাশ কর। আমাদের জীবন মধ্যে দৈবী ভাব জাগ্রত কব।

শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে

মা আনন্দময়ীর আগমন। অভিনব সংবাদ বটে। স্বরূপতঃ যিনি নিত্যা এবং উৎপত্তিরহিতা, তাঁহার শুভ আবির্ভাব। দুঃখী সন্তানের জন্য বরাভয়করা দিকে দিকে মঙ্গলের জয়ডংকা ধ্বনিত করিয়া আসিতেছেন। আসিবার কথা নহে। আসিবার কালও নয়, তবু আসিতেছেন। মধুমাসে, শুভ বসন্তেই দেবী আসেন। শরৎকালে নয়। কিন্তু শোকতাপদগ্ধ অভাব-অভিযোগ প্রপীড়িত সন্তানের আর্তিতে বেদনাতুরা করুণাভরা মাতৃহৃদয়। তাই ছুটিয়া আসিতেছেন অকালেই। সন্তানের দুঃখবেদনায় করুণাময়ীর কি কালাকালের অপেক্ষা থাকিতে পারে? শারদীয়া পূজা দেবী মহামায়ার অকালবোধিত পূজা।

বর্ষে বর্ষে দেবী আসেন আমাদের ঘরে। গ্রীষ্মের তাপ ও বর্ষার আকাশের ঘনান্ধকার অপসারিত হইয়া স্বচ্ছ সুন্দর শারদশোভায় দিগ্বিদিক্ হয় পূর্ণ। যেন সকলের ত্রিতাপজ্বালা ও নৈরাশ্যের বেদনা শারদীয়াদেবীর আবির্ভাবের সূচনাতেই দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়। উপরের আকাশ, নীচের শস্যক্ষেত্র সকলই শ্যামলশোভা ধারণ করে। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্তির দ্যোতনায় নাচিয়া উঠে সবার প্রাণ। উৎসবানন্দে আকাশ বাতাস হইয়া উঠে মুখর। দুর্গতিনাশিনীর আগমন সূচিত হয় দিকে দিকে।

সন্তাপে জর্জরিত জীব। আর্তিভরা জীবন সকলের। জীব চায় সুখ শান্তি। কোন্ পথে গেলে কী উপায় অবলম্বন করিলে লাভ হইতে পারে—ইহাই জীবন-জিজ্ঞাসা। ত্রিকালদর্শী ঋষির সত্যানুভূতি—দেবী মহামায়ার শান্তিময় ক্রোড়েই উহা লভ্য। করুণার নিলয় মা

** 'উজ্জীবন'। আশ্বিন, ১৩৮২, খড়দহ শ্রীশ্রীবলবাম ধর্ম সোপান প্রকাশিত। 'শ্রী' সম্প্রদায়ের মাসিক পত্রিকা। সম্পাদকঃ শ্রীমৎ নৃসিংহবামানুজ দাস।*

আমাদের। কিন্তু মোহগ্রস্ত জীব স্বরূপভ্রষ্ট। ভুলিয়াছে করুণাময়ী মাকে, তাইতো জীবন হাহাকারে ভরা। নিজ চেষ্টায় মাতৃস্মৃতি ফিরাইয়া আনা একরূপ অসম্ভব। তাই শত চেষ্টা করিয়া জীবনে শান্তিলাভ করা সম্ভব হইতেছে না। অহেতুক কৃপাময়ী মায়ের করুণাই সম্বল। তিনি করুণা করিতেই আসিতেছেন। সকল অক্ষমতা ঘুচাইয়া, বেদনা মুছাইয়া শান্তিসুধা পাত্র হস্তে আসিতেছেন মা আমাদের। সকল মানবসহ বিশ্বপ্রকৃতি আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে আবির্ভূতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে।

জীবন যে দুঃখে ভরা তাহার কারণ মাতৃদেবীর সহিত যোগসূত্রের অভাব। মায়ের আরাধনাতেই এই যোগসূত্র স্থাপিত হইবে। তাই রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে লক্ষ্য করিয়া আর্ত সন্তপ্ত জগজ্জীবের জন্য ঋষি উপদেশ করিয়াছেন—

"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।।" (চণ্ডী, ১৩।৪-৫)

—হে মহারাজ। সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও, যিনি আরাধিতা হইলে জনগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাধকদ্বয় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য কঠোর সাধনা করিয়া মহাদেবীর সাক্ষাৎকার ও বর লাভ করেন। রাজা প্রার্থনা করিলেন—ইহজন্মে হৃতরাজ্য উদ্ধার ও পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ। আর বৈশ্য চাহিলেন—জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা 'আমি ও আমার' এই মিথ্যা অভিযান ও আসক্তি দূর হয়। রাজা চাহিলেন রাজ্যসুখ ও বিষয়ভোগ। আর বৈশ্য চাহিলেন বিবেক ও বৈরাগ্য। উভয়ের প্রার্থনানুযায়ী ফললাভ। রাজা পাইলেন—ভুক্তি, আর বৈশ্য পাইলেন—মুক্তি।

দেবী মহামায়া সুখদা ও মোক্ষদা। চণ্ডীর দুইজন শ্রোতার রহস্য ইহাই। বিষয়-সুখ ও মোক্ষ ছাড়া আর একটি পরম সম্পদ্ মহাশক্তি মহাদেবী প্রদান করিতে পারেন। তাহা হইতেছে — শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি (সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী)। যাহার যে অভাব এবং তজ্জনিত যে আর্তি — প্রার্থিত সম্পদ্ দান করিয়া তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ দূর করেন। দেবগণ মাতৃস্তবে যথার্থই বলিয়াছেন— "সর্বস্যার্তিহরে দেবি" সকলের সকল প্রকার আর্তি বা বেদনা হরণ করাই মায়ের করুণাশক্তির কাজ। ভোগী ব্যক্তির ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত যে আর্তি, বৈরাগ্যবান সাধকের মুক্তিলাভের জন্য যে আর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে শুদ্ধাভক্তির প্রয়াসী নির্মলচিত্ত ভক্তজনের যে আর্তি—সকলই দূর করেন মাতা প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া। সাক্ষাৎ করুণার প্রকট বিগ্রহ সন্তানের সকল বেদনা দুঃখ-তাপ মুছাইতে মা অভয়-বরদারূপে নিয়তই আমাদের শিয়রে প্রতীক্ষমানা।

মানবসভ্যতা আজ ভোগমুখী। ভোগ-সুখের প্রতি অতিরিক্ত অভিনিবেশই সকল দুঃখের কারণ। বিষয়সুখের কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে স্বরূপবিস্মৃতি আনয়ন করে। মা মহামায়াকে ভুলিয়া জীব মহাদুঃখে নিপতিত হয়। অপরপক্ষে

মাতৃস্বরূপে স্থিত হইলে সকলই লাভ হইয়া থাকে, কিছুই হারাইতে হয় না। বিশ্বমাতার পূজায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসার। বিশ্বভ্রাতৃত্ব সকলকে মহৎ করিয়া তোলে। সকলে সর্বভূতহিতে রত হইলেই বিশ্বের পরম কল্যাণ। আজ সমস্যাবহুল দেশের চরম দুর্দিনে বিপন্মুক্তির জন্য ভক্তিবিনম্র চিত্তে মাতৃচরণে আমাদের স্তুতি ও প্রণতি জানাই—

"শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।" ❑

জগজ্জননী কালীমাতার তত্ত্ব

কালী মহাকালের শক্তি মূর্তি। যাহা কিছু কালে ছিল, আছে এবং থাকিবে—সকলই মহাকালীতে বিরাজমান। অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ একটি নিত্য মূর্তির মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজিত।

সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ, একই মহাশক্তির পরস্পর-সাপেক্ষ বিবিধ বিকাশ। বীজ-ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের ধ্বংসে যৌবনের উদয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্বের আস্বাদন। ভারতীয় ঋষিদের ইহা অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধ্বংসের মধ্যে তাঁহারা অনুপম সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সেই করুণাময়ী সৌন্দর্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তির বিগ্রহ মূর্তিই কালিকা। কেবল ধ্বংসের নহে, বিশ্বের সৃজন, পালন বিনাশকারী যাবতীয় শক্তিই কালিকাতে বিরাজিত। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, শ্রীকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান। মহাপ্রকৃতির পরিপূর্ণ চিত্র কালিকা। এই স্বরূপ ভক্তের ধ্যাননেত্রে দর্শনীয়।

কালীর হস্ত চারিখানি। দুই হাতে পালন করেন, দুই হাতে নিধন করেন। বামদিকের খড়্গ এবং মুণ্ড ভীষণ ধ্বংসের চিহ্ন। দক্ষিণ দিকের দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত, আর এক হাতে সান্ত্বনা। এক হাতে ভীতি-প্রদর্শন, অপর হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। এমন বিরুদ্ধতার অপূর্ব সমন্বয়, সামগ্রিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি—সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির এমন পূর্ণতম প্রতীক সারা বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। দেবীর গলদেশ মুণ্ডমালায় বিভূষিত। মুণ্ড হইতেছে জ্ঞান-শক্তির আধার। জ্ঞানরূপ মুণ্ডমালায় মহাশক্তির কণ্ঠ বিভূষিত। মুণ্ডসংখ্যা পঞ্চাশৎ। ইহা পঞ্চাশটি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমালা শব্দ-ব্রহ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ। আর্যঋষি শব্দব্রহ্ম (Logos) তত্ত্বের গভীর তলদেশে বিচরণ করতঃ মহাশক্তির রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কালিকার কণ্ঠে নরমুণ্ড সুগভীর মন্ত্রশক্তির প্রতীক চিহ্ন।

মায়ের পশ্চাতে আলুলায়িত কেশরাশি যেন একটি যবনিকা। পিছনটা ও মধ্যটা আমাদিগকে দেখিতে দিবেন না। "যাম্যেন চাভবৎ কেশঃ"—যমের শক্তি হইতে কেশ হইয়াছে। জীবনকে

* 'জগজ্জননী কালীমাতার তত্ত্ব' (পুস্তিকা), ১৩৯৯, ট্রাস্ট

রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন মৃত্যুর আবরণ দ্বারা কোন বৈচিত্র্যময় জগতের চরমতত্ত্বকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

কালিকাদেবীর অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ। সর্ব বর্ণের বিলয়-ভূমি কৃষ্ণই। অনন্ত অন্ধকারই কালীর যথার্থ রূপ। ঋগ্বেদ গাহিয়াছেন, "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে", আদিতে অন্ধকার গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত ছিল। আদিতে ছিলেন বলিয়াই তো তিনি আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি বলিয়াই তিনি অন্ধকার বর্ণা। পরমহংসদেব বলিতেন—"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রং নাই।" মহাশক্তি নিরাকার তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কালী দিগম্বরী। দিক্-দেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিবসনা। দেশ-কালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নহে; অসীম তিনি, ইহা বুঝাইতেই দিগ্বসনা মূর্তি।

মৃত ব্যক্তির ছিন্ন হস্তদ্বারা একটি মেখলা। হস্ত কর্মশক্তির আধার। জীবগণের কর্মফল মহাকালের অবিদ্যার অংশে আশ্রয় লয়। ঐ কর্মফল-বশতঃই তাহাদের আবার জন্ম হইবে। জীবের অভুক্ত কর্মফল প্রলয়ে মহাপ্রকৃতির গর্ভে নিহিত থাকে। পরবর্তীকল্পে ভোগের নিমিত্ত। তাই মহামায়ার কটিতে নৃ-করমালা দোদুল্যমান।

জননী ত্রিনয়না। ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি অন্ধকার-বিধ্বংসী এই তিন শক্তির বিকাশ। তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন। সত্য, শিব ও সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষস্থিত উন্নত স্তন ক্ষীর-পরিপূর্ণ। এক স্তন দ্বারা জগৎ পালন করেন আর এক স্তন-ধারায় সাধকগণকে পরমা মূর্তির অমৃতাস্বাদন করান।

জননীর রক্তবর্ণ জিহ্বা রজোগুণের সূচক। শুভ্রতা সত্ত্বগুণের প্রতীক। শুভ্র-দন্তের দ্বারা রসনা দংশন করিয়া সাধকদিগকে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে সংহত রাখিতে শিক্ষা দিতেছেন। ব্রহ্মপুরুষ শিব চরণতলে থাকিয়া তিনিও যে মহাশক্তির অধীন তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। পুরুষ শুধু অধ্যক্ষ বা দ্রষ্টা বা ঈক্ষণকারী। মহাপ্রকৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময় নিয়ত নৃত্যশীলা বা ক্রীড়াপরায়ণা। মহাশক্তির বাসস্থান শ্মশান। শ্মশান বলিতে শবের শয়ন স্থান। কর্মফল ভোগান্তে জীবের শেষ বিশ্রাম স্থান শ্মশান। সেই শ্মশানে কালী বাস করেন। কল্পান্তে তাঁহার আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। আমাদের প্রাত্যহিক প্রলয়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও আমরা যোগনিদ্রারূপিণী ঐ কালিকার স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করি।

ব্যাধি, সন্তাপ, বিরহ, বেদনা, উদ্বেগ সর্বতোভাবে মুছাইয়া দেন ঐ শ্মশানবাসিনী জননী কালিকা। জননীকে বলা হইয়াছে ভীষণ বদনা—"করালবদনাং ঘোরাং"—বিকট করালদংষ্ট্রা-সমন্বিতা। দেখিলেই মহাভীতির উদয় হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—'সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্"—সুখাতিশয্য হেতু সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল। মুখপদ্মে মৃদু হাসি শোভমান।

একই কালে বিরুদ্ধতার নিরুপম সমাবেশ। আসুরিক শক্তির সহিত যুদ্ধের সময়—"চিত্তে কৃপা সময়নিষ্ঠুরতা—চ দৃষ্টা"—এক অনির্বচনীয় ভাব। কালিকারূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নরনারীর পরমা জননী। ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী।

ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট—জীবেশ্বরের এই সম্বন্ধই পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রে পাই। খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরে পিতৃস্বরূপের ভাবও জানাইয়াছে। একমাত্র হিন্দু ঋষি ঈশ্বরে পরম মাতৃত্বের মূর্তি দর্শন করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা মাতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ নিবিড়তর। মাতৃ-সম্বোধন অধিকতর প্রাণস্পর্শী এবং সান্ত্বনাদায়ক। ক্রীড়ক্লান্ত শিশু মাতৃবক্ষে আরাম ও বিশ্রান্তি লাভ করে। আর্য ঋষি পরমকারণকে কেবল মা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—বিশ্বের সর্বভূতে এ মাতৃত্বের প্রকাশ দেখিয়াছেন—"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" মায়ের মূর্তির দিকে দৃষ্টি সম্পাত করিয়া ভক্ত সাধক দেখেন বজ্রকঠোর পুষ্পকোমল শাসন, গর্জন, পালন, পোষণ—অতি সৌম্য অতি রৌদ্র ব্রহ্মময়ী শক্তির এক করুণাস্নিগ্ধ বিরাট্ মাতৃত্ব। ইহাকেই অর্চনা করি। ইহারই চরণে ক্ষুদ্র আমিত্ব জলাঞ্জলি দিয়া, ইহারই ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া হিন্দু ভক্ত-সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। সর্বভূতে মাতৃত্বের দর্শনে সাধক কামজিৎ হন। কামের বিনাশে প্রেমের উদয়। প্রেম আসিলে ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়। মানবজাতির ঐক্য দৃঢ়তর হয়। আজ সমাজে সর্বাধিক প্রয়োজন জাতীয় একতার। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাই প্রার্থনায় কালীমাকে বলিয়াছেন—

"এস মা পাগলা কালী—
লয়ে প্রেমের ডালি—"।

বৈদিক বাঙ্ময়ে শ্রীশ্রীকালী

বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার কথা কোথায় কোথায় আছে ইহাই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অনেক পণ্ডিত লোকের ধারণা কালী বৈদিক দেবতা নহে। বেদ খুলিলে অগ্নিসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, বরুণসূক্ত, সোম সূক্ত, মিত্রদেব সূক্ত, আদিত্য সূক্ত—এইরূপ বহু সূক্ত দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে। তাহাতে ১০২৮টি সূক্ত আছে। ইহাতে কালী নামে কোন সূক্ত নাই।

ঋগ্বেদ ছাড়া আরও তিনখানি বেদ আছে। তাহার মধ্যে অনেক সূক্ত আছে। কিন্তু কোথাও কালী নামে কোন সূক্ত দৃষ্ট হয় না। এইজন্য অনেকের ধারণা—কালী বৈদিক দেবতা নহে; কালী অনার্য দেবতা বা লৌকিক দেবতা। আর্যজাতির একটি স্বভাব ছিল, যেখানে যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত বস্তু পাওয়া যায়—তাহাকেই তাহাদের নিজেদের ব্যাপক ঔদার্য বলে একাকার করিয়া লওয়া। এই কথাটিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় গর্বের সহিত বলিয়াছেন—

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হুন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা।
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হ'ল হারা।।"

আর্যজাতির স্বভাব এখনও বিরাজমান। তাই আর্যরা কোন কালের কোন অনার্যজাতির দেবতা কালীকে মিশাইয়া লইয়াছে। কালীমাতার মূর্তিটির দিকে তাকাইয়া দেখুন। লোল জিহ্বা, বিকট দশনা, গলায় নরমুণ্ডের মালা, রক্তপানে উন্মত্ত, বিবসনা ও স্বামীর বক্ষে দণ্ডায়মানা এবং

দর্শন মাত্রেই ভীতি উৎপাদনকারী—এইরূপ কোন দেবতার মূর্তি বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয়নি। সুতরাং ইহা আর্যেতর গোষ্ঠীর কোন দেবতা বলিয়া মনে হয়।

বহু বহু শতাব্দী পূর্বে আর্যরা কালীমাতার মূর্তি দেবতার গোষ্ঠী (pantheon)-এর ভিতর মিশাইয়া লইয়াছেন। এই ভাবনা অধুনা কাল পর্যন্ত আছে। প্রাচীন আর্যরা আকাশের তারাগুলি সংখ্যা তত কোটি মনে করিত, এর প্রত্যেক তারাকেই দেবতা মনে কবিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার ভাবনা করিত। এতগুলি দেবতাগোষ্ঠীর ভিতর দু'-একটি যোগ বা বিয়োগ দিলে কিছু ক্ষতি হইত না। এই জন্যই কালীকে দেবতা গোষ্ঠীব ভিতর অন্তর্ভুক্তিতে কোন ক্ষতি হইত না। এখন আমরা সুবচনী সন্তোষী প্রভৃতি দেবতাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছি এবং বেদের বিশিষ্ট দেবতা ইন্দ্র-বরুণদের পূজা বাদ দিতেছি। তাঁহাদের সম্বন্ধেও এরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

আমরা মনে করি শ্রীশ্রীকালী বৈদিক দেবতা। বৈদিক শাস্ত্রে কালীর নাম খুব সম্মানের সহিত উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ্
গীতা ও মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে কালীর নাম উল্লেখ আছে। একটু চক্ষু খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন। ❑

সরস্বতীদেবী অর্চনা

সোনার বাংলা, যে দেশে বাংলাভাযা জীবন্ত। রাজধানী ঢাকা শহর, সেখানে সৌন্দর্যের নাই অন্ত। এক মহীয়সী মহিলার নামাঙ্কিত হল 'রোকেয়া হল'—বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রীনিবাস। সেই হলের ছাত্রীবৃন্দ অর্চনা করিবেন সরস্বতী দেবীর। এই আনন্দের সংবাদটা এল এক পত্রে। তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলাম এই পত্রী।

দেবী সরস্বতীর আর এক নাম বাগ্‌দেবী। বাক্ হইতেই নিষ্পন্ন বাক্য শব্দ। আমরা দেখি, দৃষ্টিশক্তি দ্বারা, শুনি শ্রবণশক্তি দ্বারা, বাক্য বলি বা লিখি বাক্‌শক্তি দ্বারা। বৈদ্যুতিক শক্তি নাই; গৃহ অন্ধকার। বাক্‌শক্তি নাই—সাহিত্য চর্চা, কথালোচনা, বাগ্মিতা স্তব্ধ। বাক্‌শক্তি-অনুগ্রহ কার না প্রয়োজন?

বিদ্যা বাক্‌শক্তির অবদান। বিদ্যার রূপ নাই। কিন্তু আজ তাকে দিতে হবে রূপ। জ্যামিতির রেখার রূপ নাই। তার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই। তাই আঁকা যায় না। কিন্তু শিক্ষক বোর্ডের গায়ে একটি রেখা টানিয়া বলেন 'মনে কর ইহা একটি রেখা'। রূপহীনকে রূপ না দিলে ইতি হবে জ্যামিতির পঠন-পাঠন।

আজ দিতে হবে বিদ্যাদেবীর রূপ। মনে করতে হবে ইনিই বিদ্যাদেবী। মনে যদি না করেন শ্রদ্ধা জানাব কীরূপে? জাতীয় পতাকাকে অভিনন্দন না করিলে জাতিকে মর্যাদা দিব আর কী উপায়ে? পতাকা তুলিয়া দেশকে সম্মান দেই। সরস্বতীর মূর্তি বসাইয়া বিদ্যাকে সম্মান দেই।

* *'আঙ্গিনা'। ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংকলন (ফাল্গুন ১৩৯১)।*

বিদ্যালাভে অন্তর বাহির হয় মালিন্যহীন। শুভ্রতা নির্মলতার প্রতীক। বাগ্‌দেবী শুভ্রা, পবিত্রতার ছটায় বিশ্ব আলো করা। বিদ্বান্ ব্যক্তি হয় উদার, তাঁর ঔদার্য হয় জননীর। তাইতো সরস্বতী মা। দ্যোতমানা বলিয়া তিনি দেবী। উদারতা ও উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত বিদ্যা সর্বত্রই শোভায় অতুলনীয়া।

দেবী হংসবাহনা। জলে দুধে মিশিয়ে দিলে রাজহংস দুধটা খেয়ে নেয় জলটা পড়ে থাকে। যে প্রকৃত বিদ্যাবান সে সৎ অসৎ মিশ্রিত জগৎ হইতে সৎকে বেছে নেয়। সত্যকে গ্রহণ করে। ন্যায়কে আদর করে। যাহা কল্যাণময় তাহাকে অনুসরণ করে। যাহা তদ্বিপরীত তাহা ত্যাগ করে।

বিদ্যা মানব জীবনকে করে ছন্দোময় সঙ্গীতময়। তার প্রতীক মায়ের হাতে বীণা যন্ত্রটি। সকল ধর্মেই আছে একটি মহিমান্বিত গ্রন্থ। তাহা ঈশ্বরের বাণী। সেই পবিত্র গ্রন্থটি সরস্বতীদেবীর শ্রীহস্তে বিরাজমান।

অর্চনীয়া বাগ্‌দেবী আমাদের আশীর্বাদ করছেন—জীবন শুদ্ধ পবিত্র রাখ। সত্যকে আকড়ে ধরে রাখ। মূল গ্রন্থের বাণী পালন কর। জীবন ছন্দোময় কর। স্ব-ছন্দে থাক। এই আশীর্বাদ কার না সমাদরণীয়?

আজ সরস্বতী মায়ের পূজারিণী ছাত্রীবৃন্দ তোমরা। শির অবনত কর শ্রদ্ধায়। মিলিত হও আন্তরিকতায়। এক মন হও সমর্প্রাণতায়। পূজার ফল লাভ কর—তোমাদের জীবন হোক শুচি সুন্দর অনাড়ম্বর। চিত্ত হোক মায়ের মত স্নেহ করুণার নির্ঝর।

মহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯
৩১-১-১৯৮৪

শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ঃ আদি কথা

"শ্রীরামঃ শরণং সমস্ত-জগতাং রামং বিনা কা গতী,
রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্যং নমঃ।
রামাত্তৃপ্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বং বশে
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ।।"

শ্রীরামচন্দ্র নিখিল জীব-জগতের আশ্রয়স্থল।
শ্রীরাম ভিন্ন জীব-জগতের আর অন্য উপায় কী আছে?
একমাত্র রাম নাম দ্বারাই কলিহত জীবের তাপ নষ্ট হয়।
শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা সকল জীবের অবশ্যই কর্তব্য।
শ্রীরামচন্দ্র হইতেই ভীষণ কলিযুগ-সর্প তৃপ্ত হয় অর্থাৎ শান্ত হয়।
শ্রীরামচন্দ্রের বশীভূতই বিশ্বের সমস্ত জীব।
শ্রীরামচন্দ্রেই আমার অখণ্ড ভক্তি লাভ হউক।
হে রাম! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

একদিন বাল্মিকী দেবর্ষি নারদ মুনির আশ্রমে আসিলেন। দেবর্ষি তখন বিদ্যাধ্যয়নে রত। বাল্মিকী দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, আমাকে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষের কথা বলুন। দেবর্ষি বলিলেন, কীরূপ আদর্শ মানুষের কথা শুনিতে চাও?

বাল্মিকী বলিতে লাগিলেন, এমন একজন মানুষের কথা বলিবেন যিনি সর্বগুণে সমন্বিত, অপরিমিত পরাক্রমী, যিনি ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানেন। যিনি কোনদিন মিথ্যা কথা বলেন না, যাঁহার সঙ্কল্প কখনও শিথিল হয় না, কেহ তাঁহাকে সামান্য উপকার বা সেবা করিলে তিনি তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখেন।

বাল্মিকী বলিলেন, দেবর্ষি! আরও বলি শুনুন, এমন একটি ব্যক্তির কথা বলিবেন যাঁর অসীম ধৈর্য, অন্যের গুণের মধ্যে কাহারও দোষ দেখেন না, যিনি ক্রোধরূপী মহাশত্রুকে জয় করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধাবিষ্ট অবস্থায় দেখিলে দেবগণও ভীত হন। তাঁহার মনের গুণরাশি যেমন দেহের গুণরাশিও তেমন, উজ্জ্বল কান্তিময় পুরুষ, এমন একজন আদর্শ পুরুষের কথা বলুন যিনি বাস্তবে পৃথিবীতে বাস করিয়াছেন বা করিতেছেন।

বাল্মিকীর প্রশ্নে নারদ খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, শোনো, তোমার জিজ্ঞাসার

উত্তর দিব।

তুমি যে-সব গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ ঐরূপ গুণরাশির সমাবেশ কোনও মানুষে সত্যিই দুর্লভ। আমি চিন্তা করিয়া বলিতেছি ঐরূপ সর্বগুণান্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা বলিব।

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম রামচন্দ্র। তিনি পরম কান্তি, অতি সমুজ্জ্বল, স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত, তাঁহার গ্রীবাদেশ ক্ষীণ রেখা দ্বারা শোভিত, বাহু আজানুলম্বিত, ললাট মস্তক উন্নত সুন্দর; তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, গতি সিংহের মত। তাঁহার বর্ণটি স্নিগ্ধ শ্যামল। অতি বিনীত ও আশ্রিত-বৎসল। তিনি আচার ও প্রচার দ্বারা ধর্মের রক্ষক, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রপারদর্শী। তাঁহার প্রতিভা ও জনপ্রিয়তা সর্বজন-চিত্তাকর্ষী। সকল নদনদীর আশ্রয় যেমন সমুদ্র তেমনি সকল সজ্জনগণের আশ্রয়স্থল সমদর্শী এবং সকলেরই প্রীতি-সম্পাদনকারী শ্রীরামচন্দ্র।

রামচন্দ্র চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, অগ্নির মত শক্তিশালী। তাঁহার ক্ষমাশীলতা পৃথিবীর মত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে প্রলয়কালীন অগ্নির মত। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় তিনি মূর্তিমান ধর্ম। বেদ-বেদান্তের গূঢ় রহস্য রামচন্দ্র জানেন। ধনুর্বেদশাস্ত্রের পরম পণ্ডিত। রাজধর্ম-পরায়ণ ও স্বজন-প্রতিপালক।

এইরূপ সকল গুণে বিভূষিত সর্বজনের রক্ষক রামকে রাজা দশরথ যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজা দশরথের এক প্রিয়া মহিষী কৈকেয়ী পূর্বে রাজার নিকট দুইটি বর চাহিবার জন্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। রামের অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া তিনি ঐ দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। প্রথম বরে রামের বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজপদে অভিষেক। "বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্।"

রাজা দশরথ পরম সত্যবাদী হওয়ায় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে বনবাসে পাঠাইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, পিতৃদেব যাহা বলিবেন তাহা অবশ্যই করিব। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই তাঁহার বনে গমন। "পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ।" পিতৃআজ্ঞা পালন এবং প্রীতিবিধান দুই-ই পালন করা অবশ্যই তাঁহার ধর্ম।

রামের অনুজ সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ। বড় ভাই বনে যাইবে দেখিয়া স্নেহবশতঃ তিনিও বনগমন করিলেন। এই আচরণের দ্বারা লক্ষ্মণ অকপট ভ্রাতৃপ্রেম দেখাইলেন।

জনক রাজার কন্যা সীতাদেবী রামের প্রাণসমা পত্নী। তিনি রমণী-শিরোমণি রঘুকুলসতী। তিনিও পতির সহিত গমন করিলেন।

রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে ছিলেন। সেখানে নিষাদপতি গুহক বাস করিতেন। তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিলেন। বহু নদনদী পার হইয়া সীতা লক্ষ্মণসহ ভরদ্বাজ মুনির কুটিরে পৌঁছিলেন। ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামকে চিত্রকূট

বাস করিতে আদেশ করিলেন। সেইখানেই তাঁহারা তিনজন পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ওদিকে পুত্র-বিরহে কাতর রাজা দশরথ বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি ভরতকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন রাজ্য চালাইবার জন্য। ভরত বশিষ্ঠর প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি অগ্রজকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন।

ভরত চিত্রকূটে রামের সন্ধানে গিয়া রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। কোনও প্রকারেই ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া পিতার আদেশ পালন করাকেই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিলেন। তিনি ভরতকে শ্রীপাদুকা দান করিয়া প্রীত করিলেন। ভরত নিরুপায় হইয়া নন্দীগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন ও রামের পাদুকাকে আসনে বসাইয়া সেবক স্বরূপ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের আদর্শ উজ্জ্বল। ভরতের আদর্শ তদপেক্ষাও উজ্জ্বল।

পুনর্বার ভরত আসিতে পারে এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বনবাসী তপস্বী আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আবেদন জানাইলেন বনের দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে। রামচন্দ্র ঋষিগণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসগণকে বধ করিবেন।

দণ্ডকারণ্যে বসবাসের সময় রাম মায়াবিনী রাক্ষসী শূর্পনখাকে নাসাকর্ণচ্ছেদনের দ্বারা বিরূপা করেন এবং চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন। জ্ঞাতিগণের নিধন সংবাদে অধিপতি রাবণ ক্রোধে অধীর হইল। রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের সহায়তায় রাম-লক্ষ্মণকে অতি দূরে সরাইয়া সীতাকে হরণ করিলেন। সীতার রক্ষার্থে আগত জটায়ুকে রাবণ বধ করেন।

রামচন্দ্র নিজের কুটীরে আসিয়া মৃতপ্রায় জটায়ুর রক্তাক্ত মুখ হইতে সীতাহরণের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। রামচন্দ্র কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে বধ করেন। রামের হাতে নিহত হইয়া কবন্ধ স্বর্গে গমন করিল। গমনকালে সে রামচন্দ্রকে তপস্বিনী শবরীর নিকট গমন করিতে নির্দেশ দিলেন। রামচন্দ্র শবরীর গৃহে আসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করেন।

তৎপর পম্পা সরোবর তীরে উপস্থিত হন। পম্পাতটে রামচন্দ্র হনুমান নামক এক বানরের সহিত মিলিত হন। হনুমানের প্রস্তাবে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হন। বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং নিজের মতই দুঃখী দেখিয়া প্রীত হইলেন। সুগ্রীব তাঁহার রাজ্য নাশ ও পত্নী হারাইবার কথা রামের নিকট নিবেদন করিলেন। শ্রীরাম ও সুগ্রীব অভিষেক করিয়া মিত্রতা স্থাপন করেন, উভয়ের দুঃখ উভয়ে নাশ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া। শ্রীরামকে লইয়া সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন। সুগ্রীবের

গর্জনে তাঁহার অগ্রজ বালী বাহির হইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে রত হন। এই অবস্থায় রাম বালীকে নিহত করেন। রাম বালীর রাজ্যে সুগ্রীবকে স্থাপন করেন। সুগ্রীব বানর সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরণ করেন।

মহা শক্তিশালী হনুমান সম্পাতি নামক পক্ষীর নির্দেশমত (গৃধ্রস্য বচনাৎ) সমুদ্র লঙ্ঘন করেন। হনুমান রাবণ কর্তৃক রক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে অশোকবনে রামধ্যানরতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন (ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্)। সীতার নিকট হনুমান রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান দেখাইলেন। সীতা আশ্বস্থা হইলেন। হনুমান রাবণের সাতজন মন্ত্রীপুত্রকে বধ করিলেন, অক্ষকে নিষ্পিষ্ট করিলেন (শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য) এবং পিতামহ-দত্ত বর-প্রভাবে নিজেকে মুক্ত জানিয়াও ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন। হনুমান স্বেচ্ছায় এই বন্ধন স্বীকার করিলেন (যদৃচ্ছয়া)।

হনুমান অশোকবন ভিন্ন সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিবার জন্য রামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন (রামায় প্রিয়মাখ্যাতুম্)। হনুমান শ্রীরামকে নিবেদন করিলেন আমি সত্যই সীতাকে দেখিয়াছি (দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ)। রাম সুগ্রীবের সহিত লবণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তেজোময় বাণের দ্বারা সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিলেন। সরিৎপতি নিজে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কথামত রামচন্দ্র নল নামক বানরের দ্বারা সেতুবন্ধন করিলেন। এই সেতুর সাহায্যে তিনি লঙ্কায় গমন করিয়া রাবণের প্রাণহরণ করিলেন এবং সীতাকে উদ্ধার করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

রাম জনসমক্ষে সীতার প্রতি অতি কঠোর উক্তি প্রয়োগ করিলেন। সীতা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অগ্নির কথায় সীতাকে পাপশূন্য জানিয়া সীতাকে গ্রহণ করিলেন। এই মহৎকার্যে দেবতা মুনি স্থাবর জঙ্গম সহিত সমস্ত ত্রিভুবন সন্তুষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিলেন, দেবতাগণের নিকট বর প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে নিহত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিলেন। তারপর পুষ্পক রথে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন, সেখান হইতে হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইলেন। তারপর নন্দীগ্রামে পৌঁছিলেন। সেখানে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন। জটাভার ত্যাগ করিলেন, সীতাকে পাশে রাখিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

এই পর্যন্ত বলিয়া নারদ বাল্মিকীকে বলিলেন— সেই রামই এখন রাজ্য পালন করিতেছেন। রামরাজ্যে প্রজাগণ সুখে শান্তিতে থাকিবে, রাজ্যে দুঃখ থাকিবে না। কাহারও শারীরিক ব্যাধি, মানসিক তাপ ও দুর্ভিক্ষ জনিত ভয় থাকিবে না। ঝঞ্ঝাবাতের ভয় চৌর-ভয় কখনই হইবে না। সম্পূর্ণ রাজ্যেই ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিবে। রামরাজ্যে কোন পিতাই পুত্রের মৃত্যুদর্শন করিবে না, নারীগণ বৈধব্য প্রাপ্ত হইবে না এবং ব্যভিচারিণী হইবে না।

এই রামচরিত অতি পবিত্র পাপনাশকারী। ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-পারদর্শী

হইবে, ক্ষত্রিয় রাজ্য লাভ করিবে, বৈশ্য বাণিজ্য লাভ করিবে, শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবে।

বাল্মিকী নারদের মুখে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিলেন। শিষ্যবর্গ লইয়া বাল্মিকী নারদকে অর্চনা করিলেন। নারদ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

তারপর বাল্মিকী মুনি তমসা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। নদীর তটস্থিত বিশাল বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। একটি বৃক্ষে দু'টি ক্রৌঞ্চ পাখী বসিয়াছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না। পাখী দু'টি মধুরভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাধ তখন তাদের মধ্যে একটি পাখীকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। পাখীটি রক্তাক্ত শরীরে ভূমিতে পড়িয়া গেল। অপর পাখীটি করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। আহত পাখিটি ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত বাল্মিকী বলিয়া উঠিলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

ওরে নিষাদ, আনন্দোন্মত্ত একটি পাখীকে তুই বধ করিয়াছিস্, তুই পৃথিবীতে কোনদিন কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারবি না।

পাখীর শোকে কাতর মুনির মুখ হইতে যে দুইটি পংক্তি বাহির হইল তাহাকে নাম দিলেন শ্লোক (শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা)। ইহাতে চারিটি পাদ। প্রতিটি পাদে আটটি অক্ষর। উহা বাদ্যযন্ত্রের সহিত তানলয়ে গান হইতে পারে। এইরূপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের দ্বারা কোন্ মহতের গুণগান করিব? নারদমুখশ্রুত শ্রীরামচন্দ্রের গুণগানই করিব। □

'শ্রীশ্রীরামচরিত-মানস'—ভূমিকা

'শ্রীশ্রীরামচরিতমানস' গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজীর মানস-প্রতিমা, বুকচেরা ধন। প্রাণভরা রাম-প্রেমের উৎস হইতে ইহা গঙ্গোত্তরীর ধারার মত স্বতঃ উৎসারিত। ইহাকে গ্রন্থ মাত্র বলিলে কিছুই যেন বলা হয় না। মূলগ্রন্থ হিন্দী ভাষায় প্রকটিত। তাহাকে বাংলা ভাষায় রূপায়িত করি শব্দার্থ, পদার্থ ও বিশদার্থ বর্ণনায় অলংকৃত করিয়াছেন মা শ্রীযুক্তা জীবনবালা দেবী। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন উত্তর বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। এইটি প্রথম খণ্ড।

এ জীবাধমের প্রতি মাতা আদেশ করিয়াছেন একটি ভূমিকা লিখিতে। আদেশটি পালন করিতেই হইবে। কিন্তু কাজটি বেশ দুরূহ মনে হইতেছে। তুলসীদাসজী নিজেই নিজ শ্রীগ্রন্থের

'শ্রীশ্রীরামচরিতমানস' (১ম খণ্ড, বালকাণ্ড)। অনুবাদিকা—শ্রীমতী জীবনবালাদেবী। প্রকাশক ঃ বাংলা সাহিত্য মন্দির। জলপাইগুড়ি ১৩৫৯।

ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই খণ্ড সেই ভূমিকা খণ্ডই। ভূমিকা হইল ভিটি। ভিটির ভূমিকা হইল মাটি। যদি মাটি হইতে পারিতাম তবে হয়তো ঐ তুলসী প্রসাদের ভূমিকা কিছু করা সম্ভব হইত!

গ্রন্থ-ভূমিকায় তুলসীর প্রণাম-বন্দনায় দৈন্য-বিনয়ের নিরুপম ভিত্তিস্থাপন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। যাঁহার গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে কাব্যরসের উৎস তিনি কিনা শপথ করিয়া বলিয়াছেন "কবিতা বিবেক এক নহিঁ মোরে।" কবিতা রচনা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বা বিচারশক্তি এক বিন্দুও নাই—একথা "সত্য কহোঁ লিখি কাগদ কোরে" শপথ করিয়া কোরা কাগজে লিখিয়া দিতেছি।

আপনাকে সর্বতোভাবে পরম দেবতার পদারবিন্দে সমর্পণ করিয়া যিনি নিজ জীবনকে তাঁহার হাতের ক্রীড়নক তুল্য করিয়াছেন তিনি ছাড়া তুলসীদাসজীর মত দৈন্যের অধিকারী আর কেহ হইতে পারেন না। লেখনী লিখিলেও যেমন লেখার গৌরব সব লেখকেরই সেইরূপ শ্রীরামচরিত গ্রন্থের গৌরব সৌরভ যাহা কিছু সবই শ্রীরামচন্দ্রের, তুলসী নিজে লেখনীমাত্র এই দিব্যানুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন আপনাকে উৎসর্গ করিয়া উজাড় করিয়া দিয়া। ঐ দিব্যানুভূতিই শ্রীতুলসীর স্বকৃত গ্রন্থ-ভূমিকার প্রাণমন্ত্র। তাহার আবার ভূমিকা করিতে হইলে আরও অতল জলের ডুবুরী হইতে হইবে। লঘু তৃণের মত আমি জীবাধম নিজ চঞ্চলতা লইয়া ভাসিয়া বেড়াই। কৃপাভারে ভারী না হইলে ডুবিতে পারা যায় কই!

ডুবিয়াছেন বটে দেবী জীবনবালা। তাই অতি যত্নে জীবনব্যাপী সাধনায় এই রত্ন তুলিয়াছেন। শ্রীতুলসীর ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারা এ রত্ন অনেক দিন যাবৎ সগৌরবে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। বঙ্গজননী বহু ধনে ধনী হইলেও এই রত্নে বঞ্চিতা ছিলেন। বাংলার কৃতী সন্তান শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্রথমে এই অভাব পূরণ করেন। তাহার কতিপয় সংস্করণ অল্প দিনে নিঃশেষ হইয়াছে। তাহার পরে আরও অনেক ব্যক্তি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন ও হইতেছেন। দেবী জীবনবালার জীবন-সাধনায় এই ব্যাখ্যানুবাদ যেরূপ জীবন্ত হইয়াছে তেমনটি আর দেখি নাই। দোহা চৌপাইর বিশদার্থগুলিতে অনেক মধুখণ্ড আছে। এ সকল গ্রন্থকর্ত্রীর গুরুকৃপালব্ধ ধন।

গ্রন্থের পুরোভাগে শ্রীগুরুদেবের একটি চিত্র আছেন। বঙ্গদেশীয় লোক অনেকেই তাঁহাকে জানেন না। অযোধ্যায় তাঁহাকে না জানেন এমন একটি ছেলে-মেয়েও নাই। ইনি ছিলেন রামভক্তির মূর্তিমান বিগ্রহ। জীবনবালা দেবী বলেন "গুরুদেব ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অনুকল্প অবতার।" অঝোরে ঝুরিয়া ইনি শ্রীরামচরিতমানস ব্যাখ্যা করিতেন। সহস্র সহস্র নরনারী অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া তাহা শ্রবণ করিত। পদাশ্রিতা জীবনবালা আজও শোনেন। সেই শ্রুতি হইতেই এই গ্রন্থের অভিব্যক্তি। যন্ত্রের মত চালিত হইয়াই তিনি এই বিরাট্ গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছে অনেক বৎসর পূর্বে। অন্ধকারেই ছিল। আজও আছে। যেটুকু মুদ্রিত হইল তাহা সমুদ্রের বিন্দু। এই বিন্দু যদি কোন সজ্জনের চিত্ত উন্মুখ হয় সম্পূর্ণটি মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর করে দিতে তবেই এই ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

কোন সমাজ বা রাষ্ট্র যদি শান্তিকামী হয় তবে তাহাদের সর্ব প্রধান কর্তব্য হইবে নরনারীকে 'সৎ' করিয়া তোলা। কেবল সদুপদেশে মানুষ সৎ হয় না। শ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্রের ধ্যান ছাড়া

মানব জীবন কল্যাণ উন্মুখী হয় না। আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ পতি, আদর্শ পত্নী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা, আদর্শ সুহৃৎ—এ সকলের একত্র সমাবেশ ত্রেতায় অযোধ্যার রঙ্গমঞ্চে যেরূপটি হইয়াছিল, ঋষিকবি বাল্মীকি যাহার রূপায়ণ করিয়া রামায়ণ নাম দিয়াছেন, বিশ্বসাহিত্যে তাহার আর জুড়ি নাই।

রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করে সমাজকে শান্তিময় করিতে, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য সাধনে রামায়ণের মত শক্তিশালী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। প্রাচীনকালের ভারতীয় আর্য ঋষিরা ইহা ভালই জানিতেন। আর আজও ইহা একটা বলিবার মত খবর যে, অল্পদিন পূর্বে রাশিয়ায় শ্রীরামচরিতমানস অনুদিত হইয়া গৃহে গৃহে স্থান পাইতেছে। শ্রীরামকে পুরুষোত্তম বলিয়া না মানিলেও রামকথা অনুশীলনে যে পুরুষকে উত্তম করে একথা রাশিয়ার কমিউনিষ্টরাও মানে। আর মানুষ উত্তম না হইলে যে রাষ্ট্র বা সমাজ উত্তম হয় না ইহা সকলেই জানে।

বর্তমানে জগতে প্রলয়বাত্যা চলিতেছে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিযাছেন মহাপ্রলয়ের পর মহাউদ্ধারণ রাজত্ব করিবে। আমরাও বিশ্বাস করি রামভক্ত মহাত্মা গান্ধীজীর 'রামরাজ্য' স্বপ্ন একদিন সত্য হইবেই। ভারত আবার রামাযণের আদর করিতে শিখিবেই। প্রাচীন গৌরবে ভারত আবার প্রতিষ্ঠিত হইবেই।

শ্রীরামের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সীতারামের জয় হউক।

মহাউদ্ধারণ মঠ
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা - ১১।

জীবাধম
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
শ্রাবণ, ১৩৫৯

'মহাকাব্য দর্শন'—ভূমিকা

মহাভারত একটি বিচিত্র যুদ্ধের কাহিনী, এক পক্ষের মূল দুর্যোধন, আর এক পক্ষের মূলে যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন অজেয়। তাহাকে কেহই বধ করিতে পারে না। ভীমও পারিতেন না, যদি না অন্যায় যুদ্ধ করিতেন। দুর্যোধনের জন্যই যুদ্ধটা ঘটিল। দুর্যোধন মন্যুময়। মন্যু হইল অহংকর্তা এই অভিমান, তাহার সঙ্গে যুক্ত ভীযণতম স্বার্থপরতা। পৃথিবীতে যত অশান্তি তাহার একটিই কারণ হীন স্বার্থান্ধতা। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ মধ্যে স্থির। চরমতম অশান্তির মধ্যেও ধীরস্থির অচঞ্চল। দুই পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দুই ভাগ হইয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে, এখনই আরম্ভ হইবে। সেই দুই সৈন্যদলের মধ্য দিয়া যুধিষ্ঠির হাঁটিয়া চলিয়াছেন। নিরস্ত্র রক্ষীহীন। কোথায় যাইবেন? যুধিষ্ঠিরের পিতামহ যিনি সেই ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ লইতে। সেই পূজ্য পিতামহ কিন্তু শত্রুপক্ষের। এইরূপ একটি দৃশ্য অকল্পনীয়। এই যুদ্ধ কেহ কোন দিন দেখেন নাই, কোন দিন কল্পনাও করেন নাই। যুদ্ধের মধ্যে,

* *'মহাকাব্য দর্শন'—শ্রীমৎ সদ্‌গুরুদাস। শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবা সম্প্রদায়।*

এই স্থিরত্ব বড় বিস্ময়কর স্থিরত্ব। এমন কোনদিন আর হয় নাই, হইবেও না। এই স্থিরত্বটাকে কে দিল? যুধিষ্ঠির ধর্মময় দ্রুম। সেই ধর্মই এই স্থিরত্ব দিল। ধর্ম কী? প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন; "ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ"। যুধিষ্ঠিরের সকল কর্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ-করুণাপুষ্ট। দুর্যোদনের কর্তৃত্ব অভিমানপুষ্ট, অন্ধ পিতার দ্বারা লালিত। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতা দুইরকম। মাতার দোষে জন্মান্ধ, আর অন্তরের অন্ধতা দুর্বার পুত্রস্নেহগত। স্বার্থপরতার সর্বতোভাবে প্রশ্রয় দেয় মোহান্ধতা। পাঁচখানি গ্রাম ত্যাগ করার মত একটু স্বার্থত্যাগ যদি সে করিত তাহা হইলে মহাযুদ্ধ হইত না। দুর্যোধনের বিরাট্ মিথ্যা অহঙ্কার দাঁড়াইয়া আছে মর্মান্তিক মোহান্ধতার ভিত্তিতে।

এই যুদ্ধ বেদ-সংহিতায় আছে ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের যুদ্ধরূপে। চণ্ডীর যুদ্ধও এই যুদ্ধ। এই ভারতেই অনেক বার যুদ্ধ হইয়াছে, আর একটা আসিতেছে।

এই যুদ্ধটা কলিযুগের প্রারম্ভে মূর্তিলাভ করিয়াছিল। কৌরব ও পাণ্ডবের দুইটা পরিবারের ভিতরে। এই যুদ্ধ কি সত্য? বস্তুগত সত্য কিনা বলা যায় না। সাহিত্যগত সত্য নিশ্চয়ই। এই সাহিত্যের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস। চিরকালের মানুষের জন্য, চিরকালের মানবজাতির ইতিহাস। অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের মহা সত্যের ইতিহাস। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন 'Memory of Race' যথার্থ ভারত-ইতিহাস। এই বিরাট্ যুদ্ধের মধ্যে ছোট ছোট যুদ্ধ অনেক। অর্জুন বলেন, যুদ্ধ করিব না "ন যোৎস্যে"। সারথি বলেন, করিতেই হইবে, "উত্তিষ্ঠ, যুদ্ধায় কৃত- নিশ্চয়।" দ্রোণ ও অর্জুন মুখোমুখি; গুরুশিষ্যে যুদ্ধ। এমন আর হয় নাই। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন মিথ্যা বলিব না। সকল গোষ্ঠী মিলিয়া বলিতেছেন— বলিতেই হইবে। দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যুধিষ্ঠিরকে, আপনি অজস্র গুণে গুণী হইয়াও হীন দ্যূতক্রিয়ায় আসক্ত হইলেন কেন? যুধিষ্ঠির বলিলেন—দ্রৌপদী! তুমি কি নাস্তিক? যাহারা ভাবে অহংকর্তা তাহারা নাস্তিক। সকল কর্মের কর্তা তো একজন মহাকাল, যাহা ঘটিবে তাহাও ঘটাইয়া রাখিয়াছেন। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" আমরা প্রত্যেকেই নিমিত্তমাত্র। নিখিল বিশ্ব ভরিয়া মহাকালের অচিন্ত্যনীয় ক্রিয়াবিলাস দেখ। নিমিত্তমাত্র জানিয়া ধৈর্য সহকারে কেবল দেখ। বেদব্যাস দেখাইতেছেন, ঐ দেখ যিনি মহারাজ চক্রবর্তী, রাজসূয় যজ্ঞে নিখিল রাজন্যবর্গের মধ্যমণি, তিনি আজ বনে বনে ভিখারী, বিরাট্ রাজার কর্মচারী। আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চরম দৃশ্যটি কেমন দেখ। আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া দেখ তবে উপভোগ হইবে। প্রচণ্ড কর্মস্রোতের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাও। কর্মকর্তা কে? তাহাদের সঙ্গেই আছেন, একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধন যেমন এক একটি শাশ্বত তত্ত্ব তেমনই ভীম অর্জুন দ্রোণ কর্ণ শল্য দ্রৌপদী কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরও এক একটি তত্ত্ব। খুব সহজ (simple) তত্ত্ব নহে। অতি জটিল (complex) । অন্তরে বাহিরে যে অন্ধতম ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার মধ্যেও শাস্ত্রজ্ঞান আছে। দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! কী উপায়ে আমি সকলের বড় হইতে পারি?" ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের মত সচ্চরিত্র হও, তবেই হইবে।" কি জটিল তত্ত্ব! ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছেন—

"যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।

কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্বরাজ্ঞাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!।।১১১।।
যদাশ্রৌষং দ্বারকায়াং সুভদ্রাং প্রসহ্যোঢ়াং মাধবীমর্জুনেন।
ইন্দ্রপ্রস্থং বৃষ্ণিবীরৌ চ যাতৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।।"১১২।।

'হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম, অর্জুন ধনুতে গুণারোপণ পূর্বক আশ্চর্য লক্ষ্য বেধ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিয়াছে এবং সমস্ত রাজারা দেখিতেছিলেন—এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে; সঞ্জয়! তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন আমি শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকা নগরীতে যদুবংশীয়া সুভদ্রাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছে; তাহাতে আবার যদুবংশের মধ্যে মহাবীর রাম ও কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থেই আসিয়াছেন, সঞ্জয়! তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই!"

যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন না ইহা স্থির নিশ্চিন্ত হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে কেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন ইহা এক রহস্য।

যিনি সর্বপ্রকারে পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করেন তিনি ভীষ্ম, তাঁহাদের শত্রুপক্ষের। যিনি যুদ্ধকালে পার্থ পার্থসারথিকে রক্তাপ্লুত করিয়াছেন সেই ভীষ্ম মৃত্যুকালে বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে, ক্ষণকাল সম্মুখে দাঁড়াও, যতক্ষণ না প্রাণ ত্যাগ করি।

"শিত-বিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ।।" শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।৩৮

এই জটিলতম চরিত্রগুলি আলোচনা করিয়াছেন এই মহাকাব্য দর্শন গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ সদ্‌গুরুদাসজী। গুরুকৃপাধন্য শ্রীদাসজী। গ্রন্থে তিনি চরিত্র আলোচনা ছাড়াও বহু পরিভাষায় গূঢ়ার্থ বলিয়াছেন অতি সুন্দরভাবে। সকল উপদেশ ও নির্দেশের গভীরে ডুবিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন অতি নিপুণতার সহিত। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

আমি কখনও সমগ্র মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছি এমত মনে পড়ে না। ছেলেবেলা পিতৃদেবের কোলের কাছে শুইয়া দিনের পর দিন তাঁহার মুখে অষ্টাদশপর্ব মহাভারত শুনিয়াছি। তাহাই বুকের মধ্যে লেখা আছে। বর্তমানে এমন পিতা বিরল। অথচ মহাভারত না জানিলে সত্তর কোটি নরনারী ভারত- সন্তান হইবে না কোনদিন। তাই এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে অশেষ কল্যাণ হইবে উদীয়মান কল্যাণকামী যুবক-যুবতীগণের। ইহা মনে করিয়া এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত

জন্মাষ্টমীর পূজা

আজ জন্মাষ্টমী। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। এই দিনে হয়েছিল একটি বিশেষ জন্ম। তা কিন্তু ঘটেছিল সুদূর অতীত যুগে, বহু সহস্র বছর আগে। স্মরণ চলছে তার আজিও। দেশে দেশে ঘরে ঘরে ভক্ত-সজ্জনের অন্তঃপুরে।

সেই জন্মটির বিশেষত্ব হ'ল এই যে, জন্ম স্বীকার করেছেন তিনি যিনি অজ, যাঁর জন্ম আদপেই হতে পারে না। উদয় হয়েছিল ভূমিতে সেই ভূমা স্বরূপের। নেমে এসেছিলেন চির-সুন্দর এই অসুন্দর জীবনিবহের হানাহানির মধ্যে। যিনি নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনীয়, তিনি নেমে এসেছিলেন পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চের পঙ্কিলতার মধ্যে।

সূর্য স্থির গতিহীন। কিন্তু তার উদয়াস্ত দৃষ্ট হয় প্রতিটি দিন। সেই মত, যিনি অচল সনাতন সর্বগত, তিনি হয়েছিলেন এই চলমান জগৎ মধ্যে ব্যক্ত, প্রকটিত, মধুর ক্রীড়ারত। যিনি বিরাজিত সর্ব ঘটে, তাঁর আবার আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটে!

সূর্যের উদয়ে পাই প্রত্যক্ষ আলোর মালা, সূর্যের অস্তে পাই চন্দ্রমার বিস্মিত কিরণের খেলা। ভগবানের আবির্ভাবে পাই অপ্রাকৃত লীলামঙ্গল। তাঁর তিরোভাবে পাই তাপহারী স্মরণ-মঙ্গল।

নিত্যলীলার দ্রষ্টা হন ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবান। ভাগ্যহত যারা আমরা করি স্মরণে তার আস্বাদন। আজ জন্মাতীতের জন্মলীলা স্মরণের দিন, মননের দিন, সেই লীলা-মহোদধিতে তন্ময় হয়ে তিথিপূজা করার দিন।

অশান্ত জীব আমরা সদাই শান্তি-প্রয়াসী। শান্তিলাভের আশায় শান্তিদাতাকে খুঁজে বেড়াই। এই প্রয়াস ও প্রচেষ্টার নাম সাধনা·তপস্যা। অনাদিকাল ধরে চলছে এই তপস্যা। জড়জগৎ তপস্যা করেই পেয়েছে জীবন। পেয়েছে বৃক্ষলতা পশু-পাখীতে প্রাণের স্পন্দন। প্রাণ-শকতিও তপস্যা করেছে লক্ষ লক্ষ বছর, তাই পেয়েছে একটি বুদ্ধিমান্ সন্তান, যার নাম মানব; মননশীলতা যার ধর্ম।

তপস্যা আজও চলছে। তপস্যা চলেছে সকলের অগোচরে আঁধার-ঢাকা কারাগারে। আজ তপস্যা করছেন মানব-সমাজের দু'টি প্রতীক ব্যক্তি। একটি মহীয়ান্ পুরুষ, বিজ্ঞানমূর্তি বসুদেব, আর একটি মহীয়সী মহিলা, শুদ্ধা ভক্তিমূর্তি দ্যোতমানা দেবকী। দু'জনের যুগনদ্ধ তপস্যা সুদীর্ঘ কাল, দিনের পর দিন পাষাণ-চাপা বক্ষে, ভোগসর্বস্ব কংসের তমোগুণে ঢাকা কারাকক্ষে।

দু'জনের আকুতিভরা আগ্রহ পূর্ণ হয়েছিল পীরিতি-ভরা অনুগ্রহে। তপস্যার কর্ষিত ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল করুণা-বরুণা-ধারা। মহাপ্রকাশ ঘটেছিল এক মহা দিব্যজীবন নায়কের। "জন্ম-কর্ম চ মে দিব্যম্"—তাঁরই শ্রীমুখবাণী। বাণী মূর্ত হ'ল কাহিনীতে। ধ্যানের ধন জীবন্ত হ'ল দেশ-কালের বাস্তবতায়। রসিকশেখরের স্বরূপ-বিগ্রহ, তাঁর মহাবতরণের সহায়ক পরম কারুণ্যের

---

* 'যুগান্তর'
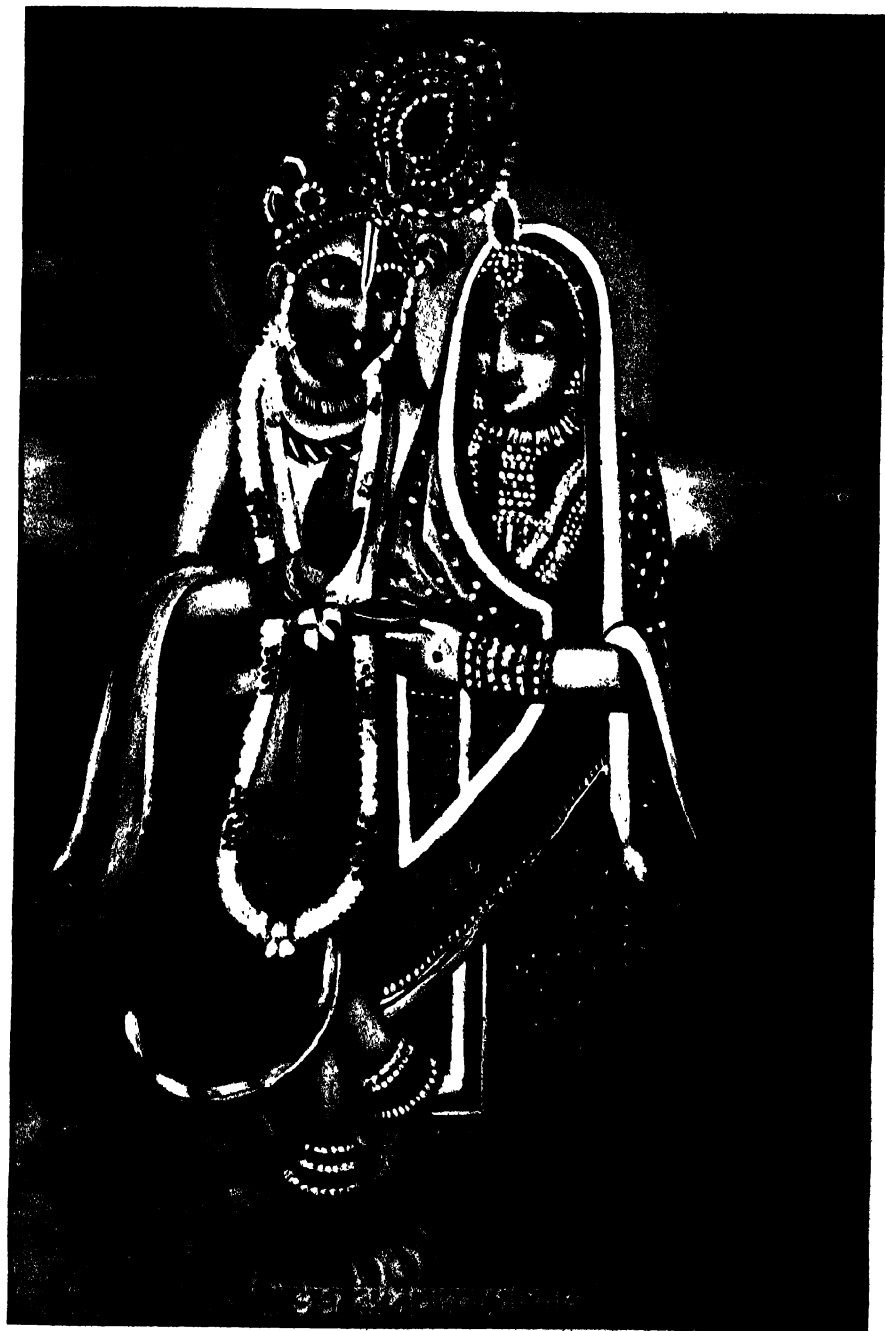
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এই শ্রীমূর্তি নিজ শ্রীহস্তে ভক্তবর শ্রীরণজিৎ লাহিড়ীকে তুলিয়া দিয়াছিলেন নিত্যসেবার জন্য।

প্রবাহ। তাঁর শুভ আগমনীতে সংবর্ধনা জানায়েছে সারাটি সংসার।

দিঙ্‌মণ্ডল হয়েছে উদ্ভাসিত, গ্রহ তারা হয়েছে অসাধারণ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত। সমীরণ হয়েছে মৃদুমন্দ প্রবাহিত। কত জলাশয়ে হয়েছে জলজ পুষ্পরাশি বিকশিত। দ্বিজাতির গৃহে যজ্ঞাগ্নি হয়েছে স্বতঃ প্রজ্বলিত। জলধর মৃদুমন্দ আনন্দধ্বনি সহকারে হয়েছে সাগর-মুখে প্রধাবিত। সাধুসন্তের হৃদয় হয়েছে আনন্দে উদ্দীপিত। ভাবী বিপদাশংকায় অসাধু জনের অন্তর-মন প্রকম্পিত।

প্রশান্ত হয়েছে অন্নময় প্রাণময় মনোময় ভূমি। তাই নেমে এসেছেন ধূলার তলে বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহ ঘনীভূত হয়ে, প্রকটিত হলেন পরম দিব্যশিশু-স্বরূপে। নীরব সাধনার শেষ প্রান্তে কৃপায় এসেছেন একান্তে। বাদল-ঘন রাতে, প্রবল বর্ষাপাতে, অনুগ্রহের ভাণ্ডার হাতে। দর্শন করলেন বসুদেব-দেবকী কারুণ্যোদ্ভাসিত দিব্য নয়ন-পাতে।

সীমাহীন সত্তা, বাধাহীন চেতনা, অন্তহীন আনন্দ মূর্তিমান্ হয়েছিল সচ্চিদানন্দঘন বালক মূর্তিতে। অদ্ভুত বালক। অম্বুজেক্ষণ, সুপীত বসন, সান্দ্রপয়োদঘন কাজল বরণ। কিরীট-কুণ্ডলে দ্যোতমান, কাঞ্চী-কঙ্কণে রোচমান, চারি হস্তে উদ্যত শংখচক্রগদাপদ্মে শোভমান।

আজ মানবতার মহাগ্লানিময় যুগ। তুমি এসে বাজাও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পাঞ্চজন্য। শান্তিধারা বর্ষণ কর শান্তি-হারা জীবজগতের শিরে। ঘুচায়ে দাও দ্বন্দ্বময় সহস্র দ্বেযাদ্বেযী। জাগায়ে তোল প্রীতিময় অজস্র মিশামিশি। মহামিলন মৈত্রীর পুষ্পাঞ্জলি আমরা অর্পণ করি। রাতুল পদে তুলে লও। জয় হোক জন্মতিথির। জয় হোক আজিকার অতিথির। জয় গৌর হরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ☐

জন্মাষ্টমীর সম্পদ্

জন্মাষ্টমী। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। প্রায় পাঁচ সহস্র বছরের পূর্বের কাহিনী। একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক জনের জন্ম। একটি অপূর্ব আবির্ভাব। একটি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা। ঘটেছিল গভীর নিশীথে। কারাগারের ভরা আঁধারে, লোক-লোচনের অগোচরে। সেই ঘটনাটির স্মরণে আজ কোটি কোটি নরনারী উপবাসব্রতী, অগণিত আবাসে পূজার্চনা গান কীর্তন সভাসমিতি। উদ্দেশ্য একটি মাত্র—সেই আবির্ভাবটির তাৎপর্য অনুধাবন, সেই প্রকট রহস্যের মর্মার্থটির মর্মে প্রতিফলন। শুধু অবির্ভাব নয়, একটি অশ্রুতপূর্ব প্রকটন। একটি অসাধারণ অবতরণ। ভূমা নেমে এলেন ভূমিতে। মুক্ত অঙ্গনে হ'ল অব্যক্তের প্রকাশ। চলিল জড়-জগতীতলে চিন্ময় স্বরূপের চিত্ত-বিনোদিনী লীলা।

বেদের ঋষিরা বলেছেন—তাঁকে দেখেছি। ছটায় ম্লান আদিত্যের জ্যোতিঃ, অন্ধকারের পরপারে তার স্থিতি। আজকের আবির্ভাবের পর ভাগবতীয়েরা দিলেন নূতন ঘোষণা, যা অকথিতপূর্ব।

তাঁরা বললেন—কতিপয় চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টা দেখেছেন যাঁকে তিনি নিজে এসেছেন দেখা দিতে

* 'যুগান্তর'

সকলকে। যিনি থাকেন ধরা-ছোঁয়ার নৈরাজ্যে, তিনি এসে পড়েছেন মিলামিশার স্বরাজ্যে। যিনি সর্বজীবের অন্তরচারী, আজ তিনি হয়েছেন দেবকী-বসুদেবের অঙ্কবিহারী। যিনি ধ্যানের ধন স্বয়ং হবি, তিনি ব্রজকর্দমে রিঙ্গন-লীলাকারী। কী করে ঘটলো এ অঘটন। চির দিনের অধর, অজানা ধরায় ধরা দিলেন কোন্ মোহিনীবিদ্যা মাধ্যমে আজিকার দিনে তাই অনুশীলনের বিষয়। আর একটি বিষয় জানতে হবে, সাধন রাজ্যে কী ধন এল এই বিশ্বদয়িতের অবদানে।

গ্রীসের প্লেটো ছিলেন দার্শনিক-শিরোমণি। তাঁহাব লেখাগুলি গভীর তত্ত্বের। গ্রীকভাষা জানি না তাই তাহা এক বিন্দুও বুঝি না। অবশ্য তাহার ইংরাজী অনুবাদ আছে; তাই আস্বাদ হয় ভালভাবেই।

পরব্রহ্ম তত্ত্বটি ভাবাতীত, ভাষাতীত ও গুণাতীত। তাঁর কথা ভাবা যায় না, লেখা যায় না, বলাও যায় না। আজিকার আবির্ভাবে তাঁর হয়েছে অনুবাদ। মানব-ভূমিতে মানবীয় ভাষায় পরব্রহ্মের সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ। আজ তাঁর জন্ম। জন্মাতীতের জন্ম। স্থির সূর্যের উদয়াস্তের মত। অযোগ্য জনের অনুবাদ তৃপ্তিপ্রদ নয়। যোগ্যতর যোগ্যতম ব্যক্তিদের সাহিত্যানুবাদ অধিকতর আস্বাদ্য হয়। লেখক যদি নিজে অনুবাদক হন তবে হয় উৎকৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণরূপে পরব্রহ্মের অনুবাদটি তিনি নিজেই করেছেন। তাঁর স্বীকৃতিও আছে। 'আত্মানং সৃজাম্যহম্'। অনুবাদ মূল অনুরূপ, তত্ত্বাংশে। মূলকে অতিক্রম করেছে অনুবাদ, মাধুর্যাংশে। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ তাই। সচ্চিদানন্দ কী? এই তুমি আমি আছি। এই থাকাই সৎ। আমরা যে আছি তা আমরা নিজে জানি। এই জানাটাই চিৎ। এই জানা সুষ্ঠু হবে, নিজেকে নিজে যথার্থভাবে জানিব যখন তখনই আনন্দ। সৎ আর চিদের মিলনভূমিই আনন্দ।

তুমি আমি ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম বৃহত্তম সচ্চিদানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ পুরুযোত্তম সচ্চিদানন্দ। তাঁর সত্তা অনন্ত, চেতনা অপরিসীম, আনন্দ অফুরন্ত। দুইই এক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে কান্তি আছে, ক্রীড়া আছে, আর আছে কৃপা। এই তিন পরব্রহ্মে অস্ফুট।

কান্তি অর্থ রূপ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে। সে রূপ সর্বজীব-মনোহারী। পশুপাখী নরনারী যে তাঁকে দেখেছে সে-ই মজেছে। সে ডুবে গেছে রূপসাগরের অগাধে। ব্রহ্ম অরূপ অব্যয়। শ্রীকৃষ্ণ রূপের সমুদ্র, অপ্রাকৃত রূপের পরম নিলয়।

ক্রীড়া অর্থ খেলা। ব্রহ্মে খেলা নাই। কৃষ্ণ খেলেন নিজের সঙ্গে নিজে বহু হইয়া। নিজেকেই লয়েন বহু করিয়া। কেহ সেবক, কেহ সখা, কেহ মাতৃসমা, কেহ প্রিয়তমা। এদের মাধ্যমে তিনি আস্বাদন করেন নিজেকে নিজে। তাদের চোখ দিয়ে দেখেন, বুক দিয়ে নিজেকে ভালবাসেন। এই নিজ সঙ্গে নিজ ক্রীড়ার নাম লীলা। ব্রহ্ম লীলারহিত। শ্রীকৃষ্ণে লীলা সতত প্রবাহিত তরঙ্গায়িত।

কৃষ্ণে আছে কৃপা। ব্রহ্মে তা নেই। জলে তৃষ্ণা যায়, বরফে যায় না। তত্ত্বে আর শক্তিতে ভেদ। কৃষ্ণ কৃপাময়, তাই ক্ষমার মূর্তি। পাপীয়সী পূতনার পুঞ্জিত পাপ মাপ করিয়া দিলেন বৈকুণ্ঠে পাঠায়ে। নিজে বধ করে বলেন—যা স্বর্গে যা।

ব্রহ্ম চিরকাল একই রূপ, এক রকম ভাবানুযায়ী; কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন। যার ভাবটি যেমন, কৃষ্ণের স্বরূপ তেমনি।

কৃষ্ণের বয়স তখন দশ বছর আট মাস। উপনীত হয়েছেন মথুরা নগরে। কংসের ধনুর্যজ্ঞ। কৃষ্ণকে বধ করার ষড়যন্ত্র ফেঁদে মল্লগণ কংসরাজকে ঘিরে বসে আছে দল বেঁধে। দ্বারদেশে কৃষ্ণকে বাধা দিল এক বিরাট্ হস্তী। তাকে মেরে দাঁত দু'টো উপড়ে নিয়ে কাঁধে তুলে কানাই-বলাই দু'ভাই দাঁড়ালেন রঙ্গমঞ্চে। তখন তাঁকে দেখছেন সবাই। কে কী দেখছেন—

মল্লরা দেখছেন, কৃষ্ণ নয়, সাক্ষাৎ অশনি বজ্রকঠোর। বসুদেব-দেবকী দেখছেন, বাৎসল্যের ধন, লাবণ্য মাখা শিশুসুন্দর। নরপতিরা দেখছেন কৃষ্ণ রাজ-চক্রবর্তী বিশ্বপালক। অসৎ রাজারা দেখছেন একজন দণ্ডধারী শাসক। গোকুলের গোপেরা দেখলেন কৃষ্ণ তাঁদের নিজজন। কংস রাজা প্রত্যক্ষ দেখলেন সাক্ষাৎ শমন। ভক্ত যোগীরা দেখলেন পরতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-ঘন। বুক ভরা মধু বধূরা দেখলেন ফুলের ধনু-ধরা মদন। মূঢ় যারা গূঢ়তত্ত্ব জানে না, তারা দেখল নন্দ ঘোষের ছেলে, অতি সাধারণ।

তিনি এসেছিলেন ধূলায় নেমে মানুষকে ভালবাসতে, ভালবাসা শেখাতে। শুদ্ধ ভালবাসায় তাঁকে আপন করা যায় এই কথা জানাতে, শেখাতে, দেখাতে। তখন কতশত জ্ঞানী ছিল ধনী ছিল, বর্ণাভিমানী সমাজের মাথারা ছিল। কোন পাড়া মাড়াননি তিনি। কারো দুয়ারে ধর্ণা দেননি তিনি। জন্মিয়াই গেলেন ঘোষপল্লী গোয়ালপাড়ায়। মিশলেন গোপ-গোপী সঙ্গে, রঙ্গ-ভালবাসার তরঙ্গে।

গোপপল্লীর নরনারীর ধন ছিল না, বিদ্যা ছিল না, আভিজাত্য ছিল না, ছিল শুধু ভালবাসা। হৃদয়-পাত্র ভরা কৃষ্ণতৃষ্ণা। শুধু প্রীতিরসে তিনি বাঁধা ইহাই লীলার শিক্ষা। ইহাই সাধন-রাজ্যে সাধকের সম্পদ্। বিশ্বের কল্যাণ মহাউদ্ধারণ এই ঈশ্বরপ্রেমে জীবপ্রেমে। এই পথের পতাকাধারী নদীয়াবিহারী গৌরহরি। জয় গৌর। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ☐

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর তত্ত্বরহস্য

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।" চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। জগদতীত যিনি তিনি এই তিথিতে অতিথি হইয়াছিলেন জগজ্জীবের দুয়ারে। এই তিথির আরাধনা আজ ঘরে ঘরে। অপ্রাকৃত বস্তু প্রকট হইয়াছিলেন প্রাকৃত প্রপঞ্চে এই শুভ তিথিতে।

ঈশ্বর আসিয়াছেন নশ্বর জগতে। ভূমা নামিয়াছেন ভূমিতে। ইহা লাখ ঘটনার এক ঘটনা। এক অসাধারণ কাহিনী। ইহার মধ্যে এক বিশাল দুর্ভেদ্য রহস্য আছে।

শ্রীভগবান্ অজ জন্মরহিত। শ্রীভগবান্ অব্যয় পরিণামরহিত। জন্ম থাকিলেই বাল্য কৈশোর জরা মৃত্যু থাকিবে। যিনি পরিবর্তনসহ, যিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তিনি জীব। ঈশ্বর নন।

শ্রীভগবান্ জীব নন। যাঁহার জন্ম হইয়াছে তিনি ভগবান্ হইতে পারেন না। যাঁহার বাল্য-

---
* 'যুগান্তর'।

কৈশোর আছে তিনি বিনশ্বর। সুতরাং অনীশ্বর। ঈশ্বর নিত্য শাশ্বত। সদাকাল একই স্বরূপে স্থিত।

যুক্তিগুলি শক্তিশালী। যাহারা অবতারবাদে অবিশ্বাসী এইগুলি তাহাদের হাতে ধারাল অসি। ইহাকে নিরস্ত করা সহজসাধ্য নয়। জন্মাষ্টমীর দিন যাহারা করিবে ভগবানের জন্মতিথির উৎসব তাহাদিগকে এই যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে হইবে, অবশ্যই করিতে হইবে।

বস্তুতঃ ঐ যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয়। উহা মানিয়া লইয়াই অবতারবাদ স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীভগবানের জন্ম নাই একথাও ঠিক। আবার জন্মিয়াছেন তিনি জন্মাষ্টমীর দিন একথাও ঠিক।

দুইটি বিপরীত কথা। বিরুদ্ধ উক্তি। যিনি আসিতে পারেন না তিনি আসিয়াছেন। এই দুই বিপরীতমুখী বাক্যের সমাধান কোথায়? এই রহস্যভেদ করিয়াই উৎসবানন্দ করিতে হইবে। সংশয়ের বাতাসে পূজার প্রদীপ ক্ষীণাভ না হয়।

সূর্য উঠে। প্রভাতে রক্তরাঙা বালার্ক। ধীরে উপরে উঠে। মধ্যাহ্নে মার্তণ্ড। দৃষ্টি দিলে ব্যাহত হয়। আবার সন্ধ্যায় কত শোভা ছড়াইয়া ঢলিয়া পড়ে। নিভিয়া যায়। সূর্যের উদয়াস্ত সর্বজন প্রত্যক্ষীভূত সত্য। নিত্য নিয়মানুবর্তিতার সাধক ও সাক্ষী দেব দিবাকর।

সূর্য কি সত্যই উঠে, সত্যই অস্ত যায়? যে-কোন ভূগোলের ছাত্র জানে সূর্য স্থির। সর্বদা একই স্থানে একই অবস্থায় আছে। তবে নিত্য যে উদয়াস্ত দর্শন করি, যাহার সঙ্গে জীবনের প্রত্যেকটি কার্য বাঁধা, তাহা কি সত্য নয়?

সূর্যের গতি নাই ইহাও সত্য। সূর্য নিত্য পূর্বাচল হইতে পশ্চিমাচলে গমন করেন ইহাও সত্য। শ্রীভগবান্ অজ জন্মরহিত ইহাও সত্য। তিনি জন্মাষ্টমীর দিন জন্মিয়াছেন ইহাও সত্য।

যে-সূর্যের উদয়াস্ত নাই তাহার কথা শুনিয়াছি, কেহ দেখি নাই। যাহার উদয়াস্ত আছে তাহাকেই দেখি, তাহার কথাই লিখি। যে-ভগবান্ কখনও আবির্ভূত হন নাই, যিনি জন্মাতীত কর্মাতীত, তাঁহার কথা শাস্ত্রে শুনি। কিছু জানি না। যিনি মথুরায় জন্মিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে নাচিয়াছিলেন, বাঁশী বাজাইয়া সবাইকে পাগল করিয়াছিলেন তাঁহাকেই চিনি, তাঁহাকেই জানি, তাঁহার কথাই বলি, তাঁহার চরণেই দেই আত্মবলি। পরব্রহ্ম আমাদের চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত, বাক্যের অতীত। তাঁহার কথা বলা যায় না, ভাবা যায় না, ধ্যান করা যায় না। তিনি যখন আসিলেন আমাদের চিন্তার মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে, ভাবনার মধ্যে, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

যিনি বাক্য-মনের বাহিরে, ধরা ছোঁয়ার বাহিরে, শাস্ত্রজ্ঞদের দৃষ্টিতে অবাঙ্মনসোগোচর— তিনি যখন আসিলেন ধরা দিলেন প্রীতির বন্ধনে তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার কথাই বলি, শুনি. লিখি, ধ্যান করি, মনন করি, আপন করিয়া লই। ভগবান্ বলিতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি।

গ্রীক ভাষায় হোমারের কবিতা পড়িতেও পারি না, অর্থও জানি না। কেহ যদি অনুবাদ করিয়া দেয় মাতৃভাষায়, রসানুভূতিতে আনন্দে ডুবি। পরমাত্মা পরব্রহ্ম আমাদের কাছে গ্রীক ভাষার কবিতা। শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুবাদ। মানবীয় ভাষায়। পরব্রহ্মের সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ। বেদান্তের যিনি সচ্চিদানন্দ, ব্রজের প্রেমভূমিতে তিনিই নন্দদুলাল।

আবির্ভাব লীলা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সংবাদ দিয়াছেন—দেবকী মাতা যেন পূর্বাকাশ তাহাতে পূর্ণচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন। আসিলেন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। স্তব করিলেন

বসুদেব দেবকী। উত্তর করিলেন নবজাত। তারপর দেখিতে দেখিতে প্রাকৃত শিশুর মত হইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান্ ধর্ম। তিনি আসিয়াছিলেন ধর্ম সংস্থাপন করিতে। তিনি রসিকশেখর, আসিয়াছিলেন স্বীয় অনন্ত মাধুর্য আস্বাদন করিতে প্রিয়জনের মাধ্যমে। প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদন করিয়াছেন অশেষে বিশেষে।

শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ। তিনি করুণা করিয়া আমাদিগকে ভক্তিধনের সন্ধান দিয়াছেন। যশোদা সামান্য কেশবন্ধন রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা জানিতাম। শ্রীকৃষ্ণলীলায় আমরা জানিলাম তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ নন, প্রেষ্ঠও বটেন। তিনি প্রিয়তম, তিনি আপনজন, তিনি ঘরের লোক—তিনি প্রেমের লোক, তিনি আদরের ধন। তাঁহার কাঁধে ওঠা যায়—তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়ানো যায়।

শ্রীকৃষ্ণ আগমনে জগৎ ধন্য হইয়াছে। জীব ধন্য হইয়াছে। সাধনপথ মধুময় হইয়াছে। রসিকশেখর কারুণ্যের আধার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভ জয়ন্তী জয়যুক্ত হউক। জয় ব্রজবিহারী। জয় গৌরহরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ☐

পার্থসারথির দান*

আজিকার দিনটির পরিচয় জন্মাষ্টমী। এই দিনে জন্মেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মঙ্গলকামী। বর্ষণমুখর ভাদ্র মাসে গভীর নিশীথে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অনেক পূর্বে কিঞ্চিদধিক পাঁচশো শতাব্দী অতীতে। কত দিনের কথা। কত লক্ষ কথা চলে গেছে অতীতের গহ্বরে। কিন্তু এই তিথির যিনি অতিথি, মানুষ ভোলেনি তাঁকে; গেঁথে রেখেছে গূঢ় অন্তরে। তিনি ছিলেন দাতা, ভূরিদাতা। তাই পারেনি মানুষ তাঁর দানকে ভুলতে। তাঁর মহাদান দু'টি মাত্র গান। একটি গীতার ছন্দে, ভীতিপ্রদ রণাঙ্গনে; আর একটি বাঁশীর রন্ধ্রে, মধুক্ষরা কুঞ্জ-কাননে। কালের দুর্বার স্রোত তাকে ক্ষীণ করেনি। ইতিহাস তাকে লীন করেনি। আজিকার দানীর দান নিত্য নবায়মান চির সবুজ।

সুরেলা বেণুর ঝঙ্কার বুঝতে চাই সমজদার। সকলের গ্রহণ করার মত কান নেই। আপন করে নেবার মত টান নেই। সেই সুন্দর সুরের চাহিদা প্রীতিভরা সবখানি প্রাণ। ব্রজবন ছাড়া আর কোথাও নেই তার স্থান । গীতার গানটি কিন্তু সকলের। কোন দলের কথা সে কয়নি। বেদ হিন্দুর, বাইবেল খৃষ্টানের, কোরাণ মুসলমানের, ভাগবত বৈষ্ণবের, চণ্ডী শাক্তের—গীতা মানুষের। সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়ায়ে জীবকল্যাণ তার লক্ষ্য; সকলের জন্য উন্মুক্ত তার বিশাল বক্ষ।

গীতা কার নয়? যে বাহিরে যে ঘরে, সাধুর পর্বতে পাহাড়ে, গৃহীর গৃহে অন্দরে, কার জন্য গীতার দ্বার নয় খোলা। যে ছন্নছাড়া যে ছন্দহারা, যে পথভ্রষ্ট যে বিষাদগ্রস্ত, শান্তি সিঞ্চনে গীতা সকলের জন্য মুক্ত হস্ত। গীতার উদাত্ত আহ্বান প্রত্যেকটি নর-নারীকে দিয়েছে মঙ্গলময়

** 'যুগান্তর'। ২৩ আগষ্ট, ১৯৮১; (৬ ভাদ্র, ১৩৮৮)*

পথের সন্ধান।

গীতার গায়কের পরিচয় পার্থসারথি। পৃথিবীর সকল সন্তানের তিনি সারথি। জীবন-রথের সারথি। দুর্গম পথের চির সাথী। গীতা আমাদের সকলের চালক পালক আলোকদাতা। গীতার উদ্‌গাতা সকলের সুহৃদ্।

এই সুহৃৎকে চির সুহৃদ্ বলে জানাই গীতার সাধনা। আছেন তিনি সকলের হৃদ্দেশে। তাঁর নির্দেশে যখন পথ চলা, সম্মুখে তখন সবিতার বরেণ্য আলো, সব ভালো। যখন তাঁকে সরায়ে তাঁর আসনে বসায়েছি আমিকে, তখন সম্মুখে হতাশার অমানিশা, সব কালো।

স্বার্থান্ধতায় ঘেরা বিরোধ-বিষাদে ভরা বন্ধুর পথে চলতে হলে, মুক্তির স্বাদ পেতে হলে, নিতে হবে গীতার নির্দেশ। সকল দেশের সকল জাতির, ক্ষুদ্রতায় খণ্ডিত মানব-সংহতিকে মানবতার অখণ্ডতায় পৌঁছুতে হলে, সবটা মন দিয়ে শুনতে হবে গীতার বুক-চেরা চির সুন্দরের আহ্বান।

গীতা কী বলেছেন? গীতা বলেছেন, মানুষ! পশুত্বকে প্রশ্রয় দিও না। থাকুক সে দুর্গা মায়ের পদতলে বাহন হয়ে। মনুষ্যত্বে জাগ, প্রকৃত মানুষ হও। দেবত্বে উন্নীত হও। ঈশ্বরের স্বধর্মতা লাভ করে ঈশ্বরতুল্য হও। তোমার মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মত যে ঈশ্বরাংশ ঘুমন্ত, তাকে বিকশিত হতে দাও পূর্ণতায়।

ভোগময় সংসারে জন্মেছ। ভোগ কর, কিন্তু ত্যাগী হয়ে। কর্ম কর কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে। যুদ্ধ কর কারো প্রতি বৈরীভাব না পোষণ করে। শুধু কর্তব্য বুদ্ধিতে। সকল কর্মের যিনি কর্তা, তুমি কর্ম কর তাঁর হয়ে। তাঁর হাতের ক্রীড়নক হয়ে আপনাকে শুধু নিমিত্তমাত্র করে। ক্ষুদ্র আমিত্বকে বৃহত্তর আমিত্বে উঠায়ে দিয়ে। একটি জাতি নরজাতি। একটি সত্য বিশ্বের একত্ব। ভেদ গুণগত, জন্মের নয়। কর্মে সবই সমান, উঁচু-নীচু নেই। মন্দিরের ঝাড়ুদারও বড় যদি ঝাড়ু দেয় দেব-সেবা ভাবনায়। পুরুত ঠাকুরও ছোট, যদি পূজা করে সংকীর্ণ স্বার্থের প্রেরণায়।

যাই কর আরাধনা বোধে করলেই সিদ্ধি। নিজ সুখ-লালসা থাকলেই জঞ্জাল বৃদ্ধি। গীতা বলেন, যে নিজের জন্য পাক করে খায়, সে খায় পাপ নিজ হাতে তুলে। যে খায় সবাইকে বিলিয়ে, যজ্ঞাবশেষ প্রসাদ লয় ভক্তি ভরে, সে খায় অমৃত। অমৃতের সন্তান তোমরা অমৃতময় হও। তাঁর পায়ে নিজেকে অর্পণ করে শরণাগত হয়ে তুচ্ছ আমিত্বকে হারায়ে, সত্যিকার বাঁচা বাঁচো।

জন্মাষ্টমীর বার্তা

আমরা অগণিত জীবনিবহ আছি। বাঁচিয়া আছি। ইহাতে বুঝি আমাদের সত্তা আছে। আমাদের যে সত্তা আছে তাহা আমরা জানি, অনুভব করি। ইহাতে বুঝি আমাদের চেতনাও আছে। সৎ আর চিৎ অনুভববেদ্য।

আমরা আছি কিন্তু বড় দুঃখ কষ্টে আছি। ইহাতে বুঝি আমরা আনন্দহীন। সকলেই আনন্দ

* *'যুগান্তর'। ১৪ ভাদ্র, ১৩৭৯ (31-8-1972)*

চাই। সকলেই লালসা করি আমাদের চেতনা-যুক্ত সত্তাটি আনন্দে থাকুক। সকলেই চাই সচ্চিদানন্দ। আমরাও সচ্চিদানন্দের অংশ, তবু আনন্দহীন। সকলেরই একটি চাহিদা আনন্দপূর্ণ সচ্চিদানন্দ। যাঁর সত্তা পূর্ণ, চেতনা অসীম, আনন্দ অফুরন্ত তিনিই ভগবান্। আমরা চিনি বা না চিনি, বুঝি বা না বুঝি, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকলেই ভগবান্‌কে চাই। যে ভগবান্ মানে না, সেও ভগবান্‌কেই চায়।

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ ভগবান্‌কে চাহিয়াছে। তাঁহাকে চাহিয়া, তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণ হইতে চাহিয়াছে। অক্সিজেন না হইলে যেমন মানবের দেহ বাঁচে না, সেইরূপ ভগবান্ না হইলে মানুষের অন্তর সত্তা ও সচেতনতা ম্রিয়মান্ হইয়া পড়ে।

মানুষ ভগবান্‌কে চাহিয়াছে, পায় নাই কাঁদিয়াছে, ফল হয় নাই। অনেক সাধন-ভজন করিয়াছে, তাহাতে মিলে নাই। কারণ তিনি চেষ্টালভ্য বস্তু নহেন।

মানুষ তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া চাহিয়াছে। আজ তিনি মানুষকে চাহিয়াছেন। মানুষের আগ্রহকে সার্থক করিতে আজ তিনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। যে-দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছে সেই দিনটির নাম জন্মাষ্টমী।

যেদিন সাধনার অতীত পুরুষ করুণায় ধরা দিতে আসিয়াছিলেন সেই দিনটিকে মানুষ ভুলিতে চায় নাই। চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে জন্মাষ্টমী নামকরণ করিয়া। রাশিচক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি বৎসর সেই চিহ্নিত দিনটি একবার দেখা দেয়।

সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। ভাদরের বাদল ঝরা গভীর রাত্রে তিনি আসিয়াছিলেন অনাদরে অনাড়ম্বরে প্রাচীর ঘেরা কারাকক্ষের অন্ধকারে, অশ্রুতপ্ত বন্দী জনক-জননীর অঙ্কোপরে।

তিনি আসিয়াছিলেন একটি বার্তা লইয়া। আজিকার দিনে সেইটিই একমাত্র অনুধ্যানের বিষয়। সেইটিই জন্মাষ্টমীর খবর।

তিনি আছেন ইহা বেদের খবর। বেদের ঋষি বলিয়াছেন, তিনি আছেন নিশ্চিত জানি। তাঁহাকে দেখিয়াছি। জন্মাষ্টমীর খবর, তিনি আসেন। মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে আসেন।

বেদের খবর, বহু তপস্যায়ও তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি দুর্লভ। জন্মাষ্টমীর খবর, তিনি সহজলভ্য। তিনি মানুষকে ভালবাসেন। হৃদয়ের সহজ ভালবাসা দ্বারা মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে।

যে মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের ওপর অত্যাচার করে, সে তাঁহার শত্রু। সেই কংস শিশুপাল জরাসন্ধদের কাছে তিনি আসেন সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে। আর যাঁহারা মানুষকে ভালবাসিয়া ভগবান্‌কে আপন করিয়া ভালবাসায় ডুবিয়া রয়, তাহাদের কাছে তিনি আসেন পরম অমৃত স্বরূপে। তাঁহার দু'হাতে দু'টি বস্তু। মৃত্যু আর অমৃত। 'মৃত্যুম্ উত অমৃতঞ্চ'। যাহারা বহির্মুখ রাবণ হিরণ্যকশিপু তাহারা পায় নির্মম মৃত্যু; যাঁহারা অন্তর্মুখী, কৃষ্ণকে কৃষ্ণের জীবকে ভালবাসে তাঁহারা পায় অমৃত। অমৃতের আস্বাদনে জীবন হয় মধুময়, বিশ্ব হয় সুখময়।

এই কল্যাণময়ী জন্মাষ্টমীর বার্তা শুনাইতে আসিয়াছিলেন নদীয়ার প্রেমের দেবতা। কাঁদিয়াছিলেন তিনি গলদশ্রুধারে জীবের দুয়ারে। আজ জন্মাষ্টমীর দিনে সেই নদীয়ার কান্নার রোল আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করুক—তবে মহা দুর্যোগের অবসান ঘটিবে। জয় গৌর, জয় জগদ্বন্ধু। ❑

ভূমিতে ভূমার আবির্ভাব

"দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা"— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা কত ছোট। কত রকমে ছোট। ছোট বলিয়াই দেখি না সুখের মুখ। 'নাল্পে সুখমস্তি।' সুখ বড়র। বড় হইলেই সুখ। 'ভূমৈব সুখম্।' সুখ খুঁজি সবাই। তাইতো চাই বড় হইতে। উৎসবের দিনে আসে বড়র সংবাদ। বড়র বিবরণই আনন্দবহ। বড়র কথাই সুখের। উৎসবের দিনে বড়র কথা বলিয়া বড় হইয়া আনন্দ ভোগ করিতে চাই।

৩১শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর উৎসব। এ এক অদ্ভুত উৎসব। অসাধারণ ঘটনা। সাধারণতঃ ছোটরা ভিড় জমায় বড়র বাড়ী, আনন্দের প্রত্যাশায়। বড়র নামে পরিচিত হইয়া ছোটরা জগতে বিকাইতে প্রয়াসী—বড়র পদবীতে ছোট উঠিতেছে, জাগিতেছে, দেখিলে অন্তরে সুখ হয়। প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। উৎসবে ছোট আমরা বড় হইয়া যাই, তাই আনন্দোল্লাস।

কিন্তু আজিকে ঘটিয়াছে এক অপূর্ব ঘটনা, অভূতপূর্ব ব্যাপার। যার জুড়ি মিলিবে না কোথাও ইতিহাসের পাতায়। আজ ছোটর দুয়ারে নামিয়া আসিয়াছেন যিনি সবার উপরে। ছোটর কাছে আসিয়াছেন বড়। আসিয়াছেন তিনি ছোটর কাছে ছোট হইবার লালসায়। ছোটদের থাকে বড় হইবার সাধ। বড়র ছোট হইবার প্রয়াস কখনও দৃষ্ট হয় না। আজ তাই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার উৎসব। বড়ই অদ্ভুত আজিকার কথা। আজ ছোটর ঘরে বড়র আগমন। ছোটর অঙ্গনে বড়র আসন। যিনি মুক্ত, মুক্তিদাতা, তাঁর আবির্ভাব বন্দীশালে, বন্দী-বন্দিনীর কোলে। যিনি আলোর মানুষ, তাঁহার আত্মপ্রকাশ বাদলঘন নিশীথে। আদরের দেবতা আসিয়াছেন ভাদরের দুর্যোগে। উৎসব আজিকে তাঁহারই স্মরণে।

যিনি অমৃতময়, তিনি আসিয়াছেন মর্ত্যের দুয়ারে। তারপর গিয়া ভিড় জমাইয়াছেন গোকুল নামে এক ছোট গাঁয়ে, ছোটদের আঙিনায়। ছোটই তারা। তারা ধেনু চরায়, শিঙ্গা বাজায়, মথুরার বাজারে দই-দুধ বেচিয়া দিন চালায়। সেই সব-হারাদের উদার হৃদয়ে উদয় হইয়াছেন সর্বেশ্বর। আজ সেই কথাটি বলিতে ধরণী আনন্দমুখর।

যিনি এত বড়, তিনি আসিয়াছেন ছোটদের ছোট পরিচয়ে চির পরিচিত হইতে। যাঁর পরিচয়ের ভাষা শ্রুতিতে "নেতি নেতি", দর্শনে বিশ্বানুগ বিশ্বাতীগ, পুরাণে বিশ্বনাথ, তিনি আজ পরিচিত হইয়াছেন যশোদার দুলাল রূপে, সুবলের সুহৃদ্ রূপে, ব্রজ-গোয়ালিনীর নাগর রূপে। অনিত্য প্রপঞ্চে প্রকটিত সেই নিত্য ঘটনার আজ স্মরণ-মঙ্গল উৎসব।

এই অভিনব উৎসবে মানুষের কাছে প্রকট হইল দুইটি মহা সত্য। আজ মানুষ বড়কে দেখিল ছোট করিয়া। ছোটকে জানিল বড় করিয়া। বড়র বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল তখনই যখন সে ধরা দিল ছোটর কাছে। ভাষার গৌরব বাড়িল তখনই, যখন সে কবিতা হইল ছন্দের বাঁধনে। গদ্য কাব্য ব্রহ্মপুরুষ গোকুলের রস-বন্ধনে মধুর গীতিকাব্যরূপে সুন্দরতম হইল—এই প্রথম

সত্য।

আর দ্বিতীয় মহা সত্য হইল এই যে, ছোটরাও ছোট নয়, ছোটদের মধ্যেও আছে বড়কে ধরিবার মত একটা বড় সম্পদ্। সেই সম্পদ্‌টির নাম শুদ্ধ ভালবাসা। এই সম্পদে সম্পত্তিশালী প্রত্যেকটি মানব, প্রতিটি জীব, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, রাজা-প্রজা, ভৃত্য-মনিব ঐ সম্পদের অধিকারে সকলে সমান। মানবীয় সাম্যবাদের ইহাই ভিত্তি। মানবীয় একত্বের ইহাই বিশ্বকালীন মূলসূত্র। শুদ্ধ ভালোবাসা প্রেম।

চক্ষু আছে দেখি, কান আছে শুনি। তেমনি হৃদয়ে প্রেম আছে, বড়কে সম্মান করি, পরকে আপন করি, চির মুক্তকে বদ্ধ করি। পরাৎপর ব্রহ্মপুরুষকে উদূখলে বন্ধন করি। বড়কে ধরার এই মহা অস্ত্রটি আছে সকল জীবে জীবে। বঞ্চিত করেন নাই প্রেমের দেবতা কাহাকেও এই মহার্ঘ্য রত্নে।

মানুষের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ প্রেম মহা বস্তু আছে। উহা দ্বারা ধরা পড়েন বড়। ধরা পড়িয়া মধুব্রহ্ম হন মধুপতি। সীমার মধ্যেই অসীমের মাধুর্য।

সীমিত অসীমই সুন্দরতম। অসীমকে সীমায় বাঁধিবার রজ্জু যে প্রেমভক্তি, তাহার অধিকারী হওয়াতেই বদ্ধ মানবের কৃতার্থতা।

বাঁশের গৌরব বাঁশীতে। ফুলের গৌরব হাসিতে। মানবের গৌরব ভালোবাসিতে। ভালোবাসার যাদুস্পর্শে মানুষ দেবতা হয়, দেবতাও মানুষ হয়। দু'জনার প্রেম-প্রীতির মাখামাখিতে ধরণীর ধূলি ধন্য হয়। আজিকার উৎসবের খোল এই বোলই বাজায়।

অনন্ত অনন্তে মহীয়ান্; ব্যাহত করে সে বিচারবুদ্ধিকে। সান্তের আবেষ্টনীতে অনন্ত মধুর হৃদয়-মন মুগ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ সরস করে। ক্ষুদ্র জীব অসীমতার বেষ্টনে নষ্ট ক্লিষ্ট ভ্রষ্ট পরাহত। সেই আবার অসীমের ধ্যানে সন্ধানে প্রেমে আত্মবিতরণে বিরাট্ বিশ্বজোড়া পরামৃত। আজিকার দিনে ঘরে-ঘরে নরে-নরে এই ঘটনাই রটনা করে বাউলের খঞ্জনী।

মানবের সভ্যতা পদবী আজ স্বার্থের অন্ধ গলিতে অপদস্থ। ঘাত-প্রতিঘাতের নির্মমতায় পর্যুদস্থ। এই মুমূর্ষু সভ্যতাকে জীবন দানে সমর্থ একমাত্র প্রেমপ্রীতির সঞ্জীবনী সুধা। তাহার প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল আজিকার দিনে গোকুল-ভবনে। এক মহা মানবদরদী তাহা বিতরণ করিয়াছিলেন জনে-জনে নবদ্বীপের অঙ্গনে।

আজিকার উৎসবের দিনে সেই নদীয়ার দাতা-শিরোমণিকে ডাকিয়াই বলিব, ব্যথাহত বুকে নিবেদন করিব—

"মিলাইয়া দেও মানব সংহতিকে এক বিশ্বজনীন সাম্যক্ষেত্রে। শুদ্ধ প্রেমের একপ্রাণতায় পুরাতন সভ্যতা লাভ করুক নূতন জীবনীশক্তি।"

জাতির নবজন্মে জন্মাষ্টমীর উৎসবানন্দ সার্থক হউক। তবেই ভূমার ভূমি-তে আগমনের যথার্থতা। 'জয় গৌর হরি', 'জয় জগদ্বন্ধু হরি'। ❑

কৃষ্ণ নবজলধর

জগতের আদরের ধন আসিয়াছেন ভাদরের বাদলঘন বরষায়। আসিয়াছেন নব জলধররূপে। লীলার অমৃতধারা বর্ষণের মহড়ায়। এই ধরিত্রীর বিশাল ক্ষেত্রে জীবকুল নব শস্যোপম। সেই শস্যরাজি নিয়ত সন্তপ্ত তাপত্রয়ের তীব্রতায়। শ্যাম-জলধরের লীলামৃত-ধারা বর্ষণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে ঐ শস্যসম্পদ্।

সমগ্র লীলাটি যেন বর্ষাঋতু। তুলনাটি দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়। কবিরা ক্রান্তদর্শী। মাংস চক্ষে যা' দেখি না, মানস চক্ষে তাই দেখেন তাঁরা, দেখান আমাদিগকে। সকলেই বর্ষার কবি, কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ। বর্ষায় মাতিয়াছেন বৈষ্ণব কবিরাও—

"মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার।।"

শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের মহাকবি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ষার সম্পদ্ ভোগ করিয়াছেন শ্রীবৃন্দাবন ধামের বর্ষণ দর্শন করিয়া। সেই ভোগে একটু ভাগ বসাইব আমরা।

লীলায় আসিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকটিত হইয়াছেন সগুণ হইয়া। বর্ষায় বহিঃ প্রকৃতিতেও তাই দেখি। মুক্ত নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন। মেঘে আছে গর্জন, আর আছে বর্ষণ। বিদ্যুতের আছে বিস্ফুরণ। নির্মল গগন নিরঞ্জন নির্গুণ ব্রহ্ম। বর্ষার গগন নিজেকে মেঘ বসনে ঢাকিয়া, বৈচিত্র্যময় হইয়া সগুণ সাজিয়াছেন। বর্ষণের আছে সত্ত্বগুণ, গর্জনের রজোগুণ, আঁধারের তমোগুণ। গুণাতীত আজ গুণময়। "ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ" (ভাঃ ১০/২০/৪)।

গগনে উঠিয়াছে রামধনু। বর্ণালীর বৈচিত্র্যে ধনুখানি গুণশালী। আসলে কিন্তু রামধনু গুণহীন, জ্যা-রহিত, ছিলা নাই। রামধনু একই সময় গুণহীন ও গুণশালী। আজ আসিলেন যিনি অনাদরে বাদলের অন্ধকারে তিনিও "নির্গুণো গুণী"। যখন তিনি বিশ্বগ তখনই তিনি বিশ্বাতিগ। যখন গুণময় তখনই গুণাতীত। "নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাক্"।

বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ বায়ু-প্রেরিত হইয়া বিশ্বজনকে আপ্যায়ন করে জলদান করিয়া। মেঘ সজ্জন। বিদ্যুচ্চক্ষু খুলিয়া দেখেন কষ্টমলিন জগৎ। নিজেকে নিজে বিলাইয়া দিতেছেন তাই জলরূপে করুণার প্রেরণায়। পরের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া। "মুমুচুঃ করুণা ইব।"

বর্ষার রাত্রি নীরন্ধ্র অন্ধকার। দেখা যায় না আকাশের বড় বড় জ্যোতিষ্কগুলি। দেখা যায়, কেবল বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকী। কলিকাল পাপের ঘনান্ধকারে ঢাকা। দেখা যায় না মহদ্ব্যক্তিদের জীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুলি। শুধু দেখা যায় হীন চরিত্র লোকদের ক্ষুদ্রতাগুলি। "খদ্যোতস্তমস ভান্তি ন গ্রহাঃ"।

ক্ষুদ্র নদীগুলি গ্রীষ্মে শুষ্ক ছিল, ভালই। অনেক জল পাইয়া ছুটিল পথ ছাড়িয়া বিপথে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিদের ছিল ভাল দারিদ্র্যের শুষ্কতা। ঐশ্বর্য পাইয়া উৎপথগামী হইল যে!

---

* *'যুগান্তর'।*

মেঘের মন্দ্র আহ্বানে দাদুরীদের ডাক শুরু। আচার্যদের অর্থপূর্ণ ডাকে অন্তেবাসীদের বেদপাঠ আরম্ভ। মেঘাড়ম্বরে ময়ূরের উল্লাস। উচ্চপুচ্ছে নৃত্য। গৃহাশ্রমে নরনারী নিয়ত বেদনাহত। একমাত্র হরিভক্ত সমাগমে গৃহীর গৃহ আনন্দযুক্ত। ভক্ত সঙ্গে গৃহী শ্রেয়োলাভে কৃতার্থ। "কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।" "গৃহেযু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে।"

নভোমণ্ডলে চন্দ্রমা বিরাজিত। মেঘ হেতু দীপ্তির প্রকাশ নাই। আবরণকারী মেঘ কিন্তু ঐ জ্যোৎস্নাতেই উদ্ভাসিত। "স্ব-জ্যোৎস্নারাজিতের্ঘনেঃ।" জীবমাত্রের অন্তস্তলে আছে ভক্তির জ্যোৎস্না। কিন্তু ঐ জ্যোৎস্নাতেই প্রকাশিত অহঙ্কারের মেঘাবরণে নিত্য সিদ্ধ ভক্তির ভাস্বর প্রভা অপ্রকাশিত।

পশুপাখী নরনারী ছিল মনমরা। নবীন বর্ষার জলের সঙ্গে আসিল আনন্দের প্রবাহ। বাড়িয়া গেল দেহ-মনের শোভা সম্পদ্। জীবের জীবনের পরিপূর্ণতা শ্রীহরি-সেবায়। সেই সেবায় সকলেরই অঙ্গে ফুটিয়া উঠে মনোহারী রূপ লাবণ্য। "অবিভ্রৎ রুচিরং রূপং যথা হরিনিযেবয়া।"

নন্দনন্দন আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন বর্ষার সৌন্দর্য দেখিয়া। কাননে প্রবেশ করিলেন কানাইয়ালাল গোগণ ও গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া। সেই বনে পক্ক খর্জুর ও জম্বুফল ছিল প্রচুর, "পক্কখর্জুরজম্বুবৎ।"

আয় আয় বলিয়া ধেনুদের ডাকিলেন ধেনুর রাখাল। স্তনভারে মন্দগামিনী ধেনুগণ চলিল তার সঙ্গে সঙ্গে। স্তন হইতে তাদের ক্ষরিত হইতে লাগিল ক্ষীরধাবা বর্ষাব মত। সে বর্ষণেও ভিজিল ধরণীর ধূলি।

বর্ষায় বনবিহারী থাকেন বনে বনেই। বৃষ্টি যখন বিন্দু বিন্দু, দাঁড়ান তখন বনস্পতির ক্রোড়ে; জল যখন প্রবল, প্রবেশ করেন তখন গোবর্ধনের গুহার অভ্যন্তরে। আর তখন আহারীয়? "কন্দমূলফলাশনঃ।"

নন্দালয় হইতে জননী যশোদা পাঠান "দধ্যোদন"। প্রতিদিনই পাঠান টাট্‌কা দধি মাখন গরম ভাত। তাই আহার করেন সঙ্গী সঙ্গে বহু রঙ্গে জল সমীপস্থ শিলা খণ্ডের উপর বসিয়া। "শিলায়াং সলিলান্তিকে।"

নব তৃণের উপর শয়ান পরিতৃপ্ত বৃষগণ স্তনভা্র ক্লান্ত গাভীগণ নিমীলিত নয়নে করে রোমন্থন। তাদের কত ভালবেসে বাল্যভাবাবেশে দর্শন করেন গোকুলানন্দ। "সর্বজনসুখাবহঃ" বর্ষার শোভা। তাহার সমাদর করেন সর্বেশ্বর হরি।

"ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে"। ভগবান্ পূজা করেন প্রাবৃট্‌কালের শ্রীদেবীকে। নিজ সত্তা হারাইয়া তার সঙ্গে এক হইয়া পূজা করেন। কারণ, ঐ শোভা তো তাহারই নিজ শক্তির অভিব্যক্তি। "আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্।"

বর্ষায় ব্রজবন আনন্দমুখর। কৃপার সাগর বেণু-কর ভাবে রসে গরগর। রস-নায়কের সঙ্গে মিলনাভিসারের এই শুভ অবসর।

"বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল্ সুবদনী সঙ্কেত গেহ।।"

গোবিন্দের গণ ভক্তগণ! আসুন যাই। আমরাও ছুটিয়া যাই। বর্ষণের ঝরঝর সঙ্গীতে বর্ষা কবিতার ভাব ইঙ্গিতে জীবন-দেবতার চরণোপান্তে। যাই সুবদনীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের মিলনের সঙ্কেত গৃহে। হেরি মিলন রঙ্গ। গাই জয় শ্যামসুন্দর. সুন্দরী সঙ্গে একাঙ্গে জয় গৌরসুন্দর। জয় জয় মহামিলনময় শ্রীবন্ধুসুন্দর।। ❐

জন্মাষ্টমী প্রশস্তি

জন্মাষ্টমী ভাদ্রমাসের রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী। ভাদ্রে সূর্যের স্থান সিংহে। এ মাসে জন্মিলে জাতক হয় সিংহবীর্য। রোহিণীর সঙ্গে চন্দ্রের মিলন পরম রমণীয়। জন্মিলে জাতকের রূপ হয় আকর্ষণীয়। পূর্ণিমায় আলো, অমাবস্যায় কালো। অষ্টমী তিথি মধ্যবর্তী। তাতে জন্মিলে জাতকের জীবনধারা হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রতিভা হয় সর্বতোমুখী, সকল দিকে ভারসাম্য শোভন ও সুস্থির। আবার অষ্টম গর্ভের সন্তান হয় শক্তিমান্, বিবেকী ও কৌতুকী। এ জন্য কৃষ্ণজন্মতিথির সার্থক নাম জয়ন্তী। আর কারো জন্মতিথি জয়ন্তী নয়।

গোলোকের হরি, নেমে এসেছিলেন ধরণীর ধূলায়। ক্রীড়ার জন্য প্রকটিত হয়েছিলেন নিত্য লীলাময় অনিত্য মানবের মর্ত্য ভূমিকায়। শ্রীগীতাশাস্ত্রে বিঘোষিত শ্রীমুখবাণী। আমি আসি যুগে যুগে। আসি ধর্মের গ্লানি হলে তা দূর করতে। আসি সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যের সুদৃঢ় সিংহাসনে। তখন পাদপীঠ রচি পার্থিব প্রপঞ্চে।

কাপুরুষ কংসের প্রাসাদ মধ্যে এলেন অক্ষরপুরুষ, তা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানল না কংস। জানল বটে আর একদিন কিঞ্চিন্নধিক এক দশক পরে। সেদিন আবার এলেন। তার সম্মুখে ভয়াল মৃত্যুরূপে। জন্মের দিন রজনীতেই বিজয় করলেন গোকুলনামা এক পবিত্র পল্লীতে। বাদল-ঝরা দুর্যোগের মধ্যেই চলে গেলেন। উদ্দেশ্য — সেথায় বিতরণ করবেন মধুর পরমামৃত। এক হাতে তার মৃত্যু, আর হাতে অমৃত। বহির্মুখী বিষয়াসক্ত পায় মৃত্যু। অন্তর্মুখী ঈশ্বরানুরক্ত লুটে অমৃত। অপূর্ব তাঁর রহস্যময় ব্যক্তিত্ব।

শুধু ভারতাত্মা নন তিনি। তিনি বিশ্বাত্মা পরমাত্মা। তিনি সচ্চিদানন্দ। বৈষ্ণব কবির অনবদ্য ভাষায় সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর সত্তায় জগৎ সত্তাময়। তাঁর চেতনায় জীব চৈতন্যময়। তাঁর আনন্দে বিশ্বসংসার মধুময়।

তাঁর সৎ শক্তির বিলাস মথুরা দ্বারকায়। অসুরঘাতক বিপন্ন রাজ্যের সংগঠক, কল্যাণ রাষ্ট্রের সংস্থাপক তিনি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রতাপবান। তাঁর চিৎশক্তির বিলাস কুরুক্ষেত্রে। সেখানে তিনি ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জুনেরও উপদেষ্টা। তিনি মহান আচার্য, তিনি জ্ঞানসিন্ধু গুরু, তিনি প্রজ্ঞাঘন।

বৃন্দারণ্য তাঁর আনন্দশক্তির বিলাসভূমি। সেখানে তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের চিত্তাকর্ষক।

* *'যুগান্তর'*, ১-৯-১৯৮০

নরনারী সকলের প্রীতির পাত্র, পরম আদরের ধন। সেখানে তিনি অফুরন্ত প্রেমের ব্রজে মূর্তি। ব্রজে তিনি রসিক-নাগর রসঘন। ❑

পূতনামোক্ষণলীলা

শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষণ আছে 'আত্মারামগণাকর্ষী।' যাঁরা 'আপ্তকাম' 'আত্মারাম',* যাঁদের কোন প্রয়োজন নেই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকেও আকর্ষণ করেন। তার পরম দৃষ্টান্ত হলেন শুকদেব মহারাজ নিজে। শুকদেব ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে বিভোর হয়ে থাকতেন। বাল্যবয়স থেকে তপস্যা করতে করতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করলেন। সবসময় ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকতেন। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" এই রকম একটি অবস্থায় থাকতেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতকথা বলতে এলেন কীভাবে? ঐ যে 'আত্মারামগণাকর্ষী'—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামকে আকর্ষণ করলেন। কী করে আকর্ষণ করলেন শুকদেবকে সে এক মধুর কাহিনী।

ব্যাসদেব নারদের কৃপায় শ্রীমদ্‌ভাগবত লিখলেন। নারদ তাঁকে জানালেন, "তুমি এত কথা লিখেছ কিন্তু শ্রীভগবানের মধুর লীলাকথা বর্ণনা করনি, তাই তোমার মনে সুখ নেই।" লীলাকথা সংক্ষেপে নারদ ব্যাসদেবকে জানালেন এবং ব্যাসদেব ধ্যানস্থ হয়ে তা দর্শন করলেন এবং গ্রন্থাকারে বর্ণনা করলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত তো প্রকট হলেন, এখন প্রচার করবার লোক তো চাই। তাই প্রচার করবার জন্য নিজে তপস্যা করে পুত্রলাভ করলেন। এখন পুত্র তো বাল্য বয়সেই তপস্যায় চলে গেল এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। এখন এই ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্র কি ব্যাসদেবের ভাগবত প্রচারে আসবে? ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন থাকে না। তাঁরা ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকেন। এই পুত্রকে কি আর ভাগবত পুঁথি পড়াতে পারবেন? কী করবেন? বেদব্যাসের মনে দুঃখ হ'ল।

ব্যাসদেব যে-বনে বাস করতেন সেই বনের ধারে ক'এক ঘর কাঠুরিয়া বাস করত। ব্যাসদেব তাদের ছেলেদের ডেকে ভাগবতের বেশ ভালো ভালো কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করালেন। মুখস্থ করালেন অর্থাৎ তাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করে শ্লোকগুলি তাদেরকে আত্মস্থ করালেন। এইবার তিনি তাদেরকে বললেন, "ঐ যে ওখানে এক সাধু বসে তপস্যা করছে, তার চারপাশে গিয়ে তোরা এই শ্লোকগুলি বলবি।" কাঠুরিয়ার ছেলেরা কাঠ কাটে আর ভাগবতের শ্লোক আওড়াতে থাকে। শুকদেব আত্মানন্দেই থাকতেন। কখনও বাহ্যজ্ঞান হ'ত। সেই সময়

"অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ
অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি-কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।।" চৈচৈঃ ২/২৩/৩৪

শ্রীমহানাম অঙ্গনে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ক্যাসেট থেকে অনুলিখন করেছেন শ্রীবুধাদিতা খান (শিলিগুড়ি)।

বাহ্যজ্ঞান হয়েছে একটু এমন সময় শুনলেন—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।" ভাঃ ৩/২/২৩

শ্লোক শুনে শুকদেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এই রকম শ্লোক আগে কখনো শুনেননি। যে-ছেলেদের কাছে এটি শুনেছেন তাদের বললেন, "এমন শ্লোক তোরা কোথায় পেলি?" ছেলেরা বলল, "ঐ যে গাছতলায় একজন বৃদ্ধ তপস্বী বসে আছেন, তিনি শিখিয়েছেন।" ফিরে এলেন পিতার কাছে। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মধুর শ্লোক কোন্ গ্রন্থে আছে?"

পিতা উত্তর দিলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে।"

শুকদেব—"এই গ্রন্থের দ্রষ্টা কি আপনি?"

ব্যাসদেব—"হ্যাঁ, আমি।"

শুকদেব এই শুনে বললেন, "আমি এসেছি আপনার দুয়ারে ভাগবত কথা শুনতে। এত সুন্দর শ্লোক! আগে তো জানতাম না। ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বভূতেষু। কিন্তু ব্রহ্ম যে কাউকে কৃপা করেন, এ তো আমি জানতাম না, ভাবিওনি কখনও। শ্লোকে বললেন যে, ব্রহ্ম এত কৃপাময় যে পূতনাকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন! কেবল বৈকুণ্ঠে নয়, বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়ে ধাত্রীগতি দিলেন! এই রকম এক অপরাধী রাক্ষসী, তাকে এত কৃপা করেছেন ব্রহ্ম, আমি ভাবতেও পারি না। কারণ, ব্রহ্ম তো নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নিরুপাধি। তিনি কী করে কৃপাময় হবেন? দয়া করে ব্রহ্মের সেই কৃপাস্বরূপের কথা আমাকে বলুন।" এইভাবে বেদব্যাস কৌশলে ছেলেকে ঘরে তুললেন ভাগবতের একটি শ্লোক দিয়ে। এই শ্লোকের বিশেষ কথা হ'ল কৃপার কথা। ব্রহ্ম আর ভগবানের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল এই যে, ব্রহ্মে কৃপার প্রকাশ নেই; ভগবানে আছে। উভয়ে কিন্তু একই বস্তু। যেমন বায়ু আছে সর্বত্র, বায়ু আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু খুব গরমে আমি যখন ছটপট করি তখন এই বায়ু আমায় বাঁচায়, কিন্তু তৃপ্ত করে না। আর এই বায়ুটাকেই আমি যখন পাখা দিয়ে আমার কাছে টেনে এনে আন্দোলিত করি তখন তা আমায় তৃপ্ত করে। তাই পাখার হাওয়াটা আমার 'ভগবান্', এটি আমায় প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা করছে; আর যে বায়ুটায় আমি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি, যা আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে মাত্র, তা হ'ল 'পরব্রহ্ম'। তাই ব্রহ্ম ভক্তের ভগবান্ হলেন তখন যখন তাঁর মধ্যে অসীম করুণাশক্তির প্রকাশ ঘটল। ব্রহ্মে কৃপাশক্তি বিনিদ্রিত, আর শ্রীভগবানে কৃপাশক্তি বিলসিত। এখন এত কৃপা পূতনাকে ভগবান্ কোথা থেকে দিলেন—সেই কৃষ্ণকথা শুনতে চেয়েছেন শুকদেব।

এখন পূতনা কী করে ধাত্রীগতি পেয়েছেন তার প্রতি ভগবানের কৃপার কথা একটু ভালো করে বোঝা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরেই পূতনামোক্ষণ লীলা। শ্রীকৃষ্ণের পরে নন্দরাজ আনন্দে জন্মোৎসব করলেন, তারপর ভাবলেন, "যাই একবার মথুরায় ঘুরে আসি।" গোকুলের মালিক হলেন কংসরাজা, তাই সেই নিয়মানুসারে মথুরায় গিয়ে কর (Tax) দিতেন কিন্তু উপেক্ষাই করতেন বরাবর। কখনও দিতেন কখনও দিতেন না, কয়েক বছরেরটা পড়ে থাকত। এখন হ'ল কি, পুত্র জন্মবার পর বেশী করে সংসারী হয়ে গেলেন। ভাবলেন, "যদি

কংসরাজ রেগে যায়, যদি আমায় ঘর ছাড়া করে, তখন গোপাল নিয়ে কোথায় যাব?" আগে ভাবতেন, করুক গে ঘরছাড়া, যমুনার পাড়ে গিয়ে তপস্যা করব বা হিমালয়ে চলে যাব ইত্যাদি। নির্লিপ্ত যে সে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবার পরে সংসারে লিপ্ত হলেন 'কৃষ্ণার্থে'। তাই ভাবলেন, কংসের যা বাকি খাজনা-টাজনা আছে আর যদি রাগ-টাগ করে তাই কিছু ভেট নিয়ে, দই-টই কিছু ভালো বানিয়ে নন্দরাজ চলে গেলেন মথুরায় কংসের বাড়িতে। সেখানে খাজনা ও ভেট দিয়ে কংস রাজাকে খুশি করলেন। উদ্দেশ্য এই যে, "কংস আমাদেরকে যেন কোন উদ্বেগ না দেয়।" নন্দ আসবার সময় বসুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসলেন। বসুদেব কারাগারে এখনও। নন্দরাজাকে দেখে বসুদেব চমকে উঠলেন। উঠে বললেন, তুমি কেন এসেছ? তুমি এখনই বাড়ি যাও।"

নন্দ—"কেন?"

বসুদেব—"তোমার কোন বিপদ্ হতে পারে গোকুলে। তুমি বাড়ী যাও।

নন্দরাজ—"তুমি কী করে টের পেলে?"

বসুদেব—"হ্যাঁ আমি টের পেয়েছি। তুমি বাড়ি যাও।"

বসুদেবের কাথায় নন্দরাজ তাড়াতাড়ি গোকুলে ফিরছেন। ঠিক এমন সময়টায়। কংস টের পেয়েছে তাকে যে মারবে সে গোকুলে জন্মেছে। শুনেছেন কোথাও না কোথাও সে আছে। এখন তার মনে হ'ল এই শিশুটিকে তার মারতে হবে। পূতনাকে ডাকলেন, ডেকে বললেন, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।" পূতনা বলল, "কী কাজ?" কংস উত্তর দিলেন, "আমার একজন শত্রু জন্মেছে। ঠিক কোথায় আছে জানি না। তবে এই মথুরামণ্ডলেই আছে। তুমি এক কাজ কর, যত শিশু জন্মেছে গত দশ দিনের মধ্যে, সবাইকে তুমি মেরে ফেল। তাহলেই আমার শত্রু চলে যাবে। কোথায় জন্মেছে কবে জন্মেছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আজ থেকে তিন-চার দিন আগে আমার হাত থেকে ছিটকিয়ে আকাশে উঠবার আগে সেই দুর্গা মূর্তি বলে গেল "তোর শত্রু জন্মেছে।" তাই দুই-চার দিন তার সঙ্গে আরও যোগ করে, আরও কয়েকটি দিন যোগ করে "দশ দিন" সময় দিলাম।

পূতনা এখন করে কী? পূতনা এখন মথুরা মণ্ডলের প্রতিটি ঘরে ঘরে যায়, যেখানে যত নবজাতক শিশু আছে তাদের আদর করে এবং সকলের অলক্ষ্যে নিজ বিযাক্ত স্তন পান করায়। এই ভাবে তার স্তনে যেই মুখ দেয় সেই মরে যায়। এই ভাবে পূতনা মথুরা মণ্ডলের নানা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং সেই সঙ্গে গ্রাম-কে-গ্রাম শিশুশূন্য হতে থাকল। এই ঘটনা কখন ঘটল? যখন নন্দরাজ মথুরায় গিয়েছেন, সেই ফাঁকটায়। এমন অবস্থায় পূতনা নন্দালয়ে প্রবেশ করেছে। আর গেছেন। এক সুন্দরী রমণীর বেশে। সব জায়গাতে ছদ্মবেশেই যেত। রাক্ষসীরা মায়াবিনী কিনা। আজ এমন বেশ নিয়েছে যে, যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। মনে হয় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী এসেছেন। হাতে আবার পদ্ম ফুলও নিয়েছেন। 'পদ্মালয়া' এখন পূতনা তো এসে ঢুকেছে নন্দালয়ে, তাকে দেখে যারা আসে-পাশে ছিল তারা তটস্থ হয়ে গেল। তারা একে অপরকে বলতে লাগল, "দেবী এসেছেন আমাদের গোপালকে দেখতে! দেবী এসেছেন!" যশোদা, রোহিণী আর জননীরা যাঁরা এতক্ষণ গোপালকে নিয়ে বসেছিলেন তাঁরাও একটা কথা

বললেন না। সরল হৃদয়া মা আজ কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এদিকে নন্দরাজও বাড়িতে নেই। আর যারা আছে তারা সব হাতজোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পূতনা গোপালের দিকে তাকিয়ে যশোদাকে বলতে লাগলেন, "যশোদা! তোমার ছেলেটি কি সুন্দর, কেমন সুন্দর হাসে, কেমন সুন্দর হাত নাড়ে, দাও না আমার কোলে।" মা এতক্ষণ মনে মনে ভাবছিলেন, "দেবী যদি কৃপা করে আমার গোপালকে স্পর্শ করেন তবে আমার গোপালের সব অমঙ্গল দূর হবে।" মা নিশ্চিত মনে পূতনার কোলে গোপালকে তুলে দিলেন। আর গোপাল তো গোপালই। সেও তাঁর ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে পূতনার কোলে উঠে পড়ল। কিন্তু কোলে উঠলে কী হবে গোপাল কিন্তু পূতনার দিকে একবারের জন্যও তাকাননি। অর্থাৎ গোপাল পূতনার কোলে উঠতেই নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলেন। কারণ, গোপাল জানেন, 'আমি যদি পূতনার দিকে তাকাই তাহলে পূতনার এই কপট বেশ খুলে যাবে। কারণ, শ্রীভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কপটতা থাকতে পারে না। "স্বদৃষ্টি-স্বাভাবিক-তদ্বিবর্ধনাভাবায়।" সেই রকম হলে মা ভয় পেয়ে যাবেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁর জীবনান্তও হতে পারে। পূতনা গোপালের অঙ্গে হাত বুলাচ্ছে। আশেপাশে যারা ছিল তারা সবাই দূরে সরে গেছে। এইভাবে আদর করতে করতে এক সময় পূতনা সবার অলক্ষ্যে নিজ স্তন গোপালের মুখে দিয়েছে। স্তনে যে বিষ মাখানো আছে তা অতীব তীব্র। কৃষ্ণ স্তন মুখে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তন আকর্ষণ করলেন। অর্থাৎ কিনা দুধ ধরে টান দিয়েছেন। আসলে দুধ তো নেই, ফাঁকি সব। আর টান দিয়েছেন এমন জোরে যে প্রাণ শুদ্ধ টান দিয়েছেন। কিন্তু পূতনা তো প্রাণ দিতে যায়নি। নন্দালয়ে গিয়েছিল বিষ দিতে। ঠাকুর এমনই দয়াময়-যে তিনি, বিষও নিলেন স্তনও নিলেন সেইসঙ্গে প্রাণও নিলেন। আপনি যদি ঠাকুরকে কিছু দিতে যান তবে ঠাকুর আপনার জিনিসের সঙ্গে আপনাকেও নিবে। কৃষ্ণ যেই না পূতনার প্রাণ আকর্ষণ করেছেন, পূতনা তার প্রাণ-বিয়োগের বেদনায় চিৎকার করে উঠেছে। এ বেদনা এমন বেদনা যে সে তার সেই কপট ছদ্মবেশ আর ধরে রাখতে পারল না। সেই অপূর্ব সুন্দরী 'পদ্মালয়া' হয়ে দাঁড়াল এক বিভৎস রাক্ষসী—দেখলে শরীর কম্পমান হয়। সবাই হাহাকার করে উঠল। পূতনার চীৎকারে নন্দগোকুল কেঁপে উঠল। মনে হ'ল যেন ভূমিকম্প হয়েছে। পূতনা চীৎকার দিয়েই "ছাড় ছাড়" বলতে বলতে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু ধরবার যিনি তিনি পূতনাকে ধরেই বসে আছেন। পূতনার অবস্থা এদিকে কাহিল, সে আর সহ্য করতে পারছে না। প্রাণ-বিয়োগের তীব্র বেদনায় গাছপালা ঘরবাড়ি সমেত সে মাটিতে পড়ে গেছে। সবাই দিশাহারা হয়ে গেছে। মনে প্রথম চিন্তা এল—গোপাল কই? তারা দেখে পূতনা তো মরে পরে আছে, আর গোপাল এখনও পূতনার সেই স্তন মুখে দিয়ে পূতনার বুকের উপর শুয়ে আছে। ঠাকুর আমার স্তন ছাড়েন নাই। তার মুখের এমন ভাব যেন কিছু জানেনই না। গোপমায়েরা তাড়াতাড়ি পূতনার বুক থেকে গোপালকে কোলে নিলেন। গোপালকে সুস্থ দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন "গোপাল বেঁচে আছে! গোপাল বেঁচে আছে!" এরপর গোপালের সারা গায়ে গাভীর লেজ বুলিয়ে দিয়ে গোপালের যত অমঙ্গল সব দূর করে

দিলেন। মা যশোদা গোপালের সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে মন্ত্র পড়ে দিলেন রক্ষা-কবচের। "হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয় সকল রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপাধিপতি তোমার চিত্ত ও যোগেশ্বর তোমার মন রক্ষা করুন। অর্থাৎ যেখানে যত দেবতা আছেন সকলে এসে আমার গোপালকে রক্ষা করুন।" এই ভাবে মা গোপালের সর্ব অঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন আর হাত বোলাতে লাগলেন।

এদিকে পূতনা মরবার আগে এত জোরে চীৎকার দিয়েছিল যে পথি মধ্যে নন্দরাজ তা শুনতে পেলেন। শব্দ শুনেই তো তিনি প্রমাদ গুণলেন; ভাবলেন, "বসুদেব যে বিপদের কথা বলেছিল সে বিপদ্ তো তাহলে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কারণ, এই চিৎকার তো নন্দালয় থেকেই আসছে।" নন্দরাজ পড়ি-মরি করে গৃহে ফিরলেন, এসে দেখলেন এই অবস্থা। সবাই পূতনাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কাছে যেতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। নন্দরাজ পরীক্ষা করে দেখেন পূতনা সত্যি মরে গেছে। নন্দরাজের কথাকেও অনেকের বিশ্বাস হয় না। তখন তিনি বললেন, "এক কাজ কর—এই রাক্ষসীর দেহ টুকরো টুকরো করে কাটো এবং দূরে গিয়ে পুড়িয়ে ফেল।" নন্দরাজের এই কথা সকলের মনে ধরল। কিন্তু পূতনার দেহ যখন দাহ করা হ'ল তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল! কী ঘটল? মানুষ পোড়ালে দুর্গন্ধ বের হয়। রাক্ষসী-দেহ যখন তখন তো দুর্গন্ধে ভরে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সারা গোকুল অপূর্ব সুগন্ধে ভরে গেল। এক তমোগুণাশ্রিত রাক্ষসীর দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ বের হচ্ছে। এর কারণটা কী? দেহ যদি তমোগুণের আশ্রিত থাকে তাহলে দেহ থেকে দুর্গন্ধ হয়। সত্ত্বগুণময় দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় না। কিন্তু যেই মাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূতনার কোলে উঠলেন, পূতনা কৃষ্ণের গায়ে হাত বুলালেন, পূতনার স্তন কৃষ্ণ মুখে নিলেন—সেই মাত্র পূতনা ধাত্রীগতি লাভ করলেন। একথা যে শুনবে সেই বলবে "বলেন কী? এ তো অবাক্ কাণ্ড!" পূতনার তো মহা নরকে গতি হওয়ার কথা ছিল, তা তো হ'ল না। কেন হ'ল না? এই "কেন হল না"—এর দু'টি কারণ আছে। প্রথমটি হ'ল "সদ্বেশাদিব", দ্বিতীয়টি হ'ল "স্তনং দত্ত্বা"। একটি হল সদ্‌বেশ। পূতনা মায়ের বেশ ধরে এসেছিল। বেশেরও একটা মূল্য আছে। একটা গল্প বলছি—একটি বনে এক ব্যাধ থাকত এবং বনের পাখি শিকার করে জীবনযাপন করত। কিন্তু এমন একদিন আসল যখন বনের যত পাখি ছিল তারা ব্যাধকে দেখলেই প্রাণভয়ে পালাতো। তার ফলে ব্যাধের পাখি শিকার বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। একদিন যখন ব্যাধ ক্লান্ত হয়ে গাছের নিচে বসে ছিল তখন সে দেখে এক সাধু নদীতে স্নান করে এসে তিলক সেবা করছে। আর সাধুর চারপাশে নানা রং-এর হরেক রকম পাখি কিচির-মিচির করছে। এমনকি সাধুর গায়ে শুদ্ধ এসে বসছে, কোলে এসে বসছে। এই দেখে ব্যাধ ভাবল, "এইতো পাখি মারবার একটি ভালো বুদ্ধি পেয়েছি। ব্যাধ তাড়াতাড়ি সাধুর পোশাক পড়ে, কপালে তিলক এঁকে গাছতলায় বসে পড়ল। আর সেই না বসা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে নানা রং-এর পাখি উড়ে উড়ে আসতে লাগল। ব্যাধ মনে করল, পাখি তো এখন আমি ধরলেই ধরতে পারি, আটটা দশটা, এত কাছে! কিন্তু ইচ্ছে যে করছে না। ব্যাধ আরও ভাবে, "আমি সাধু হইনি, সাধুর নকল করছি মাত্র, এতেই বনের পাখি আমাকে বিশ্বাস করছে। আমার কাছে আসছে,

জানে আমি আমি হিংসা করব না। আর আমি যদি ভিতরে বাইরে সাধু হতাম তাহলে না জানি কী করতে পারতাম। জগতের অশেষ কল্যাণ করতে পারতাম। আমি আর পাখি মারব না। এখন থেকে আমি আসল সাধু হব। ব্যাধ গিয়ে পড়লেন কোন এক মহাপুরুষের শ্রীচরণে। গিয়ে বললেন, "আমায় আপনি সাধু ঝরে দিন!" মহাপুরুষ বললেন, "তুমি তো সাধুই।" ব্যাধ বলল, "ওটা বাইরের খোলস মাত্র, ভিতরে বিন্দুমাত্র সাধুতা নেই।" মহাপুরুষের কৃপা-বলে ব্যাধের জীবনে পরিবর্তন এল। সজ্জনের যদি আপনি নকলও করেন তাহলেও আপনার কল্যাণ হবে। তাই সজ্জনের বেশকে শ্রদ্ধা করতে হয়। আপনি এক সাধুকে জানেন যে নাকি ভালো না, কিন্তু যেহেতু সে সজ্জনের বেশ ধরে এসেছে তাই সেও শ্রদ্ধার পত্র। পূতনা যত পাপই করুক না কেন সাধুর বেশ, মায়ের বেশ ধরে এসেছিল, মায়ের মত হয়ে এসেছিল। এই যে মাতৃবেশ, ঠিক যেন স্নেহময়ী মায়ের মত যশোদাকে বলেছিল, "যশোদা! তোমার ছেলেটি কি সুন্দর!" অর্থাৎ কৃষ্ণের গুণকীর্তন করেছিল। আপনি বলবেন, "গুণকীর্তন তো কপটতার সঙ্গে করেছিল।" আহা! কপটতার সঙ্গে গুণকীর্তন গাইলে কী হবে, গুণ তো গেয়েছিল কৃষ্ণের। "যশোদা তোমার ছেলের কি মিষ্টি হাসি"—বলেছিল তো। "কেমন সুন্দর হাত পা নাড়ে"—বলেছিল তো। আপনি বলবেন, "সে তো কপটতার সঙ্গে বলেছিল। তা হলেও লাভ হবে?" শাস্ত্রকার বলবেন, "হ্যাঁ, তা হলেও লাভ হবে।" এই হ'ল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল "স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্"। শ্লোকটির অর্থ হ'ল—পূতনার কোন গুণ নেই। একটা একটা করে দেখেন—পূতনা 'লোকবালঘ্নী'। চাকরি করত বালকবধের। 'রাক্ষসী' জন্মেছে রাক্ষস বংশে। আমরা যত খারাপই হই না কেন, রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করিনি। 'রুধিরাশনা', আপনি যাই খান নিরামিষ আমিষ কিন্তু রক্ত তো খান না। আবার কার রক্ত? শিশুর রক্ত। তাই পূতনা শিশুর রক্ত পান করতে রাক্ষস বংশে জন্মেছে। এই রকম একটি পাপী গিয়েছে বৃন্দাবনে। মানুষ বৃন্দাবনে যায় তীর্থভ্রমণ করতে, কৃষ্ণভজন করতে; আর পূতনা বৃন্দাবনে গিয়েছিল কৃষ্ণবধ করতে। তাই কোন দিকেই পূতনার ভালো গুণ নেই। তাহলে পূতনার এত ভালো গতি হ'ল কী করে? এই যে "স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্"—কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পূতনা যে স্তন দান করেছিল এতেই পূতনার ধাত্রীগতি লাভ হয়ে গেল। আপনি আবার প্রশ্ন তুলবেন, "এর তো শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।" শাস্ত্রকারেরা উত্তর দিবেন, "হ্যাঁ। উচিত ছিল শাস্তি দেওয়ার, সময় ভগবান্ পাননি।" আপনি বলবেন, "সময় পাওয়া গেল না এই কথার মানে কী?" এখন শাস্তি তো বিচার-বিবেচনা করে দিতে হবে। কপটতার বেশ ধরে যদি আর অন্য জায়গায় যেত তবে পূতনা নিশ্চয় শাস্তি পেত। কিন্তু কপটতার বেশ ধরে সে এল কৃষ্ণের কাছে, গিয়ে কৃষ্ণকে আদর করে কোলে নিয়ে স্তন দান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পূতনার সব পাপ চলে গিয়ে সদ্‌গতি হয়ে গেল। পূতনা যে কপটতা করে এসেছিল, তাকে যে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন—এই চিন্তার অবকাশ কৃষ্ণ পাননি। কারণ, গীতায় ভগবান্ নিজ মুখে বলেছেন "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্। সাধুরের স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।" (গীতা ৯।৩০) দূরাচার যদি হয়, সুদুরাচারও যদি হয়, "ভজতে মাম্ অনন্যভাক্"—আমাকে

যদি অনন্যভাবে ভজনা করে, "সাধুরেব স মন্তব্যঃ" সে সাধু হয়ে যাবে। আপনি বলবেন, "পূতনা সাধু তো হয়নি, এ ঘটনা দুরাচার তো।" ভগবান্ বলবেন, হ্যাঁ দুরাচার কিন্তু "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা" (গীতা ৯/৩১)। তিনি আবার এক জায়গায় বলেছেন "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (গীতা ৯/৩১)। আমার ভক্তের নাশ নেই। কিন্তু পূতনা তো কোন ভজনা করেনি। তাহলে সে কী করে সদ্গতি পায়? ঐ যে বললাম 'সদ্বেশ'। অনুকরণেরও ফল আছে। জপ করতে পারি না, কিন্তু যারা জপ করে তাঁদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করি, আঙুল ঘুরাই, এতেই ফল হবে। পূতনা এই যে মায়ের মত করে নিজ স্তন গোপালের মুখে ধরল—এতেই তার সদ্গতি লাভ হয়ে গেল। এখানে একটা জিনিস্ বোঝার ব্যাপার আছে। করুণাময় ভগবানের করুণা কত দেখুন। যে-পূতনা মাতৃবেশে কপটতা করে কৃষ্ণের মুখে বিষ স্তন দিল তাঁর কপটতাকে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার সময় ভগবান্ পাননি। বিচার করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় তো লাগবে। যেই-মাত্র পূতনা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন দান করেছেন, সেই মাত্র সব পাপ শূন্য হয়ে সদ্গতি পেল; পেয়ে কোথায় গেল? একেবারে বৈকুণ্ঠে। মাঝখানেও তো দিতে পারতেন। না, তা দিলেন না। দিলেন তো একেবারে চরম গতি দান করলেন। এখন প্রশ্ন হ'ল, বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি দান করলেন কেন? কৃষ্ণ ভাবলেন, "পূতনা, তুমি আমার মা হয়ে এসেছিলে, এসে কোলে নিয়েছিলে। যেমন তোমার ইচ্ছা। মা তো আমার অনেক আছে, দেবকী আছে রোহিণী আছে, যশোদা তো আছেই, তাই এখন থেকে তুমি আমার ধাত্রী মাতা হও।" পূতনা-মোক্ষণলীলা ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের কথা। এখন প্রশ্ন হ'ল, এর থেকে কি মানুষ খারাপ শিক্ষা পাবে না? বলবে না, "আমরাও কপটতা করি?" কৃষ্ণ বলবেন, "হ্যাঁ কর, তবে আমার কাছে এসে কর। অন্য কোথাও করলে কঠিন শক্তি পাবে।" ভগবানের কাছে গিয়ে কপটতা করলেও ভগবানের ভজনাই করা হয়।

এখন আপনি বলবেন, "লীলাকথা তো শুনলাম, এতে আমার লাভ কী হ'ল? পূতনা তো ধাত্রীগতি পেল, তাতে আমাদের কী লাভ হল?" মনে করুন একটি বড়লোকের বাড়িতে অনুষ্ঠান হচ্ছে, নিমন্ত্রিত যাঁরা তাঁরা বিনা বাধায় ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু রবাহুত যারা তাদের কী হবে? সাধন-ভজন করেছে যারা ভগবানের কাছে যেতে তাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু আমরা যারা পতিত জীব, যারা নাকি সারাজীবনে বিন্দু মাত্র ভজন-সাধন করিনি, তাদের জন্য তো কোন আমন্ত্রণ পত্র নেই। তারাও কিন্তু গুটি-গুটি পায়ে বৃন্দাবনের সেই অনুষ্ঠান বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, আর মনে লালসা ভগবানের করুণা-প্রসাদের। এখন অনুষ্ঠান বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে আপনি ভিতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছেন; ভাবছেন, "যদি তাড়িয়ে দেন।" এখন আপনি দেখলেন লোক ভিতরে ঢুকছে, কিছু লোক বেড়িয়ে আসছে। অনুষ্ঠান বাড়িতে যেমন হয় আর কি। এখন যে আগে গিয়েছিল সেই তো আগে বেড়িয়ে আসবে, পূতনা বৃন্দাবনের সর্বপ্রথম যাত্রী। সুতরাং সে-ই প্রথম প্রথম বেড়িয়ে আসবে। আপনি তো অনিমন্ত্রিত অতিথি, ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। পূতনা বাইরে এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। "ভিতরে যান। এখানে রাস্তায় বসে আছেন কেন?" আপনি বলবেন, "সাহস পাই না, ভয় হয়।"

আপনি—"আমাদের নিমন্ত্রণ-পত্র নেই, মানে সাধন-ভজন নেই।"

পূতনা—"বলেন কী? সাধন-ভজন লাগবে কিসের? তাঁর চরণের কাছে গেলেই আপনি প্রসাদ পেয়ে যাবেন। যান যান, ভয় পাবেন না। আমাকে চেনেন? আমার নাম পূতনা। আমি মহাপাপী। আমি এমন পাপ করেছি যা আপনারা কেউ করেননি। আপনি কোন্ বংশে জন্মেছেন? হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না হয় শূদ্র। রাক্ষস বংশে তো জন্মাননি? আমি রাক্ষস বংশে জন্মেছি। অনুষ্ঠান বাড়ি অর্থাৎ বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা? লোকে বৃন্দাবনে যায় কৃষ্ণ-ভজনের জন্য, আমি গিয়েছিলাম কৃষ্ণ-বধ করবার জন্য। আপনারা কেউ নিরামিষ কেউ আমিষ খান, আমি যা খাই তা আপনারা কেউ খাননি। কী শুনবেন? বলব? বড় লজ্জা করে বলতে। জীবন-ভোর শিশুর রক্ত খেয়েছি। সেই আমি গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। আর যাওয়া মাত্র তিনি আমায় মায়ের স্থান দিলেন! তাই বলছি, যে-কোন অন্যায় করেছেন পাপ করেছেন, একবার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে বলতে চলে যান তাঁর শ্রীচরণের কাছ। আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তিনি আপনাকে সদ্‌গতি দিবেন। আমার কথাই ধরুন, আমি নন্দালয়ে সত্যিকারের মা হতে যাইনি। মা সেজে গিয়েছিলাম মাত্র। আর তাতেই আমি মাতৃগতি পেলাম। স্তন্য দিয়ে পালন করতে যাইনি। স্তন দিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। তাতেই তাঁর আমার প্রতি এত কৃপা!"

পূতনার এই কথা শুনে আমার আপনার সবার বুকে বল এল—"তা হ'লে বৃন্দাবনের এই ব্যাপার! তাঁর বাড়িতে আমার-আপনার মতো রবাহূতদেরও স্থান আছে!" তাই বলি, আগে পাপ করেছেন, তা আর না করে এবার ফেরেন তাঁর দিকে। একবার যদি নন্দনন্দনের আঙিনায় ঢুকতে পারেন, তাঁর করুণা-কটাক্ষে পড়তে পারেন, তাহলে আপনার সমস্ত পাপরাশি ছাই হয়ে ওখানেই পড়ে যাবে, আপনি মহাগতি লাভ করবেন।

তাহলে এবার বলুন এই লীলাকথা শুনে আমাদের লাভ হয়নি? জগৎজীবের লাভ হয়নি? পূতনা-মোক্ষণলীলাকথায় জগৎ-জীব একটি আশ্বাসের খবর পেল। এত বড় আশ্বাস আগে কেউ দেয়নি কখনও। সবাই বলে, "ভজন-সাধন করেন তাঁকে পাবেন", কিন্তু পূতনা শুনালেন নতুন কথা। তিনি বললেন, "কোন ভয় নেই, আমার মতো মহা পাপীকে যিনি বৈকুণ্ঠে পাঠিয়েছেন, কেবল মাত্র একটু নিকটবর্তী হওয়ার ফলেতে। আর আপনাদের কোন ভয় নেই। 'হা গোবিন্দ' বলে একবার চলুন তাঁর পদমূলে। আপনার কল্যাণ হবে।"

পূতনা যে উচ্চগতি পেল তাতে আপনি হিংসা করেন কেন? আপনি বলবেন, "পূতনার যে যোগ্যতা তার থেকে সে বেশী পেয়েছে।" হ্যাঁ বেশী পেয়েছে। কৃপাময়ের এত কৃপা যে, কৃপা করে পূতনাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেই কৃপাতে আমরাও ধন্য হয়ে গিয়েছি। শুকদেব মহারাজ ব্যাসদেব-এর কাছে যখন এই কাহিনী শুনলেন তখন তিনিও ভেসে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করলেন, "আমি তো ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এতকাল মেতে আছি। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিরুপাধি। কিন্তু তিনি যে এত কৃপাময় তা তো ভাবতে পারিনি।" ঈশ্বরের ভগবৎ-স্বরূপে যত কৃপার প্রকাশ আছে ব্রহ্ম-স্বরূপে তত কৃপার প্রকাশ নেই। পরমাত্মা রূপেও এত কৃপা করেন না। এক একটা রূপে এক একটা জিনিস্ দেন। এক রূপে আপনি যা পাবেন

অন্যরূপে তা আপনি পাবেন না। জলরূপে পিপাসা যায়, বরফরূপে পিপাসা যায় না। আপনার পিপাসা লেগেছে; আমি যদি একথালা বরফ আপনার সামনে এনে বলি "খান", আপনি খাবেন? উল্টে বলবেন, "কি মশাই? পাগল হয়েছেন নাকি? জল-টল দেন খেয়ে প্রাণ জুড়াই।" তাই সেই রকমই ভগবান্ ব্রহ্মরূপে আমার তাপ দূর করেন না। আমায় শান্তি দান করেন না। এখানে তিনি সমান "ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বভূতেষু। আর এই ব্রহ্ম যখন ভগবান্, আসেন নন্দালয়ে, তখন তিনি অশেষ করুণাময়। কৃপাশক্তি ব্রহ্মে অব্যক্ত আর ভগবৎস্বরূপে ব্যক্ত, অফুরন্ত। শুকদেব ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, এবারে কৃষ্ণজ্ঞানী হওয়ার লোভে শ্লোকেব উৎস ধরে পিতার কাছে চলে এলেন।

আসলে শ্রীমদ্ভাগবত ভরাই কৃপার কথা। আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা কৃপারই লীলা। বৃন্দাবনে ভগবান্ অশেষ করুণা করেছেন। যে-সব অসুর মেরেছেন তাদেরও করুণা করেছেন। সবাইকেই বৈকুণ্ঠে গতি দিয়েছে। এই যে কৃপার লীলা এই হ'ল শ্রীমদ্ভাগবতলীলা। এই লীলার প্রথম লীলা হ'ল পূতনামোক্ষণ। পূতনা যে সদ্গতি পেল তাতে জগৎজীব একটি আশ্বাসের বাণী পেল। আশ্বাসের বাণীটি কী আবার বলি ঃ পূতনা লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী, রুধিরাশনা হরিকে মারতে এসেছিল বৃন্দাবনে। কিন্তু "স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিম্ আপ। স্তন দান করে সদ্গতি লাভ করল। আর একটা কারণ হ'ল 'সদ্বেশাদ' মায়ের বেশ ধরে এসেছিল। সুতরাং অসীম করুণার সাগর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্লোকটি হ'ল "কং বা দয়ালু শরণং ব্রজেম্"— এমন দয়াল ঠাকুর ছাড়া আমরা আর কার চরণে শরণ নেব? কে আছে? পাপী-তাপী জীবের আশ্রয় আর কে আছে? পূতনার মত মহা পাপীয়সীকেও যিনি ধাত্রীগতি দান করলেন তাঁর মত করুণানিধান তো আর কেউ নেই। তাই পূতনার গতিদাতা নন্দনন্দন বালগোপাল-এর শ্রীচরণেই শরণগতি গ্রহণ করি।—জয় জগদ্বন্ধু। ❑

শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা

মা যশোদা বসে বসে ভাবছেন "গোপাল পাড়ায় পাড়ায় এত চুরি করে খায় কেন? দিনরাত নালিশ আসে।" কী রকমের নালিশ? তার একটু নমুনা বলি। পাড়ার কোন মেয়ে বলে "গোপাল আমার বাড়ি ক্ষীর চুরি করে খেয়েছে।" কোন মেয়ে বলে, "গোপাল আমার বাড়ি দই চুরি করে খেয়েছে।" কেউ বলে, "আমার হাড়ি থেকে মাখন চুরি করে খেয়েছে।" মা বুঝতে পারেন না, মা বলেন, "তোরা জিনিসপত্রগুলি খেতে পারে এমন জায়গায় রাখিস্ কেন, শিকায় তুলে রাখতে পারিস্ না?" তারা বলে, "শিকায় রাখলে কী হবে মা, তোমার গোপাল একটা পিড়ি পাতে, তারপর আর একটা উদুখল পাতে, তার পর উঠে। তারপরেও যদি নাগাল না পায় তাহলে নিচে এসে একটা লাঠি দিয়ে ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে হাড়ির নিচে ফুটো করে, আর হা করে খায়।" মা বলেন, "আচ্ছা তোরা একটা কাজ করিস্ না কেন? তোরা জিনিপত্রগুলি আঁধার ঘরে রাখতে পারিস্ না? তাহলে গোপাল আর দেখতে পাবে না।" এই কথা শুনে সকলে হেসে দিয়েছে। তারা বলে, "মা, অন্ধকার ঘরে রেখে কোন লাভ নেই। তোমার ছেলের গায়ে এত

জ্যোতি। 'ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপম্।' আর তুমি গোপালকে অলংকারও তো কম পরাও না। একে গোপালের অঙ্গের জ্যোতি, তারপর আবার অলংকারের ছটা। গোপাল আঁধার ঘরে ঢুকলেই আঁধার ঘর আলোকিত হয়ে যায়। এমন কোন আঁধার ঘর নেই পৃথিবীতে যেখানে তোমার ছেলে ঢুকলে আঁধার থাকে।" এবার মা বললেন, "তোরা যে এতো নালিশ করিস্ একবার তাকে ধরে আনতে পারিস্ না?" গোপীরা বলেন, "ধরে যে আনবো, ধরতে গেলেই তো পালিয়ে যায়।" উপানন্দের স্ত্রী বললেন, "আরে ধরে তো এনেছিলাম সেদিন, কী হয়েছিল মনে নেই?"

উপানন্দ নন্দ রাজার ভাই। তার ঘরে গোপাল চুরি করতে গেছে। উপানন্দের স্ত্রী ধরে ফেলেছেন। "আরে দুষ্টু, তোর হাতে মাখন, মুখে মাখন, এই অবস্থায় তোকে তোর মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাব। যখনই বলি তোর মা বিশ্বাস করে না। এইবার দেখাবো তোর ছেলে চোর কিনা।" গোপাল বলেন, "আমায় ধরে নিয়ে যেও না। আমি আর করব না, আর করব না।" উপানন্দের স্ত্রী বলেন, "আর করব না কী? ছেড়ে দিলেই আবার করবি"—এই বলে তিনি গোপালকে কোলের মধ্যে নিয়ে চললেন যশোদাকে দেখাতে। হাঁটতে হাঁটতে আসছেন এমন সময় মাঠের মধ্যে শ্রীদাম সুদাম বসুদামেরা খেলছে। উপানন্দের স্ত্রী মনে করলেন, আমি যে গোপালকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি তা তারা যদি বুঝতে পারে তাহলে তারা আমার কোল থেকে গোপালকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তিনি গোপালকে তার আঁচল দিয়ে ঢাকলেন। কোলে একটা কিছু আছে মনে হয় কিন্তু গোপাল আছে মনে হয় না। এইভাবে তো যশোদার কাছে গেলেন। যশোদাকে বললেন, "এই দ্যাখ্, তুই তো বলিস্ তোর ছেলে চোর না, আজ আমার ঘরে মাখন চুরি করছিল, ধরে আনলাম।" মা বললেন, "কখন চুরি করল?" উপানন্দের স্ত্রী বললেন, "এই তো এখনই।" মা অবাক্ হয়ে বললেন, "বলিস্ কী? গোপাল তো এতক্ষণ আমার কোলেই ছিল। এইতো ছানা মাখন খাইয়ে দিলাম পেট ভরে। তারপর এদিক পানে গেল। তোর বাড়ি ওদিকে। কত দূর তোর বাড়ি, এর মধ্যে তোর বাড়ি গেল, চুরি করল, ধরে আনলি? এত সময় তো হয়নি।" উপনন্দের স্ত্রী বললেন, "বলিস্ কী? আমি ধরে নিয়ে এনেছি এই তো আমার কোলের মধ্যে।" এর মধ্যে পাড়ার অন্য মেয়েরাও সব এসে দাঁড়িয়েছেন। যশোদা বললেন, "দেখা তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এত সব কাণ্ড এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে হ'ল?" উপানন্দের স্ত্রী তার আঁচল তো সরালেন। কিন্তু আঁচল সরিয়ে দেখা গেল যে কোলে গোপাল নয়, তার নিজের ছেলেই! এই দেখে আর সব হাসতে লাগলো। মা বলেন, "হায় ভগবান্, তুই নিজের ছেলে, আর আমার ছেলে চিনিস্ না! মাখন খেয়েছে আর অমনি রেগে গিয়েছিলি। এমনই রাগ রেগেছিস্ যে ছেলেটার মুখের দিকেও তাকাস্নি। তোর নিজের ছেলে চোর আর চিৎকার করতে করতে পাড়া মাথায় করে এসেছিস্ আমার ঘরে?" উপানন্দের স্ত্রী একেবারে লজ্জায় পড়ে গেছেন। তাই গোপালকে ধরে আনবারও উপায় নেই। কোন মায়েরা বলেন, "কোন দিন যদি ঘরে খাবার না থাকে তাহলে গোপাল রেগে যায়। বলে লক্ষ্মীছাড়া ঘর, আমার খাবার নেই। তখন এই বলে সে ঘরে জল ঢালে, ছোট বাচ্চারা যারা

ঘুমিয়ে আছে তাদের চিমটি কেটে উঠিয়ে দেয়, ঘরের ভিতর এটা ভাঙ্গে ওটা ভাঙ্গে। এইসব কথা মা প্রায় শোনেন। শুনতে শুনতে মা ভাবছেন, "গোপাল এত চুরি করে খায় কেন? আমার ঘরে তো কম জিনিস নেই। কত ছানা মাখন ভরা আমার ঘরে। এইসব কথা চিন্তা করে মার মনে হল যে—"আমার ঘরের জিনিসগুলি আমি তৈরী করি না। দাসদাসীরা করে। তারা আমাকে কোন কাজই করতে দেয় না। যা করি ওমনি তাই টেনে নিয়ে যায়। ওরা খুব ভালো তৈরী করতে পারে না বোধ হয়। স্বাদ হয় না। আর এই জন্যই গোপালের তৃপ্তি হয় না ঘরেরটা খেয়ে। আর সেই জন্যই এর বাড়ি তার বাড়ি চুরি করে খায়।" এইবার মা বুঝতে পারলেন। তাই মায়ের ইচ্ছা হ'ল "একদিন অন্তত ঘরের খাবার আমি নিজে করে দেখি গোপালের খেয়ে তৃপ্তি হয় কিনা।" কিন্তু দাসীরা এত অনুগত আর মাও এত কোমল-হৃদয়া যে মা বলতে পারেন না যে, "আজ তোরা কাজ করিস্ না, আমি করি।" কারণ, তাতে তারা খুব দুঃখ পাবে, তারা ভাববে যে, "বিনা দোষে মা আমাদের সেবায় বঞ্চিত করলেন।"

মায়ের এই ইচ্ছা যোগমায়া পূর্ণ করলেন। কী করে করলেন? গোবর্ধনে ইন্দ্রপূজা প্রত্যেক বছর হয়। সেখানে নন্দরাজা এবং আর সকল গোপসমাজ যাবেন। খুব আনন্দ হবে সেখানে। নন্দরাজ সবাইকে ডাকছেন "চল সবাই"। এই পূজা এক সময় শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার বদলে গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন করেছিলেন। যখন ইন্দ্রপূজা বন্ধ করেছিলেন তখন কৃষ্ণ বড়, সাত বছর বয়স। সবাই যাচ্ছে দেখে দাসীদেরও মনে যাওয়ার ইচ্ছা জাগল। যশোদা কাউকে কিছু বলেননি। দাসীরা বলেন "মা আমি যাই?" মা বলেন "যা।" এইভাবে প্রত্যেকে চলে যেতে লাগলো।

মা ভাবলে, "যদি এরা চলে যায়। তাহলে আমি নিজে হাতে সব কাজ করবো এবং গোপালকে খাইয়ে দেখবো পাড়ায় চুরি বন্ধ হয় কিনা।" মা চুপ করে আছেন, দেখতে দেখতে সবাই চলে গেল। একটাও দাসদাসী নেই বাড়িতে। এই রকম আগে হয়নি কখনও। সবাই মনে করছে "আমি গেলাম আরো কত আছে।" মার মনে খুব আনন্দ। দই পেতে রেখেছেন কাল সকালে মাখন তুলবেন। বাড়িতে ভালো অষ্ট পদ্মগন্ধী গাভী আছে। সেই গাভীর দুধে পদ্মের গন্ধ। এই দুধ গোপাল খুব ভালবাসে। কড়াইতে সেই দুধ দোয়ানো আছে। সেই দুধে দই, ক্ষীর, ছানা, মাখন হবে। এই সব কথা মা মনে মনে ভাবছেন। মাখন টানা সাধারণত শেষরাত্রে খুব ভালো হয়। মা সাধারণত শেষ রাত্রে খুব একটা উঠেন না। গোপাল সকালে উঠে স্তন্য পান করেন, তখন গোপালের সঙ্গে মাও উঠেন। কাজ নেই, দাসীরাই সব কাজ করেন। আজকে দাসী নেই, মা তাই শেষ রাত্রে উঠেছেন। এখন গোপাল তো মাকে জড়িয়ে আছে। যশোদা আস্তে আস্তে গোপালের হাত ছাড়াচ্ছেন। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে আসবার সময় একটা বালিশ কোলে ঠেসে দিয়েছেন। আর গোপাল সেই বালিশকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন। ঘুম ভাঙ্গে নাই। এইবার মা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে আগের দিন যে দই পেতে রেখেছিলেন সেটা বের করে ঠিক দরজার সামনা-সামনি বসেছেন। উদ্দেশ্য যে, গোপাল যদি জেগে উঠে তাহলে তাকে গিয়ে কোলে নেবেন। আর রান্নাঘরে গিয়ে, রান্নাঘরটা সোজাই,

সেখানে উনান ধরিয়ে দুধ বসিয়েছেন, পদ্মগন্ধী দুধ। মা যেখানে দই নিয়ে বসেছেন সেখান থেকে গোপালকেও দেখা যায় আবার দুধের কড়াইও দেখা যায়। তার কারণ, দুধ যদি উথলিয়ে উঠে তাহলে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে লেগে না যায়। তাহলে মা দধি মন্থনও করছেন, গোপালকেও দেখছেন, আবার দুধের কড়াই-এর দিকেও দৃষ্টি রাখছেন। শুকদেব বর্ণনা করছেন—

"একদা গৃহদাসীযু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি।।" ভাঃ ১০/৯/১

মা নিজে আজ দধি মন্থন করছেন। মায়ের অভ্যাস নেই। গোয়ালার মেয়ে জানেন, দেখেছেন। শুকদেব মায়ের চেহারা বর্ণনা করছেন—

"ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রম-ভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ,
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্মমন্থ।।" ভাঃ ১০/৯/৩

শ্লোকটি খুবই সুন্দর, সুন্দর তার ছন্দ। মা তো কোনদিন দধি মন্থন করেননি। যে কাজটি কোনদিন করিনি সেই কাজ হঠাৎ একদিন করলে মানুষ ফটো তোলে, তুলে বলে "দেখি আপনাকে কেমন লাগছে, এই কাজ তো আগে আপনাকে করতে দেখিনি।" তখন তো আর ফটোগ্রাফি ছিল না, তাই শুকদেব বর্ণনায় মায়ের ছবি তুলেছেন। মা শেষরাত্রে উঠে বাসি কাপড়টি ছেড়েছেন। ছেড়ে একটি শুদ্ধ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করেছেন। কাপড়টা ছাড়লেন এই জন্য যে দেবতার কাজ করতে হলে পবিত্র বসনে করা উচিত। মা গোপালকে কখনও দেবতা জ্ঞান করেননি। তবে ছাড়লেন কেন? ছাড়লেন এই কারণে যে, ছোটবেলা থেকেই মা শুনেছেন যে, বাসি কাপড়ে কোন রান্না বা কোন কিছু তৈরি করলে তা অশুচি হয় এবং তা খেলে অসুখ করে। তাই "গোপালের অসুখ হবে আমি বাসি কাপড়ে কাজ করলে"—এই ভেবে মা শুদ্ধ বস্ত্র পরলেন। কিন্তু মা যে কাপড় পরেছেন সেটাকে ঠিক কাপড় বলে না। ঘাঘরা বলে। গোকুলে মায়েরা ঘাঘরা পরেন এবং ওড়না গায়ে দেন। কিন্তু মা ঘাঘরা ঠিকমতন বাঁধতে পারেন না, মার কোমরে থাকে না কারণ, মা "পৃথুকটি-তটে" একটু স্থূলাঙ্গী। গোয়ালার মেয়ে ছানা মাখন খায়, স্বাস্থ্যবতী। মা যে স্থূলাঙ্গী বা কোমরে কাপড় ঠিক মতন থাকে না, খুলে খুলে যায়, তাই দধি মন্থনকালে কোমরের কাপড়টিকে দড়ি দিয়ে খুব করে বেঁধেছেন "সূত্রনদ্ধং", যাতে কাপড় খসে না যায়। এই সঙ্গে মা গান গাইছেন। তালে তালে মন্থনের রজ্জু টানছেন আর গান গাইছেন। কী গান করছেন? গোপালের গুণকীর্তন। এখন এই গুণকীর্তন-এর গান কোথায় পেলেন? তখন তো আর কৃষ্ণলীলা রচয়িতা বিদ্যাবতী বা চণ্ডীদাস জন্মাননি তাহলে গান হ'ল কী করে? মথুরামণ্ডলে ভাটকবি আছে তারা জন্মকবি। ছেলেবেলা আমরাও দেখেছি এখন আর দেখি না। তারা কোন সুন্দর জায়গায় কোন একটা সুন্দর আশ্চর্যজনক বিস্ময়কর ঘটনা দেখলে বা ঘটলে ছড়া বাঁধতো। সেটা তারা লোকের বাড়ি বাড়ি বলতো এবং পয়সা পেত। এটাই তাদের আয়ের পন্থা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের যে-কয়টা লীলা হয়েছে যেমন তাঁর চৌর্যলীলার ছড়া

বেঁধেছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে খেলছে তার ছড়া বেঁধেছে, এইরকম অনেকগুলি লীলার ছড়া বেঁধেছে। এই ভাটকবিরা যশোদার বাড়ি এসে বেশি বেশি গায়। মায়ের খুব ভালো লাগে শুনতে, "আবার এসো" বলেন। তাই পুনঃপুনঃ তাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণগাঁথা ছড়া শুনে মায়ের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে। মা যখন হাতে কোন কাজ করেন, তখন মুখে ঐ গানগুলি সুর করে করে গান।

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা গুনগুন করে গাইছেন এবং সেই সঙ্গে দধি-মন্থনের দড়িও টানছেন, এর ফলে মায়ের পরিশ্রম হচ্ছে। তাই 'রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ' কঙ্কণে ঠেকছে এবং টুংটাং শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে গানে যেন কেউ তাল দিচ্ছে। গানের সঙ্গে তো বাজনা লাগে তাই মায়ের কঙ্কণে সেই বাজনা হচ্ছে। আর মায়ের কানের যে কুণ্ডল সেটাও তালে তালে দুলছে। তাহলে কুণ্ডল দুলছে, কঙ্কণ টুংটাং শব্দ করছে, আর ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে দধি মন্থনের। মা একেবারে তন্ময় হয়ে আছেন।

"যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত।।" ভাঃ ১০/৯/২

গান যে গাইছেন যশোদা কেবল গান গাইছেন না। আমরা সবাই গান করে গেলাম, মন পড়ে রয়েছে অন্য জায়গায়। গানের মধ্যে যে পদগুলি আছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা, গুণের কথা, কাজের কথা সেগুলি মা চিন্তা করছেন। সেগুলি চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছেন। হাতে গোপালের কাজ করছেন, মুখে গোপালের নাম করছেন আর অন্তরে গোপালকে চিন্তা করছেন। মা একেবারে গোপালময় হয়ে আছে। গোপালের যে রূপের বর্ণনা আছে সেই রূপের কথা ভাবছেন। গোপালের ধ্যান হচ্ছে, সেই সঙ্গে মা একেবারে তন্ময় হয়ে দধি-মন্থন করছেন।

শুকদেব মায়ের এই রূপ এত সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন এই জন্য যে, ব্রজের ভজন রসের ভজন। সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর যে রসেরই ভজন করেন না কেন, তা আপনাকে আনুগত্যে করতে হবে। আপনি যদি গোপালকে বাৎসল্য স্নেহে ভালবাসতে চান, তাহলে একজনের আনুগত্যে ভজন করতে হবে। যশোদাই হল এই রসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনার গুরু হলেন যশোদা। যশোদা যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন তার যতটুকু অনুকরণ করতে পারেন তা করলেই আপনার বাৎসল্য-স্নেহের উদয় হবে। যার যে গুরু তাঁর তো একটা ধ্যান আছে। গুরুর রূপ কর্ম ইত্যাদি চিন্তা করতে হয়। যাঁরা বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে চান তাঁদের ধ্যানের জন্য যশোদার এই রূপখানি এত সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। তন্ময় হয়ে দধি-মন্থন করছেন।

এদিকে গোপালের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘুম ভেঙে মায়ের স্তন্য পান করবার জন্য হাত পাতছেন। মা তো নেই। কিন্তু এই রকম তো কোনদিনই হয় না। ঘুম ভাঙ্গলেই শিশুর স্তন্যপিপাসা লাগে। গোপালের খুব পিপাসা লেগেছে সেইজন্য তাঁর খুব রাগও হয়েছে। মা একটা বালিশ দিয়ে রেখে উঠে চলে গেছেন। এইরকম তো কোন দিনও হয় না। গোপাল একটু কান পেতে শুনলেন। শুনলেন কোথায় যেন ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ শুনে গোপাল

বুঝলেন যে মা দধি-মন্থন কবছেন। আজ তো কেউ বাড়ি নেই তাই মা নিজেই দধি মন্থন করছেন। আমাকে ফাঁকি দিয়ে রেখে গেছেন। দধি-মন্থনের হাড়িটি হল মায়েব খুবই প্রিয়। না হ'লে আমাকে ফেলে যাবে কেন? গোপাল বিছানায় উঠে বসেছেন মায়ের কাছে যাবেন। কিন্তু নামবেন কী ভাবে? উঁচু খাট, নামতে তো পারেন না। কখনও নিজে নামেননি। মা-ই কোলে কোলে নামান আবার কোলে কোলে উঠান। খাটে উঠবার মতন শক্তি তার হয়নি। একটি চরণ নামিয়েছেন কিন্তু মাটি পেলেন না। আর একটি চরণ নামিয়েছেন তাও মাটি পেলেন না। শুকদেব বলছেন, "ওমা! একি! গোলোক থেকে নেমে এসেছ ভূলোকে, খাট থেকে নামতে পার না—এমনই মাধুর্য তোমার!" গোপাল এবার ভাবলেন, "এইবার দুই চরণ নামিয়ে দিই, দেখি কী হয়।" এইবার চরণ নামিয়ে অনেক কষ্টে নামলেন। খাট থেকে নেমে মা যেখানে দধি-মন্থন করছেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে গোপালের পিপাসা লেগেছে, মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। কিন্তু মা দধি-মন্থন করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে তন্ময় হয়ে চোখ বুজে আছেন। সামান্য একটা আনন্দ হলেই আমাদের চোখ বুজে যায়। কিন্তু মার তো অফুরন্ত আনন্দ। মনে গোপালের ধ্যান করছেন, তালে তালে দধি মন্থন করছেন, হাতের কঙ্কণের শব্দ হচ্ছে, একটা চমৎকার ভাব। এতে একেবারে মা তন্ময় হয়ে আছেন। গোপাল যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তা তিনি দেখতে পাননি। তাই গোপল মায়ের মন আকর্ষণ করবার জন্য দধি-মন্থনের জন্য যে দণ্ড হয়— (দধি-মন্থন নিশ্চয় আপনারা দেখেছেন। একটা হাড়ির মধ্যে দণ্ড থাকে, সেটাকে দড়ি দিয়ে দুই হাতে ঘোরানো যায়।) আর দণ্ডের যে অংশ লাগানো থাকে গোপাল সেই দণ্ডটিকে দুই হাত দিয়ে ধরেছেন। যেই না ধরেছেন সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটা আটকিয়ে গিয়েছে। অনেক সময় এমনও হয় যে দড়ি টানবার সময় প্যাঁচ লেগে যায় তখন দণ্ড আটকিয়ে যায়। তখন আবার ঠিক করে নিতে হয়। দণ্ড থেমে যাওয়াতে মা মনে করলেন, কিছু একটা মনে হয় হয়েছে তাই তাল কেটে গিয়েছে। মার আবেশ ভেঙে গিয়েছে। চোখ খুলেছেন দড়িটা ঠিক করবার জন্য। কিন্তু দেখেন গোপাল দাঁড়িয়ে আছেন। কখন যে এসেছেন তাও দেখেননি। আর গোপাল যে অত্যন্ত পিপাসার্ত তা দেখেই মা বুঝতে পেরেছেন। গোপালের সকালে উঠেই দুধ পিপাসা লাগে। এখন দুধ মা খাওয়াবেন তাই তাড়াতাড়ি দধি মন্থন সমাপ্ত করলেন। যদিও সমাপ্ত এখনো হয়নি। মাখনটা কেবল ভাসছে, আর একটু উঠবে তারপর আস্তে আস্তে নামাবেন। তাই কাজটা এখনো অসমাপ্ত। কিন্তু আর তো দধিমন্থন করা যায় না গোপালকে স্তন্য না দিয়ে। তাই মা দধিমন্থন ছেড়ে বসলেন। গোপালকে কোলে নিয়ে।

"তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নতীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্।।" ভাঃ ১০। ৯। ৪

মা গোপালকে কোলে নিয়ে একটু হাসলেন। হাসলেন কেন? মা মনে করলেন, "আমার ছেলে দুর্দান্ত হয়েছে। পাড়ার সবাই নালিশ করে। কিন্তু বোকা হয়নি, বুদ্ধি আছে। এই দণ্ডটা চেপে ধরলে যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে, সেটা বুঝতে যতখানি বুদ্ধি লাগে, ততখানি বয়স গোপালের এখনি হয়নি। সুতরাং গোপাল বড় হয়ে বুদ্ধিমান্ হবে। বুদ্ধি হলেই দুষ্টামি

কেটে যাবে। আর দুষ্টামি কেটে গেলেই গোপাল ভালো ছেলে হবে।" অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু যিনি তিনি যে বড় হয়ে ভালো ছেলে হবেন এটা ভাবতেই মায়ের মনে বড আনন্দ হ'ল। সেই জন্য মা হাসলেন, মুচকি মুচকি হাসলেন। হেসে গোপালকে কোলে নিয়ে গোপালের মুখে স্তন দিলেন। গোপাল একটা স্তন ধরে পান করছেন অপর আর একটা ধরে আছেন। যেন দুটোই তার। আর যেন কেউ না খায় এই রকম দাবিদার ভাব। মার এত দুগ্ধ ক্ষরণ হচ্ছে, মা চেপে রাখতে পারছেন না। দুগ্ধ গোপালের গাল বেয়ে গাড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আর মা তাঁর বসন দিয়ে ছেলের শ্রীবদন মোছাচ্ছেন। একবার শ্রীবদন মোছাচ্ছেন আর গোপালেব মুখেব দিকে তাকাচ্ছেন, সেই সঙ্গে আবার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। মায়ের বুকের সঙ্গে গোপাল যেন লেগে আছেন। মায়ের এত আনন্দ, মা যেন ভেসে যাচ্ছেন। মা রোজ সকালে উঠে বিছানায় যে গোপালকে দুধ খাওয়ান তখন তো এত আনন্দ হয় না! মা গোপালের চাঁদ বদনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন তন্ময় হয়ে আছেন। গোপাল স্তন্য পান করছেন, মা স্তন্য পান কবাচ্ছেন, মুখ মোছাচ্ছেন শ্রীঅঙ্গে হাত বুলাচ্ছেন, তাকাচ্ছেন, একেবারে আবিষ্ট হয়ে আছেন।

কিন্তু হঠাৎ মায়ের আবেশ কেটে গেল। তখনও গোপালের স্তন্যপান হয়নি। মায়েরা বুঝতে পারেন শিশুর স্তন্য পান পুরো হলে সে স্তন্যপান ছেড়ে দেয। গোপাল মায়ের স্তন এখনও ছাড়েননি, খুব পান করছেন। এমন সময় মায়ের গোপালকে কোল থেকে মাটিতে ফেলে রেখে তো চলে যাওয়া ঠিক নয়। সাধারণ মা-ই ফেলে যান না কিন্তু এখানে তিনি যশোদা স্বয়ং। আর মার তো তখন কোন কাজ নেই। আর অন্য কাজ থাকলেও গোপালকে ছেড়ে যাওয়া তো ঠিক নয়। ব্যাপার কী? একটু বুঝতে লাগবে।

ব্যাপারটা হল এই যে, মা যেখানে দধিমন্থন করছিলেন তার সোজাসুজি রান্নাঘর, সেখানে উনানে দুধ বসানো রয়েছে। এখন দধিমন্থন করবার সময় মা চোখ বুজেছিলেন, গোপালকে দেখেন নি। আবার গোপালকে স্তন্য পান করবার সময় মা আর কোন দিকে ধ্যান দেন নি। মা যে উনানে দুধ বসিয়েছিলেন তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। হঠাৎ চোখ খুলে ঐদিকে নজর গিয়েছে। মা দেখেন কি যে, কড়ায়ের দুধ উথলিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সর্বনাশ! এখন তো কড়ায়ের দুধ রক্ষা করতে হবে। এখন, দুধ তো আছে অনেক। কিন্তু পদ্মগন্ধী গাভীর দুধটা যদি পড়ে যায় তাহলে গোপালের সেইরকম দুধ আর হবে না অন্য দুধ দিয়ে। তাই ঐ দুধটা রক্ষার জন্য মা আকুল হয়ে গিয়েছেন, তাই চলে গেলেন। "গোপালের সেবার দ্রব্য রক্ষার তরে" এটা চলে। ভগবানের সেবার জন্য ভগবৎ-লঙ্ঘন করা চলে, কারণ, ভগবানের চেয়ে ভগবানের সেবাটা বড়। ফেলে যাওয়া তো লঙ্ঘন করাই হ'ল। চৈতন্যলীলায় মহাপ্রভুর এই রকম একটা কাহিনী আছে।

মহাপ্রভু নীলাচল ধামে নিজ গম্ভীরায় প্রসাদ গ্রহণ করে শুয়ে আছেন একেবারে দরজা জুড়ে। সেবক গোবিন্দ শ্রীচরণসেবা করছেন। এখন সেদিন মহাপ্রভু এত কীর্তন-নৃত্যাদি করেছেন যে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। গোবিন্দ প্রভুর এক চরণ সেবা করেছেন। এখন অপর আর এক দিক করবেন। দুই চরণ সমান ভাবে সেবা হলেই তো প্রভু আরাম করে ঘুমাবেন। কিন্তু অপর চরণ সেবা করতে তো ঐদিকে যেতে হবে, তা তিনি যাবেন কী করে? তাই চিন্তা

করছেন। কিছুক্ষণ ভাববার পর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে একটি কাপড় বিছিয়ে তার উপর দিয়ে পার হলেন। তারপর ঐদিকে বসে ঐদিকের শ্রীচরণ সেবা করলেন। এইবার প্রভুর ঘুম গাঢ় হ'ল। সেবা করে গোবিন্দ তো সেখানে বসেই আছেন। অনেকক্ষণ পর মহাপ্রভুর ঘুম ভেঙ্গেছে। উঠে দেখেন গোবিন্দ বসে আছে। মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, "গোবিন্দ! তুমি খেতে যাওনি?" মহাপ্রভু প্রসাদ পাওয়ার পর প্রভুর অবশেষ নিয়ে গোবিন্দ আহারে বসেন।

"তুমি তো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছ" প্রভু বললেন। "আমি তো অনেক্ষণ ঘুমিয়েছি। এতক্ষণ বসে আছ কিসের জন্য?" গোবিন্দ বললেন, "প্রভু! আপনি এমন ভাবে শুয়েছেন যে আমাকে খেতে যেতে হলে আপনাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। তাই যাইনি।" প্রভু চিন্তা করে বললেন, "গোবিন্দ, তুমি তো এই দিকে ছিলে আমি যখন শুলাম, ঐ দিকে গেলে কী করে?" গোবিন্দ হেসে বললেন, "প্রভু আপনাকে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছি। আপনার উপর একটি কাপড় বিছিয়ে তার উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছি।" প্রভু হেসে বললেন, "একবার ডিঙালে তো আর একবার ডিঙালে না কেন?" গোবিন্দ উত্তর দিলেন, "প্রভু, একবার যে ডিঙিয়েছি তা আপনার সেবার জন্য। আপনার এক দিক্ সেবা করেছি। অপর আর এক দিক্ সেবা করব তার জন্য। এখন তো আমি খেতে যাব; আপনাকে ডিঙিয়ে তা কী করে হয়? সেটা আমার মন চাইল না। তাই বসে আছি।" এই দৃষ্টান্তে বোঝা গেল, প্রভুকে ডিঙানো যায় প্রভুর সেবার জন্য। আমার বা নিজের সেবার জন্য নয়।

তাই ঘরে এত দুধ থাকতেও মা যে দুধ দেখতে গেলেন কারণ, ঐ দুধটা বিশেষ দুধ এবং ওটা গোপালের প্রিয় দুধ। তাই গোপালের প্রিয় দুধ রক্ষা করবার জন্য গোপালকে উপেক্ষা করে গেলেন। এমন কি "অতৃপ্তমুৎসৃজ্য", তৃপ্ত হননি এখনও গোপাল, এটা বুঝেও মাটিতে ফেলে গেলেন। ঘরে গিয়ে যে পালঙ্কে রাখবেন তার সময়ও মা পাননি। কারণ ঘটনাটি একেবারে অকস্মাৎই ঘটে গেছে।

এখন মা তো দুধ দেখতে গেলেন গোপালকে মাটিতে ফেলে রেখে। এর ফলে গোপালের রাগ হল "সঞ্জাতকোপঃ"। রেগে গেছেন। আসলে সকাল থেকেই রাগ হয়েছে।প্রথমত সকালে মা স্তন্য পান না করিয়ে একটা বালিশ রেখে উঠে চলে গেছেন; দ্বিতীয়ত গোপাল ঘুম ভেঙ্গে বিছানা থেকে নেমে মায়ের সামনে এসে কেঁদেছেন, মা চোখ খুলেননি; শেষে দধি-মন্থনের দণ্ড চেপে ধরাতে বুঝতে পেরেছেন এবং স্তন্য পান করিয়েছেন। এখন আবার গোপালের পিপাসা মিটতে না মিটতে হঠাৎ উঠে চলে গেছেন। কেন গেলেন? কিসের জন্য গেলেন? কী দরকার ছিল যাওয়ার? এই সব গোপাল ভাবছেন। এখন সাধারণ মানুষ কী করে? যার উপর রাগ হয় তার ক্ষতি করে। গোপালের মায়ের উপর রাগ হয়েছে তাই গোপাল ভাবছেন "মায়ের ক্ষতি করব"। কী করলে মায়ের ক্ষতি হবে? সাধারণত একজনের খুব প্রিয় বস্তু থেকে যদি তাকে বঞ্চিত করলে তার ক্ষতি হয়। এখন মার প্রিয় জিনিষ কী? এতদিন মনে করতাম আমিই বুঝি মার প্রিয় জিনিষ। কিন্তু এখন দেখছি তো তা নয়। আমার থেকে মার প্রিয় হল মার দধির হাড়ি। আর সেই জন্যই মা সকালে উঠে আমাকে বিছানায় রেখে দধির হাড়ি নিয়ে ঘটঘট

করছে। এই দধির হাড়িকেই আমি দূর করে দিব। এই বলে দধির হাড়ি ধরে টানছেন। কিন্তু দধির হাড়ি তো ভারী, অনেক দধি আছে, টেনে আর নামাতে পারছেন না। তখন একটা পাথরের খণ্ড নিয়ে এসে হাড়ির কান্দায় মারছেন। এর ফলে ঠং ঠং করে শব্দ হচ্ছে, শব্দ শুনে গোপাল নিজেই চমকিয়ে গিয়েছেন। তারপর ফিরে তাকাচ্ছেন, শব্দ শুনে মা আসেন কিনা তাই দেখছেন। এরপর তিনি হাড়িকে বলছেন, "হাড়ি, তুই মাকে ডাকছিস্! দাঁড়া, তোর মুখে মেরেছি কিনা তাই ডাকছিস্, এবার তোর তলায় মারব, দেখি কেমন করে ডাকিস্ দেখি?" এই বলে হাড়ির তলায় ঠক্ ঠক্ পাথর দিয়ে ঠোকা মেরেছেন। আর যেই দিয়েছেন, মাটির হাড়ি তলাটা পাতলা থাকে, আবার রাত ভর দই ছিল। তাই ভিজে থাকলে আরো পাতলা থাকে। যেই না ঠোকা দিয়েছেন হাড়ি তো একদম দুই ভাগ হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং সমস্ত দধি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেছে। দধি এমন ভাবে গড়াচ্ছে যেন মনে হচ্ছে দধি কাঁদতে কাঁদতে গড়াচ্ছে। কারণ দধির দুঃখ যে, সে আর একটু পরেই সেবায় লাগতো। কিন্তু এখন এই ঘোলও লাগবে না, মাখনও লাগবে না। কারণ মাটি থেকে উঠিয়ে মা সেবায় দিবে না। তাই সে যেন কাঁদতে কাঁদতে গড়িয়ে যাচ্ছে।

এখন গোপালের কাজ তো শেষ। তিনি ভাবছেন এখন পালাই। কিন্তু পালিয়ে কোন্ ঘরে যাব? বড় ঘরে গেলে তো মা গিয়ে ধরে ফেলবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলবে না। এদিকে চারিদিক্ অন্ধকার। কোথায় যাব ভাবছেন। সামনে আর একটা ঘর আছে, ভাণ্ডার ঘর। সমস্ত দই ছানা মাখন থাকে। সেই ঘরটাই খোলা আছে। কারণ ঐ ঘরটার মধ্যেই দুধের কড়াইটা ছিল দধির হাড়িটাও ছিল। ঐ ঘরটার মধ্যে মার দরকার ছিল বলে মা ঐ ঘরটা আটকাননি। তাই ঘরটা খোলা দেখে গোপাল ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ঢুকে ভাবলেন "মা তো এখানেও আসবে। তখন যাব কী দিয়ে? মা এলে পালাব কোন দিক্ দিয়ে?" দেখলেন যে পিছনে একটা জানলা আছে দরজাও একটা আছে। পিছনের দরজা ও জানলা খুলে দিলেন। মা যেই ঢুকবে এই দিক্ দিয়ে পালাব। একেবারে পাকা চোর!

যে পাকা চোর সে গৃহস্থের বাড়ি ঢুকে চুরি করবার আগে চিন্তা করে "গৃহস্থ জাগলে কোন পথে পালাব।" গোপাল যেই না জানলা খুলে দিয়েছেন পিছনে ছিল বাগান। বাগানের গাছে বাঁদররা ঘুমাচ্ছিল। যেই জানলা খুলে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। এ অপূর্ব গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে। এখন কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ ব্রজবাসী সকলেই চেনে, বাদরেরাও চেনে, গাভীরাও চেনে, গন্ধ পেয়ে তারা ধপধপ করে গাছ থেকে নেমে এসেছে। নেমে জানলার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ গ্রহণ করছে। গোপাল তাদের দেখে বলছেন, "তোরা এতো সকালে এখানে এসেছিস্ কেন? খাবি? খিদে পেয়েছে? আচ্ছা দাঁড়া খেতে দিচ্ছি। তোরা আমার অনেক উপকার করেছিস্ সাগরবন্ধনে রাবণ-বধে। তোরা আমার অনেক কাজ করেছিস্। আমি তোদের কোন উপকার করিনি। দাঁড়া খাওয়াব।" এই বলে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। দেখলেন যে হাড়িতে ছানা-মাখন আছে।

গোপাল একটা উদূখল টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে মাখন-ছানার হাড়িগুলি নামিয়েছেন

এবং সেগুলি হাতে নিয়ে জানলার দিকে ছুড়ে মারছেন। আর যেই না ছুড়েছেন, বাঁদরগুলির কি ফূর্তি! টাটকা টাটকা সুন্দর সুন্দর ছানা মাখনগুলি বাঁদরগুলি লুটেপুটে খাচ্ছে। গোপাল এদিকে ছড়াচ্ছেন সেদিকে ছড়াচ্ছেন। একটার পর একটা হাড়ি শেষ করছেন। খুব আনন্দ করে বাঁদর খাওয়াচ্ছেন। বলছেন, খা খা—আরো খা। এই ভাবে আছেন কৃষ্ণ।

আর যশোদা কী করছেন? মা রান্নাঘরে গিয়ে হাতা দিয়ে নেড়ে দেখলেন দুধটা লেগে গিয়েছে নাকি। কড়াই-এ যদি দুধ লাগে তবে একটা পোড়া পোড়া দুর্গন্ধ হয়। সেই দুধ দিয়ে যা বানাবেন তাই গন্ধ হবে। দুধে পোড়া গন্ধ লাগলে সেই গন্ধ ঢাকা যায় না। তাই মা তাড়াতাড়ি এসে দেখলেন কড়াই-এ দুধ লাগেনি। মা ভাবলেন "ভাগ্যিস্ লাগেনি। আমি আর একটু পরে এলেই দুধ লেগে যেত। ঠিক সময়েই আমি এসেছি।" মা দুধটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে উনানের আঁচটাও ঠিক মত করলেন যাতে দুধ উথলিয়েও না যায়, আবার আগুনটা নিভেও না যায়। এই ভাবে বুদ্ধিপূর্বক আঁচ রেখে, আবার দুই-একবার হাতা নাড়া দিয়ে মা দধিমন্থনের জায়গায় আসলেন। ও মা! এসে কী দেখেন? দেখেন যে সারা ঘরে দই পড়ে আছে। হাঁড়ি ভাঙ্গা। কে করল? কে আবার করবে—সমস্ত কর্মের কর্তা যিনি তিনিই করেছেন। মা বুঝলেন "দুষ্ট ছেলেই আমার হাঁড়ি ভেঙ্গেছে। পাড়ায় পাড়ায় অত্যাচার করে শুনে বিশ্বাস করি না। আজ আমার হাড়ি ভেঙ্গেছে! তাই আজ আমি যদি এই বয়সে আমার ছেলের শাসন না করি, মা হয়ে, তাহলে বড় হলে গোপাল দুর্দান্ত হবে।" তাই মনে করলেন "আজ আমি গোপালকে শাসন করব।" কিন্তু কী দিয়ে শাসন করবেন? এদিক্-ওদিক্ তাকালেন, দেখলেন ছোট একটা লাঠি, গোপালের খেলার লাঠি পড়ে আছে, এটা দিয়ে মারবেন। কিন্তু গোপাল কই? চারিদিক্ তাকিয়েও বুঝে উঠতে পারছেন না। "পালিয়েছে ঠিকই দুষ্টু ছেলে। এই হাঁড়ি ভাঙা যে অন্যায় তার জ্ঞান আছে। না হলে হাঁড়ি ভেঙ্গে বসেই থাকতো। বুদ্ধি আছে। বড় হলে বুদ্ধিমান্ হবে।" মা হাসছেন আর খুঁজছেন "কোথায় পালালো"। ঠিক এই সময় ঐ ভাণ্ডার ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়েছে। মা তাকিয়ে দেখলেন যে "ঠিকই তো, ঐ তো দেখা যায়, উদুখলের উপর দাঁড়িয়ে আছে, মাখন খাচ্ছে।" মা ধাওয়া করেছেন আর যেই না মা ঢুকেছেন ঘরে, ঠিক তখনই গোপাল মাকে দেখে নিয়েছেন। মাঝে মাঝেই গোপাল তাকাচ্ছিলেন "মা আসে নাকি, মা আসে নাকি।" এবারে একেবারে গোপালের দুই চক্ষু মায়ের দুই চক্ষু দেখা-দেখি হয়ে গেল। মায়ের দুই চক্ষু ক্রোধ ভরা, আর গোপালের চক্ষু দুইটা "ভীতিবিহ্বলেক্ষণম্" ভয় ভরা। তিনি মায়ের ভয়ে ভীত হয়েছেন। তাহলে দু'টি ভীতি ভরা চক্ষুর দু'টি ক্রোধ ভরা চক্ষুর দেখা হয়ে গেল। আর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপাল যে উদুখলের উপর দাঁড়িয়ে বানরদের মাখন দিচ্ছিলেন সেইখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলেন এবং পালাবার জন্য যে দরজাটা আগেই খুলে রেখেছিলেন সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে দে দৌড়।

এখন মাও গোপালের পিছনে দৌড়ালেন। আগে আগে গোপাল দৌড়াচ্ছেন, পিছনে পিছনে মা দৌড়ালেন।

"তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ।।" ভাঃ ১০/৯/৯

শুকদেব এই লীলা দর্শন করে মনের আনন্দে বলছেন "দেখ, যাঁকে ধরবার জন্য যোগী মুনি ঋষিরা ইচ্ছা করে, কিন্তু করে পায় না। তাহলে কী করে। তাঁরা দ্বাদশ বছর তপস্যা করে। ব্রহ্মচর্য পালন করে, কঠোর আহার বিহার সংযম করে তপস্যা করে। করে যখন মন স্থির হয় তখন ঈশ্বরের ধ্যান করে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করে। যাঁকে হাতে ধরা তো দূরের কথা, মনেও ধরতে পারেন না মুনি-ঋষিরা তাঁদের দ্বাদশ বছরের তৈরী করা মন দিয়েও, আজ তাঁকে হাতে ধরবার জন্য যশোদা ছুটছেন! এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! গোপালের পিছনে মা দৌড়াচ্ছেন। গোপাল দৌড়াচ্ছেন অনেক কায়দা করে, একবার এদিক্ আর একবার ওদিক্। গোপাল যখন এদিক থেকে ওদিকে যান তখন মা উলটিয়ে পড়ে যান। এইভাবে দৌড়াতে গিয়ে মা একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আগেই বলেছি মা একটু মোটা তারপর দধিমন্থন করেছেন। মা একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন। মা ভাবছেন। "গোপালকে ধরতেই হবে। আমি যদি না ধরি তাহলে দুষ্টু ছেলে যে কতদূর দৌড়াবে। এদিকে বাড়িতে লোক নেই, ওর বাবা বাড়িতে নেই ওর সখারাও নেই। দাসদাসীও নেই, সবাই গেছে গোবর্ধনে। গোপালকে খুঁজে আনবে কে? তাই যতদূরেই পালাক আমাকে পিছনে ছুটতেই হবে।" মা হয়রান হয়ে গেছেন। এইভাবে ছুটতে ছুটতে এক সময় গোপাল মায়ের হাতে এসে পড়েছেন আর মাও গোপালকে ধরে ফেলে' শুকদেব বলছেন, গোপাল মায়ের ক্লান্তি দেখে ধরা দিলেন। যদি গোপাল দৌড়ে প্রায় বাহির বাড়িতে চলে যেত তবে কি লজ্জাই না হ'ত। পাড়ার লোকে বলতই বা কি! "সকাল বেলা উঠে মা ছেলের পিছনে দৌড়াচ্ছে।" "কোনদিন বাইরে যাইনি। তাই বাইরেও যেতে পারতাম না, আবার গোপাল কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে যায়, গোপালের কষ্ট হবে।" এই সব কথা ভাবছেন আর গোপালের কষ্টের কথা চিন্তা করছেন, এই সময় ঠিক তখনই মা গোপালকে ধরে ফেলেন। গোপালকে ধরে মা একেবারে ভিতর বাড়িতে নিয়ে আসলেন। ঘরের দাওয়ায় বসে মা গোপালকে লাঠি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, "দুষ্টু ছেলে! আজ তোমাকে উচিৎ শিক্ষা দিব। তুমি আমার হাঁড়ি ভেঙ্গেছ! আমার মাখন চুরি করেছ!" মায়ের হাতে লাঠি দেখে গোপাল ভয়ে কাঁপছেন। মা গোপালকে এই ভাবে কাঁপতে দেখেননি কখনো। দেখে ভাবছেন, "এই লাঠি দেখে যে কাঁপছে, কাঁপলে তো অসুখ করবে, কাঁপাটা ভালো না।"

"ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।" ভাঃ ১০/৯/১২/১

মা হাতের থেকে লাঠিটা ফেলে দিলেন। "লাঠি কখনো দেখাই নি, তাই গোপাল কাঁপছে" তাই লাঠি ফেলে দিলেন। এখন লাঠি মা যেই না ফেলে দিলেন গোপালের মনে হল মায়ের রাগ বুঝি একটু কমছে। মা গোপালকে বকছেন, "কাঁপছিস্ কেন, দুষ্টু ছেলে? তুই আমার মাখন চুরি করে বানরদের খাওয়াচ্ছিলিস্ কেন?" গোপাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন এমন ভাব দেখিয়ে মাকে বললেন, "আমি তো তোমার মাখন চুরি করে খাওয়াই নি।" মা বলেন, "মাখন চুরি করিস্ নি তো ওখানে কি করছিলিস্?" গোপাল উত্তর দিলেন, "ও মা! ঐ জানলা দিয়ে বানরগুলি ঢুকছিল যে, তাই ওদের তাড়াচ্ছিলাম?" "আমি নিজের চোখে দেখেছি তুই হাতে করে মাখন তুলে নিয়ে বাইরে ছড়াচ্ছিলিস্। তুই একটা বানর হচ্ছিস।" আর যায় কোথায়, যেই না মা বলেছেন, "তুই একটা বানর হয়েছিস্।"—গোপাল যেন কথাটা লুফে নিয়ে বললেন,

"মা তুমি ঠিক বলেছ, আমি বানর। তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বনে যাই। সেখানে আমি বানরদের সঙ্গে থাকবো, গাছের পাতা খাব। তোমার ছানা-মাখন খাব না, পাড়ায় পাড়ায় অত্যাচার করবো না। আমায় তুমি ছেড়েই দাও। আমি যখন বানর তখন বানরদের সঙ্গেই যাই, তোমার ঘরেও থাকবো না, তোমার কোলেও উঠবো না।" মা তো অবাক্, ভাবছেন, "হায় হায়! এ কী কথা বললাম, এ ছেলে তো নিজেকে বানর ধরে বসেছে।" এদিকে মা তো কাথাটা ফিরাতেও পারছেন না। যশোদা গোপালকে নিয়ে চিন্তাতেও পড়লেন। "ছেড়ে যদি দিই, তাহলে শাসন হবে না। দোষী যখন তখন শাস্তি দিতেই হবে, লাঠি তো ফেলে দিয়েছি। আর প্রহারও কখনো করিনি।" গোপালকে নিয়ে মা সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেলেন। একে তো ছেলের ভবিষ্যৎ, শাসন না করলে হবেও না। কারণ চোখের সামনে অন্যায় করা দেখে যদি শাসন না করি তাহলে মায়ের কর্তব্যের অবহেলা করা হবে। এ ছেলে বড় হয়ে দুর্দান্ত হয়ে যাবে।" তাই গোপালকে কোলে নিয়ে ভাবছেন, "কীভাবে গোপালকে শাস্তি দিই।" হঠাৎ মায়ের একটা কথা মনে হয়েছে। "দাঁড়াও, আমি তোমাকে বেঁধে রাখবো। আমি তোমাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে পারি। কিন্তু ওদিকে দুধ দেখতে হবে। তাছাড়া ঘরে কত কাজ। দধি ভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছিস্, সেগুলি পরিষ্কার করতে হবে। দাসীরাও কেউ নেই। ঘরের এত কাজ করবে কে? তোকে আমি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।" উদূখল দেখেছেন নিশ্চয়। কাঠের লম্বাকৃতি খণ্ড, মাঝখানটা সরু। উল্টা খাড়া করে দাঁড় করালে তার উপরে উঠা যায়। জিনিস্‌টা খুব ভারী হয়। ওর মধ্যে শস্য অবঘাত করা হয়, জাঁতায় যেমন শস্য ভাঙ্গা হয়। মারোয়াড়ীদের বাড়িতে এখনও দেখা যায়। "গোপালকে যদি উদূখলের সরু অংশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে গিট দিয়ে রাখি তাহলে সে ভারী উদূখল টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি রান্না ঘরে যাব, সব কাজ করবো আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো। শাস্তিও হবে, আবার আমার কাজেরও কোন ক্ষতিও হবে না।" মা ভেবে দেখলেন এটাই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি।

মা এবার গোপালকে বাঁধবার ইচ্ছা করলেন। শুকদেব মহারাজ বর্ণনা করছেন—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।।
তং মত্বাত্মজমব্যক্তমর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।।" ভাঃ ১০/৯/১৩-১৪

পরীক্ষিৎ মহারাজ একেবারে আকুল হয়ে শুনতে চাইছেন। শুকদেব বলছেন, "শুনুন মহারাজ! যাঁহার আদি নেই, যাঁহার অন্ত নেই, যাঁহার মধ্য নেই, অসীম যিনি, ভূমা যিনি, যিনি বিশ্বব্যাপী বিরাট্, যাঁহার সীমা নেই, যাঁকে বন্ধন করা যায় না, তাঁকে বন্ধন করবেন দড়ি দিয়ে, এইটি ইচ্ছা করছেন মা যশোদা। পরীক্ষিতের আকুল জিজ্ঞাসা, "তাহলে কী হ'ল প্রভু, ভগবান্ কি বাঁধা পড়বেন?" শুকদেব উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় বাঁধা পড়বেন। আস্তে আস্তে বলি শোন।"

এখন মা ভাবছেন, "গোপালকে তো বাঁধব কিন্তু দড়ি পাব কোথায়? মা যে এতক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করলেন তাতে মায়ের চুলের দড়ি গেছে খুলে। চুলের মধ্যে মালতী ফুল গোঁজা

ছিল। মা যখন দধিমন্থন করছিলেন তখন ফুলগুলি একটি দু'টি ঝড়ে ঝড়ে পায়ের কাছে পড়েছিল। এরপর যখন গোপালের পিছনে দৌড়িয়েছেন তখন ফুলগুলি পড়তে পড়তে গিয়েছে। সে রাস্তাটা দাগ কাটা আছে ফুলে ফুলে। তাই মায়ের মাথায় আর ফুল নেই, চুলও আলুলায়িত। চুলের মধ্যে চুল বাঁধবার দড়ি আছে। মা সেই একগাছা দড়ি চুলের থেকে টেনে বের করলেন। "এই দড়ি দিয়েই তোর কোমর বেঁধে রাখব।" এই কথা চিন্তা করে মা দড়ি দিয়ে গোপালের কটি বেষ্টন করলেন। কটি বেষ্টন করা খুবই কঠিন কাজ। ছেলে ছটফট করছে। শান্ত হয়ে দাঁড়ালে তো! " মা আমায় বেঁধো না, আমি আর করব না, আর তোমার ঘরে থাকব না, আমি বানরদের সঙ্গে থাকব, আমায় তুমি ছেড়ে দাও।" তাই ছটফট করছে যে ছেলে তার কোমরে একগাছা দড়ি ঘুরিয়ে এনে গিঁঠ দিয়ে আবার উদূখলের সঙ্গে গিঁঠ দেওয়া তো খুব ধীরে ধীরে করবার কাজ। তাই গোপালের এই নড়া-চড়ার জন্য মা তা কিছুতেই পারছেন না।

এর মধ্যে সকালও হয়ে গেছে। পাড়ার আর সব মায়েরাও এসেছেন। প্রত্যেক দিনই তাঁরা আসেন। এসে গোপালের চাঁদবদন দেখেন। একটু আদর করেন তারপর যে-যার বাড়ি চলে যান। আজকেও তাঁরা এসেছেন। ও মা! আজকে এ কী দেখলেন? অন্যদিনে দেখেন গোপাল খেলছে, কিংবা মায়ের কোলে স্তন্য পান করছেন, এই সব নানান দৃশ্য। আজ এসে দেখলেন যা কোন দিন দেখেননি! কী দেখলেন? দেখলেন, মা যশোদা গোপালকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করছেন আর গোপাল ছটপট করছেন আর বলছেন, "মা আমায় বেঁধো না, আমি বানরের সঙ্গে যাব, আমায় ছেড়ে দাও"—এই দৃশ্য মায়েরা কোনদিন দেখেন নি। যাঁরা এসেছেন তাঁরা একেবারে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন আর দেখছেন। যশোদা বললেন, "তোরা দাঁড়িয়ে কী দেখছিস্? মজা দেখছিস্? তোদের বাড়িতে চুরি করে বলে নালিশ করে গেলি। এখন আমি যদি শাসন না করি তাহলে তোদের হাড়ি ভাঙ্গবে, তোদের সর্বস্য চুরি করবে এক সময় বড় হলে। এখন তোরা আমায় বাঁধতে সাহায্য কর। তোরা গোপালের দুইটা হাত ধর, আমি বাঁধি।" কেউ এগিয়ে এসে গোপালের হাত দুটো ধরল না। মায়েরা বললেন, "দেখ মা, তোমার গোপালকে বাঁধতে সাহায্য যদি আমরা করি, তাহলে গোপাল আমাদের ঘরে গিয়ে আমাদের পিছনে লাগবে, আমাদের হাঁড়ি ভাঙবে আর বলবে, "আমাকে বাঁধবার সাহায্য করেছিলে, দাঁড়াও এবার তোমাদের হাড়ি ভেঙে ছানা-মাখন খাব।" এমন সময় মায়ের একটা বুদ্ধি এল। গোপালকে ধরে তাঁর মাথা মা নিজের কোলে চেপে ধরলেন। এতে তার একটা হাত মুক্ত হ'ল। এইবার দড়িটা গোপালের কোমর ঘুরিয়ে আনলেন। এইবার গিঁঠ দেবেন। কিন্তু গিঁঠ দিতে পারলেন না, কেন? দড়িটা কম পড়ল। "দ্ব্যঙ্গুলোণমভূত্তেন" (ভাঃ ১০/৯/১৫)। মুখে মুখে লাগলেও তো গিঁঠ দেওয়া যায় না। দড়িটা একটু বড় না হলে তা গিঁঠ দিয়ে আবার বাকি দড়িটা উদূখলের সঙ্গে বাঁধবেন কী করে? তাই বড় তো হ'লই না বরঞ্চ ছোট হল।' কতখানি ছোট হল? দুই আঙুল ছোট হল। মা ভাবলেন, দূর ছাই। এত কষ্ট করে জড়ালাম, দড়িটা খাঁটো হল! গোপালের কোমর থেকে দড়িটা খুললেন। খুলে আবার চুল হাতড়াচ্ছেন। চুলে আর এক গাছা দড়ি ছিল। এখন দড়ি দড়ি গিঁঠ দিতে হবে। এখন দুই হাত দিয়ে যদি দড়ি গিঁঠ দেন তাহলে এই অবসরে

তো গোপাল পালাবে। এক হাত দিয়ে তো গোপালকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছেন। তাই বহু কষ্টে এক হাত ও পায়ের সাহায্যে দড়ি দু'টো গিঁঠ দিলেন এবং দড়িটা বড় করলেন। মা ভাবলেন, "এইবার তোমায় বাঁধব।" এদিকে মায়েরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছেন, কেউ আর সাহায্য করেন না। বলেন, আমরা কেউ সাহায্য করবো না, তুমি বাঁধো মা। তাই বহু কষ্ট করে সময় নিয়ে দড়িটা গিঁঠ দিলেন এবং দড়ি গোপালের কোমরে ঘুরিয়ে আনলেন। এবার আবার গিঁঠ দিতে যাবেন। কিন্তু 'তদপি দ্ব্যঙ্গুলম্'(১০/৯/১৬)। কী যে হল! মা মনে করলেন, "আর একটা দড়ি হলে হ'ত। কিন্তু চুলে তো আর দড়ি নেই। এখন ঘরে যদি দড়ি আনতে যাই, তাহলে গোপাল এই ফাঁকে তো পালাবে। এখন কী করবো?" এই ভেবে মা! যে-সব মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের বললেন, "তোরা আমায় দড়ি এনে দে ঘর থেকে। অমুক অমুক জায়গায় দড়ি আছে। সেখান থেকে দড়ি এনে দে। আমি বেঁধে রাখি।" মায়েরা বলেন, "মা তুমি ঠিক বুঝবে না। তোমাকে তো বললাম, গোপালের বাঁধবার সাহায্য যদি আমরা করি তোমাকে দড়ি এনে দিয়ে, তাহলে আমাদের নিস্তার নেই। আমাদের বাড়ি গিয়ে ছেলেপিলেদের গায়ে জল ঢালবে, ঘুমন্ত ছেলেকে চিমটি কেটে জাগিয়ে দেবে, এখানে নোংরা করবে ওখানে নোংরা করবে, বলবে, 'তোমরা আমার বাঁধবার সাহায্য করলে কেন?' আমরা সাহায্য করব না। তুমি বাঁধো, কেমন করে বাঁধো দেখব।" 'মা তখন নানা পন্থায় তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। বললেন, "ঐ যে দড়ি দেখা যাচ্ছে, নিয়ে আয়"—এই ভাবে অনেক অনুনয় করলেন। তখন দুই একজন গিয়ে মাকে দড়ি এনে দিল। সেই দড়ি আনবার পরে মা আবার গিঁঠ দিলেন। এবার দড়িটা অনেক খানি বড় হয়েছে। এবার ঘুরিয়ে আনলেন। আবার দুই আঙুল কম পড়ল। আবার "দড়ি আন দড়ি আন" বলছেন। যেখানে যত দড়ি ছিল, মা দেখিয়ে দিলেন। সেই সব দড়ি নিয়ে আসা হ'ল, দড়ির সঙ্গে দড়ি গ্রন্থণ করছেন, করে দড়ি বড় করছেন আবার ঘুরিয়ে আনছেন, আবার দুই আঙুল ছোট হচ্ছে। গোপীরা হাসছেন, মা ছেলেকে বাঁধতে পারছেন না তাই হাসছেন। একজন বলছেন, "যশোদা! তুই যখন দেখলি একটা দড়ি ছোট, দু'টো দড়ি ছোট, তিনটাও ছোট, তখন তুই আর তোর ছেলেকে বাঁধতে পারবি না।" মা বললেন, "তুই চুপ কর! মা ছেলেকে বাঁধতে পারবে না? কেন পারবো না?" কোন গোপী আবার বলছেন, "কোন কোন ছেলের কুষ্টিতে বন্ধন-যোগ থাকে না। বোধ হয় তোর ছেলের কুষ্টিতে বন্ধনযোগ নেই, তাই বাঁধতে পারছিস্ না।" মা বললেন, "রাখ তো কুষ্টি আর ঠিকুজি।" মা বলছেন, "আবার এক গাছা দড়ি আন।" এইভাবে হতে হতে দড়ির উপর দড়ি, ঘরে যত দড়ি ছিল আনা হ'ল, ঘরে পাচ্ছেন না তো পাশের বাড়ি থেকে দড়ি আনাচ্ছেন, কিন্তু কোন ভাবেই গোপালের কটি বেষ্টন করে দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারছেন না। আর গোপালও কোলে ছটপট করছে আর বলছে, "মা! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও!" কেমন একটা দৃশ্য হ'ল!

কিন্তু বাঁধতে পারছেন না কেন! গোপালের কটি তো এতটুকুই আছে, বড় হলে তো মা ভয় পেতেন। যে কটিতে মা কাঞ্চি পরিয়েছেন সেই কটিই আছে। কিন্তু দড়ি পরাতে গেলেই কটি বড় হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? দু'টো জিনিস্ বুঝতে হবে। "কেন বাঁধতে পারছেন না"

এই; আর একটা, কেন প্রতিবারই দুই আঙ্গুলই ছোট হচ্ছে। এই দু'টো বুঝলেই তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গোপাল তো আর এখানে ভগবান্ নন। তিনি শিশু নরশিশু। একেবারে মায়ের শিশু। ভয়ে কাঁপছেন পালাবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত কিছুই একেবারে শিশুর মতন। ব্রজরসের লীলার সময় ভগবানের ঐশ্বর্য শক্তি থাকে না। ঐশ্বর্য শক্তি শ্রীকৃষ্ণে ঠিক নেই, তাঁর আছে বিষ্ণুশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অসুর বধ করেন বিষ্ণুদ্বারে, বিষ্ণু দ্বারা করেন।

"স্বয়ং ভগবান্ অবতরে সেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসে মিলে।।
নারায়ণ চতুর্ভুজ অবিচ্ছেদ্য অবতার।
যুগ মন্বন্তর ভরে যত আছে আর।
সবে আসি কৃষ্ণ সঙ্গে হয় অবতীর্ণ।।
ঐছে ঐ সব অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।।" চৈঃ চঃ

পূর্ণ ভগবানে যখন আসেন সব শক্তিই তাঁর মধ্যে থাকে এবং এই সব শক্তির দ্বারা তিনি তাঁর কাজ করেন। বৃন্দাবনের রসের লীলায় ভগবানের সব শক্তি ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কেবল তিনটি শক্তি তাঁর কাছাকাছি থাকে। তারা হলেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমত্ত্ব ও বিভুত্ব। এদের ভগবান্‌কে ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। যদি তাঁর কোন প্রয়োজন হয় তাহলেই তারা ভগবানের সেবা করবেন। এখন বিভুত্ব শক্তি দেখছেন মা গোপালকে বাঁধতে চান। আর গোপাল বাঁধা পড়তে চান না। তিনি বলে চলেছেন, মা আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বেঁধো না, আমায় ছেড়ে দাও। তাই আমার ঠাকুরের ইচ্ছা নেই বাঁধা পড়তে। কিন্তু মা চেষ্টা করছেন। এই যে ঠাকুরের ইচ্ছে নেই যখন তখন আমি বাঁধতে দেব না। দেখি মা কী করে বাঁধেন। এই ভেবে বিভুত্ব শক্তি শ্রীকৃষ্ণের কটিতে এসেছেন। আর যেই না কটিতে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কটি বিভু হয়ে গেছে। বিভু মানে বিরাট্। কিন্তু বড় হয়নি। গোপনে থেকে সেবা করছেন। কটিকে বড় করতে পারেননি। যখন বামন অবতারে বলিকে ছলনা করতে গিয়েছিলেন তখন বলির কাছে তিন পা জায়গা চেয়েছিলেন। সেই তিন পা মাপতে গিয়ে বিরাট্ হয়ে গেলেন। তিন চরণ দিয়ে স্বর্গ মর্ত পাতাল আক্রমণ করলেন। বলিকে ভগবানের বিভুত্ব শক্তি তাঁর নিজ স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সেখানে বিভুত্ব শক্তির কোন ভয় ছিল না। কিন্তু এখানে বিভুত্ব শক্তি ভয় পেয়েছেন। যার ভয়ে গোপাল কাঁপে তার ভয়ে গোপালের শক্তিও কাঁপে। মায়ের সামনে কোন ক্ষমতা নেই বিভুত্ব শক্তির যে গোপালের দেহকে বড় করে ফেলবেন। গোপালের কটি যেমনকার তেমনই আছে, গোপনে সেবা করছেন। গোপনে সেবা করা যায়। যেমন আপনি বুঝতে পারছেন আপনাকে বা অমুককে গোপনে কে সাহায্য করল। তাহলে গোপালের কটি বিশ্বব্যাপী হয়ে গেছে। যিনি বিরাট্ বিভু তাঁকে কে বেষ্টন করবে? যাঁর শেষ নেই, যিনি অসীম অনন্ত, তাঁকে কি বাঁধা যায়?

তাহলে লড়াই হচ্ছে কার সঙ্গে? কৃষ্ণের সঙ্গে নয়। কৃষ্ণের বিভুত্ব শক্তি একদিকে। আর

একদিকে মা বা মায়ের জেদ। বাৎসল্যময়ীর জেদ। "কি! আমার ছেলেকে আমি বাঁধতে পারব না? আর পারব না দেখে পাড়ার মানুষ হাসবে? বলবে যে, "মা তার ছেলেকে বাঁধতে পারছে না!" আমি বাঁধবই! তাহলে একদিকে মায়ের জেদ আর একদিকে বিভূত্ব শক্তির দৃঢ়তা।

এইভাবে চলতে চলতে মা একসময় বিস্মিতা হলেন। এতক্ষণ এইভাবে চলতে চলতে ভাবছিলেন গোপালকে আমি বাঁধবই। পেটে বেঁধেছি দশ মাস আর এখন বাঁধতে পারবো না? কিন্তু হঠাৎ এখন মনে হ'ল বাঁধা বোধ হয় যাবে না। কী যেন একটা ব্যাপার আছে। এমন একটা কিছু আছে যাতে কিনা বাঁধা যাবে না।

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।" ভাঃ ১০/৯/৮

মার চুল-টুল সব আলুলায়িত হয়ে গেছে। কাপড়চোপড় সমস্ত খুলে একেবারে আলুথালু হয়ে গেছে। সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। মা একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে চরম ক্লান্তও হয়ে গেছে।

শুকদেব বলছেন "শোন মহারাজ! দুই আঙুল খাটো কেন হ'ল।" শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ ঈশ্বর বা ভগবান্। আনন্দঘন ভগবান্। আনন্দকে সবাই বাঁধতে চায়। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আনন্দ চায় না। নিজের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকেই আনন্দকে জড়িয়ে রাখতে চায়। তাই মায়ের কাজটা হ'ল সার্বজনীন কাজ। আপনি দেখছেন মা গোপালকে বাঁধবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেই কাজ আমরা সবাই করছি। আমরা প্রত্যেকেই আনন্দ চাই। যদি পাই একটু সেইটুকুকে ধরে রাখতে চাই। তাই মা গোপালকে ধরেছেন তাকে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছেন। এই যে আনন্দের পিছনে ছোটা। মা ছুটেছেন আনন্দের পিছনে। সবাই ছোটে। আনন্দের পিছনে ছোটা, তাকে পাওয়া, পেয়ে ধরে রাখা। এই যে একটি কর্ম, যেটা বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ কেন, পশু-পক্ষীও করে। যেখানে গেলে আনন্দ পাবে সেখানে যায়, যেখানে গেলে একটু আনন্দ পায় আর সেখান ছাড়তে চায় না। এমন আনন্দঘন ভগবান্‌কে পেতে গেলে কী লাগে? সাধন-ভজন লাগে। তাই মাও সাধন-ভজন করছেন। এই যে গোপালকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা, এটা বাৎসল্য-রসের সাধনা। কিন্তু সাধন করেও গোপালকে বাঁধতে পারছেন না কেন? পারছেন না কারণ, ভগবান্‌কে সাধনের দ্বারা পাওয়া যাবে না? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" তিনি যাকে কৃপা করেন এবং কৃপা করে ধরা দেন সে-ই তাঁকে ধরতে পারে বাঁধতে পারে। না হ'লে পারা যায় না। কৃপা ছাড়া হবে না। আমার আপনার প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই কথা, ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবান্‌কে পাওয়ার কোন উপায় নেই। তাহলে বসে থাকি। যেদিন কৃপা করবেন সেইদিন হবে। চেষ্টা করব না। না, চেষ্টা করেন, সাধন করেন। কিন্তু সাধনের দ্বারা পাওয়া যাবে না তো বললেন। হ্যাঁ, সাধনের দ্বারা পাওয়া যাবে না ঠিকই। তবে সাধন করব কেন? এই কথা শুনে আপনি আমাকে বলেই বসবেন, 'উলটো-পালটা কথা বলবেন না। সাধনের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, কৃপায় পাওয়া যায়। কিন্তু কৃপা কখন আসবে? যে সাধন মোটেই করে না তার কাছে কৃপা কখনই আসবে না। সাধন করতে হবে তাহলেই কৃপা আসবে। কিন্তু সাধনটা

কত দূর পৌঁছালে কৃপা আসবে বলতে পারেন? হ্যাঁ, বলতে পারি। দাগ দিতে পারেন? হ্যাঁ, দাগ দিতে পারি। কী করে? সাধন করতে করতে করতে করতে যখন আপনার মনে হবে "সাধনে তাঁকে পাওয়া যাবে না", তখন কৃপা আসবে। ব্যাপারটা ঠিক মতন করে বুঝতে হবে। "সাধনে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না"—কথাটা বই পড়ে শুনলাম, একজন সাধুর মুখে শুনলাম, এতে হবে না। আপনাকে সাধন করতে হবে। এই সাধনের সীমা কত দূর? সাধন যখন নিজের অক্ষমতা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে তখন। সে বলবে, "আমি সাধন, আমার দ্বারা তুমি কৃষ্ণকে পাবে না। ভগবান্‌কে পেতে পারো না।"—এই জ্ঞান আপনার সাধন করে হতে হবে। ভক্ত সাধনে স্থিত হ'লেই তাঁর এই জ্ঞান হবে। মায়ের গোপালকে বাঁধবার চেষ্টাই হ'ল মায়ের সাধন। গোপালকে বাঁধবার চেষ্টা করতে করতে মা হঠাৎ মনে করলেন "বাঁধতে বোধ হয় আর পারা যাবে না।" এতক্ষণ জেদ ছিল। এই যে "সাধনে পাওয়া যাবে না" এই জ্ঞান এখন মায়ের হ'ল। 'কৃপাশক্তি' যিনি তিনি কখন আসবেন? যখন ভক্তের সাধনে ক্লান্তি আসবে। ভজন করতে করতে সাধনরত ভক্ত তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে মনে করবে ভজন করে কোন লাভ হবে না, তখন কৃপাশক্তি আসবেন। তাই মা ক্লান্ত হয়েছেন। এমনি পরিশ্রম করে নয়, গোপালকে বাঁধতে গিয়ে। বাঁধার চেষ্টাই হ'ল বাৎসল্য রসের সাধন। ক্লান্তি এতদূর এসে পৌঁছিয়েছে যে, মায়ের মনে হয়েছে "আর পারবো না।" ভজনে ক্লান্তি আসবেই। আমার হোক কি আপনার হোক একই কথা। ভজনের প্রথমে মনে হয় "পাব"। ভজন করি সাধন করি ধ্যান করি—জপ করি পূজা করি, যা কিছুই করি না কেন "পাব"। এই করতে করতে এক সময় মনে হবে পাওয়া বুঝি আর যাবে না। এই যে "পাওয়া যাবে না" মনে করলেন, এইবার কৃপা আসবে। মায়ের ক্ষেত্রেও তাই। যেই না মা তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃপা-শক্তির উদয় হ'ল। মা গোপালকে বেঁধে ফেললেন।

এখন কৃপাশক্তি এসে কী করলেন? কৃপাশক্তি কিছুই করলেন না। বিভূত্ব শক্তি যিনি তিনি তো গোপালের কটি গোপনে বড় করে রেখেছেন। এখন কৃপাশক্তি আসলেন। কৃপাশক্তি হলেন সম্রাজ্ঞী। শ্রীভগবানের যে অনন্ত শক্তি আছেন তাদের সকলের উপরে আছেন কৃপাশক্তি। এখন রাণী যদি কোথাও আসেন তাহলে চাকর-চাকরাণী যে-যেখানে থাকে সরে দাঁড়ায়। "সর্ সর্, রাণীমা আসছেন।" ভগবানের যেখানে যত শক্তি আছেন সৃষ্টিশক্তি, পালন শক্তি, সংহার শক্তি—যত শক্তি আছেন, যদি কৃপাশক্তি আসেন এরা রাস্তা ছেড়ে দেন। তাই যখনই কৃপাশক্তির উদয় হ'ল তৎক্ষণাৎ বিভূত্ব শক্তি সরে দাঁড়ালেন। কারণ বিভূত্ব শক্তির ক্ষমতা নেই কৃপাশক্তির পথ বন্ধ করে রাখে। যেই না বিভূত্ব শক্তি সরে দাঁড়ালেন তখন তো গোপালের কোমরটা তো কিছুই না। এতটুকু একটু কটি গোপালের এক মুঠিতে ধরা যায়। তা বাঁধতে পারছিলেন না এতক্ষণ? যশোদা গোপালকে কোলের মধ্যে ভালো করে চেপে ধরে দড়ি দিয়ে গিঁঠ দিলেন। যত দড়ি নিয়ে এসেছিলেন সব ছুড়ে ফেলে দিলেন। মা আর সব গোপীদের বললেন, "দ্যাখ, বিনা কারণে কত দড়ি এনেছিলাম। একগাছা দড়ি খাটো ছিল। কিন্তু দুই গাছা দিয়ে সহজেই বাঁধা গেল। মা ছেলেকে বাঁধতে পারবে না? এই তো বাঁধলাম। গোপাল ছটপট করছিল তাই

বাঁধা যাচ্ছিল না। এইবার আমি তাকে এমন করে ধরেছি আর ছটপট করতে পারেনি, তাই বাঁধতে পারলাম।"

শুকদেব এখানেই নবম অধ্যায় শেষ করলেন। অন্তরে ইচ্ছা—"একটু বেশী সময় বন্ধনে থাকুন ঠাকুর। থাকলেই মায়াবদ্ধ আমাদের মত অভাজনদের প্রতি দৃষ্টি পড়বে।" জয় জগদ্বন্ধু। ▢

গীতা ও ভাগবতের পৌর্বাপর্য

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর লীলাভূমি। এই লীলা গোপনলীলা। কেহই জানিত না। যাহারা কিঞ্চিৎ জানিত তাহারাও বুঝিতেন না। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রেবও ভুল হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবও ব্রজলীলা সম্বন্ধে রহস্যবেত্তা ছিলেন না। ভীষ্ম-অর্জুনের মত ভক্তেরাও জানিতেন না।

দ্বারকা কুরুক্ষেত্র—শ্রীকৃষ্ণেব যৌবনের লীলাভূমি। সকল ঘটনা সকলেই পরিজ্ঞাত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জনকে গীতা বলেন। অর্জুনকে বলার আগেও গীতার তত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভগবান্ মনুকে বলিয়াছিলেন। মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। রাজর্ষি-পরস্পরায় প্রকাশ ছিল।

গীতা মহাভারত গ্রন্থে বেদব্যাস কর্তৃক প্রকাশিত। সকল লোকেরই পরিজ্ঞাত। গীতা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ—তত্ত্বময় গ্রন্থ, ঘটনাময় নয়। ভাগবতী লীলা বৃন্দাবনীয় লীলা—একটি ঘটনা। রাসলীলা একটি ঘটনা, তার মধ্যে তত্ত্ব কিছু আছে কিনা—তাহা ভাবুক-দার্শনিকের ধ্যানগম্য। এই ধ্যান দিয়াছেন ব্যাসদেবপুত্র শুকদেব। ভাগবত লিখিয়াছেন ব্যাসদেব—জীবনের শেষভাগে মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রকাশের পর চিত্তে শান্তি না পাওয়ায়—নারদ-উপদেশে ভাগবত লিখেন। লিখেন অর্থ মানসে লিখেন—তাহাই পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দেন। ভাগবতের রূপ দেন শুকদেব—মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর পূর্বে। পরীক্ষিৎ—অর্জুনের পৌত্র—অভিমন্যুর পুত্র। সুতরাং ভাগবতীয় লীলার ঘটনা গীতার প্রকাশের পূর্ববর্তী হইলেও জগতে ভাগবতের বিকাশ অনেক পরে। বেদব্যাস যখন গীতা মহাভারত লিখেন তখন তিনি ভাগবত জানিতেন না। শুকদেব যখন ভাগবত বলেন—তখন তিনি গীতা খুব ভালভাবেই জানেন। অন্তরে গীতা তত্ত্ব রাখিয়াই ভাগবত গ্রন্থ রূপায়িত—এই জন্য গীতার সহায়তা ভিন্ন ভাগবতীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য"—অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত থাকিলেই—রাসলীলায় গোপিগণের শ্রীকৃষ্ণের অভিসার—তাহার রহস্য আস্বাদিত হইতে পারে। এই জন্য ভাগবতীয় লীলার আস্বাদন হইবে গীতা-ভিত্তিক। কিন্তু গীতাচর্চা করিতে ভাগবত জানার প্রয়োজনীয়তা নাই। গীতায় পুরুষোত্তম শব্দটি আছে। তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত এই তত্ত্বটুকু আছে। কিন্তু পুরুষোত্তমের কোন লীলাখেলা নাই। কোন আভাসও নাই। শুধু গীতার শেষভাগে 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকের শেষাংশে পরা ভক্তির উল্লেখমাত্র আছে। এই পরা ভক্তি বা প্রেমভক্তির সময় লীলামাধুর্যের প্রকাশ বৃন্দাবনে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্রজলীলা

* *'গীতামৃত'। অষ্টাদশ বর্ষ, ১৯৯৯। রাঁচী। সম্পাদক : শ্রীসত্যরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।*

পূর্ববর্তী। কুরুক্ষেত্রের লীলা পরবর্তী, ভাগবত আগে গীতা পরে—কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে—তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে—গীতা পূর্ববর্তী ভাগবত পরবর্তী। যিনি ভাগবত-রসে ডুবিতে চাহেন তিনি গীতার দর্শন পূর্বাহ্ণে আয়ত্ত করিয়া লইলে তাঁহার পথ সুগম হয়। কেবল গীতা নহে, উপনিষদ্ শাস্ত্রেরও সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে ভাগবতে প্রবেশ করা সহজ সুন্দর হয়। শ্রুতিতে আছে 'রসঃ বৈ সঃ'—তিনি রস স্বরূপ। তাঁহার মূর্তি শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবনীয় লীলায়। যাঁহারাই ভাগবত অনুশীলন করিয়াছেন সকলেই শ্রুতি ও গীতায় বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট ছিলেন।

* * * *

আর একটি জিজ্ঞাসা পাইয়াছি।

মহাপ্রভু একাধারে মিলন-বিরহের মূর্তি, ঘনীভূত বিগ্রহ। ব্রজলীলায় রাধা-গোবিন্দের মাথুর-বিরহের তীব্র বেদনার পর আর মিলন হয় নাই। কুরুক্ষেত্রে একবার দেখা হইয়াছিল—এর ব্যাখ্যা কী জানিতে চাহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবন ছাড়িয়া গেলেন দশ বৎসর আট মাস বয়সে, তারপব আর ব্রজে আসিযাছেন—এরূপ কোন স্পষ্ট উক্তি ভাগবত গ্রন্থে নাই। মাত্র একস্থানে আছে দন্তবক্রকে বধ করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন, এই পুবী কোন্ পুরী তাহা বুঝা যায় না। যদি বৃন্দাবনপুরীও হয় তবু সেখানে কোন খেলা-লীলার কথা নাই।

কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্যমন্তক তীর্থে এক সময় ভারতের বহু স্থানের বহু লোক সমাগত হইয়াছিল—কারণ সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ক্বচিৎ হয়। সেই সময় বৃন্দাবনের ভক্তেরাও আসিয়াছিল। দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণও সজ্জন-সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গ্রহণের একদিনই দেখা সাক্ষাৎ। শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—সেই তুমিই আছ—সেই আমিও আছি; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে বংশীনাদে মুখরিত কুঞ্জে মিলনে যে আনন্দ হইত—তাহা আর হইল না। মন কেবল তাহাই চায়। পুরীতে রথাগ্রে রথের সম্মুখে নাচিতে নাচিতে—একটি কাব্যের শ্লোক বলিতেন—শ্লোকটির মধ্যে শ্রীরাধার অন্তরের ভাব গুপ্তভাবে নিহিত। রাধাগোবিন্দের লীলায় চারি প্রকার বিরহ ও চারি প্রকার মিলন। পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান ও মাথুর—এই চারিপ্রকার বিরহ। সংক্ষিপ্ত, সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিমান্ এই চারিপ্রকার মিলন। এক এক প্রকার বিরহের পর এক এক প্রকার মিলন। বিরহের যত তীব্রতা মিলনের তত গভীরতা। মাথুর বিরহের পর যে মিলন তাহার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। তাহা বৃন্দাবনলীলায় হইয়াছে—এমন কোন আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। ভক্ত কীর্তনীয়াগণ মাথুর গানের পর—ভাব সম্মিলন করে। বাস্তব মিলন নাই।

এই মিলনই মহাপ্রভুতে হইয়াছে, শ্রীগৌরহরি রাধাভাবে নিরন্তর কাঁদিতেন। কান্নার তীব্রতায় বিরহের চরম বেদনার মধ্য দিয়া প্রগাঢ় মিলন ঘটিয়াছে। এইজন্য মহাপ্রভু একাধারে বিরহ-মিলনের ঘনীভূত মূর্তি। এই রহস্য বিস্তাব করিতে অনেক কথার প্রয়োজন। এখন আর বলিব না, বলার প্রয়োজন নাই। ❑

'গোপীগীতা'—প্রাক্‌কথন

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র-শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগ্রন্থরূপে পরিবর্তিত। আদ্যন্ত মধুবর্ষী। তন্মধ্যে দশম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা সমধিক মাধুর্য-সম্পৃটিত। ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা—এই তিনটি লীলাই প্রাণস্পর্শী ভাষায় ও ছন্দে রূপায়িত।

ব্রজলীলায় প্রধানতঃ তিনটি রসের আস্বাদন—বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। এই আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনদের নিকট "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি" রূপে প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ আমার সর্বস্ব ধন প্রাণবল্লভ প্রিয়তম—এই সুনিবিড় অনুভূতির ভিয়ানে মধুর রস সমুজ্জ্বল। ইহাপেক্ষা কৃষ্ণানুরাগের নিবিড়তম অভিব্যক্তি মানবীয় ভূমিতে অদৃষ্টচর।

মধুর রসের চরম আস্বাদন রাস পঞ্চাধ্যায়ীতে। রসজ্ঞেরা বলেন আস্বাদনের উৎকর্ষতা মিলন হইতে বিরহে সমধিক। বিরহের তন্ময়তা সুগভীর ও সুবিশাল। বাহিরে হারাইয়া বিশ্বময় পাওয়া।

রাসে দুইটি বিরহের প্রকাশ। একটি প্রাপ্তির পূর্ববর্তী, আর একটি প্রাপ্ত বস্তু হারা হইয়া পরবর্তী। প্রথমটি গোপীর অভিসারে ও উপেক্ষিতার আত্মনিবেদনে পরিস্ফুট। ইহার ফল কৃষ্ণপ্রাপ্তি। সর্বতোভাবে প্রাপ্তি।

তারপর আবার বিরহ। মিলনের পরবর্তী বিরহ। প্রাপ্ত সম্পদ্ হারা হওয়ায় বিরহের যে সন্তাপ তাহা নিবিড়ভাবে হৃদয়স্পর্শী, প্রবলতায় তীব্রতায় উহা অতলান্ত।

ভুবনমোহন রাসমণ্ডলী। একটি কৃষ্ণ একটি গোপী, একটি কৃষ্ণ একটি গোপী, অভূতপূর্ব শোভায় শোভমান। নৃত্যগীতবাদ্য-মুখর রাস-বিলাসের আনন্দসমুদ্র উদ্বেল। এমন সময় বুঝি বা তীব্রতম বিরহ-সন্তাপ প্রকটনের উদ্দেশ্যে যোগমায়ার লীলাকৌশল। গোপীচিত্তে জাগিল 'সৌভাগ্য-মদ' আর গোপীশিরোমণি ভানু-নন্দিনীর চিত্তে জাগিল 'মান'। একই কালে মদ ও মানের উদয়কে প্রশমন ও প্রসাদন করিবার জন্য রসিকশেখরের আত্ম-সংগোপন।

অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি মুহূর্ত মধ্যে প্রাপ্তধন হারা হইয়া গোপীগণ ডুবিয়া গেলেন বিরহের অতলস্পর্শী মহোদধিতে। তাঁহাদের বিরহানুভূতির প্রকাশ পর পর তিনটি স্তরে। উন্মত্ত অনুসন্ধান, অপরূপ লীলানুকরণ ও বুকফাটা ক্রন্দন।

পাগলিনী গোপবধূগণ যাহাকে নিকটে পান তাহাকেই কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যমুনার তীরবর্তী বড় বড় গাছ, ছোট ছোট গাছ, লতা-গুল্ম, তৃণ-পুষ্প, তুলসী, বনের হরিণী, মাধবীবেষ্টিত তমাল—সকলের নিকটই জানিতে চান কোথায় প্রাণকৃষ্ণ। গভীর আর্তির সহিত প্রশ্ন করেন—কোন্ পথে দর্পহারী প্রাণের হরি।

কোথাও কোন সন্ধান না পাইয়া যখন জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন যোগমায়া তাঁহাদিগকে "প্রতিশয় মূর্তি" সাজাইলেন। অভূতপূর্বভাবে লীলানুকরণে নিযুক্ত করিলেন। বাল্যলীলা হইতে রাসের অভিসার পর্যন্ত নিখুঁত অভিনয়। মনে হয়—বিরহের উত্তপ্ত সমুদ্র মধ্যে মিলনানন্দের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ভিতরে তীব্র দহন, বাহিরে অভিনয়ের আস্বাদন।

** 'গোপীগীতা'। অনুবাদক : শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভারতী, সাহিত্যবিনোদ। ১৯৮৭।*

কতক্ষণ পরে এই ভাব-বিহ্বলতার তরঙ্গ প্রশমিত হইল, দ্বীপ-চর ভাসিয়া গেল। আরম্ভ হইল আকুল কান্না। সুতীব্র বিরহাগ্নিতে দগ্ধীভূতা গোপীগণ দাঁড়াইলেন যমুনাতটে। মুখ ফিরাইলেন বনের দিকে। বনবিহারীর প্রতি অন্তর-রাজ্যের গভীর বেদনাময় আর্তি জানাইতে লাগিলেন করুণ ক্রন্দন-রোলে।

খুঁজিলে তিনি লুকান। ধরা দিবেন না বলিয়া অন্ধকারে বনে বনে সরিয়া বেড়ান। তাহাতে সুকোমল পদতল তৃণাঙ্কুরে ক্ষত হয়। যে সুকোমল পদতল বক্ষে ধরিলে বক্ষের কঠোরতায় চিত্ত উদ্বেল হয়—সেই পদে তৃণাঙ্কুরংক্ষত হয় আমাদের অনুসন্ধানের ফলে। তবে আর খুঁজিব না। শুধুই কাঁদিব এই ভাবনায় তাঁহারা কান্নাই সার করিলেন।

শ্রুতি-শাস্ত্র রসসিন্ধুর অত গভীর তলে ডুবিতে না পারিলেও সুখী হইল, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই মন্ত্র অতি মৃদুমধুরভাবে উচ্চারণ করিয়া। শ্রুতি আত্মতৃপ্তির সুখানুভূতি লাভ করিল।

সন্তপ্তা গোপীর এই কাতর কান্না গোপীগীতি। দশম স্কন্ধেরই একত্রিংশ অধ্যায়ের উনিশটি মন্ত্র। ছন্দের সৌন্দর্যে, ভাবের মাধুর্যে, আর্তির তীব্রতায়, অনুরাগের প্রখরতায় এই গোপীগীতি উপমাহীন। পৌরাণিক-সাহিত্যে, লৌকিক-সাহিত্যে, লোক-সাহিত্যে, আধ্যাত্মিক-সাহিত্যে, সাধন-সাহিত্যে কোথাও ইহার সমতুল্য গীতি নাই। এই কান্না একক। ইহার সমকক্ষ কেহ নাই। যেমন লীলাময় তেমনি লীলা, তেমনি এই গীতিকা, অসমোর্দ্ধ অনবদ্য।

এই অপরূপ গীতির কাব্যানুবাদ করিয়াছেন মুক্তিপদ কাব্যভারতী। মুক্তি যাঁর পদে পড়িয়া কাঁদে তাঁর শ্রীচরণাশ্রয় ঐকান্তিক ভাবে না হইলে এই অনুবাদ সম্ভব হয় না। মহৎ কৃপা ও তপস্যার সম্মিলনে ইহা রূপায়িত হইয়াছে। মূল শ্লোকের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য এই অনুবাদে সুব্যক্ত। কোন সমালোচনা করিয়া আস্বাদনের বস্তুর মাধুর্যহানি করিতে স্বভাবতঃই সংকোচ জাগে। এই গীতি যাঁহাদের নিত্য ধ্যানের তাঁহারা পাঠ করুন, কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্য আবৃত্তিতে বিরহকাতরা ব্রজবধূগণের মানস-সান্নিধ্য লাভ করুন। মাদৃশ বঞ্চিতদের প্রতি কৃপাকটাক্ষে কৃপণতা করিবেন না।

রসলোলুপ
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিশেষ করিয়া মানবীয় লীলা অতি নিগূঢ়—বেদগুহ্য বলা চলে। আচার্য শঙ্করের মত জ্ঞানীগুণী লোকও মাঝে মাঝে লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে ভুল করিয়া বসেন। আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের অতি প্রচারে শাস্ত্রীয় গভীর শ্লোকগুলি, লীলারসিক মহাজনদের ভাবগর্ভ পদ-পদাবলীগুলি অতি সাধারণ লোকেরও সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে বিস্তর। এই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যে কী তাহা সম্মুখে কিছু দেখিতে পারিতেছি না। তবুও

বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়া লীলা আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সর্বাপেক্ষা বোঝা প্রয়োজন যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখাসখীগণ মানুষ মূর্তিধারী হইলেও আমাদের মতন মানুষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দটি বৃন্‌হ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বৃন্‌হ্ ধাতুর অর্থ বড় হওয়া ও বড় করা। যিনি সবচেয়ে বড় তিনিই ব্রহ্ম। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, এ সমস্তের মূল যিনি এবং যাহাতে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম। তিনি অন্য সকল অপেক্ষা বড়। সকল অপেক্ষা সকল বিষয়ে সমধিক রূপে বড়। তাঁহার সমান কেহ নাই—তাঁহার অধিকও কেহ নাই।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম বস্তুটি মূলতঃ আনন্দই। সৎ চিৎ আনন্দের বিশেষণ। এই প্রাকৃত জগতের আনন্দের মত সে আনন্দ ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য নহে। এই আনন্দ চিৎ—চৈতন্যময় বস্তু। প্রাকৃত আনন্দের মত জড় বস্তু নয়। সৎ শব্দ অস্তিত্ববোধক। চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাদান। উহা কেবল নিত্য নহে চৈতন্যও। ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রস অর্থ চমৎকারিত্ব।

যে-বস্তু আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই চমৎকারিত্ব তাহাই ব্রহ্মরস। ইহা বলিতে রস ও রসিক দুইই বোঝায়। রসের যেখানে পূর্ণতম বিকাশ তাহাকে বলে পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়াছেন "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"। অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। যেমন মনে করুন একটা উজ্জ্বল বস্তু—এত উজ্জ্বল যে উজ্জ্বলতার জন্য বস্তুটাকে দেখা যায় না। তখন যদি কেহ কাহাকেও বলে ঐ উজ্জ্বলতার প্রতিষ্ঠা ঐ মণিটাতে। যদি এমন একটা চশমা লাগাও যাহাতে ঐ উজ্জ্বলতা অনেক কমিয়া যাইবে তাহা হইলে মণিটাকে দেখা যাইবে। অনেক জ্ঞানী জন আছেন যাঁহারা ব্রহ্ম বলিলে সহজেই বুঝিতে পারেন কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে বুঝিতে পারেন না। তাহার কারণ এই জ্ঞানের চক্ষে ব্রহ্মের অশেষ জ্যোতি দৃষ্ট হয়। ভক্তির দৃষ্টিতে জ্যোতিটা কিছুটা কাটিয়া যায়। জ্যোতি ও ব্রহ্ম একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়াছেন উনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণব আচার্যগণ সহজ ভাষায় বলেন ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ।

জ্যোতি বস্তুটা নিরাকার। যাঁহার জ্যোতি সে সাকার। এইজন্যই বলা হয় পরব্রহ্ম নিরাকার এবং শ্রীকৃষ্ণ সাকার। শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি। দ্বি ভুজ, দ্বি পদ, এক মস্তক—দুই কর্ণ ও দুই চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়। শিশুগণ যেই রূপ খেলা করে শ্রীকৃষ্ণের লীলাও সেইরূপ। কোনও রূপ কার্য সিদ্ধির সংকল্প নাই। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের প্রেরণায় লীলা করেন। লীলাখেলা একাকী হয় না। খেলার সঙ্গীদের বলা হয় পরিকর। খেলার স্থানকে বলা হয় ধাম। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের ভাণ্ডার। মাধুর্য এত অধিক যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। আকর্ষণ করার গুণ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের এমন একটি আকর্ষণীয় শক্তি আছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আস্বাদন করিতে চঞ্চল হন। নিজের মুখ নিজের দেখিতে ইচ্ছা হইলে দর্পণের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজের সঙ্গে চিদ্‌দর্পণ আছে—তাহার নাম যোগমায়া। যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরিকর সকলকে মুগ্ধ করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটি শক্তি আছে। সৎ অংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী। চিৎ অংশকে বলে সংবিৎ ও আনন্দ অংশকে বলা হয় হ্লাদিনী। হ্লাদিনীশক্তি আনন্দ

সম্বন্ধীয় শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং অপরকেও করান। শ্রীকৃষ্ণের সখা-সখীগণ সকলেই আনন্দঘন মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণের করুণা ও ভক্ত-বাৎসল্য গুণ অফুরন্ত। তিনি নিজেকে ভক্ত-পরাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে চারিভাবে লীলা আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যরসের পরিকরদের নাম রক্তক পত্রক ইত্যাদি। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধিবশতঃ দাসের মত তাঁহারা সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন। সখ্যরসের পরিকর সুদাম-মধুমঙ্গল প্রভৃতি। দাসগণ অপেক্ষা ইহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক। বাৎসল্যে সখ্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধি অধিক। নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসের পরিকর। মধুর রসে বাৎসল্যরস অপেক্ষা মমতা বুদ্ধি অধিক। রাধিকা প্রভৃতি সখীগণ মধুর রসের পরিকর। সকল পরিকরগণের মধ্যে শ্রীরাধিকার রূপ, গুণ ও মাধুর্য সর্বাধিক। শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদন করিবার পরিপাটিও সর্বাধিক। পরিকরগণের সকলেরই উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান। তাঁহাদের আত্মসুখবাঞ্ছা বিন্দুমাত্র নাই। আত্মবলিদান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণের পদে সমর্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরগণের সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনে প্রবেশ উচিত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা একটি খেলার মতন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের লৌকিক খেলাতেও চারিটি পক্ষ থাকে। সপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ পক্ষ। মনে করুন ফুটবল খেলা হইতেছে। ইহাতে সপক্ষ ও বিপক্ষ আমরা সকলেই বুঝি। সুহৃৎপক্ষ একটু বোঝানো দরকার। সুহৃৎপক্ষ থাকে দর্শকদের মধ্যে। সুহৃৎপক্ষ দুইভাগ। কাহারও এই পক্ষের জয়ে আনন্দ। কাহারও বা অপর পক্ষের জয়ে আনন্দ। তটস্থ পক্ষ কোনও পক্ষেরই জয়-পরাজয়ে আনন্দ বা বিষাদ নাই—খেলা দেখিতেই আনন্দ, জয়-পরাজয়ে কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। খেলার সময়ে অতি প্রিয়জনও বিপক্ষে যাইতে পারে। খেলার শেষে আর বিপক্ষ ভাব থাকে না। সেইরূপ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী সহোদরা ভগ্নীর মতন। খেলার সময়ে তাঁহারা দুইপক্ষ। খেলার অন্তে তাঁহাদের বিরুদ্ধভাব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া যখন মথুরা যান তখন তাঁহাদের দুইজনের পরস্পরের প্রতি বিরোধভাব আর থাকে না।

লীলা একটি খেলা বা অভিনয়ের মতন। অভিনয় অভিনয়ের মতন করিয়া দেখিলে আনন্দ হয় না। অভিনয় তন্ময় হইয়া দেখিতে হয়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিনয় দেখিতে দেখিতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে একবার রাগ করিয়া মঞ্চে জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। নীলচাষের অভিনয়ে সাহেবের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, মঞ্চে সাহেবের উদ্দেশ্যে জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। পরে অনেক কষ্টে তাঁহাকে ইহা অভিনয় এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহার ক্রোধ উপশম করানো হইয়াছিল। লীলার কথা বলিতে ও শুনিতে অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন। অযোগ্য হইয়া যদি বলি বা শুনি তাহাতে কল্যাণ না হইয়া বরং বিপরীত কিছু হইবার সম্ভাবনা।

মানলীলা—শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলা বোঝা কঠিন, তন্মধ্যে মানলীলা সর্বাপেক্ষা কঠিন।

স্বপক্ষ - বিপক্ষ—শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী পরস্পর বিপক্ষ। যাহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন তাহাদিগকে পরস্পরের বিপক্ষ পক্ষ বলা হয়। বিপক্ষদের দু'টি কাজ—ইষ্টহানি

ও অনিষ্ট সাধন। শ্রীরাধার অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বসিয়া আছেন। ইহা জানিতে পারিয়া চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা চন্দ্রাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছেন। সুবলের নিকট শ্রীরাধা এই বিবরণ শুনিয়া কী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৃন্দা তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে মুকুন্দ! সুবল শ্রীরাধারানীর নিকট গিয়া বলিলেন—"পদ্মা চন্দ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়াছেন।" সুবলের মুখে এই কথা শোনামাত্র শ্রীরাধা স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত শ্রীরাধার স্তব্ধতা বিরাজমান ছিল। ইহার নাম ইষ্টহানি।

অনিষ্টকারী ঃ শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলা চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" পদ্মা বলিলেন—"আমি গোবর্ধনের তটদেশ হইতে আসিয়াছি।" জটিলা বলিলেন—"আমার বধূকে কি দেখিয়াছ? পদ্মা বলিলেন—"হাঁ দেখিয়াছি। সূর্য মন্দিরের দুয়ারে সূর্য পূজার জন্যে বসিয়া আছে।" জটিলা বলিলেন—"অনেকক্ষণ গিয়াছে—এখনও ফিরিতেছে না কেন?" পদ্মা বলিলেন—"পথে শ্রীকৃষ্ণ যাইতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। রাধা কেবল তোমার পথ চেয়ে আছে। দ্রুত চলিয়া যাও।" পদ্মা সখী এইভাবে শ্রীরাধার অনিষ্ট সাধন করিলেন।

কেহ বলিতে পারে—ব্রজে কৃষ্ণের সকলেই প্রিয়জন। সকলেই চাহে শ্রীকৃষ্ণের সুখ। তাঁহারা নিজের সুখ কিছুই চাহেন না। তারই মধ্য বিপক্ষতা কিরূপে সম্ভব? তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান সকলেরই কাম্য ইহা ঠিক, তথাপি শ্রীকৃষ্ণই রসের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য গোপীসুন্দরীদের মধ্যে স্বপক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই বিপক্ষতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রেমের স্বাভাবিক গতি অত্যন্ত কুটিল। এই কুটিলতা শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই হয়।

অসংখ্য ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য, তাহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের নিমিত্ত প্রবলবাসনা। নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একই সময়ে সকলের বাসনা পূরণ সম্ভব নয়। মধুর রসে একটি সঞ্চারীভাব আছে—তাহার নাম ঈর্ষা। শ্রীকৃষ্ণ এই, ঈর্ষারূপ সঞ্চারীভাবকে কোনও কোনও ব্রজসুন্দরীতে নিক্ষেপ করেন। ইহা দ্বারা তাহাদের পরস্পরের বিপক্ষরূপ সম্পাদন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূলতা করা হয় না। বরং আনুকূল্যই করা হয়। ঈর্ষার ফলে বিপক্ষ সখীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ পরিপুষ্টতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ সময়ে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে পরস্পর বিপক্ষ ভাব, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষাদি জন্মে কিন্তু বিয়োগ দশায় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন) তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাদির পরিবর্তে স্নেহই পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেই জানা গেল—সংযোগকালের ঈর্ষাদ্বেষাদি কেবল বাহ্যবৃত্তিতেই উদিত হয়, অন্তর্বৃত্তিতে উদিত হয় না। অন্তঃস্থিত কৃষ্ণরতিকে ভেদ করিতে পারে না। বস্তুত ঈর্ষাদ্বেষাদি সঞ্চারিভাব সমূহও কৃষ্ণরতিরই বৃত্তি বিকাশ, কৃষ্ণরতির বিজাতীয় বস্তু নহে।

এই বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) শ্রীকৃষ্ণের মথুরা অবস্থানকালে দিব্যোম্মাদগ্রস্ত

শ্রীরাধা একসময়ে গোবর্দ্ধনস্থিত স্ফটিক শিলায় প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রাবলী মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—চন্দ্রাবলি, তুমি বহুবার শ্যামসুন্দরের অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ—তোমার দেহ মঙ্গলযুক্ত হইয়াছে। তোমার সেই মঙ্গলময় দেহ সৌভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। তুমি তোমার মঙ্গলময় শীর্ণ বাহু দ্বারা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমাকে প্রাণদান কর। (২) শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্ত শ্রীরমেশচন্দ্র কঠোর ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি মানলীলা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটিকে আদেশ করিলেন—তুমি রমেশকে মানলীলার মাধুর্য বুঝাইয়া দাও। তোমাকে কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গাকে দিয়া যেভাবে বুঝাইয়াছিলাম সেইভাবে বুঝাইয়া দাও। তোমরা দুইজনই উচ্চ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতরা প্রায়ই তার্কিক হয়। তর্কটা বুদ্ধির ফল। অনুভূতিটা বোধির ফল। তোমার একটু বোধি জন্মিয়াছে। রমেশের এখনও জন্মায়নি।

চম্পটি মহাশয় রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন—তুমি জান গঙ্গানদী হিমালয় হইতে জন্মিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। নদীর স্বাভাবিক গতি দক্ষিণমুখী। কিন্তু কাশীর গঙ্গা উত্তরবাহিনী। ইহাতে গঙ্গার মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে। সেই প্রকার ব্রজগোপীদের সকলের প্রেমই কৃষ্ণমুখী, কৃষ্ণ-সুখ-বিধান-মুখী। তার মধ্যে মধুস্নেহবতী শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রতি গাঢ় অনুরাগ বিপরীতমুখী হয়। ইহাতে গঙ্গার মতন তাঁহার মহিমা বর্দ্ধিত হয়। মানে ও মানভঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয্য হয়। চম্পটি ঠাকুরের দ্বারা গঙ্গার দৃষ্টান্তে রমেশচন্দ্রের মানলীলার মাধুর্য কিঞ্চিৎ অনুভূত হইল। চম্পটি বলিলেন—রমেশ, তুমি শ্রীশ্রীপ্রভুর 'হরিকথা' পড়িও। রমেশ 'হরিকথা' গ্রন্থে কোথায় কী আছে তাহা জানিতে আগ্রহান্বিত হইলেন এবং চম্পটিকে তাহা বলিলেন।

দশম দশায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবিরহে মৃততুল্যা। শৈব্যাকে পাঠাইয়া চন্দ্রাবলীকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রীরাধা বলিলেন—বোন চন্দ্রাবলী! অবিলম্বে আমার মৃত্যু হইবে। কৃষ্ণধন কাহার কাছে রাখিয়া যাইব এই ভাবনা আমাকে মরিতে দিতেছে না। হঠাৎ মনে হইল তুমিই যোগ্য লোক। তাই তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। কৃষ্ণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলাম। তুমি ভাবিতেছ কৃষ্ণ এখানে নাই কেমন, করিয়া সমর্পণ হইবে। কিন্তু বলি শোন—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্ন। কৃষ্ণ নাই বটে, কিন্তু অভিন্ন কৃষ্ণ নাম সর্বদা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এই নাম মন্ত্রটি তোমার কর্ণে অর্পণ করিব। তবেই তুমি আমার কৃষ্ণকে পাইবে। চন্দ্রাবলী সানন্দে কান পাতিলেন—শ্রীরাধার কণ্ঠোচ্চারিত নামটি চন্দ্রাবলীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই নামটি কী?

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।"

এই মধুক্ষরা নামটি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাবলী অপূর্বভাবে পরিবর্তিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে পাইয়া রাধা যেমন গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, হরিনাম মন্ত্র পাইয়া চন্দ্রাবলীও সেইরূপ নিত্যানন্দে পরিগণিত হইলেন। "এই আমি গুরু হইলাম—তোমার কর্তব্য গুরুদক্ষিণা দেওয়া। কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রচার করাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।" চন্দ্রাবলী নিত্যানন্দ হইয়া গুরুদক্ষিণা দিতে হরিনাম কীর্তনে মগ্ন হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহকালে স্বপক্ষ ও বিপক্ষভাব যে থাকে না ইহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইল না কি?

মানলীলার ভূমিকা হইল। মানলীলার কথা অফুরন্ত। শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থে অপূর্বভাবে প্রকাশ হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে দুই-চারিটি কথা বলিব। পূর্বে ঘৃতস্নেহ মধুস্নেহের কথা বলিয়াছি। ঘৃতস্নেহে মান হয় না। মানলীলায় মধুস্নেহে মান হয়। যাঁহারা ঘৃতস্নেহ-পথিক তাঁহাদের প্রীতির নাম তদীয়তাময়। তাঁহারা ভাবে, তাঁহারা জানে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য সেবিকা, তার মধ্যে আমি একজন, অতিশয় ক্ষুদ্র। শ্রীকৃষ্ণ যে আমাকে কৃপা করিয়াছেন ইহাতে আমি ধন্য। তাঁহাদের মান করিবার অবকাশ কোথায়? যাঁহারা মধুস্নেহবাদী তাঁহাদের প্রীতির নাম মদীয়তাময়। তাঁহারা প্রেমের গাঢ়তায় ভাবে—শ্রীকৃষ্ণ আমারই, আর কাহারো নয়। কৃষ্ণপ্রেমে এক বিন্দু শিথিল মনে হইলে তাঁহাদের মান হইতে পারে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চন্দ্রানন বলিয়া ডাকিয়াছেন—চন্দ্রা বলিয়া ফেলিয়াছেন—বাকীটা বলেন নাই। চন্দ্রা নাম শুনিয়াই রাধারানী মানিনী হইলেন। আমার সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রাকে ডাকা কেন? আনন শব্দটি একটু আস্তে বলিয়াছিলেন। ইহাতেই শ্রীরাধারানীর মান হইল। যেখানে কোনই কারণ পাওয়া যায় না তাহাকে বলে অহৈতুকী মান। যাঁহারা মান করে তাঁহাদের বলে মানিনী। শ্রীরাধা এবং তাঁহার মানিনীদের যূথের সকলেরই মান হয়। ভেদ আছে—তন্মধ্যে প্রধান তিনটি ভেদের কথা বলিব। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদ।

শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা মধুর ভাবে ভালবাসেন সেই গোপীগণের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি। এক গোপীকে যূথেশ্বরী শিখাইয়া দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কোনও অন্যায় ব্যবহার করিলে মান করিবে। গোপী ফিরিয়া আসিলে অন্যান্য গোপীরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই মান করিতে পারলি না শুনিয়াছি।" গোপী উত্তর করিলেন—"তোমরা অনেকেই মান করিতে পার। আমার মান অন্তরে প্রবেশ করিলে অন্তর কাঁপিতে থাকে। তিনি জীবনের জীবন সর্বেশ্বর—তাঁর প্রতি মান করিব কী?" এই গোপী মানে অক্ষমা।

কোনও গোপী মান করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও মান না করিয়া আসিলে—মান কেন করেনি বা করিতে পারেনি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিল—"আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমার অবাধ্য হইল।" পা দু'টিকে বলিলাম—কৃষ্ণের দিকে যাইও না। পা ঘুরিয়া সেইদিকেই গেল। ভাবিলাম তাঁহাকে তিরস্কার করিব কিন্তু মুখ কিছুতেই পারিল না—তাঁহাকে মিষ্ট কথাই বলিল। রুক্ষভাষা বলিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু জিহ্বা কিছুতেই তাহা পারিল না—সেই মিষ্ট কথাই বলিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেই ইন্দ্রিয়গুলি বিপরীত আচরণ করে। কথা শোনে না। মান করিবার চেষ্টা করি কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় না। তাঁহারা মৃদুস্বভাবা গোপী।

* * * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীজী জানাইয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।

সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোস্বামী।"

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—দুই জনের একই আত্মা, দুইটি দেহ। দুইটি ব্যক্তিত্বের একটি হইয়া যাওয়া একটা কথার কথা নহে। তাহা কী করিয়া হইল—এই জিজ্ঞাসার একটি উত্তর দিয়াছেন শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে—

"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনীস্বেদৈর্বিলাপভ্রমাদ
যুজন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
বিশ্রায় মম্বরঞ্জ যদিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে
ভূয়োভিনবরাগ-হিঙ্গুলিভরৈ-শৃঙ্গারকারুকৃতিঃ।।"

শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ বেশ জটিল। তাহা এখন বলিব না। শ্লোকটির মূল তথ্যটি যাহা তাহা সহজ ভাষায় বলিব।

শ্রীরাধা ও গোবিন্দকে এক তনু করিয়া দিয়াছেন একজন উত্তম সুনিপুণ কারুকার্যবিদ্। তাহার নাম শৃঙ্গার রস বা মধুর রস। সেই শিল্পী কী উপায়ে কার্যটি সমাধান করিযাছেন তাহা বলি। শিল্পীবর দুই খণ্ড লাক্ষা লইয়াছেন দুই হাতে। একটি অগ্নিশিখায় দুই খণ্ড লাক্ষা দুই দিক্ দিয়া তাপ দিতে দিতে দুই দিক্ দিয়া পড়িতে পড়িতে এক খণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুই খণ্ডেরই একটা ভ্রম ছিল যে তাহারা দুই খণ্ড। এখন সেই ভেদভ্রম সম্পূর্ণভাবে দূব হইয়া গিযাছে। সেই বিচক্ষণ শিল্পীর সাধ ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ দেবগৃহে একখানি অভিনব আলেখ্য টাঙাইয়া দিবেন। সেই সাধ তাহার মিটিয়া গেল।

এই সুন্দর কথাটি লইয়াই এই নিবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, দুইজনে একাধারে একীভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহা মোটামুটি আমরা সকলেই জানি। এত গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয় মোটামুটি জানিলে কিছু জানা হয় না। সূক্ষ্মভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া জানিলে যথার্থ জানা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার দু'জনারই অনেক ভাব ও অবস্থা আছে। ঠিক কোন্ ভাবে কোন্ অবস্থায় দু'জনে একত্রিত হইলে গৌরস্বরূপতা প্রকট হইতে পারে তাহা একটু নিপুণভাবে অনুধ্যান করিতে সচেষ্ট হইব। রাধাকৃষ্ণের লীলারসের ৬৪ প্রকার ভেদ, এ কথাটা ভক্তমাত্রেরই জানা থাকা ভাল। রসবৃক্ষের দুইটি শাখা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। সম্ভোগ চারপ্রকার—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিমান। এই হইল ৪+৪=৮ প্রকার। এই ৮ প্রকারের প্রত্যেকটিই আবার ৮ প্রকার। অতএব ৮ × ৮ = ৬৪ প্রকারের। প্রত্যেকটিই ৮ প্রকার কী করিয়া হয় ইহা বুঝিতে পারা যায় না। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) পূর্বরাগ ৮ প্রকার; যথা—দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গুণীজনের গান, ভাটমুখে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ, স্বপ্নদর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন ও চিত্রপট দর্শন।

(২) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ ৮ প্রকার; যথা—স্বপ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্রে, বাক্-বিলাপে, ব্রজাগতে, ওদন কৌতুকে, একত্র নিদ্রায়, বিপরীত সম্ভোগ ও স্বাধীনভর্তৃকা। যাহা বলা হইল না, যাহার শুনিতে ইচ্ছা জাগে গুরুমুখে শুনিবেন। এই গেল রসের ভেদ। ইহা ছাড়া নায়িকার ব্যক্তিত্ব ভেদ

৮ প্রকার। শ্রেষ্ঠা নায়িকা শ্রীরাধার ৮টি অবস্থা। ক্রমে বলিতেছি। ইক্ষুরস গাঢ় হইলে গুড় হয়। গুড় গায় হইলে চিনি হয়। চিনি গাড় হইলে মিছরি হয়। সেইরূপ প্রেমবস্তু ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, রূঢ়মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব ও মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণত হয়। স্তর গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ—

প্রেম যখন গাঢ়তর হয় তখন চিত্তরূপ দীপকে উদ্দীপ্ত করে "চিদ্দীপ-দীপনম্" এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করে "হৃদয়ং দ্রাবয়ন্" তখন তাহার নাম 'স্নেহ'। অন্তরে স্নেহ জন্মিলে কৃষ্ণের রূপ দর্শনে কখনও নয়নের তৃপ্তি হয় না।

"কোটি আঁখি নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ দিল কী দেখিব মুই।।"

স্নেহের উদয় হইলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে কর্ণের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আরও শুনিতে সাধ হয়। কৃষ্ণ নাম জপ করিতে রসনার তৃপ্তি হয় না, পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়।

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

এখানে প্রেম স্নেহে পরিণত হইয়াছে। স্নেহ দুই প্রকার—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। ঘৃতস্নেহ শ্রীকৃষ্ণের আদরে কৃতার্থ হইয়া যেন বিগলিত হইয়া যায়। মধুস্নেহ কৃষ্ণের আদরে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়তর হয়। তাহাতে কৃষ্ণের সুখাতিশয্য হয়। ঘৃতস্নেহ স্বয়ং আস্বাদ্য নহে, অন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া আস্বাদ্য। মধুস্নেহ স্বয়ংও আস্বাদ্য, অন্যের সঙ্গে মিলনেও আস্বাদ্য।

মধুস্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইলে নবতর মাধুর্যের উদয় হয়। তখন তাহা কি যেন কি এক অদ্ভুত উপায়ে অতি প্রিয়-প্রেমাস্পদের প্রতি অদাক্ষিণ্য ভাব ধারণ করে! তখন তাহার নাম 'মান'। মানে কৃষ্ণের অত্যাদরেও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়। শেষে তীব্র বিরহদশা উদিত হয়।

"কাঁদিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে হারাইলাম কানুগুণনিধি।।"

মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন বিশ্রম্ভরূপ ধারণ করে তখন বলে 'প্রণয়'। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ অভিন্নমনন। নিজ দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির অভিন্নতা মনে হয়। তখন প্রেমের নাম 'প্রণয়'। প্রগাঢ় প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেহ, প্রাণ, মনের ঐক্যভাবনা হেতু শ্রীরাধার বাহিরের পরিচ্ছদাদিও নীলবর্ণ হয়। অন্তরের ঐক্য যেন বাহিরে ব্যক্ত হয়।

"নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপনে,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয় সনে, ভুজযুগ বন্ধন,
পহিরণ নীল নিচোল।।"

এই প্রণয় গাঢ়তর হইলে তাহার নাম হয় 'রাগ'। অন্তরে রাগের উদয় হইলে প্রিয়তমের জন্য অতিশয় দুঃখও সুখ বলিয়া মনে হয়।

"তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

রাগের গাঢ়তর অবস্থায় নাম 'অনুরাগ'। তখন নিত্য নবায়মান প্রিয়কে নব নব ভাবে আস্বাদনে সাধ জাগে, কেবল সাধ জাগে না—সামর্থ্যের উদয় হয়,

"সেই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিতে, তিলে তিলে নূতন হোয়।"

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য যে কৃষ্ণেরই আছে তাহা নহে। অনুরাগী ভক্তের নয়নের উপর উহা নির্ভরশীল। যেমন অনুরাগ বাড়ে, তেমন সৌন্দর্যও বাড়ে।

"আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।।"

অনুরাগ দশায় আর একটি ঘটে অভিনব ব্যাপার। প্রিয়সঙ্গে মিলনকালে এক কল্পকে এক ক্ষণ বলিয়া মনে হয়। "গত যামিনী জিত দামিনী।" ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপিয়া রাসলীলা হইল গোপীদের মনে হইল বিদ্যুতের মত রাত্রিটা আসিল আর চলিয়া গেল। আবার তদ্বিপরীত, প্রিয়ের বিরহকালে ক্ষণার্দ্ধকে যুগশত বলিয়া মনে হয়। "যুগায়িতং নিমিযেণ।" আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হয় অনুরাগ দশায—যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় তাহাতেও গোপীকার অনিষ্ট আশঙ্কা জাগে। রাসরজনীতে বিরহিণীরা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন—আমাদের কর্কশ স্তনে কৃষ্ণ তোমার কোমল চরণ কমল রাখিলে পাছে তুমি ব্যথা অনুভব কর এই ভয়ে "ভীতাঃ শনৈঃ দধীমহি কর্কশেষু" কত সন্তর্পণে ধীরে বুকের উপর চরণপদ্ম রাখি। আর সেই চরণে তুমি বিচরণ করিতেছ বনে বনে—যেখানে আছে কত শিলাতৃণাঙ্কুর। একথা ভাবিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। তবে কি আমাদের কঠিন বক্ষস্পর্শে কৃষ্ণের চরণতল কঠিন হইয়াছে? অথবা কোমল চরণস্পর্শে বনপথের পাথরখণ্ডগুলি কোমল হইয়া গিয়াছে—এই সকল ভাবনা অনুরাগবতীর লক্ষণ।

অনুরাগ যখন 'স্বয়ংবেদ্যদশা' প্রাপ্ত হইয়া 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি' হয় তখন তাহাকে 'ভাব' বলে। অনুরাগ এমন এক অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, যাহা কেবল নিজের অনুভবের বিষয়—তাই বলিয়াছেন স্বয়ংবেদ্য দশা। আর যতখানি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব সবখানি একই সময় হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তি।

ভাবের উদয় হইলে অন্তরের অবস্থা বাহিরে প্রকাশ পায়। অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, স্তম্ভ ও প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিকভাব বাহিরে প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে অন্তরে ভাব উদিত হইয়াছে।

ভাব গাঢ়তর হইলে মহাভাবে পরিণত হয়। যখন সাত্ত্বিক ভাবগুলি সাধারণভাবে প্রকাশিত হয় তখন রূঢ়মহাভাব। যখন অসাধারণভাবে একই কালে সবগুলি ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় তখন অধিরূঢ় মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাবের ঘনীভূত মূর্তিই শ্রীমতী রাধা। আমাদের দেহ যেমন রক্তমাংসে গঠিত, শ্রীরাধার দেহ সেরূপ নহে। তাঁহার "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।" স্বর্ণালঙ্কারের যেমন সবটাই সোনা—শ্রীরাধার সেইরূপ সবটাই মহাভাব। মাদনাখ্য মহাভাবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ঋণ স্বীকার করেন। জগমোহন শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী শ্রীরাধা।

মাদনাখ্য মহাভাববতী বলিয়াই শ্রীরাধা জগদাকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। প্রগাঢ় মিলন আনন্দ আস্বাদনে মাদনে পরিণত হয়। মাদন সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী। একই মাদনকালে সর্ববিধ ভাবের উদয়।

কোন সাহিত্যের যে প্রধান ব্যক্তি তাহাকে সংস্কৃত সাহিত্যে বলে নায়ক। শ্রেষ্ঠ নায়ক চারি প্রকার হইতে পারে—ধীর-শান্ত, ধীর-উদ্ধত, ধীর-উদাত্ত ও ধীর-ললিত। কোন প্রকার চিত্ত-বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাহার চিত্ত বিকার হয় না তাহাকে বলে ধীর।

"বিকারহেতৌ বিক্রীয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" (কুমারসম্ভব)

সাহিত্যে যে নায়ক তিনি অবশ্যই ধীর ব্যক্তি হইবেন। তাদের চারটি প্রকার (type)– ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ না দিয়া উদাহরণ অর্থে দিব। ধীর-শান্ত নায়ক হইতেছেন শ্রীরামচন্দ্র। ধীর-উদ্ধত নায়ক শ্রীঅর্জুন। ধীর উদাত্ত নায়ক যুধিষ্ঠির। ধীর-ললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। ধীর-ললিত নায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ। ধীর-ললিত নায়কের দেহে মনে এক অপূর্ব লালিত্য মাখানো যাহাতে সকলেরই মন মুগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের লালিত্যছটাকে বলে নব তারুণ্য। লক্ষণে আছে—"বিদগ্ধ নবতারুণ্য-পরিহাস-বিশারদঃ। নিশ্চিন্ত ধীর-ললিতঃ স্যাৎ প্রায়শঃ প্রেয়সীবশঃ।।"

বিদগ্ধ শব্দের অর্থ সর্বপ্রকার কলাকার্যে সুনিপুণ। নবতারুণ্য অর্থ অঙ্গের তরুণতা ও লাবণ্য সর্বদাই নূতন। যখনই দর্শন করা যায় তখনই উজ্জ্বল মনে হয়—তাহাকে বলা হয় নব তারুণ্য। হাস্য-পরিহাসময় বাক্য প্রয়োগে তিনি সর্বদাই সুপটু। নিশ্চিন্ত শব্দের অর্থ হইল যাহার কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা বা উদ্বেগ নাই। তাঁহার যাঁহারা প্রিয় পাত্রী বা প্রেয়সী সর্বদাই তাঁহাদের অনুগত থাকেন। কোন সময় কোন প্রকারে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন না। দেহে মনে প্রাণে সর্বদাই বশীভূত থাকেন। এই রূপ নায়ককে বলে ধীর ললিত নায়ক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এক অভূতপূর্ব লালিত্য দ্বারা নন্দিত। শ্রীরাধা সন্নিধানে এই লালিত্য সর্বাতিশায়ীভাবে বিকশিত হয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা বিহারের কালে শ্রীরাধার ৮ টি অবস্থা প্রকটিত হয়—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীন ভর্তৃকা।

শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য শ্রীরাধিকা যখন আলুথালু বেশে কাহারও বাঁধা না মানিয়া চলিয়া যান তখন তিনি অভিসারিকা।

"ধায় কমলিনী, যেন পাগলিনী,
হাতে বন ফুলমালা।
ভরম শরম, ধরম করম
পাশরে রাজার বালা।।" (হরিকথা)

প্রিয়তম আসিবেন এই ভাবিয়া শ্রীরাধা নিজের দেহ ও কুঞ্জগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনি তখন বাসকসজ্জিকা। বাসকসজ্জার দৃষ্টান্ত শ্রীজয়দেব দিয়াছেন—

"পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।"

অর্থাৎ, পাখী উড়িয়া বসিলে, গাছে পাতা নড়িলেও তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে তোমার পথপানে চাহিতেছেন।

প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে শ্রীরাধা অত্যন্ত উৎসুকা হইয়া থাকেন, তখন তিনি উৎকণ্ঠিতা। উৎকণ্ঠিতা অবস্থায় রাধার অঙ্গে তাপ হয়, গাত্র কম্প হয়। না আসার হেতু চিন্তায় অস্থির হন, বড় দুঃখে অশ্রুপাত হইতে থাকে। কবি জয়দেব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহ দহনবহনেন বহুদূষণম্।।"

অর্থাৎ, অহো তিনি আসিবেন বলিয়া আমি এই বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ কবিলাম, কিন্তু এসব তাঁহারই বিরহানল বহিয়া আসিয়া এখন আমার যন্ত্রণার কারণ হইল।

আসিবার সময় চলিয়া গেল, শ্রীরাধা গভীরভাবে ব্যথিতাজ্বরা, তখন তিনি বিপ্রলব্ধা। তখন তাহার মনের নির্বেদ, খেদ, অশ্রুপাত, ঘন ঘন নিশ্বাস ও মূর্চ্ছা প্রকাশিত হয়।

শ্রীজয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্মর-সমরেচিত-বিরচিতবেশা।
গলিত-কুসুমদর-বিলুলিত-কেশা।।
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা।।"

অর্থাৎ রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুলদল খসিয়া পড়িয়াছে।"

অন্য কোন প্রিয়জনের সহিত মিলনের চিহ্নাদি লইয়া অঙ্গে প্রকাশিত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আসেন। তখন শ্রীরাধার অবস্থার নাম খণ্ডিতা। এই সব লক্ষণ মৌন, ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস। শ্রীজয়দেবের পদ—

"সজল-জলদ-সমুদয়-রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ।
কণকনিকষরুচিশুচিবসনেন
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন।।"

অর্থাৎ সেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন তাহার হৃদয় বিরহভাবে আমার মত বিদলিত হয় না। সেই পীতাম্বরধারী (নিকষে কণকরেখার মত বর্ণরুচিযুক্ত শুচি বসন যিনি পরিধান করেন যাহার সহিত বিহার করিতেছেন, পরিজন পরিহাসে তাহাকে আমার মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না।

নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণে পতিত হন। শ্রীরাধা তখন নিদারুণভাবে উপেক্ষা করেন। অসহ্য ব্যথাতুর কৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া যান। মুহূর্তকাল পরেই শ্রীরাধা নিজের কুঞ্জ অন্ধকার দেখিয়া হায় হায় করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন। শ্রীঅঙ্গে সুতীব্র তাপ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শ্রীরাধা কলহান্তরিতা। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের পদ—

"তোহে কহু মরম কি দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোয়ই
সোই তাপিনী জগমাহ।।
যো হাম মান বহুত করি মানলু কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর তাকর দরশন ন পেখি।।
ধৈরজ লাজ মান মান ময়ে ভৈগেল
জীবন রহত সন্দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ শুন সতি ভামিনী
ঐছন কানুক লেহা।।"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলে শ্রীরাধার অবস্থা তখন প্রোষিতভর্তৃকা, তখন তিনি কৃষ্ণের গুণ-কীর্তন করেন, নিদ্রা ভঙ্গ হয়, দেহ কৃশ হইয়া যায়। দেহ অত্যন্ত মলিন হয়। সবর্কার্যে চিত্তের অনাসক্তি অনাসক্তি ও জড়তা প্রকাশ পায়। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর পদ—

"মনোব্যথা কারে কব, কোথা প্রাণের মাধব,
বৃথা সব তাহার বিহনে।
বৃথা বহি দেহভার, মণিমতি অলঙ্কার,
ভার বোধ হইতেছে মনে।।
যথা বাঁকা সখা আছে, সব শোভা তার কাছে,
এ সকল রহে অকারণে,
শুনল সজনীগণ, বুঝি নিকট মরণ,
মোরে লয়ে চল নিধুবনে।।
যমুনা তটিনীকূলে, কেলি কদম্বের মূলে,
মোরে লয়ে চলল ত্বরায়
অন্তিমের বন্ধু হয়ে, যমুনা-মৃত্তিকা লয়ে,
সখী মোর লিপ সর্বগায়।।
শ্যামনাম তদুপরি, লিখ সব সহচরী,
তুলসী মঞ্জরী দিও তায়
আমারে বেষ্টন করি, বল সবে হরি হরি,
যখন পরাণ বাহিরায়।।"

কখনও কখনও বিনা কারণে শ্রীরাধা দুর্জয় মানবতী হন। তখন তিনি স্বাধীনভর্তৃকা। শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তির মূর্তি। সকল শক্তিরই স্বাধীনতায় পূর্ণ বিকাশ হয়। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধায় তখন হ্লাদিনীশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়, কোন রূপ বাধা থাকে না। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ আদেশ করেন। বলেন, আমার বসন ভূষণ আলুলায়িত হইয়াছে—তুমি আমাকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া দাও, আমার জন্য পুষ্পাদি চয়ন কর। মালা গাঁথিয়া পরাও। এই

সব কার্য তখন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে করেন। রাধার চরণতলে আত্মপ্রদান ও তাহার পাশে পাশে নিজ নাম লেখেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন ধীরললিত নায়ক, সর্বতোভাবে প্রেয়সী-বশ। একজনার পূর্ণ স্বাধীনতা আর একজনার পূর্ণ বৈশ্যতা। এই অবস্থায় তিনি রাধা-কবলিত হইয়া গৌর হন। মানুষ আত্মহারা হইলে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজত্ব হইল ভগবত্তা। ভগবত্তা-শূন্য হইলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাধিক মধুর। যেন একেবারে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থাতেই তিনি শ্রীরাধার চরণ বক্ষে ধরিয়া মানভঞ্জন করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে পারেন। জয়দেবের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মুখোক্ত—"দেহি পদপল্লবমুদারম্" কথাটি উচ্চারিত। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্ত শ্লোকটি এই—শ্রীজয়দেবের ভাষায় "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্। জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিত বিকারম্।।" হে প্রিয়ে! কামবিষ বিনাশক আমার শিরোভূষণ তোমার ঐ পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনানলে জ্বলিতেছে, তোমার চরণস্পর্শ সে বিকার বিদূরিত করুক।

এমন একটি সুন্দরতম ভগবানের রূপ এই জগতে অদ্যাপি কেহ দর্শন করে নাই। কোন শাস্ত্রকার কোথাও বর্ণনা করেন নাই। কোন সাহিত্যিকের লেখাতে ফোটে নাই। এই দৈন্য ও বিষাদময় ভগবানের রূপটি আমরা দর্শন করিয়াছি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।

মাদনাখ্য মহাভাব সম্বন্ধে আরো দু'-একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। প্রেম গাঢ় অবস্থায় কী হয় তাহা ভাষার দ্বারা বলা যায় না। অতি গভীরভাবে অনুভববেদ্য। ঐ অবস্থায় একটি দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) কোন সখী নিজ হাতে একটি অতি সুন্দর দীর্ঘ মালা গাঁথিয়াছেন, সেই মালাটি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে দুলিতেছে। মালাটি চরণাবধি দীর্ঘ। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছেন, গলায় মালাটি দুলিতেছে। তাহা দর্শন করিয়া সকলেরই পরমানন্দ হইতেছে। শ্রীরাধারও পরমানন্দ দর্শনে। কিন্তু মহাভাবাবিষ্ট শ্রীরাধার ঐ আনন্দ-সমুদ্রের মধ্যেই একটা ঈর্ষার উদয় হইয়াছে। ঈর্ষা কোন মানুষের উপরে নাই, বড় মালাটার উপরে। শ্রীরাধা মালার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মনে মনে মালাটিকে বলিতেছেন—

মালা রে! তোর তো মহা সৌভাগ্য। ঐ মধুর কণ্ঠের সঙ্গে দোলায়মান থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে শ্যামসুন্দরের পরম স্নেহময় বক্ষের পরশ পাইতেছ। ঐ পরশের দুর্দমনীয় উল্লাসে তুমি ভরপুর। প্রতি মুহূর্তে শ্যামের দুইটি চরণ চুম্বন করিয়া আনন্দ সহকারে ডুবুরি হইয়াছ। তোমার কত আনন্দ! যতই ভাবি ততই আমার হৃদয়ে গাঢ় ঈর্ষা জাগে। তুমি যে আনন্দ পাইতেছ ইহা সর্বতোভাবে আমার প্রাপ্য। আমার নিকট হইতে না বলিয়া না চাহিয়া আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া ভোগ করিতেছ। ইহা আমার পক্ষে অসহনীয়। আমার সম্মুখে স্থিত হইয়া তুমি যে দুলিয়া দুলিয়া রস অনুভব করিতেছ তাহাতে কি তোমার সংকোচ হইতেছে না। তোমার এই সংকোচহীন প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আমি যে কিরূপ বিষময় বেদনা অনুভব করিতেছি তাহা তুমি বুঝিবে না।

মালাদর্শনে শ্রীরাধার যে, ঈর্ষাপূর্ণ ব্যথা ইহাই আর কোথাও সম্ভব হয় না। এই মালাঈর্ষা

মহাভাবময়ী শ্রীরাধার একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এই কথা বলা বাহুল্য যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের এই যে মান, অভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইহা কিছুই প্রাকৃত জগতের মত রজঃ বা তমোগুণময় নহে। সবই শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়। অতি মধুর রসসিক্ত দুগ্ধ হইতে ক্ষীর তৈরী করিয়া সেই ক্ষীরের দ্বারা যদি তিক্ত ফল অম্ল ফল বা কটু ফল তৈরী করিলে তাহাদের প্রত্যেকের আস্বাদই ক্ষীরের মত হইবে। তিক্ত, অম্ল বা কটু হইবে না। সকলই সুস্বাদু ক্ষীরের মত হইবে।

মাদনাখ্য মহাভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত (২) ব্রজবাসিনী কয়েকটি পুলিন্দ রমণী বনে বিচরণ করিতেছে। পুলিন্দ শবরী এক প্রকার বন্য জাতি। ইহাদের কোন অক্ষরবিদ্যা নাই। কিন্তু হৃদয়ের অনুভব আছে। অনেক গভীর অনুভবই আছে। রামভক্ত শবরীর কথা সকলেই জানে। শবরীর মত পুলিন্দও একটি বন্য জাতি।

একটি পুলিন্দ রমণী বনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহার বদনে মাখা কুমকুম। এই কুমকমের গন্ধ পাইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—অহো! এই কুমকুম শ্রীকৃষ্ণের বক্ষপিষ্ট। জানি না শ্রীকৃষ্ণের পেযণে কোন রমণীর বক্ষ হইতে উহা পড়িয়া গিয়াছে। আবার ঐ পুলিন্দ রমণী ভূমিতল হইতে তাহা তুলিয়া নিজ বদনে মার্জন করিয়াছে। উহার গন্ধে আমার দেহ নাচিতেছে এবং ঐ পুলিন্দ রমণীর সৌভাগ্য দর্শনে আমার হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে।

(৩) পথের পাশে একটি স্বর্ণলতা একটি তমালবৃক্ষকে জড়াইয়া জড়াইয়া ক্রমে বাড়িতেছে। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র শ্রীরাধার অন্তরে একটি ভাবউল্লাস দেখা গেল, লতাকে বলিতেছেন—তুই তো মহাভাগ্যবতী, এই ভাগ্য আমার হইল কৈ। তুই সর্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে তাকাইয়া ঊর্দ্ধপানে উঠিতেছিস্। তোর সৌভাগ্যের পরিসীমা আমার কবে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তোকে টানছেন আর তুই তাঁর দিকে চলছিস্। এই ভাগ্য যদি আমার কখনও হয়। হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কারণ আমি যে ভাগ্যহত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিতা।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে একটু গভীরভাবে ধ্যান দিলে মাদনাখ্য মহাভাবময়ীর হৃদয়ের কিঞ্চিৎ স্পর্শ অনুভব হইবে, সহৃদয় সাধকের অন্তরে।

মাদনাখ্য মহাভাব অনুরাগের গাঢ়তম অবস্থা। এই নিবন্ধে গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম শব্দগুলি কয়েকবার ব্যবহার হইয়াছে গাঢ়ত্ব অবস্থাটি একটু বোঝা দরকার গাঢ়ত্ব হইল অন্য বস্তুর প্রবেশের অবকাশ-রাহিত্য। জল গাঢ় নহে, তাহার ভিতরে হাত ঢুকানো যায়। মাটির মধ্যে হাত ঢুকানো যায় না। সরু কঞ্চি ঢুকানো যায়। একখানা কাঠের মধ্যে কঞ্চি ঢুকানো যায় না কিন্তু একটি পেরেক ঢুকানো যায়। একটি লোহার বলের মধ্যে পেরেকও ঢুকানো যায় না। ইহা হইল গাঢ়, গাঢ়তর এবং গাঢ়তমের দৃষ্টান্ত। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যখন কৃষ্ণ চিন্তা প্রবেশ করে তখন অনেক চিন্তা প্রবেশ করে। ধ্রুব, প্রহ্লাদের মত ভক্ত যখন কৃষ্ণ চিন্তা করে তার মধ্যে বাজে চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। প্রহ্লাদের মনে মধ্যে হয়ত হিরণ্যকশিপুর কঠোর নির্দেশের কথা একটু মনে হইতে পারে। ধ্রুবেরও হয়ত রাজসিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা একটু জাগিতে পারে। কিন্তু শ্রীরাধার কৃষ্ণচিন্তার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। যখন তিনি কৃষ্ণের রূপ চিন্তা করেন তখন তাহার মধ্যে কৃষ্ণের গুণের চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। যখন গুণের চিন্তা

করেন তখন মহিমার চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই হইল মাদনাখ্য মহাভাবের গাঢ়তমতা। অন্য কিছু প্রবেশের অবকাশের সম্পূর্ণ শূন্যতা।

এই মধুর নামক মহাভাবের মধ্যে একবারে সবগুলি ভাবের উদয় হয়। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি সবগুলি ভাবের এক সঙ্গে উদয় হয়। অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয়। মাদনাখ্য মহাভাবময়ী রাধার প্রেমসিন্ধুর ব্যাপকতা ও উদ্দামময়তা ও গভীরতা সীমাহীন। এই অবস্থাটি একমাত্র রাধাতেই আছে। শ্রীকৃষ্ণেতে নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মহাভাবের মধ্যে থৈ পান না, নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। এই অবস্থাটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমতম মিলনেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ।

* * *

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কথা কিছু বলা হইল। এখন উভয়ের প্রেমবিলাসের কথা কিছু বলিব। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রগাঢ় প্রেম-উদ্ভূত যে ক্রিয়া তাহাকে বলে প্রেমবিলাস। এই বিলাসে পরিপূর্ণ বা চরম পরিপাক অবস্থায় একটি অদ্ভুতভাবের উদয় হয়। এই ভাবটিকে বলে বিপরীত। বিপরীতের আর একটি প্রতিশব্দ বিবর্ত। শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়াবিহার যখন প্রেমবিলাসভূমিতে বিরাজিত তখনই গৌরসুন্দরের প্রকটন। বিবর্ত কথাটিকে আর একটু পরিষ্কার করিতেছি। একটা আম যতক্ষণ কাঁচা থাকে সে আমের শাখায় লাগিয়া থাকে, তখন তার বর্ণ থাকে সবুজ। যখন খুব পরিপক্ক হয় তখন সে গাছ হইতে খসিয়া পড়ে, তখন বর্ণটা হয় হলুদবর্ণ। এই গাছ হইতে পড়া সুন্দর হলুদ বর্ণ আমটাকে আমরা যদি বলি আমটির বিবর্ত অবস্থা তদ্রূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিলাস বিবর্ত বলিব তখনই যখন দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। একটি লক্ষণ ভ্রান্তি আর একটি লক্ষণ বৈপরীত্য। আমটির যেমন বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতন ও হলুদ বর্ণ ধারণ। দৃষ্টান্তটা খুব ভাল না হইলেও কিছু প্রকাশ হইল। আরও বিশদ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে করুন দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। দুইজনে অতি ভদ্র ঘরের সন্তান। হঠাৎ কোন বিষয় লইয়া একটা কথান্তর হওয়ায় দুইজনেই ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগালি করিতে লাগিল। ক্রমে গালাগালি হাতাহাতি ও ভীষণ মারামারিতে পৌঁছিল, তাহাদের মারামারি নিতান্তই ভদ্রতা বিরুদ্ধ। তাহারা দু'জনে যে ভদ্রলোক ভদ্রসন্তান ইহা তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। এইটি বলিলাম ভ্রম। তাহারা দু'জনেই ভ্রমে পতিত। তখন আছে কী—তখন আছে একটা স্বরূপ-ভ্রষ্টতা আর একটা মূর্তিমন্ত ক্রোধের বিদ্যমানতা। কতকটা এইরূপ যখন রাধাকৃষ্ণ বিলাসের প্রগাঢ়তায় তাহারা স্বরূপ হারাইয়া ফেলেন, কে রমণী সে তাহা একেবারে ভুলিয়া যান। থাকে শুধু বিলাসের উদ্দামতা তখন বলিব বিবর্তবিলাস। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর গৌরসুন্দরের সঙ্গে রসতত্ত্ব ও বিলাস মহত্ত্ব কথা বলিতে বলিতে নিজকৃত একটি গান শুনাইয়াছিলেন—মহাপ্রভুকে গানটির মধ্যে একটি পংক্তি আছে—

"ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি।।"

এই পংক্তি শুনিয়াই মহাপ্রভু রামানন্দের মুখ ঢাকিয়া দিলেন, আর শুনিতে চাহিলেন না। যাহা

শুনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা যেন শোনা কথা, শোনা হইয়া গিয়াছে। বিষয়টির তাৎপর্য এইরূপ পূর্বদৃষ্টান্তে যেমন ভদ্রলোক দুইজন যে ভদ্রলোক, ভদ্রসন্তান ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, ছিল শুধু মূর্ত ক্রোধ। এখানেও রাধাকৃষ্ণ দু'জনের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, রমণ ও রমণী, ভোক্তা ও ভোগ্য, আশ্রয় ও বিষয় ইহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছে—আছে মাত্র পরম মাহাত্ম্যপূর্ণ মাধুর্যঘন বিলাস। শুধু বিলাসই আছে—পাত্র দু'টি যেন বিলাস-সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দুই তলাইয়া গিয়াছে বিলাস তলস্পর্শী মাধুর্যসিন্ধুর তলদেশে। আছে শুধু 'রস' নামক একটি বস্তু যে রস শব্দটির দ্বারা শ্রুতি পরব্রহ্মের লীলাপুরুষোত্তমের পরম পরিচয় দিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"।

রাধাগোবিন্দের বিলাসের মূল স্বরূপ হইতেছে পরস্পরের প্রীতি ইচ্ছা। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা শূন্যতে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছাই সমুজ্জ্বল ভাবে বিরাজিত আছে। এই মূর্ত রস বস্তুটিই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। বিলাস-বিবর্তে তাহা প্রকট হইল। পাছে ধর পড়িয়া যান এই জন্যই মুখ চাপিয়া ধরিলেন। পরে যখন গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন তখনও দেখিলেন রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। দুই আর দুই নাই দুই এক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে দুইয়ের বিলাসময় স্বরূপ সত্তা বিরাজমান আছে।

প্রথমে যে শ্রীরূপ গোস্বামী একটি শ্লোক দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে "নির্ধূত-ভেদভ্রমাৎ" যুগলের মধ্যে যে একজন রমণ আর একজন রমণী এই ভেদজ্ঞান রূপ একটা ভ্রম আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে—নির্ধূত হইয়া গিয়াছে। নিঃশেষে ধৌত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরূপ বলিয়াছেন, এই কাজটি করিয়াছে 'শৃঙ্গার' রস নামক একজন কারুকার্যবিদ্। রামানন্দ রায় তাঁহার রচিত গানে বলিয়াছেন মনোভাব ঐ কারুকৃৎ ও এই মনোভাব একজনই।

বিলাসবিবর্তে শ্রীরাধারাণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-কবলিত। কবলিত অর্থ সর্বতোভাবে নিঃশেষে আত্মসাৎকৃত। এই স্বরূপটি শ্রীশ্রীগৌরহরি। ❑

নব যোগেন্দ্র সংবাদ

ভগবান্ মনুর বংশে বহু মনীযী জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে তপস্বী ঋষভদেব নাম উল্লেখযোগ্য। ঋষভ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার। পূর্ণাবতারের থাকে অনেক কাজ। অংশাবতারদের একটি মাত্র কাজ পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ানো—দীন-হীনের দুঃখ দূর করিতে। ঋষভও জগতে ভাগবতধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই ঋষভের বংশেই জন্মেন ভরত, যাঁর নাম হইতে ভারতবর্ষ।

ঋষভের সন্তানগণের মধ্যে নয় জনের নাম বিখ্যাত। কবি হরি অন্তরিক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রমিল চমস ও করভাজন। ইঁহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ। জীবের কল্যাণের জন্য ইহারা পৃথিবী পর্যটন করিতেন। নিমি মহারাজ একটি যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। একদিন কবি প্রভৃতি নয় জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন নিমি মহারাজের যজ্ঞস্থলে।

নিমি মহারাজ তাঁহাদিগকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, আপনাদের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনাদের দর্শন মোক্ষপ্রদ। শুধু তাহাই নহে, আপনাদের দুর্লভ দর্শন ফলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয়। আপনাদের পবিত্র দর্শন মানেই আমার জন্মজন্মান্তরের সকল পাপ চলিয়া গিয়াছে। তবু মনে এক বাসনা আছে। কী বাসনা তাহা বলিতেছি।

আপনাদিগকে প্রথমে বিশ্রাম করিতে বলা উচিত। কিন্তু মন মানিতেছে না। হাতের কাছে রত্ন পাইলে কেহ কি তাহা তুলিয়া নিতে বিলম্ব করে? আপনারা তো আর চিরকাল আমার কাছে থাকিবেন না। যতটুকু সময় থাকেন, তাহারই সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য। আপনারা আমায় ভাগবতধর্মের কথা বলুন অবশ্য যদি মনে করেন আমার কর্ণ আপনাদের কথা শোনার যোগ্য। মহারাজ নিমির জিজ্ঞাসায় পরম প্রীত হইয়া প্রথমে ভাগবত-বীর্যের মহিমা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, মহারাজ! সংসারের সকল ধর্ম-কর্মই ভয়যুক্ত। সকল কর্মের পালনেও কর্মকৃত বৈগুণ্যের সম্ভাবনা। একমাত্র ভাগবতধর্মই সর্বপ্রকার ভয়মুক্ত। কথাটা ভাল কবিয়া বলি।

সাধারণতঃ জগতের নরনারী ক্ষণভঙ্গুর বস্তু-সকলের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। যেমন নিজের ও আত্মীয় স্বজনের দেহ ও ধনসম্পদ্। এসব অনিত্য বস্তু। ইহাদের নাশ অবশ্যম্ভাবী। ঐ সকল বস্তুর নাশ হইলে উহাতে আশাযুক্ত ব্যক্তিগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা ভাগবতধর্ম আচরণ করেন—যাঁহাদের মনঃপ্রাণ শ্রীহরির চরণে সর্বদা সংলগ্ন তাঁহারা সকলে প্রায় উদ্বেগমুক্ত। বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের কথা ভগবান্ শ্রীহরি মহর্ষিগণের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন—কিন্তু ভাগবত ধর্মের কথা নিজমুখেই বলি কারণ, উহা অতীব রহস্যময়। এই ধর্ম আচরণে বিজ্ঞ ব্যক্তির কথাই নাই—অবিজ্ঞ পতিতগণেরও পরম কল্যাণ হয়। এই ধর্মের মাহাত্ম্য অসীম। এই ধর্মে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারাই ভক্তিমান্ হয়েন—যাঁহারা আচরণ করেন তাঁহাদের কথা আর কী বলিব।

যাঁহারা কর্মপথের পথিক বা যোগপথের পথিক তাঁহাদের অন্তরে সামান্য কারণেই অহংকারের উদয় হয়। অহংকার ফলে তাহাদের সাধনসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু ভাগবতধর্মের আশ্রয় লইলে কোনও প্রকার প্রমাদে পড়িতে হয় না। এই ধর্ম সর্ববিধ বিঘ্নবিহীন। আর ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ চক্ষু খুলিয়াই চলুন আর চক্ষু বুজিয়াই চলুন—ইঁহাদের পদস্খলন কখনও হয় না। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়—যিনি কোন রাস্তা ঠিকভাবে চেনেন তিনি পথিককে বলেন—এই পথে চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যান—ঠিক পৌঁছিয়া যাইবেন যথাস্থানে। ভাগবতধর্ম সম্বন্ধেও শাস্ত্রকার সেইরূপ বলেন। যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানকারীর সামান্য ত্রুটি ঘটিলে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়। যোগীর যোগধ্যানে সামান্য বিচ্যুতি ফলে যোগভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ভক্তিপথে তাহা হয় না। ভজনীয় ধর্মের বিহিত কোন অঙ্গভঙ্গে ভক্তের পাপ হয় না। ভগবৎপ্রীতিরূপ ফল হইতে বঞ্চিত হয় না। তাৎপর্য এই যে, ভক্তিমার্গের সাধকের জ্ঞাতসারেও বিধিনিষেধ পরিহারে দোষ হয় না। অজ্ঞাতসারে বিধিনিষেধ না মানিলে তো হয়ই না। ভাগবত ধর্মে নিষ্ঠাবান সাধকের বর্ণাশ্রমাদি আচার অনুষ্ঠানের তত প্রয়োজন হয় না। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করা কর্তব্য। ❑

রাগ

প্রণয়ের উৎকর্ষাবস্থার নাম রাগ। প্রণয় হইলে প্রিয়জনের সহিত নিজের অভিন্নতা বুদ্ধি হয়। নিজের পা নিজের গায়ে লাগিলে যেমন কোন উদ্বেগ হয় না—প্রণয়াবস্থায় নিজের পা প্রিয়জনের গায়ে লাগিলেও সেইরূপ কোন উদ্বেগ হয় না। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজে খাইতে যেমন কোন সঙ্কোচ হয় না, নিজের উচ্ছিষ্ট প্রিয়জনকে দিতেও সেইরূপ কোন সঙ্কোচ আসে না। এই প্রণয়বশতঃই সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠিতে পারেন ও উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে পারেন। এই প্রণয় বশতঃই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণে আলতা পরাইয়া দিলে তাঁহার তাহাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় না।

রাগের লক্ষণ শ্রীরূপ বলিয়াছেন, প্রণয়ের উৎকর্ষতা বশতঃ যে-স্থলে চিত্তে অতি দুঃখকেও অতি সুখরূপে মনে করায় তাহার নাম রাগ। যে-দুঃখ বরণ করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা থাকে সেই দুঃখও সুখ বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে সুখকেও দুঃখ বলিয়া মনে হয়। এই রূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে রাগের উদয় হইয়াছে।

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।" (চণ্ডীদাস)

শ্রীরূপ গোস্বামী রাগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে—

"তীব্রার্কদ্যুতি-দীপিতৈ-রসিলতাধারাকরালাশ্রিভিঃ
মার্ত্তণ্ডোপলমণ্ডলৈঃ স্থপুটিতেঽপ্যদ্রেস্তটে তস্থুষী।
পশ্যন্তী পশুপেন্দ্রনন্দনমসাবিন্দীবরৈরাস্তৃতে
তল্পেন্যস্তপদাম্বুজমেব মুদিতা ন স্পন্দতে রাধিকা।।"

গ্রীষ্মকাল। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন। কৃষ্ণদর্শন-লালসায় আকুল শ্রীরাধা সখীগণের সঙ্গে দিবায় অভিসার করিয়াছেন। গিরি গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন না। অনুমান করিলেন গোবর্দ্ধনের অপর পার্শ্বে আছেন। দর্শন করিবার জন্য গিরি রাজের ওপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন নীচে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। অনিমিষে রূপ দেখিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরাধার পায়ের নীচে পর্বত সূর্যতাপে আগুনের মত গরম। পাথরের খণ্ডগুলিও আগুনের মত। পাথরগুলির পার্শ্ব তরবারির মত ধারাল। কোণগুলি সুতীক্ষ্ণ। এত যে কষ্ট সে বিষয় শ্রীরাধার অনুসন্ধান নাই। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া এক সখী অপর সখীকে বলিতেছেন—দেখ সখী! শ্রীরাধা মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্যতাপে তপ্ত গোবর্ধনের ওপর হাঁটিয়া এবং খড়্গাতুল্য ভয়ঙ্কর অগ্রভাগযুক্ত প্রস্তরের ওপর দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। তাহাতে এমনই আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পদ্মপলাশ রচিত শয্যায় পাদপদ্ম দিয়াই যেন পরম সুখে একবিন্দু

নড়িতেছেন না।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেছেন এই হেতু শ্রীরাধা অতি তপ্ত ও তীক্ষ্ণ পাহাড়ের শিলার ওপর দাঁড়াইবার নিদারুণ দুঃখকেও সুখ মনে করিতেছেন। যদি বলা যায় এখন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে পায়ের কষ্টের বোধ নাই, পরে বোধ হইবে—তাহাও নহে। পরেও তিনি শ্রীচরণের কষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র আহা-উঁহু করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের সহায়ক হইয়াছে বলিয়া উহাকে তিনি সুখই মনে করিবেন।

এই শ্লোকে শ্রীরাধা যে দৈহিক দুঃখকে সুখ মনে করেন এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মানসিক দুঃখকেও যে সুখ মনে করেন এই মর্মে আর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"তারাভিসারক! চতুর্থ-নিশাশশাঙ্ক-
কামাম্বুরাশি-পরিবর্দ্ধনদেব! তুভ্যম্।
অর্ঘো-নমো ভবতু মে সহ তেন না
মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ।।"

রাগবতী এক গোপী ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথির চাঁদের কাছে প্রার্থনা করিতেছে—হে তারাভিসারক চন্দ্র! তোমাকে পূজা দিতেছি—তুমি এই কর যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার মিথ্যা অপবাদ রটে। ভাদ্রের চতুর্থীর চাঁদকে বলে নষ্ট চন্দ্র। ঐ চন্দ্র দর্শনে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। তাই গোপী প্রার্থনা করিতেছে—শ্রীকৃষ্ণ আমার দয়িত, আমি দয়িতা—এই রূপ একটা মিথ্যাপবাদ রটুক। সাক্ষাতে তাকে পাইবার আশা তো নাই-ই। যদি ঐরূপ একটা কলঙ্কেরও পাত্রী হই তা হইলেও নিজেকে ধন্য মনে করি। মিথ্যাপবাদ মানসিক দুঃখের হেতু; গোপী তাহাই যাচ্ঞা করিতেছে। মিথ্যা কলঙ্কের হার গলায় পরিতে চাহিতেছে। ইহাতে রাগের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত। মানসিক ক্লেশদায়ক ভীষণ পীড়াদায়ক অবস্থা পাইবার জন্য অত্যাগ্রহ দৃষ্ট হয়।

রাগ দ্বিবিধ—নালিরাগ ও মাঞ্জিষ্ঠ রাগ।

চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণে নালিরাগ। শ্রীরাধা ও গোবিন্দে মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। যে-রাগে ব্যয় সম্ভাবনা নাই, কখনও কমে না, বাহিরে বেশি ব্যক্ত হয় না, স্বলগ্ন আবরক—তাহা নালি রাগ। শ্রীরূপচরণ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"প্রসন্নবিশদাশয়া বিবিধমুদ্রয়া নির্মিতং
প্রতারণমপি ত্বয়াগুণতয়া সদ্‌গৃহ্নতী।
তথা ব্যাজহার সা ব্রজকুলেন্দ্র! চন্দ্রাবলী
সখাভিরপি তর্কিতা ত্বয়ি যথা তটস্থেত্যসৌ।।"

চন্দ্রাবলীর এক সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন— "হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! তুমি অনেক সময় নানা ভঙ্গী করিয়া চন্দ্রাবলীকে প্রতারণা কর। কিন্তু চন্দ্রাবলী সেই প্রতারণাকে তোমার একটি গুণ বলিয়া মনে করে। কারণ আমার সখী সদাপ্রসন্ন ও নির্মলচিত্ত। কাহারও দোষ লয় না। তোমার দোষকেও গুণ মনে করে। প্রতারণা বাক্যকে বৈদগ্ধ্য রূপ গুণ মনে করেন এবং সেই মত ব্যবহার করে।

প্রিয়জনের প্রতারণা বাক্যে দুঃখ হওয়া উচিত। চন্দ্রাবলী রাগবশতঃ সেই দুঃখকে সুখ মনে করেন। প্রতারণার দুঃখকে চন্দ্রাবলীর প্রীতির উৎকর্ষতা ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ। সুতরাং সংলগ্নভাবের আবরক হইল। চন্দ্রাবলীর ব্যবহার দেখিয়া মনে করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণতে তটস্থ উদাসীন। ইহাতে বোঝা গেল প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ হয় না।

"অহার্যোঽনন্যসাপেক্ষো যৎ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা।।"

যে-রাগ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না, যে-রাগ অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষায় থাকে না, যে সর্বদাই বাড়ে, স্বকীয় করিতেই বাড়ে, তাহার নাম মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। শ্রীরাধা-মাধবের মধ্যে এই রাগ বিদ্যমান। ❐

পুরাণ পুরুষের বয়স

শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্বলোক-নমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্।।" শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৮/১৭

পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ হইতেছেন পুরাণ পুরুষ। তাঁর বয়সের আদি অন্ত কিছু নাই। মানুষের দেহে যে সকল বয়সের ধর্ম প্রকাশ পায় তাহা কৃষ্ণের হয় না। শ্রুতি পরব্রহ্মকে 'অজর' জরাবর্জিত বলিয়াছেন। তাঁহাতে জরা বার্ধক্য নাই। গোপালতাপনী উপনিষদ্ বলিয়াছেন পরব্রহ্ম নিত্য তরুণ।

"গোপবেশমভ্রাবং তরুণং কল্পদ্রুমস্থিতম্।"

নিত্যকাল তিনি নিত্যকিশোর। কৈশোরে অর্থাৎ পঞ্চদশবর্ষ বয়সে যেরূপ সৌকুমার্য থাকে সে সকল শ্রীকৃষ্ণদেহে সততই বিরাজমান। অবিকৃতভাবে স্থিত।

লীলাবৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হন তখন তিনি মা যশোদার কোলে বালগোপাল। সখাগণ সঙ্গে গোচারণাদি লীলায় তিনি পৌগণ্ড। বাল্য ও পৌগণ্ডের অবসানে প্রকটলীলায় সর্বত্র তিনি কৈশোরে অবস্থিত। এই বাল্য ও পৌগণ্ড দুইটি বয়সের বিষয় কিঞ্চিৎ অনুধাবনীয়।

বাল্য ও পৌগণ্ড এই দুইটি বয়সকে ভক্তসাধকগণ বলেন বয়োধর্ম। ধর্মী আর ধর্ম দুইটি কথা। জল ধর্মী আর শীতলতা তার ধর্ম। ধর্মী অপরিবর্তনীয় থাকিয়াও ধর্মের পরিবর্তন হইতে পারে।. যেমন গরম জল। জল স্বভাবত গরম নহে। সূর্যের তাপ বা অগ্নির তাপ জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গরম করে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই নিত্য কিশোর, বাৎসল্য রস ও সখ্য রস এই দুই রসের স্রোতস্বিনীতে যখন তিনি অবগাহন করেন তখন ধর্মের পরিবর্তন হয়। ধর্মী কিন্তু ঠিকই থাকে। যশোদার বাৎসল্য রসের মধ্যে নামিলেই তিনি বালগোপাল হইয়া যান। শ্রীদামের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেই তিনি পৌগণ্ড হইয়া যান। ঐ দুই রসের সন্নিধানতা না

থাকিলে তিনি নবকিশোর। এই পরিবর্তন দণ্ডে হইতে পারে, মুহূর্তে মুহূর্তেও হইতে পারে।

শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে আছে আকাশে মেঘ ঘনীভূত, বনানী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। নন্দ বাবার কোলে গোপাল। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতেছেন প্রবল বৃষ্টির ভয়ে। কিন্তু গাভীগুলিও মাঠে চরিতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি আসিলে তাহারাও ভিজিয়া যাইবে। নন্দবাবা চিন্তাতুর। গোপাল আর গাভী কাকে রক্ষা করিবেন। সেই সময় অতি নিকটবর্তী পথ ধরিয়া যাইতেছেন শ্রীরাধারাণী। নন্দরাজ শ্রীরাধাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি গোপালকে গৃহে লইয়া যাও। আমি গাভীগুলি লইয়া আসিতেছি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দগৃহে গেলেন না। গেলেন যমুনা তীরবর্তী কুঞ্জগৃহে। সেখানে রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াবিলাস (রহঃকেলয়ঃ) আরম্ভ হইল। বুঝা গেল নিত্য কিশোর শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড দু'টি বয়োধর্ম।

বাৎসল্য রসে বাল্যই অনুকূল। সখ্যরসে পৌগণ্ড অনুকূল। মধুর রসে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বাল্য (বাল্যকে কৌমারও বলে), দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর।

বাৎসল্য ও সখ্যরসের বৈচিত্রী বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্য 'কৈশোর' বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বয়শ্চ তচ্ছৈশব-শোভয়া শ্রিতম্
সদা তথা যৌবনলীলদৃতম্।
মনোজ্ঞ-কৈশোরদশাবলম্বিতম্
প্রতিক্ষণং নূতন-নূতনগুণৈঃ।।"

পরমাশ্চর্য শৈশব শোভা বিশিষ্ট, যৌবনলীলা দ্বারা আদৃত। মনোজ্ঞ কৈশোর দশা দ্বারা অবলম্বিত প্রতি ক্ষণে নূতন হইতে নূতন রূপে প্রতিভাত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহাকে দর্শনকারীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি লাভ করে না।

"তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে কোটি গুণ।"

এতাদৃশ অত্যদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের বয়স। ❐

'ব্রজগীতিকা'—অবতরণিকা

ব্রজগীতিকা একটি অভিনব সাহিত্য। সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য। মানুষের সহিত মানুষকে যে-গ্রন্থ মিলন ঘটাইয়া দেয় তাহাই সাহিত্য।

মন থাকিলেই মানুষ। মনের মধ্যে আছে কতগুলি ভাব। সুখ-দুঃখ চিন্তা-ভাবনা, স্নেহ-প্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরোপকার করার বাসনা, পরকে পীড়ন করার বুদ্ধি এই ভাবগুলি অল্পবিস্তর সকল মানুষেরই আছে।

* *'ব্রজগীতিকা' (১ম ও ২য় একত্রে) শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্ত। ট্রাস্ট। রাজ সংস্করণ, ১৯৯৮*

আমার অন্তরের ভাবগুলি আপনার অন্তরের ভাবগুলির সঙ্গে সাহিত্যই নিকটবর্তিতা ঘটায়। রামকৃষ্ণ-কথামৃত একখানি সাহিত্য। খুলিয়া পড়িলাম একটি মাত্র পংক্তি—"যত মত তত পথ।' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অসংখ্য প্রকারের মানুষের সঙ্গে আমার একটা যোগ ঘটিয়া গেল।

মনে হইল আপনি পথ চলেন কতগুলি ধারণা লইয়া। আপনার মত আমিও কতগুলি চিন্তাভাবনা লইয়া চলি। আপনার গুলি আপনার মত, আমার গুলি আমার মত। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি মতই তাহাকে কোন একটি পথের সন্ধান দেয়। আপনার যে মত তাহা যদি আমার সঙ্গে মিলিয়া যায় তাহা হইলে আমি যেন একটু বড় হইয়া যাই। আপনি যেন আপন হইয়া যান। যে-সব কথায় আপনার হাসি পায় বা দুঃখ হয় সে-সব কথায় আমারও প্রায় সেইরূপ হয়। এইটি হইল সাহিত্য, যা আপনার সঙ্গে আমার নিকটবর্তিতা ঘটায়। এরূপ যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে একটা উদারতার একত্ব হয়। যতই মানুষের চিত্তের ভাবের সঙ্গে আমার একাত্মতা হইয়া যায়, ততই যেন আমি বড় হই। যার যে মত তার মধ্যেই যেন একটা চলার পথের খবর পাই। 'যত মত তত পথ' কথাটা আমাকে বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া দেয়। এই বন্ধুত্ব ঘটাইয়াছিল যে মতগুলি, সেগুলি আমাদের মধ্যে একত্ব বা সাহিত্য আনিল। এই কথাগুলির নাম সাহিত্য।

যদি মতগুলি বিরোধী হয়, তাহা হইলেও একটা সাহিত্য হয়। যখনই আপনার ভাবনাচিন্তাগুলি আমি ভাবি, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই আপনার সঙ্গে সাহিত্য অনুভব করি। সুতরাং 'যত মত তত পথ' কথাটা একটা সংহতি ঘটাইল। এই সংহতিটাই সাহিত্যের মূল। 'যত মত তত পথ' কথাটা আমাকে অন্যের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হইতে শিখাইয়া দেয়। যত মত বাড়িতে থাকিবে আপনি ততই বিরাট্ বা বড় হইতে থাকিবেন।

যত মানুষ অহিংস ভাবাপন্ন, তাহাদের সঙ্গে ছিল গান্ধীজির সহৃদয়তা। আর যাহারা হিংসাসম্পন্ন তাহাদের সঙ্গে বিরোধিতা। এই বিরোধী ভাবটি গান্ধীজি আপনার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি একটা বিরাট্ বড় লোক হইয়া গেলেন। বড় লোক অর্থ মহান্ ব্যক্তি। তাই বলিয়াছি 'যত মত তত পথ' কথাটি একটি সুন্দর সাহিত্য।

যাঁহারা সাহিত্য লেখেন তাঁহারা সাহিত্যিক। যাঁহারা সাহিত্য লইয়া সমালোচনা করেন তাঁহারা সাহিত্য-সমালোচক। আমাদের দেশে একজন নামকরা সাহিত্য-সমালোচক জন্মিয়াছিলেন তাঁহার নাম মম্মট ভট্ট। তাঁহার বইয়ের নাম 'কাব্যপ্রকাশ'। এখানে কাব্য অর্থ সাহিত্য। তাঁহার বই কাব্যপ্রকাশে প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন—সাহিত্য রচনায় লাভটা কী? তিনি ছয়-সাতটা প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়াছেন। কাব্য ভাল হইলে যশ হয়, অর্থাগম হয়, অনেক অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বিপদে আপদে এমন উপদেশ পাওয়া যায় যাহা সহধর্মিণীর উপদেশের মত অন্তর দিয়া গ্রহণযোগ্য।

প্রথমেই বলিয়াছি ব্রজগীতিকা একখানি সাহিত্য। এই সাহিত্যের যিনি লেখক তাঁহার এই বই লিখিয়া কোন যশ হয় নাই, অর্থাগম হয় নাই। কোন হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই।

তবে লিখিলেন কেন? ইহার উত্তরে আমরা এখন কাব্যপ্রকাশটি ছাড়িয়া সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থের সাহায্য লইব।

বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। যে-বাক্যে রস আছে তাহাই সাহিত্য। তাহা লোক লেখে, বলে মনের আনন্দে। রসটা কী তাহার কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। রসের কথা শুনিলেই চিত্তটা উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"এই যে একেবারে সাগরে আসিয়া পড়িলাম।" শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখিবেন, কতগুলি নোনা জল লইয়া যাইবেন না।" এই কথাগুলি এত সুন্দর যে সকলেই আনন্দিত হইল। একশো বছর পরেও যখন আমরা এই কথাটা শুনি তখন আমাদের চিত্তে অনির্বচনীয় আনন্দ হয়। শত শত বৎসর ধরিয়াই হইবে। তাই এই কথাটা কাব্য বা সাহিত্য পদবাচ্য।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র বলে রসস্বরূপ একমাত্র শ্রীভগবান্। কথা যদি ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া হয় তবে তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য। কারণ তাহার মূল বস্তু ভগবান্।

আগে রামায়ণের কথা বলি। রাম বনে যাবেন, লক্ষ্মণও যাবেন। লক্ষ্মণের যাবার কথা না তবুও রামেব সঙ্গে ভালবাসার টানে যাবেন। ১৪ বছরের জন্যে লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনে যাবেন। লক্ষণ মা সুমিত্রাকে বলিলেন, "মা! ১৪ বছরের জন্য বনে যাইতেছি—দুইটি ভাল কথা শুনাইয়া বিদায় দাও।" সুমিত্রা বলিলেন, "দাদার সঙ্গে বনে যাবি যা, সেখানে বাবা কোথায় পাবি। রামকে সাক্ষাৎ পিতৃদেব মনে করবি। আমি তোর মা, আমিও বনে যাইতেছি না। সীতা মাকে মা মনে করবি। অযোধ্যা নগর ছাড়িয়া যাইতেছিস্, এই সুন্দর নগরী কোথায় পাবি? বনের মধ্যে পশুপাখী বৃক্ষলতাপূর্ণ অরণ্য, তাহাকেই অযোধ্যা নগরী বলিয়া মনে করবি। এই তিনটিই আমার কথা। সব সময় মনে রাখবি। দাদার সঙ্গে আনন্দ মনে যথাখুশী চলিয়া যাও।"

"রামং দশরথং বিদ্ধি, মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।'
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ তাত যথাসুখম্।।" রাঃ অযোধ্যা ৩৪/৯

স্নেহের পুত্র কিছুকালের জন্য বনে যাইতেছেন। তখন মায়ের উপদেশ বাণী পৃথিবীতে অনেক বইতে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু সুমিত্রা যে কথা বলিলেন এমন কথা কেউ কখনো শোনে নাই। তাই এই কথাগুলি সাহিত্য হইয়া রহিয়াছে চিরকালের জন্য।

কুন্তীদেবী বসুদেবের ভগ্নী। বসুদেবের পিতা কুন্তীভোজ রাজাকে নিজের কন্যা কুন্তীকে দত্তক দিয়াছিলেন। বসুদেবের গোষ্ঠী কুন্তীর ভাইয়ের গোষ্ঠী। আর কুন্তীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ছেলে—তাহারা সন্তান গোষ্ঠী। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে থাকেন তখন কুন্তীর কি আনন্দ, আমার ছেলেরা কৃষ্ণের সঙ্গে পরমানন্দে আছে! কিন্তু ভাইয়ের গোষ্ঠী কৃষ্ণ-হারা হইয়া বিরহ-দুঃখে মলিন হইতেছে। আবার ঠিক বিপরীত হয়। কৃষ্ণ যখন কুন্তীর ভাইদের সঙ্গে থাকেন তখন কুন্তীর পরমানন্দ, কারণ তাহার ভাইরা কৃষ্ণ-সঙ্গে মহা আনন্দে আছেন; ছেলেদের জন্য মহাদুঃখী

কারণ, তাহারা কৃষ্ণবিরহ-দুঃখসাগরে ডুবিতেছে।

একদিন কৃষ্ণ যদু রাজ্যে বিদায় হইবার সময় বলিলেন, "কুন্তী পিসী! তোমরা এখন ভাল আছ। আমি যাদবদের কাছে যাই।" কুন্তী বলিলেন, তুই যাবি যা, কে ঠেকাবে। আমাকে একটা বর দিয়ে যা। আমার ভাইদের ও সন্তানদের প্রতি আমার দুইদিকে দুই টান নিঃশেষে দূর করিয়া দে। আমি যেন তোকে ছাড়া আর কাহারও সুখদুঃখের কথা না ভাবি।" ভক্ত ভগবানের কাছে অন্তরের প্রার্থনা জানাইতেছেন বা বর চাহিতেছেন, ইহার দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র। কিন্তু কুন্তী যাহা চাহিলেন তাহা কেউ কোনদিন ভগবানের কাছে চাইতে শুনি নাই। কুন্তীর প্রার্থনাটি মহা সাহিত্য হইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত অনেক আছে আর বলিব না। এখন আসল কথা—এই ব্রজগীতিকা গ্রন্থের কথায় আসি।

বর্তমানকালে অনেকেরই ধারণা, সাহিত্য হইতে গেলে রস তো লাগিবেই এবং সে রস প্রধানত কান্তাপ্রেমের রস। মনে করুন একফালি পড়ন্ত রোদের ছায়ায় যুবক-যুবতীর একটা সংকেতময় দৃষ্টির বিনিময়, এই বিনিময় না ঘটিলে যেন আজকার সাহিত্য রসের সূচনা হয় না।

ব্রজগীতিকার কবি লিখিয়াছেন—

"ব্রজের বন্ধু হইলে কেন সে চিরতরে ব্রজ ছাড়িয়া যায়?
যশোদা-জীবন হইলে কেন বা দুঃখিনী মায়েরে এত কাঁদায়?
নন্দদুলাল বলা তারে ভুল, বৃদ্ধ বাপের তত্ত্ব না লয়।
রাখালের সখা হইলে কেমনে প্রাণসখাগণে ভুলিয়া রয়?
গোপিকারঞ্জন বলিস্ না তারে, গোপীবুক আঁখি জলে ভাসায়,
'রাধাকান্ত' যে বলে ভ্রান্ত, রাধাপ্রেম-তরী গাঙে ডুবায়।
চতুর কিশোর ক্ষীর-ননী চোর; দিন কত ব্রজে সবে মজায়;
গোপাল হইয়া বাঁশি বাজাইয়া শেষে পলাইয়া যায় মথুরায়।। ১৫১।।"

একটি মানুষের বিরহ-বেদনায় একটি গ্রামশুদ্ধ লোক ব্যাকুল। দৃশ্য দেখিয়া আপনার চক্ষু দুইটাও কি ভিজিয়া ওঠে না?

বাৎসল্য রসের চমৎকারিতা দেখুন, মা গোপালকে ভর্ৎসনা করিতেছেন তাহার অতি দুষ্টামিপূর্ণ স্বভাবের জন্য—

"ওরে নন্দলালা!
খালি ঘর পেয়ে ঢুকে পড় তুমি
তোমা নিয়ে মহাজ্বালা;
ক্ষীর ননীভরা যত ভাঁড় পাও
শূন্য করি খাও, সখাগণে দাও;
অবশেষ পশুপাখীরে বিলাও—
ঢালাও লুটের মেলা।

ছুটি' পিছে তোমা ধরা নাহি যায়,
যদি ধরা পড় বাঁধা হয় দায়;
বাঁধনরশিতে কভু না কুলায়—
হাঁক ডাকে বাড়ে বেলা।। ২।।"

মায়ের এই গ্রামীণ ভাষা শুনিতে শুনিতে আপনার অন্তরের মধ্যে কি এক আনন্দের ঢেউ খেলে না? সখ্যরসের সখাগণের গভীর বেদনাপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনুন প্রাণ কানাইর কাছে—

"গোকুলেও গাঁও ছেড়ে কেন গেলি প্রাণ-কানাই।
মথুরায় গোকুলানন্দ, কি আনন্দ বল দেখি ভাই;
ওখানে কি দধি মথন ধ্বনি ওঠে প্রতি ঘর—
ওখানে কি মিলে কানু নিত্য ননী ক্ষীর সর?
পাখী ডাকা ভোরে তোরে জাগায় কিরে রাখাল ভাই?
ওখানে কি নিতি নিতি সাজায় তোরে যশোমতী?
ওখানে কি হয় রে গোঠে সখাসঙ্গে মাতামাতি?
ওখানে কি পাও রে কানাই লুকোচুরি খেলার ঠাঁই?
ওখানে কি বাজাও তোমার মোহন বাঁশি কুঞ্জবনে?
ওখানে কি নরনারী মুগ্ধ হয়ে বাঁশি শোনে?
ধেনুযূথ কি ফিরে আসে বাঁশির ডাক শোনে যেই?
ওখানে কি কুলের বধূ জলকে যায় নদীর ঘাটে?
ওখানে কি কলহাস্য ওঠে পল্লী পথে বাটে?
ওখানে কি যমুনাতে জলকেলি করে কানাই?।। ৩২।।"

কবিতাটি পড়িতে পড়িতে বাল্যবেলার আনন্দময় খেলাধূলার সঙ্গে তীব্র বেদনার তরঙ্গ আপনাকে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে না? কি বেদনা স্নেহময় খেলার সাথীদের বুকে—একটু অনুভব করুন না।

"শোকের সাগরে পড়ি হাবুডুবু খাই;
কাঁদিব এমন শক্তি নাহি রে, কানাই।
শয্যা তেয়াগিতে চাই ভোরের বেলায়;
কানু নাই শয্যা ছাড়ি কী করিব, হায়?
আকাশের আলো আসি পশে দ্বারপথে?
শব সম পড়ে থাকি সব বিছানাতে।
গোশালাতে ধেনু মাতা ডাকে না বাছা রে;
বৎসেরা না পিয়ে স্তনদুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
গাভীরা গোঠের পথে যেতে নাহি চায়;
অপরিচিতের মত থমকি দাঁড়ায়।

নাহি শুনি বেণুধ্বনি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস;
বৃন্দারণ্য কানু-শূন্য হয়েছে বিশ্বাস।
চিরাভ্যাসে ছুটে আসে যশোদার দ্বারে;
দ্বার রুদ্ধ হেরি ধেনু আছাড়িয়া পড়ে।
(মোরা) কী লইয়া যাব গোঠে কেমনে বা যাই?
পথের দু'ধারে বসি' কাঁদিয়া কাটাই।
বাতাহত বৃক্ষপত্রে ঝরিছে শিশির;
শ্যামহারা তরুসারি ফেলে আঁখি নীর।। ৩১।।"

কেউ হয়তো বলিলেন ঐ ভালবাসার পাত্রটি ভগবান্ বলিয়াই এমন হইতে পারিতেছে। আমরা বলি, তা কেন? এই দেখুন না, উপেনের বিঘা দুয়েক জায়গার বাড়ীটুকু জমিদার মিথ্যা দেনার খতে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। উপেন মনোদুঃখে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। তারপর সে একদিন মনে মনে ভাবিতেছে—

"মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহ গর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু' বিঘার পরিবর্তে।"

কত মানুষই তো সংসারের অত্যাচারে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে চায়। ভগবান্ ভালই করিলেন, মোহ হ'তে আমাকে উদ্ধার করিয়া সারা পৃথিবীটা আমার করিয়া দিলেন। আপনি যদি কোনদিন কোন কারণে সন্ন্যাসী হন, আপনি কি ঐরূপ ভাবিতে পারিবেন? একটি ব্যক্তিগত সামান্য ঘটনা, কেমন করিয়া সর্বজনীন হইয়া গেল, ইহাই তো সাহিত্যের কাজ।

যে-ব্যক্তি অতি বেদনা পাইয়াছে সে অপরকে দুঃখ ভুলিতে উপদেশ দিতে পারে। দেখুন না আজ দুঃখে জর্জরিত সখীদের সান্ত্বনা দিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন শ্রীমতী রাধারাণী।

"ছাড়, সখি মিছে ভাবনা।
মথুরায় যে গেছে চলি সে, মোদের ব্রজের কেহ না।
মোদের কানু, চরায় ধেনু, গোকুল কভু সে ছাড়ে না।
মথুরায় যে রাজা হয়েছে গোয়ালার সে ছেলে না।
যায়নি সে আছে ব্রজেতে, লুকায়েছে কোথা দেখ না।
এ তাঁর নতুন লীলাখেলা বুঝেও কি তা বোঝা না।
জীবন ভরে খুঁজবো তারে একসাথে করি মেল না।
পাবো তাঁরে ব্রজেই পাবো, আর কোথা কভু যাব না।
হারাধন খুঁজতে মোদের হয় যদি দেহ পাতন।
তাঁর চরণ ছোঁয়া ব্রজধূলায় মিশে হবে কৃষ্ণ-প্রাপনা।। ৫৬।।"

গীতিটি পড়িতে পড়িতে আপনার কি মনে হয় না সত্যিই বুঝি তাকে খোঁজা হয় নাই। আবার উদ্যোগী হইয়া খুঁজিব, দেখিব মন বনের কোন্ গহনপ্রদেশে সে লুকানো আছে। কাছেই আছে, পাবই পাব।

এইরূপ আর কত দৃষ্টান্ত দিব, ব্রজগীতিকার যে গীতিটিই পড়ি না কেন আমি যেন কোন্ আনন্দ-পাথারে ডুবিয়া যাই। দেখুন আমি ও আমার অগ্রজ একই জননীর গর্ভে জন্মিয়াছি। তিনি হইয়াছেন একজন ইকনমিক্সের অধ্যাপক—মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর কলেজের সর্বজন-প্রীতিপাত্র। আমি সংসার ছাড়িয়া সাধু হইয়াছি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নাম লিখাইয়াছি। দাদাকে দেখিয়াছি একজন আদর্শ সুন্দর ভদ্রলোক। আমার পক্ষে আদর্শ বৈষ্ণব হওয়া দূরের কথা, বৈষ্ণবের ছায়ার তলেও যাইতে পারি নাই। বৈষ্ণবের লক্ষণ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "যাহারে দেখিলে মুখে আসে কৃষ্ণনাম," আমি নামডাকের একজন বৈষ্ণব হইয়াও কিছু হইতে পারি নাই। আর তিনি একজন আদর্শ হিন্দু হইয়া নীরবে গোপনে ব্রজরসের সাগরে ডুবিয়া আছেন। আমি ধন্য তিনি আমার বড় ভাই বলিয়া নহে, আমি তাঁহার ছোটভাই বলিয়া। এখন বার্ধক্যের কিনারে বসিয়া ভাবি কখন ঐ রসের একটু সুস্নিগ্ধ স্পর্শ মিলিবে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ☐

'গীতামাধুরী'—ভূমিকা .

গীতা পরিচয়

"পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী—
মম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।।"

হে মাতঃ ভগবদ্গীতে! প্রাচীন আচার্যপাদগণ তোমাকে মাতৃ সম্বোধন কবিয়াছেন। তোমার মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন এই গ্রন্থে পূজ্যপাদ মনস্বী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহোদয়। এই জীবাধমের উপর আদেশ হইয়াছে ভূমিকার পাদপীঠ রচনার। এই কার্যে আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সদা সচেতন। তথাপি মহতের আদেশ শিরে ধরিয়া ব্রতী হইলাম গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিতে।

ভূমিকা আর কী লিখিব! একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইব গীতা-জননীর, যাঁহারা পথিকৃৎ তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে। উপরোক্ত শ্লোকটি গীতার একটি সুন্দর পরিচয়-বাহক। শ্লোকটি কাহার সার্থক লেখনী-প্রসূত তাহা জানি না। প্রাচীন কালের গীতার কোন মরমীভক্তের অন্তস্তলের নিবিড় অনুভূতি হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকিবে এই অপূর্ব সন্দেশটি। অজ্ঞাতনামা সেই ভক্তপ্রবরকে প্রণাম করিয়া আস্বাদন করি তাঁহার অনবদ্য এই অবদানটি।

হে ভগবদ্গীতে জননী, তোমার অনুধ্যান করিতেছি। জননীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটি অপূর্ব বিশেষণ দ্বারা। গীতা-জননীর স্থান মহাভারতের মধ্যে—' মধ্যে মহাভারতম্'। মহাভারত বলিতে তিনটি বস্তু বুঝায়। মহাভারত একটি গ্রন্থের নাম, মহাভারত একটি ভূখণ্ডের নাম, মহাভারত সেই ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির নাম। প্রায় লক্ষ শ্লোকযুক্ত অষ্টাদশ পর্ববিশিষ্ট

* *'গীতামাধুরী', বঙ্কিমচন্দ্র সেন। প্রকাশক; শ্রীজয়নারায়ণ কাপুর, ৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলকাতা - ৩। ১ম মং ১৩৭০*

বিরাট্ গ্রন্থখানির নাম—মহাভারত। এইরূপ তথ্যবহুল ও, তত্ত্ববহুল, একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য—মহাভারতের মত অদ্ভুত গ্রন্থ মানবেতিহাসে আর নাই। এই গ্রন্থখানির মধ্যস্থলে গীতার স্থান।

মহাভারতের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। ভীষ্ম-পর্ব হইতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ। দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মধ্যস্থল। ইহার আগে সূচনা ও প্রস্তুতি, ইহার শেষে সংগ্রাম ও পরিণতির মধ্যস্থলে গীতার আবির্ভাব। এইরূপ সংকটময় স্থলে গীতার মত একখানি গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থের জন্ম আর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।

মহাভারত বলিতে শুধু গ্রন্থখানিকেই বুঝায় না, একটি বিরাট্ ভূখণ্ডকেও বুঝায়। তুষারশুভ্র হিমগিরি যাহার শিরের শোভা বাড়ায়, অসীম নীলসমুদ্র যাহার চরণ ধোয়ায়, সেই বিশাল ভূমিখণ্ডের নাম—মহাভারত। অংশবিশেষ খণ্ডিত, কর্তিত বা অপহৃত নহে। নীলনদ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট্ ভারত (Greater India)-এর নাম মহাভারত। ইহার মধ্যস্থল গীতার স্থান নহে। কিন্তু তৎকালীন ভারতের কর্মময় জীবন-চাঞ্চল্যের ইহা তখন মধ্যস্থলে। কুরুক্ষেত্র কর্মভূমি, যুদ্ধভূমি। ব্রহ্মতত্ত্ব-গবেষণার ভূমি নহে অথচ সেইখানেই গীতার জন্ম। ইহা এক বিচিত্র বার্তা।

ভারতের ঋষিদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশস্থান অরণ্য। আরণ্যক নাম তাহাদের গায়ে এখনও লাগিয়া আছে। ভোগজীবনের অবসানে বাণপ্রস্থী হইয়া বনে গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছেন ও নিজেদের উপলব্ধ সম্পদ্ আমাদের দিয়াছেন। বন মানবীয় বাসভূমির প্রান্ত (outskirt)-এ, জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের বাহিরে। শান্ত-রসাস্পদ তপোবনই ব্রহ্ম-তপস্যার যোগ্য স্থান। কিন্তু কি আশ্চর্য! সর্বশাস্ত্রের নির্যাস ব্রহ্মতত্ত্বময় গীতার আবির্ভাব জীবনের প্রান্তে নহে, সংগ্রামময় জীবনের কেন্দ্রস্থলে। ভীষণ যুদ্ধের শঙ্খ-দুন্দুভি-নিনাদ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—গীতার প্রশান্ত সঙ্গীত-ঝঙ্কার। 'মধ্যে মহাভারতম্'।

মহাভারত নামক বিরাট্ দেবভূমির যে অখণ্ড সংস্কৃতি—তাহারও নাম মহাভারত। এই সংস্কৃতি বহুমুখী। বিশাল বটবৃক্ষের মত অসংখ্য শাখাপল্লব। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীতকলা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যষ্টি সমষ্টির জীবন-নীতি, বর্ণ, আশ্রম, শিক্ষা, ক্রীড়া—জীবনের এমন কোন দিক্ নাই যে-দিকে আর্য ঋষি-মনীষা প্রকাশিত হয় নাই। এই বহুমুখী সংস্কৃতির মধ্যে একটা অখণ্ডতা আছে। ইউরোপের সভ্যতা বহুমুখী কিন্তু একতার বন্ধন নাই। এই বিরাট্ উপমহাদেশের বহু বৈচিত্র্যময় ভাব, ভাষা ও জীবনযাত্রার মধ্যে এক অপূর্ব একত্ব বিদ্যমান। বহুবিধ পুষ্পকে যেমন সূত্র একত্রীভূত করিয়া মালিকায় পরিণত করে, মহাভারতীয় বহুমুখী সংস্কৃতিকেও সেইরূপ অখণ্ডরূপ দিয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু দর্শনেই ঋষি-মনীষার চরম ফল প্রকাশিত। এই তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। সমস্ত আর্য সংস্কৃতিই গীতা-কেন্দ্রিক—"সূত্রে মণিগণা ইব।" বহুমুখী সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও পোষক শ্রীগীতার সূত্র। সূত্রের স্থান মালাখানির মধ্যেই— "মধ্যে মহাভারতম্"। পার্থকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ এই গীতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। নারায়ণ শব্দের অর্থ

নর সমূহের অয়ন বা আশ্রয় বা অবলম্বন। নারায়ণের স্থান প্রতি জীবের অন্তরে আত্মান্তর্যামিরূপে। সর্বভূতের হৃদ্দেশে থাকিয়া নারায়ণ আমাদের সকলের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে পরম আশ্রয়। অন্তর্যামিরূপে হৃদয়ে থাকিয়া তিনি সর্বদা আমাদের ধী বা বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিয়া কর্মে প্রণোদিত করিয়া প্রবুদ্ধ করেন। বিবেকের বাণীরূপে আমরা নারায়ণের বাণী শুনি। যখনই অন্যায়-পথে চলি, অনুচিত কার্য করি, তখনই, অন্তরে থাকিয়া নারায়ণ আমাদিগকে কল্যাণ-পথে চলিবার জন্য নির্দেশ দেন। তবে নারায়ণের ঐ নির্দেশ আমরা সকল সময় শুনিতে পাই না, শুনিতে পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত মত পথ চলিতে পারি না। আজ যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাই এই জন্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে মর্মবাণী শুনাইতেছেন।

যিনি আমাদের সকলের অন্তর্যামী তিনি আজ অর্জুনের রথে উপবিষ্ট। ইনি শুধু অর্জুনের রথের সারথি নহেন। জীবনের সারথি। শুধু অর্জুনের জীবন-সারথি নহেন, আমাদের সকলের জীবন-রথের সারথি নারায়ণ। অর্জুন শুধু একটি ব্যক্তি নহেন। তিনি আমাদের সকলের প্রতীক ব্যক্তি। সকল মানবের প্রতিনিধি ব্যক্তি। আমরা সকলে যেন তাঁহাকে ভোট দিয়া পাঠাইয়াছি। শাস্ত্রকার অর্জুন ও কৃষ্ণকে নর-নারায়ণ বলিয়াছেন। অর্জুন নর, নর মানুষ। সকল মানবের প্রতিরূপ মানুষ (typical man), অর্জুনের বিষাদ আমাদের সকলের বিষাদ। বিশ্বমানবের সকলের জীবনযুদ্ধের সংঘর্ষ। অর্জুন দাঁড়াইয়াছেন কুরুক্ষেত্রে। কুরুরাজার ক্ষেত্রে তো বটেই আরও কিছু। 'কুরু' শব্দের অর্থ কর। যে-ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে চারিদিক্ হইতে কেবল কর কর ডাক আসে, কর্তব্যের আহ্বান আসে।

আপনি পিতা, পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য করুন। আপনি পুত্র, পিতার প্রতি কর্তব্য করুন। আপনি পতি, পত্নীর উপর কর্তব্য করুন। আপনি পত্নী, পতির প্রতি কর্তব্য করুন। আপনি শিক্ষক, ছাত্রের প্রতি কর্তব্য করুন। আপনি ছাত্র, অধ্যাপকের প্রতি কর্তব্য করুন। আপনি শাসক, শাসিতের প্রতি কর্তব্য করুন। আপনি শাসিত, শাসকের প্রতি কর্তব্য করুন। যেখানে যে ভূমিকায় আপনি আছেন চারিদিক্ হইতে কর্তব্যের ডাক। কে ডাকে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু ডাকটি বড় কঠোর। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—'Stern Daughter of the Voice God'। ইহাই আমাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র। এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিরুদ্ধমুখী কর্তব্যের সঙ্ঘাতে আমরা ভাঙ্গিয়া পড়ি। অর্জুনের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে, যুদ্ধ কর। তাহার পারিবারিক কর্তব্য বলে, আত্মীয়ের রক্তে হস্ত কলুষিত করিও না। এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে অর্জুন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বিষাদযুক্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমুখ হইয়াছেন। এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই এইরূপ অসংখ্য দ্বন্দ্বের আঘাতে বেদনার্ত। তাই অর্জুন আমাদের সকলের প্রতীক নর।

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে অন্তর্যামীর বাণী আসে তাহা আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাই না। আজ সর্ব জীবান্তর্যামী নারায়ণ বিষাদিত অর্জুনকে প্রতিবোধিত করিবার জন্য যে মহাবাণী দিতেছেন তাহা শুধু ব্যষ্টি জীবের অন্তরের কোণ হইতে নহে, বিপৎসঙ্কুল সমষ্টি জীবকুলের যুদ্ধ-প্রান্তরের মধ্য হইতে। মৃদু স্বরে নহে, উচ্চ স্বরগ্রামে গান করিতেছেন। গান হইয়াছে বলিয়াই গীতা নাম। ভগবান্ গান করিয়াছেন বলিয়া 'ভগবদ্গীতা' এই সার্থক নাম।

এই নর-নারায়ণের মহাবাণী জগতের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন মহামুনি বেদব্যাস। ব্যাস একটি উপাধি, ব্যক্তিটির আসল নাম কৃষ্ণ। অর্জুনের অনেকগুলি নাম, তার মধ্যে একটি নাম কৃষ্ণ। বক্তাও কৃষ্ণ, শ্রোতাও কৃষ্ণ, তাঁহাদের বাণীর প্রচারকও কৃষ্ণ। এই একত্ব শুধু নামে নয়, কামেও। নিজেই বলিয়াছেন আমি "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ", আর "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ"

মায়ের স্বরূপে অষ্টাদশটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বেদব্যাসের যত কিছু লেখা সবই অষ্টাদশাঙ্গ। পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ, মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব। ভারত সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অষ্টাদশ দিন ব্যাপী যুদ্ধ। গীতারও অষ্টাদশ অধ্যায়। ইহার কারণ কী রসিক ভক্ত চিন্তা করিবেন। আমরা শুধু আপনার ভাবনার একটি রহস্যময় খোরাক দিলাম।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় যেন অষ্টাদশখানি সিঁড়ি। নিম্নের সিঁড়িতে 'বিষাদ' আর সর্বোচ্চ সিঁড়িতে 'মোক্ষ'। জীবনের আরম্ভ বিষাদে। পরিণতি মুক্তিতে। বিষাদ জীবনের শেষ কথা নয়। জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু ইহাই চরম বার্তা নয়। চরম সংবাদ দুঃখ-মুক্তিতে, সুখময়ের সান্নিধ্যে পরানন্দ প্রাপ্তিতে। অর্জুন গীতার সিঁড়ি বাহিয়া ভূমির অশান্তি হইতে ভূমার প্রশান্তিতে পৌঁছিয়াছেন। অর্জুন পথিকৃৎ। আমাদিগকেও ঐ পথে চলিতে হইবে। এই জীবনেই পৌঁছিতে হইবে। কারণ গীতা জীবন্মুক্তিবাদী।

মায়ের কর্ম সন্তান-পালন। পালন কার্যের দুইটি মুখ্য অঙ্গ। ক্ষতিকারী শত্রু-বিতাড়ন ও পুষ্টিকারী খাদ্য-বিতরণ। সন্তানের যে শত্রু মা তাহাকে আদর করেন না—বিদ্বেষ করেন, দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। স্তনক্ষীর সন্তানের পুষ্টিকারী। মা তাহা দিয়া তাহার পোষণ করেন। গীতা-জননীরও এই দুই কাজ "ভবদ্বেষিণীম্" আর "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্"। ভূ-ধাতু হইতে ভব। যাহার জন্ম আছে, সুতরাং মৃত্যু আছে তাহাই ভব। যাহা জন্মমৃত্যুর অধীন তাহাই ভব। আমাদের দেহদৈহিক যাবদ্ বস্তুই ভব। নশ্বর বস্তুর জন্মমৃত্যুর প্রবাহকেও ভব বলা হয়। এই ভবই দুঃখময় সংসারসমুদ্র। ইহাই আমাদিগের দুঃখের মূলীভূত হেতু। এই জন্য জননী 'ভব'-কে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন। কেমন করিয়া ভব নাশ করিয়া সন্তানদিগকে শান্তির সন্ধান দিবেন প্রতিনিয়ত করুণাময়ী তাহাই চিন্তা করেন।

নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হওয়াই দুঃখের হেতু। আচার্যেরা ইহাকে "দ্বিতীয়াভিনিবেশ" বলেন। অদ্বিতীয় বস্তু ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই সকল ভয় ও দুঃখের জনক। এই ব্যাধির ঔষধই হইল অদ্বিতীয় বস্তুর অনুধ্যানে। অদ্বয়তত্ত্বের জ্ঞানলাভ। ভব নামক ব্যাধি নাশ করিবার জন্য জননী তাই অদ্বৈতামৃত বর্ষণ করেন। এই অমৃত কেবল ভব নাশই করে না, জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া স্বভাবে পরিণত করিয়া আনন্দঘন ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়—"পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ।"

অ-মৃত কী? যে-বস্তুর আস্বাদনে মরণ-ধর্ম নাশ হয়। অমরণধর্মী অদ্বৈতামৃতটি কী? তিনি ছাড়া কিছুই নাই এই জ্ঞান। তিনিই সব, তাঁহাতেই সব, সকলের মধ্যে তিনি, তাঁহার মধ্যে তিনি, তাঁহার মধ্যে সকল—এই উপলব্ধি।

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"—ইহাই অদ্বৈতামৃত। জননীর স্তন হইতে এই অমৃতময়ী ক্ষীরধারা নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে। এই ক্ষীরধারায় যে সন্তান সঞ্জীবিত গীতামাধুরী

বিতরণে সে-ই অধিকারী। দেশ-জননীর সুসন্তান, আমাদের প্রাণের দাদা শ্রীবঙ্কিম সেন গীতামাতার অঙ্কে আরোহণ করিয়া সেই অমৃত লুটিয়া তাহার 'মাধুরী' পরিবেশন করিয়াছেন এই গ্রন্থে। "সুধীর্ভোক্তা"—সুধীজন ভোগ করুন। আমি মায়ের হীন সন্তান। তাই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াই বিরত হইলাম। তবে অযোগ্য হইলেও লালসা রহিল অন্তরে আপনাদের অধরামৃতের। জয় জগদ্বন্ধু হরি।।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৯
শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন
মহানাম যজ্ঞক্ষেত্র, ফদিরপুর।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

জয় জগদ্বন্ধু হরি

'নাম-মাধুরী'—ভূমিকা

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।"—শিক্ষাষ্টক

শ্রীহরি মাধুর্য-বিগ্রহ। শ্রীহরি ও তাঁহার শ্রীনাম অভিন্ন বস্তু। তাই শ্রীনাম মাধুর্যের খনি। নামে আছে অফুরন্ত মাধুরী। সেই মাধুরী সম্ভোগে নিমজ্জমান ছিলেন পুণ্যশ্লোক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন। নিজে আস্বাদন করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। অফুরন্ত ঝরনায় উদ্বেলিত রসোদ্‌গারের প্রতিমূর্তি 'শ্রীনাম-মাধুরী' শ্রীগ্রন্থ।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন গ্রন্থকারের পদাশ্রিত শ্রীরাইমোহন আচার্য মহোদয়। বৈষ্ণবাজ্ঞা শিরোধার্য। নিজ অযোগ্যতায় জাগ্রত আছি। তবু লিখিতে বসিয়াছি। পূজ্যপাদ বঙ্কিমদাদার অপার্থিব স্নেহ-করুণার কথা স্মরণ করিয়া—"তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।"

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের কথা। ফরিদপুর শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁহার সুদীর্ঘ বাহুপাশে বঙ্কিমদাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথীতে স্নান করিলাম।" তদবধি নিরুপাধি হইয়াও তিনি সেই উপাধিটি কণ্ঠহার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমদা ছিলেন সদা ভাবে ভোরা, প্রাণখানি ছিল প্রেমে-গড়া। তাঁহার অনাবিল স্নেহধারায় স্নাত হইয়া ধন্য হইয়াছি। যাহা পাইয়াছি তাহার প্রতিদান হয় না। তবু অক্ষম করে লিখনী ধরিয়াছি, সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের স্মরণে কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে আত্মজীবন শুদ্ধ হইবে এই আশা পোষণে।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম আর নামী অভিন্ন। কথাটি সুন্দর ; কিন্তু তত্ত্বটি তলাইয়া

** 'নামমাধুরী' (তৎসহ কীর্তন-মাধুরী)। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন। প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য। ৩/৩২, সি. আই. টি; বিল্ডিংস, কলকাতা -১০; ১লা পৌষ, ১৩৭৬।*

বুঝিতে গেলে অতলান্ত। নামী বাচ্য, নাম বাচক। নাম শুদ্ধ, নামী বস্তু বা ব্যক্তি। শব্দ আর বস্তু কি অভিন্ন হয়? দুইটি অক্ষরে লিখিত 'জল' একটি শব্দ। নদীতে বহমান এক প্রকার তরল বস্তুর নাম 'জল'। এই দুই জল কি এক? বস্তু-জলে অবগাহন চলে, পানে পিপাসা যায়। শব্দ-জলে সে ক্ষমতা কোথায়?

অক্ষরে লিখিত 'সন্দেশ' কথাটি বাচক। জলযোগ বিপণিতে সজ্জিত এক প্রকার সুস্বাদু বস্তু তার বাচ্য। বাচ্য-সন্দেশ রসনাকে তৃপ্তি দেয়, উদরকে পূর্তি করে। বাচক-সন্দেশ রসনাকে জলসিক্ত পর্যন্ত করিতে পারে। তারপর আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ একজন মহদ্ব্যক্তি। অগণিত কাব্য কবিতায় তাঁহার প্রতিভার অভিব্যক্তি। আবার রবীন্দ্রনাথ একটি নাম। তাহার উচ্চারণে অন্তরে শ্রদ্ধা জাগে, কিন্তু ভাবময় কবিতার তো উৎপত্তি হয় না। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ নামী আর রবীন্দ্রনাথ নাম অভিন্ন নয়। নাম নামী অভিন্ন বলা সহজ, বুদ্ধিগত করা দুরূহ।

এই জগতের কোন নাম-নামীই অভিন্ন নয়। কোন বাচকেই বাচ্যের শক্তি নাই। কোন শব্দেই বস্তুর গুণ নাই। অভিন্নতা সত্য জগদতীত বস্তু সম্বন্ধে। যে বস্তু অপার্থিব, অপ্রাকৃত, অসীম, অনন্ত; একমাত্র সেই বস্তু সম্বন্ধেই ঐ কথা সত্য। জাগতিক নাম ও নামীর ব্যবধান অনেক। সমান্তরাল দুই রেখার মত তাহারা থাকে দূরত্ব ঠিক রাখিয়া, মিশামিশি করে না কদাপি। তবে হ্যাঁ, সমান্তরাল রেখাও মিশে অসীমে অনন্তে গেলে। Parallel lines meet in Infinity. যেটি নিখিল বিশ্বের পরম তত্ত্ব, চরমতম বস্তু সেই অনন্তানন্তময় শ্রীহরিতেই বাচ্য ও বাচক একাকার হইয়াছে। নাম ও নামী অভিন্নতায় একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। জল জল বলিয়া চীৎকার করিলেও পিপাসা যায় না। সন্দেশ সন্দেশ বারবার মুখে উচ্চারণ করিলে মুখ মিষ্টত্বে ভরিয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ সারাদিন জপ করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যে মহামাধুর্য আছে তাহাতে প্রাণ ভরিয়া যাইবে। কথাটা অদ্ভুত বটে কিন্তু সত্য। পরম সত্য। পরম বস্তুতে—

"বাচ্যবাচকয়োঃ সমান-রস-স্থিতিঃ।"

পরব্রহ্ম চরমবস্তু। তাহার বাচক প্রণব। প্রণবই তিনি। প্রণব জপিতে জপিতে পরব্রহ্মের জ্যোতির দর্শন হইবে। যে অক্ষর বা মন্ত্র পরম পুরুষকে বুঝায় তাহার পুনঃপুনঃ উচ্চারণে সেই পুরুষবরের সাক্ষাৎ মিলে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সূত্রাকারে কহিয়াছেন—

"হরিশব্দ উচ্চারণ হরি পুরুষ উদয়।"

'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে করিতে হরি শব্দ বাচ্য যে লীলাপুরুষোত্তম তাহার উদয় হইবে। হরি শব্দের মধ্যে হরি নিদ্রিত আছেন। পুনঃপুনঃ উচ্চারণে মন্ত্রের চৈতন্য হইবে। মন্ত্রে চৈতন্য হইলে ঘুমন্ত দেবতা জাগিয়া ওঠেন। তখন নামীতে নামেতে একটা ঐকান্তিক মাখামাখি হয়। প্রিয়ের সঙ্গে প্রাণের একটা নিবিড় দেখাদেখি হয়। তাহাতে 'আনন্দাম্বুধি' উদ্বেলিত হয়। প্রতিপদে 'পূর্ণামৃতাস্বাদন' হয়। নাম উচ্চারণকারীর 'সর্বাত্মস্নপন' হয়। দেহ, মন, আত্মা সুস্নাত হয়—সুস্নিগ্ধ হয়।

এটি হইল পরম অবস্থা। এখানে পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই নামের ক্ষেত্র প্রস্তুতি কার্য চলিতে আরম্ভ করে। ফুলটি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই পাঁপড়িগুলির স্ফারতা ধীরে অতি ধীরে আরম্ভ হয়।

নামাশ্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নাম উচ্চারণকারীর চিত্তদর্পণে যে সকল কু-কামনার মালিন্য থাকে নাম তাহা মাজিয়া ঘসিয়া ঝকঝকে করিয়া দেয়। ভব ব্যাগ্নির দাবদাহন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া নিভাইয়া দেয়। সর্ববিধ মঙ্গলপুষ্পগুলিকে করুণাচন্দ্রিকা ছড়াইয়া ফুটাইয়া দেয়। ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক অর্জিত সকল বিদ্যার অন্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা জীবন্ত করিয়া তোলে। শ্রীনামের এই মহাশক্তির কথাই শিক্ষাষ্টকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমুখে ব্যক্ত হইয়াছে—

> "চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
> শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
> আনন্দাম্বুধিবিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
> সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।।" চৈঃ চঃ

এই সত্যেরই প্রকাশক নামেতে নামীর সর্বশক্তি এই কথা। যখন লীলায় আসেন শ্রীভগবান্ তখন তাঁহার ধাম পরিকর সব লইয়া আসেন। যখন চলিয়া যান সব লইয়াই যান। রাখিয়া যান শুধু নাম। নামীর সর্বশক্তি লইয়া নাম থাকেন জীব-জগতের কল্যাণের জন্য।

শ্রীরামচন্দ্র লীলা করিয়া চলিয়া গেলেন। অযোধ্যাবাসী কিষ্কিন্ধ্যাবাসী সব সঙ্গে চলিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু 'রাম' এই নাম। রহিলেন রামের কার্য করিবার জন্য। শ্রীরামচন্দ্র পাষাণীভূতা অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী করিয়াছিলেন শ্রীচরণদানে। এখন তো রাম চলিয়া গিয়াছেন নিত্যলীলায়। এখন আমাদের মত অহল্যাকে উদ্ধার করিবে কে? রামের নাম এই কার্য করিবে। 'হল' অর্থে লাঙ্গল। হল চলে যে জমিতে সে জমি হল্যা। সাধন-ভজনের হল যে চিত্তক্ষেত্রে অচল সে-ই অহল্যা। শ্রীরামের নাম যদি আশ্রয় করি তাহা হইলে আমরা সকল অভাজন অহল্যারা উদ্ধার লাভ করিব। রামের কার্য রামের নাম করিতেছেন যুগ যুগ ধরিয়া। সীতাকে রাবণ চুরি করিয়া নিয়াছে। রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করেন রামচন্দ্র। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপী সীতাকে চুরি করিয়াছে আমাদের দুর্দৈব রাবণ। এখন রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবে কে? ভয় নাই, 'নাম' আছেন। নামাশ্রয় করুন। 'নাম ভজ নাম চিন্ত, নাম কর সার।' নাম সর্ববিধ দুর্দৈব রাবণ বধ করিয়া ভক্তিসীতাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। যাহা রাম করিয়াছেন একদিন, তাহা নাম করিতেছেন চিরকাল।

শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-মোক্ষণ করিয়াছেন। কালীয়কে সরাইয়া দিয়া কালীদহ নির্বিষ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম নামাশ্রয়ীর চিত্তের কামনা কালীয় দমন করিয়া হৃদয়-কালীদহ নশ্বর বিষয়বিষ শূন্য করতঃ কৃষ্ণ ক্রীড়ার যোগ্য করিতেছেন।

নামীর কাজ নাম নিত্যই করিতেছেন। শ্রীগৌরনিতাই জগাই-মাধাইর উদ্ধার করিয়াছেন। গৌর-নিতাইর মধুমাখা নাম কত অহংকারী মদমত্ত জগাই মাধাইর উদ্ধার করিতেছেন। কত গর্বোন্নত শির লোটাইয়া দিতেছে অকিঞ্চন ভক্তের চরণতলে। শ্রীহরিপুরুষ মহা উদ্ধারণে

আসিয়া মহাদশার আবরণে আত্মগোপনে আছেন। তাঁহার অখণ্ড মহানাম মহাউদ্ধারণ আনিতেছে মহাকীর্তন যজ্ঞরূপে।

সুতরাং নামীর কাজ সর্বত্রই নাম করিতেছেন। আবহমানকাল ধরিয়া করিবেন। সর্ববিধ কল্যাণের মুকুটমণি হইতেছেন প্রেম লাভ। যে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়াছে এই জগতীতলে সেই মহাধন্য। সেই সুদুর্লভ প্রেমধন লাভ হয় একমাত্র নাম ফলে।

"নাম ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।"

একমাত্র প্রেমই নন্দনন্দনকে নিজ জন করিয়া সকল গূঢ় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে সক্ষম। এইজন্য মহাপ্রভুর মধুর ভাষা—'প্রেম প্রয়োজন'। এই প্রেম প্রাপ্তি ঘটে একমাত্র নামের কৃপা হইতে। সুতরাং ইহাপেক্ষা অমূল্য সম্পদ্ জীবের আর নাই। সর্বপ্রকার ক্লেশনাশকতা ও মঙ্গলদায়কতা নামের আনুষঙ্গিক ফল। মুখ্যফল প্রেম। প্রেমের অসীম শক্তি। যেখানে থাকুন নন্দনন্দন, তাঁহাকে টানিয়া আনিবে (কৃষ্ণাকর্ষণী মতা)। নামীকে পাইয়া নাম-সতীর জীবন সার্থক হইবে।

কন্যা থাকে কুমারী। পতিসঙ্গে হয় পুত্রবতী। নাম থাকে স্রোতস্বিনী। কৃষ্ণ পতি পাইয়া হয় প্রেমবতী। তখন তটিণী হয় তরঙ্গিণী। নদী হয় বারিধি। এতক্ষণ আসিলাম নদী বাহিয়া, এখন নামিলে অথৈ পাথার। এই পাথার রত্নের আকর। সেই রত্নাকরে ডুবিয়া রত্ন তুলিয়াছেন ডুবুরী গ্রন্থকার। ভক্তবৃন্দ আস্বাদন করুন।

গ্রন্থকারের প্রাণধন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি মধুবাণী উচ্চারণ করিয়া বাচালতার উপসংহার টানি।

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গাহিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকিও,
স্মরিও, কাঁদিও, জপিও, সেবিও,
বাসিও, আপন করিও।"

জয় জগদ্বন্ধু হরি।

কৃপার্থী—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**।❑

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ

**"রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্।।" ভাঃ ১২।১৩।১৪**

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্"—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের এই সুগভীর সুমনোহর স্বরূপ পরিচয়টি শাস্ত্র-প্রারম্ভেই প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। সকল শাশ্বত

* *'আর্যদর্পণ', আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের মাসিক মুখপত্র, হালিশহর। কার্ত্তিক, ১৩৫৬।*

সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নির্গমন অর্থাৎ প্রকটন হইয়াছে যাহা হইতে তাহাই হইল নিগম বা বেদ-শাস্ত্র। সেই বেদরূপ রসাল বৃক্ষেরই রসবন্ত গলিত ফল হইল শ্রীমদ্ভাগবত। ব্রহ্মের পরিণতিতেই ফলোৎপত্তি। ফলদানেই বৃক্ষজীবনের সার্থকতা। বেদার্থের চরম পরিণতি শ্রীভাগবত আবির্ভাবেই। ভাগবতীয় তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত প্রকটনেই বেদার্থের সার্থকতা।

বৃক্ষ ও ফলের উক্ত দৃষ্টান্তটি একটি রূপকথা মাত্র নহে। একটি অতি গভীর সত্যের ইঙ্গিত ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত। সমগ্র বেদের সার হইল প্রণব। প্রণবের মূর্তি হইল ব্রহ্ম-গায়ত্রী। ব্রহ্ম-গায়ত্রীই জীবন্ত হইয়া ফলবন্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে। বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্ত মধ্যে এই কথা কয়টি লুকাইয়া আছে। এই লুকানো তথ্যটি আর একটু বিশদ করা যাইতেছে।

"বেদঃ প্রণব এবাগ্রে" (ভাঃ ১১। ১৭। ১১) — বেদ অগ্রে প্রণবরূপেই ছিলেন। "প্রণবঃ সর্ববেদেষু" (গীতা ৭। ৮) — সমগ্র বেদে আমি প্রণব। প্রণব ব্রহ্মের বাচক। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" (পতঞ্জলি)—প্রণব হইলেন ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা নিকটতম নাম বা পরিচয়।" 'ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম শ্রুতিঃ।' প্রণবের পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্।।" ভাঃ ১২। ৬। ৪১

প্রণব পরব্রহ্মের বাচক। ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ। সর্বশ্রুতির ইহা বীজভূত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও প্রণবকে বেদের মহাবাক্য বলিয়াছেন। "প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি ৭ম)। কী কারণে প্রণবকে মহাবাক্য বলা হইয়াছে, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাহার কারণ দর্শাইয়াছেন শ্রুত্যধ্যায় (১০।৮৭) দ্বিতীয় মন্ত্রের টীকায়। "সর্বং বেদবাক্যার্থ-সমন্বয়-বিধানত্বেন মহত্ত্বং, অকারাদ্যক্ষরাত্মক-পরস্পর-সংবদ্ধ-পদ-সমুদয়ত্বাৎ বাক্যম্।" অস্যার্থঃ— সর্ব বেদার্থ সমন্বয় করে বলিয়া ইহার মহত্ত্ব। অকারাদি তিনটি অক্ষরাত্মক পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট পদের সমন্বয় আছে বলিয়া বাক্যত্ব। মহত্ত্ব ও বাক্যত্ব দুই থাকায় ইহার মহাবাক্যত্ব সিদ্ধ হইল।

এই প্রণবরূপী মহাবাক্যের বিশ্লেষণই ব্রহ্ম-গায়ত্রী। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।"

প্রণব যেন একটি কুসুমকলি। তাহারই ফুটন্ত শোভা বিরাজমান ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে। শ্রীমদ্ভাগবত এই পুষ্পেরই চরম ও পরম পরিণতি নির্দোষ নির্মল সুপরিপক্ব মধুময় ফল। আচার্যেরা কেন এইরূপ বলেন তাহাই বলিতেছি।

গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্যটি সংক্ষেপে এই, বিশ্ব-প্রসবিতার যে বরণীয় জ্যোতি তাহা আমরা ধ্যান করি। তিনিই আমাদের বুদ্ধিকে কর্মে প্রচোদন অর্থাৎ প্রেরণ করেন। গায়ত্রীর এই অর্থই যে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটিত, তিন প্রকারে তাহা স্থাপন করা যায়।

(ক) ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে "জন্মাদ্যস্য যতঃ...." এই আদি মন্ত্রটি সমগ্র গ্রন্থের বীজ-স্বরূপ—এই কথা তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে এই বীজ শ্লোকের একবাক্যতা আছে। কীরূপে—তাহার দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে দুইটি ক্রিয়াপদ। একটি 'ধীমহি' ধ্যান করি, অপরটি 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরণ করেন (করুন)। ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও দুইটি মুখ্য ক্রিয়াপদ। একটি 'ধীমহি' অপরটি 'তেনে'। 'ধীমহি' পদ সঙ্গে তো সর্বতোভাবেই একবাক্যতা হইল। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের এই অংশে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বেদতত্ত্ব প্রচোদনের কথাই আছে। কাজেই "প্রচোদয়াৎ" আর "হৃদা তেনে" এই দুয়ের একার্থতাই। এই স্থলে ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদও লিখিয়াছেন "অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ।" 'গায়ত্রী মন্ত্রে যাহা "বরেণ্যং ভর্গঃ" ভাগবতের প্রথম শ্লোকে তাহাই "সত্যং পরম্।" গায়ত্রী মন্ত্রে "সবিতুর্দেবস্য" পদের যাহা তাৎপর্য, ভাগবতীয় বীজ শ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" পদে তাহাই উদ্দিষ্ট। ভাগবত শাস্ত্রে বীজ-স্বরূপ এই প্রথম শ্লোকের সহিত গায়ত্রীমন্ত্রের এইরূপ সর্বাংশে সাদৃশ্য থাকাতে, ভাগবত যে গায়ত্রীরই ভাষ্য তাহা প্রমাণিত হয়। শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া শ্রীধর স্বামিপাদ উপসংহারে বলিতেছেন, "গায়ত্র্যা প্রারম্ভেন গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতম্।" এই কথা বলিয়া মৎস্যপুরাণের প্রমাণ তুলিয়াছেন। "যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদান-প্রস্তাবে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্মবিস্তরঃ বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে।" তৎপর "পুরাণান্তরে চ" বলিয়া অন্য কোনও পুরাণেরও আর একটি প্রমাণ বাক্য তুলিয়াছেন। "গ্রহোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি।।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও কহিয়াছেন—

"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং ধীমহি' সাধনে প্রয়োজন।।"

(খ) শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ত্রিংশৎ হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ এই সাতটি শ্লোককে চতুঃশ্লোকী বলা হয়। ইহাঁতে চারিটি আলোচ্য বিষয় আছে বলিয়াই চতুঃশ্লোকী নাম। এই চারিটি বিষয় হইল জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। শাস্ত্রের অর্থাববোধকে বলা হইয়াছে 'জ্ঞান', তত্ত্বানুভূতিকে বলা হইয়াছে 'বিজ্ঞান', রহস্য পদে 'প্রেমভক্তি' এবং তদঙ্গ পদে 'সাধনভক্তি' লক্ষীভূত হইয়াছে। এই চারিটি বিষয়ই সমগ্র শাস্ত্রের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। ইহাদিগকে কেহ কেহ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় বলেন। এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ই চতুঃশ্লোকীর সাতটি শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়ং উপদিশ্য অনুভাবিতবান্।" শ্রীগৌরসুন্দরও বলিয়াছেন—

"প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।।"

শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা এই চতুঃশ্লোকী নারদকে প্রদান করেন। নারদ ইহা বেদব্যাসকে অর্পণ করেন। ব্যাসদেব ইহা লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তি রচনা করেন।

"ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী কহিল।
ব্রহ্মা নারদকে সেই উপদেশ দিল।।

নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি ব্যাসদেব মনে বিচার করিল।।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৫

অতএব গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য অর্থ অভিন্ন। ভাগবত চতুঃশ্লোকীরই পরিণতি। অতএব ইহা গায়ত্রীরই পক্ব ফল।

(গ) সত্যের দ্বিবিধ রূপ। অমূর্ত ও মূর্ত। যেমন দু'য়ে দু'য়ে চার হয়, এইটি অঙ্ক শাস্ত্রের একটি অমূর্ত সত্য। দুইটি বস্তু আর দুইটি বস্তু একত্রে চাবিটি বস্তু হয় ইহা ঐ সত্যেরই মূর্তরূপ। গায়ত্রী প্রতিপাদিত সত্যটি অমূর্ত। তাহা পূর্ণাঙ্গে মূর্তিমন্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে। কোথায় কীরূপে তাহা পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

গায়ত্রী মন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রণোদিত করেন। কিন্তু কী উপায়ে এবং কোন্ দিকে যে পরিচালিত করেন তাহা মন্ত্রে উল্লেখ নাই। বুঝিতে হইবে, সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দিকেই প্রণোদিত করেন। উপায়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌টি এবং দিকের মধ্যে সর্বোত্তম কোন্‌টি তাহা বিনির্ণয় করিতে হইবে।

বহুবিধ উপায়েই বুদ্ধিতে কর্মপ্রেরণা দেওয়া যায় যেমন, বলপ্রয়োগ পূর্বক, ব্যাবহারিক বিধি বা আইন প্রণয়ন পূর্বক, উপদেশ পূর্বক, ধর্মবিধি পূর্বক ও স্নেহপ্রীতি পূর্বক। ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ বদ্ধ জীবনিবহকে কর্মে প্রেরণ করেন বলপূর্বক (বলাদিব নিয়োজিতঃ, গীতা ৩।৩৬)। সজ্জনগণের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ দ্বারা (তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ, গীতা ১৬।২৪) অর্জুনের মত ভক্তকে কর্মে নিয়োজিত করেন উপদেশ দ্বারা। রুক্মিণী প্রমুখ দেবীগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন ধর্মোপেত ভালবাসা দ্বারা, আর ব্রজে ব্রজবধূগণের বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়াছেন—ধর্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ 'পিরীতি' দ্বারা। ইহাই সর্বাতিশায়ী প্রচোদন। নির্মল প্রীতি আত্মার ধর্ম। তাহা দ্বারাই আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

আমাদের বুদ্ধি অনেক দিকেই প্রধাবিত হয়, তিনিই করান। ভোগের দিকে, স্বর্গের দিকে, কর্তব্য কর্মের দিকে, স্বধর্মের দিকে (যেমন অর্জুনকে) ও মুক্তির দিকে—নানাদিকেই জীবের বুদ্ধিকে তিনি প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিক্ হইল সেই দিক্ যেদিকে তিনি আছেন। সর্বব্যাপীরূপে তিনি সবদিকে থাকিলেও যেদিকে তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন-স্বরূপে অপ্রাকৃত রসমাধুর্যে মূর্তিমন্ত ভাবে বিরাজমান আছেন সেই দিক্ই সর্বশ্রেষ্ঠ দিক্।

যখন কাহারও বুদ্ধিকে তিনি নির্মল প্রীতি-রজ্জুদ্বারা স্বকীয় আনন্দঘন স্বরূপাভিমুখে আকর্ষণ করেন, তখনই সেই প্রচোদনে গায়ত্রী মন্ত্র পূর্ণাঙ্গ মূর্তি লাভ করে। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীগোপীজনবল্লভ যখন মনোনেত্ররসায়ন—স্বীয় ভর্গ জ্যোতিঃ যাহা দেখিয়া শ্রীলীলাশুক কহিয়াছেন "জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতাম্ একাভিরামাদ্ভুতম্।" সেই জ্যোতির প্রকাশ করতঃ "বংশীছিদ্র আকাশে" স্বীয় "পিরীতি মধু" ঢালিয়া দিয়া, ব্রজবধূগণের মনঃপ্রাণ জীবন-যৌবন যথাসর্বস্ব আপনার অভিমুখে ('স যত্র কান্তঃ জবলোলকুণ্ডলাঃ') আকর্ষণ করিয়াছেন, তখনই সেইখানেই ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র মূর্তিমন্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের অমূর্ত গায়ত্রী ভাগবতের রাস রজনীতে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্র ভাগবত-দেবতার মুখারবিন্দ-স্বরূপ। রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় তাহাতে

পঞ্চপ্রাণ। প্রাণের স্পন্দনেই বদন হাস্যময়। ঐ পঞ্চাধ্যায়েতেই গায়ত্রীমন্ত্র প্রাণবন্ত—অতএব গায়ত্রীরই পরিণত ফল শ্রীমদ্ভাগবতম্—ইহা রূপকোক্তি নহে, মর্মান্তিক সত্যই।

ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য

বেদের তিনটি বিভাগ। কর্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড ও দেবতা কাণ্ড। জ্ঞান কাণ্ডকেই উপনিষদ্ বলে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে একশত আট খানি প্রধান। আচার্য শঙ্কর তন্মধ্যে দশখানিকে প্রধান আসন দিয়াছেন। এই সকল উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষদের সিদ্ধান্ত সামগ্রিক ভাবে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্যন্ত ৫৫৫টি অল্পাক্ষর বিশিষ্ট সারার্থভূত সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই নাম বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র।

সূত্রসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহাদের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। নানা জন নানা রূপ ব্যাখ্যান করিতে থাকিলে সূত্রকর্তা বেদব্যাস দেখিলেন তাহার কথার কদর্থ হইতেছে ও ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে। তখন তিনি নিজ হার্দ নিজেই প্রকাশ করিবার জন্য নিজেই নিজ সূত্রের এক অভিনব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সেই ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বলিয়াছেন শ্রীব্যাসদেব বিচার করিতেছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ।
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়।।
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন।।
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বেদব্যাসের সূত্রার্থ অতি গভীর। তিনি আপনি ছাড়া তাহা সম্যক্রূপে বুঝিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। তাই তিনি আপনিই আপন সূত্রের ব্যাখ্যান করিতে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছেন। সূত্রকর্তা যদি নিজে ভাষ্য লিখেন তবে তাহা নিশ্চয়ই অকৃত্রিম বস্তু হইবে—

"প্রভু কহে, আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গম্ভীরার্থ, ব্যাস ভগবান্।।
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছেন ব্যাখ্যানে।।
যেহ সূত্রকর্তা সেহ যদি করয় ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।।"

সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যই যে ভাগবতের শ্লোকে পরিস্ফুট আছে ইহা দেখাইতে হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে, তাই মুখ্য কতিপয় বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় পরিবেশিত হইয়াছে। তাহাদের পারিভাষিক নাম সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

"অতএব ভাগবত এহ নিত্য কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন-ময়।।" (চরিতামৃত)

ব্রহ্মসূত্রেও মুখ্যতঃ ঐ তিনটি বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব সূত্রে সর্বাবসান।।" (চরিতামৃত, আদি ৭)

মূল বাচ্য অর্থাৎ শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য তত্ত্বের নাম 'সম্বন্ধ'। মূল প্রাপ্য তত্ত্বটির নাম 'প্রয়োজন'। প্রয়োজন তত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য যে কর্তব্যতত্ত্বের উপদেশ তাহাই 'অভিধেয়'। ব্রহ্মসূত্রের 'সম্বন্ধ' অর্থাৎ মুখ্য প্রতিপাদনীয় বস্তুতত্ত্বটি যে কী তাহা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের ভূমিকায় শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার বলিতেছেন—

"বিযয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুযোত্তমঃ।"

অর্থাৎ, সর্ব দোয-বর্জিত প্রাকৃতাদি স্পর্শশূন্য অনন্ত গুণগণালঙ্কৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু। "সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" বাস্তব অর্থাৎ পারমার্থিক বস্তুই বেদ্য বা প্রতিপাদ্য। সে বস্তুটি কী—১।২।১১ মন্ত্রে শৌণকাদির প্রতি শ্রীসূত কহিতেছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই পরমতত্ত্ব বলেন যাহা অদ্বয় ও অখণ্ড। সেই অখণ্ড বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। যে অখণ্ড তত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ সেই "স্বয়ং ভগবান্" কৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু।

ব্রহ্মসূত্রে প্রয়োজন তত্ত্ব আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পাই। 'সাম্পরায়ে' এই ২৮ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যানে শ্রীগোবিন্দভাষ্যকারের উক্তি এই যে, যাহাতে সমস্ত বস্তু মিলিত হয় তাহা 'সাম্পরায়' ; এই পদে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝায়। "তদ্বিষয়ক প্রেমা সাম্পরায়ং কথ্যতে।" তদ্বিষয়ক প্রেমাই সাম্পরায়। এই সাম্পরায় বা প্রেমই পরম প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলিতেছেন—

"ময়ি নির্বন্ধহৃদয়ঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।" ভাঃ ৯।৪।৬৬

সতী রমণী সৎপতিকে যেমন প্রীতিমাখা ভক্তি দ্বারা বশীভূত করে, যে-সকল ভক্ত আমাতেই বদ্ধহৃদয়, সেই সমদর্শন সাধুগণ প্রীতি লক্ষণা ভক্তিতে আমাকে তেমনই বশীভূত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্রে অভিধেয় বস্তুর আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দৃষ্ট হয়। প্রারম্ভে গোবিন্দ-ভাষ্যকার বলিতেছেন—

"অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তি-রুচ্যতে।" এই পাদে প্রাপ্য যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুরাগ তাহার হেতু-রূপ ভক্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তির কথা বলা হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ

স্কন্ধে জনক রাজার প্রতি প্রবুদ্ধ বলিতেছেন—

"স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।" ভাঃ ১১।৩।৩২

পাপহারী ভগবান্ শ্রীহরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও করাইবে। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-ভক্তির উদয় হইলে তনু পুলকিত হইবে।

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধে শতশত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। এই সকলেরই বীজ রহিয়াছে পূর্ব কথিত চতুঃশ্লোকীর মধ্যে।

অতএব যেমনই ব্রহ্মসূত্রে তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে উভয়ত্রই সম্বন্ধ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম, প্রয়োজন প্রেম, ও অভিধেয় শ্রবণ-কীর্তনলক্ষণা সাধন-ভক্তি। এতদ্দ্বারা গরুড় পুরাণের নিম্নোক্ত উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদিত হইল।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।"

এই ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। ইহাতে বেদার্থ বর্দ্ধিত রূপে পরিকীর্তিত হইয়াছে। ভাগবতকার নিজেও কহিয়াছেন — "সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।" (১২।১৩।১৫)। বেদান্ত-শাস্ত্রের সারাংশই ভাগবত নামে কথিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কহিয়াছেন—

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহাতে হইতে পারে সূত্র-স্মৃতির অর্থ সার।।"

মহাপ্রভুর উক্তিতে সূত্র শব্দে ব্রহ্মসূত্র ও স্মৃতি শব্দে ভগবদ্গীতা লক্ষিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা এই প্রস্থানত্রয়ের সার নির্যাস রূপে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বিরাজমান আছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যাহা চরম সত্য তাহারও জীবন্ত মূর্তি শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকট। গীতায় শ্রীভগবান্—"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্" (১৮।৬৩) বলিয়া গীতার বক্তৃতা 'ইতি' করিলেন। শেষ করিয়াও আবার ইতির পর পুনশ্চের মত "সর্ব-গুহ্যতমং ভূয়ঃ" ইত্যাদি বলিয়া সর্বগুহ্যতম কথা বলিতে লাগিলেন। দুইটি শ্লোকে অন্তরের সর্বগুহ্যতম কথা বলিলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।"
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" গীঃ ১৮।৬৫-৬৬

গীতার এই চরম পরম শ্লোকদ্বয়েরও একটি প্রকট মূর্তি চাই। অর্থাৎ এমন কোন স্থান, কাল ও পাত্র চাই যেখানে ঐ মন্ত্র-যুগলের অন্তর্নিহিত সত্যটি রূপায়িত হইয়াছে। বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতেই

সেইটি দেখাইয়া দিয়াছেন। রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে বিরহকাতরা গোপীগণের অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে বেদব্যাস লিখিতেছেন—

"তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।।" ভাঃ ১০।৩০।৪৩

গোপীগণ তখন তাঁহার কথাই মনন করিতেছেন, তাঁহার কথাই আলাপ করিতেছেন, সমস্ত কায়চেষ্টায় তাঁহারই অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহার ভাবেই তদাত্মতা লাভ করিতেছেন, তাঁহারই গুণগাথা গান করিতেছেন—গান করিতে করিতে নিজ নিজ দেহ ও গেহের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

গোপীদের অবস্থাগুলি যেন গীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" শ্লোকটির অনুবাদ। তারপর সকল ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র তাঁহারই চরণে আত্মাহুতির জীবন্ত দৃষ্টান্তও রাস-রজনীতে ধাবমানা গোপবধূগণ। "যামাভজন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য" (১০।৩২।২২) দুর্জয় গৃহ-শৃংখলা ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুঃ মুকুন্দপদবীম্" (১০।৪৭।৬১) যাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীমুকুন্দের পদবীকে ভজনা করিয়াছে ইত্যাদি শ্রীগ্রন্থোক্ত বহু বাক্য তাঁহাদের সর্ব ধর্ম পরিত্যাগের সাক্ষ্য-স্বরূপ স্থিত আছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রীগীতাশাস্ত্র সার্থক। গীতা উপনিষদ্-গাভীর দুগ্ধ। ভাগবত সেই দুগ্ধের মন্থনোদ্ভূত নবনীত। কি বেদার্থ, কি সূত্রার্থ, কি গীতার্থ—ভাগবত সকলেরই পূর্ণাঙ্গ মূর্তি।

চেষ্টালব্ধ নহে, কৃপালব্ধ

ভাগবত নিগম-কল্পতরুর ফল কেন তাহা বলা হইয়াছে। এখন ইহাকে 'গলিত' ফল কেন বলা হইয়াছে তাহা আলোচনীয়। বৃক্ষের ফল দুইভাবে আহরণ করা যায়। এক, আকর্ষি দ্বারা টানিয়া নামানো যায়, অপর; পরিপক্ক হইয়া আপনি ঝরিয়া পড়িলে কুড়াইয়া লওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতকে গলিত ফল বলার তাৎপর্য এই যে, ইহা কোন চেষ্টালব্ধ বা সাধনালব্ধ নহে। ব্যাসদেব চেষ্টা দ্বারা গবেষণা বা সাধনা বলে ভাগবত লিখেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্তি দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহেই লিখিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরও কহিয়াছেন—

"ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্তি যে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।।" চৈতন্যভাগবত

শ্রীসূত মুনি বলিয়াছেন "বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্" (ভাঃ ১।৭।১২) কী ভাবে কৃষ্ণ-কথার উদয় হইল তাহাই বলিব। কী ভাবে রচিত হইল বলেন নাই। কারণ স্বপ্রকাশ কৃষ্ণকথা আপনিই উদিত হইয়াছেন। ধ্যানাবিষ্ট বাদরায়ণের "সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে মনোমধ্যে"। যেমন পরম পুরুষ উদিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলাকথাও তেমনই ভাবে উদিত হইয়াছেন। বেদব্যাস ভাগবত গ্রন্থের স্রষ্টা নহেন, তিনি গ্রন্থপ্রণেতা বা গ্রন্থকার নহেন। তিনি ভাগবতের দ্রষ্টা ঋষি। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও কহিয়াছেন—

"যেইমত মৎস্য কূর্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তার সবার।।
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনিই হয়।।" (চৈতন্যভাগবত)

ভাগবতীয় তত্ত্বকে বেদব্যাস দর্শন করিয়াছেন, সৃজন করেন নাই। চেষ্টা করিয়া অর্জন করেন নাই, কৃপা শক্তিতে লাভ করিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে 'গলিত' ফল বলা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—ব্যাসদেব যেন বলিতেছেন, "তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেন আনীয় মহ্যং দত্তম্।" বস্তুতঃ ভাগবতীয় তত্ত্বের কেহই সৃজনকর্তা নাই। ইহা কোন পুরুষ-কৃত নহে। ইহা অপৌরুষে গ্রন্থ। বেদ যেমন অপৌরুষেয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ।

বৃক্ষ হইতে ফল। ফল হইতে বৃক্ষ। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ফল ও বৃক্ষ অভিন্নই। কল্পতরু বেদ ও গলিত ফল ভাগবত অভিন্নই। যেহেতু কল্পতরু স্বয়ং অপৌরুষেয়, সেই হেতু ভাগবত-ফলও অপৌরুষেয় হইবেন। শ্রীশ্রীমহাভাগবতে দেখানো হইয়াছে যে বৈদিক মন্ত্রেই শ্রীশ্রীভাগবতীয় লীলা বর্ণিত আছেন।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুমঃ।।" (৬।১।৪০)। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং ইহা স্বয়ম্ভূ, অনন্যাপেক্ষী। বস্তুতঃ যাহা শাশ্বত সত্য তাহা কোন কালেই কোনও পুরুষসৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ সত্যকে কেহ কোন দিন সৃজন করিতে পারে না। যাহা সৃষ্ট তাহা বিনাশশীল হইবেই। কদাপি তাহা নিত্য সত্য সনাতন হইতে পারে না। দু'য়ে দু'য়ে চার হয় এই গাণিতিক সত্যটির যেমন কোন সৃষ্টিকর্তা নাই,' আবিষ্কারক বা দ্রষ্টা থাকিতে পারেন। ঠিক তেমনই, আধ্যাত্মিক সত্য বেদ বা ভাগবতের সৃজনকারী কেহ থাকিতেই পারে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বেদব্যাস নারদের নিকট পাইয়াছেন, নারদ ব্রহ্মার নিকট পাইয়াছেন। ব্রহ্মাকে স্বয়ং ভগবান্ দিয়াছেন। ভগবান্ তো ইহা আর কাহারও নিকট পান নাই। নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই ইহা সৃষ্ট বস্তু হইল। মানব-সৃষ্ট নাই হইল, ঈশ্বরসৃষ্ট তো হইল। ভগবান্ও তো এক পুরুষ—পুরুষোত্তম। কাজেই ভাগবত তত্ত্বের পুরুষকৃতত্ব বা পৌরুষেয়ত্ব হইলই। এই প্রশ্নের উত্তর এই —

ভগবান্ প্রতি কল্পেই ব্রহ্মার নিকট এই বৈদিক (ভাগবতীয়) তত্ত্ব প্রকাশ করেন। প্রত্যেক কল্পেই একই রূপ করেন। কোন কিছু যোগ-বিয়োগ করেন না। নূতন কিছু দিলেই তাহার তৎকৃতত্ব সিদ্ধ হয়। অনাদি কাল ধরিয়া একই বেদ একই চতুঃশ্লোকী ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করায় ঐ বস্তুতে ভগবৎসৃষ্টত্বও আরোপিত হইতে পারে না। নিত্য বস্তুকে নিত্য পুরুষও সৃষ্টি করেন না। তিনি তাহা নিত্যকাল আস্বাদন করেন ও বিতরণ করেন মাত্র। তিনি নিজে নিজ লীলার আস্বাদক ও প্রচারক — সৃষ্টিকারক নহেন।

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ" (১০।৩৩।৩) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণেন অত্র সংপ্রবর্তিত ইত্যনুক্তেঃ স্বতন্ত্রকর্তৃত্বং তস্মৈ রাসায়ৈব দদতা স্বয়ং চ করণত্বং ভজতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বস্মাৎ সর্বশক্তিভ্যশ্চ সর্বলীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষঃ স্বদত্তো

ব্যঞ্জয়ামাস।"

"এই স্থলে, শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসব প্রবৃত্ত করাইলেন একথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসকেই রাস প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্য কর্তৃত্ব দান করিয়া এবং নিজে করণত্ব ভজনা করতঃ নিজ হইতে সকল শক্তি হইতে এবং সকল লীলা হইতে রাসোৎসবের মহান্ উৎকর্ষ প্রকটিত করিলেন।"

এইরূপ লীলার যেরূপ স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব—লীলা-কথারও সেইরূপই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব। ভগবান্ নিজে করণ মাত্র। অতএব বেদ ও ভাগবতের ঈশ্বরকৃতত্ব সিদ্ধ হইল না—অপৌরুষেয়ত্বই সিদ্ধান্ত রহিল। তাহাই তো গ্রন্থ শেষে শেষ স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।।" ভাঃ ১২।১৩।১৯

শ্রীভাগবত একটি অতুলনীয় জ্ঞানময় প্রদীপ। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে, তৎপর নারদের হৃদয়ে, তৎপর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হৃদয়ে, তৎপর শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে, তৎপর মহারাজ পরীক্ষিতের হৃদয়ে। যাঁহার পরম করুণায় প্রদীপ এইভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন সেই শুদ্ধ নির্মল অশোক অমৃত পরম সত্যকে ধ্যান করি।

এই অপৌরুষেয় গ্রন্থের দ্রষ্টা ঋষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। শ্রীসূতমুনি বলিয়াছেন—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।।" ভাঃ ১।৩।৪০

বেদতুল্য এই পুরাণের দ্রষ্টা ঋষি—ভগবান্ বেদব্যাস। ইনিই ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা, ইনিই মহাভারত, অতএব তদন্তর্গত ভগবদ্গীতার দ্রষ্টা। ইনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ"। শ্রীশ্রীলঘুবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে ব্যাসদেবের বন্দনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ।।"

ভগবান্ বাদরায়ণের চতুর্বদন না হইলেও ব্রহ্মাতুল্য, ভালে লোচন বিশিষ্ট না হইলেও শম্ভুতুল্য, দ্বিভুজ হরির অপর এক মূর্তি। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসদেবের পরিচয় দিয়াছেন—

"দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ।।" ভাঃ ১।৪।১৪

দ্বাপর যুগে পরাশর হইতে, উপরিচর বসুর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে শ্রীহরির অংশ ব্যাসদেবরূপে আবির্ভূত হন। অতএব বেদব্যাসের বাক্য ভগবদ্বাক্যই। ভগবদ্বাক্য ভ্রম-প্রমাদাদি সর্ব দোষ-শূন্য।

"ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব।
আর্য-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব।।" চৈঃ চঃ

স্বয়ং ভগবান্ ঋষি যাহার দ্রষ্টা সে গ্রন্থ পরম আর্য গ্রন্থই। পারমার্থিক সত্য নির্দ্ধারণে এই আর্যগ্রন্থের প্রামাণ্য সর্বোপরি। আচার্যেরা তাই কহিয়াছেন—

"ভাগবতং প্রমাণমমলম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিকতা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে পরম বিচার নৈপুণ্য সহকারে স্থাপন কবিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার প্রমাণ অপেক্ষা শব্দ-প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রুতিই এই শব্দ-প্রমাণ। সর্বশ্রুতির (প্রস্থানত্রয়ের) অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

"বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত।
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি, ভাব সুনির্মল রে।।"

এতাবতা সিদ্ধান্তিত হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদমাতা গায়ত্রী ও উপনিষদ্-সারভূতা ভগবদ্গীতার ও ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যগ্রন্থ। ইহা অপৌরুষেয় পরম আর্য ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য কৃপালব্ধ গ্রন্থ। অতএব ইহা সর্ব প্রমাণ-শিরোরত্ন।

কেবল তাহাই নহে, এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা প্রশ্ন করিয়াছেন—

"ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ।।" ভাঃ ১।২।২৩

ধর্মের বর্ম স্বরূপ ব্রহ্মণ্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, অতএব ধর্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন?

উত্তরে শ্রীসূত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।।" ভাঃ ১।৩।৪৩-৪৪

ধর্ম ও জ্ঞান লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে প্রস্থান করিলে লোক-সকল অজ্ঞানাঁধারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই এক্ষণে এই ভাগবত-সূর্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীগ্রন্থকে "শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্তিত" বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও কহিয়াছেন—

"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভুঃ সর্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়।।" চৈঃ চঃ, মধ্য ২৪

প্রাচীনেরা কৃষ্ণতুল্য শ্রীগ্রন্থ-মহাপুরুষের নিম্নোক্ত রূপ ধ্যান কবিয়াছেন—

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ, তৃতীয়-তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ,
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দৌর্যুগলং তথাসৌ।
কণ্ঠস্তু নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমং প্রফুল্লম্,
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি যো দ্বাদশ-এব ভাতি।।

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।।"

প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধ দুইটি চরণ, তৃতীয় চতুর্থ স্কন্ধ দুইটি ঊরুদেশ, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষোদেশ, সপ্তম অষ্টম স্কন্ধ দুইটি বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশমস্কন্ধ হাস্যময় বদনপদ্ম, একাদশস্কন্ধ ললাটদেশ এবং দ্বাদশস্কন্ধ শিরোদেশ। এইরূপ রূপ-বিশিষ্ট যিনি, যিনি করুণাবতার আদিদেব স্বরূপ, অপার সংসার-সমুদ্রের সেতু-স্বরূপ তমালদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য শ্রীমদ্ভাগবত বিগ্রহ-স্বরূপকে আমরা ভজনা করি। ❑

"শ্রীমদ্ভাগবত" - সাক্ষাৎকার

**"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।" ভাঃ ৩।২।২৩**

ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গভীর বনে ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন। তাঁহার কখনও অন্তদশা কখ[illegible] অর্দ্ধবাহ্যদশা। অর্দ্ধবাহ্যদশায় তিনি শুনিলেন উপরোক্ত শ্লোক। শ্লোক শুনিয়া শ্রীশুকদেব হইলেন বিস্ময়াবিষ্ট। এই অপূর্ব মন্ত্রের দ্রষ্টা কে? অনুসন্ধানে জানিলেন ইহা তাঁহারই পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখনী হইতে উৎসারিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক।

বৈবস্বত মনুর মন্বন্তরে দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আবির্ভাব। ভারতীয় জাতিকে বাঁচাইবার জন্যই তিনি জন্মিয়াছিলেন। যুগ সন্ধিক্ষণের মহা দুর্লক্ষণ এই যে, পুরাতনী অথচ চিরন্তনী সত্য কথা লোকে যেন শুনিতে চায় না। অথচ পুরাতনের সঙ্গে সংযোগ হারাইলে কোন জাতিই বাঁচে না। যেমন গাছের শিকড় কাটিয়া দিয়া তাহার পত্র-পল্লব পুষ্পে অজস্র জল সিঞ্চন করিলেও সেই বৃক্ষ বাঁচে না—মরিয়া যায়, তেমনিই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল শাশ্বত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য হইলেই জাতীয় জীবনে ঘনাইয়া আসে মৃত্যু। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে আজ এশীয়, সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অস্তিত্ব লুপ্ত, প্রায় নাই বলিলেও চলে—তাহার মূলে একই কারণ। ইহারা নিজ ঐতিহ্য ভুলিয়া

'সনাতনী'। রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, ১৪১৪। অমৃত সংঘের মুখপত্র। প্রতিষ্ঠাতা : শ্রীমৎ রাঙ্গা ঠাকুর, সম্পাদক : শ্রীসুজন চন্দ।

গিয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মূলধারাটিকে রক্ষা করিবার জন্য 'বেদব্যাস' সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রের যুগ উপযোগী নূতন রূপ দান করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম 'পুরাণ'। পুরাপি নব—চির পুরাতন কথা। কিন্তু শুনিলে মনে হইবে অভিনব। পুরাণকার বেদব্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাভারত ও তাহার মধ্যে বিরাজমান অতুলনীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদের মধ্যে তিনি গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন সমগ্র বেদ ও উপনিষদ্ সমূহের নির্যাসটুকু।

জগৎজীবের মহা কল্যাণকল্পে এত গ্রন্থ রচনা করিয়াও বেদব্যাসের চিত্তে প্রশান্তি আসিল না। আত্মতৃপ্তি হইল না। চিন্তাকুল বেদব্যাস সরস্বতী নদী তীরে বসিয়া ভাবিতেছেন—চিত্তের কেন এই অপ্রশান্তি?

এমন সময় দেবর্ষি নারদ হইলেন সেইখানে উপস্থিত। দুইজনে হইল বহু মূল্যবান কথাবার্তা। ভারতীয় সংস্কৃতির দুই মধ্যমণি—দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি বেদব্যাস। বেদব্যাসের চিত্তের অপ্রশান্ত ভাব সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন— "বেদব্যাস, তুমি বলিয়াছ সকল কথাই। কিন্তু সকল শাস্ত্রকথা সার্থক রূপ পাইয়াছে যে মহাজীবনের মাঝারে তুমি তাঁহারই জীবনকথা বল নাই আজও। সর্বশাস্ত্রের মহাদান প্রাণবন্ত হইয়াছে যে মহানায়কের লীলানাট্যে, তুমি তাঁহার কথা বিস্তারিত করিয়া বল নাই। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী শ্রীগীতা তুমি বলিয়াছ, অথচ তাঁহার লীলাকাহিনী শ্রীমদ্ভাগবত তুমি বল নাই। সেই মহাজীবন লীলা শুনিলেই বিশ্বজীবেরও পরমা-শান্তি লাভ হইবে।

দেবর্ষি নারদ তখন মহর্ষি বেদব্যাসকে দিলেন 'বাসুদেব মন্ত্র' আর দিলেন 'চতুঃশ্লোকী'। এই 'চতুঃশ্লোকী' নারদ পাইয়াছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট হইতে। যখন শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মা ছিলেন ধ্যানস্থ—তখন ব্রহ্মার অন্তরে অন্তরে স্বয়ং নারায়ণ দিয়াছিলেন ব্রহ্মাকে এই 'চতুঃশ্লোকী'। 'বাসুদেব মন্ত্র' ও 'চতুঃশ্লোকী' পাইয়া বেদব্যাস হইলেন ধ্যানমগ্ন। তখন অপরোক্ষ অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলামৃত তিনি দর্শন করিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইল তখন বেদব্যাসের লেখনী হইতে 'শ্রীমদ্ভাগবত'।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত তো হইলেন। কিন্তু প্রতি নর-নারীর কাছে দেশময় তাহা পৌঁছাইয়া দিবার উপায় কী? বেদব্যাস ভাবিলেন কোনো ছাত্রকে পড়াইলে সে দেশে দেশে গিয়া সজ্জন সভায় পাঠ করিবে — তবেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারণ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাস এমন সব তত্ত্ব ও রসের পরিবেশন করিয়াছেন যাহার আস্বাদন করিতে হইলে আজন্ম ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারীর প্রয়োজন। এইরূপ ছাত্র বেদব্যাস পাইলেন না। তাই তিনি তখন নিজে এক সুযোগ্য সন্তানের পিতা হইবার সঙ্কল্প করিলেন। পিতার তপস্যায় মাতৃগর্ভে সন্তান আসিলেন। সুদীর্ঘ দিন চলিয়া গেল— সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। মহামায়ার তপস্যা করিয়া মহামায়ার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ক্ষণার্দ্ধ সময় পৃথিবীকে মায়াস্পর্শ শূন্য করাইলেন বেদব্যাস। সেইক্ষণেই ভূমিষ্ঠ হইলেন এই ধরাধামে আজন্ম তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশুকদেব। উপবীতাদি হইবার পূর্বেই শুকদেব চলিয়া গেলেন তপস্যা করিতে। 'হা-পুত্র', 'হা-পুত্র' বলিয়া

পিছন হইতে কত ডাক দিলেন ব্যাসদেব। বন হইতে সেই ডাকের প্রতিধ্বনি আসিল, কিন্তু পুত্র দিল না কোনো সাড়া পিতার আকুল ডাকের 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু"— এই হইল ব্রহ্মচারী শুকদেবের অবস্থা। কিন্তু তখনও তাঁহার "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" হয় নাই। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে তখনও প্রবেশ করেন নাই ব্রহ্মচারী শুকদেব।

বেদব্যাস ভাগবতের যে শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া তপস্যারত শুকদেবকে আকর্ষণ করিলেন সেই শ্লোকটি প্রবন্ধের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। এই অপূর্ব শ্লোকের দ্রষ্টা বেদব্যাস তাহারই পিতা ইহা জানিবার পর শুকদেব ফিরিয়া আসিলেন বেদব্যাসের তপোবনে। শুকদেব বেদব্যাসকে জানাইলেন তাঁহার আকুল আগ্রহ এই ভাগবতীয় তত্ত্বরসের আস্বাদনের তৃষ্ণা। লালসা প্রবল হইয়াছে দেখিয়া পুত্রকে তখন পিতা দিলেন ভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রাপ্তির উপায় মাত্র একটিই। ইহার প্রতি তীব্র লালসা। একান্ত আগ্রহমূল্যে ভাগবতধন পাইলেন শুকদেব পিতা বেদব্যাসের নিকট হইতে। "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্"।

'ভাগবত' পাইবার পর হইতেই শ্রীশুকদেব হইলেন ভাগবতপুরুষ, জীবন্ত ভাগবত, চলন্ত ভাগবত।

দ্বাপর- কলির সন্ধিক্ষণে 'কলি' প্রবেশ করিবার উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত। তৎকালে ভারতবর্ষের সম্রাট্ পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ—অর্জুনের পৌত্র। অভিমন্যু—তাঁহার পিতা। মাতা উত্তরা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্তিকালে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরাগর্ভে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির ভারতের সম্রাট্ হন তারপর পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ স্বর্গে গমন করেন, রাজ্যভার পরীক্ষিতের উপর দিয়া।

পরীক্ষিৎ সম্রাট্ থাকাকালীন তাঁহার রাজত্বে কলির আগমন হয়। কলি পরীক্ষিৎকে তাঁহার রাজত্বে একটুখানি স্থান দিতে বলেন। পরীক্ষিৎ রাজী হন না। কলি পরীক্ষিতের দেহে পাপের রন্ধ্র খুঁজিতে থাকে। একদিন মৃগয়ায় গিয়া মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ সঙ্গীহারা হইয়া পড়েন। ফিরিয়া আসিবার কালে জল পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি শমীক ঋষির তপোবনে তাঁহার নিকট জল যাচ্ঞা করেন। শমীক ঋষি তখন কিন্তু ছিলেন ধ্যানস্থ। পরীক্ষিতের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। মহারাজ ঋষির কোনো সাড়া না পাইয়া হইলেন রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ। ক্রোধে তিনি তাঁহার ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প তুলিয়া লইয়া, সেই মৃত সর্প শমীক ঋষির গলায় দেন জড়াইয়া। রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক এই মহৎ ব্যক্তির অবমাননায় রাজার দেহে প্রবেশের ছিদ্র—কলি এইবার পাইয়া গেল।

কিয়ৎ পরে পরীক্ষিৎ বুঝিতে পারিলেন যে, ঋষি ছিলেন ধ্যানস্থ তাই তিনি তাঁহার জল পানের প্রার্থনা শুনিতে পান নাই। পরীক্ষিৎ দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন অনুতাপরূপী অনলে। শমীক ঋষির পুত্র পিতার এই অবমাননায় পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত দিলেন যে সাতদিন অন্তে সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই অভিসম্পাত বাণী শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ একবিন্দুও বিচলিত হইলেন না। তিনি সেই অভিশাপকে বর রূপে গ্রহণ করিয়া লন। তাঁহার পাপ কর্মের সুযোগ্য ফলভোগের উপায় হইল জানিয়া। আর মাত্র সাতদিন আছে—

তাঁহার মৃত্যুর। পরীক্ষিৎ রাজত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন হরিদ্বারে। হরিদ্বারে গঙ্গার তটে আসন গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহকাল প্রয়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। এই সাতদিন তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরি কথা শুনিবেন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু শ্রীহরিকথা বলিবার মতন যোগ্যব্যক্তি দেখিতে না পাইয়া আকুল অন্তরে পরীক্ষিৎ অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। পরীক্ষিতের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ভাগবত- পুরুষ—শ্রীশুকদেব। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন অকস্মাৎ, হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে। সেখানে বিরাট্ জনসভা। মধ্যস্থলে ভারত-সম্রাট্ পরীক্ষিৎ প্রয়োপবেশনে—শ্রীহরিকথা শুনিবার লালসায় বসিয়া রহিয়াছেন। সাতদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে পাপ ক্ষালন করিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায়।

পরীক্ষিতের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া—ভাগবত-পুরুষ শ্রীশুকদেব সপ্তাহকাল ধরিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন রাজা পরীক্ষিতের কাছে ও সেই মহতী জনসভায়। শ্রীভাগবত এইভাবে প্রকটিত ও বিকশিত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত কলিহত জীবের কাছে কী অভিনব সন্দেশটি লইয়া আসিলেন তাহা অবশ্যই আমাদের আজও বিশেষ করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে।

নিখিল শাস্ত্রের বক্তব্যটি কী তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। শ্রুতি, বেদ ও উপনিষদ্ নিখিল শাস্ত্রের সার। উপনিষদ্ হইলেন বেদান্ত। বেদান্ত বিশ্বমানবকে আহ্বান করিয়া জানাইয়াছেন— "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" "ওহে অমৃতের পুত্রগণ শোন" সকলকেই আহ্বান করিয়া সকলকার চির কল্যাণদ বার্তা জগৎকে দিয়াছেন 'বেদান্ত'। শ্রুতির সার বার্তা এই যে, আমাদের জীবন ভরাই দুঃখ। দুঃখশূন্য হইয়া শাশ্বত সুখ লাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা তাই সর্বদাই সুখলাভে চেষ্টা পরায়ণ। লৌকিক চেষ্টায় আমাদের দুঃখ ঘুচে না। ঘোচে সাময়িকভাবে। অল্প ঘুচে। দুঃখের চির নির্বাপণ আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে না। সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় শ্রুতি জগৎকে জানাইয়াছেন।

শাস্ত্র আমাদের পরম সুহৃদ্। দুঃখের জ্বালায় আমরা অহরহ জর্জরিত। অব্যাহতি পাইবার জন্য তাই আমরা সর্বদাই সচেষ্ট। কিছুতেই পারি না আমরা দুঃখের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে। দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভে শাস্ত্র আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। প্রথমে দুঃখের কারণ কী তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন— তাহার পর নিরাকরণের উপায় বলিয়াছেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন দুঃখের কারণ—"নাল্পে সুখমস্তি।" অল্পতায় সুখ নাই। সীমাবদ্ধতাই দুঃখের হেতু। সঙ্কীর্ণতাই সকল অশান্তির মূল কারণ। দুঃখ দূর করিবার উপায় শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন—"যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখম্"। ভূমা অর্থাৎ বৃহতের সহিত মিলন হইলেই সুখ। অসীমের সঙ্গে যোগ হইলেই দুঃখ দূর হইবে। ভূমা বা ব্রহ্ম— অসীম, অনন্ত, শাশ্বত। সেই ব্রহ্মবস্তু বা ভূমার সহিত সংযুক্ত হইলেই জীবের সকল দুঃখ চিরতরে চলিয়া গেল। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সবার চাইতে বড়। বড়কে পাইলেই সকল দুঃখের চরম নিবৃত্তি।

জীবনের মধ্যে দুঃখ আছে, এই কথায় আপত্তি তুলিবার মত লোক আজকে ঘোর সংশয়ের যুগে আছে বলিয়া মনে হয় না। যে-ই শুনিবে সে-ই একবাক্যে বলিবে, হ্যাঁ—দুঃখ আছে এ কথাটি ঠিক। দুঃখ কিন্তু কেহই চায় না। অন্যকে আশীর্বাদ করুক আর না করুক সকলেই প্রভাতে উঠিয়া নিজেকে নিজে আশীর্বাদ করে—"আমার যেন দুঃখ না আসে—সুখ যেন পাই।" সকলের মনের অন্তস্তলের এই কথাটি শ্রুতি মন্ত্র বলিয়াছেন "দুঃখং মা ভূয়াৎ সুখং মে ভূয়াৎ।" সকল জীবের অন্তরের লালসা, দুঃখ না হউক—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই "সুখ হউক" কথাটি আছে। আমাদের জীবনে দুঃখ একটা সুখের সংবাদ বহন করিয়া আনে। দুঃখ মানুষ ভোগ করে ইহার গূঢ় হেতু হইল যে, কোথাও না কোথাও সুখের সন্ধান আছে। সুখ যদি কোথাও না থাকিত ও সুখ সম্বন্ধে কোনও স্মৃতি বা কোনও আশা যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটানা দুঃখ কেহই ভোগ করিত না। শ্রুতিও সেই কথাই বলিয়াছেন—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষঃ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"। কে-ই বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিত, কে-ই বা জীবন ধারণ করিত, যদি কোথাও আনন্দ বস্তু না থাকিত? আনন্দ বস্তু তাহা হইলে একটি আছে।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে দুঃখাদি আপেক্ষিক অনুভূতি। দুঃখ অনুভূতির মূলে আছে সুখস্মৃতি। তুলনাতেই দুঃখের বোধ হয়। বিত্তবানের সন্তান হঠাৎ বিত্তহীন হইয়া পড়িলে তাহার দুঃখ যতটা গভীর, যে প্রথম হইতেই বিত্তহীন তাহার দুঃখ বোধকরি ততটা তীব্র নহে। আমাদের জীবনের দুঃখ অনুভূতিরও সেইরূপ একটি বিপুল মহত্ত্বের সন্ধান আনিয়া দেয়। বৃহত্ত্বের মধ্যে যে আমাদের জন্ম—ভূমাত্বের সঙ্গে যে আমাদের যুক্ততা আছে, দুঃখের অভিঘাত তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋষিরা তাই কহিয়াছেন—"দুঃখ-ত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা"—ত্রিবিধ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তরে তাহা জাগে। জাগে অন্তরে আমাদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আমাদের জীবনে যে পুঞ্জীভূত দুঃখ তাহা ইহাই জানাইতেছে যে, আনন্দঘন বস্তুর স্পর্শ এখনও আমাদের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত হইয়া লাগিয়া আছে। লাগিয়াও আছে—আবার হারাইয়াও ফেলিয়াছি। কথাটা আপাত-বিরোধী, কিন্তু ইহা সত্য।

অল্পে সুখ নাই। খণ্ডে আনন্দ নাই। ভূমাই সুখের আকর। অখণ্ডের মধ্যে আনন্দ। অতএব অখণ্ড আনন্দের সন্ধান লও। খাঁচায় বদ্ধ পাখী কেবল খাঁচার বেড়াটা কামড়ায়। কামড়াইতে কামড়াইতে কেবল "নাল্পে সুখমস্তি" এই বেদমন্ত্রটি জপ করে।

ব্রহ্মের স্বরূপ কী ও কী উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ইহাই বেদান্তের সার কথা। ব্রহ্মপ্রাপ্তির নাম 'উপাসনা'। উপাসনা অর্থ নিকটে আসা। ব্রহ্মের যতই নিকটবর্তী হইব ততই দুঃখের অবসান হইবে। নিকটতর হইতে হইতে যখন ব্রহ্মভূত হইবে তখনই জীব দুঃখের অতীত হইবে। ইহাই শাস্ত্রের সার সংবাদ।

সকল শাস্ত্রের যে কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা তো আছেই। ইহা ছাড়াও ভাগবতের নিজের অভিনব কথা আছে কলিহত জীবের জন্য। সে কথা আর কেহই বলেন নাই আমাদের ইহার পূর্বে, শ্রীভাগবত স্বয়ং প্রকটিত না হইবার পূর্বে।

কলিহত জীবই ভাগবত শাস্ত্রের প্রধানতম শ্রোতা। "সাংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যম্।" অতি করুণাপরবশ হইয়া ভাগবত দুঃখতপ্ত কলিগ্রস্ত সংসারী জীবগণকে বলিতেছেন—"তোমরা এত দুঃখ ভোগ করিতেছ। উপাসনা করিয়া ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভের যোগ্যতা তোমাদের নাই। আমি আনিয়াছি তোমাদের জন্য — নূতন সংবাদ, শোন সেই কথা।"

"জীব! তুমি অক্ষম, শ্রীভগবানের সন্নিকটে যাইবার মতন শক্তি তোমার নাই। ইহা জানিয়া—ইহা বুঝিয়া পরব্রহ্ম আজ করুণা করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছেন। জীব! তুমি 'গোলোকে' যাইতে অসমর্থ, তাই 'গোলোক-বিহারী' স্বয়ং আসিয়াছেন তোমার জন্যে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে।

ভাগবতের ইহাই প্রথম বার্তা। "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।" জগতের প্রতি অশেষ অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া মানুষী তনু ধারণ করিয়াছেন শ্রীভগবান্। এস, তাঁহাকে দেখিয়া যাও ব্রজে বংশীবটে—গোচারণ মাঠে। কত দূরের বস্তু আজ ঘরের হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ আছেন ইহা প্রাচীন বার্তা। তিনি আমাদের জন্য ধরাধামে স্বয়ং আসেন ইহা ভাগবতীয় বার্তা।

ভাগবত বলিয়াছেন—জীব! তুমি শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে জান না। তোমার ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি তাঁহার গোলোকের আসন পর্যন্ত পৌঁছায় না। জীব! তুমি তাঁকে আর কী ডাকিবে? কান পাতিয়া শোন। শোন, তিনি নিজে তোমাকে ডাকিতেছেন। মধুর মুরলীয়া তানে মুরলীধর তোমাকে আকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছেন। তোমা অপেক্ষা কোটিগুণ আর্তি লইয়া তিনি তোমাকে তাঁহার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন।

আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ। কেবলই মধুর তানে ডাকেন বলিয়া তিনি মুরলীধর। তাঁহার বংশী "সর্বভূত-মনোহরম্"—সকল জীবের মনোহরী, মনঃপ্রাণ আকর্ষণকারী, ইহা শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় বার্তা। শ্রীভগবান্ আছেন শুধুই নহে—তিনি আমাদের জন্য আমাদের কাছে আসেন ও তিনি আমাদের ডাকেন।

বেদান্ত বলিয়াছেন ব্রহ্মের কথা। কিন্তু কী বলিয়াছেন? কিছু বলা যায় না—তিনি 'অশব্দ'—এই কথাটি বলিয়াছেন। তিনি শব্দের অবাচ্য ইহাই শুধু বলা যায়। তিনি অরূপ, অস্পর্শ, অব্যয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। মনের অতীত। বুদ্ধির অতীত। ধ্যান-ধারণার অতীত। এমনকি আলোচনারও বহির্ভূত বা ঊর্দ্ধে স্থিত। এই 'ভাবনার অতীত'কে লইয়া ভাবনা করিতে সাধারণ জীবের ভয় হয়। চিন্তায় যাঁহাকে নাগাল পাওয়া যায় না, তাঁহাকে চিন্তার গণ্ডীতে আনিবে কে? ভাগবত জানাইতেছেন—জীব! ভয় নাই-ভয় নাই। ভাবনার অতীত ধন, ভাবনার মধ্যে আজ নামিয়া আসিয়াছেন।

ধ্যানের অতীত ধন, ধ্যানের মধ্যে দিয়া ধরা দিয়াছেন। নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকারের ভাষা আমাদের আয়ত্তে নাই— তাহা আমরা পড়িতে জানি না। অজানা ভাষা, আজ জানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছেন। নির্গুণ-নিরাকার-নির্বিশেষ পরব্রহ্মের সগুণ-সাকার-সবিশেষ-অনুবাদই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা নিখিলজীবের আত্মার আত্মা, তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনে নন্দনন্দন—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।" ভাঃ ১০।১০।৫৫

শ্রীকৃষ্ণ গূঢ় কপট মানুষ।" মানুষ, কিন্তু মানুষ নহেন। তিনি পরাৎপর ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় অনুবাদ। ইহাই ভাগবতের তৃতীয় বার্তা। যিনি চিন্তার অতীত—অচিন্তনীয় তিনিই আজ চিন্তামণি হইয়া জীবের ভজনার ধন হইয়াছেন। ব্রহ্মের কথা বলা যায় না। যদি ঈশ্বরের কথা কিছু বলিতে ও শুনিতে হয় তবে শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলিতে এবং শুনিতে হইবে। শ্রীভগবানের কথা যদি বলিতে ও শুনিতে হয় তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতই একমাত্র ভরসা। ইহা ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবত জীবের দুয়ারে এক পরম করুণার বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীভগবান্ 'পরমবস্তু'। তাঁহাকে পাইবার অধিকারী প্রত্যেক নরনারী। কোন্ যুক্তিতে বলিলেন এই কথা? ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা সকলের আছে কি? উত্তর এই যে, ঈশ্বর লাভ করিতে মাত্র একটিই বস্তু লাগে এবং তাহা সকলেরই কাছে কাছে। কী সেই বস্তু? সেটি আর কিছু নয়—হৃদয়ের সহজ শুদ্ধ ভালবাসা।

'সহজ'—কথাটির অর্থ সহজাত আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। 'সহজ ভালবাসা' বলিতে বুঝায়—যে-ভালবাসা দ্বারা মানুষ ভালবাসে তাহার মাতা-পিতাকে, স্ত্রী-পুত্রদের। আত্মার তিনটি ধর্ম—"অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ত্ব।" এই প্রিয়ত্ব ধর্মই ভালবাসা। সেই ভালবাসা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

'শুদ্ধ-ভালবাসা' বলিতে বুঝায় যে-ভালবাসা স্বার্থলেশহীন, যে-ভালবাসার মধ্যে কোনো স্বার্থপরতা নাই—নাই কোনো অভিসন্ধি বা মতলব, যাঁহাকে ভালবাসিতেছি তাঁহার সুখবিধান ছাড়া মনে অন্য কোনও বাঞ্ছা নাই। এই শুদ্ধ ভালবাসা সকলের আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, হ্যাঁ আছে। আমাদের সাধারণ ভালবাসার যাহা মালিন্যটুকু তাহা কিন্তু ভালবাসার স্বভাব নহে। মালিন্যটি আগন্তুক। সেই মালিন্যটি সরাইয়া দিলেই ভালবাসার স্বাভাবিক শুদ্ধতা ব্যক্ত হইবে।

জল যেমন স্বভাবতঃই অমলিন। তাহাতে মালিন্য আসিয়া পড়িলে তাহা দূর করা যায়। জল ফুটাইয়া অথবা পাতন করিয়া অথবা ফিলটার করিয়া মলিন জপ সুপেয় পানযোগ্য হইয়া যায়। চিত্তের ভালবাসা সেইরূপ— স্বভাবতঃই শুদ্ধ। মলিন হইয়াছে স্বার্থ সংযুক্ত হওয়ায়। চিত্তের মার্জন করিয়া ভালবাসাকে শুদ্ধ করা যায়। চিত্তের মার্জন হয় ভজনে। ভজন দ্বারা সুমার্জিত হইলেই সকলের হৃদয়ের সকল ভালবাসাই শুদ্ধ হইয়া যায়। সেই শুদ্ধ ভালবাসা শ্রীনন্দ-নন্দনে সমর্পিত হইলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

এই বিরাট্ সত্য শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ঘোষণাই করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের লীলাজীবনের মধ্যে তাহা মূর্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণের কারণ যে লীলাপুরুষোত্তম তাঁহাকে বৃন্দাবনে এক সাধারণ গোয়ালিনী রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন, ইহা এক অভিনব বার্তা শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" হৃদয়ের সহজ শুদ্ধ ভালবাসা দ্বারা

সকলেই পরমবস্তু কৃষ্ণধনকে আপনজন করিয়া লইতে পারে ইহা ভাগবতের এক অপূর্ব ঘোষণা।

"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণের ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার।।" চৈঃ চঃ

মুরলীধর তাঁহার মোহনীয়া বাঁশি বাজাইয়া আমাদের অবিরত ডাকিতেছেন—তবে সেই ডাক আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না কেন? ভাগবত বলেন,—সংসারের কর্ম কোলাহলে আমাদের কর্ণ বধির হইয়াছে, তাই শুনিতে পাইতেছি না। সেই বধিরতা ঘুচাইবার ওষধটি কী তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। বলিতেছেন— মুরলীর ডাক শুনিয়া যাঁহারা উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদেরই কথা শোন—নিত্যই শোন। শুনিতে শুনিতে যাহার কান শোনার যোগ্য হইয়াছে—সেই-ই শোনে।

হৃদয়ের সহজাত ভালবাসা কৃষ্ণে অর্পিত হইলেই যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি তবে সেই ভালবাসা তো ধন-ঐশ্বর্য, পুত্র-কন্যা, পতি-পত্নীর দিকেই ধাবিত হয়। কৃষ্ণের দিকে তাহাকে লইবার উপায়টি কী? ভাগবত উপায় বলিতেছে—যাঁহাদের ভালবাসা কৃষ্ণের পানেই ধাবিত হইয়াছে তাঁহাদের সঙ্গ কর। দৈহিক সঙ্গ কর। মানস সঙ্গ করা সকলেরই সম্ভব। নিত্য নিয়মিতভাবে তাঁহাদের কথা শ্রবণ ও মনন করিলেই মানস সঙ্গ হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ এমনি লীলা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলেই চিত্ত তৎপর হইয়া যায়।

যাহা শুনিলে চিত্ত তৎপর হয়—অর্থাৎ কৃষ্ণপর হয়, কৃষ্ণ অনুপ্রাণিত হয় সেই কথা শোন। ভাগবতী কথা শুধুমাত্র শ্রবণেই অশেষ মঙ্গল—শ্রবণ মঙ্গলম্। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তনই কলিহত জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ অথচ সহজতম সাধন।

বেদান্তকে বলা হয় 'নিগম'—সমস্ত জ্ঞান যে আকর হইতে নির্গত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন বেদরূপে কল্পবৃক্ষের সুপক্ক গলিত ফল। গাছ হইতে আম্রফল দুইটি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। আঁকশি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আহরণ দ্বারা, অথবা আম্রফল গাছেই যখন সুপরিপক্ক হইয়া যাইবার পর আপনা হইতেই ভূতলে পড়িয়া আসে। আঁকশি দ্বারা আপাতঃ পক্ক ফলটি কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে তখনও কাঁচা থাকিতে পারে কিন্তু আপনা হইতে পক্ক ফলটি ভূতলে যে পড়ে তাহা কিন্তু সুপরিপক্ক। শ্রীমদ্ভাগবতে এর পরিচয়—"গলিতং ফলম্"। এই কথাটির অর্থ তাই অতীব নিগূঢ়।

বেদমন্ত্রে আছে যে, পর-ব্রহ্মের সংবাদ চেষ্টা করিয়া জানা যায় না। তিনি সাধনের অতীত। তাঁহাকে জানা যায় শুধু তাঁহারই করুণায়। তিনি আমাদের 'প্রয়াস-সাধ্য' নহেন তিনি 'প্রয়াস-লব্ধ'। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। 'গলিতং ফলম্' কথাটির মধ্যে সেই তত্ত্বটিই লুক্কায়িত।

সাধনায় তাঁকে যদি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সাধনার প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে দারুণ দাবদাহে—গৃহমধ্যে কেহ তপ্ত। নির্দেশ করা হইল ঘরের

জানলাটি খোল। সে জানলা খুলিয়াই তৎক্ষণাৎ বাতাস চাহিতেছে। কিন্তু জানলা খোলা আর বাতাস আসার মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ কিন্তু নাই। বাতাস না বহিলে জানলা খোলা থাকিলেও বাতাস গৃহে প্রবেশ করিবে না। আবার বাতাস বহিতেছে কিন্তু জানলাটি বন্ধ তখনও বাতাস ঘরে আসিবে না।

বাতাস যদি বহে, আর ঘরের জানলা যদি থাকে খোলা তবেই সে ঘর বাতাস পরশনে স্নিগ্ধ হইবে। বন্ধ দুয়ার—বন্ধ গবাক্ষ যাহার তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

আমাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খোলাটির নামই সাধনা। বাতাস আসা করুণা। কপাট খুলিয়া অপেক্ষায় থাকাই তপস্যা। আম্রবৃক্ষের গলিত আমটি পাইতে কাহাকেও অপেক্ষায় থাকিতে হইবে আম্রবৃক্ষের তলদেশে। বেদবৃক্ষের গলিতং ফলম্ শ্রীমদ্ভাগবত তপস্যামূর্তি মহর্ষি বেদব্যাস যখন ছিলেন অপেক্ষমান সরস্বতী নদীতীরে তখন কারুণ্যমূর্ত দেবর্ষি নারদ দিলেন বেদব্যাসের হস্তে তুলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পক্ক ফলটি। ভাগবত একটি অতি সুন্দর সংবাদটি এই যে, —তপস্যা দ্বারা মানুষ যেমন ব্রহ্মত্ব লাভ করে বেদ যাহা বলিয়াছেন—তেমনি পরব্রহ্মও সেইরূপ তপস্যা দ্বারা মানবত্ব লাভ করেন। এই কথাটি বেদ-বেদান্ত ব্যক্ত করেন নাই। ভাগবতই প্রথম সে খবরটি আমাদের দিয়াছেন।

মানুষের যে তপস্যা তাহাকে বলা হয় সাধনা। শ্রীভগবানের তপস্যার নামটি হইল করুণা। সাধনায় মানুষ উর্ধ্বে ওঠে। করুণায় ঈশ্বর নিচে নামিয়া আসেন। নামিতে নামিতে ভগবান যখন একেবারে মানুষ হইয়া "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি" হইয়া যান তখন শ্রীভগবান সুন্দরতম হইয়া যান। সুন্দরতম মাধুর্যে ভরা। "মাধুর্য ভগবত্তা সার।" ইহাই ভাগবতের পরম বার্তা।

"মাধুর্য ভাগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন নানা মতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ।।"

ভাগবতের সকল সংবাদই ভক্তেরা শোনেন। শ্রদ্ধার সহিত শোনেন। ব্রজের সুন্দরতমের সংবাদ পাইলে তাঁহারা মাতিয়া উঠেন। আনন্দে পাগল হইয়া যান। কারণ সুন্দরতম যিনি তাঁহার মাধুর্যময় সংবাদই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তরের অন্তরতম বার্তা। সর্বজীবের অন্তর আলোড়নকারী বার্তা।

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চারিটি মাধুর্যের বার্তা দিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্যে এই বার্তা আর কোথাও নাই। রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য ও লীলামাধুর্য। এই চারি মাধুর্যে ব্রজের নন্দনন্দন অনন্য-সাধারণ। তাঁহার রূপও অরূপের রূপ, শাশ্বত নিত্যরূপ, নবকিশোর-নটবর। *সেরূপে শুধু জগৎই ভোলে না—আপনার রূপেও আপনি মুগ্ধ তিনি। আত্ম-পর্যন্ত সর্ব-চিত্তহর!*

ভাগবতের প্রতিপাদ্য দেবতা বেণুধর। বেণুধর বেণুমাধুর্যে জগৎকে ডাকেন তিনি, আপনার অভিমুখে বংশীর তানে। যখন বংশীতে ফুৎকার দেন তখন অধরের মাধুর্যরাশি বংশীর ছিদ্রপথে ঢালিয়া দেন। উহাই ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতে ছড়াইয়া যায়।

"বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পায় পরিণাম।"

সেই বংশীধ্বনিতে নিখিল বিশ্বে আলোড়ন উপস্থিত হয়।

সেই বংশীধ্বনিতে গিরি গোবর্দ্ধনের শিলা গলে। বেগবতি যমুনা নদী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। গো-ধেনুর পাল উর্দ্ধ পুচ্ছে ছোটে। নর-নারীর চিত্ত কৃষ্ণ লালসায় আকুল হইয়া উঠে। আরও কত কি ঘটে। ভাগবত গাহিয়াছেন প্রাণ ভরিয়া, সেই মুরলীর মোহনীয় মাধুর্য।

ব্রজধামের গোপ-গোপীগণের শুদ্ধ ভালবাসায় ষড়্-ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান্ পর্যন্ত আত্ম-বিস্মৃত। যিনি এত বিরাট্, স্বরাট্ তিনি হইয়া যান কত ছোট—ইহাই প্রেমমাধুর্য। যাঁহার ভয়ে যম পর্যন্ত সদা সন্ত্রস্ত—সর্বদা ভীত সেই শ্রীভগবান্ মায়ের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মিথ্যা উক্তি করেন। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র-পুরুষ হইয়াও ভগবান্ শুদ্ধ প্রেমের দুয়ারে সম্পূর্ণ অধীন। এই ভক্ত-অধীনতা বশতঃই ব্রজেন্দ্রনন্দনের এত মধুরিমা। এই প্রেমমাধুর্যের গভীরতা অতল স্পর্শী।

লৌকিক সাহিত্যে সাহিত্যকারেরা প্রধানতঃ কান্তা-প্রেমেরই বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেরই আস্বাদন করিয়াছেন। এই পঞ্চ রসের মধ্যে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই তিনটি রসের যে অপূর্ব ভিয়ান করিয়াছেন ভাগবত শাস্ত্র তাহার জুড়ি নিখিল বিশ্বসাহিত্যে নাই। শ্রীভগবান্ ভক্তহৃদয়ের প্রেম-মাধুর্যের ভোক্তা। শ্রীভাগবত তাই অশেষে-বিশেষে প্রেম-রসের যত প্রকার বৈচিত্র্য হইতে পারে তাহা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

শ্রীহরি লীলাময়। সেই লীলায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এই দুইটি বস্তু আছে। ঐশ্বর্যে শ্রীহরির মহত্ত্ব প্রকাশিত। মাধুর্যে প্রকাশিত তাঁহার প্রিয়ত্ব। এই দুই মিলিয়া এক অনির্বচনীয় মধুরিমা।

শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে বধ করিয়াছেন তাহার স্তন্যপান করিতে করিতে। পূতনা বধে ঐশ্বর্য, স্তন্যপানে মাধুর্য। দুইয়ের মিলনটি চমৎকার। আবার পূতনা যে আসিয়াছিল কৃষ্ণকে বধ করিতে তাহাকেই তিনি দিলেন গোলোকে ধাত্রীগতি। ইহার তুলনা নাই।

কালীয় দমন করিতেছেন নন্দনন্দন। কৃষ্ণ নৃত্যের তালে তালে নাগরাজের বিষধর ফণাগুলি এক এক করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া। কালীয় দমনে ঐশ্বর্য। মধুর নৃত্যে অপূর্ব মাধুর্য। এই দুই-এর মিলন অভিনব চিত্তচমৎকারী। ব্রজ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য অপরিসীম মধুরিমামণ্ডিত। ইহার বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের নৈপুণ্য বিস্ময়কর।

চারি মাধুর্যে মণ্ডিত মধুময় শ্যামসুন্দর সুন্দরতম। এই সুন্দরতমকে আপনজন করিয়া লইবার সহজ উপায় হইল হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু যাহা — 'ভালবাসা' তাহাকেই নিঃশেষে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করা। সেই ভালবাসা আছে সকল জীবের বুকেরই তলে। সুতরাং জাতি-বর্ণ-

গোত্র নির্বিশেষে সকল নর-নারীই সেই সুন্দরতম প্রিয়তমকে হৃদয় সর্বস্ব করিয়া লইবার অধিকারী।

শ্রীভাগবতের অপূর্ব দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভাগবতশাস্ত্র শুধুমাত্র শ্রবণ করিলেই কল্যাণ উদয় হয় — ইহা ভাগবতের এক অপূর্ব বিশেষত্ব। অন্য যে-কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া কার্যতঃ কিছু অন্ততঃ করিতে হয়। "সদা সত্য কথা বলিবে" — এই উপদেশ শুনিয়া সত্য কথা বলিতে হয়। না করিলে উপদেশ শোনা প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। ভাগবত কথা কিন্তু শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়! ইহার কারণ এই যে, অন্যান্য শাস্ত্রে আছে—ইতি-কর্তব্যতা। ইহা করা উচিত। ইহা করা অনুচিত। এই সব কর্তব্যের উপদেশ। এই সব উপদেশমত জীবন যাপন করিলে তবেই কল্যাণ হয়। উপদেশগুলি কেবল শুনিলেই বা জানিলেই কোন ফল হয় না।

ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ-প্রধান নহে। কর্তব্য-অকর্তব্য ইহাদের নির্দেশ ভাগবতের একমাত্র কার্য নহে। জীবের কাছে বিশেষ একটি বার্তা পরিবেশন করাই ভাগবতের মূল উদ্দেশ্য। শ্রীভগবান্ প্রেমের ঠাকুর। তাঁহাকে শুদ্ধ ভালবাসায় পাওয়া যায়। তিনি আসেন জীবের ঘরে। তিনি জীবকে ডাকেন মধুর সুরে। তিনি আমাদের আপনজন অনাদিকাল ধরিয়া। এই সংবাদটিই ভাগবত আমাদের জানাইতেছেন। আমরা আমাদের অনাদিকালের সুহৃৎ সখাকে ভুলিয়া গিয়াছি। কোন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কথা মনে আবার জাগিলেই সেই বিস্মৃতপ্রায় সৌহার্দ্য জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহাতেই চরম মঙ্গলের উদয়।

যাঁহারা সাহিত্যরসের মর্মজ্ঞ—তাঁহারা 'রসিক'। যাঁহারা দর্শনতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা 'ভাবুক'। রসিক যাঁহারা তাঁহারা শুষ্ক দর্শন-তত্ত্ব আস্বাদন করেন না। পক্ষান্তরে দর্শনতত্ত্বজ্ঞরা সাহিত্যরসকে করেন উপেক্ষা। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু রসিক ও ভাবুক এই উভয়েরই আস্বাদ্য বস্তু।

ভাগবত শ্রীভগবান্‌কে করিয়াছেন সহজ সুন্দর মানুষ। আর তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন নির্মল ভালবাসা। মানুষ আর ভালবাসা এই দুইটি বস্তু হইল লৌকিক সাহিত্যের উপাদান। এইজন্য পুরাণ-শিরোমণি, সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছেন অপূর্ব সাহিত্য। যুগ যুগ ধরিয়া শত কাব্যমোদীর রসের উপাদান জোগাইয়াছেন ভাগবত শাস্ত্র।

আবার ভাগবতের লক্ষ্যবস্তু পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ সেই শাশ্বত বস্তুর ও তত্ত্বের আলোচনায় শ্রীভাগবত গ্রন্থ হইয়াছেন দর্শন গ্রন্থ। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবত রসিক এবং ভাবুক এই দুই জনারই আস্বাদন বস্তু। ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। দর্শনতত্ত্ব এবং কাব্যরসের মিলিত মাধুর্য ভাগবত গ্রন্থে প্রবাহিত। তাই প্রারম্ভেই ঋষির আহ্বান—"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।"

'ব্রহ্মসূত্র' বেদান্ত-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বেদান্ত দর্শনের ধারা দুইটি। একটি জ্ঞানের ধারা ও আর একটি ভক্তির ধারা। ভিত্তিভূমি কিন্তু একই— ব্রহ্মসূত্রের উপরেই সব প্রতিষ্ঠিত। অপৌরুষের শাস্ত্রই বেদশাস্ত্র। বেদের প্রাণমন্ত্র প্রণব। বেদ ও উপনিষদ্ সমূহের অভ্যন্তরে গভীরতমভাবে প্রবেশ করিয়া মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে।

ব্রহ্মসূত্রের মত চতুঃশ্লোকীও একইভাবে বেদব্যাসের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যাহা ব্রহ্মসূত্রে তাহাই চতুঃশ্লোকীতে শ্লোক আকারে প্রকটিত। ব্রহ্মসূত্র খুব কঠিন, রহস্যপূর্ণ ও দুর্বোধ্য হওয়ায় বেদব্যাস নিজেই চতুঃশ্লোকীতে ব্যক্ত করেন শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিত রূপে। এই ভাগবতই—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড় পুরাণ বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।"

"ব্রহ্মসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে
অতএব আপন সূত্রের করিয়াছেন ব্যাখ্যানে।।
যে সূত্রকর্তা সে যদি করে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।।
প্রণবেতে যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।।
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল।।
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।।
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীমদ্ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ।।"

সুতরাং ভাগবতই হইল ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ভাষ্য। সূত্রের এই অকৃত্রিম ভাষ্য ভাগবত থাকিবে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের নূতনভাবে মূল্যায়ন করিতে হইবে। যে-ভাষ্যকারের যে-কথা শ্রীভাগবতের অনুগত তাহাই আদরণীয়। যাহা শ্রীভাগবতের অনুগত নহে বরং বিরুদ্ধার্থে তাহা ভাষ্যকারের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" এই সূত্রটি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ। ইহা দ্বারা উভয় গ্রন্থের একত্ব বুঝিতে পারা যায়। উভয় গ্রন্থের লক্ষ্য একই—চরম ও পরম বস্তু যিনি ব্রহ্ম। পার্থক্যটুকু এই যে "ব্রহ্মসূত্রে" পরম তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মভূমিতেই স্থিত। বেদান্তের ব্রহ্মে, ব্রহ্মের প্রিয়স্বরূপতা ও কারুণ্যময়তা অপ্রকট। ভাগবতে শ্রীভগবানের ভগবত্তার সর্বাধিক অভিব্যক্তি। প্রিয়স্বরূপে ভগবান্ পতি, পুত্র, সখা। কারুণ্যশক্তির বিলাসে তিনি দয়ার ঠাকুর ও ক্ষমার দেবতা। যে-শ্লোক অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রবণ করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী পরম তপস্বী শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবত আস্বাদনের জন্য লোলুপ হইয়া বেদব্যাসের কুটিরে ছুটিয়া আসেন সেই শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে—পাপী পূতনা কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে নিজ স্তনে কালকূট বিষ মাখাইয়া দুগ্ধপান করাইয়াছিল। পূতনা আসিয়াছিল মাতৃরূপ ধাত্রী সাজে—শিশু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইতে। পূতনারও সর্বপাপ ক্ষমা করিয়া পরম করুণাময় যে দেবতা পূতনাকে বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি দিয়াছেন সেই দয়ালু প্রভু ছাড়া আমাদের মতন অভাজন জীব আর কাহার শরণ লইবে? পাপীর

এমন বন্ধু, এমন দয়ালু বন্ধু আর কে আছে?

শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সবই জানেন। তাঁহার জানার বাকী কিছুই ছিল না। তবু তিনি একটি কথা জানিতেন না যে পরব্রহ্ম এত করুণাময়। কেননা বেদান্তের ব্রহ্মে করুণাশক্তির বিলাস নাই। তাহা আছে শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবানে।

জল আর বরফ বস্তু হিসাবে একই। কিন্তু পার্থক্য কিছুটা আছে। জলে "তৃষ্ণা-নিবারণী শক্তি" সুব্যক্ত। বরফে উহা অব্যক্ত। ভাগবতের ভগবানে করুণাশক্তি সুপরিব্যক্ত। বেদান্তের ব্রহ্মে করুণাশক্তি ঘুমন্ত। তাই ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেবেরও শ্রীভাগবতের উপরে লোভ। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ "আত্মারামগণাকর্ষী"।

মানুষে মানুষে প্রীতির মিলন, আনন্দ ও বিরহের বেদনা ও উহাদের বিবিধ বিচিত্রতা লইয়াই লৌকিক সাহিত্য ও লৌকিক কাব্যগ্রন্থ। শ্রীভাগবতেরও মুখ্য আলোচ্য বিষয় প্রেম ও প্রীতির মিলন, বিরহ ও তাহার অশেষ প্রকার বিচিত্রতা লইয়া। পার্থক্যটুকু এই যে লৌকিক সাহিত্যে ও কাব্যের মানুষ মরজগতের মানুষ ও মরজগতের ভালোবাসা। নশ্বর ব্যক্তিদের বিনাশশীল আকর্ষণ। পক্ষান্তরে ভাগবতেব মানুষ 'গূঢ়কপট মানুষ'— মানুষরূপে পরব্রহ্ম। ভাগবতের ভালোবাসা আত্মার সহিত পরম আত্মার। ভাগবতের প্রেম, ভক্তসঙ্গে ভগবানের শাশ্বত ভাববন্ধন। ভাগবত যেন খাদবিহীন খাঁটি সোনা। লৌকিক সাহিত্য যেন গিল্টি করা সোনা। আপাত দৃষ্টিতে দুইই সমুজ্জ্বল, গভীর দৃষ্টিতে, একটি বস্তু অবিনশ্বর অমৃতময়—অপরটি মরণধর্মী বিষময়।

লৌকিক সাহিত্যে আগাগোড়া—ভক্তির প্রবাহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন; অখণ্ড। শ্রীমদ্ভাগবত যতই পড়া যায় — ততই হরিভক্তি রসমাধুর্যে অন্তর নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। বৈষয়িক মায়িক ভোগ লালসা আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। কৃষ্ণ-প্রেম জাগে। আত্মপ্রীতি চলিয়া যায়। লৌকিক সাহিত্য পাঠে একটি মায়িক বৈষয়িক সুখভোগের লালসা। পার্থিব-নশ্বর ভোগ লালসা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। আত্মপ্রীতি স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিত্ত কৃষ্ণবিমুখ হইতে থাকে। কৃষ্ণকে ভুলিতে ভুলিতে আমরা আরও দুঃখের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকি। তথাকথিত জ্ঞান অর্জনটি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানই বৃদ্ধি করে। চিত্ত, বুদ্ধি, মন ভুল পথে ধাবিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে থাকিলে অথবা নিয়মিত শ্রবণ করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে চিত্তের মালিন্য ঘুচিয়ে থাকে। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে আমাদের যে প্রকৃত পরিচয়টি—স্বরূপটি লুক্কায়িত আছে তাহা আস্তে আস্তে আলোকে আসে—আত্মজ্ঞান জাগে—আমাদের প্রকৃত স্বরূপটি কী ও কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধটি কী তাহা আমরা জানিয়া যাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জগদ্গুরু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব ভক্তশিরোমণি। গীতায় ভগবান্ বক্তা — কাজেই তাঁহার পক্ষে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সমস্ত কথাগুলি বলা সম্ভব হয় নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং যে সুন্দরতম, মধুরতম এবং তাঁহার প্রিয়ত্ব ও প্রেমের আস্বাদন কত গভীর ; এই সব কথা তিনি নিজ মুখে

বলিতে পারেন না। ঐসব কথা তিনি নিজেও ভাল করিয়া জানেন না, বলেন না — বলিতে পারেন না। যদি বলিতেন তাহা হইলে তাহা রসাবহ হইত না। শ্রীভাগবতের বক্তা ভক্ত। তাই শ্রীভগবানের ঐ সকল মাধুর্যের কথা অতীব মনোজ্ঞভাবে শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন।

'ভগবদ্-ভক্তি' বস্তুটি আসলে কিন্তু ভক্তেরই সম্পদ্—ভগবানের নয়। পুত্রের হৃদয়েই থাকে পিতৃমাতৃ-ভক্তি। পত্নীর হৃদয়ের গভীরে থাকে পতির প্রতি প্রেমটি। ভগবদ্ভক্তিও সেইরূপ ভক্তজন-হৃদয়-কন্দরে বাস করে। ভক্ত-হৃদয়ে সদা সর্বদা প্রবাহিত হইতে থাকে। এই হেতু ভক্তমুখেই ভক্তি-প্রেমের আস্বাদন ও কথা অধিকতর মাধুর্যমণ্ডিত হয়। তত্ত্বকথার আলোচনায় শ্রীভগবান্‌কে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সেই কারণেই গীতার তত্ত্বকথা আর ভগবতের তত্ত্বকথা অভিন্নই। গীতায় যে-সকল সাধক-ভক্তের লক্ষণ বলা আছে, ভাগবত তাঁহাদের মূর্তি আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন। যেমন গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগে ভক্তের লক্ষণ সকলই ভাগবতের শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। "সর্বধমান্ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ" গীতার এই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি শ্রীমদ্ভাগবতের রসলীলায় গোপীর অভিসারে জীবন্ত হইয়াছে।

গীতার চরম তত্ত্ব 'পুরুযোত্তম'—এই তত্ত্বটি গীতা অতি সুন্দরভাবেই বলিয়াছেন, কিন্তু পুরুযোত্তমের লীলারস-মাধুর্যের সবটুকু ভাগবতই উপছাইয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। গীতা ও ভাগবত দুইই পুরুযোত্তমবাদী। পুরুযোত্তমের তত্ত্বটির দিকে গীতার দৃষ্টি। তত্ত্বকে গ্রহণ করে চিত্তের যুক্তি। সুতরাং গীতা যুক্তিপ্রধান, ভাগবতের দৃষ্টি রসের দিকে। রসকে গ্রহণ করে চিত্তের ভাবনা। সুতরাং ভাগবত ভাবপ্রধান।

তত্ত্ব ও এই কথা দুইটি কী—তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। সন্দেশ একটি সুখাদ্য বস্তু। সন্দেশের মধ্যে কী কী উপাদান, কী কী ক্রম অনুসারে সেই সব উপাদান সংমিশ্রণ, সন্দেশের প্রস্তুত প্রণালী কী — এই সকল আলোচনাকে বলা যায় সন্দেশের তত্ত্ব আলোচনা। আর আমাদের রসনার সহিত সন্দেশের মিলন ঘটিলে যে একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি হয়— তাহার স্বরূপ ও বৈচিত্র্যের আলোচনাকে বলা যায় রস-আলোচনা। পরমতম ব্রহ্ম বস্তুর আলোচনায় উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও ভাগবত সকলেই একই পথের পথিক। কিন্তু রসের বিন্যাসে, রসের বিস্তারে ও তাহার আস্বাদনে শ্রীমদ্ভাগবত সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। ভাগবত তাই শাস্ত্র-চক্রবর্তী।

উপনিষদ্‌কে আচার্যপাদগণ বলিয়াছেন, 'শ্রুতি-প্রস্থান'। ব্রহ্মসূত্রের নাম দিয়াছেন, 'ন্যায়-প্রস্থান'। এই দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃষ্ট স্বরূপ পরিচয় হইতে পারে — 'রস-প্রস্থান'।

শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রে যাঁহার স্বরূপের সন্ধান, মধুব্রহ্ম আনন্দব্রহ্ম নামে যাঁহার পরিচয়, ভাগবত তাঁহারই নিরূপণে রসলীলার কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে ঐ রস, ঐ মধু, ঐ আনন্দ অলৌকিক রূপে আস্বাদিত হইয়াছে।

চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ ভারতের ঋষি প্রদর্শিত সাধনের মুখ্য লক্ষ্য। এইজন্য সাহিত্যিকদিগের প্রতিও নির্দেশ ছিল মহনীয় চরিত্র লইয়া কাব্য ও সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। যোগেশ, সুরেন,

সরোজিনী, বিনোদিনী ইহাদের লইয়া সাহিত্য রচনা প্রাচীনকালে রীতি ছিল না। সাধারণ লোকের জীবনকথা পাঠে নৈতিক চরিত্রের গতি নিম্নগামী হইবার আশঙ্কা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে অগণিত মহৎ চরিত্রের মূর্তি অঙ্কিত আছে। তাঁহাদের চারিভাগে ভাগ করা চলে।

(১) যাঁহারা শৌর্যে, পরাক্রমে, ক্ষাত্রবীর্যে বড়। যেমন হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি।

(২) যাঁহারা শম, দম, তপস্যা প্রভৃতি ব্রহ্মণ্যধর্মে উজ্জ্বল। যেমন কপিল, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি।

(৩) যাঁহারা ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রাহ্মণ্য তপস্যা দুই মিলিয়া বড়। যেমন রামচন্দ্র, জনক, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি। এবং

(৪) যাঁহারা ভক্তি-বলে বড়, হরি-ভজনময় জীবন যাঁহাদের। যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি।

আর একটি মহা উজ্জ্বল চরিত্র আছে যাহা সকলের মুকুটমণি। যাঁহার কাছে ঐ সকল চরিত্রই ম্লান হইয়া যায়। অথবা মহনীয় চরিত্রের উজ্জ্বলতা যাঁহার বরণীয় চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য হইতে সমাগত। যিনি তুলনাহীন, সবার উপরে বিরাজমান, শিরোভূষণ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত- প্রতিপাদ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ।

যাঁহার শৌর্যবলে কংসাদি তাঁহার হাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কপিল বেদব্যাস যাঁহার গুণ গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার অংশ! অর্জুন ভীম যাঁহার ভক্ত। যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিযা ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ এত সুন্দর হইয়াছেন। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সর্বোজ্জ্বল চরিত্র, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মধ্যমণি—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

সেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার কথাই—শ্রীমদ্ভাগবতের উপজীব্য। ভাগবত নয়টি স্কন্ধে ভূমিকা করিয়া দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ভক্ত-অমৃত বিতরণ করিয়া দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অমৃত বিতরণ করিয়াছেন ভাগবত। এই অমৃত যে আস্বাদন করিল না সে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রের সহিত সংযোগটি হারাইল। যাহারা ইহা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল তাহারা ঐতিহ্যময় জাতীয় জীবনের অন্তর-আত্মার সাক্ষাৎকার করিল।

বিরাট্ গ্রন্থ মহাভারত। মহনীয় চরিত্রের এক চিত্ত আকর্ষী মহাপ্রদর্শনী। ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, দুর্যোধন, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা এই গ্রন্থের নায়ক। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের মহানায়ক। একক এই মহানায়কের কথা বলিয়াছেন ভাগবত।

ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির এমন কোনো মূল্যবান সম্পদ্ নাই যাহা মহাভারতে স্থান পায় নাই। "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে।" মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে প্রতিমা নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাকেই পূর্ণাঙ্গ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রাণ সঞ্চার কার্যটি বাকি ছিল বলিয়াই বেদব্যাস চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

দেবর্ষি নারদ এই প্রাণমন্ত্রের দ্রষ্টা। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীশুকদেব সেই প্রতিমার পূজারী। ভক্ত আচার্যগণ যুগ যুগ ধরিয়া এই ভাগবত প্রসাদের বিতরণকারী। এই ভাগবত মহাপ্রসাদ স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আস্বাদন করিয়া অবিচারে, অকাতরে, ঘরে ঘরে, নরে নরে কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিতরণ করিয়াছেন। আমরা সেই মহাপ্রসাদের ফেলালবের আশায় হাত পাতিয়াছি।

আজকে জগতের এই ভীষণ সঙ্কটের দিনে মহাপ্রলয়কালে আমাদের বাঁচিবার ঔষধটি যে কী তাহা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর স্বকরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা শুধু এই যে "ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত।"

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপটি শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ আমাদের জানাইয়াছেন। তাহা এই যে "শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিতঃ"। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ শব্দ ব্রহ্মরূপে পরিবর্তিত। "শ্রীগোবিন্দ" আর 'শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ'—অভিন্ন।

শ্রীভাগবত গ্রন্থে প্রায় চৌদ্দ হাজার মন্ত্র আছেন। দ্বাদশটি স্কন্ধে শ্রীগ্রন্থ পরিসমাপ্ত। কোন কোন আচার্যপাদের মতে শ্রীগ্রন্থের ধ্যানে বলা হইয়াছে যে শ্রীগ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দুইটি—শ্রীকৃষ্ণের দুই শ্রীচরণ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুই জঙ্ঘা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধ তাঁহার বাম ও ডান পার্শ্বদেশ। সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দুই বাহুযুগল। নবম স্কন্ধ—তাঁহার হৃদয়স্থল। একাদশ স্কন্ধ তাঁহার কপাল ভাগ। দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীগোবিন্দেব মস্তক। তাহা হইলে দশম স্কন্ধটি কী? দশম স্কন্ধ তাঁহাদের নেত্রে দেখা দিয়াছে পরম করুণ, পরম সুন্দর, পবম রসিক রসরাজের শ্রীঅধরের অপরূপ মধুরিমা মণ্ডিত মৃদুহাস্য—'মঞ্জুহাস্যতাম্।' অল্পক্ষণের জন্যে সাক্ষাৎকার করিতে হইলে কাহারও বদনের মধুর হাসিটুকুই দেখা উচিত।

'হাসি' এই কথাটি রূপকমাত্র নহে। অন্তরের মধ্যে নিহিত নিভৃত আনন্দের আস্বাদনকে ব্যক্ত করে মঞ্জুহাস্য। শ্রীভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিমান্। তিনি কৃপাময়। এইসব কথা আমরা শুনিয়াছি। ঋষিগণ জানিতে চান শ্রীভগবানের মধ্যে হাসি আছে কিনা? আনন্দ আছে কিনা? রস আছে কিনা? তাঁহাদের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন — শ্রীভাগবত তাঁহার দশম স্কন্ধে।

দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথা। প্রথম নয়টি স্কন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ কথার প্রস্তুতি পর্বমাত্র। ক্ষুধার উদ্রেক করিবার তরেই আহারের প্রস্তুতি। কৃষ্ণকথার প্রস্তুতি হইল কৃষ্ণকথা শুনিবার তীব্র লালসা উদয়ে। পূর্ববর্তী নয়টি স্কন্ধ—সেই লালসা জাগ্রত করিয়াছে। অন্তর ভরা লালসা লইয়াই শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।

ঈশ্বরকে ভালবাসার নাম ঈশ্বরপ্রেম। মানবপ্রীতি মানবকে ভালবাসার নাম। এই দুইয়ের ভিতর গভীর ঘনিষ্ঠতা। ঈশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় প্রেম ব্যতিরেকে মানব প্রীতি দাঁড়াইতেই পারে না। শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কটুকু গভীর না হইলে বিশ্বপ্রেম মানবপ্রেম, এসব কেবল কথার কথা মাত্র হইয়াই দাঁড়ায়। ইঁটের উপর ইঁট সাজাইলে ইঁটের পাঁজাই হয়—বাসযোগ্য গৃহ হয় না।

একটি ইঁটের সহিত অন্য ইঁটের মধ্যের ব্যবধান দূর করিয়া দিতে হয়—সিমেন্ট নামক মসলা দ্বারা। সেইরূপ কতকগুলি মানুষ হইলেই একটি সমাজ বা রাষ্ট্র হয় না। একটি জাতি তৈয়ারী হয় না। মানুষে মানুষে যে শত শত প্রকারের ব্যবধান আছে—তাহা বিদূরিত করিয়া এক মন করিয়া তাহাদের মিলাইতে পারিলেই তবে জাতির সংগঠন হয়।

মানুষে মানুষে মিলাইতে যে বস্তুর প্রয়োজন তাহার নাম শুদ্ধ ভালবাসা। ইহারই অপর নাম 'প্রেম'। সমাজে এই প্রেমের অভাবই মর্মান্তিক অভাব। ইহা স্থিররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"সনাতন, প্রেম প্রয়োজন।" অন্য যে বস্তুটির অভাবে আমাদের দেশের ও পৃথিবীর সর্বদেশের সমাজ যাহার জন্য হাহাকার করিয়েছে — তাহার নাম 'প্রেমধন'।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আসিয়া দান করিলেন ঘরে ঘরে নবে নবে—কৃষ্ণপ্রেমধন আর তাহার সহিত নিবিড় মানবপ্রীতি। কৃষ্ণকে ভালবাস আর কৃষ্ণের জীবগণকে ভালবাস এই মহাবাণী দিলেন, গৌরসুন্দর সবাইকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগ্রন্থের মধ্যস্থতায়। "মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ"।

ভাগবত একটি বিশেষ প্রকারের জীবন-ধারা জীবনাদর্শ। ভাগবতীয় প্রসঙ্গ নিত্য আস্বাদনে নর-নারী দিব্য-জীবন লাভ করিতে পারে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থন্ধতা, বিদ্বেষ সমাজ হইতে বিদূরণ করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু — জীবগণের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার ক্ষালন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শাস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিয়া। 'দেখা' আর 'সাক্ষাৎ' দুইটির মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য আছে। বাহিরের পরিচয়ের নাম 'দেখা'। অন্তরের গভীর পরিচয়টুকু ঘটিলেই 'সাক্ষাৎকার'। মহাপ্রভু শ্রীভাগবতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় পরিচয় করাইয়া আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইতে বাঁচাইয়াছিলেন।

দ্বাপর আর কলিযুগের সন্ধিক্ষণে আর একবার ভারতীয় জাতিকে বাঁচাইয়াছিলেন এই শ্রীমদ্ভাগবত। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাঙ্‌ময়ী মূর্তি, শব্দব্রহ্ম শ্রীমদ্ভাগবত সূর্যের মত স্বমহিমায় রহিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে উপনীত ভারতের চিন্তাশীল ষাট হাজার ঋষি, সেই পরম সিদ্ধান্তের বর্তিকা লইয়া চতুর্দিক্‌ ছড়াইয়া পড়েন—কৃষ্ণকথার উদয় হয় ভারতের ঘরে ঘরে। জাতি রক্ষা পায়।

কলির প্রথম সন্ধ্যায়—শ্রীগৌরসুন্দর আবার ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া আমাদের বাঁচাইয়াছিলেন।

আজ আবার আমাদের ভারতে ঘোর দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিক গভীর অন্ধকারে। ঘোর হতাশায় সারা দেশ, সারা জাতি আজ ভুগিতেছে—কোথায় আলো? কী উপায়ে আমরা বাঁচিব? সেই উত্তর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর দিয়া গেছেন—নবদ্বীপের প্রদীপ আবার জ্বালাইয়া—ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত। ভাগবত জীবনের সার কর। ভাগবতই আবার আমাদের বাঁচাইবে। ❐

শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণ

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।
স্থিরোদাত্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।
প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।।
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী।। (চৈঃ চঃ মধ্য, ২৩ পারি।)

অয়ং নেতা — এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—

১। সুরম্যাঙ্গ — অঙ্গ সন্নিবেশ রমণীয়।
২। সর্বসুলক্ষণান্বিত—সমস্ত সুলক্ষণ যুক্ত।
৩। রুচির—মনের আনন্দদায়ক।
৪। তেজসান্বিত — তেজোরাশিযুক্ত।
৫। বলীয়ান্ — বলশালী।
৬। বয়সান্বিত — বিলাসময় দেহ।
৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ।
৮। সত্য বাক্য।
৯। প্রিয়ংবদ।
১০। বাবদূক — বাক্য যাঁর রসযুক্ত।
১১। সুপণ্ডিত।
১২। বুদ্ধিমান্।
১৩। প্রতিভান্বিত।
১৪। বিদগ্ধ — চৌষট্টি বিদ্যায় নিপুণ।
১৫। চতুর — কার্য সাধনে সমর্থ।
১৬। দক্ষ।
১৭। কৃতজ্ঞ — অন্যকৃত সেবাদি জানেন।
১৮। সুদৃঢ়ব্রত — প্রতিজ্ঞা সত্য।

১৯। দেশকাল-পাত্রজ্ঞ।
২০। শাস্ত্রচক্ষু — শাস্ত্রানুসারে দেখেন ও করেন।
২১। শুচি — দোষশূন্য।
২২। বশী — জিতেন্দ্রিয়।
২৩। স্থির — ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীন।
২৪। দান্ত — ক্লেশসহ।
২৫। ক্ষমাশীল।
২৬। গম্ভীর — দুর্বোধ।
২৭। ধৃতিমান্ — ক্ষোভশূন্য।
২৮। সম—রাগ-দ্বেষ শূন্য।
২৯। বদান্য—দানবীর।
৩০। ধার্মিক।
৩১। শূর।
৩২। করুণ।
৩৩। মান্যমানকৃৎ।
৩৪। দক্ষিণ—কোমলচরিত।
৩৫। বিনয়ী—ঔদ্ধত্যশূন্য।
৩৬। হ্রীমান্—সংকুচিত।
৩৭। শরণাগত-পালক।
৩৮। সুখী—দুঃখগন্ধ-স্পর্শহীন।
৩৯। ভক্তসুহৃৎ।
৪০। প্রেমবশ্য।
৪১। সর্ব শুভঙ্কর
৪২। প্রতাপী।
৪৩। কীর্তিমান্।
৪৪। রক্তলোক—সকলের অনুরাগের পাত্র।
৪৫। সাধুসমাশ্রয়—সাধুর প্রতি
পক্ষপাতযুক্ত।
৪৬। নারীগণমনোহারী।
৪৭। সর্বারাধ্য।
৪৮। সমৃদ্ধিমান্—সম্পদ্শালী
৪৯। বরীয়ান্—সর্বশ্রেষ্ঠ।
৫০। ঈশ্বর—অন্য নিরপেক্ষ। যাঁর আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য। ইচ্ছামাত্র ঈপ্সিত সিদ্ধ।

কৃষ্ণ এবং শিবাদিতে আছে ৫টি—

১। স্বরূপসম্প্রাপ্ত, ২। সর্বজ্ঞ, ৩। নিত্য-নূতন, ৪। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ, ৫। সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত

কৃষ্ণ-নারায়ণাদিতে আছে ৫টি—

১। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি।

২। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ বিভু, কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী।

৩। অবতারাবলী বীজ।

৪। হৃতারিগতি-দায়ক।

৫। আত্মারামগণাকর্ষী।

কৃষ্ণের অসাধারণ ৪টি গুণ—

"সর্বাদ্ভুত-চমৎকারী লীলা-কল্লোল-বারিধি।"

লীলা-তরঙ্গের সমুদ্র এবং

অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলী।

মধুর প্রেম দ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন।

"ত্রিজগৎ-মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।"

মুরলীর কলধ্বনিতে ত্রিজগতের মনোহারী।

"অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ।"

অসমোর্ধ্ব রূপমাধুর্য দ্বারা চরাচর সকলে বিস্মিত।

"লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যে বেণুরূপয়োঃ।" ৫০+৫+৫+৪=৬৪

(১) লীলামাধুর্য, (২) প্রেমমাধুর্য, (৩) বেণুমাধুর্য ও (৪) রূপমাধুর্য। ❑

'শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমি'—আলোচনা

পূজ্যপাদ যোগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বহু দিনের। কিন্তু তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত হাতে আসে নাই। আজ তিনি নিত্যধামে। হঠাৎ তাঁহার লিখিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইলাম। পুস্তিকা বলিলাম—মাত্র এক ফর্মার বই এই জন্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার গবেষণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় বহু দিন পাইয়াছি—কিন্তু বেদ শ্রুতি পুরাণাদি ও ভাগবত সম্বন্ধে তাঁহার সামগ্রিক অনুধাবন যে এত গভীর তাহা বুঝিতে পারি নাই। মানুষটিকে চিনিলাম তাঁহাকে হারাইবার পর। ইহা অনুতাপের বিষয়।

** 'শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমি।' শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-যোগমায়া আশ্রম, নবদ্বীপ ধাম, সম্পাদকঃ শ্রীমৎ কেশব ব্রহ্মচারী।*

ব্রহ্মচারীজীর গ্রন্থটির নাম 'শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমি'। ভূমিখানি মুখ্যতঃ বৈদিক। ইহা পূর্বেও জানা ছিল। কিন্তু তিনি একরূপ অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন তাহার মুখ্য আলোচ্য দুইটি শব্দ—স্বরাট্ ও সত্য। এই শব্দ দু'টি ভাগবতের প্রথম শ্লোকে আছে। বেদে স্বরাট্ শব্দ ৩৪ বার আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বরাট্ শব্দ ২৯ বার আছে।

সত্য শব্দটি ঋগ্বেদে ১৬৩ বার আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভে সত্য শব্দ আছে, সমাপ্তি শ্লোকেও সত্য শব্দ আছে। ভাগবতের মধ্যে অগণিত বার সত্য শব্দের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার উপক্রমে (১০/২/২৬ শ্লোকে) সত্য শব্দটি সাতবার ব্যবহৃত হইযাছে।

উপনিষদে সত্য শব্দটি ব্রহ্মবাচক—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" জগৎ প্রসিদ্ধ কথা। ভাগবতের আদি, অন্তে ও মধ্যে (শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলায়) সত্য শব্দ অতি প্রসিদ্ধ।

বিশেষ অনুষ্ঠানে দেখা যায় যে সত্য ও স্বরাট্ শব্দও একার্থক। সত্য অর্থ তিন কালে যাহা অপরিবর্তনীয় অনন্ত কাল যাহার স্বরূপ একই, পরিবর্তনহীন—তাহা সত্য। স্বরাট্ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ হইল যিনি স্বয়ং বিরাজিত। যাহাকে থাকিবার জন্য কোন বস্তুর উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরতা নাই। অনন্ত বিশ্বে যাহার কাহারও উপর কোন কারণে নির্ভর করিতে হয় না—যিনি স্বয়ং বিরাজমান আছেন। দু'টি শব্দই মূলতঃ ব্রহ্মবাচী। বেদের যাদৃশ ব্রহ্মানুভূতি শ্রীমদ্ভাগবতের ঠিক তাদৃশ—ইহাই ঐ দুইটি শব্দ প্রকাশ করিতেছে। তাছাড়া বেদেব বিশ্বদেব ও ভাগবতের বাসুদেব—একই। ইহাও তিনি নিপুণভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীজী দেখাইয়াছেন যে বেদের যে সংকীর্ণতা-শূন্য ঔদার্য, উপনিষদ্‌গুলির যে সার্বভৌমিকতা—শ্রীমদ্ভাগবতেও একই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত ব্যাপক উদারতা সুস্পষ্ট। তিনি দেখাইয়াছেন ভাগবত শুধু বৈষ্ণবদের গ্রন্থ নহে—শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক যে-কোন পথের সাধকের ভাগবত সর্বতোভাবে উপজীব্য। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশাক্ষরী মহামন্ত্র যে কত সর্বজনীন ও সুগভীর তাৎপর্যের দ্যোতক তাহা তিনি বৈজ্ঞানিক সুলভ বিশ্লেষণ দ্বারা সুপ্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি শুধু হৃদয়গ্রাহী নহে, অমোঘ ও অকাট্য। ❑

জয় জগদ্বন্ধু হরি

'শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর' নাটক—মুখবন্ধ

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে। প্রকৃতির বিকারজ প্রাকৃত ক্ষণস্থায়ী রস প্রকৃত রসপদবাচ্য নহে। ভক্তিরসিকেরা লৌকিক রসকে রসাভাস বলেন। কারণ উহা অবাস্তব।

একমাত্র "বাস্তব বস্তু" হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনিই বস্তুতঃপক্ষে রস পদবাচ্য।

শ্রীগোস্বামীপাদগণের অমিয় ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অখিল রসের অমৃতঘন মূর্তি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কথা গাথাই প্রকৃতপক্ষে রসাত্মক কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের মত শ্রেষ্ঠ কাব্য বিশ্ব সংসারে আর দ্বিতীয়টি নাই। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকে "শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিতঃ"

বলিয়াছেন। রসবিগ্রহ শ্রীগ্রন্থ বিগ্রহতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাব্য দ্বিবিধ। শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্যকাব্য। রঘুবংশ শ্রব্যকাব্য ও উত্তররামচরিত দৃশ্যকাব্য। ভাগবত শ্রব্যকাব্য, ললিতমাধব দৃশ্যকাব্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রব্যকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য বর্ণনাত্মক। দৃশ্যকাব্য রূপায়ণাত্মক।

শ্রব্যকাব্য কেবলমাত্র পঠনীয় ও শ্রবণীয়। দৃশ্যকাব্য পঠনীয় ও শ্রবণীয় তো বটেই অধিকন্তু উহা দর্শনীয়। দৃশ্যকাব্য হইতেছে বাগিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় এই তিনটি মহাশক্তিশালী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নিরুপম বস্তু।

ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনকে আচার্যপাদগণ উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন। "আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।" নাসিকায় কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ লাভ, স্পর্শেন্দ্রিয়ে তাঁহার স্পর্শসুখ লাভ, জীবের পক্ষে সুদুর্লভ। কিন্তু রসনায় তাঁহার কথা উচ্চারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ে তাঁহার কথা আস্বাদন ও নয়নপথে তাঁহার রূপমধুরিমা সম্ভোগ সকলের পক্ষেই সম্ভব।

তন্মধ্যে আবার শ্রবণ অপেক্ষা দর্শনের শক্তি সমধিক। শ্রীজীব গোস্বামীচরণ শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভে দৃশ্যকাব্যের রসভাবনা বিচার প্রসঙ্গে কহিয়াছেন যে, শ্রবণজ অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজ অনুরাগ শ্রেষ্ঠ। "শ্রবণজানুরাগাৎ দর্শনজানুরাগস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ।" এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ভাগবতীয় শ্লোক তুলিয়াছেন—

"শ্রুতমাত্রেঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাঞ্চ কিং পুনঃ।।" ভাঃ ১০।৯০।২৬

যিনি শ্রুতমাত্রেই বলপূর্বক স্ত্রীগণের মন হরণ করেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছে যে কৃষ্ণমহিষীগণ তাঁহাদের কথা আর কী বলিব।

একথা সত্য বটে যে, নাটকে রঙ্গমঞ্চে যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভূমিকায় উপস্থিত হন তিনি বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কোন নট তাঁহার অনুকরণ করেন। কিন্তু সহৃদয় দর্শকের যদি সত্ত্বগুণময় ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে, অনুকরণকারী নটকে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করেন। নট যদি নিপুণ শিল্পী হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভায় অযোগ্য শ্রোতাও তৎকালে যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে পারে।

সুতরাং দৃশ্যকাব্যের নাট্যাভিনয়ে দর্শকগণের শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও তজ্জনিত বিপুল আনন্দ উপভোগ হইতে পারে। ইহা ভজনের এক প্রকৃষ্ট পন্থা। সেইজন্যই মহাপ্রভু গৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামীচরণকে নাটক লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজেও গম্ভীরায় শ্রীল রাম রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক আস্বাদনে ডুবিয়া থাকিতেন।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নাটকখানি শ্রীনিতাইসুন্দরে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিও পাঠ করিয়াছি। হয়তো কোনদিন রঙ্গমঞ্চে দর্শনের ভাগ্যও হইবে, হয়তো হইবে না। যদি নাই হয় তথাপি শ্রীশ্যামসুন্দরের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না।

* *'শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নাটক' (২য় খণ্ড)। শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-শাস্ত্রী। ভাগবত ভবন, ১০২/৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। ১৩৬৪।*

শ্রীরূপের ললিতমাধবের অভিনয় কোথাও দর্শন করি নাই। অভিনীত না হইলেও উহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উহার দান অতুলনীয়। তদ্রূপ শ্রীশ্যামসুন্দর মঞ্চে রূপায়িত না হইলেও যুগ যুগ ধরিয়া ভক্তগণের হৃদয়মঞ্চে স্থান করিয়া লইবে।

রসিক ভক্তগণ বলেন শ্রীশ্যামসুন্দর ও তাঁহার কথা দুইই সমান, দুইই অমৃতময়। "বাচি বস্তুন্যপি সমান-রসস্থিতিঃ"—বাক্যে এবং বস্তুতে সমান রসের অবস্থান। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে রস তাঁহার কথা-গাথাতেও ঠিক সেই রস বিদ্যমান আছে। শ্যামসুন্দরে যে মাধুর্য তাঁহার লীলাকথাতেও সেই মাধুর্য বিরাজমান আছেন। একমাত্র শরণাগত ভক্তেরা উহা আস্বাদন করেন।

শ্রীশ্যামসুন্দরের সুন্দর কথার বিনিময়ে শ্রীগৌরসুন্দর মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে প্রেমালিঙ্গন দিয়াছিলেন। যাহাকে চোখের দেখাও দিবেন না একথা জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন, 'ভূরিদা ভূরিদা' বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়া। কেবলমাত্র সুন্দরের সুন্দর কথা আস্বাদনের মূল্য স্বরূপ।

বিশেষ প্রীতি ও রুচি লইয়া শ্যামসুন্দর পাঠ করিয়াছি। শান্তরস, হাস্যরস ও সর্বোপরি করুণ রসে হৃদয় ভরপুর হইয়াছে। কোথাও কোথাও নিজ অজ্ঞাতসারে 'চমৎকার' বলিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি।

"রসে সারশ্চমৎকারো যদ্বিনা ন রসো রসঃ"

চমৎকৃতিই রসের প্রাণ। এই গ্রন্থের প্রাণ আছে। ভাষায় প্রসাদতা আছে। মনঃপ্রাণ প্রসন্ন করে। ওজঃ গুণ আছে, গাম্ভীর্য আছে। বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া ভাবরাজ্যে নিয়া ভোগ করায়। "যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" শ্রীশুকের বাণী সার্থক করায়।

গ্রন্থখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুধু ভাগবতপ্রোক্ত লীলাকথাই পরিবেশিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্যপুরাণে কথিত এবং বিশেষভাবে শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ে ও শ্রীজীব ও শ্রীকর্ণপুরের চম্পূদ্বয়ে যে সকল লীলা-মধুরিমা আস্বাদিত হইয়াছে, তাহারও সন্ধান ইহাতে আছে। তদ্ভিন্ন বৈষ্ণবপদকর্তৃগণের পদপদাবলীতে বর্ণিত কথা ও গীতি স্থানে স্থানে সুনিপুণভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠক পরম্পরাগত অনেক চাতুর্যপূর্ণ লীলাকথাও গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়া অদ্ভুত রসের ও হাস্যরসের পোষকতা করিয়াছে।

গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব এই যে, ব্রজে নিভৃতকুঞ্জে লীলা দর্শন করাইতে করাইতে নাট্যকার অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে গৌড়দেশে গঙ্গার কূলে আনিয়া গৌরসুন্দরের নটনমধুরিমা আস্বাদন করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীল রামানন্দ রায়ের অতুলনীয় ভাষায় বলিলে বলিব—

—শ্রীগ্রন্থ "অমৃতের পুর
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর।"

রাসনৃত্যের ঝঙ্কার শুনাইতে শুনাইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তন আসরে আমাদিগকে আনিয়া রসের চরম ঘন পরিণতি নাটুয়া মূরতির সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন—এই শ্যামসুন্দরের নাট্যকার।

নাট্যকারের জয় হউক। শ্রীনাটকের জয় হউক। যে মহানের করুণায় এই শ্রীগ্রন্থের প্রকাশ তাঁহার জয় হউক। জয় জগদ্বন্ধু। জয় শ্যামসুন্দর। জয় গৌরসুন্দর।

মহাউদ্ধারণ মঠ
পৌষ, ১৩৬৪

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'বিরহি-মাধব'—ভূমিকা

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।।" শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৪৭/৫৪

শ্রীভগবান্ জীবমাত্রেরই আরাধ্য ধন। আবহমান কাল ধরিয়াই জীব ভগবান্‌কে ডাকে—নানা নামে ডাকে, নানা রূপ প্রতীকের মধ্য দিয়া ডাকে, নানা পদ্ধতিতে নানা প্রয়োজনের তাগিদে ডাকে। ভগবান্‌কে দিয়া জীবের প্রয়োজন আছে। এ কথা সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্রই জানে, বলে ও বিশ্বাস করে।

মানুষ তাঁহাকে ডাকিয়াছে, ডাকিয়া পায় নাই। ডাক যত দূর পৌঁছায়, তিনি তাহার চেয়েও দূরে, তাহার চেয়েও ঊর্ধ্বে। ইহা উপলব্ধি করিয়া বৈদিক ঋষিরা জানাইয়া দিয়াছেন "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" বাক্য তাঁহার নিকট প্রহত হইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে—ডাকিয়া খুঁজিয়া ভজিয়া পাওয়া যায় না। এমত অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত একটি নূতন সংবাদ আনিয়াছেন।

ভাগবত বলিয়াছেন—"জীব! তুমি তাঁহাকে কী ডাকিবে? কতটুকু ডাকিতে জান, কতটুকু তোমার ক্ষমতা? তুমি বরং কোলাহল বন্ধ করিয়া নীরব হও। নীরব হইয়া শ্রবণ কর। তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। মুরলীর রন্ধ্রপথে তাঁহারই মধুর ডাক বিশ্বময় ছড়াইয়া যাইতেছে। সেই "সর্বভূতমনোহর বংশী" জীবমাত্রেরই মন হরণ করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে। তিনি জীবকে আকর্ষণ করেন। জীবকে দিয়া তাঁহার প্রয়োজন আছে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন বার্তা—

বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ মাথুরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে শ্রীরাধা তাঁহার বিরহে কাতরা হইয়া তৎসন্নিধানে বৃন্দা-দূতীকে প্রেরণ করেন।

"রাই, ধৈর্যং রহু ধৈর্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রত্যেকে যাঁহা দরশন পাওয়ে।" —

এই কথা বলিয়া দূতী কৃষ্ণানুসন্ধানে যাত্রা করেন। লীলাকীর্তনে ভক্তগণ ইহাই আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব কিন্তু এ আস্বাদন দেন নাই। তৎস্থলে তিনি অপর একটি অভিনব

* *'বিরহি-মাধব।' শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী। জঙ্গীপুর, ১৩৫৬। খাগড়া, মুর্শিদাবাদ হইতে বিমলারঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত।*

লীলারহস্যের অর্গল খুলিয়াছেন।

বিরহ-বেদনায় ভক্ত কাঁদিতেছে, ভগবান্‌ও কাঁদিতেছেন। বার্তাবহ প্রেরিত হইতেছে কিন্তু ভাগবতে সে বার্তাবহ বৃন্দাদেবী নহেন, উদ্ধব মহারাজ। ভক্তের নিকট হইতে ভগবানের দিকে নহে, ভগবানের নিকট হইতে ভক্তের দিকে। ব্রজ হইতে মথুরায় নহে, মথুরা হইতে ব্রজে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৬তম ও ৪৭তম অধ্যায়ে উদ্ধবসংবাদ বর্ণনে শুকদেবের মর্মবাণী মূর্ত হইয়াছে।

ভক্তের জন্য ভগবানের হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা বলাই ভাগবতের অন্তরের সাধ। বিরহ-কাতর ভগবান্ ব্রজবাসীর জন্য আকুল আগ্রহে উদ্ধবকে পাঠাইতেছেন। এই লীলার মধ্য দিয়াই ভাগবতের অন্তরের অন্তরতম বার্তা ধ্বনিত হইতেছে। আনন্দ-রস-ঘন বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অন্তর রাজ্যের যে অন্তস্তলটি খুলিয়া দেখাইবার জন্য চৌদ্দ হাজার শ্লোকময় শ্রীগ্রন্থ তাহার কেন্দ্রস্থলটি উদ্ধব সংবাদের দুইটি অধ্যায়ে রূপ পাইয়াছে. এই অধ্যায় দুইটি ভাগবত রসসাগরের নিরূপম রত্নখণ্ড। শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর 'বিরহি-মাধব' গ্রন্থ সেই রত্নের ছটাতে উদ্ভাসিত। সেই নিগূঢ় রসেরই পরিবেশনে বিরহি-মাধবের মরমী কবি ভাগবতের অস্ফুট অব্যক্ত ঈষদ্ব্যক্ত কথাগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সে প্রয়াস যে কেবল আস্বাদন যোগ্য হইয়াছে তাহাই নহে, মাদৃশ শুষ্ক জীবের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলিতেও সমর্থ হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি ছাড়া সে গম্ভীর-হৃদযের গুপ্ত-বেদনা জানিবার সামর্থ্য সম্ভবে না। কৃপাস্নাত বিরহি-মাধব কাব্য আমার প্রাণ চঞ্চল করিয়াছে। তাই এই লেখনীর চাঞ্চল্য।

"প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ" আজ 'দয়িত-সখা' উদ্ধবকে গোপনে ডাকিয়াছেন। "গৃহীত্বা পাণিনা পাণিম্"। হাতে হাত দিয়া প্রাণের কথা জানাইতেছেন, বলিতেছেন, "গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য"— সৌম্য উদ্ধব! তুমি ব্রজে যাও। কণ্ঠ গদ্‌গদ্ যেন কথা বলিতে পারিতেছেন না। কী বেদনা লইয়া উদ্ধবকে পাঠাইতেছেন, কাহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে, কী দেখিয়া সে কান্না আজ উদ্বেলিত হইতেছে, শ্রীভগবানের মনের তলের সেই কথা বিরহি-মাধবে ঝংকৃত হইতেছে—

> "প্রাসাদ শিখরে ভাবে শ্যামরায়,
> সমুখে যমুনা বয়ে চলে যায়
> অংকিত যেন তারি নীল গায় অতীত প্রেমের স্মৃতি।
> কানে যেন আসে কল্লোলে তার
> বিরহ-তাপিতা ব্রজ-বনিতার
> হৃদয়-বিদারী দীন হাহাকার কৃষ্ণ-বিরহ-গীতি।" (পৃ. ৩)

মথুরায় নগরের সাজানো প্রীতি আর ব্রজপল্লীর সহজ স্নেহের যে পার্থক্য বিরহি-মাধবের বিরহাকুল চিত্তের ভাবনার মধ্যে যে রূপ প্রকট হইয়াছে তাহা তুলনাহীন।

মথুরানাথ ব্রজের জন্য কাঁদেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন—

> "ব্রজের পথের রজ ইচ্ছা হয় সর্ব অঙ্গে মাখি,
> প্রেমের সে পুণ্য তীর্থে ইচ্ছা হয় জন্মে জন্মে থাকি।" (পৃ. ৬)

মথুরায় প্রেম মর্যাদাঢাকা ঐশ্বর্যশিথিল, ব্রজের অনুরাগ মর্যাদালঙ্ঘী, নগ্ন, শুদ্ধ, সুনির্মল। এই অনুরাগ তিনটি রসের পটভূমিকায় আস্বাদিত। বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর সেই তিনটি রস। ব্রজের এই তিন রসের ফুটন্ত মূর্তি কৃষ্ণপ্রিয়াদের সঙ্গেই উদ্ধবের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সুগভীর কৃষ্ণপ্রীতি ও অতলস্পর্শী বিরহবেদনা রূপায়িত হইয়াছে।

প্রথমে উদ্ধবের সংগে নন্দ মহারাজের দেখা ও কথাবার্তা। নন্দরাণীর সহিত কোনও কথা হইয়াছিল কিনা তাহা শুকদেব জানান নাই, কেহই জানান নাই। বোধ হয় সে বেদনা too deep for tears বলিয়াই লিখিতে সাহসী হন নাই—

"যশোদা-আননে গভীর মৌন প্রকাশিল গূঢ় ব্যথা।"

শুধু এই কথা বলিয়াই শেষ করিতে হইয়াছে। আর যে বলা যায় না! নন্দরাজকে উদ্ধব অনেক বুঝাইলেন, পুনঃপুনঃ কহিলেন যে তাঁহাদের কৃষ্ণ—

"নহে নহে দূরে অন্তরপুরে আছে অন্তরতম।
অরণির মাঝে বহ্নি যেমন, ক্ষীরে নবনীত সম।।" (পৃঃ ১০)

নন্দরাজ ঐ সব তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বলিলেন—

"হোক নির্গুণ পরম ব্রহ্ম, হোক সে বিশ্বময়,
তবু আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে কানু ছাড়া কিছু নয়।"

যে-কানু নবনীত খায় না, নন্দরাজ সেই অন্তর্যামী কৃষ্ণকে চিনেন না। উদ্ধব বুঝিলেন, নন্দরাজের প্রেমভূমিকা তাঁহার বেদ-বেদান্ত জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজমান। বুঝিয়া উদ্ধব নির্বাক্ হইয়া গেলেন।

তারপর উদ্ধবের দেখা ব্রজবালকগণের সহিত। শ্রীমদ্ভাগবত এই দেখার কথা বলেন নাই, চাপিয়া রাখিয়াছেন। বালকগণের হৃদয়ের বেদনা অতি তীব্র। তাহার ফলে তাহাদের নিরন্তর অসাক্ষাতে সাক্ষাৎ হইত, মনে হইত তাহাদের রাখালরাজ ভাই প্রতিক্ষণ তাহাদের কাছে কাছেই আছে। লীলার স্মৃতিগুলি মূর্তি ধরিয়া প্রত্যক্ষবৎ সর্বদা তাহাদের মানসগোচরে ভাসমান হইত। তাই কোমলপ্রাণ শুকদেব সে বিরহগীতি গাহিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই না-বলা বেদনার উচ্ছ্বাস বিরহি-মাধব কাব্যে উপছিয়া পড়িয়াছে।

"বিস্মিত রাখাল কহে, কৃষ্ণ সে তো রাজা নহে,
রাখাল সে আমাদেরই মত।
ব্রজে চরাইত ধেনু, বনে বাজাইত বেণু,
আমরা ছিলাম অনুগত।।
মথুরার রাজা যিনি, সে কৃষ্ণে মোরা না চিনি,
নাহি হয় কোনও অনুমান।
সখা কৃষ্ণ আমাদের, সঙ্গী কৃষ্ণ রাখালের,

কৃষ্ণ এই গোকুলের প্রাণ।।
চিরে রাখালের বুক, দেখ আঁকা সেই মুখ,
সব সুখ গেছে যার লাগি
দিতে পার নাগরিক!, আমাদের সে মাণিক,
শুধু মোরা এই ভিক্ষা মাগি।।"

রাখালগণের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন কবি বিষ্ণু সরস্বতীর নিজ ধ্যানলব্ধ সম্পদ্, শুকের কণ্ঠের না-গাওয়া গান, সাহিত্যে এক অনবদ্য দান হইয়াছেন।

অতঃপর গোপকুমারীদের কথা। সব শেষে ব্রজবিলাসিনী ভানুদুলালীর কথা। তাঁহার হৃদয়-মহাসমুদ্র গভীর হইতে গভীর—অতলস্পর্শী। ডুবুরি শুকদেব তাহাতে ডুবিয়া রত্ন তুলিয়াছেন। মনে জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে, যিনি বালকগণের বেদনার কথা গাহিতে পারিলেন না, তিনি রাধারাণীর গভীর ব্যথার গীতি কীরূপে গাহিলেন। এ জিজ্ঞাসার উত্তর দূরে নহে। শ্রীরাধারাণীর সহিত উদ্ধবের কোনও কথোপকথনই হয় নাই, হইতে পারে না; যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আলাপন নহে, আত্মগত উক্তি মাত্র। একটি মধুকরকে দেখিয়া তাহাকে কৃষ্ণদূত মনে করিয়া শ্রীরাধা স্বগত প্রলাপোক্তি করিতেছেন। এই অলি-জল্পনাও সহজ সবল ভাষায় নহে। সরল উক্তি সে তীব্র বেদনার বাহন হইতে পারে না। বামা নায়িকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধা ভ্রমরটিকে দেখিয়া গভীর শ্লেষপূর্ণ বক্রোক্তিময় প্রলাপ করিয়াছেন। তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। স্রোতের বেগ এত প্রখর যে তরী চলিতে পারে না। হঠাৎ নদীর বাঁকে ঠেকিয়া স্রোত উল্টামুখে চলিয়াছে, সেইখানে একটু চলা যায়। 'ভ্রমরগীতি' বিরহ-তটিনীর উদ্বেল জোয়ারের মধ্যে একটু উজান গতি। তাই শুকদেবও সেইখানেই তরণী ভাসাইতে সাহসী হইয়াছেন। বিরহি-মাধবের কবিও শ্রীশুকের নৌকায় নিজের ক্ষুদ্র 'ডিংগা' বাঁধিয়া দিয়াছেন। মাঝির চতুরতা প্রশংসার্হ বটে।

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। এই অবস্থা দ্বিবিধ প্রকার—চিত্রজল্প ও উদ্‌ঘূর্ণা। ভ্রমরগীতিতে শ্রীশুকদেব চিত্রজল্পই আস্বাদন করিয়াছেন। ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অংশকে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ উদ্‌ঘূর্ণার আস্বাদন দিয়াছেন। উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থায় শ্রীরাধা ভ্রান্ত হইয়া কখনও বাসকশয্যা নায়িকার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করেন, কখনও খণ্ডিতা ভাব অবলম্বনপূর্বক কোপনা হইয়া নীল মেঘকে তর্জন করেন, কখনও বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করেন। বিরহাবস্থার এই সকল বিচিত্রগতি উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

চিত্রজল্প কতকগুলি জল্পনা বা প্রলাপোক্তি। কাহাকেও প্রিয়ের প্রেরিত দূত মনে করিয়া বিরহিণীর নানারূপ জল্পনা। এই জল্পোক্তির বাহির ঈর্ষা, অসূয়া ও ভর্ৎসনায় পূর্ণ। অন্তর গূঢ় রোষে ভরা, আরও অন্তস্তল সুতীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠাময়। এই চিত্র জল্পের অসংখ্য ভাববৈচিত্র্য, অগণিত ভেদ। তন্মধ্যে প্রজল্প পরিজল্প বিজল্প উজ্জল্প সংজল্প অবজল্প অধিজল্প আজল্প প্রতিজল্প ও সুজল্প এই দশবিধ জল্প শ্রীশুক ভ্রমরগীতার দশটি মন্ত্রে আস্বাদন করিয়াছেন। কবি বিষ্ণু সরস্বতী শ্রীশুকের পদাংকই অনুসরণ করিয়াছেন। এই অনুসরণ কার্যটি অতি কৃতকার্যতার সহিত সাধিত হইয়াছে। শ্রীশুকের আস্বাদনের সঙ্গে বৈষ্ণবতোষিণীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের রসানুভূতি

ও সারার্থদর্শিনীতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের রস-পরিবেশন মিশাইয়া যে অপরূপ অমৃতমধুর পায়স বস্তুকে মধুর্যমণ্ডিত ছন্দে রূপদান করিয়াছেন তাহার দুই-একটির আস্বাদনের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"স্বর্গে অমরী, মরতের নারী, পাতালের নাগকন্যা মাঝে
কে না হয় দাসী, হেরি তাঁর হাসি, এমন কে কোথা রমণী আছে?
সে রূপসীকুলে বৃন্দাবনের গোপকন্যা অগণনীয়া।
চিরসুন্দর রমণীমোহন কী করিবে বল মোদের নিয়া?
সকল শোভার পরম-আকর রমাই করিছে চরণ-সেবা,
তাঁর তুলনায় রূপগুণহীনা পল্লীযুবতী আমরা কেবা?
আমরা যে দীনা, হেন দীনজনে করেছে সে অনুকম্পা দান।
উত্তমশ্লোক এ নাম গ্রহণে যোগ্য তো তাই সে মহাপ্রাণ।" (পৃ. ৩৩)

এই বক্রোক্তিময় প্রলাপপূর্ণ কান্নার নাম উজ্জল্প। ইহাতে গর্বগর্ভ ঈর্ষা আছে; অসূয়াপূর্ণ আক্ষেপ আছে। অন্তরে নিগূঢ় রোষ আছে, তাহারও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের সুতীব্র লালসা আছে। এ সমস্ত মিলিয়া একটি অখণ্ড রসের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বস্তু বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয়।

চিত্রজল্পের শেষ মন্ত্রটি সুজল্প। তাহাতে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীই বা কত মধুর!

"প্রলাপবচন শুনো না আমার, বল বল প্রিয়, আছে তো ভালো?
বল কেমনেতে শ্যামলচন্দ্র মথুরাগগন করিছে আলো?
আজও কি তাহার পড়ে সখা মনে সদানন্দিত নন্দগেহ?
আজও কি সে স্মরে জনকজননী বন্ধুজনের বিমল স্নেহ?
প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনেরে আজও কি সে স্মরে করুণাময়?
তাহার চরণে চির-কিংকরী আমাদের কথা কভু কি কয়?
আবার কখন আসিবে ফিরিয়া মথুরা হইতে মথুরানাথ?
রাধা বলি ডাকি রাখিবে মাথায় অগুরু-গন্ধ মধুর হাত?" (পৃ. ৩৫)

ইহার মধ্যে সারল্য আছে, গাম্ভীর্য আছে, দৈন্য আছে, চাপল্য আছে, উৎকণ্ঠা আছে; বাম্য গিয়া দাক্ষিণ্য আসিয়াছে। সব মিলিয়া একটা জমাট বাঁধা মাধুর্যের খণ্ড।

এই সকল প্রলাপোক্তি শুনিয়া উদ্ধব মহাশয় বুঝিলেন ব্রজের অধিরূঢ় মহাভাব কত উর্ধ্বভূমিতে বিরাজমান। সেখানে তাঁহার মুখব্যাদান করাই ধৃষ্টতা। ইহা বুঝিয়া উদ্ধব নীরব হইয়া গেলেন। শেষে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

"নমো নমো নমঃ কৃষ্ণপ্রেয়সি ভুবনপূজ্যতমা,

চরণের রেণু দাও শিরে মম নন্দজ-প্রিয়তমা!
অনুত্তমা এ তোমাদের প্রেম, বিরহ সুদুঃসহ,
করিল আমার অধম জীবনে মহান্ অনুগ্রহ।" (পৃ. ৩৭)

কেবল মুখে "নমো নমো" উচ্চারণ মাত্র নহে, কার্যতঃ—
"ব্যাকুল উদ্ধব কাঁদি গোপীপদরেণু মাখি গায়,
তীর্থ মানি ব্রজভূমি লুটাইল ধরণীধূলায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত এইখানেই নীরব হইয়াছেন। বিরহি-মাধবের কবি নীরব হন নাই। ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উদ্ধবের অপ্রাকৃত চক্ষু ও অপ্রাকৃত কর্ণলাভ হইল। তিনি কী দেখিলেন ও কী শুনিলেন কবি আমাদিগকে তাহা শুনাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিয়াছে।

"সহসা উদ্ধব দেখে বৃন্দাবন অতি অভিনব,
দেখিল নয়নপথে মনোহর কৃষ্ণময় সব।

... ...

সর্বত্র দেখিল কৃষ্ণে, মিলনের দৃশ্য মনোরম,
শুনিল অপূর্ব বাণী স্মরণীয় অতি অনুপম।" (পৃ. ৪৮)

... ...

কহে কৃষ্ণ—

"বিশ্বমাঝে নিশিদিন নূপুর বাজায়ে আমি যাই,
আহ্বান সংকেত-ধ্বনি জানাইয়া বাঁশরী বাজাই।
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে নিত্য খুঁজি প্রিয় রাধিকায়,
বিরহ-বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকি মিলন-আশায়।
যেখানে তোমরা থাক হে আমার বৃন্দাবনবাসী,
আমি সাথে সাথে থাকি সবারে সতত ভালোবাসি।
যেখানে তোমরা থাক, সে'থা মোর পড়ে' থাকে মন,
যেখানে থাক না সেথা রচিবারে চাই বৃন্দাবন।

কবে সুরু হবে লীলা এক সঙ্গে অনন্ত ভুবনে?
হবে নব বৃন্দাবন মানব ও মানবীর মনে?" (পৃ. ৫২)

আমরাও সেইদিনের আশায় আছি, যে-দিন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায় "ঘাটে ঘাটে যমুনা বইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে রাস হইবে, মহাউদ্ধারণলীলা উদ্‌যাপিত হইবে।"

দাস—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব

পুরীধামে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নয় দিন ব্যাপী। পুরীধাম উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। উড়িষ্যার প্রাচীন নাম উৎকল। পুরীধামের শাস্ত্রীয় নাম 'পুরুষোত্তম'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত নাম পুরুষোত্তম। এই পুরীধাম তাঁহার অতি প্রিয় বলিয়া নিজ নামে ধামের নাম রাখিয়াছেন। "নিজ নামে স্থান মোর অতি প্রিয়তম।"

পুরুষোত্তমধাম সর্বভারতীয় তীর্থ। তথাপি বাঙালি জাতির ইহা একটি প্রধান তীর্থ। কারণ, বাংলার ঠাকুর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পর শেষ জীবনের চব্বিশ বৎসর কাল পুরুষোত্তম ধামেই অবস্থান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ। গঙ্গানদীর প্রবল ভাঙ্গন হেতু লীলার কোনো স্মৃতি বিদ্যমান নাই। কিন্তু পুরীধামে মহাপ্রভুর অগণিত স্মৃতিস্থান অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান। যে নির্জন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি অবস্থান করিতেন তাহার নাম 'গৌরগম্ভীরা'। যে-সড়ক ধরিয়া নিত্য নিত্য সমুদ্রস্নানে যাইতেন সেই পথের নাম 'গৌরবাটসাহী'। যে-স্থানে তিনি ভক্তগণসহ বসিতেন তাহার নাম 'চৈতন্যচত্বর।' শেষ লীলার চব্বিশ বৎসর প্রত্যেক বৎসর গৌড়দেশীয় ভক্তগণ, প্রায় দুই শত লোক নবদ্বীপ হইতে পুরীধামে পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। সেই স্মৃতি আজও জীবন্ত। এখনও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ভক্ত পুরীধামে গমনাগমন করেন। তাঁহারা শুধু জগন্নাথ দর্শনেই যান না, গৌরগম্ভীরা, হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থল, সিদ্ধ বকুল ও সমাধি স্থান দর্শন করেন। যে সমুদ্রকে মহাপ্রভু মহাতীর্থ বলিয়াছেন, সেই সমুদ্রের শোভা তাঁহারা দর্শন ও স্নানাবগাহন করিয়া গৌর বিরহ-বেদনার স্মৃতিতর্পণ করেন।

এই নিবন্ধে 'রথযাত্রা' সম্বন্ধে সকলের জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা আলোচনা করিব। বৎসরে জগন্নাথদেবের ৬১টি যাত্রা বা উৎসব আছে। তার মধ্যে রথযাত্রা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ একমাত্র এই যাত্রাতেই সপার্ষদ জগন্নাথদেব পুরীর মন্দির ছাড়িয়া সদর রাস্তায় রথারোহণ করতঃ সর্বমানবের নয়নগোচর হন। স্নানযাত্রাতে শ্রীমন্দির ত্যাগ করেন কিন্তু বড় দেউল বা প্রাচীরের বাহিরে পদার্পণ করেন না। তাই এই যাত্রা দর্শনে লক্ষ লক্ষ নরনারী সমাগত হন। তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিকাংশ। পুরীর শ্রীমন্দিরের বিগ্রহ চারিজন। এই চারিজনের জন্য তিনখানা রথ নির্মিত হয়। প্রত্যেক বছরই নূতন রথ নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের ও সুদর্শনের রথের নাম নন্দিঘোষ। ইহার উচ্চতা ৩৩ হাত। পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৬টি চাকার উপর এই রথ স্থিত। বলরামের রথের নাম তালধ্বজ। ইহা উচ্চতায় ৩২ হাত ও চারিহাত পরিধি বিশিষ্ট চাকা ১৪টি। সুভদ্রাদেবীর রথের নাম পদ্মধ্বজ। ইহাতে চারিহাত পরিধি বিশিষ্ট ১২টি চাকা থাকে, উচ্চতা ৩১ হাত। মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী হইতে রথের কাঠ সংগ্রহ আরম্ভ হয় ও পাঁচ মাস ধরিয়া কাজ চলে। রথ তিনখানির চাকার উপরিভাগ হইতে চূড়া পর্যন্ত নানা রঙের বস্ত্রর দ্বারা সুশোভিত হয়। প্রত্যেকখানি রথে একজন

** "পূর্বায়ণ"। জুন ও জুলাই, ১৯৮৭।*

রক্ষক, একজন বাহক ও ৪টি ঘোড়া থাকে। ইহা ছাড়া বহু পার্শ্বদেবতা থাকেন। এই সকলই দারু নির্মিত বটে। পার্শ্বদেবতাদের বসাইবার যাঁর যে-স্থান তাহা আবহমান কাল ধরিয়া নির্দিষ্ট আছে।

বিগ্রহগণকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রারম্ভ করিতে মধ্যাহ্ন কালে উপস্থিত হয় 'পহুণ্ডীবিজয়'। 'পহুণ্ডীবিজয়' অর্থ পদবিন্যাস, বিগ্রহগণকে শ্রীমন্দির হইতে নামাইতে আনিয়া রথে আরোহণ করাইবার নীতি আছে। তদনুসারে কার্য সমাধান করিতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে। বহু নরনারী এই লীলাদর্শন করিয়াও কৃতার্থ হয়।

বিগ্রহগণ রথে অধিষ্ঠিত হইলে পুরীর যখন যিনি রাজা থাকেন তিনি স্বর্ণ সম্মার্জনী লইয়া রথের উপরতল ও সম্মুখস্থ পথ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করেন। মহাপ্রভুর সমকালে যিনি সিংহাসনে স্থিত ছিলেন তাঁহার নাম ছিল প্রতাপরুদ্র। তিনি স্বয়ং সত্যসত্যই স্বর্ণ সম্মার্জনী লইয়া রথের ও মহাপ্রভুর গমন পথে ঝাড়ু দিয়াছিলেন, অত বড় ব্যক্তির ঐরূপ হীন সেবা দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপূর্বভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর পদাশ্রিত পরম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বলরামের রথ সর্বাগ্রে যাত্রা করেন। তৎপর সুভদ্রার রথ ও সর্বশেষে জগন্নাথদেবের রথ যাত্রা করেন। শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচার মন্দির পর্যন্ত মাত্র দুই মাইল পথ। পুলিশগণ রথ রক্ষা করেন সুদৃঢ় কাছির দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়া। যাত্রিগণ ও বিশিষ্ট একশ্রেণীর সেবক রথ টানিয়া লইয়া যান। হরিনাম করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ লোক উল্লাসভরে রথ-রজ্জু আকর্ষণ করেন। রথাগ্রে বহু সংকীর্তনের দল কীর্তন করেন। কোন দল নামকীর্তন করেন, কোনও কোনও দল মহাপ্রভু যেভাবে রথাগ্রে জগন্নাথ দর্শন করতঃ নর্তন-কীর্তন করিতেন তাহা বর্ণনা করিয়া লীলা স্মরণে বিভোর থাকেন। মহাপ্রভু ঐ দারুবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিতেন এবং ভাবিতেন যে কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে। এই ভাবনা ও তদনুকূল উক্তি-প্রত্যুক্তিসকল যে কত মধুময় ও সুগভীর তাহা রসজ্ঞ ও ভাবুক ভক্তগণ আজও আস্বাদন করিয়া থাকেন। আজও ভক্তগণ সেইভাবে বিভোর হইয়া রথযাত্রা দর্শন করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী সাধক তাঁহারা কঠোপনিষদের মন্ত্র স্মরণ করেন—আত্মাই রথী, দেহই রথ, বুদ্ধিই সারথি, মনই অশ্ব। তত্ত্বজ্ঞেরা দেহরথে জগদ্‌রথে পরমাত্মা দর্শন করেন। সাধারণত অসংখ্য নরনারী এই রথ দর্শনে আর পুনর্জন্ম হইবে না এই আনন্দে রথ টানেন। রথ যখন চলে রথের উপরে শতাধিক কাঁসর বাজে একই তালে ও চতুর্দিক্ হইতে কদলী ফল বর্ষিত হইতে থাকে। ইহা এক প্রাণোন্মাদনকারী দৃশ্য। সন্ধ্যায় রথ গিয়া গুণ্ডিচা মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়। তিন রথের বিগ্রহগণের আরতি ও ভোগ হয়। রাত্রিটা তাঁহারা রথেই থাকেন। পরদিন সকালে পূর্ববৎ পহুণ্ডীবিজয় করিয়া গুণ্ডিচায় মহাবেদীতে আরোহণ করেন। আটদিন গুণ্ডিচায় বাস করেন, নবম দিনে পুনর্যাত্রা করেন। দ্বাদশীর দিন শ্রীমন্দিরে বিজয় করেন। পুরীর রথযাত্রা স্মরণে একই সময়ে ভারতের সহস্র সহস্র স্থানে একই লীলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্তী মাহেশের রথ সুপ্রসিদ্ধ। রথোৎসবের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। ❑

‘ভগবল্লীলা-চিন্তামণি’—প্রাক্-কথন

সারা বাংলা-ভারত ঘুরিয়া বেড়াই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান প্রেমভক্তির প্রবাহ যেমনটি দেখি শ্রীহট্ট জেলায়, তেমনটি আর কোথাও দেখিতে পাই না। দেশ বিভাগের পরেও সেখানকার ভক্তিধারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মনে হয়—গৌর-হরির পিতৃপুরুষের ভূমি, ভক্তিবৃক্ষের মূল স্কন্ধ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাই-এর জন্মভূমি, গৌর-আনা ঠাকুর সীতানাথের বাল্যলীলাভূমি—এই জন্যই বুঝিবা শ্রীভূমি শ্রীহট্ট সততই প্রেম-রসসিক্ত।

ভাগবতী পরিক্রমায় শ্রীহট্ট গেলে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ হাতে আসে। গ্রন্থখানির নাম ‘শ্রীভগবল্লীলাচিন্তামণি।’ এইরূপ একটি গ্রন্থ পূর্বে কখনও দেখি নাই; শুনিও নাই। এইটি শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যান। এই ব্যাখ্যার মধ্যে সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক ভাগবত আস্বাদন। একটি শ্লোকাবলম্বনে প্রায় চৌদ্দ হাজার শ্লোক। একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে একটি বিশাল মহীরুহ।

গ্রন্থখানি আমার হাতে দেন একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁহার নাম শ্রীযোগেন্দ্রকুমার দাস। জমিদার সন্তান—শ্রীহট্টের বিখ্যাত মদনমোহন কলেজ তাঁহার পিতৃপুরুষের দান। কিন্তু তাঁহার ব্যবহার অভিমানশূন্য, বৈষ্ণবতা ভরা। সতত ভক্তিগ্রন্থ আলোচনায় তন্ময় থাকেন। ‘গ্রন্থখানির মর্মার্থ কিছু বুঝিতে পারি না’ বলিয়া অতীব দৈন্যের সহিত তিনি আমার হাতে গ্রন্থখানি তুলিয়া দেন। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলাম—আমিও বুঝি না! মাত্র এইটুকু বুঝিলাম যে, একটি মাত্র শ্লোকের ৮৭ প্রকার ব্যাখ্যান, প্রথম স্কন্ধ হতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত যত বিশেষ কাহিনী ও লীলাকথা সবই বীজাকারে এই মন্ত্রটির মধ্যে নিহিত।

শ্লোক না বলিয়া মন্ত্র বলিলাম। শ্লোকের অর্থ বুঝিলেই বুঝা হয়—আর কিছু বাকী থাকে না। আর যেটি মন্ত্র তাহা শুধু পাঠ করিয়া বুঝা যায় না। বুঝিলেও অনেক কিছু বাকী থাকিয়া যায়। মন্ত্র মননের বস্তু (‘মন্ত্রো মননাৎ’—যাস্ক)। মনন করিতে করিতে নিদিধ্যাসন হয়। সত্যের দর্শন হয়। এই একটি মন্ত্র লইয়া গ্রন্থকার যে মনন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা তুলনা রহিত। ইনি নিজেও বলিয়াছেন—আমরাও বলি—শ্রীকৃষ্ণের তথা শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বিশেষ করুণা ছাড়া এইরূপ গভীর মনন সম্ভবপর নহে।

বইখানি আমার কাছে পড়িয়া আছে প্রায় দশ বছর। মাঝে মাঝে একটু পাঠ করি আর চমৎকৃত হই। গ্রন্থের ভাবোদ্ধারে যে অবকাশ, অভিনিবেশ ও তপস্যা প্রয়োজন তাহা আমার ছিল না। আজও নাই। কৃপার উদয় হইল। পথ খুলিল। একজন সাহায্যকারী প্রভু মিলাইয়া দিলেন, যাঁহার সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অসাধারণ। অনেক কলেজে অধ্যাপনার পর বার্দ্ধক্যে এখন অবসর লইয়াছেন। সুতরাং অবকাশ প্রচুর। ইঁহার নাম শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত।

ইঁহার ঐকান্তিক সাধন ও সহায়তা ব্যতীত গ্রন্থখানি সংকলন করিতে পারিতাম না। ইনি আমার মাতুল-সম্পর্কে অগ্রজ। সুতরাং ধন্যবাদ বা আশীর্বাদ কোনটারই পাত্র নহেন। শ্রীশ্রীপ্রভুপদে

*‘ভগবল্লীলা-চিন্তামণি।’ পণ্ডিত কমললোচন শর্মা। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। মহাউদ্ধারণ মঠ হইতে প্রকাশিত।

ইঁহার শুদ্ধা ভক্তি কামনা করি।

যাঁহারা ভাবুক ও রসিক, ভাষানিপুণ ও ভাগবতসেবী তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবেন। মনে হইবে শ্রীভগবান্ আদি কবির হৃদয়ে যে ভাগবতীয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, সেই বীজ বোধহয় এই মন্ত্রটিই। মন্ত্রে ধ্যান করা হইয়াছে সত্যকে, পরম সত্যকে। যে সত্যের স্বতঃসিদ্ধ আলোকে সকল কুহক দূরীভূত হয় (নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি)। মন্ত্রের বীজের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অমিয় লীলা-সমূহ। মন্ত্রের আরম্ভ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র লইয়া (জন্মাদ্যস্য যতঃ)—মন্ত্রের শেষ, গায়ত্রীর 'ধীমহি' শব্দ দ্বারা।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিচরণ বলিয়াছেন—"অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ।" গায়ত্রী মন্ত্রের মুখ্য বার্তা 'প্রচোদয়াৎ' পদে নিহিত। এই মন্ত্রের মাধ্যমেই যেন ভাগবতের প্রথম প্রণোদন। মন্ত্র মন্ত্রাক্ষর ধন্য। দ্রষ্টা ঋষি ধন্য। ব্যাখ্যাতা গ্রন্থকার ধন্য।

শান্তি প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন শ্রীঅবিনাশ রায়, এম. এ., গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য অভিনিবেশ সহকারে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীমান্ প্রশান্ত সেনগুপ্ত প্রুফ সংশোধনে ও অন্যান্যভাবে আনুকূল্য করায় সেও আমার আশীর্বাদভাজন।

শ্রীশ্রীবৈশাখী নবমী
সন ১৩৮৭, শকাব্দ ১৯০২
মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা।

বৈষ্ণব-পদ-রজো-লেশ-লোলুপ
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

হিন্দোলনলীলা

শ্রীশ্রীভগবানের জন্ম-কর্মের নাম লীলা। মানুষ এই ত্রিগুণের দেশে বাস করে। তাই কর্ম করা মানুষের স্বভাব, মানুষের এই কাজকর্মের নাম ঘটনা, শ্রীভগবান্ ত্রিগুণাতীত তাঁর কোন কর্ম নাই, তবু কি জানি কোন্ এক অজানা কারণে তিনি সতত কর্ম পরায়ণ, তাই তাঁর এই জন্ম-কর্মের নাম লীলা। এই লীলা ও ঘটনাতে কিছু প্রভেদ আছে, একটি ঘটনা জানিলেই জানা হয়। অমুক সনে শিবাজী মারাঠা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ইতিহাস জানিলেই জানা হয়। আর অমুক সময় শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই নদীয়ায় প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, জানিলেই জানা হইল না। শ্রীমুখে তাই অর্জুনকে কহিয়াছেন, "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" শ্রীহরির জন্মকর্ম দিব্য, তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। ঘটনা অনিত্য, গত হইয়া গেলে কেবল স্মৃতি থাকে, লীলা তত্ত্বতঃ নিত্য (eternal as principles), হইয়া গেলেও হইয়া যায় না, সরস হৃদয়ে প্রত্যহ তাহার আস্বাদন ঘটে। ঘটনা দিনের পর দিন বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া যায়, লীলা প্রতি পদে পদে উজ্জ্বলতর ও মধুরতর হইয়া উঠে। ঘটনা জৈব কর্ম, তাঁহার ফল বন্ধন; লীলা শ্রীভগবদ্বিলাস, তাহার ফল উদ্ধারণ—জীবের অনাদি কর্মবন্ধ-বিমোচন। এই লীলা কিন্তু অন্তর্মুখী হইয়া আস্বাদন করিতে হয়। জীব বহিরিন্দ্রিয়-সর্বস্ব, তাই লীলা আস্বাদন তাহাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

* 'আঙ্গিনা'।

আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা। আজ জোৎস্নাস্নাত গভীর নিশি যোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসময়ী বিনোদিনীকে লইয়া বৃন্দাবন বিপিনে হিন্দোলনে ঝুলন খেলা খেলিয়াছিলেন। এই লীলা তত্ত্বতঃ আস্বাদন করিতে হইবে। ঐ যে ভক্ত রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন—

"হেলন দোলন প্রেম খেলন
কীর্তন কোঁদল মাধুর্য গুপ্তি।"

এই মাধুর্যগুপ্তিই লীলা-তোরণের অর্গল। ভাঙ্গিয়া গেলেই অনন্ত তত্ত্বরহস্য খুলিয়া যায়। একটি আম্রের বীজ তোমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, এটি অমৃতের বীজ, তুমি অমনি মুখে পুরিয়া দিয়া কোন রস না পাইয়া ছুড়িয়া ফেলিলে, বীজ বাগানের কোণে পড়িয়া রহিল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, একদিন দৈবাৎ বাগানের দিকে গিয়া দেখিতে পাইলে, কচি কচি পল্লবে সুশোভিত একটি বৃক্ষ তোমার বাগানখানাকে অপূর্ব শোভায় সাজাইয়া দিয়াছে। এই নয়ন-তৃপ্তিকর পল্লবের সৌন্দর্য কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক চলিয়া গেল, আর একদিন বাগানে গিয়া কী দেখিতে পাইলে? অসংখ্য মঞ্জরী গন্ধে বাগান আমোদিত হইয়াছে, কত ভ্রমর গাইতেছে, পাতার আড়ালে কত কোকিল কুহুরবে রাগিণী তুলিয়াছে। সেদিন পাতার শোভায় চোখ জুড়াইয়াছিল, আজ গানে ও ঘ্রাণে কর্ণযুগল ও নাসারন্ধ্র পরিতৃপ্ত হইল। এই সুষমা রাশি কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক পরে গিয়া কী দেখিলে? ফলভারাবনত একটি অমৃত বৃক্ষ, আজ একেবারে রসনা তৃপ্তি, উদরপূর্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া লইলে। এত মধুরিমা কোথায় ছিল? সৎকার্যবাদী দার্শনিককে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে বলিয়া দিবে, এই সৌন্দর্য মাধুর্য সব ঐ বীজেতেই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান ছিল—ইহাকেই বলে মাধুর্য-গুপ্তি।

অনন্ত মাধুর্য-সিন্ধুস্বরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র, ঐ গুপ্তি আর স্ফূর্তিই তাঁর লীলা। যখন স্ফূর্ত (manifest) তখনই প্রপঞ্চধামে প্রকটন, যখন গুপ্ত (unmanifest) তখনই নিত্য ধামে আস্বাদন। এমন কেন হয়? রসিক যারা তারা বলেন এই তার সাধের ব্যবসায়। যখন উদ্দীপন, তখন তেমন প্রকটন। বিশাল বারিধি বক্ষ আজ প্রশান্ত। আকাশের তারাগুলি তাহাতে ঐ মালার মত শোভিতেছে। ক্রমে ঋতু ফিরিয়া আসিল, গগনে জলদ জাগিল, পবন বহিল, সাগর নাচিয়া উঠিল, হেলিয়া দুলিয়া বেলা ভূমিকে চুম্বন করিয়া সোহাগে গলিয়া পড়িল।

একে তো শ্রীবৃন্দাবন ধাম, তাহাতে বর্ষাকাল। সৌন্দর্যরাণী যেন আপনাকে খুলিয়া মেলিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

"নব ঘন কানন শোভন কুঞ্জ।
বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ।।
নবনব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুকপিক গাওয়ে রসাল।।"

শ্রীবৃন্দাবনের বর্ষার শোভা অপূর্ব। শ্রীল শুকদেব স্ফুটনোম্মুখ গুপ্ত মাধুরী কর্ণিকার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করতঃ অতি চমৎকারভাবে এই বর্ষার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা শ্রীদশমে—

"অষ্টৌ মাসান্নিপীতং যদ্ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে।। ভাঃ ১০/২০/৪.

আট মাস ধরিয়া সূর্যদেব অবনীর জলময় ধন আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই রস মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্রও স্বীয় অনন্ত রস মাধুর্য আকর্ষণ করতঃ আপনাতে আপনি আবৃত রাখিয়াছিলেন, আজ সময় বুঝিয়া বিকর্ষণ-লীলা আরম্ভ করিলেন। তত্রৈব—

"ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা।।" ভাঃ ১০/২০/১৮

গগনের গায়ে সাতরঙের রামধনু উঠিল। রামধনুর কোন গুণ* নাই, অথচ সে উদয় হয় আকাশের উপরে। আকাশের কিন্তু শব্দ-গুণ আছে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে গর্জিত শব্দ-গুণ তো আছেই। তদ্রূপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত, অথচ সত্ত্বাদি গুণযুক্ত এই ব্যক্ত প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া তিনি অতি উপাদেয় লীলাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দিকে শোভারাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগোস্বামিগণ কহিলেন এই শোভা তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ ("স্বলীলাযোগ্যাযোগ্যতাপাদনার্থমাত্মশক্ত্যা হ্লাদিনী-নাম্না উপবৃংহিতম্"—শ্রীজীব)। তখন শ্রীভগবান্ ঐ শোভাকে পূজা করিলেন (ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে) অর্থাৎ সর্ব সৌন্দর্যের খনি তিনি, আপনারই ঐ সৌন্দর্য আপনি সমাদর করিয়া আপনাকেই তাহাতে হারাইয়া ফেলিলেন, বনবিহারী বনমালী অমনি অধরে মুরলী ধরিলেন। গুপ্ত মাধুর্যের দ্বার খুলিয়া গেল। তোরণে দাঁড়াইয়া পদকর্তা গান ধরিলেন—

"আষাঢ় গত পুন, মাস শাওণি,
সুখোদয় যমুনা তীর।
চাঁদনি রজনী, সুখময় সুখোদয়,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।।"

আমরা জানি যার অনুদয় ছিল, তারই উদয় হয়, আজ কিন্তু বড় রহস্য হইল। সুখময়ের সুখোদয় হইল। ইহা তত্ত্বজ্ঞ রসিক ভক্তের আস্বাদন। নিত্য সুখের আকর তিনি আজ তার দশদিকে উদ্দীপনবিভাব। কলনাদিনী কালিন্দীতটে বংশীবট মূলে ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া শ্যাম সখা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া দিলেন। অমনি—

"উথলহ কালিন্দীতীর।"

সখ্যমনা যমুনার শ্যামলিম জলরাশি ধবলিম বীচিমালা আরক্তি চরণ চুম্বন করিতে লাগিল। বিহ্বলা গোপবালা যুথে যুথে ছুটিয়া আসিল। কালিয়া বধুর রূপের ঝলকে তাহাদের হৃদয় দোলা দুলিতে লাগিল। কত রাশি রাশি লতাপাতা তুলিয়া, বিবিধ কুসুম চয়ন করিয়া তারা পদ্মাকারে এক অভিনব হিন্দোলা রচনা করিলেন। তদুপরি রাধামাধব অধিরোহণ করিলেন।

* গুণ—ধনুকের ছিলা।

"বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখি আনন্দে বিহ্বলা।।"

তখন বনদেবীও প্রেমানন্দে জয় জয় রোল তুলিয়া দিলেন।

"হংস সারস সুরস শবদিত,"
"দাদুরী ঘন ঘন রোল।"

আবার—

"হরিগুণ গায়ত চৌদিশে।
শুকপিককুল হিয়া অধিক উল্লাসে।।"

তখন শ্রীরাধামাধব হিন্দোলনে দুলিতে লাগিলেন।

"হিন্দোলনে মিলন রাধামাধব।
বেষ্টন নর্তন সখীগণ সব।।" (হরিকথা)

লীলারঙ্গ দেখিয়া—ভক্তগণের বিস্ময়ের পর বিস্ময় হইতে লাগিল, কৃষ্ণদাস কহিলেন,—'প্রথমতঃ কালিন্দীকূলে কাল মেঘের উদয়, ইহাই চমৎকার, তাহাতে সেই মেঘ আবার নরশরীরধারী, ইহা আরও চমৎকার, বিদ্যুৎ সকল সেই মেঘকে দোলাইতেছে, ইহা পূর্বাপেক্ষাও চমৎকার, তারপর ঐ সৌদামিনী সেই মেঘ হইতে পৃথক্ হইয়া সবিলাসাঙ্গে শোভা পাইতেছে, আর সুগন্ধ জলধারা ঢালিয়া মেঘকে সিঞ্চন করিতেছে, ইহা তদপেক্ষাও চমৎকার, তারপর ঐ মেঘে আবার বৃন্দা প্রভৃতির লোচন-চাতক সর্বদা অমৃত পান করিতেছে। ইহা চমৎকারিত্বের চূড়ান্ত। উপমার পর উপমা তুলিয়া চতুর ভক্ত সে শোভারাশি দেখিতে লাগিলেন। তথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

"অনাচ্ছন্নম্ভোদৈর্দিবসকর-বিম্বোপরি স চেৎ-
নবাম্ভোদব্যূহঃ প্রকট-চপলাভিঃ সুবলিতঃ।
মহাবাত্যোদ্‌ভ্রান্তঃ সততমভবিষ্যত্তত ইতঃ।
তদা তস্যাঘারেস্যাপমিতি মলপ্স্যন্ত কবয়ঃ।।" ১৪।৬৪

ভানু-মণ্ডলের উপরিভাগ যদি মেঘমণ্ডলদ্বারা আচ্ছাদিত না হয়; এবং স্থিরতর বিদ্যুৎমণ্ডলে যদি অভিনব জলধর মণ্ডল সংযুক্ত হয়—ও মহাবায়ু সমূহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে তবেই এই সখীবেষ্টিত হিন্দোলিকোপবিষ্ট অঘারি শ্রীকৃষ্ণের উপমাস্থল হইতে পারে।. তখন আরও আশ্চর্য হইল। এক কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বামে লইয়া হিন্দোলে দুলিতে লাগিলেন আর দুই দুইটি সখীর মধ্যে এক একটি কৃষ্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইবার গুপ্ত মাধুরী ষোল আনা ফুটিয়া উঠিল। অহো! মাধুর্যের কথা আর কী বলিব—যেন একখানি আকাশগামী পর্বতে প্রফুল্ল স্বর্ণলতা দ্বারা বেষ্টিতাঙ্গ একটি তমাল তরু শোভা পাইতেছে, আর চারিদিকে অসংখ্য কনককদলী সংযুক্ত-তাপিঞ্ছতরু মণ্ডলী হইয়া পরিবেষ্টন করিতেছে*। এই প্রকারে লীলারূপ সলিল সমূহের ধারাপাতে বিশ্বকে সেচন করিতে লাগিলেন। সে রসস্নাত ভক্তকুল জয় জয় উচ্চারণ করিলেন।

"লীলাকীলা লীলাধারা পাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বং
শ্রীবৃন্দারণ্যোঽসৌ জীয়াদেবং দোলালীলাখেলঃ।।"

মধুর শ্রীহিন্দোলন লীলার জয় হউক। মধুর শ্রীবৃন্দাবন ধাম জয়যুক্ত হউক।

রঙ্গলালের এই রঙ্গের খেলা নিত্য সত্য। কঞ্জনয়না কালিন্দী কূলে বংশবটমূলে এই হিন্দোলন লীলা নিত্যকাল চলিতেছে। ক্ষুদ্র দৃষ্টি জীব কিন্তু কিছুকাল পরে আর দেখিতে পাইল না। অনন্ত প্রপঞ্চ-মঞ্চ পরিভ্রমণ করিয়া লীলারস-শেখর আবার কলিসন্ধ্যায় নদীয়া নগরে সর্ব নয়নগোচর হইলেন।

সেই হিন্দোল এই, এখনও শেষ হয় নাই, ঐযে—

"ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম কষিত কাঞ্চন জিনিয়া।।
ঝুলায়ত ভক্তবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দ সঘন জয় জয় রব উথলে নগর নদীয়া।।"

অনিবার্য গৃহকর্ম ফেলিয়া নগরবাসী পুরুষ-নারী আলু-থালু বেশে ছুটিয়াছে। তারা শারদপী বিনিন্দিত সেই মুখখানি দেখিয়া জীবন-যৌবন ধন্য করিবে।

"নয়ন-কমল মুখ নিরমল শত চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া।।"

পতিত-পাবনী সুরধুনীর আজ আর আনন্দের সীমা নাই।

ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে, বাসু ঘোষ কহে জানিয়া।।"

আসুন ভক্তগণ! ঐ গোরাচাঁদ চরণে জীবন সমর্পণ করিয়া আমরাও বলি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ! জয় জয় ঝুলন রঙ্গ!!

ঐ রসরঙ্গে কুত্রাপি ভঙ্গ নাই, অনাদি অনন্ত অফুরন্ত। নিত্য বামে অনাদিকাল হইতে, দু'টি ভাই ছিলেন একক। তখন কি রসে ডগমগ ছিলেন, তা কেমন করিয়া জানিব? কে জানে কেন ইচ্ছা জাগিল, 'অনন্ত বিশ্ব সঙ্গে খেলিব।' ঐ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই স্পন্দন উঠিয়াছে। যমুনাতটে সেই স্পন্দনের মূর্তিখানি আমরা দেখিয়াছি। নদীয়ার মাঠে সে মূর্তির নাচন কুন্দনে আমরা খেলিয়াছি, আজ এই মহাউদ্ধারণ পটে হৃদয় প্রেমের হিল্লোলে দুলিতেছে, অণুতে অনন্ত সত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে। মহানাম হিন্দোলে গোলোকরতন দুলিতেছেন। ভাবময় আঙ্গিনাগগনে রাগময় মাদল গর্জনে জলস্থল বায়ুমণ্ডল দুলিতেছে। নয়ন থাকে তো খুলিয়া দেখ, সারা বিশ্ব জুড়িয়া সে আন্দোলনের ঢেউ খেলিতেছে। কুঞ্জ দ্বারে গড়াগড়ি দিয়া মহানাম-মালা লইয়া ভক্ত-কুঞ্জ সেই হিন্দোলনে দুলিয়াছে।

* "তাপিতঞ্চেৎ খচর-কনকক্ষ্মাভৃদুখোঽভবিষ্যৎ, প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরটলতয়া বেষ্টিতাঙ্গঃ পবীতঃ। তাপিঞ্ছানাং কনককদলী-সংযুজাং মণ্ডলীভিঃ, সাম্যং শৌরের্জগতি স তদা তাদৃশস্যাপাবাপ্স্যৎ।।" ১৪।৭৩ গোবিন্দলীলামৃত।

"চালিতা বৃক্ষ দোলে আনন্দ হিল্লোলে,
গায় পঞ্চবটী জয় মহাউদ্ধারণ রে।"

বনবিহারী বন্ধু হরি অই হেলন দোলনে ভক্ত-কোকিল জাগরণ গাহিয়া জগৎ নাচাইয়া তুলিয়াছে। মহানামের মলয় হিল্লোলে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি দুলিতেছে; অই কুসুম-কোমল অঙ্গের অতুল অমূল্য গন্ধে অন্ধ হইয়া জীবকুল ঐ একই বক্ষে হেলিয়া দুলিয়া ছুটিয়াছে। 'বন্ধু বোল' বোল বলিয়া, প্রেমভক্তির রোল তুলিয়া, আপনি আপনাহারা হইয়া বনচারী ছন্ন-ভক্ত প্রাণ-মাতানো গান ধরিয়াছে—

"বিজনে কোকিল ডাকে,
দোলে ফুল শাখী শাখে,
মলয় হিল্লোলে বিলায় গন্ধ অতুলন।
জয় জগদ্বন্ধু জয় বল রে বদন।।" ❑

শ্রীশ্রীহরিকথায় "কুঞ্জভঙ্গ"

(১)

"নিশীথিনী অনীকিনী অনঙ্গ সম্বরে।
রণে ভঙ্গ রস অঙ্গ আবরে কাতরে।।
(বড় ভয়ে যায় রে) (সমরে পরাজিতা)।"

শ্রীশ্রীমহানাম-মণি-দীপিকা

<u>নিশীথিনী অনীকিনী</u>—

অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস নিত্য। অনিত্য এই প্রপঞ্চে বাস করিয়া নিত্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। অথচ এই নিত্যতা না বুঝিলে লীলা বুঝা হয় না। শ্রীশ্রীপ্রভু হরি তাই 'কুঞ্জভঙ্গ' লীলা লিখিতে বসিয়া সর্ব প্রথমে "নিশীথিনী অনীকিনী" পদটি প্রয়োগ করিয়া নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিতেছেন।

দিনের পর রাত হয়, রাতের পর দিন হয়। একদিন দুই দিন করিয়া মাস হয়। মাস মাস করিয়া ঋতু বর্ষ অতীত হয়। এই কালগতি দ্বারা আমরা বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। যা দেখি দিনে আছে, তা দেখি রাতে নাই। যা দেখি শীতে ছিল, তা দেখি গ্রীষ্মে নাই। যা দেখি ও বছর ছিল তা দেখি এ বছর নাই। ইহা দ্বারা বস্তুজাত পরিবর্তনশীল ইহাই বুঝিতে পারি। অথবা দর্শনের ভাষায় বলিলে বস্তুসমূহ পরিবর্তনশীল বলিয়াই কাল ঐরূপ গতিমান বলিয়া বোধ করি। সে যাহাই হউক না কেন, কালগতি ও বস্তুর পরিবর্তনশীলতা এই দুইটি বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ঠিক তদ্বিপরীত বস্তুর নিত্যতা

** আঙ্গিনা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৩৮), ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৩৮), ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩০৯) ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা (১৩৩৯ বন্ধুবাসন্তী সংখ্যা)।*

বা স্থিত স্বভাব তা বুঝিতে হইলে কালকে গতিহীন বুঝিতে হইবে।

নিশীথিনী গভীর রাত্রি — একটি কাল বিশেষ। তাহার সঙ্গে কোনও কালে কাহারও মৈত্রী নাই। কেহ কোনও কালে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সে চলিয়াই যায়। কিন্তু নিত্য লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের রজনী অভিনব প্রকারের। গভীর নিশীথে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের লীলাবিলাস হইতেছে। কালের গতিবশতঃ অই নিশি যদি ফুরাইয়া যায় তবে ঐ গতিমান কালের অধীন হইয়া পড়ে ও 'ফলবলাৎ' হানি হয়। শ্রীশ্রীপ্রভু তাই বলিতেছেন — "নিশীথিনী অনীকিনী"। অনীকিনী অর্থ স্ত্রীসৈন্য। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের প্রেমবিলাস একটি সমর বিশেষ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা যেমন একে অন্যের সর্বস্বান্ত করিয়া ধনরত্ন লুটপাট করিতে সচেষ্ট, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণও তেমনি। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণমধুরিমা লুটিযা লইবেন, শ্রীকৃষ্ণ চাহেন শ্রীরাধামাধুরী সবটুকু আস্বাদন করিবেন।

সখীগণ কেহ স্বপক্ষ, কেহ বিপক্ষ, কেহ সুহৃৎপক্ষ, কেহ বা তটস্থ হইয়া ঐ সমরের সহায়তা করে। তাই সখীগণ অনীকিনী।

"রাধা সহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ।।"—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ললিতা-বিশাখাদি সখীগণের কথা আমরা শুনিয়াছি। নিশীথিনী সখীব কথা আমরা শুনি নাই। আজ শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু বলিতেছেন — নিশীথিনী একটি সখী। এইটি একটি নূতন কথা। কথাটির তাৎপর্য এই যে, আমরা প্রত্যহ এই যে দিবারাত্র দেখিতেছি, শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য লীলার এই দিবা রাত্র নহে। আমরা যে গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু পরিবর্তন দেখিতে পাই, নিত্য লীলায় এই সকল ঋতু নহে। সে সব এক নূতন রকমের। আমাদের এই রজনী হইলে সে কি এই লীলার নিত্যতা রক্ষা করিবার জন্য বসিয়া থাকিত? নাকি ষড়্‌ঋতু একত্র বসিয়া কুঞ্জকানন সাজাইয়া রাখিত? সূর্যি ঠাকুরের আবর্তনে রাত দিন হইয়া যাইত। গ্রীষ্ম বর্ষায় পরিণত হইত। শ্রীবৃন্দাবনে রজনীর অনুগত লীলা নহে। লীলার অনুগত রজনী, তাহাই বলিতেছেন —

"নিশীথিনী অনিকিনী"

যখন প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন সখী নিশীথিনী সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। রাসের রজনীর দিন কী হইয়াছিল? লীলার পরিপুষ্টির জন্য রজনী যুগ সহস্র পরিমিতা হইয়াছিলেন—

"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ।।" শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩৩/৩৮

উপাবৃত্ত অর্থে—কোন টীকাকার বলিয়াছেন অবসান, কেহ বা তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া 'উপ' উপসর্গের 'আধিক্যেন' অর্থ করিয়া ব্রহ্মরাত্রির পুনঃপুনঃ আবৃত্তি অর্থ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, তোমরা যদি মনে কর, একটি রাত্র যুগ সহস্র হইয়া গেল আর সমস্ত পৃথিবীটা হাজার বছর আঁধারে পড়িয়া থাকিল, আর আকাশের চাঁদ-সূর্যের গতাগতি রুদ্ধ হইয়া থাকিল, তবে কিন্তু মস্ত বড় ভুল হইবে। নিত্যলীলার আলাদা রাত্র আছে। তিনি লীলার পরিপুষ্টি সাধন করেন, স্বেচ্ছাচারীর মত যখন তখন অতিবাহিত হইয়া গিয়া প্রেমের খেলা নষ্ট করিয়া

ফেলেন না ; তিনি এক অভিনব রাত্রি। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি বড় আদর করিয়া একই কালে ৭।৮টি নামকরণ করিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন।

"তামি-তমা-তমস্বতী-তমস্বিনী-ক্ষপা।
ক্ষণদা-ত্রিযামা-তমী-তমিস্রা-ঐ-তপা।
(বড় ভক্তি করে গো) (তামসী চন্দ্রিকা লোভে)"—শ্রীহরিকথা।

তামসী যে এত ভক্তি করিয়া স্থির স্বভাব হইয়া বসিয়া থাকে তাহার কারণ কী? পদ-কর্তা বন্ধুহরি বলিতেছেন, তামসী বড় লোভী। ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকা লোভে সে অত ভক্তি দেখায়। পাছে ঐ চাঁদপানা মুখখানা দর্শনে বঞ্চিত হয়, তাই সে স্বেচ্ছামত দৌড়িয়া পালায় না, করজোড়ে অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকে। নিশীথিনীর দুইটি সেবা — একটি সংবরণ আর একটি আবরণ। নিশীথিনী অনঙ্গকে সংবরণ করেন আর ঐ রস-অঙ্গ দুইটি আবরণ করিয়া রাখেন। অনঙ্গের অঙ্গ নাই, সে একটি ভাব মাত্র। আত্মতৃপ্তি বাসনার নাম অনঙ্গ, তারই নামান্তর কাম।

"আত্ম-ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।"

নিশীথিনী ঐ কুঞ্জ মধ্যে আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে আসিতে দেন না, সর্বদাই সেখানে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বিরাজ করেন। নিশীথিনীর দ্বিতীয় সেবা আবরণ। প্রেমরসে পরিশ্রান্ত রঙ্গরাজ আর রসময়ীর যে রসেগড়া অঙ্গ দুইটি তাহা তিনি কোলে করিয়া আবৃত করিয়া রাখেন। কেন? প্রাকৃত জীব-জগতের চোখের আড়াল করিবেন বলিয়া। নিত্যকাল ঐ নিত্য নিকুঞ্জে দেবী নিশীথিনী রাধাশ্যামকে বুকে লইয়া বিভোর আছেন ইহাই নিত্য- লীলা।

এবার কুঞ্জভঙ্গের কথা হবে। নিত্যলীলায় আবার ভঙ্গ কেন, তাই শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে সূত্র করিতেছেন —

"অরুণ উদয়ে কুঞ্জ ভঙ্গ।"

আমরা জানি সূর্যদেবের এক সাত ঘোড়ার রথ আছে। অরুণ তার সারথি, আগে সাত রংয়ের সাত ঘোড়া পূর্বাকাশ জুড়িয়া দেখা দেয়। তারপর অরুণ আসেন। তার পিছনে সূর্য উঠে। কিন্তু এই কোন্ অরুণ? পূর্বেই বলিয়াছি নিত্য বৃন্দাবনে সব নূতন। একটি অভিনব-অরুণ আছেন তিনি লীলার বিপক্ষ। অরুণ আসিলেই কুঞ্জভঙ্গ আরম্ভ হয়। কুঞ্জভঙ্গ একটি লীলা। নিত্যধামে নিত্য কাল পূর্বাকাশে অরুণ হাসিতেছে, আর নিত্যকাল কুঞ্জভঙ্গ হইতেছে। আবার নিশীথিনী অলস শয়নে শায়িত রাধাশ্যামকে নিভৃত নিকুঞ্জে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা নিত্যলীলা — ললিতাদির আনুগত্য ব্যতীত ধারণায় আসে না।

অলস রস আস্বাদন হইয়া গিয়াছে। এখন কুঞ্জভঙ্গের দৃশ্য আসিতেছে। প্রত্যেকটি খেলাই নিত্য। আমরা বুঝিবার সৌকর্যার্থ পর পর বুঝিয়া লইতেছি।

বিপক্ষ অরুণ উঠিয়াছে। তার আগমনে নিশীথিনীর লীলা পরাজিত হইয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে সে লীলাদর্শক ভক্তের সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতেছে পাছে ভক্তগণ ব্যথা পায়।

স্বপক্ষ আর বিপক্ষই লীলার পরিপুষ্টি সাধন।

"স্যাৎ স্বপক্ষবিপক্ষৌ চ ভেদাবেব রসপ্রদৌ।"

অরুণ বিপক্ষ। ঠিক চন্দ্রার মত। ঐ যে মঞ্জুভাষিণী শ্রীরাধাকে ডাকিয়া কহিতেছেন।

"দিগিয়মরুণিতৈন্দ্রী কিন্তু পশ্যাবিরাসীত্তবসুখমসহিষ্ণুঃ সাধ্বি! চন্দ্রাসখীব।।"

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১/২৫

হে কমলমুখি সখি রাধিকে— ঐ পূর্বদিগ্রূপা বধূ চন্দ্র সখীর ন্যায় তোমার সুখে অসন্তোষ প্রকাশ করতঃ রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

কেবল মঞ্জুভাষিণী নহে, পশু-পাখীরা সকলে মিলিয়াই রাধাশ্যামকে ডাকিতে লাগিলেন।

"শাখীশাখে পাখীগণ যুগল জাগায়।
অরুণাখি অঙ্গরাখি নিরখি ঘুমায়।।
(চেয়ে চেয়ে ঘুমায় রে) (এই রাধাকৃষ্ণ প্রেম)"

শাখী—বৃক্ষ। এই সকল শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ, এরাও অভিনব। ছয় ঋতু বারো মাস এরা পুষ্পিত হইয়া থাকে। এদেশের বৃক্ষরাজির মত এরা ফুল ঝাড়িয়া পাতা শুকাইয়া শ্রীহীন হইয়া যায় না। এরা সব বনদেবীর রাজত্বে বাস করেন। বনদেবী মনের মত করিয়া ঐ সব তরুলতা ও ফলপুষ্প সাজাইয়া রাখেন। যেখানে যে ফুলটি ফুটিলে ভাল হয়, যেখানে যে ভ্রমরটি যেভাবে পাখাটি মেলিয়া উড়িয়া বসিলে শোভা হয় — বনদেবী তাহা ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যে-সকল নৈষ্ঠিক ভক্ত শ্রীবনদেবীর অনুগত হইয়া ব্রজের প্রেমসেবা প্রার্থনা করেন তাহারাই শ্রীধামে তরুলতা হইয়া বাস করিতেছেন। এই যে স্বরূপ দর্শন করিয়া ভক্ত লিখিতেছেন—

"হেরিতে শ্রীকুণ্ডলীলা তীরে সারি সারি।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র রাজে তরুরূপা ধরি।।"

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাকুল গোপীগণ ঐ বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন তাহাই জানিতে চাহিয়া বলিয়াছেন—

"চূত-প্রিয়ালপনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্কবিল্ব-বকুলাম্রকদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।।" শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৯

হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, হে আসন, হে কোবিদার, হে জম্বু; হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে কদম্ব, হে নীপ, হে অন্যান্য তরুগণ! পরের নিমিত্তই তোমাদের জন্মগ্রহণ, তোমরা যমুনাকূলবাসী পরম ভাগ্যবান, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিতে পার?

এই সকল তরু-গুল্মরূপে ব্রজে বাস করিবার জন্য ভক্ত সাজিয়া স্বয়ং প্রভু এই যে প্রার্থনা করিতেছেন —

"বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরণে।।"

বনদেবীর কড়া শাসন। কাহারও ইচ্ছা মত নড়িবার জো নাই।

"(বড় শাসন রে) (বন দেবীর শরণে)"

বনদেবী একটি সখী। তিনি স্বপক্ষা। ঐ সকল শাখীগণের শাখায় বসিয়া পাখীগণ ডাকিতে আরম্ভ করল। বৃন্দাবনের পাখীগণও ইচ্ছামত ডাকিতে পারে না, ওরা সব বৃন্দার অধীন। তথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

"আসন্ যদর্থং প্রথমং দ্বিজেন্দ্রাঃ
সেবা-সমুৎকণ্ঠধিয়োঽপি মূকাঃ।
বৃন্দানির্দেশং তমবাপ্য হর্ষাৎ
ক্রীড়ানিকুঞ্জং পরিতশ্চুকূজুঃ।।"

শ্রীবৃন্দাদেবীর অনুগত সেই সকল বিহঙ্গম কুঞ্জে আগমন করিয়া মূকের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। অনন্তর বৃন্দার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে কুঞ্জে ইতস্ততঃ কলরব করিতে আরম্ভ করিল।

"দ্রাক্ষাসু সার্যঃ করকেষু কীরাঃ
জগুঃ পিকীভিশ্চ পিকা রসালে।
পীলৌ কপোতাঃ প্রিয়কে ময়ূরাঃ
লতাসু ভৃঙ্গা ভুবি তাম্রচূড়াঃ।।"

দ্রাক্ষালতায় সারীগণ, দাড়িম্ব বৃক্ষে শুকগণ, আম্রশাখায় কোকিল কোকিলা সকল, পীলুবৃক্ষে কপোতসমূহ, কদম্ব তরুতে ময়ূর সকল, লতাগহনে ভ্রমরগণ ও ধরাতলে কুক্কুটী সকল কলরব করিতে আরম্ভ করিল। পাখীরা ডাকিয়া কী বলিতেছে—

"গোকুলবন্ধো জয় রসসিন্ধো
জাগৃহি তল্পং ত্যজ শশিকল্পম্।
প্রীত্যনুকূলাং শ্রিতভুজমূলাং
বোধয় কান্তাং রতিভরতান্তাম্।।"

তাহারা সকলে যুগল রাধাশ্যামকে জাগাইতে চাহিল। জাগরণের কথা শুনিয়াই রাইকানু কী ভাবে ঘুমাইয়া আছে জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। তাই বলিতেছেন —

"অরুণাঁখি অঙ্গ রাখি নিরখি ঘুমায়।
(চেয়ে চেয়ে ঘুমায় রে) (এই রাধাকৃষ্ণ প্রেম)"

শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। ইহাই শ্রীহরিকথার বিশেষত্ব ও এইজন্যই শ্রীশ্রীপ্রভুর গ্রন্থ অতি দুর্বোধ্য।

নিদ্রা তমোভাব হইতে উৎপন্ন। সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বভাব—শান্তরসাস্পদ। রজঃ চঞ্চল ক্রিয়াত্মক। তমঃ জড়তাময়। এই ত্রিগুণে ন্যূনাধিক্য বশতঃ ত্রিজগৎ স্থিতিবৎ। মূলা প্রকৃতিতে ত্রিগুণ-সমতা বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকৃতির পর — অব্যক্তেরও আদি, অতএব ত্রিগুণের অতীত

বস্তু। রাধাশ্যাম দোঁহে দোঁহা আস্বাদন করতঃ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছেন — কিন্তু এ কেমন ঘুম — এ জাগ্রত নিদ্রা। অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত একটি অনির্বচনীয় অবস্থা।

"জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির ও পারে
মধুর বধূর বংশী ফুকারে।" (শ্রীমহানাম)

শ্রীরাধা মহাভাব-সমুদ্র, তাঁহার বুকে শ্যামচাঁদ। শ্যামের সামর্থ্য নাই যে না ডুবিয়া থাকিতে পারেন — তাই সকল ভুলিয়া ঐ প্রেমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন — কিন্তু ঘুম কি হয়? অমন একটা উজ্জ্বল সূর্যের সম্মুখে নিদ্রা কি আসে? শ্রীরাধার প্রেম যে একটি জলন্ত মার্তণ্ডের মত—

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্বর।"

তাই কারো চোখে ঘুম নাই। কি জানি পলক দিলে পাছে পরম রতন হাবাইয়া ফেলি এই ভয়ে দুইজনে নির্নিমিষে পরস্পরের রূপরাশি সন্দর্শন করিতেছেন।

যখন কুটিলকুন্তল ঐ শ্রীমুখ দর্শন হয়, তখন অক্ষির পক্ষনির্মাণকারী ব্রহ্মাকে মূর্খ বলিয়া মনে হয়।

ঐ শ্রীমুখ দর্শনকালে বড় অপূর্ব হয়। দর্শকের যেমন দেখিবার সাধ, দৃশ্যেরও তেমনি দৃষ্ট হইবার সাধ, ইহা অপ্রাকৃত প্রেমের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধার চক্ষু দু'টি অনুরাগে অরুণ বর্ণ হইয়াছে, আর শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমমাখা আঁখি দু'টির অগ্রে আপনাকে খুলিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণও ভানুদুলালীর রূপরাশি দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে কমল নয়ন দুইটি রাগে রক্তাভ হইয়াছে, আর শ্রীরাধা ঐ ললিত লোচনের অগ্রে আপনার কান্তমণি কান্তিহারী রূপরাশি বিস্তার করিয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন। তাহাই বলিয়াছেন—

"অরুণাঁখি অঙ্গরাখি নিরখি ঘুমায়।
(চেয়ে চেয়ে ঘুমায় রে) (এই রাধাকৃষ্ণ প্রেম)"

দেখিতেও সুখ, দেখাইতেও সুখ। পলকে হারা হইলেই দুঃখের অবধি থাকে না।

যাহা হউক — রাধাশ্যাম ঐ ভাবে থাকুন, ভাগ্যে থাকিলে ঐ লীলাবিলাস আমরা পরে দর্শন করিব, আগে বনের বিহঙ্গমকুলের কলরব শুনিয়া লই—

"শুক ডাকে শ্যাম সখা নিশি অবসান।
শারি ভাষে ও কিশোরী হও সাবধান।।
(রাই সামাল ভাই) (মহানিশা পলায়েছে)"

নিশীথিনী অবসিতা হইয়াছেন। কিন্তু রসমগ্ন শ্রীরাধাগোবিন্দের সে দিকে লক্ষ্য নাই শুকসারী ডাকিয়া বলিতেছে, হে কমলমুখি শ্যামাঙ্কশায়িনি রাধে তুমি 'সামলাও', আত্মসংবরণ কর, অমন ধারা আপনাকে খুলিয়া মেলিয়া আর শ্যাম-সুধা-রস আস্বাদন করিও না। সোহাগের কোলে শুইয়া বেশ ঘুমাইতেছ, জান না নিশীথিনী চলিয়া গিয়াছে, এখনই বহিরঙ্গ লোক জাগিবে, ঐ একটানা প্রেমপ্রবাহে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তুমি নিজে সাবধান হও, সতর্কতা অবলম্বন কর।

শুক কৃষ্ণানুরাগী, বড় ধীর স্বভাব, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, উপস্থিত বক্তাও বটে। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গোপযোগ মধুর গান গাহিয়া সে ডাকিতে লাগিল—

"জয় জয় গোকুল-মঙ্গল-কন্দ
ব্রজযুবতীততি-ভৃঙ্গ্যরবিন্দ।
প্রতিপদ-বর্দ্ধিত-নন্দানন্দ
শ্রীগোবিন্দাচ্যুতনতশন্দ।।" শ্রীগোবিন্দলীলামৃত

হে অচ্যুত, তোমাদের মধুর প্রেমবিলাস জয়যুক্ত হউক। তুমি ব্রজবাসিগণের মঙ্গলের মূল। তুমি ব্রজবাসিনী রমণী ভ্রমরীর পদ্ম, তুমি শ্রীনন্দের আনন্দ বর্দ্ধক, তুমি শরণাগত- প্রতিপালক — এই দেখ নিশি অবসান হইয়াছে, ঐ দেখ দিনকর ক্রোধভয়ে রক্তবর্ণ হইয়া উদয়াচল যাত্রা করিয়াছেন। ঐ দেখ দিক্-বধু কিরণজাল জড়িত হইয়া রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সখী নিশীথিনী দিবাকরের ভয়ে নিশাকরের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। অতএব তুমি এখন এই নির্জন কুঞ্জের নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ কর।

শারী শ্রীরাধার স্নেহপাত্রী, সদা প্রেমপুলকিতগাত্রী। শারী মধুরভাষিণী বড় সূক্ষ্মধী। শারী শ্রীমতীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে যত্নবতী হইলেন—

"নিদ্রাং জহীহি বিজহীহি নিকুঞ্জশয্যাং
বাসং প্রযাহি সখি আলসতাং প্রযাহি।
কান্তঞ্চ বোধয় ন বোধয় লোকলজ্জাং
বালোচিতাং হি কৃতিনঃ কৃতিমুন্নয়ন্তি।।"

হে ব্রজেন্দ্রনন্দনপ্রিয়ে ভানুদুলালি রাধে! এখন আলস্য ছাড়িয়া নিকুঞ্জ শয্যা পরিহার কর। প্রাণকান্তকে জাগাইয়া গৃহে গমন কর। এই এখনই দেখিতে দেখিতে ব্রজের রাজপথ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিবে, যাবৎ অধিক লোক পথে গমনাগমন আরম্ভ না করে তৎপূর্বেই তুমি কুঞ্জকৌতুক পরিত্যাগ করতঃ গৃহে গমন কর। নতুবা গুরুগঞ্জনার সীমা থাকিবে না।

শুক শারীর এত ডাকাডাকিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন সখী বৃন্দা ছুটিয়া আসিলেন—

"বীরা রাগ রাই কানু ত্বরা ঘরে চল।
নিশি যায় ভয় নাই সবেই চঞ্চল।।
(ও মা এ কি মা) (ছি ছি ছি ছি ছি)"—হরিকথা

বৃন্দা দূতী। বৃন্দা বড় সুচতুরা। সকল প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিপক্ষের মধ্য দিয়া শ্যামকে খুঁজিয়া আনিয়া রাধার সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া বা রাধাকে খুঁজিয়া আনিয়া শ্যামের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া এই শ্রীবৃন্দার সেবা। কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শত দ্রোহের মধ্যেও বৃন্দাদেবী মহানিশা ক্ষণে নিভৃত নিকুঞ্জে মিলন করাইয়া দিয়া নিজে গিয়া নিজ কুঞ্জে শয়ন করিয়াছেন।

"সব সহচরী করিল গমন।

নিজ নিজ কুঞ্জে করিল শয়ন।
নিঃশব্দ নিবিড় নিকুঞ্জ কানন।" (বিবিধ সঙ্গীত)

বৃন্দা অনুরাগিণী। শয়ন করিয়াও বৃন্দার চোখে ঘুম নাই, সকলের আগে জাগিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দার এই অনুরাগ অনন্যসাধারণ — এই রাগের নাম "মাঞ্জিষ্ঠ রাগ।" শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

"অহার্য্যোঽনন্য-সাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠ-রাগোঽসৌ।।"—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি

যে-রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না, অন্যকেও অপেক্ষা করে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তি দ্বারা বৃদ্ধিশীল থাকে তাহাকেই মাঞ্জিষ্ঠ রাগ বলে।

হঠাৎ অরুণাগত দেখিয়া বৃন্দার বড় দুঃখ হইয়াছে, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে মিলনটি সংঘটন করিয়াছেন অরুণ তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে, দুঃখে অনুরাগ নবায়মান হইল। বৃন্দা বড় বিদুষী, ঐ দুঃখভার বুকে রাখিয়াও সময়োপযোগী কাজ করিতে বৃন্দার ভুল হয় না, বৃন্দা পাখী সকলকে প্রেরণ করিলেন।

"বিলোক্য লীলামৃতসিন্ধুমগ্নৌ
তৌ তাঃ সখীশ্চ প্রণয়োন্মাদান্ধাঃ।
বৃন্দা প্রভাতোদয়-জাতশঙ্কা
নিজেঙ্গিতজ্ঞাং নির্দ্দিদেশ শারীম্।।"

নিশাবসান বিবেচনায় বৃন্দা শঙ্কাকুলিতমনা হইয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ ও সখীগণ সকলেই লীলামৃত-সাগর-নিমগ্ন, সকলেই প্রণয় বশতঃ উন্মাদান্ধ, তাই তিনি ইঙ্গিতজ্ঞা শারীকে পাঠাইয়াছেন, শারী অন্যান্য পাখীগণকে সঙ্গে লইয়া কুঞ্জে গিয়াছেন। বৃন্দার এই নবায়মান অনুরাগের নাম "নীলিমা।"

"ব্যয়-সম্ভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্।
স্বলগ্ন-ভাবাবরণো নীলিরাগঃ সতাং মতঃ।।" —শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি

যে রাগ স্বলগ্ন ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে অথচ নিজে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় না, অন্য কোন সঞ্চারী ভাবের দ্বারা যাহার ব্যয় অর্থাৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে পণ্ডিতগণ নীলিরাগ বা নীলিমা কহেন। বৃন্দার স্বলগ্নভাব দৌত্য ; বর্তমানে সেই ভাবটি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে — শারীকে পাঠাইতেছেন মিলন ভাঙ্গিবার জন্য। শারীকে বিশেষ কিছু বলিয়া দেন নাই, বলিয়াছেন তোমরা ডাকিবে। ভাবিয়াছেন শারিকার মৃদু মধুর ডাকেই যদি কাজ সিদ্ধি হয় তবে অমন কাজে নিজে আর যাব না। এই জন্য বলিয়াছেন 'বহির্নাতি প্রকাশবান।' অর্থাৎ মনের ভাবটি বাহিরে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শারীকে পাঠাইয়া বৃন্দা পূর্বদিকে তাকাইয়া নিজ কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃন্দা দেখিলেন পূবাকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে — পাখীগণ অনেক ডাকাডাকি করিয়াছে তথাপি ঘুম ভাঙ্গে নাই। বৃন্দা বড় চিন্তায় পড়িয়াছেন —

অরুণোদয় যখন হইয়াই গেল তখন রাধা-শ্যামকে জাগাইয়া স্ব-স্ব গৃহে পাঠাইতেই হইবে — বৃন্দা ভাবিতে ভাবিতে প্রথমে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া শেষে একেবারে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। বৃন্দার কাজ কী? দূতীপনা — মিলন ঘটনো। আজ বৃন্দা কী কার্যে যাইতেছেন? হায় হায়! বৃন্দা আজ মিলন ভাঙ্গিতে যাইতেছেন। বৃন্দার দুঃখের পরিসীমা নাই, বুকে দুঃখভার চাপিয়া ছুটিয়াছেন। কেন? কেবল ভয়ে, পাছে অনধিকারী বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া অযথা রাধাকৃষ্ণের অপবাদ করে। কারণ যারা লীলামাধুরী অনুভব করিতে পারে না, তারা তো কুৎসা করিবেই — বৃন্দার এই ভয়। এই ভয় হইতে জাত—যে মনের দ্বিবিধ অবস্থা তাহার মূলীভূত যে অনুরাগ তাহার নাম 'শ্যামারাগ'।

"ভীরুতৌষধসেকাদিঃ আদ্যাৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশভাক্।
যশ্চিরেণৈব সাধ্যঃ স্যাৎ স শ্যামারাগ উচ্যতে।।"

নীলিরাগ হইতে শ্যামারাগ অধিকতর প্রকাশ স্বভাব, এই রাগে রাগময় হইয়া বৃন্দা নিজেই ছুটিয়াছেন —শারিকাকে পাঠাইয়াই নিরস্ত হইতে পারেন নাই।

অনুরাগিণী ত্রস্তপদে ছুটিয়াছেন। আজ মিলন ভাঙ্গিতে হইবে, বীরার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বৃন্দা আসিয়া দেখেন কেহ জাগে নাই। বৃন্দার ডাকিবার ইচ্ছা না থাকিয়াও আছে। তাই যাই যাই করিয়াও কুঞ্জের দ্বারদেশ পর্যন্ত আর যাইতে পারিলেন না, একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

বৃন্দার আর এক নাম বীরা। সে কথাগুলি বলে বীরের মত — হৃদয়ে অফুরন্ত দুঃখ রাশি চাপিয়া রাখিয়াও বেশ মিঠে কড়া কথা কহিতে সে পরম পটু — ঠোঁটে মুখে ও চোখের পটল চাহনীতে হাসি কান্নার সংবেদন সমভাবে বিরাজ মান। বীরার এই ভাবটিকে রসশাস্ত্রবিদ্ ভক্তগণ — 'রক্তিম রাগ' কহিয়া থাকেন। শ্রীরূপ তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

"রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠা-সম্ভবো রক্তিমা মতঃ।"

কুসুম্ভ রাগ ও মাঞ্জিষ্ঠ রাগের মিলন হইতে সম্ভূত যে অপূর্ব অবস্থা তাহাই রক্তিম রাগ। পূর্বে বলিয়াছি, বৃন্দার স্বাভাবিক মাঞ্জিষ্ঠরাগ —

"কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্।
অন্যরাগচ্ছবি-ব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতম্।।"

বৃন্দার তৎকালীন শোভাটি বড় মনোহর। পদকর্তা শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি — বৃন্দার ছবিখানি দেখিয়া বলিতেছেন, — 'বীরা রাগ' এ তো বীরা নহে, ঠিক যেন মূর্তিমতী চতুর্বিধ রাগ।

বীরা ডাকিতেছেন —"রাইকানু ত্বরা ঘরে চল।' বীরা রাইকানুকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে ইচ্ছুক হইয়াও সাহসী হয়েন নাই। প্রাণ চায় নাই। তাই তৃতীয় ব্যক্তির মত শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছেন — 'নিশি তো অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। ছিঃ ছিঃ! লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই। সকলে দেখিতে পাইলে এখনই সাধে বাদ সাধিবে। এ কি একটু বুদ্ধি বিবেচনাও কি নাই ; কালিয়া ফণীর ফাঁপরে পড়ে একেবারেই কি লাজলজ্জার মাথা খেলি। নিত্যি নিত্যি শপথ করিস্, নিজে একটু সামলে না চললে কি চলে? পুনঃপুনঃ বলি ঐ আয়ানের চোখে বরং ধূলি

দেওয়া যায় — কিন্তু ঐ যে দুই বুড়ী ওদের যেন সারা গায়ে চোখ। আর এই সখীগুলিরও একই দশা। এরা তো নেহাৎ দুগ্ধপোষ্য নয় — কাছে কাছে ঘুমাইয়া থাকে — অথচ সময় মত জে'গে জাগাতে পারে না।"

কালোচিত কর্তব্য করাই ধীরতার লক্ষণ। কাহারও ধীরতা স্থিরতা নাই। সবাই চঞ্চল।

বৃন্দার ডাকাডাকি শুনিয়া ললিতা বিশাখা সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, কুঞ্জের বাহিরে গিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া তাহাদের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তখন—

"বিশাখা তরাসে আসে এস কৃষ্ণ ঘরে।
ললিতা চিন্তিতা অতি রাই রাই করে।।
(তোর কি হল রাই) (চল লয়ে ঘরে যাই)"

* * *

"বিশাখা তরাসে আসে এস কৃষ্ণ ঘরে।
ললিতা চিন্তিতা অতি রাই রাই করে।।
(তোর কি হ'ল রাই) (চল লয়ে ঘরে যাই)"

শ্রীশ্রীমহানামমণিদীপিকা

বিশাখা প্রাণকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ললিতা চিন্তাযুতা হইয়া প্রাণপ্যারীকে আবাহন করিতে লাগিলেন। বিশাখা ভাবিতেছেন এই এখনই তো মা যশোমতী জাগিয়াছেন। এখনই তিনি দাসীগণকে ডাকিয়া কহিবেন, "ওগো তোমরা নিঃশব্দে দধিমন্থন কর, আমার বাছাধন বনপর্যটনে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতেই তো জননী শ্রীকৃষ্ণের গৃহে গমন করিবেন, তৎপূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যাগৃহে না পাঠাইতে পারিলে কী উপায় হবে?

হায় হায়! ঐ যে ধবলী শ্যামলী ধেনু সকল উর্দ্ধকর্ণে হাম্বারবে সতৃষ্ণ বৎসগণকে ডাকিতেছে আর স্তনভারে প্রপীড়িতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য পথের পানে নেত্রপাত করিতেছে এমন সময় শ্রীকৃষ্ণকে জাগানোই প্রয়োজন, তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছেন।

ললিতা ভাবিতেছেন—এই এখনই তো মা আর মেয়ে জাগিয়া উঠিবে। এখনই তো 'উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাধে তদিহ কুরু গৃহে মঙ্গলাং বাস্তুপূজাম্'—রাধে! ওঠ ওঠ! মঙ্গল বাস্তু পূজা কর গিয়ে—বলিয়া জটিলা পুত্রি পুত্রি ডাকিতে ডাকিতে রাধার ঘরে আসিবে। হায় রে! তৎপূর্বে রাধাকে না পাঠাইতে পারিলে কি গঞ্জনাটাই না সহিতে হইবে। তারা তো সর্বদাই ছিদ্রান্বেষণ করে—কখনও কটুবাক্য ছাড়া কথা কয় না। তাতে যদি আজ এই কাণ্ড হয় তবে দেশময় অপবাদ রটিবে আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। যে-ভাবে হউক শ্রীরাধাকে জাগাইতে হইবে, তাই তিনি রাই রাই বলিয়া ডাকিতেছেন। স্বপক্ষ সখীগণের মধ্যে কেহ সমস্নেহা কেহ অসমস্নেহা। যাঁরা সমস্নেহা তাই রাইকানু বলিয়া ডাকিয়াছেন। ললিতা রাধাতে স্নেহাধিকা—তাই

রাই রাই ডাকিতেছেনে। বিশাখা কৃষ্ণতে অধিক স্নেহপরায়ণা তাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগলিনীপারা হইয়াছেন।

রাই রাই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্রীললিতা উম্মনা হইয়া পড়িলেন। "তোর কী হল রাই, চল লয়ে ঘরে যাই" বলিয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সখীগণ যার যেমন ভাব তদনুসারে কথা বলিতে লাগিলেন—

"সখীসব মা মা রব উ উ ছি ছি কয়।"

রাধাশ্যামের প্রেমলীলা বিহারের সম্যক্ বিস্তার সাধন করেন—বলিয়া তাহাদিগকে সখী বলা হয়। সখীদের আর একনাম পেটি, রসবেত্তা শ্রীরূপ লিখিয়াছেন 'বিশ্রম্ভ রত্নপেটী'—তারা বিশ্বাস-রত্নের পেটিকা বা পেটারা স্বরূপা অর্থাৎ বিশেষ বিশ্বাসের পাত্রী। সখীগণের ষড়্‌বিধ ভেদ।

"প্রেম-সৌভাগ্যসাদ্‌গুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী।
সভা তৎ সাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘুত্বাত্তথা লঘু।।"
"দুর্লঙ্ঘ্য-বাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎ- সাম্যমাগতা।।"

কেহ অধিকা, কেহ সমা, কেহ লঘ্বী। কেহ প্রখরা, কেহ মধ্যা, কেহ মৃদ্বী। শ্রীললিতাকে কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশোন্মুখ দেখিয়া যাঁহারা 'অধীরা' তাঁহারা 'মা' বলিয়া নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—রাখ না দিদি, এমন মিলনমাধুরী হঠাৎ ভেঙ্গে দিস্ না। যাঁহারা 'লঘ্বী' তাঁহারা 'মা' বলিয়া কোমল কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অধৈর্য হইয়াছেন বটে কিন্তু উচ্চ করিয়া ডাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, তা—যে-ভাবে হউক কানু-কমলিনীকে জাগানো দরকার। ঐ যে আকাশে ভানু ভ্রূকুটি করিতেছে ভানুদুলালীকে নগর-পথে লইয়া যাওয়াই ভার। যাঁহারা 'সমা' তাঁহারা 'উ' বলিয়া কিং-কর্তব্য বিতর্ক করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দু'মনা—রাখিতেও ভয়, ভাঙ্গিতেও ভয়। তাঁহাদের একজন কহিল, হায়! এই নবীন নাগর পাশে এই রসের মঞ্জরীটি যদি চির বিকশিত রহিত তবে না জানি কি সৌভাগ্য-সুখেরই উদয় হইত। যাঁহারা মৃদ্বী তাঁহারা 'উ' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন—উঃ! কি অচ্ছেদ্য প্রেমের গভীরতা! এখনও জাগিতেছে না। সত্যসত্যই—

"শ্যাম নীলকান্তমণি রাই কনকবরণী মা।
হিমাচলে যেন হেমলতার আশ্রয় মা।।"

কোন কোন সখি প্রখরা, তাঁহারা নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, ছিঃ! কি নির্লজ্জ এই কালিয়া ভ্রমরা; মুদিতা কুমুদিনীয় মুখ চাহিয়া এখনও যেন মাদকরসে মাতোয়ারা। যাঁহারা মধ্যা তাঁহারা ছিঃ! বলিয়া লজ্জা-বিনম্র বদনে অঞ্চল ঢাকা দিয়া একপাশে চুপটি করিয়া রহিলেন।

এইভাবে সকল সখিগণ—স্ব স্ব ভাবানুযায়ী ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখন পৌর্ণমাসীর কথা। পৌর্ণমাসীর ভাবটি সম্পূর্ণ আলাদা রকমের—

"পৌর্ণমাসী ভয় বাসি সামালিয়ে রয়।
(সব সামালে গো) (যোগমায়া ইন্দ্রজালে)"

উপযুক্ত কর্মচারীর হস্তে কার্যভার ন্যস্ত করিয়া গৃহস্বামী যেমন নিজে তাহার অধীনের মত থাকেন—সমগ্র লীলাটিকে পৌর্ণমাসীর হাতে দিয়া লীলাময় তদ্রূপ তদধীন হইয়া রহেন। লীলার পরিকরগণ সব মাসীমার হাতের খেলনা। যোগ—যোগ অর্থ কর্মকৌশল। যোগ অর্থ মিলন। এখানে যোগপদে শ্রীরাধাশ্যামের মিলন-কৌশল তৎসম্বন্ধী যে মায়া—বিসদৃশ প্রতীতির সাধনস্বরূপ অঘটন-ঘটনপটীয়সী যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবিশেষ, তাহাই যোগমায়া।

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পৌর্ণমাসী ঐ শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদনে সকল সখিগণই সর্বদা সচেষ্ট। যার যেমন সাধ্য, কলাকৌশল বিস্তার করিয়া লীলার পরিপুষ্টি সাধন করেন। কিন্তু পৌর্ণমাসীর কৌশলটা একটু অভিনব। সখীগণের ছলচাতুরী সাদাসিধা অনেক কম ধরা পড়ে। পৌর্ণমাসীর চতুরতা অতি অপূর্ব। বিজন বিপিনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে বনমধ্যে গিয়া কুটিলা তো ঐ দেখিয়া আয়ানকে ডাকিয়া দেখাইল। আয়ানের আর এক নাম অভিমন্যু—তার মন্যু অর্থাৎ ক্রোধ-বেগ অতি তীব্র। দেখামাত্রই ক্রোধে তার চক্ষু দুইটা জবাফুল হইয়া গিয়াছে—দণ্ড হাতে করিয়া তীরের মত ছুটিয়া যেই শ্রীমতীর পাশে আসিয়াছে অমনি দেখেন রাধিকা ধ্যানস্তিমিত লোচনে চতুর্ভুজা শ্যামা মাতার ধ্যান করিতেছে। সম্মুখে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবীকে দেখিয়া আয়ান ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই সব যোগমায়ার কাণ্ড। বস্তুতঃ শ্যাম শ্যামা হন নাই—হ'তে পারেন না। পূর্ণ মাধুর্যসিন্ধু স্বরূপ কৃষ্ণ আমার কেন ঐ ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগদম্বার মূর্তি পরিগ্রহ করিবেন। আর শ্রীমতীই বা কেন তার পূজা করিবেন? মূলকথা যোগমায়া আয়ানের দর্শনেন্দ্রিয় আবৃত করিয়া এইরূপ বিসদৃশ প্রতীতি জন্মাইয়াছে। এইরূপ অঘটন সংঘটন করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই, পৌর্ণমাসী তাহাতে পটীয়সী। ঐ কার্যের জন্য যে অস্ত্রটির প্রয়োজন তাহার নাম 'ইন্দ্রজাল'। ইন্দ্র অর্থ ইন্দ্রিয়, জালি ধাতুর অর্থ আবৃত করা। যাহার দ্বারা দর্শকের ইন্দ্রিয়কে আচ্ছাদন করিয়া ভ্রমে পতিত করেন—তাহার নাম ইন্দ্রজাল।

পৌর্ণমাসী নিজ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে তাকাইলেন—দেখিলেন সত্যসত্যই অরুণোদয় হইয়া গিয়াছে, অথচ রাধাশ্যামের লীলাবিলাস ভঙ্গ হইতেছে না, আর অন্যান্য সখিগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না।

পৌর্ণমাসী ভাবিলেন—কী করি? একটি বার আড় নয়নে ঐ যুগল মাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া ইন্দ্রজালটি বিস্তার করিয়া দিলেন।

যশোমতী ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন—তার যাদুধন শয্যা আলো করিয়া শুইয়া আছে। 'কই রে আমার সোনার গোপাল' বলিয়া বাৎসল্যময়ী জননী ঘুমন্ত গোপালের চাঁদ অধর দুইটি চুম্বন করিলেন—গোপাল নয়ন খুলিল। জননী অমনি হাত দু'টি বাড়াইয়া দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। রাখালগণ দ্বারে আসিয়া—

"দে মা দে মা যশোদে দে মা সাজায়ে।
কানু গোচারণে যাবে বনে বেণু বাজায়ে।।"

গাহিতে আরম্ভ করিল। ঊর্ধ্বপুচ্ছ গাভিগণ গোপালের মুখখানা দেখিয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিল।

ওদিকে যাবটে জটিলা বুড়ী ঘুম হইতে উঠিয়াই বধূর চাঁদপানা মুখখানা দেখিতে চলিলেন। গিয়া দেখেন রাধা এখনও জাগে নাই। জটিলা কহিলেন, পুত্রি, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ অদ্য যে রবিবার! সকাল সকাল স্নান করিয়া সূর্যপূজার জোগাড় কর গিয়া।

এইরূপে ইন্দ্রজালখানি বিস্তার করিয়া যোগমায়া সব দিক্ রক্ষা করিলেন—পদকর্তা প্রভু বন্ধুহরি তাহাই কহিয়াছেন—

"(সব সামালে গো) (যোগমায়া ইন্দ্রজালে)"

পৌর্ণমাসীর কাজ সে করিয়া রাখিল। এদিকে ওদিকে কোথাও কেহ তাহা টের পাইল না। বলিতে কি, শ্যামচাঁদ নিজেও জানিতে পারিলেন না।

"আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ।"

পাখীরা বৃন্দা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ডাকিতেছে—
রাইকানুর ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত তাদের ডাকিতেই হইবে।

"কেকীভয় কেকাকয় পিক কুহু গায়।
বানরী কক্ষটী রবে জাগাইয়া যায়।।
(ক্ক ক্ক কয় বা)   (ক্ষ ক্ষ ক্ষ ক্ষ ক্ষ)"

কেকী বামা জাতি। তাই তার ভয় বেশী। সে ভাবিতেছে, হায় রে! আজ না জানি কী হয়। আমাদের ডাকিয়া ফল কী! আমাদের কি সামর্থ্য আছে যে প্রেমরসে নিমজ্জমান রাধাবিনোদকে জাগাইব। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্রীরাধার ধৈর্য ধরাধরের গর্ব খর্ব করিতে আর কে পারে? আর শ্রীরাধা-ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জর বশীকরণ ওষধি আর কার কাছে আছে? কেকী তাই ভয়ে চুপ হইয়া আছে। কেকা তার সহজ সরল ভাষায় কহিতে লাগিল, ওগো ব্রজনাথ! তুমি কি জান না, অরুণ ব্রজতরুণীগণের প্রতি বড়ই অকরুণ—সেই অরুণ আসিয়াছে, অতএব শীঘ্রই এই নিভৃত নিলয় হইতে নিজালয় গমন কর।"

পিক কুহু গায়। সহকার-শাখে পিকবর কুহু কুহু ডাকিতে লাগিল। কোকিলের ক্রোধ চাঁদ আর সূর্যের উপর—চাঁদ অস্তাচলে গেল বলিয়াই তো নিশীথিনী পলাইল। আর সূর্য উদয়াচলে এল বলিয়াই তো সাধের কুঞ্জ ভাঙ্গিতে হইল। কোকিল ভাবিতেছে অপরাধী চাঁদ ও সূর্যকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই সে কুহু কুহু বলিয়া অমাবস্যাকে ডাকিতে লাগিল—কারণ অমাবস্যা এলেই চাঁদ মৃত্যুমুখে পড়িবে, আর সূর্য রাহুগ্রস্ত হইবে।

** 'আঙ্গিনা', তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৯। শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর। সম্পাদক : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়।*

বানরী কক্ষটি শব্দ করিয়া ডাকিতেছে—বানরী বলিতেছে ক্ক ক্ক আবার বলিতেছে ক্ষ ক্ষ। কিম্ শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে ক্ক হয়, বানরী বলিতেছে—কোথায় কোথা, অকরুণ অরুণ কোথায়? আমি এখনই তার গতিরোধ করিব। উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া বানরী দেখিল, অরুণ অনেক দূরে, তাহাকে নাগাল পাবার জো নাই, সে তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল 'ক্ষ-ক্ষ'—তুমি ক্ষয় হও, ক্ষয় হও। নিত্য নিত্য এমনিভাবে আসিয়া আমাদের প্রেমের যুগল ভাঙ্গিয়া দিও না। ক্ষৈ-ধাতু হইতে ক্ষ শব্দটি নিষ্পন্ন। ক্ষৈ-ধাতুর অর্থ ক্ষয় হওয়া।

"কপোতী কপোত ডাকে উঠ প্রাণপ্যারী।"
কুরঙ্গী কুরঙ্গ বলে আতঙ্ক প্রচারি।।
(পুঁ পুঁ পুঁ করে রে) (মুঁ মুঁ মুঁ মুঁ মুঁ মুঁ)

কপোত কপোতী প্রাণপ্যারীকে ডাকিয়া বলিতেছে, ওগো—

"যাতা রজনী প্রাতর্জাতং সৌরমণ্ডলম্ উদয়ং প্রাপ্তম্।
সম্প্রতি শীতল-পল্লব-শয়নে রুচিমপনয় সখি পঙ্কজ-বদনে।।"

প্রাণেশ্বরি! বিনোদমোহিনি—নয়ন খুলিয়া দেখ রজনী বিগত, প্রভাত সঞ্জাত, তপন উদিত হইয়াছে সম্প্রতি শীতল পল্লবশয্যা পরিত্যাগ কর।

রঙ্গদেবী আদর করিয়া কুঞ্জবনের কুরঙ্গের নাম রাখিয়াছেন 'সুরঙ্গ', আর কুরঙ্গিণীকে ডাকেন 'রঙ্গিণী'। তারা দু'জনে রঙ্গ করিতে করিতে কৃষ্ণ দর্শনোদ্দেশে কেলীকদম্বের মূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে নিকুঞ্জের দিকে তাকাইয়া দেখিল রাধাবিনোদ এখনও জাগরিত হন নাই। তখন তাঁহারা রঙ্গ করিয়া একটা আতঙ্ক লাগাইয়া দিল—সুবঙ্গ পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল—'জটিলেয়মুপস্থিতা' ওগো জটিলা আসিয়াছে। জটিলার নাম শুনিয়া সকলের প্রাণ আতঙ্কে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, প্রমাদ গণিল। তোমরা হয়ত ভাবিবে কুরঙ্গেরা এমন একটা মিথ্যা কথা কী করিয়া কহিল। কিন্তু বস্তুতঃ তারা মিথ্যা বলে নাই, তবে একটু চাতুর্য প্রকাশ করিয়া কহিয়াছে। পূর্বদিগের উর্ধ্বগামী সূর্যের কিরণজাল ঠিক জটার মত দেখা যাইতেছিল। সুরঙ্গ বলিয়াছে যে 'জটিল' অর্থাৎ জটাধারী কেহ আসিতেছে—সকল সখিগণকে অতি সন্ত্রস্ত দেখিয়া রঙ্গিণী সম্পূর্ণ কথাটি বলিয়া দিয়া রহস্য খুলিয়া দিল—

"রক্তাম্বরা সতাং বন্দ্যা প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী।
উর্ধ্বপ্রসর্পদর্কাংশু-জটিলেয়মুপস্থিতা।।"

ঐ যে প্রাতঃসন্ধ্যা নামা তপস্বিনী আসিতেছে—রক্তবস্ত্র পরিহিতা সকলের বন্দনীয়া উর্ধ্বগামী সূর্যকিরণ তার জটাজুট। পদকর্তা তাহাই কহিয়াছেন। কুরঙ্গ দম্পতী জটিলার নাম করিয়া আতঙ্ক প্রচার করিয়া দিল।

কুরঙ্গের শ্লোকপাঠ এ আবার কেমন কল্পনা। পদকর্তা প্রভু বন্ধুহরি তাহাই বলিতেছেন—পুঁ পুঁ পুঁ করে রে—তাহারা ডাকিতেছে ঠিক বেদপাঠ করার মত। বেদে যেমন উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত সুরের খেলা এও ঠিক তেমনি পুঁ পুঁ পুঁ মুঁ মুঁ মুঁ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—ঠিক যেন ঋষি

বালকেরা—স্তোত্র পাঠ করিতেছে।

"মনসিজ মনঃপ্রাণে প্রাণেশ্বরী ডাকে।
রতিসনে একমনে আহ্বানে তোমাকে।।
(উঠ উঠ উঠ ভাই) (রতি ডাকে মুই ডাকি)"

স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী আছেন। যদি জিজ্ঞাসা করি, সবচেয়ে বীর কে—সকলের উপরে রাজত্ব কার? তোমরা হয়তো ব্রহ্মা-বিষ্ণুর নাম করিবে, কিন্তু তা নয়। একটি দেবতা আছেন তার নাম মনসিজ—তিনি সকলের মনের মধ্যে জন্মিয়া তার উপর আধিপত্য করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সবাই মনসিজের দাস। স্বামিপাদ শ্রীধর লিখিয়াছেন 'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্প' সে পদানত করিয়াছে। একবার শিবঠাকুর তাহাকেই পুড়াইয়া ছিল বটে কিন্তু তারপরেও সে অনঙ্গ হইয়া শূলপাণির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

বিশ্বের সর্বত্র মনসিজের অবাধ গতি। কেবল ঐ যমুনার ওপারে তার যাওয়া নিষেধ। বৃন্দাবনেশ্বরীর রাজত্বে তার প্রবেশ নাই। কেননা সেখানে স্মরদর্প খর্বকারী মনোহারী মুরারি রহিয়াছেন।

"ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ।"

গোপীগণের মানসে কিন্তু সে মনসিজ জন্মিতে পারেন না, কেননা তাঁদের মনের মধ্যে হৃদয়াসন জুড়িয়া সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণকিশোর বিরাজমান।

"চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মনোমথে,
নাম ধরে মদনমোহন।"

যাহার নিজের মন আছে·মনসিজের সেইখানেই অধিকার আছে। এ সংসারে সকলেরই একটি নিজস্ব মন আছে। কেবল গোপীদের মন নাই; তাঁহাদের ষোল আনা মনটি তাঁহারা সমর্পণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণে। মনসিজের সামর্থ্য নাই যে শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি স্পর্শ করে। শ্রীকৃষ্ণ মনসিজের সকল দর্প খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বড় চতুর, পরাজিত করিয়া তাহাকে দগ্ধ না করিয়া মুগ্ধ করিয়া নিজধামে স্থান দিয়াছেন। রতিসহ রতিকান্ত এখন ব্রজেই থাকেন—তাহার দুইটি কাজ,—কুঞ্জে যখন রাধাশ্যামের লীলাবিলাস হয় তখন কুঞ্জকাননের, বাহিরের তোরণের একপাশে দাঁড়াইয়া দুইজনে চোখের জলে ভাসেন—

"কাতরে কন্দর্পরতি করজোড়ে রয় মা।" (শ্রীমতী সংকীর্তন)

আর যখনই অবসর ঘটে তখনই সারা ব্রজময় ধূলায় গড়াগড়ি যান।

"বন্ধু বলে ধরাতলে রতিপতি পড়িল।" (শ্রীনামসংকীর্তন)

রতিপতির প্রাণটি বড় কোমল। ব্রজের রজঃ মাখিয়া মাখিয়া আরও মধুর হইয়াছে। অমন নিষ্কলঙ্ক নির্মল প্রেমের মিলন—বহিরঙ্গ লোকে দেখিয়া অযথা কলঙ্ক লেপন করিবে, তাহা মনসিজের সহ্য হয় নাই। তাই রতিকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে প্রাণপণ করিয়া প্রাণেশ্বরী রাধাকে

ডাকিয়া বলিতেছেন—"ওগো-শ্যামাঙ্কশায়িনি, তুমি আর ঘুমাইও না—ওগো কুরঙ্গনয়নি, একটিবার নয়ন দু'টি খুলিয়া দেখ, আমরা কে কে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।" "রতি ডাকে মুই ডাকি" মনসিজ তখন নিজ প্রাচীন গৌরবের কথা মনে করিয়া বলিতে লাগিল—"ওগো গোবিন্দ-রঞ্জিনি! এই জীবনে আহুত হওয়া ব্যতীত কোনদিন কাহাকেও আহ্বান করি না। চিরটি কাল ধরিয়া সকলেই আমাদের ডাকে, আমরা কদাপি কাহাকেও ডাকি না। জীবনে এই প্রথম এই শেষ, তোমার কিঙ্কর-কিঙ্করী হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি। ওগো আনন্দদায়িনি! অন্ততঃ আমাদের আব্দার রক্ষা করিতে একটিবার ফিরিয়া চাও। তোমার ঐ প্রেমচঞ্চল আঁখি দু'টি সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করি।"

রতি-রতিপতির মধুর আহ্বানে রাধাবিনোদ একটু জাগিয়াও ঐ বিশুদ্ধ প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিদ্রিতের ভাণ করিয়া রহিলেন। তখন বনদেবী যুক্তকরে গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া কাতরে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন—

"বনদেবী ঘন বলে রাধে রাধে রাধে।
কুঞ্জ দ্বারে কর জোড়ে কত কত সাধে।।
(করজোড়ে বলে গো) (প্রাণেশ্বরী ঘরে চল)"

বনদেবী দূতী। তিনি সেবাপরা পরিচারিকা শ্রেণীর। বনদেবী বহুরূপা, নানাভাবে তিনি ভাবময়ের প্রেমের সেবা করেন। তিনি কখনও ফুল হইয়া হাসেন, কখনও ভ্রমর হইয়া নাচেন, কখনও সুস্বাদু ফল হইয়া রাধাগোবিন্দের পরিতৃপ্তি বিধান করেন। কখনও লতাকুঞ্জরূপে আপনিই বিলাসভবন হইয়া রহেন। কাননে যত ওষধি-তরু সবই তাঁহার মূর্তি। আকাশের তারা আর চাঁদ ইহারা তাঁহার সুহৃদ্, চাঁদ উঠিলে বন-দেবীর আনন্দের সীমা থাকে না, অমনি সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, নবপল্লবে নবকুসুমে সাজিয়া-গুজিয়া সাধ্বী সতীলক্ষ্মীটির মত মরালগামিনী গোবিন্দমোহিনী শ্রীমতীর অনুগমন করিয়া কুঞ্জবাসরে আসর জাকাইয়া দেন। অকরুণ অরুণ উদিত হেরিয়া চন্দ্র তারকা সকলেই লুকাইল, তদ্দর্শনে বনদেবী প্রমাদ গণিলেন—

"তারকা চন্দ্রমা ত্বরা গগনে লুকায়।
তরুণ অরুণ ভাতি তরু ও লতায়।।
(হা হা হা জ্বলে রে) (নিশি শেষ সর্বনাশ)"

বনদেবী শ্রীরাধাকে ডাকিয়া কহিলেন—ওগো বাসররঙ্গিণি! ঐ দেখ চন্দ্রতারকা সব ডুবিয়া গেল; আর নিকুঞ্জ বাসরে থাকিয়া ফল কী?

"বিধুনা সহিতা সবিতুশ্চকিতা
রজনী বনিতা চলিতা ত্বরিতা।
অনয়া সময়া প্রিয়য়া ত্বরয়া
সহিতঃ সরিত্ত- স্তটতোহটতঃ।।"

"হায়, ঐ যে সকল তরু-লতার অগ্রে কিরণ সম্পাত হইতেছে, এখনই আমার সর্বসম্পৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। কৃষ্ণসেবার জন্য যত ফুল ফুটাইয়াছি, সব শুকাইয়া যাইবে। যত ফল

ফলাইয়াছি, সব ঝড়িয়া যাইবে। কুঞ্জবন আঁধারে পড়িয়া থাকিবে।' অরুণের কিরণ বনদেবীর কাছে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে; সন্তাপিতা হইয়া বনদেবী 'হা হা হা জ্বলে রে' বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

সত্যসত্যই মিলন-রজনী ফুরাইয়া গেলেই সর্বনাশ। সখি! নিশীথিনি! তুমি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমরা ঐ যুগল-কিশোর মাধুরী—আর একটিবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া তাপদগ্ধ জীবন জুড়াইব।

* * *

"নাগরবর রস গর-গর।
রাই কোরে রে প্রেম ঢর-ঢর।।
অলস মুদিত অরুণ আঁখি।
মিলিত দু'তনু শপথ রাখি।" —শ্রীশ্রীহরিকথা

শ্রীশ্রীমহানামমণি দীপিকা

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি এই বার অফুরন্ত প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জমান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত নিকুঞ্জ বাসরে অতি অপূর্বভাবে দু' তনু মিলিত হেরিয়া পরম উল্লাসে সেই নিখুঁত নির্মল মিলনের নিটোল ছবিখানি রসপিয়াসী রাগমার্গী ভক্তগণের অগ্রে তুলিয়া ধরিতেছেন। আমরা অকৈতব অঞ্জনে নয়নযুগল রঞ্জন করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুর অপ্রাকৃত তুলিকায় আঁকা শ্রীশ্রীযুগলকিশোর দর্শন করি।

নাগর—নগরবাসী। যে-সকল নগরবাসী ধৃষ্টব্যক্তি নানা দুরভিসন্ধি করিয়া ছলে বলে পরের ঘরের রমণীকে কুলের বাহির করিয়া নির্লজ্জের মত জন-সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহারা নাগর। গোপবধূটি-চিত্তচৌর কালিয়া বঁধু কেবল নাগর নহেন, নাগরবর। সকল নাগরের তিনি চূড়ামণি, সকল লম্পটের তিনি শিরোমণি, পরকীয়া পীরিতির তিনি অফুরন্ত খনি। এই পরকীয়া রস কী? ইহা অতি নিগূঢ় কথা। একমাত্র রসিক অথচ সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর শুদ্ধ হৃদয়েই এই রসানুভূতি হয়।

রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরতমুনি। তাহার পর হইতে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বহু রসজ্ঞ সাধক রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। রসের কবি গাহিয়াছেন—

"রসিক রসিক সবাই কহয়, রসিক কেহ ত নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিকে গুটিক হয়।।"

এ কথা অতি সত্য। তথাকথিত বহু রসিক রসের কথা কহিয়াছেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে কী বলিয়াছেন—

"দোঁহার যে সম রস ভরতমুনি মানে।

আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে।।"

রসিকগণ কহিয়াছেন—'স্বকীয়' শ্রেষ্ঠ। স্বকীয় অর্থ আমি যাহাকে ভালবাসিব সে যদি আমার নিজের হয়, সে যদি আমার আপনার হয় তাহাকে যদি সর্বদার তরে আমার বুকের কাছে দেখিতে পাই তবেই সুখ তবেই সুখের ফোয়ারা। আর পরকীয় হীন নিকৃষ্ট; কারণ যাহা আমার নয় তাহাকে ভালবাসিয়া সুখ কোথায়? কেবল দুঃখ জ্বালা, লোক-গঞ্জনায় লাঞ্ছিত হইয়া প্রিয়বিচ্ছেদে তাপিত হওয়াই তাহার পরিণতি। এই হেতু প্রাচীন উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থ সমূহের প্রায় সর্বত্রই নায়িকা নায়কের স্বকীয়া। সোজা কথায় নায়িকা নায়কের পরিণীতা, আপনার ঘরের লোক। যেমন রামলীলায় সীতাদেবী, দ্বারকালীলায় রুক্মিণী সত্যভামা ইত্যাদি। সীতা যদি সহস্র যুগ শ্রীরামের বামে গলাটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে পৃথিবীতে এমন কোন জীব নাই যে তাহাকে লেশমাত্র কটাক্ষ করিবে বরং সকলে বলিবে সতী, পরমা সাধ্বী। ইহা স্বকীয়া প্রীতি।

কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবনে একটি অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার অলৌকিক ভালবাসার অভিনব অভিনয় হইয়াছিল। তাহা কী বস্তু কেহ তাহা বোঝে নাই।

তাই সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে নিজে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।"
শ্রীরাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে।।"

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্বরসতত্ত্ব তাহা দ্বারা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি শ্রীগ্রন্থে শ্রীরূপ লিখিতেছেন—

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণে।।"

এই যে ভরত প্রভৃতি রসবিৎ পণ্ডিতগণ পরকীয়াকে লঘু বা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন তাহা প্রাকৃত নায়কপর। অর্থাৎ যেখানে প্রেমের মধ্যে কামগন্ধ আছে, আত্মেন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান সেই জাতীয় প্রেমে—যাহাকে প্রেম না বলিয়া কাম আখ্যা দেওয়া সঙ্গত—সেই প্রেম বিষয়ে নায়িকা যদি হয় স্বকীয়া তবেই উৎকৃষ্ট। যদি হয় পরকীয়া তবে তাহা নিকৃষ্ট, তবে তাহা লাম্পট্য, সমাজে তাহা ঘৃণিত উপহাসিত। কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা নিকৃষ্ট তো নহেই বরং উহাতে ব্রজপ্রেমের চরম উৎকর্ষ।

এখানে প্রশ্ন আসে, কেন? যাহা দোষের তাহা সর্বত্রই দোষের হওয়া উচিত। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলিয়া তাঁহার কোন দোষ নাই। না তাহা নহে। শ্রীরূপ বলিতেছেন—
"রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণে।"

তিনি রস নির্যাস আস্বাদনের জন্য অবতরণ করিয়াছেন। এই হেতু তাহাতে দোষ নাই। এই রসনির্যাস কী?

গোলোকরতন গোলোকে ছিলেন, একা একা আপন মনে। সাধ জাগিল তাই দুই ভাগ হইলেন। আধা কনকবরণী রাধা, আধা নবজলধর ত্রিভঙ্গ বাঁকা। শ্রীশ্রীপ্রভু তাই বলিয়াছেন—"রাধা-কৃষ্ণ সহোদর-সহোদরা।"

কেবল সহোদর নহে, যমজ। একটি অখণ্ড রস দুই ভাগ হইয়াছেন। তবু রাধা জ্যেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তি, হিন্দোলায় দোল দিয়াছে, তাই না রস-সিন্ধু দুলিতে দুলিতে দুইভাগ হইয়াছে। আপনাকে আপনি ভালবাসিবেন তাই এক দুই হইয়াছেন। সকল মানুষ আপনাকে আপনি ভালবাসে—বড় ভালবাসে, সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। আপনার কাছে আপনার কিছু গোপন নাই। কিন্তু মানুষ তো আর দুই ভাগ হ'তে পারে না, তাই পাত্রান্তর খুঁজিয়া সে ভালবাসা অর্পণ করে। শ্রীকৃষ্ণ চতুর-চূড়ামণি, তাই তিনি বড় চাতুরী খেলিয়াছেন। ভালবাসার বৃত্তিকে আর ভালবাসার পাত্রকে দুই ভাগ করিয়াছেন। ঐ বৃত্তির নাম মহাভাব, আর মূর্তির নাম রসরাজ। এখন আনন্দময় গোলোক ধামে দোঁহে দোঁহা আস্বাদনে বিভোর, ইহা গোলোকের বসাস্বাদন।

বহু কাল ধরিয়া এই রসাস্বাদন করিতে করিতে রসময় বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক রকম কত দিন ভাল লাগে। তাই তিনি ভাবিছেন এবার রসনির্যাস আস্বাদন করিব। মানুষ আমরা, আমরা কী করি? মনোমুগ্ধকর গোলাপ ফুলগুলি নিত্য দেখি, নিত্য গন্ধ লই, শেষে একদিন সাধ হয় নির্যাস তুলিয়া লইব, অগণিত ফুল পিষিয়া তুলিয়া লই তার সারটুকু। শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রও আজ ইচ্ছা করিয়াছেন রসের নির্যাস আস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—শ্রীরাধা আমার, আমি শ্রীরাধার, প্রাণ ভরিয়া উভয়ে উভয়কে ভালবাসি। যখন চাই তখনই পাই। এই পাওয়ার যেন তেমন সুখ নাই, রাধা যদি আমার সুলভ না হয়, কোথায় রাধা, কোথায় রাধা বলিয়া খুঁজিয়া বেড়াই আর বাধা কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া কাটায় তবে না জানি কী সুখ হয়। আমি যদি প্রিয়ার তরে কদম্বের শাখায় লুকাইয়া থাকি আর প্রিয়া যদি জল আনিবার ছল করিয়া ঘাটে আসিয়া যমুনার কোলে আমার ছায়া দেখিয়া ধরিব বলিয়া জলে ঝাপাইয়া পড়ে তবে না জানি কী আনন্দ হয়। প্রিয়া যদি পরের ঘরে বন্দী থাকে আর আমি যদি বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া তাহাকে ডাকি, আর সকলের চোখের আড়াল দিয়া প্রিয়া যদি ছুটে আসে উন্মাদিনীর মত ধীর সমীরে যমুনা তীরে তবে না জানি কী আনন্দ হয়! মধুর চাঁদনী রাতে প্রিয়া যদি বাসর জাগাইয়া বসিয়া থাকে, আমি যাব বলিয়া, আর আমি যাই নাই বলে সে যদি অভিমানে ফুলিয়া থাকে চাঁদপানা মুখখানা মলিন করিয়া তখন আমি যদি মাথা লুটাইয়া দেই ঐ চরণতলে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' গাহিয়া তবে না জানি কী আনন্দ হয়।

ইহারই নাম রসনির্যাস। আমার বস্তুকে আমি আমার বুকে তুলিয়া ভালবাসি, ইহা গোলোকের স্বকীয় রসাস্বাদন। আমার বস্তুকে আমি আমার না করিয়া দূরে রাখিয়া পরের করিয়া রাখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য ছুটি—ইহা রসনির্যাসাস্বাদন। কোথায় গিয়া এই রসনির্যাস তুলিব ভাবিতে ভাবিতে ভাবময় মহাভাবময়ীকে পরের করিয়া পরকীয়া রস আস্বাদনের জন্য বৃন্দাবনে আসিলেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বই আর কাহার হইবে? কেবল শ্রীরাধা কেন বিশ্বের যা কিছু সবই

তো শ্রীকৃষ্ণের। শিশুরা যেমন লুকোচুরি খেলা করে—একজন ঝোপের আড়ালে লুকায় আর সবাই তাহাকে খোঁজে—এই খোঁজা-খুঁজিতে একটা বিপুল আনন্দ আছে। প্রাপ্তিতে যে আনন্দ, অন্বেষণে তার সহস্রগুণ। যে প্রিয়বস্তুকে খুঁজিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া উন্মাদ হইয়াছে সে-ই জানে। যখন প্রিয়কে পাই তখন কেবল একদেশে তাহাকে দেখি; যখন প্রিয়কে হারাই তখন সর্বদিকে সর্বদেশে তাহাকে দর্শন করি। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহাতেই প্রিয়র ভুবনমোহন মূর্তিখানি স্ফূর্তি পায়! তাই লীলা-রসরাজ ইচ্ছা করিয়াই প্রণয়িনীকে পরের করিয়া ব্রজমণ্ডলে উদয় করাইলেন। গোলোকে ছিলেন রসের সাগর, আজ ব্রজ আসিয়া হইলেন রসের নাগর। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—নাগরবর। পরকীয়া হেতুক রস দুষ্ট করে নাই বরং সম্যক্ পরিপুষ্টি হইয়াছে। রসনির্যাসে পরিণত হইয়াছে তাই বলিয়াছেন রসগরগর।

পরকীয়া রসে গরগর তনু নাগরবর নব নটরাজ রাই-কমলিনীর অঙ্কে আপনাকে ষোল আনা ঢালিয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধা হইয়া যাইতেছেন—তাই।

"অলস-মুদিত অরুণ আঁখি।
মিলিত দু'তনু শপথ রাখি।।"

এই 'অলস' আর 'শপথ' পদদ্বয়ের মাধুর্য ক্রমে আস্বাদন করিবার আশায় রহিলাম।

* * *

"অলস মুদিত অরুণ আঁখি।
মিলিত দু'তনু শপথ রাখি।।"

অলস— লস্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা। 'অ'-কার পদটি এই প্রাকৃত জগতে অভাববাচী। প্রাকৃত জগতে বলিলাম কেননা প্রাকৃত জগতে অভাবের স্থান আছে। যে-দেশ অপ্রাকৃত—সেখানে অভাব বলিয়া বস্তুর সত্তা নাই। সে-দেশে অকার পরিপূর্ণতা-জ্ঞাপক। শ্রুতি বলেন—তিনি অপাণি-পাদ। তাঁহার কর-চরণ নাই। এই নাই পদের অর্থ কী? আমাদের সকলের যে-রূপ কর আছে—তাঁহার সে-রূপ নাই। আমরা ব্যষ্টি জীবন। তাই আমাদের করের শক্তি সীমাবিশিষ্ট। তাহা তাঁহার নাই। তাঁহার সমষ্টিকর অসীম শক্তিস্বরূপ। অতএব অপাণির 'অ'-কার সমষ্টি ও অসীমবাচী। অলসের 'অ'-কারও ঐরূপ তাৎপর্য বিশিষ্ট। তাহা কীরূপ তাহাই আস্বাদন করিব।

একটি বিশাল সমুদ্র, মনে করুন প্রশান্ত মহাসাগর। উপরে দৃষ্টিপাত করুন। অগণিত কল্লোল একটির পর আর একটি মাথা তুলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত ছুটিয়া চলিয়াছে। তদুপরি প্রবল বাত্যা হইলে তো আর কথাই নাই। তরঙ্গরাজি ফুলিয়া উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিতে চায়। ইহা সমুদ্রের লাস্য বা ক্রীড়া। আমরা বলিতে পারি সমুদ্র লসিত বা ক্রীড়া-পরায়ণ। তীরে দ্রষ্টা আপনি যাবৎ দেখিবেন তাবৎ এই ক্রীড়ার বিরাম নাই। এখন এই সমুদ্রের আলস্য দেখিবেন

তো নীচে ডুবিতে হইবে। ডুবিয়া একেবারে গভীরতম প্রদেশেও চলিয়া গেলে চলিবে না। কারণ অতি নিম্নে পূর্ণ শান্ত, সেখানে লাস্যও নাই, আলস্যও নাই। আপনি মাঝামাঝি তলে থাকুন। যাহার নীচে তরঙ্গ নাই, আর উপর হইতে সকল তরঙ্গের আরম্ভ, সমুদ্রের এই মধ্যবর্তী বিশাল তলদেশকে লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিব সমুদ্র অলস। দৃষ্টান্তটি প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শাইয়া অলস তত্ত্বটি আরো ভাল করিয়া বুঝা যাক। নিত্য ধামে একা শ্রীকৃষ্ণ, সখা-সখী কেহই নাই। লাস্যও নাই, আলস্যও নাই। এ দু'য়ের বাহিরে যদি কিছু থাকে তাহাই আছে, কিন্তু তাহা কেবল তিনিই জানেন। কারণ আর কেহ যে-দিন তৈরী হইবে সেইদিনই লাস্য আরম্ভ হইবে। এই নিত্যধাম সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ তলদেশ। লীলাবৃন্দাবন বিলাসময়, ইহা সমুদ্রের উপরিভাগ। সর্বত্র প্রেমের অফুরন্ত তরঙ্গ। কোথাও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোচারণ মাঠে সুবলের গলা ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া বন-শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন। কোথাও যশোমতীর কোল ভরিয়া হাস্যবদন নীলরতন ক্ষীর-নবনী ছড়াইতেছেন, কোথাও ধীর সমীরে যমুনাতীরে পঞ্চম রাগিণীতে বাঁশরীর তান তুলিয়া কালিন্দীর গতি উজানমুখী করিয়া দিয়াছেন। কোথাও বিনোদিনীকে পার করিবেন বলিয়া রাজঘাটে নাবিক হইয়া বসিয়া আছেন। কোথাও বা রাইকিশোরীর কৃপাকটাক্ষ পাইবার আশে যোগিনী সাজিয়া কুঞ্জদ্বারে ভিখারিণী হইয়াছেন। অধিক কী বলিব, কাম্য বন হইতে মানস সরোবর ধাম বৃন্দাবনে যেখানে যাই—যেখানে তাকাই সেখানেই প্রেমরসরাজ অকৈতব প্রেমের তরঙ্গে দোল খেলাইতেছেন। এই তরঙ্গ ও নিস্তরঙ্গের মাঝামাঝি নিত্য ও লীলার সঙ্গমস্থলে আলস্য। সেখান হইতে আর একটু ডুবিলেই এক হইয়া নিত্যে চলিয়া যাইবে। আর একটু ভাসিলেই বহু হইয়া কুঞ্জকানন মুখর করিয়া তুলিবে। এখন জাগিয়াও নাই ঘুমাইয়াও নাই। আর একটু ঘুমাইলে আর দু'টি পাইব না, দুঁহু তনু এক হইয়া যাইবে। আর একটু জাগিলে আর দু'টি পাইব না। দু'টি হইতে কত-শত রঙ্গের পুতুল বাহির হইবে। ইহাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের অলস। শ্যাম-সখা বিনোদিনীর বুকে বুক রাখিয়া একেবারে সকল বিলাস-রস সম্ভোগ করেন। চতুর মধুকর যেমন একটি রন্ধ্রপথে কুসুমের বুকভরা সবটুকু মধু চুষিয়া লয়, অলস শয়নে কালিয়া ভ্রমরাও তদ্রূপ মহাভাবময়ীর প্রেমে গড়া হৃদয়জোড়া অনন্ত ভাবরাশি একটি চুম্বনের সাথে আস্বাদন করেন। বৃন্দাবনের মধুর মাধুরী মাখানো নিভৃত নিকুঞ্জের বিলাসকক্ষই এই রস আস্বাদনের একমাত্র ক্ষেত্র। ঐ যে চতুর ভক্ত চুপি চুপি গাহিতেছেন—

বৃন্দামাধুরীর বিলাস কক্ষে,
কিশোর কৃষ্ণ কিশোরী বক্ষে,
মধুর চুম্বন রসে ভোর।

ইহারই নাম অলস। ইহা বিলাসের অভাব নহে—অনন্তলীলা বিলাসের পরিপূর্ণ রূপ। তাই বলিয়াছি অলসের 'অ'-কার অভাব-জ্ঞাপক নহে। (ক্রমশঃ) ❑

শ্রীশ্রীযুগলকিশোর মাধুরী

"তত্ত্বপঞ্চক"

১। বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধা ভক্তি, কৃষ্ণরস,

গোপীভাব, যুগল প্রেম— ইহার উপরে আর কিছুই নাই।

শ্রীমহানাম মাধুরীধারা (ভাষ্য)

বৈষ্ণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে যিনি বিষ্ণুর অপত্য বা যিনি বিষ্ণুকে জানেন। এই বিষ্ণু কে ও এই জানাই বা কীরূপ, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া তত্ত্বপঞ্চকের রস নিষ্কর্ষণের প্রয়াস পাইব। ঋক্ বেদ অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি কেহ রচনা করেন নাই। ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। ইহাই হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এই ঋগ্‌বেদের প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তমবর্গে আমরা প্রথমতঃ বিষ্ণু শব্দের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে বিষ্ণু সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্রই আছে। এইখানে তন্মধ্যে একটি মাত্র মন্ত্র (পঞ্চম সূক্তের ২০শ মন্ত্র) উদ্ধৃত করিয়া আচার্য মতানুসারে অনুবাদ করিতেছি। ইহা হইতেই বৈদিক যুগে বিষ্ণু সম্বন্ধে কীরূপ অনুভূতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।।"

এই মন্ত্রটি আজও প্রত্যেক নৈষ্ঠিক হিন্দু দেবকার্যের পূর্বে পাঠ করিয়া আত্মশোধন করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর যে পরম উৎকৃষ্ট পদ তাহা সুর বা বিদ্বান্‌গণ শাস্ত্ররূপ দৃষ্টি দ্বারা সর্বদা দেখিতে পারেন। অতএব অন্যান্য সাধারণ লোক দেখিতে পারেন না। যেরূপ মুক্ত আকাশে কোন বস্তু থাকিলে, দেখিতে কোথাও দৃষ্টি প্রহত না হওয়ায়, তাহা দেখিতে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় না, তদ্রূপ পরম জ্ঞানই যাঁহাদের চক্ষু তাঁহারা অতি বিশদরূপে সেই পরম পদ দর্শন করিতে পারেন। বিষ্ণুকে কখনও উরুক্রম বলা হইয়াছে। তিনি তিন পাদক্ষেপে সমগ্র ভূমণ্ডল আবৃত করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ধর্মকে ধারণ করিয়া রাখেন (অতো ধর্মাণি ধারয়ন্)। বেদ হইতে আমরা আরও যাহা পাই তাহাতে বুঝি যে, বিষ্ণু-পদবাচ্য একটি পরম পুরুষের কিঞ্চিৎ সন্ধান ঋষিরা পাইয়াছিলেন, তবে তখন বৈষ্ণব বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি তো হয়ই নাই ; ঐ শব্দেরও কোন বিদ্যমানতা তখন ছিল কিনা সন্দেহ। তারপর পৌরাণিক যুগে আমরা বিষ্ণুকে বহু রূপে বহু স্থলে দেখিতে পাই। তিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী ও সত্ত্বগুণময়, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় — জগতের এই মহা কর্মত্রয়ের মধ্যে তিনি স্থিতি-পালনের কর্তা। পুরাণে বিষ্ণুর কর্ম বহুতর। এস্থলে তাহাও আমার আলোচ্য বিষয় নহে ; কেননা, পৌরাণিক যুগেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া কোন উপাসক সম্প্রদায় ছিলেন কিনা তাহা বিশেষ বিচারসহ। অর্থাৎ 'বিষ্ণুই

* *'আঙ্গিনা' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৩য় সংখ্যা এবং ৪র্থ সংখ্যা (১৩৩৮)।*

উপাস্য, তাঁহাকেই আরাধনা করিতে হইবে' এইরূপ জ্ঞানে কোন কোন লোক বিষ্ণু আরাধনা করিলেও কোনও দার্শনিক ভিত্তি অবলম্বনে কোন উপাসক সঙ্ঘ তৎকালে সংগঠিত হয় নাই, যাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দর্শনের যুক্তি ও মীমাংসার উপর না দাঁড়াইলে কোনও নির্দিষ্ট উপাসনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনও ধর্মসঙ্ঘ স্থির ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অনুমান খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম শ্রীরামানুজ আচার্যই ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করিয়া বিষ্ণুভজনের প্রবর্তন করেন। রামানুজের মতাবলম্বী সম্প্রদায়কে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা হয়। রামানুজ বলেন শ্রীবিষ্ণু অশেষ কল্যাণগুণাকর। তিনি সৃষ্টিকর্তা, কর্মফলদাতা, নিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী তিনি সকলের অধীশ্বর বিভু ও পুরুষোত্তম। এই বিষ্ণু পঞ্চ প্রকারে লীলা করেন; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চাবতার। তিনি স্বয়ং পর বা পরতত্ত্ব। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ। বাসুদেব ষড়্গুণ পরিপূর্ণ, সঙ্কর্ষণ জ্ঞান ও বলযুত। প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য ও বীর্যবান্, অনিরুদ্ধ শক্তি ও তেজোযুক্ত। তত্তৎজাতীয় রূপাবির্ভাবের নাম বিভব — মৎস্য-কূর্মাদি দশটি এই বিভব। অন্তর্যামী রূপে তিনি সর্ব হৃদয়ে অবস্থিত। অর্চাবতার রূপে তিনি উপাসকের গৃহে গৃহে পূজিত। এই অর্চাবতার বা বিগ্রহতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব একই বস্তু। এই বিষ্ণুই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নির্গুণ, কিন্তু শ্রীরামানুজের বিষ্ণু সবিশেষ ও সগুণ ; তিনি উপাসনাগম্য, ভক্তিপূত-চিত্তে আরাধনা করিলে বিষ্ণু-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। জীবের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্বন্ধ এই যে, জীব বিষ্ণুর শরীর স্বরূপ, জীব ও বিষ্ণু উভয়ই চেতন। বিষ্ণু বিভু, জীব অণু। বিষ্ণু পূর্ণ, জীব খণ্ডিত। বিষ্ণু ঈশ্বর, জীব দাস। অথচ জীব স্বয়ং প্রকাশ, নিত্য চেতন ও আত্মস্বরূপ। অতএব জীব ও বিষ্ণুতে স্বজাতীয়-বিজাতীয় পার্থক্য নাই কিন্তু স্বগত প্রভেদ আছে, এই জন্যই রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে।

এই জগৎ ব্রহ্মের শরীর ; বিষ্ণু জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। সূক্ষ্মরূপে তিনি কারণ, স্থূলরূপে তিনি জগৎ। জগৎ সৎ, মিথ্যা নহে। শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বই মুক্তি। বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি দেবীসমেত বিষ্ণুর সেবাই পরমপুরুষার্থ। ভক্তিই এই পুরুষার্থ লাভের উপায় ; জ্ঞান নহে।

অতঃপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব হয়। ইনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ইহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মবৈষ্ণব সম্প্রদায়। মধ্বাচার্যের মতে অশেষ সদ্‌গুণ সম্পন্ন বিষ্ণুই উপাস্য। জীব ও বিষ্ণু অত্যন্ত ভিন্ন। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ-পতি—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। ইনি সবিশেষ, তবে দেশকাল দ্বারা পরিছিন্ন নহে, — তিনি অসীম অনন্ত সুতরাং তাঁহার গুণের অবধি পাওয়া যায় না, এই অর্থে নির্গুণ। বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তিই মুক্তি। বিষ্ণুর নামাঙ্কন, নাম-করণ ও ভজন করিলে তিনি প্রীত হন। তাঁহার অনুগ্রহে সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তিও লাভ হয় ; মুক্তিই পুরুষার্থের মধ্যে সর্বোত্তম। রামানুজ ও মধ্বাচার্যের মতের মূল পার্থক্য এই যে, রামানুজ বলেন যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ, আর মধ্ব মতে জীব পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কেননা তিনি জীবের সেব্য। যে যাহার সেব্য সে তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। রাজা ভৃত্য হইতে ভিন্ন, পুরুষার্থ প্রার্থনা করিতে গিয়া কেহ রাজত্ব যাচ্ঞা করিলে তিনি অনর্ঘ্যভাজন হইয়া

থাকেন। "ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতি বাদিনম্।"

মধ্ব মতেও জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু ইহা অস্বতন্ত্র। রামানুজের মতে যিনি মুখ্যরূপে ব্রহ্ম, তিনি স্থূলরূপে জগৎ। কিন্তু মধ্বাচার্যের মতে জগতের সহিত বিষ্ণুর অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি নিয়ামক মাত্র। ভক্তিই মুক্তির উপায়, এ সম্বন্ধে মধ্ব ও রামানুজের একই মত, তবে উপাসনা-প্রণালীর ভেদ আছে। আচার্যদ্বয়ের এই ভক্তি একপ্রকার জ্ঞান বিশেষ; ইহা জ্ঞানের সার বা ফল, কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় ও ভক্তি দ্বারা জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়। রামানুজ ও মধ্ব উভয়েই শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা স্বীকার করেন।

অতঃপর নিম্বার্কাচার্য—'সনক সম্প্রদায়' প্রবর্তন করেন। ইনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইঁহার বেদান্তভাষ্যের নাম 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'। ইঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন ও অভিন্ন। জীব ও জগৎ উভয়েই ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি জগতের অতীত ; অতীত বলিয়াই ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক্, আবার জগৎ ব্রহ্মে অবস্থিত এই বলিয়া ব্রহ্ম ও জগৎ অপৃথক্। নিম্বার্ক মতে অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিমান্ সর্ব ভিন্নাভিন্ন বিশ্বাত্মা রমাকান্ত বাসুদেবই ব্রহ্ম ; তিনি উপাস্য। এই মতে রমা ও রমাপতি বাসুদেবেরই নামান্তর 'রাধাকৃষ্ণ'। তিনি আরাধনার বস্তু। ভগবান্ বাসুদেবের দর্শনলাভ ও কৃপালাভ ইহাই চরম পুরুষার্থ — কারণ ইহা হইতেই সর্ব দুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারার্থ-দর্শিনী' ব্যাখ্যাই ইহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা। নিম্বার্ক মতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। আপনাকে ও সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনাই নিম্বার্কাচার্যের ভক্তির প্রধান অঙ্গ। এই মতবাদ ভেদাভেদ মতবাদ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রুদ্র সম্প্রদায় নামে আর একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী ইহার প্রবর্তক। অথবা বিশেষভাবে বলিতে গেলে, বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় অধস্তন চতুর্থ শিষ্য শ্রীবল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ের সংস্থাপক। ইঁহারা শুদ্ধ দ্বৈতবাদী, ইঁহাদের মতে বালগোপালই ব্রহ্ম, তৎপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। বল্লভাচার্যের বেদান্তভাষ্যের নাম অণুভাষ্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকার নাম সুবোধিনী। এই মতে ব্রহ্ম-গোপালসাযুজ্যই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মে শক্তি অচিন্ত্য, ও অনন্ত। তিনি সকলই করিতে পারেন। অতএব তাঁহাতে যে বিরুদ্ধ গুণরাশি আছে, তাহা দোষের কারণ না হইয়া পরম অভিনব গুণরূপেই পরিণত হইয়াছে। বল্লভ বলেন, বালগোপাল ক্রীড়ার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। একাকী ক্রীড়া অসম্ভব। তাই তিনি লীলার জন্য জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টির উপাদান তিনি, অথচ অচিন্ত্য শক্তি বলে তিনি নির্বিকার। বল্লভ অবিকৃত পরিণামবাদী, জীব ব্রহ্মের অংশ এবং অণু। বল্লভ ভক্তিপথের সাধক। তবে তাঁহার ভক্তিপথে কিছু অভিনবত্ব আছে। তাঁহার পথের নাম 'পুষ্টিমার্গ'। যেভাবে উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রতি অঙ্গের মিলন হয় তাহাই পুষ্টিমার্গ। এই ভাবে ভক্তের শরীরে সাত্ত্বিকাদি নানাভাবের উদয় হইয়া থাকে। আপনার আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবচ্চরণে বিসর্জন করিয়া তাঁহাকে একান্ত আপনজন মনে করতঃ নিত্যকাল তাঁহার সঙ্গে মিলনানন্দ আস্বাদন করাই পুষ্টিমার্গের সাধনবৈশিষ্ট্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। তিনি পূর্ব-প্রবর্তিত কোনমতই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বকীয় অভিনব মত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রবর্তন করেন। অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বা পরিকরবৃন্দের মধ্যে কেহই বেদান্তের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। বোধ হয় শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য — এই বিশ্বাস হেতুই গৌরভক্তগণ ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তবে গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীসনাতন বৈষ্ণবতোষিণী টীকাতে, শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে গৌড়ীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। অবশেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীরূপ-সনাতনের ও শ্রীজীবের গ্রন্থরাজি ভিত্তি করিয়া গোবিন্দভাষ্য নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদ ও বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গীয় সাধন এই তিনের মিলনেই গৌড়ীয় মতের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য গৌড়ীয় মতের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্ব — ইহাতে লেশ মাত্র সংশয় নাই। অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে মাধ্বগৌড়ীয় নাম প্রদান করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

চারি সম্প্রদায় ছাড়া যে পঞ্চম সম্প্রদায় হইতে পারিবে না একথা কোনও আচার্য বলিয়াছেন কি? মতভেদই যদি সম্প্রদায় ভেদের কারণ হয়, তবে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে পঞ্চম সম্প্রদায় বলাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য একথাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না যে অন্যান্য মতের মধ্যে মধ্বের সঙ্গে গৌড়ীয়ের সাদৃশ্য অধিক। মধ্ব মতে ব্রহ্ম ও জীব চির ভিন্ন, বলদেবের মতে জীব ও ব্রহ্মও ভিন্ন, তবে গুণ ও গুণীভাবে অভিন্ন যেমন, অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ, যেমন সূর্য ও তাহার কিরণ — যেমন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ।

সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য আছে। মধ্ব মতে কেবল সেব্য সেবক ভাবের স্ফূর্তি আছে, গৌড়ীয় মতে দাস্য, ব্যতীত শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের উপাসনাও আছে। বলদেবের মতে তত্ত্ব পাঁচটি —

"ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।"

রামানুজ মতে তত্ত্ব তিনটি — চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন, নিত্যানিত্য-বিবেকবান্ ও শমদমাদি সম্পন্ন সন্ন্যাসী অধিকারী। কিন্তু বলদেব সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন। যিনি মধুপ্রসঙ্গ ভালবাসেন তাঁহারই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার আছে। শঙ্কর বলেন — নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অবাচ্য, শ্রুতি কেবল নেতি নেতি বলিয়া নিষেধ মুখে ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছেন। বলদেবের মতে, ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহেন। "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি. অথবা — বেদ সকল যাঁহাকে ব্যক্ত করে, উপনিষদের এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব প্রমাণিত হয়।

"অশব্দস্তু কার্ৎস্ন্যেনাশব্দিতত্বাৎ দৃষ্টোঽহপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাৎ অদৃষ্টঃ কথ্যতে"— 'শ্রীগোবিন্দভাষ্যম্'।

অর্থাৎ যেমন একটি বৃহৎ পর্বত দৃষ্ট হইলেও একেবারে সর্বাংশ অদর্শন হেতু অদৃষ্টও বলা যায়, তদ্রূপ বেদ সকল সাকুল্যে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার অবাচ্যত্ব হইয়াছে।

দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, বলিলে যেমন তাঁহার কাশীপুরী গমনপূর্বক নিবৃত্তি বুঝায় তদ্রূপ "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" — বাক্য সকল যাহাকে না পাইয়া মনসহ প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই কথা বলিতে তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। মোট কথা, বেদ ব্রহ্মেরই স্বরূপ — অতএব তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশে তাহার স্বপ্রকাশত্বের বিরুদ্ধ হয় না। মধ্বাচার্যের মতে অশেষ কল্যাণ গুণময় নারায়ণই পরম পুরুষোত্তম। আর বলদেবের মতে নিরবদ্য বিশুদ্ধ অনন্তগুণশালী অচিন্ত্য অনন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। ইনি নিখিল শাস্ত্রবেদ্য। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। জীব অণুচৈতন্য হইলেও নিত্য জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট — এবং অস্মৎ শব্দবাচ্য — এ বিষয়ে জীব ব্রহ্মের সমতা ; তবে ব্রহ্ম বিভু — জীব অণু। শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্ত হইলেও ভক্তিব্যঙ্গ।

* * *

"অব্যক্তোপি ভক্তিব্যঙ্গো, এক রস প্রযচ্ছতি চিৎসুখম্ স্বরূপম্।"—শ্রীগোবিন্দভাষ্যম।

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি—সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ—নির্গুণ। নির্গুণ অর্থে প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমোগুণ-বর্জিত। স্বরূপানুবন্ধী অতি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত গুণরাশি তাঁহাতে আছেই। শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভই চরম পুরুষার্থ, জ্ঞান বৈরাগ্য সহকারী। অনুশীলন দ্বারা ভক্তি উৎকর্ষলাভ করে। প্রথমতঃ সাধনভক্তি ইহা সাধনীয়া-বিধিমার্গের সামান্য ভক্তি। এই ভক্তিসাধন দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণে রুচি হয়। এই রুচি হইতে জাত চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে অনির্বচনীয় অবস্থা তাহাকে ভাব বলে। এই ভাব -ভক্তিই—ভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। এই ভাব ঘনীভূত হইয়া যখন সর্বেন্দ্রিয়ের সাধনা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই পর্যবসিত হয়, তখন উহাকে প্রেমভক্তি কহে। এই মতাবলম্বী ভক্তগণকেই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব কহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মাধ্ব সম্প্রদায় তত্ত্ববাদী সন্ন্যাসীর সাধ্য-সাধনতত্ত্ব লইয়া তর্ক-বিতর্ক হয়। সেই আলোচনাতে গৌড়ীয় মতের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা—

"'তত্ত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন।।
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাই আমাতে।।
আচার্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন।।

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ।।
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা-ফলের পরম সাধন।।
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে—
"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"
"শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থ সীমা।।
কর্ম-ত্যাগ কর্ম-নিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি কভু নহে।।
তথাহি—
"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।।"
"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি দেখে মুক্তি নরকের সম।।"
তথাহি—
"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈ-ত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।"
কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন।।
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্যসাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন।।
শুনি তত্ত্বাচার্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত।।
আচার্য কহে, তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।।
তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ।

সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ।।
প্রভু কহে—কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন।।
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়।।'"

'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ।।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা শ্রীগৌড়ীয় মতে যাহা প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য তাহা বেশ সহজেই বুঝিয়া লইতে পারি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জীবের চরম পুরুষার্থ। শ্রবণ-কীর্তনাদি প্রাপ্তির উপায়ভূতা পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের নিকট নরক-সদৃশ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় বিঘ্ন ঘটে।

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম।
তিঁহ এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মতবাদের নাম "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তিবলে জীব কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জীব কৃষ্ণের দাস অথচ তটস্থ শক্তি। 'দাস'-হেতু চিরভিন্ন। আবাব শক্তি বলিয়া শক্তিমানের সঙ্গে অভেদ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালা চয়।"

সূর্যের কিরণের ক্ষুদ্রাংশ সকল তেজোরূপ সূর্য হইতে অভিন্ন কিন্তু ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সূর্যের সমীপবর্তিতা লাভ করিতে অসামর্থ্য বিধায় সূর্য হইতে ভিন্ন। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল তেজোরূপে অগ্নি হইতে অভেদ বিশিষ্ট। কিন্তু অগ্নি হইতে পৃথক্ত্ব লাভ করতঃ অন্ধকার মধ্যে পতিত হয় এবং পুনরায় অগ্নিকুণ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শক্তিহীন হয় বলিয়া ভেদবিশিষ্ট। তেজোস্বরূপ সূর্যেতে বা রাশিকৃত অগ্নিতে এতাদৃশ কোন শক্তি আছে যাহাতে অন্ধকার তাহাদের সমীপে যাইতে পারে না। কিরণাণু বা স্ফুলিঙ্গে তাদৃশ শক্তি নাই সুতরাং অন্ধকার তাহাদিগকে আবরণ করে। সেইরূপ জীবসকল সচ্চিদানন্দাংশে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাবঞ্চিত, অনাদি বহির্মুখীনতা হেতু কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না—এই কারণে ভিন্ন। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, আচার্য রামানুজের বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদ আচার্য মধ্বের দ্বৈতবাদ, আচার্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, সর্বমতের সমাধান সকল আচার্য-শিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে। আচার্য বল্লভের পুষ্টিমার্গের পূর্ণ পরিণতি

মহাপ্রভুর রাগানুগাভজনে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ধর্ম বর্তমানে নানা প্রকার আউল, বাউল, কিশোরী-ভজন, কর্তাভজন, নাগর ভজন প্রভৃতি উপধর্ম সমাচ্ছন্ন ও নির্মল গৌড়ীয় ভজন নানাপ্রকার ছিদ্র-সমাকুল ও দোষযুক্ত সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জগদ্বন্ধুসুন্দর আবার ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া সেই সুনির্মল গৌড়ীয় ধর্ম পুনরায়—সর্বকুসংস্কার ও মালিন্য বিদূরিত করতঃ অভিনব ভাবে প্রবর্তন করিবার মানসে শ্রীশ্রীকর-কিশলয়ে লেখনী ধারণ করতঃ অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে 'শ্রীশ্রীযুগলকিশোরমাধুরী' লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমি জীবাধম শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীষ শিরে লইয়া উক্ত যুগলকিশোরমাধুরীর ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমহানামমাধুরীধারা প্রণয়নে ইচ্ছুক, তাই নতজানু হইয়া করপুটে সর্ব বান্ধবচরণে কৃপাশক্তি ভিক্ষা করিতেছি।

সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু—'বৈষ্ণবে রুচি'—পদটি প্রয়োগ করিতেছেন। 'বৈষ্ণব' পদদ্বারা শ্রীশ্রীপ্রভু উপরোক্ত শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দরের মতাবলম্বী ভক্তগণের কথা বলিতেছেন। কারণ তৎপরেই 'শুদ্ধাভক্তি'র কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র বা সনক কোন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের কথা বলেন নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ—শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোথাও শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই তাহা ক্রমে আলোচনা করিব। অতএব শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুবর্তী যে পঞ্চম সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, তাঁহাদিগের প্রতি যে রুচি বা একান্ত অনুরাগ—তাহাই প্রেমরাজ্যে পৌঁছিবার প্রথম সোপান। তথা শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখবাক্য—

> "প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম সংকীর্তন।
> দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ।।"
> "কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
> সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে।।"
> "যাহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
> তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।।"
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।. মধ্য, ১৬শ পরিঃ

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি ভক্ত-ভাব গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা শিক্ষা দিতেছেন।

> "দরশন পরশন শ্রবণ কীর্তন।
> সাধুগুরু বৈষ্ণবের বন্দিও চরণ।।
> (সদা মতি যে রেখ গো) (সাধুগুরু বৈষ্ণব পদে)
> (ও সে ঠাকুর বৈষ্ণব পদে) (দূর কর মোহমদে)
> (সদা ঠিক থেকে পদে পদে)"

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-কণিকা আর করপুটে পান।
করঙ্গ কৌপীন ডোর বাহু উপাধান।।
(বড় আশায় আছে গো) (বিরক্ত বৈষ্ণব হব)"
"সদা রজঃ-স্নাত তনু তরুতলে বাস।
বড় সাধে বুক বাঁধে জগদ্বন্ধু দাস।।
(মোয় দয়া কর হে) (গুরু গৌর বৈষ্ণবগণ)
(এই বিনে গতি নাই) (বন্ধুর অন্য গতি নাই)
(পাদপদ্মে দেও ঠাঁই)"

সাধু-গুরু ও বৈষ্ণবচরণে রুচি জন্মিলে তাঁহার কৃপানুগ্রহে 'শুদ্ধা ভক্তি' লাভ হয়। এই শুদ্ধা ভক্তি পদ দ্বারা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বা প্রেমভক্তির কথা কহিতেছেন। ক্রমে তাহা আস্বাদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শুদ্ধাভক্তি

পরম পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করাই মানবের চরম পুরুষার্থতা। ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এই যে মত ইহারই নাম ভক্তিবাদ। এই মতাবলম্বীগণকে ভাগবত, সাত্বতপন্থী, বৈষ্ণব বা ভক্ত বলা হয়।

ভক্তিবাদ বহু প্রাচীন। কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা বেদে পূজার কথা পাই। ভক্তি ব্যতীত পূজার কোন অর্থ থাকে না। "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ"। ১/১/৭ এই ব্রহ্মসূত্রে 'তন্নিষ্ঠ' পদে সহজেই ভক্তির কথা মনে আসে। বর্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের একটা ধারণা জন্মিয়াছে এই যে, ভক্তির কথা আমাদের বেদ-বেদান্তে নাই—বেদে যাগ-যজ্ঞের কথা আছে আর বেদান্তে অদ্বৈতবাদের কথা আছে। অবশেষে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের সঙ্গে হিন্দুদের মিলন হইবার পরে এই ভক্তিবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্ম হইতে হিন্দুধর্মে প্রবেশলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজী ১৮৭৩ সনে যখন *Indian Antiquary* ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নামক গ্রন্থ বাহির হইল ও জনৈক খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত Dr. Lorinser লিখিলেন "Traces in Bhagabad Gita of Christian writings and ideas" (ভগবদ্‌গীতায় খ্রীষ্টধর্মের ছায়া); সেই সময় হইতে বিলাতী শিক্ষিত মহলে এরূপ একটি ধূয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, তাহারা আমাদের নিজেদের ঘরের জিনিষ খুলিয়া দেখেন না, দেখিলে আর বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বে গীতা রচনা হইয়াছে ও এদেশে ভক্তিবাদের প্রচার ছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) সাহেব তৎপ্রণীত 'পাণিনি' নামক গ্রন্থে পাণিনিকে বুদ্ধবেবের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তাহা হইলে পাণিনিকে অন্ততঃ খ্রীষ্টের ৭০০ বৎসর পূর্ববর্তী বলা যায়। পাণিনির ব্যাকরণে যুধিষ্ঠির, দ্রোণ, কৃষ্ণ, অর্জুন, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, রাম, ভীম, ভীষ্ম, বাসুদেবার্জুন

ও অর্জুনের গাণ্ডীব প্রভৃতি শব্দ সাধিত হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পাণিনির পূর্বে মহাভারত রহিয়াছে। কাজেই মহাভারতের কাল খ্রীষ্টপূর্ব নয়-দশ শত হওয়াই সঙ্গত। জ্যোতিষিক প্রমাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। কাজেই যীশুর ধর্মের ছায়া লইয়া তাব হাজার দুই বৎসর পূর্বে গীতা রচনা হইয়াছে—একথা হইতে ব্যাস মুনির সর্বজ্ঞতা বা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মহাশয়ের অর্বাচীনতাই প্রতিপন্ন হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি কথাপূর্ণ। মহাভারতে পাঞ্চরাত্র মতের কথা উল্লেখ আছে। পাঞ্চরাত্র মত ভক্তিবাদ বই আর কিছু নহে। ব্রহ্মসূত্রও পাণিনির পূর্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ পাণিণির ৪/৩/১০ সূত্রে পারাশর্য ভিক্ষুসূত্রের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সূত্রই পরাশরসুত ব্যস বা বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র। সূত্রে দুই স্থানে আচার্য আশ্মরথ্যের কথা নাম আছে। তিনি বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী বা ভক্তিবাদী। অতএব ভক্তিবাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। কালিদাসের 'গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ' (মেঘদূত) হইতে মনে কেবল ভক্তির কথা উদয় হয় না, একটু প্রেমধর্মেরও যেন ছায়া পতিত হয়।

যাহা হউক, ভক্তিধর্ম সেদিনকার জিনিষ নহে। বহু যুগযুগান্ত ধরিয়া আমাদের দেশীয় ভক্তাচার্যগণ ভক্তিরস আস্বাদন করিতেছেন, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সর্বাগ্রে সেই প্রাচীন ভক্তাচার্যগণের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

'নারদ-ভক্তিসূত্র' একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। সূত্র রচনা শেষ করিয়া নারদ বলিয়াছেন—

"ইত্যেবং বদন্তি জনজল্প-নির্ভয়া একমতং কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিল্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনূমদ্-বিভীষণাদয়ো ভক্তাচার্যাঃ।"

অর্থাৎ সনৎকুমার ব্যাস শুক শাণ্ডিল্য গর্গ বিষ্ণু কৌণ্ডিল্য, শেষ উদ্ধব আরুণি বলি হনুমান বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের আচার্যগণ সকলে একমত হইয়া এই ভক্তিধর্মের কথা বলেন। অবশ্য অন্য বহু লোক তাহা লইয়া নানাকথা আলোচনা করেন, কিন্তু এই আচার্যগণ "জনজল্পনির্ভয়া"—সাধারণ মানুষের বাজে জল্পনা-কল্পনাতে বিচলিত না হইয়া নির্ভীকচিত্তে ভক্তির কথা প্রচার করেন।

এই "জনজল্প" পদ দ্বারা ভক্তির বিরোধী কোন সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সম্বন্ধে নারদ আর কিছুই বলেন নাই। শাণ্ডিল্য বোধ হয় নারদের পূর্ববর্তী। কারণ নারদসূত্রে শাণ্ডিল্যের নাম আছে, শাণ্ডিল্য নারদের নাম করেন নাই। শাণ্ডিল্যের সূত্র সমূহও পরম ভক্তিরসাত্মক। শাণ্ডিল্য ২৫ ও ৩০ সংখ্যক সূত্রে কাশ্যপ ও বাদরায়ণের মত বলিয়াছেন—

"তমৈশ্বর পরাং কাশ্যপং পরত্বাৎ।"
"আত্মৈক্য পরাং বাদরায়ণঃ।"

নারদ হয় তো বা এই কাশ্যপ ও বাদরায়ণের অনুবর্তীগণের মতবাদ লক্ষ্য করিয়া "জনজল্প" কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, শাণ্ডিল্য, ব্রহ্মসূত্রকর্তা বাদরায়ণকে অদ্বৈতবাদীই ধরিয়া লইয়াছেন। কাজেই তখন ভক্তিবাদের প্রচার থাকিলেও ব্রহ্মসূত্রকে

ভিত্তি করিয়া ভক্তির প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর প্রচেষ্টা বোধ হয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রামানুজাচার্যই সর্বপ্রথমে করেন। একথা আমি 'বৈষ্ণবে রুচি' নামক পূর্ব নিবন্ধে বলিয়াছি। এই কথা হইতে কেহ যেন এমন ভ্রমে পতিত না হয়েন যে, রামানুজই প্রথম ভক্তিবাদের প্রচারক। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—রামানুজের গুরুদেব যামুনাচার্যের স্তোত্ররত্ন পাঠ করিলে কার হৃদয় না অনাবিল ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

যামুনাচার্য—

"পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়-সুহৃৎ।
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্।।
তব দাস্য-সুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বপি কীটজন্ম-মে।
ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূৎ অপি মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা।।"

তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই দয়িত, তুমিই পুত্র, তুমিই বন্ধু, তুমিই গুরু, তুমিই জগতের একমাত্র গতি। যে-ব্যক্তি তোমার দাস্যসুখে সুখী তাঁহার বাড়ীতে আমার কীটজন্ম হউক, আর যাহার বুদ্ধি অন্যরূপ তাহার ঘরে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়াও জন্মিতে কামনা করি না।

এই সকল ভক্তিরসাত্মক শ্লোক শুনিলে সহজেই মনে হয় যে, রামানুজের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই ভক্তিধর্মের যাহা মূল কথা তাহা প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। তবে ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করিয়া অদ্বৈতমতকে খণ্ডন করিয়া ভক্তিধর্মের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা রামানুজই সর্বপ্রথমে করিয়াছেন। তৎপূর্বে শ্রীকণ্ঠাচার্য (৫ম শতাব্দী) ভক্তিবাদে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহার ভাষ্য শিবপর। শ্রীকণ্ঠের শিবের স্থানে বিষ্ণুকে বসাইলে রামানুজের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য খুব অল্পই থাকে। রামানুজ নিজে তৎপূর্ববর্তী দ্রমিল, টঙ্ক, গুহদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্যদের নাম করিয়াছেন। সূত্রেই আশ্মরথ্যের নাম আছে, তা পূর্বেই বলিয়াছি।

ভক্তির লক্ষণ কী? শ্রীনারদ বলিয়াছেন, "অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্"। ৮১। ভক্তি প্রেমস্বরূপ। তাহার লক্ষণ অনির্বচনীয়। বাক্য দ্বারা বলা যায় না। আমরা হয় তো এই লক্ষণে সুখী না হইয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তোমরা ভক্তির অধিকারী, অথচ ভক্তির লক্ষণ বলিতে পার না, এ কেমন কথা? নারদ এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—"মূকাস্বাদনবৎ" ।৫২। এ যে মূকের আস্বাদনের মত। রসনায় যে কী রস অনুভূত হইতেছে মুখে তাহার প্রকাশ করিবার মত সামর্থ্য হইতেছে না। ভক্তিরসে মূক হইয়া নারদ তাই কেবল "পরম-প্রেমস্বরূপা" ছাড়া ভক্তির আর কোন লক্ষণ বলেন নাই। শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ।।২।। ঈশ্বরের প্রতি যে চিত্তের ঐকান্তিকী আসক্তি তাহাই ভক্তিপদবাচ্য। বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর যেরূপ অভিনিবেশ, সেইরূপ যদি শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে হয়, তবেই তাহাকে ভক্তি বলেন। পরাশর বলেন, শ্রীকৃষ্ণের পূজায় যে একান্ত অনুরাগ তাহাই ভক্তি—"পূজাদিষু অনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ"। গর্গ বলেন, শ্রীকৃষ্ণকথায় যে অনুরক্তি তাহা ভক্তি, "কথাদিষু ইতি গর্গঃ।" নারদ নিজে কী বলেন? তিনি বলিলেন—

"নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা।
তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।।"

কায়িক বাচিক মানসিক যত প্রকার আচরণ সবই শ্রীহরিচরণে সমর্পণ করিয়াছেন, আর তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেই যাব হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে তিনিই ভক্ত।

ভক্তিগ্রন্থ

নারদপঞ্চরাত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিগ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ভক্তিদেবীর প্রকট প্রতিমূর্তি। ঐ মূর্তির দুইটি দিক্। বাহিরে—দর্শন, অন্তরে রস। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিদর্শন ও ভক্তি বস দুই বিজড়িত হইয়া আছে। পরে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণ এই দুই ভাগকে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করেন। শ্রীরূপ প্রধানতঃ ভক্তিরসের ও শ্রীজীব ভক্তিদর্শনেব কথাই বেশী বলিয়াছেন। বসগ্রন্থেব মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও দর্শনগ্রন্থের মধ্যে ষট্সন্দর্ভ সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভক্তিরস

ভক্তি সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকার্ষণী একাঢ আস্বাদন বিশেষ। যিনি অনন্ত বিশ্ব জগৎকে আকর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ। এই সর্বচিত্তাকর্ষক পুরুষবব নিজে এই ভক্তি দ্বাবা আকৃষ্ট হয়েন বলিয়াই ইহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং শ্রীউদ্ধবকে কহিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।"

হে উদ্ধব, যোগ বল, সাংখ্য বল, আর ধর্ম-কর্ম বল আর বেদাধ্যয়ন দান তপস্যাই বল কেহই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। কেবলমাত্র মদ্বিষয়িনী বিশুদ্ধা ভক্তি আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলে। একটি ঘনীভূত আনন্দ বিশেষ এই রসের আত্মা স্বরূপ। শ্রীপ্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন—

"ত্বৎ-সাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো।।" — হরিভক্তিসুধোদয়।

হে জগদ্গুরো! আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি—এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ সুখও গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে।

এই ভক্তিরস সুদুর্লভা, ইহা লাভ হইলে ভক্তের কী অবস্থা হয় তাহার বর্ণন করতঃ নারদ বলিতেছেন—যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি ।। ৪।। যাহাকে লাভ করিয়া মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃত স্বরূপ হয়, পরিতৃপ্ত হয় তাহাই ভক্তি। যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি, নোৎসাহী ভবতি ।। ৫।। যাহা পাইলে জীব আর কিছু কামনা করে না, আর কিছুর জন্য শোক করে না, কোন কিছুতেই দ্বেষ করে না, আর কিছু লাভের আশায় উৎসাহযুক্ত হয় না তাহাই ভক্তি। "যৎ জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি, শুদ্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।" যাহা জানিলে আত্যন্তিক দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, যাহা পাইলে শুদ্ধ হয়, যাহা পাইয়া

জীব হয় তাহাই ভক্তি। ভক্তি—ভক্তি—ভক্তির উপর আর কোন গুণ নাই।

"গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণম্।
বর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতমমনুভব-রূপম্।।" ৪।। নারদ

ভক্তিরস একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারার মত অবিরত বর্দ্ধনশীল। ভক্তিরস এই স্থূল জগতের বস্তু নহে। সূক্ষ্মতর জগতের কোন এক অনির্বচনীয় পরম বস্তু ভক্তি বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাহাকে আস্বাদন করিতে হয়।

শ্রীরূপের ভক্তিলক্ষণ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ প্রারম্ভে প্রথমতঃ ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া তারপর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। শ্রীরূপের প্রণামটিও বড় মধুময়। তিনি বলিয়াছেন, ভক্তগণ মকর-সদৃশ, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কাব করি। এই মকরগণের তিনটি বৈশিষ্ট্য; প্রথমতঃ ইঁহাদের জালে পড়িবার ভয় নাই। জন্ম মৃত্যু বন্ধন ও দুঃখের সূত্র দ্বারা যে সংসার-জাল নির্মিত হইয়াছে, এই মকরগণ কখনও সেই জালে পড়েন না। দ্বিতীয়, তাঁহারা ক্ষুদ্র নদীতে বাস করেন না, সালোক্যাদি ষড়্‌বিধ মুক্তিরূপ যে নদীসকল তাহাতে তাঁহারা বিচরণ করেন না। তবে সর্ব নদীসমূহের যাহা আশ্রয় সেই ভক্তিরসের যে অমৃত-সিন্ধু তাহাতেই তাঁহারা চির নিমজ্জিত। শ্রীরূপকৃত ভক্তিরসের লক্ষণ এই—

"অন্যাভিলাযিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"
"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।"

শ্রীচরিতামৃত, মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ।

এই লক্ষণ শ্লোকটির দুই ভাগ। প্রথমার্ধে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ, দ্বিতীয়ার্ধে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

"কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি"।

ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। অনুশীলনের দুইটি রূপ। ভাবরূপ আর চেষ্টারূপ। একটি কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ, অপর প্রীতি-বিষয়াত্মক ভাবরূপ। শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা, বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও লীলাকীর্তন, আর মন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রূপমাধুরী পরিচিন্তন। ইহারা চেষ্টারূপ।

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীহরির সেবনই ভক্তি।

এই চেষ্টারূপা ভক্তি নববিধা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এতন্মধ্যে কেহ বা এক অঙ্গ সাধন করেন, কেহ বা অনেকাঙ্গ সাধন করেন।

শ্রবণ—শ্রীহরির নাম শ্রবণ, গুণ শ্রবণ ও চরিত শ্রবণ। ভক্তগণ বলেন, সংসাররূপ কালসর্পের দংশনে জর্জর-চিত্ত ব্যক্তির কেবল একটিমাত্র মহৌষধ আছে, তাহা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ

এই মধুময় নাম শ্রবণ। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন **"কৃষ্ণ নামে ব্যাধি বিনাশ হয়।"** মানুষের মহাব্যাধি পাঁচটি—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক আর মোহ। এই মহাব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কী? যে-স্থানে ভক্তগণের বদনচন্দ্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরিতরূপ অমৃত নদী সর্বতোভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইখানে অবস্থিতি পূর্বক বাসনা-শূন্য চিত্তে কর্ণাঞ্জলি দ্বারা তাহা পান করা। পরীক্ষিৎ মহারাজ সপ্ত দিবস প্রয়োপবেশন করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন।

স্মরণ—স্মরণ বলিতে প্রধানতঃ ধ্যানই বুঝায়। রূপ-ধ্যান, গুণ-ধ্যান, ক্রীড়া-ধ্যান ও সেবা-ধ্যান এই চারিপ্রকার ধ্যান হয়। সর্ব মাধুর্যের সার সর্বাশ্চর্যময় ও পরম মনোহব শ্রীহবির রূপরাশি চিন্তা করিলে হৃদয় নির্মল হয়, তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশি ভাবনা করিলে পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়; পরিকরগণসহ তাঁহার ক্রীড়া-কৌতুক স্মরণ করিতে করিতে জীব তাঁহার আপনজন হইয়া যায়। মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা আনন্দচিত্তে শ্রীহরির সেবা-ধ্যান করিলে ক্রমে তাঁহাব সাক্ষাৎকার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

ভক্তকুল-মুকুটমণি প্রহ্লাদ এই স্মরণাঙ্গেব সাধক ছিলেন। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণই তাঁহার জীবনের জীবন ছিল।

পাদসেবন— শ্রীলক্ষ্মী দেবী ঐ রাঙ্গাচরণ দু'খানি বুকে ধরিয়া দিবা নিশি তৎ প্রীতিসম্পাদনেই বিনিযুক্তা থাকেন। পৃথু রাজা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা ভিন্ন অন্য কার্য জানিতেন না। মুনিবব অক্রূর সতত শ্রীহরির চরণ বন্দনেই জীবনের সার্থকতা অনুভব করিতেন।

দাস্য—শ্রীহরির চরণে কর্মফল সমর্পণ করাকে কেহ কেহ দাস্য বলেন। বস্তুতপক্ষে সর্বতোভাবে দাসত্বাভিমানের নামই দাস্য। শ্রীমৎ হনুমানজীর জীবনের ব্রত ছিল শ্রীরামের দাস্য।

সখ্য—বিশ্বাস আর মিত্রবৃত্তি এই দুইকে সখ্য বলা হয়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেব ছিল শ্রীকৃষ্ণসখ্য।

আত্মনিবেদন—"হে প্রভো! আমি তোমার হইলাম" বলিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন বলিরাজ। বহু অঙ্গের ভক্ত ছিলেন মহারাজ অম্বরীষ। এই নয় প্রকার অঙ্গেব মধ্যে নামকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ।

"কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।।
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।।
আনুষঙ্গিক ফল নামে মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ।
হরিদাস কহে যৈছে সূর্যের উদয়
উদয় না হইতে আরম্ভে তম হয় ক্ষয়।।
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।"

নাম

চিন্তামণি-স্বরূপ নাম নামীর সঙ্গে অভেদ। তাহা মায়োপহিত জীবের বাগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে "নাম লইব" এইরূপ ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে যেই মাত্র ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়, অমনি পাপরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। রসনা পবিত্র ও নির্মল হয়। তখন 'নাম' কৃপা করিয়া স্বয়ং তাহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু লিখিয়াছেন, "নাম উচ্চারণে ভক্তি হয়", "নাম উদ্ধারণ।" এই নবাঙ্গ যুক্তা ভক্তিই চেষ্টারূপা ভক্তি বা সাধন ভক্তি।

এই গেল ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম ভক্তি বস্তুটি কী? এখন শুদ্ধা ভক্তি বুঝিতে হইবে। কী হইলে ভক্তি শুদ্ধ হয়, কী হইলে অশুদ্ধ হয় বুঝিতে হইলে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ জানিতে হইবে। তাহাই শ্রীরূপ কহিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।"

যে-ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা আবৃত নয় এবং যাহাতে অন্য প্রকার অভিলাষ নাই, তাহাই শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি।

জ্ঞান-কর্ম

এই জ্ঞান কর্ম কী? অন্য অভিলাষই বা কী? শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থে বহু স্থলে ভক্তিপ্রসঙ্গে জ্ঞান-কর্ম পরিহারের কথা ও জ্ঞানী কর্মীর নিন্দার কথা পাওয়া যায়। যথা—

"কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, জগ মাঝে দুই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা।" "কর্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড।" "প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।" "কর্মকাণ্ড পরিহরি, প্রেমে বল হরি হরি।" "কর্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে" ইত্যাদি।

এই সকল উক্তি হইতে অনেকে ধারণা করিয়া লইয়াছেন, ভক্ত হইতে গেলে তাঁহার জ্ঞান-কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তির সন্ধান পাইতে হইলে অজ্ঞান এবং নিষ্কর্মা হইতে হইবে, এরূপ ধারণা যে কীরূপ ভ্রমাত্মক ভাবিলেই বোধগম্য হইবে।

পুরাকাল হইতে এ পর্যন্ত যত ভক্তের কথা পাওয়া যায় তন্মধ্যে কেহই জ্ঞান-বুদ্ধিহীন বা অলস ছিলেন না, বরং শ্রীশুক, ব্যাস, নারদ, ভীষ্ম, বিদুর, অম্বরীষ, রামানুজ, মধ্বাচার্য, শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর ও গোস্বামিগণ সকলেই পরম জ্ঞানের আকর সদৃশ ছিলেন। কেহ কেহ বা ব্রজ-গোপীগণের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না গোপীগণ সাক্ষাৎ শ্রুতিবিদ্যাস্বরূপিণী। বস্তুতঃ যিনি পরম বস্তু তাঁহাকে একমাত্র আপনজন বলিয়া জানা অতি গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর তাই বলিয়াছেন, "অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না।"

তারপর কর্মের কথা, কর্ম ছাড়িয়া তো জীব এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।"

ভক্তির যে নয়টি প্রকার উক্ত হইয়াছে। তাহা তো প্রত্যেকটিই কর্ম। ভক্তকুল-শেখরীভূতা গোপীগণ সর্বদা কৃষ্ণসেবায় তন্ময় থাকিতেন। এ সেবাও তো কর্ম বই আর কিছু নহে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম কদাপি পরিহরণীয় নহে। যে-জ্ঞান-কর্মকে পরিহার করিতে বলা হইয়াছে, সে কোন্ জ্ঞান ও কোন্ কর্ম, ভালরূপ চিনিতে হইবে।

জ্ঞান স্বভাবতঃ প্রকাশ স্বভাব। কর্মও চিত্ত শুদ্ধিকারক। কিন্তু শ্রীরূপ লিখিতেছেন জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা অনাবৃত। কাজেই বুঝিতে পারি একটা আবরণ স্বভাব জ্ঞান-কর্ম আছে, তাহাই পরিহার্য।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।'

যে-জ্ঞান বা কর্ম এই স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, বা ঢাকিয়া রাখে, বা ভুলাইয়া রাখে তাহাই আবরণ স্বভাব। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য—অর্থ—তুমি তাঁর। আমি কৃষ্ণের এই জ্ঞান, সত্য সুন্দর নিত্য বাঞ্ছনীয়। এই জ্ঞানে স্বরূপ-বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। আর এই মহাবাক্যের অর্থ যদি হয় তুমি সেই, আমিই কৃষ্ণ—এই জ্ঞান অসত্য, অসুন্দর ও চিরতরে বর্জনীয়। এই জ্ঞান স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে।

তদ্রূপ আমি যখন আমার প্রভুর সেবার জন্য প্রাণপণ করিয়া দিবস-রজনী কর্মে লিপ্ত থাকি তখন সেই কর্ম সুখের সেতু। সেই কর্ম প্রতি মুহূর্তে আমার স্বরূপকে জাগাইয়া রাখে। আর আমি যখন প্রভু ও প্রভুর সেবা ভুলিয়া আপন স্বর্গভোগ বা ধনৈশ্বর্য মান প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে কর্মে তৎপর হই, তখন সেই কর্ম দুঃখের নিদান, বাহিরের লোকের চোখে তা শুভই হোক আর অশুভই হোক আমার পক্ষে তাহা বিষের ভাণ্ড সদৃশ। যেহেতু তাহা প্রতি মুহূর্তে আমাকে আমার প্রভু হইতে দূরে লইয়া যায়।

ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য জ্ঞান-কর্ম

অতএব কর্ম অর্থে সকাম বা কাম্য কর্ম। আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি মানসে যে-কর্ম তাহা বর্জনীয় ও জ্ঞান অর্থে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ চিন্তন বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তাহাই স্বরূপের আবরণ-স্বরূপ, অতএব বর্জনীয়। ঐরূপ জ্ঞান-কর্মের সংস্পর্শ শূন্য যে ভক্তি তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। আত্মস্বরূপ জ্ঞান, কৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞান, প্রেম-ভক্তি ও অহর্নিশ সেবাকর্মে তন্ময়তা ইহাই ভক্তির মুর্তি। এই জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর **"মহানাম উচ্চারণে জ্ঞান হয়"** বলিয়াছেন ও ঐ কর্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই "ধর্ম-করত কর্ম খর" লিখিয়াছেন। অর্থাৎ কর্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে চাও তো সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল সেবা-কর্ম কর। সর্বপ্রকার সেবার মধ্যে আবার কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাও বলিয়াছেন "কর্ম নাম"।

জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি

আর একটি বিষয় আলোচ্য এই যে, জ্ঞান অর্থ যদি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তবে "জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির" তাৎপর্য কী হইবে? যদি ব্রহ্ম আর জীব অভেদ এইরূপ জ্ঞান হয় তবে তো ভক্তি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় ও বিষয়হীন হইয়া পড়িবে।

পূর্বে বলিয়াছি, ভক্তিপদে ভক্তির স্থান সর্বোপরি। সাধ্য-সাধন তত্ত্বজ্ঞান সহকারী। অদ্বৈত-বাদেও ঠিক তেমনই জ্ঞানের স্থান সর্বোপরি। ভক্তি তৎসহকারিণী। কিন্তু এই ভক্তি আমাদের বৈষ্ণবের ভক্তি নহে। শঙ্করের মতে চিত্তের যে বৃত্তিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতা বোধ জন্মে সেই বৃত্তিই ভক্তি। অদ্বৈতবাদীর ভক্তি আত্মানুসন্ধান। ঈশ্বর ও আত্মার অভিন্নতা বোধ। শঙ্করের মতে ভজ্ ধাতুর অর্থ তদাকারাকারিত হওয়া, চিত্ত ঈশ্বরে তন্ময় হইলে, ব্যাপক হইয়া ঈশ্বরে মিলিয়া যাইবে। ইহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। একত্ববোধ হইলে আর এই ভক্তির স্থান নাই। অর্থাৎ যাবৎ অজ্ঞান তাবৎ এই ভক্তি; জ্ঞান হইলে আর ভক্তির প্রয়োজনীয়তা নাই। এই ভক্তিতে বিরহ নাই, অশ্রু নাই; আছে কেবল মিলন। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, বিরহ না থাকিলে মিলনে সুখ নাই, মিলনের কোন তাৎপর্য নাই, চিরকাল বিরহে থাকিব, কেবল তাঁহাকে খুঁজিব; খুঁজিয়া পাইলেও মিলিব না, দুই চিরকাল দুইই থাকিব। একত্ব কেবল সেখানে যেখানে বুঝিব "তোমার আমি"। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কথা। অতএব তাঁহারা ঐ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি কামনা করেন না।

মধ্বাচার্যের জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি

আচার্য মধ্ব বলেন, নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান হইতে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি যতই গাঢ় হইতে থাকে জ্ঞান ততই পরিশুদ্ধ হয়। ভক্তির ফলেই ভগবান্ লাভ হইয়া থাকে। এই মত হইতে শ্রীগৌড়ীয় মতের একটু বিশিষ্টতা আছে। মধ্বমতে জ্ঞানের ফল ভক্তি, ভক্তির ফল জ্ঞান। ভক্তি প্রগাঢ় হইলে জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গাঙ্গি ভাব সম্বন্ধ। শ্রীগৌড়ীয় মতে জ্ঞান ভক্ত্যঙ্গ নহে। জ্ঞান হইতে ভক্তি জন্মে কিন্তু ভক্তি জন্মিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজনী[illegible] থাকে না। ঠিক শঙ্করের বিপরীত।

জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি

ভক্তগণ বলেন, জ্ঞান চিত্তকে কঠিন করে। ভক্তি বড় সুকুমার স্বভাব। জ্ঞানের সঙ্গে সে তার কমনীয়তা হারাইয়া ফেলে। কদলীবৃক্ষ যেমন ফলদান করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ভক্তির কারণ বটে, কিন্তু ভক্তিলতায় অঙ্কুরোদ্গম হইলেই সে অন্তর্ধান করে। তখন সেই জ্ঞান-শূন্যা ভক্তিই উৎকৃষ্টা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি নামে অভিহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

এই শ্লোকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখিরতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।" ভাঃ ১০/১৪/৩

এই শ্লোকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে।

ভাবভক্তি

এই পর্যন্ত শুদ্ধাভক্তির বাহিরের দিক্ বা চেষ্টারূপা। শুদ্ধা ভক্তির অন্তরের দিকের নাম ভাব-ভক্তি। এই ভাবময়ী ভক্তি যে কী বস্তু তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সুদুঃসাধ্য। শ্রাবণের ধারা সম্পাতে নিদাঘ-সন্তপ্তা ধরণী যেমন আর্দ্র ও স্নিগ্ধ হইয়া শস্যভারে শোভাময়ী হইয়া ওঠে, এই ভাবময়ী ভক্তিলতা অঙ্কুরিতা হইলেও ভক্তের হৃদয় তেমনই এক অপ্রাকৃত রসে পরিসিঞ্চিত হইয়া অনুরাগে নবায়মান হইয়া উঠে। ভক্তের প্রাণ তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তার বুকখানা তখন শ্রীকৃষ্ণানুকূল্য লাভের জন্য কাঁদিয়া ওঠে, তার মর্মস্থল তখন শ্রীকৃষ্ণ-সৌহার্দ্য লালসায় ফোঁপাইয়া ওঠে। এই ত্রিবিধ অভিলাষময় অতি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ যে অনীর্বচনীয় চিত্তবৃত্তি তাহাই ভাবময় ভক্তি।

"শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।"

এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বিশেষ। ইহাকে প্রেম-সূর্যাংশু-সাম্যভাক্ বলা হইয়াছে। সূর্য উদিত হইতেছেন এমন সময় কিরণ যেমন অল্প অল্প প্রকাশ পায় তদ্রূপ প্রেম রবি যেন উদয় হইবে—**"গোপীভাব"** যেন ফুটিয়া বাহির হয় হয়—এই তাহার প্রথমাবস্থাই ভাব-ভক্তি। এই ভাবই উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া প্রেমদশা লাভ করিতে পারে।

বান্ধবগণের আশীর্বাদে শুদ্ধাভক্তিদেবীর প্রসাদে মাদৃশ জীবাধমও যেন ক্রমে ক্রমে গোপীভাব কৃষ্ণরস ও যুগল প্রেমের আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে, কারণ এই সুদুর্লভা ভক্তি যে একমাত্র ভক্তগণের অযাচিত কৃপালভ্যা। ❑

দু'টি গান

মহাগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে আবির্ভূত হইয়া দুইটি গান গাহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান, জীব-জগতের পথের সম্বল।

একটি গান গাহিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে — সর্বজীবের জন্য, সর্বকালের জন্য। সেই গানটির সংক্ষিপ্ত নাম গীতা। আর একটি গান গাহিয়াছেন বৃন্দাবনে। সেটি ওস্তাদী কালোয়াতী গান। ঐ রাজ্যে পারদর্শী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। ঐ গানের মর্ম আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই বলিয়া তিনিই আবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। তিনি তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনজনকে আদেশ করিয়া ঐ ব্রজে গাওয়া গানের মর্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ঐ তিনজনের নাম শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব। এই তিনজনের লিখিত গ্রন্থরাজি ও শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাজীবন অবলম্বনে ঐ বৃন্দাবনে গীত গানটির কিঞ্চিৎ মধুরিমা আস্বাদন করিব — আজি তাহার আবির্ভাবের শুভদিনে। প্রেমের মর্মস্থলের কথাটি হইল শ্রীকৃষ্ণ আমার

এই বোধ। এই বোধকে ভক্তেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি। প্রেমের পথ ছাড়া আর কোন উপায়েই কৃষ্ণে মমত্ব বোধ জাগে না। যদি কোথাও জাগে বুঝিতে হইবে প্রেমের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আমার "একান্ত আপন জন" এই অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত হওয়া জীবের পরমাতিপরম সৌভাগ্য।

শ্রীকৃষ্ণের মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইলে তাহাকে পাইবার জন্য, একান্ত আপন করিয়া পাইবার জন্য একটা তীব্র লালসা জাগে। এই লালসা একটা তৃষ্ণার মত। জল পান করিবার ইচ্ছা জল তৃষ্ণা। জল তৃষ্ণা জাগিলে জলের জন্য উৎকণ্ঠা হয়, তৃষ্ণা তীব্র হইলে উৎকণ্ঠা প্রবল হয়। ক্রমে এমন হয় জল না হইলে বাঁচাই অসম্ভব হয়। কৃষ্ণ পাইবার জন্য যখন এরূপ অবস্থা হয় তখন বুঝিতে হইবে প্রেমের উদয় হইয়াছে। প্রেমের উদয় হইলে তখন অন্তর কৃষ্ণে অধিষ্ঠিতা হয়। চিত্ত কৃষ্ণময় হয়। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই চাহিদা থাকে না। কিছুই ভাল লাগে না। যদি ইহার মধ্যে এক বিন্দু স্বার্থ-বাসনা থাকে তবে তাহা প্রেম পদবাচ্য হয় না। কৃষ্ণকে চাই আমার কোন সুখ-সুবিধা স্বর্গ-মোক্ষের জন্য নহে। তাঁহাকে চাই তাহাকে সেবা করিব বলিয়া। সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব বলিয়া।

প্রেমতৃষ্ণার সহিত জলতৃষ্ণার দৃষ্টান্ত করিয়াছি। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ জলতৃষ্ণা দূর হওয়া যায় জল পান করিলেই। কিন্তু কৃষ্ণতৃষ্ণা কৃষ্ণ পাইলেই দূর হয় না। যত পায় ততই তৃষ্ণা বাড়ে, যতই কৃষ্ণ রূপ গুণ মাধুর্য আস্বাদন করা যায় ততই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের মাধুর্য নিত্য নূতন, তাহাও ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হয়। ভক্ত তাহাতে আস্বাদন করিতে করিতে তাহার আস্বাদন-লালসা বর্দ্ধিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণমাধুর্যও বাড়িতে থাকে। চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে কোটিগুণ।" আবার লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্বানুভাব অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।।"

এই রূপ অনুরাগের নাম রাগাত্মিকা প্রেম। এই প্রেম মানুষে সম্ভবে না। এই রাগাত্মিকা প্রেমের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভাবনা তাহাকে বলে রাগানুগা ভজন। কৃষ্ণের ব্রজের ভক্তদের কথা ভাবনা করিতে করিতে গভীর ধ্যান করিতে করিতে মানুষ উহার কাছাকাছি অবস্থা লাভ করিতে পারে।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্য ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত্য ভক্তি রাগানুগা নামে।।"

ব্রজবাসী শব্দের অর্থ বৃন্দাবনে যারা বাস করেন। এখানে এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে না। বৃন্দাবনে চোর দস্যু থানা-পুলিশও আছে। তাহারা ব্রজবাসী নহে। একটা বৃক্ষে বানর পক্ষী থাকে—তাহারা বৃক্ষবাসী নহে। তাহারা যে-কোন মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারে। বৃক্ষের শাখা-পত্র-পুষ্প-ফল ইহারা বৃক্ষের সত্তার সঙ্গে যুক্ত। ইহারা যথার্থ বৃক্ষবাসী। বৃক্ষ হইতে খসিয়া গেলে যাহাদের সত্তাই থাকে না, তাহারাই প্রকৃত বৃক্ষবাসী। যাহাদের মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধি সর্বদা কৃষ্ণময় তাহারাই প্রকৃত ব্রজবাসী। তাঁহারা ব্রজ সমান স্থানে বাস না করিয়া

অন্যস্থানে থাকিয়াও যদি মনঃপ্রাণ কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ ভজন করে তারাও ব্রজবাসী। "ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।" মানসে ব্রজবাসও ব্রজবাসী।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবার জন্য যাঁহার পরম লোভ জাগে তিনি বাবাজীপথের সাধক হ... অধিকারী। যাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজের নিত্য সাধক তাঁহাদের মত সেবা করিবার জন্যে যাঁহার চিত্তে লোভ জাগে সে-ই রাগানুগা ভক্ত।

মনে করুন কেহ মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়া তাহার বর্ণনা করিলে শুনিয়া আপনার মনে লোভ হইল। সেখানে গিয়া দর্শন করিয়া আসিলেন। আর একজন মানস দর্শন সুন্দর একখানি বই লিখিয়াছেন। বইখানা পাওয়ার আপনার লোভ আছে প্রকাশ হইল। মনে হইল এখানে ছুটিয়া যাই। আপনি অর্থহীন, কিন্তু লোভ জন্মিতে কোন যোগ্যতা হবার নাই। পথের যোগী, তেঁতুল দেখিয়া খাইতে লোভ জন্মিল। জিভে জল আসিল। জল আসা এত স্বাভাবিক যে তাহা উচিত-অনুদিত যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার রাখে না।

সেইরূপ ভক্তমুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ ভাগবতাদি পাঠ করিয়া কৃষ্ণলীলা অভিনয় দেখিয়া আপনার প্রাণে লোভ জন্মিল। আমি ব্রজের প্রিয় ভক্তদের মধ্যে একজন হইলে জীবন সার্থক হইত। এই লোভ তীব্র, ফলে আপনাকে কৃষ্ণ পাওয়াবে, মানস সরোবরে যাইবার লোভ হইলে যাইতে পারিলেন না আরও অনেককেও প্রয়োজন হইলেও কিন্তু কৃষ্ণলীলা পারিষদদের মধ্যে একজন হইবার লোভ যদি আবার প্রবলতম হয় তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

'লৌল্যমেকলম্' অর্থাৎ উহা পাইবার জন্য লৌল্যই উহার একমাত্র পত্র। লৌল্য অর্থ লোলুপতা, প্রবল লোলুপতা, লোভী ব্যক্তির থালা ভরা রসগোল্লা।

ভাগবত-কথামৃত

(প্রথম স্কন্ধ অবলম্বনে)

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রারম্ভে গ্রন্থকার শ্রীবেদব্যাস তিনটি শ্লোক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকেতে প্রণাম করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে সর্বশাস্ত্রের মধ্যে যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব তাহা বলিয়াছেন। তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন ভাগবত কেবল সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা সর্বশাস্ত্রের ফল স্বরূপ। এই জন্য এই শাস্ত্রকে সকলেরই পরমাদরে গ্রহণ করা কর্তব্য।

প্রথম শ্লোকে প্রণাম করিয়াছেন সত্যকে ; পরব্রহ্মকে বা শ্রীকৃষ্ণকে নহে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সত্যের একটি বিশেষ পরম অর্থ, সত্যের যিনি সত্য সেই পরম সত্যকে ধ্যান করিতেছি। আর একটি পরিচয়, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাহা হইতে সংঘটিত হয়, আর একটি পরিচয়, যে-সত্যের আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার দূরে পলায়ন করে সেই পরম সত্যকে প্রণাম করিতে বলেন নাই ; দেহ-মনঃ-প্রাণ এক করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

---

* *'দিব্যদর্শন'। দেওঘরে বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীজি প্রতিষ্ঠিত দেব সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। সম্পাদক ঃ শ্রীমৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (মাঘ ১৪০৫)*

দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন। এই শাস্ত্রে যে ধর্মের কথা আছে তাহার মধ্যে কোনও কপটতা নাই। ধর্মের যাহা জ্ঞাতব্য তাহা সত্য ও বাস্তব। ধর্মের নামে বিষয়সুখ স্বর্গসুখ এমন কি মুক্তির সুখ কামনা করাও কপটতা। বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধানে ত্রিতাপ দূর হয় ও পরম শিব বা মঙ্গল লাভ হয়। অন্য শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া কিছু করণীয় কর্ম থাকে। ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ মাত্রেই আরাধ্য বস্তু হৃদয়ে উপস্থিত হয়। অন্য শাস্ত্র উপদেশ-প্রধান। ভাগবত শাস্ত্রে উপদেশ অনেক থাকিলেও মূল কথা একটি — প্রেমময় ভগবানের বার্তা। এই বার্তা শুনিলেই কল্যাণ।

তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, ভাগবত বেদাদি নিখিল শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের পরিপক্ক ফল। ফলটি অতীব রসাল। এই রস পান করিলেই জীবন অমৃতময় হয়। যাঁহারা রসিক এবং ভাবুক, তাঁহারাই এই রস পানের যোগ্য।

মঙ্গলাচরণের পর সূত মুনির নিকট শৌণক ঋষির প্রশ্ন লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ। নৈমিষারণ্য, সেখানে সমবেত হইয়াছেন শৌনকাদিসহ ষষ্ঠি সহস্রাধিক ঋষি। সহস্রবর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা। সহসা রোমহর্ষণের পুত্র সূত মুনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৌণকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সমুদয় শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত আছেন। শাস্ত্রসমূহের মধ্যে জীবের পক্ষে যাহা শীঘ্র ফলপ্রদ ও পরম কল্যাণকর তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন।

কলিযুগ আগত হইয়াছে বলিয়া আমরা দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিয়া বাস করিতেছি। এখন আমাদের হরিকথা শুনিবার অবকাশ আছে। দুস্তর কলি পার হইবার জন্য আমরা উপায় অনুসন্ধান করিতেছি। বিধাতা আপনাকে আমাদের কর্ণধার করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নররূপ ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক লীলা করিয়াছেন তাহা দয়া করিয়া বর্ণনা করুন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ধর্মের রক্ষক। তিনি এখন লীলা শেষ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম এখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে?

ঋষিদের প্রশ্নে সূতমুনি পরমানন্দে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে শ্রীশুকদেবের চরণ বন্দনা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। পিতা ব্যাসদেব যাঁহার বিরহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া যাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যিনি বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিধ্বনি রূপে পিতার উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশুকদেবের চরণ বন্দনা করি।

সংসারের গাঢ় অন্ধকার সমুদ্র পার করাইতে ইচ্ছুক, যিনি জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাসসুত শ্রীশুকদেবের আশ্রয় ভিক্ষা করি। এইভাবে দুই শ্লোকে গুরুবন্দনা করিয়া শ্রীসূত কহিলেন, "হে মুনিগণ, আপনারা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া অত্যন্ত উত্তম কার্য করিয়াছেন। আপনারা জানিতে চাহিয়াছেন, স্বধর্ম কী? তাহা বলিতেছি। যে-ধর্ম হইতে শ্রীভগবানে শুদ্ধাভক্তির উদয় হয় তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। শুদ্ধা ভক্তিতে কোন কামনার গন্ধ থাকে না। যাহার দ্বারা প্রাণে পরা শান্তির উদয় হয় তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। ইহাই জীবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম। পাদপদ্মে ভক্তি হইলেই বিষয়ে

বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য আসিলেই আত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায়। আত্মাকে জানিলেই মুক্তি হয়। ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্যন্ত যাহা তাহাই পরম ধর্ম। ভক্তি ও বৈরাগ্যের চর্চার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। বাঁচিতে হইলে অর্থ ও কাম্যবস্তু প্রয়োজন। উহাদের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া নির্লিপ্তভাবে ভোগ করিতে হইবে। একমাত্র তত্ত্ববস্তু অন্বেষণ করাই জীবের জীবন-ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। নশ্বর স্বর্গাদি লাভ ধর্মের উদ্দেশ্য নহে।

তত্ত্ব কী? বলিতেছি শুনুন। যাহা অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত্ত্ব। তাহার তিনটি নাম। জ্ঞানিগণ বলেন ব্রহ্ম, যোগিগণ বলেন পরমাত্মা, ভক্তগণ বলেন ভগবান্। শাস্ত্র পাঠ করিলে যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির দ্বারা পরমতত্ত্বকে নিজ আত্মার মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভক্তিপরায়ণ হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীহরির নাম, গুণ ও লীলা শ্রবণ কীর্তন ও ধ্যান-পূজা করাই জীবের একান্ত কর্তব্য। যাহাদের কৃষ্ণকথায় রুচি না হয় তাহারা দুর্ভাগা। নিত্য ভাগবত শাস্ত্রপাঠ ও ভক্তসেবা করিলে সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। মনের সর্বপ্রকার মলিনতা দূর করিতে ভক্তি বিনা দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পরম পুরুষ ভগবান্ যখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় করিয়া পালন করেন, তখন তিনি বিষ্ণু। রজোগুণের আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মা। তমোগুণের আশ্রয় করিয়া প্রলয় করেন, তখন তিনি শিব। মূল এক হইলেও বিভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সত্ত্বতনু বাসুদেব জীবের ভজনের ধন।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে বাসুদেব একটি পুরুষমূর্তি ধারণ করিলেন। ইহার মধ্যে ষোলটি অংশ—মহৎ তত্ত্ব, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই মূর্তি হইলেন নারায়ণ। ইনিই কালসমুদ্রে যোগনিদ্রায় শয়নে ছিলেন। তাঁহার নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত পুরুষমূর্তি হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বভূত হইয়াছে। এই আদি নারায়ণ মূর্তি হইতে বহু অবতার মূর্তি প্রকট হইয়াছেন। প্রথম অবতার চতুঃসন—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইহাদের ব্রহ্মচর্যব্রত অখণ্ডিত। দ্বিতীয় অবতার হইলেন মহা বরাহ। ইনি রসাতলগতা পৃথিবী উদ্ধার-মানসে শূকর রূপ ধারণ করিলেন। তৃতীয় অবতার দেবর্ষি নারদ। তিনি বৈষ্ণবতন্ত্র প্রচার করেন। চতুর্থ অবতার নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়। পঞ্চম অবতার সিদ্ধ কপিলমুনি। ইনি সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেষ্টা। ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয় প্রহ্লাদকে আত্মবিদ্যা উপদেশ দান করেন। সপ্তম অবতার যজ্ঞ। ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জগৎ পালন করেন দেবতাগণের ইন্দ্র হইয়া। অষ্টম অবতার ঋষভদেব, ইনি পরমহংসগণের পথপ্রদর্শক। নবম অবতার পৃথুরাজা। ইনি পৃথিবী হইতে ঔষধি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করেন। দশম অবতার মৎস্য। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভয়াবহ জলপ্লাবন হইতে ভগবান্ মৎস্য রূপ ধারণ করেন ও বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশ অবতারে ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করেন। দেবর্ষি মুনিরা সমুদ্রমন্থনকালে কূর্মদেব মন্থন দণ্ডরূপ মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ অবতার ধন্বন্তরি। ত্রয়োদশ অবতার মোহিনী। ইনি অসুরগণকে মোহিত করিয়া সুরগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন।

চতুর্দশ অবতার নরসিংহ। ইনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ অবতার বামন—ইনি বলিরাজার নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ষোড়শ অবতার পরশুরাম ইনি নৃপতিগণকে ব্রাহ্মণদ্বেষী দেখিয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। সপ্তদশ অবতার ব্যাসদেব। ইনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ অবতার রামচন্দ্র। ইনি সাগর বন্ধন করিয়া রাবণবধ করেন এবং সীতাকে উদ্ধার করেন। কলিযুগে কল্কিনামে অবতার হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ আর সকলে তাঁহার অংশ এবং কলা। অবতার অসংখ্য, মাত্র কয়েকজনের নাম করা হইল। যে-মানব এই অবতারের নামাবলী সকাল-সন্ধ্যা কীর্তন করেন, তিনি সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। জীব দেহাত্মজ্ঞানরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া বন্ধনদশায় পতিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ভ্রম দূর হয়। ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দে বিরাজ করে। ভগবান্ অভিনেতার ন্যায় নানা রূপ ও নাম ধারণ করিয়া লীলা করেন। লীলাসকল বাক্যমনের অতীত। ভক্তিহীন জ্ঞানীগণ তর্কের দ্বারা, বিচার দ্বারা ব্যাপকত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না। যাঁহারা শুদ্ধাভক্তির দ্বারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা নামাবলী আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীভগবানের মধুর লীলাসকল ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভগবান্ বেদব্যাস রচনা করিয়াছেন। স্বীয় তনয় শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন। যখন গঙ্গাতীরে ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন তখন শ্রীশুকদেব তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ঐ সভার এক পার্শ্বে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবর্তে এখন এই ভাগবত পুরাণরূপ সূর্য উদিত হইয়াছেন। ধর্মকে এখন তিনি রক্ষা করিবেন। আমার বুদ্ধি অনুসারে শ্রীভাগবতের অর্থ তাৎপর্য যতদূর উপলব্ধি করিয়াছি তাহা আপনাদের নিকট কীর্তন করিব।

শৌণক সূতমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিয়াছি ব্যাসদেব মহাভারত লিখিয়াছেন। তিনি আবার ভাগবত কবে কখন লিখিলেন জানিতে ইচ্ছা হয়। শুকদেব মহাত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ, জড় উন্মত্ত ও বোবার মত বিচরণ করেন। তিনি পিতার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন কখন কীরূপে? আর মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট সাতদিন ভাগবতকথা কীভাবে কহিলেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎই বা কেন রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে অনশনে ছিলেন ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সূতমুনি কহিলেন, যাঁহারা বেদশাস্ত্রে অধিকারী বেদব্যাস তাঁহাদের জন্য মহাভারত রচনা করিলেন। মহাভারত রচনা করিয়াও তাঁহার চিত্তে প্রসন্নতা ছিল না। তিনি অপ্রসন্ন হৃদয়ে সরস্বতী নদীতটে উপস্থিত হইলেন।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষি! আপনি দেহ মন আত্মার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন তো? মহর্ষি বলিলেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি জীবের কল্যাণের জন্য মহাভারত রচনা করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। দেবর্ষি বলিলেন, আপনি ধর্মকথা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকথা তাদৃশ বর্ণনা করেন নাই।

যে-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হয়, তাহা যদি কৃষ্ণভক্তি-বর্জিত হয় তাহার কোন শোভা থাকে না। আপনি সত্যনিষ্ঠ ধীরব্রত। আপনি জগৎ-জীবের পরম আনন্দলাভের জন্য পুরুযোত্তম

শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া বিস্তারিত বর্ণনা করুন। আপনি ভগবানের লীলাকথা অবগত আছেন তথাপি আমি সংক্ষেপে কিছু কীর্তন করিব। তৎপূর্বে আমি আমার নিজের কথা কিছু নিবেদন করিব।

পূর্বজন্মে আমি এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণ বর্ষারম্ভে চাতুর্মাস্যব্রত গ্রহণ করিয়া মনোহর কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। আমি তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে অবশিষ্ট প্রসাদ-অন্ন ভোজন করিতাম। তাঁহারা আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে নিত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার কৃষ্ণকথার প্রতি আকর্ষণ হইল। আমি তখন নিতান্ত বালক হইলেও তাঁহারা আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতেন। মুনিগণ কৃপার্থ হইয়া আমার নিকট গোপনীয় কৃষ্ণমন্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রজপের ফলে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহাব পাদপদ্মে প্রেমভক্তি দান করিলেন। আপনি শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করুন। তাহাতে মহা আনন্দ ও শান্তি লাভ করিব।

মহর্ষি দেবর্ষি নারদের নিজ জীবনের কাহিনী আরও শুনিতে চাহিলে নারদ কহিলেন, আমি দাসী মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। তিনি আমার প্রতি খুব স্নেহশীলা ছিলেন। একদিন হঠাৎ সর্প-দংশনে মাতার মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণগণের চাতুর্মাস্য ব্রতও শেষ হইয়া যায়। আমি একাকী উত্তরে যাত্রা করিলাম। এক জনহীন অরণ্যের মধ্যে দিয়া যাত্রা করিয়া আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তখন শ্রীহরি কৃপা করিয়া আমার হৃৎপদ্মে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি পরম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেলে আমি তাঁহার ঐ রূপ দর্শনের জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তাঁহার আর দেখা পাইলাম না। দৈববাণীর মত শুনিলাম — তুমি এই জন্মে আমার দর্শন পাইবে না। তুমি পরজন্মে আমার পার্ষদ-দেহ লাভ করিবে।

আমি তখন নিষ্পেষিত চিত্তে পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ মৃত্যু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি দেহ ত্যাগ করিয়া পার্ষদ-দেহ লাভ করিলাম। ভগবান্ আমাকে একটি বীণা প্রদান করিলেন। ঐ বীণার স্বতঃসিদ্ধ স্বরগ্রামে ব্রহ্মনাদ বিরাজিত। আমি বীণাযন্ত্রে হরি বোল গান করিতে করিতে পর্যটন করিয়া থাকি। তিনি আমাকে প্রায়শঃ কৃপা করিয়া মনোমন্দিরে দর্শন দান করেন। আমি আপনার পরিতোষের জন্য এই কথা বলিলাম। নতুবা নিজের কথা নিজে বলা শোভন নয়। নারদ বিদায় হইলেন।

সূতমুনি বলিলেন, আপনাদিগকে পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেবর্ষি-মহর্ষি সংবাদ বলিলাম। দেবর্ষির বীণাযন্ত্রের হরিনাম গানে জগৎ চির পবিত্র হয়। দেবর্ষির কৃপানির্দেশে বেদব্যাস ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ কেন গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে হইলে তাঁহার জন্মকথা ও তাঁর পূর্ববর্তী কিছু কথা বলিতে হইবে। এখন তাহাই বলিতেছি।

ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন নদের তীরে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। উহার পর তাঁহার বন্ধু অশ্বত্থামা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার দশা দেখিয়া ও কাতর কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে কথা দিলেন, আমি এখনই পাণ্ডব বংশ ধ্বংস করিব। গভীর নিশিথে যখন সকলে নিদ্রিত তখন অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশপূর্বক পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে তাঁহাদের দ্রৌপদীর গর্ভজাত পাঁচ পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিয়া দুর্যোধনের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। দুর্যোধন ভীমের

মাথাটা বাছিয়া লইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভাঙ্গা পায়ে পদাঘাত করিলেন। মাথাটা গুঁড়া হইয়া গেল। দুর্যোধন বুঝিলেন ইহা ভীমের মাথা নহে। ইহা নিশ্চয়ই পঞ্চপাণ্ডবের ছেলের মাথা। অতঃপর দুর্যোধন অশ্বত্থামার অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

পরদিন সকালে পাণ্ডব শিবিরে কান্নার রোল উঠিল। পাঁচ পুত্রের মৃত্যুতে দ্রৌপদী পাগলিনীর মত হইলেন। অর্জুন দ্রৌপদীকে বলিলেন, তোমার পুত্র-হত্যাকারীকে ধরিয়া এখনই লইয়া আসিব। অশ্বত্থামা যখন শিবির হইতে চলিয়া যান, তখন সাত্যকি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে অশ্বত্থামার.কথা শুনিয়া অর্জুন অনেক খুঁজিয়া অশ্বত্থামাকে ধরিয়া রথের চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া দ্রৌপদীর সন্নিকটে আনিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া দ্রৌপদী চীৎকার করিযা উঠিলেন। এ কী? তোমাব গুরুপুত্র ব্রাহ্মণ, ইহাকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না। অর্জুন বলিলেন, এই তোমার পুত্রহন্তা। দ্রৌপদী বলিলেন, হউক পুত্রহন্তা, তবু তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও। ইহার মাতা কৃপী। ইহাকে মারিলে কৃপীও আমার মত পুত্রশোকে আর্তনাদ করিবেন, তাহাতে আমার পুত্রশোক বাড়িবে বই কমিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন অশ্বত্থামাব শিরোমণি কাটিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শিরোমণি ছেদনে অশ্বত্থামা মুনি অপমানে বিমর্ষ হইয়া গেলেন ও কিছুদূর গিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন— লক্ষ্য, উত্তরার গর্ভস্থিত একটি ভ্রূণ। উত্তরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত অর্জুনপুত্র অভিমন্যব পত্নী। তাঁহার গর্ভে পাণ্ডব বংশের শেষ সন্তান আছে।

সকল প্রকার উদ্বেগ অশান্তি দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা রওনা হইতেছেন। রথের সিঁড়িতে এক পা তুলিয়াছেন। এমন সময় আলুলায়িত বেশে উত্তরা ছুটিয়া আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গোবিন্দ! রক্ষা কর, রক্ষা কব।" অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র আমাকে তাড়া কবিতেছে। আমি মরিলে দুঃখ নাই, আমার গর্ভস্থ কুরুপাণ্ডব বংশের একটি বীজ, তাঁহাকে বাঁচাও।" শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের তীব নিজ অঙ্গে গ্রহণ করতঃ সন্তানটিকে রক্ষা করিলেন। এই সন্তানই পরীক্ষিৎ।

শ্রীকৃষ্ণ আবার দ্বারকায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুন্তীদেবী আসিয়া তাঁহাকে থামাইলেন ও কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। কুন্তীদেবী কৃষ্ণের পিসিমাতা। তাঁহার অন্তরের গভীর স্তরে এক বাৎসল্যের স্নেহের ধারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সতত রহিয়াছে, কোন বিরাট্ ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি দেখিলে বাৎসল্য রসকে আবরণ করিয়া দাস্যভাবের উদয় হয়। সে ভাবেই কুন্তী বার বার শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি অনভিজ্ঞ নারী। তোমার মহিমা কী জানি? পরমহংস মুনিগণ পর্যন্ত তোমার অক্ষররূপ ও গভীর লীলাচাতুর্য অবধারণ করিতে অক্ষম। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। তুমি প্রকৃতির নিয়ন্তা। তুমি আদি পুরুষ। তুমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছ। তুমি পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে ধন্য করিয়াছ। তুমি নন্দ-যশোদাকে পিতা মাতা ডাকিয়া যে লীলা বিস্তার করিয়াছ তাহা অপূর্ব। দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া অপরাধ করিয়াছ।.অপরাধ [illegible]লে মা যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার জন্য হস্তে রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি তখন ভয়ে ভীত হইয়া অধোবদন হইয়াছিলে।

তোমার অশ্রু বিগলিত হইয়া নয়নের কাজলকে ধোয়াইয়া দিতেছিল। তখন তোমার সেই কপট কাতর নিত্য মাধুর্য আমার মন বিমোহিত করিয়াছিল। তুমি একটু আগে বলিয়াছ এখন আমাদের কোন বিপদ্ নাই বলিয়া তুমি আমাদের ছাড়িয়া দ্বারকায় যাইতেছ।

শোন কৃষ্ণ! তুমি জগদ্‌গুরু। যেরূপ বিপদ্ থাকিলে তোমার দর্শন লাভ হয়, সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে, সেইরূপ দুঃখ সর্বদাই যেন আমার লাগিয়া থাকে। তুমি বিশ্ব আত্মা। নিখিল বিশ্ব তোমার মূর্তি। আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি পাণ্ডবদের ও যাদবদের স্নেহে আবদ্ধ। এই আবদ্ধতা হেতু আমি তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাই। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, পাণ্ডব যাদব এই উভয়কূলের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় ভালবাসার বন্ধন আছে তাহা নির্ম্মম ভাবে দূর করিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার কথা ভাবিবাব সুযোগ হইবে। কৃষ্ণ! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।

কুন্তীদেবীর স্তুতিগাথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্যময় মুখে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ তাহা চিরদিন অবিচলিত থাকিবে।"

* * *

কয়েকদিন পর শ্রীকৃষ্ণ আবার দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বাধা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অগণিত আত্মীয়স্বজনের বধ সাধন করিয়া আমার চিত্ত যৎপরোনাস্তি বিষাদগ্রস্ত। আমার চিত্তকে শান্ত না করিয়া যাইতে পারিবে না। লোকে বলে তুমি বলিয়াছ যে, প্রজা পালন করিলে বা ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুবধ করিলে রাজা পাপে লিপ্ত হন না। এই উপদেশে আমার শান্তি হয় না। কারণ, আমি প্রজাপালক রাজা ছিলাম না। কেবল রাজ্যলোভেই যুদ্ধে পতিত হইয়াছিলাম। আমার পাপ অপরিসীম। আমি কী উপায়ে রক্ষা পাইব?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার শত্‌শত উপদেশ তোমার কাছে ব্যর্থ হইয়াছে। এখন চল ভীষ্মের কাছে যাই। ভীষ্ম এখনও শরশয্যায় শয়নে আছেন। চল তাঁহার কাছে যাই। তিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া সকল মোহ দূর করিয়া দিবেন। চল যাই ভীষ্মের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া ভীষ্মের কাছে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সঙ্গী হইলেন। ভীষ্মের কাছে পৌঁছাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু আত্মীয়স্বজন বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের চিত্ত বিভ্রান্ত। আমি অনেক উপদেশ দিয়াছি কোন ফল হয় নাই। এখন তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া দাও যাহাতে তাঁহাব চিত্ত শান্ত হয়।

ভীষ্মদেব হাসিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! তুমি যাহাকে শান্ত করিতে পার নাই, আমি তাহাকে শান্ত করিতে পারিব—এই কথা তোমার চাতুরী মাত্র। আমার শেষ মুহূর্ত প্রায় নিকটবর্তী। তুমি আসিয়াছ, কৃপা করিয়া শেষ সময়ে আমাকে দেখা দিতে। তোমার নির্দেশ মত আমি দু'চারটি কথা যুধিষ্ঠিরকে বলিব, তাহার পর উত্তরায়ণ আসিলেই আমি দেহত্যাগ করিব। তুমি তখন আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে। তোমার বদনের মাধুর্য দর্শন কবিতে করিতে দেহত্যাগ করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিয়াছিলেন। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের নিবৃত্তি

ধর্ম, দান ধর্ম, রাজ ধর্ম, মোক্ষ ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, স্ত্রীধর্ম সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে যোগিগণের বাঞ্ছিত উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের উপসংহার করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিলেন। পরম শান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্মদেব কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে সর্বপ্রকার তৃষ্ণাহীন মন সমর্পিত করিলাম। আমার কাছে তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম পরিচয় তুমি অর্জুনের সারথি। অর্জুনের সঙ্গে আমার দশ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। তুমি ছিলে আমাদের মধ্যস্থলে অর্জুনের সারথিরূপে। তোমার রূপখানি কি মনোহর ত্রিভুবন-কমনীয়, তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব শোভা, তোমার পরিধানে পীতাম্বর। তোমার মুখপদ্ম ভুবন-মোহন। আমার প্রার্থনা, তোমার প্রতি আমাব কামনাশূন্য রতি উৎপন্ন হউক। যুদ্ধকালে অর্জুনের রথে বিরাজিত তোমার উজ্জ্বল দেহ আমার তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল।

তুমি সখা অর্জুনের বাক্যে উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া অর্জুনকে বলিয়াছিলে এই সমবেত কুরুসৈন্য দেখ। দেখাইবার জন্য তুমি নিজে শ্রীহস্তেব তর্জনী অঙ্গুলিটি আমাদের উপর দিয়া ঘুরাইয়া নিয়াছিলে তখন দৃষ্টিদ্বারা আমাদের আয়ু হরণ করিয়া নিয়াছিলে। তুমি মোহগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলে।

তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তোমায় অস্ত্র ধারণ করাইব। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য তোমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিয়াছিলে। তখন তোমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তোমার উত্তরীয় বসন উড়িয়া গিয়াছে। তোমার পদভারে ধরণী কম্পিতা হইয়াছিল। আমি তখন জয়শঙ্খ বাজাইয়াছিলাম। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে জয়ী করিয়াছিলে।

তুমি পরমপুরুষ। তোমার কৃপায় আমার সকল সংশয় ও ভেদজ্ঞান দূর হইয়াছিল। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমার চরণপদ্মে আমার ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকুক। আমি কৃতার্থ। বলিতে বলিতে ভীষ্ম তাঁহার আত্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের এই মৃত্যু জগতে তুলনাহীন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুর গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিলেন। দ্বারকার উপকণ্ঠে আসিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ করিলেন। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া রাজ্যের সমস্ত নরনারী ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সাদর সংবর্ধনা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাঁহার সহিত সেরূপ করিলেন। কাহাকে প্রণাম, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকে করস্পর্শ, কাহারও উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে সম্মানিত করিলেন। গুরুতর কার্যভার হইতে অবসর গ্রহণ ব [illegible] য়া শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত মনে পারিবারিক সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

যোগমায়ার আবরণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা এতই সুন্দর যে, সকলেই তাঁহাকে আপনভাবে

ভাবিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যভাবে সকল লীলা খেলা করেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভস্থিত পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শুভ রজনীর শুভক্ষণে অর্জুনের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পাণ্ডুবংশধর ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুমারের জাতকর্ম সম্পন্ন করিলেন।

এই শিশু মাতৃগর্ভে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভুলিয়া যান নাই। নতুন মানুষকে দেখিলেই তাকাইয়া পরীক্ষা করিতেন, সেই গর্ভদৃষ্ট মানুষটি কি এই? এই পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতই ধার্মিক, কৃষ্ণভক্ত ও সকলের আনন্দদানকারী। পরীক্ষিৎই জীবনের শেষভাগে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীশুকমুনির নিকট ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেসব কথায় পরে আসিতেছি।

ভক্তবর বিদুর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি অনেকদিন পরে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বিদুরকে পাইযা সকলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠির বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমাদিগের কথা স্মরণ করিতেন? আপনি কি দ্বারকাপুরী হইয়া আসিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ যদুগণসহ কুশলে আছেন তো? বিদুর কিছু কিছু বলিলেন, কিছু কিছু বলিলেন না। যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছে এই কথা গোপন রাখিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করিয়া কিছু তত্ত্ব কথা শুনাইলেন।

বিদুর বলিলেন, আপনি অন্ধ ছিলেন। এখন বধির হইয়াছেন। বুদ্ধিও ক্ষীণ হইয়াছে। আপনার ভোগলালসা এখনও যায় নাই। এখন চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবার সময়। অতঃপর বিদুর সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন উত্তরদিকে গমন করিলেন।

অনুজ বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের মোহনিদ্রা কাটিয়া গেল। তিনি একদিন সকলের প্রতি মমতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া হিমালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গান্ধারীও পতির অনুগমন করিলেন। পাণ্ডবজননী কুন্তীও তাঁহাদের সঙ্গ নিলেন। যুধিষ্ঠির পরদিন সকালে গুরুজনদের প্রণাম করিতে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সঞ্জয় বলিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিদ্রা কালে সব পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন জানি না। সকলেই শোকার্ত, তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে দেবর্ষি নারদ বলিলেন, ধর্মরাজ আপনি তাঁহাদের মোক্ষ পথের বাধক হইবেন না। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে তাঁহারা দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের দেহ যোগাগ্নি দ্বারা ভষ্মীভূত হইল।

অর্জুন কৃষ্ণ-দর্শন লালসায় দ্বারকাগমন করিয়া কয়েকমাস কাটাইলেন। অর্জুন ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহার আকৃতি এবং প্রকৃতি দেখিয়া সন্দেহযুক্ত হইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জুন বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, মহারাজ, আমাদের পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে এই পৃথিবী আমার কাছে শ্রীহীন মনে হইতেছে।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান ও যদুকুলের ধ্বংসের কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চলভাবে স্বর্গারোহণে

কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে বসাইলেন। তিনি মথুরার সিংহাসনে বসাইলেন বজ্রকে। শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ-তনয়। অতঃপর যুধিষ্ঠির কাহারও বাক্যে কোন কর্ণপাত না করিয়া বধিরের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। অনুজগণ দ্রৌপদী সহ অগ্রজের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিলেন।

সূতমুনি কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভূ-ভার হরণ করিয়াছিলেন সেই মূর্তিতেই অন্তর্ধান করিলেন। যে-দিবস শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ কবিলেন, সেই দিবসই কলিযুগ পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইল। শ্রীকৃষ্ণেব প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবগণেব মহাপ্রস্থান কথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিরাট্‌তনয় উত্তবের কন্যা ইলাবতীকে বিবাহ কবিলেন। তাহাদেব জন্মেজয় প্রমুখ চারটি পুত্র হইল। পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নির্দেশমত রাজ্য পালন করিতেন। রাজ্য খুব সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল।

একদিন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। মহারাজ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। একস্থানে দেখিলেন একজন দুর্দান্ত লোক একটি বৃষ ও একটি গাভীকে লগুড়াঘাত কবিতেছে। বৃষটির তিন পা ভাঙ্গা, এক পায়ে কোন রকম দাঁড়াইযা আছে। পরিচয় নিয়া মহারাজ জানিলেন বৃষটি ধর্মের মূর্তি। তাঁহার চারিটি পা ছিল সত্য যুগে — তপস্যা, শুদ্ধি, দয়া ও সত্য। ত্রেতায় এক পা গিয়াছে। দ্বাপরে দুই পা গিয়াছে। এখন কলি আসিয়া আমার তৃতীয় পা শেষ করিতেছে। এই যে দুর্দান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিটি ইনি কলি। ইনি আমাকে অবিশ্রাম বেত্রাঘাত করিতেছে। আর এই গাভীটি পৃথিবী। তাহার গায়ে পদাঘাত করিয়া কলি ন্যায়নীতিকে ধ্বংসেব পথে নিতেছে। ন্যায়নীতিকে পদাঘাত করিয়া পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিতেছে।

মহারাজ সব বুঝিতে পারিয়া কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। চতুর কলি পবীক্ষিতের পা ধরিয়া বলিলেন, "আমিও আপনার একটি প্রজা। আমাকেও আপনার একটু স্থান দিতে হইবে।" পরীক্ষিৎ মহারাজ একটু দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমি পাঁচটি স্থান দিলাম। যেখানে পাশাখেলা, মদ খাওয়া, পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি, প্রাণী হিংসা ও সুবর্ণের প্রতি লোলুপতা সে স্থানে তোমার বাস হউক।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ধর্মকে বলিলেন, তোমার নষ্ট তিনটি পা আমি যোজনা করিবার চেষ্টা করিব। পৃথিবীরূপ গাভীর গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, তুমি আশ্বস্ত হও। কলি আর তোমার গায়ে হাত দিতে পারিবে না।

একদিন মহারাজ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি হরিণও পান নাই। বনের মধ্যে শমীক নামক এক ঋষির তপোবনে প্রবেশ করিলেন। ঋষি ধ্যানস্থ অবস্থায় ছিলেন। মহারাজ তাঁহ । কাছে পিপাসার জল চাহিলেন। ঋষিকে নিঃস্পন্দ নিরুত্তর দেখিয়া রাজা ক্রোধযুক্ত হইলেন। নিকটস্থ একটা মরা সাপকে ধনুর অগ্রভাগে তুলিয়া ঋষির গলায় জড়াইয়া

দিয়া ক্রোধের অভিব্যক্তি করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঋষিপুত্র শৃঙ্গী—ক্রীড়াসঙ্গী বালকদের মুখে ধ্যানস্থ পিতার অপমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্ত হইলেন। কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া তিনি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, আমার ধ্যানস্থ পিতার গলদেশে যে কুলাঙ্গার মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে তাহার মৃত্যু হউক।

ধ্যানান্তে ঋষি পুত্রের মুখে সব শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। বলিলেন, তুমি লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়া মহাপাপ করিয়াছ। এই রাজার মৃত্যু হইলে কলি আসিয়া এই রাজ্য দখল করিবে। তৎপর ঋষি বালকের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—

"অপাপেষু সর্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি।।" ভাঃ ১/১৮/৪৭

এইদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ বাজধানীতে ফিরিতে ফিরিতে অনুতপ্ত হইলেন। ভাবিলেন, ধ্যানস্থ ঋষির প্রতি অবমাননা সূচক কার্য করিয়া আমি খুব গর্হিত কার্য করিয়াছি। এই নিন্দনীয় কাজের জন্য আমার বিশেষ কোন প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যখন রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন শমীক ঋষির গৌরমুখনামক এক শিষ্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে মৃত্যুর খবর দিলেন।

মহারাজ ভাবিলেন, এই অভিশাপে আমি মহাপাপ হইতে রক্ষা পাইলাম। মুনি-ঋষিদের দয়ার সীমা নাই। তাঁহারা আমাকে যথোচিত কর্তব্যাদি করিবার সাতদিন সুযোগ দিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ভাবিলেন, আমার যে ব্রহ্মশাপ হইয়াছে ইহা শ্রীহরির অনুগ্রহ। তিনি তখন পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হরিদ্বার চলিয়া গেলেন। গঙ্গার দক্ষিণ কূলে উত্তর মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সঙ্গী অগণিত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরাও আপনার সঙ্গে অবস্থান করিব।

মহারাজ করজোড়ে সকলের পদবন্দনা করিয়া কহিলেন—সকল অবস্থায় নিয়ত মরণের পূর্বে মানুষের অনুষ্ঠেয় কার্য কী? আপনারা আমাকে উপদেশ করুন।

ঠিক এমনই সময় ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সংবর্ধনা করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিলেন। আজ আমাদের কি শুভ দিন, আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবদের ভালবাসিতেন। আমি সেই পাণ্ডবদের বংশধর। তাই আপনি করুণা করিয়া উপস্থিত হইলেন, আমার মৃত্যুও সন্নিহিত। এই সময় আপনার আগমন কৃষ্ণকৃপা বিনা সম্ভব নয়। শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে, অন্তিমকালে মানুষের যাহা একান্ত কর্তব্য তাহা কৃপা করিয়া বলুন। শুকদেব পরম সন্তুষ্ট চিত্তে কথা বলিতে আরম্ভ করিলনে। ❑

ভাগবত-ধর্ম*

ভাগবত-ধর্মের ভিত্তি প্রধানতঃ ভাগবত-গ্রন্থ।[১] ভাগবত গ্রন্থের আরম্ভ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বাক্য লইয়া। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। ইহাতে বোঝা যায় ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তভিত্তিক। ভাগবতগ্রন্থকে বেদবৃক্ষের গলিত ফল বলা হইয়াছে। বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রী। ভাগবত সেই গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ, এই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম বুঝিতে হইলে বেদান্তের সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক।

বেদান্ত বেদের নির্যাস। সনাতন বেদ হিন্দু-জাতির মূল ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের যত কিছু ধর্মতত্ত্ব, জীবনাদর্শ, তাহার মূল বেদ। বেদান্তের বার্তা বিশ্বমানবের জন্য। নিখিল বিশ্বের নরনারীকে বেদান্ত ডাকিতেছেন মধুময় আহ্বানে — 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' হে অমৃতের পুত্রগণ শোনো। বেদান্ত আমাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন — 'অমৃতের পুত্রগণ' এই সম্বোধন করিয়া।

তথাপি আমাদের সকলেরই জীবনে দুঃখ আছে। এই দুঃখ কেহই চাহে না। সংসারের সকল নরনারীরই একটি জপমন্ত্র 'দুঃখং মে মা ভূৎ, সুখং মে ভূয়াৎ' — যেন দুঃখ না পাই, যেন সুখে থাকি। দুঃখের গ্রাহক নাই। প্রত্যেকটি মানুষই সুখার্থী, অথচ দিনরাত সুখ সুখ করিয়া

• ১৯৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল'-স্মারক বক্তৃতামালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। — সঃ

১। ভাগবত-ধর্ম বহু প্রাচীন। ইহার ভিত্তি কবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। লেখক নিজেই লিখিয়াছেন 'ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন নাম পাঞ্চরাত্র-মত বা সাত্বত মত। ভাগবত-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে ইঁহার কথা আছে।'

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হেলিওদোরস্ (Heliodorus) নামে একজন গ্রীক ভাগবত-ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি তক্ষশিলারাজ গ্রীক অন্তিঅলিকিত (Antialkidas)-এর রাজদূত হিসাবে বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হন এবং ভাগভদ্রের রাজ্যের চতুর্দশ বর্ষে মধ্যপ্রদেশের বেশ-নগরে একটি গরুড়-ধ্বজ-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাহাতে ভাগবত ধর্মে তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণের কথা ও ভাগবত-ধর্ম বলিতে যে (১) দম (২) ত্যাগ ও (৩) অপ্রমাদ বুঝায়, ইহা উৎকীর্ণ করেন। লক্ষণীয় যে, দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই শব্দত্রয় মহাভারতেরই কথা। পরবর্তী কালে ভাগবতধর্ম বিশাল আকার ধারণ করে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, বিশেষতঃ একাদশ স্কন্ধের নবযোগীন্দ্র-সংবাদে। গীতায় (রচনাকাল : রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রারম্ভের পরে নহে।) ভাগবত-ধর্ম যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল : শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থটি কোন্ সময়ে রচিত? এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব কর্তৃক উহা রচিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই মত বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে উহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতক বা তাহারও পরে। পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞঃ ডঃ রাজেন্দ্র হাজরার মতে মূল পুরাণটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং পরে উহাতে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাগবতের রচনাকাল নির্ধারিত না হইলে, 'ভাগবত-ধর্মের ভিত্তি প্রধানতঃ ভাগবত-গ্রন্থ' এই উক্তির সহিত অনেকেই একমত হইবেন না। যাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে, একই ব্যক্তি মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত-সমেত যাবতীয় পুরাণগ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। —সঃ

** 'উদ্বোধন'। ৭৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা (আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৮২) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মাসিক মুখপত্র। সম্পাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।*

সুখের পিছনে ছুটিয়াও কেহ সাক্ষ্য দিতেছে না যে, সে খুব সুখে আছে।

বেদ বলেন, মানবীয় চেষ্টায় দুঃখ কিছু কমিবার নয়। কিছু কমে সাময়িকভাবে, আংশিকভাবে। শ্রুতি বলেন, আমার কথা যদি শোনো, তাহা হইলে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে। সকল দুঃখ যাইবে একেবারেই। বেদ দুঃখের কারণ বাহির করিয়াছেন ও দূরীকরণের উপায় বলিয়াছেন। দুঃখের কারণ অল্পে সুখানুসন্ধান। কিন্তু বেদ বলেন ঃ "যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি" — অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমার সন্ধানই করিতে হইবে। ভূমার সঙ্গে যুক্ততায় সুখের উদয়, দুঃখের নিবৃত্তি। দুঃখের মূল কারণ অল্পতা ক্ষুদ্রতা। মানব যে দুঃখী তাহার কারণ এই যে, সে নিজেকে বড় ছোট করিয়াছে, অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছে। সংকীর্ণতা সীমাবদ্ধতা সকল দুঃখের জনক।

মানব! তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয়ত একটি পাড়ার নাম কর। তুমি যখন পাড়ায় জন্মিয়াছ তখনই একটি জেলায় একটি প্রদেশে বা একটি দেশে বা পৃথিবীতে জন্মিয়াছ। তুমি একটা পল্লী-সচেতন না হইয়া একটা দেশ-সচেতন হইতে পার। দেশ-সচেতন না হইয়া বিশ্ব-সচেতন হইতে পার। নিজেকে বড় করিয়া দেখ — নিজেকে বিশ্ববাসী বলিয়া ভাবো।

নিজেকে যত ছোট করিয়া দেখিবে, ততই দুঃখে ডুবিবে। যত বড় করিয়া জানিবে, ততই দুঃখের মাত্রা কমিয়া গিয়া সুখের উদয় হইবে। আমরা স্বরূপতঃ বড়ই আছি, কিন্তু বড় চেতনায় সজাগ নাই। নিজেকে বড় করিয়া জানিবার উপায় বড়র সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তুমি যত বড়র সঙ্গে যুক্ত হইবে তত বড় হইবে।

যিনি সর্বাধিক বড়, — বৃহত্তম, তিনি ভূমা। ভূমার সঙ্গে যুক্ত হইলেই ভূমা হইবে। ভূমাই সুখের নিলয়, ভূমাতেই দুঃখের নিবৃত্তি। সুতরাং দুঃখী জীবের জানিবার বস্তু— জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় শুধু ভূমা।

ভূমার অপর নাম ব্রহ্ম। বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম। যিনি সবচেয়ে বড়, যাঁহার বৃহত্ত্ব সর্বাতিশায়ী, তিনি ব্রহ্ম। শুধু তাহাতেই নহে। ব্রহ্ম শুধু বড়ই নহেন। তিনি অপরকেও বড় করেন। বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। যিনি আসেন ব্রহ্মের সংস্পর্শে, তিনিও বড় হইয়া যান। ব্রহ্মের কথা বলিলে, ভাবিলে, ধ্যান করিলে, অনুধাবন করিলে, বড় হওয়া যায়। বড় হইলেই দুঃখ যায়।

এই ব্রহ্মের সংবাদ লইয়াই ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তসূত্র। ইহা ভারতীয় দর্শন সমূহের শিরোমণি। বেদান্ত-দর্শন একত্বের দর্শন। একত্ব-দর্শনই বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য তাৎপর্য। যিনি একত্ব অনুভব করেন, তাঁহার আর শোক তাপ দুঃখ থাকে না। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'

ব্রহ্মসূত্রে ৫৫৫টি সূত্র আছে। প্রথম সূত্রঃ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—আসুন ব্রহ্মের কথা বলি। কাজকর্মের শেষে যদি কিছু অবকাশ পাইয়া থাকেন — আসুন সবচেয়ে যিনি বড়, তাঁহার কথা আলোচনা করি।

ব্রহ্ম বস্তুটি কী, ইহা লইয়া দ্বিতীয় সূত্র। এই নিখিল বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' 'জন্মাদি' — জন্ম স্থিতি পরিণতি। 'যতঃ'—যাঁহা হইতে তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া প্রধানতঃ দুইটি ধারার উদ্ভব হইয়াছে। একটি জ্ঞানীদের,

অপরটি ভক্তদের। ভক্তদের ভাবনার ধারাই ভাগবত-ধর্ম।

ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে কোন ক্রিয়া আছে কিনা, মুখ্যতঃ ইহা লইয়া জ্ঞানী ও ভক্তদের মধ্যে মতভিন্নতা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে, অপূর্ণ বস্তুরই ক্রিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মবস্তুতে ক্রিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম অপূর্ণতা-দোষযুক্ত হন। ক্রিয়ার প্রকাশ গতিতে। যার গতি আছে সে পূর্ণ নয়। সুতরাং পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মে কোন গতি নাই — সুতরাং কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই। যাঁহাতে ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই, তিনি সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না ; অথচ বেদান্ত বলিতেছেন — সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হইতেছে তিনি ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানবাদীদের মতে নিখিল সৃষ্টি ব্রহ্মের বিবর্ত বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে 'ভাণ' মাত্র।

বিবর্ত কথাটির অর্থ কী? অন্ধকার পথে একগাছি রজ্জু দেখিয়া আপনি তাহা সর্প মনে করিয়া ভীত হইয়াছেন। সর্পকে রজ্জু সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই সৃষ্টিতে রজ্জুর কোন ক্রিয়াকারিত্ব নাই। এইরূপ সৃজনকেই বেদান্ত বলেন বিবর্ত। সর্পটি সত্য না হইয়াও সত্যের ভাণ (appearance) হয়। ভাণের ভিত্তিটিকে বলে অধিষ্ঠান। সত্য রজ্জুর অধিষ্ঠানে মিথ্যা সর্পের ভাণ। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মের উপর জগতের ভাণ হইতেছে। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। মিথ্যার বাধ হয়। সত্যের কখনও বাধ হয় না। সত্যজ্ঞান আসিলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। আলো আসিলে রজ্জুটি দৃষ্ট হইলে, সর্প আর থাকে না। রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে রজ্জুর যে স্থান, ব্রহ্মের সেই স্থান এবং সর্পের যে স্থান, তাহা জগতের স্থান। এই কথাকেই সংক্ষেপে বলা হয় 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

জ্ঞানবাদীর এই মত। ভক্তিবাদীরা অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম ইহা স্বীকার করে না। জ্ঞানবাদীর মতে ব্রহ্ম স্থির স্থাণু অচল বস্তু। ইহা গতিহীন ক্রিয়াহীন। ভাগবত-ধর্ম এই মত অগ্রাহ্য করেন। ভক্তিবাদিগণের মতে ব্রহ্মবস্তু গতিশীল ক্রিয়াশীল একটি Dynamic জীবন্ত সত্তা। ভক্তিবাদী বলেন ঃ যাহার ক্রিয়া নাই, কাজ নাই, গতি নাই — সে অচেতন বা মৃত। ব্রহ্মবস্তু চৈতন্যময়। সুতরাং ব্রহ্ম স্বভাবতই ক্রিয়াযুক্ত। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'। ক্রিয়াটি শক্তির পরিচায়ক। ভক্তিবাদীর মতে ব্রহ্ম শক্তিমান্। জ্ঞান-বাদীর মতে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক।

ভাগবতধর্ম-মতে বিশ্ব-সৃষ্টি ব্রহ্মেরই কার্য, বিশ্বের মূল উপাদান প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। সৃষ্টি প্রকৃতির পরিণতি — বিবর্ত নহে। পরিণতি হইলেও ব্রহ্ম পরিণামী বা বিকারী হন না। দেহস্থিত কেশ-লোমাদির মত। কেশ-লোমের পরিবর্ধনে পরিবর্জনে দেহী যেমন বিকারগ্রস্ত হন না — স্পর্শমাত্র লৌহকে সুবর্ণ করিয়াও স্পর্শমণি যেমন বিকারী হয় না, তদ্রূপ।

ভাগবতধর্ম-মতে সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্মেরই কার্য, অপরাশক্তি। ইহা ভিন্ন জীবশক্তি নামে ব্রহ্মের আর এক শক্তি আছে — গীতার পরিভাষায় 'পরা প্রকৃতি'। অপরা প্রকৃতির পরিণাম পরা প্রকৃতির ভোগের জন্য। জীবশক্তির অনাদি-সঞ্চিত কর্মফলগুলির ভোগের জন্য প্রকৃতির পরিণতি ঘটিয়া বিশাল প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়।

ভাগবতধর্ম-মতে ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব ও জগৎ নিয়ম্য। জীব চিৎস্বরূপ ভোক্তা, অচিৎ জগৎ ভোগ্য — ব্রহ্ম উভয়েরই নিয়ন্তা ও জীবও সত্য — ব্রহ্মের অধীনে সত্য। জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, ভক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। ইহা বুঝিলেই ভাগবত-ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য জানা হইল।

ভাগবতীয়দের চিন্তাধারা তিন ভাগ করিয়া অনুশীলন করিতেছি। প্রথম বৈদিক যুগ হইতে আচার্য রামানুজ পর্যন্ত — ইহা প্রাচীন যুগ। আচার্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত মধ্য যুগ। মহাপ্রভু হইতে বর্তমান যুগ চলিতেছে।

ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন নাম পাঞ্চরাত্র মত বা সাত্বত মত। বর্তমানে ইহার চলতি নাম বৈষ্ণব ধর্ম। ভাগবত-ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি। ইনি নারায়ণের অবতার। মহাভারতে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে ইঁহার কথা আছে। ইনি প্রথমে দেবর্ষি নারদকে এই পাঞ্চরাত্র-ধর্ম উপদেশ দেন। পাঞ্চরাত্র নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ কেহ বলেন, সত্যযুগে কেশব ব্রহ্মাকে পাঁচ রাত্রি ধরিয়া উপদেশ দান করেন। অপরে বলেন, ঐ উপদেশ তিনি পাঁচ জনকে দিয়াছিলেন। এইজন্য পাঞ্চরাত্রে পাঁচ ভাগ ও পাঁচ লক্ষ শ্লোক। ভাগগুলির নাম ব্রহ্মরাত্র, শিবরাত্র, ইন্দ্ররাত্র, ঋষিরাত্র ও রুদ্ররাত্র। ইহার অন্য নাম সাত্বত মত। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশে সাত্বত নামক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত নামকরণ। পাঞ্চরাত্র মত এই বংশে বেশী প্রচলিত ছিল।

এই ধর্ম নারায়ণ ঋষির নিকট লাভ করেন নারদ। নারদ দেন ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেব দান করেন শুকদেবকে ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে। আবার অন্যত্র আছে, নারায়ণ ঋষি দেন বিবস্বানকে, বিবস্বান দেন মনুকে, মনু দেন ইক্ষ্বাকুকে। সেই ধারার কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুনকে গীতায় ও অনুগীতায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও এই ধর্ম উপদেশ দেন। এই ধর্ম আবার বেদব্যাস দেন বৈশম্পায়নকে এবং তিনি দেন জনমেজয়কে। এই ধারা মহাভারতে কীর্তিত। এই ধর্মের পরবর্তী নাম বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব শব্দ বেদে পাওয়া যায় না। বেদে 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। এই অর্থে যজুর্বেদে 'বৈষ্ণব' শব্দ আছে। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা আছে — একমাত্র বিষ্ণুই যাঁহার শ্রোতব্য কীর্তনীয় পূজ্য আরাধ্য, তিনিই বৈষ্ণব। মহাভারতে বৈষ্ণবদের 'একান্তী' বলা হইয়াছে। যাঁহার চিত্তবৃত্তি একটি বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরে অন্তে বা সমাপ্তি প্রাপ্ত — অভিনিবিষ্ট, তিনি একান্তী, তিনি বৈষ্ণব।

বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য ও ধর্মের সাধনাদি সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের সকলেরই প্রায় একই মত। এই মত গীতায় সুব্যক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—একই পরতত্ত্বের তিন নাম—ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর দৃষ্টিতে তিনি আত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি ভগবান্। ভাগবতের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িক ভাবের অনেক ঊর্ধ্বে।

ভক্তের ভগবানের স্বরূপ শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'আমি সমগ্র জগতের প্রভাব এবং প্রলয়।' 'আমি জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী শরণ ও সুহৃদ্।' 'আমি প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ।' 'আমি ভূতবর্গের আদি, অন্ত ও মধ্য।' ইহাতে বুঝা গেল ভগবান্ বিশ্ববীজ, বিশ্বরূপ ও বিশ্বমূর্তি। তাঁহা হইতে ব্যতিরিক্ত চর অচর কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার ব্যক্ত রূপ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-রূপ মায়িক। তাঁহার ইন্দ্রিয়াগোচর অপ্রাকৃত স্বরূপ অক্ষয় অব্যয়। 'আমার পরম ভাবকে না জানিয়াই বুদ্ধিহীন নরনারী অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।' 'আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকট নহি। মূঢ় লোক জানে না যে, আমি অজ ও অব্যয়।' 'অব্যক্তস্বরূপ আমা দ্বারা সর্ব জগৎ

ব্যাপ্ত।' 'সর্ব ভূতবর্গ আমাতে স্থিত। আমি উহাঁদিগেতে স্থিত নহি।' 'আমার আত্মা ভূতভাবন, কিন্তু ভূতস্থ নহেন।' 'আমি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত। আমি পুরুষোত্তম।' 'আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখ আমাতেই স্থিত।'

ঈশ্বরের এই অপ্রাকৃত স্বরূপতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের মোটামুটি একই মত। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের জীবন-দর্শনও মোটামুটি একই রূপ। 'বাসুদেবই সকল'— ইহাই সর্বোচ্চ জ্ঞান। তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি সর্বদা এই পরম জ্ঞানে সুস্থিত। ভাগবত-ধর্মের জীবন-দর্শনের সার কথা হইল ঈশ্বরার্থে সকল কর্ম করা। ভক্ত সাধক শরীর বাক্য মন ইন্দ্রিয়সমূহ ও বুদ্ধিসহায়ে যাহা কিছু কার্য করিবেন সমস্তই ঈশ্বরার্থে করিতেছি মনে করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিবেন। 'তদর্থেহখিল-চেষ্টিতম্।' ভাগবত-ধর্মের সাধক এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, শ্রীভগবান্ বাসুদেব তাঁহার এই এই কর্ম করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমি তাঁহারই ভৃত্য, তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহার কর্ম করিতেছি মাত্র — নিজ প্রয়োজনে কিছুই করিতেছি না ; আমি আমার নিজের জন্য যাহা করিতেছি, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই কর্ম। কারণ, আমি তাঁহারই। ইহাই ঈশ্বরার্থে কর্ম করা।

গীতা প্রথমে বলিয়াছেন, ফল কামনা না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম কর। তাহার পর বলিয়াছেন, কর্ম কর, করিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর। তাহার পর বলিয়াছেন, আগে নিজেকে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তুমিই তাঁহার হইয়া যাও — তাহার পর তিনি যাহা করান তাহাই কর। প্রথমে বলিয়াছেন স্বধর্মবুদ্ধিতে কর্ম কর। তাহার পর 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' — কর্ম করিয়া উহা আমাকে অর্পণ কর। সর্বশেষ 'মামেকং শরণং ব্রজ' — আমার হইয়া যাও। আমিই সব করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

স্বধর্মবুদ্ধিতে কর্ম করার অর্থ বর্ণাশ্রম-নীতি অনুসারে যাহার যাহা নির্দিষ্ট কর্তব্য তাহা করা। সেই কর্মও ভগবানের অর্চনা-বুদ্ধিতে করিতে হইবে। কর্মের ছোট বড় নাই, কী উদ্দেশ্যে — অন্তরে কী ভাব লইয়া কর্ম করা হইতেছে, তাহাই আসল কথা।

ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার পূজাদি কর্ম উদর-পূর্তির জন্য করেন, তবে তাহা হীন কর্ম। ঝাড়ুদারও যদি তাহার কর্ম ভগবদর্চনা-বুদ্ধিতে করে, তবে তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' ভাগবত-ধর্ম বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু সকল কর্ম সেবাবুদ্ধিতে করিবার উপদেশ দেন। ভাগবত-শাস্ত্র বলেন যে, যাহারা বিদ্যাহীন তাহারাও যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেইজন্য ভগবান্ সুনিশ্চিতভাবে যে-সকল সাধন-ভজনের কথা বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম। এই ধর্ম অবলম্বন করিলে কখনও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয় না। চক্ষু বুজিয়া দৌড়াইলেও এই ধর্ম পালনকারী ভক্ত-সাধকের পদস্খলন হইবে না। আমি তাঁহারই পদাশ্রিত — আমি তাঁহারই করস্থিত যন্ত্রতুল্য। তিনি প্রতিমুহূর্তে যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি, এই বুদ্ধি যাঁহার চিত্তে সর্বদা জাগরূক — সত্য সত্যই সংসার-পথে চক্ষু বুজিয়া ছুটিলেও তাঁহার কখনও আছাড় খাইয়া পতিত হইবার ভয় নাই।

ভাগবত-ধর্মের আর একটি অভিনবত্ব—অবতারবাদ। ভগবান্ আসেন মানব-সমাজের মধ্যে। এই মত ইসলাম-ধর্মাবলম্বিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তিনি নিজে আসেন না,

আসিতে পারেন না — তাঁহার প্রেরিত লোক পাঠান। তাহাও পাঠানো শেষ হইয়াছে। শেষ নবী আসিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টান ধর্মে বলা হয় — ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে একবার মাত্র পাঠাইয়াছিলেন — আর পাঠাইবেন না। মানুষ ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই স্বর্গকে আবার পাইবার পথ করিয়া দিতে — মানুষ ও ভগবানের মধ্যে, আজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত যে বিরাট্ ব্যবধান হইয়াছিল, তাহা দূর করিয়া দিতে — ঈশ্বরের পুত্র আসিয়া ক্রুশে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই আত্মদান দ্বারাই পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়াছে। তাঁহার আত্মদান একটি সেতুস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরভ্রষ্ট মানুষকে আবার তাঁহার নিকট সহজে যাইবার নিশ্চিত উপায় করিয়া দিয়াছে। এই ঘটনা একবারই হইয়াছে, আর হইবে না।

হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব শাক্ত সৌর ও গাণপত্য মতাবলম্বিগণ, বৌদ্ধ ও শিখগণ, ব্রাহ্মসমাজ-ও আর্য-সমাজ — ইঁহারা অবতারবাদের বিরোধিতা না করিলেও নিষ্ঠার সহিত কোন অবতারকে নিজ নিজ সাধন-পথের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করেন না। একমাত্র ভাগবত-ধর্মই অবতারবাদকে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। অবতারবাদই এই ধর্মকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পরবর্তী গৌড়ীয় মতে দেখা যায় যে, একমাত্র অবতারবাদের ভিত্তিতেই ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। অবতার না মানিলে ইহার ভিত্তিই যেন ধসিয়া যায়।

অবতারবাদের মূল তাৎপর্য এই যে, আমার জীবনের ও সমাজের দুর্দশার জন্য আমিই চিন্তিত নই, তিনিও ব্যথিত হইয়া কল্যাণের জন্য নামিয়া আসেন। কেবল একবার আসেন নাই, সাত সহস্রবার আসিয়াছেন ও আরো আসিবেন। ভাগবত বলিয়াছেন 'অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ'।

মানুষকে বলা হইয়াছে সাধন ভজন উপাসনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে। ভাগবত বলেন, তোমার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সামর্থ্যাভাব দেখিয়া তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন। তুমি তাঁহার কাছে যাইতে পার না দেখিয়া তিনি তোমার কাছে আসিয়াছেন। যাহাতে তুমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পার, ভালবাসিতে পার, সেইজন্য তিনি তোমার নিকটতর হইয়াছেন।

ভগবান্ অবতাররূপে আসিয়া নিজ জীবনের আচরণ দ্বারা এমন সব উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন, যাহার আলোকে লোক শত শত বৎসর ধরিয়া পথের সন্ধান পায়। শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, সীতাদেবীর পতিভক্তি, হনুমানের প্রভুভক্তি — সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের যাত্রাপথে উজ্জ্বল বর্তিকা হইয়া রহিয়াছে।

গৌড়ীয় মতের দৃষ্টিতে ভগবান শুধু মানবের কল্যাণের জন্য অবতরণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কর্ম করেন না — প্রেমের সহিত মানুষকে ভালবাসিয়া কর্ম করেন। জীবের দুর্গতি দেখিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। 'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।' যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অন্তরে এক অভাবনীয় ঈশ্বরপ্রেমের উদয় হয়। তাঁহার করুণায় তাঁহাদের জীবন ভরপুর হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্‌কে অবতাররূপে নিজ জন করিয়া পাইবার ফলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম যে কত উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা পরবর্তী ভাষণে বলিব।

* * *

ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ বলা হইল। মধ্য যুগের কথা ও বর্তমান কথা পরবর্তী প্রবন্ধে বলিব। তৃতীয় নিবন্ধে 'ইসলামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালের ভাগবত-ধর্মের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের কথা বলিব। মধ্যযুগ বলিতে আচার্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত ধরিতেছি। এই সময় ভাগবত-ধর্মে চারিটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। প্রাচীন ভাগবত-ধর্মে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহা বাড়িতে থাকে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারি শাখায় বিভক্ত। কালানুক্রমে বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ প্রথম। আজ হইতে প্রায় সাড়ে নয় শত বৎসর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক।

রামানুজের পর নিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হন। কেহ কেহ তাঁহাকে তৎপূর্ববর্তী বলেন। ইনি ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। এখন হইতে ৭৭৫ বৎসর পূর্বে মধ্বাচার্য আবির্ভূত হন। তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য বল্লভ। তিনি ৪৯৬* বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করেন যে, তাঁহারা অতি প্রাচীন ও প্রাচীন কাল হইতে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছেন। রামানুজ শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ধারাকে বলে সনকাদি সম্প্রদায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ পিতার নিকট উপনীত হন। ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করেন। মহাবিষ্ণুও হংসরূপ ধরিয়া আসিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেন। পরে ব্রহ্মা উহা সকনাদিকে দান করেন। নারদ উহা সনকাদির নিকট লাভ করেন। নারদ হইতে নিম্বার্কাচার্য উহা প্রাপ্ত হন।

শ্রীমধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা হইতে শক্তি পরাশর ব্যাস পরম্পরায় উহা প্রাপ্ত। মধ্বাচার্য স্বয়ং ব্যাসদেবের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়। ইনি দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজমন্ত্রীর পুত্র। ইনি বিষ্ণুর অবতারতুল্য পুরুষ ছিলেন। রুদ্রদেব তাঁহাকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। বিল্বমঙ্গল এই মতের প্রচারক ছিলেন। কালক্রমে এই মত লুপ্তপ্রায় হইলে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অনুরোধে বল্লভাচার্য উহা পুনরুজ্জীবিত করেন। বিষ্ণুস্বামী ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি নৃসিংহদেবের উপাসনা করিতেন। বল্লভের মতকে শুদ্ধাদ্বৈত বলে। ইনি জ্ঞান-মার্গ বা ভক্তি-মার্গ কাহাকেও উৎকৃষ্ট না বলিয়া প্রীতিমার্গকে উৎকৃষ্ট বলেন। বল্লভমতে ভক্তি দ্বিবিধ —

* লেখক রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্যের কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ***Indian Philosophy, Vol. II***-তে প্রদত্ত তথ্যের মিল আছে কিন্তু এখানে মিল নাই। তবে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের ***Vaisnavism Saivism and Minor Religions Systems***-গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের সহিত এখানে মিল আছে। রাধাকৃষ্ণনের মতে বল্লভের জন্ম ১৪০১ খৃঃ, ভাণ্ডারকরের মতে ১৪৭৯ খৃঃ। —সঃ

মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। প্রীতিভক্তিই পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে এই পুষ্টিমার্গ লাভ হয়। কৃষ্ণসুখের জন্য নিখিল চেষ্টা। ভগবান্ ভক্তকে গ্রহণ করেন। সাধনে নয়, কৃপায় পুষ্টিমার্গে প্রবেশ।

এই চারি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্যই জ্ঞানবাদী আচার্য শঙ্করের বিরোধী। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' — এই মতবাদের খণ্ডন ইঁহারা প্রায় সকলেই করিয়াছেন। ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ছোট-বড় বিষয় লইয়া অনেক মতানৈক্য আছে। প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তুলিয়া তুলনামূলক আলোচনা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই শঙ্করকে পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্যের মতবাদ লইয়া কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-মন্ত্র সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা এক একজন এক এক প্রকার করেন। মন্ত্রের সহজ অর্থ, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক এবং দ্বিতীয়রহিত। সুতরাং এই মন্ত্রাবলম্বনে অদ্বৈতবাদই আচার্য শঙ্কর সত্য ও সিদ্ধ মনে করেন।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য মনে করেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-মন্ত্র দ্বৈতবাদ-বিরোধী নহে। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ঈশ্বর হইতে অধিক বা তাঁহার সমান বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। ইহাতে জীব ও জগৎ নামক যে আর দুইটি বস্তু নাই, ইহা কিছুতেই বুঝায় না। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম নিয়ামক। জীব আর ঈশ্বব তো সমকক্ষ বস্তু নয় যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিলে জীবও ব্যাবৃত্ত হইবে।

আচার্য রামানুজ বলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-শ্রুতি স্পষ্টত দ্বৈতবাদবিরোধীই বটে।

আচার্যপাদগণ তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। একটি আম গাছের সঙ্গে একটি কাঁঠাল গাছেব যে ভেদ বা পার্থক্য, তাহা স্বজাতীয়। একটি আমগাছের সঙ্গে একটি ঘোড়ার যে ভেদ বা পার্থক্য, তাহা বিজাতীয়। এক আমগাছের কাণ্ডে শাখায় পাতায় পাতায় যে ভেদ, তাহা স্বগত।

আচার্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত। ব্রহ্মের সজাতীয় কোন বস্তু নাই। কারণ ব্রহ্মতুল্য জগতে কেহই নাই, কিছুই নাই। ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ নাই, কারণ তদ্‌ভিন্ন বস্তু আর কোথাও নাই। ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই, কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ— একরস ব্রহ্মে কোনও স্থানের নির্দেশক কিছুই নাই।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্মে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই, একথা সত্য ; কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। বিজাতীয় নহে। চিৎ জীব ও অচিৎ জগৎ ব্রহ্মের শরীরতুল্য। ইহারা ব্রহ্মের দুইটি বিশেষণের মত। সুতরাং ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে।

মধ্ব বলেন, ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ আছে —সজাতীয় স্বগত ভেদ নাই। ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে ভেদ বিজাতীয় ; সজাতীয় বা স্বগত নহে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্রহ্ম স্রষ্টা, জীব ও জগৎ সৃষ্ট। স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুতে কী জাতীয় ভেদ থাকিতে পারে? একজন কুম্ভকার ও একটি মাটির কলসীর মধ্যে কী সম্বন্ধ থাকিতে পারে? সুতরাং স্বগত ভেদ নাই। স্বগত ও স্বজাতীয় কোন ভেদই নাই। একমাত্র জীব ও জগৎ তাঁহার বিজাতীয় ভেদরূপে বিরাজমান।

আচার্য শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম কাহারও কারণ নহেন। উপাদান কারণও নহেন। নিমিত্ত কারণও নহেন। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র—রজ্জু অধিষ্ঠানে যে সাপটি দৃষ্ট হইতেছে — ঐ সাপের উপাদান বা নিমিত্ত কি রজ্জু?* ব্রহ্ম সত্য—অধিষ্ঠানরূপে সত্য, নিমিত্ত বা উপাদানরূপে নহে।

রামানুজাচার্য বলেন, ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি উপাদান কারণ। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। চিদচিৎ বস্তুসমূহ সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর, এই হেতু ব্রহ্মের নিয়ম্য। ব্রহ্ম নিয়ামক।

মধ্ব মতে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ নিত্য সুতরাং তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতঃ জগদ্রূপে পরিণত করিয়া পরিণামের নিয়ামকরূপে থাকেন। জগৎ অস্বতন্ত্র, জগৎ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র, সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

আচার্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই জীবের অবিদ্যা দূর হয়। সুতরাং শুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তিলাভের হেতু। রামানুজাচার্য ইহা স্বীকার করেন না। অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্যও ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রুতিতে যেখানে জ্ঞানদ্বারাই মুক্তির কথা আছে, সেখানে জ্ঞানের অর্থ ধ্যান, উপাসনা। 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থ জ্ঞান মাত্র নহে।

বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে ভক্তি দ্বারা, ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা মুক্তি হয়। শ্রবণ মনন স্মরণ ইত্যাদি উপায়ে মুক্তিলাভ হয়। স্মরণের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত নিরন্তর ঈশ্বর-ধ্যান। উহা করিতে করিতে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। একান্তভাবে ভগবৎ-চরণে শরণাগত হইয়া এই উপাসনা করিতে হয়।

কেবলমাত্র শ্রবণ মনন স্মরণ দ্বারাও ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বর যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহারই নিকট ঈশ্বর আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রিয় ব্যক্তিই বরণীয় হয়। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, সে-ই ঈশ্বরের প্রিয় হয়। সর্বদা ভগবৎ-স্মরণ যাঁহার অতিশয় প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয়, সুতরাং বরণীয়। তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন।

আচার্য শঙ্করের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বন্ধনদশাকালেও সে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং তাহার বন্ধনটা মিথ্যা। এই বন্ধনবোধ অবিদ্যাজাত। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে জীবের বন্ধন পারমার্থিক, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। পাপকার্য ও পুণ্যকার্য বশতঃ মনুষ্যাদি শরীর ধারণ ও কর্মফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের অনুভবই জীবের বন্ধন। সুতরাং বন্ধনকে মিথ্যা বলার উপায় নাই। একমাত্র ভক্তিময়ী শরণাগতি ও উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্ট শ্রীভগবানের প্রসাদেই জীবের বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। উপাসনার অর্থ ঃ স্তুতি নতি কীর্তন অর্চনা ও ধ্যানাদি।

রামানুজ ও মধ্ব উভয়েই একথা স্বীকার করেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পরের ভেদ স্বাভাবিক ও নিত্য। তবে মধ্ব মনে করেন, মুক্তাবস্থাতেও জীবগণের পরস্পরের

* শাঙ্করমতে রজ্জুই সর্পের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ইহা দার্ষ্টান্তিকেও প্রযোজ্য। —সঃ

মধ্যে যে ভেদ তাহা বিদ্যমান থাকে। রামানুজ মনে করেন যে, সমস্ত জীব স্বভাবতঃ সমান। উহাদের ভেদ বদ্ধাবস্থায় শরীরোপাধিবশতঃ। মুক্তাবস্থায় ভেদ নাই, — শরীরোপাধি হইতে বিমুক্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীব সমান।

রামানুজ ও মধ্ব উভয়ের মতেই মুক্ত জীব বহু ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তবে রামানুজ মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দেহ ও দেহীর মত একটা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করেন। মধ্ব তাহা করেন না। মধ্ব মুক্ত জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধও নিয়ম্য-নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করেন।

মধ্বাচার্য পঞ্চভেদবাদী। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবের ও জগতের ভেদ, জীবগণের পরস্পরের ভেদ, জগতের ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের পরস্পরের মধ্যে ভেদ। এই পঞ্চভেদ মধ্বাচার্যের মতে সত্য এবং নিত্য। এই পঞ্চপ্রকার ভেদের জ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে — ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। রামানুজমতে মুক্ত পুরুষ জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন।

যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন ও জীব ও ব্রহ্মের একত্বের কথা বলেন, মধ্বাচার্য তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরাধীন বদ্ধ স্বল্পজ্ঞ স্বল্পশক্তি এবং সদোষ। আর পরমাত্মা স্বাধীন স্বতন্ত্র চিরমুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমামৃতময়। এই দুইকে যাহারা অভিন্ন দেখে তাহারা দুষ্কৃতকারী।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী। তিনি বলেন, জীব ও ঈশ্বরের কোন কোন অংশে অভেদ আছে; কোন কোন অংশে ভেদ আছে। ইহাই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতিমন্ত্র তুলিয়া বিশেষভাবে বিচার করিয়া নিম্বার্কাচার্য অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন যে, ভেদাভেদবাদই শ্রুতির প্রতিপাদ্য।

নিম্বার্কাচার্য কোথাও শঙ্করমতের সমালোচনা বা খণ্ডন করেন নাই। ইহাঁ হইতে মনে হয়, তিনি শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী। পরবর্তী হইলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে বাধ্য হইতেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে নিম্বার্কের নাম নাই। বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে নিম্বার্কের সময় একাদশ শতাব্দী নির্ণীত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্যের মতে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্ ও সগুণ ; আবার জগতের অতীত, এজন্য নির্গুণ।

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নির্বিকার—এ কথায় সকল বৈষ্ণবাচার্যগণই একমত।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যযুগ ধরিয়া লইয়াছি। রামানুজাচার্য হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত এই যুগ। এই পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ের প্রকাশ। ইহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে বৈষ্ণবধর্মে যে মহাপ্লাবন আসে সেই কথা বলিব।

মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃঃ আবির্ভূত হন। তাঁহার মহাদান রাগভক্তি বা উজ্জ্বলরস-প্রধান প্রেমভক্তি। এই পরম ধনের সন্ধান ইতিপূর্বে আর কেহ দেন নাই। তবে এই সম্পৎকে যদি কৃষ্ণভক্তি-রসতরু বলি, তাহা হইলে ইহা প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর জীবনে।

মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি মহাপ্রভুকে আহ্বান করিয়া জগতে আনয়ন করেন, সেই অদ্বৈতাচার্যও মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে যিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ সহায় সেই নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গেও

দাক্ষিণাত্যে মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর কথা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ

"মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনমাত্র হয় অচেতন।।"

এই যে মেঘদর্শনে অচেতন অবস্থা, ইহা একটি আশ্চর্য সংবাদ। জগতের ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি দর্শন স্পর্শনে ভূমার কথা মনে জাগ্রত হওয়া এবং তাঁহার প্রতি চিত্তের গভীর আকর্ষণে বাহ্য চেতনাশূন্য হইয়া যাওয়া, ইহা একটি অপূর্ব জীবন-দর্শন।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি।।" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে-বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তাহাই চিত্তে পরমারাধ্য পরম বস্তুর কথা জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কথা অন্তরে উদিত হওয়ায় এমন প্রবল ভাবের আবেশ আসে যে, আর সকল বিষয়বস্তু দূরে সুদূরে চলিয়া যায়। আনন্দে জীবন ভরিয়া উঠে। অনিত্যের মধ্য দিয়া নিত্যবস্তুর অনুভূতি ও সেই অনুভূতির নিবিড় আস্বাদনে জীবন ঈশ্বরভাবময় হইয়া যাওয়া — ইহা এক অভূতপূর্ব সংবাদ। এই সংবাদ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

সত্যদর্শন, জীবনসাধনা ও গভীর রসানুভূতি— এই তিনের মিলনময় এই যে আধ্যাত্মিক তপস্যা, ইহার শেষ রূপায়ণ রসপ্রস্থানে। শাস্ত্রে তিনটি প্রস্থানের অনুশীলন আছে — শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব রসপ্রস্থান নামক চতুর্থ প্রস্থানের আবিষ্কারক ও উদ্‌গাতা।

রসপ্রস্থানের ভিত্তি শ্রুতি। অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বস্তুর তিনটি প্রকাশ — অস্তিত্ব, ভাতি ও প্রিয়ত্ব। অস্তি—ব্রহ্মবস্তু আছেন, চিরকাল আছেন চির বিদ্যমান আছেন। তাঁহার থাকার বাঁধ নাই বিরতি নাই, শেষ নাই। ভাতি—ব্রহ্মবস্তু শোভমান, স্বস্বরূপে প্রকাশমান, সর্বাতিশায়ী উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান। প্রিয়ম্—ব্রহ্ম বস্তু প্রিয়, ভালবাসার বস্তু, অনুরাগের বিষয়, গভীর প্রেমের পাত্র। ব্রহ্ম কত প্রিয়? "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ"— আত্মজ হইতে প্রিয়, সকল সম্পদ্ হইতে প্রিয়, সংসারে অন্য যাহা কিছু আছে সকলের অপেক্ষা প্রিয়। অর্থাৎ তিনি প্রিয়তম।

ব্রহ্মবস্তু সর্বাপেক্ষা বড়, ইহাই জানা আছে। এখানে জানা গেল, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নহেন, পরম প্রেষ্ঠও বটেন। তিনি শুধু পরম কারণ — কারণের কারণ নহেন, তিনি প্রেমময় মধুময় রসময়। তিনি রসস্বরূপ তিনি রসিক। তাঁহার সান্নিধ্যে নিরানন্দ প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। এই রসতত্ত্বের উপর রসপ্রস্থানের ভিত্তি।

শ্রুতিপ্রস্থানের ভিত্তি অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্, স্মৃতিপ্রস্থানের ভিত্তি পদ্মনাভের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা গীতা, ন্যায়প্রস্থানের ভিত্তি পঞ্চশত পঞ্চান্নটি ব্রহ্মসূত্র — 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হইতে 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' পর্যন্ত। রসপ্রস্থানের অবলম্বন পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীরূপ-সনাতনের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত। ইহার দার্শনিক রূপকার শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রসপ্রস্থানের আসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া ও তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পার্ষদগণকে লইয়া। পূর্ববর্তী মহাসাধক মাধবেন্দ্র পুরী,

ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈতাচার্য ; পরবর্তী শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ; পূর্ববর্তী রসজ্ঞ জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি; পরবর্তী শতাধিক বৈষ্ণব কবি। কোথা হইতে প্রেমের বন্যা আসিল, কোথায় সব ডুবিয়া গেল, কেমনে কী হইল, ইহা এক যুগবিস্ময়।

শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিক মতের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। ইহাতে নূতন কথা যে খুব বেশী আছে, তাহা নহে। তৎপূর্বে ভাস্করাচার্য নিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন। 'অচিন্ত্য' শব্দটি যোগ করিয়া শ্রীজীব যে কী বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বলিব। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'প্রীতিসন্দর্ভ'। প্রীতি বা প্রেম চিত্তের একটি বৃত্তি বা emotion। শ্রীজীব প্রেমকে দার্শনিক ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করিয়াছেন। গুটিকতক সারাৎসার সত্যের উপর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দণ্ডায়মান ঃ

১। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। ইহার ভিত্তি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ভাগবতের এই উক্তি।

২। পরতত্ত্বের তিন রূপ — ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্।

৩। পরতত্ত্বের পরা শক্তির তিনটি শক্তি — স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

৪। আর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় — 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা'।

শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্ পরমারাধ্য। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব। তিনি বেদান্তের ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান্। তিনি অবতারী, সর্ব কারণের কারণ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে—নিত্য শাশ্বত হানোপাদানরহিত। তিনি সাকার নহেন, নিরাকার নহেন, চিদাকার—চিদ্‌ঘনাকার। 'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।'

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গার অপর নাম স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। বহিরঙ্গার অপর নাম মায়াশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি। তটস্থা শক্তির অপর নাম জীবশক্তি। এই শক্তিগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক ভেদ ও অভেদ। এই ভেদাভেদ বুদ্ধিগম্য নয়। রসভূমিতে অনুভববেদ্য।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিন ভেদ—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবান্ যে শক্তির দ্বারা সমস্ত সত্তাকে ধারণ করেন এবং করান, দেশ-কাল ও সকল বস্তুজগৎ যাহাতে প্রকটিত হয়, তাহা সন্ধিনী শক্তি। "যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব-দেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকারিণী সন্ধিনী।" ভগবানের সত্তাবিষয়িণী সামর্থ্যই সন্ধিনী শক্তি। যে-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে জানেন ও অপরকে জানাইতে পারেন, সেই শক্তি সংবিৎ শক্তি। "যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সংবিৎ।" ভগবানের জ্ঞানবিষয়িণী যে সামর্থ্য, তাহা সংবিৎ শক্তি। যে-শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন করেন ও অপরকে আনন্দ উপভোগ করান তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। "যয়া হ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনী।" হ্লাদিনী শ্রীহরির আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি।

এই আনন্দ-শক্তিকে সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীরাধা। শক্তি সকল সময়ই তাঁহার মধ্যে অমূর্তরূপে আছে। অমূর্তরূপে থাকায় আস্বাদনের পূর্ণতা হয় না। তাই শ্রীরাধারূপে মূর্ত করিয়া লইয়াছেন। যখন মূর্ত হইয়াছেন, তখনও অমূর্তরূপে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত, শ্রীরাধার বিগ্রহও তদ্রূপ আনন্দশক্তি-ঘনীভূত। আনন্দশক্তির মধ্যে সৎ ও চিৎ শক্তি সর্বদাই রহিয়াছে। কোন বস্তুর সত্তা আছে, কিন্তু চেতনা নাই, এমন সম্ভব ; কিন্তু চেতনা আছে সত্তা নাই, ইহা সম্ভব নয়। তদ্রূপ সৎ ও চিৎ আছে, আনন্দ নাই, ইহা সম্ভব ; কিন্তু আনন্দ আছে, সত্তা ও চেতনা নাই এমন সম্ভব নহে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ। সুতরাং অচিন্ত্য ভেদাভেদ। রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু, শুধু আস্বাদনের জন্য দুই। আনন্দ আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কার্য। সুতরাং শ্রীরাধা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই নহেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে শ্রীরাধা শ্রীরাধাই নহেন। একে অন্যের পরিপূরক, এই জন্যই ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদ বুদ্ধিবিচারের অগম্য। দুই-ই যখন আনন্দ আস্বাদনে এক হইয়া যান এবং এক হইয়াও দুই থাকেন, তখনই ঐ ভেদাভেদ অনুভববেদ্য। চিন্তার অতীত, রসানুভবে বেদ্য, এই জন্য অচিন্ত্য।

জীবের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অচিন্ত্য ভেদাভেদ। জীবও একটি ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ। এই অংশে অভিন্ন। আর জীব অণুচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য। এই অংশে ভেদ। এই ভেদাভেদ অনুভূতি রসভূমিতে লাভ করা যায়। ইহা বিচার বা চিন্তার অতীত। বিচার-বুদ্ধির মন্তব্য ভেদ ও অভেদ বিরোধী, একই সময় সম্ভব নয়। এই যুক্তি দ্বারাই শঙ্করাচার্য ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইলেও, অচিন্ত্য হইলেও, ভেদাভেদ রসভূমিতে অনুভববেদ্য। প্রেম দু'টি বস্তুকে এক করে, আবার ভোগের জন্য পৃথক্ রাখে। সুতরাং অভেদরূপে একত্বের ও ভেদরূপে পৃথক্ত্বের আস্বাদন একই সময় ঘটে।

জীবকে রসভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে আনন্দঘনকে আস্বাদনের জন্য। জীব তটস্থা শক্তি। তট জলভাগের মধ্যেও নয়, জলভাগ হইতে দূরেও নয়। জীব তটস্থ—উভয় কোটিতে অনুপ্রবিষ্ট। অন্তরঙ্গা শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী জীবশক্তি। মায়াশক্তির অভিমুখী হইলেই জীবের দুঃখ আরম্ভ। আর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির অভিমুখী হইলেই আনন্দাস্বাদন।

আনন্দশক্তি-মূর্তি শ্রীরাধা। তাঁহার কার্য শ্রীকৃষ্ণেরে সুখ-বিধান-রূপ আরাধনা। তাঁহার আর একটি কার্য ভক্তের সুখ-বিধান। শুদ্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারিলেই জীবের আনন্দ ও পরাশক্তি লাভ। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা দ্বারা আনন্দ দিতে হইলে জীবের শ্রীরাধার সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। রাধা-ভাবনায় রাধা-ভাবময় হইতে হইলে, চাই শ্রীরাধার আনুগত্য। আনন্দশক্তি শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও সুখবিধানই জীবের চরম পুরুষার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে জগতে প্রকট না হইলে রাগমার্গের ভক্তিধারা প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব হইত। জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস সখা পিতামাতা ও কান্তা প্রভৃতি পরিকরগণ লইয়া অপূর্ব প্রেমের লীলা প্রকটিত করেন। সেই সব লীলা শ্রবণ করিলে দেখা যায়, পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না — গভীর প্রেম এই ঈশ্বরবুদ্ধি ঢাকিয়াছিল — অথবা ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকার জন্য প্রেম সুগভীর হইতে পারিয়াছিল। লীলাশ্রবণে দেখা যায় যে, পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে একবিন্দুও নিজ সুখানুসন্ধান ছিল না। প্রেমের কৃষ্ণবশীকরণ-সামর্থ্য দেখিয়া, প্রেম সেবায় অসমোর্ধ্ব আনন্দের আস্বাদন অনুভব করা যায় বুঝিয়া, ভক্ত-সাধক শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-ভক্তগণের আনুগত্যে রাগানুগমার্গের ভজনে লুব্ধ হইয়া থাকেন। এই লোভই অনুরাগময় প্রীতির

জনক। সুতরাং অবতাররূপে শ্রীভগবান্ প্রকটলীলা না করিলে রাগমার্গ সুদৃঢ় সুন্দর ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে পারিত না। এইজন্য অবতারবাদ মহাপ্রভুর ধর্মমতের প্রাণ।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু অপূর্ব অভূতপূর্ব অবতার। তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাও পূর্বে অজ্ঞাত, অনর্পিত। মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব অনুশীলনে জানা যায় শ্রীরাধার মহাভাব কত গভীর। সেই মহাভাব আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত লোলুপ। শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা—কৃষ্ণাস্বাদনে অতলস্পর্শী সুখের মাধুর্য—জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরও কামনা। ভক্ত-ভগবান্‌কে লইয়া প্রেমের লীলা কীরূপ, মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই সকলই শাস্ত্রীয় মতবাদ।* কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শুধু শাস্ত্রীয় মতবাদ নহে। মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গৌরাঙ্গসুন্দরে মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরাধা আরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য। ইঁহাদের মিলনের চরম ভূমিতে একাত্মতা। ইহা অদ্বৈত সিদ্ধান্ত। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একদেহে একীভূত গৌরাঙ্গ হইয়াছেন — ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সার্থক হইয়াছে। আবার এক হইয়াও তাঁহারা দুই রহিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও রাধাভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতেছেন — কখনও কৃষ্ণভাবে 'রাধে রাধে' বলিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। সুতরাং দ্বৈতও রহিয়াছে। চরম মিলনেও দ্বৈত নাশ হয় না — ইহা দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। সুতরাং মহাপ্রভুতে দ্বৈতসিদ্ধান্তও সার্থক হইয়াছে।

শঙ্কর বলেন, দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ হইতে পারে না, কারণ তাহা বিরোধী। বিরোধী দুই বস্তু একত্র থাকিতে পারে না—Law of contradiction অনুসারে বিরোধিতা একত্র থাকিতে পারে না।

এই যে পারে না—ইহা বুদ্ধি-বিচারের কথা। চিন্তারাজ্যের কথা। চিন্তারাজ্যে সম্ভব নয় এক হইয়াও দুই থাকা, কিন্তু প্রেমানুভূতির রাজ্যে মহাভাবের সমুদ্রে দুই থাকিয়াও এক হওয়া সম্ভব — ইহা অনুরাগভূমির গভীর অনুভূতিগম্য ; 'অচিন্ত্য' শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে। চিন্তারাজ্য আর প্রেমানুভূতি রাজ্য উভয়ই অন্তঃকরণের রাজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেনঃ যখন ব্রহ্মে দ্বৈতাভাস হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত আত্মাই হইয়া গেল তখন কী দিয়া কাহাকে দেখিবে, কী দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, ইত্যাদি।

যতক্ষণ রসাস্বাদন ততক্ষণ মন সক্রিয়—ততক্ষণ ভেদ। মহাভাবের অবস্থায় ও মন কারণশরীরে—'ভাগবতী তনু'তে তখনও ভেদ। ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তাঁহার মন মহাকারণে লীন হইত—বেদান্তে যাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়, তখনই অভেদ — প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের 'ত্রিরূপভঙ্গ'। জীবের মহাভাব হয় না, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি

* এইগুলি শুধুই শাস্ত্রীয় মতবাদ নহে — শঙ্কর, মধ্ব ও নিম্বার্কের জীবনে ইহারা রূপায়িত। এই সকল মহান আচার্যগণ অনুভূতি না করিয়া কোন মতবাদই প্রচাব করেন নাই। স্ব স্ব মতবাদের তাঁহারা মূর্তবিগ্রহ রূপ। —সঃ

হইতে পারে। তবে জীব সেই সমাধি হইতে সাধারণ ভূমিতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষরাই ভেদ হইতে অভেদ এবং অভেদ হইতে ভেদে — লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায় — যাতায়াত করিতে পারেন। জীবের পক্ষে এই ভেদাভেদ অবশ্যই — 'অচিন্ত্য'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ 'আমাদের ভেদ ও অভেদের মধ্যে একটা প্রাচীর নাই।' আমাদের মতে ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ।* গভীরতম প্রেমের শক্তিতে মাদনাখ্য মহাভাব রসরাজ দুই এক হইয়াও আস্বাদনে দুই হইয়াও আস্বাদনে দুই রহিয়াছেন। এইজন্য বলিয়াছি, মহাপ্রভুর স্বরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ মূর্তিলাভ করিয়াছে। ❑

* চিন্তারাজ্য আর প্রেমানুভূতির রাজ্য উভয়ই অন্তঃকরণের রাজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন ঃ যখন ব্রহ্মে দ্বৈতাভাস হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপকে শোনে, একে অপবকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত আত্মাই হইয়া গেল তখন কী দিয়া কাহাকে দেখিবে, কী দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ইত্যাদি।

যতক্ষণ রসাস্বাদন ততক্ষণ মন সক্রিয়—ততক্ষণ ভেদ। মহাভাবের অবস্থায়ও মন কারণ শরীরে—'ভাগবতী তনুতে—তখনও ভেদ। ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তাঁহার মন মহাকারণে লীন হইত—বেদান্তে যাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়, তখনই অভেদ—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের 'ত্রিরূপভঙ্গ'। জীবের মহাভাব হয় না, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি হইতে পারে। তবে জীব সেই সমাধি হইতে সাধারণ ভূমিতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। অবতার বা অবতাকল্প পুরুষরাই ভেদ হইতে অভেদ এবং অভেদ হইতে ভেদে—লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায়—যাতায়াত করিতে পারেন। জীবের পক্ষে এই ভেদাভেদ অবশ্যই—'অচিন্ত্য'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ 'আমাদের ভেদ ও অভেদের মধ্যে একটা প্রাচীর নাই।' আমাদের মতে ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ।—সঃ

ভাগবত পরিচায়িকা

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগ্রন্থগণের শিরোমণি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা। আচার্যেরা গ্রন্থ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অভিন্ন কহিয়াছেন। গ্রন্থ আত্মপরিচয় দিয়াছেন, বেদকল্পতরুর বিগলিত ফল। লীলানায়ক শ্রীকৃষ্ণও নিগমকল্প-বৃক্ষের স্বেচ্ছায় ধূলায় গড়ানো মধুর পক্ক ফল।

গাছের ফল পাই দুই প্রকারে। আঁকশি দিয়া টানিয়া নামাইয়া কিংবা সুপরিপক্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। প্রথমটি চেষ্টার ফল, দ্বিতীয়টি কৃপার দান। ভাগবত ও তাঁর দেবতা প্রয়াস-সাধ্য বস্তু নহেন, প্রসাদলব্ধ মহাসম্পদ্।

কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন কৃপায় নামিয়া—"অনুগ্রহায় ভূতানাম্"। বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ যমুনাতটে প্রকট হইয়াছিলেন স্বীয় স্বতঃ ইচ্ছায়। কংসের অত্যাচারে পীড়িত মানুষের অন্তর তাঁহারে চাহিয়াছিল। ধরণী বেদনায় কাঁদিয়াছিল। সে কান্নার সুর ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

* *'সহস্র শ্লোকী ভাগবত' (৩য় খণ্ড)। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৩নং অন্নদা নিয়োগী, বাগবাজার, কলকাতা - ৩ (১৩৭২)। সম্পাদক মণ্ডলী ঃ শ্রীমৎ যতীন্দ্ররামানুজাচার্য (সভাপতি), ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীসুরে- ন্দ্র দাস ও শ্রীমৎ নৃসিংহরামানুজ দাস।*

এ সব ঘটিয়াছি আনুষঙ্গিক। আসিয়াছিলেন তিনি গলিয়া পরম করুণায় ঝরিয়া।

আসিয়াছিলেন ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে কারাগৃহের রুদ্ধ করে বাদলঘন নিশীথ অন্ধকারে অনাদরে অনাড়ম্বরে। অতীব-রহস্যাবৃত তাঁহার গমনাগমন। জন্ম-কর্ম তাঁহার দিব্যাতিদিব্য; জড়ীয় বা ভৌম নহে। ভূমির মানুষের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। তবু আমরা ধূলার হইয়াও তাঁহাকে বুঝিতে চাই। আসিলেন তিনি কংসালয়ে, চলিয়া গেলেন নন্দালয়ে; আসিলেন ভোগময় মহানগরে, চলিয়া গেলেন শ্যামলঘন পক্ষে প্রান্তরে। আসিলেন ভোগসর্বস্ব কংসরাজের আসুরিক সম্পদের আবেষ্টনে, চলিয়া গেলেন ত্যাগসর্বস্ব নন্দরাজের দৈবী সম্পদের অন্তর-আকর্ষণে। আসিলেন বন্ধনে, চলিয়া গেলেন মুক্ত অঙ্গনে, শত শোভাময় ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে।

প্রেম-প্রীতিধনে ধনী গোপপল্লীতে গিয়া বর্ষণ করিলেন মধুমাখা লীলামৃতধারা। দশ বৎসর আট মাস পর ফিবিলেন আবার কংসভবনে—মূর্তিমান মৃত্যু হইয়া, মৃত্যু-উপহার লইয়া ('মৃত্যুর্ভোজপতেঃ')। যাঁহারা ভাবসম্পদে সম্পন্ন, তাঁহাদের অন্তরে ঢালিলেন অমৃত। যাহারা রাক্ষসীবলে দুর্দমনীয়, তাহাদের উপরে হানিলেন মৃত্যুর আঘাত।

ভক্তজনের গৃহে নাচে ছন্দদুলাল নন্দদুলাল, ব্রজের কালো বালক। অভক্তের গৃহে হানা দেয় বজ্রকঠোর কাল পুরুষ—

"অন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ
প্রযচ্ছতু মৃত্যুমুতমমৃতঞ্চ।"

অন্তর্মুখী বহির্মুখী দু'জনের গৃহেই উদয় হন। বিতবণ করেন কখনও অমৃত, কখনও মৃত্যু। নন্দগোষ্ঠী পাইল অমৃত। কংসগোষ্ঠী পাইল মৃত্যু।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে একই কালে দুইটি মূর্তি প্রকট করিয়াছেন। প্রাণপ্রিয় অর্জুনের বিষাদ দূর করিয়াছেন কথার অমৃত ঢালিয়া। সুধীজনের জন্য চিরন্তন পানীয় রাখিয়াছেন—"গীতামৃতং মহৎ।" আবার দংষ্ট্র-করাল ভয়াল বদন দেখিয়া অর্জুন সভয়ে শুধাইয়াছেন তদীয় পরিচয়—"কো ভবানুগ্ররূপঃ"?। উত্তর আসিয়াছে বজ্রগম্ভীর রবে—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ"। মহাকাল পুরুষ আমি, ধ্বংস করাই আমার কার্য। মৃত্যুময় মূর্তি দেখিয়া অর্জুন কাঁপিয়াছেন ভয়ে ভয়ে, অগ্রে পশ্চাতে লুটাইয়াছেন। আবার অমৃতঘন সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ভয়-ব্যাকুল পার্থবীর। শ্রুতি তাঁহাকে 'আনন্দময়' বলিয়াছেন আবার 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'—উদ্যত বজ্রের মত ভয়ানকও বলিয়াছেন। তাঁহার বাঁশীর তানে বিশ্ব মুগ্ধ—সুদর্শনের গর্জনে দুর্বৃত্তদল স্তব্ধ। গোপিকা অভিসার করিয়াছেন, প্রেমে পুলকিত। কাল-যবন ছুটিয়া পলাইতেছেন, মহদ্ভয়ে শঙ্কিত। শরণার্থীর আশ্রয়দাতা—

"অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা"।

একই কালে অধৃষ্য ও অভিগম্য' মহাসাগরের মত। রত্নের লোভে ডুবুরি ডুবায়, আর হাঙ্গরের ভয়ে স্নানার্থী দূরে রয়। মাধুর্য আকর্ষণ করে, ঐশ্বর্য ঝলসাইয়া দেয়। একই সময় মল্লরা দেখে অশনি, রাজারা দেখে নৃপমণি, যোগীরা দেখে ব্রহ্মণ্যদেব, নারীরা দেখে কামদেব। এমন মিলনময় পরম চরিত্রের জুড়ি ইতিহাসে আর কোথায়?

আর্যশাস্ত্র অসংখ্য মহৎ চরিত্রের প্রদর্শনী। চারিদিকে গ্যালাবি। একদিকে দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহারা কর্মে বড়, পরাক্রমে মহান্, শৌর্যে-বীর্যে শ্রেষ্ঠ—রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু শিশুপাল। আর এক দিকে দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহারা তপস্যায় বড়, সাধনায় মহান্, ব্রহ্মবীর্যে গরীয়ান্—ব্যাস, শুক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও নারদ। অপর দিকে উভয়কে ছাড়াইয়া উচ্চশীর্ষে শোভা পাইতেছেন, যাঁরা এই দুইয়ের মিলনে মহীয়ান্, ক্ষাত্রবীর্যে অপরাজেয়, ব্রহ্মণ্য বীর্যে মহাঋষি—ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও জনক। ইঁহাদের যেমন ধনুকের গৌরব, তেমনই জ্ঞানের সৌরভ। আর একদিকে আলো করিয়া আছেন যাঁহারা বিনয়ে নতশির, চিত্তেব অনুভূতিবৃত্তিতে ভাস্বর ভক্তসমাজ—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, বিদুর ও অম্বরীয।

ইঁহাদের সর্বোপরি সর্বোচ্চ আসনে বিরাজমান একজন, একজনই। তাঁহার শৌর্যে কংস-শিশুপালের মত বীরগণ মৃত্যু আলিঙ্গন কবিয়াছেন। তাঁহার গুণ গাহিয়া ব্যাস, শুক ও নারদ কৃতার্থ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম তাঁহার ভক্ত, অর্জুন তাঁহার শিষ্য। তাঁহার রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও উদ্ধব ধন্য। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নিজেই নিজের উপমা।

ব্রজে যিনি গোপবালক বৈশ্য, দ্বারকায় তিনি রাজ্যপালক ক্ষত্রিয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যিনি মহোপদেশক—গীতার উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্তবিগ্রহ, রাজসূয় যজ্ঞে তিনিই ভৃঙ্গার হস্তে পাদ-প্রক্ষালক শূদ্র। চারিবর্ণের সমবায়ে সর্ববর্ণনাতীত পুরুষ-শিরোমণি।

তিনি দুর্যোধনের রাজভোগ ফেলিয়া ভক্ত বিদুরের অন্ন যাচিয়া খান। তিনি দ্বারকার সিংহাসনারূঢ় থাকিয়া সুদাম বিপ্রের চিপিটক কাড়িয়া খান। তিনি অগ্রজ বলদেবকে ভয় করেন। কৃষ্ণার সঙ্গে কৌতুক করেন। আপনার গোষ্ঠী দুর্দান্ত দেখিযা নিজে তাঁহাদেব বিনাশের ব্যবস্থা করেন।

তিনি মুক্তিদাতা হইয়াও দামবদ্ধ। লক্ষ্মীকান্ত হইয়াও চৌরাগ্রগণ্য। তিনি সত্যসংকল্প হইয়াও ভক্তের বাক্য রক্ষার্থ নিজ বাক্য তুচ্ছকারী। যে জরাব্যাধ তাঁহার শ্রীচরণে শেয বাণ নিক্ষেপ করে, তাঁহাকে তিনি আদেশ করেন—পরম সুকৃতিলভ্য স্বর্গভূমিতে গমন কর—"যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্।"

যিনি মহাভারত বা বৃহত্তর ভারত ভূখণ্ডের বিরাট্ সংস্কৃতির মহানায়ক, ভারতীয় কৃষ্টি-কীর্তিকার তিনিই ছন্দ, রত্নমালিকার তিনিই সূত্র। জাতির অখণ্ডতাব তিনি মহাপ্রাণ। তিনিই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের অমৃতময় দিব্যলীলা-কথাই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা ভক্তিমার্গের সাধকমাত্রেরই উপজীব্য।

পরমভাগবত শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার আজীবন শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনের দ্বারা জনগণের সেবায় ব্রতী। সুবিশাল ভাগবতরস-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি যে সহস্রশ্লোকী ভাগবত পরিবেশন করিতেছেন, তাহা যে অমৃত-ই তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংক্ষুব্ধ অশান্ত জগজ্জীব নিয়ত এই ভাগবতসুধার আস্বাদনে সঞ্জীবিত ও পরা শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। ❑

শ্রীবৃন্দাবনের সপ্ত দেবালয়

শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলে প্রথমেই শ্রীশ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনকে দর্শন ও প্রণাম করিতে হয়। শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রণাম শ্লোক—

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।।" চৈঃচঃ ১/১/৫

আমি গতিশক্তিহীন এবং মন্দমতি, কিন্তু আমার একমাত্র গতি ও সর্বস্ব যাঁহার পাদপদ্ম, সেই কৃপালু শ্রীশ্রীমদনমোহনেব জয় হউক।

শ্রীশ্রীগোবিন্দেব প্রণাম শ্লোক—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যং কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।"

—পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নিম্নদেশে পরম সুন্দর রত্ন মন্দির মধ্যস্থ সিংহাসনে আসীন প্রিয় সখীগণ কর্তৃক পরিসেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীগোপীনাথের প্রণাম শ্লোক—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ।।

—বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত বেণুধ্বনিদ্বারা কান্তাভাববতী গোপীদিগের আকর্ষণকারী রাসরস প্রবর্তক সেই গোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন।

এই তিনটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণের পর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ শ্রীশ্রীগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইয়া এই তিনমূর্তি অবশ্যাই দর্শন করিতে হয়। এই তিন বিগ্রহ দর্শন করিলে পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়। কেন দর্শন করিতে হয় তাহারও একটি ইতিহাস আছে।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন। তাহার পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভের ইচ্ছানুযায়ী বিশ্বকর্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ হইল। সেই সময় একজন ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন—তিনি অনিরুদ্ধের সহধর্মিণী শ্রীমতী উষাদেবী। উষাদেবীকে মূর্তি দেখানো হইল, তিনি বলিলেন—শুধু মুখখানি হইয়াছে, আর কিছুই ঠিক হয় নাই। আর একখানি তৈয়ারী করা হইল। দ্বিতীয়খানি দেখিয়া বলিলেন—শুধুর বুকের দিক্‌টা হইয়াছে। আর একখানি তৈয়ারী কর। তৃতীয়খানি দেখিয়া বলিলেন, এবারে চরণ দু'টি হইয়াছে। তিনি বলিলেন, এইবার এই তিন মূর্তি তিন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। এই তিন মূর্তির নাম শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন। গোবিন্দের মুখ, গোপীনাথের বুক ও মদনমোহনের শ্রীচরণ দর্শন করিলে পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়।

"এই গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন বিগ্রহ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনধাম জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বয়ং এবং পরে তাঁহার পার্ষদগণকে ব্রজে পাঠাইয়া লুপ্ততীর্থ

উদ্ধার করাইয়াছেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রমুখ সকলেই প্রভুর আদেশে জঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবনে আগমন করেন। তাঁহাদের দ্বারা যে সাতটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সেই মন্দিরগুলির নামই সাত দেবালয়। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধারমণ, শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীগোকুলানন্দ। এই দেবালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেন যথাক্রমে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীমধু পণ্ডিত, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

এই প্রতিটি মন্দির প্রতিষ্ঠার এক একটি সুন্দর কাহিনী আছে। এই ইতিহাস জানিয়া দর্শন কবিলে সত্যকার সার্থক দর্শন হয়। প্রত্যেকটি মন্দিরের বিগ্রহপ্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার কথা অতি মনোগ্রাহী।

১। **শ্রীগোবিন্দ**—শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেন ঐ বিগ্রহগণের অনুসন্ধানে। একদিন যমুনাতীরে বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন, তখন একজন ব্রজবাসী আসিয়া বলিলেন, ঐস্থানে গোমটিলা নামক স্থানে বনের মধ্যে একটি গাভী নিত্য গিয়া দুগ্ধক্ষরণ করেন। ঐটিই গোবিন্দের স্থান। কথাটি জানাইয়াই ব্রজবাসী অন্তর্হৃত হইলেন। শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনা লাভ করিয়া বুঝিলেন, গোবিন্দ নিজেই নিজের গুপ্তস্থান দেখাইয়া দিলেন। সেইস্থান খনন কবিয়া পরমসুন্দর শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হইলেন। গোবিন্দমন্দিরেব মধ্যে ঐ স্থানটি অদ্যাপি যোগপীঠ নামে খ্যাত আছে। প্রথমতঃ গোবিন্দজীকে একটা প্রকোষ্ঠে রাখেন। তৎপর মান সিংহ বিরাট, মন্দির করিয়া দেন। ঔরংজেবের অত্যাচারে ঐ মন্দিবের প্রভূত ক্ষতি হয়। বর্তমানে জয়পুরে গোবিন্দজী আছেন। প্রতিভূ মূর্তি বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর ঃ শ্যামানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। শ্যামানন্দ প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য। গুরুদেব তাঁহাকে পদব্রজে ব্রজে পাঠাইয়া দেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দকে নিকুঞ্জবন ঝাড়ুসেবায় নিযুক্ত করেন। একদিন ঝাড়ু দিতে গিয়া শ্রীরাধাঠাকুরানীর একটি নূপুর পান। ললিতা আসিয়া নূপুর চাহিলে শ্যামানন্দকে দর্শন দেন ও তাহার ললাটে নূপুর দ্বারা দাগ দেন। তাহা তিলকের আকার ধারণ করে। শ্রীরাধাঠাকুরানীর পরম কৃপাপাত্র শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠিত এই শ্যামাসুন্দরমূর্তি অতি মনোহারী শ্রীবিগ্রহ। শ্যামানন্দের পূর্ব নাম দুঃখী, পরে নাম হয় শ্যামানন্দ। শ্যামা-শ্রীরাধা আনন্দদানকারী।

২। **শ্রীগোপীনাথজী**—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গণ শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে শ্রীগোপীনাথজীউকে প্রাপ্ত হন বংশীবটে। গোপীনাথের প্রণামমন্ত্রে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ'। বংশীবটে যে স্বরূপে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হন তিনিই গোপীনাথ। পরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় গোপীনাথ লাভ করিয়া গদাধর প্রভুর শিষ্য মধুপণ্ডিতকে প্রথম সেবাইত নিযুক্ত করেন।

৩। **শ্রীমদনমোহন**—শ্রীমদনমোহনকে প্রকট করেন শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণ মথুরার এক চৌবের গৃহ হইতে। চৌবের গৃহিণী মদনমোহনের সেবা করিতেন, তাঁর কোন নিয়মনিষ্ঠা ছিল না। মদনমোহন সনাতনকে স্বপ্নে আদেশ করেন আমাকে আনিয়া তুলসী-জলে সেবা কর। অনুরূপ

স্বপ্ন চৌবের গৃহিণীকেও জানান। তিনি সনাতনকে আনন্দে বিগ্রহ দান করেন। তিনি আনিয়া দ্বাদশ আদিত্য টীলার উপর এক লতাপাতার ঘর বাঁধিয়া মদনমোহনকে রাখেন।

সনাতন মাধুকরীতে আটা পাইতেন তাহা ডেলা পাকাইয়া আধাপোড়া করিয়া লবণহীন ভোগ দিতেন। মদনমোহন সনাতনের নিকট লবণ চাহিলে সনাতন বলিলেন, তুমি লবণের পর আবার চিনি চাহিবে তোমার এত বায়না আমি মাধুকরী করিয়া যোগাইতে পারিব না। মদনমোহন এক বণিকের জাহাজ যমুনার চড়ায় ঠেকাইয়া দিলেন। বণিক মদনমোহনকে মিনতি করিয়া কহিলেন, এবারে বাণিজ্যে যত উপসত্ব হইবে সমুদয় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বণিক লক্ষমুদ্রা দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেবার শৃঙ্খলা করিয়া দিলেন। পরে অহিন্দুর অত্যাচারে ব্রজের অন্যান্য বিগ্রহের সহিত মদনমোহন জয়পুর চলিয়া যান। করৌলীরাজ গোপাল সিংহ মদনমোহনকে জয়পুর হইতে স্বীয় রাজধানী করৌলীতে লইয়া যান। অদ্যাপি সেইস্থানে মদনমোহন-বিরাজমান আছেন। প্রতিভূ মূর্তি শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত আছেন।

৪। **শ্রীরাধাদামোদর**—শ্রীরাধাদামোদরের বিগ্রহ শ্রীরূপ গোস্বামী নিজ হস্তে নির্মাণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীকে সেবার জন্য প্রদান করেন। বর্তমানে শ্রীজীব-সেবিত বিগ্রহ জয়পুর বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিভূ মূর্তি আছেন।

৫। **শ্রীরাধাবল্লভ**—শ্রীহরিবংশ গোস্বামী কর্তৃক নিকুঞ্জবন হইতে প্রকাশিত এই বিগ্রহ। হরিবংশ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। একাদশীর দিন শ্রীরাধারাণীর চর্বিত তাম্বুল খাইয়াছিলেন বলিয়া গুরু কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। ইঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম রাধাবল্লভী সম্প্রদায়।

৬। **শ্রীগোকুলানন্দজী**—ইনি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীজীর স্থাপিত। গোকুলানন্দজীর পার্শ্বে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আছেন। এই বিনোদকে প্রকট করেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীকিশোরী কুণ্ডের নিকট বিনোদজী প্রকটিত, হন। লোকনাথ গোস্বামীজী শ্রীবিনোদকে বক্ষে ধারণ করিয়া বহুদিন ব্রজ পরিক্রমা করেন। পরে শ্রীরূপ-সনাতনের অনুরোধে তিনি গোকুলানন্দ মন্দিরে কিছুদিন স্থায়ীভাবে থাকেন। ঐ স্থানেই তাহার শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ আছেন, সন্নিকটে তাঁহার নিত্যদেহ সমাহিত আছেন। শ্রীরূপ-সনাতন জগদানন্দ মাধ্যমে একখণ্ড গোবর্দ্ধন শিলা পুরীধামে মহাপ্রভুকে পাঠাইয়াছিলেন, উহা পাইয়া তিনি আনন্দে মগ্ন হন। শ্রীহস্তে লইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন। সেই শিলাখণ্ড প্রভু রঘুনাথ গোস্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র শিলা গোকুলানন্দ মন্দিরে বিরাজমান আছেন। দর্শনপ্রার্থী হইলে পূজারী উহা দর্শন করাইয়া থাকেন।

৭। **শ্রীরাধারমণ**—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের সেবিত। এই বিগ্রহ শালগ্রাম হইতে স্বয়ং প্রকটিত। জনৈক ধনী ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বিভিন্ন মন্দিরে বিগ্রহগণকে অনেক বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করেন। গোপাল ভট্টের প্রাণে সাধ জাগে, যদি শালগ্রামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিত তবে মনের সাধে সাজাইতাম। কি শোভা হইত! রাত্রিকালে শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী মূর্তি প্রকট করিয়া স্বপ্নে ভট্ট গোস্বামীকে জানাইয়া দেখা দিলেন। অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন। সুখের বিষয় ইনি জয়পুরে যান নাই। ....❑

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে

** ['যুগান্তর' সম্পাককে লেখা এই প্রতিবাদপত্রটি যুগান্তরে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই বছরই মায়াপুর শ্রীচতন্য মঠ ও কলিকাতার শ্রীচৈতনা বিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'শ্রীগৌড়ীয়' পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে পুনঃমুদ্রিত হয়। এখানে ভূমিকা স্বরূপ লিখিত ছিল—"গত ৭ই সেপ্টেম্বব যুগান্তবেব চিঠিপত্র স্তম্ভে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি জন্মাষ্টমী শীর্ষক আলোচনায় ঐ মর্মবেদনা কবিয়া পত্র দেওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সেই জন্য তাঁহার আলোচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।"]*

"১৫ই ভাদ্র যুগান্তরে" 'জন্মাষ্টমী' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িলাম, পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম। আপনারা বলিয়াছেন, "অবশ্য একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে যে নওল-কিশোর, গোপীজনবাঞ্ছিত রাধিকারঞ্জন কৃষ্ণ সর্বজনের আরাধ্য, ইনি ইতিহাসের কৃষ্ণ নন।" একথা বলিবার অধিকার আপনারা কোথায় পাইলেন? লক্ষ লক্ষ নরনারী সহস্র সহস্র বৎসর যাঁহার উপাসনা করিতেছে তিনি কি নিছক কল্পনা? এত বড় কথা বলা দুঃসাহসিকতা! আপনারা আবার পরে লিখিয়াছেন, "শ্রীরাধাও ইতিহাসের ব্যক্তি হইতেই পারেন না।" এরূপ কথা বলা নিতান্তই অনধিকার-চর্চা বলিয়া মনে হইল। বৃষভানুরাজ তাঁহার পিতা, কৃত্তিকা তাঁহার মাতা, রাউল তাঁহার জন্মস্থান, বর্ষাণা তাঁহার পিত্রালয়, যাবট তাঁহার শ্বশুরালয়, তিনি হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরাধা—আমরা তাঁহাকে নিত্য সহস্রবার স্মরণ করি। পরব্রহ্ম যেরূপ কৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিও সেইরূপ শ্রীরাধারূপে আসিয়াছেন। এই মহাসত্য ভারতের নিখিল বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। কোন পুরাণে না হয় নাই থাকিল, স্বয়ং মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতাকে স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর মতে রাধাকৃষ্ণ শুধু ভাবের ঠাকুর নহেন—ভাবময় চিন্ময় বিগ্রহের জীবন্ত প্রকটিত মূর্তি। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' "দেহভেদং গতৌ তৌ" বাক্যে তাঁহাদের দেহ স্বীকার করা হইয়াছে। "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি" বাক্যে দেহ ধারণের কথা সুস্পষ্ট। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের উক্তিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। তাঁহাকে অস্বীকার করার মত সাহস আপনারা কোন্ তপস্যাবলে লাভ করিলেন? আপনাদের উক্তিতে বৈষ্ণবধর্মের মর্মে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার কার্টুন দেখিলাম, ভাদ্রের দুর্যোগে কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে যাত্রা নয়—বার্লিনের দুর্যোগে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাধীনতা লইয়া বেলগ্রেড যাত্রা। এমন পবিত্র বস্তু লইয়া এমন বিদ্রূপও এদেশে চলে! তাও আবার বৈষ্ণব সংশ্লিষ্ট কাগজে!! ভাবিলাম আরবের কিংবা জেরুজালেমের আচার্যদের লইয়া এরূপ ব্যঙ্গচিত্র করিলে পত্রিকা অপিসে নিশ্চয়ই হামলা হইত। ❑

প্রেমধর্ম

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিতেন — বিশ্বমানবের একটাই ধর্ম উহা মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম।

ঐ যে মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম তাহা লাভের জন্য সাধারণ মানুষকে একটি স্তর অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। মহদ্‌ব্যক্তির সঙ্গলাভ এই অগ্রগমনের একটি উপায়। এই প্রেম বা বিশ্বপ্রেম জিনিষটি কী তাহা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইয়া গিয়াছেন। গৃহনির্মাণে প্রতিটি ইঁটের ফাঁক পূরণে ও ইঁটগুলিকে দৃঢ় সম্বদ্ধ করিতে মশলার যে ভূমিকা, মানুষের ফাঁক পূরণে ও মিলনে প্রেমের সেই ভূমিকা। কিন্তু

এই প্রেম ভাগবতীয় প্রেম হওয়া চাই। কেননা পার্থিব প্রেম স্বার্থময় ও অস্থায়ী। উহা সংকীর্ণ। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সেই সম্বন্ধে সকল মানুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই বন্ধন ভাবের বন্ধন। উহা কখনও বিনষ্ট হয় না। মানুষের অন্য পার্থিব সম্বন্ধ একটা চুক্তি বা কনট্রাক্ট-এর মত। উহা নানা কারণে ভঙ্গ হয বা নষ্ট হয়। মহাপ্রভু জগতে এই প্রেমধর্ম প্রচারে ভাগবত-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আসিয়াছিলেন। এই প্রেমলাভে মহাপুরুষ সঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু সে সঙ্গলাভ দুর্লভ ও দুষ্কর। তবে যাহা সুসাধ্য তাহা হইতেছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্তনে শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। যাঁহারা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাহাদের সঙ্গ বা তাঁহাদের কথা সঙ্গ করিলেই সেই মহাপুরুষ-সঙ্গ করা হয়। প্রহ্লাদ প্রমুখ কৃষ্ণভক্তের কথা পাঠে বা শ্রবণে সেই মহৎ সঙ্গলাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন লীলা। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের লীলা মধুর এবং ইহা বেশী চিত্তাকর্যক। শ্রীকৃষ্ণ ধীর অর্থাৎ বিকারের কারণ সত্ত্বেও বিকৃত হন না। ধীর নায়ক চারিপ্রকার — শান্ত, উদাত্ত, উদ্ধত ও ললিত নাযক। রাম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও মদন যথাক্রমে এই চারিপ্রকার ধীর এর মূর্তিমান উদাহরণ। কিন্তু কৃষ্ণ একাই এই চতুর্বিধ ধীর এর উদাহরণ। ঈশ্বরের দুইটি বিভাব। একটি ঐশ্বর্য, একটি মাধুর্য। ঐশ্বর্যের মহিমায় তিনি মহান্। তিনি ভয় ও বিস্ময় স্রষ্টা, তিনি প্রণম্য। মাধুর্যে তিনি সুন্দর। তিনি ললিত কোমল, তিনি প্রিয়, তিনি নিকটের বস্তু, তিনি আপনজন। বৃন্দাবনের লীলায এই মাধুর্যের ভাবগুলির মধ্যে বাৎসল্য সহজ। অন্যগুলি কিছু কঠিন। কিন্তু আপন সন্তানকে সকলেই ভালবাসে। সে স্বার্থময় সম্পর্ক। সকলের সন্তানকেই সমভাবে ভালবাসাই শুদ্ধ বাৎসল্য।

রাজা পরীক্ষিৎ হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে সাতদিন ধরিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতেছেন। শুকদেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন। আড়াই বৎসর বয়সের গোপালের ননীচুরির নানা ঘটনার বর্ণনা দিতেছেন। আবার বলিতেছেন, এই গোপালের দিকে যে চোখ দেয়, নয়ন ভরিয়া দেখে, তিনি তার চোখ চুরি করিয়া লন। সে তখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখে না। সবই কৃষ্ণময় দেখে। যে তাঁর দিকে মনোযোগ করে তার তিনি সকল মন হরণ করিয়া তাহাকে হরণ করেন। একবার তিনি পাপও হরণ করেন। পূতনার পাপ হরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দেন। তাই তার নাম হরি।

গোপালের বাল্যলীলার ননীচুরির ঘটনায় দেখি, গোপালকে যখন কেহ 'আমার ঘর, তুই চোর' বলিতেছেন, গোপাল তাহার উত্তরে বলিতেছেন, "ঘর আমার, তুই-ই চুরি করিয়া রহিয়াছিলি।" তাৎপর্য এই — বিশ্বের সকল ঘরই তো তাঁরই ঘর — গোটা বিশ্বটাই তো তাঁর লীলাস্থল। যে একথা না বুঝিয়া আমার ঘর, আমার আমার বলে সে বোঝে না যে সে প্রকৃতই চুরি করিতেছে।

বাৎসল্যরস বড়ই মধুর আর অতি সহজ-সরল। পরীক্ষিতের সেই ভাগবতী সভায় 'রসিকাঃ' অর্থাৎ ভক্তগণ এবং 'ভাবুকাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীগণ — এই দুই প্রকার শ্রোতাই রহিয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন ভাব অনুসারে লীলার ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঘর তৈয়ারী খেলিতে গিয়া গোপাল মাটি খাইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া মা যশোদা ছুটিয়া আসিলেন। গোপাল বলিল "আমি মাটি খাই নাই।" মা হাত ধরিয়া রাখিয়া তর্জন করিয়া বলিল, 'হাঁ কর, দেখি।' গোপাল মুখব্যাদান করিলে মা যশোদা

দেখিলেন, গোপালের মুখে সমস্ত বিশ্ব, তার মধ্যে জম্বুদ্বীপ, তার মধ্যে বৃন্দাবন, তার মধ্যে নন্দ-গোপগৃহ — এমন কি মা হাত ধরিয়া রহিয়াছেন, আর গোপাল হাঁ করিয়া রাহিয়াছে, তাহাও। মা ভয় পাইলেন। গোপালকে কি ভূতে ধরিয়াছে? অমঙ্গলের আশংকায় শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এই বর্ণনা শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন, কি মধুর! কি মধুর! জ্ঞানী বলিলেন — বেদান্তের বিশ্বোদর কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ। তিনি 'অণোরণীয়ান্' ও 'মহতো মহীয়ান্' এর মূর্তিমান স্বরূপ দর্শন। পরবর্তীকালে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন এ তাহাই। কিন্তু বিষয় এক হইলেও ভাবের তফাৎ বিস্তর। অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য দর্শনে চমৎকৃত ভীত বিস্মিত অনুতপ্ত।

মা যশোদার কাছে গোপাল মধুর — তাই এখানে সেই ভয় বিস্ময় নাই — শুধু বাৎসল্য রসের অধিক প্রকাশ। মাটি খাইয়াছেন — আবার বলিতেছেন খাই নাই। মায়ের শাসনের ভয়ে ভীত বালক। কিন্তু তিনি কি মিথ্যা বলিলেন? জ্ঞানী বলিবেন — সবই তো তাঁর উদরস্থ — তিনি আবার ভক্ষণ করিবেন কী করিয়া? বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য লুক্কায়িত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ প্রকাশিত। ভাগবতে তাহাই বলিত। তিনি দেবকীর গর্ভে ধরায় আসিলেন; কিন্তু যশোদাব স্তন্যপানে বর্ধিত হইলেন। ইহার কারণ এই যে, ত্রেতায় রামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া কৈকেয়ীব ঘরে প্রথমে যান এবং মা কৈকেয়ী যাহা চাইবেন তাহাই করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। কৈকেয়ী বলেন, পরবর্তীকালে রাম যেন কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাম সম্মত হন, কিন্তু এই শর্তে যে, তিনি পরবর্তী জন্মের সেই মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিবেন না, দ্বাপরে সে কারণে তিনি দেবকীর গর্ভে জন্মান কিন্তু তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চির মাতা যিনি সর্বদা তাহার লীলায় ধরায় আসেন, তাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করেন। বৃন্দাবন লীলায় যশোদা সেই চিরমাতা। যশোদার বাৎসল্য নিত্য বাৎসল্যের স্বরূপ। উহা সহজ আবার কঠিন। হরিকথা শ্রবণে ---- সেই কঠিন ভাব সহজ হয়। কয়লা জ্বলিলে যেমন আগুন হয়, নিভিলে আবার অঙ্গার, তেমনি হরিকথার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের তনুমন রসনা কর্ণাদি অপ্রাকৃত হয়। সেই কথাচ্যুত হইলেই এগুলি আবার প্রাকৃত হইয়া যায়। ওঁ তৎ সৎ হরি ওঁ। ❑

রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ

নিখিল বিশ্বসংসারের যিনি মূল কারণ তিনি শ্রীভগবান্। তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন, ইহা আর্যশাস্ত্রের একটি অপূর্ব দান। এই অপূর্ব বার্তাটি আমরা পাইয়াছি স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হইতেই, ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে। তিনি বলিয়াছেন প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে। বলিয়াছেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে', বলিয়াছেন—'আত্মানং সৃজাম্যহম্'।

তিনি কেন আসেন, আসার প্রয়োজনটা কী, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন স্বমুখে। আসেন—'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' জগজ্জীবের জীবনের মধ্যে ধর্মের সংস্থাপনের জন্য। এই কার্যটি তিনি করিতে পারেন না সর্বময় থাকিয়া। পারেন না গোলোকে বৈকুণ্ঠে বাস করিয়াও। ঐজন্য তাঁহাকে অবতরণ কবিতে হয এই ধূলিময় ধরণীর বুকেই।

তাঁহাব ধরাপৃষ্ঠে আগমন ও আগমনের কারণ লইয়া নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন আচার্যপাদগণ। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি আসেন না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি আসিতে পারেন না। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে মনে হয় যেন আসিয়াছেন—'আবির্ভূত ইব'।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, আসেন তিনি নিশ্চয়ই। আসেন তিনি যোগমায়ার আবরণে। মানুষ হইয়া আসিয়াও সর্বতোভাবে মানুষ হন না। হন, গূঢ়কপট মানুষ। হন, 'মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্'। তাঁহার আগমনের কারণ লইয়া বিচার—তিনি নিজ আগমনের কারণ, নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই একমাত্র কারণ নহে। যেটি গীতায় বলিয়াছেন ওটি বাহ্য কারণ, আর একটি আন্তর কারণ আছে। যেটি ব্যক্ত করিয়াছেন ওটি বহিরঙ্গ কারণ, আর একটি আছে অন্তরঙ্গ কারণ। বহিরঙ্গ কারণটি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কারণটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার অন্তরবেত্তা অন্তরঙ্গ প্রিয়জনেরা। বহিরঙ্গ কারণটি হইল ধর্মসংস্থাপন। অন্তরঙ্গ কারণটি হইল রসের আস্বাদন, আস্বাদন করিতে করিতে বিতরণ।

অন্তরঙ্গ কারণটি প্রিয়তম ভক্তেরা প্রকট করিলেন কোন্ বিচারবলে তাহা বলিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে পরব্রহ্মের পরিচয় লক্ষণ দুই প্রকার আছে। একটিকে বলে তটস্থ লক্ষণ, আর একটিকে বলে স্বরূপ লক্ষণ। লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বলিতেছি। অর্জুনের পরিচয় দিতে একজন বলিলেন অর্জুন অভিমন্যুর পিতা। আর একজন বলিলেন, ভারতযুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। ইহার প্রথমটি অর্জুনের তটস্থ পরিচয়, দ্বিতীয়টি স্বরূপ পরিচয়। প্রথমটি তটস্থ লক্ষণ বলি এই জন্য যে, অভিমন্যুর জন্মগ্রহণের পূর্বেও অর্জুন ছিলেন, অভিমন্যুর মৃত্যুর পরও অর্জুন বিরাজমান রহিলেন। সুতরাং অভিমন্যুর পিতৃত্ব অর্জুনের সত্তার সঙ্গে

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ পঞ্চশত আবির্ভাব পূর্তি স্মরণিকা।
শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর। ১লা মাঘ, ১৩৯২। ইং- ১৯৮৬।

শ্রীশ্রীনাটুয়া গৌরসুন্দর

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দিরে এই নাটুয়া গৌরসুন্দরকে ঘন্টার পর ঘন্টা দর্শন করিতেন

সর্বতোভাবে যুক্ত নহে। ওটি একটি সাময়িক ব্যাপার। আর বীরশ্রেষ্ঠত্ব অর্জুনের সঙ্গে সর্বদাই একীভূত। যখন যেখানেই অর্জুন সত্তাবান, সেইখানেই তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠত্ব বিশেষণ সংযুক্ত।

বেদান্তসূত্র প্রারম্ভে দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ছিলেন। সৃষ্ট জগৎ লয় হইয়া গেলেও তিনি চির বিদ্যমান রহিবেন। সুতরাং ওটি তাঁহার সাময়িক পরিবর্তনসহ বিশেষণ বা পরিচয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মের আরও পরিচয় আছে—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।" তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তিনি আদ্যন্ত সীমারহিত। এই পরিচয় ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্ম যখনই আছেন তখনই তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্", এই জন্য এইটি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রহ্মের যত কার্য সকলই বহিরঙ্গ। স্বরূপ লক্ষণসহ সম্পর্কিত যত সব কার্য তাহা অন্তরঙ্গ কার্য। তাঁহার ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার যে কারণটি তটস্থ লক্ষণ সঙ্গে যুক্ত, তাহা বহিরঙ্গ কারণ। যেটি স্বরূপ লক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সেটি অন্তরঙ্গ কারণ। জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধটাই তটস্থ, সাময়িক ব্যাপার, সুতরাং জীবজগতের ধর্মসংস্থাপন কার্যটি বহিরঙ্গ হেতু। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়াছি "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"। ইহাপেক্ষাও তাঁহার নিগূঢ় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন দ্রষ্টা ঋষিগণ। তিনি 'সত্যম্' কারণ তিনি সত্তাস্বরূপ। তিনি 'জ্ঞানম্' কারণ তিনি পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। সত্তাটি শাশ্বত হইলেই তিনি 'সত্যম্' হন। চিৎস্বরূপতা শাশ্বত হইলেই তিনি জ্ঞানস্বরূপ হন। সৎ ও চিৎ-এর একটি মিলনভূমি আছে, সেটি হইল 'আনন্দ'। তাই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বলিলেই তাঁহার সৎস্বরূপতা ও চিৎস্বরূপতা ফলবলাৎ পাওয়া যায়। তাই শ্রুতির প্রকৃষ্ট উক্তি "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। এই আনন্দ-স্বরূপতাকে ঋষি আরও গভীরে গিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছেন—আনন্দ হয় রসের আস্বাদনে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সুতরাং রসই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণের চরম পরিচয়, তাই শ্রুতির ঘোষণা "রসো বৈ সঃ।" ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপগত পরম চরম পরিচয়।

রস বস্তুটি দুইটি অবস্থায় থাকিতে পারে—আস্বাদিত ও অনাস্বাদিত। এই ভেদ বস্তুতঃ পক্ষে একটা কথার কথা মাত্র। অনাস্বাদিত রস রসই নহে। রসনা কর্তৃক আস্বাদিত সন্দেশটিই মধুর, অনাস্বাদিত সন্দেশটি মধুর নহে। মধুরতার সম্ভাবনা বিশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ। সুতরাং রস সর্বদাই আস্বাদ্যমান। রস আছে, অর্থই হইল আস্বাদ্যমান অবস্থায় আছে। রসস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই আস্বাদ্যমান, যিনি আস্বাদন করেন তিনিও রস। যাহা আস্বাদন করেন তাহাও রস। সুতরাং ব্রহ্মপুরুষ নিয়তই নিজেকে নিজে আস্বাদন করিতেছেন।

আপনার মুখখানি আপনি দুই রকমে জানিতে পারেন। এক প্রকার পারেন নিজ হস্তার্পণ করিয়া, আর একপ্রকারে পারেন একখানি দর্পণের মধ্যে। হস্তার্পণে মুখের সত্তা

ও কোমলতা মাত্র জানিতে পারেন। দর্পণে প্রতিবিম্বের মধ্যে মুখের সুন্দরতা, স্নিগ্ধতা, হাস্য-করুণাদি রসানুভূতির পৃথক্‌তা ইত্যাদি সব জানিতে পারেন। দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা অর্থ হইল মুখখানাকে পৃথক্ করিয়া দেখা। শ্রীভগবান্ নিজেতে থাকিয়াও নিজেকে জানিতে পারেন। আর তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক ভাবে জানিতে পারেন নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া। তিনি একাকীও আস্বাদন করেন, আবার এই দুই হইয়া নিজ চিৎ-দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করাইয়া নিজ রসস্বরূপতাকে উপভোগ করেন। যখন একাকী থাকেন তখন তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। যখন তিনি নিজেকে পৃথক্ করিয়া আস্বাদন করেন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। যখন আস্বাদনের জন্য দুই হন তখন একজন আস্বাদক, অপর জন আস্বাদ্য; একজন আরাধক অপর জন্য আরাধ্য।

এই আস্বাদ্য আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। এই ভূমি স্থির শাশ্বত। আরাধক ভূমির তর-তমতা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে, প্রাতঃসূর্যের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে। তাহা কিন্তু সকল স্থান হইতে একই রূপ ভোগ্য হয় না। যেখানে পূর্বদিক্ উন্মুক্ত সেখানে দর্শন উত্তম হয়। একটা সমুদ্রের কিনার হইতে আরও ভাল দৃষ্ট হয়। একটা উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে অতি উত্তম দর্শন হয়। এই পৃথিবীতে যত স্থান আছে তন্মধ্যে দার্জিলিঙের নিকটবর্তী একটি পর্বত শৃঙ্গ (টাইগার হিল) হইতে সূর্যের উদয়ের শোভা সর্বাতিশায়ী। প্রত্যহ সেখানে শতশত নরনারী সমবেত হয়। তাঁহারা সেখান হইতে সূর্যদেবের উদয়লীলা দর্শনে পুলকাপ্লুত হয়েন।

আরাধ্য রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে আরাধনাকারীর ভূমিকা বহু। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, নারদ, হনুমান্, অর্জুন, উদ্ধব সকলেই সেই আরাধ্যের আরাধনা-রত। প্রত্যেক স্থান হইতেই তাঁহাকে আরাধনা করা যায়। কিন্তু প্রাপ্তির তরতমতা আছে। ধ্রুবের পার্শ্বে দাঁড়াইলে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেখা যাইবে উদ্ধবের পার্শ্বে দাঁড়াইলে তদপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য মাধুর্যপূর্ণ দৃষ্ট বা ভোগ্য হইবেন শ্রীকৃষ্ণ। এই আরাধকের ভূমিকার ক্রমোর্দ্ধ চিত্ত অঙ্কিত আছে। বর্ণাশ্রম ভূমি, কর্মার্পণ ভূমি, জ্ঞানমিশ্র ভূমি, জ্ঞানশূন্য ভূমি, প্রেমভূমি, ব্রজরসের ভূমি, তন্মধ্যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসের ভূমি। তদুপরি ব্রজসুন্দরীগণের ভূমি, সর্বোপরি গোপীশিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভূমি। শ্রীরাধিকা যেখানে আরাধিকা তথায় রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বিলাসমাধুর্য সর্বাতিশায়ী। সকলই অতি সুগভীর, অতি সুনিবিড়, পরম মনোহারী।

যদি শ্রীকৃষ্ণ-মধুরিমা আস্বাদনে কাহারও একান্ত সাধ জাগে তবে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ পার্শ্বে, অথবা যিনি আছেন চরণপার্শ্বে তাঁহার পার্শ্বে, তখনই তাঁহারই হইবে সেই অসমোর্দ্ধ মধুরিমার অশেষে বিশেষে আস্বাদন-চমৎকারিতা।

যদি একদা সূর্যদেবের মনে সাধ জাগে দার্জিলিঙের হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে তিনি নিজের উদয়-শোভা প্রত্যক্ষ করিবেন, তাহা হইলে ঘটনাটি কীরূপ হইবে? সূর্য যদি উদয়াচলেও

থাকেন আর সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া শ্রীরাধার পার্শ্বে দাঁড়ান বা পার্শ্বে দাঁড়াইতে না চাহিয়া যেখানে শ্রীরাধা সেইখানেই দাঁড়ান, তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া, অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে! সেই ঘটনাই ঘটিয়াছিল পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে গঙ্গার সুস্নিগ্ধ কূলে মিশ্র পুরন্দর-পত্নী শচীদেবীর আনন্দময় কোলে। তখন রসাস্বাদনের একটি অনির্বচনীয় চমৎকারিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই তাপদগ্ধ ধরিত্রীর ধূলিময় অঙ্কদেশে। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত রস। তিনি নিজেকে আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক। আর যখন নিজেকে পৃথক্ করিয়া পরম আরাধিকা রাধিকার সঙ্গে একই তনু হইয়া নিজেকে আস্বাদন করেন তখন তিনি রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তিনি অনাদিকাল এইরূপে স্বমাধুর্য আস্বাদনে নিমগ্ন। তাঁহাকে আমরা নিজ ঘরের লোক, অতি নিজজন করিয়া পাইলাম মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্বে হোলী লীলার দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যালগনে, কলঙ্কী চাঁদ রাহুগ্রস্ত হইলে, কীর্তনের কলকোলাহলে মাতোয়ারা অগণিত নরনারীর তৃষিত নয়নের পুরোভাগে।

ব্রজের কৃষ্ণ বিলাসী। নদীয়ার গৌর বিলাসীও বটেন, বিরাগীও বটেন। অন্তরে রস-নির্যাসের আস্বাদক হইয়াও বাহিরে হইলেন সন্ন্যাসী। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও বাহিরে আচার্য-শিরোমণি। হরি হইয়াও হরিবোল বলিতে আত্মহারা। ব্রজে রস ও ভাবের পৃথক্ লীলা, নদীয়ায় একাত্মতায় লীলা। দুই নিত্য। ব্রজলীলায় রসের আস্বাদনের বৈচিত্র্য। নদীয়ালীলায় ভাব আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য। ব্রজে রসের প্রাচুর্য, নদীয়ায় মহাভাবের উদ্বেলতা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন হইলেও লীলায় ভিন্ন।

গৌরসুন্দর একাধারে রসের ভোক্তা ও রসদাতা। স্বয়ং ভাবোন্মত্ত আবার ভাবোন্মত্ততা-প্রদাতা। শ্রীগৌরসুন্দরে ছিল অলোকসামান্য সৌন্দর্য, অনন্য-সুলভ পাণ্ডিত্য, স্বভাবসুলভ বিনয়, নম্র মধুর ব্যবহার। তিনি সর্বজাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল—ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, সন্ন্যাসী-কুলগুরু প্রকাশানন্দ, দুর্বিনীত পাঠান সৈন্য বিজলী খাঁ, দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার জগাই-মাধাই। তাঁহার মাধুর্যে সমাকৃষ্ট উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপ রুদ্র, নিষ্কিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর, নবদ্বীপের অত্যাচারী চাঁদ কাজী, বিরাট্ ব্যক্তিত্বশালী বাদশাহ হোসেন শাহ। তাঁহার মধুরতায় বিমুগ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি শ্রীবাস, বিষয়স্পর্শশূন্য রঘুনাথ ভট্ট, বারো লক্ষ টাকার জমিদার রঘুনাথ দাস। তাঁহার প্রেমময় আকর্ষণে গৃহত্যাগী হইয়াছিল রাজনীতিবিদ্ বৃহস্পতিসম বুদ্ধিসম্পন্ন রূপ-সনাতন আর বিপুল বৈভবভোগী রায় রামানন্দ। সকল শ্রেণীর সকল নরনারী শ্রীগৌরসুন্দরের সদ্গুণ-কদম্বে সমাকৃষ্ট হইয়া পাদপদ্মে সর্বাঙ্গীণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নদীয়ার রসঘন শ্রীগৌরসুন্দর সাধ্যসীমা শ্রীরাধাতত্ত্বের আবিষ্কারক, সংকীর্তনৈকপিতা মর্ত্যজগতে নাম-গুণ-লীলা-মাধুর্যের কীর্তন-প্রবর্তক। তিনি মালী হইয়া বৃক্ষধর্ম প্রাপ্ত হইলেন আর স্বকীয় পরিবারবর্গকে আদেশ দিলেন প্রেমফল বিতরণ কর পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া,

অবিচারে অকাতরে ঘরে ঘরে যারে তারে। শ্রীগৌরসুন্দরের যে কত মহা দান তাহা "এক মুখে কত কব বলরাম দাস।"

তথাপি তাঁহার মুখ্য দানটি বিচার করিয়া অনুধাবন করিব। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহাদানটি এক কথায়—রস-প্রস্থান। শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় ইহা শ্রুতি-প্রস্থান, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অনুধ্যান করা যায় ইহা স্মৃতি-প্রস্থান, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তিশব্দাৎ" পর্যন্ত পাঁচশত পঞ্চান্ন (৫৫৫)-টি ব্রহ্মসূত্রের বিচার-বৈদগ্ধী মধ্যস্থতায় ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভূতিগম্য হয় ইহা ন্যায়-প্রস্থান। ইহা সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আর একটু অভিনব পথ আনিলেন, তাহার নাম রস-প্রস্থান।

তিনি রসস্বরূপ। তিনি রসিক। তিনি রসিকশেখর। তাঁহার আস্বাদন রসের মাধ্যমে। নির্মল প্রেম-প্রীতি, হৃদয়ের শুদ্ধ সহজ ভালবাসা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে চিরতরে হৃদয়ের ধন আপনজন করিয়া লওয়া যায়। তিনি পরাৎপর পুরুষ পুরুষোত্তম—কিন্তু আজ তিনি আমাদের ঘরের ঠাকুর নদীয়ার প্রাণ শ্রীগৌরহরি। শ্রীগৌরচন্দ্রিকা পদাবলীতে দৃষ্ট হয় গৌরহরি ব্রজের প্রত্যেকটি রসমাধুর্যই নবদ্বীপে আস্বাদন করিয়াছেন। এই আস্বাদন করিয়াছেন গৌড়মণ্ডলের অগণিত প্রিয়বর্গ সঙ্গে। প্রিয় পার্ষদগণ সঙ্গে যে সুনির্মল বিলাসপুর নির্মাণ করিয়াছেন নবদ্বীপে, তাহা অনবদ্য অনুপম।

রসিকশেখরের অনুসন্ধান করিতে আর কালিন্দীতটে সমুদ্র নিকটে যাইতে হইবে না। তিনি চিন্তামণি, গৌড় মণ্ডলেই সুপ্রকট। তাঁহাকে পাইতে সকলেই সমান অধিকারী। উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই রসিকশেখর গৌরমাধুর্য আস্বাদনে যোগ্য। তাহা আস্বাদন করিতে আর প্রকৃতি দেহ ভাবনা করিয়া গভীর রজনীতে নিভৃত কুঞ্জে যাইতে হইবে না। গৌড়মণ্ডলের গৌরের লীলামধুরিমা, যাহার যে যথাবস্থিত দেহেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। ভাবাঢ্য গৌরসুন্দরকে সকল ভক্তগণই সেবা করেন নিজ নিজ ভাবানুসারে। "ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথসুতায়"—তাঁহাকে সতত আরাধনা করি নবদ্বীপধামেই। নদীয়া হইতে আর বাহির হইতে চাই না। নীলাচলের পথে নগ্নপদে আর ছুটিতে চাই না ঝাড়িখণ্ডের পথে হিংস্র পশু-পক্ষী-সর্প-সমভিব্যাহারে আর বনে অরণ্যে ছুটাছুটি করিতে চাই না, গৌড়মণ্ডলেই গৌড়ীয়ার প্রাণধনকে ধরিয়া রাখিব। শুদ্ধ ভালবাসার যে হাট পত্তন করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া ঋণী ভগবান্‌কে আর কোথাও কেনা-বেচা করিতে ছাড়িয়া দিব না। "কৃষ্ণকে বাহির না করিও ব্রজ হৈতে"—এই বাণী আমরা শুনিয়াছি, এই বাণীর অনুকরণে, অনুসরণে ও অনুধ্যানে আমরা রসিকশেখর গৌরসুন্দরকে গৌড়মণ্ডল হইতে বাহির করিব না।

সেই গৌর আমাদের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী নহেন, অরুণ বসন কৌপীনধারী নহেন, আমরা শ্রীলোচনদাসের লোচনে তাঁহাকে নিত্যকাল দেখিব—

"ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপর দুলিয়ে যাইছে কোঁচা।।
বাঁকমল সোনার নূপুর, বাজাইছে মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা।।"

মধু শীল অশ্রুজলে ভাসিয়া কাটোয়ায় তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করে নাই — ঐ দেখা যায়, দেখ—

"দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় দিয়েছে চাঁপার ফুল,
কুন্দ-মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা।
চন্দন-মাখা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায়,
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা।।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের হাতে গড়া 'শারিকা' গুপ্ত রাধিকা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের অশ্রুসিক্ত কীর্তনের আখরের মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় বলিব—গৌর আমাদের নদীয়া-বিনোদিয়া, শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া, কীর্তন-রসরসিক, রাসবিলাসের পরিণতি, রাইকানু একাকৃতি, প্রণয়-বিলাসাকৃতি, বিবর্ত-বিলাসমূর্তি—নদীয়ার ঠাকুর গৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের শচী মায়ের দুলালিয়া, গদাধরের প্রাণ-বধূয়া, নরহরির চিতচোরা, নিতাইচান্দের হৃৎকেতন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন।

রসপ্রস্থানে কেন্দ্রগ পুরুষ রসশেখর শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁর আদরের ধাম নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপ। সেখানেই যাব শ্রীবন্ধুসুন্দরের তীব্র লালসার মধুর পদ স্মরণ করিতে করিতে—

স্মরণিকা

"পরিয়ে ডোর কৌপীন, হয়ে দীনের অধীন,
কবে মুই যাব নদীয়ায়।
সুরধুনী পাড়ে রয়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে,
ভাসিব রে নয়নধারায়।।"

ধারায় সিক্ত হইয়া একটি মন্ত্রই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিব—

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র!
হা নাথ! বিশ্বম্ভর! নাগরেন্দ্র!
হা শচীনন্দন চিত্তচৌর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ! গৌর!!।

রস-প্রস্থানের পরম লক্ষ্যভূমি প্রিয়াজীর প্রাণেশ্বর ধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর!!

ঐ ধামের ধূলিভিখারী—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ❑

নিমাই পণ্ডিতের সমসাময়িক নবদ্বীপ

ফুলিয়ার কৃত্তিবাস কবি লিখিয়াছেন—"সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।" বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপ সম ধাম ত্রিভুবনে নাই।" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"ভূমিস্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে।"

নবদ্বীপ ছিল শাক্ত লীলাভূমি। বিশেষতঃ ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রের আলোচনায় নবদ্বীপ ছিল সর্বোপরি। অসাধারণ ধীসম্পন্ন বাসুদেব সার্বভৌম, তার্কিক-চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি, তন্ত্রের রাজা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নবদ্বীপ ভূমিকে অলংকৃত করিয়াছেন।

এই নিবন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জমিদারগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সর্বপ্রথমে একজন জমিদারের কথা বলিব। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে বুদ্ধিমন্ত খান নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি নবাবের অধীনে শাসনকর্তা পদে স্থিত ছিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জনক শ্রীসনাতন মিশ্র তাঁহার রাজসভায় পণ্ডিত ছিলেন।

বহু দিন হইতে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিথিলা। মিথিলা ঋষি গৌতমের জন্মস্থান। বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন আচার্য, উদ্যোতকর প্রমুখ মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব ভূমি মিথিলা। মিথিলার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের গ্রন্থ বাহিরে নিতে দিতেন না। বাসুদেব সার্বভৌম এই অভাব দূর করিয়া নবদ্বীপকে মিথিলার সম্মান করিয়াছিলেন।

বাসুদেব বাল্যকালে বিদ্যাবিমুখ ছিলেন। তাঁহার পিতা মহেশ্বর বিশারদ দুঃখে পত্নীকে বলিয়াছেন, "অমন পুত্রের মুখে ছাই দিতে হয়"। পত্নী স্বামীর আদেশে পুত্রের ভাতের থালার পার্শ্বে কিছু ছাই দেন। বাসুদেব বনমধ্যে গিয়া বটবৃক্ষ মূলে দেবীকে পান, তদুপরি ঘট স্থাপনা করিয়া পূজা করেন। দেবীর বরে তিনি মহাপণ্ডিত হন। এই দেবীই নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী পোড়ামা বা পরমা বা পড়ুয়ার মা নামে আজও খ্যাত আছেন।

বাসুদেব মিথিলায় গিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বিরাট্ গ্রন্থ 'চিন্তামণি' কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে লইয়া আসেন, ভগীরথ যেরূপ গঙ্গা আনিয়াছিলেন তদ্রূপ। বাসুদেব বিদ্যানগরে ন্যায় শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। সহস্র সহস্র ছাত্র আসিয়া বিদ্যানগরের টোল অলংকৃত করিল। রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেবের ছাত্র ছিলেন। রঘুনাথ গুরুদেব হইতেও বড় পণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া গুরু তাঁহাকে মিথিলায় প্রেরণ করেন। মিথিলার উপাধি দিবার অধিকার ছিল—নবদ্বীপের ছিল না। রঘুনাথ বিদ্যাবলে সেই অধিকার নবদ্বীপেও লইয়া আসেন। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের মত মহাপণ্ডিতকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ এক চক্ষুহীন ছিলেন। তিনি বাণভট্ট শিরোমণি নামে ভুবন-বিখ্যাত। রঘুনাথ গঙ্গেশের চিন্তামণির ওপর 'চিন্তামণি- দীধিতি' রচনা করেন। ইহা হইতেই নব্য ন্যায়ের শুভারম্ভ।

রঘুনাথের ছাত্রগণ মধ্যে মথুরানাথ, রামভদ্র ও জানকীনাথ শ্রেষ্ঠ। জানকীনাথ 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের প্রণেতা। মথুরানাথ দীধিতির 'সরলা' টীকা রচনা করেন। রামভদ্র উদয়নাচার্যের 'কুসুমাঞ্জলি কারিকাভাষ্য' লেখেন। মথুরানাথের ছাত্র ভবানন্দ দীধিতির 'মণিদীধিতি' ভাষ্য লেখেন। ভবানন্দের

* *'বাংলাবাণী' (দৈনিক সংবাদ পত্র)। ১২ মার্চ, ১৯৯৬, ঢাকা। প্রতিষ্ঠাতা—শেখ ফজলুল হক মণি।*

পুত্র মধুসূদন ও পৌত্র রুদ্ররায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ তুল্য মূল্যবান 'ভাষা পরিচ্ছেদ' ও তার টীকা 'সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী' রচনা করিয়া বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন অমর হইয়া আছেন।

হিন্দু জাতির সমাজ জীবনের রীতি-নীতি দশকর্ম সংস্কার সকলই স্মৃতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন ১৯ খানা স্মৃতি ছিল। তাহাতে নানা মুনির নানা মতে সমাজ জীবন বিশৃংখলাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মূলে কোন রাজশক্তি না থাকায় সমাজ অধঃপতনের দিকে যাইতেছিল। শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য সকল বিরোধী বাক্যের মধ্যে অভিনব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া নতুন স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই কার্যে যে অসাধারণ বিচার শক্তির আবশ্যকতা তাহা তাঁহার গ্রন্থে সুস্পষ্ট। তাঁহার যশোরাশি দশদিকে বিচ্ছুরিত ছিল। অগণিত ছাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইত।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। তখন তন্ত্রশাস্ত্র-বেত্তাগণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও বৌদ্ধের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিলিয়া তন্ত্র নূতন রূপ নিল।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একজন মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিলেন তান্ত্রিকেরা তন্ত্রের বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে না পারায় কেবল নিষ্ঠুরতা ও মদ্যপান লইয়া মাতিয়া আছে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রের সার সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। গভীরভাবে সকল শাস্ত্র অধিগত করিয়া 'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থে তিনি শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদ নিরস্ত করেন। তিনি উভয় মতাবলম্বীদের দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি সুন্দররূপে বিবৃত করেন। কিভাবে সাত্ত্বিক পূজা করিতে হয়, তাহাও তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথের পুত্র গোপাল ও মধুসূদন। তাঁহারা তন্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোপালের 'তন্ত্র-দীপিকা' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কৃষ্ণা-নন্দ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ছিলেন কিন্তু তাঁহার উপাস্য ছিল শ্রীকৃষ্ণ। তন্ত্রসারের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা।"

সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দরিদ্র হইয়াও কীরূপ নির্লোভ ছিলেন, ব্রাহ্মণীরা কীরূপ উদার স্বভাব ছিলেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রানী গঙ্গার ঘাটে দেখেন, সেখানে একটা ঘটনা ঘটে। রানী স্বামীকে বলেন, তুমি নাকি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের খুব দান কর। গঙ্গার ঘাটে এক পণ্ডিত গৃহিণীকে দেখিলাম গায়ে এক রতি সোনা নাই, শাঁখা পর্যন্ত নাই, একটি লাল ফিতা বাঁধা, তাঁহাদের কিছু দান কর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া এক হাজার টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন। পণ্ডিত দান নিতে অস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, দাঁড়ান, আমার টাকা রাখার জায়গা নাই। জায়গা আনিতেছি। পণ্ডিত নিজ পত্নীর ধনলোভ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। অল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্মণী দরিদ্র পল্লীতে গিয়া সংবাদ দিলেন ও বহু লোক ডাকিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণী রাজাকে বলিলেন, এই দরিদ্রগণ আমার জায়গা। রাজা প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া টাকা দেন। এত লোক আসিল যে রাজার টাকা ফুরাইয়া গেল। ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে যাঁহার বাস, অভাবের তাড়নায় যাঁহার দেহ ক্ষীণ,

হাতে লাল ফিতা মাত্র যাঁহার আভরণ, সেই ব্রাহ্মণপত্নীর কি উচ্চ হৃদয়, কি বিরাট্ ঔদার্য দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। এই ছিল তৎকালীন আদর্শ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কত নির্ভীক, কত স্পষ্টবাদী ও রসজ্ঞ ছিলেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাপ্রভুকে অবতার বলিয়া মানিতেন না। একদিন অদ্বৈতবংশীয় পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে রাজার দেখা হয়। গোস্বামীকে রাজা বলেন, "আমি অনেক শাস্ত্রালাপ করিয়া বুঝিয়াছি মহাপ্রভু অবতার নহেন। আপনি কী মনে করেন?" শ্রীরাধামোহন কহিলেন, "ঐ সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ ছিল, আজ সন্দেহ দূব হইল। যখন ভগবান্ অবতার হন তখন একজন রাজাকে তাঁহার বিরোধী দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য অবতারে ঐরূপ কোন রাজাকে দেখি নাই, আজ আপনাকে পাইলাম। আমার সকল সন্দেহ দূর হইল।" এই স্পষ্টবাদিতা ও শ্লেষপূর্ণ রসিকতা তুলনাহীন।

মহাপ্রভুর সময় সমাজে এ তিনটি ধারা বিদ্যমান ছিল—ন্যায়ের ধারা, স্মৃতির ধারা ও তন্ত্রের ধারা। এই তিনটিতে বিরাট্ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু 'রস' নামক বস্তুটির আত্যন্তিকভাবেই অভাব ছিল। মানুষের জীবন ছিল শুষ্ক। তৎকালীন এক কবি লিখিয়াছেন—

"কত শত বিদগধ, রস অনুমানই,
অনুভব কাহুক ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলল এক।।"

রসে অনুমিতি ছিল, অনুভূতি ছিল না। প্রাণ জুড়াবার স্থান ছিল না। মহাপ্রভু গৌরসুন্দর আনিলেন প্রাণ-জুড়ানো সুধা। উন্নত উজ্জ্বল রসের ধারা সকল ধারার শুষ্কতা ঘুচাইয়া সরসতা আনিল। সকলকে সঞ্জীবিত করিল। ভক্তিপ্রেমের রস-বন্যায় ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারী নিমাই পণ্ডিতের প্রেমের ধারায় ভাসিয়া গেল।

প্রদীপের তৈলাধার ছিল, তৈল ছিল, সলিতা ছিল, তাহা প্রজ্বলিত করিবার মত কেহ ছিল না। মহাপ্রভু প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলেন। তিনি নবদ্বীপকে মহাতীর্থে পরিণত করিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—"জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ।" ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রদীপটি নবদ্বীপেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল। গৌরহরি শুধু ভারতবাসীকে বাঁচাইয়াছিলেন না—নাচাইয়াছিলেন। কেবল জনসাধারণকে নাচাইয়াছিলেন না, রাজা-রাজড়াদেরও নাঁচাইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর বাদশাহের একটি পদ দেখুন—

"জীউ জীউ মেরে মন চেরা গোরা,
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা।
খোল করতাল বাজে ঝিগি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া।।
পদ দুই বারি চলু নট নটিয়া।

থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া।।
ঐছন পহুকে যাউ বলিহারি।
শাহ্ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী।।" ❐

প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার

বৈষ্ণব কবির অমর লেখনী লিখেছে 'চিত্রম্'—অতীব বিচিত্র বার্তা, বিস্ময়কর অথচ মনোহর। শোন সে সংবাদ।

মাত্র পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে শ্রুতির পরাৎপর সত্য তত্ত্ব রূপ পেয়েছিল সুবর্ণবর্ণে নবদ্বীপ ধামে এই ধরণীর ধুলায়। ধরা ধন্যা হয়েছিল, লীলা-পুরুষোত্তমের পরম পুণ্যময় পদার্পণে, দোলের আবির-আবৃত অনুরাগে রাঙা রাজপথে।

প্রকটিত হয়েছিল একটি মণিদীপের শাশ্বতী রশ্মিমালা, সমগ্র মানব-জাতির ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক জীবন-প্রণালীর ঔজ্জ্বল্য বিধান উদ্দেশ্যে। তাঁর সুবিশাল ব্যক্তি-পুরুষের ব্যথাহরা উদাত্ত আহ্বানে সম্যক্ সঞ্জীবিত হয়েছিল বেদনা-বিহৃত মানব-সন্তানের মনঃপ্রাণ।

ভুলে গেছিল তারা জাতি-বর্ণের ভেদ-ভিন্নতা। বিদূরিত হয়েছিল উঁচু-নিচুর বিরাট্ ব্যবধান। সমবেত হয়েছিল তাঁর চরণ পাশে। মানব-সংহতি লাভ করেছিল এক দিব্য জীবন। ধনী, মানী, পণ্ডিত, অস্পৃশ্য দাঁড়িয়েছিল তাঁর মহা সাম্যের পূত পতাকাতলে। এইটিই বিচিত্র বার্তা, অদ্ভুত খবর, অভূতপূর্ব সংবাদ।

সেই পরম পুরুষের শুভাগমনে নব জীবন পেয়েছিল নব্য ন্যায়চর্চায় বিশুষ্ক বিমলিন পণ্ডিত পাঠক পড়ুয়া দল। তৃষ্ণাতপ্ত মানব-সংস্কৃতির মধ্যস্থলে প্রবাহিত হয়েছিল এক অভিনব রসধারা—যার মধ্যে ফল্গুর মত বহমান বৃন্দাবনীয় উন্নত রসের মধুময় সুবাস, আর ছিল মহাকীর্তনের উন্মাদনাময় পরম উল্লাস।

আরও বিচিত্র কথা, এত বড় বৈপ্লবিক সুমহান্ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য সঙ্গে অস্ত্র এনেছিলেন দু'টি মাত্র। অযোধ্যাপতির ধনুকবাণ নহে, দ্বারকাপতির গদা চক্র নহে, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র নিজ সাঙ্গোপাঙ্গ সবাই। সেই অস্ত্র হল নাম আর প্রেম। গৌড়ীয় সাহিত্যিকদের মধুক্ষরী ভাষায়—

"গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।
নাম প্রেমে মালা গাঁথি পরাইলা সংসার।।"

বক্ষে অস্ত্র নিক্ষেপ করে নয়, ক্ষত আহত করে নয়, বিষয় বিরক্ত করে আনন্দে উন্মত্ত

---

* *শ্রীচৈতন্য : জীবন-সাহিত্য-দর্শন।' মালদহ জিলা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশত জন্মজয়ন্তী মহোৎসব কমিটি। মুকদমপুর, মালদহ, ৭৩২১০৩। সম্পাদক : ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ। ২৬ মার্চ, ১৯৮৬।*

করে নামের বিশ্বধন্যকারী সূত্রে আর প্রেমের তুলসীপত্রে গ্রন্থিত মালিকা কণ্ঠে দোলায়ে। তাতে ঘটিয়েছিল ছোট বড়, ধনী মানীর অভ্যাবনীয় একাকারতা। তাতে রাজা চলেছিল নগ্নপদে, কুলবধূ বেরিয়েছিল রাজপথে। নদীমালা খালবিলের ব্যাপক একত্রীকরণ। এত বড় বিপ্লব অদৃষ্টপূর্ব অচিন্ত্যপূর্ব। নাম-প্রেমের পুষ্প-মালিকার একটিমাত্র স্রগ্‌ধরা ছন্দে।

নাম করেছিল মানবকুলকে উর্ধ্বমুখী, আর প্রেম এনেছিল মানুষে মানুষে একাত্মতার সংহতি। আজানুলম্বিত স্বর্ণদণ্ড ভুজযুগলের বিশাল ঔদার্যপূর্ণ আকর্ষণে তিনি বেঁধেছিলেন বিচ্ছিন্ন মনুষ্যকুলকে এক অখণ্ড একপ্রাণতায় প্রীতিরস-মন্দিরে চন্দ্রাতপ-ছায়ায়, উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে তা ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

সেই কথা আজ শুধু স্মরণীয় নয়, দুর্দশাগ্রস্ত আজিকার সমাজ জীবনে সে কথা পুনরায় রূপায়ণীয়। সহস্রধা বিভক্ত সমসাময়িক বৈষম্য-বিখণ্ডিত সুবিস্তৃত চত্বরে, আবার সংস্থাপন করতে হবে গোরাচাঁদের সেই প্রেমের বাজার। যে বাজারে বিকাবে না স্বার্থান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মতান্ধতা, বস্তুবাদের ভোগান্ধতা। থাকবে শুধু প্রভু জগদ্বন্ধুর ভাষায় 'জয় নবদ্বীপ, ভারত-প্রদীপ'—সেই ভারত-প্রদীপের আঁধারহরা প্রজ্বল ছটা, আর সেই ছটায় উদ্ভাসিত পুলকিত নরনারী, ঐক্যের একতানতায় শুদ্ধ সমৃদ্ধ। ❑

একপ্রাণতার যাদুকর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর

আটশত বৎসর পূর্বে অখণ্ড বঙ্গভূমির শিক্ষা-সংস্কৃতির রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। শত শত পণ্ডিত ছিলেন। অগণিত ছাত্র ছিল বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন। ন্যায় সাংখ্য তন্ত্রের গবেষণায় পণ্ডিত-সমাজ ছিল তুলনাহীন দক্ষতা সম্পন্ন। মানুষের ধনধান্য ছিল, অর্থ সম্পৎ ছিল। সমাজে মানুষ সাধারণতঃ যাহা কামনা করে তাহা সবই ছিল। ছিল না শুধু একটি বস্তু।

ছিল না মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের একতা। ছিল না মানুষের প্রতি মানুষের অন্তরে দরদ। তদ্বিপরীত ছিল আভিজাত্যের গর্ব ও বিদ্বেষ। লক্ষের মধ্যে একটি লোকও পাওয়া যায় না যাহার হৃদয়ে অপরের জন্য বেদনা আছে, গভীর সহানুভূতি আছে। সমাজ বিশুষ্ক প্রাণহীন হৃদয়, যেন স্পর্শ হীন। গোটা সমাজ কাঁদিতেছিল একটি প্রাণ জুড়াইবার মানুষের জন্য। সকলের হৃদয়ের বেদনা, গভীর আর্তি টলাইয়া ছিল গোলোকের আসন। ধরণীর ধূলায় নামিয়া আসিয়াছিলেন প্রাণ জুড়াইবার মানুষ। আসিয়াছিলেন তিনি নবদ্বীপ প্রবাসী শ্রীহট্টিয়া ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী জননীর অঙ্ক আলোকিত করিয়া। অমৃতলোকের প্রেমের দেবতা দেখা দিয়াছিলেন নরলোকের মানুষের মাঝখানে, আজ হইতে পাঁচশত আট বছর পূর্বে একটি সন্ধ্যায়। তাঁহার নাম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। মানুষের মধ্যে একপ্রাণতা স্থাপনের শ্রেষ্ঠ যাদুকর।

ঐ মধু বাসন্তীর পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা লগনে নবদ্বীপের গঙ্গার তটে প্রকট হইয়াছিলেন ঐ মহা যাদুকর। সেদিন হোলির বিলাসে আকাশ ছিল রঙধরা। চন্দ্রগ্রহণের উল্লাসে বাতাস ছিল

কীর্তনমুখর। গোলোকের বিশুদ্ধ ভালবাসা ছড়াইয়া দিয়া মর্ত্যজীবের ভালবাসা লুটিয়া নিতে বেদের রসব্রহ্ম মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিলেন মানুষের দেশে মানুষের বেশে।

তাঁহার রূপে নরনারী হইয়াছিল বিমোহিত। তাঁহার গানে বন্য জন্তু হইয়াছিল অনুগত। তাঁহার ঔদার্যে বিরোধীরা হইয়াছিল ক্রোড়গত। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় দিগ্বিজয়ী কম্পান্বিত, স্বরূপ দর্শনে পণ্ডিত সার্বভৌম পদানত। তাঁহার প্রেমকান্নায় শিলা হইয়াছিল বিগলিত। তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল না এমন মানুষটি ছিল না সেই যুগে সারা দেশে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল অগণিত সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী। দুর্বিনীত পাঠান বিজলী খাঁ, দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার জগাই মাধাই। তাঁহার মাধুর্যে সমাকৃষ্ট উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপরুদ্র, নিষ্কিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর, বিরাট্ ব্যক্তিত্বশালী বাদশাহ হোসেন শাহ, নবদ্বীপের মুলুকপতি চাঁদ কাজী।

শ্রীগৌরসুন্দর সুনিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, মানুষকে সমাজের সাম্যভূমিতে আনিতে হইলে সর্বাগ্রে সাধন-ভজনের সাম্য ভূমিতে একত্র করিতে হইবে। এই সাধনক্ষেত্রের সাম্য ইসলাম ধর্মে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান। অন্য শত শত স্থানে ভেদ-ভিন্নতা উঁচু-নীচু থাকিলেও ইসলামের ভক্ত মসজিদের ছায়ায় নমাজের ক্ষেত্রে সমান। যখন ঈশ্বরের সন্নিধানে তখন সকলে একই ভূমিকায়।

হিন্দু সমাজের জন্য গৌরসুন্দর আবিষ্কার করিলেন সংকীর্তনের এক অপূর্ব অস্ত্র। চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামসংকীর্তন। তিনি ডাক দিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক সংকীর্তনের সাম্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে। মানুষ সেই ডাক শুনিল। গৌরসুন্দর ডাকিয়া বলিলেন, এসো নগরবাসী এসো। আজ সকলে মিলিয়া মহাকীর্তন করিব। সকলে মিলিয়া কাজীর বাড়ী যাইব। কাজী যে কীর্তনে বাধা দিযাছেন, তাঁহাকেও আপনজন করিব। তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপন করিয়া লইব।

লক্ষ লক্ষ লোক বিরাট্ কীর্তনের সামিল হইল। প্রত্যেককে আদেশ করিলেন হাতে একটি করিয়া মশাল লও। মশাল দেউটি অন্ধকার অপনোদন কারক। প্রভু যেন বলিলেন, আজ সকলে ক্ষুদ্রতার অন্ধকার দূর কর। 'আমি বড় তুমি ছোট', তোমাদের এই ব্যবধানের গাঢ় অমানিশা আজ প্রীতি-জোৎস্নায় দূর হইয়া যাউক। তাই একপ্রাণতার দেউটি প্রতীক লইয়া কীর্তন সমভিব্যহারে রাজপথে বাহির হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

সেদিন সকলে একাকার। সমাজের ধনী-মানী চণ্ডাল-বিপ্র মুচি-মেথর কুলীন-কায়স্থ সবাইকে একাকার করিয়া বিরাট্ নগরকীর্তন লইয়া কাজীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন ...।

শ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্যের কথা

শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীটিই অঙ্গন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াভূমি। অঙ্গনের উত্তর দিকে একটি মনোরম ঠাকুর ঘর। একদিন প্রভাতকালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরটি

প্রদক্ষিণ করিতেছেন। শ্রীঅঙ্গখানি উন্মুক্ত। তাহা হইতে অপূর্ব লাবণ্য যেন প্রবাহিনীর মত প্রবাহিতা।

ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকে বাস করে দরজী। সেলাই করা তার কাজ। লোকটি সৎ নহে; বিধর্মী ও মদ্যপায়ী। সকালে উঠিয়া সে নিজ সেলাইয়ের কাজে মন দিয়াছে। হঠাৎ পরিক্রমণ-রত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি দরজীর দৃষ্টি পড়িল। তাহার মনে হইল একটি কাঁচা সোনার মানুষ ঠাকুর ঘর প্রদক্ষিণ করিতেছে।

রূপ দর্শন করিয়া দরজী হতচকিত হইয়া গেল। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে "অহো! কী দেখিলাম! অহো! কী দেখিলাম!" বলিতে লাগিল। দরজীর সর্বাঙ্গে পুলক দেখা দিল। চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেলাইয়ের কার্য ত্যাগ করিয়া উর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।

দরজীর অদ্ভুত ভাববিকার দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীবাস! হঠাৎ এই বিধর্মীর কেন এত আনন্দ উদয হইল! শ্রীবাস হাসিয়া কহিলেন, প্রভু! ইহা আপনার রূপ-মদের মহিমা। এই লোকটি অপর্যাপ্ত সুরা পান করে। কলসী কলসী মদ খাওয়াতেও ইহাকে কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। আর তিলমাত্র আপনার দর্শনে এই ভীষণ মত্ততা!

বাজারের মদ হইতে আপনার রূপের মদের মত্ততা নিশ্চয়ই অধিক। শ্রীবাসের কথায় প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। দরজী সেই দিন হইতে হরিনাম আশ্রয় করিয়া অবধূতের বেশ ধারণ করিল। তাহার ধর্মীয় লোক তাহাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সে সে-সব কথায় কর্ণপাত করিল না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "জগতের একমাত্র ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়া আর কেহই নাই।" সেই দরজী তখন সিদ্ধপুরুষের মত জগতে বিচরণ করিত।

দরজী নীচ জাতি হইয়াও কী প্রকারে এমন মহাসৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইল? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন কবি কর্ণপুর—

"ন জাতি-শীলাশ্রম-ধর্মবিদ্যা, কুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদঃ।
যাদৃচ্ছিকোঽসৌ বত নাস্য পাত্রা-পাত্র-ব্যবস্থা-প্রতিপত্তিরাস্তে।।"

করুণাময় শ্রীগৌরহরি জাতি স্বভাব আশ্রম ধন বিদ্যা কুল কিছুরই অপেক্ষা করেন না, পাত্রপাত্রী কিছুই বিচার করেন না। স্বাভাবিকভাবে সকলের ওপরই শ্রীগৌরহরি প্রসন্ন থাকেন।

অপর এক দিন। পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদিমায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত। মুরারি গুপ্তের বাড়ীতে গৌরসুন্দর আছেন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত। হঠাৎ কাদম্বরী নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদিরাগন্ধ সকলের নাসিকায় প্রবেশ করিল। এই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কহিলেন, "আজ সংকর্ষণদেব আসিবেন। তাই তাঁহার প্রিয় মদিরা, লাঙ্গল ও মুষল অগ্রেই উদিত হইয়াছেন।" বলিতে বলিতে গৌরসুন্দরের স্বর্ণবর্ণ শ্বেত বর্ণ হইয়া গেল। কর্ণে এক সোনার কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। চক্ষু দু'টি মদিরা মদে আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কৌতূহলে প্রভু হলধর মূর্তি ধরিলেন। ভক্তবৃন্দ স্তব করিতে লাগিলেন।

তৎপর প্রভু রুদ্র বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অবতারের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্ভুজ মূর্তি দর্শন করাইলেন। ষড়্ভুজ মূর্তি কী প্রকার?

"ভুজাভ্যামুভাভ্যাং দধচ্চারুবংশীং
চতুর্ভির্গদা-শঙ্খ-চক্রাম্বুজানি।
কিরীটঞ্চ হারাংশ্চ কেয়ূরকে চ
স্রজং বৈজয়ন্তীং মণিং কৌস্তুভঞ্চ।।"

দুই বাহুতে মনোহারী মুরলী। অপর চারিটি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা বিস্তার করিতেছে। তিনি কিরীট হার কেয়ুর বৈজয়ন্তী বিবিধ ভূষণ দ্বারা বিভূষিত।

"অনাহার্য-সৌন্দর্য-মাধুর্য-ধুর্য
মহৌদার্য-চাতুর্য-গাম্ভীর্য-শৌর্যম্।
অবৈধুর্যধৈর্যং সদা সৌকুমার্যং
মহস্তুর্যমার্যং তদাশ্চর্যমাসীৎ।।"

সৌন্দর্য মাধুর্য ঔদার্য চাতুর্য গাম্ভীর্য ধৈর্য ও শূরত্ব প্রভৃতি গুণরত্নের তিনি আকর। প্রত্যেক গুণই তাঁহার উপমারহিত। তাঁহার তুল্য আর দ্বিতীয়টি কেহ নাই। তিনি আনন্দময়, তেজোময়, তুরীয় পুরুষ। পরমেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইলেন ষড়্ভুজ মূর্তিতে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই ষড়্ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া—আনন্দে বিহ্বল হইলেন। রোমাঞ্চ রূপ কঞ্চুকে আবৃত-দেহ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

"হরিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চিস্ত্বমেব
ত্বমাপস্ত্বমগ্নি-স্ত্বমিন্দুস্ত্বমর্কঃ।
নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুত্ত্বং মুরারে
নমস্তে নমস্তে নমস্তে স্বরায়।।"

প্রভো! তুমি হরি, তুমি হর, তুমি ব্রহ্মা, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি বিশ্ববিধানের যত কিছু কারণ তাহা সবই তুমি। হে মুরারে, হে জগৎপতে! তোমার পাদপদ্মে প্রণাম।

"ভুজৈঃ ষড়্ভিরেভিঃ সমাখ্যাতি কশ্চিৎ
নিসর্গোগ্রষড়্বর্গহন্তেতি ভোস্ত্বম্।
বয়ং ব্রূমহে হেমহেতুত্বমেভিঃ
চতুর্বর্গদো ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ।।"

কেহ কেহ বলেন তুমি ষড়্ভুজ মূর্তি ধরিয়াছ জীবের ষড়্রিপু বিনাশ করিবার জন্য। কিন্তু আমরা তাহা বলি না, আমরা বলি—তোমার চারি বাহু জীবের চতুর্বর্গ-দাতা এবং অবশিষ্ট বাহু দু'টির একটি ভক্তিদাতা, অপরটি প্রেমদাতা। ❑

যুগ-সমস্যার দিশারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

কিঞ্চিদধিক ২৫০০ বৎসর পূর্বে বৃহত্তর ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ড হইতে আসিয়া সিদ্ধিলাভান্তর ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার সাধনলব্ধ ধর্মাদর্শে সমগ্র ভারত তথা এশিয়া মহাদেশ প্লাবিত করেন। ইহার ১৪০০ বছর পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার অদ্বৈত মতবাদ প্রতিষ্ঠা পূর্বক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কেবল খর্ব নয়, ভারতবর্ষ হইতে প্রায় নির্মূল করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা-মহারাজ যদি কোথাও আসেন, তাহার সঙ্গোপাঙ্গ আসেন আগেই পরিবেশ যথোপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য। সেইরূপ পূর্ণ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ভক্তি ভাবাদর্শের সাধকগণের অভ্যুদয়ে ধন্য হয়।

মহাপ্রভুর মধ্যে আমরা দেখিয়াছি প্রেমঘন বিগ্রহ এক যুগান্তরকারী মানুষ। বাংলার কোলে ভাগীরথীর কূলে কীর্তন-মাতোয়ারা নদীয়ায়, পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায় শ্রীশচী-জগন্নাথের আনন্দমুখর আঙ্গিনায়। রূপ তাঁহার অনবদ্য, গুণ ছিল নিরুপম, মাধুর্য ছিল অনির্বচনীয়। সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য সকল নীচতার বেদনা তিনি মুছাইয়া দিয়াছিলেন। বৈষম্য-ক্লিষ্ট সমাজের অগণিত নর-নারীকে তিনি এক প্রেমপ্রীতির ভূমিকায় উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই যুগে এমন একটি মানুষও ছিল না যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।

বর্তমান যুগসমস্যায় আমরা মহাপ্রভুর যে দান তাহার মধ্যেই সমাধান খুঁজিব। এই যুগে জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। নানাবিধ গবেষণায় নূতন সত্য আবির্ভাব হইতেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি জীবনের বহু প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। জড়বাদী সুখ লাভই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে দূরের মানুষ নিকট হইতেছে। দূর-দূরান্তরের ঘটনা নর-নারীর দৈনন্দির জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পৃথিবীটা যেন আয়তনে ছোট হইয়া গিয়াছে। দূর দেশবাসী যেন নিকট প্রতিবেশীর মত। কিন্তু এই বিরাট্ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে ইহা যেমন সত্য, একই বিজ্ঞান নিকট জনকে দূরতর করিয়াছে ইহাও মর্মান্তিক সত্য। একই বিজ্ঞানের প্রসারতায় দুই বিপরীতমুখী গতি দেখা যাইতেছে। এই যুগে মানুষ প্রতিবেশীকে চেনে না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, এমন কি পিতামাতার পর্যন্ত খবর রাখে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা ও জাতিসমূহ একের অন্তর অপরের কাছে কপটতার আবরণে আবৃত। সকল কার্য যন্ত্রের মাধ্যমে, ফলে মানুষ যেন যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। যান্ত্রিক সভ্যতা লোকসংঘর্ষ বাড়াইয়াছে। মানুষ মানুষের গায়ে চলিতেছে। চা[illegible] জনসমুদ্র অথচ ইহারই মধ্যে মানুষ যেন একাকী অসহায়, নিজের ভারে নিজে আতুর। যে বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে সেই বিজ্ঞানই আপনাকে পর করিতেছে। লোকে গায়ে গায়ে ঠেকিতেছে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে মিশিতেছে না। মানুষ হাত পা চোখ কান বর্ধিত করিবার বুদ্ধি ও যন্ত্র আয়ত্ত করিতেছে; কিন্তু দীন সংকুচিত আত্মাকে বিশালতায় পৌঁছাইবার সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে। ভোগ-বিলাসের সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া সহস্র সহস্র দোকানের শোভা-বর্ধন করিয়াছে, কিন্তু আত্মার মহদ্ গুণসমূহ

* 'সহস্রাব্দ প্রসাদ' (বিশেষ সংখ্যা)।

মৃতকল্প হইয়া মানব সভ্যতাকে সাহারা মরুতে পরিণত করিতেছে—ইহাই বর্তমান যুগ সমস্যা। এই বিরাট্ মানবীয় ব্যবধান দূর হইবে কীরূপে? অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের অতি নিকট। ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া মানুষ মানুষ হইতে অতি দূর। দেহ কাছে প্রাণ দূরে। মানুষে মানুষে ঠেকাঠেকি প্রাণহীন যন্ত্রের ধাক্কাধাক্কির তুল্য। এই অসামঞ্জস্য, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে সৃষ্টি করিতেছে ঘোরতর অশান্তি ও বিভেদ। হাজার হাজার সভা দিনের পর দিন বসিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে। সমস্যার সমাধান মরীচিকার মত দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

মুসলমান শাসনের শেষভাগ। দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, তবে ধনৈশ্বর্যের অভাব নেই। শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, শাস্ত্র-চর্চা-প্রচুর। নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। শত শত চতুষ্পাঠী সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়া চুলচেরা ন্যায়ের বিচারসভা বসাইয়াছে। নব্য ন্যায়ের শুষ্ক তর্কে গঙ্গাতট মুখর। কিন্তু এত মানুষ থাকিতেও মানুষ নাই, মানুষে মানুষে মিলন নাই। বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডী মানুষের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। মুখে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্র, মনে ভয় অন্যের স্পর্শে বুঝি অপবিত্র হইয়া যাইবে। আজ সমাজের যে অবস্থা করিয়াছে জড় বিজ্ঞান, সেই কালে তাহাই ঘটাইয়াছিল শুষ্ক জ্ঞানের ব্যর্থ বিচার। জীবন ছিল রসহীন, সভায় ছিল রসের বিচার। পুঁথিতে ছিল ভাষ্যের অণুভাষ্য, কিন্তু হৃদয়ে ছিল না মানবীয় উদারতা। আজ যান্ত্রিক প্রাচুর্যের মধ্যে যেমন হৃদয়ের দারিদ্র্য, সেদিন ছিল পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্যের মধ্যে আত্মিক দৈন্য। জাতির দুর্দশা দেখিয়া মিথিলার দরদী কবির ব্যথাভরা অভিব্যক্তি—

"কত বিদগ্ধ জন, রস অনুমানই,
অনুভব কাহুক ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলল এক।।"

দেশভরা পণ্ডিতের খেলা, কোথাও কিন্তু নাই প্রাণ জুড়াইবার ঠাঁই। তাই জাতির কবি চণ্ডীদাস বেদনাহত হইয়াই গাহিলেন—

শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

একজন প্রাণের মানুষ, একজন হৃদয়-জুড়ানো সুহৃদের জন্য গোটা জাতি যেন ছটফট করিতেছিল। সমগ্র সমাজের ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া শ্রীহট্টের কমলাক্ষ ঠাকুর (অদ্বৈতাচার্য) প্রাণ উঘাড়িয়া প্রাণের দেবতাকে ডাকিতেন। তাঁহার কাতর আহ্বানে নামিয়া আসিয়াছিলেন সকলের প্রাণের দেবতা। ধূলার মানুষ ঘনীভূত প্রেম বস্তুকে মানব মূর্তিতে পাইয়া জীবন জুড়াইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—কোন যুগে কোথাও কি এমন একটি মানুষ দেখিয়াছে যাঁহাকে আপামর সকলে প্রাণের জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে? রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলে এক সাম্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া

চির স্নিগ্ধ হইয়াছে? "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ!"

বর্তমান যুগ-সমস্যার ঘোর অন্ধকারে সেই নদীয়ার ঠাকুরের যে প্রেমের দেউটি তাহার আলোতেই পথ দেখিতে হইবে। ঐ প্রেমের অভাবে সর্ব দিক্ শূন্য। ইঁটের উপর ইঁট সাজাইলে সৌধ হয় না। ভোগ্য দ্রব্যের বিপুল সম্ভার উৎপাদন করিলেই মানবীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে না। প্রত্যেকটি ইঁটের সুদৃঢ় একত্ব স্থাপনের জন্য চাই সংযোজক সিমেন্ট। মানবের হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধের জন্য প্রয়োজন প্রেমের। এই একটি বস্তুর অভাবে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগজ্জীবকে শুনাইয়াছেন একটি নিগূঢ় সংবাদ— "প্রেম প্রয়োজন"। প্রেম ছাড়া মানবসভ্যতা একটি প্রহসন মাত্র। শিবহীন যজ্ঞ যেমন দক্ষযজ্ঞ, প্রেমহীন সভ্যতা অপরিসীম থাকিলেও প্রেম-প্রীতিহীন মানব-কৃষ্টি মরুভূমির বালুসম। প্রকৃত মানব-প্রেম সহস্র বাক্‌বিতণ্ডা, লক্ষ সভা-সমিতি বা বাহ্য আড়ম্বরে উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে আছেন—"ঈশ্বর-সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি।" (গীতা)—এই অনুভূতি জাগলেই জীবে জীবে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুগভীর ভগবৎপ্রেম, বিশ্বপ্লাবী মানবপ্রেম শ্রীগৌরাঙ্গে একাঙ্গে একীভূত। যুগসমস্যায় বিধ্বস্ত সমাজ যদি মহামিলনের আলোক চাহে তবে ঐ নদীয়ার ঠাকুরকেই আশ্রয় করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত প্রেমবিগ্রহ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এই মহাবাণীই ঘোষণা করিয়াছেন।

"আমি ভবভয়ে ভীত হয়ে ডাকি তোমায় বিশ্বম্ভর।"

"ওহে নবদ্বীপচাঁদ, আমার পুরাও মনঃসাধ।
প্রেমকণা দানে নাশ মনের বিষাদ।।"

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষ লাভ করিয়া প্রেমধনে যে ধনী হইয়াছে তাঁহার কাছে এই দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা অশান্তি বিভেদ বিচ্ছেদময় জগৎ সুখ-শান্তি ও আনন্দপূর্ণ—"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে।" ❐

"চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমোঽস্তু"

**"আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমোঽস্তু।।"**

চব্বিশ বৎসরের তরুণ যুবক। 'কৌপীনৈক-পরিচ্ছদঃ'। কটিতে কৌপীন মাত্র সম্বল। অনাবৃত দেহ, দিন নাই, রাত নাই, তরুণ যুবক কেবল ছুটিতেছে। মাঘ মাস, প্রবল শীতের সময়। দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য যুবক কেবলই অগ্রসর হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্র, অনবরত।

যুবকের অঙ্গে যেন রূপৈশ্বর্যের সাজানো পসরা। দেহখানি বুঝিবা চাঁদের সুধায় তৈয়ারী।

* শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবা সমিতি। দ্বাদশ বার্ষিক স্মারক পুস্তিকা। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

তাহা হইতে স্নিগ্ধমধুর কিরণমালা উপছিয়া পড়িতেছে। বর্ণটি কাঁচা সোনার মত। সুঠাম সুন্দর আকৃতি। কর্ণবিশ্রান্ত সজল আঁখি, বিম্বের মত রাঙা ওষ্ঠ দু'টি মৃদু কম্পমান। শুদ্ধ প্রেমের মূর্তি, অথচ বৈরাগ্যমণ্ডিত।

অই মস্তকে ছিল চাঁচর চিকন কেশ, সবেমাত্র মুণ্ডন হইয়াছে। গৃহে ছিল বাৎসল্যাধার জননী, সবেমাত্র স্নেহের বন্ধন ছিড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। আরও ছিল প্রিয়তমা প্রেয়সীর কুসুমকোমল বাহুলতার আবেষ্টনী। সবেমাত্র খসিয়া গিয়া অঙ্গে উঠিয়াছে সন্ন্যাসের সাজ। টানিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে কৃষ্ণপ্রেম।

অভিসারিকা কান্তের অনুসন্ধানে যাইতেছে। পথের পর পথ পিছনে পড়িয়া রহিতেছে। পথ-বিপথ কিছু নাই। উঁচু-নীচু বোধ নাই। জল-স্থল জ্ঞান নাই।

"অপন্থার পন্থা বা ন ভবতি দৃশোরন্যবিষয়ঃ।
কিমুচ্চং নীচং বা কিময়ং সলিলং বা কিমু বনম্।।"

তিনদিন উপবাসী। জলবিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ হয় নাই। অন্য কোন দৈহিক ক্রিয়ার তো কথাই নাই। "আহারোঽদ্য দিনত্রয়ং ন চ পয়ঃপানং কিমন্যা ক্রিয়া।"

সোনার মানুষ আত্মহারা। কেবল কোকিলের কলকাকলীর ন্যায় কণ্ঠ হইতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই মধুরাস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইতেছে। পথে বন দেখিলেই তমালবৃক্ষ স্ফূর্তি। জলাশয় দেখিলেই রাধাকুণ্ড স্ফূর্তি। বৃক্ষ দেখিলেই কেলিকদম্ব ভাবনা। তাহার তলে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঠমকে ঠমকে নাচ। আবার নীল মেঘের দিকে চাহিয়া ঐ বলিয়া বেগে প্রধাবন।

তরুণ সন্ন্যাসীর বদনে করুণ ব্যাকুলতা। নয়নে জলধারা অঝোরে ঝরিতেছে, গিরিশৃঙ্গ হইতে নদীর জলধারার মত। তাহাতে মুখ ভাসে বুক ভাসে, পথের ধুলি কাদা হইয়া যায়। ব্রজ "প্রেমাশ্রুধারাভিঃ নির্ঝরঃ গিরিশৃঙ্গবৎ।"

নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে জনতা। যে আসিয়াছে সে আর ফিরিতে পারে নাই। অপলকে সন্ন্যাসীর বদন দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি কিন্তু লক্ষ্যহীন। কখনও আকাশ পানে, কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে। যেন কোন হারানিধির খোঁজ চলিতেছে। মাঝে মাঝে অর্ধ-বাহ্য দশা। তখন যে সম্মুখে পড়িতেছে তাহার প্রতিই প্রশ্ন করুণ কণ্ঠে, "ভাই, বৃন্দাবন আর কত দূর?" এমন দেবদেহ নবযৌবনে কঠোর সন্ন্যাসের বেশ কেন, এই মহাভাবনায় সকলের মুখ করুণ, রূপের উচ্ছ্বাসে সন্ন্যাসীর ভাবতরঙ্গে অভিঘাতে সকলে বিহ্বল। কুলবধূ পর্যন্ত সম্ভ্রম ভুলিয়া সজল চোখে পথের ধারে দাঁড়াইয়া। অসংখ্য মানুষ একটি মানুষকে দেখিতেছে। যেখানে রাতুল চরণ পড়িতেছে সেখান হইতে ধূলি লইতেছে, তাহাতে পথে পথে গর্ত হইয়া যাইতেছে। আনন্দঘন মানুষ সবাইকে লইয়া যেন আনন্দধামে চলিতেছে। সকলে বলাবলি করিতেছে, "এ তো মানুষ নয়, মানুষের আকারে আনন্দ-রসবিগ্রহ।" "আনন্দ-ব্রহ্মণো রূপম্।"

সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন অবধূত সাধু। সেও চলে উন্মাদের মত, কিন্তু দৃষ্টি তার সুস্থির। একমাত্র সন্ন্যাসীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেন সর্বদাই ভয়, পাছে হারাইয়া যায়। তিন দিন

অবধূত নবীন সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করিতেছে।

অবধূত কখনও পাছে কখনও পাশে চলিতেছে, হঠাৎ যেন স্বেচ্ছায় সম্মুখ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ তিন দিন পর সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়িল অবধূতের উপর। বিস্ময় বিমুগ্ধ সন্ন্যাসী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। অবধূতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আপনি কোথা যাইতেছেন?"

কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া অবধূত উত্তর করিলেন, "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইব প্রভু।" "খুব ভাল" বলিয়া সন্ন্যাসী আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কতগুলি রাখাল বালক গরু চরাইতেছিল। প্রভুর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারা করতালি দিয়া হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। হরিনাম শ্রবণে সোনার মানুষের গতি মন্থর হইল। করুণ কণ্ঠে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ ভাই! বৃন্দাবনের পথ কোন্‌দিকে, আমায় বলিতে পার?" অবধূত নিত্যানন্দের চাতুর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে রাখাল বালকগণ প্রভুকে বিপরীত পথ দেখাইয়া কহিল, "এই যে এইদিকে পথ।" আনন্দময় সেই দিকে বেগে ছুটিতে লাগিলেন।। আবার কতক্ষণ পরে অবধূতকে সম্মুখে দেখিয়া ভাবের মানুষের চকিত দৃষ্টি স্থির হইল। কত কাতরতা ভরা সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কত দূরে?"

ওষ্ঠ চাপিয়া অবধূত কহিলেন, "প্রভু এই তো আমরা বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া গিয়াছি। ঐ তো তমালকুঞ্জ। ইহার পার্শ্বেই যমুনা।" "অহো ভাগ্যম্" প্রভু আরও দ্রুত দৌড়াইলেন। ক্রমে ভাগীরথীর তটে আসিলেন। নিত্যানন্দ গঙ্গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "প্রভু, এইতো শ্রীযমুনা!" প্রভু নতজানু হইয়া স্রোতের দিকে তাকাইলেন। এর পর গম্ভীর যুক্ত করে স্তব করিলেন—

"অমানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়াস্নো বপুর্মিত্রপুত্রী।"

তুমি পাপনাশিনী, কল্যাণ-বিধায়িনী তপনতনয়া। আমার দেহ পবিত্র কর।

স্তব করিতে করিতে প্রভু গঙ্গায় ঝাপাইয়া পড়িয়া সানন্দে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জল হইতে উঠিলেন। মাঘের শীতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ঠিক এমন সময় পক্ক-শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নৌকা লইয়া নিকটবর্তী হইলেন। হস্তে তাঁর একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও একজোড়া কৌপীন। বিস্ফারিত চোখে প্রভু বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি তো শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য। আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন? আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি আপনি কীরূপে জানিতে পারিলেন?"

অদ্বৈতাচার্য বলিলেন, "প্রভু আমার পরম ভাগ্য তুমি গঙ্গাতীরে পদার্পণ করিয়াছ। এপারেই শান্তিপুরে আমার পর্ণকুটির। কৌপীন-বর্হির্বাস পরিধান করিয়া এই নৌকায় উঠ। অসংখ্য লোক দর্শনের আশায় অপেক্ষমান আছে।"

আচার্যপাদের কথায় প্রভুর ভাবদশা তিরোহিত হইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া অতীব ব্যাথাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দের ইহা কি উচিত কার্য হইল? আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া

বৃন্দাবনে আসিয়াছি বলিয়া শান্তিপুর আনয়ন করা কি যুক্তিযুক্ত কাজ হইল?" কথা বলিতে বলিতে প্রভু অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। চক্রী অবধূত আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিলেন। আচার্যের কিন্তু বুঝিতে বাকী রহিল না। প্রভুর কাতরতা ও নিত্যানন্দের চতুরতা দু'য়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আচার্য উত্তর করিলেন, "প্রভু! শ্রীপাদ তোমাকে প্রবঞ্চনা করেন নাই। যেখানে তোমার উপস্থিতি সেইখানেতেই বৃন্দাবন। যাহা বলিয়াছেন ঠিকই।"

দৈন্যবিষাদ ভরা কণ্ঠে প্রভু কহিলেন, "ও কী বলছেন, ও কথা বলতে নাই। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার ভাগ্যে যেন শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয়। আচ্ছা আপনি বলুন তো গঙ্গা দেখাইয়া আমাকে যমুনা বলিয়া বঞ্চনা করা কি শ্রীপাদের ঠিক কাজ হইয়াছে?" আচার্য বলিলেন, "প্রভু! শ্রীপাদ কখনও কি মিথ্যা কথা বলিতে পারেন? তুমি এখন যমুনাতেই স্নান করিয়াছ। তুমি জান তীর্থরাজ প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা মিশিয়াছে, মিশিয়াও তারা মিশে নাই। পূর্ব তীর ধরিয়া গঙ্গা চলিয়াছে, পশ্চিম তটে যমুনা। এই পশ্চিমতটে স্নানে তোমার যমুনা স্নানই হইয়াছে।"

অদ্বৈতাচার্যের মন্তব্যে প্রভু নীরব হইয়া গেলেন। প্রভুর নৌকা চলিল। দুই তীরে অসংখ্য নরনারী ভাবগম্ভীর বদনপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহরে নৌকা শান্তিপুর পৌঁছিল। ঘাটে লক্ষ লক্ষ পুরুষ-নারী দণ্ডায়মান। সকলের মুখে হরিধ্বনি। সকলের ক্ষুধার্ত নয়ন গৌরবদনে নিবদ্ধ। নর্তনে কীর্তনে ধুলায় অবলুণ্ঠনে "হা গৌর! হা গৌর!" ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গঙ্গার ঘাট আনন্দমুখর। অদ্বৈত গৃহে বিপুল জনতা। তিন দিন ধরিয়া পথ চাহিয়া আছে। নদীয়া শান্তিপুরের বালকবৃন্দ যুবক বধূ কেহই গৃহে বদ্ধ নাই। ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত পাষণ্ড কেহই বাকী নাই। তিন দিন সকলেই আহার নিদ্রা ছাড়িয়াছে। নিরন্তর গৌর ভাবিতে ভাবিতে সব গৌরময়। গৌর-বিরহ-বেদনায় নগর গ্রাম আজ গৌরময় হইয়া গিয়াছে। এখন সকলে নয়ন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া আনন্দ-রস-বিগ্রহ গৌরসুন্দর দর্শনে আনন্দময় হইয়া গেল।

শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম অরূপ। আবার বলিয়াছেন "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্", আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। সেই পুঁথির কথা পুঁথিতেই রহিয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দ রূপ মানুষ এ পর্যন্ত দেখে নাই। আজ দেখিল। বিরহের বেদনাভরা চোখে দেখিল। তাই দেখা গেল। দেখিয়া নিরানন্দ জীব আনন্দী হইল।

গৌরসুন্দর সত্য সত্যই সুন্দর। যেন একটি আনন্দের মহাসিন্ধু। সিন্ধুতে উর্মিমালা থাকে। রসময় গৌরের প্রতি অঙ্গেই উর্মিমালার নৃত্য ছন্দ। সমুদ্রে থাকে গর্জন, গৌরসুন্দরেরও তাহা আছে, ঘনঘন হরি হরি রবে গভীর হুঙ্কার তাহাই আনন্দ সাগরের গর্জন।

"নৃত্যোর্মীকঃ প্রকটিতং হোল্লাস-
হুঙ্কারঘোষঃ স্বেদস্তম্ভ-প্রভৃতি-বিলসদ্-ভাব-রত্নাবলীকঃ।"

সমুদ্রে থাকে রত্ননিচয়, গৌরসুন্দরেও আছে। স্বেদ-স্তম্ভ-কম্প প্রভৃতি ভাব-বিকার সমূহ ঐ-চিন্ময় দেহে রত্নরাজি।

এই আনন্দ-সমুদ্র আজ সর্ব নয়ন-গোচর। চব্বিশ বছর আগে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা

লগ্নে এই আনন্দবিগ্রহ বাংলা ভূমিকে ধন্য করিয়াছে। এই চব্বিশ বছর তাঁহাকে চিনিয়াছে মুষ্টিমেয় জন কতক। আজ দেশবাসী প্রতি জনে তাঁহাকে চিনিল, চিনিয়া আপন করিয়া লইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, অদ্বৈত আচার্যের নয়নজলে কৃষ্ণ-আরাধনা সার্থক হইল। শান্তিরাজের আগমনে আজ শান্তিপুর আনন্দে ভরপুর হইল। কোকিলকণ্ঠ শ্রীমুকুন্দ আনন্দে গান ধরিলেন—

"চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"
জয় গৌর হরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।। ❐

গৌর প্রেম ছড়িয়ে দিতে

আর্য-সংস্কৃতির বহু অবক্ষয় হয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনুপ্রবেশের ফলে। রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবানল দানা বেঁধে, আর্যকৃষ্টি ও শাস্ত্রকারদের যা শ্রেষ্ঠ দান, তা অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেছে। দিনের পর দিন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। রক্ষা পাবার উপায় কী? প্রভু জগদ্বন্ধু একটি উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নবদ্বীপে যে প্রদীপ আলো জ্বেলে দিয়েছিল, নদীয়ায় যে-প্রেমের আলো গৌরসুন্দর এসে প্রজ্বলিত করেছিলেন সে আলোকে আবার যদি উঁচু করে তুলে ধরা যায় তবে এই সংস্কৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অন্ধকার দূরীভূত হবে। অতএব এই বাণীটিকে সম্বল করে এই গৌরকথা আস্বাদনের পরিক্রমায় বেরিয়েছি।

মহাপ্রভু এসেছিলেন ৫০০ বৎসর আগে। এক সোনার মানুষ নেমে এসেছিলেন এবং মানুষটি প্রেমিক। তাঁহার মাধুর্য তাঁহার সৌন্দর্য সৌকর্য তাঁহার প্রেমৈশ্বর্য তাঁহার জীবদুঃখকাতরতায় মুগ্ধ হননি এমন মানুষ তৎকালে ছিল না। তাঁহার সৌন্দর্য মাধুর্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। মুগ্ধ হয়েছিল তাঁহার রূপে গুণে কার্যে স্নেহে তাঁহার প্রেমে। প্রেম শব্দটা অভিধানে ছিল, একবার মাত্র মূর্তি লাভ করেছিল, একবার মাত্র জীবন লাভ করেছিল। শুনেছি কিন্তু জীবন্ত দেখিনি। সে সময় প্রেম জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আপনাকে আপনি প্রকাশ করেছিলেন নদীয়ায়। এই আলোতেই আমাদের এই জীবনকে যদি একবার উদ্ভাসিত করা যায় তাহলে এই গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত হবে। এই বাণীকে জীবনে ধারণ করে আপনাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য আপনাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। উদ্দেশ্য আবার বেঁচে উঠি। গৌরপ্রেমে গৌরকথায় গৌর-চিন্তায় গৌরধ্যানে, গৌরের হরিনাম কীর্তনে আমরা যদি আবার জাগ্রত হই তবে বাঁচবার আশা আছে, নতুবা শেষ হয়ে যাবো।

শুধু বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, ঋষিদের যা শ্রেষ্ঠ দান শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, যা বিশ্ব মানবের সম্পদ্, মানব ঐতিহ্যে যা শ্রেষ্ঠ বস্তু তাকে বাঁচিয়ে তুলবার উপায় গৌরসুন্দরের এ প্রেমের আলো। গৌরসুন্দর স্বয়ং সে আলো। সে আলো নিভে যায়নি ডুবে যায়নি, সে আলো আছে। কিন্তু ঢাকা পড়ে আছে, চাপা পড়ে আছে। সে আলো তৈলের বাতি না যে, তেল ফুরিয়ে গেলে

* *'মাসিক বৈদিক সংবাদ', চট্টগ্রাম, ৮ বৈশাখ, ১৩৯০*

নিভে যাবে ঝ বাতাসে নিভে যাবে। এই আলো সদা-সর্বদা জ্বলছে; তা-থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে পারছে না একমাত্র ঢাকা পড়ে আছে বলে, চাপা পড়ে আছে বলে। তাকে আবার উজ্জ্বল করে উঁচু করে তুলে ধরতে হবে সমস্ত মানব-সমাজের কাছে। বিশ্বের মানুষ হাহাকার করছে। যদিও বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানুষের হাহাকার কমেনি, বেড়েছে। মানুষের চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে ক্ষুধায়। এই ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। আজ যত কিছু সম্পদ্ বিজ্ঞান দিয়েছে তাতে আত্মার ক্ষুধা মিটছে না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে একটা আকুল তৃষ্ণা একটা লালসা আছে। এই আত্মার ক্ষুধা মিটাবার মত সম্পদ্ বিজ্ঞান দিতে পারেনি। একমাত্র বস্তু সচ্চিদানন্দ ভগবানের সাথে যে আত্মার সম্বন্ধ থাকে সে আত্মাই আত্মতৃপ্তিজনক খাদ্য প্রদান করতে পারে। এই সম্বন্ধ সাধন করিয়ে দিতে আত্মার তৃপ্তিজনক খাদ্য নিয়ে দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে পরিবেশন করতে মহাপ্রভু এসেছিলেন নদীয়ায়। তাই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য জাতি গৌরপ্রেমের কথা বলছে, নদীয়ার দিকে ছুটছে। তালে তালে নাচছে, কীর্তন করে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবীময়। মহাপ্রভুর কথা আজ সার্থক হয়েছে। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম।।" পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়েছি সেদেশে কিছুর অভাব নাই। শুধু একটি বস্তুর অভাব, সেটি হচ্ছে ভগবৎপ্রেম, মানবপ্রেম। মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছিলেন, সনাতন! একটি মাত্র বস্তুর অভাব আছে তা হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম বস্তুটি কী? মানুষ আছে রাষ্ট্র আছে সমাজ আছে কিন্তু প্রেম নেই! প্রেম বস্তুটি কী কাজ করে? সে বিশ্বজনকে একত্রিত করে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আছে। কে কী অবস্থায় আছে জানি না। যে-বস্তু মানুষে মানুষে ব্যবধান দূর করে দেয়, ইটের মধ্যে সিমেন্ট দিয়ে যেমন দু'টো ইটকে একত্র করে ধরে রাখে, তিন চার পাঁচ লক্ষ ইটকে একত্র করে একটি সুন্দর উদার সৌধ নির্মিত হয়; তেমনিভাবে আমাদের ভিতরে যে ফাঁকা আছে ব্যবধান আছে, মানুষে মানুষে যে ব্যবধান রয়েছে, তা দূর করে মানুষকে একত্রিত করে যা তারই নাম প্রেম। এই ফাঁকা ব্যবধান দূর না হলে সংসারে মানুষ একত্রিত হতে পারবে না। একত্রিত না হলে ঘরে ঘরে অশান্তি, সমাজে অশান্তি, রাষ্ট্রে অশান্তি। আন্তর্জাতিক অশান্তির কারণ একটি মাত্র বস্তুর অভাব—তা হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমধন দিতে এসেছিলেন, বিলিয়ে দিতে এসেছিলেন অবিচারে অকাতরে দ্বারে দ্বারে যে সোনার মানুষটি তিনি গৌরসুন্দর। যে-প্রেমধন দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করেছিলেন, জাতিকে ধন্য করেছিলেন তা আজ থেকে ৫০০ বৎসর আগে। বেশী দিনের কথা নয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের কথা নয়। আমাদের দেখা জীবনের মধ্যে ৫০০ বৎসর আর ক'টা দিন। তাই এই গৌরসুন্দরের প্রেমের আলোতে ডুব দিতে হবে। আমার আপনার বাঁচবার সমস্যা থেকে রক্ষা পেয়ে বাঁচতে হলে এই প্রেম ছাড়া মানব সমাজ বাঁচবে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, যদি আমরা সেই প্রেম সম্পদ্‌কে জাগাতে না পারি, গৌরসুন্দরের প্রেমের আলোতে উদ্ভাসিত হতে না পারি। আমি বিদেশেও এই কথাটা বলেছি। আমরা যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে হৈ চৈ করি ভোট দাও বলে, তেমনি হৈ চৈ করে বেড়াব গৌরকে ডাক, গৌরকে ধর, গৌরের নাম কর এই বলে। সবাই দেখবে সবাই জানবে। আমাদের বেদে আছে "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং, সং বো মনাংসি জানতাম্"—তোমরা একত্রে চল, এক সাথে বল, একত্রে বস, একত্রে চিন্তা কর, এক ভাবাপন্ন হও—তবেই বাঁচবে।

বহুধা বিভক্ত জাতিকে এক করতে মহাপ্রভু এসেছিলেন। মানুষকে তিনি ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। প্রত্যেক ধর্মে একটি গ্রন্থ আছে। আমাদের বহু গ্রন্থের মধ্যেও একটি গ্রন্থ আছে, সেটি হচ্ছে 'চৈতন্য-ভাগবত'। আমাদের এক মন্ত্র 'জয় গৌর জয় গৌর'। যে যেখান থেকে যাকেই প্রথমে দেখব বলব 'জয় গৌর'। 'জয় গৌর জয় গৌর' করতে করতে গৌরসুন্দরের প্রেম ধর্ম আপনিতেই জীবনে জয়যুক্ত হয়ে উঠবে, তবেই আপনি বাঁচবেন। আপনার আত্মার যে খাদ্য গৌরসুন্দর মাথায় করে এনেছিলেন দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সম্পদ্ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, গৌরকৃপার বাণী আমরা শুনি নাই। এখন থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা শুনব। এই প্রতিজ্ঞা করি ঘরে ঘবে ডেকে ডেকে গৌরকথা শুনিয়ে যাব। আমরা সকাল বিকাল দুই বেলা মা বাবা ছেলেমেয়ে ৪/৬ জন ঘরে যারা আছে তারা হাততালি দিয়ে যন্ত্রপাতি না থাক, সুর লাগবে না ,কেবল "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এইভাবে নাম করব। এতে আপনার ব্যক্তিগত কল্যাণ হবে, সমাজের কল্যাণ হবে, বিশ্বের কল্যাণ হবে—এত শক্তি এই নামের মধ্যে আছে। আমরা করি না, বলি সুর জানি না। সুরে কী হবে? সুর ছাড়া নেচে নেচে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবাই তবেই আমরা বাঁচব। আমরা এখনই প্রতিজ্ঞা করি প্রত্যেক হিন্দু মিলে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলায় ঘরে যতটি লোক আছে প্রত্যেকে একত্রে বসে ১০ মিনিট কাল হাততালি দিয়ে নাম করব। আমরা প্রস্তুত হব, আমরা প্রত্যেক গৃহে হরিনাম কীর্তন করব। গৌরের আদেশে প্রত্যেক 'জীবে সম্মান দিব জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

আমি আপনাকে সম্মান করি কারণ আপনি ধনী, আপনাকে সম্মান করি আপনি উচ্চকুলে জম্মেছেন। কিন্তু "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—আমরা তা করি না। মানুষকে হেলা করে মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অপরাধ করেছি। মানুষকে না ছুঁয়ে পাপ করেছি। আমি বড় তুমি ছোট—এই ভেদাভেদ দূর করব। আর না—মানুষকে সম্মান দেব প্রত্যেক হৃদয়ে গোবিন্দ আছেন জেনে। তিনি নিজে বলেছেন "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি।" আপনার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে প্রত্যেক জীবের জীব-জগতের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন। কিন্তু এটা মুখে বলি, যদি ব্যাখ্যা করতে বলেন তাহলে দু'চার ঘণ্টা এমন ব্যাখ্যা দেবো, সবাই একেবারে থ বনে যাবে। কিন্তু কাজে করি না। খালি বড় বড় কথা বলি। গৌর-আবির্ভাব পঞ্চশত বর্ষের প্রস্তুতি, আমরা এই কথা বলব, আমরা পালন করব, গৌরের কথা শুনব। মানুষকে সম্মান দেবো জেনে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। তাই কেউ ছোট নয়, যে কৃষ্ণ নাম নেয় সে-ই মহান্।

পঞ্চশতবর্ষপূর্তি উৎসবে আমরা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম কীর্তন করব। দেশে তো আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়াই আছে। সমগ্র বিশ্বে যে ধ্বংসলীলা শুরু হয়েছে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে একটি মাত্র অস্ত্র আছে তা হচ্ছে হরিনাম। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।" সত্য সত্যই এটি অমোঘ অস্ত্র, এই অস্ত্র দিয়েই আমরা মানব জাতিকে বাঁচাব। আমরাও বাঁচব এই হরিনাম নিয়ে। □

তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কথা, বাংলাদেশ তখন মুসলমানের পদানত। হিন্দু রাজা সুবুদ্ধি রায়কে চ্যুত করিয়া তাঁহার সেনানায়ক হোসেন খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। নাম লইয়াছেন গৌড়েশ্বর হোসেন সা। গৌড় বাংলাদেশের রাজধানী। রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মালদহ জেলার রাজমহলের নিকটে। রাজধানীর পার্শ্ববর্তী একটি সমৃদ্ধশালী গ্রামের নাম রামকেলি। রাজধানীর বিশিষ্ট কর্মচারীরা অনেকেই রামকেলিতে বাস করিতেন। গৌড়েশ্বরের প্রধানমন্ত্রী দবির খাস সনাতন ও অর্থ সচিব সাকর মল্লিক রূপ। রামকেলি ইহাদের বাসাবাটী। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া রামকেলিতে বেশ বড় রকম একটা কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একদিন গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ বৈকালিক বিশ্রামান্তে সবেমাত্র আসিয়া রাজসভায় বসিয়াছেন। নগর কোতোয়াল আসিয়া সংবাদ দিল—"রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছে। তিনি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্তন করেন। সঙ্গে তাঁহার অগণিত লোক, লোকগুলি সবাই তাঁহার বাধ্য। দেখিলে রাজদ্রোহের আশঙ্কা হয়।" কোতোয়ালের কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্ন্যাসীর চেহারা কীরূপ? আচার ব্যবহার কী রকম? অবসর কালে কী কার্য করেন?" কোতোয়াল বলিল—"জিজ্ঞাসা করিলেন তাই নির্ভয়ে বলি। এমন অদ্ভুত লোক জীবনে দেখি নাই। দেহখানি অতি দীর্ঘ, লক্ষ লোকের উপরে দেখা যায়। গায়ের রং কাঁচা সোনার মত। হাত দু'খানি জানু পর্যন্ত দোদুল্যমান। গ্রীবা সিংহের মত। স্কন্ধ হস্তীর মত। মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ হইতেও স্নিগ্ধ। চক্ষু দু'টি পদ্মের পত্রের মত বিশাল। অধর টুকটুকে রাঙ্গা। দন্তপাটি মুক্তার ন্যায়। বক্ষঃস্থল বিশাল চন্দন-চর্চিত। কটিতে অরুণ বর্ণের বসন, চরণ দু'টি যেন দু'টি গোলাপ ফুল, নখগুলি দর্পণের মত নির্মল। মনে হয়—

"কোন বা দেশের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পেয়ে ন্যাসী হয়ে করয়ে ভ্রমণ।।"

"তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নবনীতের মত কোমল। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্তন করেন। ঘনঘন ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়েন। ভীষণ আঘাতে পাষাণ ফাটে, কিন্তু দেহে কোন ক্ষতচিহ্ন হয় না। সর্ব শরীরে রোমাঞ্চ। কখনও বা ঘোরতর কম্প, দশ-বিশ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। নয়নে নদীর স্রোতের মত অশ্রুধারা। কখনও হাসে কখনও কাঁদে, কখনও মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছা হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়—মনে হয় মৃত। আবার হুঙ্কারসহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য। সর্বদাই এই ভাবে, কখন যে আহার বা নিদ্রা যান তাহা বুঝিতে পারি না।"

"তাঁহাকে দেখিবার জন্য চতুর্দিক্ হইতে লোক আসিতেছে। যে আসিতেছে, সে আর ফিরিয়া যাইতেছে না। লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়াছে। চলিতে যেখানে চরণ দেন—'সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত হয় পথে।' যাহা নিজ-চক্ষে দেখিয়াছি তাহা হুজুরের দরবারে নিবেদন করিলাম।"

কোতোয়াল চলিয়া গেল। গৌড়েশ্বর কেবল ছত্রী নামক একজন হিন্দু কর্মচারীকে ডাকিয়া

** 'সত্যং প্রসঙ্গঃ' হইতে পুনঃমুদ্রিত। যুগান্তর, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৭ মার্চ ১৯৯৫*

জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছত্রী! শুনিলাম রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তুমি তাঁহার কথা কিছু জান?" ছত্রী জানিতেন যে, হোসেন শা হিন্দু-বিদ্বেষী, তাই প্রকৃত কথা গোপন করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ জানি, একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে, গাছতলায় থাকে, ভিক্ষুকমাত্র।"

ছত্রী কেন তথ্য গোপন করিলেন, তা অনুমান করিয়া গৌড়েশ্বর কহিলেন, "শোন ছত্রী একটা কথা। তোমরা কর্মচারী। মাসান্তে বেতন পাও, কাজ কর। একমাস বেতন না দিলে সবাই আমাকে ছাড়িয়া পালাইবে, না আপনার খাইয়া আমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে? আর আপনার খাইয়া কখনও না খাইয়া 'বিনি দানে এত লোক যাঁর পাছে ধায়'—তুমি বল, তিনি একজন ভিক্ষুক মাত্র? যাহা হউক, তুমি আমার রাজ্যমধ্যে ফরমান জারী করিয়া দাও যে, কেহ যেন ঐ সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার না করে। উনি আমার অধিকার মধ্যে আপন ইচ্ছায় চলুন যাহা উহার মন।"

কেশব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় লইলেন। রাজ্যমধ্যে রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত মুসলমান রাজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। গোপনে একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। ভক্তগণকে বলিয়া দিলেন—"রাজধানীর নিকট হইতে অন্যত্র গমন করাই যুক্তিযুক্ত।" সন্ধ্যার পর গৌড়েশ্বর প্রধানমন্ত্রী দবির খাসকে ডাকাইয়া নিভৃতে নবাগত সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দবির খাস বললেন, আপনি তাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন? আপনি নিজেই তো প্রাসাদের উপর উঠিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। আপনি রাজা, আপনাতে বিষ্ণুর অংশ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার নিজের যাহা মনে হয়, তাহাই ঠিক—"তব চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ।"

গৌড়েশ্বরের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল। প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"রাজা কহে, "শুন মোর মনে হেন হয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহ' নাহিক সংশয়।।"

কয়েকদিন মাত্র পূর্বে এই হোসেন শা উড়িষ্যায় গিয়া শত শত দেবমন্দির বিগ্রহ বিনষ্ট করিয়াছেন। আর আজ এক নবীন সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া সবিস্ময় বলিতেছেন—"সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহ' নাহিক সংশয়।" গৌড়েশ্বর ঠিকই বলিয়াছেন—বিনা কারণে এত লোক যাঁর দিকে আকৃষ্ট, তিনি নিশ্চয় মনুষ্য নহেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ তিনি নিশ্চয়ই পড়েন নাই তবু তাঁহার এই অনুভবটি মর্মান্তিকভাবেই সত্য যে, নিরুপম প্রেম হয় একমাত্র আত্মার জন্য। আর আত্মার আত্মা যিনি তাঁর জন্য। নিরুপাধি প্রেমের বিষয়ই ঈশ্বরত্ব। সেই নবীন সন্ন্যাসী একটি যুগের মানুষ। সমস্ত যুগটি, যুগের সমস্ত নরনারীগণ ঐরূপ একটি মানুষের জন্য হা-হুতাশ করিয়া আর্তি জানাইতেছিল। কেন এই আকুতি—জাতির কবি বিদ্যাপতি তাহার উত্তর দিয়াছেন—"কত বিদগধ জন রস অনুমানই, অনুভব কাহুক ন পেখ। বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে, লাখে না মিলল এক।।"

প্রাণ জুড়াইবার মানুষ নাই। ভারতে ধনৈশ্বর্য আছে। বিদ্যা-প্রতিভা আছে। বিদ্যার গৌরবে ভাস্বর নবদ্বীপ চারিদিকে কিরূপ ছড়াইতেছে। সব আছে, কেবল নাই প্রাণ স্নিগ্ধ করিবার স্থান।

যাহা থাকিলে প্রাণ স্নিগ্ধতা আসে, জীবনে শান্তি আসে তাহা নাই। তাহা কি বস্তু কতগুলি পাকা ইষ্টক একের উপর আ সাজাইলেই ইমাত হয় না। সেগুলিকে পরস্পরে সঙ্গে লাগাইবার জন্য চাই সিমেন্ট। সেইরূপ কতগুলি ব্যক্তি, অর্থ, বিদ্যা, তর্ক আইন সভা—এসব থাকিলেই সমাজ শান্তিময় হয় না—মানুষের প্রাণ জুড়াই না। ঐগুলিকে একত্রিত করিয়া গড়িবার জন্য চাই মানব সিমেন্ট-মসল্লাশূন্য সৌধ যেমন, প্রেম, শান্তিময় সমাজও তেমন আকাশকুসুম।

বর্তমান যুগে পরাধীনতা ও যন্ত্র-সভ্যতার চাপে যেমন আমরা শুকাইয়া গিয়াছি সেই কালেও পরাধীনতা, পুঁথিগত বিদ্যা আর তর্ক-বিচারের চাপে সমাজ শুকাইয়া গিয়াছিল। ছিল সব, কেবল ছিলনা, মানুষকে মানুষ জানিয়া ভালবাসা। জাতির আর এক মরমী কবি জাতির প্রাণের ব্যাথা জানিয়াই লিখিয়াদিলে—

'সবার উপরে মানুয সত্য তাহার উপরে নাই।'

ন্যায়ের বিচার, স্মৃতির বিধান, বর্ণাশ্রমের অনুশাসন যন্ত্র, সভ্যতার আকাশচুম্বী ইমারত—এ সকলের উপর যে মানুষ বড়, এত বড় কথাটা মানুষ ভুলিয়া যায়। ঐ বড়ত্ব জানাই মনুষ্যত্ব। ভুলিলেই মানুয অমানুষ হয়। সমাজে 'মানুষ' ছিল না, প্রাণ জুড়াইবার পাত্র ছিল না। সকল মানুষের বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিয়া শান্তিপুরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাণের মানুষের জন্য নিত্য প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন, প্রাণের দেবতার পাদপদ্মে। দেবতা তাই মানুষ হইয়া আসিযাছিলেন, প্রেমবন্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, মুসলমান রাজার কথা শুনিয়াছি। এক হিন্দু রাজার কথা শুনি—

"প্রতাপ রুদ্র কহে আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে, এই মোর আশ।।"

কাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তের পণ্ডিতের কথা শুনি—

"আজ হতে নিমাই তোর সঙ্গে যাব।
জ্ঞানের গরিমা আর কভু না করিব।।"

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের কথা শুনি—

"তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।।"

নবদ্বীপের নগর রক্ষী দুই ভাই মদে মত্ত। তাঁহার আলিঙ্গনে প্রেম উন্মত্ত হইয়াছে। পথের মধ্যে এক গ্রাম্য ধোপা কাপড় কাচিতেছে—তাঁহার করুণার স্পর্শ পাইয়া হরিনামানন্দে নাচিয়া গ্রামবাসীকে নাচাইয়া তুলিয়াছে। মৎসজীবী জেলে সমুদ্রে মাছ ধরে—মহাপ্রভুর ভাবাবিষ্ট দেহের স্পর্শে হরিধ্বনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দুর্দান্ত চাঁদ কাজী বলিয়াছেন, "তোমার কৃপায় মোর দুর্মতি ঘুচিল।" তিনি ফুলিয়ার মাধব দাসের বাড়ি আসিয়াছেন—লক্ষ লক্ষ লোক

গঙ্গা সাঁতরাইয়া তাঁহার দর্শনে ছুটিয়াছেন। শরীরময় গলিত কুষ্ঠের ক্লেদ বসুদেব বলিতেছেন—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পালায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।।"

রাজা-প্রজা, ছোট-বড়, নর-নারী, হিন্দু-মুসলমান সেই যুগে এমন মানুষ ছিল না যে তাঁকে ভালবাসে নাই বা যে তাঁর কাছে ভালবাসা পায় নাই। পৃথিবীর ইতিহাসকে স্পর্ধা করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় এমন একটা ভালবাসার মানুষ, মানুষের দরদী মানুষ—আর কোথাও দেখিয়াছে কি...? ❑

শ্রীচৈতন্য ও সমন্বয় চেতনা

'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল/লাগলো যে দোল।' কবিগুরুর উদাত্ত আহ্বান। এসেছে ফাগুন। আগুন। বনেও আগুন। মনেও আগুন। জরারূপী শীতবুড়ি থুড়থুড়ি বিদায় নিয়েছে। প্রকৃতি সেজেছে নতুন রূপে। পুষ্পাভরণে। নব কিশলয় পত্রপুটে। যৌবনের দীপ্তি তার অঙ্গে। মঞ্জরিত শালবীথি। কৃষ্ণচূড়া শিমুল পলাশে আজ খুশির হিল্লোল। মৃদুমন্দ হাওয়ায় সুখের পরশ। নিজেকে এভাবে গুটিয়ে রাখা কি ঠিক হবে? খুলে যাক হৃদয়ের দ্বার। যত সংকীর্ণতা, যত ভেদবুদ্ধি, যত কলুষতা উবে যাক কর্পূরের মতো। বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতি আজ মেতেছে এক অপূর্ব দ্যোতনায়। হোলি। রক্তবর্ণ আবীর চূর্ণে, ফল্গু বা ফাগে রাঙিয়ে উঠেছে আজ মানুষে মানুষে প্রীতির 'ফল্গু-বন্ধন'।

এমনি এক দোলপূর্ণিমার দিনে (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি) "বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" বাঙালির হোলিখেলার এ যেন প্রেমঘনরূপ। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন ঃ

"চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।।"

পুরুষ সিংহ। আবার 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি।' সে তো মহামানব অবতার পুরুষেরই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখানে আমরা তাঁহার বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রাণতা ও অধ্যাত্মভাবের আলোচনায় যাচ্ছি না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বরং তাঁহার সংহতি ভাবনা ও সমন্বয় দৃষ্টির সমুচ্চ অবদানের প্রসঙ্গ করি।

চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গদেশের সমাজে এসেছিল এক চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের যুগ। উচ্চবর্ণের হাতে তখন ধর্ম এক পণ্যবিশেষ। জাতিভেদের পাপ পঙ্গু করেছে সমাজকে। আচার-সর্বস্বতা ঝেঁকে ধরেছে সমাজ জীবনকে নাগপাশের মতো। জাতিভেদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। তারই মধ্যে তো এলেন শ্রীচৈতন্য। নিয়ে এলেন অভয়মন্ত্র প্রেম ও মৈত্রীর বাণী। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আরম্ভ হ'ল এক মহামিলন যজ্ঞ। কার্ল মার্কসের মতে "শ্রীচৈতন্য জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী উদারনীতির প্রবক্তা।" রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও ইতিহাসের দিক্ দিয়েও তাঁহার

* *যুগান্তর। ১৯ মার্চ, ১৯৯৫*

নাম-সংকীর্তনের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তখন গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)-এর রাজত্বকাল। যুদ্ধকালে উড়িয্যার মন্দির ভাঙ্গা বা কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বাদ দিলে তিনি সাধারণভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও মুসলমান রাজ-কর্মচারীদের অনেকেই হিন্দুদের প্রীতির চোখে দেখত না। তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মাচরণে বাধার সৃষ্টি করতো। নবদ্বীপের কাজী বিরল দৃষ্টান্ত ছিলেন না, নাম-সংকীর্তনের মতো অহিংস ধর্মপন্থা যে কিছু কিছু অপশাসকের ক্রোধ উৎপন্ন করতে পারে কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে নগরসংকীর্তন ও তার ফলাফল থেকে তা অনুভব করা যায়। আরও একটি কথা। শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগ বা পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা অনেককে জোর করে তখন ধর্মান্তরিত করে চলেছে। অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা আব নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিন্দু সমাজের উপেক্ষিত নীচু জাতের মানুষেরা দলে দলে মুসলমান হয়েছে। এছাড়া শাসকগোষ্ঠীর ধর্মগ্রহণে বাস্তব কিছু সুবিধা ভোগের প্রলোভনও ছিল। তাই শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তনে সংঘবদ্ধ করে যে ভক্তসমাজ গড়ে তোলেন তাতে জাতপাতের ভেদ ছিল না। শ্রীচৈতন্যের সমাজ-সংস্কার ও রক্ষামূলক দূরদৃষ্টির এতেই পরিচয় মেলে। তাঁহার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নিত্যানন্দকে তাই তিনি সাম্যের বার্তা প্রচারের জন্যে গৌড়বঙ্গে প্রেরণ করলেন ঃ

> "এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
> তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
> মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
> ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।।" (চৈতন্যভাগবত)

এইভাবে অনুদার, সঙ্কীর্ণ, প্রথাসর্বস্ব তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের অচলায়তনে দারুণভাবে আঘাত হানলেন শ্রীচৈতন্য। প্রায় একই সময়ে ইউরোপের ধর্ম, সমাজ ও ভাবজগতে মার্টিন লুথারও (জন্ম ১৪৮৪ খ্রীঃ) প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের কৃষ্টি-জগৎকেও বিরাট্‌ভাবে পরিপুষ্ট করেছিলেন চৈতন্যদেব। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত—সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভা বিকীর্ণ হয়েছে। তাঁহাকে কেন্দ্র করে ধর্ম-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-সাহিত্য ও দর্শন-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পদাবলী কীর্তন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঠাঁটের কীর্তন সঙ্গীত বৈষ্ণব সন্ত-সাধকেরই তো সৃষ্টি। চৈতন্যদেবের প্রভাব স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতেও প্রসারিত।

চৈতন্যদেবই দীর্ঘকাল পরে আবার ঘরকুনো বাঙালিকে বহির্মুখী করেছিলেন তাঁর ভারত-পরিব্রজ্যার পরাকাষ্ঠায়। ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর শ্রীচৈতন্য ভক্তিরসে আপ্লুত করে ভারতভূমিতে জাগাতে চেয়েছিলেন এক অপূর্ব ভাবগত সংহতি-চেতনা। বঙ্গদেশের পর উৎকলভূমি বা উড়িষ্যা। তারপর দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র আর গুজরাট। উত্তর ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ এবং বারাণসী। বহুকাল যাবৎ বাণিজ্যপিপাসু বাঙালি বণিক্‌দের বহির্বাণিজ্য তখন বলতে গেলে

প্রায় অবলুপ্ত। ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক সংযোগও ছিন্ন। চৈতন্যদেবের এই পরিক্রমার ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ও চিত্ত-বিকাশে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল, একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, "দিব্যোন্মাদে মত্ত হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র সদা প্রসারিত থাকত। পাঠান-সূর্য তখন অস্তমান। মোগল-সূর্য সবে উঠছে। এমতাবস্থায় মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসীধাম ও জয়পুরের হিন্দু রাজন্যবর্গের একটা ভূমিকা তাঁর চোখ এড়ায়নি। স্বরূপ-দামোদর প্রমুখ পার্ষদসহ তিনি নিজে থাকলেন পুরীতে, দক্ষিণে রাখলেন রায় রামানন্দকে, গৌড়বঙ্গে নিত্যানন্দকে, বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে এবং রূপ-সনাতন প্রমুখ ছ'জন সমকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও উন্নত সাধককে প্রেরণ করলেন বৃন্দাবনে। এভাবে পূর্ব ভারত, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক এক সুদৃঢ় সংহতিচেতনা ও ভাব-বন্ধনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন।"

শ্রীচৈতন্যের সমাজ-সংস্কারমূলক কার্যাবলী আজকের প্রেক্ষাপটেও পুনর্বিবেচনার যোগ্য। নারীমুক্তি ও পতিতোদ্ধার শ্রীচৈতন্যের সমাজ-সংস্কারের অন্যতম দৃষ্টান্ত। সন্ন্যাস জীবনে সন্ন্যাসের নিয়মানুযায়ী তিনি কিন্তু মহিলাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন দূরে। পতিতা পদস্খলিতাদের সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হরিনাম দিয়ে এদের পাপ-তাপ-গ্লানি ধুইয়ে দিতে চৈতন্যদেব প্রধান উদ্যোগী।

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় আজ ভারতভূমি আবার সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে, বিচ্ছিন্নতার কণ্টকজ্বালায় জর্জরিত। শ্রীচৈতন্যের সুগভীর সমন্বয় দৃষ্টির দিকে তাকানো তাই এ মুহূর্তে খুবই প্রাসঙ্গিক। ভারত পরিক্রমার দীর্ঘ পথে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নানা সম্প্রদায়ের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি তিনি ভক্তি ও পরম শ্রদ্ধায় দর্শন করেছিলেন। সর্বত্রই তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। "স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্তি।।" (চৈতন্য-চরিতামৃত) তাঁর মানবপ্রীতির মূলমন্ত্রে 'এক দেশ এক জাতি এক প্রাণ'-এর মহানুভাব সঞ্জীবিত। পরিশেষে তাই বলতে পারি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের ভাষায়—"বর্তমান ভারতের কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।" ❑

কল্পতরু শচীনন্দন

অপূর্ণ আমরা সবাই, অন্তরে তাই কামনা বাসনা। পূর্ণতম শ্রীভগবান্ তারও অন্তরে বাঞ্ছা! ইহা এক অকথ্য কথন। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় পুরুষোত্তম রসিকশেখর। তবু তাঁর অন্তরে তিনটি বাঞ্ছা।

বাঞ্ছা তিনটি তিনটি বস্তু অবলম্বনে—আশ্রয়, বিষয় ও রস। আশ্রয় রাধা, বিষয় কৃষ্ণ ও সুখানুভূতি রস। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কীরূপ এই প্রথম বাঞ্ছা। ইহা আশ্রয়তত্ত্ব-বিষয়ক। শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদ্য আমার মধুরিমা কীরূপ এই দ্বিতীয় বাঞ্ছা। ইহা বিষয়তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। আমার অনুভবজনিত শ্রীরাধার সুখানুভূতি কীদৃশ এই তৃতীয় বাঞ্ছা। ইহা রসতত্ত্ব অবলম্বনে।

একটি মৌলিক বাঞ্ছারই তিনটি রূপ। আশ্রয়ানুবন্ধী, বিষয়ানুবন্ধী ও রসানুবন্ধী। বাঞ্ছাত্রয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সমগ্রতাকে আলোড়ন করে। এই আলোড়নের চরম পরিণতি নদীয়ার শচীর দুলাল। রসব্রহ্মের যে মৌলিক আকৃতি তার পরম পরিণতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা। শ্রীরাধা নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী। একই রসব্রহ্ম অখণ্ড থাকিয়াই আস্বাদ্য আস্বাদকরূপে দ্বিধা ব্যক্ত। পরিপূর্ণ ভাব না হইলে পরিপূর্ণ রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

সন্দেশ মিষ্ট। তার একটা দাবী আছে আস্বাদিত হইবার। রসনার সঙ্গে একাত্মতায় সেই দাবী মিটে। রসের একটা চিরন্তন দাবী আস্বাদিত হইবার। আশ্রয় বিষয় দুই থাকা পর্যন্ত দাবী মিটে না। দুই এক না হওয়া পর্যন্ত তিন বাঞ্ছা। অতৃপ্ত দাবীর বেদনা জানায় তিন বাঞ্ছারূপে।

শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার বিনা বাঞ্ছা পূর্তির আর উপায়ান্তর নাই। রসের বিষয়কে আজ আশ্রয় হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে রাধা হইতে হইবে।

বিলাসের জন্য একের দ্বৈত। আজ নবায়মান বৈচিত্র্যের জন্য দ্বৈতের একত্ব। দ্বৈতের বৈচিত্র্যসম্পুটিত এই নব আশ্রয়ব্রহ্ম শ্রীশচীসমুদ্র মন্থনোত্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

যখন তিন বাঞ্ছা আস্বাদন করেন তখন গৌরহরি রসিকশেখর। যখন কৃপায় বিগলিত হইয়া বিতরণ করেন তখন পরম করুণ। আনন্দরসের উত্তাল তরঙ্গ যখন স্বাভিমুখী তখন রসিক-শেখরত্ব। যখন জীবাভিমুখী তখন পরম করুণত্ব।

নিজ অন্তর মধ্যে যে তিন বাঞ্ছার পরিপূর্তিময় আস্বাদন উহা গৌরহরির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত নামাক্ষরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মহাপ্রভুর হৃদয়ভরা রাধাভাবে কৃষ্ণ-আস্বাদন। সেই আস্বাদনের মধুরিমা তৎকণ্ঠোদ্‌গীর্ণ নামের মধ্যে বিরাজিত।

তাই গৌরসুন্দরের মহাদান—"নাম প্রেমে মালা গাঁথি পরাইল সংসার।" ব্রজপ্রেমের সূত্রে হরিনামের মালিকা গ্রন্থণ করিয়া—কলিহত জীবের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন। তাই তো পরম করুণ। করুণার পারাবার শ্রীগৌরাবির্ভাবে ধরণী ধন্য হইয়াছেন।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া 'পাদ' আছে। সর্বসমেত ষোড়শ পাদ বা ষোড়শ কলায় বেদান্তশশী পূর্ণতার প্রতীক। ইহা যেন ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ পৌরুষ রূপ। "সম্ভূতঃ ষোড়শকলং আদৌ লোক-সিসৃক্ষয়া।"

* *'যুগান্তর'* ১৩.১২.১৩৮৬

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের পরম স্নেহের পাত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভাষ্য রচনার সঙ্গে একটি কাহিনী জড়িত আছে। খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুরের নিকটস্থ একটি মঠের কর্তৃত্ব লইয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটা গোলযোগ সৃষ্টি হয়। 'গলতার গদীতে' বিচার বসে। শ্রীপাদ বলদেব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী-পাদের কৃপা আজ্ঞা শিরে লইয়া জয়পুর গমন করেন এবং চমকপ্রদ বিচারমল্লতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের বিশাল গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিপক্ষদল বিচারকালে তাহার যুক্তি ও বিচারের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য দেখিতে চান। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতি অল্পকাল মধ্যে এই 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়া সভায় উপস্থিত করতঃ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। ভাষ্যকারের দৃঢ়বিশ্বাস যে তিনি নিজ শক্তিবলে এই কার্য করেন নাই। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা বলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাই 'গোবিন্দভাষ্য' নামকরণ করিয়াছেন। স্বকৃত 'সূক্ষ্মা' নাম্নী ভাষ্যটীকায় নিজেই লিখিয়াছেন "শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যমগাত্ততঃ।" ভাষ্যোপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যো
রাধাবন্ধুর্বন্ধুরা স জীয়াৎ।।"

যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দেশ দিয়াছেন, সেই রাধাবন্ধু বঙ্কিমঠাম শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

"ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্বযুগসার। হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার।।"

এই মহা বিনষ্টির দিনে হরিনামেই রক্ষা। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাবাণী—'প্রলয় কাল, রক্ষা হরিনাম।' জয় গৌর। জয় জগদ্বন্ধু হরি। □

নাম-সংকীর্তনং কলৌ পরম উপায়

মানব জীবনে দুঃখ আছে। বহু প্রকারের দুঃখ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। দুঃখ যাহাতে না থাকে এবং সুখ যাহাতে হয় তাহাই সকল জীবের কাম্য। জীবনে সকল প্রচেষ্টার উৎসই এই, অথচ মানবের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতই উন্নততর হউক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত চেষ্টায় এই বস্তু লাভ সম্ভব হইতেছে না ; দুঃখ যেন দিন-দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। দুঃখ-মুক্তি ও শান্তিলাভ কী প্রকারে হইতে পারে তাহা সকলেই জানিতে চায়। আমাদের শাস্ত্র সেই সংবাদ দিয়াছেন। নিঃসংশয়রূপে বলিয়াছেন, জড়-সভ্যতার যতই চাকচিক্য থাকুক, দুঃখমুক্তি ও শান্তিদানের ক্ষমতা নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক-উন্নতির যুগে এই সত্য যেন অধিকতররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তবে প্রশ্ন, দুঃখ দূরীকরণের উপায় কী, আনন্দলাভের কোন পথ আছে কী? আমাদের সব শাস্ত্রই এক বাক্যে বলিতেছেন—আছে, এক পরম বস্তু

* *শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সংঘ প্রবর্তিত 'বিবর্তন', ফাল্গুন ১৩৭১।*

আছেন। শ্রীগীতা বলিয়াছেন — "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" —অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিলে সবই পাওয়া হয়। আর কোন অভাব থাকে না, গুরুতর দুঃখও আর বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কী সেই পরম বস্তু? শাস্ত্রই বলিয়াছেন— তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তিনি ভগবান্। দুঃখময় অধন্য জীবনের চরম সার্থকতাই শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভে। কারণ, তিনি যে কেবল বড় তা নয়, তাঁকে জানিলেই, তাঁকে পাইলেই বড় হওয়া যায় (বৃহত্ত্বাৎ বৃংহ্নত্বাৎ)। তিনি যে কেবল অমৃতময় তা নয়, তাঁকে লাভ করিলেই জীবের মরণশীলতা ঘুচিয়া যায়, সে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে (যেনাহং অমৃতং স্যাম্)।

ভগবৎ-প্রাপ্তিতে দুঃখ যাইবে ও শান্তিলাভ হইবে ইহা তো বুঝাই গেল। এখন প্রাপ্তির উপায় কী? কোন্ পথে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? আবার উপায়টি এই কলিযুগের উপযোগী হওয়া চাই এবং তাহা সর্বসাধারণের সাধ্যের মধ্যে যদি হয় তবেই তো লাভ। এখন সেরূপ কোন উপায় আছে কী? শাস্ত্র সংবাদ দিলেন নিশ্চয় আছে—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং, ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং, কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।"— অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা ও দ্বাপরে পরিচর্যায় যে পরমবস্তুকে লাভ করা যাইত, কলিতে কেবল হরিনামেই তাহার প্রাপ্তি ঘটে। কলির বহু দোষ থাকিলেও এই এক মহৎ গুণ যে, শ্রীহরিনাম বহুল প্রচারিত। নাম-ই যুগধর্ম, নামী শ্রীহরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নাম-দান করায় যুগও ধন্য। "ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্বযুগ সার। হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার।।" কলিহত জীবের প্রতি পরম করুণা-পরবশ হইয়া মহা-বদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর নাম-প্রেমময় এই অভিনব উপায়টি দান করিয়া জগৎজীবকে ধন্য করিয়াছেন।

সংকীর্তনের জনক গৌরহরি নামদান করিতে কলিতে আবির্ভূত হন। আবার অন্ত্যলীলায় মহাভাবদশার মধ্যে গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে নাম-মাহাত্ম্যসূচক শিক্ষাষ্টকের অপূর্ব শ্লোকগুলি আস্বাদন করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বহু অমৃত পরিবেশনের পর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে যেন সর্বাতিশায়ী মাধুর্য দান করিলেন। দুঃখী কলিহত জীব লাভ করিল এক রসময় আনন্দময় ভগবৎলাভের পথ। পথটি নাম-প্রেমময় অথচ এগুলি জীবকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। আপনার মহাভাবদশাজনিত আস্বাদনের বিভোরতায় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই ইহাদের মাধুর্য নিরুপম।

গম্ভীরাতে গৌরসুন্দর শ্রীরাধা-ভাব-কান্তিময় এই মহাভাব দশায় বিভাবিত। বিপ্রলম্ভ-রসাবতার। কৃষ্ণ-হারা শ্রীরাধার বিরহ আর্তিময় মহাভাবদশা, মাথুর-বিরহে ঝুরছেন নিরন্তর। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সকল আশাই চিরতরে নির্মূল—এই ভাব ও গাঢ় অনুরাগ উত্থিত সুতীব্র দৈন্য ও আর্তিময় দ্বাদশ দশাশ্রিত প্রভু। "শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। এই মত প্রলাপ চেষ্টা প্রভুর রাত্রদিনে।।" দিবারাত্র "কাঁহা কৃষ্ণ, কাঁহা যাই, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাই"— এই ক্রন্দন-হাহাকারে মুখরিত লবণ-সমুদ্র-তীরস্থিত শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র।

এই গৌর-বিরহ-বিষাদ-সিন্ধুতে অকস্মাৎ হর্ষরূপ সঞ্চারী ভাবের উদয়। কৃষ্ণহারা অভিনব-কৃষ্ণ গৌরসুন্দরের মনঃপ্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত। কৃষ্ণ-হারানোর গভীর দুঃখের মধ্যে হঠাৎ এত

আনন্দ কিসের? কৃষ্ণকে পাইয়াছেন কি? না, তা নয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন কেবল। তাতেই এত আনন্দ প্রভুর। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে উপায় দেখিলেন। উপায়টি এই—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

সংকীর্তন যজ্ঞই তো শ্রেষ্ঠ উপায় রহিয়াছে। মহাপ্রভু ভাবিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবত যখন বলিতেছেন তখন আর সংশয় নাই, নিশ্চয়ই পাইব। তাই আনন্দে বলিতেছেন—

"সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।"

জীব তো অনাদি বহির্মুখ। কৃষ্ণস্মৃতি নাই। কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ হারাইয়া স্বরূপভ্রষ্ট। কৃষ্ণই পরম সম্পদ্, কৃষ্ণহারা জীবন ব্যর্থ অধন্য এই বোধও তাহার নাই। মায়া তাহাকে অজ্ঞান অন্ধকারে ফেলিয়া দুঃখসাগরে ভাসাইয়াছে। কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই তাহার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি। কিন্তু অনাদি বহির্মুখ যে তাহার উপায় কী? কৃষ্ণ-হারানোর বেদনা তো তার নাই। কৃষ্ণ- প্রাপ্তির এই আশাও নাই। বিষয়ের জন্য বা ভোগের অপ্রাপ্তির জন্য ক্রন্দন আসে। কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন নাই। থাকিলে কৃষ্ণ-জন্য বেদনাজনিত মহাসৌভাগ্যের উদয় হইত। বিরহ- রসাবতার মহাপ্রভুর কৃপায় জীবন ধন্য হইত। বিষয়-বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম, বিষয়-বিস্মৃতি ও কৃষ্ণস্মৃতি জাগিত। এই প্রেমই পরম প্রয়োজন। অনাদি বহির্মুখের উপায় কী, কীরূপে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কেন, ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম দান করিয়াছেন শ্রীহরি নিজেই। ভাবনা কেন? নামাশ্রয়েই তো প্রেমচিন্তামণি লাভ হইবে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর স্বয়ং বলিয়াছেন—"নাম ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।"

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" নামাশ্রয় ব্যতীত এই যুগে আর ধর্ম নাই। "কেহ বলে নাম হইতে হয় সংসার ক্ষয়। কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়।।" নামের ফলে পার্থিব অভাব অভিযোগ ও সংসার-দুঃখ দূর হওয়া বা মোক্ষলাভ করা কিছুই বড় কথা নয়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণের পক্ষে দুর্লভ যে শুদ্ধ ব্রজ-প্রেম তাহাও লাভ হইয়া থাকে। তীর্থে বাস, লক্ষ লক্ষ গাভীদান বা কোটি জন্মের সুকৃতি কিছুই শ্রীগোবিন্দ নামের তুল্য নয়। নামের ক্ষমতা অপরিসীম অচিন্ত্যনীয়। কেবল নামাভাসেই জন্মজন্মান্তরীণ পাপরাশি দগ্ধীভূত হইয়া যায় ও মোক্ষলাভ ঘটে। আভাসেই যখন এই হয়, তখন নামের মহিমা কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? শ্রীরামগত-প্রাণ তুলসীদাসজী বলিয়াছেন—"রাম না শকহি নামগুণ গাই" অর্থাৎ রাম নামের যে মহিমা স্বয়ং রামচন্দ্র তাহা বলিবার শক্তি ধরেন না। তবে অন্যের কী কথা।

নামের কি মহিমা! রামচন্দ্র তখনও লীলায় আসেন নাই। রাজা দশরথ ভুলক্রমে শব্দভেদী বাণে মৃগ মনে করিয়া সিন্ধুমুনিকে বধ করেন। পুত্রশোকে অন্ধমুনি ও তাঁর পত্নী দশরথের সামনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনটি নিরপরাধ ঈশ্বরানুরাগী প্রাণের বিনাশের কারণ হওয়ায় রাজা দশরথের নিজেকে মহা অপরাধী মনে হইল। প্রাণে দুঃসহ জ্বালা উপস্থিত হইল। প্রাণে আর কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। রাজ্যে ফিরিবেন মানসিক অবস্থা পর্যন্ত এরূপ নয়। ভাবিলেন প্রায়শ্চিত্ত করিলে মনে শান্তি আসিতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়া গুরুদেব বশিষ্ঠের

গৃহে আগমন করিলেন। বশিষ্ঠদেব গৃহে নাই। পুত্র বামদেব রাজা দশরথের আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন — আমি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিতেছি, আপনি স্নান করিয়া আসুন। রাজা আসিলে পর বামদেব বলিলেন— তিনবার রাম নাম উচ্চারণ করুন। দশরথ তাহাই করিলেন। নাম-প্রভাবে তাঁহার সকল পাপ বিদুরিত হইল, তাঁর প্রাণে শান্তি আসিল, তিনি রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। বশিষ্ঠদেব গৃহে ফিরিলে পুত্র রাজার আগমনের কথা ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় সব জানাইলেন। পুত্রের তিনবার রাম নামের বিধান শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। একবারের স্থলে তিনবার কেন? রাম নামে অবিশ্বাস! 'রা' বর্ণটি উচ্চারণ করিতেই সব পাপ চলিয়া যায় আর 'ম' বর্ণটি বলিয়া মুখ বন্ধ করিলে আর পাপ আসিতে পারে না। এ হেন নামে অবিশ্বাস চণ্ডালেই সম্ভব। নামের প্রতি অমর্যাদায় বশিষ্ঠদেব পুত্রকে সক্রোধে কহিলেন— তুমি আমার সন্তানের যোগ্য নও। চণ্ডাল তুমি, তোমার মুখ দর্শন করিতে চাই না, দূর হইয়া যাও। অপরাধী পুত্র পিতৃচরণে শরণাগত হইল। মুনিবর পুত্রকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু বলিলেন তাঁহার বাক্য বিফল হইবার নয়। জন্মান্তরে চণ্ডাল হইতে হইবে। তবে ইহা শাপে বর হইল। যে রামনামের এত মাহাত্ম্য শুনিলেন সেই পরব্রহ্ম শীঘ্রই লীলায় আসিবেন। চণ্ডাল দেহ হইলেও তাঁহার অপার কৃপা লাভ করিবে। কেবল তাঁহার দেখা নয়, রামচন্দ্রের মিত্রতা ও আলিঙ্গন লাভে ধন্য হইবে। অতঃপর বামদেব প্রাণ বিসর্জন করিয়া গুহক চণ্ডাল হইয়া আসিল, পিতৃবাক্য সকল সফল হইল।

নামের শক্তি মুখে বলা যায় না। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন— নামমাহাত্ম্য লেখনীর অসাধ্য, গুরুমুখে শ্রোতব্য। নচেৎ এত মাহাত্ম্য যে, বিশ্বাস স্থাপন করা শক্ত। যেমন শাস্ত্রে আছে "একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।।" মানুষের দুষ্কৃতি হেতু, দুর্দৈব হেতু নামমাহাত্ম্য শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। এই নামাপরাধের জন্য নাম করিলেও নামের কৃপা হয় না, হইলেও দেরী হয়। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আরও জানাইয়াছেন— ইহা "স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার সাধন করে।" অর্থাৎ নাম কীর্তন যিনি করেন তারই কেবল মঙ্গল হয় না, যতদূর ঐ ধ্বনি যায় ততদূরের লোককে উদ্ধার করে। কেবল তাহাই নয়, ইহা "চতুর্দশ ভুবনের মাঙ্গল্য বিধান করে।" অথচ নাম গ্রহণের যোগ্যতা সকলেরই আছে। এমন ভুবনমঙ্গল নাম থাকিতে লোক নিজ মঙ্গলের জন্য কিনা এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে? কি দুর্দৈব আমাদের!

এখন দেখা যাক নামেতে এত শক্তি আসিল কোথা হইতে। শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। সপরিকরে আসেন এবং কার্যান্তে সগণেই নিত্যধামে চলিয়া যান। দুঃখী জীবের জন্য রাখিয়া যান তাঁহার অভয় ও অমৃতপ্রদ 'নাম-চিন্তামণি'। শুধু তাহাই নহে, নামের মধ্যে নিজ সর্বশক্তি আধান করিয়া যান। 'সর্বশক্তি দিলা নামে করিয়া বিভাগ।' নামের নিজের শক্তি তো ছিলই, প্রভুর শক্তি পাইয়া নাম এখন নামী অপেক্ষাও মহীয়ান্ হইয়াছে। রামচন্দ্র একজন পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেন। নাম যুগে যুগে শত শত অহল্যাকে উদ্ধার করিতেছেন। এত অহল্যা কোথায় এখন? তবে শুনুন— 'হল্যা' অর্থ চাষের যোগ্য, 'অহল্যা' অর্থে চাষের অযোগ্য, পাষাণ। জড় সভ্যতার আঘাতে জীবহৃদয় পাষাণ হইয়া যাইতেছে,

সাধন-ভজনের কর্ষণ চলে না ; সেই অহল্যাসম পাষাণ-হৃদয়ে রাম নাই, কে তাদের উদ্ধার করে? রাম-নাম আছেন ; নামাশ্রয়ে কত শত ঘোর বহির্মুখ পাষাণ-হৃদয় নিয়তই গলিয়া যাইতেছে। নামী উদ্ধারণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, নাম এখন মহাউদ্ধারণ লীলা প্রকট করিয়া শত শত জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। হরিনামের মূর্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহান্ বাণী সার্থক—"হরি শব্দ উচ্চারণে, হরিপুরুষ উদয়।"

শ্রীরামচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সাগর বন্ধন করিয়া লঙ্কায় গমন এবং রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন। এখন এই কাজ কে করিবে? আমাদের সকলের সামনেই দুস্তর ভবসাগর। তারপর দুর্দৈবরূপ রাবণ আমাদের ভক্তিসীতা অপহরণ করিয়াছে। রাম নাই, রাম-নাম আছেন সাগর বন্ধনের জন্য। নামীর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইলেও, নামের তাহার প্রয়োজন নাই। রাম-নাম লইয়া হনুমান অনায়াসেই সাগর পার হইয়া গেল। নাম আশ্রয়ে বিপৎসঙ্কুল দুঃখময় ভব-সংসারের কত জন পার হইয়া যাইতেছ। নামের এত সামর্থ্য। নাম আমাদের দুর্দৈবরূপ রাবণকে অনায়াসেই বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তিরূপিণী সীতাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন— "এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।"

নামে সর্বশক্তি দান করিয়াই করুণা-শক্তি ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষের প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য বহু নাম প্রকট করিয়াছেন। যার যে নামে রুচি লাগে, সে সেই নাম আশ্রয়েই পরমপদ লাভ করিবে। "অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।।" (মহাপ্রভু) আবার নাম গ্রহণের বিষয়ে স্থান-কালের কোন বিধি-নিষেধ রাখেন নাই (নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ)। যে-কোন অবস্থাতে যে-কোন সময়ে নাম-গ্রহণকারীকে নাম কৃপা করিয়া থাকেন।

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়।।"

এ হেন অসীম করুণাশক্তি নামেতে লুক্কায়িত আছে। স্বরূপতঃ নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়াই নয়, নামীর নিকট নিজ-নাম আবার পরম প্রিয়। তাই নামের কৃপা হইলে মুহূর্তেই অনাদি বহির্মুখ জীবের জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়বাসনা তিরোহিত হইয়া যায়। ব্রজলীলায় মহাবহির্মুখ ভোগসর্বস্ব কালীয় সর্পের শত কামনার প্রতীক যে শত ফণা তাহার উপর নিজ চরণ অঙ্কিত করিয়া যমুনাকে বিষমুক্ত ও নিজ লীলার উপযোগী করেন। বহু বাসনা জীবের অশান্তি ও দুঃখের কারণ। হৃদয়-যমুনাকে কে ভোগবাসনা-বিষমুক্ত করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার ক্ষেত্র করিয়া দিবেন? কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ভাবনা কী, অভিন্ন কৃষ্ণ নাম আছেন—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই ভোগবাসনাজনিত মলিন চিত্তের মার্জন (চেতোদর্পণমার্জনম্) এবং সর্বগ্রাসী সংসার-দুঃখ-যন্ত্রণার নিবারক (ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্)। নামাশ্রয়েই জীবন সর্বপ্রকার মঙ্গলের আকর হইয়া ওঠে। তাই মনে হয়, বর্তমান দুঃখদুর্দশাপূর্ণ

ও সমস্যাবহুল যুগসংকটের দিনে নামসংকীর্তনই পরম উপায়। নিরন্তর নামামৃত পানে সর্বজীব ধন্য ও কৃতার্থ হউক। নামপ্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের ও নিতাই-গৌর অভিন্ন তনু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের করুণা সর্বজীবের উপর বর্ষিত হউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সর্বোপরি বিরাজিত থাকুন। জয় গৌরহরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ❑

গৌর তত্ত্বকথা

গীতায় ভগবানের পরম উক্তি — মানুষ সাধনবলে আমার স্বাধর্ম্য লাভ করিতে পারে, আমার মত হইয়া যায়। উপনিষদ্‌ও সেই কথা বলিয়াছেন— ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা বড় কথা আর আমরা জানিতাম না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ইহা অপেক্ষা একটি মধুর কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, ভগবান্ ভক্তকে চাহেন ; চাহিতে চাহিতে ভগবান্ ভক্ত হইয়া যান। ভক্তের ভূমিকায় ভগবান্ দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি নদীয়ার রাজপথে।

মানুষ যখন ব্রহ্মভূত হয় বা মানুষ যখন ভগবানের স্বধর্মতা লাভ করে তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। বস্তুতঃ তখন সে মানুষ নয়, ভগবান্। পক্ষান্তরে ভগবান্ যখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার ভগবত্ত্ব হারাইয়া ফেলেন তখন তিনি ভগবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিতে আরূঢ়। তখন আর তিনি ভগবান্ নহেন, মানুষ, পূর্ণ মানুষ। পূর্ণ মানুষ হইয়া তিনি নিজের মধুরিমার অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন। এই বার্তার বাহক নবদ্বীপ ধাম। আপনাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ণ মানুষ হইয়া নদীয়ার মাটিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ কত সুন্দর হরি জানিবার জন্য হরি-পুরট-সুন্দর দ্যুতি লইয়া পথে পথে কান্দিতেছেন 'হরি হরি' বলিয়া। এই সংবাদ অশ্রুতপূর্ব। নদীয়ায় এই সন্দেশ মানব-সমাজের হস্তে অভিনব অবদান। বলিলাম সন্দেশটি অশ্রুতপূর্ব, কিন্তু কথাটি ঠিক বলি নাই। আদি গ্রন্থ শ্রুতি। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। সেই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে আমরা সবিস্ময়ে পাঠ করি—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।"

নিরাকারবাদী শংকরও এই 'পুরুষবিধ'কে নিরঞ্জন নির্গুণ জ্যোতির্ময় বলেন নাই। স্বগতভেদশূন্যও বলেন নাই। বলিয়াছেন হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট বিরাট্ স্বরূপ। এই হস্তপদাদি কখনও প্রকৃতির বিকারজ হস্ত-পদ হইতে পারে না (কারণ সৃষ্টির আদিরূপের কথা বলা হইতেছে তখন পর্যন্ত কোন ঈক্ষণে প্রকৃতির বিকার আরম্ভ হয় নাই)। অতএব অপ্রাকৃত হস্তপদ-বিশিষ্ট একটি পুরুষ স্বীকৃত হইল। এই পুরুষই গীতার পুরুষোত্তম।

ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন, পুরুষোত্তমের রমণ ইচ্ছা জাগিল। একাকীতে রমণ হয় না। তিনি দ্বিতীয় সাজিতে ইচ্ছা করিলেন।

* *'মহানাম অঙ্গন', ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (চৈত্র ১৪০৫)*

"স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।"

"আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ"— এই কথাই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপদামোদর আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। "একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।" ইহাই রসশাস্ত্রের বিষয় ও আশ্রয়।

বিষয় চিৎ শক্তি, আশ্রয় আহ্লাদিনী শক্তি। এই আহ্লাদিনী শক্তির মূর্তিই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার প্রয়োজনীয়তা কী তাহা পূর্বাহ্ণে ধ্যান করিতে হইবে।

ভগবান্ সর্বজ্ঞ, সবই জানেন। কেবল জানেন না, তিনি নিজে যে কত সুন্দর তাহা। গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন কত কথা, বলেন নাই কেবল নিজ মাধুর্যের বার্তা। বলেন নাই তাঁহার স্বরূপে কত আনন্দের ঘনতা, তাঁহার রূপে কত প্রীতির মধুরতা, তাঁহার বংশীতে কত মর্মস্পর্শী মাদকতা। তাঁহার প্রেমের কত প্রাণমাতানো উদ্বেলতা বলেন নাই, বলিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুভূতি নাই, অনুমিতি আছে, তাহা বলা হয় নাই।

শ্রীভগবানের নিরুপম সৌন্দর্যের কথা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যের কথা বিষয়ক অনুভূতি আছে একমাত্র ভক্তজনের। সর্বাধিক আছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রজজনের। সর্বাতিশায়ীরূপে আছে ব্রজের ভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধার। রাধার সঙ্গে সহানুভূতি ছাড়া কৃষ্ণের উপায় নাই নিজের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করিবার। সেই সহানুভূতি পাইবার লোভে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভূমিকায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই দ্বিতীয়টির উপযোগিতা আমরা পাইলাম নদীয়ায় আসিয়া। নদীয়ায় পাইলাম এই মহান্ অভিনেতাকে। এখানে চিৎ শক্তি অভিনয় করিতেছেন হ্লাদিনী শক্তির ভূমিকায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধা সাজিয়াছেন সর্বতোভাবে। এই মহান্ মহা অভিনেতা মর্ত্যে ধরণীর মাটিতে প্রকট হইয়াছিলেন গঙ্গার তটে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা লগ্নে। ঐ সময় চন্দ্রগ্রহণের উল্লাসে বাতাস ছিল কীর্তনমুখর। ঐ সময় নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের শুষ্ক চর্চায় মানুষের জীবন ছিল তৃষ্ণাব্যাকুল। ঐ সময় জীবজগতে দুঃখের তীব্রতায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নয়ন ছিল অশ্রুসজল। শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" মূর্তি ধরিয়াছিলেন শচীদেবীর অঙ্কদেশে। তিনি একের পর দুই হওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সেই দুই সমালিঙ্গিত তনু লইয়া সর্বসমক্ষে ব্যক্ত হইয়াছিলেন লীলারঙ্গমঞ্চে শ্রীবাস আঙ্গিনায়। তাঁহার রূপ দেখিয়া নরনারী হইয়াছিল স্তব্ধ। এমন একটি লোক ছিল না তৎকালে বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যে তাঁহাকে ভালবাসিত না। ঝাড়খণ্ডের বনমাঝে বন্য হিংস্র জন্তুও ঐ পুরুষবরের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। চতুষ্পদ পশু সিংহ ব্যাঘ্র দুই পদে দাঁড় হইয়া তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় বাংলা তথা ভারতের তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ হইয়াছিলেন বিস্ময়ান্বিত। দিগ্‌বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী হইয়াছিলেন পরাজিত। সর্বশ্রেষ্ঠ বেদান্ত আচার্য বাসুদেব সার্বভৌম ঐ পুরুষবরের বা অভিনেতার স্বরূপ একবিন্দু জ্ঞাত হইয়া হইয়াছিলেন গললগ্নীকৃতবাসে পদাশ্রিত। কাশীর দশ হাজার শিষ্যের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার মধ্যে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় মূর্তি দেখিয়া হইয়াছিলেন বিমোহিত। তাঁহার 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমের কান্নায় আলালনাথের মন্দিরে কঠিন শিলা হইয়াছিল বিগলিত। তাঁহার ঔদার্যের

পাদমূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল হীন পতিত কাঙ্গাল কত শত অগণিত। রাধাবেশী ঐ শ্রীকৃষ্ণের উদার প্রেমের ছিটাফোটা আস্বাদন করিয়া ধন্য শতধন্য হইয়াছিল বিশ্ববাসী নরনারী। মহামূল্যবান্ সম্পদ্ দান করিয়াছিলেন দাতা-শিরোমণি যারে তারে অকাতরে অবিচারে পথে-ঘাটে। মহাসাধনদুর্লভ ব্রজপ্রেমরসের নির্যাস ছিল তাঁহার মহাদানের সামগ্রী। দান করিলেই দাতা হয় না। ঘরের আপনজনকে মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কার দিলেই দাতা বলে না। আবার পথের কাঙ্গালদের মুষ্ঠি করিয়া পয়সা ছড়াইলেই দাতৃত্ব প্রকাশ পায় না। অতি মূল্যবান সম্পদ্ যদি পথে ঘাটে কাঙ্গাল-দরিদ্রকে দান করা যায় তবে বলে দাতা। গৌরসুন্দর মহাসাধন-দুর্লভ ব্রজের প্রেমভক্তিরস দান করিয়াছেন যত্রতত্র। আত্মপর ভাবনা করেন নাই, যোগ্য অযোগ্য চিন্তা করেন নাই। অপেক্ষা করেন নাই সময় অসময়ের।

"পতিত দেখিয়া কাঁদে।
হিয়া স্থির নাহি বান্ধে।"

দীন পতিত দেখিয়া অশ্রুজলে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন। পতিতকে পতিতপাবন করিয়াছেন। তাই তো বদান্যশিরোমণি গৌরসুন্দরের মহাদানের মহামূল্য অনুভব করিয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, "নরসিংহ রূপে বধ করিয়াছেন দৈত্যকুল রাক্ষসকুল, তাহাতে এমন কী হইয়াছে? সিদ্ধ কপিলদেব যোগমার্গের ক্রিয়াযোগ শিক্ষা করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন, শিব রূপে সংহার করেন, তাতে জগতে বিশেষ কী হইয়াছে? ভারাক্রান্ত ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বরাহরূপে, তাতেই বা বিশেষ কী হইয়াছে? এই ঘোর কলিযুগে দুর্গত জীবের পরাশক্তি লাভের জন্য প্রেমভক্তির যে অপূর্ব সুন্দর পথ জীব-জগৎকে দিয়া গিয়াছেন সেই দাতা-শিরোমণি গৌরসুন্দরের দানের তুলনা কোথায়?"

প্রেমের গতি উভয়মুখী। ভক্ত যায় ভগবানের দিকে, ভগবান্ যায় ভক্তের দিকে। ব্রজে ব্রজসুন্দরের দিকে ছুটিয়াছেন অভিসারে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী আর ব্রজ-বিহারী নিরন্তর অনুধ্যান করিতেছেন ভানুবালার প্রেমের মহিমা আস্বাদিত সুখের গভীরতা। দুই মিশিয়া এক হইয়া গেলে ছোটাছুটি বন্ধ হইয়া যায়। ব্রজে রাধাগোবিন্দের চরম মিলনে লীলার উপসংহার। ব্রজের যেখানে উপসংহার, নদীয়ায় সেখানে উপক্রমণিকা। ছোটাছুটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যাঁহার তিনি আবার ছুটিতেছেন। খোঁজাখুঁজি নাই যাঁহার তিনি আবার খুঁজিতেছেন, "কাঁহা কৃষ্ণ কাঁহা যাই, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাই।" আনন্দরসের ঠাকুর নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। গাঢ় মিলনে মিলিত সম্ভোগ-রসের বিগ্রহ প্রতি পথে পথে বিরহ-বেদনায় ঘুরিতেছেন। এই মিলন-বিরহে প্রবল অশ্রু-ধারা অপূর্ব রহস্যময়। এই অশ্রুধারা-সিক্ত নিরুপম প্রেমভক্তি-সরণী জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন জগন্নাথসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই নিরুপাধি দান কেহ কোনদিন কোথাও দেখে নাই। ইহা নবদ্বীপের মহাসম্পদ্। এই সম্পদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"জয় নবদ্বীপ, ভারত প্রদীপ।।"

এই বিশাল ভারতভূমির বহুমুখী বিরাট্ সংস্কৃতি আজ অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। এই

নিমজ্জিতপ্রায় মহাসংস্কৃতি যদি কেহ যথাযথ রূপে দর্শন করিতে চান, মানব জাতিকে উহা বিলাইয়া সঞ্জীবিত করিতে প্রবল বাসনা পোষণ করেন; তাহার হাতে একটি আলোর প্রয়োজন। সে আলোটি প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মতে—

নদীয়ার প্রেমভক্তি-সমুজ্জ্বল প্রদীপ। ❑

রসব্রহ্মের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর

"নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।" চৈঃ চঃ

দুঃখী জীব। দুঃখের পেষণে জর্জরিত জীবনিবহ। দুঃখ যাইবে কী হইলে জানিতে চায় সকলে। ঋষি বলেন, আপনাকে জান, আপনার শাশ্বতী সত্তা অন্তরে অনুভব কর, তবে দুঃখ যাইবে। 'আত্মানং বিদ্ধি।' আত্মসন্ধানেই মিলিবে শান্তির উৎস।

নিজ আত্মাকে জান। আরও গভীর কথা, বিশ্বের আত্মাকে জান। আরও নিগূঢ় কথা, বিশ্বের যিনি আত্মা তিনি যে নিজেকে নিজে জানিতেছেন, তাহা জান। বিশ্বম্ভরের আত্মাস্বাদনের আস্বাদন কর। পরমাত্মার আস্বাদনই লীলা। লীলাসিন্ধুতে ডুবিলেই জীবের পরাশান্তি প্রাপ্তি।

নিজেকে জানার কার্যই চলিতেছে সারা বিশ্ব ভরিয়া। ফুল ফুটে, নদী ছুটে, পাখী গায়, বাতাস বয়। নিখিল বিশ্বের যত বেগ তার মূলে রহিয়াছে, নিখিলানন্দের আত্মাস্বাদনের আবেগ। ব্রহ্মাণ্ডের যত বিভূতি তার মূলে রহিয়াছে রসব্রহ্মের রসের আকুতি।

পরমপুরুষ শ্রীহরিপুরুষ আছেন আত্মধ্যানে নিজেকে নিজে ভোগ করিতে। ভোগ করিতে হইলে ভালবাসিতে হইবে। একাকী কিন্তু চলে না ভালবাসা। "একাকী নৈব রমতে।" তাই ভালবাসিতে, ভালবাসিয়া নিজ রসমধু নিজে আস্বাদন করিতে এক হইলেন দুই। "আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ।"

দুই হইতেই তিন হইলেন। তিনি সৎ, যাহাকে পৃথক্ করিলেন তিনি চিৎ। দুয়ের সম্ভোগে আনন্দ। তিনিই সচ্চিদানন্দ। তিনি বিষয়, যাহাকে পৃথক্ করিলেন তিনি আশ্রয়, মিলনে ঘনায়িত হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন যিনি তিনি শ্রীরাধা। আস্বাদনের চমৎকারিতাই মহারাস। এই রসসম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া-বিনোদিয়া শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর।

রসব্রহ্মাণ্ডের স্বানুভূতি আজ প্রকটিত হইয়াছে এই ধরণীর ধূলিতে। পরমপুরুষের আস্বাদন-বিচিত্রতা আজ মূর্তি পাইয়াছে নদীয়ার রাজপথে। ভূমা আসিয়াছেন ভূমিতে। রসের ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছেন নবদ্বীপের বাজারের মধ্য দিয়া। ইহা এক অঘটন। ঘটিবার কথা নয়। তবু ইহা ঘটিয়াছে ইতিহাসেই।

বিশ্বের যেটি মৌলিক সম্ভোগ, আদি আশ্রয়তত্ত্ব ও বিষয়তত্ত্বের নিবিড় মিলন, সেটির পূর্ণাঙ্গতা লাভ হইয়াছে শ্রীরাধা-গোবিন্দের একাঙ্গতায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে। ইহা ঘটিয়াছিল, আজ হইতে চারিশত পঁচানব্বই বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণে, হরিকীর্তনে, পূর্ণিমা লগনে। লীলা নিত্য। তাই আজও উহা ঘটিতেছে। এই নিত্যত্ব জানাতেই

সৃষ্টি ও সৃষ্টির সার্থকতা।

আজ শুভ সন্ধ্যায় তাই আবার জাগিয়াছে তাঁহাকে জানিবার প্রবল আগ্রহ। যুগ যুগ ধরিয়া জাগিবে। জানিবার কথা দুইটি মাত্র। একটি তাঁহার নিরুপম বিগ্রহ, অপরটি তাঁহার অফুরন্ত অনুগ্রহ। বিগ্রহটি সোনার গৌরাঙ্গসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্যামনাগর। অনুগ্রহটি হরিনাম বিতরণে। নামপ্রেমের মালিকা গাঁথিয়া বেদনাহত জীবের কণ্ঠে সমর্পণে।

বস্তুর বহিরভিব্যক্তিই দ্যুতি। প্রাকৃত বস্তুর ভিতর বাহির ভিন্ন, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর নহে। অপ্রাকৃত কান্তি বস্তুর স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছু নহে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্যামবর্ণ, তাহা নিরর্থক নহে। শৃঙ্গার রসের বর্ণই হইল শ্যাম। যিনি শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিধর তিনি শ্যামসুন্দরই হইবেন।

অনুরাগের বর্ণটি অরুণ। গাঢ়ানুরাগ বা মহাভাবের বর্ণই হইল গৌর। মহাভাবময়ী ভানুবালা গৌরাঙ্গী। বর্ণটির ব্যক্তি ভাবের প্রগাঢ়তায়। মহাভাববতীর মাদনাখ্য ভাব অন্তরে গ্রহণ করিলে শ্যামের বাহিরের কান্তি স্বতঃই রূপায়িত হইবে। মধুর রসের বর্ণ শ্যাম বটে, কিন্তু যতক্ষণ কাঁচা। রসাল ফলটি কাঁচা যখন শ্যাম বর্ণই বটে, কিন্তু পাকিলেই গৌর।

রসের আস্বাদন ভাবে। ভাবের অভিব্যক্তি রসে। নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ। নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা। একই রসব্রহ্ম অখণ্ড থাকিয়াই আস্বাদক আস্বাদ্যরূপে দ্বিধা ব্যক্ত। ভাবের পরিপূর্ণতায় রসের পূর্ণ আস্বাদন। মহাভাব ছাড়া রসরাজের সম্ভোগের চরমতা হয় না।

রসের বিষয়কে আজ আশ্রয় হইতে হইবে। শ্রীশ্যামসুন্দরকে শ্রীরাধা হইতে হইবে। বিলাসের জন্যই একের দ্বৈত। আজ আবার নবায়মান বৈচিত্র্যভোগের জন্য দ্বৈতের একত্ব। ভেদাভেদের নাম অচিন্ত্যতা, রস সংবেদনে পর্যাপ্ত। দ্বৈতের বৈচিত্র্য সম্পুটিত নব রসের অদ্বয় ব্রহ্মই শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া বিষ্ণুপ্রিয়েশ শ্রীগৌরহরি।

শান্তিহারা জীব চায় শান্তিময়কে। ছুটিতে চায় অন্তর দিয়াই, কিন্তু কেহ পারে, কেহ পারে না। পারে না যারা, তাদের তরে নামিয়া আসিয়াছেন পরাৎপর পুরুষ মানবের দুয়ারে। করুণায় গলিয়া, বিলাইয়া দিলেন আপনাকে— আপনার অভিন্ন মহানামকে। দিলেন উজ্জ্বল রসের প্রেমের সূতায় গাঁথিয়া নামের মালিকা।

নাম সাধন। প্রেমধন সাধ্য। সাধ্য-সাধন একত্রীভূত করিয়া দোলাইয়া দিলেন ব্যথাহত মানুষের বক্ষে। নির্বাপিত হইল অশান্তি। বিশ্রান্তি পাইল আপামর সকলে তাঁর আকাশের মত উদার অঙ্কদেশে। হরিকীর্তনের উন্মাদনায় জাতি জাগিল নবচেতনায়।

সংকীর্তনের পিতা মহাপ্রভু। হরি, কৃষ্ণ, রাম এ সব নিত্যকালের নাম, নূতন কিছু নহে। কীর্তন কথাটিও নূতন নহে। তবে কী দিলেন জন্মদাতা? নামও ছিল কীর্তনও ছিল। কিন্তু ছিল না নামে এত মধুরিমা, কীর্তনে এত উন্মাদনা। কীর্তনের পিতা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন নামের মধ্যে ব্রজমাধুর্য। নামাক্ষরের মধ্যে উজ্জ্বলরস সম্পুটিত করিয়া তাহাতে আনিয়াছেন নবায়মান প্রেরণা।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন হরিনাম করিয়াছেন উদাত্ত কণ্ঠে, তখন তিনি কেবল মুখেই নাম করেন

'শ্রীসুদর্শন'। ৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৮৭)।

নাই। তাঁহার সমস্ত অন্তর দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে তিন বাঞ্ছার পরিপূর্তিময় আস্বাদন, উহা কণ্ঠোৎসারিত নামাক্ষরের মধ্যে করিয়াছে অনুপ্রবেশ।

আচার্যেরা কহিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণং হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।" অক্ষরগুলি শ্রীগৌরহরি উচ্চারণ করেন নাই, উদ্‌গীরণ করিয়াছেন। উদ্‌গার ভোজনের পূর্ণতার প্রকাশক। উদ্‌গার বহিয়া আনে আহার্য বস্তুর আমোদ। মহাপ্রভুর অন্তর ভরা রহিয়াছে রাধাভাবে কৃষ্ণ আস্বাদন। সেই আস্বাদনের মধুরিমা তৎকণ্ঠোদ্‌গীর্ণ নামের মধ্যে হইয়াছে অনুপ্রবিষ্ট।

আপনাকে বলিলাম, 'আগুন লেগেছে।' আপনি নড়িলেন না, খবর নিলেন— কোথায়? তখন পথে কেহ আর্তনাদ করিল 'আগুন আগুন' বলিয়া। আপনি দিগ্‌বিদিক্ ভুলিয়া ছুটিলেন। কেন এমন হয়? আমার দেওয়া আগুনের খবর বুদ্ধির রাজ্যের। পথিকের আর্তনাদ অনুভূতির ভূমিকায়। তার উচ্চারিত 'আগুন' শব্দটায় উদ্বেগ-ত্রাস-আশঙ্কা ভরা। উহা উন্মাদনা জাগাইয়া আপনাকে ছুটাইয়াছে।

শব্দে যদি বেদনা থাকে, তবেই তাহা জাগাইতে পারে চেতনা। গৌর-কণ্ঠের 'কৃষ্ণ' শব্দে আছে বিরহিণী-ব্যথা-পুঞ্জিত বেদনা। তাই তাহা জীব-হৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া গৌরের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছে। ছিল হরি শব্দ চিরকালই। আজ শ্রীগৌরমুখে ঐ নামে যে অভূতপূর্ব আকর্ষণ জাগিল, উহা চিরসন্নিবিষ্ট হইয়া রহিল নামের অভ্যন্তরে। ইহাই দাতা-শিরোমণির মহাদান।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর হরিনামকে 'রাই-ঋণ' কহিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরের রাই-ঋণ শ্রীনামাক্ষরেই মূর্ত। আসুন সকলে মিলিয়া গোরাচাঁদের ঋণ শোধ করি। গোরা ভাবে মজিয়া আর্তকণ্ঠে নাম উচ্চারণে নামীকে ভাবি। ইহাই জীবোদ্ধারণ। নিখিল জীবকুলের ঐ আকুলতার জাগরণেই মহাউদ্ধারণ — মহাশান্তি। জয় জগদ্বন্ধু হরি। জয় প্রাণের গৌর হরি। ❑

প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও বর্তমান যুগ-সমস্যা

আজি হইতে চারিশত চুয়াত্তর বৎসর পূর্বে। আমাদেরই মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন প্রেমঘন বিগ্রহ এক যুগের মানুষ। বাংলার কোলে, ভাগীরথীর কূলে। কীর্তন-মাতোয়ারা নদীয়ায় পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায়, শচী-জগন্নাথের আনন্দমুখর আঙ্গিনায়।

তাঁর রূপ ছিল অনবদ্য, গুণ ছিল অনুপম, মাধুর্য ছিল অনির্বচনীয়। আকৃষ্ট হয় নাই তাঁর প্রতি এমন মানুষটি ছিল না সেই যুগের মাঝে। মুছাইয়া ছিলেন তিনি সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য, ঘুচাইয়াছিলেন তিনি সকল নীচতার বেদনা, মিটাইয়া দিয়াছিলেন তিনি সকল প্রকার সমস্যার কঠিনতা। তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তিনি এক মহাসাম্যনীতির ভূমিকায় বৈষম্যপিষ্ট সমাজের অগণিত নরনারীকে।

ধন্য হইয়াছিল অশান্ত জীবনিবহ তাঁর ডাকে শান্তির সন্ধান পাইয়া। আবার, আজিকার দিনে

* *'যুগান্তর'।*

উদ্ভব হইয়াছে সমাজে যে নবতর যুগসমস্যার—তাহার সমাধান খুঁজিতে আমরা আকূল হৃদয়ে তাকাইব সেই মহাযুগ-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মের দিকেই। সর্বাগ্রে আমরা বুঝিব বর্তমান যুগ কী, তার সমস্যা কী; তারপর বেদনার অন্ধকারে আলোকের অনুধ্যান করিব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাচন্দ্রিকায়।

বর্তমান যুগ বলিতে বুঝায় বিজ্ঞানের যুগ। সভ্যতা বলিতে বুঝায় যন্ত্রের সভ্যতা। এই সভ্যতার দুই বিপরীতমুখী টানে মানবসমাজ ক্ষতবিক্ষত। বিজ্ঞানের প্রসাদে দূর নিকট হইয়াছে, কিন্তু নিকট দূরে সরিয়া গিয়াছে। দূরদেশবাসী প্রতিবেশী হইয়াছে, নিকট প্রতিবেশী অপরিচিত হইতেছে। লোকে গায়ে গায়ে ঠেকিতেছে, প্রাণহীন যন্ত্রের ঠেকাঠেকির মত। প্রাণে প্রাণে মিশিতেছে না জীবন্ত মানুষের মত। ঠেলাঠেলি আছে, গলাগলি নেই। কাছে আসিয়াছে দেহ, দৈহিক প্রয়োজন। দূরে অতি দূরে চলিয়া গিয়াছে প্রাণ ও আত্মিক প্রয়োজন। বাড়িয়া চলিয়াছে দেহের তৃষ্ণা, মরিয়া যাইতেছে আত্মার ক্ষুধা। বিলাস সম্ভার বর্ধন করিতেছে বিপণির সৌন্দর্য, আত্মিক গুণ উপেক্ষিত হওয়ায় জীবন হইতেছে প্রাণের প্রাচুর্য। মানুষ আয়ত্ত করিয়াছে তার হাত পা চোখ কান বর্ধিত করিবার যন্ত্র, ভুলিয়া গিয়াছে আত্মাকে বিশালতায় পৌঁছিয়া দেবার মন্ত্র। পথঘাট জনবহুল, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে, আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া যাওয়ায় মানবেরই জড়সাধনা তাঁহার জন্য নির্মাণ করিতেছে নরমেধ যজ্ঞের বিভীষিকা পটভূমিকা। মিলন মুরলী মূক, বাজে বক্ষবিদারী রণ-দামামা।

সমাধান কোথায় এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের, দূর হইবে কেমনে এই বিরাট্ মানবীয় ব্যবধান ইহাই এই যুগের মৌলিক জিজ্ঞাসা। কখনও সম্যক্ বুঝিয়া, কখনও কিছুই না বুঝিয়া বর্তমান কালের নরনারী ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরই খুঁজিতেছে। ব্যাবহারিক পারমার্থিক ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম মানব আজ দিনের পর দিন সহস্র সহস্র সভা ডাকিতেছে ভাঙ্গিতেছে, মূল প্রশ্নের জবাব দেয় নাই। বাস্তব সমস্যার সমাধান পায় নাই। আজিকার এই জীবন- জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিতে হইবে সেই প্রেম-পুরুযোত্তম শ্রীগৌরসুন্দরের পাদমূলেই। এই দিনের মহান্ধকারে ভরসা নদীয়ার প্রেমের দেউটিই।

সমাজের যে অবস্থা করিয়াছে আজ জড়বিজ্ঞানের গবেষণা, সেদিন তাহাই ঘটিয়াছিল শুষ্ক নব্য ন্যায়ের ব্যর্থ বিচারৈষণা। জীবন ছিল রসহীন, রসের শুষ্ক বিচার ছিল শত শত পণ্ডিতসভায়। ব্রহ্ম ছিল অদ্বিতীয় অবিভক্ত শাস্ত্রের বিচারে, মানবের সমাজ ছিল লক্ষধা বিভক্ত বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়ালে। শাস্ত্রে ছিল যুক্তি-সম্পদ্, হৃদয় ছিল দরদহীন। ভাষ্যের অনুভাষ্য ছিল পুঁথিতে লেখা, চিত্ত ছিল মানবীয় ঔদার্যবর্জিত। আজ যেমন যান্ত্রিক প্রাচুর্যের মধ্যে হৃদয়ের দারিদ্র্য, সেদিন ছিল পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্যের মধ্যে আত্মিক দৈন্য। আজ যেমন দেশভরা যন্ত্রের খেলা, সেদিন ছিল রাজ্যভরা পণ্ডিতের মেলা। পাণ্ডিত্য মানুষকে কঠোর করিয়া কাঠ বানাইয়াছিল, আজ যন্ত্র মানুষকে যন্ত্র করিয়া যন্ত্রণা বাড়াইয়াছে। এত থাকিতেও কবি দরদী ভাষায় কহিয়াছেন, "প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।" মানুষের অন্তরের ব্যথা বুঝে এমন মানুষ কই? বেদনাহত কবি কাঁদিয়া কহিয়াছেন মর্মান্তিক কথা— "সবার ওপরে মানুষ-সত্য, তাহার উপরে নাই।"

একজন প্রাণের মানুষের জন্য একজন হৃদয়-জুড়ানো সুহৃদের জন্য গোটা জাতি ছটফট করিতেছিল। গুমরিয়া কাঁদিতেছিল সকল মানুষের প্রাণ একজন দরদী বন্ধুর জন্য। প্রাণ উঘারিয়া ডাকিতেছিল শান্তিপুরের এক বৃদ্ধ পণ্ডিত সমগ্র মানবের ব্যথা বুকে চাপিয়া ধরিয়া। হাঁ, টলিয়াছিল গোলোকের আসন বর্ষীয়ান্ আচার্যের বেদনায়। প্রাণের মানুষ নামিয়া আসিয়াছিলেন ধূলার তলে সকাতরে সুহৃদের সাশ্রু আহ্বানে। স্নিগ্ধ হইয়াছিল মানবের দগ্ধ প্রাণ প্রেমঘনবিগ্রহ আপনার দুয়ারে পাইয়া।

আসিয়াছিলেন তিনি নদীয়ায়, কিন্তু ছিলেন তিনি সারা বাংলার, সারা ভারতের, সর্ব মানবের। জন্মিয়াছিলেন তিনি শচীর অঙ্গনে কিন্তু নাচিয়াছিলেন তিনি নিখিল বিশ্বের প্রাঙ্গণে। প্রকাশ হইয়াছিল তাঁহার প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে কিন্তু আজিও তাঁহার জীবনাবদান ভাস্বর ভাস্কর। এসেছিলেন যুগের মানুষ। যুগ যুগের প্রত্যেকটি মানুষের দরদী মানুষ। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করি — দেখিয়াছ কখনও এমন একটি মানুষ যাঁহাকে ভালবাসে প্রাণের জন বলিয়া যুগের প্রত্যেকটি মানুষ পরম প্রাণের জন জানিয়া। রাজা- প্রজা ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পণ্ডিত-মূর্খ পুরুষ-নারী সকলে এক পতাকাতলে দাঁড়াইয়াছিল।... ❑

নদীয়ার অবতারীর অবদান

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।"

সসীম মানুষের প্রধাবন অসীমের দিকে। অসীম ভগবানের অবতরণ সসীমের প্রাণপুরে। মানুষ উঠে, ভগবান্ নামে। মাঝপথে দেখা হয় দু'জনায়। মানুষ ছুটে সাধনায়, ভগবান্ ছুটেন করুণায়। মিলন ঘটে খেয়ার ঘাটে। মানবের প্রয়াস, ঈশ্বরের প্রসাদ। এই যুগল-পটে সাক্ষাৎকার।

মানুষের উন্নয়নের চরমতা ভগবত্ত্ব লাভে। ভগবানের অবতরণের চরমতা মানবত্ব লাভে। যে মানুষ ভগবত্তুল্য সে মহীয়ান্। যে ভগবান্ মানব-তুল্য সে মনোরম। ভূলোকের মানুষের গোলোকপ্রাপ্তি তীব্র তপস্যার পরিণতি। গোলোকের দেবতার ভূলোকে গতাগতি কৃপা-ভাগীরথীর অমিত প্রগতি।

সাধনবলে মানুষের ভগবত্ত্ব লাভের সংবাদ দিয়াছেন, বেদ উপনিষদ্। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ইহা বৈদান্তিকের গবেষণা। অসীম কারুণ্যে ভগবানের মানবত্ব লাভের সংবাদ দিয়াছেন নদীয়ার সুরধুনী তট। 'সর্বোত্তম নরলীলা' ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঘোষণা। বেদের সংবাদ মানুষকে করিয়াছে জ্ঞানবান ভাবুক। নদীয়ার সংবাদ মানুষকে গড়িয়াছে প্রাণবান প্রেমিক।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে ইহা মানবতার মহিমা। ঈশ্বরের মধ্যে মানবতা আছে ইহা ঈশ্বরতত্ত্বের মধুরিমা। সাধক ঈশ্বরকে চায়, চাহিতে চাহিতে ঈশ্বরের স্বধর্মতা লাভ করে। "মম

সাধর্ম্যমাগতাঃ" —এই গান গাহিয়াছেন ভগবদ্‌গীতা। ভগবান্ ভক্তকে চান। চাহিতে চাহিতে ভগবান্ ভক্ত হইয়া যান। ভক্তের ভূমিকায় ভগবান্ নাচিয়া চলেন নদীয়ার রাজপথে। এই কাহিনী শুনাইয়াছেন অমৃতময়ী বৈষ্ণব কবিতা।

আনন্দে মানুষ হয় আত্মহারা। আত্মহারা অবস্থাতেই আনন্দের পূর্ণ সম্ভোগ। আপনাকে হারাইয়াই প্রাপ্তি। আত্মহারা হইলেই আত্মদর্শন। আত্মদর্শনই আনন্দের নিদান। ভগবান্‌ও পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করেন আত্মহারা হইলেই। ভগবত্ত্বই ভগবানের আত্মা, ভগবান্ যদি ভগবত্ত্ব হারাইয়া ফেলেন তবেই প্রকটিত হয় তাঁহার আনন্দের পূর্ণ স্বরূপতা।

ভগবানেরও আছে একটা মহা সাধনা। তাঁহার লক্ষ্য স্বস্বরূপের আস্বাদন। খুঁজিয়া বেড়ান তিনি আপনি আপনাকে। অনন্ত বিশ্বের প্রকাশ অনুসন্ধানেরই মহাফল। তবু সে নাই চরম প্রাপ্তিতে, খোঁজ চলিতেছেই, বিরতি বিহীন। খুঁজিতে খুঁজিতে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন নূতন রূপে। 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।' খুঁজিয়া তখনই আপনাকে পান, যখন সর্বতোভাবে আত্মহারা হইয়া যান।

ভগবান্ স্বস্বরূপ আস্বাদনে সিদ্ধকাম তখনই যখন নিজ ভগবত্ত্ব হারান। যখন পূর্ণ মানুষ হইয়া নিজ মধুরিমার অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন। এই বার্তার বাহক নবদ্বীপ ধাম। আপনাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ণ মানুষ হইয়া নদীয়ার মাটিতে উদিত হইয়াছেন স্বয়ং ভগবান্। কত সুন্দর হরি, জানিবার জন্য হরি পুরটসুন্দরদ্যুতি লইয়া পথে পথে কাঁদিতেছেন হরিহরি বলিয়া। অশ্রুতপূর্ব। নদীয়ার এই সন্দেশ মানব সমাজের হস্তে অভিনব অবদান।

ভগবান্ সর্বজ্ঞ—জানেন সবই। কেবল জানেন না, তিনি নিজে কত সুন্দর। গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন কত কথা। বলেন নাই কেবল নিজ মাধুর্যের বার্তা। বলেন নাই তাঁহার রূপে কত প্রীতির মধুরতা, তাঁহার বংশীতে কত মর্মস্পর্শী মাদকতা, তাঁহার প্রেমে কত প্রাণ-মাতানো উদ্বেলতা। বলেন নাই, বলিতে পারেন নাই। উহার অনুভূতি নাই, অনুমিতি আছে, তাই বলা হয় নাই।

যাহা নিজের বুকে তাহার হয় অনুভূতি। যাহা অপরের মুখে তাহার হয় অনুমিতি। আমার হৃদয়ের সন্তাপ আমার অনুভূতি। তোমার হৃদয়ের সন্তাপ আমার অনুমিতি, তোমার আর্তনাদ রূপ, সদ্ধেতুদ্বারে সুসিদ্ধ। শ্রীভগবানের নিরুপম সৌন্দর্যের কথা, অনির্বচনীয় মাধুর্যের কথা, অসমোর্ধ্ব লীলাতত্ত্ব তাঁহার অনুভূতি নহে, একমাত্র ভক্তজনের। সর্বাধিক আছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রজজনের। সর্বাতিশায়ীরূপে আছে ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর। শ্রীরাধার সঙ্গে সহ-অনুভূতি ছাড়া উপায় নাই আর উহা ভোগ করিবার। এই সহানুভূতি পাইবার লোভে গোবিন্দ আসিলেন নদীয়ায় শ্রীরাধাঠাকুরাণীর মহতী ভূমিকায়।

আজ হইতে চারিশত একাত্তর বৎসর পূর্বে এক মধুবাসন্তীর পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপের গঙ্গার তটে প্রকট হইয়াছিলেন ঐ মহা অভিনেতা। সেদিন চন্দ্রগ্রহণের উল্লাসে বাতাস ছিল কীর্তনমুখর। ন্যায়চর্চার শুষ্কতায় মানুষের জীবন ছিল তৃষ্ণাব্যাকুল। জীব-জগতের দুঃখের তীব্রতায় অদ্বৈত ঠাকুরের নয়ন ছিল অশ্রুসঙ্কুল। গোলোকের ভালবাসা ছড়াইয়া দিতে, মর্তের ভালবাসা

লুটিয়া নিতে, শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" মূর্তি ধরিয়াছিল আসিয়া শচী জননীর অঙ্কদেশে। তাঁহার রূপে নরনারী হইয়াছিল লুব্ধ। তাঁহার গানে বন্য হিংস্র জন্তু হইয়াছিল মুগ্ধ। বীরত্বে বিধর্মী হইয়াছিল ত্রাসিত, ঔদার্যে বিরোধী হইয়াছিল ক্রোড়গত। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় দিগ্বিজয়ী কম্পান্বিত। স্বরূপ প্রদর্শনে সার্বভৌম পদানত। তাঁহার দৈন্য বিনয়ে প্রকাশানন্দ বিমোহিত, প্রেম কান্নায় শিলা বিগলিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল হিমাচলের মত, তাঁহার পাদমূলে সমাশ্রিত হীন-পতিত দীন-কাঙাল কতশত অগণিত। তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল না এমন মানুষটি ছিল না সেই যুগে সারা দেশে। দাতা-শিরোমণির দানে ধন্য হইয়াছিল সকলে।

দান করিলেই দাতৃত্ব হয় না। স্ত্রী-পুত্রকে মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার প্রদানে কেহ দাতাপদবাচ্য হয় না। আবার পথের কাঙালদের মুষ্ঠি আধলা পয়সা ছড়াইলেও প্রকাশ পায় না কোন বদান্যতা। অতি মূল্যবান সম্পদ্ যদি বিতরণ করা যায় পথেঘাটে যারে তারে অবিচারে অকাতরে তবেই বলি দাতা-শিরোমণি। নদীয়ার ঠাকুর আমার বিচার করেন নাই পাত্রাপাত্র, ভেদ দৃষ্টি রাখেন নাই আত্ম-পরে, ভাবনা করেন নাই দেয়াদেয়, অপেক্ষা করেন নাই সময়ের। মহাসাধন-দুর্লভ যে প্রেমভক্তিরস তাহা যত্র-তত্র যাকে-তাকে প্রদান করিয়াছেন। তাই তো বদান্য-শিরোমণি।

প্রেমের গতি উভয়মুখী। ভক্ত ধায় ভগবানের দিকে, ভগবান্ আসেন ভক্তের দিকে। ব্রজে শ্যামসুন্দরের দিকে শ্রীরাধা করিয়াছেন অভিসার। শ্যাম অহর্নিশি অনুধ্যান করিয়াছেন ভানুবালার স্নেহ পারাবার। দুই মিলিলে ছুটাছুটি ঘুঁচিয়া যায়। ব্রজে রাধাগোবিন্দ মিলনে লীলার উপসংহার। নদীয়ার এইখানেই উপক্রমণিকা। ছুটাছুটি নাই যাঁর তিনি ছুটিয়াছেন, খোঁজাখুঁজি নাই যাঁর তিনি খুঁজিতেছেন। হাসির ঠাকুর কাঁদিতেছেন। সংম্ভোগ রসের ঘন মূর্তি বিপ্রলম্ভে ঝুরিতেছেন। এই চমৎকারিতা তুলনাবিহীন। পূর্ণতমের অপূর্ণতার রোদন মহা রহস্যময়। নদীয়ার অবতারীর অশ্রুপ্রবাহে বিনির্মিত হইয়াছে প্রেমভক্তির এক অভিনব সরণি। সেই মহাদানের দিকে দৃষ্টি করিয়া সরস্বতী শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ

> "রক্ষো দৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং, যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া-
> মার্গো বা প্রকটীকৃতং কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ
> মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
> ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্য-মূর্তিং স্তুমঃ।।"

নরসিংহরূপে রামরূপে বধ করিয়াছেন দৈত্যকুল রাক্ষসকুল। তাহাতে এমন কী হইল? যোগাদি সাধন মার্গের ক্রিয়াপথ প্রদর্শন করিয়াছেন সিদ্ধ কপিলদেব তাহাতেই বা কী হইল? ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে করেন পালন, সংহার করেন রুদ্ররূপে—তাঁহার বিশ্বের তিনি ত্রাতা। মেদিনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বরাহরূপে তাহাতেই বা এমন বিশেষ কী হইল?

এই ঘোর কলিযুগে পরম প্রেমোচ্ছল প্রেমভক্তির মহাসুগম যে অপূর্ব পথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন যিনি জীব-জগৎকে, সেই চিদানন্দঘন গৌরসুন্দরের দানের তুলনা কোথায়? সেই সর্বসুখদ নদীয়া-বিনোদিয়ার চরণেই প্রণত হই। তাঁহারই জয়গাথা গাই।

চৈতন্যের সৃষ্টি এই মহাসংকীর্তন

পুরীর প্রশস্ত রাজপথ। পার্শ্বে বিরাট্ রাজপ্রাসাদ। অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদে তিনটি পুরুষ দণ্ডায়মান। দৃষ্টি তাঁহাদের সুদূরে আঠারনালার পথের দিকে নিবদ্ধ।

তাঁহাদের পরিচয় পরিচ্ছদেই অনুমেয়। একজনের শিরে উষ্ণীষ, গাম্ভীর্যপূর্ণ রাজবেশ। ইনি গজপতি প্রতাপরুদ্র। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মণ্যতেজে সমুজ্জ্বল উন্মুক্তদেহ এক বিপ্র। উপবীত ও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ঝলমল করে। ইনি বাসুদেব সার্বভৌম। ন্যায়বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজেব সভার ভূষণ। তাঁহার পার্শ্বে তিলককণ্ঠীভূষিত- বিশিষ্ট বৈষ্ণববেশযুক্ত আচার্য গোপীনাথ। ইনি পণ্ডিত বাসুদেবের ভগ্নীপতি।

বাংলাদেশ হইতে বিরাট্ কীর্তনমণ্ডলী আসিয়াছে। সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে চলিয়া তাঁহারা পুরীধামের সীমার মধ্যে পৌছিয়াছেন। আঠারনালায় সেতু পার হইয়া তাঁহারা শ্রীজগন্নাথ-এর শ্রীমন্দির অভিমুখে আসিতেছেন। কীর্তন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি ব্যক্তি মহাপ্রভুর প্রিয়জন। আসিয়াছেন তাঁহারা প্রাণগৌরকে দর্শন করিতে। রথাগ্রে গোরাচাঁদের নৃত্যমাধুরী ভোগ করিতে। জগন্নাথের বদন দেখিয়া কেমন করিয়া গৌরহরি অশ্রুগঙ্গায় ভাসেন, তাহা আস্বাদন করিতে।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্তরে সাধ জাগিয়াছে — কীর্তন নামক ব্যাপারটি কী তাহা জানিবেন। কীর্তনীয়া মহাপ্রভুর নিজজনদের চিনিবেন। পণ্ডিত সার্বভৌমকে বিনয় করিয়া বলিযাছেন, যাঁহারা আসিয়াছেন কৃপা করিয়া আমাকে চিনাইয়া দিবেন। পণ্ডিত বলিয়াছেন, আমার বাড়ী নবদ্বীপ বটে কিন্তু বহুদিন তো আমি দেশছাড়া। ওদেশের সবাইকে আমি চিনিব না। আমার ভগ্নীপতি গোপীনাথ সবাইকে চিনে। সেই দিবে আপনাকে চিনাইয়া। এই পরামর্শ করিয়া তিনজনে অট্টালিকায় আরোহণ করিয়াছেন।

সোৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে নয়ন নিবদ্ধ করিয়া আছেন তিনজনই। কীর্তন শব্দটি রাজা শুনিয়াছেন মাত্র। ওটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে এখনই। এই আনন্দে রাজা উল্লসিত। কীর্তন এখন পর্যন্ত দৃষ্টিপথের মধ্যে পৌঁছে নাই। হঠাৎ রাজা দেখিলেন, দুই ব্যক্তি দুই ফুলের মালা লইয়া ছুটিতেছেন আঠারনালার দিকে।

"মালা হাতে লইয়া ছুটিতেছেন এই দুইজন কে?" জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র। উত্তর দিলেন ভট্টাচার্য সার্বভৌম, "যিনি অগ্রবর্তী তিনি পণ্ডিত স্বরূপদামোদর। ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবরস্বরূপ। তাঁহার পশ্চাতে যিনি তিনি ভৃত্য গোবিন্দ দাস। ইঁহারা মহাপ্রভুর আদেশে চলিয়াছেন প্রসাদী মালা লইয়া কীর্তনমণ্ডলীকে সংবর্ধনা করিতে।"

কীর্তন ক্রমে নিকটবর্তী হইল। সকলের পুরোভাগে এক মহাতেজস্বী পুরুষ। বয়স বার্ধক্যের কোঠায়, কিন্তু যৌবনশ্রী অম্লান। সর্বাঙ্গ হইতে তরুণ তপনের প্রভা বিকীর্ণ হয়। প্রণত হইয়া স্বরূপ প্রসাদী পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন তাঁহার কণ্ঠে। গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার করের মালাও তাঁহারই গলে দোলাইয়া দিলেন। নয়নে এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার কৌতূহলী মন প্রশ্ন করিল—

---

* *যুগান্তর।*

"রাজা কহে যারে মালা দিল দুইজন।
কহ আচার্য, তেজে বড় এই মোহন্ত কোন্ জন?।।"

পরম তেজস্বী এই পুরোবর্তী পুরুষবরকে জানিতে মহারাজ উদ্‌গ্রীব। গোপীনাথ কহিলেন, ইনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। ইনি "মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্বশিরোধার্য।" তারপরই দেখুন, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত। গোপীনাথ অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দেখাইয়া বলিয়া চলিলেন। বলিতে বলিতে সমগ্র কীর্তনমণ্ডলী মহারাজের দৃষ্টিপথের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

কীর্তনরত ভক্তগণের "কোটি সূর্যসম উজ্জ্বল বরণ" দর্শন করিয়া বিস্ময় বিহুল গজপতি প্রতাপরুদ্র বলিয়া উঠিলেন—

"রাজা কহে দেখি আমাব হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐছে তেজ নাহি দেখি আর।।"

কীর্তন আরও নিকটতর হইল। কীর্তন-মাধুর্য দর্শনে রাজা প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অজ্ঞাতসারেই মুখ হইতে বাহির হইল অস্ফুট উক্তি — অহো কি প্রেম! কি নৃত্য! কি মধুর হরিনাম! কি আনন্দ কি উল্লাস!! স্পষ্টতর করিয়া কহিলেন গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া—

"ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।।"

ঐ অপূর্ব, অভূতপূর্ব, এমন নর্তন-কীর্তন, এমন ভাবোন্মাদনা, এমন প্রেমতন্ময়তা, এমন উন্মাদ করা করতাল-মৃদঙ্গের ধ্বনি—দেখা তো দূরের কথা, জীবনে কখনও শুনিও নাই।

রাজার চিত্তের উল্লাস দেখিয়া সগৌরবে গম্ভীর কণ্ঠে, কহিলেন পণ্ডিত সার্বভৌম—

**"ভট্টাচার্য কহে তোমার মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই মহা সংকীর্তন।।"**

বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এমন বস্তু কেহ দেখে নাই। মৃদঙ্গ করতাল ছিল, হরির নামও ছিল, কিন্তু ভাবে রাগে রসে প্রেমে এমন নিবিড় তন্ময়তার সঙ্গে ইহাদের ঈদৃশ মহামিলন ছিল না। কীর্তন নামক এই অপূর্ব সম্পৎটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধন-ভজনের কত শত পন্থা ছিল। পূর্ব পূর্ব যুগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইত যজ্ঞাদি দ্বারা। এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যাঁহারা সুবুদ্ধি তাঁহারা কীর্তনযজ্ঞ দ্বারাই কীর্তনেশ্বরের অর্চনা করিয়া থাকেন। এই যুগে কীর্তনেশ্বর ঠাকুরটি কে, তাহাও দেখুন, শাস্ত্র কি চমৎকার করিয়া জানাইয়াছেন ঃ

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈ- র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

অঙ্গকান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, শ্রীমুখে যিনি নিরন্তর 'শ্রীকৃষ্ণ' এই বর্ণ দু'টি উচ্চারণ করেন, পাষণ্ডীকে আঘাত করিবার জন্য যার হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই; আছে কেবল তাহাদের শোধন করিবার জন্য কীর্তনমগ্ন সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তবৃন্দ—তিনি এই যুগের আরাধ্য

দেবতা।

পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া মহারাজ গজপতি আবেগযুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর যে অবতার এ কথা তো শাস্ত্রেই আছে। যদি শাস্ত্রে আছে তাহা হইলে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে মানে না কেন? তাঁর প্রবর্তিত কীর্তনযজ্ঞে ব্রতী হয় না কেন? "তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ।"

মহারাজের জিজ্ঞাসায় পণ্ডিত সার্বভৌমের নিজের কথা মনে পড়িল। দৈন্যমাখা দৃঢ়তার সুরে কহিলেন — "মহারাজ, গৌরে রতি, গৌরকীর্তনে প্রীতি, পুঁথিগত বিদ্যায় হয় না। শাস্ত্রে থাকিলে কী হইবে — কৃপা না হইলে চক্ষু ফুটাইয়া দিবে কে?"

"ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে।।"

শুনিয়া প্রতাপরুদ্র মনে মনে শ্রীগৌরকৃপা প্রার্থনা করিলেন। আসুন আমরাও করি। আজিকার শ্রীগৌরাবির্ভাবের শুভদিনে আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করি — প্রাণগৌর হে! কৃপালেশ বিতরণ কর — আমাদের সকলের উপর। রতি হউক তোমার রূপে, রুচি হউক তোমার নামে, প্রীতি হউক তোমার বিশ্বজনে। জয় গৌরহরি। জয় বন্ধু হরি।। ❑

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও মানব সমস্যা

পাঁচ শতাব্দী পূর্বে অবতরণ করেছিলেন আমাদেরই মধ্যে প্রেমবিগ্রহ এক সোনার মানুষ। বাংলার কোলে ভাগীরথীর কূলে কীর্তন-মাতোয়ারা নদীয়ায় পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায় শ্রীশচী-জগন্নাথের আনন্দমুখর আঙ্গিনায়।

তাঁর রূপ ছিল অনবদ্য, গুণ ছিল অনুপম, মাধুর্য ছিল অনির্বচনীয়। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি সেই যুগের মধ্যে এমন মানুষটি ছিল না। সমাজের সকলের আত্মিক দৈন্য তিনি মুছিয়ে দিয়েছিলেন। সকল নীচতার বেদনা তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক প্রকার সমস্যার কঠিনতা তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন। বৈষম্য-ক্লিষ্ট সমাজের অগণিত নরনারীকে তিনি এক মহা-সাম্যনীতির ভূমিকায় উন্নীত করেছিলেন। ডেকে ডেকে শান্তির সন্ধান দিয়ে অশান্ত জীবনিবহকে তিনি ধন্য করেছিলেন। আজি আবার মানবসমাজে যে মর্মান্তিক যুগ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে আমরা তার সমাধান খুঁজব। আমরা সেজন্য সেই মহাযুগের দেবতা শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মের দিকেই তাকাব। সর্বাগ্রে বুঝবো বর্তমান যুগ কী? তারপর বেদনার অন্ধকারে মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণাচন্দ্রিকাই আমাদের চলার পথের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ পাথেয় হবে।

বর্তমান যুগ বলতে প্রধানত বৈজ্ঞানিক যুগই বুঝি। এই যুগে জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি

* *'পূর্বায়ণ', এপ্রিল, ১৯৮৭ (বিশেষ সংকলন)। সম্পাদক : শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়।*

হয়েছে। নানাবিধ গবেষণায় নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে। ব্যাবহারিক জীবনে ঐ সকল তথ্য বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাদিতে রূপ পেয়েছে। জড়ীয় সুখ লাভের উদ্দেশ্যে যন্ত্রাদির বহু ব্যবহার হচ্ছে। ফলে, সমাজে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে।

যন্ত্র সভ্যতা লোক-সংঘট্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ মানুষের গায়ে ঠেকে চলছে। মানুষের চাপে মানুষ নিষ্পিষ্ট হয়ে মরছে। চারিদিকে জন-সমুদ্র অথচ এরই মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন অসহায়, একাকী, নিজের ভারে নিজে আতুর। যে-বিজ্ঞান দূরকে নিকট করেছে, সেই আপনাকে পর করেছে। লোক-সংঘট্ট বাড়ছে, কিন্তু 'লোক-সংগ্রহ' কার্যটি একেবারে যেন চির বিদায় নিয়েছে। লোকের গায়ে গায়ে ঠেকছে কিন্তু প্রাণে প্রাণে মিশছে না। নিরন্তর ঠেলাঠেলি চলছে কিন্তু একটি বারও গলাগলি করছে না। মানুষ হাত পা চোখ কান বর্ধিত করবার বুদ্ধি ও যন্ত্র আয়ত্ত করেছে কিন্তু দীন সংকুচিত আত্মাকে বিশালতায় পৌঁছাবার সাধনা ভুলে গিয়েছে।

এই যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বেড়েছে, আত্মিক ক্ষুধা মরে গিয়েছে। ভোগবিলাস-সম্ভার পুঞ্জীভূত হয়ে সহস্র বিপণির শোভা বর্ধন করছে কিন্তু আত্মার মহদ্‌গুণসমূহ মৃতকল্প হয়ে মানব-সভ্যতাকে সাহারা মরুতে পরিণত করছে। এটা বর্তমান যুগ সমস্যা। এটা বর্তমান যুগের বড় প্রশ্ন। এই বিরাট্ মানবীয় ব্যবধান দূর করতে হবে কীরূপে? অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের অতি নিকট। ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলে গিয়ে মানুষ মানুষ থেকে দূর অতি দূর। দেহ কাছে, প্রাণ দূরে। মানুষে মানুষে ঠেকাঠেকি প্রাণহীন যন্ত্রের ধাক্কাধাক্কির তুল্য হয়ে উঠছে। এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যই সমাজে অশেষ প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করছে। এই সামঞ্জস্যের সমাধান কোথায় এইটি এই যুগের মৌলিক জিজ্ঞাসা। বুঝে না বুঝে মানুষ এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজছে। সহস্র সহস্র সভা দিনের পর দিন বসছে, ভাঙছে। মূল প্রশ্নের জবাব আসেনি। আমরা আজ পাঁচ শত বৎসর পিছিয়ে এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করি।

বর্তমান যুগসমস্যার ঘোরান্ধকারে সেই নদীয়ার ঠাকুরের করে যে প্রেমের দেউটি, তাহার আলোতেই পথ দেখতে হবে। আজকের মহা সমস্যার সমাধান পেতে হলে নানা কোলাহলে চাপা-পড়া নদীয়ার বাণীই আবার কান পেতে শুনতে হবে।

, নদীয়ার বিশাল বাণী একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে বলা চলে। সেটি হইল—প্রেম। এই একটি বস্তুর অভাবে সব দিক্ শূন্য। ইটের উপর ইট সাজালে যেমন সৌধ হয় না, তেমনি জড়ীয় যন্ত্র পেশে ভোগ্য দ্রব্যের বিপুল সম্ভার উৎপাদন করলেই মানবীয় সভ্যতা গড়ে উঠে না। প্রত্যেকখানি ইটের সঙ্গে প্রত্যেকখানির সুদৃঢ় একত্ব স্থাপনের জন্য যেমন সিমেন্ট বা সংযোজক মসল্লার প্রয়োজন, মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেইরূপ প্রয়োজন প্রেমের। এই একটি বস্তুর অভাবে বর্তমান যুগন্ধরগণের সকল প্রকার শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থতার আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত।

ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আহার্য দ্বারা উদর পূর্তির ফল, মানবপ্রেম সেইরূপ ঈশ্বরীয় প্রেমের অনিবার্য পরিপূর্ণতা। কোন কৃত্রিম উপায়েই মানবীয় একত্ব আসে না। অন্তরের দেবতার সঙ্গে

অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপিত হলেই জীবে জীবে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম জীবপ্রেম এক রেখার দুই প্রান্ত। এই দুই প্রান্তের অখণ্ড মিলনঘন মূর্তিই মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। সুগভীর ভগবৎপ্রেম বিশ্বপ্লাবী মানবপ্রেম শ্রীগৌরাঙ্গর একাত্মে একীভূত। যুগসমস্যায় ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত সমাজ যদি মহামিলনের আলোক চায় তা হলে ঐ নদীয়ার ঠাকুরটির চরণ-চন্দ্রেই পেতে হবে। ❑

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও মহাপ্রভু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কাব্যে উপেক্ষিতা—বাল্মিকীর উর্মিলা দেবী ও কালিদাসের অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা।" গৌড়ীয় সাহিত্যে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রায় তদ্রূপ। মহাপ্রভু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, যেন এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যিকেরাও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ছয় গোস্বামীর এত গ্রন্থ, তার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অনুপস্থিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এত বড় মহাগ্রন্থ, তার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উপেক্ষিতা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও বাসু ঘোষাদি কতিপয় পদকর্তার লেখনীতেই যাহা কিছু প্রিয়াজীর সংবাদ মিলে। গোস্বামিগ্রন্থে প্রিযাজীর কথা না থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিত্য সাধন-ভজনেব মধ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। ফলে সীতারাম রাধাকৃষ্ণের মত গৌরবিষ্ণুপ্রিযা-ভজন জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয নাই। ইহা চিন্তা কবিতে বেদনা হয। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন লিখিলেন ঃ

"সেই ব্রজেশ্বর ইঁহা জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্ববী ইঁহা শচীদেবী মাতা।
সেই নন্দসুত ইঁহা চৈতন্য গোসাই।
সেই বলদেব ইঁহা নিত্যানন্দ ভাই।।"

তখন কি "সেই রাধারাণী ইঁহা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া" এই কথাটি তাঁহার লেখনীতে আসিতে পারিত না? আবার যখন লিখিলেন—

"গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি।"

তখন কি পাঠটি একটু বদলাইয়া 'গদাধর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর নিজ শক্তি' এইরূপ লিখিতে পারিতেন না? 'আদি' লিখিবার সময় তাঁহার অন্তরে কাহারও কথা তো ছিল। তাহা কি ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিতেন না? যদি ভাবি, ছয় গোস্বামী কিছু লিখেন নাই বলিয়া তিনি লিখিতে সাহসী হন নাই, তাহা হইলে মনে উত্তর আসে, ছয় গোস্বামী তো জগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী, নিত্যানন্দ, গদাধর সম্বন্ধেও কিছু লিখেন নাই। যদি ভাবি রাধারাণী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে একাঙ্গে আছেন এই জন্য প্রিয়াজীকে রাধারাণী বলিতে বাধা আসে, তাহা হইলে তাঁহাকে রুক্মিণী বা সত্যভামাও বলা চলিত। গদাধরকে রুক্মিণী বলা হইয়াছে। জগদানন্দকে সত্যভামা বলা হইয়াছে—ইহার সমর্থনও তো ছয় গোস্বামীর গ্রন্থে নাই। দেবী এত উপেক্ষিতা ভাবিতে

** 'শ্রীসুদর্শন'। জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩৭৬ (২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এবং ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা)*

আমাদের কষ্ট হয়।

শ্রীভগবান্ যখনই আসেন তখনই হ্লাদিনী শক্তি তাঁহাকে ও ভক্তগণকে আনন্দ দিতে আসেন। হ্লাদিনী শক্তি কখনও অমূর্ত থাকেন, কখনও মূর্ত থাকেন। শ্রীসীতাদেবীও হ্লাদিনীর এক মূর্তি। রুক্মিণী সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণও হ্লাদিনীর প্রকাশ। যে লীলায় লীলাময়ের ঐশ্বর্য মাধুর্য যতখানি ব্যক্ত হয় সেই লীলায় হ্লাদিনী শক্তিও তৎ সমতুল্য ভাবে প্রকটিতা হন। ভক্ত ও ভগবান্‌কে আনন্দ দিতে হ্লাদিনীরই সামর্থ্য। সুতরাং যে-লীলায় ভক্ত-ভগবানের যে জাতীয় ও যৎপরিমাণিক আনন্দ সেই লীলায় হ্লাদিনী শক্তিরও ততখানি অভিব্যক্তি।

শ্রীভগবান্ যখন হ্লাদিনী শক্তিকে একাঙ্গে একীভূত করিয়া আসেন তখনও ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে পৃথক্ রাখিতেও পারেন। ইচ্ছা করিলে না-ও রাখিতে পারেন। শ্রীগৌবসুন্দরে হ্লাদিনী শক্তি একীভূত হইলেও শ্রীগদাধরে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে। শ্রীগদাধরে যেমন হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ প্রকাশ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতেও তদ্রূপ এইরূপ স্মরণ মনন কবিতে অসুবিধা বা অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। শ্রীগৌরসুন্দর প্রিয়াজীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহের পর শ্রীপ্রিয়াজী ও প্রভুকে দর্শন করিয়া নরনারী কী বলাবলি করিতেছে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পদে আমরা তাহা শুনি—

"কেহ বলে এই হেন বুঝি হরগৌরী।
কেহ বলে হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি।।
কেহ বলে এই দুই কামদেব-রতি।
কেহ বলে ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি।।
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এই মত বলে সর্ব সুকৃতি বর্ণিতা।।"

যে যাই বলুক রসরাজবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের যিনি অঙ্কশায়িনী তিনি মহাভাবময়ীই—এইরূপ অনুধ্যানে আমাদের অন্তবে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৌরাঙ্গ-বল্লভা রূপেই আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও প্রিয়াজীকে গৌরাঙ্গপ্রেয়সীরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও প্রিয়াজীকে শ্রীগৌরসোহাগিনী জানিয়া খেতুরে ছয় বিগ্রহের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার অমর গ্রন্থ 'অমিয়নিমাইচরিত'-এ প্রিয়াজীকে শ্রীগৌরপ্রিয়তমারূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতে প্রিয়াজীকে নদীয়া-নাথের প্রাণপ্রিয়তমা রূপে আস্বাদন করিয়াছেন। কুমিল্লা জেলার গৌরগতপ্রাণ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীদাদা "বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর" কীর্তন রোলে পূর্ববঙ্গ মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীবিধুভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তৎসম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে রামানন্দ সংবাদে—

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।"

এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় অতি বিচক্ষণতার সহিত দেখাইয়াছেন যে, ব্রজে রসরাজ শ্যামবর্ণ ও মহাভাব গৌরবর্ণ নদীয়াযুগলে দুই একরূপ অর্থাৎ একই বর্ণ। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েই গৌরবর্ণ। ঐ বস্তু দর্শনেই রামানন্দ রায়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। শ্রীযুত বিধুবাবু দুই একরূপ ও দুয়ে একরূপ এই পাঠ ও পাঠান্তর লইয়াও সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। এই সকল বিদ্বদনুভূতি অস্বীকার করিবার মত হেতু কিছুই দেখি না। [শাস্ত্রে একই শ্লোক বা পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরস্পরের বাধক নহে। শাস্ত্রাক্ষর যে কামধুক্ তাহারই দ্যোতক। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকের ব্রহ্মপর, কৃষ্ণপর, এমনকি গৌরপর ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়। 'জন্মাদ্যস্য' শব্দটি জন্মাদি + অস্য অথবা জন্ম + আদ্যস্য অর্থাৎ আদিরসের জন্ম যাহা হইতে এই ভিন্ন ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়। রাম বলিতে কেহ পরশুরাম, কেহ দাশরথি রাম, কেহ বলরাম কেহ বা নিত্যানন্দরামকে বুঝিতে পারেন। 'একরূপ' পদে কেহ দুইই পুরুষ রূপ ভাবিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা গৌরগদাধর ভাবিতে পারেন। কেহ একরূপ অর্থ একাত্মতা ভাবিয়া রাধাগোবিন্দ দর্শন করিতে পারেন। কেহ বিধুবাবুর দৃষ্টিকোণ হইতেও আস্বাদন করিতে পারেন।]

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীকে শ্রীরাধারাণী বলিতে একটি আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, প্রিয়াজী স্বকীয়া নায়িকা আর রাধারাণী পরকীয়া নায়িকা। এই আপত্তির উত্তর নানা প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে—

১। অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবে স্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামিজীর মতে 'স্বকীয়া'। যদি বলা যায় নদীয়া-লীলায় অপ্রকট ব্রজটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইলে কোন দোষের তো হয়ই না বরং মাধুর্যাধান হয়।

২। শ্রীরূপকৃত 'ললিতমাধব' গ্রন্থে দেখা যায় রাধারাণীই সত্যভামারূপে স্বকীয়া হইয়া পুরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। নদীয়ালীলা তাহারই পরিণতি বলিলে গৌরলীলা উজ্জ্বলতর হইয়াই উঠে।

৩। স্বকীয়া পরকীয়া নায়িকার মূল পার্থক্যটি কোথায় তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় স্বকীয়া সুলভ, পরকীয়া দুর্লভ। দুর্লভত্বই পরকীয়া নায়িকার বিশেষত্ব। নদীয়া লীলায় প্রিয়াজী স্বকীয়া হইয়াও চিরতরে দুর্লভা হইয়াছেন। সন্ন্যাসলীলাহেতু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শন, স্পর্শন, সাক্ষাৎকার সবই সু-দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। যে দুর্লভতা পরকীয়ার প্রাণ—তাহা প্রিয়াজী-গৌরাঙ্গে ব্রজ হইতেও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

গৌরলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়াজীর স্থান কোথায় এইরূপ জিজ্ঞাসা কেহ কেহ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন হ্লাদিনী শক্তি তখন তাঁহার স্থান সর্বোপরিই। হ্লাদিনীও একাঙ্গেই আছেন আবার পৃথক্ থাকার প্রয়োজনীয়তা কী—এইরূপ প্রশ্ন করিলে উত্তরে বলিব—গদাধররূপে পৃথক্ থাকিবার যে প্রয়োজনীয়তা, বিষ্ণুপ্রিয়ারূপেও সেইরূপ।

*　*　*　*

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে যাইবার কালে শ্রীমুখে বাক্য দিয়াছিলেন 'আয়াস্যে' আবার আসিব।

"তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ।।" (ভাঃ ১০/৩৯/৩৫)

আবার আসিব এই শ্রীমুখের বাক্যের মূল্য অনেক। বিরহের প্রত্যেকটি ক্ষণে এই প্রবোধ— শ্যামসুন্দর নিশ্চয়ই বাক্য রক্ষা করিতে আসিবেন—এই ভাবনা তীব্র দুঃখকে কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রিয়াজী একান্তভাবেই জানেন যে তাঁহার প্রাণনাথ আবার আসিবেন না। এ জীবনে তাঁহার সহিত আব দেখা হইবে না। ক্ষণকালের জন্যও দর্শনের সম্ভাবনা নাই। এই হেতু প্রিয়াজীর বেদনা তীব্রতর।

দ্বিতীয়তঃ শ্যামসুন্দরের জন্য রাধারাণী ব্যাকুল। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল। শ্রীরাধারাণী জানেন যে শ্যামসুন্দর মথুরায় রাজতুল্য ঐশ্বর্য মধ্যে আছেন। কি মথুরায় কি দ্বারকায় লৌকিক দুঃখকষ্ট বিন্দুমাত্রও তাঁহার নাই। এই ভাবনা বিরহবেদনায় কিঞ্চিৎ লাঘবতা আনে। পক্ষান্তরে প্রিয়াজী জানেন তাঁহার প্রিয়তম সন্ন্যাসী হইয়াছেন। নগ্নপদে কত বনপথে একাকী চলেন। কোন ভোগের দ্রব্য ভোগ করেন না, শয্যায় শয়ন করেন না, উদর পূর্ণ কবিয়া ভোজন করেন না।

"গোবিন্দে বোলাইয়া প্রভু কহেন বচন।
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।।
পিণ্ডা ভোগ এক চৌঠি পাঁচকড়া ব্যঞ্জন।।
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে হেথা আমা না দেখিবা।।
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন।।" চরিতামৃত, অন্ত্য

প্রভু তৈল মাখেন না। জগদানন্দ পণ্ডিত গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছেন শুনিয়া প্রভু কহিলেন—

"প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিল গৌড় হতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে।।"

পণ্ডিত অভিমান করিয়া তৈলের ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। প্রভু লেপ তোষক বালিস বিছানা ব্যবহার করেন না। তুলা অর্থাৎ যে জিনিষে তুলা ভরা আছে তাহা লন না।

"গোবিন্দকে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল।।
কলার শরলাতে শয়ন অতি ক্ষীণকায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়।।"

এই সব সংবাদই নবদ্বীপে পৌছায়। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সব শুনেন। যাঁহার বিরহ জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছেন, তিনি এত কষ্ট দুঃখ বরণ করিতেছেন ইহাতে প্রিয়াজীর প্রিয়-বিরহবেদনা সহস্র গুণ হইয়া মর্মে আঘাত করে।

তৃতীয়তঃ শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের দেখা হইয়াছে কয়েক বার। একবার কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণে, দ্বিতীয়বার প্রভাসে যজ্ঞানুষ্ঠানে, তৃতীয়বার দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাক্য রক্ষার্থ ব্রজপুরীতে গমন করিয়াছেন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। ভাগবতের ১০/৭৮/১৫ শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধৃতি দিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে প্রিয়াজী জীবনে আর দেখা পান নাই। বিরহের তীব্র তাপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধাঠাকুরাণীর যে কৃষ্ণ-বিরহ প্রিয়াজীর গৌর-বিরহ তাহাকে বহু গুণে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই চরম বিরহ-বেদনার মূর্তিখানি জগজ্জীবকে দেখানোই প্রিয়াজীর লীলামঞ্চে প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই গৌরহরি সন্ন্যাস করিবেন জানিয়াও আবার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হইবেন জানিয়াও আবার বিবাহ করা সামাজিক দৃষ্টিতে সুন্দর কার্য হয় না। কেবলমাত্র জগৎকে বিরহ-বেদনার একটি অতুলনীয় বিগ্রহ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই এই কার্য করিয়াছেন।

যিনি বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী তিনি দীর্ঘদিন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ) ব্রজবিহারীর পাদপদ্মের সেবা পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। লক্ষ্মীপ্রিয়া রূপে আসিয়া তিনি গৌরলীলায় শ্রীগৌরপাদপদ্মের সেবা লাভ করিলেন। তারপর অল্পদিন পরেই চলিয়া গেলেন। বঙ্গদেশে গেলেন প্রভু কয়েক মাসের জন্য। এই বিরহ -সর্পের দংশনেই তিনি বিদায় হইলেন। সন্ন্যাস-বিরহের ভীষণ বেদনা সহ্য করিবার মত সামর্থ্য লক্ষ্মীদেবীর নাই। রুক্মিণীদেবীরও নাই। সমর্থা রতি ছাড়া ঐ তীব্রতম বিরহ-বেদনা কে বুকে লইবে? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সমর্থা রতির মূর্তিমতী বিগ্রহ বলিয়াই ঐ নিদারুণ বেদনা ভোগ করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীরাধারাণীর শ্রীমুখের কথা শ্রীগৌরসুন্দর গম্ভীরায় শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।"

অদর্শনে মর্মাহত করার পূর্ণতম মূর্তিটি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতেই প্রকট। তাই তো তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে 'প্রাণনাথ' হইয়া নিত্য বিরাজমান আছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে যদি কেহ 'প্রাণনাথ' সম্বোধন করিতে চায় তবে তাহার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্য ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়?

শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত সম্বন্ধকে আচার্য-পাদগণ "দাম্পত্যোদ্‌গীর্ণ পরকীয়া" নাম দিয়াছেন। প্রিয়াজীকে তাঁহার পরিপূর্ণ মূর্তি একথা বলা যাইতে পারে। শ্রীগৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়াজী সত্যসত্যই দম্পতি। আবার সন্ন্যাসব্রত ফলে পরকীয়া অপেক্ষাও দুর্লভা হইয়াছেন।

প্রাণদয়িতের বিরহে প্রিয়াজী নিরন্তর স্মরণে ডুবিয়া থাকিতেন। বিরহ-বেদনা যেমন তীব্রতর, স্মরণও তেমনি গভীরতর। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত শ্রীগৌর-স্মরণে শ্রীগৌর-জপনে কাটাতেন।

বৈষ্ণব ভক্ত যেমন তুলসীর মালায় জপসংখ্যা রাখেন প্রিয়াজী সেইরূপ কয়েকটি তণ্ডুল লইয়া জপসংখ্যা রাখিতেন। দিনান্তে যে কয়টি তণ্ডুল হইত তাহাই পাক করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে অর্পণ করিয়া মহাপ্রসাদ লইতেন। গৌরকথা ছাড়া আনকথা বলিতেন না, শুনিতেন না—স্বপ্নেও দেখিতেন না। এমন কঠোর ভজন ইতিহাসে দুর্লভ।

বিষ্ণুপ্রিয়াজী বিষ্ণুভক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ। একথা অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর সম্মুখেই ব[illegible]ন। প্রভু নীরবতা দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে— কোনও প্রসঙ্গক্রমে মহাপ্রভু বলিতেছেন—"শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ সা ভবৎসু সৎসু বর্তত এব।" শ্রীপদে বিষ্ণুভক্তি তাহা তোমাদের সকলের মধ্যে বিরাজমান। সুতরাং সকলেই শ্রীবাস। এই কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য বলিলেন—"ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া"—এখন সেই বিষ্ণুভক্তিই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরূপে মূর্তিমতী। মহাপ্রভু যেন অদ্বৈতাচার্যের কথা বুঝেন নাই এইরূপ ভঙ্গী করিয়া অন্য অর্থে ঐ কথাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—

"অথ কিং সৎসু জ্ঞানাদিমার্গেষু
ভক্তিরেব বিষ্ণোঃ প্রিয়া।"

তা নয়ত কী? জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ, যত পথ মতই থাকুক না কেন—একমাত্র ভক্তিই শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া। এই কথার পর অদ্বৈত ঠাকুর বেশ রসাল করিয়া বলিলেন, 'অতএব ভগবানপি তামঙ্গীচকার' অর্থাৎ এই জন্যই তো ভগবান্ আপনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে ভক্তিদেবী বিষ্ণুর প্রিয়া বলিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ বলিয়াই আপনি তাঁহাকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু ইহার কোন বাদ প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি যেন অদ্বৈতাচার্যের শ্লেষ বুঝেন নাই—তিনি যেন বুঝিয়াছেন ভগবান্ ভক্তিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন—নিজের ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—এই ভাব দেখাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিদেবীর মূর্তি, প্রেমভক্তির ঘনীভূত প্রতিমা—তাই জগজ্জীবকে তিনি যে ভক্তির ভজন শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

সন্ন্যাসী গৌরকে লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অধিকাংশ লীলা আস্বাদন। এই সন্ন্যাসী জগৎকে দান করিয়াছেন বিষ্ণুপ্রিয়াজী। তিনি তাঁহার প্রাণকান্তকে না ছাড়িলে তিনি কিছুতেই গৃহত্যাগ করিতে পারিতেন না।

শ্রীশ্যামসুন্দর যেমন বৃন্দাবনচন্দ্র, শ্রীগৌরসুন্দর তেমনই নবদ্বীপচন্দ্র। নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ ছাড়িয়া গেলেন—গিয়াও যান নাই। নিত্য নবদ্বীপ তাঁহার নিত্যধাম। এই নিত্যধামে নিত্য বাস ঘটিতেছে কাঁহাদের প্রীতির টানে? শচীজননী ও প্রিয়াজী ছাড়া আর কাহার আকর্ষণে তিনি নিত্য নবদ্বীপে নিত্য বিরাজমান আছেন? নদীয়া-নাগরকে নদীয়াতেই ভাবিতে হইলে—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী।।"

এই মধুময় পদই স্মরণ করিতে হইবে। গৌরসুন্দর গৃহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। 'প্রকাশরূপে' নিজ প্রিয়ার নিকটে আসিয়া নিজমূর্তি প্রস্তুত করিয়া

তাহাতেই স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত' চতুর্দশ সর্গে অষ্টম শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্।।"

প্রকাশরূপে নিজপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকটে আসিয়া নিজমূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। দেবীও প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছেন, সেবা করিতে করিতে ধামেশ্বরের সঙ্গে একাঙ্গতা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যখন নবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক নেত্রে অশ্রুসিক্ত হইয়া আর মুখে নিজ-রচিত পদ—"কনকবরণ কমলনয়ন, লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ" উচ্চারণ করিতেন—তখন যে তিনি প্রিয়াজীর ভাবেই বিভাবিত হইতেন না তাহা কে বলিতে পারে?

জনৈকা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবে বিভাবিত হইয়া বন্ধুসুন্দরকে সাক্ষাৎ গৌরজ্ঞানে যে কয়েকখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন—তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমার অন্তরের নিভৃত কন্দরে তোমাব জন্য সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়াছি। তোমার প্রতীক্ষায় আমার আনন্দ-প্রদীপ ক্ষীণাভ। তোমার আগমনে তাহা সমুজ্জ্বল হইবে। তোমার আগমন হউক বা না হউক, যাবৎ অশ্রু শরীরকে দ্রবীভূত না করে তাবৎ আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব। তোমার তুষ্টির জন্য আমার প্রেমসুরভিত অশ্রু তোমার শান্তিময় চরণ সিক্ত করিবে। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আমার হৃদয়-সিংহাসন শূন্য থাকিবে। তোমার নিকট কিছুই বলিব না। কিছুই চাহিব না। আমি এইমাত্র জানিয়াই থাকিব যে তোমার প্রতীক্ষারত আমার হৃদযের ব্যথা তুমি অবগত আছ। তোমার প্রেম আমার ভক্তিমন্দিরে চির জাজ্জ্বল্যমান হউক। আমি যেন সকলের অন্তরে তোমার প্রেম উন্মেষিত করিতে পারি। তুমি আমার ভগ্ন চিন্তাতরীর কাণ্ডারী হও।"

"আমি সংযম-মন্দিরে তোমার অনুগত, আমি ভক্তিমন্দিরে তোমায় ভালবাসি, আমি প্রেম-মন্দিরে তোমায় পূজা করি, আমি স্থিরতা মন্দিরে তোমার পাদস্পর্শ লাভ করি।

আমি আনন্দ-মন্দিরে তোমার নয়ন দর্শন করি, আমি আবেশ-মন্দিরে তোমাকে অনুভব করি, আমি ধ্যান-মন্দিরে তোমার জন্য প্রযত্ন করি, আমি শান্তি-মন্দিরে তোমায় উপভোগ করি।"

প্রাণস্পর্শী দেবভাষা। কি অপ্রাকৃত ভাব-মাধুর্য! ইহা শ্রীপ্রিয়াজীর ভাষা মনে করিয়াই আমি নিত্য ভোগ করি। কেমন করিয়া 'হা মদনগোপাল' বলিয়া কাঁদিয়া গোলোক-রতনকে ভূলোকে আনিতে হয় তাহা জগৎকে দেখাইয়াছেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। কেমন করিয়া 'হা রাধে হা রাধে' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে ব্রজকুঞ্জে প্রবেশ করিতে হয় তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। আর কেমন করিয়া গৌর-বিরহে 'হা গৌর, প্রাণ গৌর' বলিয়া অশ্রুধারা ঢালিয়া—প্রাণ-দয়িতের পরম সেবায় তিলে তিলে নিজেকে মিশাইয়া দিতে হয় তাহা জীবজগতে প্রকটন করিয়াছেন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। প্রিয়াজীর পরম শিক্ষা আমাদের কৃপাপূত সাধন-পথে পাথেয় হউক। ❑

দয়ানিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

রসতত্ত্ববেত্তা স্বরূপদামোদর কাশীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া যখন পুরীধামে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণত হন। তখন তিনি একটি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন—

"হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলনদামোদয়া, শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া। শাশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া, শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যদেব! আমার প্রতি তোমাব দয়া হউক। তোমার দয়া আনন্দ প্রকাশক, শান্তিবিধায়ক, ভক্তিরূপ প্রদায়ক মাধুর্যের মর্যাদা প্রাপক, উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাবাদির কারক, সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ-ভঞ্জক।

শেষোক্ত কথাটি সমধিক তাৎপর্যমণ্ডিত। 'শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া' — শ্রীগৌরহরির মাধুর্যপ্রভাবে শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হইযাছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রের অনুগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে। তাহারা স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করে। কিন্তু শ্রীগৌরহরির মাধুর্যেব আকর্ষণে সকলেই স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রবিবাদ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের শাস্ত্র-বিবাদ চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে। ইহার কারণ, তাহারা সকলে সকল শাস্ত্রের সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহকে পাইয়াছে। শাস্ত্র-বিবাদকে শান্তভূত করিয়াছে যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা নহে—নিজ জীবনলীলার প্রত্যেকটি আচরণ ও ঔদার্যময় প্রচারণের মধ্য দিয়া। শাস্ত্র-সমন্বয়ের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়াই তিনি শাশ্বত ধর্মকে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আজিকার দিনে মানব-সমাজের সর্বপ্রকারে দুর্গতিপূর্ণ অবস্থার অন্যতম কারণ শাস্ত্র- পরাঙ্মুখতা। সমাজ আবার উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও উন্মুখ হইলে। এই উন্মুখতা আনয়ন করিতে সর্বাধিক যোগ্যজন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাই শাস্ত্রবহির্মুখ হইয়া অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ভারতভূমিকে আবাব সমুজ্জ্বল করিতে কার মুখের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করি? শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু উত্তর দিয়াছেন—

'জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ।'

সত্য জ্ঞান ও প্রেমধর্মের যে প্রদীপটি পাঁচশতবর্ষ পূর্বে শ্রীনবদ্বীপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাঁহার উদ্ভাসক আলোক ধারাতেই আমরা আবার জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারি।

"হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলনদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।" —শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮/১৪

হে দয়ানিধে! হে চৈতন্য! আমার প্রতি তোমার দয়া হউক। তোমার সুনির্মল দয়ার মহিমা কী আর বলিব! তোমার দয়ায় অনায়াসে সকল দুঃখ দুর হয়। তোমার দয়ায় শুদ্ধা ভক্তিরস লাভ হয়। তোমার দয়ায় তোমার পরম মাধুর্যের যে মর্যাদা তাহা সমধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। আর সকল শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়।

* * *

গৌরাঙ্গসুন্দর। বিশ্বমাঝে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভোগী তিনি। বিশ্বের সকল শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধ ইহার মধ্য দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অফুরন্ত মধুরিমা সম্ভোগ করিতেছেন। সর্বাধিক ভোগী শ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া উদার বাহু বেষ্টনে বিশাল বক্ষ মধ্যে তিনি বিশ্বের সকল জীবকুলকে আকর্ষণ করিয়াছেন। কৃষ্ণধন কৃষ্ণপ্রেমধন বিলাইবার জন্য বিরাট্ ত্যাগী বলিয়াই তিনি বিশ্বপ্রেমিক। কৃষ্ণ-ভজন-বিমুখ পতিত জীব-বিরহের বেদনায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়াছেন। "উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।" ত্যাগী হইয়া তিনি শুষ্ক কঠোর নির্মম হন নাই। নিরুপম ঔদার্যে তিনি বিশ্ববাসীকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। সর্ব বিষয় ত্যাগী হইয়াও তিনি বিশাল ভোগী। সর্বময় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হইয়াই তিনি "ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা" মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ রূপে বিরাজমান ছিলেন। গীতোক্ত ধর্মের তিনি মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন বলিয়াই প্রকৃত সনাতন ধর্মকে অধর্মের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় সত্য ত্যাগ তপস্যার সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে ধনে ধনীতে রাজৈশ্বর্যে তৃণতুল্য তুচ্ছ কী হইলে সম্ভব হয়? সকল লোভনীয় বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে কে, যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রার্থনা —

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী, কবিতা চাই না, কী চাই — মাত্র একটি ধন চাই — জগদীশ! তোমার পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিধন। জন্ম জন্মান্তরে এই মাত্র ধনের আকাঙ্ক্ষা আছে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"— মন্ত্রের ইহা অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ আর কে হইতে পারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া? সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনের সন্ধান পাইলেই সকল ধনে পরধনে নির্লোভতা লাভ হয়।

শ্রুতি ত্যাগী হইয়া ভোগ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ছিলেন ত্যাগী-শিরোমণি। বৃদ্ধা জননী, যোড়শী সহধর্মিণী, নবদ্বীপের সকল নরনারীর স্নেহপ্রীতি, পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতা, দেশবিখ্যাত চতুষ্পাঠী, অগণিত বিদ্যার্থী, সংসারের সর্ববিধ সুখ-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন ত্যাগী বীর। পাঁচশত বৎসর পূর্বে এদেশে ধর্মের গ্লানি ঘটিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ভয়াবহ পরধর্ম আসিয়া সনাতন ধর্মকে কবলিত করিতেছিল প্রবলভাবে। কারণ তাহার সঙ্গে ছিল রাজশক্তি। সনাতনধর্ম ছিল শৌর্যবীর্যময় ক্ষাত্রধর্মপরাঙ্মুখ। তাই বাঁচিবার কোন উপায় ছিল না। ধর্মের গ্লানি অধর্মের অভ্যুত্থান চরমতায় পৌছিয়াছিল। ঐ সময় যদি ধর্মের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গৌড়দেশ উদয় গিরিতে চন্দ্র-সূর্যের মত উদিত না হইতেন তাহা হইলে গাঢ় অন্ধকারে সনাতন ধর্ম অবসন্ন হইয়া পড়িত। শুধু একটা সত্তাহীন নামে মাত্র পর্যবসান হইত।

সনাতন ধর্মকে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করিতে পারেন একমাত্র তিনি যাহার জীবনে ঐ ধর্ম মূর্তিমান হয়। অন্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। সনাতন ধর্ম শ্রুতি-স্মৃতির ধর্ম। বহু মন্ত্রেই এই ধর্মের রূপ অঙ্কিত আছে। আমরা আদর্শ রূপে বৈদিক শাস্ত্রের একটি মন্ত্রকে গ্রহণ করি। ঈশ

উপনিষদের প্রথম মন্ত্র—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্।।"

একটি মন্ত্রে তিনটি বিষয় আছে — দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও জীবন যাপন বা সাধন শাস্ত্র।

জগৎ জুড়িয়া ঈশ্বর আছেন — দর্শনশাস্ত্র।

পরদ্রব্যে লোভ করিও না — নীতিশাস্ত্র।

ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ কর — জীবনপথে সাধনশাস্ত্র।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি।

যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্তি।।" — এই ছিল শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থাটি। ঈশাবাস্য মন্ত্রের ইহা অপেক্ষা বিগ্রহ আর কী হইতে পারে? পর ধনে নির্লোভিতা। ধন অর্থ মান যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ইহা একজন শ্রেষ্ঠ রাজরাজার মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে.। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র। তাহার সঙ্গে একটু পরিচিত হইবার চেষ্টা করা দূরে থাক — রাজা স্বয়ং আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। তাহাকে উপেক্ষা করিলেন গৌরহরি কি কঠোর ভাষায়! "রাজদর্শন শাস্ত্রে নিষেধ"। প্রবল লালসা যুক্ত রাজাব প্রতিজ্ঞা—প্রভু বিনে ত্যজিব জীবন। প্রভুর প্রতিজ্ঞা — না করিব রাজ-দর্শন। ❑

দোলের দিন তিনি এসেছিলেন

সেদিন হোলির বিলাসে আকাশ ছিল রঙ ধরা। বাতাস কীর্তনমুখর। ভরা চন্দ্রগ্রহণ। ওই মধুবাসন্তীর পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপের গঙ্গার তট আলোকিত হয়ে উঠল। অবতীর্ণ হলেন সেই মহা জাদুকর। যাঁর স্পর্শে ধুয়ে গেল সব ক্লেদ, সব আবিলতা।

পাঁচশ বছর আগে অখণ্ড-বঙ্গভূমির শিক্ষাসংস্কৃতির রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। শত শত পণ্ডিত ছিলেন, অগণিত ছাত্র ছিল বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন। ন্যায়, সাংখ্য ও তন্ত্রের গবেষণায় পণ্ডিত-সমাজ ছিল তুলনাহীন দক্ষতা সম্পন্ন। মানুষের ধনধান্য ছিল, অর্থ সম্পদ্ ছিল। সমাজে মানুষ সাধারণত যা কামনা করে তার সবই ছিল। ছিল না শুধু একটি বস্তু। ছিল না মানুষের প্রতি মানুষের অন্তরের দরদ। ছিল আভিজাত্যের গর্ব বিদ্বেষ। লাখে এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না যার হৃদয়ে অপরের জন্য বেদনা ছিল, সহানুভূতি ছিল। সেই মানুষটির জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সবাই। তিনি এসেছিলেন নবদ্বীপে প্রবাসী শ্রীহট্টিয়া ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে, পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীরানীর কোল আলো করে। অমৃতলোকের প্রেমের দেবতা দেখা দিয়েছিলেন নরলোকের মানুষের মাঝখানে। তাঁর নাম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

পাঁচশ আট বছর আগের সেই ফাল্গুনী সন্ধ্যায় তাঁর রূপে বিমোহিত হয়েছিল মানুষ। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর গানে বন্যজন্তু হয়েছিল অনুগত। তাঁর ঔদার্যে বিরোধীরা হয়েছিল ক্রোড়গত। তাঁর বিদ্যাবত্তায় দিগ্বিজয়ী কম্পান্বিত, স্বরূপ দর্শনে পণ্ডিত সার্বভৌম পদানত। তাঁর প্রেমকান্নায় শিলা হয়েছিল বিগলিত। তাঁকে ভালবাসেনি এমন মানুষ সেই যুগে সারা দেশে

ছিল না।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অগণিত সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী, দুর্বিনীত পাঠান বিজলী খাঁ, দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার জগাই-মাধাই। তাঁহার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ওড়িশার নরপতি প্রতাপরুদ্র, নিষ্কিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর, বাদশাহ্ হোসেন শাহ্, নবদ্বীপের মুলুকপতি চাঁদকাজী।

কাজীর হুকুমে নাম সংকীর্তন বন্ধ হয়েছিল নবদ্বীপে। একদিন গৌরসুন্দর বললেন, এসো নগরবাসী এসো। আজ সকলে মিলে মহাকীর্তন করব। সকলে মিলে কাজীর বাড়ি যাব। যে কাজী কীর্তনে বাধা দিয়েছেন তাঁকেও আপনজন করব। তাঁর গলা জড়িয়ে ধবে আপন করে নেব।

হাজার হাজার লোক সেই ডাকে কীর্তনে সামিল হ'ল। গৌরাঙ্গসুন্দর আদেশ করলেন, প্রত্যেকে হাতে একটি করে মশাল নাও। মশাল অন্ধকার অপনোদন করুক। প্রভু যেন বললেন, আজ সকলে ক্ষুদ্রতার অন্ধকার দূর কর। আমি বড় তুমি ছোট—তোমাদের এই ব্যবধানের গাঢ় অমানিশা আজ প্রীতির জ্যোৎস্নায় দূর হয়ে যাক।

সেদিন সকলে একাকার। সমাজের ধনী-মানী, চণ্ডাল-বিপ্র, মুচি-মেথর, কুলীন-কায়স্থ সবাইকে একাকার করে বিরাট্ নগরকীর্তন নিয়ে কাজীর দরজায় উপস্থিত হলেন। প্রেমমাখা কণ্ঠে কাজীকে ডেকে বললেন, মামা, তুমি আমাদের কীর্তন বন্ধ করেছ কেন?

কাজী বললেন, "ভাগ্নে! আমি কেন তোমার কীর্তন বন্ধ করব? তোমাদেব পাড়ার পণ্ডিত বামুনরা আমাকে বলেছে— উচ্চৈঃস্বরে খোদাতাল্লাকে ডাকিলে তিনি কুপিত হন। মহামারী পাঠান। তাহা যে মিথ্যা কথা তাহা তো জানিতাম না।"

মামা-ভাগ্নেতে সন্ধি হয়ে গেল। কেবল সন্ধি নয়, মহা সন্ধি। প্রভু বললেন, "মামা তোমার কাছে একটা দান চাই। দেশে কীর্তন যেন বন্ধ না হয়।"

কাজী বললেন, "তথাস্তু।"

বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা কি সমকণ্ঠে মামাভাগ্নের সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে পারি না! ❑

'শ্রীহরিদাস চরিতামৃত'—ভূমিকা

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কথা অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। এই গ্রন্থটিতে তাঁহার কথা এত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিয়া পাঠক শুধু মুগ্ধ হইবেন না, গভীর অনুরাগে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি সমাকৃষ্ট হইয়া ধন্য হইবেন।

আমি ভূমিকায় কী-ই বা লিখিব? তাঁহার সীমাহীন গুণ-সমুদ্রে নিমজ্জমান আত্মহারা শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং যা বলিয়াছিলেন, তাহারই এক বিন্দু। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

---

* *'শ্রীহরিদাস-চরিতামৃত'। শ্রীকল্যাণকুমার সাহা। প্রকাশক : শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮। ১৪০২ বঙ্গাব্দ*

সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু লিখিয়াছেন—কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া তিনি যে কত বড় মহামানব ছিলেন, তাহা সর্বাধিক সুন্দরভাবে আমরা সকলে জানিতে পারিয়াছি। এমন আর হয় না।

হরিদাস ঠাকুর সম্পর্কে প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরহরি নিজ মুখে কী বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য কী করিয়াছিলেন তাহা জানিলে শ্রীহরিদাসকে ঠিক চিনিতে ও জানিতে পারিবেন। তিনি যে আমাদের চেনা-জানার অনেক উর্দ্ধে এক অনন্তপুরুষ, বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। শ্রীহরিদাস অন্তরে ব্যথিত, কারণ তাঁহার নাম-জপ সংখ্যা পূর্ণ হয় না, সেই হেতু তিনি আহারও ত্যাগ করিতে চান। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহাকে তখন বলিলেন,—"তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, এখন সংখ্যা জপে এত আগ্রহ ধর কেন?" কথাটির তাৎপর্য হইল, সংখ্যা ধরিয়া জপ করেন সাধকেরা। কিন্তু হরিদাস সাধক নন, তিনি 'সিদ্ধ পুরুষ'। তাঁহার অন্তরে নিরন্তর জপ হয়। অজপা জপ চলিতেই থাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। 'সিদ্ধ' ব্যক্তির আর সংখ্যা-জপের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? কোন সাধকের প্রশংসায় ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর ভাষা আর কী আছে?

শ্রীহরিদাস বলিলেন, "প্রভু! তোমার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না। তোমার আগে আমি দেহত্যাগ করিতে চাই। তোমার চরণে মাথা বাখিয়া, তোমার শ্রীবদনে দৃষ্টি আরোপ করিয়া ও মুখে নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহ ছাড়িব।" প্রভু বলিলেন—'কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া তোমার চলিয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?" তবুও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। ভক্তের সাধ পূর্ণ করিতে তাঁহার কি ব্যস্ততা! পবদিনই সকালে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গেলেন হরিদাস অঙ্গনে। ভক্ত সঙ্গে হরিদাসকে ঘিরিয়া কীর্তন শুরু করিলেন। হরিদাসের প্রত্যাশাও পূর্ণ হইল। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু সকলে প্রত্যক্ষ দেখিলেন।

ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, না আরও অধিক? প্রভু ভক্তবাৎসল্যে আপনাহারা। ভক্ত যাহা চাহে নাই, তাহাও দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন। ভগবান্ ভক্তের দেহ কোলে লইয়া নাচেন—ইহা কোন দিন কেহ দেখেন নাই। শুধু কি তাই? ভক্তের প্রাণহীন দেহের সৎকার প্রভু নিজ হস্তে সম্পাদন করিলেন সমুদ্র তীরে। হরিদাসের দেহ স্পর্শে সমুদ্রও মহাতীর্থ হইল।

প্রভু হরিদাস-মহোৎসব করিবার জন্য আনন্দবাজারে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পুত্র পিতার মহোৎসব করে। শিষ্য গুরুর দিবসী করে। আজ ভক্তবাৎসল্যের আতিশয্যে সে সম্পর্কও উল্টাইয়া গিয়াছে। আরাধ্য'ধন আরাধকের জন্য মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন।

'বেদশাস্ত্র' পৃথিবীকে একজন দেবতা বলিয়াছেন। আবার পৃথিবীকে মাতাও বেদ বলিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবী হইলেন দেবী মা। মায়ের মাথায় একটা মুকুট থাকিবেই। সেই মুকুটমণির মধ্যস্থিত মণি ছিলেন শ্রীহরিদাস। আজ সেই মণি-শূন্য মুকুট পরিয়া মায়ের আর সুখ নাই। তাই মণিহারা মা—অতীব বিষণ্ন! ❑

কেশব কাশ্মীরী প্রসঙ্গে

৮ই জুলাই, ১৯৮৮ 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের প্রতি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি এই প্রবন্ধ পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্ত অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। আমাকে ইহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম—"জন্মের আগেই মহাপ্রভু তর্ক করলেন কী করে?" — নামটির মধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অগ্রভাগের খোঁচা আছে। তাহাতে গৌড়ীয় ভক্ত-বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রাণে ব্যথা লাগিবারই কথা। শিরোনামটি বদলাইয়া 'মহাপ্রভু ও কেশব কাশ্মিরী' — এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। তিনি পূর্বে এইরূপ লিখিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পাঁচটি অসামঞ্জস্যের কথা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাহার এক কপি আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রবন্ধ পড়িয়া সুখী হইয়াছি। তবু উত্তর দিয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করি নাই। নাভাজীর যে প্রতিজ্ঞা তাহা আমাদের বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। সকলের সুযশই গাইব। কাহারও দোষ দর্শন করিব না। বৈষ্ণবদের একটি বিশেষণ আছে অদোষদর্শী। তাহা হইতে বিচ্যুতি হইলে আমরা বৈষ্ণবতা হারাইব। প্রবন্ধের লেখক অ-প্র-ভ মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য, গুরুনিষ্ঠা ও শাস্ত্রনিপুণতা আমি বিশেষভাবে জানি। তাঁহার লেখনীতে এইরূপ শিরোনাম থাকা আমার কল্পনাতীত।

উক্ত প্রবন্ধে অনেক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐসব গ্রন্থ আমার দেখা থাকিলেও এখন হাতের কাছে নাই। একমাত্র চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই হাতে আছে। উহা নিত্য একবার শিরে ধারণ করি। উহার লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মালার মণি। দৈন্যের তিনি খান। তাঁহার লেখনীতে ভুল আছে, কল্পনা আছে বা অসত্যের গন্ধ আছে ইহা আমাদের ভাবনার অতীত। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য-নিষ্ঠ, তথ্য-নিষ্ঠ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃত। অ-প্র বাবুর প্রবন্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীর উপরে কঠোর কটাক্ষপাত করিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী কোথাও একথা বলেন নাই যে কেশব কাশ্মিরী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য। অ-প্র বাবু কেশব কাশ্মিরীকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য মনে করিয়া "জন্মের আগেই মহাপ্রভু তর্ক করলেন কী করে?"— এইরূপ কটূক্তি করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশ্মীর দেশে নিশ্চয় কেশব নামে কোন পণ্ডিত ছিলেন। একই নামে কোন পণ্ডিত সজ্জন থাকিতে পারেন। কেহ নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "শঙ্করাচার্যের গুরু 'গোবিন্দ' — মহাপ্রভুর ভৃত্য হলেন কী করে?" নামের মিল আছে বলিয়াই 'দুই গোবিন্দ' — 'এক' হইলেন? মহাপ্রভুর সমকালে কাশ্মীরে কেশব নামে কোন পণ্ডিত ছিলেন না — এইরূপে বলিলে কবিরাজ গোস্বামীকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। যাঁহার যত বিদ্যাবত্তা থাকুক না কেন কবিরাজ গোস্বামীকে যিনি মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন তিনি আর যাহাই হউন আমাদের আদরণীয় নহেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক

কালে কেশব নামে কোন পণ্ডিত ছিলেন না, — ইহা প্রমাণ করিতে হইলে কাশ্মীরে গিয়া তাহাকে ও আমাকেও research করিতে হইবে। নিম্বার্কী কেশবের উপাধি ছিল ভট্টজী ; কবিরাজ গোস্বামী কোথাও ভট্টজী বলেন নাই।

কেশব কাশ্মিরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর কোন তর্ক হয় নাই। কেশব অনর্গল সংস্কৃত শ্লোকে গঙ্গার মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিতকে তাঁহার শ্লোকগুলির মধ্যে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া তাহার বিচার করিতে বলিয়াছেন। বিচার অর্থ "critical analysis"। পণ্ডিত উক্ত শ্লোকে গুণ ও রীতি আলোচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্লোকে দোষ কী আছে শুনিতে চাহিয়াছেন। পণ্ডিত বলিয়াছেন দোষ নাই। প্রভু চার-পাঁচটি দোষ দেখাইয়াছেন। পণ্ডিত আর কোন উত্তর করেন নাই। মনে হয় মানিয়া লইয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে তর্ক বলে না। পণ্ডিত ও মহাপ্রভুর আলোচনা কাব্যের দোষগুণ লইয়া। দার্শনিক কিছু নহে। ইহাতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্পর্শও করে না। সুতরাং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী অ-প্র বাবুর উহা গায়ে লাগাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পণ্ডিতের শ্লোকের পাঁচটি দোষ আছে বটে তবে পাঁচটি অলঙ্কারও আছে — এ কথাও তো প্রভু বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রশংসা হইয়াছে এবং বলিয়াছেন— 'প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।'

আরও বলিয়াছেন—

"তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য বাণী।।
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজল-ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর।।
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ।।
দোষ-গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিতা করণে শক্তি তাহা সে বাখানি।।
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার।।
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার।।"

পণ্ডিত যাহাতে ব্যথা না পান তাহার জন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তিগুলি কি চমৎকার! পরের দিন তাঁহার কাছে শাস্ত্রকথা শুনিবেন এইজন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এই উত্তরে মহাপ্রভু কেশব কাশ্মিরীকে পরাজিত করিয়াছেন তর্কে — তাহা সত্য কথা নহে। তর্কও নয়, পরাজয়ও নয় — সুতরাং অ-প্র বাবুর ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

যদি অ-প্র বাবু বলেন কেউ সুখী বা দুঃখী হইল তাহা দেখিবার নয় — যাহা ঐতিহাসিক সত্য তাহা বলিব। তাহার উত্তরে একটি নীতিকথা বলি — সত্য বাক্য যদি কাহারও মনে দুঃখ

দেয় তবে নাভাজীর সমগোত্রীয় কোন বৈষ্ণবের বলা উচিত নহে।

অ-প্র বাবু যদি কোন প্রবন্ধ লেখেন "পৃথিবী সাতদিনে সৃষ্টি হইয়াছিল" — বাইবেলের এই কথাটি মিথ্যা অবৈজ্ঞানিক। "কুমারীর গর্ভে যীশু জন্মিয়াছিলেন" — ইহা অবৈজ্ঞানিক ; সুতরাং অসত্য। একথা সত্য হইলেও খৃষ্ট-ভক্ত মর্ম-বেদনা পাইবেন মনে করিয়া লেখা উচিত নহে ; বলা উচিত নহে কোন বৈষ্ণবের।

কু-সমালোচনা করার ইচ্ছা থাকিলে যাহা কিছু লইয়া লেখা যায়। বেদে গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। ঋষি বিশ্বামিত্রের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণেরা উপনয়নকালে গায়ত্রী মন্ত্র কি পাইতেন না, বা জানিতেন না? ইহা লইয়া মনোরম একটি সমালোচনা করা যাইতে পারে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী কাঠের কৌপীন পরেন। ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? কোন্ মহাজনের আচরণে আছে? থাকিলে সকল বৈষ্ণবরাই ঐরূপ করেন না কেন? ইহা লইয়া কি সমালোচনা চলে না? শুনিয়াছি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য লিখিতভাবে কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন — 'মহাপ্রভু কৃষ্ণের অবতার নহেন।' ইহা কোনও সম্প্রদায়ের কাছে আদৃত হইতেও পারে, — কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাছে ইহা শিরশ্ছেদ তুল্য।

"কায়মনে কোন জীবে উদ্বেগ না দিবে" —ইহা মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা। অ-প্র বাবুর প্রবন্ধের গবেষণা যদি আংশিক সত্যও হয় তাহা হইলেও তাহা নিখিল বৈষ্ণবমণ্ডলীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। কেহ মুখ খুলিতেছেন না বটে, তবে সকলেই অন্তরে ব্যথাতুর। বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অ-প্র বাবুর কর্তব্য ক্ষমার্থী হওয়া। □

প্রেম-ভক্তি সাধন

প্রেমভক্তিময় সাধনের প্রথমাবস্থা সাধনভক্তি ও পরবর্তী অবস্থা রাগভক্তি। সাধনভক্তির অপর নাম বৈধী ভক্তি। শাস্ত্র কথিত বিধি দ্বারা ভজনে প্রবৃত্ত হইলে বৈধী ভক্তি বা বিধি মার্গের ভক্তি। এই ভক্তির ৬৪টি অঙ্গ।

(১) **গুরুপদাশ্রয়**—পিতামাতা স্ত্রীপুত্র সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ এক জন্মের অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর কোন যোগ থাকে না। কিন্তু গুরুদেবের সাথে সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। "চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে গুরু সেই।" সেই গুরুর দর্শন পাওয়া অবধি তাঁহাকে গুরু রূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয়। তখন হইতে তাঁহার নিকটবর্তিতা লাভ করিয়া তাঁহার ভাব-বাঞ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনা আরম্ভ করিতে হয়। ইহা গুরুপদাশ্রয়। তারপর যে-দিন গুরুদেব কৃপা করিবেন সে-দিন দীক্ষা।

(২) **দীক্ষা**—শিক্ষা গ্রহণ। শ্রীমুখে দীক্ষা মন্ত্র প্রাপ্তির পর তাহার অর্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শিক্ষা দরকার। শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ছাড়া অন্য ব্যক্তি হইতে পারেন। একাধিক ব্যক্তিও হইতে পারেন।

(৩) **গুরুসেবা**—সেবা অর্থ সুখবিধান। যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করা। শিষ্য নিয়মিত সাধন-ভজনে রত থাকিলে গুরু সন্তুষ্ট থাকেন।

(৪) **সাধুবর্ত্মানুগমন**—সজ্জনগণ যে পবিত্র পথে চলেন সেই পথে বিচরণ। মহদ্ব্যক্তিদের অনুসরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

(৫) **সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা**—গুরুর নিকট বা অন্য কোন সাধু-সজ্জনের নিকট গমন করিলে যা-তা প্রশ্ন করিবে না, সদ্ধর্ম বিষয়ক জিজ্ঞাসা কবিবে। নিজ ভজন-সাধনের অনুকূল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

(৬) **কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ**—যে-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহে তাহা ত্যাগ। মৎস্য, মাংস, ধূমপান, মদ ইত্যাদি কুৎসিত বস্তু কৃষ্ণের প্রিয় নহে। তাহা ত্যাগ করিলে কৃষ্ণ প্রীত হন, এইজন্য ত্যাগ।

(৭) **কৃষ্ণতীর্থে বাস**—আরাধ্য যেখানে গমন করিয়াছেন তাহার নিকট বাস। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তগণের স্মৃতি জাগে যেখানে বাস করিলে সেখানে বাস। অসাধ্য হইলে সেখানে মনে মনে বাস।

(৮) **যাবৎ-নির্বাহ-পরিগ্রহ**—সহজ-সরলভাবে জীবন-ধারণে যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক গ্রহণ না করা। যদি বিনা চেষ্টায় উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা সৎ পাত্রে বিতরণ করা। আপনার ৪ খানা বস্ত্রের প্রয়োজন। ৮ খানা হাতে আসিলে তাহা পুঁজি না করিয়া সৎপাত্রে অর্পণ করা। বস্ত্রহীনকে দান করা কর্তব্য।

(৯) **হরিবাসর সম্মান**—শ্রীহরিভক্তের একাদশী ব্রত, নরসিংহের ভক্তের নৃসিংহ-চতুর্দশী, শিবভক্তের শিবচতুর্দশী ইত্যাদি তিথি ব্রত পালন।

(১০) **ধাত্রী-অশ্বত্থাদি পবিত্র বৃক্ষের গৌরব দান**। তুলসী, বট, অশ্বত্থ, আমলকী কৃষ্ণপ্রিয়,। বিল্ববৃক্ষটি শিবপ্রিয়। ইষ্টের প্রিয় বৃক্ষাদির মর্যাদা দান।

এই দশবিধ সাধন ভক্তির আরম্ভ স্বরূপ। এই অঙ্গগুলি অনুশীলন না করিলে সাধন ভজন আরম্ভই হয় না।

পরবর্তী দশবিধ বর্জনাত্মক।

(১১) **ভগবদ্‌বিমুখগণের সঙ্গত্যাগ**—শতগুণে গুণী হইলেও যে ভগবান্ মানে না, শাস্ত্র বাক্যে বিমুখ তাহার সঙ্গ করিবে না।

(১২) **শিষ্যাদি-অননুবন্ধিত্ব**—বহু শিষ্য না করা। অনেকে শিষ্য হইয়া শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন, এরূপ না করা। নিজে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বছর সাধন না করিয়া অন্যকে শিষ্য করিতে না যাওয়া। যোগ্য হইলেও বহু শিষ্যের গুরু না হওয়া।

(১৩) **বিভিন্ন কলাভ্যাসবর্জন**—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার বাদ্য-শিক্ষাদি যাহা ভক্তিরসের বিরোধী।

(১৪) **শোকাদিতে বশীভূত না হওয়া**—কোন শোকেই বিচলিত না হওয়া। নিজ ভজন-সাধন উপেক্ষা না করা।

(১৫) **বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জন**—অনেক পুঁথিপত্র শাস্ত্র-অশাস্ত্র অধ্যায়ন করা ব্যাখ্যা করা অকর্তব্য। বৈষ্ণবের পক্ষে গীতা-ভাগবত সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

(১৬) **ব্যবহারে অ-কার্পণ্য।**

(১৭) **অন্য দেবতার প্রতি আস্থাহীনতা**—সকল দেবদেবী আরাধ্য দেবতার অংশ জানিয়া শ্রদ্ধা

করা।

(১৮) প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া।

(১৯) সেবাপরাধ—নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকা।

(২০) শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত সম্বন্ধে নিন্দা-অপবাদ না করা। প্রতিবাদে অসক্ত হইলে স্থান ত্যাগ বিধেয়। এই দশটি বর্জনাত্মক

ভক্তি মার্গে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ—

(২১) **অঙ্গে তিলকাদি ধারণ।**

(২২) **অঙ্গে শ্রীহরির নামাক্ষর লিখন।**

(২৩) **নির্মাল্য ধারণ।**

(২৪) **আরাধ্য অগ্রে নৃত্য-গীত।**

(২৫) **দণ্ডবৎ নমস্কার**—দেহে সামর্থ না হইলে মানসে।

(২৬) **শ্রীমূর্তি দর্শনে গাত্রোত্থান।**

(২৭) **অনুব্রজ্যা**—শ্রীমূর্তির পাছে পাছে গমন।

(২৮) **ভগবদধিষ্ঠান স্থানে গমন।**

(২৯) **মন্দিরাদি পরিক্রমা।**

(৩০) **অর্চন (পূজা)।**

(৩১) **পরিচর্যা।** "বসন ভূষণ শয্যা আসনাদি আর। এসব কৃষ্ণেব শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।।"

(৩২) **গীত**—লীলা-নাম-কীর্তন।

(৩৩) **সংকীর্তন**—একটি মাত্র নামের অখণ্ড কীর্তন।

(৩৪) **জপ**—গুরুদত্ত বীজ ও মন্ত্র জপ।

(৩৫) **নিবেদন**—আপনাকে তাঁর পাদপদ্মে সমর্পণ।

(৩৬) **স্তব পাঠ**—আরাধ্যের গুণ ও মহিমা সম্বলিত স্তবাদি আবৃত্তি।

(৩৭) **মহাপ্রসাদের স্বাদ গ্রহণ।**

(৩৮) **চরণামৃতের স্বাদ গ্রহণ।**

(৩৯) **প্রসাদী ধূপ**—দ্বীপের সৌরভ গ্রহণ।

(৪০) **শ্রীমূর্তি স্পর্শন।**

(৪১) **শ্রীমূর্তি দর্শন।**

(৪২) **আরতি উৎসবাদি দর্শন।**

(৪৩) **শ্রবণ**—ভক্তমুখে ভাগবতীয় গ্রন্থপাঠ শ্রবণ।

(৪৪) **কৃপেক্ষণ**—কৃপা প্রাপ্তির আশা-প্রার্থনা।

(৪৫) **স্মরণ**—রূপ ও লীলার অনবরত চিন্তন।

(৪৬) **ধ্যান**—তৈলধারাবৎ ভাবনা।

(৪৭) **দাস্য**—নিজেকে সর্বাপেক্ষা অক্ষম মনে করা।

(৪৮) **সখ্য**—তিনি সর্বাপেক্ষা আপনজন এই বোধ।

(৪৯) **আত্মনিবেদন**—নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে তাঁর পদে সমর্পণ দণ্ডবৎ।
(৫০) **শ্রীকৃষ্ণে তৎপ্রিয় বস্তু অর্পণ।**
(৫১) **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা**। যা কিছু করিতে হয় কৃষ্ণসেবার্থে হয়।
(৫২) **তৎকৃপাবলোকন**—যাহা ঘটে সবই তাঁহার কৃপাশক্তির কার্য।
(৫৩) **নিজ প্রিয় দান।**
(৫৪) **শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সেবা।**
(৫৫) **শ্রীবৃন্দাবনস্থ ধামের সেবা।**
(৫৬) **বৈষ্ণব সেবা।**
(৫৭) **ভক্তবৃন্দের সেবা সাধ্যানুযায়ী।**
(৫৮) **কার্ত্তিকাদি ব্রত নিয়মসেবা।**
(৫৯) **জন্মাষ্টমী ব্রতাদি পালন।**
(৬০) **শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা।**
(৬১) **রসিক ভক্ত সঙ্গে ভাগবতাদি শাস্ত্রাস্বাদন।**
(৬২) **স্বজাতীয় স্নিগ্ধ আশ্রয়**—সমভাবাপন্ন সৎসঙ্গ।
(৬৩) **নাম-সংকীর্তন।**
(৬৪) **মানসে মথুরা মণ্ডলে অবস্থিতি।**

৬৪ মধ্যে শেযোক্ত পাঁচটি আশ্চর্য প্রভাবশালী।

"সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেমা জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।"

বিধি মার্গের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল। এখন রাগমার্গের কথা। অভীষ্ট বস্তুতে যে পরম আবিষ্টতা তাহা রাগ। সেবা দ্বারা অভীষ্ট বস্তুকে সুখী করার যে তীব্র বাসনা তাহার নাম রাগ। রাগ একটি প্রেমময়ী তৃষ্ণা বিশেষ।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ এই স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থ লক্ষণ।।"

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা। বলবতী বাসনা। জল পানের ইচ্ছাকে বলে তৃষ্ণা। শরীরে যখন প্রয়োজনীয় জলের অভাব হয় তখন তৃষ্ণা জাগে। তৃষ্ণা হইলেই জলপানের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হয়। তৃষ্ণা যত গাঢ় হয় উৎকণ্ঠা তত প্রবল হয়। এমন হয় যে জল না হইলে বাঁচা যাইবে না। ইহার নাম গাঢ় তৃষ্ণা। কোন বস্তুর জন্য যে বলবতী আকাঙ্ক্ষা তাহাকে এখানে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে। এই বস্তু যে কৃষ্ণ তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা। উৎকণ্ঠা যখন তীব্র হয় তাঁহাকে না পাইলে প্রাণ যায় যায় অবস্থা তখন তাহাকে বলে রাগ।

এই কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণসেবার জন্য যে তৃষ্ণা তাহা চিৎশক্তির একটি বৃত্তি। এই ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহা শ্রীবৃন্দাবনেই দৃষ্ট হয়। ঐ রাগাত্মিকা যাঁহাদের হৃদয়ে আছে তাঁহাদের আনুগত্যে যে ভজন তাহা রাগানুগা।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্য-ব্রজবাসিজনে।
তার আনুগত্য ভক্তি রাগানুগা নামে।।" চৈঃ চঃ

ব্রজবাসীদের সেবামাধুর্যের কথা শুনিয়া তাহা পাইবার জন্য লোভ জন্মে।

শাস্ত্রানুশীলন হইতে বৈধী ভক্তি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার লোভই রাগানুগার প্রবর্তক। রাগানুগার প্রারম্ভে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। ভজনের অপেক্ষা আছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কিরূপে আবির্ভূত হয় তাহার একটি ক্রম আছে। তাহা বলিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ যে করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন।।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর।।
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম।।" চৈঃ চঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১/৪/১১

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততো প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"... ❑

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ'—ভূমিকা

ধর্মগ্রন্থের বিক্রেতা "মহেশ লাইব্রেরী" কলিকাতা শহরে বিখ্যাত। তাহার স্বত্বাধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার প্রকাশন বিভাগের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ প্রশান্ত চক্রবর্তী ইচ্ছা করিয়াছে "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবে।

* *'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ'। মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশিত।*

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ টীকা সহ সংস্করণ বাজারে এখন দুষ্প্রাপ্য। শ্রীমান্‌দ্বয় আমার কাছে আসিল গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার অনুরোধ লইয়া। আমি বলিলাম—"এই পুঁথি কি এখনও বাজারে চলিবে? এই জাতীয় গ্রন্থের ক্রেতা কি দেশে এখনও আছে?" তাহারা গভীর প্রত্যয়ের সহিত জানাইল, "এখনও তো কিছু মানুষ অধীর আগ্রহে এই ধরণের গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করেন। আমরা তাঁহাদের জন্যই প্রকাশ করিব।" আমি ভাবিয়াছিলাম বর্তমান ঈশ্বরশূন্য রাজত্বে এই জাতীয় অনুষ্ঠানমূলক ধর্মগ্রন্থ আর চলিবে না। তাহাদের উক্তি শুনিয়া আমি বুঝিলাম এই নিরীশ্বরতার রাজত্বেও নদীর under current-এর মত ধর্মের একটি স্রোত সজ্জনের হৃদয়ে এখনও প্রবাহিত আছে। শত সন্তাপেও তাহা শুকায় নাই, শুকাইবেও না। আমি আনন্দে ভূমিকা লিখিতে সম্মত হইলাম।

গ্রন্থের ছাপা প্রায় শেষ হইলে আবাব আসিয়া ভূমিকা লিখিবার অনুরোধ করিল প্রকাশকদ্বয়। শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিলাম, দোষত্রুটি হইলে বৈষ্ণববৃন্দ ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিবেন।

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' স্মৃতিগ্রন্থ। বাংলাদেশের ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানে শ্রীরঘুনন্দনের স্মৃতি এখনও প্রচলিত। শ্রীগৌরসুন্দর ধরাধামে আসিযা যে অভিনব প্রেমধর্ম প্রকট করিয়াছেন তদ্‌ভাবের পূজার্চনাদি শ্রীরঘুনন্দনের স্মৃতিতে চলিতে পারে না। তাই প্রভু স্বয়ং শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদকে বৈষ্ণবস্মৃতি লিখিতে আদেশ করেন। শ্রীসনাতন প্রভুর আদেশ প্রাপ্তির পর বিনয়ে প্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন—

"মুঞি নীচ জাতি, কিছু না জানোঁ আচার।
মো 'পরি দিশা হয় স্মৃতি পরচার।।
সূত্র করি দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ।।
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয়।।" চৈঃ চঃ, মধ্য

শ্রীল সনাতন তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' রচনায় ব্যাপৃত থাকাতে উক্ত স্মৃতি গ্রন্থ রচনার অবকাশ করিতে না পারায় শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে স্মৃতিগ্রন্থের খসড়া তৈয়ার করিতে অনুরোধ করেন। গোপালভট্টজী সেই কার্য শেষ করিলে শ্রীসনাতন ইহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া কিছু ওলট-পালট যোগ-বিয়োগ করিয়া তৎসহ নিজকৃত 'দিগ্‌দর্শিনী' নামক টীকা যুক্ত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন।

"হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত।।
এইসব গ্রন্থ কৈলা গোসাই সনাতন।।" চৈঃ চঃ, মধ্য

শ্রীগৌরহরির আদেশ, প্রেরণা শক্তি ও গোস্বামীদ্বয়ের কঠোর ত্যাগময় সাধনা এই গ্রন্থের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান।

শ্রীল শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। তিনি আবির্ভূত হন আনুমানিক ১৫৫৭ সংবৎ (১৫০০ খৃষ্টাব্দে)। প্রকট কাল ৮৫ বৎসর। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর ভারত তীর্থে গমনাগমন করিয়াছেন, বাকী ১৮ বৎসর নীলাচলে স্থিতি। তিনি যখন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণে রত তখন একদা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ের বেঙ্কট ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বহু সম্মান করিয়া নিজ গৃহে আনিলেন—

"শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।।" চৈঃ চঃ, মধ্য

প্রভু শ্রীবেঙ্কটের গৃহে উপনীত। বেঙ্কট-তনয় শ্রীগোপালভট্ট তখন এগার বৎসরের বালক। সপরিবারে মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিলে বালক গোপাল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত পান করিল। পান করিয়াই প্রেমে বিভোর হইল। সময়টি তখন চাতুর্মাস্যের। বেঙ্কটের কাতর প্রার্থনায় প্রভু তাঁহার ঘরেই চাতুর্মাস্যব্রত করিতে মনস্থ করিলেন। বেঙ্কট, পুত্র গোপালকে গৌরসেবায় সমর্পণ করিলেন। গোপাল যে গৌরেরেই নিজধন। বেঙ্কটের আনন্দ আর ধরে না, নিজ গৃহে গৌরধন পাইয়া।

প্রতিদিন প্রভু কাবেরীতে করিতেন অবগাহন, শ্রীরঙ্গনাথনদেবকে করিতেন দর্শন, আর প্রেমাবেশে করিতেন নর্তন। এই বিখ্যাত রঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দিরেই জড়াইয়া আছে শ্রীযমুনাচার্য আর তাঁহার শিষ্য শ্রীরামানুজাচার্যের বহু স্মৃতি।

প্রভু আনন্দের সহিত বেঙ্কটগৃহে চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিলেন, এইবার প্রভু শ্রীরঙ্গম্‌ পরিত্যাগ করিবেন। বালক গোপালের সেবায় খুবই তুষ্ট হইয়াছেন প্রভু। বেঙ্কটকে ডাকিয়া প্রভু বলিলেন—"শোন বেঙ্কট! তোমার এই গোপাল চারিটি মাস আমায় খুবই উত্তম সেবা করিল। ইহার প্রতি আমার সর্বদা কৃপাশীষ আছে জানিবা। তুমি তোমার পুত্রকে শাস্ত্ররসে নিমজ্জিত করাও। কদাচ মায়িক সংসারে জড়াইয়া রাখিবে না। বিবাহ দিবে না, ও যে আমার একান্ত আপন জন। যথা সময়ে ইহাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিও।"

বেঙ্কটেরা ছিলেন তিন ভাই, অন্য দুই ভাই বেঙ্কটের ছোট, প্রবোধানন্দ ও ত্রিমল্ল। প্রবোধানন্দ ছিলে পরম শাস্ত্রজ্ঞ, উপাধি তাঁহার সরস্বতী। শ্রীগোপাল প্রভুর আদেশ মত এই পিতৃব্যের নিকটই শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। অতি অল্প কালেতেই সকল শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃস্ফুরিত হইতে থাকে।

"পিতৃব্য-কৃপায় সর্ব শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান।
গোপালের সম তথা নাই বিদ্যমান।।"

শ্রীগোপাল তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা গত হইলে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীধাম্‌ বৃন্দাবনের

উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। উত্তর ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণান্তর ও বহু পণ্ডিত, সন্ন্যাসীকে শাস্ত্র যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট উপনীত হইলেন। প্রভুর নিকট শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ-সনাতন প্রেরিত একটি পত্র আসিল। সেই পত্রে শ্রীগোপালের শ্রীধাম বৃন্দাবন পৌঁছাইবার খবর পাইয়া প্রভুর চিত্ত পুলকিত হইল। প্রভুও গোপালের জন্য ডোর-কৌপীন-বহির্বাস ও আসন পাঠাইলেন। প্রভুর প্রসাদী ডোর-কৌপীনাদি পাইয়া গোপাল ভট্টজী যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন। গোপাল ভট্টজী শ্রীধামে আসিবার পথে গণ্ডকী নন্দী হইতে একটি সুদৃশ্য শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। সেই শালগ্রাম শিলা নিজ ভজন কুটীরে স্থাপন পূর্বক ভজন করিতে থাকেন, ইনিই পরে শ্রীরাধারমণ মূর্তিতে প্রকটিত হন, সে এক অদ্ভুত কাহিনী।

গোপাল ভট্টজী গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিত্য শালগ্রাম সেবা করিতেন। একদিন একজন শেঠজী আসিয়া বৃন্দাবনের সব ঠাকুর বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচুর বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিতে লাগিলেন। গোপাল ভট্টজীর শালগ্রাম শিলার উদ্দেশ্যেও শেঠজী দান করিলেন। গোপাল ভট্টজী প্রতিদিন বৈকালে সব ঠাকুর বাড়ী দর্শন করিতে যাইতেন। দেখিলেন সব ঠাকুরই সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়াছেন। নিজের ঠাকুর সাজাইতে না পারিয়া মনে দুঃখ হইল।

রাত্রিতে শয়ন করিয়াছেন শ্রীগোপালভট্ট। ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—"গোপাল! আমাকে সাজাইলে না?" শ্রীগোপালভট্ট বলিলেন— "তোমাকে কোথায় সাজাইব? তোমার হাত নাই, বাঁশী দিব কোথায়? চরণ নাই, নুপুর দিব কোথায়? শির নাই, চূড়া পরাইব কোথায়? কটি নাই, পীত বাস পরাইব কোথা?" ঠাকুর উত্তর করিলেন— "তুমি যদি আমাকে সাজাইতে চাও, তবে দেখ আমার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আছে।"

ঐ গভীর রাত্রিতেই শ্রীগোপালভট্ট শ্রীমন্দির খুলিলেন। খুলিয়া দেখিলেন—ঐ শালগ্রাম হইতে ছোট্ট একটি ঠাকুর প্রকটিত হইয়াছেন। কি সুন্দর তাঁহার রূপ, কি সুন্দর হস্ত, পদ, শির! আনন্দে পুলকিত গোপালভট্টজী প্রতিটি বস্ত্র অলঙ্কার সুন্দর রূপে ঐ শ্রীবিগ্রহকে পরাইলেন। অদ্যাপি তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত রোমাঞ্চিত গাত্রে দর্শন করেন শালগ্রাম হইতে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহকে। শ্রীগোপালভট্ট শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনকে বলিলে তাঁহারাও আসিয়া ঐ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া উৎফুল্ল হইলেন ও নাম রাখিলেন—শ্রীরাধারমণ। এই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীই 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের মূল কাঠামো শ্রীল সনাতন প্রভুর আদেশে রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের অপূর্ব লীলাকথাও কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতেছি।

শ্রীল শ্রীসনাতন গোস্বামী

বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীঅনুপম (বল্লভ)

তিন সহোদর ভ্রাতা। শ্রীজীব গোস্বামী ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের পুত্র। শ্রীসনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব কাল ১৪১০ শকাব্দে (ইং ১৪৮৮ খ্রীঃ)। প্রকট কাল ৭০ বৎসর। বৈষ্ণব সাহিত্যের অনবদ্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৈষ্ণবতোষণী নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। এই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীজীব গোস্বামী 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী' নামক একটি প্রাঞ্জল টীকায় রূপদান করেন। এই টীকার সমাপ্তি কালে শ্রীজীব গোস্বামী নিজেদের যে বংশ পারচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

"কর্ণাটভূমিপতিঃ শ্রীসর্বজ্ঞজগদ্‌গুরু ভুবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণী। ....যজুর্বৈদিক বিশ্রামভূর্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিন ক্ষিতৌ জগ্মিবান্। .... তস্য তনয়ৌ প্রযজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী। শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ .... পৌলস্ত্যদেশং যযৌ। .... ধন্যং পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্। মূর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ। ..... শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী। জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ। ....তৎপুত্রেষু .... আদিঃ শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়....।"

অস্য ভাবানুবাদ—পূর্বকালে সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে একজন কর্ণাট দেশীয় রাজা ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অনিরুদ্ধদেব নামক এক সর্বজনপূজিত পুত্র ছিলেন। অনিরুদ্ধদেবের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটি পুত্র হয়। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র দ্বিজবর কুমার ইনি বঙ্গদেশে বাস করেন। কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রিয়তম সনাতন, রূপ ও বল্লভ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভই শ্রীজীবের জনক।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের পূর্ব নাম ছিল অমর ও সন্তোষ। ঘটনা ক্রমে এক সময় ইঁহারা বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মোরগা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা কী প্রকারে তৎকালীন বাংলার নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী হইয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে একটি অপূর্ব ঘটনা আছে।

হোসেন শাহ তখনকার গৌড়ের রাজধানী রামকেলী নগরে বাস করিতেন। তিনি অনেক মসজিদ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মসজিদের গায়ে কারুকার্য করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এক সময় একটি নূতন মসজিদ তৈয়ারী হইতেছে। তৈয়ারী প্রায় শেষ সেই সময় হোসেন শাহ বাঁশের মই বাহিয়া ওপরে উঠিয়া মসজিদটি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ও ঐ স্থানে দাঁড়াইয়াই প্রধান রাজমিস্ত্রীর সহিত আলাপ করিতেছেন আর কোন্ কোন্ স্থানে কাজ ভাল হয় নাই তাহা লইয়া উদ্বেগের সহিত কথা বলিতেছেন। রাজমিস্ত্রী কথার উত্তর দিতেছিলেন। অনেক লোকের স্বভাব থাকে কথা বলিবার সময় গায়ে হাত দিয়া ধাক্কা দিয়া কথা বলা।

হোসেন শাহের সেই স্বভাব ছিল। হোসেন শাহ্ কথায় কথায় ঐ রাজমিস্ত্রীর গায়ে ধাক্কা দেন। ধাক্কায় রাজমিস্ত্রী উঁচু বাঁশের খাঁচা হইতে নীচে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। নবাব নীচে নামিয়া আসিয়া হিঙ্গা নামক এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "হিঙ্গা! তুই মোরগা যা।" এই কথা বলিয়া তিনি রাজপ্রসাদের অন্দরে চলিয়া গেলেন। মোরগা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সকলেই চিনে। ভৃত্য হিঙ্গা মোরগা গ্রামে চলিয়া গেল। সেইখানে গিয়া একই রাস্তায় বারবার ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল।

রাস্তার পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীর, তাহার বারান্দায় বসিয়া দুই জন পণ্ডিত শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন। পণ্ডিতদ্বয় একটি অপরিচিত লোককে একই রাস্তায় আনাগোণা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এইখানে ঘুরিতেছ কেন?" হিঙ্গা বলিল, "আমি হোসেন শাহের ভৃত্য। তাঁহার আদেশে আসিয়াছি। কী কাজে আসিয়াছি তাহা জানি না।"

পণ্ডিতদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মালিককে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন, কী কাজে যাইবে?" হিঙ্গা বলিল, "তখন নবাবের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, আমি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। আমাকে আদেশ করিয়া তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন। আমি বাহির বাড়ির ভৃত্য, অন্দরে ঢুকিবার কোন অধিকার নাই। বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া যদি আমাকে দেখেন যে আমি যাই নাই তাহা হইলে ভর্ৎসনা করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবেন—মারিতেও পারেন।" "নবাবের মেজাজ এইরূপ রুক্ষ হইবার কারণ কী?" পণ্ডিতদ্বয় জানিতে চাহিলেন। হিঙ্গা বলিল, "উনি একটি মসজিদ নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া বাঁশের মাচার উঁচুতে উঠিয়াছিলেন। ঐখানে প্রধান রাজমিস্ত্রীর সহিত কথা বলিতে তাঁহাকে ধাক্কা দিলে রাজমিস্ত্রী নীচে পড়িয়া যান ও মৃত্যু হয়। এই কারণে নবাবের মেজাজ ভীষণ ভাবে রুক্ষ ছিল।"

পণ্ডিতদ্বয় তখন হিঙ্গাকে একখানা কাগজে চার জন ওস্তাদ রাজমিস্ত্রীর নাম লিখিয়া বলিলেন, "তুমি এই চারজন রাজমিস্ত্রী লইয়া যাও। তাহাদের বাসস্থান নিকটেই।" ঐ কথামত হিঙ্গা ঐ চারজন রাজমিস্ত্রী লইয়া রামকেলী চলিয়া আসিলেন। রাজমিস্ত্রী পাইয়া হোসেন শাহ সন্তুষ্ট হইয়া হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে তো রাজমিস্ত্রীর কথা বলিয়া দেই নাই, তুই চারজন রাজমিস্ত্রী লইয়া আসিলি কোন্ বুদ্ধিতে?"

হিঙ্গা বলিল, "ঐখানকার দুইজন পণ্ডিত এই বুদ্ধি আমায় দিয়াছিলেন, আমার মুখে সব শুনিয়া।" এই কথা শুনিয়া নবাব অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, ঐ দুইজন পণ্ডিত নিশ্চয়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হইবেন। এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোককেই রাজসভায় মন্ত্রী রাখিতে হয়। হোসেন শাহ তৎক্ষণাৎ হিঙ্গার সঙ্গে পাল্কী দিয়া পাঠাইলেন। হিঙ্গা পাল্কী লইয়া গিয়া পণ্ডিতদ্বয়কে বলিলেন, "আপনাদের এখনই রাজদরবারে যাইবার হুকুম। এই পাল্কীতে চড়িয়াই চলুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ-আজ্ঞা পালন কর্তব্যবোধে যবন রাজার দরবারে দুই ভাই পাল্কীতে চড়িয়া আসিলেন। হোসেন শাহ তাহাদিগকে সসম্মানে বসাইয়া বলিলেন, আপনারা দুইজন আমার রাজ্যের মন্ত্রী হউন, একজন অন্দর মহলের (খাস দরবারের) মন্ত্রী,

অপরজন অর্থসচিব।” তাঁহাদের নাম হইল দবীর খাস (সনাতন) ও সাকর মল্লিক (রূপ)। তাঁহাদের মন্ত্রীত্বকালে হোসেন শাহের রাজ্য সকল বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। রামকেলীতেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দবীর খাস এবং সাকর মল্লিককে কৃপা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের নাম রাখেন রূপ ও সনাতন। পরবর্তীকালে তাঁহারা রাজার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে একটি অপরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

একদিন রাত্রিকালে হোসেন শাহের বেগম স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া সেবা করিতেছিলেন। দেখিলেন স্বামীর পিঠের উপরে একটি প্রকাণ্ড দাগ। ঐ দাগটি কিসের জানিবার জন্য পতিকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও হোসেন শাহ বলিতে রাজী হইলেন না। শেষে একান্ত পীড়াপীড়িতে রাজী হইয়া বলিলেন, “আমি এক সময় জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলাম। তিনি আমাকে একটি পুষ্করিণী খনন করিবার ভার দিয়াছিলেন। আমি অনেক চতুরতা করিয়া কাজটিতে ফাঁকি দিয়াছিলাম। মনিব আমার চতুরতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হাতের লাঠি দিয়া আমার পীঠে সজোরে আঘাত করিয়াছিলেন। ঐটি সেই আঘাতের দাগ।” বেগম জানিতে চাহিলেন, “সুবুদ্ধি রায় এখন কোথায় আছে?” বেগম বলিলেন, “যাহার লাঠির দাগ নবাবের পীঠে সেই লোকটি এখনও বাঁচিয়া আছে? ইহা আমি সহ্য করিব না। কাল সকালেই ডাকিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে হইবে।” নবাব বলিলেন, “তিনি আমায় শাস্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে শাস্তি পাইয়াই আমার বিবেক জাগিয়াছিল। তদবধি সৎ পথে চলিয়াছি। আমি একটি ভৃত্য ছিলাম। ভাগ্যবশে এখন নবাব হইয়াছি। আমার উন্নতির মূলে সুবুদ্ধি রায়ের ভর্ৎসনা ও লাঠি। আমি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে পারিব না। আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।” বেগম বলিলেন, “তুমি তাহার শিরশ্ছেদ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব।” বহুক্ষণ ধরিয়া কথা কাটাকাটিতে ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। নবাব নিরুপায় হইয়া সেই গভীর রাত্রে মন্ত্রী দবির খাসকে লোক পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনিলেন। দবির খাস নবাবের কথার আদ্যোপান্ত শুনিয়া কী করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে রক্ষা করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া বেগমকে কহিলেন, “যদি সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ড না দিয়া তাঁহাকে ধর্মচ্যুত করিয়া দেই তাহা হইলে কেমন হয়?”

বেগম শুনিয়া খুব উল্লাস সহকারে বলিলেন— “তাহাই করুন।”

দ্বন্দ্ব মিটাইয়া সেই গভীর রাত্রেই তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন। তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি হইতেছিল। ফিরিবার পথে বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া এক কৃষকের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছেন।

কৃষক-পত্নী বলিল, “ঘরের পাশ দিয়া একটি লোক গেল মনে হইল।” কৃষক বলিল, “এত রাত্রে একটি লোকের বাহির হইবার কী দরকার হইতে পারে? আমার মনে হয় একটি কুকুর হইবে।” কৃষকপত্নী বলিল—“কুকুরেরই বা কী দরকার হইতে পারে? কুকুর তো ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে পারে। রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইবে কেন?”

কৃষক বলিল — "তোমার কী মনে হয়?"

কৃষক পত্নী বলিল — "আমার মনে হয় কোন মানুষই হইবে। বোধ হয় কোন মনিবের দাসত্ব করে। তাহার মনিবের হুকুমে এই রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়াছে। নতুবা এই বর্ষায় এত রাত্রে কে বাহির হইবে?" কৃষক ও কৃষকপত্নীর এই আলাপগুলি শ্রীসনাতন শুনিলেন, শুনিয়া ভাবিলেন— সত্যিই তো, পরের দাসত্ব করি বলিয়াই এই অবস্থায় বাহির হইয়াছি। যে অবস্থায় একটি কুকুরও বাহির হয় না। আর বাহির হইয়াও আমি কি গর্হিত কার্য করিলাম! একজন নৈষ্ঠিক হিন্দুর জাতিভ্রষ্ট করিবার পরামর্শ দিয়া আসিলাম। ইহা ভীষণ পাপের কার্য করিলাম। আবার ভাবিলেন, প্রাণটি বড় না ধর্ম বড়? যাইত যাইত প্রাণটি যাইত। আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হইতে পরামর্শ দিলাম? বিষণ্ণচিত্তে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সনাতন বাড়ী ফিরিলেন।

শ্রীসনাতন দুই দিন রাজ সভায় যাইলেন না। তিনি কেন আসিতেছেন না, রাজার নিকট হইতে খবর আসিল। উত্তরে তিনি বলিলেন—আমি অসুস্থ। নবাব পরদিন এক কবিরাজ পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিলেন কয়েক জন ভক্ত লইয়া তিনি শ্রীভাগবত চর্চা করিতেছেন। কবিরাজ তাঁহার কী অসুখ জানিতে চাহিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমার দেহের কোন অসুখ নাই, মনের অসুখ।" কবিরাজ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া নবাবকে সেই কথা জানাইলে নবাব নিজেই চলিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—"আপনি প্রতিদিনের মত আমার রাজ দরবারে যাইতেছেন না কেন?" শ্রীসনাতন বলিলেন, "আমি আর আপনার চাকুরী করিব না।" নবাব বলিলেন— "আপনি চাকুরী না করিলে আমার রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইবে।" শ্রীসনাতন কহিলেন, "যাহা হইবার হউক, আমি কিছুতেই আপনার চাকুরী করিব না।" নবাব বলিলেন—"আপনি চাকুরী না করিলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিব।" সনাতন কহিলেন—"আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। চাকুরী আর করিব না।"

কিছুদিন পরে হোসেন শাহ উড়িষ্যা বিজয়ে যাইবেন। তিনি কারাগারের মধ্যে যাইয়া শ্রীসনাতনকে বলিলেন—"আপনি আমার সহিত চলুন। আমি উড়িষ্যা যাইতেছি। আপনার বুদ্ধি অনুযায়ী চলা আমার একান্ত প্রয়োজন।" শ্রীসনাতন বলিলেন—"আমি কিছুতেই আপনার সহিত যাইব না। আপনি উড়িষ্যা যাইয়া দেবতার মন্দির ভাঙ্গিবেন। তাহাতে আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গে থাকিব না। আমি আপনার চাকুরী আর কিছুতেই করিব না। তবে আপনার রাজত্বে এতদিন আমি মন্ত্রী ছিলাম। আপনাকে সুপরামর্শ দেওয়া আমার কর্তব্য। উড়িষ্যায় এখন আপনি যাইবেন না। উড়িষ্যা এখন খুব সুরক্ষিত। এখন উড়িষ্যা যাইলে পরাজিত হইয়া আসিবেন।" হোসেন শাহ শ্রীসনাতনের কথা না শুনিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই ভীষণ ভাবে হারিয়া আসিয়াছিলেন।

অবস্থা অত্যন্ত ভয়াভহ দেখিয়া শ্রীরূপ তাঁহার বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া দশ হাজার মুদ্রা এক মুদি দোকানে রাখিয়া গেলেন ও বলিয়া গেলেন, "আমার দাদা বিপদে পড়িলে

তাঁহাকে এই টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন।" শ্রীরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বহু দিন ঘুরিয়া প্রয়াগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

মুদিওয়ালা শ্রীরূপের গচ্ছিত টাকা গোপনে কারাগারে শ্রীসনাতনের হাতে পৌঁছাইয়া দিলেন। কারাগাররক্ষীকে শ্রীসনাতন ঐ টাকা দেখাইয়া লোভ দেখাইলেন ও বলিলেন—"তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও। তোমার মনে আছে তো, এক সময় আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি।" মুক্ত হইয়া শ্রীসনাতন বহু পথ অতিক্রম করিয়া কাশী অভিমুখে রওনা হইলেন। কাশীতে যাইয়া শ্রীসনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তখন কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়ী অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে দিয়া শ্রীসনাতনের ক্ষৌরকর্মাদি করাইয়া ভদ্রবেশ করাইলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া প্রণত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপ ত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়।।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।"

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহাকে সকল শাস্ত্রের সার কথা, জীবের স্বরূপ, কর্তব্য ও ভজনাদি বিষয় জানাইয়াছিলেন। এইসব তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২০শ-২৪শ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এই অংশগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি প্রধান অঙ্গ।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ ও কৃপাশক্তিতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড ও অন্যান্য অনেক লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীমদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ উদ্ধার করিলেন। রচনা করিলেন অনেক ভক্তিগ্রন্থ।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী উভয়েই শ্রীধাম বৃন্দাবনেই অপ্রকট হইয়া নিত্যলীলায় গমন করেন। উভয়েরই সমাধি মন্দির অদ্যাপি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত।

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী দু'জনাই। উভয়েরই গবেষণা ও লেখনীর বিরল প্রতিভা এই গ্রন্থের মধ্যে সমুজ্জ্বল। এই জন্য এই গ্রন্থের প্রাক্‌কথন রূপে এই দুই গোস্বামীপাদের কথাই বলা হইল।

"শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সংকলন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে যে সকল গ্রন্থ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে এই 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। এই গ্রন্থ রচনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশেই কীভাবে করিলেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

"মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানো আচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার।।
সূত্র করি দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ।।
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করহ, সেই সিদ্ধ হয়।।
প্রভু কহে, যে করিতে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ।।"

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ প্রকটিত হইলেন। 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের ২০টি বিলাস বা অধ্যায় আছে। প্রতিটি বিলাসের পৃথক্ পৃথক্ নাম। নিম্নে প্রতিটি বিলাসের আলোচ্য বস্তু কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল—

"(১ম) **গৌরব-বিলাস**—সকারণ শ্রীগুরুর আশ্রয়। শ্রীগুরুর লক্ষণ। শিষ্য লক্ষণ। গুরুশিষ্য পরীক্ষাদি। ভগবানের তত্ত্ব-মাহাত্ম্যাদি।

(২য়) **দৈক্ষিক বিলাস**—দীক্ষা।

(৩য়) **শৌচীয়-বিলাস**—নিত্য ব্রাহ্ম মুহূর্তে শুভ কর্ম জন্য গাত্রোত্থান। নিত্য পবিত্রতা (হস্তপদ প্রক্ষালণ, দন্তধাবন, আচমনাদি শুচিতা), শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণ, বাদ্য সহযোগে ভগবানের জাগরণ, শৌচবিধি, আচমনাদি।

(৪র্থ) **শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার-বিলাস**—মন্দির সংস্কার, স্বস্তিক নির্মাণাদি, পুষ্পতুলসী প্রভৃতি আহরণ, আচমনাদির জন্য নিজাসন, উর্দ্ধপুণ্ড, গোপীচন্দনাদি, চক্রাদি মুদ্রা মালা, গৃহে সন্ধ্যা, শ্রীগুরু অর্চন ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(৫ম) **আধিষ্ঠানিক-বিলাস**—শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারদেশ ও মধ্যগৃহের বন্দনা, পূজা, নিজ আসনের কথা, অক্ষাদি স্থাপন বিষয়ক কথা, বিঘ্ন-করণ, গুরুবর্গকে বন্দনা, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, পঞ্চমুদ্রা, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, শালগ্রাম শিলাদি ও মূর্তির লক্ষণ ইত্যাদি।

(৬ঠ) **স্নানাদি-বিলাস**—শ্রীমূর্তির আবাহন, স্নপন, শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্য, সহস্রনাম ও পুরাণ পাঠ, নৈবেদ্য, আনুষঙ্গিক আবশ্যক বর্ণনা।

(৭ম) **পৌষ্পিক-বিলাস**—শ্রীকৃষ্ণপূজা-যোগ্য পুষ্প বিবরণ, তুলসীপত্র বিবরণ, মহাত্ম্যাদি অঙ্গ উপাঙ্গ ও আসনাদির বর্ণনা।

(৮ম) **প্রাতরর্চন-সমাপন-বিলাস**—শ্রীমূর্তি সমীপে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পান, হোম, গণ্ডুষার্থ জল, মুখবাস, ছত্র, চামরাদি, গীতবাদ্য, নৃত্য, মহা নিরাজন, স্তুতি নতি, প্রদক্ষিণ, অপরাধ, নির্মাল্য ধারণ ইত্যাদি।

(৯ম) **মহাপ্রসাদ-বিলাস**—তুলসীতত্ত্ব মাহাত্ম্য, ধাত্রীমাহাত্ম্য, স্নানের নিষিদ্ধকাল, জীবিকার্জন, মধ্যাহ্নকালে বৈশ্বদেবাদি শ্রাদ্ধ, শ্রীবিষ্ণুকে অর্থাযোগ্য বস্তু, অর্চনা ব্যতীত

ভক্ষণ ও অনিবেদিত ভক্ষণের দোষ, নৈবেদ্য ভক্ষণ।

(১০ম) **সৎসঙ্গম-বিলাস**—সাধুগণ, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, অসৎ লোকের গতি, বৈষ্ণবগণের উপহাস ও নিন্দজাত কুফল, সাধুগণের সম্মানন, বিষ্ণুশাস্ত্র।

(১১শ) **নিত্যকৃত্য-বিলাস**—শ্রীমূর্তির অর্চন (কালত্রয়ে), রাত্রিকৃত্য, পূজাফল সম্পূর্ণতার প্রকার, শ্রীহরিনাম, শ্রীনাম জপ, কীর্তন, নামাপরাধ ও অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি। প্রেম, ভক্তি মাহাত্ম্য ও শরণাগতি।

(১২শ) **একাদশী-নির্ণয়-বিলাস**—একাদশী বিধি।

(১৩শ) **বিষ্ণুব্রতোৎসব-বিলাস**—উপবাস, অষ্ট মহাদ্বাদশীব্রত।

(১৪শ) **যাণ্মাসিক-বিলাস**—অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাসের করণীয় ব্রতাদি।

(১৫ম) **দিব্যাবির্ভাব-বিলাস**—নির্জলা একাদশী, তপ্ত মুদ্রা ধারণ, চাতুর্মাস্যব্রত, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণা দ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়া দশমীব্রত।

(১৬শ) **শ্রীদামোদরপ্রিয়-বিলাস**—কার্তিক কৃত্য বা দামোদর ব্রত (ঊর্জব্রত বা নিয়ম সেবা) দীপদানাদি, গোবর্দ্ধন পূজা, রথযাত্রা।

(১৭শ) **পৌরশ্চারণিক-বিলাস**—পুরশ্চরণ, জপ ও মালা।

(১৮শ) **শ্রীমূর্তি প্রাদুর্ভাব বিলাস**—বিষ্ণুর শ্রীমূর্তির প্রকার।

(১৯শ) **প্রাতিষ্ঠিক-বিলাস**—শ্রীমূর্তির প্রতিস্থাপন ও তাঁহার স্নপাদি এবং

(২০শ) **প্রাসাদিক বিলাস**—শ্রীবিষ্ণুর মন্দির নির্মাণাদি, জীর্ণোদ্ধার, শ্রীতুলসী বিবাহ ও ঐকান্তিক ভক্তগণের কৃত্য।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন — আশ্রব

রথযাত্রা, ১৪০৩ — **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

নবদ্বীপের মহানাম মঠে গৌরসভা—একটি প্রাণস্পর্শী অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানের শেষ ভাষণে শ্রীমন্‌মহানামব্রতজী মহারাজ গভীর অনুপ্রেরণা ও ভক্তিভাবে অভিভূত হয়ে ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে প্রেমঘন শিহরণে তাঁর আশ্চর্য ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করেন। তিনি গৌরসুন্দর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন— রাধাকৃষ্ণ দেখেছি, গৌরসুন্দরও দেখেছি। কুঁড়িও দেখেছি, ফোটা ফুলও দেখেছি। কিন্তু কুঁড়ি কেমন করে ফুট্‌ল, রাধার ভিতরে কৃষ্ণ কেমন করে অনুপ্রবেশ করতে করতে একেবারে এক হয়ে গেল—কুঁড়ি কেমন করে ফোটা ফুল হয়ে গেল, তা দেখিনি। সেটাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন রায় রামানন্দ। আমরা দেখি প্রভুর দেওয়া নিত্য ভজনের মধ্যে।

---

* *'মহানাম অঙ্গন', ৫ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন, ১৩৯৪) অনুলিখন ঃ শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী।*

রাধা ডাকছেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ডাকছেন হরে, রাধা ডাকছেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ডাকছেন হরে হরে। এইভাবে কখন কিভাবে রাধা কৃষ্ণ এক হয়ে গেলেন—গৌর হয়ে গেলেন—সেটাই পরম আস্বাদনীয়। রাধা কৃষ্ণের মধ্যে, কৃষ্ণ রাধার মধ্যে প্রবেশ করতে করতে সম্পূর্ণ একীভূত হয়ে গিয়ে গৌর হয়ে গেলেন। কাঁচা আম পেকে গেল। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে গেল। আর রাধা মুখে উচ্চারিত কৃষ্ণ নাম শুনে চন্দ্রাবলী হয়ে গেলেন নিত্যানন্দ। রাধারাণীর বিরহের চরম মূর্তি গৌর। যখন গোবিন্দ আর বাহিরে নেই, তখন প্রচণ্ড বিরহে অন্তরে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন। সেই বিরহদশায় কৃষ্ণকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিলে রাধার যে অবস্থা, সে অবস্থাতেই তো গৌর হয়ে গেলেন।

জগদ্বন্ধুসুন্দরের দৃষ্টিতে গৌর দেখতে হবে। 'জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ।' পৃথিবী যখন মিথ্যায় পাপে ভরে গেছে—অন্ধকার হয়ে গেছে, তখনই কিন্তু শেষ নয়। একটা প্রদীপ আছে। ভারতের সেই প্রদীপটি নবদ্বীপ। ওই আলো দেখে আমাদের চলতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভুসুন্দর এই নবদ্বীপে হরিসভায় গৌরসুন্দরকে দেখেছেন—বিভোর হয়ে তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়ে দেখেছেন। এই বন্ধুসুন্দরের দর্শন দিয়ে গৌরকে আমাদের দেখতে হবে। নামের মধ্যে জপের মধ্যে লীলাকে দর্শন জগদ্বন্ধুর দর্শন। 'ওই আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব। তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব'। রবীন্দ্রনাথের এই কথা কোথায় পাবেন? ইসলাম ধর্মে খ্রীষ্টধর্মে, জগতের কোনো ধর্মে নেই। পূর্ণ বিনয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার এই আকুতি মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেই আছে। ❑

শ্রীহরির আবির্ভাব ও তিরোভাব

"এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।" চৈঃচঃ

শ্রীভগবানের জন্ম মৃত্যু নাই। বেদ তাঁহার অবতার গ্রহণকে আবির্ভাব ও লীলা সংবরণ করাকে তিরোভাব বলে। বস্তুতঃ লীলা নিত্যই বিদ্যমান। লীলার কোন স্থানে ছেদ নাই, বিরতি নাই। কথাটি এইরূপ ঃ সূর্যের উদয়াস্ত নাই। একই স্থানে একই স্বরূপে চির বিরাজমান আছে। পৃথিবীর মানুষ আমরা সূর্য এখন উদয় হইয়াছে, এখন অস্ত গিয়াছে, এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করি। আমাদের ভাষা ব্যাবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য—সূর্য একই স্থানে স্থিরভাবে নিত্য বিরাজমান।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, আমি অজ, জন্মরহিত, সর্বভূতেশ্বর, কোন ধর্মাধর্মের অধীন নই। সুতরাং আমার জন্ম প্রাকৃত জীবের মত হয় না। আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে আধান করিয়া অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময় প্রকৃতি স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

** 'মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ'। শ্রীসুকুমার মজুমদার। শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, কলকাতা - ৩৫। মহালয়া ১৪০৩।*

আমি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করি। অকর্তা হইয়াও কর্ম করি, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তরূপ ধারণ করি।

"জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি পাণ্ডব।।" গীতা, ৪/৯

আমার জন্মকর্ম দিব্য, অপ্রাকৃত। যিনি ইহা তত্ত্বতঃ জানেন, সে ব্যক্তি দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং আমাকে প্রাপ্ত হন।

জীবের মত শুক্র-শোনিত যোগে ভগবানের জন্ম হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ঃ

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।।
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।"

(ভাঃ ১০/২/১৬ ও ১৮)

শ্রীভগবান্ জগন্নাথ হইয়াও স্বভক্ত-পালন-পরায়ণ; তিনি সর্বাংশ পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। পূর্বদিক্ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে ধারণ করেন, সেই শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবকী বসুদেব কর্তৃক সমর্পিত, সর্বজীবসুখপ্রদ, যোগধারণাদি ব্যতীত স্বয়ংই আবির্ভূত, ভুবনমঙ্গল, সর্বাংশপরিপূর্ণ শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—"জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।" জীবের মত বসুদেব-দেবকীর ধাতু সম্বন্ধ হয় নাই—ইহাই মনদ্বারা ধারণ করিলেন, বলিবার তাৎপর্য "দৃষ্টান্তমাহ—যথা প্রাচীদিক্ চন্দ্রমিতি।" পূর্বদিক্ যথা চন্দ্রকে ধারণ করে তথা।

এই গর্ভধান রহস্য। জন্মিবার সময় আবার বলিয়াছেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০/৩/৮)—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।"

সেই চিরস্মরণীয় শুভ মুহূর্তে পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র বিকাশের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর ক্রোড়ে সর্বগুহাশয় সর্বব্যাপী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন—গৌরসুন্দর অযোনিসম্ভব। জগন্নাথ ও শচীদেবীর অঙ্গজ্যোতি অবলম্বনে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

"জগন্নাথ কহে মুই স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।।
আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়।।"

জ্যোতির্ময়ধাম জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে শচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। বলিবার তাৎপর্য এই যে জীবের মত ধাতু-সম্বন্ধ হয় নাই।

"প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।"

এই গেল সংক্ষেপে আবির্ভাবের কথা। এখন তিরোভাবের কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণের নির্যাণের কথা শ্রীশুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৩১/৫-৬)—

"সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।
লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণা ধ্যানমঙ্গলম্।।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।।"

আত্মস্বরূপে মন সংযোগ করিয়া ভগবান্ পদ্মনেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন। আগ্নেয়ী যোগধারণা, ধারণা ধ্যানমঙ্গল, স্বীয়তনু অদগ্ধ্বা, দগ্ধ না করিয়া স্বধামে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—আগ্নেয়ী যোগদ্বারা—যোগীরা তনু দগ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ নিজতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বধামে গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব লীলা দর্শন করিতে দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মাদি দেবগণ সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুই দেখিলেন না, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন চক্ষু বুজিয়াছিলেন, তাহার কারণ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণকে, "বঞ্চয়িতুং সমাধিমিব কুর্বন্ নেত্রে ন্যমীলয়দিতি।" দর্শকদের বঞ্চিত করিবার জন্য—যাহাতে তাঁহারা কিছুই দেখিতে বুঝিতে না পারেন সেজন্য চক্ষু বুজিয়া ছিলেন।

"দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতা।।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/৩১/৮)

এখন পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ নিজধামে প্রবেশকারী অবিজ্ঞাতগতি শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন, আর যাঁহারা দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

এই গেল শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কথা। এখন মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা বলিব। মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্য-ভাগবতে কিছুই বলেন নাই। সম্পূর্ণ নীরব। অতি বেদনার কথা বলিয়া হয়ত বলেন নাই। বিয়োগান্ত গ্রন্থ করা সেইকালে নিষেধ ছিল। হয়ত বা এই জন্যই বলেন নাই। বলিয়াছেন, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শেষ খণ্ডে (২৬৪ পৃষ্ঠায়) ঃ

"হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে।।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু।।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে।।
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর।।
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।

সেইক্ষণে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়।।
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট।।
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার।।
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত-পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ।।
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়।।
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কী কী বলি সত্বরে সে আইল তখন।।
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাও কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা।।
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ী মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।।
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া বলি শুন সর্বজন।।
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখচন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর।।"

মহাপ্রভুর অতি প্রিয় কৃষ্ণলীলার মধুমতী সখী-স্বরূপা শ্রীনরহরি ঠাকুরের অতি আদরের শিষ্য লোচনদাস ঠাকুর গুরুদেবের আদেশেই এই গ্রন্থ লিখেন। গুরুদেবের আদেশেই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে এই গ্রন্থ দেখাইয়া আসেন। তিনি আদ্যোপান্ত দর্শন করেন ও তাঁহার গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখেন। নিজগ্রন্থের নাম বদলাইয়া 'চৈতন্য-ভাগবত' রাখেন। এই গ্রন্থে কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ থাকা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। তবে লোচনদাস ঠাকুর ঐ লীলা নিজ চক্ষে দেখেন নাই। একজন বিশিষ্ট পড়িছা পাণ্ডা দর্শন করিয়াছেন। লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডে বাংলাদেশে। সেখান হইতে নীলাচল যাইতে তখন বহুদিন মাস সময় লাগিত। সেইখানে গিয়া তিনি কোন অনুসন্ধান নিয়াছিলেন এমন কোন উল্লেখ নাই।

এখন আমরা আর এক গৌরলীলা লেখকের কথা বলিতেছি যিনি ঐ সময় নীলাচলেই ছিলেন। তাঁহার শ্রীগ্রন্থের নাম 'চৈতন্যচকড়া'। গ্রন্থখানি উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত। উড়িষ্যা ভাষায় চকড়া অর্থ যে কী তাহা আমরা জানি না। তবে মনে হয় আমরা যাকে কড়চা বলি, তাহাই

উড়িয্যা ভাষায় চকড়া। এই মত বর্ণবিপর্যয় সংস্কৃত ভাষায়ও হয়। সিংহ শব্দটি হিংস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। হিংস্ হইতে সিংহ। পণ্ডিতেরা বলেন, সিংহ বর্ণ বিপর্যয়। সুতরাং বর্ণ বিপর্যয় হইয়া কড়চা—চকড়া হওয়া স্বাভাবিক।

পাণ্ডুলিপি হইতে এই পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্মা। ইনি জগন্নাথ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিশেযজ্ঞ পরিযদের সদস্য। ইনি বলিয়াছেন—"চকড়া লেখক গোবিন্দদাসজী অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তথ্যনিষ্ঠ, সংযত, জ্ঞানী, স্বল্পভাযী, সুকবি, শব্দ চয়নে সিদ্ধ হস্ত। নিজে ভাবুক। ভাবনিধি শ্রীচৈতন্যের দিব্য ভাবোচ্ছল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি চিত্রকরের মত বাণীবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিকের মত সাল, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র, স্থানকাল উল্লেখ করেছেন।" গ্রন্থে ৫৪টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, সকলই তাঁহার সমসাময়িক। অধিকাংশই তাঁহার প্রত্যক্ষ।

মহাপ্রভুর বাংলা ভাযায় জীবন-লীলার মধ্যে তিনখানি গ্রন্থ বিখ্যাত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। ইহাদের গ্রন্থকারগণও অশেষ গুণে গুণী ছিলেন। উপরোক্ত সব গুণই তাঁহাদের ছিল, কিন্তু কেহই ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দেন নাই। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টরূপ মহাবৈশিষ্ট্য হেতু চকড়ার কবি সমধিক মূল্যবান মনে হয়।

মহাপ্রভুর তিরোধান লীলা তিনি উড়িয্যা ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন স্বামী শিবানন্দ গিরি এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের গ্রন্থকার ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

পূর্বে বলিয়াছি, ৫৪টি লীলা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ৫৩তম ঘটনাটি 'তথলীন লীলা'—পরবর্তী ঘটনা ৫৪তম, গ্রন্থকারের বংশ পরিচিতি। এটি বাদ দিলে সর্বশেষ ঘটনাই মহাপ্রভুর তিরোভাব লীলা। চৌদ্দ'শ ছাপ্পান্ন শকে (ইং ১৫৩৩ খৃঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হয়। আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথি। আতুর ভাবে গোরা কীর্তন করতে লাগলেন। সেই গুণ্ডিচা মন্দির। অসাব্যস্ত শরীর, উদ্দণ্ড কীর্তনে মত্ত বিহ্বল। গোবিন্দ ও স্বরূপের করে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন।

অপূর্ব বিরহ কীর্তন। মহারাসস্থলী প্রকম্পিত হ'ল। বহির্বাস খুলে গেল। গলার মালা ছিড়ে পড়ে গেল। মহারাসস্থলী রাসগীতে অবিরাম মুখরিত। বিরহে মিলন। সবার হৃদয়ে আকুল ক্রন্দন। রায় রামানন্দের পাশে বসে সবাই কাঁদছেন। সবকিছু বেতাল। স্বর বেতাল। মৃদঙ্গ বেতাল। সবাই অনুভব করলেন, লীলা সংবরণের কাল উপস্থিত।

সন্ধ্যারতির সময় হ'ল। সেবকেরা আদর করে ডেকে নিয়ে এলেন গৌরাঙ্গ ঠাকুরকে। প্রভু গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আকুল চিত্তে দরশন করতে লাগলেন। আরতির ধ্বনি উঠল। সহসা মহাভাব যেন শত চন্দ্রোদয়ের জ্যোতি দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হ'ল। সকলের চোখের সামনে গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে একটি জ্যোতি গিয়ে জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেল।

'জয় হরি। জয় গৌর হরি। জয় নীলাচলপতি।' ধ্বনিতে সকল গুণ্ডিচা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে গেল। প্রভুর স্বরূপ আর দেখা গেল না।

মহাপ্রভুর শ্রীদেহ (স্বরূপ) কোথায় গেল কেহই খুঁজিয়া পাইল না। খুঁজিবার দরকার ছিল না—নিশ্চয়ই চিন্ময় অপ্রাকৃত প্রভুর চিদ্‌জ্যোতির্ময় শ্রীদেহ জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া

ছিল।

পূর্বে দেখিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের নির্যাণের সময় শিবব্রহ্মাদি দেবগণ উপস্থিত থাকিয়াও কিছুই দেখিতে বুঝিতে পারেন নাই। সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিলেন।

গুঞ্জাবাড়ীতেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রভু যে ঐ দিন জগন্নাথে মিলিয়া যাইবেন—ইহা একেবারে দৈবাৎ নহে। পূর্ব পূর্ব ভক্তগণের কাছে মনের এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচকড়া গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায়—

"টোটা গোপীনাথ দর্শন করে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে এসে সকল বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করলেন। ইঙ্গিত মাত্রে সকলে এসে সমবেত হলেন। মহাপ্রভু বললেন—আমি জগন্নাথ শরীরে অপ্রকট হব। আঠার বছর তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করলাম। তোমাদের যা প্রশ্ন আছে—জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমাদের সকলের আশা পূর্ণ করব। এই সিদ্ধান্ত জানবে।" সবাই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, "হে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার কি কেউ অন্যথা করতে পারে? কিন্তু মীন যেমন জল বিহনে, পদ্ম যেমন সূর্য বিহনে, আমাদের অবস্থাও তেমনি। সব ছেড়ে তোমার পাদপদ্ম সম্বল করেছি, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই। তোমার চরণে আমাদের মতি থাকুক।" প্রাণের ঠাকুর বললেন—"বৈষ্ণবদের গতি শুধু বৈষ্ণব—একথা জেনে রাখ। আমাদের গতি কেবল সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি, প্রভু জগন্নাথ। সেই বৈষ্ণবের প্রাণপতির সেবা আমাদের অনন্য সার পথ। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আমি যুগ যুগ ধরে মিলিত হয়ে থাকবো, বিষ্ণুর সুখের জন্য। যেখানে নাম ও কীর্তন সেখানেই আমার নিবাস। এই কথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো।"

এই ঘটনা দেখে শিখি মহান্তি রাজবাটীতে প্রবেশ করে রাজাকে খবর দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ভগবৎ আরাধনা শেষ করে এসে বেদীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রভু গদ্‌গদ স্বরে নামের মাহাত্ম্য ও প্রেমের লক্ষণ সবিস্তারে বলতে লাগলেন।

প্রভু নিজের গলার মালা প্রতাপরুদ্রকে পরাইয়া দিলেন। প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত কাতব হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। রামানন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। রাজা বললেন—হে ঠাকুর! অকিঞ্চনকে আদেশ করুন, আমি কী করবো। মহাপ্রভু বললেন—"নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। জগন্নাথ সেবা বিনা তোমার অন্য কর্তব্য নাই।"

আকুল হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণিপাত করে বললেন—"প্রভু! আপনি যদি অদর্শন হন তবে আমি কেন এই ক্ষেত্রে পড়ে থাকবো?"

লীলা সংবরণের পূর্বে প্রভু ভক্তগণকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কীভাবে জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হইবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন।

এই সকল কথা যিনি 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি পরম বৈষ্ণব, গৌরজগন্নাথগত প্রাণ। প্রভুর নীলাচল লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ইহার একটি কথাও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। মহাপ্রভুকে যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা জগন্নাথে মিলিয়ে যাওয়ার কথাও বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারাই আধুনিককালে নানা রকম কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের কথা তুলিয়া সবই যুক্তিযুক্ত ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এই গ্রন্থলেখক। সে সকল কথা আর পুনরুক্তি করিলাম না। ❑
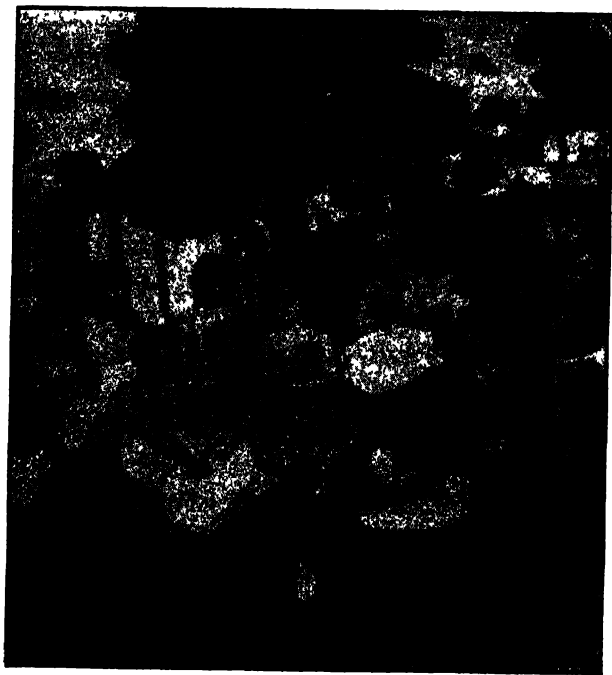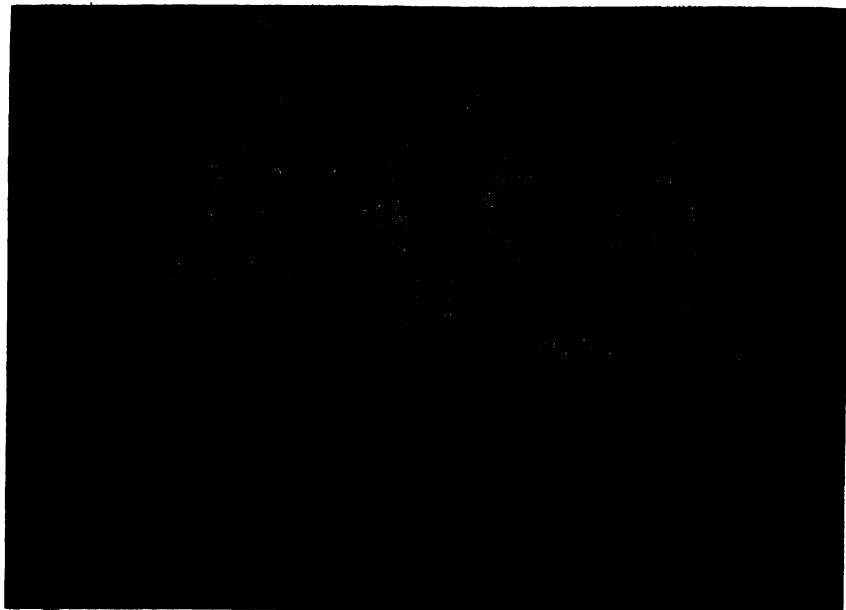
পুরী নরেন্দ্র সরোবরের তীরে শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদনরত সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও পরিকর

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরকে আমরা দুই ভাবেই দেখি— গুরুভাবে ও ঈশ্বরভাবে।

১। **গুরুভাবে—** "আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।" ভাঃ ১১/১৭/২৭
"গুরু কৃষ্ণরূপে হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।" চৈতন্যচরিতামৃত।

"শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।"—বিল্বমঙ্গল
"সাক্ষাৎ হরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তং তথা ভাব্যত এবং সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

গুরু সাক্ষাৎ হরি—শাস্ত্রও বলেন, সজ্জনরাও বলেন। কিন্তু তিনি প্রভুর পরম প্রিয়—এই ভাবেই ভাবনীয়। শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয় নিত্যানন্দ। শ্রীশ্যামসুন্দরের পরম প্রিয় অনঙ্গ-মঞ্জরী।

শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে অনঙ্গমঞ্জরী। শ্রীগৌরের দক্ষিণভাগে নিত্যানন্দ। প্রভু জগদ্বন্ধু অনঙ্গমঞ্জরী ভাবে শ্যামের বামে—নিত্যানন্দ রূপে গৌরহরির দক্ষিণে বিরাজিত।

আমি পূজারী। যখন পূজা করি আরতি করি, ভাবি—প্রথম প্রভু জগদ্বন্ধুর হাতে পঞ্চদীপটি দেখাই। তিনি অনঙ্গমঞ্জরী রূপে শ্যামের আরতি করেন। আবার প্রদীপটি জগদ্বন্ধুর হাতে দেই তিনি নিতাইরূপে গৌরের আরতি করেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন গুরু সম্বন্ধে—

"গুরুববং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর।"
শ্যামসুন্দরের প্রেষ্ঠ অনঙ্গমঞ্জরী,
গৌরসুন্দরের প্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ,
তাই মধ্যস্থলে তাঁহার স্থান।

এইভাবে তিনি গুরু রূপেই মধ্যে উপবিষ্ট।

২। **ঈশ্বরভাবে—**

গুরুভাবে আগে ভাবনা করিয়া শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দরের পূজা আরতি তাঁকে দিয়া করাইয়া—আমি পূজারী, নিজে পূজারতি করি বন্ধুসুন্দরের। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর মিলিত স্বরূপে—এ বিষয় শাস্ত্রীয় বাক্য—

"চৈতন্যলীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর।
দোঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য।

সাধুগুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য।" —চৈতন্যচরিতামৃত।

আর প্রমাণ—বহু বিদ্বদনুভূতি। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
আর প্রমাণ—শ্রীমুখের বাক্য। ❏

জয়তু জগদ্বন্ধুসুন্দরঃ

মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু একশত বৎসর পূর্বে ধরণীর ধূলিতে আসিয়াছিলেন। ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। রহিতেন অতি সঙ্গোপনে আপনাকে আবরণ করিয়া। সতেরো বৎসর ছিলেন নীরবে নির্জনে অসূর্যম্পশ্য অবস্থায়। অন্তরঙ্গ ছাড়া তাঁহাকে কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারে নাই। আজ অভিনয় মঞ্চে শিল্পীগণ তাঁহাকে প্রকট করিবেন সর্বজন সমক্ষে। দেবতার অন্তরঙ্গলীলা আমরা দর্শন করিব, ইহা আনন্দের বার্তা।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন মহাতপস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আপনি আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন ব্রহ্মচর্য। বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যই শক্তির উৎস। আগে সকলে শক্তিমান্ হও। ব্যক্তির ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করিতে ব্রহ্মচর্যব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় আদর্শের ইহা মূল সূত্র।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন হরিনামের মূর্ত বিগ্রহ। রাধা নাম শুনিলে তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। হরিনাম শুনিলে তাঁহার অঙ্গে হরি, কৃষ্ণ, রাম নামাক্ষর ফুটিয়া উঠিত। তিনি হরিনাম অকাতরে বিলাইয়াছেন—বলিয়াছেন, "আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই। তোরা নাম করে আমাকে তোদের সঙ্গে মিশাইয়ে নে।" তিনি হরিনামের ভিখারী হইয়া কাঁদিয়া মর্ত্যের মাটি ভিজাইয়াছেন। নদীয়ার প্রেমের দেবতার নবরূপায়ণ মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রভুসুন্দরের প্রেমময় স্বরূপের মধ্যে।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন ক্ষমার দেবতা। নিজ দেহে পাযণ্ড অত্যাচারীরা নির্মম আঘাত করিলেও হাসিমুখে তিনি বলিয়াছেন, "আমি দণ্ডদাতা নহি, উদ্ধারণ বটি।" তাঁহার ক্ষমাগুণে অপরাধীর জীবনে ভক্তির জোয়ার আসিয়াছে।

সর্বোপরি বন্ধুসুন্দর ছিলেন অবজ্ঞাত জাতির পরম আশ্রয়। সমাজে ঘৃণিত অবহেলিত অস্পৃশ্য ডোম ও বুনো জাতিকে বুকে তুলিয়া তিনি তাহাদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রজনী সর্দারের আনীত জল নিত্য পান করিতেন। কায়স্থদের আহারের পংক্তিতে বুনারা প্রবেশ করায় তাহারা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া যায়—সেই দুঃখে তিনি তিন দিন নিরম্বু উপবাস করেন। হরিভক্ত বুনো জাতিকে তিনি মোহন্ত পদবী দিয়াছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পতিত কাঙ্গালের পরম সুহৃৎ। গৌরকিশোর সাহা প্রভুকে নিত্য ফলমূল ভোগ দেন। তার বোন বালবিধবা মুক্তাদাসী বলে, "দাদা, প্রভু শুধু ফল খেয়ে থাকেন—অন্ন দেওয়া যায় না?" গৌরকিশোর জিহ্বা কাটিয়া বলে—"আমরা সাহা।" মুক্তা আঙ্গিনার কোণে দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিলেন, "মুক্তা

* *'প্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভাব শতবার্ষিকী স্মরণিকা।' প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ আন্দুল প্রকাশিত।*

প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন।।
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

রে, ঐ মাঠের মধ্যে মায়েরা কী করে? "মটর শাক তোলে"। "ও দিয়ে কী করে?" "ওমা! তাও জানেন না, রেঁধে খায়।" "আমাকে মটরশাক খাওয়াবি?" মুক্তা প্রেমভরা প্রাণে অশ্রুভরা নয়নে শাক অন্ন আর যা জুটিল রাঁধিয়া দিল। কম্পিত পদে গৌরকিশোর ভোগ লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। প্রভু বলিলেন, "গৌর, আজ মহা অন্ন এনেছ!" করুণাময় দুয়ার বন্ধ করিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন, এক কণা প্রসাদও রহিল না। দরজা খুলিয়া গৌরকিশোর কহিয়া উঠিল—"এমন দয়াল নিধি কভু দেখি নাই।"

গৌরকিশোর বলিলেন, "প্রভু, গরমে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেবাবাদী হ'বার ভয়ে দরজা খুলিয়া বাতাস দিলাম না।" প্রভু বলিলেন—"না রে, গরমে কষ্ট হয়নি। মুক্তা মিষ্টি বাতাস দিচ্ছিল।" দাদার মুখে ঐ কথা শুনিয়া মুক্তা আনন্দে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। প্রভুর ভোগ পাঠাইয়া সে তাহার গৃহস্থিত প্রভুর চিত্রপটের গায়ে বাতাস করিতেছিল।

মহাপ্রভুব মত প্রভুবন্ধুও কাহাকেও কানে মন্ত্র দেন নাই। নানাপ্রকারে প্রিয়জনদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রকে শক্তি দিয়া করিয়াছেন নিষ্ঠাবান চিরকুমার, চম্পটীকে শক্তি আধান করিয়া করিয়াছিলেন হরিবোলা ঠাকুর, প্রেমানন্দ ভারতীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়াছেন আমেরিকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে। কুমারটুলির এক গলি পথে টহল-কীর্তন রত মহাত্মা শিশিরকুমারের শিরে গবাক্ষ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে করিয়াছেন গৌরপ্রেমী, অমিয় নিমাইর লীলারূপকার। বন্ধুসুন্দর হাতে হাত বুলাইয়া দিয়া নবদ্বীপ ব্রজবাসীকে করিয়াছেন অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক। হরি কীর্তন ছড়াইয়া তিনি ডোম-বুনোদের মোহন্ত করিয়াছেন। রামদাস বাবাজীকে মহাশক্তি দিয়া গৌরলীলার শ্রেষ্ঠ প্রচারক করিয়াছেন, মহানাম মহাপ্রচারণে মহেন্দ্রজীকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন অযাচিত করুণা বিতরণ করিয়া। তিনি বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন ভারত উদ্ধারে মৌন-মূকের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে ইসারা দিয়া। ভাগবত গ্রন্থ প্রচারে রাজর্ষি বনমালীকে ব্রতী করাইয়াছেন শ্রীমুখে আদেশ বাণী দিয়া। প্রেমঘন মূর্তি প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন এক মহাশক্তির উৎস। তাহা পাত্রে পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন অতি নীরবে, নিবিড় সঙ্গোপনে। তাই বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ লিখিয়াছেন 'লীলাম্বুধি' গ্রন্থে—"গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে।" শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে আবার অবিলম্বে আসিবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি আছে জননী ও ভক্তগণের নিকট। তথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"আরো দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।"
"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্তনানন্দ রূপ হইবে আমার।।"—চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড ২৪ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের অনুভূতি এই যে তিনি নিতাইসুন্দর ও গৌরসুন্দরের একাধারে সম্মিলিত তনু। যে কারণে রাধাগোবিন্দ এক তনু হইয়া গৌর হইয়াছেন সেই এই কারণে গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর একাঙ্গে এক তনু হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, পরতত্ত্ব একটি বই দুইটি হইতে পারে না। শ্রীগৌর আর নিতাই এক বস্তুই দুই

ভাগ হইয়াছেন, "এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বিলাইতে" (চৈতন্যভাগবত)। সুতরাং পুনঃ দুইয়ের একাত্মতা অপরিহার্য। শ্রীমুখের বাক্য—আমি একক সর্বসমষ্টি। মধুর শ্রীব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়। মধুর নদীয়া লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়। রাই কানু মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। একে তো বিবর্ত-বিলাস, তাহাতেও ভোগের লালসা জাগিতেছে। কিন্তু ভোক্তা-ভোগ্য এক ঠাঁই। সেই লালসা কিরূপে পূর্ণ হইবে? বন্ধুসুন্দরের আদরের শারিকা শ্রীল রামদাস বাবাজী কীর্তনের আখরে লীলার নিগূঢ় রহস্য উন্মুক্ত করিয়া গাহিয়াছেন—

> "ভোগীর ভোগলালসা দেখে আর কি রইতে পারে?
> শ্রীগৌর-সেবা-বিগ্রহ নিতাই আর কি রইতে পারে?
> অভিন্ন চৈতন্য তনু নিতাই আশ্রয় জাতীয় ভাবে আসিয়া দাঁড়াল সম্মুখে।
> গৌর স্বরূপ নিতাই দেখে, বাহু পশারি ধরল বুকে।
> মহাভাব নিতাই, রসরাজ গোরা, হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি।"

এই জড়াজড়ির ফলেই একাকৃতি। নিতাই গৌর মিলিত তনু জগদ্বন্ধু হরি।

ভক্তি-ভাগীরথী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র আস্বাদন করিয়াছেন—"হরিনাম—রাই ঋণ" বন্ধুসুন্দরের এই উক্তি। "অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।" বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ রাইঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে মহামুনি পরাশর এই গোপন তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। উক্ত পুরাণানুসারে শ্রীরাস মণ্ডলে শ্রীরাধারাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নামটি শুনাইয়া তাঁহাদের ঋণ শোধে কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি কিন্তু কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণসুখ তাৎপর্যের পরম মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। সে বস্তুটি বৃন্দাবন লীলাতে অব্যক্ত থাকিয়া যায়।

ভগবানের পূর্ণত্ব মহাভাব। মহাভাবই নামের বীর্য। মহাভাবস্বরূপিণী রাধারাণীর ঋণ স্বীকারের ভিতরই নামের যত চাতুরী ও রহস্য। "হরি শব্দ উচ্চারণে হরিপুরুষ উদয়।" কৃষ্ণলীলা হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত মাধুরী শ্রীগৌরাঙ্গে অনঙ্গরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া গৌর-নিত্যানন্দের লীলায় প্রকাশতত্ত্ব প্রমূর্ত হইল নামে। আবার ব্রজলীলা গৌরলীলার মিলিত মাধুর্য নামে প্রমূর্ত হইল হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলায়। রাই ঋণ শোধের দায় গড়ায় এত দূর। এতই সে বস্তু মধুর!

তিনি ব্রজলীলা-গৌরলীলা মহাসম্মিলন—এই পরিচয় বন্ধুসুন্দর নিজেই দিয়াছেন প্রিয় ভক্ত নবদ্বীপদাসজীর নিকট। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতে—

> "চৈতন্য-লীলামৃত-পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
> দোঁহে মিলে হয় সুমাধুর্য।
> সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যে আস্বাদে,
> সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য।।"

প্রভু জগদ্বন্ধু প্রাচুর্য মাধুর্যময়, মহাবতারী পুরুষ।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—"অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই লীলার সর্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি তিনি শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে সেই, জানলি।"

শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন—

"হরি মহাবতারণ।"

বিশ্ব জীবের কল্যাণ কামনায় সকলের পাপ-তাপ বুকে লইয়া আজ জগদ্বন্ধুসুন্দর মহাদশায় নিমজ্জিত আছেন। অখণ্ড মহানাম যজ্ঞ চলিতেছে তাঁহাকে পরিক্রমণ করিয়া। মহানামে জগজ্জীবের শান্তি হউক, বন্ধুসুন্দরের জয় হউক। ❐

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষে' (১৩২২) শ্রাবণ সংখ্যায় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আত্মভোলা বাঙ্গালী জাতির স্মৃতি পথে স্থাপন করিতেছি।

"গাড়ী নিস্তব্ধ! শিষ্যেরা ভক্তিতে, আমি দ্বৈধমতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরব। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অপর সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, স্বভাবতঃ অল্পভাষী জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসিক কলিকাতা যাইতেছ?" ...

কিছুকাল পরে জগদ্বন্ধু বলিলেন, "মানুষ এত মলিন হইয়া যায় কেন? রা.... আগে ভাল গান করিত এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। তুমি আগে কেমন সুন্দর ছিলে এখন কেন মলিন হইয়াছ?"

আমি জগৎকে তখন প্রভু জগদ্বন্ধু মূর্তিতে দেখি নাই, বাল্যবন্ধু জগৎ বলিয়াই আলাপ করিতেছিলাম—"আমরা তো ভাই সাধু হই নাই, সংসারের জীব, পাপী-তাপী, কাজেই মলিন।" জগৎ ধীরে ধীরে যেন ব্যথিত ও কাতর কণ্ঠে কহিলেন—"পাপে কি ঘৃণা হয় না?" নিমিষে আমার কাকু শতযুগ হইয়া আমারই কাছে ফিরিয়া আসিল।

সেদিনের সে প্রশ্ন আজও থাকিয়া থাকিয়া আমার প্রাণের গোপন পর্দার পরতে পরতে ঘা মারিতেছে।

জগৎ রাজবাড়ী ষ্টেশনে নামিয়া গেল। আমি লজ্জিত না হইলেও চিন্তিত হইয়া কলিকাতা আসিলাম।

ইহার অনেকদিন পর আমরা একদিন ফরিদপুরের এক স্থানে কোন বাল্যবন্ধুর গৃহে অতিথি। 'বুনো'রা মাটি কাটিয়া ডওয়া বাঁধিতেছিল। সন্ধ্যাকালে তাহারা হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া চাটাই

* *'যুগান্তর'। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।*

পাতিয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে বসিল। বুনোরা সকলেই যুবক। একজন বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, একটি খোল (মৃদঙ্গ) পাইতে পারি? হিন্দুবাবুরা মৃদঙ্গ দিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা ও সুদের হিসাব লইয়া ব্যস্ত। বুনোরা তখনি হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতে বসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—জগদ্বন্ধু প্রভাবে তাদের ঐরূপ সুমতি হইয়াছে। বুনোরা প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম মুখে স্মরণকালে তাঁহার উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিল।

(যে সকল ভীল, কোল, সাঁওতাল কুলি নীল-চাষী হইয়া এদেশে আসে ও নীলকুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়, তাহারা যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকার শহরতলিতে বসবাস করে। সমাজে ঘৃণিত অস্পৃশ্য তাহারা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা স্থানীয় লোকের নিকট অনাদরে 'বুনা' নামে পরিচিত)। "ইহার কয়েক বৎসর পর ফরিদপুরে বন্ধুবর ক্ষিতীশবাবুর বাসায় সায়ংকালে সুখালাপ হইতেছিল। পাশের বাড়ীতে মৃদঙ্গধ্বনি ও হরি-সঙ্কীর্তনের মধুর রোল উঠিল, আমরা নীরব হইয়া সেই দিকে কান পাতিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষিতীশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেটা বুনো বাড়ী পরিবর্তন! শৈশবে শুনিয়াছি, বুনো বাড়ী অশ্লীল নাচ গান ব্যভিচার ও সুরাপানের জন্য কুখ্যাত ছিল। পরে পাদ্রী খৃষ্টানেরা তাহাদিগকে লেখা-পড়া শিখাইয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেন। কিন্তু তাহাদের অন্তর বদলাইতে পারিতেন না। বুনো চণ্ডাল জুটাইয়া ছোটনাগপুরের মত ক্রমে ফরিদপুরও খৃষ্টধর্ম প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একদিন নীরব সাধক জগদ্বন্ধুসুন্দর ঘৃণিত বুনোদিগের বাড়ীর উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্রহ্মচর্যের অদ্ভুত তেজে তাহারা বিস্মিত হইল। সে অপরূপ মোহন মূরতি দেখিয়া তাহাদের সরল প্রাণ মোহিত হইল। ফরিদপুরে অনাচারী বুনো শুদ্ধাচার হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিল। ভাঙ্গা অঞ্চলের মুসলমান, মাঝি সম্প্রদায়ও এইরূপে জগতের নামে মাতিয়া হরিনাম গাহিতে আরম্ভ করিল।" "ফরিদপুর, যশোহর রাস্তার ধারে শহর হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে গোয়ালচামট আমবাগানে চারিদিকে ঘন বাঁশের বেড়ায় ঘেরা একখানি খড়ের ঘরে জগদ্বন্ধু গভীর তপস্যায় (স্বানুভাবানন্দে) নিমগ্ন। জগদ্বন্ধু হাটে, বাজারে, মেলায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন না। বেদীতে বসিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করেন না। নগরে নগরে ঘুরিয়া মুক্তির মন্ত্র কর্ণে ফুঁকিয়া শিষ্য সংগ্রহ করেন না। মুদ্রিত পুস্তিকা বিতরণ করিয়া মত প্রচার করেন না। তিনি ভেল্কি জানেন না, যাদু জানেন না, ভবিষ্যৎ গণিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করেন না এবং তুকতাক তন্ত্র-মন্ত্র ঔষধ-কবজের ভান করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্রাশ্রম লোকে লোকারণ্য কেন? এ রহস্য কে বুঝাইয়া দিবে? তিনি নিত্যশুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁহার ত্যাগ আছে, সাধনা আছে, সুকৃতি আছে, জীবন আছে, তাই তিনি নীরব হইয়াও মুখর, নিষ্ক্রিয় হইয়াও কর্মশীল, মৌনী যোগী হইয়াও প্রচারক। যাহার প্রাণ নেই, সে অপরকে প্রাণের স্পর্শ দিবে কী প্রকারে? যে নিজে না মজিয়াছে সে অপরকে মজাইবে কীরূপে? আমরা আমাদের সমাজের কল্যাণের জন্য সংসারের শুষ্ক বাক্যের আচরণে প্রাণহীন চপলতা দেখিতে চাই না। জগদ্বন্ধুর ন্যায় নীরব সাধনাযুক্ত সন্ন্যাস-জীবন চাই। যেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া পরাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি। এইহেতু জগতের বাক্হীন বাগ্মিতার উদ্দীপনা বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিতে পারিয়াছে।" জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ জেলার

অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী ডাহাপাড়া গ্রামে ১২৭৮ সনের ১৭ই বৈশাখ সীতানবমীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দীননাথ চক্রবর্তী, মাতা বামাসুন্দরী দেবী। দীননাথ মুর্শিদাবাদ বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত ও ন্যায়ের খ্যাতনাম অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুরে ছিল; জগদ্বন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। জগদ্বন্ধুর আদরের নাম জগৎ। জগৎ পাবনায় ইংরেজী স্কুলের ১ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করেন।

এই সময় তিনি কাহারো সঙ্গে মিশিতেন না এবং সর্বদাই নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে জগতের উপনয়ন হয়। উপনয়ন সংস্কার হওয়ার পর হইতেই খুব সন্ধ্যা পূজা ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের ব্রত প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। জগতের হৃদয়-কোণে ভক্তিকমল বিকশিত হইলে সর্বপ্রথম পাবনায় তিনি আত্মগোপন করিতে অসমর্থ হন। সাধু বৈষ্ণব দেখিলে গড় করিয়া প্রণাম করিতেন। হরিনাম শুনিতে শুনিতে অজ্ঞান হইতেন। ছোটকাল হইতেই তিনি হরি সঙ্কীর্তন ভাল বাসিতেন। হরিনামের ধ্বনি শুনিলে অবিচারে তথায় যাইতেন। "সঙ্কীর্তনে যাওয়ার বাধা মানিতেন না। কীর্তনে অল্প সময় নৃত্য করিয়াই আবিষ্ট হইতেন। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া স্কন্ধে লইয়া আনন্দে কীর্তন করিত। পাবনার এক দল লোক তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জগদ্বন্ধু হরিনামে মত্ত করিয়া লোকদিগকে সংসার ত্যাগ করিয়া ফেলিবে ও ছেলেরা পড়াশুনা না করিয়া অকর্মণ্য ও চরিত্রহীন হইবে, বিশেষতঃ সকলে তাঁহাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহারা প্রভুকে বাক্যতঃ কার্যতঃ কঠোর শাসন আরম্ভ করেন। তাঁহার কোমল অঙ্গে প্রথম দুইবার গুরুতর রূপে প্রহার করে। কিন্তু প্রভু চিরদিনই ক্ষমার দেবতা। কাহারো নাম প্রকাশ করেন নাই। নিন্দা কুৎসা নির্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।"

১২৯৫ সালে প্রভু কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। কলিকাতায় সেইবার তাঁহার ফটো তোলা হয়। এই ফটোই আজ জগতে প্রচারিত। তখনও তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অপূর্ব দেহকান্তি পবিত্র সুন্দর মুখজ্যোতি এবং মিষ্ট করিত। প্রভু কলিকাতার রামবাগানে ডোম পল্লীতে বাস করেন। হরিনাম সঙ্কীর্তনের দ্বারা ডোমদের জীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন-সাধন করেন। কলিকাতার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্লেগের সময় রামবাগানের এই কীর্তনের দল সঙ্কীর্তনের রোলে মহানগরী মুখরিত করতঃ রোগমুক্ত করিয়াছিল। এই সঙ্কীর্তন সমাজের একজন প্রধান শিষ্য আজ শ্রীরামদাস বাবাজী নামে সুপরিচিত। আজকাল চারিদিকে যে নিম্ন-শ্রেণীর উন্নয়নের রব উঠিয়াছে, তাহার প্রকৃত পথপ্রদর্শক প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সঙ্কীর্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইনু ত্রিভুবন।।" জগদ্বন্ধুর জীবন ইহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রভু জগদ্বন্ধুর উপদেশের সার 'সংযম ও হরিনাম'। একবার কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দুর্জয় ইন্দ্রিয়-সকলকে শাসনে রাখিবার উপায় কী? প্রভু উত্তর করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ও পরমেশ্বরে নির্ভর।" প্রভু স্বয়ং জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন ও নামরসে তন্ময় হইয়া সুদীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষকাল রসানন্দে তন্ময় ছিলেন। ধর্ম-সাধনই ধর্ম

প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়।

"আপনি না কৈলে ধর্ম শিখানো না যায়।"

জগতের গুরু জগতের ধর্ম প্রচারক জগদ্বন্ধু, কিন্তু তাঁহার কোন মন্ত্র-শিষ্য নাই। গুরুগিরি করিয়া শিষ্য জোটানো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি তিনি যেখানে গিয়াছেন, অনলশিখার আকর্ষণে পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য ভক্ত হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলী গঠন করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"তারকব্রহ্ম হরিনাম মহা উদ্ধারণ মন্ত্র।" তিনি বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবে শুদ্ধাভক্তি কৃষ্ণ রস, গোপীভাব যুগলপ্রেম"—ইহার উপরে আর কিছুই নাই।"

"'জগদ্বন্ধু বৈষ্ণব, জগদ্বন্ধু ভক্ত, জগদ্বন্ধু বৈষ্ণব ধর্মের শেষ সাধন। যুগল প্রেমের মদিরা পানে বিভোর মুক্ত জগদ্বন্ধুর প্রাণে আনন্দের সীমা নাই। 'কি কহব রে সখী আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।' তাই তিনি লোক-সংস্পর্শ হইতে দূরে নির্জনে নীরবে কত মধু-যামিনী রভসে গোঙাইয়াছেন। আমাদের বহু পুণ্যের ফলে দেশের সমাজের সাধনায় ও শিক্ষায় যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ও সাধুতা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদেরই মধ্যে আমাদেরই একজন হইয়া কলুষ রাশি ধ্বংস করিতে আগমন করেন। ইহা দেউটির ন্যায় অমানিশার ঘোর আঁধারে উজ্জ্বল আলোক কেন্দ্র। অবসন্ন শ্রান্ত পথিক ঐ আলোক-রস্মি লক্ষ্য করিয়া পান্থশালার পানে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসে।'"

"সাধু সঙ্গে কৃষ্ণভক্তে যদি শ্রদ্ধা হয়।
ভক্তিদল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।।" ❑

জন্ম-রহস্য

"শ্রুত আছি, ১২৭৮ সনের বৈশাখ মাসের সীতানবমী তিথির শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে পুষ্পবন্ত যোগে অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী যখন আত্মস্থা হইলেন, তখন অমিয়-নিমাই-গৌরহরি পূর্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ এবং অনর্পিত প্রেম বিতরণ করিবার জন্য গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করতঃ তাহার মেরুদণ্ডাশ্রিত সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্র-বিরাজিত হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইলেন।।" —'জগদ্গুরু'

শ্রীমহানাম-মধু-ভাষ্য

(জন্মরহস্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

শ্রীবন্ধুপদকমলং হৃদয়ে নিধায়
শ্রীগুরুপদবন্দনং শিরসা বিধায়।
নিগূঢ়-জন্মরহস্য-সুখাববোধায়
শক্তিং যাচে দেহি নাথ! চরণাশ্রিতায়।।

১২৭৮ সন—বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ (খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দী)। বঙ্গীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর আবির্ভূত হন। তাঁহার শুভাগমনের পর কলিযুগের পরমায়ু আর পঞ্চ সহস্র মাস মাত্র অবশেষ রহিল। একথা শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু স্বহস্তে লিখিয়া জানাইয়াছেন; যথা,—"কলি সংখ্যা পূর্ণ বটে, পঞ্চ সহস্র মাহে বটে, এই মাত্র সংখ্যা বটে।" পঞ্চ সহস্র মাস বা চারিশত যোল বৎসর আট মাস মাত্র। অর্থাৎ বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর (খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর) শেষার্দ্ধে কলিযুগ শেষ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবন্ধু কলিযুগের আয়ু আর অতি অল্প মাত্র অবশেষ দেখিয়া সমাগত সত্যযুগের সঙ্গে কলির সংঘর্য কালে ভীষণ মহাপ্রলয় আশঙ্কা করতঃ, তাহার কবল হইতে জগৎ রক্ষা করিবার জন্য ১২৭৮ সনে ধরাধামে অবতরণ করেন। তথাহি, শ্রীহরিকথায়াম্—"ঐঐ প্রলয় হয়, ভ ভ ভয় কয়।"

সীতানবমী—শ্রীশ্রীরামলীলায় মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকদুহিতা সীতার জন্মের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যবশতঃ নবমী বলিয়া সীতা শব্দটি দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। সীতাদেবী অযোনিজাতা, যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্না। পুণ্যময়ী নবমী তিথির এইটি মহাগৌরব। সীতা-রামকে বুকে লইয়া গৌরবে নবমী তিথি নিজেকে সকল তিথির রাণী ভাবিয়া গর্বানুভব করিতেছিলেন। হঠাৎ দোল পূর্ণিমার ভাগ্য দেখিয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া সে কত না কাঁদিয়াছে। আজ চারিশত বৎসর ধরিয়া সে কত না আক্ষেপ করিয়া বিলাপ করিতেছে? হা দেব! শ্রীরামাবতারে আমাকে এত আব্দার দিয়া এত অধিকার দিয়া আজ কেন এমন করিয়া বঞ্চিত করিলে? আহা পূর্ণিমার এত ভাগ্য! দুই তনু এক হইয়া তুমি পূর্ণিমাকে ধন্য করিলে! হা নাথ! আমাকে কৃতার্থ কর, করুণাকটাক্ষপাতে আবার আমাকে ধন্য কর। আবার কবে ভাগ্য প্রসন্ন হইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া নবমীদেবী এই সুদীর্ঘ কাল কত না কাঁদিতেছে। দয়াময় আজ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। পূর্ণিমা হইতেও অধিকতর সৌভাগ্য তাঁহাকে দান করিবার জন্য একাধারে পঞ্চতত্ত্ব লইয়া আজ শ্রীনবমীতে উদয় হইবেন। সেই পূর্ব পরিচিতা গৌরবময়ী নবমী তিথির অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সুরসিক গ্রন্থকার শুধু নবমী না বলিয়া "সীতানবমী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"অভিন্ন শচীমাতা বামাদেবী"

শ্রীশ্রীপ্রভু আমার লীলারসরাজ। শ্রীশ্রীগোলোকধামে তিনি একক। সেখানে পিতা মাতা সখাসখী কেহই নাই। সেখানে কী আনন্দে যে তিনি ছিলেন জগজ্জীবের কাছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভক্ত তাই গাহিয়াছেন—

"নিত্যে যখন ছিলে গো গুপ্ত, সুপ্ত ছিলে কি জাগ্রত।
জানিতে পারেনি জগতের জীব, হয়ে কৈতব-নির্হত।।"

একা একা থাকা ভাল লাগে না। এক তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, "একোঽহং বহু স্যামিতি" (শ্রুতি)। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতবৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টিতে লীলাধাম ফুটিয়া উঠিল।

এক তনু দুই হইল। রসগোরা ও নিতাইচাঁদরূপে প্রকাশ হইলেন। তথাহি শ্রীচন্দ্রপাতমাধুর্যবিন্দৌ শ্রীল শিশুরাজেন—

"প্রথম অমৃত বৃষ্টি—রস গৌরী
ধ্রুবতারা নিতাই ভাব নিছনি।"

অমৃত তিনি দুই ভাগ হইলেন—রস আর ভাব। রসময় গোরা আর ভাবময় নিতাই। নিত্য ধামে গৌরলীলা প্রকাশ হইল। এইরূপে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় লীলার দ্বিতীয় তৃতীয় স্তর প্রকাশ হইল। আপনাকেই আপনি আস্বাদন করিবার জন্য কত না কৌশলকলা বিস্তার করিলেন। ললিতা বিশাখা লইয়া নন্দলালা মহারাসে মজিয়া রহিলেন। অমৃত বৃষ্টির প্লাবনে গোলোক ভরিয়া গেল। প্রপঞ্চের দেশেও দুই এক ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত ধাম গড়িয়া উঠিল। নিত্য আজ জীবের গোচরে সত্য হইল। নিত্যের দেশের রাধাকৃষ্ণ আজ লীলায় আসিবেন। সর্ব-রসাধার স্বীয় অঙ্গ হইতে বাৎসল্যাদি রসের মূর্তি কত-শত পুতুল গড়িয়া লীলার সঙ্গী করিয়া লইলেন। পিতৃশান্তভাবেব মূর্ত বিগ্রহ নন্দমহারাজ ও মাতৃবাৎসল্যভাবের পূর্ণ প্রতিমা যশোমতী ধনিষ্ঠা পৌর্ণমাসী কৃত্তিকা—সকলকে আগে পাঠাইলেন। পরে সখ্য ও মধুর রসের সখা ও কান্তাগণকে লইয়া সর্ব জীবগোচর হইলেন। মাঠে ঘাটে যমুনাতটে কত রঙ্গের খেলা খেলাইয়া মায়ের কোলে সর-নবনী ছড়াইয়া, সখাগণের কাঁধে হেলিয়া দুলিয়া, গোপবালার হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া রসময় আড়ালে লুকাইলেন। কে জানে কোন্ জগতের ভাগ্যাকাশে উদয় হইয়া আবার অভিনয় করিতে লাগিলেন? অন্ত জগতে নিত্য লীলা অনন্তকাল চলিতেছে। আবির্ভাব ও তিরোভাব জীবের চক্ষে যোগমায়ার আবরণে ভোজের বাজীর মত বিস্ময়কর।

পাঁচ হাজার বছর কাটিয়া গেল। ১৪০৭ শকের দোল পূর্ণিমায় নিত্য ধামের দ্বিতীয় পর্দাখানি সরাইয়া দিয়া সেই চির পুরাতন নবীনরূপে প্রকাশ হইলেন। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের খেলাধুলা প্রথম দৃশ্যে জগৎকে দেখাইয়াছেন, আজ শুধু মধুর রস হইয়া মূর্ত মধুবিগ্রহ প্রকট হইলেন। আজ মধুর রসকেই পঞ্চভাবে আস্বাদন করিবেন। মধুর শান্ত, মধুর দাস্য, মধুর বাৎসল্য, মধুর সখ্য ও মধুর মধুর। স্বরূপাদি মধুর রসাধিকারী ভক্তগণকে লইয়া পরে আসিবেন। আগে মধুর পিতৃ বাৎসল্যময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবীকে পাঠাইলেন। অধিকার অনুযায়ী পরিকরগণকে কাহাকেও পূর্বে কাহাকেও পরে পাঠাইয়া রসের তনু গৌররবি প্রেমের মূর্তি অনন্ত ভাবময় নিতাইচাঁদকে লইয়া গৌড়দেশে উদয় হইলেন। তথাহি শ্রীচরিতামৃতে, শ্রীল কৃষ্ণদাসেন—

"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।"

তথাহি শ্রীমহানাম-গ্রন্থে শ্রীশিশুরাজেন—

"দু'টি বাহু তুলে, ভাই নিতাই সনে, ডোর কৌপীন পরি।
সন্ন্যাসীর বেশে, হরি বলে হরি, নাচিলে ব্রহ্মাণ্ড ভরি'।।"

নদীয়ায় প্রেমের হাট বসাইয়া গম্ভীরায় রসের উৎস ছুটাইয়া বৃন্দাবনের রসকেলিবার্তা পুনরুজ্জীবিত করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে জীব-নয়নের অগোচর হইলেন। নিত্যের লীলা নিত্যে

চলিতে লাগিল। কোন্ অজানা দেশের পুণ্যাকাশে সে প্রেমের রবি দশদিশি উজ্জ্বল করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, স্থূলবুদ্ধি মানব তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া জন্ম-কর্ম আবির্ভাব-তিরোভাব লইয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

তথাহি শ্রীগীতায়াম্—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" ৯/১১

নিত্যলীলার দ্বিতীয় তৃতীয় দৃশ্য জগদঙ্কে অভিনীত হইল। আপন জনের সহিত খেলাধূলা করিয়া রসরাজ পরিতৃপ্ত হইলেন না। তথাহি শ্রীচন্দ্রপাতাখ্য মহাউদ্ধারণ গ্রন্থে—

"রাধাকৃষ্ণ ধাম তৃষ্ণ প্রয়াস পাবন।"

অস্যার্থঃ। শ্রীশ্রীরাধা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীধাম—কাহারও তৃষ্ণা মিটিল না। সবাই সতৃষ্ণ। নিকুঞ্জের প্রেমের খেলা, গম্ভীরার গুপ্ত লীলা সর্বত্রই রাগের অমিয় ধারা। কিন্তু জীব জগৎ অন্ধ। বহির্মুখ জীব তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। আজ নিখিল জীব-জগতের অণুপরমাণুকে পর্যন্ত আপন জন করিয়া প্রেমের বুকে তুলিয়া লইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণ। হ্লাদিনীর সারভূতা মহাভাবময়ী শ্রীমতী অনন্ত জীবের বহির্মুখীনতা ঘুচাইয়া প্রাণদয়িতের প্রেমের সেবায় অধিকারী করিয়া দিতে সতত সতৃষ্ণ। শ্রীশ্রীধাম গোলোকেই নিত্য গুপ্ত না রহিয়া, বৃন্দাবন নবদ্বীপেই গুপ্ত না রহিয়া ঘাটে ঘাটে যমুনা বহাইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে গোলোক ফুটাইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতে সতত সতৃষ্ণ। এই তিনের তৃষ্ণা বা স্বরূপা ইচ্ছাশক্তির প্রয়াস বা প্রচেষ্টাই পাবনলীলা বা উদ্ধারণ লীলার মূলসূত্র। তথাহি শ্রীহরিকথায়াম্—

"বৃন্দা নাচে চন্দ্রা গায় ললিতা বাজায়।
বন্ধু বুধ কার্যসিদ্ধি উদ্ধারণ চায়।।"

সেই কার্যসিদ্ধি উদ্ধারণ হইল কই? তাই আজ পতিত-পাবনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নিত্যের দ্বার খুলিয়া গেল। অনন্ত রহস্যের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল, পতিতের দুয়ারে পতিত-পাবন গড়াইয়া পড়িলেন। তথাহি শ্রীলীলাবৈচিত্র্য-কবিতায়াম্ শ্রীল-শিশুরাজেন—

"পাবন করিছে পতিতের আরতি।
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব পরকাশি।।"

জীব তাঁহাকে ধরিতে পারিল না দেখিয়া আজ ইচ্ছাময় স্বেচ্ছায় ধূলায় নামিলেন। ঐ যে "কী ভয় রে" বলিয়া অভয় বাণী শুনাইতে শুনাইতে একক সর্বময় তিনি ছুটিয়া আসিলেন. মধুর ভাবের রস ছানিয়া গম্ভীরায় ছড়াছড়ি করিয়াছেন; আজ দুগ্ধপুরে সুকর্পূর মিলাইয়া মধুর মধুর রস অধিকতর ঘনীভূত করিয়া সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত পঞ্চভাবে সেই রসমাধুর্য আস্বাদন করিতে আসিলেন। মধুর মধুর শান্ত রসমাধুরী, মধুর মধুর দাস্যরসমাধুরী, মধুর মধুর সখ্যরস মাধুরী, মধুর মধুর মধুর রস-মাধুরী। মহা মহা রসরাসেশ্বরের এই অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নিরুপম সুধাধার জগজ্জীবকে দিবার জন্য জগৎস্বামী কাঁদিতে লাগিলেন। আগে মধুর মধুর পিতৃশান্ত ভাব বিগ্রহ শ্রীশ্রীদীননাথ ও মধুর মধুর মাতৃবাৎসল্য রসসিন্ধুর প্রকট প্রতিমা

শ্রীশ্রীবামাদেবী প্রকাশ হইলেন। এই দীননাথ-বামাদেবী, জগন্নাথ-শচীদেবী ও নন্দ-যশোমতী— স্বরূপতঃ এক। রসাস্বাদনের অধিকার-তত্ত্ব-বিচারে পৃথক্। বাৎসল্যরসময়ী যশোমতী সেদিন মধুর বাৎসল্যে শচীদেবী হইয়াছিলেন। আজ মধুর মধুর বাৎসল্যরস-মাধুর্যে বামাদেবী হইয়াছেন। অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী ইত্যাকার মহারহস্য ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করতঃ, অভিন্না এই নঞ্ সমাসবদ্ধ পদ রচনা করিয়া তত্ত্বরসিক গ্রন্থকার উভয়ের ভেদ ও অভেদ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ বিভিন্নতা থাকিলেও স্বরূপতঃ ভেদ নাই, এই পরম নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত করিবার জন্যই অভিন্না পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা সর্বতোভাবে অভেদ হইলে শচীমাতা-বামাদেবী এইরূপ অভেদ কর্মধারয় করিলেই হরিহর শব্দবৎ কার্যসিদ্ধি হইত। অতএব ভেদাভেদ প্রকাশই অভিন্না পদ প্রয়োগের তাৎপর্য, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। বাষ্প, মেঘ, তুষার ও রামধনু যেরূপ স্বরূপতঃ একই জলের রূপান্তর মাত্র হইয়াও শোভা, সৌন্দর্য ও শক্তি-তত্ত্বে বহুল ভেদবিশিষ্ট; তদ্রূপ অভেদ হইয়াও ভেদবিশিষ্ট, ইহাই জানাইবার জন্য অভিন্না বলা হইয়াছে। তৎসদৃশ তদন্যত্বই এ স্থলে নঞ্ পদের অর্থ বুঝিতে হইবে।

"যখন আত্মস্থা হইলেন"

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা।" যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবীর একখানি রহস্যময় আবরণ আছে। সেই আবরণই এই সর্বোত্তম লীলার মাধুর্যাস্বাদনের প্রধান সহায়ক। স্বীয় অন্তর্নিহিত অনন্ত রস আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীহরি লীলায় আসেন। উপাদেয় বহুবিধ আহার্য বস্তু প্রস্তুত থাকিলেও, যেমন রসজ্ঞ পরিবেশক না হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না, পরিবেশনের ক্রম, পরিবেশনের পরিমাণ ও পরিবেশকের সুমিষ্ট ব্যবহার ফলেই যেমন আহারের পরিতৃপ্তি হয়, তেমন পৌর্ণমাসী দেবী যে পর্দাখানার আবরণে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ অনন্ত রসমাধুর্যের এক একটি ধীরে ধীরে সময়োপযোগী ভাবে লীলারসরাজ শ্রীহরির সম্মুখে প্রকাশ করেন, তাহারই ফলে নরলীলা এত মাধুর্যময় হইয়া উঠে। ইচ্ছাময় অনন্ত শক্তিময় হইলেও পৌর্ণমাসীর হাতের পুতুল। এক হাতে ভক্ত আর এক হাতে ভগবান্ লইয়া দেবী অনন্তকাল এক মজার খেলা খেলাইতেছেন। 'আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ।' ভক্তও জানেন না, ভগবান্ও জানেন না। যোগমায়াদেবী আড়ালে রহিয়া কত না ছাঁদে উভয়কে নাচাইতে থাকেন!

সর্বোত্তমত্বে ইহাই হেতু। অখিল বিশ্বপতি যোগমায়ার হাতে নাচেন, নরলীলার এই রহস্য। লীলার পরিকরগণ সকলেই আপনাভোলা। গোপালের মুখে মাটি গিয়াছে। যশোমতী 'হা রে গোপাল রে কী খেয়েছিস্' বলিয়া ফেলিতে গেলে গোপাল হা করিলেন। মা দেখিলেন বিরাট্ বিশ্ব গোপালের মুখের মধ্যে। স্থাবর-জঙ্গম অন্তরিক্ষ, দিক্সকল, কত সিদ্ধ বিদ্যাধর, কত যোগী ঋষি তপস্বী নদী অরণ্যানী, কত চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সব গোপালের মুখের মধ্যে বিরাজমান। এক মুহূর্তে মা ভাবিলেন, এ কী! একি স্বপ্ন, না আমার বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়াছে, নাকি গোপালেরই কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য। অহো! গোপাল তবে মানুষ নয়। তবে কি নারায়ণ!! দুর্বিভাব্য তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে 'প্রণতোঽস্মি তৎপদং' বলিয়া জননী প্রণতা হইলেন। যোগেশ্বর অমনি যোগমায়াকে ইঙ্গিত করিলেন। অমনি "বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ" (ভা.

১০/৮/৪৪) অমনি "প্রবৃদ্ধস্নেহসলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা।" যেমন ছিলেন তেমন হইলেন।

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্তু সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্।।" (ভা. ১০/৮/৪৫)

চাঁদবদনে শত শত চুম্বন করতঃ বুকে তুলিয়া লইলেন।

এই যে মুহূর্তে মনে হওয়া আর মুহূর্তে ভুলিয়া যাওয়া, ইহাই লীলার রসব্যঞ্জক। যোগমায়াদেবীর এই ক্রিয়াকৌশলেই সর্ববিধ রস আস্বাদনীয় হয়। পৌর্ণমাসী যখন পর্দাখানা একটু সরাইয়া দেন, ভক্ত ভগবান্ তখন কোথায় যেন ডুবিয়া যায়। ডুবিয়া গেলে আর লীলা হয় না, দেবী তাই অমনি আবরণখানি টানিয়া দেন, ভক্ত তখন ভাসিয়া উঠে। উচ্ছলিত মধুসিন্ধুর তরঙ্গরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া ভক্ত ভগবানের গলাটি জড়াইয়া প্রেমের খেলা খেলাইতে থাকে। এই ডোবা অবস্থাকেই আত্মস্থ ভাব বলে।

মুর্শিদাবাদ বাংলার প্রাচীন রাজধানী। তথা শ্রীহস্ত লিখিত আত্মপরিচয়ে "মুর্শিধাভাধ্ রাঝ্।" পতিতপাবনী সুরধুনী পশ্চিম দিক্ বিধৌত করতঃ কত না অতীত গাঁথা গাহিতে গাহিতে বীচিমালা সহ হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার দুই কুলের কত না শোভা! পূর্ব তীরে নবাবের রাজধানী, পশ্চিমতীরে শ্রীশ্রীডাহাপাড়া ধাম। শ্রীদীননাথ বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত। বামাদেবী সহ ডাহাপাড়ায় অবস্থান করেন।

সাধারণ মানুষের মত আচার ব্যবহার বাহ্যতঃ পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে সাধারণ জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের, তাহা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য কোথায়? গঙ্গার তীরে অনতিদূরে দুই জনে বাস করেন। দীননাথ ন্যায়ের পণ্ডিত। ভাগবত-শাস্ত্রে প্রগাঢ় রতি। সকালে বিকালে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণসহ অধ্যাপনা করেন। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে নিজে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতা একজন মাত্র, তিনি পতিপ্রাণা বামাদেবী। নন্দদুলাল গোপালের কথা গাথা শুনিতে শুনিতে দেবী আবিষ্ট হইয়া নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। কত ভাব, কত স্মৃতি, কত কল্পনা পর পর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কোন্ যেন এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়। কখনও ননী চুরি করিয়া প্রতিবেশীর ঘরে উৎপাত করিয়াছে বলিয়া দড়ি লইয়া বাঁধিতে যান, অমনি "চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণম্"—পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্নেহবশতঃ কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করেন। কখনও সর-নবনী অঞ্চলে বাঁধিয়া, কখন গোঠের খেলা খেলিয়া নীলমণি আমার ঘরে ফিরিবে ভাবিয়া স্নেহসিক্ত নেত্রে সহস্রবার পথ-পানে তাকাইতে থাকেন। হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কে দেখিল ভাবিয়া আত্মসংবরণ করেন।

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপঙ্গ্যসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।" ভা. ১০/৯/২০

—শ্লোক শুনিয়া দেবী কপালে করাঘাত করেন। কখনও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ এহি স্তনং পিব' বলিয়া ডাকিতে থাকেন।

"অহো ভাগ্যম্ অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।' ভা. ১০/১৪/৩২

—পড়িতে পড়িতে ধীরাগ্রগণ্য দীননাথও অস্থির হইয়া পড়েন। কখনও স্বপ্ন দেখেন গোপালকে বুকে চাপিয়া শুইয়া আছেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজায় বসিয়া 'নন্দ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ ত্রয় এবং মহোদয়ম্' ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলেই কার্য শেষ করেন, মুখে মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।" ভা. ১০/২/১৬—পড়িতে পড়িতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দীননাথ বামাদেবীকে ডাকিয়া তোলেন। উভয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করেন। হরিকথা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা নাই, ভাগবত ছাড়া আন চিন্তা নাই। আজ কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উভয়ে কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। আর ঘুম হইল না।

রাত্রি শেষ হইয়াছে। শুক্লা নবমীর চন্দ্রকলা পশ্চিমাকাশে ডুবু ডুবু হইয়াছে। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইয়াছে। পূর্বাকাশ অরুণরাগে ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছে। আজ জগতের ভাগ্য পরিবর্তনের দিন। বনরাজি পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কমলদলে শোভাময়ী হইয়াছে। পদ্মগন্ধে ভরপুর হইয়া সুখস্পর্শ মলয় মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া কোন্ এক মঙ্গলবার্তা যেন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দিতেছে। চাঁদ সূর্যি দেখাদেখি হয় না। দুইদিকে হিঙ্গুল মাখাইয়া প্রকৃতিদেবী গঙ্গার তরঙ্গে রঙ্গে গড়িয়া পড়িয়াছেন। দু'টি পাঁচটি উজ্জ্বল তারকা শুভযোগের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। মেষে সূর্যদেব, তুঙ্গে গুরুদেব, ধরণী সুপ্রসন্না, এমন সময়ে গঙ্গার ঘাটে আর্দ্র বসনে দীননাথ ও বামাদেবী। উভয়ে আত্মস্থ। অমিয় নিমাই গৌরহরি পূর্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে তাঁরে তারে ভজে তৈছে।।"

শ্রীগীতায় অর্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" পুত্ররূপে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পৃশ্নি আর সুতপা। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকার দিতে দিতে তাঁহাদিগকে ব্রজরসের অধিকারী করিলেন। 'ন পারয়েঽহম্' বলিয়া ভক্তের ভক্তির দ্বারে চির বাঁধা রহিয়াছেন। গৌররূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম।।"

শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—

"আরও দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।" চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ২৪শ পরিঃ

বিরহাকুল ভক্তগণকে কহিয়াছেন—

"এই মত আরও আছে দুই অবতার।
কীর্তন আনন্দরূপ হইবে আমার।।
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্তন করিবে মহাসুখে আমা সঙ্গে।।" (ঐ)

পূর্ব পূর্ব সকল কথা এককালে মনে উদয় হইল।

জীবজগৎকে প্রেম দান করিতেই হইবে। 'আমা বিনু অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।' পাপতাপক্লিষ্ট জীবের পাপ-তাপ কালিমা ধুইয়া মুছিয়া অমূল্য প্রেমধনে ধনী করিতে অধিকার তো আর কাহারও নাই। এবার ব্রজপ্রেমদানে সকলকে ধন্য করিব। "ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।।" এবার আর কাহাকেও বাকী রাখিব না। বাৎসল্যময়ী জননীর নিকটেও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রিয় ভক্তগণের কাছেও অঙ্গীকার আছে। ঋণ দেনা প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার সব এককালে মনে হইল। দেনার দায়ে দায়বদ্ধ হইয়া লীলারসরাজ ধার শোধিতে আসিলেন।

"বন্ধু বলে খত লিখিলে ধার শোধিতে এলে তাই।।"

"গাভীর অশ্রু চাঁদের সুধা"

"ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ।।
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত।।" ভাঃ ১০/১/১৭

অসুরের অত্যাচারে পাপভারাক্রান্তা ধরিত্রী প্রপীড়িতা হইয়া গো-রূপ ধারণ করতঃ খিন্না ও অশ্রুমুখী হইয়া ব্রহ্মার সমীপে আপনার বিপদ্ কাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া পৃথিবী কহিলেন—

"তদ্ভূরিভারপীড়ার্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ।।
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মতিবিহ্বলা।।" (বিষ্ণুপুরাণ)

হে দেবগণ, তোমরা আমাকে রক্ষা কর; আমি যেন ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতলগামী না হই। দেবগণ সহ ব্রহ্মার প্রার্থনায় গোলোকবিহারীর আসন টলিয়াছিল। এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পৌরাণিকী বার্তা। বিংশ শতাব্দীর ভীষণ বিজ্ঞানের যুগে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এটি একটি নিরেট আষাঢ়ে গল্প। তাহাদিগকে ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার মত উপকরণ আমার নাই; কারণ সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব বা তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যাহারা অনাস্থাবান্ তাহাদিগকে এইসব তত্ত্ব বুঝানো কঠিন ব্যাপার।

তবে স্থূলতঃ ব্যাপারটির তাৎপর্য এইভাবে নির্ণয় করা যায় যে জগতের একটি শোচনীয় বা অধঃপতিত অবস্থা দেখিয়া উন্নতসত্তা মনীষিগণ প্রাণে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন ও ইহার প্রতিকারকল্পে অনন্যসাধারণ কোনও শক্তির আবির্ভাবের জন্য সতত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত লিখিয়াছেন "এস এস দয়াধার। মলিন হৃদয়ে, হের গো দাঁড়ায়ে, ঊর্দ্ধমুখে

নারীনর।।" উৎপীড়িতা গোরূপা ধরিত্রীর অশ্রুবর্ষণ অর্থে, অত্যাচারিত মানবসমাজের অবস্থা সন্দর্শনে কৃতী সন্তানগণের কাতর প্রার্থনা, এইরূপ বুঝিতে পারি। মূল কথা এই যে মায়াধীশ অজ নিত্যপুরুষবর যেমন স্বকীয় যোগমায়ার আবরণে সামান্য মানুষরূপে ধরায় নামিয়া খেলাধূলা করেন, বিশাল ধরিত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীও তেমনি নিখিল বিশ্বের সন্তানগুলিকে বুকে ধরিয়া অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্‌রূপে গাভী সাজিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন।

"শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্‌ঝিতাধুনা।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি।।" ভা. ১/১৭/২৭

ধরণীদেবীর এই অশ্রু মোচন নিত্য। যুগে যুগেই প্রপঞ্চে তাহা প্রকট হয়। শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "তত্র তাবৎ প্রথমং ভগবদবতারকারণম্।" শ্রীল সনাতন ও চক্রবর্তী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "তত্র তাবৎ ভগবদবতারে প্রসিদ্ধকারণম্।" যদা ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি তদাত্মানং সৃজাম্যহম্—ইহা যদি সত্য হয়, তবে গ্লানিকালে অত্যাচারিতের অত্যাচার-নিবেদন সত্য না হইবে কেন? এই নিবেদন আবেদন স্থূলে যেমন সত্য, মূলেও তেমন সত্য, প্রকাশেও তেমনি সত্য। বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্ব, দেবকী পরা ভক্তি; উভয়ের মিলনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; কংস পাপান্ধকার, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিনাশ করেন;—এই স্থূল ব্যাখ্যাও যেমন সত্য। সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও তেমনি সত্য; আবার একদিন প্রপঞ্চে যে তাহা প্রকট হইয়াছিল তাহাও তেমনি সত্য, বর্তমান জাগতিক অবস্থা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে যে অপরিমিত ক্ষমতাবান্ কোন বিরাট্ ইচ্ছাশক্তি না হইলে, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জড় বিজ্ঞানের যুগে সত্যধর্ম ও প্রেমধর্ম স্থাপন পূর্বক সারা জগৎময় প্রকৃত শান্তি সংস্থাপন কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ধর্মপিপাসু নিঃস্বার্থ জগৎকল্যাণকামী মহাত্মাগণ বহুদিন হইতে এস এস বলিয়া ঐ যে তাহাকে ডাকিতেছেন, কেহ বা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ বা যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে আগমনী গাথা গাহিতেছেন। দৃপ্ত অসুরের শাসনে বর্ণাশ্রমধর্ম উচ্ছন্নপ্রায় হইলে ধরাদেবী বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। গাভীরূপ ধারণ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। একটি নৃশংস ব্রাহ্মণ তাহাকে পাইয়া জমি কর্ষণার্থে নিযুক্ত করিলেন। গাভী হইয়া জমি চাষ, তাহা আবার ব্রাহ্মণের হাতে! শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া ধরণীর দুঃখের আর অবধি নাই।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড সূর্য, স্পৃহনীয় চন্দ্রমা। দিনগুলি ভীষণ গরম। কাহারও কোন কাজ কর্ম করিবার সামর্থ্যই যেন তখন থাকে না। কবি লিখিয়াছেন 'উৎপ্লুত্য ভেক-স্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি।' শেষ রাত্রটি কেবল মনোরম। 'নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীল-রাজয়ঃ' তাহাই মানুষের একমাত্র প্রিয়। রাত্রশেষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ অন্য এক বলদের সঙ্গে ধরণী মাতাকেও মাঠে টানিয়া লইয়া গেল। হাল টানিতে টানিতে দেবী অত্যাচারের কথা ভাবিতে লাগিলেন। "কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশঃ অধর্মহেতুভিঃ।" কোন মতে এক পায়ে ভর করিয়া অতি কষ্টে চাষ করিতে লাগিলেন আর নির্দয় ব্রাহ্মণ তদুপরি ভীষণ কশাঘাত করিতে লাগিল। কাতরা ধরিত্রী দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিলেন—

"কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।

ত্যক্ষন্তি হি প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি।।
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ।।" ভাঃ ১২/৩/৪১-৪২

হায় রে ঘোর কলি! বিশটি পয়সার জন্য বিরোধ করিয়া মানুষ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিতেছে, স্বীয় প্রিয় প্রাণ বিনাশ করিতেছে, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতেছে। দিনের পর দিন জীব এত নীচাশয় হইতেছে যে বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা না করিয়া কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন কাটাইতেছে। হায় হায় হায় রে বলিয়া দেবী বিপদ্বারণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে উষালোক সমাগত দেখিয়া ক্লান্ত ব্রাহ্মণ হাল ছাড়িয়া অদূরে বৃক্ষতলে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল। বসুন্ধরা দেবী তৃষ্ণাতুরা হইয়া কোনমতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ঘাটে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণীর মত দম্পতিযুগলকে ধ্যানস্তিমিত সন্দর্শন করিয়া সেই পুরাতন স্মৃতি নূতন হইয়া উঠিল। দুঃখ-সমুদ্র যেন ফুলিয়া উঠিল। দু'টি গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় পবিত্র অশ্রুরাশি ঝর্‌ঝর্ করিতে লাগিল। গাভীরূপা ধরণী কাঁদিতে লাগিলেন—

"যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।" ভা. ১২/৩/৪৪

অহো কি পরিতাপ! যাহার সর্বমঙ্গলপ্রসূ নামটি একটিবার গ্রহণ করিলে পতিত, ঘৃণিত, ম্রিয়মাণ আতুর পর্যন্ত উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়, হতভাগ্য কলির জীব সেই দয়াল ঠাকুরের নামটি মুখে উচ্চারণ করে না। "ন তং কলৌ জনাঃ" "ন তং কলৌ জনাঃ" বলিতে বলিতে উন্মাদিনী ধরণী আজ অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন। কুলু-কুলু করিয়া কলনাদিনী অলকানন্দাও যেন তার কান্নায় সাড়া দিয়া সেই তপ্ত অশ্রুরাশি বুকে লইয়া দয়িতের অন্বেষণে দ্রুতগমনে ছুটিতে লাগিল। হা প্রভু! শ্রীচরণে জন্ম দিয়াছ, এই বুকে কত খেলিয়াছ, এই তটে কত নাচিয়াছ। আজ সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী বুকের ধন বুক-ছাড়া হইয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া পাগলিনী মন্দাকিনী আলুথালু হইয়া পড়িল। সম দুঃখিনীকে দেখিয়া দুঃখভার আরও ভারী হইয়া উঠিল। শত সহস্র তরঙ্গচ্ছলে হৃদয় সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সুধারাশি লইয়া সুধাকর মঘা নক্ষত্র সঙ্গে সারা নিশি ক্রীড়া-কৌতুকে কাটাইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ধরার বুকখানি শীতল করিবার জন্য সুনির্মল জ্যোৎস্না সঙ্গে গলিয়া গলিয়া চন্দ্রদেব গঙ্গার তরঙ্গভাঙ্গা বুকে পড়িতে লাগিলেন।

মাতৃজঠরে যেমন রজো-বীর্যের মিলন হয়, আজ পাপতাপ-নাশিনী ভাগীরথীর কোলে তেমনি গাভীর অশ্রুর সঙ্গে চন্দ্রের সুধার অপ্রাকৃত মিলন ঘটিল। শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ পুষ্পবন্তযোগ একই কালে উদয় হইল। ভাবময় মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। হরিনামরূপ নামী মহামহাবিগ্রহ গ্রহণ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সিদ্ধ বিদ্যাধর, ঋষি তপস্বিগণ জয় জয় রব উচ্চারণ করিলেন। পঞ্চগ্রহ তুঙ্গে উদয় হইলেন, কেতুসঙ্গে অষ্টম স্থানে রহিয়া শনিদেবও

কুদৃষ্টি পরিত্যাগ করতঃ শুভগ্রহ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব পুণ্য মুহূর্তে গঙ্গার কূলে হরিনাম মূর্ত হইয়া অনিন্দ্যসুন্দর একটি সোনার কমলের মত দিব্য লাবণ্যময় অপ্রাকৃত শিশুরূপে ভাসিতে লাগিলেন। আহ্লাদে আত্মহারা জাহ্নবী প্রসন্নোজ্জ্বল বদনে সেই হারাধন গোলোকরতন বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যে ঘাটে ধ্যানস্থ দম্পতিযুগল গোপালের চিন্তায় তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, সেই ঘাটের দিকে চলিলেন।

জন্মরহস্য তত্ত্ব লিখিতে বসিয়া বেশ এক কাব্যের উপন্যাস হইল, একথা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এক কথায় বলিয়া উঠিবেন—তাহা জানিয়াও লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম কাব্য নবমীর দুঃখ, দ্বিতীয় গাভীর কান্না, তৃতীয় চাঁদের সুধা। গাভীর অশ্রু সম্বন্ধে দু'-এক কথা বলিয়াছি, এখন নবমীর কথা আর চাঁদের কথা একটু আলোচনা করিব।

মনে করুন, একটি শুভ দিনে একটি শুভ ঘটনা ঘটিল। ব্যাপারটিকে আমরা দুই ভাবেই বলিতে পারি; অমন শুভ দিনটি বলিয়াই এমন সুন্দর ঘটনাটি ঘটিল বা অমন সুন্দর ঘটনাটি ঘটিল বলিয়াই দিনটি শুভ। সাধারণতঃ উন্নতসত্তা সাধু মনীষিবৃন্দের ও অবতারের জন্মক্ষণটি অতি শোভনীয় থাকে। বলবান গ্রহ সকল উচ্চস্থানে বিরাজ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর আবির্ভাব কালে পাঁচটি গ্রহই তুঙ্গস্থানে ছিল। শ্রীসীতারামের জন্মকালেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। একথা শাস্ত্রে আছে, তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

> "উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
> লগ্নে কর্কটকে পুনর্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।
> নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
> রাবির্ভূতমভূদ-পূর্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ।।"

নবমী একটি তিথি। চন্দ্রের কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি হেতু ঐ তিথিটি হয়। এক মাস পর পর সেই একই নবমী তিথি ফিরে ফিরে আসে বটে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহগণের গতির বৈলক্ষণ্যবশতঃ তুঙ্গস্থ গুর্বাদি পঞ্চ গ্রহ সহ একই কালে নবমী ক্বচিৎ উদয় হয়। অগণিত গ্রহনক্ষত্রে অনন্ত গতি একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার (Phenomenon)। প্রকৃতি প্রাণবতী না হইলেও ক্রিয়াবতী। সেই শুক্লা নবমী সহ তুঙ্গস্থ পঞ্চগ্রহের মিলন ঘটাইতে প্রকৃতির একটা চেষ্টা—তাহাই নবমীর কান্না। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় একবার ঐরূপ হইয়াছিল, নবমীতে হয় নাই, তাহাই যেন পূর্ণিমার সঙ্গে নবমীর দ্বেষ। সেই চেষ্টা আজ ফলবতী হইল। তাই এত আনন্দ। একটা ফুল ফুটাইতে প্রকৃতির কত চেষ্টা! একটা বীজকে লইয়া খাটিতে খাটিতে যে-দিন কৃতকার্যতা লাভ করে, সে দিন হাসিরাশি আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। এত চেষ্টার পর আজ সেই নবমী আবার আসিয়াছে, অতএব ভগবান্ আসিবেন; তাই প্রকৃতির অত আনন্দ, ফুলে ফলে গঙ্গার কোলে তাই অত শোভা ঢালিয়া দিয়াছে।

তারপর চন্দ্রের সুধার কথা। গাভীর অশ্রু যেমন জাগতিক ধর্মবিপ্লব বুঝায়, চন্দ্রের সুধা তেমনি শান্তিদাতার আগমন বুঝায়। জগতের দুঃখ দেখিয়া চাঁদের মত কমনীয় কান্তি আশ্রয় করতঃ এক নব শিশু আবির্ভূত হইলেন। রসিক ভক্ত যাহারা, তাহারা আর একটু সরস করিয়া

বুঝিয়া লউন। ঐ যে সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর সার্দ্ধ চব্বিশ চাঁদ স্বরূপ আমার কালাচাঁদ, ঐ চাঁদ আজ তাপময় ধরার বুকে গলিয়া পড়িলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।
সখি হে, কৃষ্ণ মুখদ্বিজরাজ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।।
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেই এক পূর্ণ চন্দ্র মানি।।
কর নখ চাঁদের হাট, বংশীর উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান।।
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্রে লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু নাসা-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান,
নারীর মন বক্ষ-বিঁধে তায়।।
এ চাঁদের বড় নাট, পশারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত।।"

আজ নিখিল জীব জগৎকে আপ্যায়িত করিতে গাভীর অশ্রু আশ্রয় করিয়া বা জীবদুঃখ-কাতরতায় বিগলিত-তনু হইয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক বীর আমার কোন কথাই শুনিবেন না। চন্দ্র একটা জড়পিণ্ড, তার জ্যোতিও নাই, সুধাও নাই। তার কমনীয়তাই কী, আর সার্দ্ধ চব্বিশ না হউন সাত শত থাকিলেই কী; তার আবার গ'লে পড়াই কী? অবশ্য যে-সকল যন্ত্রাদি সাহায্যে বর্তমানে চন্দ্রের স্বরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহা যদি অভ্রান্তই ধরিয়া লই, তবে চাঁদকে একটি জ্যোতিহীন জড়পিণ্ড বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ঐ আলোগুলি তাহার নিজেরই হউক, আর সূর্য ঠাকুরের ধার

দেওয়াই হউক, নিদাঘ নিশিতে নিশাপতির রমণীয় রূপখানি যে মনোনয়ন-স্নিগ্ধকর ও হৃদয়জুড়ানো তাহা বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক মাত্রই অনুভব করেন। ওর পানে একটিবার মাত্র তাকাইলে বিরহী প্রেমাস্পদ যে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। ফলিত জ্যোতিষ চন্দ্রকে সকল মনের অধিপতি ধরিয়া এতাবৎ কাল হিসাব নিকাশ করিয়া আসিতেছেন, কই, কোন কালে কেহ তো তাহাতে কোনরূপ ভুল ধরিতে পারে নাই। জন্মকালে চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশিই একটি মানুষেব সমগ্র জীবনটি চালিত করে। কেবল মনের উপর নহে, যাবতীয় ওষধির উপরেও চন্দ্রের রাজত্ব।

"তেনৌষধ্যঃ সমুদ্ভুতা যাভিঃ সন্ধার্যতে জগৎ।
স লব্ধতেজো ভগবান্ ব্রহ্মণা বর্দ্ধিতঃ স্বয়ম্।।"

এস্থলে ব্রহ্মণা অর্থে সূর্যেণ বলিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে মিল রাখা যায় বটে, কিন্তু ধান্যাদি ওষধি বৃদ্ধির হেতু যে চন্দ্র তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। ওষধির বিকার বিশ্বের যত কিছু সবই; মূল যে ওজঃ ধাতু তাহাও ওষধির বিকার। তাই তারও এক নাম চন্দ্র। অতএব বৈজ্ঞানিক মতে মত ঠিক রাখিয়াও আমরা বলিতে পাবি, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর যাহা সারভূত, যাবতীয় মনের যাহা অধিপতি স্বরূপ, সেই মহাশক্তি মূর্তিমান হইয়া ধবায় প্রকাশ হইলেন। কেন হইলেন? গাভীর অশ্রু দেখিয়া। গাভীব অশ্রু কেন? কলির জীবের দুর্দশার জন্য; সেই দুর্দশার কারণ কী? চন্দ্রের অভাব, মহাশক্তির অভাব, তেজোবীর্য ব্রহ্মচর্যের অভাব। প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাহাই দান করিতে, শক্তিদানে নিখিল বিশ্ব সঞ্জীবিত করিতে, মহা-মহাশক্তি ঐ যে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার কূলে সামান্য শিশুরূপে ভাসিয়া চলিলেন।

এই অনাহত চক্রই হৃদয়-সরোজ ত্রিতন্ত্র-মিলন-ভূমি। এই অনাহত চক্রেই আনন্দময় পুরুষবর বাস করেন। শব্দব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ। শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মময় পুরুষ জীবের এই চক্রে অবস্থান করেন। তথাহি তন্ত্রসারে—

"তদূর্দ্ধেহনাহতং পদ্মমুদ্যাদাদিত্য-শঙ্কাশং
* * *
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দোহনাহতস্তত্র দৃশ্যতে
* * *
আনন্দ-সদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্।"

মায়ান্ধ জীব সেই পুরুষের সন্ধান জানে না। জীবের নিত্যস্বরূপজ্ঞান হইলেই, সম্পূর্ণ আত্মস্থ ভাব আসিলেই সেই পরমস্বামীর সন্ধান পায়।

তথাহি তত্রৈব—

"ধ্যানিনাম্ অথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্য চ।
যস্মাদাদ্যঞ্চ হৃদয়ং তস্মাদাদীতি গদ্যতে।।"

আজ দম্পতীযুগল গঙ্গাতীরে ধ্যানস্থ; গোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সম্পূর্ণ আত্মস্থ

হইয়া পড়িয়াছেন। অনাহত চক্রে স্পন্দন খেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে অনাহত পদ্মদল বিকশিত হইল! পরম পুরুষবর হৃদয়মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ব মিলন, বাহিরেও যিনি ভিতরেও তিনি। অন্তরে পরমপুরুষরূপে অনাহত চক্র আলোকিত করিয়া উদীয়মান আদিত্যের প্রভা মলিন করতঃ আর—বাহিরে গঙ্গাস্রোতে সুধামাখা তনু প্রাকৃত শিশুরূপে ভাসমান হইয়া বিরাজিত। মুহূর্তে অন্তর বাহির মিলন হইল। উভয়তঃ প্রাজ্ঞ দীননাথ চোখ খুলিলেন।

"পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময়" ইতি মূল।

অপ্রাকৃত মহাভাবের মানুষ তিনি—প্রাকৃত মানুষরূপে মানুষের দ্বারে ছুটে আসেন যখন তখন তাহাকেও দেশোচিত কালোচিত যুগোচিত শ্রীদেহ ও তৎকান্তি গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্র লিখিয়াছেন—

"গৃহ্ণত্যনুযুগং তনুঃ।" শিশুরাজ লিখিয়াছেন—"কান্তি কাঁদে হেরে কান্তি।" প্রাকৃত জগতের কান্তি সেই বিমল অমল কান্তি দেখিয়া মলিন বিষণ্ণ, এ জগতের রূপ-লাবণ্য যেন কত ভয়ভীতিতে জড়সড় হইয়া দূরে অতি দূরে সরিয়া কেবল অশ্রুনেত্রে যুক্ত-করে গৌরব প্রদর্শন করে। সেই ভাবের মানুষের সঙ্গে এই ভাবের মানুষ মিলিতে পারে না। প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন "জীবের হিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন লইয়া মানুষের ভিতরেও মানুষ হইয়া আসেন। লক্ষণে চিনে নিতে হয়।" সেই লক্ষণটি কী, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। লক্ষণ দুই প্রকারের হয়, স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। যে বৈশিষ্ট্য বশতঃ এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহাই তাহার লক্ষণ। প্রত্যেক বস্তুর দুই প্রকারের সত্তা আছে। তাহা আপনাতে আপনি যাহা (in itself), তাহা অন্যের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় যে ভাবে, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাষায় Subjective & Objective Existence বলা হয়। শ্রীশ্রীভগবান্ আপনাতে আপনি যাহা তাহাই তাঁহার Subjective Existence, তাঁহার নির্দেশই স্বরূপ লক্ষণ। অজ্ঞ জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে তিনি যেমন ভাবে প্রকাশ হন বা জীব তাহাকে যেভাবে জানে তাহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ, তেমনই 'পঞ্চতত্ত্বময়' পদটি দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ ও 'পীতবর্ণ' পদ দ্বারা তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন। উপনিষদ্ গাহিয়াছেন, 'অবাঙ্মনসো-গোচরম্।' উপনিষৎকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেমন? উপনিষদ্ বলিবে—"যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" 'নেতি' 'নেতি' তিনি এ' নয়, তিনি ও' নয়, তিনি প্রাকৃত নামরূপ শব্দস্পর্শগন্ধের অতীত। প্রাকৃত মন তাহাকে জানে না।, সসীম বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন "সত্য পরং ধীমহি।" তিনি সৎ, তিনি পরম। তিনি আছেন, অনন্ত বিশ্বে কেবল তাঁহারই পরম সত্তা। তিনি আছেন। পরম জ্ঞানস্বরূপ তিনি, আনন্দ-রস-ঘন তিনি। শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'অনন্তানন্তময়।' অসীম অনন্ত ভাব তাঁহার, অসীম অনন্তরূপ তাঁহার, মহামহা-ভাবরসেশ্বরেশ্বর তিনি। অতি অতি গম্ভীর সেই ভাব-বারিধির কূল-কিনারা নাই। শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিলেন 'পঞ্চতত্ত্বময়'। এই পঞ্চতত্ত্ব রহস্য আস্বাদন করিবার পূর্বে একটি নীরস তত্ত্ববিচারের অবতারণা. করিতে হইবে। 'অবাঙ্মানসো-গোচরম্' 'সত্যং পরং' 'অনন্তানন্তময়'

ইত্যাদি উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচন্দ্রপাতোক্ত উত্তরোত্তর গভীর গভীরতর স্বরূপলক্ষণ শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট থাকিলেও গ্রন্থকার শিশুরাজ মহেন্দ্রজী সে সকল ভাবের পদ না লইয়া 'পঞ্চতত্ত্বময়' এইরূপ স্বরূপ নির্দেশ করিলেন কেন? এইস্থলে রহস্য হইতেছে এই যে, স্বরূপ ও তটস্থ বলিয়া যে দ্বিধা লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের স্বরূপটি যে কী তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই! তাহা চিরগুপ্ত, চির অজ্ঞাত। শ্রীশ্রীপ্রভু যে কে, কেমন ও কী বস্তু তাহা তিনি ছাড়া কেহ কদাপি জানিতে পারে না, পারে নাই, পারিবে না। অতএব তাঁহাকে 'বন্ধু' না বলিয়া আমরা বলিব 'জগদ্বন্ধু' অথবা আরও সত্য করিয়া বলিব "আমার বন্ধু"। ভক্তের কাছে তাঁহার প্রকাশ যাহা তিনি তাহাই বলিয়া নিখিল শাস্ত্রে কীর্তিত ও গীত হইয়া আসিতেছেন। তিনি যেন একটি 'ভাব', আর অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারের অনন্ত অক্ষৌহিণী জীব-হৃদয়ে যেন সেই ভাবের একটি 'উচ্ছ্বাস'। তিনি যে কেমন, জীব তাহা জানে না, কদাপি জানিবে না, জানিতে বৃথা চেষ্টা করিবে মাত্র। আমার নিকট তিনি কেমন, ভক্তের বুকে তাঁহার প্রকাশ কেমন, জীব কেবল তাহাই জানিবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বটি চির অজ্ঞাত। 'আমার প্রভু' যিনি তিনি যে কেমন, কেবল তাহাই জানিবার শক্তি আমাকে দিয়াছেন। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কেবল তিনিই তাঁহাতে আছেন। তদিতর অন্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট যাহা কিছু, সবই অভেদ হইয়াও ভেদ-বিশিষ্ট। অতএব স্বরূপ লক্ষণ জানিবার উপায় কোথায়? এই মনের দ্বারাই তাঁহার সেই মনের অতীত স্বরূপটি ধরিবার প্রয়াস বৃথা নহে কি? 'নেতি নেতি' দ্বারা কোন ভাব বস্তুর (Positive) স্বরূপ নির্ণয় হয় না। 'সত্যপরং' বলিতে গেলেই তটস্থভাব তাহাকে স্পর্শ করে অর্থাৎ জীবের স্বানুভূতি তুলিকায় তিনি চিত্রিত হইয়া পড়েন। তবে 'অনন্তানন্তময়' এই যে স্বরূপ ইহা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, নিখুঁত ও নির্মল। কারণ তাঁহাকে বলিতে হইলে, এই শব্দটি ছাড়া আর গত্যন্তব নাই। কিন্তু অজ্ঞ জীবের ব্যাবহারিক জ্ঞানবত্তার মাপকাঠীতে ঐ পদটি একটি নিরর্থক পদের সমান। স্বয়ং প্রভুই নিজকে নিজে 'অনন্তত্বম্' বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু সাধনাবিহীন সাধারণ জীবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। অধিকন্তু, অনতত্ত্ব হইতে পৃথক্‌রূপে শ্রীশ্রীপ্রভুর তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই লক্ষণ নির্দেশ, সেই প্রয়োজন 'অনন্তানন্তময়' পদ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তত্ত্বদর্শী পরম দয়াল গ্রন্থকার নিখিল জীবের চিত্তপট যেন প্রত্যক্ষ করতঃ সাধারণের সহজ-বোধ্যভাবে তাঁহাকে ধরিবার, বুঝিবার, জানিবার ও চিনিবার মত লক্ষণ নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময়' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

লীলারসরাজ শ্রীশ্রীগোলোকনায়ক শ্রীশ্রীহরি। প্রাকৃত জগতে তাঁহার প্রথম প্রকাশ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রাসরসেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে। শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনের নিকুঞ্জগগনে রসাধিকারিণী ললিতাদি তারার হাটে শ্যামচাঁদ প্রেমসুধার বিকিকিনি করেন, দশমদশার বিরহ বেদনা বুকে লইয়া বৃন্দাবনচন্দ্রমসী পশ্চিমাচলে অন্তর্ধান করিলেন। নবদ্বীপে গৌরশৈলে মহামিলন হইল।

"রাইকুন্দ ললিতিকা, শ্যামসুন্দর বৃন্দিকা" বিরহ-প্রতাপে মহাযোগে যুক্ত হইলেন। শ্রীনিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—প্রত্যেকেই পঞ্চগোপীময় (শ্রীহরিকথা প্রকটরহস্য দ্রষ্টব্য)। ব্রজধাম রূপান্তরে নদীয়ায় উদয় হইল। নিভৃত নিকুঞ্জের প্রেমসুধা জীবের হাতে তুলিয়া দিলেন। "হরের্নামৈব কেবলম্" এই মহামন্ত্র জীবের কানে দিয়া পঞ্চতত্ত্ব নীলাচল-অচলে লুকাইয়া

রহিলেন। আজ "দুহুঁ ধাম দুহুঁ ধামের শকতি" মহা-মহাসম্মিলনে মহামহাকায় মহাবিগ্রহ প্রকট করিলেন। তথাহি শ্রীপ্রেমযোগ গ্রন্থে—

"ব্রজলীলার পরিকর পঞ্চ সম্মিলনে,
পঞ্চতত্ত্ব গৌরের প্রেম-প্রচারণে,
পঞ্চতত্ত্ব একাধারে প্রেমের প্লাবন,
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।।"

অতএব সংক্ষেপতঃ সার কথায় 'পঞ্চতত্ত্বময়'—ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরূপ লক্ষণ।

'পীতবর্ণ।' বর্ণদ্বারা লক্ষণ বিনির্ণয় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; তথা "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও পরিকরবৃন্দের লক্ষণ শ্রীশ্রীপ্রভুও বর্ণদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। "কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, চালিতা গাছের পাতার রং; রাধিকা স্বর্ণবর্ণ, গিণি ও পাউণ্ডের রং; আর সমস্ত পরিকর বৃক্ষের রং।"

উক্ত সর্বত্র বর্ণ শব্দটি উপলক্ষণ। বর্ণটি সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত। বর্ণদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানসে সর্বাঙ্গ দর্শন হয়। শ্রীদীননাথ নয়ন খুলিয়া কী দেখিলেন? ভানুকোটী-উজ্জ্বল চন্দ্রকোটী-সুশীতল একটি পীতবর্ণ অম্বুজাক্ষ পরম রমণীয় শিশু। গঙ্গাদেবী সানন্দে সেই পরম শিশুটি দীননাথের হাতে তুলিয়া দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

"অনর্পিত প্রেম বিতরণ করিবার জন্য"

আজ নবমীর ক্ষীণ উষালোকে একটি আলোর মানুষ আঁধার জগতে নামিয়া আসিলেন—কেন? সেই অনর্পিতচরী ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য। শত সহস্রবার অর্পিত হইলেও সে মধুসিন্ধু চির অনর্পিত। শ্রীশ্রীহরিপুরুষতত্ত্ব জীব কেন, বিধি ব্রহ্মাদিরও চির অনাস্বাদিত। স্বয়ং শ্রীমুখে তাই বলিয়াছেন যে ব্রজলীলার রসাস্বাদন করিয়াছিল অষ্টসখী, গৌরলীলায় রসপাত্র ছিলেন সাড়ে তিন জন। ও সব লীলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। এবার পরমধনের আস্বাদন দিতে প্রাণধন ছুটিয়া আসিলেন। এবার 'গুরু তত্ত্ব প্রকাশ হ'বে, ভাবের দ্বারা সেবা হ'বে, ঘাটে ঘাটে যমুনা ব'বে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হ'বে।' প্রত্যেক জীব পরম স্বামী শ্রীহরিপুরুষের সঙ্গে পরমানন্দে বিহার করিবে, বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণু ঐ রসস্বরূপকে আস্বাদন করিবে—উহাই করাইবার জন্য উধাও হইয়া ধরায় আসিলেন।

"জন্য"—এস্থলে একটি অনুমান প্রমাণাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ভাবুক গ্রন্থকার "জন্য" পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি শিশু জন্মিয়াছে শুনিলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিবেন, প্রাক্তন-কর্মফল ভোগ করিতে জন্মিয়াছে; কারণ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভবের হেতু প্রাক্তন-কর্ম। জীবমাত্রের জন্মের হেতু স্বকীয় কর্মবন্ধ-পাশ। আর শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মের হেতু 'অনর্পিত প্রেম বিতরণ'।

জন্মের হেতু যখন সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তোমরা একটা অনুমান করিয়া লও। সাধারণ জীবের জন্ম জননীজঠরেই হইয়া থাকে। গর্ভাবাসে কঠোর যন্ত্রণা, তাহা নরকসদৃশ উক্ত

হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু যখন সাধারণ জীব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তখন তাঁহার জন্মের প্রকারও বিভিন্ন হইবে; ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ইহাই জানাইবার উদ্দেশ্যে "জন্য" পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। জীবের ও প্রভুর জন্মের হেতুদ্বয়ের সম্পূর্ণ বিসদৃশত্ব দেখানো এই "জন্য" পদ প্রয়োগের তাৎপর্য। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন "জন্মগুহ্যং ভগবতঃ"।

"এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ঃ বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ।।" ভাঃ ১।৩।৩৫

ষড়িন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হৃষীকেশ হইয়াও তিনি যে কী প্রকারে আত্মতন্ত্র রহিয়া ইন্দ্রিয়বিষয় গ্রহণ করেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। স্বামীপাদ শ্রীধর লিখিয়াছেন, "দূরাদেব গৃহ্ণাতি ন তু সজ্জতে"। এই জগতে আসিয়াও তিনি যে কীরূপে না আসিয়া থাকেন, তাহা তর্কাদি দ্বারা কদাপি জ্ঞাতব্য নহে। শাস্ত্রে তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
ববৈতি জন্তুঃ কুমনীশ ঊতীঃ।।" ভাঃ ১।৩।৩৭

তথাপি আমরা অতি স্থূল বুদ্ধি দ্বারাও এ পর্যন্ত অনুমান করিতে পারি যে কর্মফলরূপ শরীরধারী জীবের জন্ম যেরূপ কামজ; যিনি আসেন স্বেচ্ছায়, যিনি আসেন কামনাবদ্ধ জীবের দুর্গতি দর্শন করতঃ কৃপা পরবশ হইয়া, যিনি আসেন জন্মাদি আত্যন্তিক দুঃখের কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধারণের পথে তুলিয়া অনর্পিত প্রেমধনে ধনী করিতে—তাঁহার জন্ম কদাপি তদ্রূপ নহে। অতএব কেমন কবিযা একটি শিশু উদ্ভূত হইয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিল ভাবিয়া একেবারে ধাঁধায় পড়িও না। এই কথাটি বলিবার জন্যই গ্রন্থকাব "প্রেম বিতরণের জন্য" এই বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

"অমিয় নিমাই গৌরহরি পূর্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ"—এই বাক্যাবলীর ভাষ্যরচনা পূর্বেই করিয়াছি। গ্রন্থকারের ভাব পরম গম্ভীর। লেখনী পরম চতুর। একটি অক্ষরও নিরর্থক ব্যবহার করেন নাই। "অমিয়" পদটি প্রয়োগ করিবার নিগূঢ় তাৎপর্য শুনুন। যে শচীর নিমাই আজ আবার নবশিশুরূপে দীননাথের অঙ্কদেশ উজ্জ্বল করিলেন, তিনি আরও কতবার এই কামময় জগতে আসিয়াছিলেন—অমিয়-তনু লইয়া। সেই তপ্ত-রুক্ম-সুধানিধিকায় প্রাকৃত রজোবীর্যাত্মক নহে। তিনিই যখন আসিলেন, তখন তোমরা একটি উপমান-প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া বুঝিয়া লও। 'অমিয়' পদ প্রয়োগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার উপমান-প্রমাণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। "প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধনম্ উপমানম্।" প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপীয় পদার্থের প্রজ্ঞাপনই উপমান। শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি প্রসিদ্ধ বা প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত তত্ত্ব। শ্রীশ্রীগৌরহরির অমিয় তনু অযোনিসম্ভব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসিদ্ধতত্ত্ব। তিনি অযোনিসম্ভব। সেই দুই তনু অভিন্ন-তনু শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। তিনি যোনি-সম্বন্ধ ব্যতীত আপনা-আপনিই আবির্ভূত হইলেন শুনিয়া চমৎকৃত হইবার হেতু কিছুই নাই। তিনি যে অমন-ভাবেই আসেন। একবার, দুইবার, বার বার আসিয়াছেন, দেখিয়াও কি সংশয় দূর হয় নাই—এতখানি কথা বলিবার জন্য গ্রন্থকার "অমিয়" পদটি ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলিলেন বটে, কিন্তু আমরা টীকাকার, দেবকীগর্ভে কংস কারাগারে জন্মিলেন যিনি, তিনি অযোনিসম্ভব, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? দেখা যাউক, শ্রীমদ্ভাগবতের গুটিকতক শ্লোক আলোচনা করিয়া কিছু লাভ হয় কিনা—

তথা শ্রীদশমে—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।।"

ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। সর্বতত্ত্ববেত্তা শ্রীপাদ শ্রীধর ভাবার্থদীপিকায় কী লিখিতেছেন, নিবিষ্টচিত্তে অনুভব করুন।

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভুব জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ" জীব-সকলের ন্যায় তাহার ধাতুসম্বন্ধ হয় নাই। এইভাবে রহিলেন শ্রীবসুদেবে। এখন শ্রীদেবকীতে আধান হইলেন কীরূপে, তাহাই শুনুন।

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।" ভা. ১০/২/১৮

পূর্বদিক্ যদ্রূপ আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে তদ্রূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্ব দেবকী-বসুদেব কর্তৃক বেদদীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ যাহা ভক্তানুগ্রহার্থ পরিচ্ছন্ন শরীরতুল্য হইয়াছিল, তাহা আপনার মন দ্বারাই ধারণ করিলেন।

(সমাহিতং সম্যগ্‌ভূতমেবাহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতম্ অচ্যুতস্য অংশ ইব অংশস্তং ভক্তাগ্রহানু গ্রহায় পরিছিন্নমিব বপুরিত্যর্থঃ ইতি শ্রীধরঃ)। এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীতে গোস্বামিবরেণ্য শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন—"তেন জীবজ্জন্মাভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতো জন্ম উচ্যতে।" প্রাকৃত জীবের মত জন্ম হয় নাই বলিয়াই এইরূপ বলিলেন। এই গেল গর্ভাধান। আসুন এখন জন্ম সময়টি দেখি—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।" ভা. ১০/৩/৮

দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন, পূর্বদিকে যেমন চন্দ্র শোভা পায়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হরি দেবকীতে ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। "যথা" অর্থ শ্রীধর লিখিলেন। "যথাবৎ ঐশ্বরেণ রূপেণ"। তারপর আবির্ভূত হইলেন কিরূপ?

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।।
মহার্হবৈদুর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত।।" ভাঃ ১০/৩/৯-১০

দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে বালক নাড়ী বিজড়িত হইত; বর্ণনায় সে কথা নাই। তারপর চতুর্ভুজ জীবন্ত শিশু কদাচিৎ সম্ভব হইলেও কাপড় পরা, অলঙ্কার পরা, আয়ুধধরা

শিশুর জন্ম সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে প্রাকৃত জীবের মত ভূমিষ্ঠ হন নাই।

ঐ রূপ দেখিয়া শ্রীদেবকী কহিলেন—

"উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্।।" ভা. ১০/৩/৩০

হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খচক্রগদাপদ্মের শোভায় শোভিত এই অদ্ভুতরূপ তিরোহিত কর। তখন শ্রীভগবান্ কী করিলেন?

"—ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।।" ভাঃ ১০/৩/৪৬

ভগবান্ হরি দর্শনকারী পিতামাতার সমক্ষে নিজ মায়াযোগে প্রাকৃত শিশুরূপ হইলেন। এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা।

এখন আসুন, দেখি, যাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপায় প্রকৃত ভাগবত-তত্ত্ববেত্তা হইয়াছিলেন, সেই গোস্বামিগণের তিলকস্বরূপ শ্রীল রূপ কীভাবে "জন্মলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে দৃষ্টিপাত করুন, 'প্রকটাপ্রকটলীলা' নবম শ্লোক হইতে ত্রয়োদশ শ্লোক আলোচনা করুন।

"যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ,
আবির্বুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।
অন্তঃস্থিতা বিষ্কর্তব্য তদন্যব্যূহ ঈশ্বরঃ,
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ।।" ৯।।

যে লীলাপুরুষোত্তমের মহানারায়ণ বিলাসমূর্তি সেই লীলাপুরুষোত্তম ঈশ্বব আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রে সংকর্ষণকে আবিষ্কার পূর্বক বাসুদেবাদি ব্যূহত্রয় আবিষ্কার কর্তব্য বিবেচনায় বসুদেবের মনোমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্য রাখিবেন, দেহ মধ্যে, মূল ধাতুরূপে নয়। তারপর গর্ভাধান শুনুন—

"ভূমের্ভারনিরাসায় দেবানামভিযাঞ্চয়া
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্নষ্টাবিংশে চতুর্যুগে।
ক্ষীরাব্ধিশায়ী যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়াস্মৃতং
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি।।" ১০।।

দেবগণের প্রার্থনানুসারে ভূমির ভার হরণার্থ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরাবসানে ক্ষীরসাগরশায়ীর যে-রূপ অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্তি বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে, সেই মূর্তি বসুদেবের হৃদয়স্থ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ লইয়া, গর্ভেতে নহে। জরায়ুস্থিত বালক মাতৃভুক্ত দ্রব্যাদির সারাংশ চুষিয়া বাঁচিয়া থাকে। তিনি কী করিয়া সেই হৃদয়ে ছিলেন?

"প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব।।" ১১।।

তখন দেবকীর বাৎসল্যের এক স্বরূপ প্রেমামৃত কর্তৃক লাল্যমান হইয়া হরি চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

সাধারণতঃ দশ মাস দশ দিন গর্ভবাস করিয়া প্রাকৃত শিশু প্রসবদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। তিনি কী করিলেন?

"অর্ধ ভাদ্রপদাষ্টম্যামসিতায়াং মহানিশি।
তস্যাহৃদস্তিরোভূয় কারায়া সূতিসদ্মনি
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ।।" ১২।।

অনন্তর ভাদ্র মাসের অসিতপক্ষীয় অষ্টমীর অর্দ্ধ রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় হৃদয় হইতে অন্তর্ধান করিয়া বন্ধনালয়ের সূতিকাগৃহে দেবকীশয্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তারপর সকলেই জানিলেন। তাঁহারা কী জানিলেন? দেবকীদেবীই বা কী ভাবিলেন?

"জনয়িত্রী প্রভৃতিভিস্তাভিরিতাবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত।।" ১৩।।

দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ লৌকিক ব্যবহার অনুসারে জানিতে পারিলেন যে বিনা কষ্টেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই গেল শ্রীরূপের স্বকীয় অনুভূতি।

অন্যত্র তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন ভাগবতগণের মত বলিতেছেন—

"কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ২১
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।। ২২
গত্বা যদুবয়ো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্।।" ২৩।

বসুদেবের গৃহে আদ্যব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন, আর গোকুলমধ্যে মায়াশক্তি দুর্গার সহিত শ্রীলীলাপুরুষোত্তম আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর বসুদেব গোকুলমধ্যে গমন পূর্বক তথায় সুতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল কন্যামাত্র দেখিতে পান। পরে তাহকেই গ্রহণ করতঃ মথুরায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে গিয়া প্রবেশ করেন।

আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এত সব কথা আছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন নাই কেন? শ্রীরূপ তাহার উত্তর দিয়াছেন—

"এতচ্চাতিরহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিঞ্চ ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ।।"

এ বিষয়টি অতি গোপনীয় রহস্য-পরিপূর্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তৎলীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হয় নাই। তবে শ্রীশুকদেব প্রভৃতি কোনও কোনও স্থানে কথাপ্রসঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র সূচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থবিস্তারভয়ে সেই সকল স্থান নির্দেশ করিতে বিরত থাকিলাম। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই অলৌকিক জন্মলীলার সকল কথা শুনিয়া তোমার আমার মত জীবের বিশ্বাস হউক বা না হউক, স্বামীপাদ শ্রীধর, গোস্বামীবরেণ্য রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব যে শ্রীকৃষ্ণকে অযোনিসম্ভব জানিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অযোনিসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যখন সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, তবে আমাদের এত ভয়ই বা কেন? বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদগণের আনুগত্য ব্যতীত যখন ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিবার আমাদের আর গত্যন্তর নাই, তখন বিশ্বাস করিতেই হইবে।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। গ্রন্থকার অমিয় নিমাইকে অযোনিসম্ভব বলিতে চাহে। তৎসম্বন্ধে প্রাচীন কোন গ্রন্থোক্ত বিশেষ প্রমাণ আমার নাই। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তিটিকেও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।" প্রাচীন গ্রন্থে নাই বলিয়াই যে সমীচীন নয়, আজ কেহ বলিতেছে বলিয়াই যে অগ্রহণীয়, এইরূপ বদ্ধমূলসংস্কার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেযতঃ এই সকল নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব—ঠিক ঠিক যাঁর কথা, তিনি না বলিলে মানুষের জানিবার সাধ্য নাই। তাই শ্রীশ্রীব্রজচাতুরী শ্রীগৌরহরি আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর আজ শ্রীগৌরমাধুরী শ্রীবন্ধুহরি জানাইতেছেন, ইহাতে কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের মহাবাক্য শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মলীলা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"অতি মহা বেদগোপ্য এ সকল কথা।" "দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য খেলা রে"—এই কথা পুনঃপুনঃ বলিয়াও পরিষ্কার কথায় কেন যে লিখেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না। হয়ত তৎকালীন দেশকাল বিবেচনা করিয়াই তিনি ঐ রহস্য বিকাশে বিরত রহিয়াছেন। তবে সদ্যোজাত শিশুর বর্ণনায় একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর
দোলয়ে তাহা বনমাল।
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল।।"

মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যজাত শিশুর চন্দনচর্চিত বক্ষ আর বনমালা শোভিত গলদেশ হয় কি? এস্থলে প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর আবির্ভাবের সময়টি যে! আহা! কি সুন্দর! ভাবিলেই হৃদয়খানা আনন্দরসাপ্লুত হয়।।

"... নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্তন।।
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজন দুর্জন।
সভে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ।।
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।।
চতুর্দিক্ পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।

জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।।
হেনই সময় সর্বজগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।।" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গর্ভাধানের বর্ণনা দিয়াছেন—

"জগন্নাথ কহে,—আমি স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।।
আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "জন্মলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন। অযোনিসম্ভব সম্বন্ধে তিনিও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তবে যে "অমিয়" পদের ভাষ্য রচনা করিতেছি, দাসঠাকুর সে অমিয়া ছানিয়া লুটিয়া লইয়াছেন। শ্রীদেহখানি যে প্রাকৃত নয়, সবটুকুই যে অমৃতময় তাহা বহুবার বলিয়াছেন।

"ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা।"
"নয়নে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন।"
"প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।।"
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি।।"
"গৌরনাগরিয়া গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গে রস রাশি অমিয়া অখণ্ড।।"

শাস্ত্রেও স্পষ্টোক্তি দেখিতে পাই —

"ন তস্য প্রাকৃতামূর্তিঃ মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
ন যোগীত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ।।"

তাঁহার মূর্তি প্রাকৃত মেদ-মাংস-অস্থি-সম্ভব নহে। তিনি ঈশ্বর, ঈশনশীল পুরুষ, সত্যরূপ অচ্যুত ও বিভু।।

এখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-বন্ধুহরির মহাবাণী শুনুন।

"...মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া আসিলেও মায়ার অতীত বস্তু। সুতরাং অপ্রাকৃত। 'প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাই পণ্ডিত।' অযোনি-সম্ভব। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।"

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর এই বাণী হইতে শ্রীমহাপ্রভু গৌরহরি যে অযোনিসম্ভব তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে যেদিন আসিয়াছিলেন, সেদিনও অযোনিজাত, শ্রীশ্রীগৌররূপে যেদিন আসিয়াছিলেন, সেদিনও অযোনিজাত। আর আজ এই দুই লীলার মহামিলনশক্তি লইয়া এই শুভলগ্নে অপ্রাকৃত তরুণ শিশুটি মুর্শিদাবাদের গঙ্গার কূলে উদয় হইলেন তিনি অযোনিসম্ভব না হইবেন কেন?

মূলে "অমিয়" পদটি প্রয়োগ দ্বারা ভাবুক গ্রন্থকার এই এতগুলি কথা বলিয়াছেন।

"হৃদয় সরোজ বিকশিত করিয়া"—

এই বাক্যের ভাষ্য পূর্বেই করিয়াছি। সম্প্রতি "করিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগের নিগূঢ় তাৎপর্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাঙ্গলা ভাষায় "ইয়া" প্রত্যয় সংস্কৃত ব্যাকরণের "ক্ত্বাচ্" প্রত্যয়ের অনুরূপ। ঐ প্রত্যয় সম্বন্ধে পাণিনিসূত্র, যথা—"সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে।" ৩/৪/২১।

দুই ক্রিয়ার কর্তা এক হইলে ও এক ক্রিয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে আর এক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে পূর্ববর্তী ক্রিয়ায় ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যোগ হয়। দীননাথ ও বামাদেবীর সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্রবিরাজিত হৃদয়সরোজদ্বয় বিকশিত করিলেন যিনি, গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া অঙ্কদেশ আলোকিতও করিলেন তিনি। তবে দুইটি মূর্তিতে একটু প্রভেদ আছে। গ্রন্থকার ইড়া বা পিঙ্গলা ব্যবহার না করিয়া সুষুম্না পদ প্রয়োগ দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুষুম্না যমুনার আর একটি নাম। তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ববর্ণন প্রসঙ্গে,—

"কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।"

হৃদয়ে কালিন্দীতট বিহারী কালাচাঁদরূপে, আর বাহিরে অভিনব শিশুমূর্তি শ্রীহরিপুরুষরূপে। গোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন উভয়ে বাৎসল্যরসসায়রে ডুবিয়া গিয়াছেন, তখনই হৃদয়ে বালগোপালরূপে দেখা দিয়া ঠিক অব্যবহিত পর মুহূর্তে শ্রীহরিপুরুষরূপে ক্রোড়দেশে আরোহণ করেন। পূর্বে শ্রীদীননাথ ও পরে শ্রীবামাদেবী যখন নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, তখন অন্তরের মূর্তি বস্তুতঃ তিরোহিত হইয়াছে। তবে (after image-এর মত) তখনও সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন চোখের উপরে হাসিতেছিল। দীননাথ উভয়তঃ প্রাজ্ঞ। অন্তরের আলোকময় মূর্তিখানি কীরূপে বাহিরের আলোতে মিশিয়ে গেল, তাহা তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন। "করিয়া" পদ দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এ কথায় আপত্তি করিয়া কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ হইবার কারণ কী? তজ্জন্য আসুন, সাত্বত সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের একটি শ্লোকাস্বাদন করিয়া লই।

"ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত।।"

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, ধরানাম্নী ভার্যার সহিত ব্রহ্মার নিকট বর চাহিয়াছিলেন, 'ভগবন্, আমরা দুইজন অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের দুইজনেরই যেন বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে পরমা ভক্তি উৎপন্ন হয়।' বিরিঞ্চিদেব 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করেন। সেই মহাযশস্বী দ্রোণ ব্রজমণ্ডলে নন্দ ও দ্রোণভার্যা ধরাই যশোদা। সেই কারণে জনার্দন ভগবান্ পুত্রীভূত হইলে, ব্রজগোপগোপীর মধ্যে এই দম্পতীর নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।

পুত্র শব্দের উত্তর 'চ্বি', প্রত্যয়যোগে পুত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ এই যে, যিনি কখনও অন্যের পুত্র হয়েন না, সেই কৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর পুত্রভাবে সঞ্জাত হইয়াছিলেন।

কারণ শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—

"বাৎসল্যাভিধপ্রেমবিশেষণৈঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পুত্রতয়োদেতি ন তু স্বদেহাদাবির্ভাবেণ;

হিরণ্যকশিপুসভাস্তম্ভে শ্রীনৃসিংহস্য, ব্রহ্মণি শ্রীরামস্য পিতৃত্ব প্রয়োগাৎ ন চ গর্ভপ্রবেশেন পরীক্ষিদ্রক্ষণার্থং তৎপ্রবিষ্টস্যাপি তস্যোত্তরামাতৃত্বাশ্রবণাৎ। তাদৃশ প্রেমা তু শুদ্ধঃ সমুদ্রিক্তশ্চ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরেব। অতএব গর্ভপ্রবেশাদিকং বিনাপি তয়োঃ পুত্রতয়া তস্য প্রসিদ্ধিঃ। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদ ধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশপ্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাব্যবহিতপূর্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ততস্তদাবেশ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরপ্যবশ্যমেব কল্পতে ব্রহ্মবর-প্রার্থনয়াপি তদেব লভ্যতে ইতি সমান এব পন্থাঃ। বাৎসল্যং ত্বত্রাধিক্যং যেন বিনা তস্য পুত্রভাবো ন সম্ভবতীত্যত্রৈব পুত্রতাং মন্যামহ ইতি পুত্রীভূত ইত্যস্য ভাবঃ।।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ)

বাৎসল্য-নামক প্রেম-বিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। যদি তাহাই হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্থিত স্তম্ভকে শ্রীনৃসিংহদেবের পিতা বল না কেন? তবে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্ব প্রয়োগ হয় না কেন? যদি বল, ইঁহারা তো গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন নাই, কাজেই ইঁহারা কাহারও পুত্র হইতে পারে না, যিনি গর্ভপ্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে পারেন। এই কথাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকেই মাতা বল না কেন? সুতরাং বাৎসল্য-প্রেম ঐশ্বর্য জ্ঞানাদি-বিহীনরূপে নন্দ-যশোমতীতে সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল। আজ আরও মধুর মধুর হইয়া সেই বাৎসল্য দীননাথ ও বামাদেবীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ-আত্মস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা যেন সিন্ধুমাঝে ডুবিয়া গিয়াছেন, গর্ভ প্রবেশাদি ব্যতীতই যেমন শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন, ঠিক তদ্রূপ গর্ভাবাস না করিয়াই শ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু হইলেন বামাদেবী-অঙ্কশোভন। বহিঃ-প্রাকট্যের পূর্বে ঐরূপভাবে মনে প্রকাশ আজ কেবল দীননাথ বামাদেবীরই হয় নাই, নন্দ-যশোমতীরও হইয়াছিল। সর্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়। প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ তাহাদের ধ্যেয় বস্তুরূপে উদয় হইয়াছিলেন, পরে স্বরূপে বহির্দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। আবির্ভাবের এই রীতি সম্বন্ধে সর্বসম্মতি দেখা যায়।

শ্রীভগবান্ নারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, ব্রজরাজ দম্পতীরও তেমন, জগন্নাথ দম্পতীরও তেমন, দীননাথ দম্পতীরও তেমন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবদাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে সর্বদা তাহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবেশ হয়। গ্রন্থকার "করিয়া" পদ দ্বারা এই অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিষয় সর্বত্রই এক রীতি অর্থাৎ প্রেমবিশেষই তাঁহার আবির্ভাবের হেতু।

প্রেমপ্রভাবে প্রথমে মনে স্ফূর্তি, পরে বহিঃ-সাক্ষাৎকার। শ্রীজীবের মতে "পুত্রীভূত" পদপ্রয়োগের এই তাৎপর্য। 'চ্বি' প্রত্যয় দ্বারা শ্রীশুকদেব যাহা জানাইয়াছেন, এস্থলে 'ইয়া' প্রত্যয় দ্বারা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাহাই জানাইয়াছেন। বলিতে পারেন, উপানন্দ, কৃত্তিকা, ধনিষ্ঠা, অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী, গোলোকমণি দেবী, রাসমণি দেবী, দুঃখীরাম ঘোষ, দিগম্বরী দেবী সকলেই বাৎসল্য-রসের ভক্ত। ইহাদিগকে পিতামাতা বলি না কেন? এ'কথার উত্তর এই যে যেরূপ বাৎসল্যপ্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব সম্ভব হয় না, নন্দ-যশোমতীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম প্রচুর,

জগন্নাথ-শচীদেবীর সেইরূপ প্রেম প্রচুরতর মধুরতর, দীননাথ বামাদেবীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম আরও গাঢ় আরও ঘনীভূত, প্রচুরতম মধুরতম। এইজন্য শ্রীব্রজমণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীব্রজরাজ-দম্পতীকেই আমরা পিতামাতা বলি, এই জন্যই শ্রীগৌড়মণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীমিশ্র দম্পতীতেই আমরা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব আরোপ করি; এই জন্যই আজ শ্রীশ্রীবন্ধুমহামণ্ডলের ভক্তকুলের মধ্যে আমরা শ্রীন্যায়রত্ন-দম্পতীকেই পিতামাতা বলিয়া মনে করিতেছি।

"পঞ্চতত্ত্বময়"

এই পদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছি। স্বরূপলক্ষণ নির্দেশই এই পদপ্রয়োগের তাৎপর্য, এইরূপ সেখানে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি রহস্যবিদ্ গ্রন্থকারের রচনা পরম চাতুর্যপূর্ণ, শুধু একটি উদ্দেশ্য লইয়াই একটি পদ প্রয়োগ করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বময় পদ রচনার দ্বিতীয় আশয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। এই অলৌকিক জন্মকথা শুনিয়া সাধারণ মানুষ স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিবে এই যে, সাধারণ মানুষের জন্ম হয় জননীর জরায়ু আশ্রয় করিয়া; শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জন্ম হইল মিশ্রবর ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি আশ্রয় করিয়া; আর আজ শ্রীহরিপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করিয়া। উৎপত্তির আশ্রয় বা আধার সম্বন্ধে এই পার্থক্য বেশ। কিন্তু দেহের উপাদান-কারণ সম্বন্ধে বিভিন্নতা কী? পিতৃশুক্র ও মাতৃশোণিত ব্যতীত দেহের উৎপত্তি কি কখনও সম্ভব? তত্ত্ববেত্তা গ্রন্থকার পঞ্চতত্ত্বময় কথাটি বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কীরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহাই আস্বাদন করিব।

রজঃবীর্য সম্বন্ধ ব্যতীত দেহের জন্ম সম্ভব কিনা? তদুত্তরে স্বয়ং শ্রীত্রিকালগ্রন্থে লিখিয়াছেন। "মৃত্তিকাই জন্ম-মৃত্যুর কাবণ; সুতরাং মায়া ও মিথুন অনাবশ্যক।" এই কথা শ্রীশ্রীপ্রভু সংসারের যাবতীয় জীব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। কৈমুতিক-ন্যায়াশ্রয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধেই যখন তিনি এই কথা বলিয়াছেন, তখন যিনি জীবপাবন, তৎসম্বন্ধে আর অন্য কথা কী? এখন সংশয় হইতেছে এই যে যদিও শ্রীত্রিকালগ্রন্থে মায়া ও মিথুন অনাবশ্যক এই কথা বলা হইয়াছে, তথাপি কামনাবদ্ধ জীব আমরা কিছুতেই ঐ কথাতে আস্থাবান হইতে পারি না। আসুন দেখি, প্রাচীন শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন।

ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মধ্যে পদার্থতত্ত্ব-নির্ণয়ে বৈশেষিক দর্শনই সিদ্ধহস্ত। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যগ্রন্থে পৃথিবীতত্ত্ব নিরূপণাবসরে ভাষ্যকার পদার্থধর্মবেত্তা আচার্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—

"শরীরং দ্বিবিধং যোনিজম্ অযোনিজঞ্চ। তত্রাযোনিজং অনপেক্ষশুক্রশোণিতং দেবর্ষিণাং শরীরং ধর্মবিশেষ-সহিতেভ্যোঽণুভ্যো জায়ন্তে। শুক্রশোণিতসন্নিপাতজং যোনিজম্।" বৈশেষিক দর্শন।

কন্দলীকার দার্শনিকপ্রবর শ্রীধর টীকায় বলিয়াছেন;—

'অন্বয়ব্যতিরেকাবধারিতকারণভাবস্য শুক্রশোণিতস্য অভাবে কথং শরীরোৎপত্তিরিত্যত আহ ধর্মবিশেষ-সহিতেভ্যো বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ ধর্ম এব বিশেষঃ ধর্মবিশেষঃ প্রকৃষ্টো ধর্ম-স্তৎসহিতেভ্যোঽণুভ্য ইতি।'

এই সকল শাস্ত্রবাক্য ও শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে শুক্রশোণিত সম্পর্ক ব্যতীতও দেহোৎপত্তি সম্ভব। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন, মৃত্তিকাই জন্ম মৃত্যুর কারণ। শাস্ত্র

বলিয়াছেন—পার্থিব পরমাণুই পার্থিব দেহের কারণ। একই কথা সাধারণতঃ সম্মিলিত শুক্রারম্ভক পরমাণু ও শোণিতারম্ভক পরমাণু জঠরানল সম্পর্কে দ্বণুকাদিক্রমে জীবদেহ গঠন করে। এই দেহের বিভিন্ন প্রকারভেদ হইবার কারণ জীবাত্মার ভোগাদৃষ্ট। অদৃষ্ট অর্থ, ধর্ম ও অধর্ম। মহাপাতকাশ্রিত আত্মা অধর্মবশতঃ যোনি-সম্পর্ক ব্যতীতই পাপময় পরমাণুসংগ্রহ করিয়া দংশী মশকাদি-দেহ তৈয়ার করিয়া লয়। জীবের মঙ্গল সাধনরূপ বিশিষ্ট ধর্মাশ্রিত দেবর্ষিগণের পুণ্যাত্মা ভগবদিচ্ছায় শুক্রশোণিত সম্পর্ক ব্যতীতই সুপবিত্র পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দেহ তৈয়ারী করতঃ তাহার আশ্রয়ে বাস করে। মোটকথা আমরা বুঝিলাম, ধাতুসম্বন্ধ ভিন্নও দেহোৎপত্তি সম্ভব। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক কথা সময়ান্তরে আলোচনীয়। প্রকৃতস্থলে বক্তব্য বিষয় এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে অযোনিসম্ভব তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে তাঁহার শ্রীদেহের উপাদান কী, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীত্রিকালগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পঞ্চমিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর।" শরীর পদটি উল্লেখ করিয়া স্পষ্টই জানাইয়াছেন,—রাধাশ্যাম বীরাকুন্দ ও ললিতা, এই পঞ্চ সম্মিলনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীদেহ হইয়াছে। আর আজ এই শুভ সীতানবমীযোগে অপ্রাকৃত নব শিশুমূর্তিতে শ্রীহরিপুরুষ প্রকাশমান হইলেন, তাঁহার শ্রীদেহের উপাদান কী, গ্রন্থকার "পঞ্চতত্ত্বময়" পদ দ্বারা তাহাই জানাইছেন। গৌর-নিতাই-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধর, এই পঞ্চতত্ত্বের মহামিলনেই শ্রীশ্রীহরিপুরুষের মহাকায় উৎপন্ন হইল। কেহ কেহ আপত্তি তুলিবেন "রাধা-শ্যাম বীরা-কুন্দ ললিতাসুন্দরী" এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, শ্রীদেহতত্ত্ব নহে। গৌর নিতাই অদ্বৈতাদি পঞ্চতত্ত্ব শ্রীহরি-পুরুষের স্বরূপ, সে কথা অত্র ভাষ্যগ্রন্থেও পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় পদের ব্যাখ্যাস্থলে কথিত হইয়াছে। তাহা আবার শ্রীদেহতত্ত্ব হইল কীরূপে? আর যে বস্তু নিত্য, তৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হইল একথাই বা সঙ্গত হয় কীরূপে?

এই আপত্তির উত্তর দিতেই হইবে। কারণ একটু পূর্বে বলিয়াছি, পঞ্চতত্ত্বময় পদ দ্বারা স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, আবার এখনই যদি বলি, উক্ত পদ দ্বারা শ্রীদেহতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাষী পাগল সাব্যস্ত হইব। কারণ, মানুষ জানে স্বরূপ-অর্থ যাহা চিরকাল স্থির থাকে, আর রূপ-অর্থ যাহা স্বরূপের আবরণ—কিছু সময়ে স্বরূপটি যে আশ্রয়ে বাস করে। কিন্তু এই ধারণা লইয়া যদি মানুষ অগ্রসর হয় "তবে কেবল মাদৃশ অজ্ঞকে নহে, সুপ্রজ্ঞাসতী শ্রুতিদেবীর উক্তিকেও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে হইবে। কারণ দেখুন শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং
পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং
সমরুদ্‌গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।" (পূর্বতাপনী) ৩৫।

ব্রহ্মা বলিতেছেন 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে সতত বিরাজমান। তিনি পঞ্চপদাত্মক। আমি মরুদ্‌গণের সহিত উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করি।'

প্রথম কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণরূপই ধ্যানধারণার মঙ্গল অর্থাৎ শোভন ও সুন্দর বিষয়। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তাকর্ষক সর্বকারণের কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ। কিন্তু রূপ-

সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই যে, তাহা নশ্বর। সেই রূপ যদি না থাকে তবে কোন্ বস্তুতে চিন্তা -ধারণা করিবে? শ্রুতি তাই বলিয়াছেন; 'বৃন্দাবনে বৃক্ষমূলে সতত বিরাজমান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।'

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটি ধ্যান না করিয়া বিগ্রহ অর্থাৎ দেহটি ধ্যান করিলেন কেন? যাহা বিগ্রহ তাহা সৎ বা সতত বিরাজমান কী করিয়া হয়? আর তাহা না হইলে একটি অনিত্য বস্তু ব্রহ্মার সতত ধ্যানধারণার বিষয়ই বা কী করিয়া হয়?

শ্রীএকাদশ স্কন্ধোক্ত একটি শ্লোক স্বামিপাদ শ্রীধরের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া পরে রহস্য বলিব।

"লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকম্।।" ভা. ১১/৩১/৬

শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী-যোগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই স্বশরীরে সুমঙ্গল স্বীয়ধামে গমন করিলেন। ভাবার্থদীপিকায় শ্রীপাদ শ্রীধর লিখিতেছেন—

"যোগিনামিব স্বচ্ছন্দোমৃত্যুভ্রমং বারয়তি লোকাভিরামমিতি। অয়মর্থঃ—যোগিনো হি স্বচ্ছন্দো-মৃত্যবঃ... ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধামং বৈকুণ্ঠাখ্যম্ আবিশৎ। তত্র হেতুঃ। লোকাভিরামঃ অভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাঃ তাম্ জগদাশ্রয়ত্বেন জগতোঽপি দাহপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। কিন্তু ধারণয়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ম্ ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং স্যাৎ দৃশ্যতে চাদ্যাপ্যুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপসাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ" (শ্রীমদ্ভাগবত)।

শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, এই শ্লোকে যোগীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দমৃত্যু নিষেধ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, যোগীগণের মৃত্যু ইচ্ছাধীন; তাঁহারা আগ্নেয়ী-যোগ ধারণ দ্বারা নিজতনু দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহা করেন না। তিনি দগ্ধ না করিয়া নিজতনুসহ স্বধামে গমন করিলেন। কারণ সেই তনুতে সর্বতোভাবে লোকসকলের স্থিতি; সুতরাং যাহা জগতের আশ্রয় তাহা দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ উপস্থিত হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের রূপ জীবের ধ্যানধারণার সর্বোত্তম বস্তু। অদ্যাপি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহা লাভ করেন। সেই শ্রীদেহের নির্বিষয়তা আপত্তি হয়।

পরিব্রাজক-চূড়ামণি সরস্বতী শ্রীপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন—

"অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্ত-জগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তীবলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীববিকলং তাপত্রয়েণানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা।।" চন্দ্রামৃত ১৭

সমগ্র জগতের অন্ধকার দূরকারী, রসসমুদ্রের উদ্বেলয়িতা, ত্রিতাপনাশী, বিশ্বশীতলকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অঙ্গচ্ছটা তোমাদিগের হৃদয়ে সতত প্রকাশিত হউক এই বলিয়া আচার্যপাদ শিষ্যবর্গকে আশীর্বাদ করিতেছেন। এই শ্রীদেহচ্ছটা যদি অনিত্য হয়, তবে শ্রীগৌররূপের সতত ধ্যানের বিষয়ের নির্বিষয়ত্বাপত্তি হয়। এখন দেখুন, স্বরূপ ও দেহ সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা,

তাহা লইয়া বিচার করিলে স্বামিপাদ শ্রীধর ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দকেও বিরুদ্ধভাষী পাগল বলিতে হয় কিনা।

আসল রহস্য এই যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষের রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই। শ্রীহরিকথায় আছে "স্বরূপ রে সে রূপ রে।" শ্রীত্রিকালগ্রন্থে "পঞ্চ মিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর" এই স্থলে শরীর পদটি দ্বারা এই কথা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্।
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"

শ্রীগৌরহরির অমিয় অঙ্গে রাধা-শ্যাম দুই মিলিত। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর শ্রীদেহ অযোনিসম্ভব। উহা নিত্যধামের নিত্যসিদ্ধ পঞ্চ বিগ্রহ হইতে উৎপন্ন। এই উৎপত্তির আশ্রয় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর অঙ্গজ্যোতি। তথা শ্রীহরিপুরুষের শ্রীদেহ গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—এই পঞ্চতত্ত্বময়। তথাহি শ্রীমহানামগ্রন্থে—

"অদ্বৈত গৌর গদাধর শ্রীবাস নিত্যানন্দ।
পঞ্চতত্ত্বময় বন্ধু—আনন্দকন্দ।।"
"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বময় স্বরূপ।"
"মধুর পঞ্চতত্ত্বময়রূপ প্রেমরসখনি।"
"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।।"

"গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বলিলে সবই বলা হয়।" এই হরি-শব্দবাচ্য পুরুষ যিনি তিনিই হরিপুরুষ। তাঁহারই প্রকাশ নাম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। তথাহি শ্রীত্রিকালগ্রন্থে—'হরিনাম—প্রভুজগদ্বন্ধু।।"

"রূপে"—

অধর যিনি, তিনি আজ ধরা পড়িতে ধরায় আসিলেন। অরূপ যিনি, তিনি আজ রূপ লইয়া আসিলেন রূপের দেশে। প্রবন্ধকার তাই "রূপে" প্রয়োগ করিয়াছেন।

তথাহি পাদ্মে—

"অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অকর্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে।।"

বেদ পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি যাহাকে অকর্তা বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, সেই এই ভগবান্ হরি ঈশ্বর, অনাম এবং অরূপ। তথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামসৌ প্রকীর্তিতাঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাব্দপোহসাবুদীর্যতে।।"

রসিক-রঙ্গদা টীকা বলেন, অপ্রসিদ্ধেঃ অনন্তত্বেন সম্যক্ বক্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। গুণ ও নামের অনন্তত্বপ্রযুক্ত এই হরি অনাম, তথা রূপের অপ্রাকৃতত্বহেতু অরূপ-নামে কীর্তিত হইয়াছেন।

প্রকৃতির সম্বন্ধ হেতু হরির কর্তৃত্ব নাই, এই কারণে শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ হরিকে অকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্তৃতা।
অকর্তারমিতি প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ।।"

অতএব এই যে অরূপ বা অপ্রাকৃত-রূপ শ্রীহরি গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দীননাথের অঙ্গে উদিত হইলেন, প্রাকৃত জীব তাঁহাকে দেখিতে পাইল কী করিয়া? ঐ যে শ্রীরূপ উত্তর দিয়াছেন—

"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব-শক্ত্যা স্বেচ্ছা-প্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ।।"

.তিনি নেত্রের বিষয় নহেন। স্বেচ্ছা প্রকাশিকা স্বয়ং প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নেত্রের বিষয় হইয়া থাকেন। অতএব কৃপাশক্তি দ্বারা লোকলোচনের দর্শন-পথগত হইলেন। "রূপে" শব্দটির দ্বারা গ্রন্থকার ইহাই জানাইয়াছেন।

নয়ন মেলিয়া দীননাথ দেখিলেন, বাহিরের আলো ভিতরের আলো এক হইয়া গিয়াছে। ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাধিষ্ঠিত চন্দ্র সূর্য ও অগ্নির কিরণ মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া একটি দিব্য লাবণ্যময় নিরুপমকান্তি শিশু কোলের উপর দুলিতেছে। দীননাথ অনুভব করিলেন, পরশে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুলক শিহরণ খেলিতেছে। দীননাথ পণ্ডিত, আত্মসংহরণ করিবার চেষ্টা করিয়া "এই নেও" বলিয়া বামাদেবীর কোলে প্রত্যর্পণ করিতে করিতে দেখিলেন—আলোক ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, অঙ্গগন্ধে গগন পবন আমোদিত। অপার্থিব পরশে বামাদেবীর চক্ষু খুলিয়া গেল। লাবণ্য আভায় অন্তর বাহির প্রভাময় হইয়া গিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান মাত্রও নাই, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে উচ্ছলিত সিন্ধুর মত শ্রীমুখদর্শনে বাৎসল্যরস-সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অমনি কত না সোহাগে আদরের ধন বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তে দেহমনঃপ্রাণ সুশীতল হইল। কি ছার মলয়চন্দন! এ পার্থিব জগতে সে স্পর্শের তুলনা কোথায়? সতত মায়াময় বস্তুস্পর্শে আমাদের দেহ ব্যাধিময়, তাই অপ্রাকৃত সে স্পর্শের অনুভব নাই। আজ সুনির্মল সুরধুনী ধারার মত মধুর বাৎসল্য-রসসিঞ্চনে বামাদেবীর হৃদয়খানা সরস সুন্দর; তাই ঐ স্পর্শমাত্র আনন্দ-স্পন্দনে দুলিতে লাগিল।

ভক্ত গাহিয়াছেন—

"ছোঁয়া ছুঁইর ব্যাধি যাবে যবে তোর
বুঝিবি ও' ছোঁয়ার মরম।
ছোঁয়ার আরাম আনন্দ-স্পন্দনে
দুলিছে বন্ধুর ধরম।।"

"আবির্ভূত হইলেন।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন;—

"এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।"

শ্রীল শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে বলিলেন—

"সম্ভূতং।" স্বামিপাদ শ্রীধর টীকায় লিখিলেন—'সুনিষ্পন্নং।'

শ্রীরূপ লিখিলেন, "অর্থঃ সম্ভূতমিত্যস্য সম্যক্ সত্যমিতিরীতঃ" সম্ভূত অর্থ সম্যক্ সত্য। মূঢ়বুদ্ধি অজ্ঞ আমি, আবির্ভূত অর্থে কী লিখিব ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

যাহা ছিল, তাহা প্রকাশ হইল! না, তাহাও নহে। কারণ, যদি ছিল, তবে প্রকাশ হয নাই কেন?

যাহা ছিল না, তাহাই প্রকাশ হইল! না, তাহাও নহে। কারণ, যাহা ছিল না, তাহা প্রকাশ হইল কোথা হইতে?

"জগৃহে পৌরুষং রূপং" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকপাদের সারার্থদর্শিনী টীকা শুনুন। এই টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ, যিনি টীকারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

"নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যং ধাম্নি নিত্যে ভজামঃ।।"

নিত্য ধামের সেই নিত্যানন্দাদ্বৈতযুক্ত নিত্যমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে যিনি নিত্যকাল ভজনা করেন, সেই বিশ্বনাথ "রূপং জগৃহে" পদের টীকা করিতে গিয়া চিন্তায় পড়িলেন। 'রূপং জগৃহে' পদের অর্থ 'রূপ গ্রহণ করিলেন'। প্রথমে পূর্বপক্ষ তুলিয়াছেন—

"ননু জগৃহে ইতি চেদুচ্যতে তর্হি তদ্রূপং পূর্বং নাসীদিত্যবগত্যা তদ্রূপস্যানিত্যত্বং প্রসক্তম্।" ওহে, পুরুষ রূপ গ্রহণ করিলেন, এই কথা যে বলিলেন তাহাতে সেই রূপটি পূর্বে ছিল না, আজ হইল, এই প্রকার অর্থ হওয়াতে সেই রূপটি অনিত্য হইয়া পড়িল যে! "অত অহি সম্যগ্ভূতং পরমসত্যং পূর্বপূর্বমপি সদৈব স্বরূপেণ স্থিতমেব তৎ জগৃহে, লোকসৃষ্ট্যর্থমুপাদত্ত গ্রহণস্য বিদ্যমানবস্তুবিষয়ত্বাৎ। ঘটস্যাবিদ্যমানত্বে ঘটং জগ্রাহ ইতি প্রয়োগদর্শনাচ্চ।"

উত্তর শুন। তাহা ছিল না, তাহা নহে। পরম সত্য সেই রূপ ইতঃপূর্বে সদ্রূপে স্বরূপে স্থিত ছিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। যদি বলি তিনি ঘট গ্রহণ করিলেন, তবে কি বুঝিবে ঘট ছিল না, তখন তখন তৈয়ারী করিয়া গ্রহণ করিলেন, নাকি সত্য বিদ্যমান ঘট, তাহাই গ্রহণ করিলেন?

বেশ! তবে, তাহাই যদি হইল, তবে এতক্ষণ জন্মরহস্য বলিলে কি? গাভীর অশ্রু ও চাঁদের সুধা আশ্রয় করতঃ যে পরম লাবণ্যময় শিশুটি সুরধুনীতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে মধুর মধুর পিতৃশান্তভাববিগ্রহ দীননাথের ক্রোড়দেশটি আলোকিত করিলেন, তিনি এমনি ছিলেন তবে আজ নূতন হইল কী? আসুন তবে আবার বিশ্বনাথের ভাষায় উত্তর শুনুন। "রাজা সেনান্যং দিগ্বিজিগীষয়া স্বসঙ্গে জগ্রাহ ইতিবৎ।" রাজাও আছেন, সৈন্যসামন্তও আছে, রাজার দিগ্বিজয় ইচ্ছাও সতত হৃদয়ে আছে। এই একরূপ থাকা; আজ কিন্তু আর এক রকম নূতন-থাকা হইল;

সৈন্যসামন্ত, অশ্ব-গজ-রথ-রথী স্বসঙ্গে লইয়া রাজা আজ দিগ্বিজয় আশায় সত্যি সত্যি বিদেশী রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয় জয় রব পড়িয়া গেল, এখানে ওখানে বিজয় নিশান উড়িতে লাগিল। "আভির্ভূত হইলেন" অর্থ এই, সর্বতত্ত্বময় হরি ছিলেন ও আছেন, তাঁহার এই নিত্য শিশুমূর্তি নিত্যে নিত্যকাল ছিলেন ও আছেন, তাঁহার জগদুদ্ধারণ ইচ্ছা ছিল ও আছে, শ্রীদীননাথ-বামাদেবী ছিলেন ও আছেন, গঙ্গাদেবীও ছিলেন ও আছেন; তবে আজ এই শুভ সীতা-নবমীযোগে কী হইল? ভক্তগণ অনুভব করিয়া লউন, আমার আর বলিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব

এই অপূর্ব রহস্যময়ী জন্মকথা শ্রবণ করিয়া সংশয়োদয় মানবচিত্তে স্বাভাবিক, কারণ আমাদের দৈনন্দিনদৃষ্ট ঘটনাবলী হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রমাণ কী বা সাক্ষী কে এইরূপ জিজ্ঞাসা নিতান্ত অযৌক্তিকর নহে। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ভক্ত আছেন। প্রথম শ্রেণীর ভক্তগণ অতি উচ্চাধিকারী। "তুমি প্রভু আমি দাস"—এ ছাড়া তাঁহাদের মুখে আর কোন ভাষা নাই, মনে কোন সংশয় নাই, হৃদয়ে কোন প্রশ্ন নাই, তারা সুন্দর সরল। একমাত্র মহানামই তাঁহাদের সম্বল। এই ভক্তগণের শ্রীচরণধূলি আমাদের শিরোভূষণ। ইঁহাদের কিছু জানিবার দরকার নাই; জানাইবার দরকার নাই; বুঝিবার দরকার নাই, বুঝাইবার দরকার নাই। কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোনও প্রয়াস নাই, ভাষ্যকারেরও কোনও আয়াস নাই। কেবল করপুটে কৃপাভিক্ষা ছাড়া আর ইঁহাদের নিকট আমাদের অন্য নিবেদন নাই।

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারাও প্রভুগতপ্রাণ—কিন্তু অত সুন্দর হইবার সৌভাগ্য তাঁহারা লাভ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে 'যদিও নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন "শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি কী?" তথাপি আবার শ্রীহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন "ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে।" শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য।" অতএব আমরা তাঁহাকে জানিব একমাত্র তাঁহারই অযাচিত কৃপা হইতে, কিন্তু আস্বাদন করিব সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত হইতে। শ্রবণ-মঙ্গল তাঁরই কথাগাথা আমরা আলোচনা করিব তাঁহারই সাধের উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি লইয়া। অমৃত তিনি, তাঁহাকে অনুভব করিব ছানিয়া; মধুসিন্ধু তিনি, তাঁহাকে আস্বাদন করিব ডুবিয়া, ভাসিয়া, হৃদয় ভরিয়া; সংশয় সন্দেহ যত হৃদয় হইতে দূর করিয়া, বিচারালোকে উদ্ভাসিত হইয়া।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণের জন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রমাণের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তবে কতকগুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইব বা কাহারও তত্ত্বনির্ণয়ে সহায়ক হইব এই আশায় এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। তবে শ্রবণের পর মননের বিধান যখন শ্রুতিতেই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই প্রকার মননের ফলে সেই মনোমোহনের মোহন মাধুর্য কিঞ্চিন্মাত্রও যদি অনুমিত হয়, তবে এই মরদেহেই অমৃতত্বলাভে কৃত-কৃতার্থ হইব, ইহাই চিরন্তন আশা।

অনুমানাদি প্রমাণের কথা গ্রন্থকার "জন্য" "অমিয়" প্রভৃতি পদ প্রয়োগ দ্বারা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। 'শ্রুত আছি' পদের দ্বারা শ্রুতি বা শব্দ প্রমাণের কথা স্পষ্টতরই বলিয়াছেন। কারণ তর্কাদির অগোচর এই সকল অবিচিন্ত্য তত্ত্ব একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ বলেই জ্ঞাতব্য। গোস্বামিপাদ শ্রীল রূপ গ্রন্থ প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

"নির্বন্ধং যুক্তিবিচারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেযু শব্দ এব প্রমাণ্যতে।।"

"আমি যুক্তিবিচার বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রমাণ সকলে শব্দের প্রধানত্ব হেতু শব্দকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছি।" কারণ জীব মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটি দোয আছে। অতএব অলৌকিক অবিচিন্ত্যস্বভাব বস্তু স্পর্শে অযোগ্যত্ব হেতু পুরুযকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টারূপ অষ্টবিধ প্রমাণ দোযযুক্ত। অতএব ইহারা পরমার্থ প্রমাকরণ হইতে পারে না। অতএব প্রমাণ কী? শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভকার লিখিতেছে—

"অনাদিসিদ্ধসর্বপুরুযপরম্পরাসু সর্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানত্বাৎ অপ্রাকৃত-বচন লক্ষণো বেদ এব অস্মাকং সর্বাতীত-সর্বাশ্রয়-সর্বাচিন্ত্যাশ্চর্যস্বভাবং বস্তুবিদিযতাং প্রমাণম্।"

সর্বাশ্রয়, সর্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানাভিলাযী আমাদিগের প্রমাণ, সর্বজ্ঞান নিদান বেদ। এই বেদের লক্ষণ কী? গোস্বামীপাদ শ্রীজীবের ভাযায় "অপ্রাকৃত বচন লক্ষণো বেদঃ।" যে শব্দরাশি অপ্রাকৃত অতএব ভ্রমপ্রমাদাদি প্রাকৃত দোয বিরহিত তাহাই বেদ। সেই বেদই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। গোস্বামিপাদের লক্ষণানুসারে ঋগাদি চারি সংখ্যাতেই বেদকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যে শব্দরাশিতে প্রাকৃত ভাবের স্পর্শমাত্র নাই তাহাই বেদ, তাহাই আপ্তবাক্য, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বেদান্ত সূত্রকর্তার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে শাস্ত্র শব্দের তাৎপর্যও ইহাই। শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধুহরি এই নবযুগে আরও "পঞ্চগ্রন্থ"কে বেদতুল্য বা তদপেক্ষা অধিক পূজ্য বলিয়াছেন। তদপেক্ষা অধিক বলিলাম, কেননা, শ্রীগীতাগ্রন্থে "যাবানর্থ উদপানে" শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদে নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীপঞ্চগ্রন্থের আশ্রয় চিরকালই গ্রহণীয়। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' স্বয়ং বুকে করিয়া রাখিতেন। কারণ উক্ত শ্রীগ্রন্থ "পঞ্চগ্রন্থের" অন্যতম। অপর চারিখানির নাম যথাক্রমে "**শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি**"। অল্পকথায় যাহা কর্মফলভোগী শরীরধারী জীবরচিত,নহে তাহাই অপৌরুযেয় বেদ। অবতার পুরুষের বাক্য, ভক্তজনের বাণী সবই বেদ। কারণ তাহা প্রমাদাদি দোষদুষ্ট নহে।

শ্রীশ্রীগীতা যেমন শ্রীপদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিঃসৃতা বলিয়া প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম, শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকও তেমনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মুখপদ্ম বিগলিত বলিয়া অপ্রাকৃত শাস্ত্র-শিরোমণি। শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধুহরির শ্রীহস্ত লিখিত শ্রীগ্রন্থরাজি ও শ্রীমুখোক্ত মহাবাণী সমূহ অপ্রাকৃত মহামহাবেদ। তাই শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ কল্পে উক্ত গ্রন্থরাজিকে 'ভগ্নি' সম্বোধনে এই দেখুন কী বলিতেছেন।

"জয় বিদ্যানিষ্ঠা সতী উদ্ধারণ গ্রন্থ কুলরাণী।
মহাধর্ম মহাউদ্ধারণ প্রভুলেখনী ভগিনী।।
পরাতত্ত্ব সুধাসরিৎ ও রাঙ্গা পায়ের ঘামে জানি।
কুমারীভাব-কল্লোল তুলে কাঁদাও কত বেদবেদান্তে ধ্বনি।।"

"শ্রুত আছি" বলিয়াও এই মহাবেদ মহাপ্রমাণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবন্ধুর মুখারবিন্দ-বিগলিত অমিয়বাণী ও শ্রীলেখনীপ্রসূত উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি ও শ্রীশ্রীবন্ধুলীলাসরসীতে সন্তরণকারী ভক্তবৃন্দের বাক্য-সুধা-লহরী, শ্রীশ্রীপঞ্চগ্রন্থ ও শ্রীদশমস্কন্ধ ইহাই বন্ধুভক্তগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কেবল এই জন্মরহস্য বিচারে নহে। যাবতীয় লীলাতত্ত্বের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে ইহা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এই সুদৃঢ় আশ্রয়ে স্থিত হইয়া স্বকীয় অনুভূতি বলেই তিনি এই অপূর্ব রহস্যময়ী জন্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ইহা অভ্রান্ত।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে ঐ সকল গ্রন্থরাজির ভাব ভাষা শ্রীমুখের বাক্‌চাতুর্য ও অধিকারী ভক্তজনের ভক্তী ও ইঙ্গিত বুঝিবার মত অধিকারী সাধারণ জীব নয়। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রের প্রথম পদটি 'অথ'। তাহার শারীরিক ভাষা বা শ্রীভাষ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিলে আমরা উক্ত অধিকারীর কী কী গুণ থাকা আবশ্যক জানিতে পারিয়া আপনাদিগকে বেশ অনধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারি। এইরূপ অনধিকারীর সংখ্যাই জগতে অধিক। মনে করিবেন না কেবল পাণ্ডিত্য হইলেই শাস্ত্র পাঠে অধিকারী হয়। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ বেদের এই ষড়ঙ্গ। এই ষড়ঙ্গ যথাযথ আয়ত্ত করিয়াও শাস্ত্রে অধিকার হয় না। তাই পরম কারুণিক জৈমিনি ঋষি অনন্য সাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দিয়া মীমাংসা নামক একখানি দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনের সম্যক্ জ্ঞান না লইয়া বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে সূক্তের পর সূক্তে, মন্ত্রের পর মন্ত্রে এত বিরুদ্ধ ভাবের কথাদৃষ্ট হইবে যে ভক্তি সহকারে বেদপাঠ করা আর ভাগ্যে ঘটিবে না। মহর্ষি জৈমিনি ঐ সকল আপাত বিরোধী বাক্যাবলী যেরূপ সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়াছেন তাহা দেখিলে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয় এবং উক্ত ঋষিবরের নিকটে আমরা যে কত ঋণী ভাবিয়া প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়। কিন্তু এখন দুঃখের কথা এই যে বেদ চতুষ্টয়ে প্রবেশপথে মন্ত্র সমূহের আপাত-বিরোধীরূপ যে কণ্টক ছিল, মুনিশ্রেষ্ঠ জৈমিনি স্বকীয় মীমাংসাসূত্র দ্বারা তাহা দূর করিয়া সহজ সরল ও সুগম করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু শ্রীজীবের সংজ্ঞানুসারে যে সকল উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি বা মহাবাণী সমূহের বেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি, তাহাতে মাদৃশ অনধিকারী জীবের প্রবেশ পথে যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করিবার জন্য আর একখানি মীমাংসা দর্শনের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাই সুনির্মল ধর্মে নানা প্রকার আবিলতা প্রবেশ করিবার অন্যতম কারণ। প্রত্যেক ধর্মই ধর্মযাজকগণ কর্তৃক প্রচারিত হয়। এই প্রচারকগণ প্রায়শঃ অতি উচ্চাধিকারী থাকেন। কাজেই পরবর্তী লোক প্রচারকগণের আপাত বিরোধী বাক্যাবলীর সমাধান করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়। অতএব প্রত্যেক ধর্মের তদ্ধর্মোপযোগী মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীশ্রীভক্তি গ্রন্থরাজির অধিকারীর কথা বলিতে গিয়া প্রভুবন্ধু কহিয়াছেন—

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে।
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভাব সুনির্মল রে।।"

বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি লইয়া শান্ত সুনির্মল ভাবে ডুবিয়া ভক্তি শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অন্যত্র একটি ভক্তকে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পাঠ করিতে বলিয়া তাহাতে অধিকারীর কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিও।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ করিও।।"

এই কথা লিখিয়াই, কী হইলে তাহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকারী হইবে, বলিতেছেন। যথা—

"হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও।
স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও।
গৌর-গদাধর ধ্যান করিও।।"

এইরূপ অধিকার হইলে তবে ভক্তিশাস্ত্রের রসমাধুর্য উপভোগ করিতে পারা যায় ও নানাপ্রকার আপাতবিরোধী বাক্য সমূহের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ অধিকারী নহি। অথচ শ্রীশ্রীভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিবার বাসনাও আছে কাজেই আমাদের অবস্থা সেই কবির ভাষায় বলিলে—

"নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।।"

কাজেই পদে পদে পদস্খলন সম্ভাবনা। আমি মূঢ়বুদ্ধি অজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিত। তথাপি কৃপা আজ্ঞা শিরোধারণ করত এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞ বান্ধবগণ অজ্ঞ বলিয়া কৃপাবর্ষণ করতঃ ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিলে ধন্য হইব।

মহর্ষি জৈমিনি প্রবর্তিত বিচার-প্রণালী এই রূপ—

তিনি সর্বপ্রথমে ধর্মের একটি সংজ্ঞা করিয়াছেন, এবং সমগ্র বেদের সেই ধর্মে প্রমাণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "চোদনালক্ষণো ধর্মঃ।" ইহাই জৈমিনি কৃত ধর্মের লক্ষণ। চোদনা অর্থ প্রবর্তনা। গায়ত্রী মন্ত্রে "প্রচোদয়াৎ" পদেও এই প্রবর্তনার কথা বলিয়াছেন। সেই কর্ম-প্রবর্তনা যাহাতে আছে তাহাই ধর্ম; এবং এই কর্মপ্রবর্তনা যে মন্ত্রে আছে তাহাই ধর্মে প্রমাণ। বেদে তাহা আছে অতএব বেদ প্রমাণ। কিন্তু এইরূপ যুক্তির মধ্যে ভুল থাকিল। কারণ বেদের সমস্ত ঋকের মধ্যে এই প্রবর্তনা-লক্ষণ নাই, বরং বিপরীত রূপ আছে। কর্মকাণ্ড হইতে একটি দৃষ্টান্ত বলিব। "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" স্বর্গ-কামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। এইটি বিধিবাক্য, ইহাতে কর্মপ্রবর্তনা আছে ও ইহা স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ ধর্মের উপযোগী অতএব জৈমিনি লক্ষণানুসারে ধর্মে প্রমাণ।

কিন্তু "তরতি মৃত্যুং তরতি পাপ্‌মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে। য উ চৈনং বেদেতি"—যে এই যজ্ঞের বিষয় জানে তাহারও পাপমুক্তি ও মৃত্যু জয় হয়। এই

শেষোক্ত বাক্যটিতে কোনও কর্মচোদনা নাই বরং বিরোধ আছে। তাহা এই, কেবল মাত্র অশ্বমেধের বিধান গুলি জানিলেই যদি পাপ মুক্ত হওয়া যায় তবে তদনুষ্ঠান হেতু প্রযুক্ত বিধান সমূহ বৃথা হইয়া যায়। কারণ শুধু জানিলেই যদি অনুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায় তবে কোন্ অজ্ঞ ব্যক্তি অত কষ্ট করিয়া নানাবিধ ক্লেশকর যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকায় ও কর্ম প্রবর্তনা না থাকায় এই বাক্যটি প্রমাণ হইতে পারে না। অথচ ও কথাটিও শ্রুতিতেই আছে। মীমাংসা দর্শনকার তাই ঐরূপ বাক্য সমূহের সম্বন্ধে এইরূপে প্রামাণ্য সমাধান করিয়াছেন, যথা—

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।"

এইরূপ বাক্যাবলী বিধিবাক্য নহে অর্থবাদ বাক্য। বিধিবাক্য যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্মে প্রমাণ, অর্থবাদ বাক্য সেরূপ নহে। বিধিবাক্যের সঙ্গে একবাক্যতাপন্ন হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধেই তাহাদের প্রামাণ্য। অর্থবাদ প্রধানতঃ বিধি স্তুতিতেই নিয়োজিত। "যস্তুয়তে তদ্বিধীয়তে" এই ন্যায়ানুসারে ফলবলাৎ তাহা প্রমাণতা হয। স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবে এই বাক্যে প্রকৃষ্ট প্রামাণ্য আছে, পরবর্তী অর্থবাদটি এই যজ্ঞের স্তুতিতে পর্যবসিত। স্তুতি শুনিয়া মানুষের যজ্ঞে প্রবৃত্তি হইবে, এই জন্যই জানিলেই স্বর্গ হইবে এই বাক্য দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়াছেন এইরূপ অর্থবাদ বাক্যের **আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না**। যে তাৎপর্য লইয়া ঐ কথাটি উক্ত হইয়াছে তাহাই বুঝিয়া উহার প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অতএব জৈমিনি মতে বেদত্ব পুরস্কারে প্রমাণতা স্বীকার না করিয়া কর্ম প্রযোজকত্বরূপে কাবণতা স্বীকার করিয়া বিধিবাক্য সমূহের প্রামাণ্য ও স্তুতিরূপে একবাক্যতা প্রাপ্ত অর্থবাদ বাক্যের পরম্পরা সম্বন্ধে প্রামাণ্য হইবে।

আক্ষরিক অর্থ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বুঝিলে অর্থবাদের প্রমাণতা থাকে না। আমাদিগকে মহর্ষির এই প্রণালী অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে। প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য বিচারে ধর্মই আলোক স্বরূপ। এই ধর্ম কী? মহর্ষিকৃত ধর্মের লক্ষণ বলিয়াছি। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন প্রকারে ধর্মের লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুও পর পর ধর্মের তিনটি লক্ষণ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে, ধর্ম যখন একই চিরন্তন সত্য, তখন তাহার লক্ষণ পরিবর্তন হইবার কারণ কী? এটি আলোচনীয় বিষয় বটে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। সময়ে স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে অল্প কথায় বলিতে হইলে আসল কথাটি এই যে—ধর্ম চিরন্তন সত্য, তাহার মূর্তি চিরকালই একরূপ, তবে প্রকাশের তরতমতা ভেদে বহুরূপ মনে হয় ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগধর্ম কীর্তিত হয়। যখন যেরূপ যুগ, ধর্মকে মানুষ তখনকার মত করিয়া দর্শন করে। কাজেই তৎতৎ সময়ের যাবতীয় বিষয় তৎতৎরূপ ধর্মের বর্তিকা লইয়া বিচার করিতে হয়।

অতি সহজেই বোঝা যায় যে জৈমিনিকৃত "চোদনা লক্ষণঃ ধর্মঃ" লইয়া বিচার করিলে শ্রীমদ্ভাগবতখানি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কারণ, সেখানে কোনরূপ কাম্যকর্মের বিধি নাই। অতএব বৈদিকযুগ ছাড়িয়া পুরাণের যুগে আসিলে ধর্মের লক্ষণান্তর করিতে হইবে। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর প্রথম লক্ষণ "ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ" ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-যুগপক্ষে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাবের

পূর্বকাল পর্যন্ত শাস্ত্র বিচারে "**ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ**"। তারপর শ্রীমন্মমহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত—শাস্ত্রবিচারে—"ধর্ম উদ্ধারণ" আর বর্তমান যুগে—শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর আগমনকাল হইতে "মহাধর্ম মহাউদ্ধারণ"। এই আলোকে যাবতীয় বস্তুতত্ত্বের বিচার করিতে হইবে। যেখানে যে মানুষে, যে কথায়, যে ব্যবহারে জগৎকল্যাণকর মহাউদ্ধারণ ভাব দেখিব, বর্তমান যুগে আমরা তাহাকেই মহাধর্ম মানিব ও মহা প্রমাণ রূপে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। ভক্তগণের মুখের যে কথা বা শ্রীশ্রীবন্ধুর শ্রীমুখের যে মহাবাণী উক্ত মহাধর্মানুকূল তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই প্রণালী অবলম্বনে আমরা বর্তমান যুগের যাবতীয় বিষয়ের সত্যতা, গভীরতা ও অলীকতা অনুমান করিয়া লইতে পারিব।

এবার এই মহাধর্মের আলো আমরা জন্মরহস্যের তত্ত্বানুশীলনে প্রয়োগ করিব।

"আমি অযোনি-সম্ভব।
আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ?"

এই মহাবাক্য দুইটি একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু নিজ শ্রীমুখে অতি উদাত্তস্বরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। এই মহাবাক্য দু'টি মহামহা প্রমাণ। কারণ, মহাধর্ম স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভু বন্ধুর মহামহাতত্ত্ব এই বাণী দু'টির মধ্যে নিহিত আছে। ইহার প্রত্যেকটি বর্ণ সার্থক ও সপ্রয়োজন, একটি অর্দ্ধমাত্রাও নিরর্থক নহে। ইহাই প্রমাণ বাক্যের স্বরূপ। এই চাবি লইয়া সমস্ত বাণী সমূহের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তারপর তদতিরিক্ত বাণী সমূহকে অর্থবাদ স্বীকার করিয়া, প্রমাণ বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য অর্থ বক্তার ইচ্ছা। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ না লইয়া বক্তার মনোগত ভাব বুঝিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে। কারণ আক্ষরিক অর্থ লইলে সমাধান করিতে না পারিয়া মহাসমস্যায় পড়িতে হইবে। যেমন একদিন শ্রীমুখে দেবী দিগম্বরীকে শ্রীবামাদেবীর হাতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ হাত দিয়া জন্মিয়াছি।" এই বাক্যকে অর্থবাদ বলিতেই হইবে।

"আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ!" অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, এই প্রমাণ বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে প্রমাণতা দেখানো ছাড়া আর উপায় নাই, প্রভু অযোনি-সম্ভব, এইটি মহাতত্ত্ব কথা। ঐ হাতের কথা দ্বারা এই ভাবটিরই পরিপোষণ করিয়াছেন। প্রভুর সঙ্গে যে মায়িক জীবের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি যে মায়াধীশ, এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগিলে, তবেই সাধ্য সাধনতত্ত্ব স্ফূর্তি পায়। এই বাক্যের স্তুতিরূপে অন্য বাক্যগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। যে বাক্যের আক্ষরিক অর্থ লইলে ঐ ভাবটি পরিপুষ্ট হয়, সেইটির আক্ষরিক (literal) অর্থ লইব, যাহার ঐ প্রকার অর্থ লইলে হানি হয়, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিব।

শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মরহস্য তত্ত্ব আমরা দুই প্রকারে জানিতে পারি। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীলেখনী ও মহাবাণী, দ্বিতীয়তঃ শ্রীল অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়ের বাক্যাবলী। প্রথমতঃ শ্রীপ্রভুর কথা বলিয়া পরে চম্পটী ঠাকুরের কথা আলোচনা করিব।

১। শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরচিত শ্রীগ্রন্থ রাজির মধ্যে **'চন্দ্রপাত'** সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে "চন্দ্রপাতকে কীর্তন কহে" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়া উহা যে একমাত্র কীর্তনীয় তাহা জানাইয়াছেন।

অন্য কোন গ্রন্থের প্রশংসা গ্রন্থান্তরে করেন নাই। এই চন্দ্রপাত গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় কীর্তনকে সংকীর্তন লিখিয়া ও তৃতীয়টিকে মহাকীর্তন লিখিয়া তাহার সর্বশ্রেষ্ঠতা ও মহা প্রমাণতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই মহাকীর্তনের দ্বিতীয় পংক্তিতে আপনাকে **'চন্দ্রপুত্র'** বলিয়া সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি যে দীননাথ ও বামাদেবীর পুত্র নহেন, তাহারা বাৎসল্য রসাভিষিক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে ভজন করিয়াছেন মাত্র, আপনাকে চন্দ্রপুত্র বলিবার ইহা প্রধানতম উদ্দেশ্য, একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে।

২। শ্রীশ্রীহরিকথা মহাউদ্ধারণ গ্রন্থে একথা নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন। সেই গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন—

"ঐ ঐ প্রলয় হয় ভ ভ ভয় কয়।
গো গো হাম্বা রয় যায় হায় বিনয়।।"

ঐ পংক্তিদ্বয়ে ভাবী প্রলয় দর্শনে ভীত হইয়া গাভীর কাতর ডাক ও বিনীত প্রার্থনার কথা জানাইয়াছেন।

৩। ভক্তপ্রবর কেদারনাথকে শ্রীশ্রীপ্রভু 'উপানন্দ' বলিয়াছেন ও 'কাহা' সম্বোধন করিতেন। বহুদিন নিশিযোগে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একাধিকবার তাহাকে স্বীয় জন্মকথা কহিয়াছেন, একদিন কহিয়াছেন 'গাভীর অশ্রু আশ্রয় করিয়া গঙ্গাতীরে জন্মিয়াছি।' অন্য দিন কহিয়াছেন *** নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গাভী গিয়া জমি চাষ করিয়াছিল। গাভী গঙ্গার জল খাইতে গিয়াছিল। সেই সময় ব্রাহ্মমুহূর্তেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঐ ব্রাহ্মণের নামটি 'কাহা' বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। অন্য কোনদিন বলিয়াছিলেন "মায়িক জগতের কাহারও সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। আমি-গঙ্গায় জন্মিয়াছি।" ভক্ত কেদার সরল ও নিষ্কিঞ্চন, তথাকথিত শিক্ষিত নহেন, কাজেই শ্রীমুখের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখিতে পারে নাই, তবে ভাবগুলি বেশ ঠিক আছে।

৪। ভক্তকুলমণি শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে প্রভু আদর করিয়া 'নবদ্বীপদাস' নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট স্বীয় আত্মতত্ত্ব বহুস্থলে বহুভাবে বলিয়াছেন। জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছেন—

"এক ব্রাহ্মণ গোমাতা দ্বারা গঙ্গাতীর সংলগ্ন ভূমি কর্ষণ করিতেছিল। উষার প্রাক্কালে কর্ষণান্তে গোমাতাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপানার্থ গঙ্গাঘাটে উপনীত হয়েন। ঐ সময় ব্রাহ্মমুহূর্তে আমি আসিয়াছি।

৫। ভক্তপ্রবর ডাঃ সুধন্যকুমার সরকার মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক। তিনি বলেন, কোনও এক সময়ে প্রভু বন্ধু নিজ শ্রীমুখে কোনও একটি বিশিষ্ট ভক্তকে কহিয়াছিলেন, 'সাড়ে তিন মণ চাঁদের সুধা লইয়া অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগের আভা লইয়া জন্মিয়াছি।"

৬। ভক্তবর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীধাম বাকচরবাসী। তাহাকে প্রভু জ্যেঠা সম্বোধন করিতেন কোনও একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—'দ্যাখ, তোদের মত মূতামূতিতে

আমার জন্ম নয়। দীনুর স্ত্রীর কস্মিনও গর্ভ হয় নাই জানিস্।"

৭। শ্রীবামাদেবীর হস্তের কথা উল্লেখ করিয়া একদিন শ্রীযুক্তেশ্বরী দিগম্বরী দেবীকে বলিয়াছিলেন "ঐ হাত দিয়া জন্মিয়াছি।"

৮। শ্রীযুক্ত চম্পটী ঠাকুর একদিন তদীয় সহধর্মিণী ভক্তিমতী ক্ষীরোদা দেবীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রভুর ভাগনী হয়েন। এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন "তুই এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বলিস্। আমি অযোনিসম্ভব। আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ?"

৯। শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটি ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম লইয়া পর পর চারি-পাঁচ দিবস অনেক তত্ত্বালোচনা হইয়াছিল ঐ সময় শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটি মহাশয়ের দ্বারা মহর্ষি প্রবরকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের অযোনিসম্ভবত্ব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছিলেন—"সামান্য মানুযে ঈশ্বর বুদ্ধি কেমন করিয়া হয়?" মহর্ষি এই প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীপ্রভু নিম্নোক্তরূপে উত্তর দেওয়াইয়াছিলেন—

"মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও মায়ার অতীত বস্তু। সুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।' অযোনিসম্ভব। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতিঃ হ'তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। যেমন অগ্নি হ'তে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ; চন্দ্র হ'তে জ্যোৎস্না; + + + + + **"আমি বেমালুম এই কথাতেই আমি মালুম।"** কোন কোন ভক্ত বলেন যে এই শেযোক্ত কথাটি দ্বারা প্রভু নিজের অযোনিসম্ভবত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত বাক্যাবলীর মধ্য হইতে সাধারণ (common) অংশ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে বাদবাকী অংশের প্রমাণত্ব অস্বীকার করিবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, আবার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া সমাধান করিবার মত সামর্থ্যও নাই, কাজেই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া স্তুতিরূপে প্রমাণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। ইহাতে কোনরূপ ভ্রম বা অপরাধ হইয়া থাকিলে, বিজ্ঞ বান্ধবগণ কেহ নিজগুণে সমাধান করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব। "ঐ হাতে জন্মিয়াছি" ইহার আক্ষরিক (literal) অর্থ লইলে কিছু বুঝিতে পারি না। জগতে প্রকাশিত হইয়া প্রথমে বাৎসল্যময়ীর হাতেই লালিত পালিত হইয়া, স্নেহে সোহাগে পরিবর্দ্ধিত—এইরূপ অর্থ করিয়া, তিনি যে গর্ভজাত নহেন, ইহা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য, এই বুঝিয়া সুখী হইতে পারি। তারপর 'সাড়ে তিন মন চাঁদের সুধা' এই বাক্য হইতে চাঁদের সুধা কথাটি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি, সাড়ে তিন মন অর্থ বুঝি নাই। তিন মন দ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়াও অর্ধ মন যে কেন অবশেষ থাকে, তাহা ধারণা করিতে পারি না। 'প্রণব' ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইলেও অর্ধমাত্রা কি হেতু অবশেষ থাকে তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীঋগ্বেদের ঋষিগণ বিরাট্ পুরুষের বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন "অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" সমগ্র বিশ্বব্যাপিয়াও দশাঙ্গুল কেন অবশেষ রহিল, কোন ভাষ্যকারই সন্তোষজনক উত্তর করেন নাই। কাজেই বাকী অর্ধ মণের তাৎপর্য বুঝি না, তবে তিনি যে একই কালে Transcendent ও Emanant ইহা প্রকাশ করাও অভিপ্রায় হইতে পারে এরূপ সময়ে মনে করি।

অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগ অর্থে শোকতাপময় মায়োপহিত এই জড় জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে বা বাহিরে, শোকতাপ ও মায়া সম্বন্ধ রহিত একটি অতি সূক্ষ্ম ভাবের মধ্যে তিনি

জাত, এইরূপ অনুমান করিয়া তত্ত্ব প্রকাশের এই এক প্রকার ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারি। তবে অপ্রাকৃত ধাম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড তীরস্থিত যে অশোক বৃক্ষের সংবাদ আমরা বরাহ পুরাণে পাই, তাহা বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীর দিন পুষ্পিত হয়। তথাহি—

"তত্রাশ্চর্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।।
তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
সপুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচম্।।"

(হে বসুন্ধরে, তোমাকে এক আশ্চর্য অশোক বৃক্ষের কথা বলিব, শুন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে প্রভাময় এই বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্নে এই বৃক্ষ পুষ্পযুক্ত হয়। সেই ফুল আমার ভক্তের সুখ-দায়ক। আমার আপনজন ছাড়া কেহই ঐ বৃক্ষের খবর জানে না।)

আজ তিন দিবস পূর্বে অর্থাৎ বৈশাখী সীতা নবমীর দিন উষা কালে সেই অশোক ফুলের কুড়ি থাকাই সম্ভব। সেই কুড়ির অগ্রভাগের সঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর আবির্ভাবের স্থান বা কালের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর কিনা সুধী ভক্তগণ চিন্তা করিবেন। তবে চিন্তা কবিয়া কোন কূল পাইবেন না তাহাও বলিয়া রাখি, কারণ স্বয়ং শ্রীজীব লিখিযাছেন, এই অশোক তত্ত্ব এই জীবজগৎ জানে না। জানিলে আর "তৎ শৃণু ত্বং বসুন্ধরে", হে বসুন্ধরে তুমি শোন—এস্থলে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করা হইবে কেন? যে জানে তাহাকে জানাইবার আর প্রয়োজন কী? ("অনেন পৃথিব্যাপি তস্য তাদৃশ রূপং ন জ্ঞায়তে" ইতি শ্রীজীব।) অতএব ইহা দ্বারা বোঝা গেল, যে পৃথিবীতে কেহ এই অশোকের তত্ত্ব জানে না! শ্রীজীব যখন এইকথা বলিয়াছেন, তখন আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের আর কতটুকু সাধনবল আছে? যাঁহারা শুদ্ধ ভাগবত বা ভগবানের আপনজন তাঁহারাই মাত্র জানিতে সমর্থ।

তার পর চম্পটী ঠাকুরের বাক্যভঙ্গী। ক্রমে তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। জয় জগদ্বন্ধু।

* * * * *

তারপর শ্রীল-চম্পটী ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীপ্রভু স্বীয় তত্ত্বমাধুর্য অধিকার অনুযায়ী বহু ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেও, শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের নিকট আপনাকে যেরূপ খুলিয়া মেলিয়া দিয়াছেন, সেরূপ আর কাহারও নিকট করেন নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তিনি রাজচক্রবর্তী স্বরূপ। শ্রীশ্রীপ্রভুর লোকাতীত ভাব বুঝিতে ও তাঁহার পরম নিগূঢ় তত্ত্ব রস আস্বাদন করিতে তাহার মত আর কেহ—এ পর্যন্ত পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ছোট, বড়, উচ্চাধিকারী, নিম্নাধিকারী—এক কথায় বন্ধুভক্ত বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, 'চম্পটী ঠাকুরের কাছে আমি ঋণী নহি', এমন কথা বলিবার সাহস

কাহারও নাই।

শুধু বন্ধুভক্ত কেন? সত্যকথা বলিতে গেলে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভূমিতে যে সকল উন্নতসত্তা মনীষি আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে চম্পটী ঠাকুরের গগনভেদী "হরি বোল" ধ্বনিতে মুগ্ধ স্তম্ভিত ও পুলকিত না হইয়াছেন এমনটি বিরল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গোস্বামিপাদ বিজয়কৃষ্ণ, বাবা প্রেমানন্দ ভারতী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাৎকালীন মহাপুরুষ-গণের প্রত্যেকের জীবনধারা পরিবর্তন ও অন্তর্মুখীনতার পরিবর্দ্ধনের মূলে যে সকল রহস্যময় কারণ লুক্কায়িত আছে, চম্পটী ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গ ও তাঁহার পাপ-কালিমা-ধৌতকারী উচ্চ হরিধ্বনি যে তাঁহার অন্যতম, ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। অই যে প্রভুবন্ধুর পরম আদরের সারিকা অনুগত রামা, আজ সুমধুর কীর্তন-ঝঙ্কারে সুদূর কন্যাকুমারী পর্যন্ত মুখরিত করিতেছেন, "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" মন্ত্রের একমাত্র প্রচারক ও বড় বাবাজী-রাধারমণ-প্রিয়তম সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া বলিয়া যাহার অমল ধবল যশোরাশি ক্রমে ক্রমে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাঁহার বৈরাগ্য জীবনের প্রথম অঙ্কে ভক্তসিংহ চম্পটী ঠাকুরের হরিবোল গর্জনই যে তাঁহাকে পাগল-পারা করিয়া নাচাইয়া তুলিয়াছিল, একথাটি না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। চম্পটী ঠাকুরের ইষ্টনিষ্ঠা ও নামের শক্তিতে অমিত বিশ্বাসের কথা ভাবিলে, তাঁহাকে নিখিল বিশ্ববৈষ্ণবসম্রাট্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে শুদ্ধি-আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন নীতি লইয়া বর্তমান ভারত তোলপাড়, সেই শুদ্ধি ভাবের তিনি প্রবর্তক ছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জনের তিনি প্রকৃত পথপ্রদর্শক ছিলেন। ডোম, বুনা, চাষা, ধোপা, মুচি, মুদ্দাফরাস, কসাই, লম্পট প্রভৃতি সমাজের ঘৃণিত ও পতিত জাতিকে কী করিয়া বুকে তুলিয়া হরিনাম লওয়াইতে হয়, তাহা তিনি চির জীবন ভরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। কলিকাতা রামবাগানের ডোম সম্প্রদায় ও ফরিদপুর শহরতলীর বুনা সম্প্রদায় তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এত বড় মহামহা অধিকারী হইয়াও তিনি যে কীরূপ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাশূন্যভাবে এই কলিকাতা শহরে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়!

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিবার শক্তি যে তাহাতে কীরূপ অপরিমিতি, তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। অবিরাম বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ যেরূপ জীবের কল্যাণার্থ ত্রিভুবনে বিচরণ করেন, পরম দয়াল নিত্যানন্দ যেরূপ প্রতিনিয়ত গৌরপ্রেমে গদ্-গদ্ হইয়া 'প্রেম কে নিবি কে নিবি' বলিয়া দন্তে তৃণ ধরিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ান, ভক্তকুলতিলক অবধূত চম্পটী ঠাকুরও তেমনি বড়-ছোট ধনী-দরিদ্র হিন্দু-অহিন্দু না বাছিয়া নিয়ত জগৎ-কল্যাণকামী হইয়া নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল বেশে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া অবিচারে পথে ঘাটে যথা তথা বিচরণ করেন, অথচ মূঢ়-বুদ্ধি অজ্ঞ জীব তাঁহার দ্বন্দ্বরহিত ত্রিগুণাতীত ভাব-বিহ্বলতা অনুভব করিতে না পারিয়া বাহ্য আচার-ব্যবহার লইয়া নানা প্রকার নিন্দাবাদ ও তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকে।

তদীয় সহপাঠী জ্ঞানশার্দূল সরস্বতী আশুতোষ তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত বাহ্য প্রতিষ্ঠাহীন ভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'I-envy his position"। অপ্রাকৃত চরিত্র সেই চম্পটীর ভাব, ভাষায় অঙ্কন করিতে মাদৃশ মূঢ়-বুদ্ধি মানবের

প্রাকৃত তুলিকার সামর্থ্য কোথায়? তাঁহার ভাবটি যেমন রহস্যময়, তাঁহার মুখের কথাও ঠিক তেমনি দুর্বোধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন সত্যসত্যই বলিয়াছিলেন, "চম্পটীর কথা বুঝতে পারে কলিকাতা শহরে এমন লোক নাই।" লক্ষণ দেখিয়া মানুষ চিনিয়া ভাব ও অবস্থানুযায়ী কথা বলিতে তিনি যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, সংসারে তাদৃশ একটি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মরহস্য তত্ত্ববেত্তা জানিয়া বহু ভক্ত বহু সময়ে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও কিছুই বলেন নাই, কাহাকেও বা কিছু লিখিয়া বা বলিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তন্মধ্যে তিন-চারিটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। সব কথাগুলি পরস্পর মিল সর্বাংশে না থাকিলেও আসল কথা (essential portion) নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিয়া বাকী অংশকে নিরর্থক না বলিয়া, দেশ-কাল-পাত্রসহ চিন্তা কবিয়া, সপ্রয়োজন স্বীকার করতঃ সমাধান করিতে হইবে।

১। একদিন চম্পটী মহাশয় বন্ধুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভুব জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। বোধহয় সে লেখাটি বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ও ইহধাম ত্যাগ করিযাছেন। তবে 'জগদ্‌গুরু' গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী উক্ত লেখাটি নিজে পাঠ করিযাছেন। তাহা হইতে ও প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র প্রমুখ ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথ ন্যায়ানুসারে প্রামাণ্য রূপে যতদূর সাধ্য গ্রহণ করতঃ স্বকীয় অনুভূতির সঙ্গে মিলাইযা 'জগদ্‌গুরু' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সেই লেখার যে-অংশ মহেন্দ্রজী প্রামাণ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা স্বকীয় লেখার মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রীমৎ চম্পটী ঠাকুরের প্রকটকালেই উক্ত 'জগদ্‌গুরু' গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে বহু স্থলের বহু ভুলত্রুটি চম্পটী ঠাকুর নিজহস্তে সংশোধন করিয়াছিলেন এবং একাধিক স্থলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ জন্মরহস্যের উপরে কখনও লেখনী ধরেন নাই, বরং পুনঃ-পুনঃ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইযাছেন। এক সময় কাশীধামে অবস্থানকালে বহু সময় উক্ত জগদ্‌গুরু গ্রন্থ ও শিশিরবাবুর 'লর্ড গৌরাঙ্গ' গ্রন্থ পাঠ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে দেখিয়াছি। শ্রীমন্‌মহেন্দ্রজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তিনি উক্ত স্থলে ভুল থাকা সত্ত্বেও সংশোধন করেন নাই, এরূপ কেহ মনে করিবেন না, যেহেতু তত্ত্বসিদ্ধান্তে কোথাও' লেশমাত্র বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি কাহাকেও বলিতে ছাড়িতেন না। বিশেষতঃ তিনি মহেন্দ্রজীকে গৌরব না করিয়া বরং পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক সময় মহেন্দ্রজী কোন একখানি কাগজে শ্রীশ্রীপ্রভুকে 'জ্ঞানময়' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে চম্পটী ঠাকুর অতি গম্ভীরভাবে শাসন ব্যঞ্জক সুরে বলিয়ছিলেন, "কে বলেছে প্রভু আমার জ্ঞানময়, কে বলেছে জ্ঞানে তাঁকে জানা যায়? কে কোন্ কালে তাঁকে জেনেছে?" মহেন্দ্রজী তখন নিজ ভুল বুঝিয়া 'জ্ঞানময়' স্থানে 'জ্ঞানাতীত' লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২। কোন সময়ে চম্পটী ঠাকুর পরম ভক্ত মহানুভব শ্যামানন্দদাসজীকে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দদাসজী ফরিদপুর রাজবাড়ীর ভক্তকুলমণি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধালয়ে বসিয়া গোপীদাস প্রভৃতি ভক্ত সমক্ষে সেই কথা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই—"পূর্ব দিন রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়। তাহাতে গঙ্গার জল

ফেনা বাঁধে। 'সেই ফেনার মধ্যে প্রভুর জন্ম; বামাদেবী স্নান করিতে গিয়া ঘাটে কুড়াইয়া পাইয়াছেন।'

৩। ঢাকা জেলান্তর্গত জয়পাড়া গ্রাম নিবাসী বন্ধুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা মহাশয় শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের নিকট হইতে জন্ম রহস্য জানিবার জন্য বহু দিন চেষ্টা করিয়াছেন। একদিন তাহাকে কহিয়াছিলেন, 'এই যে চোখের সামনে মৃত্যু-রহস্যটা দেখলি, এইটাই আগে বুঝে লও না। মধু পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে পরে বলিলেন, "গঙ্গার জলে পাওয়া গিয়াছে ঐটি সত্য কথা।"

৪। হাওড়া জেলার আন্দুল নিবাসী ভক্তবর ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ মহাশয় জন্মবৃত্তান্ত জানিবার জন্য বহু সময় চম্পটী ঠাকুরের নিকট অনুনয়-বিনয় জানাইয়াছেন। একদিন তাহাকে লিখাইয়া দিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহা যথাযথ 'শ্রীশ্রীবন্ধু-বার্তা' নামক লীলাগ্রন্থে ৬৩ পৃষ্ঠা হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে; যথা—জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ্ রাজ, ডাহাপাড়া প্যালেস (palace)-এর ওপার। রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। রীতিমত গড় প্রাসাদ পরিখা পরিবেষ্টিত। দীননাথ ন্যায়রত্ন বঙ্গাধিকারীর দ্বার-পণ্ডিত। ন্যায়রত্ন ও তাঁহার ব্রাহ্মণী ভট্টাচার্যদের প্রদত্ত জমিতে বাস করিতেন। ন্যায়রত্নের একটি পৃথক্ চতুষ্পাঠী ছিল; সে ঢিপি এখনও বর্তমান। ন্যায়রত্ন ও তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বঙ্গাধিকারীর বাটী যান, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘরের ভিতর অপূর্ব সদ্যজাত শিশু বর্তমান। জ্যোতির্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। ন্যায়রত্ন ও ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত। অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। লোকে জানিল যে ন্যায়রত্নের ব্রাহ্মণী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। ন্যায়রত্ন জন্মলগ্ন ঠিকুজী করিয়া রাখেন। এই সময়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর ওখানে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতিষী আসেন।

ন্যায়রত্ন গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় খোকাকে কোলে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসী খোকাকে বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন ভীত হইলেন; বলিলেন, আপনি খোকার অকল্যাণ কেন করিতেছেন? সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়া মাথার উপর খোকার পা দু'খানি রাখিলেন ও বলিলেন,—"ন্যায়রত্ন, আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, নেপাল হইতে সহসা বাঙ্লায় কেন আসিলাম। এইরূপ ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আজ আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত। তোমাকে আর আমি কী বলিব? যে পাঁচটি গ্রহের সঞ্চার ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয়, যেমন শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণ, সেই পাঁচটি গ্রহই ইঁহার জন্মলগ্নে তুঙ্গস্থ। ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন। ইঁহা হইতে জীব কৃতার্থ হইবে। ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদ শহরে দেখে নাই।" উপরোক্ত কথাগুলি উক্ত 'শ্রীবন্ধুবার্তা' গ্রন্থে যেভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে মনে করেন যে এই কথা সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের কথা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীল চম্পটি মহাশয়ই ঐ সকল কথা নিজে বলিয়াছেন। তবে যে, একদিন প্রভু ভট্টাচার্যদের বাগানে বসিয়া হাততালি দিয়া চম্পটী মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"অতুল! আয় আজ তোকে আমার জন্মরহস্য বলি"—এই বাণীটি ঐ স্থলে উক্তি করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে, চম্পটী মহাশয় প্রভুর জন্মতত্ত্ব জানেন এই কথা

প্রকাশ করা বই আর কিছু নহে। কেবলমাত্র এই একটি কথাই শ্রীমুখের। অতএব অতুল এই সম্বোধন পদের পূর্বে যে কোটেশন (") চিহ্ন আরম্ভ হইয়াছে, জন্মরহস্য বলি এই পদের পরে সেই কোটেশন শেষ (") করিতে হইবে। নতুবা উক্ত গ্রন্থে যেভাবে আছে অর্থাৎ ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদে দেখে নাই এই বাক্যের পর কোটেশন শেষ করিলে ও সবগুলি শ্রীমুখের কথা মনে করিলে, ছয় প্রকারের দোষ হয়। যথা—

১। সেই 'শ্রীবন্ধুবার্তা' গ্রন্থে ঐ বাক্যগুলির একটু উপরেই কথিত হইয়াছে যে, প্রভু মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়া ভট্টাচার্যদের বাগানে বেলতলায় বসিয়া এই কথা বলিতেছেন। সেইস্থানে উপবেশন করিয়া জন্মস্থান ডাহাপাড়া প্যালেসের ওপার প্রভৃতি কথা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ সেই ঢিপি এখনও বর্তমান; একথা দশ-বারো হাত দূরস্থিত বেলতলায় উপবেশন করিয়া বলা সম্ভবপর নহে। হাওড়া থাকিয়া চম্পটী ঠাকুরই এইরূপ কথা কহিতে পারেন।

২। একদিন শ্রীশ্রীমুখে কহিয়াছেন যে 'দীনুর স্ত্রীর কখনও গর্ভ হয় নাই।' অতএব অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল, এই কথা প্রভু বলিতেই পারে না। চম্পটী ঠাকুরও অন্য কোথাও গর্ভের কথা বলেন নাই বরং অন্য কেহ বলিলে রাগে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন। তবে দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কোথাও বলিলেও বলিতে পারেন।

৩। জ্যোতির্বিদ্ সন্ন্যাসীর সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথোপকথনের মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুকে বহু বার 'খোকা' বলা হইয়াছে ইহা দেখিতে পাই। ওটি নিজ শ্রীমুখের কথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় তৃতীয় ব্যক্তি (in third person)-এর নিজের কথা না বলিয়াছেন, এমন নহে। কিন্তু সেই সকল কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যখনই তৃতীয় ব্যক্তির মত কথা বলিয়াছেন, তখনই নিজেকে প্রভু বলিয়াছেন, যথা—"প্রভুর ভার তোমাদের মস্তকে", "অনিষ্ঠায় প্রভুর মৃত্যু," "প্রভুকে যদি মনে কর অন্নভোগ দিও"। ক্বচিৎ কখনও নিজেকে 'ফকীর'ও বলিয়াছেন, যথা,—"একালে ওকালে ত্রিকালে নিত্য চিরকাল এই ফকীরের কাছেই থাকিস্।" এ ছাড়া অন্য কোনরূপ বলিয়াছেন এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় ঐরূপ পুনঃপুনঃ নিজেকে 'খোকা' বলা শ্রীশ্রীপ্রভুর পক্ষে কদাচ সম্ভব মনে হয় না।

৪। আপন শ্রীমুখে আপন তত্ত্বকথা শ্রীশ্রীপ্রভু বহু সময়ে বহু ভক্তকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু অমুক সাধু বা অমুক সন্ন্যাসী তাঁহার সম্বন্ধে কী বলিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া, তিনি যে একমাত্র প্রভু ইহা কুত্রাপি প্রকাশ করেন নাই। বরং তদ্বিপরীত "প্রভুর পরিচয় প্রভু মাত্র" অন্যে তাঁহার তত্ত্ব জানে না—এই কথাই একাধিকবার বলিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল মৌনব্রত অবলম্বন করিবার কিছুদিন পূর্বে একদিন পূজনীয়া শ্রীযুক্তা দিগম্বরী দেবীকে বলিয়াছিলেন "আমি যে কে তাহা আমিই জানি, আর কেউ জানে না।" অধিকন্তু যখন "আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনি বাখানে," তখন তাহার ভঙ্গীই এক অভিনব প্রকারের। পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ তত্ত্বটিই নিজ শ্রীহস্তে ভক্তবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—সে লেখার ভঙ্গী দেখুন—"আমি প্রভু জগদ্বন্ধু, ক্ষণে জন্মিয়াছি; আমার জন্মস্থানে পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গে আছে। বিশ্বাস না হয় বাজারে যাচাইয়া নেও।" অতএব সন্ন্যাসীর মুখে নিজের তত্ত্ব কীভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে কখনও জানাইয়াছেন

এরূপ মনে করি না। ওটি চম্পটী মহাশয় নিজে অন্যভাবে জানিয়া নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

৫। শ্রীশ্রীপ্রভুর সমগ্র বাণীসমূহ ও শ্রীলেখনী-প্রসূত গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখি,—যখন যেস্থানে যতটুকু কথা বলা দরকার তাহা হইতে একটি বর্ণ মাত্রও বৃথা ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজী পণ্ডিতদের 'Brevity is the soul of wit', আর সংস্কৃত আচার্যদের "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" শ্রীশ্রীপ্রভুর কার্যে ও বাক্যে সুপরিব্যক্ত। কোনও লীলা-বর্ণনা বা রূপ-বর্ণনা স্থলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া "অল্পাক্ষরম্ অসন্দিগ্ধং সারবৎ গূঢ়নির্ণয়ম্" অল্প অথচ সার গূঢ় তত্ত্ব পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন। আর প্রমাণ-বাক্যের স্বরূপও তাহাই। যে বাক্যটিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার একটি অর্দ্ধমাত্রাও নিরর্থক থাকিবে না। একথা পূর্বে কহিয়াছি। জন্মরহস্য বলিতে বসিয়া বঙ্গাধিকারীর বাড়ীর গড় প্রাসাদের কথা বা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর কথা উল্লেখ করিবার কী উপযোগিতা আছে তাহা অনুমান করিবার মত হেতু খুঁজিয়া পাই না। দেশকাল বিবেচনা করিয়া চম্পটী ঠাকুর ঐকথা বলিতে পারেন, তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে বসিয়া ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা শ্রীমুখের বলিয়া বিশ্বাস করি না।

৬। পূর্বেই বলিয়াছি বাক্যের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিচারে ধর্মই আলোক স্বরূপ। সেই ধর্মের লক্ষণাদিও উল্লেখ করিয়াছি। মহাবতারী মহাতত্ত্ব বিচারে "মহাধর্ম মহাউদ্ধারণ" ইহাই একমাত্র উজ্জ্বলতম আলো। যে-কার্য বা বাক্য ঐ আলোকে উদ্ভাসিত তাহাকেই বুকে করিয়া আদর করিব, আর যাহা তদ্রূপ নহে তাহা অতি উচ্চ কথা হইলেও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণার বাহিরেই রাখিতে বাধ্য হইব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকালে দেখি শ্রীদেবকী-বসুদেবের মনের মধ্যে সর্বগুহাশায়ী তিনি পরিপূর্ণরূপে বাস করিতেছেন। আর দেবকীর বাৎসল্য রস পান করিয়া বাঁচিয়া আছেন। শ্রীগৌরহরির জন্মকালে দেখিতে পাই তিনি পূর্ণরূপে শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর হৃদয়ে পূর্ব হইতেই অধিষ্ঠিত আছেন। ("আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়ে"—শ্রীচরিতামৃত)। তারপর শুভক্ষণে উভয়ের অঙ্গজ্যোতি অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পূর্বপর লীলায় পিতা-মাতার প্রত্যেক ব্যবহারে ধর্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও ধর্মস্বরূপ উদ্ধারণ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের তত্ত্ব-মাধুর্য পরিব্যক্ত। অতএব প্রমাণরূপে গ্রহণীয়। আর আজ সেই অভিন্না শচীমাতা বামাদেবী ও অভিন্ন জগন্নাথ দীননাথ এই উভয়ে মিলিয়া যে বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন, ইহাতে মহাধর্ম স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভুবন্ধুর কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ হইল যে, ঐ কার্যটিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব? আমরা কথায় কথায় বলি "এক কার্যে করেন প্রভু কার্য পাঁচ সাত" তা পাঁচ-সাত কার্য দূরে থাকুক বাৎসল্যের আধার জনক-জননীকে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে পাঠাইয়া দিয়া কর্তা কোন্ কার্যটি করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কাজেই ঐ কার্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না ও কোন সুধীভক্ত পারিবেন বলিয়া মনে করি না। আমরা বুঝি ঘর না থাকিলে দ্বার শব্দ যেমন নিরর্থক, গুরু না থাকিলে শিষ্য পদটি যেমন অর্থহীন, স্বামী না হইলে ভার্যাপদের যেমন কোনও মূল্য থাকে না, তদ্রূপ মূর্ত-বাৎসল্যরস জনকজননী না থাকিলে

সেখানে সর্বরসাধার শ্রীহরির পুত্ররূপে প্রকাশ হওয়াও তাৎপর্য বিহীন হইয়া থাকে। রসিক ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা বলেন "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ"। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে বিরাজ করেন তখনই তিনি মদনমোহন, একা থাকিলে শুধুই মদন। বস্তুতঃ তাহাই। প্রভু যখন একা একা থাকেন তখনই তিনি জগদ্‌গুরু মহামহা প্রভু শ্রীশ্রীহরিপুরুষ, আর যখন যশোদার কোলে নবনী ছড়ান, তখনই তিনি 'নীলমণি', যখন শচীমাতার ক্রোড়ে হেলিয়া দুলিয়া নাচেন তখনই তিনি 'নিমাইচাঁদ', আর যখন বামাদেবীর অঙ্কে সেই কাঁচা সোনার পুতুল দশদিশি উজ্জ্বল করিয়া হাসির লহরী ছড়াইয়া দিলেন, তখনই তিনি 'বামাদুলাল' হইলেন। কাজেই যেদিন যেখান হইতে বামাদেবী নিমন্ত্রণ খাইতে অন্যত্র গিয়াছেন সেইদিন সেইখানে 'বামা-দুলাল' উদয় হইয়াছেন, ইহা নয়নহীনের পদ্মলোচন সংজ্ঞাব মত নিরর্থক নহে কি? অতএব ওকথা শ্রীমুখোক্ত নহে, চম্পটী ঠাকুর ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছেন মাত্র। তবে আমরা যদি আর অন্য কথা না জানিতাম তবে আলাদা কথা, হইত। শ্রীশ্রীমুখচন্দ্র-বিগলিত অন্য প্রকার বার্তা, চম্পটী মহাশয়ের মুখে শ্রুত অন্য প্রকার কথা যখন আমবা পাইতেছি ও তাহার সঙ্গে মহেন্দ্রজীর অনুভূতির যখন সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি এবং সে তত্ত্বটি যখন সুন্দর সত্য, শাস্ত্রসঙ্গত ও সুযুক্তিপূর্ণ তখন তাহাকে গ্রহণ না করিব কেন? সর্বোপরি কথা, মহাধর্ম মহাউদ্ধারণতত্ত্ব যেখানে সুপরিব্যক্ত, তাহা সর্বথা গ্রহণীয় আর ঐ আলোকে যে পথ আলোকিত নয়, তাহাতে আমার মত অন্ধজীবের গতাগতি বিপৎসঙ্কুল।

এই প্রকার সমালোচনায় শ্রীল চম্পটি ঠাকুরের কথা উড়িয়া গেল আর লেখকের ও পাঠকের মহা অপরাধ হইল বলিয়া কোনও বান্ধব যদি কানে-হাত দিয়া এই সময় উঠিয়া যান, তবে তাঁহার চরণ ধরিয়া আর একটি নিবেদন করিব—

শ্রীল চম্পটী ঠাকুর আমাদের মাথার মণি। তিনি প্রকৃতই জন্মরহস্য তত্ত্ববেত্তা। তাঁহাকে বাদ দিয়া জন্ম-রহস্যের ভায্য আমি জীবাধম রচনা করিতেছি তিনি নিজে সর্ব প্রথমে "শ্রুত আছি" বলিয়া শ্রীচম্পটী ঠাকুর মহাশয়কেই প্রণাম করিয়াছেন। এমত স্থলে মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট কোন্ সাহসে তাহাকে বাদ দিয়া জন্ম-রহস্যের উপরে লেখনী ধরিবে? বস্তুতঃ তাঁহাকে কোনও ক্রমেই বাদ দেওয়া হয় নাই, হইতেই পারে না। তবে পূর্বেই বলিয়াছি **"লক্ষণে মানুষ চিনিও, তদ্রূপ ব্যবহার করিও করাইও"**—এই উপদেশটি প্রতিপালন করিবার মত সামর্থ্য একমাত্র চম্পটী মহাশয়েরই ছিল। পক্ষান্তরে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের একটি বাণীকে দাঁড়ি কমা-শুদ্ধ ঠিক-ঠিক ভাবে বলিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য তাঁহারই ছিল। কাজেই তাঁহার মুখের বাক্যাবলীকে দুইভাগ করিয়া বুঝিয়াছি। এক ভাগকে মহামহা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। আর এক ভাগকে তিনি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অর্থবাদ রূপে প্রমাণতা স্বীকার করিয়া 'বাক্যভঙ্গী' কহিয়াছি। তবে কোন্ কথাগুলি কোন্ ভাগে পড়িবে, তাহা কীরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা পুনঃপুনঃ কহিয়াছি, যে-কথায় মহা-উদ্ধারণ তত্ত্ব প্রস্ফুটিত ও যে-কথায় প্রত্যেক বর্ণ সপ্রয়োজন তাহাই শ্রীমুখের মহাবাণী, চম্পটী ঠাকুর তাহার একটি কথাও বদলান নাই জানিয়া প্রথমভাগে সন্নিবেশ করিয়াছি, আর যাহা সেরূপ নহে, তাহার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে মহামহা অধিকারী চম্পটী ঠাকুরকে অমর্যাদা তো করা হয়ই নাই বরং তাঁহার লোকোত্তর

চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা দ্বারা আমাদের আত্মশোধন হইতেছে।

যে-কথাটি যেস্থানে যে-ভাবে উক্ত হইয়াছে সেই কথাটির প্রমাণতা সেইভাবে লইতে হইবে, তাহাতে অপরাধ তো স্পর্শিবেই না বরং সত্য গ্রহণ হেতু হৃদয় শুদ্ধ হইবে।

শ্রীল চম্পটী ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্ম-রহস্য তত্ত্ব জানিতেন একথা সত্য, পরম সত্য। তবে দেশকাল বুঝিয়া তিনি যে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন একথাও নিঃসন্দেহরূপে সত্য। আবার তিনি যে আসল তত্ত্বটি এ পর্যন্ত কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই একথাও পরম সত্য, তাহা হইলে কি আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ঐরূপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে পারিতেন? অথবা কী-যেন একটি রহস্য তিনি জানেন, তাহা যেন বলিবেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন? "অমুককে বলিয়াছি বা লিখিয়া দিয়াছি সেখান হইতে জানিয়া লওগে" এই কথা বলিয়াই তো বিরক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন।

তবে এখন প্রশ্ন এই যে, চম্পটী মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু যে তত্ত্বটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেটি কি আমরা আর জানিতে পারিব না? আমরা বলি, কেন পারিব না? নিশ্চয়ই পারিয়াছি। ঐ যে—

"যখন বামাদেবী আত্মস্থা হইলেন তখন অমিয় নিমাই গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করতঃ তাহার হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া শ্রীহরিপুরুষরূপে আবির্ভূত হইলেন।" এই কয়টি কথাই জন্মরহস্য। ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রাণের গুপ্তকথা—শ্রীবেলতলায় চম্পটী ঠাকুরকে ইহাই কহিয়াছেন। ইহাই শ্রীচম্পটী মহাশয়ের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের লুকানো-কথা মহেন্দ্রজীর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া লেখনীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ কেন মনে করিতেছি, তাহারও কারণ বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, চম্পটী মহাশয় এমন লোকই ছিলেন না যে একজন রাম শ্যাম রাস্তা ঘাটে জিজ্ঞাসা করিলেই বা অন্য কোনও প্রকারে একটু মনস্তুষ্টি করিলেই, তিনি অমনি একটি তত্ত্বরহস্য সেখানে ব্যক্ত করিয়া ফেলিবেন! আর শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব আরব্য উপন্যাসের গল্প নহে যে বলিলেই বলা হইল আর শুনিলেই শোনা হইল। আর যাহারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ রহস্য জানিতে চাহিতেন হয়ত বা তাহারাও সকলে তাদৃশ অধিকারী ছিলেন না যে, একটি নিগূঢ় তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইবা মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিবেন! একমাত্র মহানামসাধনে যে-হৃদয় উর্বর তাহাতেই শ্রীগুরুর অযাচিত কৃপাবলে সিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইতে পারে, অন্যত্র নহে। তাই কেবলমাত্র যিনি শ্রীল চম্পটী ঠাকুরকে গুরুবুদ্ধি করিয়া বহু সময় তাঁহার দুর্লভ সঙ্গে বাস করিয়া সর্বদা তাঁহার সর্বপ্রকার গতিবিধি ও ইঙ্গিত ইসারা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন, শ্রীঅঙ্গনে শ্রীহরিপুরুষের সেবানন্দে মগ্ন থাকাকালে যে অজ্ঞাত কুলশীল ছিন্ন কন্থা-ধারী বৃন্দাবন-প্রত্যাগত যুবককে প্রথম দেখিবা মাত্রই স্বরূপদর্শী চম্পটী ঠাকুর যেন কত আপনার জনের মত সোল্লাসে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, **"বাবা তুই এসেছিস্! এখন আর আমার মরলে দুঃখ নাই"**—সেই শ্রীমন্মহেন্দ্রজীর সুনির্মল হৃদয়েই চম্পটী ঠাকুরের প্রাণের কথা ইঙ্গিত আভাষের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হইয়াছেন। নতুবা যে মহেন্দ্রজী শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর ধরায় শুভাগমন বার্তা জানিয়া, শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়া, সর্বপ্রথম শ্রীল চম্পটী

ঠাকুরকে প্রভু বন্ধুহরির মর্মীভক্ত জ্ঞানে তৎপ্রতি ঐকান্তিক গুরুবুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন, সেই মহেন্দ্রজী শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের কাছে চম্পটী মহাশয়ের কথিত জন্মরহস্য লেখা দেখিয়া কোন্ সাহসে বা কোন্ বলে অমন নির্ভীকচিত্তে ভক্তপ্রবর শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ ও শ্রীমন্নিত্যসেবক ব্রহ্মচাবীর হস্তে মুদ্রণ কার্যের সংশোধনের ভার ন্যস্ত করিয়া, "জগদ্গুরু" গ্রন্থের ছাপা কার্য শেষ করতঃ, ১৩২৬ সনের জন্মোৎসবের বিপুল ভক্তসঙ্ঘের সমক্ষে উক্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন!! তারপর কোন্ সাহসেই বা তিনি ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ স্বয়ং চম্পটী ঠাকুরের হস্তে সংশোধন করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন? আর চম্পটী মহাশয়ই বা কেন অন্যান্য স্থানে এত সংশোধন করিয়া ঐ স্থানে 'আত্মস্থ' পদটি দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ের গোপ্য কথা কী করিয়া তাহার অতি গুপ্ত শিষ্য একলব্যের মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছে ভাবিযা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—আর কী জন্যই বা তাহার পর হইতে 'মতিচ্ছন্ন' না লিখিয়া মহামতিমান্ বলিয়া সম্বোধন করতঃ পত্রাদি লিখিতেন? কেনই বা 'তুই যে দ্বিতীয় চম্পটী হ'লি বলিয়া উপহাস করিতেন? পাগলে পাগলে প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ, চোখে চোখে কথা, যাঁদের খবর তাঁরাই জানে—আমবা মূঢ় জীব যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, ব্যক্ত কবি মাত্র। শুনিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনের গোপীনাথবাগে যখন দুইটি প্রেমোন্মাদ গোপীনাথের খোঁজে আপনা হারা, তখন কেহ কাহাকেও জানেন না। সে যুবক চলিয়াছিল ব্রজের ধূলায় অঙ্গ ঢাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমে টলিতে টলিতে, আর 'সে হরিবোলা ঠাকুর আসিয়াছিল পিছন দিক্ হইতে, গভীর নাদে কালিন্দীর কালো জল কাঁপাইয়া—

"বল হরি হরি বোল ভাঙ্গ ভবের হাট।
বাজার উপব হওগে রাজা লাট সাহেবের লাট।।"

বলিয়া চির পরিচিতের মত পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া কোনও পরিচয় না দিয়া, দ্রুতগতিতে অন্য গলিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। এ হেন প্রিয়জনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহার হৃদয়ের কথা সঞ্চারিত না হইলে আর কোথায় হইবে? অধিক বলিতে কি, কেবল শ্রীহরিপুরুষের নহে, শ্রীহরি যতবার ধরায় আসিয়াছেন প্রত্যেক অবতারীর জন্মের যে গূঢ় রহস্য তাহাও ঐ কয়টি কথার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ক্রমে তাহা সুপরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। অমিত কৃপাশক্তি ও অসামান্য সাধনশক্তি বলেই চম্পটী ঠাকুরের অপরিসীম স্নেহের পাত্র শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী এই জন্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, মাদৃশ মূঢ় জীব তাহার মর্মগ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীগদাধর তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রেমযোগের গ্রন্থকার যাঁহার ব্যাধি অবস্থার প্রলাপ উক্তিকেও দৈববাণীরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মহানাম-মালাটি গাঁথিয়া ভক্ত-কোকিল কুঞ্জ নিজে কুঞ্জদ্বারে যাইয়া 'ধরহে' বলিয়া যাঁহার হাতে দিয়া প্রাণবন্ধুর গলায় পরাইয়া সুখী হইয়াছে, তাঁহার অনুভূতির মর্মভেদ করিতে সাহসী হওয়াও আমার পক্ষে মহাধৃষ্টতা। তথাপি—

"পক্ষী যেন আকাশের সীমান্ত না পায় টের,
যতদূর সাধ্য উড়ি যায়"

তাই যতদূর সাধ্য উড়িতে প্রয়াস পাইতেছি। এত দেখিয়াও কোনও বান্ধব যদি বলেন

যে. সে যাহাই হউক না কেন, চম্পটী মহাশয়ের কথার সঙ্গে ঐ অনুভূতির যখন বিরোধ আছে তখন আমরা কাহাকে রাখি আর কাহাকেই বা ছাড়ি। এই কথার উত্তরে আমার আর বলিবার কী আছে। তবে একটি কথা এই যে '**বিরোধ**' কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া, তবেই বিরোধ আছে, এই কথা বলা সঙ্গত। যখন একই প্রশ্নোত্তরে দুই ব্যক্তির দুই প্রকার মতবাদ দৃষ্ট হয়, তখনই এখানে বিরোধ আছে এই কথা বলিতে হয়। চম্পটী ঠাকুর কর্তৃক কথিত ঐ বাক্যাবলীতে যে প্রশ্নের উত্তর আছে, ঐ অনুভূতিতে সেই প্রশ্নের উত্তর নহে। প্রশ্ন দুইটি, তার উত্তর দুইরূপ, তাহাতে বিরোধ কীরূপে সম্ভবে? শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মকথা কী? এই প্রশ্নের উত্তর—তিনি অযোনি-সম্ভব। এই উত্তরটি বলিতে গিয়া চম্পটী ঠাকুর স্থানাস্থান বিচার করিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আর **অযোনিসম্ভব কীরূপে সম্ভব**? এই আর একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্ন চম্পটী ঠাকুরের নিকট কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই তাই তিনি তাহা বলেন নাই।

মাতৃস্তন্যে ক্ষীর থাকিলে কী হইবে, শিশু মুখার্পণ করিলে তো ক্ষরণ হইবে। গুরুর হৃদয়ে কত তথ্য থাকে, শিষ্য জিজ্ঞাসু হইলে তবে তো জানিতে পারিবে। সব সময় সব বিষয় অযাচিত ভাবে হয় না, আদরাতিশয্যেও হয় না। দ্রোণের যতখানি বিদ্যা একলব্য বা অর্জুন শিখিয়াছিলেন, আদরের দুলাল একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা তাহা শিখিয়াছিলেন কি? তাই বলিতেছিলাম, যিনি সতত চাঁদ ধরিতে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়েই বিদ্বদনুভূতি হইয়াছে, আপনি তেমনধারা জিজ্ঞাসু ছিলেন না তাই জানিতে পারেন নাই।

এই পরম বস্তুটি তোমার আমার মত ঐ ভাবে জন্মান নাই এই বিশ্বাসটি জন্মাইয়া দিতে চম্পটি ঠাকুর নানা প্রকার অর্থবাদ ও ভঙ্গী আশ্রয় করিয়াছেন, পক্ষান্তরে যুগে যুগেই তিনি ওরূপে আসেন না, ওরূপে না আসা কীরূপে সম্ভব—তাহারই উত্তর করিয়াছে ঐ বিদ্বদনুভূতি।

ঐ অনুভূতিকে বিদ্বদনুভূতি কহিয়াছি। অনুভূতি দুই রকমের। দিব্য অনুভূতি আর বিদ্বৎ অনুভূতি।

মনে করুন, আপনি কিছুই জানেন না। ভাল মানুষটির মত আপন মনে শুইয়া বা বসিয়া আছেন। দৈবাৎ অযাচিত ভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু প্রকাশমান হইয়া আপনাকে একটি অভূতপূর্ব তত্ত্ব জানাইলেন বা কিছুই নয়নগোচর হইল না, এক অপূর্ব কণ্ঠ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল। ইহাকে বলে দিব্য অনুভূতি বা দৈববাণী। আর আপনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া কত রত্ন তুলিয়াছেন, হঠাৎ একদিন একস্থানে একটি সংশয় উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, কেবল ভাবিতে থাকিলেন, একদিন এক শুভ মুহূর্তে হঠাৎ প্রভু আপনাকে এমন একটি বুদ্ধিযোগ প্রদান করিলেন যে এক নিমিষে সূর্যোদয়ে আঁধার বিনাশের মত সকল খট্‌কা মিটিয়া গেল, ইহাকে বলে বিদ্বদনুভূতি। শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মতত্ত্ব গ্রন্থকার দেবী দিগম্বরীর নিকট শুনিয়াছেন, বীর ভক্ত শ্রীযুক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের মুখ হইতে জানিয়াছেন, শ্রীযুত কেদারনাথ, শ্রীমৎ নবদ্বীপ দাস, শ্রীল গোপাল মিত্র প্রভৃতি মহা অধিকারী ভক্তজনের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছেন, শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিত শ্রীল চম্পটি ঠাকুরের একটি উক্তিও পাঠ করিয়াছেন। তবু স্থির-সিদ্ধান্ত হয় নাই. তারপর চম্পটি ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। তখন পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত

হইতে পারেন নাই। তারপর শ্রীশ্রীধাম বাকচরে শ্রীঅঙ্গনে অবস্থানকালীন একদিন অকস্মাৎ শ্রীশ্রীপ্রভু এমন একটি বুদ্ধিযোগ দান করিলেন যেন সব দর্পণের মত নির্মল হইয়া গেল। নিকটে পণ্ডিত প্রবর হারানচন্দ্র ভাগবতভূষণ মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি লেখনী লইয়া লিখিতে লাগিলেন—

"শ্রুত আছি * * * * আবির্ভূত হইলেন।"

এই বিদ্বদনুভূতি মহামহা প্রমাণ। নিগূঢ় জন্মতত্ত্ব ইহাতে নিহিত আছে। মহাধর্ম-স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভুবন্ধুর মহামহা তত্ত্ব ইহাতে সুব্যক্ত। সুধী মহাজন পরিগৃহীত শাস্ত্রসম্মত সুসিদ্ধান্ত হইতে পরিস্ফুট। ইহার প্রত্যেকটি পদ সার্থক সপ্রয়োজন। তাহা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ক্রমেই 'আত্মস্থ' পদটির নিগূঢ় রস মাধুর্য আরও কিঞ্চিৎ আস্বাদন করতঃ উপসংহার করিব। জয় জগদ্বন্ধু।

* * * *

শ্রীহরির জন্মের রহস্য এই যে, তিনি কখনও এই জন্ম-জরাময় জগতে জন্মগ্রহণ করিতে-পারেন না কেবল প্রকাশিত হয়েন মাত্র। এই জন্যই শ্রীগীতাতে স্বকীয় জন্মকে পার্থিব না বলিয়া দিব্য বলিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"এসব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।" চৈঃ ভাঃ

অর্থাৎ আবির্ভাব তিরোভাব উক্তিমাত্র, যথার্থ নহে।

তিনি প্রকাশিত বা প্রকট হয়েন, কখন? যখন ভক্ত তাঁহাকে ডাকে। আকুল হৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে অনন্যমনা হইয়া ঐকান্তিক ভাবে ভক্ত যখন কাঁদে—এক কথায় ভক্ত যখন আত্মস্থ হয়। দাস্য-সখ্যাদি রসের ভক্ত যখন ঐ ঐ রসের অতল তলে নিমগ্ন হয়, তখনই শ্রীহরি তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া থাকেন। ভক্ত যখন দাস্য ভাবে কাঁদে, তিনি তখন প্রভু হইয়া আসেন,ভক্ত যখন সখ্যরসে গলাটি ধরিতে চায়, তিনি তখন প্রাণসখা হইয়া আসেন, ভক্ত যখন কান্তাভাবে প্রাণনাথ বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়, তখন তিনি হৃদয়-স্বামী হইয়া আসেন, যখন ভক্ত বাৎসল্যে অধীর হইয়া 'আয় রে যাদু' বলিয়া কোলে তুলিয়া লইতে চায়, অনন্তানন্তময় ভগবান্ তখন পুত্র হইয়া তাহার স্তন্য পান করেন। ইহাই জন্মরহস্য। কাহারও গর্ভ হইতে বাহির হইয়া তিনি পুত্র হয়েন না। তাহা হইলে স্ফটিক-স্তম্ভকেও পিতা বলা যাইত, পরীক্ষিৎ রক্ষার্থ উত্তরার গর্ভ প্রবিষ্ট ভগবানের উত্তরাই মাতা হইত। শ্রীশ্রীপ্রভুর সহিত কাহারও কোন মায়িক সম্বন্ধ নাই, থাকা সম্ভব নহে। প্রেম-প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া জীবে ও ভগবানে কোন সম্বন্ধ নাই, ছিল না, কোনও কালেই থাকিবে না।

"ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।।"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভক্ত ছাড়া কৃষ্ণের আর কেহ নাই। এই মায়িক জগতে যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ-

যুক্ত হইয়া আমরা পিতা-মাতা, দাদা, কাকা, বলিয়া একে অন্যকে ডাকি, জানি ও প্রীতি করি; শ্রীশ্রীপ্রভু সম্বন্ধে কুত্রাপি তাহা নহে। যাজ্ঞিক পত্নীগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে তাহারা পুত্রভাবে অন্নদান করিয়াছিলেন? শচীদেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর কোন্ সম্বন্ধ ছিল? কী হেতুই বা "জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে" এই কথা শচীদেবী কহিয়াছিলেন? কী হেতু "অন্ন দেহ মাতা মোরে বড় ক্ষুধা করে" বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শচীমাতার নিকট অন্ন চাহিয়াছিলেন? শ্রীবাস-ঘরণী মালিনীর সঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে "পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়" এই কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন? ভক্তবর কেদার শীলের সঙ্গে প্রভু বন্ধুর কোন্ সম্বন্ধ ছিল যে তাঁহাকে তিনি কাঁহা (কাকা) বলিয়া সম্বোধন করিতেন? ভক্তকুলমণি গোপাল মিত্রের সঙ্গেই বা তাঁহার কী সম্বন্ধ ছিল যে তাহাকে "জ্যেঠা" বলিয়া আদর করিতেন? ঐ শুনুন জ্যেঠা মহাশয় ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে কী গাহিয়াছেন—

"ভক্ত লাগি প্রভু সহেন কত তাপ,
আদরে কারে বা বলেন খুড়ো বাপ।
আবার অভক্ত পাষণ্ড, তাও না করে দণ্ড;
'জ্যেঠা' বলে তারে বাড়ান সম্মান।।"

ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্, এই তিন লইয়াই যত লীলাখেলা ও আনন্দের মেলা। আবার অধিক কী বলিব, শ্রীমুখে একদিন কহিয়াছেন—

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর।।"

অতএব কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভগবান্ তাহার সহিত মাতা-পুত্র সম্বন্ধ করেন ইহা অতি অশাস্ত্রীয় কথা। শ্রীভগবান্, শান্ত-ভক্ত নারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, দাস-ভক্ত হনুমানাদিরও তেমনি, সখা-ভক্ত শ্রীদামাদিরও তেমনি, বাৎসল্য-রসের ভক্ত নন্দ-যশোমতীরও ঠিক তেমনই প্রেমের বিষয়; জগন্নাথ-শচীদেবীরও ঠিক তেমনই, দীননাথ-বামাদেবীরও ঠিক তেমনই প্রেমের বিষয়। তবে কি বাৎসল্য প্রেম হৃদয়ে থাকিলেই তাহাকে আমরা পিতামাতা বলিয়া জানিব? না, তাহা নহে। তদ্রূপ হইলে উপানন্দ, কৃত্তিকা, ধনিষ্ঠা, অদ্বৈতগৃহিণী-সীতাদেবী সকলকেই মাতা পিতা বলিতে পারিতাম, গোলোকমণি দেবী, রাসমণি দেবী বা দিগম্বরী দেবী প্রভৃতি যাঁহারা সন্তান-স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহাদিগকেই মাতা বলিতে পারিতাম, অথবা যে দুঃখীরাম ঘোষকে প্রভু নন্দ ঘোষ বলিয়াছিলেন তাহাকে বা চন্দননগর নিবাসী ডাক্তার দয়ালচন্দ্র ঘোষ বা শ্রীরামবাগানের পীতাম্বর বাবাজী যাঁহাদিগকে প্রভু 'তাত' সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই পিতা বলিতাম। এ সম্বন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত শুনুন। যেরূপ বাৎসল্য প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব সম্ভব হয় না, নন্দ-যশোমতীর হৃদয়ে সেই প্রেম প্রচুর, আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলি—জগন্নাথ-শচীদেবীর সেই রূপ প্রেম প্রচুরতর মধুরতর, দীননাথ বামাদেবীর হৃদয়ে সেইরূপ প্রেম আরও গাঢ়তর আরও ঘনীভূত, প্রচুরতম মধুরতম। এইজন্য শ্রীব্রজমণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীব্রজরাজ দম্পতীকেই আমরা পিতামাতা বলি, এই জন্য

শ্রীগৌড়মণ্ডলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীমিশ্র-দম্পতীতেই আমরা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব আরোপ করি, এই জন্যই আজ শ্রীশ্রীবন্ধু মহামণ্ডলের ভক্তকুলের মধ্যে আমরা শ্রীন্যায়রত্ন-দম্পতীকেই পিতামাতা বলিয়া মনে করিতেছি। তবে গোলোকমণি দেবী, দিগম্বরী দেবী, দুঃখীরাম ঘোষ, পীতাম্বর বাবাজী, দয়াল ঘোষ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের যাঁর যেমন অধিকার, যাঁর বাৎসল্য প্রেম যেমন ঘনীভূত, প্রভু তাঁহাকে তদনুযায়ী আদর আব্দার করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও ভালবাসিতে অধিকার দিয়াছেন। এখন কথা এই যে, দেবকী শচীমাতা প্রভৃতি জননীগণ যখন সর্বদাই ঐ বাৎসল্য-ঘন রসের ভক্ত এবং ভগবান্ তাঁহাদের প্রেমেই আকৃষ্ট হইয়া অঙ্কদেশে প্রকট হইয়াছেন তখন কোনও নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার প্রকাশ হইল কেন, যে-কোন সময়ই তো হইতে পারিত। ইহার উত্তর এই, "যখন আত্মস্থা হইলেন তখন আবির্ভূত হইলেন।" ভক্ত সর্বদা ভক্তিতে গদ্‌গদ থাকে তাই বলিয়া ভগবান্ সর্বদাই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন না। শ্রীমুখেই কহিয়াছেন 'ভক্তের হৃদয়ে মোর সতত বিশ্রাম', তিনি সর্বদা ভক্ত-হৃদয়ে বাস করেন। যখনই ভক্ত আত্মস্থ হয়, তখনই হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া বাহিরে আবির্ভূত হয়েন। বাৎসল্য-রস-ঘন মূর্তি জননীর সম্মুখে যখন ঐভাবে প্রকাশমান হয়েন তখনই আমরা ভগবান্ জন্মিলেন এই কথা বলি। ইহাকেই বলে জন্ম-রহস্য। "যখন আত্মস্থা হইলেন তখন হৃদয়সরোজ বিকশিত করিয়া আবির্ভূত হন"—এই বাক্য কয়েকটির মধ্যে ঐ রহস্য সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে। এই জন্য মহাধর্ম মহাউদ্ধারণ তত্ত্ববিচারে ঐ কয়টি কথাকে মহা মহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই রহস্য প্রকাশ যে আজই একেবারে নূতন হইল তাহা নহে, তবে এইরূপ সরল সুন্দর ভাষায় সম্পূর্ণ তত্ত্বটি প্রকাশ এই নূতন বটে। ইতঃপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীলঘুভাগবতামৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে-সব কথা পূর্বে একবার আলোচনা করিলেও আবার লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভক্তগণ পুনরুক্তিকে দোষ মনে করিবেন না। লীলাময়ের ঐ লীলামাধুরী যতবার আস্বাদন করা যায় ততই মধু উঠে। একই লীলাতত্ত্ব নিত্য স্মরণ করিয়া ভক্ত নিত্য নূতন তথ্য আহরণ করে, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না। মাদৃশ ভজনবিমুখ জীব তাদৃশ আস্বাদনের অধিকারী না হইলেও গর্দভ কর্তৃক আনীত শর্করা দ্বারা যদ্রূপ মহাজনের ও ক্রেতা-বিক্রেতার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তদ্রূপ কোন ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের কারণ হইলে কৃত-কৃতার্থ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবতকার বসুদেবের কথা লিখিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শ্রীভগবান্ তাঁহার মনে প্রবেশ করিলেন (আবিবেশ অংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ)। তারপর তৎকর্তৃক বেদ- দীক্ষা দ্বারা অর্পিত হইয়া দেবকীর মনে প্রবেশ করিলেন দেবকী তাঁহাকে মন দ্বারাই ধারণ করিলেন (দধার মনস্তঃ)। ভক্তগণ উপরোক্ত বাক্যভঙ্গী অনুধাবন করুন, বুঝিবেন ভগবান্ মনে প্রবেশ করিলেন—ইহা শ্রীশুকদেব কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। আমরা একটু বিপরীত করিয়া তত্ত্বটি আস্বাদন করিয়া লইব। ভগবান্ গিয়া মনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মন গিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। আগে বসুদেবের মন শ্রীকৃষ্ণেতে থাকিল, তারপর তাহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে দেবকীও কৃষ্ণপ্রাণা হইলেন। শ্রীরূপ লঘুভাগবতামৃতেও এই কথাই জানাইয়াছেন। তারপর সেই মনঃপ্রবিষ্ট ভগবান্ কী খাইয়া বাঁচিয়াছিলেন—শ্রীরূপ বলিলেন—দেবকীর বাৎসল্যের

এক স্বরূপ প্রেমানন্দামৃত পান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ইহা হইতে কী বুঝিতে পারেন? বাৎসল্যরসে ডুবিতে ডুবিতে যেদিন উভয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইলেন সেইদিন সেই সময়ে তাহাদের বিকশিত হৃদয়-সরোজ হইতে তিরোভূত হইয়া ক্রোড়ে উদিত হইলেন। শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার জগন্নাথ ও শচীদেবীর কথোপকথন লিখিয়াছেন—

"জগন্নাথ কহে, মুই স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।।
আমার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়।।"

এই স্বপ্ন স্বপ্ন নহে ইহাই বাস্তবিক সত্য, একমাত্র মহাসত্য। পৌর্ণমাসী যোগমায়ার আবরণে সত্যকে স্বপ্ন মনে হয়, স্বপ্নকে সত্য মনে হয়। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন—

"সাক্ষী পৌর্ণমাসী
ও তা জানে বসুধা-ধনে"

বস্তুতঃ বসুধা-ধন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইতে এই তত্ত্ব স্ফুরণ হয়।

এখন কেবল একটি প্রশ্ন থাকিল, যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে পুনঃ পুনঃ দশমাস গর্ভের কথা উল্লেখ রহিয়াছে কেন?

এ সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি যে, অধিকারী ভক্তজন নানা প্রকার ভঙ্গী করিয়া কথা বলেন। শ্রীশুকদেব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচম্পটী ঠাকুর পর্যন্ত সকলেই বাক্যে ঐরূপ চতুরতা করিয়াছেন। কোন বস্তুর পূর্ণতা বুঝাইতে আমরা বলি 'যোল কলা', কখনও বলি 'যোল আনা', এখানে যেরূপ ষোল পদের আক্ষরিক অর্থ ধরিতে হয় না, তদ্রূপ দশমাস স্থলে দশ শব্দের আক্ষরিক অর্থ লইতে হইবে না। পূর্ণতা জ্ঞাপনই ঐ সব পদের তাৎপর্য। প্রাকৃত পুত্র জন্মিবার পূর্বে পিতা হইতে মাতাতে সংক্রমিত হইয়া শিশু মাতৃগর্ভে বাস করে, আর অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ পুত্র হইবার পূর্বে ঐ বাৎসল্য রস, কৃষ্ণকথা দ্বারা পিতা হইতে মাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে, উভয়ে সেই বাৎসল্য দ্বারা শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে থাকেন। চতুর শ্রীশুকদেব একটু রসিকতা করিয়া আস্বাদন করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই বাৎসল্য রসে বাস করেন। কাজেই উপমাটি বেশ ভালই লাগিল। কাজেই গর্ভ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া শ্রীশুক গোসাঞি দৃষ্টান্তটিকে বেশ জমাইয়া লইলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে প্রাকৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়; আর ঐ বাৎসল্য রস ঘনীভূত হইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা আত্মস্থ হয়েন। বাহিরের আর কিছু মনে থাকে না। সেখানে কেবল 'আমি আর গোপাল' থাকে। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ ছাড়া তখন বিশাল বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ বাৎসল্যের আশ্রয় পিতামাতা; বিষয় শ্রীভগবান্। আত্মস্থ হইলে ঐ 'আশ্রয়' আর ঐ 'বিষয়' ছাড়া জগতের কিছুই থাকে না, সম্পূর্ণ তন্ময় হইলে, চিত্ত একমাত্র তদ্‌গত থাকে। তখনই যাবতীয় শুভ গ্রহের সংযোগ হয়, তখনই রাহু আসিয়া কলঙ্কী চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলে—তখনই পুষ্পবন্ত সনে মহেন্দ্র মিলিত হয়—তখনই তুঙ্গে উঠিয়া পঞ্চগ্রহ নাচিতে থাকে আর ভগবান্ কখনও কারাকক্ষকে কখনও গঙ্গার বক্ষকে উজল করিয়া প্রকাশ হয়েন। এই পূর্ণত্ব

বিজ্ঞাপনের জন্যই চতুরতা করিয়া দশমাস গর্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আরও পূর্ণতরতা জানাইবার জন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ত্রয়োদশ মাসের কথা কহিয়াছেন। এত ভঙ্গী করিয়া চাতুর্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগের হেতু কী? শ্রীরূপ নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন (অতিরহস্যত্বাৎ) 'ইহা অতিরহস্য সেই জন্যই ঐরূপ করিতে হইয়াছে।' কেবল শ্রীশুকদেবকে কেন, শ্রীশ্রীপ্রভুকে পর্যন্ত চতুরতা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। কেন না 'অতি রহস্যত্বাৎ' ইহা অতি রহস্য সেই জন্য। প্রথমতঃ অবতার রহস্য পূর্ণাবতারী আরও রহস্য তারপর মহাবতারী, সে আরও অতি অতি রহস্য; তারপর তাঁর জন্মকথা অতি অতি রহস্যতম—রহস্যের চূড়ান্ত। তাহাই ভেদ করিতে আজ এত বাগাড়ম্বর করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা—শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণা, শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের আশীর্বাদ ও শ্রীগুরুদেবের করুণাপ্রসূত বুদ্ধি-যোগ। আমি বিষয়-বিমূঢ় জীব, প্রমাদাদি দোষ থাকাই স্বাভাবিক। ভ্রম-প্রমাদ কতটা আছে পরম দয়াল বান্ধবগণ দর্শাইয়া অনুগৃহীত করিবেন—বিপ্রলিপ্সা যে নাই তাহা খুব জোর করিয়া বলিতে পারি। তবে করণাপাটব যে আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ, লেখনী, মসীপাত্র, ভাব, ভাষা, সর্বোপরি আমার মন ও বুদ্ধি—যাহাদিগকে করণ করিয়া এই দূরধিগম্য রহস্য উদ্‌ঘাটন কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই যে অপাটব বা অপটুতা আছে তাহা বেশ অনুভব করিতেছি। কোনও কালে কোনও দিন পটুতা লাভ করিতে পারিবে কিনা স্বয়ং কর্তাই জানেন। যাহা হউক, এই পর্যন্ত এই নীরস বিচার স্থগিত রাখিয়া বাৎসল্য-রসাভিষিক্ত দম্পতি-যুগলের অনুসরণ করিব।

অই দেখুন! সোনার চাঁদ বুকে লইয়া একটি উদ্বেলিত স্রোতস্বতী ধীর মন্থর গমনে চলিয়াছেন। দু'টি বাহুলতা বেষ্টনে একটি ননীর পুতুল হৃদয়ে ধরিয়া স্বামীর অঙ্গাবলম্বনে পতিপ্রাণা সতী অগ্রসর হইতেছেন। অঙ্গের ছটায় প্রকৃতি দেবী হাসিতেছে, প্রেমসুধারস মাখা কত সুষমারাশি ঝরিয়া পড়িতেছে, কুঞ্জকানন কাঁপাইয়া পিকবধূ ললিত রাগিণী তুলিয়াছে,—

ঘোরা রজনী প্রভাত হ'ল, মোহ ঘুমঘোর ভাঙ্গিল।
সোনার বরণ তরুণ তপন, পূরব গগনে উদয় হ'ল।।

বরজ-কুসুম সুবাস ছড়া'য়ে, মলয় বাতাস ধীরে ধীরে বঙ্গ হ'তে সারা জগৎ জুড়িয়ে মৃদুমন্দভাবে বহিতে লাগিল। 'জয় জগদ্বন্ধু' ধ্বনিটি শুনিয়ে, ত্রিধারা মরি একধারা হ'য়ে, সাগর কল্লোলে কল্লোল মিলায়ে, কুলু-কুলু নাদে গাহিতে লাগিল।

সে রাগিণীর ঝঙ্কার বহিয়া পবন-বাহক প্রতি দ্বারে দ্বারে নির্ঘোষ ঘোষণা করিতেছে। মঙ্গলবার্তা পাইয়া বিশ্ববাসী নাচিয়া উঠিয়াছে। মাধুর্য-নলিনী পুলকে স্পন্দিত হইয়া চারু মুখ-খানি খুলিয়া দিয়াছে, পথে পথে পরাগময় মুক্তাবিন্দু ঝিকমিক্ ঝিকমিক্ খেলা করিতেছে।

গৃহে পৌঁছিয়া দীননাথ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। আধার কুটীর আলো করিয়া, শয়ন শয্যাকে ধন্য করিয়া শিশুবন্ধু শয়ন করিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে যে, অপ্রাকৃত বস্তু যিনি, প্রাকৃত ভাবে গর্ভে আসিতে না পারিয়া, বাৎসল্য-রসাশ্রয়ে ধরায় আসেন বটে, কিন্তু প্রাকৃত শয্যা আসন বসন ভূষণ আহার্য বস্তু কী করিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত আত্মস্থ হইলে ভগবান্ আসেন একথা বেশ, কিন্তু ঐ সকল জড় বস্তুর তো আর সাধনযোগ্যতা নাই,

কাজেই কী করিয়া ঐ সকল প্রাকৃত জাগতিক বস্তুজাত তাহার অপ্রাকৃত অঙ্গের সেবার উপযোগী হয়? এই যে ভাবুক ভক্ত সমাধান করিয়াছেন—

"আমার ধ্রুবতারা লিখেছে চিঠি,
সে আকাশ হতে খসে পড়েছে।
ভূতলের মাটি করিতে খাঁটি,
মধুর উজ্জ্বল রস এনেছে।।"

আমরা দেখিয়াছি, ধরায় আগমন করিবার পূর্বে বাৎসল্য-বিগ্রহ পিতামাতাকে প্রেরণ করেন, কেননা, ঐ বাৎসল্য-রস না হইলে তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ আগমনের পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেরণ করেন। কারণ শ্রীনিত্যানন্দ না আসিলে ভূতলের মাটি খাঁটি হয় না। পরম দয়াল নিত্যানন্দের করে প্রেম ঝরে। উজ্জ্বল রস ছড়াইয়া তিনি নূতন প্রেমের কনক পৃথিবী সৃজন করেন।

প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দের পরশে নূতন আকাশে নূতন চাঁদ উঠে, নূতন বাগানে নূতন ফুল ফোটে, নূতন ভ্রমর নূতন মধু লুটে, নূতন অবতারী নূতন জগতে নামিয়া আসেন। এই জন্যই বিশ্বরূপ রূপে তিনি শ্রীগৌরাগ্রজ, শ্রীবলরামরূপে তিনি কৃষ্ণাগ্রজ, এই এই জন্যই শ্রীগুরুচরণ রূপে তিনি শ্রীবন্ধুর অগ্রজ।

আমরা দেখিতে পাই, যতবার তিনি আসিয়াছেন ততবারই সঙ্কর্ষণ আসিয়াছেন। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা বলিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত একাধিক স্থলে 'অংশেন' ব্যবহার করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন এই 'অংশেন' অর্থ যে 'সংকর্ষণেন' তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণের তিনি 'বল' স্বরূপ তাই তিনি বলরাম, আদর করিয়া যশোমতী বলেন 'বলাই'। এই বলরাম, শ্রীনিত্যানন্দেরই বিলাস মূর্তি। রাম লীলায় লক্ষ্মণও সংকর্ষণ মূর্তি। তারপর বিশ্বরূপ—বিশ্বকে তিনি রূপ দেন, কোন্ রূপ? শ্রীগৌরসেবার উপযোগী রূপ। এই পার্থিব রূপ বদলাইয়া তিনি অপ্রাকৃত রূপ দান করেন। তিনি ভিন্ন শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না,—

"তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার।।"

তারপর শ্রীগুরুচরণ। শ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রকাশের পূর্বে দীননাথ ও বামাদেবীর অঙ্গ হইতে কৈলাস-কামিনী রূপে যেমন যোগমায়া আসিয়াছেন, তেমনি গুরুচরণরূপে শ্রীঅনন্তের মূলতত্ত্ব প্রকট হইয়াছেন। তিনি আসেন কেন? রাজা আসিবার পূর্বে অমাত্য আসিয়া যেমন আসন রচনা করেন। গুরু-বন্ধুর আসিবার পূর্বেও তেমন তাঁহার শ্রীচরণ রাখিবার পাদপীঠ রচনা করিতে শ্রীগুরুচরণ আসেন উজ্জ্বল রস মাখাইয়া ভূতলের মাটিকে খাঁটি করিতে তিনি আগে ছুটে আসেন। সংকর্ষণ অনন্তরূপ। অনন্তরূপে তিনি অনন্তানন্তময়ের সেবা করেন। যে কুটীরখানিতে শ্রীশ্রীপ্রভু প্রবেশ করিলেন, যে শয্যাখানি তিনি গ্রহণ করিলেন, যে বস্ত্রখানি তিনি ধারণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত জগতের জড় বস্তুর বিকার নহে। বিশুদ্ধ চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার বা অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের বিলাসমূর্তি। ইহা কবি-কল্পনা নহে। শ্রীনিত্যানন্দ পদমকরন্দপানে

সতত উন্মত্ত যে-সকল ভক্তভৃঙ্গ শুধু তাঁহারাই এই তত্ত্ব-রস আস্বাদন করিতে পারেন। এই শুনুন শ্রীনিতাই-সর্বস্ব ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্বকীয় অনুভূতি—

"মূর্তি ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষ্মণ অবতারেই প্রকাশ।।
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র যত ভূষণ আসন।।
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে।।"

কেবল নিজে অনুভব করিয়াই ঠাকুর মহাশয় তুষ্ট হয়েন নাই, "অনন্ত-সংহিতা" গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন।

"নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনঃ।।"

ধরণী দেবী শেষদেবকে কহিতেছেন, "হে দেব! মানুষ যে তোমাকে 'শেষ' বলে তাহা যথার্থই বলা হয়, যেহেতু শেষ পর্যন্ত যা কিছু সবই তুমি। বিভিন্ন মূর্তি ধরিয়া বিভিন্ন রূপে তুমিই তোমাকে সেবা কর। কারণ, আমার পৃষ্ঠদেশে যত প্রকার বস্তু আছে, সবই পার্থিব মৃত্তিকার বিকার—সবই জড়বস্তু। কিন্তু তুমি যখন আমাকে (পৃথিবীকে) ধন্য করিবার জন্য আমার তপ্ত বুকে শ্রীচরণার্পণ করতঃ অবতরণ কর তখন থাকিবাব মন্দিব, বসিবার আসন, বস্ত্র, উপাধান, শয্যা ছত্র এমন কি শ্রীপাদুকাখানি পর্যন্ত—যাহা কিছু সেবোপকরণ গ্রহণ কর তাহার কিছুতেই পার্থিবত্ব থাকে না। নিজেই অশেষ প্রকারে অশেষ স্বরূপ প্রকাশ করতঃ নিজেই সেবা করিয়া থাক। এই জন্যই তোমার শেষ নাম সার্থক।" তাই বলিতেছিলাম, শেষাবতার শ্রীনিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা বলেই এই মাধুর্যময় তত্ত্ব অনুভব হয়। স্বয়ং শ্রীবন্ধুহরিও তাই একদিন শ্রীমুখে উক্তি করিয়াছেন,—

"যে-বস্তুর যতক্ষণ পর্যন্ত সুকৃতি থাকে ততক্ষণই তাহা এই অঙ্গে ধৃত হইতে পারে"— অর্থাৎ এই বিশ্বমাঝে সুন্দর শোভন বস্তু একমাত্র আমি। আমারই কৃতি বা স্বরূপভেদ দ্বিতীয় মূর্তি শ্রীনিতাই। তাঁহারই প্রকাশফলে প্রাকৃত বস্তু সমূহ যখন অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া উঠে তখনই তাহা মায়াগন্ধহীন জড়াংশরহিত এই অঙ্গের সেবোপযোগী হইতে পারে। হয়ত একদিন বহুবার শ্রীভোগ নিবেদন করা হইতেছেন, শ্রীশ্রীপ্রভু কিছুতেই গ্রহণ করিতেছেন না; অনেকবার পরে শেষে একটিবার কিছু গ্রহণ করিলেন। এইরূপ হইবার কারণ এই যে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাসে যে বস্তুটি জড়ত্ব বর্জিত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য ভাবময় না হইয়াছে, সেটি ভাবের ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভুর 'ভাব-বল্লরী-জড়িত-মাধুর্য-প্রতিম' শ্রীঅঙ্গের সেবোপযোগ্য হইতে পারে না। তত্ত্ব-রসিক শ্রীঠাকুর মহাশয় এই জন্যই গাহিয়াছেন—

"নিতাই-পদকমল, কোটি চন্দ্র-সুশীতল,
যে-ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।"

এবার শ্রীসংকর্ষণ গুরুচরণ রূপে প্রকাশিত হইয়া গুরুবন্ধুর মহাউদ্ধারণ লীলা সুফলা করিয়া ক'দিন পরেই লীলার সৌকর্য বিধানার্থ লোক-লোচনের অগোচর হয়েন।

শ্রীশ্রীবন্ধুর অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অদৃশ্যভাবে অনন্ত বিশ্বে বিচরণ করতঃ জীবজগতের প্রাকৃতত্ব ঘুচাইয়া দিয়া ঐ শ্রীচরণসেবার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সতত ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছেন। অযাচিত কৃপাবলেই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া এই সব লীলারহস্যের মর্মভেদ করা যায়। কাজেই সামান্য জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব শ্রীদীননাথের যে কুটীরে উদয় হইয়া যে শয্যাখানি আলোকিত করিলেন তাহা বিশ্বরূপ নিতাইচাঁদেরই যে একটি মূর্তি ইহাতে সংশয় মাত্রও নাই।

আজ দীননাথ কুটিরে ভক্ত-ভগবানের অপূর্ব সম্মিলন হইল। অন্তরালে যোগমায়া কৈলাস-কামিনী চোখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। পঙ্কজবদনে হাসির পাপড়ি ফুটিয়া উঠিল। 'অনন্ত যাহারে ধ্যানে নাহি পায়' তিনি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী ক্রোড়ে দুলিতে লাগিলেন। স্থায়ীভাব—মধুর মধুর বাৎসল্য রসমাধুরী। আশ্রয়—দীননাথ-বামাদেবী, বিষয়—নব প্রস্ফুটিত শিরীষ কুসুম-কান্তি শিশু-বন্ধু। বামাদেবী স্বভাবতঃ মধুর মূর্তি, তাহাতে নবোদিত শিশুর অঙ্গচ্ছটায় যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছেন। সাত্ত্বিক পুলকে তনু পরিপ্লুত হইতে লাগিল, স্তনযুগল হইতে অবিরল ধারে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল, ফলে শতবার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করতঃ ঘনঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, তবু অতৃপ্ত তৃষ্ণা সহস্রধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাই পরম বৈচিত্র্য। কনকরুচি শিশু ওঙা ওঙা কাঁদিতে লাগিল, অপার্থিব হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে দীননাথের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিতে লাগিল। অনন্তভাবে অনন্ত হিল্লোলে বাৎসল্য-ব্যরিধি টলমল করিতে লাগিল। জয় জগদ্বন্ধু! জয় জন্মলীলা! জয় জয় বাৎসল্যরূপিণী শ্রীবামাদেবী, জয় জয় পিতৃ-শান্ত-মূর্তি শ্রীদীননাথ।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া পাড়া প্রতিবেশী সকলে ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অমানুষিক রুচি লাবণ্য, নিরুপম হাসি ও চাহনি দেখিয়া বাৎসল্যময়ী জননীগণের স্তনধারা গলিয়া পড়িল।

"সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা খান,
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।।"

সেই ভাগ্যবতী জননীগণের অনেকেই ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেবল সাক্ষ্য দিবার জন্য কমলাক্ষবাবুর বাড়ীর একটি বৃদ্ধা মাতা ও শ্রীযুক্তা মহালক্ষ্মী দেবী এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছেন। বহরমপুরের ভক্তবর জ্ঞানেন্দ্রের নিকট ঐ মাতা একদিন বলিয়াছিলেন, 'ওগো

তোমাদের জগদ্বন্ধু যে অযোনিসম্ভব। ন্যায়রত্নের ছেলে হয়েছে শুনিয়া আমরা সবাই দেখিতে যাই। গিয়া দেখি কি আশ্চর্য। পুত্রপ্রসব হইলে স্ত্রী-শরীরে যে সকল পরিবর্তন হয়, প্রসূতির দেহে সেরূপ কোন লক্ষণই দেখিলাম না। আর খোকাটিকে দেখে ঠিক চার-পাঁচ মাসের ছেলের মত মনে হতে লাগল।" ভাগ্যবতী মহালক্ষ্মী দেবীও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত দেবেনবাবুর নিকট প্রভুর অযোনিসম্ভবত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। দিনের পর দিন ঐরূপ কত ভাগ্যবতী আসিয়া ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য দর্শনে নয়ন সফল করিল। জননীগণ! তোমরা ধন্যা, সুন্দরীশিরোমণি বামাসুন্দরীর সুন্দর অঙ্কে জগৎসুন্দর যখন দু'হাতে ধরিয়া স্তন্যপান করেন তখন যে কী চমৎকার শোভাটি হয় তাহা একমাত্র তোমরাই—স্বীয় স্বামীপুত্রের কথা ভুলিয়া দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলে! দীননাথের পর্ণকুটীরে প্রত্যহ কত লোক আসে, কেহ কাহাকেও জানে না। দাসঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন আনন্দে বিহ্বল হইয়া কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই—

"দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেব-নরে একত্র হইল ভালমতে।।"

রসিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস বুঝি দিব্যচক্ষে তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন—

"সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচীরম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করে দরশন।।"

চতুর পদকর্তা বুঝি দিব্যকর্ণে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়াছেন।

তোর এ বালক কমলকোরক সকল সুষমা খনি।
হাসে রাকাশশী, পদনখে বসি, পরাণ পরশমণি।।
শুন দীননাথ প্রিয়ে!
কী জানি কী গুণে, লভি এ রতনে, শীতল করিলি হিয়ে।
শুধু তোরা নয়, ধন্য বিশ্বচয়. পড়শী মোরা কা কথা।
শিশু বটে হয়, বিষ্ণু চিহ্ন গায়, পরশে জুড়ায় ব্যথা।।
বুঝি মুরহর, শ্রীকৃষ্ণকিশোর, কিবা গৌর অঘহারী।
চারিহস্ত দেহ, দে'খেছ কি কেহ, নাম জগদ্বন্ধু হরি।।
মহীনের জ্ঞানে, দৈবজ্ঞ বচনে, এ যে নলিনাক্ষ হরি।
জন্মলগ্ন তুঙ্গে, পঞ্চ গ্রহরঙ্গে, দিল সাক্ষী অবতারী।।
জয় জগদ্বন্ধু হরি। জয় মহাউদ্ধারণলীলা।।
শ্রীবামানয়নানন্দং ডাহাপাড়াপুরন্দরম্।
দীননাথস্য জীবিতং নমামি শিশুসুন্দরম্।।

(জন্মরহস্য সমাপ্ত)

মহানামব্রত ☐

গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রহ্লাদ পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। বুকে ধরিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করতঃ শিরাঘ্রাণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু কহিলেন;—

"প্রহ্লাদানুচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্।।" ভা. ৭/৫/২২

বৎস! এতাবৎ কাল গুরুর নিকট হইতে যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম যে কথাটি তাহাই বল, শুনি।

প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, পিতঃ!

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।। ২৩।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" ২৪

জীবের চরম পরম প্রয়োজন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম। আর তৎপ্রাপ্তির উপায়—

"শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন।।" চৈঃ চঃ।

"এই নয়টি অঙ্গ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত হইলেই সব হইল। পিতঃ! যাহা পড়িয়াছি, তাহা মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম পড়া।"

বস্তুতঃ, সাধনের এই নয়টি অঙ্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। তন্মধ্যে শ্রবণ ও কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সহজসাধ্য নহে। দেহ ও মন দুইটি না হইলে শ্রবণ বা কীর্তন হয় না আর সেই দুইয়ের সহযোগিতা সর্বদা ঘটিয়া উঠে কই? তাই শ্রীগোস্বামিপাদ তৃতীয় অঙ্গটির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

স্মরণ মনের কার্য। কেবল তাহাই নহে, শ্রীশ্রীঠাকুর নরোত্তম কহিয়াছেন "মনের স্মরণ প্রাণ"। কথাটি কেবল সুন্দর ও মধুর নহে, গভীর দার্শনিক তথ্য পরিপূর্ণও বটে। জীবের চঞ্চল চিত্ত দিবানিশি কেবল এটা ওটা চিন্তা করিয়া বেড়ায়, একটিবার তাহাকে মোড় ফিরাইয়া প্রাণের দেবতার শ্রীচরণ স্মরণে নিযুক্ত করিয়া দাও, আর সে অমনি সকল ভুলিয়া শ্রীরাতুলচরণ হইতে শ্রীমুখারবিন্দ পর্যন্ত ভাবিতেই থাকুক। সময় নাই, অসময় নাই, দিন নাই, রাত নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, কেবল স্মরণ আর মনন, সেই হাসিরাশি, সেই সাধা বাঁশী, সেই খঞ্জন গমন, সেই করুণ নয়ন। স্মরণ করিতে করিতে মনঃপ্রাণ নবভাবে নবরসে সুরসিত হইবে। কেবল নিজে নহে, বিশ্ব জগৎসহ পরিতৃপ্ত হইবে।

ভজনের এই স্মরণাঙ্গ হইতে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে। আজ শ্যামচাঁদ বিনোদিনীকে লইয়া দোলায় দুলিয়াছিলেন, তাই আজ ঝুলন-উৎসব; আজ কালিয়া বঁধু রাসমঞ্চে

নাচিয়াছিলেন, তাই রাস-উৎসব; আজ শ্রীরঘুনাথের দণ্ড হইয়াছিল, তাই শ্রীরাঘব-ভবনে দণ্ড-মহোৎসব। উৎসব বলিতেই সুখের, আর শ্রীশ্রীজন্মোৎসব যেন সেই সকল সুখের উৎস। ভক্তি-অঙ্গ-শিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীমুখে বলিতেছেন;—

"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।"

আজ ভাদ্রপদী কৃষ্ণা-নবমী; নন্দালয়ে নন্দোৎসবের আনন্দ উৎস ছুটিয়াছে। নিত্যধামে যিনি নিত্যকাল গুপ্ত ছিলেন, আজ নন্দালয়ে সেই আনন্দ-দুলাল প্রথম প্রকাশ হইয়াছেন, তাই সারা গোকুল গোপগোপীকুল সহ পরানন্দরসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। আজ মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী, শ্রীহাড়াই-গৃহিণী পদ্মাবতীর কোল আলো করিয়া মহাভুজ নিতাই আমার একচাকায় উদয় হইয়াছেন। অচিরে আনন্দের বন্যা উঠিবে, তাই কীর্তন রাগে প্রেমের পরাগে ধূলিময় গৌড়মণ্ডলে ধূলট পরিক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা কলঙ্কী চাঁদের গায়ে মালিন্য মাখাইয়া নিষ্কলঙ্ক গোরাচাঁদ, আজ শচীর অঙ্কে উদয় হইয়াছেন। প্রতি প্রাণে তাই পুলকস্পন্দন খেলিতেছে, প্রেমের প্লাবনে শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়া নদীয়াপুর ভাসিয়া যাইতেছে। যেখানে, যেভাবে, যেদিন সেইদিন সেই লীলাটি স্মরণীয়; কিন্তু জন্মোৎসব বিশ্বজীবের। তাই আজ বিশ্ববাসীর আনন্দ। নিখিল শাস্ত্র পুরাণ পড়িয়া পড়িয়া, শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়া শুনিয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়া করিয়া মানুষ জানিয়াছে, তিনি আছেন। কিন্তু আজ এই জন্মদিনে বিশ্বজীব একটি নূতন বার্তা পাইল, তিনি কেবল আছেন নহে, তিনি আসেন। এই মানবের দেশে মানবের বেশ ধরিয়া আসেন। আসেন, ধার্মিকের জন্য; আসেন ধর্মের জন্য; আসেন আমাদের মত মায়ান্ধ পাপীতাপীকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য। কল্পে কল্পে আসেন, যুগে যুগে আসেন। আসেন, আর্তভক্তের ব্যাকুল ক্রন্দনে; আসেন, ভক্তসিংহ অদ্বৈতের তুলসীদলে আবাহনে; আবার "ইচ্ছাধীন-অবতার কী ভয় রে" বলিয়া অভয় হস্ত দু'টি তুলিয়া তুলিয়া ছুটিয়া আসেন; যখনে ইচ্ছা তখনে। তাই আজ শ্রীশ্রীজন্মোৎসবে সারা দেশময় আনন্দ, আনন্দসিন্ধু মাঝে ভক্তবৃন্দ—

"কেহ ডোবে কেহ সাতারিয়ে খেলে রসের উদ্‌গার তুলি।"

আজ শ্রীশ্রীবৈশাখী সীতানবমী। আজ আমার প্রভু আসিয়াছেন। ধন্য বঙ্গাব্দ ১২৭৮। শতধন্য ধাম শ্রীশ্রীধাম, ডাহাপাড়া। ধন্য ধন্য শ্রীশ্রীদীননাথ, ধন্য ধন্য শ্রীশ্রীবামাদেবী।

শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যক্ষ, স্মরণের পক্ষে বাধক। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। ত্রিশবছর যে কী আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে তাহা ভক্তগণ বলিয়া ফুরাইতে পারেন না। ঐ পদ্মমুখের মধুর বাণী শ্রবণ আর যুক্ত করে গলবাসে আদেশ পালন। অহর্নিশি ঐ সঙ্গ, ঐ প্রসঙ্গ, ঐ খেলাধূলা, ঐ রঙ্গরস। ভক্তগণ যেন একটি স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেন। হঠাৎ ১৩০৯ সনে মৌনব্রত গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম শ্রীহস্তে লিখিয়া উপদেশ দিতেন ও কত কথা জানাইতেন। ১৩১৪ সনে তাহাও বন্ধ হইল। তখন কেবল প্রাণমাতানো শ্রীঅঙ্গগন্ধ, আর হৃদয়জুড়ানো গলার সাড়া—ইহাই ছিল ভক্তগণের অবলম্বন। তাই সেইবার হ'তে উৎসব দেখা দিল।

সেবাইত শ্রীকৃষ্ণদাস, উদ্যোগী শ্রীনবদ্বীপ, অগ্রণী শ্রীরমেশচন্দ্র। উৎসব অষ্ট প্রহর বটে,

কিন্তু আনন্দ যেন মূর্তি ধরিয়া শ্রীঅঙ্গনে বিরাজ করিল। এখানে তুমূল কীর্তন, ওখানে পাঠ, এখানে ভাগবত কথা, ওখানে বান্ধবগণের ইষ্টগোষ্ঠী, সেখানে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অগণিত নরনারীর মহাপ্রসাদে পরিতুষ্টি। সেদিন শ্রীঅঙ্গনের একটি অপূর্ব শ্রী হইয়াছিল। আনন্দে আনন্দময় নিজেই আত্মহারা হইয়া ভোগ গ্রহণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই ভাবে পর পর ছয় বৎসর কাটিল। ১৩২০ সনে বীরভক্ত বাদল শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় হইতে উৎসব অভূতপূর্বভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তদিবস তুমূল সংকীর্তন চলিতে লাগিল। অসংখ্য নরনারী একত্রিত হইয়া শ্রীঅঙ্গনের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিয়া ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে লাগিল। সেই শুভ দিনে সকলের প্রাণেই এক মহাভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। ঐ শুনুন, প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত মুগ্ধ হইয়া গাহিতেছেন—

'মধুর লগন, প্রেমেতে মগন, সুর নর আদি সবে।
স্থাবর জঙ্গম, সাগর সঙ্গম, বিভোর বঁধুর ভাবে।।
যত পশু পাখি, নাচে থাকি থাকি, আঁখিতে আঁখি রাখি।
প্রকৃতি হাসিছে, সুষমা ঝরিছে, প্রেমসুধারস মাখি।।
বোবায় গাহিছে, খোড়ায় নাচিছে, অন্ধ দেখিছে চেয়ে।
হা বন্ধু হা বন্ধু প্রাণবন্ধু, ছুটিছে সকলে গেয়ে।।"

উৎসবান্তে নগর সংকীর্তন। তারপর কাদামাটি কীর্তন। তারপর জলকেলী। যাহারা সাক্ষাৎ না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে আনন্দের কথা লিখিয়া বুঝাইবার সামর্থ আমার নাই। পার্শ্বে* একখানি চিত্র রহিয়াছে, ওখানি (অনুমান) ১৩২২ সনের কাদামাটির চিত্র। চিত্রের এক দিকে শ্রীকৃষ্ণদাস অপর দিকে ভক্তকুলমণি ডাক্তার শ্রীসুধন্য সরকার শায়িত। মধ্যস্থলে শ্রীরামসুন্দর। চতুর্দিকে অগণিত ভক্ত, সবাই রজঃমণ্ডিততনু। সবাই তন্ময়; জাতিগত সম্প্রদায়গত পার্থক্য, বিদ্যাবুদ্ধি বা বয়োগত বৈষম্য সব ভুল হইয়া গিয়াছে। সপ্ত দিবস কীর্তন-নর্তনে শ্রীঅঙ্গনের রজঃরাণী ধরণীবাস ছাড়িয়া বাতাসে ভর করিয়া আকাশপানে দেবলোকাভিমুখে ছুটিয়াছেন। 'মহীতলং ব্যাসং কুর্বন্ কুর্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্'। ভক্তগণ যেন সেই অতুল অমূল্য রজঃকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না, তাই অশ্রুনীরে কুণ্ডনীর মিলাইয়া সারা আঙ্গিনা কর্দমাক্ত করিয়া পুনঃপুনঃ তাহাতে লুণ্ঠন করিতেছেন আর গাহিতেছেন—

"আয়, হরিনামে মাতি প্রেমে ধূলাতে লুটাই রে।"
'আয়, হরি রসে ভক্তিবশে মাতিয়ে মাতাই রে।।"

এইভাবে ১৩২৮ সন পর্যন্ত উৎসব শেষ হইয়াছে যদিও উৎসবাদির সময় প্রাণারাম প্রভুর দর্শন বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, তথাপি মহাউদ্ধারণ বন্ধুসুন্দরের মনমজানো শ্রীঅঙ্গগন্ধ ও রন্ধ্রপথে বিদ্যুল্লতিকাবৎ এক ঝলক দর্শন প্রাপ্তির আশায় সহস্র সহস্র নরনারী ছুটিয়া আসিত। ১৩২৯ সনে সকলের সে আশাও ফুরাইল। সকলেই জানিল তাহাদের প্রাণারাম প্রভু সাময়িক সম্পূর্ণরূপে লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইয়াছেন। তাই ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে উৎসবানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। দেশকে দেশ উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। এদিকে শ্রীঅঙ্গনের

* ৪৯০ পৃষ্ঠায় ক[illegible] মহোৎসবের চিত্র দ্রষ্টব্য।

উৎসবও দ্বিগুণাকার ধারণ করিল। শ্রীশ্রীমন্দির পরিক্রমণ করতঃ একটি কীর্তনধারা—সে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল, আর শ্রীঅঙ্গন প্রাঙ্গণে সপ্তদিবস আর একটি ধারা, গঙ্গা যমুনার মত উভয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বহিতে লাগিল। এইভাবে ১৩৩৬ সন পর্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে। এবার আবার উৎসবের ধারা ফিরিবে বলিয়া আশা আছে। নবনটবর প্রভু যেমন নিত্য নূতন, ভক্তগণও তেমনি তাহাদের প্রাণের দেবতাকে লইয়া নিত্য নূতন খেলা খেলেন।

ফরিদপুর সহরবাসী ভক্তগণ এবার অগ্রগামী হইয়াছেন। বুঝিবা তাহাদের সেই অতীত স্মৃতি পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান উদ্যোগী মৈত্রকুলতিলক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, অক্ষয়কুমার, মাননীয় মজুমদার, কুলমণি শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র। বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বয়স সকল দিক দিয়াই সহর মধ্যে ইঁহারা বৃদ্ধ। তরুণ ভক্তমধ্যে অরুণ-সম ইন্দুভূষণ, নিত্যগোপাল, কুমার ধীরেন, মঙ্গল, প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। ভক্ত চক্রবর্তী শ্রীসুরেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ইহাদের যেরূপ উদ্যম পরিস্ফুট হইতেছে, তদ্দর্শনে আমরা, এবারকার উৎসবে আনন্দ আরও আরও অধিকতররূপে আস্বাদন করিব, এই আশায় দিন গণিতেছি। জয় জগদ্বন্ধু। ❑

চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র

চারিহস্ত

ভক্তি—ক্ষীর, মধুর অথচ তরল। জ্ঞান—মিশ্রী, মধুর অথচ ঘন। মিশ্রী দুগ্ধ সম্মিলনে দ্রব্যও অদৃশ্য হয়; কিন্তু ক্ষীরের (দুগ্ধের) মাধুর্য বৃদ্ধি না করিয়া লুকায় না। তাদৃগ্‌ধর্মানুবর্তি জ্ঞানঘন বস্তু বিশুদ্ধ ভক্তি-ক্ষীর সংযোগে নিজমূর্তি লুকাইয়া ফেলে, অথচ ভক্তির ঔজ্জ্বল্য মাধুর্যাদি বিবর্দ্ধিত করে। সুতরাং জ্ঞানের আলস্যই ভক্তির পুষ্টিসাধক। জ্ঞান-ভক্তির ঈদৃশ অপূর্ব পাকময় পূর্ণমাধুর্যপুর নিরুপমোজ্জ্বল রসায়ন বস্তুই শ্রীগৌরচন্দ্র—জ্ঞান ভক্তির সরবৎ-সুধা। জ্ঞান উহাতে প্রচ্ছন্ন বা অলস; ভক্তি উহাতে প্রকাশস্বরূপা, নিরলসা এবং তরঙ্গময়ী। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ রাধাসুধাপ্রেম-পীযুষে লুক্কায়িত—"অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ।" জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তির পরামূর্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

ইক্ষুদণ্ড—জ্ঞান; তদ্রস—ভক্তি। ইক্ষু পক্ক হইলে, তদ্রস সুরস সুমধুর হয়। সেই রস আস্বাদন করিতে, ইক্ষু দণ্ড চর্বণ করিতে হয়। রস পান করা হইলে, ইক্ষুদণ্ড ছোবড়া হয় ও পরিত্যক্ত হয়। তদ্রূপ জ্ঞানদণ্ডে (Stalk) সঞ্জাত রসই ভক্তি। তদাস্বাদনে জ্ঞান অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞান ছাড়িয়া ভক্তির উদ্ভব অসম্ভব। এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তির পরামূর্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

$(ক + খ)^৩ = ক^৩ + ৩ ক^২খ + ৩কখ^২ + খ^৩$ গণিতের এই বীজশক্তিতে পরিলক্ষিত হয় যে 'ক' বা জ্ঞানের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে শেষ সংখ্যায় ('খ^৩'তে) শূন্যে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞান কমিতে কমিতে শেষ সংখ্যায় শূন্য হইয়াছে। আবার 'খ' ভক্তি প্রথম

সংখ্যায় শূন্য থাকিয়া শেষ 'খ°' তে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় ("ক°"তে) জ্ঞান পূর্ণ, ভক্তি শূন্য আবার শেষ সংখ্যায় ভক্তি পূর্ণ, জ্ঞান শূন্য। এই গাণিতিক, সত্যানুযায়ী ভক্তির উদয় বা জয় যতই হইতে থাকিবে ততই জ্ঞান ক্ষয় পাইতে থাকে এবং পূর্ব জ্ঞান লুপ্ত হয়। এই ভক্তির পরামূর্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ (গৌরী যাঁহার অঙ্গে, অথবা গা + ও + রঙ্গ = রঙ্গ বা নৃত্যের)।

এই জ্ঞানশূন্য কেবলা ভক্তিলীলারসে নিমগ্ন থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ একদা ভাবিলেন, এই ভাবে চিরদিন চলিবে না, ভারতক্ষেত্রের-কল্যাণ কল্পে—

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

'অবিলম্বে' অর্থাৎ এই কলিতেই বিলম্ব না করিয়া, হে মাতঃ! তোমার কোলে আবির্ভূত হইব। কারণ, জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তির প্রচার ভারতে বেশীদিন চলিবে না। প্রকৃত্যনুযায়ী মানবসমাজকে সুগঠিত করিতে হইবে। সর্বত্র অধিকারী সুদুর্লভ। জ্ঞান-কর্মাদির লোপ হইলে শুদ্ধাভক্তির প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠানলক্ষ্যে সাধারণ জীব অন্ধ, উদ্ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইবে—রাগপথে বাঘ বাসা করিবে। অতএব আমি অতঃপর চারি হস্ত হইয়া আবির্ভূত হইব অর্থাৎ কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চতুর্দলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিব। এইভাবে লোকসমাজে নবযুগ আনিয়া দিব। কর্ম, যোগ, জ্ঞান এবং ভক্তি আমার চারিহস্তের লীলাকমল হইবে। আমার চারিহস্তে এই চারি প্রদেয় বস্তু শোভা পাইবে এবং সে সব অধিকারবিচারে বিতরণ করিব। নচেৎ এমন কাল আসিতেছে যে মানবসমাজ ধ্বংসোন্মুখ হইবে। তজ্জন্য সেই অবতারে আমার এক নাম হইবে "চারিহস্ত"।

আমার চারিহস্ত—চারিতত্ত্ব। প্রথম তত্ত্ব কর্ম, শ্রীবাস পণ্ডিত (লক্ষ্মীর সংসার)—ইনি গার্হস্থ্য বিধিনিয়মাদির প্রতিপালক। দ্বিতীয় তত্ত্ব—যোগ, শ্রীনিত্যানন্দ। ইনি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিয়া প্রেমযোগ দান করিবেন। তৃতীয় তত্ত্ব—জ্ঞান, শ্রীঅদ্বৈত। ইনি ওঙ্কারস্ফূর্তিদানে জীবের চৈতন্য জন্মাইবেন এবং বিদ্যাদান করিবেন। চতুর্থ তত্ত্ব—ভক্তি, শ্রীগদাধর। ইনি সেবাভক্তি শিক্ষা দিবেন। আমি পঞ্চতত্ত্বের সীমা।

আমি চারিহস্ত হইব। চারিহস্তে চারি রসের প্রচার হইলে শ্রীবাসে দাস্য, শ্রীনিত্যানন্দে সখ্য, শ্রীঅদ্বৈতে বাৎসল্য এবং শ্রীগদাধরে সেবা পরকান্তারস প্রচারিত হইবে। এই ভবিষ্যলীলায় আমার নাম হইবে "চারিহস্ত"। পঞ্চমে স্বয়ং অবধি।

"প্রভু তুমি কৃপা ক'রে প্রতি জীবাধারে
স্থাপ পঞ্চরস ভাণ্ড।
সে রস-সুধায় নিশিতে দিবায়
মত্ত রাখ এ ব্রহ্মাণ্ড।।" (অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ—"নির্ঝরিণী")

চন্দ্রপুত্র

অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মগোপাল—পরমেশ্বর। তিনি গো বা কিরণের পালক। তিনি গোলোকের কর্তা এই অদ্বয়জ্ঞান কিরণামৃত হইতে গো বা চক্ষুর উৎপত্তি। জ্ঞান হইতে চক্ষু ফোটে। গো হইতে গো-এর উদ্ভব। জ্ঞানকিরণ দ্বারা চক্ষুর নির্মাণ হয়। চক্ষু দিব্য বস্তু। সেই চক্ষু হইতে সূর্যের সৃষ্টি।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যোজায়ত।" (ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তম্)

সহস্রশীর্ষা পুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং চক্ষু হইতে সূর্যদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। তদ্দ্বারা সূর্যাপেক্ষা চন্দ্রের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। "তেজসঃ সলিলম্" ইতি বেদান্তোপনিষদি ধৃতম্। অতএব তেজের আধার সূর্য হইতে জলনিধি—সমুদ্রের উৎপত্তি বটে, বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, ফল বৃক্ষের সারাংশ। দুগ্ধ হইতে সর্পিঃ (ঘৃত) উৎপন্ন হয়, ঘৃত দুগ্ধের সারাংশ। তদ্রূপ জ্ঞান সারাংশ চক্ষুঃ, চক্ষুর সারাংশ সূর্য এবং সূর্যের সারাংশ সমুদ্র।

অনন্তর সমুদ্রের সারাংশ সুধা (অমৃত)। সুধা সারাংশ সমুদ্রোত্থ সুধাকর চন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের সারাংশ মন এবং মনেরই সারাংশ চন্দ্রদেব। জীবের আত্মা বা সারভাগ হইতে পুত্র জন্মে। এজন্য পুত্র আত্মজ বলিয়া অভিহিত হয়। এখন ভাবিয়া দেখুন, আনন্দনিধি সুধাময় চন্দ্রের সারাংশ "চন্দ্রপুত্র"।

অতএব "চন্দ্রপুত্র" তত্ত্বতঃ কী?—তিনি উক্ত বংশানুক্রমে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মের সারাংশ-ভূত। প্রেমবিভব-বিগ্রহ আমি শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু! আমি চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র। ❑

শিশুভাব

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর 'চন্দ্রপাত' গ্রন্থে নিজের অবস্থার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

"পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাসে।"

পঞ্চম বর্ষীয় শিশু যেন ব্রজলীলা ও গৌরলীলার মিলনময় একটি মহাসমুদ্রের মধ্যে ভাসিতেছেন। তাঁহার স্বরূপটি পঞ্চম বর্ষীয় শিশু। এই রসে ভাসমান শিশুটিকে ভক্তগণ দর্শন করিয়াছেন যখন তিনি মহাগম্ভীরা লীলা হইতে বাহিরে আসেন। ষোল বৎসর আটমাস কাল এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যে অবস্থায় ছিলেন ভক্তগণ তাহাকেই গম্ভীরা লীলা বলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে গম্ভীরালীলা আস্বাদনের তন্ময়তায় বন্ধুসুন্দর ছিলেন বিভোর। গৌরসুন্দর ছিলেন ব্রজলীলা আস্বাদনে, বন্ধুসুন্দর ছিলেন ব্রজগৌরলীলার মিলনময় আস্বাদনে। এই আস্বাদনান্তে যখন বাহিরে আসিলেন, লোকলোচনের গোচরীভূত হইলেন তখন তিনি অনেকটা শিশুর মত। তখন তাঁহার হাব-ভাব, কথা-বার্তা চলাফেরা, হাসি চাহনি সকলই একটি পরম শিশুর মত।

মহেন্দ্রজী এই শিশুভাবের সাধক ছিলেন। শিশু বন্ধুর মতই তিনি দুই লীলার মোহনীয় ও মহনীয় মধুরিমা আস্বাদন করিতেন। তিনি বলিতেন, শিশুভাব হইতেছে পাঁচটি ভাবের মিলনাত্মক। ইহার মধ্যে শান্ত নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ ও একাত্মতা, বাৎসল্যের তাড়ন-ভৎর্সনা ও কান্তাভাবের সম্পূর্ণ আত্মদানের সেবা — এই সকলই অন্তর্নিবিষ্ট। শিশুভাবের মধ্যে সব ভাবই আছে। এই রসের আশ্রয় পরম শিশু শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও বিষয় নিখিল জীবনিবহ।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রে রাগমার্গের আলোচনায় কান্তা ভাবটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মহেন্দ্রজী কান্তাভাবেরও গভীরে শিশুভাবের ধ্যান করিতেন। তিনি বলিতেন, "কান্তাভাবে সকল মানুষের অধিকার নাই, শিশুভাবে আছে। নিজেদের গোপী বা মঞ্জরী ভাবনা করা দুঃসাধ্য। পুরুষদেহধারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি পরম কৃপাপাত্র ছাড়া ইহাতে প্রবেশ অধিকার নাই। কোটি কোটি নরের মধ্যে একটি দু'টি পাওয়া ভার।"

যিনি মহা উদ্ধারণ, বিশ্বের অগণিত জীবকে যিনি নিজের কোলে তুলিয়া লইতে আসিয়াছেন তিনি কান্তাভাবকে যদি চরম সাধ্য বলেন তা অগণিত জীব বাদ পড়িয়া যাইবে। তাই তিনি চরম সাধ্যকে কান্তাভাবে না বলিয়া শিশুভাব বলিয়াছেন। শিশুভাবের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল ও কান্তভাব অন্তর্মিল আছে। অথচ আস্বাদনে তিনি নিজেই এইভাবে ডুবিয়া থাকিতেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মানবশিশুর মধ্যে যেন সকলভাব অস্ফুট থাকে সেই প্রকার শিশুভাবের মধ্যে শান্ত ইত্যাদি পাঁচটি ভাব অস্ফুট এইরূপ বলিতে পার। সব ভাবগুলি ফুটন্ত হইয়া আস্বাদ্যমান হইয়াছেন ইহা কিরূপে হয়?" মহেন্দ্রজী উত্তরে বলিলেন, "কান্তাভাবের মধ্যে যেরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আছে, অস্ফুট নহে, প্রস্ফুটিত ও আস্বাদিত ভাবেই আছে। প্রভুতে স্বয়ং ললিতাসুন্দরীর পঞ্চভাব, তাঁহার মুখ্যভাব গোপী বা কান্তাভাব তাঁহার মধ্যে দাস্যে সেবা, বাৎসল্যের আদর ঘুমন্ত নহে, প্রকৃষ্ট ভাবেই জাগ্রত। আস্বাদন লৌকিক মানবশিশুর দৃষ্টান্তে চলিবে না। সেইখানে যৌবন বার্দ্ধক্যের ভাব ঘুমন্তই। কিন্তু ভাবের রেশ মহাভাবসিন্ধুর অতলে গিয়া সাধক যখন শিশুভাবে গিয়া পৌঁছাইবে তখন তাঁহার মধ্যে সকল রস বিকসিত ভাবেই থাকিবে, বিনিদ্রিত ভাবে নহে।" তাঁহার উত্তরে আমি তৃপ্ত হইলাম।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী নিজে এই শিশুভাব-রসে ডুবিয়া পঞ্চম বর্ষীয় শিশু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে আস্বাদন করিতেন। তাঁহার এই অবস্থাটিকে ভাষায় বলিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপায় অপরোক্ষ অনুভূতিতে ভোগ করিয়াছি। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে সর্বভাবে পঞ্চভাবের মিলনময় লালসা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

শিশুভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকদিন অনেক কথা; জানাইয়াছেন। সব ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। তবে শিশুভাব যে পঞ্চভাবের মাধুর্যে সংবলিত আর একটি অভিনব

ভাব ইহা বুঝিয়াছিলাম। মহেন্দ্রজী পরমশিশু হাতে একটি চুষিকাঠি ধরা ও তাহা চোষণরত অবস্থা ভাবিতেন। 'চুষি কাঠি' নামে কতিপয় কবিতা ছিল। তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। যখন যাহা লিখিতেন নিজে পড়িয়া আর পড়াইয়া বুঝাইয়া দিতেন। 'চুষি পরিচয়' নামে একটি কবিতার কতকাংশ এখনও আছে।

"এ চুষি নয় কাষ্ঠের নোলা
কিংবা তপ্ত রুক্মর ঢেলা-গোলা
প্রেমপীযূষ-বর্ষিণী ছিলাম বুঝি
রস পুত্তলিকা কমলা।"

সম্পূর্ণ কবিতা স্মরণে আসিতেছে না। তাঁহার অসীম কৃপায় তাঁহারই শিশু ভাষাগুলিকে কথা দিয়াছিলাম 'চুযি কাঠি' পরিচয় ব্যাখ্যায়। তাঁহার অতি গভীর রহস্যপূর্ণ 'মিস্টিকাল' কবিতাগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে ভবিষ্যতে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

মহেন্দ্রজীর অতিপ্রিয় পণ্ডিতপাঠক হারাণ চক্রবর্তী একদিন মহেন্দ্রজীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলে তাঁহার চোখ-মুখে অপূর্ব জ্যোতি দেখিলাম। আমরা চার-পাঁচজন মিলিয়া পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পণ্ডিতজী! কীরূপ দেখিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, "একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে কেহ যেন এনলার্জ (Enlarge) করিয়া রাখিয়াছে।" ঐ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কয়জন ছিলাম সকলেরই দেহে এক অনাস্বাদিতপূর্বের শিহরণ ছিল। ঐ এনলার্জ করা শিশু স্বরূপটি আমরাও দর্শন করিয়াছি। ❑

"জগার নাম ল'বি"

শিব অতুলচন্দ্রকে আদেশ করিলেন "নিত্য শহরে নাম দিয়ে বেড়া'বি।" অতুল সেই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। সেদিন সকাল বেলা অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। অতুলের ইচ্ছা, বৃষ্টির মধ্যেই টহলে বাহির হইয়া পড়িবেন। শিবের কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া অতুল করতাল-সংযোগে নাম ধরিলেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে
সে হয় আমার প্রাণ রে।।"

শিব তখন কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন। অতুলের ভক্তি-গদ্গদ কণ্ঠে নামের ধ্বনি শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া অতুলের গলাটি জড়াইয়া কানের কাছে কহিলেন—

* *মহাউদ্ধারণ পত্রিকা। দত্তপুকুর।*

"তুই জগার নাম বলিস্ না? জগা সাক্ষাৎ। তুই জগার নাম ল'বি।"

অতুলচন্দ্রের সম্মুখ হইতে একটা মহা-আবরণ অপসৃত হইয়া গেল। ছোট মামা জগদ্বন্ধু যে কী বস্তু তাহা এতদিন বুঝিয়াও বুঝিতেছিলেন না। তাঁহার নাম যে রাধাকৃষ্ণ নিতাই-গৌরাঙ্গ নামের ন্যায় কীর্তনীয় ভজনীয়, এই সহজ কথাটা এত দিন তাঁহার বুদ্ধিতে আসে নাই। বন্ধু-সুন্দর যে সাক্ষাৎ সেই বস্তু, তাহা অতুলচন্দ্রের মাথায় এই প্রথম প্রবেশ করাইলেন—বুড়োশিব। • ীন উৎসাহে ও অনুরাগে অতুল গাহিলেন—

"ভজ জগদ্বন্ধু, কহ জগদ্বন্ধু,
লহ জগদ্বন্ধুর নাম রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে,
সে হয় আমার প্রাণ রে।।"

শিব কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও ঢুলিয়া ঢুলিয়া, কখনও গড়াইয়া গড়াইয়া, কখনও উচ্চ বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া 'জগা'র নামে কাঁদিতে লাগিলেন। এতদিন এ' গান এ' মন্ত্র শিবের নিকট লুক্কায়িত ছিল! এই অবতারে জন-সমাজে এই প্রথম "ভজ জগদ্বন্ধু" গীত হইল। অতুলের জীবন-নাট্যের নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল। জয় জগদ্বন্ধু।

এই নব নামের নব প্রেরণায় অতুল নব উল্লাসে নাচিয়া গাহিয়া পথঘাট পল্লী-পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন। যে-পাবনায় একদিন মহা আসুরিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, লীলাশক্তির ইচ্ছায় আজ সেই দেশেই জগদ্বন্ধু মহানাম মহাউদ্ধারণ-গাথা প্রথম গীত হইল। ❑

শ্রীশ্রীলিপি-সন্দেশ

(চিকাগো শহরে মিশিগান হ্রদের তীরে সন ১৩৪২ সালের ১৩ই আশ্বিন হইতে ২রা কার্ত্তিক মধ্যে এই মহাপ্রসাদ রচনা শেষ করিলাম।—মহানামব্রত)

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহানাম যজ্ঞ!!

চিকাগো, আমেরিকা।

পরমাধিকারী সেবাকুশল
আনন্দ দা! (শ্রীমৎ আনন্দবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী)

গোলাপের কাঁটা ভালবাসি না বটে কিন্তু তার গন্ধ যে আরাম দেয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার সঙ্গে যাই থাকুক তোমার প্রসাদ বিতরণে যে সুখ পাই—এই কথা শুধু আমি কেন, ভক্ত মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করেন। তাই তোমাকেই যোগ্যপাত্র জানিয়া— এ 'মহাপ্রসাদ' বিতরণের ভার দিলাম। আশাকরি শ্রীশ্রীমাঘী উৎসবে অগত্যাপক্ষে শ্রীশ্রীজন্মোৎসবে প্রত্যেক ভক্তের হাতে হাতে এই প্রসাদ অর্পণ করিবে। প্রসাদ বিতরণের থালা-বাসন যোগাড় করিতে

** 'বন্ধুমাধুরী'। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা। রাসপূর্ণিমা, ১৩৮৭। দত্তপুকুর।*

তোমার কিছু সময় লাগিবে জানিয়া দুই মাস আগেই পাঠাইলাম। সবাইকে বিতরণ করিয়া সর্বশেষ আমার ভাগ আমাকে পাঠাইও। আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। আশাকরি বঞ্চিত হইব না। এই মহাপ্রসাদ বিতরণ শেষ না করিয়া মহানামব্রতের কাছে আর পত্র লিখিও না। অপরাধ ভঞ্জনে এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। তোমা-কর্তৃক বিতরিত হইলে এক কালে উভয়েরই অপরাধ ভঞ্জন হইবে। তোমার করে অর্পণ করিলাম জগজ্জীবকে পরিবেশন কর। জয় জগদ্বন্ধু।

তোমাদের মহানামব্রত।

চিকাগো, আমেরিকা
২রা কার্ত্তিক, ১৩৪২, সন্ধ্যা।

যখন একটি ফোটা ফুল হাতে লইয়া তাহার দিকে তাকাই তখন মনে করি ফুলটাকে দেখিতেছি। তারপর যখন একটু মনোযোগ করিয়া তাকাই তখন দেখি সমস্ত ফুলটাকে দেখিতে পাইতেছি না। কতক খানি দেখিতেছি, আর কতক খানি আড়ালে আছে। যত প্রকারে ঘুরাইয়া দেখি না কেন, যে-কোন স্থানে ফুলটাকে রাখিয়া নিজে যে-কোন স্থানে দাঁড়াইয়া তার দিকে তাকাই না কেন, সমস্ত ফুলটাকে একবারে কখনও দেখিতে পাই না। সর্বদাই খানিকটা দেখি আর খানিকটা ঢাকা থাকিয়া যায়। যে-অংশ দেখি সেই অংশই অপর খানিকটা অংশকে অদেখা করিয়া দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা কখনই ইহা ভাবি না। আমরা যখন একটা বস্তু দেখি, মনে করি সমস্তটাই দেখিতেছি। তবে ব্যাপারটা আশ্চর্য হইলেও তাহাতে কাজ আটকায় না। আমি ফুলটার খানিকটাই দেখি, আর নাই দেখি গন্ধ গ্রহণ কার্য—ঠেকা থাকে না। এইরূপ কোনমতে কাজ চলে বলিযাই ঐরূপ আংশিক জ্ঞান লইয়াও আমরা প্রত্যেক নর-নারী সংসারে বেশ কালাতিপাত করিতেছি। কাল কাটিয়া যায় বটে কিন্তু অনেকখানি যে ঠকিয়া থাকি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তকুলমণি শ্রীপাদ সর্বসুখ দাদাকে পরম দয়ালু বন্ধুসুন্দর দয়া করিয়া কবিতা ছন্দে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি অনেক দিন পূর্বে ঐ লিপিকার নাম রাখিয়াছিলাম 'লিপি-সন্দেশ।' অনেক দিন এ সন্দেশ দেখিয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন দিন আস্বাদন করি নাই। আস্বাদন করা দূরে থাকুক কোন দিন খুব ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিও নাই। পড়িয়া গিয়াছি, মনে করিয়া সব খানি দেখিলাম। ফুলের যে কতখানি অদেখা থাকিয়া গেল তাহা জানিতাম না। আজ জানি না কেন হঠাৎ সকাল বেলা ঐ লিপিখানির ভিতরের দিক্‌টা আমার কাছে অনেকটা খুলিয়া গেল। আমি একটু খানিক আস্বাদন করিয়া দেখি অপূর্ব বস্তু! তাই এ মহাপ্রসাদ বান্ধব ভক্তগণকে বিতরণ করিবার সাধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কারণ আমার মত অনেকেই হয় তো এতদিন এ লিপিকার শিরোনাম পর্যন্তই পড়িয়াছেন। ভিতর খোলেন নাই মনে করিয়াই এই কার্যে ব্রতী হইতেছি। কত দূর পরিবেশন করিতে পারিব যাঁর চিঠি তিনিই জানেন।

এতটুকু একখানি চিঠির মধ্যে যিনি এত কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহার রাতুল পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অনন্তর যাঁর দয়ায় এ চিঠির ভিতরের সংবাদ এত খানি আজ

পড়িতে পাইতেছি সেই শ্রীগুরুদেবের পদারবিন্দে দণ্ডবৎ করি। যে-সকল ভাগ্যবান আমার অনেক পূর্বেই এ লিপিকার অন্তর খুলিয়া আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃপাশীর্বাদ ভিক্ষা করি। সার্থক-জীবন শ্রীপাদ সর্বসুখ দাদার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। পরে যে-সকল বান্ধবপ্রাণ এ পর্যন্ত কেবল এ চিঠির শিরোনাম পর্যন্তই পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করি। মনে রাখিবেন, এ নিমন্ত্রণ চালিতাতলে নিমন্ত্রণ। আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি নহে। খুব যে পরিপাটি করিয়া পরিবেশন করিতে পারিব তাহা নহে। কতক মাখিয়া ফেলিব, কতক পৃথক্ পৃথক্ও রাখিব। একবার স্থলে তিনবার লন তাহাতেও আপত্তি নাই। তবে লজ্জা করিয়া ওধারে থাকিবেন না। হাত পাতিবেন, 'দলা' একটা পাইলেন কিনা জানাইবেন।

জয় জগদ্বন্ধু! চাই মহাপ্রসাদ!! নূতন সন্দেশ!!! ...।

* * * *

'শ্রীমান্ সর্বসুখ'—প্রভু যে সর্বসুখ নামক একজন ভক্তকেই সম্বোধন করিতেছেন তাহা নহে। সর্ব ভাগ্যবান 'সর্বসুখ'কে মুখপাত্র করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীপ্রভু সমগ্র জগতের গৃহস্থ ভক্তগণকেই এই লিপি লিখিতেছেন। শ্রীমান্—ভাগ্যবান হও; সর্বসুখ—সর্বদা সর্বত্র সুখী রও—বলিয়া জগজ্জীব-মাত্রকেই আশীর্বাদ জানাইতেছেন—

'ভাই বন্ধু প্রতিবেশী কুটুম্ব স্বজনে।
সত্য স্নেহ সদাচারে তুষিও সতত।'

'ভাই বন্ধু প্রতিবেশী কুটুম্ব স্বজন'—এক কথায় গৃহে পরিবারে সমাজে যাহাদিগকে লইয়া তোমরা চিরকাল সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছ তাহাদিগের সঙ্গে সদাকাল কীরূপ ভাবে আচার-ব্যবহার করিলে 'সর্বসুখী' হইবে তাহাই বলিতেছেন—'তুষিও সতত' সবাইকে সন্তুষ্ট রাখিও। সকলেরই পরিতোষ বিধান করিও। ব্যবহার দ্বারা সকলের মনেই আনন্দ দান করিও। তবেই সুখে থাকিবে। কী উপায়ে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে তাহা বলি শোন। উপায় তিনটি—(১) সত্য, (২) স্নেহ ও (৩) সদাচার।

'সত্য'—আমি ঘরের জানালার ধারে বসিয়া পথের দিকে তাকাইয়া আছি। তখন কতকগুলি লোক আনন্দ কোলাহল নৃত্যগীত করিতে করিতে ঐ পথ ধরিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। আমি আসিতে আসিতে তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা কী জানিতে উদ্গ্রীব হইয়া আমি পথের পাশে যাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি পর পর পাঁচজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। পাঁচজন লোক আমাকে পাঁচ রকম কথা বলিল। মনে রাখিবেন, সবাই ভাল লোক, কেহ কপটতা করে নাই। কিন্তু আমার কাছে সত্য কোন্টা। হয়তো কারো কথাই সত্য নহে। নয়তো সকলের কথাই সত্য। আমার উকিল দাদাদের মতে হয়তো যে অংশে পাঁচজনের মিল আছে সেই অংশটুকু সত্য। কিন্তু বলতে কি, তুমি যদি এখন এ ঘটনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে, ডাকিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাসা কর, তবেও দেখিবে প্রত্যেকে ঠিক এক প্রকার বলিতেছে না। ইহার কারণ কী? বস্তুতপক্ষে সত্য কোথায়?

ঘটনা আর বর্ণনা দুইটি বস্তু। যাহা ঘটিল তাহা ঘটনা। ঘটনা সত্য। একদল মানুষ পথের উপরে আনন্দ কোলাহল করিল—এই যাহা বাস্তবে ঘটিল তাহা সত্য। কিন্তু বর্ণনার ঘটনা এক নহে। বর্ণনা সত্যকে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা বিশেষ। আমরা অল্পজ্ঞতা বশতঃ অনেক সময় এই ঘটনা ও বর্ণনাকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে শিখি না। গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আজ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া একটা ঘটনা ঘটিতেছে। এই ঘটনাটা সত্য। ইহাকে রাম এক রকম বোঝে, শ্যাম আর এক রকম বোঝে। এই বোঝাবুঝির সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, হঠাৎ একটা বড় কথায় চলিয়া গেলাম। আসুন ঘর-বাড়ীর সুখ দুঃখের কথা কই।

পিতামাতা পুত্র-পরিবার আত্মীয়-স্বজন লইয়া একত্রে পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি। সংসারে এই বসবাস সত্য। মনে করুন আপনার পরিবারে একটা ঘটনা ঘটিল। এই ঘটনাকে আপনি একরূপ বুঝিলেন, আপনার ভাই আর একরূপ বুঝিল। দু'য়ের বুঝাবুঝিতে মিল না হওয়ায় উভয়ের মনোমালিন্য সৃষ্টি হইল। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই এই মালিন্যের কারণ মিথ্যা। আপনি যাহা বুঝিয়া আছেন তাহাও সত্য নহে, আপনার ভাই যাহা বুঝিয়া আছেন তাহাও সত্য নহে। সত্য কেবল যাহা ঘটিয়াছে। সংঘটিত ঘটনা সত্য। এই ঘটনাটা কী? কতটুকু? কত বড়? একটুখানি ভাবিলে দেখিতে পাই সংসারে কোন ঘটনাই গণ্ডী বদ্ধ নহে। এই ঘটনাটা এতটুকু এইখানে আরম্ভ—আর এইখানে শেষ—এইরূপভাবে কোন ঘটনাকেই সীমাবদ্ধ করা যায় না। চক্ষু বুজিয়া ভাবিলে দেখা যায় যে, এক একটা ঘটনা এক একটা লতার মত অফুরন্ত লতা বাহিয়া চলিয়াছে। একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত—সেটা আবার আর দশটার সঙ্গে জড়িত। যে-ঘটনাকে তুমি এখন মনে করিতেছ ব্যক্তিগত, নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে সেটার সঙ্গে সমস্ত পরিবার বিজড়িত। যেটাকে পারিবারিক মনে ভাবিতেছ দেখিবে তোমার সমাজ শৃঙ্খল সেইটার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্কান্বিত। সামাজিক আচার রীতি চালচলন হাবভাব তোমার কত প্রতিবেশীর কত শত ঘটনা তোমার পরিবারের সঙ্গে বিমিশ্রিত। পৃথক্ করিবার উপায় নাই। আবার সমস্ত সামাজিক ঘটনাবলী সমস্ত দেশের সঙ্গে বিজড়িত, সমস্ত দেশের রাজা প্রজা শাসন শৃঙ্খলা জল বায়ু হাওয়া বাতাস সব তার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। এইটুকু পারিবারিক, এইটুকু সামাজিক বলিয়া তুমি কোন ঘটনার গণ্ডী দিতে পারিবে না। ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত জগৎ ছাড়িয়া একটা 'ঘটনা'—সেটা একটা 'মহাঘটনা'। (ক্রমশঃ) ❑

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব

এই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে উৎসব পারিষদ্ গঠিত হইয়াছে তাহারা একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আমার কাছে আশীর্বাদ চাহিয়াছেন। আশীর্বাদ কাহাকে করিব ভাবিয়া পাই না। এক শত বৎসর পূর্বে প্রভু স্বয়ং এই উৎসবটি করিয়াছিলেন। এই উৎসব স্মরণে কাহাকেও আশীর্বাদ করিবার কিছুই নাই।

শুধু আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। উৎসবের স্থান নির্দেশ ও যাবৎ কীর্তন আনন্দের ব্যবস্থা
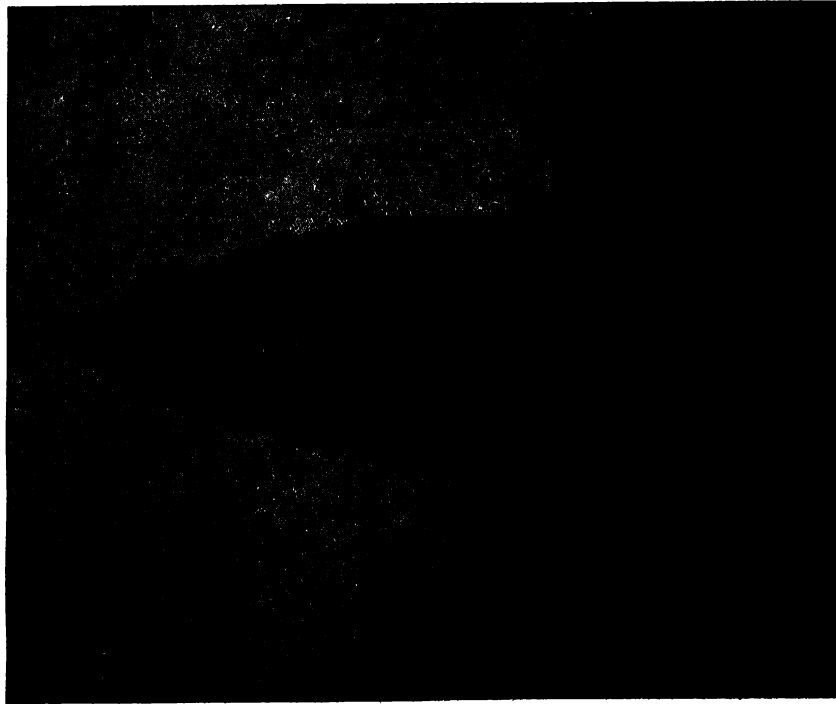
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাগম্ভীরা লীলাস্থলী শ্রীঅঙ্গন।
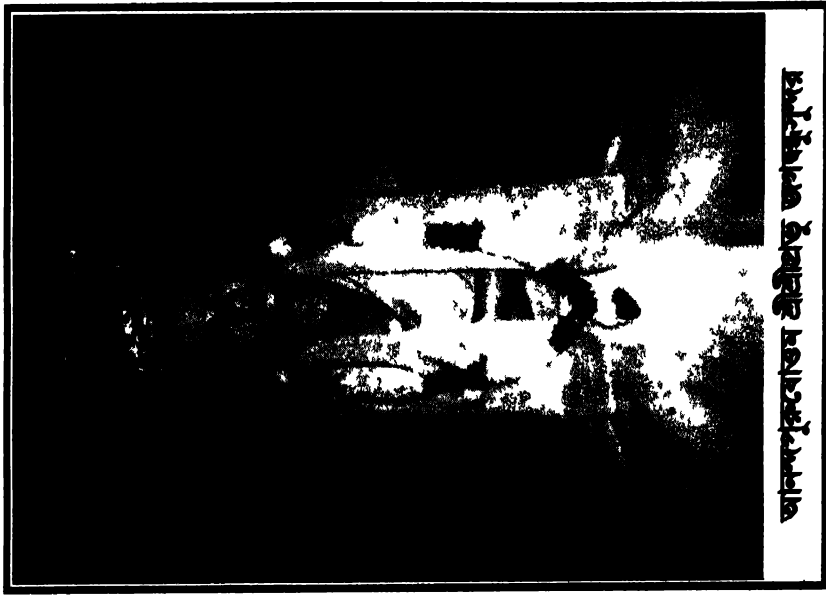
আনন্দপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

প্রভু নিজেই করিয়াছিলেন। উৎসবটি সর্বতোভাবেই প্রভুর নিজস্ব ছিল। এই সম্বন্ধে 'প্রভুর কথা' একটি গ্রন্থাকারে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তাহা পাঠ করিলেই ভক্তগণ জানিতে পারিবেন।

ফরিদপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে দরবেশের জলাশয় আছে। এই জলাশয়টি দেবখাত। কোনও কালে কেহ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বর্ষাকালে যখন পদ্মানদী প্রবলভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত তখন সেই জলরাশি এই জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শহর গ্রাম প্লাবিত করিয়া তুলিত। প্রবলভাবে ভাসাইয়া দিত। এই জলাশয়টি এখনও বিদ্যমান। ঐ দেশে জলাশয় বা লেকের মতন বড় জলাশয়কে জলা বলা হয়। ঐ জলাশয়টি ঐখানে দরবেশের জলা নামে বিখ্যাত। আজও বিদ্যমান আছে। তবুও অতীত কথার মতন বলিতেছি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ঐ পদ্মাজলরাশি যে তরঙ্গের খেলা উন্মাদনা জাগ্রত করিত এখন আর তাহা করে না কারণ আগে ওখানে একটি অল্প পরিসর সেতু ছিল। সেতুর অপরদিকে আসিয়া জলরাশি জমা হইত। সেতুর তল দিয়া আসিবার কালে জলে যে ভীষণ তরঙ্গ হইত ও শব্দ হইতে তাহা দেখিবার ও শুনিবার মতন ছিল। দেশ বিভাগের পর ঐ অঞ্চলের সরকার উহা তিনগুণ বড় করিয়াছে। বড় করিবার ফলে জল সেই জলই আছে কিন্তু তরঙ্গের বেগ কমিয়া গিয়াছে ও শব্দও অনেক স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। ঐ জলাশয়টির তীরে একটি অরণ্য ছিল। অরণ্যটি বহু প্রাচীন। মানুষের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য বলা যায়। শুধু হিংস্র জন্তু জানোয়ারই বসবাস করিত।

একদিন প্রভু নবদ্বীপ দাস নামক একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া বদরপুর গ্রামের বাদল ভবন হইতে পদব্রজে যাইতে যাইতে সেই অরণ্যে প্রবেশ করেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—নবদ্বীপ! এই স্থানে আমার আসন হইবে। এই স্থানটি কাহার তাহা জানি না, যার জানিয়া আমাকে জানাইবা। অনেক অনুসন্ধান করিয়া নবদ্বীপ দাস স্থানের মালিকের সন্ধান করিয়া প্রভুর কাছে লইয়া আসেন। মালিকরা দুই ভাই। নাম রামসুন্দর ও রামকুমার সাহা মুদী। প্রভু বলিলেন—রামসুন্দর! তোমাদের এই স্থানটি আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি আঙ্গিনা করিব। তাহারা পরমানন্দে রাজী হইলেন।

এই স্থানটি-যেন পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল। ওখানে একটি ছোট চালিতা বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষটির চারিপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো ছিল। এই চালিতা গাছটি এখনও শ্রীঅঙ্গনে বিদ্যমান। বয়স এক শত বৎসরের অধিক হইবে। ঐ গাছটিকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ যোগমায়া দেবী বলেন। ঐ বলার পক্ষে প্রভুর ইঙ্গিতও ছিল। ঐ গাছটির চালিতা খুব সুমিষ্ট। কেহ ফল পাইবার আশায় তাকাইয়া থাকে। যাহার সামনে একটি পড়ে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। ঐ ফল খাইলে অনেক ব্যাধি সারে ও কল্যাণ হয়—এই লোকের বিশ্বাস। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকেরই এই বিশ্বাস এখনও আছে। প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন বৃটিশ রাজের প্রবল অনুশাসনের মধ্যে দেশ ছাড়িয়া জার্মানী অভিমুখে যাত্রা করেন তখন শ্রীঅঙ্গনের প্রধান সেবাইত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর প্রদত্ত একটি চালিতা বৃক্ষের ফল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল চালিতা বৃক্ষের ফল সঙ্গে থাকিলে কোথাও অকৃতকার্য হইবেন না।

ভক্তগণের একান্তভাবে ইচ্ছা জাগিল ঐ স্থানটি প্রভুকে ছাড়িয়া দিতে। প্রভু বাঁশ ও খুঁটির বেড়া করিয়া তাঁহার থাকিবার উপযোগী একটি বাস তৈয়ার করাইলেন। ঐ স্থানে আজও

শ্রীঅঙ্গন বিদ্যমান। ঐ বাঁশ-খুঁটির ঘরকেই লোকে প্রভুর মন্দির বলিত। তখনও বলিত এখনও বলে। মন্দিরটি বার হস্ত দৈর্ঘ্য ও আট হস্ত প্রস্থ ছিল। তখন ছিল বাঁশ-খুটির ঘর, এখন সেখানে পাকা মন্দির হইয়াছে। ঐ ঘর যখন তৈয়ার হয় একটি ভক্ত ইঁট দিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালীন শ্রীপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয় ইঁট যোগাড় করিলেন কিন্তু খুঁটিগুলি তুলিয়া ফেলিলেন না। কারণ তিনি বলিলেন—ইহাদের সেবা থেকে বঞ্চিত করিবার অধিকার নাই। এই খুঁটিগুলি খুব লম্বা ছিল।—সকলে বলিলেন—বিশ্বাস মহাশয়! একখানা খুঁটি দিয়া দুইখানা খুঁটি করা যায়। বিশ্বাস মহাশয় রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন—প্রভুর সেবায় যে খুঁটিগুলি লাগিয়া গিয়াছে তাহাদের আমি জীবন্ত মনে করি। তাহাদের দেহের উপরে আঘাত করিবার আমার অধিকার নাই।

কোন্‌দিন আঙ্গিনা হইবে তাহা প্রভু নির্দেশ করিয়া দেন। উৎসবের প্রথম অংশটি কীভাবে অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও বলিয়া দেন। কোনও কিছু লিখিতে বা বলিতে হইলে প্রভু শ্রীরাধার নাম আগে বলিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি শ্রীরাধারানীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে দীক্ষা পাইয়াছিলেন এই কথা তাঁহাকে অনেকে বলিতে শুনিয়াছেন।

উৎসবের চিঠির উপরে "শ্রীরাধারানী" নাম প্রভুর আদেশে লেখা হয়। চিঠির মধ্যে যাহা লেখা হয় তাহাও প্রভুর আদেশে লেখা হয়।

শ্রীরাধারানী

মহামহিমেষু

আগামী ২৩৪শে জৈষ্ঠ মঙ্গলবার দিবস প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরিদপুর গ্রামে দরবেশের খালের নিকট প্রভুর অঙ্গনে শ্রীশ্রীকীর্তন এবং চৌদ্দ কাদল সংকীর্তন হইবে। আপনারা সকলে খেলে করতাল সহ শুভাগমন পূর্বক শ্রীশ্রীকীর্তন করিবেন। সুআহার করিবেন। নিজগুণে দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। এই সামান্য পত্রিকা দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম।

নিবেদন ইতি	অকিঞ্চন
১৩০৬ সন	শ্রীরামসুন্দর মুদী
২১শে জ্যৈষ্ঠ	শ্রীনগরবাসী সাহা
ফরিদপুর গ্রাম	শ্রীপঞ্চানন্দ সাহা

প্রভু যাহাকে যাহাকে সাক্ষর করিতে বলেন তাহারাই সাক্ষর করে। প্রভুর লীলা জীবনে অনেক উৎসবই হইয়াছে। কোনও উৎসবের ব্যবস্থাই তিনি করেন নাই। শুধু এই প্রথম উৎসবের সর্ববিধ ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। মহান্ত সম্প্রদায় ভক্তগণ প্রভুর আদেশে এমন কীর্তন করিয়াছিলেন যে সমস্ত ফরিদপুর গ্রাম কীর্তনে কম্পমান হইয়া উঠিয়াছিল। এই উৎসব আবার হইবে একশত বৎসর পরে।

উৎসবের কত কীর্তনীয়া আসিল কত লোক প্রসাদ পাইল ইহা বড় কথা নয়—আমরা সেই প্রথম দিনের উৎসবের ভাবে ভাবিত হইয়া কতটা উৎসব করিতে পারিলাম তাহাই হইবে প্রধান উদ্দেশ্য। সেই আশীর্বাদই ভিক্ষা করি। ❑

জাতি গঠনে বন্ধুসুন্দরের দুইটি বিরাট দান

জাতিগঠনে বন্ধুসুন্দরের বিরাট্ দান। একটি ফরিদপুরের বুনোদের উদ্ধার, দ্বিতীয়টি রামবাগানের ডোমদের উদ্ধার। এই দু'টি ঘটনাই ফরিদপুরে শ্রীঅঙ্গন স্থাপনের পূর্ববর্তী ঘটনা।

ইংরেজী Indigo শব্দের বাংলা অনুবাদ নীল। এই জিনিসটি এখন কেমিক্যালি তৈরী হয়। আগে ছিল নীলের চায। ইংরেজরা নীলচাষীদের উপর বড় অত্যাচার করত। এদেশে চাষী পাওয়া যাইত না। পাহাড় হইতে ভীল, কোল, সাঁওতাল ধরিয়া আনিয়া এই কাজ করানো হইত। তাহাদের প্রতি যা অত্যাচার করা হইত তা অমানুষিক। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' যখন স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যাচারী সাহেবদের প্রতি নিজের পা হইতে জুতা খুলিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা বিখ্যাত ঘটনা।

নীল চাষ যখন উঠিয়া গেল তখন তাহারা সাহেবদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহাদের স্থান হইল না। সামাজিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অত্যাচারের একটি নমুনা, একটি ছোট কাহিনী বলি। এই চাষীদের হিন্দুরা বলিত বুনো। তাহাদের গায়ের বাতাস লাগিলে হিন্দুরা ডুবিয়া স্নান করিত, তাহারা বাড়ি গিয়া বসিলে হিন্দুর বৌরা বুনো বসার জায়গায় গোবর-জল ছিটাইত। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বুনো ফরিদপুর ঢোল সমুদ্রের তীরে বাস করিত। তাহাদের সর্দার ছিল রজনী বাগ্দী। সমাজের যত পরিশ্রমের কাজ তাহারাই করিত। ফরিদপুর শহরে এক ভট্টাচার্যের বাড়িতে দুর্গোৎসব। ভট্টাচার্যি মহাশয় বুনোদের সর্দার রজনী বাগ্দীকে ডাকিয়া কহিলেন, "রজনী! পূজার বেলপাতা মোটেই পাওয়া যায়নি। তুমি বেলপাতা অবশ্যই আনিবে।" রজনী অনেক কাঁটার আঁচড় খাইয়া বেলপাতা আনিল। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "মায়ের দুয়ারে রাখ।" রজনী পাতা রাখিয়া মা দুর্গার মূর্তিখানি তাকাইয়া দেখিতেছিল। এই সময় রান্না ঘর হতে মন্দিরে মায়ের ভোগ গেল। ভট্টাচার্যি মহাশয় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "সামিয়ানার তলে বুনো দাঁড়াইয়া আছে, তোরা ভোগ নিলি কী করিয়া? সব ফেলে দে।" রজনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হতভাগা! সামিয়ানার নিচে দাঁড়ালি কোন্ সাহসে?" রজনীর সঙ্গে আরো দু'-তিনজন ছিল। ভট্টাচার্যি মহাশয় লাঠি উঁচু করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময় রজনী খুব ছোট্ট করিয়া বলিল, "ঐ কোণায় যে কুকুরটি আছে ওটারে তাড়াইলেন না?" ভট্টাচার্যি মশায় তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেটা! ছোট মুখে বড় কথা!"

বুনোরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ও অত্যাচারিত। এই সুযোগ লইয়া খৃষ্টান পাদ্রিরা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। তাহাদের নগদ টাকা দিতে চাহিত ও নানা রকম *প্রলোভন দেখাইত।*

একদিন সকালবেলা, প্রভুর ভক্ত দুঃখীরাম ঘোষ আসিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রায় 'ছ' হাজার বুনো আগামী রবিবার খৃষ্টান হইয়া যাইবে।

প্রভু বলিলেন, "দুঃখীরাম! তুমি এখনই যাও। রজনীকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। যাইবার সময় দুঃখীরাম বলিল, প্রভু! গত কার্তিক মাসে আমরা যে নগরকীর্তন বাহির করেছিলাম সেদিন ওদের পাড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা আপনাকে দেখিয়াছিল, সেদিন ওদের

পাড়ার দেড়-শ' দু'-শ' লোক হাততালি দিতে দিতে আমাদের সঙ্গে এসেছিল, এখানে প্রসাদ পেয়ে গিয়েছে।"

প্রভু বলিলেন, "আমি জানি, ওদের জন্যই তো সেদিন নগরকীর্তন করেছিলাম।"

দুঃখীরাম ঘোষ খুব দ্রুত বুনো পাড়ায় পৌঁছিয়া রজনীকে বলিলেন, "রজনী, প্রভু তোমাকে ব্রাহ্মণকান্দায় ডেকেছেন।" কথাটা শুনিয়া রজনী দুঃখীরামের মুখের দিকে তাকাইলেন, দুঃখীদা সত্য কথা বলতেছ! আমাকে প্রভু ডাকতেছেন! দুখীঃরাম বলিল, "হ্যাঁ, প্রভু তোমার নাম করে ডেকেছেন।" রজনী কহিল, "দুঃখীদা, প্রভু আমাকে ডাকছেন! আমি তো কোন দিন তাঁরে ডাকিনি। প্রভুর এত দয়া!" দুর্দান্ত বুনো সর্দার রজনীর চোখে জল আসিল। গামছা দিয়া চোখের জল মুছিয়া গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া দুঃখীরামের সহিত রজনী চলিল। যাইতে যাইতে রজনী বলিল, "দুঃখীদা! সেই ব্রাহ্মণকান্দায় যাচ্ছি যেখানে সেদিন বামুন-কায়েতদের সঙ্গে এক লাইনে বসিয়া মহাপ্রসাদ খাইয়াছিলাম। রজনী গিয়া দেখে প্রভু দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। যেন কার অপেক্ষায়। রজনীকে দেখামাত্র প্রভু আগাইয়া গিয়া "রজনী এসেছো! রজনী এসেছো!" বলিয়া আলিঙ্গন দিলে রজনী যেন মাটি হইয়া গেল। মাটি হইল—না খাঁটি সোনা হইল, না দেবতা হইল প্রভুই জানেন।

প্রভু বলিলেন, "রজনী!, তুমি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হবে কেন?" রজনী বলিল, "প্রভু! সবই তো জানেন, আমরা পতিত।" প্রভু যেন চমকিত হইয়া বলিলেন, "রজনী! মানুষ কখনো পতিত হয়? সব জীবই কৃষ্ণদাস, তুমিও কৃষ্ণদাস। আজ হতে তোমার নাম হ'ল হরিদাস। তুমি বুনো নও, তুমি হরিদাস। আজ হতে তোমার নাম হ'ল হরিদাস মহান্ত। আগামী পরশু তোমরা সকলে আসবে, এখানে প্রসাদ পাবে, কীর্তন করবে। আমি তোমার সঙ্গে খাব, আমার ভক্তরা তোমাদের আপন করে নিবে।"

নির্দিষ্ট দিনে পাদ্‌রী তৈয়ার হইয়া আসিল। রজনীর সঙ্গে প্রতিবেশী সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোমরা ফিরে যাও, আমরা খৃষ্টান হব না। আমরা জগদ্বন্ধুর দাস হব।" রজনীর ইঙ্গিতে শ্রীমন্ত পাদ্রীদের দেওয়া দেড় হাজার টাকা ফিরাইয়া দিল। পাদ্রীরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া তাঁরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "যা আমরা পাঁচ বছরেও করতে পারিনি, তা ব্রাহ্মণকান্দার জগৎসাধু পাঁচ মিনিটে করেছেন!" এক পাদ্রী বলিল, "উনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ!" ❑

'শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন'—ভূমিকা

শ্রীশ্রীঅঙ্গন ধামের তত্ত্ব ও মাধুর্য-আস্বাদিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে এই ধামের মহারজে গড়াগড়ি দিবার প্রথম ভাগ্য লাভ করি। তদবধি রজঃরাণীর করুণা সম্বলেই আছি। কত যে আনন্দ এই ধামে অন্তর্নিহিত আছে তাহা এখানে বাসকালে যতটা অনুভব করা

** 'শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন'। শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা - ৫৪। ১৩৭৪ (২য় সং)*

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মূল মহাগম্ভীরা লীলাস্থলী, শ্রীঅঙ্গন।

কাদা মহোৎসব, শ্রীঅঙ্গন

(৪৭৫ পৃষ্ঠা)

যায় ততোধিক অনুভব হয় বিরহকালে। প্রায় ছয় বছর কাল আমেরিকায় ছিলাম, তখন প্রতিনিয়ত শ্রীঅঙ্গন স্মরণে জাগিত। নিত্য অষ্টকালীন ভোগ সেবা কীর্তন ও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর ভক্ত-সঙ্গে মধুর ইষ্টগোষ্ঠী বন্ধুকথাপ্রসঙ্গ— এই সব স্মরণে সর্বদা বুক ভরা থাকিত। যাঁহারা শ্রীঅঙ্গন দর্শন করেন নাই, এই গ্রন্থ তাঁহাদের স্মরণের পরম সহায়ক হইবে।

শ্রীশ্রীচিন্ময় দেহের সেবার যতগুলি বিবর্তন পরিবর্তন হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে অল্পবিস্তর যুক্ত ছিলাম। পরিবর্তনের নয়টি পর্যায়ের কথা এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় দর্শনের ভাগ্য হয় নাই। প্রথম যেদিন ত্রয়োদশ দশা গ্রহণ করেন তাহার পাঁচ-সাত দিন পর শুনিতে পাই। বিশ্বাস করিতে আর পাঁচ-সাত তিন কাটে। যখন ঠিক বিশ্বাস হইল, তখন বরিশালের এক গ্রাম প্রান্ত হইতে ৩৭ মাইল পথ এক নিঃশ্বাসে দৌড়িয়া আসিলাম। চরমুগরিয়া নদীর ঘাটে সর্বানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি শ্রীঅঙ্গন হইতে ফিরিতেছেন। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া ধরিয়া ফিরাইয়া লইয়া যান, প্রায় ত্রিশ মাইল উল্টাদিকে শিকারপুর গ্রামের পূজ্যপাদ হারান পাঠক দাদার সান্নিধ্যে। "প্রভু সত্য বস্তু—নিশ্চয়ই মহাপ্রকাশ হইবে"— এই কথা অতীব দৃঢ়তার সহিত বলিয়া তিনি আমার সান্ত্বনা বিধান করেন। গৃহে ফিরি। শ্রীঅঙ্গনে কীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আবার পদব্রজে আসি শ্রীঅঙ্গনে, প্রায় নব্বই মাইল পথ চলিয়া। আসিয়া দেখি তৃতীয় পর্যায় সেবা চলিতেছে। মহানাম যজ্ঞ চালাইতেছেন মহানাম সম্প্রদায়। প্রাচীন সেবাইতগণের উপর সেবার ভার। চিন্ময় শ্রীদেহ মাটির নীচে। উপরে মাটির বেদী।

তারপর চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় দেখিয়াছি। শ্রীমন্দির কোণে জপরত ভক্ত-পাহারায়, চন্দন-সম্পুটে বিলাস-বাসরে। বৎসরে একদিন-দুইদিন দর্শন ভাগ্য। ক্রমে আসিল ১৩৩২ সনের শেষ ভাগ। চারিদিকে আতঙ্ক, দাদা ভীত হইয়া চিন্ময় শ্রীদেহের প্রতি অতি প্রীতিবশতঃ উহা রক্ষা করেন এক ষ্টিল ট্রাঙ্কে ধরণীর গর্ভে সমাহিত করিয়া। ঐ দিন যে কয় জনকে ডাকিয়াছিলেন তার মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন গোপীদা অনুপস্থিত।

ঐ সময় গোকুলানন্দ (অঙ্গনদুলাল) নামক একজন বালক ব্রহ্মচারী প্রভাতের সেবা পূজা করিত। সে জানিত না চিন্ময় বস্তু কোথায় আছে। তার সেবান্তে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী প্রায়ই আমাকে ইসারা করিতেন, যেখানে বস্তু আছে তদুপরি চন্দন তুলসী পুষ্প অর্পণের জন্য। তাই, এই ষষ্ঠ পর্যায়ের সঙ্গে একান্ত যুক্ত ছিলাম। গোপীদা মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া ষষ্ঠ পর্যায়ের অবসান ঘটান।

তারপরের যে সপ্তম অষ্টম বিবর্তন, তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম সাগরবন্ধনে কাঠবিড়ালীর মত। ভাগ্যে শ্রীঅঙ্গনে থাকিলে সকল সময়ই শ্রীপাদ ডাকিতেন। কার্যারম্ভেই ডাকিতেন। শ্রীমন্দিরে যাইতাম। শির অবনত করিয়া কোণে বসিয়া থাকিতাম। ভাবিতাম দেখিব। চন্দ্রবদন দেখিয়াছি। তাহাতে তিলফুল নাসিকা, সুচিক্কণ গণ্ড, প্রশস্ত ললাট, মধুমাখা প্রাণকাড়া হাসি দেখিয়াছি; শঙ্খের মত থাক্ থাক্ কণ্ঠ ও বিরাট্ বক্ষ-কপাট, জানুস্পর্শী করি-শুণ্ড বাহু, ত্রিবলীযুক্ত সুন্দর উদর, কদলী বৃক্ষের মত ক্রমে সরু উরু দেখিয়াছি। করপদ্ম, পাদপদ্ম, চম্পককলি অঙ্গুলি, চাঁদের জ্যোৎস্নামাখা নখ দেখিয়াছি। কবির কল্পনা নয়। প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, মদন-বিমোহন

রূপরাশি, চোখে ভাসে, অন্তরে জাগে। তাহা না দেখিয়া আজ কী দেখিব?

সেই প্রাণাকর্ষী রূপরাশি আর দেখিবেন না বলিয়া প্রাচীনভক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রাধাবল্লভ প্রমুখ ভক্তগণ—শ্রীঅঙ্গনে আসেন না। বৃন্দাবনদা শ্রীঅঙ্গনে থাকিলেও, শ্রীপাদ ডাকিলেও যান না। আমি যাই। বসিয়া থাকি মাথা গুঁজিয়া। অন্তর্যামী শ্রীপাদ অন্তরের বেদনা বুঝিয়া সর্বশেষে আবার ইসারা করেন। দীপালোক ক্ষীণ করিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া, চামরটা হাতে লইয়া ডাকেন। উঠিয়া দেখি উজ্জ্বল ঝলমল ললাটখানি। চামর লইয়া আধ মিনিট ব্যজন করি। বাহিরে আসি। ঘণ্টা খানেক একটা বেদনার রেশ থাকে।

বেদনাটা যে কিসের নিজেকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছি। উন্মুক্ত সর্বাঙ্গ দর্শন করিলে কি বুক ফাটিয়া যাইত? না, কখনই না। আর্তনাদ করিয়া কান্দিতাম? না, মোটেই না। চক্ষে দরদর ধারা বহিত? না, এক বিন্দুও না। তবে দুঃখ কোথায়? দুঃখ যে নাই এই জন্যই দুঃখ। ঐ বস্তু দর্শনে যে বুক ফাটে না, এই জন্যই দারুণ ক্ষোভ। "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ" এই জন্যই মর্মান্তিক গ্লানি।

কত সময় অন্যায় কাজ করি। সাধুজন-বিগর্হিত কার্যও করি। করি যে তাহাতে লজ্জা হয় না, দুঃখ হয় না। কিন্তু সেই কথা যখন অপরে জানে, পাঁচজনে আলোচনা করে তখন যে মরমে মরিয়া যাই। লজ্জায় ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হই, মুখ দেখাইতে পারি না। ইহাও তদ্রূপ। লোকে জানে আমি কত বড় ভক্ত, প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধুকে কত ভাসবাসি, তাঁর জন্য সংসার ছাড়িয়াছি, কত ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু চিন্ময় দেহের ভাব-অবস্থা দর্শন করিয়া যখন একবিন্দু অশ্রু গলে না, আমি যে কত ছোট, কত প্রাণহীন ভক্তিহীন, হৃদয় শূন্য, আমার যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা আমি যে কত ছোট, কত হীন, কত অপদার্থ, কত 'কাঠকঠিন ছাতিয়া', তাহা নিজের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যাই। এই ধরা পড়ায় আছে একটা বুকভাঙ্গা গ্লানি, একটা আত্মধিক্কারযুক্ত ক্ষোভ। তাহার রেশটাই ঘণ্টা খানেক থাকিত। দীর্ঘ স্থায়ী হইত না। দীর্ঘস্থায়ী হইত একটা শাস্ত্রীয় ভাবনা—সেইটি কী বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীহরিকথা গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর দশমদশার আস্বাদন বহু পদে করিয়াছেন। প্রাণস্পর্শী সব পদ-পদাবলী। তন্মধ্যে একটি পদে মৃত্যু দশায় পৌঁছিবার পূর্বক্ষণে ভানুনন্দিনী সখীদিগকে বলিতেছে তাহার শেষ নিবেদন। তাহার মধ্যে দুইটি নির্দেশ আছে—

"দেহটি আমার রেখ
নিতি নিতি সবে দেখ"

শ্রীদেহটি যত্নে রাখিও ও প্রত্যহ দেখিও। কীর্তনীয়া গোপীরা আখরে পদ যোজনা করিয়া বলেন—"কৃষ্ণপ্রেমের সাধের মরা, নিতি নিতি সবে দেখ"। ব্রজলীলায় এই দশা হইয়াছিল। গৌরলীলায়ও হইয়াছে, শুনিয়াছি। মহাউদ্ধারণ লীলায় এই দশা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর "মহামৃত্যু" মহাদশায় পড়িয়া আছেন। দশা হয় বিরহের বেদনার তীব্রতায়। বন্ধুহরির এই বিরহ কিসের জন্য? রাধারাণীর বিরহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য। রাধাভাবাঢ্য গৌর-সুন্দরের বিরহও শ্রীকৃষ্ণের জন্য। "শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের বিরহ কাহার জন্য? নিতাই-ভাবাঢ্য বন্ধুহরির কি শ্রীগৌরের জন্য এই বিরহ? এরূপ মাঝে মাঝে ভাবি, বলি-

ও। কিন্তু কোন সঙ্কেত পাই না। বন্ধুসুন্দরের এই মহা অবস্থাটি "মহামৃত্যু" নামক "ত্রয়োদশ দশা", ইহা চন্দ্রাপাত ও হরিকথা, দুইতে মিলিয়া পাওয়া যায়। শ্রীনবদ্বীপ দাসজীর মুখে সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কার বিরহে যে এই মহাদশা, তাহার কোন ইঙ্গিত কোথাও পাই না।

ক্রমে ক্রমে ভক্তশ্রেষ্ঠগণের মুখ হইতে তিনটি সঙ্কেত পাইয়াছি।

(১) শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী লিখিয়াছেন—

"মহাপ্রলয়াঘাত পাপতাপরাশি
নিজ অঙ্গে ধরি বন্ধুশশী
রাহু-ধরা শশধরের মত
রঙ্গ করে ও অধর।"

ইহার ব্যাখ্যা 'মহামৃত্যুরঙ্গ' নামক একটি গ্রন্থে আমি সাধ্যমত করিয়াছি। ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য দশাটিকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা। উক্ত পদে বোঝা গেল মহাপ্রলয়ের আঘাত শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীদেহের এই অবস্থা। ইহাতে কিসের অভাবে—কোন্ বিরহে যে এই অবস্থা তাহা স্পষ্ট হইল না।

(২) শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজীর মুখে শুনিয়াছি, প্রভু নিজ শ্রীমুখে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "জীবের জন্য এত কষ্ট!"

এই দ্বিতীয় ইঙ্গিতে প্রভুবন্ধুর জীবদুঃখ-কাতরতার একটা বেদনাময় মূর্তি অন্তর হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কিসের যে বিরহ তাহাও সুস্পষ্ট হয় না।

(৩) প্রাচীন ভক্ত শ্রীমৎ রণজিৎ লাহিড়ী মহোদয়ের দিব্য অনুভূতিতে তৃতীয় সঙ্কেত ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন হরিনামের বিরহের কথা। 'হরিনাম-বিরহ' হেতু শ্রীশ্রীপ্রভুর এই দশা। ইহাতে বিরহের হেতু স্পষ্টতর হইল। হরিনাম-বিরহ যে প্রভুর বুকভরা, তৎসমর্থক শ্রীমুখের মহাবাক্য আছে—

"আমি কি তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? তোরা কি হরিনাম দিয়ে কেউ আমাকে রক্ষা করবি না? তোরা সকলে হরিনাম কর। তাই শুনতে শুনতে আমি ধূলিতে আকাশে পৃথিবীর সমস্তে মিশে যাই। তা' হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই। তোরা হরিনাম করে আমাকে তোদের সঙ্গে মিশায়ে নে। হরিনামের জয় হউক, তোদের জয় হউক। হায় হায় কেউ হরিনাম করে না!" "হরিনাম—প্রভু জগদ্বন্ধু"—ত্রিকালোক্ত এই পরম পরিচয়ের মধ্যেও যেন কি গুপ্ত সঙ্কেত আছে।

এখন, এই তিনটি কথার একটি মিলন চাই। একত্র করিয়া অনুধ্যানে এইরূপ মনে জাগিয়াছে, প্রলয়জনিত আঘাতটা জীবেরই কৃতকর্মের জন্য। সেই আঘাত অঙ্গে ধারণই "জীবের জন্য এত কষ্ট!" জীবের কৃতকার্য সকল হরিনামবিমুখতা সঞ্জাত। এই বিমুখতার জন্যই প্রভুর অঙ্গে আঘাত। জগৎ হরিনামবিহীন বলিয়াই বন্ধুসুন্দর বেদনাতুর। হরিনাম উচ্চারিত হউক। শত সহস্র লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হউক। সকল জীবের হৃদয়তন্ত্রীতে হরিনাম ঝঙ্কৃত হউক। ইহাই তিনি

চাহেন। তিনি চাহেন লক্ষ কোটি কণ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত হরিনাম কীর্তন চলুক।

যদি এই বিশ্লেষণ সত্য হয় তাহা হইলে মহাদশাশ্রিত শ্রীচিন্ময় দেহকে রাখা, রক্ষা করা, নিত্য দেখা ও নিরবচ্ছিন্ন হরিনাম শোনানো, ইহাই সেবকের কর্তব্য হইতে পারে। "মহাকীর্তন প্রভু পতন ইতি গান"—এই চন্দ্রপাতের মহাবাক্যেও বুঝা যায়, প্রভু মহাদশায় পতিত হইলে এই মহাকীর্তন চলিবে।

শ্রীশ্রীপ্রভুর অমোঘ ইচ্ছায় তাহা চলিতেছে। দশাশ্রিত চিন্ময় শ্রীদেহ ঘিরিয়া আজ ছয়চল্লিশ বৎসর অখণ্ড মহানাম চলিতেছে। ওদিকে দশাশ্রিত শ্রীদেহও সপ্তম পর্যায়ে আসিয়া "নিতি নিতি মোরে দেখ" নির্দেশ সার্থক হইবার অবস্থায় দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেই থাকিল না। একদিকে পূজার্চনা ভোগ আরতি আরম্ভ হইল। দশাশ্রিত শ্রীদেহের পূজার্চনা ভোগরাগ কিভাবে চলে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কোথাও কোন ইঙ্গিত সঙ্কেতও পাই নাই। নিজের মানস উদ্বেগ নিজেতেই রহিয়াছে।

বিপৎকালের জন্য একটা ব্যবস্থা হইবে—শ্রীঅঙ্গন সেবক-মণ্ডলীর সাধারণ সভায় ইহা স্থির হইল। গোপীদা কলিকাতা গিয়া কী করিলেন জানি না। উহাতে চারি হাজার টাকা খরচ হইয়াছে, আমি এক পয়সাও সাহায্য করি নাই। দুই দেশের গুরুতর মনোমালিন্যের মধ্যে উহা কী করিয়া শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিল, জানি না। প্রেমদা আগে পৌঁছিয়া ব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিলেন, শ্রীবিগ্রহ আসিয়াছেন, শীঘ্র গরুর গাড়ী লইয়া পাঁচ-ছয় জন চলিয়া যাও। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল না। এক বিরাট্ বাক্স শ্রীঅঙ্গনে আসিল। উহার মধ্যে কী আছে, শত শত জন আগ্রহের সহিত দর্শন করিল। আমি দেখিলাম না। ২রা কার্ত্তিকের উৎসবান্তে ভাগবতী পরিক্রমায় ঢাকা অঞ্চলে চলিয়া গেলাম। কোন্‌দিন যে ঐ বিগ্রহ শ্রীমন্দিরে গিয়া চিন্ময় বস্তুর সহিত যুক্ত হইয়াছে কিছুই জানি না। নূতন সম্পুট কীরূপ হইয়াছে জানি না। মাঘোৎসবের পূর্বে আমার শ্রীঅঙ্গনে ফিরিবার কোন কথাও নাই।

ফরিদপুরের এক গ্রামে পাঠ। ঢাকা হইতে লঞ্চে সেখানে পৌঁছিব। রাত্র দশটায় লঞ্চ। সদরঘাট গিয়া জানিলাম লঞ্চ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রে আর কোন লঞ্চ নাই। হেলিকেপ্টারে অপ্রত্যাশিতভাবে স্থান পাইয়া পর দিন সকাল বেলা শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছি। এক ঘণ্টা পর চলিয়া যাইব বেবী ট্যাক্সীতে যথাস্থানে। তখন গোপীদা ডাকিলেন—শ্রীমন্দিরে গেলাম।

যাহা দেখিলাম তাহাতে জীবন জুড়াইয়া গেল। কি আনন্দ প্রাণে জাগিল বলিবার নয়। দেখিলাম সাক্ষাৎ প্রভু শয়নে আছে। দেহে শিহরণ লাগিল। বিগ্রহ-সম্পুটে শ্রীচিন্ময় দেহ বিরাজিত আছে। কে যেন মনে জাগাইল পুরী ধামের শাশ্বত দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচিন্ময় দেহাবশেষ আছে। তাহার আবরণে আছে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ। চিন্ময় ব্রহ্ম বস্তুর সংসর্গে দারুও ব্রহ্মময় হইয়াছে। অষ্টকালীন সেবার্চনা ভোগরাগ আরতি চলিতেছেন কত শত সহস্র বৎসর ধরিয়া। মনে হইলে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীচিন্ময়দেহে আছেন মণিময় শ্রীবিগ্রহের আবরণে। শাস্ত্র মতে বিগ্রহ চিন্ময়। তাহা পরম চিন্ময় শ্রীদেহ সংসর্গে সচ্চিদানন্দময় হইয়াছেন। জগন্নাথের যেন একটু সামঞ্জস্যের অভাব আছে। অন্তরে শ্যামসুন্দরের চিন্ময় বস্তু বাহিরে মুরলীধর নহেন, অন্য রূপ। গৌরহরি ঐরূপেই মুরলীধারী মদনমোহন দেখিতেন। আর আজ এখানে অন্তরেও

দশাশ্রিত বন্ধুহরি, বাহিরেও ভাববিহ্বল বন্ধুহরি। জগমোহনেও তাঁহারই অখণ্ড মহানাম মহাকীর্তন। তিনের একাত্মতায় মনঃপ্রাণ ভরিয়া গেল। আরতি করিলাম। শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা আরতি ভোগ শাস্ত্রসম্মত। অথচ উহার গ্রহণকর্তা চিন্ময় শ্রীদেহই। প্রভুর কাগজের মূর্তিখানার উপর চন্দন তুলসী দিতে পারি না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কাঁচ দিয়া বাঁধাইয়া আনিলে কাঁচের আবরণে প্রভুই। দারুব্রহ্মের আবরণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় শ্রীদেহ যেমন অনাদিকাল পূজা-সেবা লইতেছেন, ঠিক তেমনই মনে জাগিয়া অপার আনন্দের উদয় করাইল।

আগে দেখিতাম না—এখন পুনঃপুনঃ দেখিতে সাধ হইল। আগে কেহ দর্শন চাহিলে নিষেধ করিতাম, এখন এই উৎসবের মধ্যে শত শত ভক্ত নরনারীকে ডাকিযা ডাকিয়া দর্শন করাইয়াছি। পুরীর জগন্নাথ ও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সর্বতোভাবেই অভিন্ন। কারণ জগন্নাথ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আর তাহাতে মিশিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। সুতরাং ব্রজলীলা গৌরলীলার মিলনময় বিগ্রহ তিনি। শ্রীশ্রীবন্ধুহরির স্বরূপও তাহাই। তিনি পুরীধামেও যেখানে আছেন শ্রীঅঙ্গন ধামেও সেইভাবে থাকিলেন। এখানে অধিকন্তু আছে নিজের মহাকীর্তনের মহাপ্রচারণ। যাহা নাই বিশ্বের আর কোথাও; শ্রীজগন্নাথ দ্বাদশ বৎসর পর পর নব কলেবর হন। দারু বলিয়াই হন। মণিময় হইলে আর হইতেন না। বুঝি বা ঐ জন্যই শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী দিব্য স্বপ্নে গোপীদাকে জানাইয়াছেন "অষ্টধাতুর আবরণ কর।" তাহা হইলে আর বার বার নবকলেবর করিতে হইবে না।

এতকাল চিন্ময় শ্রীদেহ ছিল বাক্স-সম্পুটে। ইহা শাস্ত্রীয়ও নহে, সুখকরও নহে। বায়ু চলাচলহীন সতত তালাবদ্ধ বাক্স। এখন থাকিলেন শ্রীবিগ্রহ সম্পুটে—একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে, তাহাতে চারিটি জানালা সর্বদাই খোলা থাকে। একটি দরজার ছিটকিনি অর্গল ভিতরে, ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছাময় বাহিরে আসিতে পারেন। নিজ শ্রীবিগ্রহ-সম্পুটে শ্রীহরিপুরুষের চিন্ময় শ্রীদেহ ক্ষুদ্র কুটীর রূপ-বিলাসের বাসরে বিরাজমান। দর্শনে, স্পর্শনে, অঙ্গ সংবাহনে আনন্দে প্রাণ ভরিল। শত শত বার প্রার্থনা করিলাম মহাপ্রকাশ পর্যন্ত এই নবম বা নব পর্যায়ে বিদ্যমান থাক।

শুনিয়াছি, এই নব পর্যায়ের সেবায় অনেকে দুঃখিত। যে-ঘটনায় একজন সুখী, সেই ঘটনায় আর একজন দুঃখী, ইহার প্রতিকার কোথায়? মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলে গদাধর পরম সুখী। গদাধর মহাপ্রভুর সঙ্গ ধরিলে মহাপ্রভু মহা দুঃখী। কেবল প্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতে পারি, আমার আনন্দের অংশীদার তারাও হউক। যে মহাকীর্তনই এখন মহাবিগ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, তার প্রতি সকলের আর্তি বর্দ্ধিত হউক।

অনেক পত্রও পাইয়াছি, দূর-দূরান্তর হইতে; তাহার মধ্যে বেদনা নাই। জগতের বর্তমান অবস্থার ভাবনা নাই, দেশের পরিস্থিতির বোধ নাই। সেবার ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। যাহা নাই, তাহা বলিলাম। যাহা আছে তাহা বলিয়া বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত অপরাধের বোঝা বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা তাঁহাদের দুঃখের উদ্বেগের যে সকল কারণ বিন্যাস করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিগত হয় নাই। অন্যের ব্যথা বেদনা বুঝিতে হৃদয় লাগে। বোধ হয় তাহা নাই বলিয়া বুঝি নাই।❐

'মতিচ্ছন্ন' শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী

মহেন্দ্রজী ও হারান ক্ষ্যাপা

রাত প্রায় দু'টো। মহেন্দ্রজী ঘরে গিয়েছেন। মহেন্দ্রজীর কোন ঘর ছিল না, মন্দিরের বারান্দার কোণেই পড়ে থাকতেন। একদিন এক স্থানে গিয়েছেন, দু'-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলছেন। আমি এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। পরে যখন রাত ৪ টা বাজে। দেখি কি, শ্রীঅঙ্গন ফুলে ভরা, সর্বত্র ফুল ছড়িয়ে আছে। পা ফেলবার জায়গা নেই। কত রঙের কত রকমের ফুল; জীবনে দেখিনি এত রকমের ফুল। দেখে চিন্তিত হলাম। মহেন্দ্রজীর ঘরে প্রবেশ করে ফুলের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে মহেন্দ্রজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত ফুল কোথা হতে এল? আমি কোন দিন তো শ্রীঅঙ্গনে এমন দেখিনি।

তিনি বললেন, এই তো হারানক্ষ্যাপা এসেছিলেন—তাই পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে। সত্যিই যে পুষ্পবৃষ্টি হয় তা চোখে দেখিনি। পুষ্পবৃষ্টি না হলে এত ফুল কোথা থেকে এল? বুঝলাম হারান ক্ষ্যাপা এসেছিলেন। আমি শিরে করাঘাত করে বললাম—হায় হায়! আমি তাঁর দর্শন পেলাম না!

মহেন্দ্রজী বললেন, "তুমি তো দেখে গেলে আমার সাথে কথাবার্তা হচ্ছে।" আমি বললাম, "তুমি চিনিয়ে দিলে অন্ততঃ কথা বলতাম, মুখখানি ভাল করে দেখতাম।" তিনি বললেন—সাক্ষাৎ অদ্বৈত প্রভু। আমার সাথে ১ ঘণ্টা কথা বলে গেলেন। তাঁর অনেক পার্ষদ, দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। আমি বললাম, তিনি কোথায় থাকেন? তিনি বললেন, জানি না। দুই জায়গাতে তার সমাধি আছে। অথচ এখনও তিনি বর্তমান। দুই জায়গায় দাবী করেন—এইখানে দেহ রেখেছেন অথচ এখনও সশরীরে বর্তমান, জীবের কল্যাণে বেড়িয়ে বেড়ান। আমি জানতে চাইলাম, এতক্ষণ কী কথা হ'ল তোমার সঙ্গে? বললেন—বলবো, পরে আসিস্। একটু পরে আবার গেলাম—একটি কবিতা লিখে আমার হাতে দিলেন।

"এক মুক্তাকাশে রক্ত রবি খবর দিয়ে গেল
নিগমে আছে বন্ধুমণি কে বলে মরিল,
সাপের খোলস ছাড়ার মত ঢং ধরিল
আবার আসবে সুনিশ্চয়, বলি ধেয়ে চলিল;
মহা নাটকের রাজা তেইসে খবর দিল
অবধূত মতিচ্ছন্ন অবাক্ হইল।"

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ও শ্রীমদ্ভাগবত

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে পাকা মন্দিরের মধ্যে পরমাশ্রয় গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী একাকী

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি

(শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির শ্রীগুরুদেব)

আপন মনে বসিয়া আছেন। হঠাৎ আমি গিয়া শ্রীপাদের পাশে বসিলাম। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাগবত পড়িয়াছ? আমি বলিলাম, না। গুরুদেব বলিলেন, এই নাও ভাগবত, আজ হইতে এখন হইতে ভাগবত আরম্ভ কর।

একখানা শ্রীমদ্ভাগবত গুরুদেব শ্রীহস্তের নিকট হইতে একটা বিশেষ স্থান নিজেই খুলিয়া দিয়া আমাকে বলিলেন, পড়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়। রাসে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহারা যমুনার তীরে আসিলেন। এক গোপী বলিলেন, আমি আব খুঁজিব না। কেহ তাঁহাকে আমরা অনুসন্ধান করিব না। তাঁহাকে কোথাও কেহই খুঁজিয়া পায় না। নিজে কৃপা করিয়া ধরা না দিলে পাওয়া যায় না। আমরা যে যতই খুঁজিতেছি তিনি ততই বনের মধ্যে লুকাইতেছেন। এ-ভাবে বনের মধ্যে কণ্টকে তাঁহার কোমল চরণ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। এ সময় আমরা যমুনাতীরে বসিয়া কাঁদি। বনের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কাঁদি, যদি কখনও কৃপা হয়। নির্মমভাবে ক্রন্দন-পরায়ণা গোষ্ঠীগণের মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণ হাজির হইলেন। বিরহ-বেদনার মধ্যে হঠাৎ আনন্দের উদয়। গোপীকারা কৃষ্ণকে দেখিয়া একটা প্রশ্ন করিলেন।

এই জগতে তিন রকমের লোক দেখা যায়। এক ধরণের লোক ভালবাসলে ভালবাসে। আর একজন ভাল না বাসলেও ভালবাসে। আর একজন ভালবাসলেও ভালবাসে না ও না ভালবাসলেও ভালবাসে না। তুমি এদের সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

হঠাৎ গোপীদের এরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কী? কৃষ্ণকে গোপীবা অতি গভীরভাবে ভালবাসেন। তিনি বিনা কারণে হঠাৎ ছাড়িয়াছেন তাতে তাঁহারা নিদারুণ দুঃখিত। যাহারা ভালবাসলেও ভালবাসে না তাহারা সেই শ্রেণির লোক ও অতি নির্দয় অকৃতজ্ঞ লোক। কৃষ্ণ নিজে তাহাই। এই উত্তরটা কৃষ্ণের নিজের মুখ দিয়া বাহির হউক। তাঁহারা আর কিছু বলিতে চাহেন না। শ্রীকৃষ্ণ কোন ভূমিকা না করিয়াই নিজের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। কেন তোমরা এরূপ প্রশ্ন করিতেছে—ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়াই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যাহারা ভালবাসলে ভালবাসে তাহারা স্বার্থপর, যাহারা ভালবাসলেও বাসে না তাহারা খুব উঁচু দরের সাধু, আত্মরাম বা আপ্তকাম; অথবা খুব নিচু দরের জীব। হয় অকৃতজ্ঞ নয় দ্রোহী। অকৃতজ্ঞরা ভালবাসিলে ভালবাসিতে পারে না। দ্রোহীরা তার চেয়েও হীন, তারা যারা ভালবাসে তাদের দ্রোহ করে। অকারণ কষ্ট দেয়। আর যাহারা না ভালবাসলেও ভালবাসে তাহারা সর্বোচ্চ শ্রেণি। তাহারা হয়তো পিতামাতা, নয়তো কারুণ্যপূর্ণ হৃদয় অতি সজ্জন। উত্তর শুনিয়া গোপীকারা মনে ভাবিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞ হইবেন, এখন বুঝিলাম তিনি তাহা অপেক্ষাও হীন। যাহারা ভালবাসে তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন, এরূপ হীন চরিত্র লোকেব সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হয় তা তিনি নিজেই বলিবেন, আমরা আর কী বলিব। তাহারা যে কত ভর্ৎসনার যোগ্য—তাহা আমরা ভাষায় বলিয়া কুলাইতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শোন গোপীগণ, আমার একটা স্বভাব আছে যে, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে তাহারা যেন ক্রমেই আমাকে বেশী ভালবাসে। তাই তোমাদের আমার প্রতি ভালবাসা বাড়াইবার জন্যই লুকাইয়াছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তরে গোপীগণ সুখী হইলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অনেক কম আছে। এই জন্য লুকাইয়া কৃষ্ণ তাহা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম এত পরিপূর্ণ তাহা আর বাড়াইবার স্থান নাই। উত্তরটা ভাল হয় নাই বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—তোমাদের ভালবাসা বাড়াইবার জন্য লুকাইয়াছিলাম একথা ঠিক বলি নাই। আমার আর একটা স্বভাব আছে যে—আমাকে যে যতখানি ভালবাসে তাহাকে আমি ততখানি ভালবাসি। কিন্তু তোমাদের ভালবাসার প্রতিদান আমি ততখানি দিতে পারি নাই। একথা তোমাদের জানাইবার জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম। তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ। তাহা আমি হইতে পারি নাই, কোনদিনও পারিব না, তাই চিরকালের জন্য ঋণী থাকিলাম।

কথাটির তাৎপর্য এই, কৃষ্ণের মধ্যে যে গোপীপ্রেম অনুরাগ তা বিষয় জাতীয়। গোপীদের যে প্রেম উহা আশ্রয় জাতীয়। শ্রীকৃষ্ণের ঐ ঋণ শোধ সম্ভব যদি আশ্রয় জাতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণ যদি রাধা হয়ে যেতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে গৌরলীলার বীজ সুপ্ত আছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন। আর বলিতে পারিতেছিলেন না। তার মুখখানি অশ্রুভরে অস্বাভাবিক রাঙ্গা রইয়াছিল। চক্ষু হইতে বড় বড় ফোঁটা গড়াইতেছিল। পুনঃপুনঃ মুছিতেছিলেন। আমি বুঝিলাম তিনি অনুরাগে এমন কান্নাস্তরে পৌছিয়াছেন যে বাক্যস্ফূর্তি সম্ভব নয়।

লোকে আমাকে ভাবগত পাঠক বা বক্তা বলে। আমার যাহা কিছু তাহার উৎসভূমি শ্রীপাদের মুখোক্ত এই কথাগুলি। আর কয়েকদিনের কথা কিছু বলার আছে। যদি বলান তবে বলিব। ❑

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী স্মরণে

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।"—যজুর্বেদ

নীলাচলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গম্ভীরা-রসের মতই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ফরিদপুর শহরপ্রান্তে একটি জলাশয়ের তীরে ঘন বনানীর মধ্যে বাঁশের খুঁটি ও তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে মৌনব্রত অবলম্বন করে কাটিয়েছিলেন দীর্ঘ ষোলটি বছর আটমাস। সেখানে ছিলেন না রামানন্দ বা স্বরূপের মত কোন মরমী ভক্ত। নিঃশব্দে নিভৃতে গভীর আঁধারে একলাটি ছিলেন তন্ময়, স্বানুভবানন্দে।

সেই অন্ধকারে উৎসারিত আলো ছিল তাঁর অঙ্গচ্ছটা।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ছিলেন শৈশবেই সংসারত্যাগী। কৃষ্ণান্বেষণে ব্রজধাম আশ্রয় করে খুঁজে চলেছেন তাঁর প্রাণগোবিন্দকে। শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। একদিন আরাধ্য দেবতার স্বপ্নাদেশ পেলেন শ্রীপাদ—ব্রজে নহে, ফরিদপুর গম্ভীরায় রয়েছেন তাঁর অভীষ্ট পুরুষ। ব্রজধাম ত্যাগ করতে তাঁর বুক ভেঙ্গে গেলেও সেই স্বপ্নাদেশ এত প্রাণাকর্ষী যা লঙঘন করার কোন উপায় ছিল না। তিনি তাই ছুটে এলেন ফরিদপুরে, প্রভুর গম্ভীরা লীলার দশম বর্ষে।

শ্রীপাদ দিনরাত প্রভুর কুটিরের বন্ধ দুয়ারে দণ্ডায়মান, অবিশ্রাম অশ্রুধারায় বুক ভাসমান—মুখে কেবল ব্যথাভরা একটি বুলি—"জগদ্বন্ধো! আর কেন, খোল হে দুয়ার।" অবশেষে কৃপাময়ের আসন টলে উঠলো। এক নিঝুম রাত্রিতে দুয়ার খুলে গেল। আর্ত ভক্তকে টেনে নিলেন ভেতরে—চিহ্নিত দাসকে করলেন চিরতরে আত্মসাৎ।

মহেন্দ্রজী এভাবে ছিলেন সুদীর্ঘ নয় মাস—আহার-নিদ্রা বিহীন যেন দীন অভাজন। অশ্রুসজল অন্তর্বেদনা সমর্পণে। অশ্রুতপূর্ব মিলনে হলেন চির আপনজন। গুরু হ'ল ভক্ত-ভগবানের হার্দিক নিভৃত আস্বাদন। শ্রীপাদ আজ রসে ভরপুর প্রেমাতুর। চাওয়া পাওয়া শেষ। লাভ হ'ল চির আকাঙিক্ষত সাক্ষাৎ সেবাময় জীবন।

সুধন্য ভক্তবরের চরণ প্রান্তে প্রতীক্ষারত আমরাও দর্শন আশায়, কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লালসায়।❑

'শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী'—ভূমিকা

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

শ্রীগুরুপ্রণামের এই মন্ত্রটির মধ্যে শ্রীগুরুদেবের পরিচয়টি সুব্যক্ত। যিনি অখণ্ড, যিনি মণ্ডলাকার, যিনি চরাচরে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার পাদপদ্ম যিনি দেখাইয়া দেন তিনি শ্রীগুরু, তাঁহাকে প্রণাম করি। শ্রীগুরুর এই তত্ত্ব-পরিচয়টি সকল সাধকের জীবনেই সুপরিব্যক্ত থাকা প্রয়োজন। কাহার জীবনে কীভাবে তাহা রূপ লাভ করিয়াছে তাহা যাঁহার সংবাদ সে-ই জানে। অতি অভাজন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে শ্রীগুরুর পরিচয়-তত্ত্বটি কী ভাবে মূর্তিলাভ করিয়াছিল তাহা আজ এখানে বলিব। ইতঃপূর্বে কোনদিন কাহাকেও বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আজ বলিব। কেননা—এই গ্রন্থখানি আমার শ্রীগুরুদেবের মহাজীবন-লীলার সংক্ষিপ্তসার। ইহার ভূমিকা আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিতেছি। এই অবসরে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সংঘটিত এই জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যে প্রকটিত একটি ঘটনা—যাহা নিত্য স্মরণ করি বহু বার—তাহাকে ভাষায় আকার দিবার সুযোগ লইব।

বাংলা ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাস। বয়স আমার চৌদ্দ ছাড়াইয়া পনেরতে পা দিয়াছে।

* *'শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী'। দাস যোগিভূষণ, ১৩৭১। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ।*

আমরা তিনটি যুবক, বরিশাল জেলা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি ফরিদপুর। তিনজনই আমরা স্কুলের ছাত্র। বাড়ী হইতে, স্কুল হইতে পালাইয়া আসিয়াছি। আমার সঙ্গী দুই জনের নাম আশুতোষ দাশগুপ্ত ও রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আশুর ডাক নাম সোনাই। রাজেন্দ্রের ডাক নাম মহারাজ। ইহারা দুইজনেই বয়সে আমাপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং ইহাদের আমার সঙ্গী না বলিয়া আমি ইহাদের সঙ্গী বলাই ঠিক। মহারাজ আমার জীবনের প্রথম পথদ্রষ্টা। আমার বয়স যখন বারো, তখন আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব দেবমূর্তি দর্শন করি। স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন পর মহারাজ আমাকে ডাকিয়া আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সেই কথা বলে ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর একখানি শ্রীমূর্তি দেখাইয়া বলে যে দেখ, এই মূর্তিই তোমার স্বপ্নদৃষ্ট কিনা। আরও বিস্ময় হইল ইহা ভাবিয়া, আমার স্বপ্নের কথা মহারাজ জানিল কেমনে। কেমনে জানিল তাহা আজও জানি না।

মহারাজের বয়স ১৭-১৮, ঐ বয়সে ঐরূপ সত্যনিষ্ঠ ও তপশ্চর্যাপরায়ণ যুবক আমি আর দেখি নাই। বাল্যে সে-ই ছিল আমার পথদ্রষ্টা। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, জগতে কেন আসিয়াছি, জীবনের পূর্ণতা কোথায়, সংসারে নিত্য বস্তু কী, অনিত্য বস্তু কী—এই সব মহা তত্ত্বকথা মহারাজ আমাকে শিখাইয়াছে—যখন আমার বয়স তের-চৌদ্দ। জীবনে বৈরাগ্যের বীজ সে-ই বপন করিয়াছিল। মহারাজ পরম বৈরাগ্যবান ছিল। তাহার বৈরাগ্য-জীবনের নাম ছিল সংকর্ষণ দাস। নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। মহারাজ রাজেন বলিয়াও ডাকিতেন। মহারাজ মহেন্দ্রজীর পরম প্রিয় পাত্র ছিল। সোনাই ও মহারাজ আজ কেহই জগতে নাই। সোনাই ছিল আমার সহপাঠী। একদিন সোনাই ও আমি বাড়ী হইতে না বলিয়া প্রায় পনের মাইল দূরে রাজনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে প্রভু জগদ্বন্ধুর অষ্টপ্রহর কীর্তনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। বাড়ীর অভিভাবক স্কুলে নালিশ করিলেন। স্কুলের হেড্ মাষ্টার মধুসূদন সেন মহাশয় আমাকে সজোরে তিন-চারিটা বেতের আঘাত করিয়া কহিলেন, 'বল আর এরূপ কীর্তনে যাব না।' আমি বলিলাম 'না, যাব না।' তারপর সোনাইকে প্রায় বিশটি বেতের আঘাত করিলেন। সে কিছুতেই 'না' বলিল না। কেবল কয়েক বার 'জয় জগদ্বন্ধু' বলিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'কলিযুগের প্রহ্লাদ দেখিলাম!' সোনাইও ছিল মহেন্দ্রজীর হাতে গড়া।

আমার সঙ্গিদ্বয়ের পরিচয় দিতে এতক্ষণ কাটাইলাম। এই দুইটি যুবকও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর মহাপ্রভাবপুষ্ট বলিয়াই এতক্ষণ কাটাইলাম। এখন আবার সূত্র ধরিব। শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিয়াছি আমরা তিনজন, বেলা এগারোটা-বারোটা এইরূপ সময়। শ্রীঅঙ্গনে দু'-পাঁচটি মাত্র লোক। মন্দিরের দুয়ারে গেলাম। মন্দির খোলা। একজন লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া। মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে প্রভু বেড়াইতে গিয়াছেন পশ্চিম দিকের রাস্তায়। আমরা যশোহর রোড ধরিয়া পশ্চিম দিকে ছুটিলাম। পাঁচ-সাত মিনিট চলিতেই মধুর কীর্তনধ্বনি কানে আসিল। দেখিতে দেখিতে কীর্তনের দল সম্মুখে আসিল। কীর্তনের মধ্যে পাঁচ-সাতজন লোকের কাঁধে একটি ইজি চেয়ার। তার পায়ের সঙ্গে বাঁশ বাঁধা। ঐ চেয়ারের উপর উপবিষ্ট এক অনিন্দ্যসুন্দর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মানুষ। রূপে ও গন্ধে ভরপুর হইয়া গেলাম। দূর হইতেই দেখিতেছিলাম। অতি নিকটে আসিলে গড় হইয়া ভূমিতলে পড়িলাম, আমাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী।

পর পর দুইদিন ঐরূপ প্রভু বাহির হইলেন। ভগবদ্দর্শনে জীবন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু

স্পর্শন লালসা বাড়িল। পর দিন সকালে প্রভুর সঙ্গে ঐরূপ নগরকীর্তনে বেড়াইয়া আসিয়াছি। ইজি চেয়ার সহিত ভক্তগণ যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন চার-পাঁচজন বিশিষ্ট ভক্ত ছাড়া আর সবাই বাহিরে থাকেন। আমি ইজি চেয়ারের তলায় থাকিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম, উদ্দেশ্য শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিব। রাজেশ্বর নামক একটি ভক্তসেবক আমি অন্যায় ভাবে মন্দিরে ঢোকার জন্য রাগ করিয়া আমাকে বল পূর্বক ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। আমি প্রবল লালসা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। রাজেশ্বরের কার্যে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকিলাম তাহা জানি না। তবে যখন সংজ্ঞা ফিরিল তখন দেখি আমি শ্রীমন্দিরের মধ্যে, আমার পার্শ্বে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, সম্মুখে একখানি দুগ্ধফেনশুভ্র শয্যায় শায়িত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। আর কেহ নাই। কীভাবে কে আমাকে এখানে আনিল তাহা জানি না। পরে শুনিয়াছি—আমার মূর্চ্ছিত দেহকে কোলে তুলিয়া মহেন্দ্রজী নিজেই আনিয়াছেন।

আমার চক্ষু মুছাইয়া পিঠে হাত দিয়া শ্রীপাদ কহিলেন, "আয় তোকে বিয়ে করাইয়া দেই। শ্রীহরি একমাত্র পুরুষ, জীবাত্মা প্রকৃতি। এই দু'য়ের মিলন ঘটিলেই প্রকৃত বিবাহ।" বয়স অল্প হইলেও কথাটা তখন বুঝিলাম। শ্রীপাদ আমার হাত ধরিয়া প্রভুর শয্যার পাশে বসাইলেন। বলিলেন "দে, শ্রীচরণে চন্দন-তুলসী দে।" কোথায় পাইব চন্দন তুলসী! কি আশ্চর্য! দেখিলাম পার্শ্বেই একটি বাটিতে চন্দন-তুলসী। কে আনিল, কখন আনিল, জানি না। ইহা একপ্রকার অলৌকিক মনে হইল। শ্রীপাদ চন্দনে তুলসী সিক্ত করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দে, এই চরণে দে—চিরদিন বাঁধা পড়িয়া থাক্।" শ্রীশ্রীপ্রভু শয়নে আছেন কাত হইয়া। একটি চরণ ছড়ানো আমার নিকটে, আর একটি চরণ গুটানো। যে চরণখানি ছড়ানো তাহার তলা দেখা যায়। রাঙা টুকটুকে ধ্বজবজ্রাদি নানা চিহ্নযুক্ত। সে সব তিনি দেখাইয়া দিলে সুস্পষ্ট দেখিলাম। শ্রীপাদের নির্দেশমত নিকটবর্তী চরণে তুলসী-চন্দন অর্পণ করিলাম। আর একটি শ্রীচরণ পূজার সাধ জাগিল, জাগিতেই প্রভু সেই চরণখানি ছড়াইয়া দিলেন। তাহাতেও নির্দেশমত চন্দন-তুলসী দিলাম। তৎপর ইঙ্গিত মত বাটি হইতে হাত ভরিয়া চন্দন তুলিয়া শ্রীচরণের নীচে উপরে লেপিলাম। কি যে স্পর্শমাধুর্য, সমস্ত দেহ মন যেন আনন্দে জড় হইয়া গেল!

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে দু'-চারটি মাছি বসিতেছিল। তখন একজন ভক্ত আসিয়া পাখা দিয়া হাওয়া দিয়া মশারিটি ফেলিয়া দিল। শ্রীপাদ আমাকে একটু সরিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। একটু দূরে বসিয়া পাতলা মশারির মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত শ্রীঅঙ্গচ্ছটা দেখিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেলাম।

পরে সব জানিয়া মহারাজ রাজেন আমায় বলিল—শ্রীহরিতত্ত্ব অখণ্ড। গুরু গৌরাঙ্গ গোপী রাধা শ্যাম সব মিলিয়া হরি। একমাত্র শ্রীহরিপুরুষই অখণ্ডতত্ত্ব। দৈর্ঘ্য বিস্তারে ইনি চারি হস্ত। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল। সুতরাং মণ্ডলাকার। হরিপুরুষের শ্রীদেহ জড় নয়—চিন্ময়—চিদ্‌ঘন। চিদ্ বস্তু চরাচর সর্ব সত্তায় অনুস্যূত, সুতরাং পরিব্যাপ্ত। এই পরম বস্তু শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীচরণপদ্ম শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তোমাকে দেখাইয়া দিলেন, পূজা করাইয়া দিলেন, জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া মিশাইয়া দিলেন। গুরু ও ইষ্ট প্রাপ্তিতে তুমি ধন্য!

মহারাজের কথা আজও প্রাণে ঝঙ্কার দেয়। ভাবি আমি ধন্য। "তৎপদং দর্শিতং যেন"

আমার জীবনে যেরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তেমনটি বোধ হয় অন্য অনেকের জীবনেই ঘটে নাই। মনে হয় সেদিন যাহা ঘটিয়াছিল তাহা একটি ঘটনামাত্র নয়, একটা শাশ্বত সত্তার মূর্তি ধারণ—পরম গুরুতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ব্রজের জন। ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যখন ব্রজ-গৌরলীলা-মিলিতাঙ্গ, তখন তাঁহার প্রিয় জনেরা নিশ্চয়ই ব্রজের গণ। শ্রীগুরুদেবকে "গোবিন্দ-প্রেষ্ঠ" রূপে ভাবনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন গোস্বামিপাদগণ। গোবিন্দের যত প্রিয়জন আছেন তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় আমার শ্রীগুরুদেব। শাস্ত্রের যেরূপ নির্দেশ সেইরূপই ভাবনা করি। নিজ পরিচয়ে শ্রীপাদ এক কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"গোকুলে বসতি কৃষ্ণ পতি
আভিরী রূপসী আমি,
বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী ভামিনী
ভালবাসিত দিবাযামী।
শ্বশুর নন্দরাজ শাশুড়ী যশোদা
বাৎসল্যময়ী ধনিষ্ঠা অন্নদা
আদরে তুষিত শ্যাম নেচে যেত
নূপুর বাজিত ঝুমঝুমি।।
সুবলাদি সনে গোধন চরাত
প্রেমে মুগ্ধ কানু খাওয়া ফল খেত
রাখালেরা কাঁধে চড়িত চড়াত
তারা কানাইর সুখকামী।
যখন নবনী খাওয়াত জননী
ননী ছুড়ে দিত চতুর-চূড়ামণি
আঁখি ঠেরে মন প্রাণ কেড়ে নিত
প্রসাদ লইতুম মস্তক নমি।।"

অপর এক কবিতায় নিজ স্বরূপ লিখিয়াছেন—"ললিতা-স্বরূপ-মিলিত অঙ্গ বন্ধুর সেবার লাগি।" ব্রজে ললিতার যে সেবা, নীলাচলে স্বরূপের যে সেবা; মহাউদ্ধারণ লীলায় বন্ধুসুন্দরের সেই সেবা-তন্ময়তা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর। একদিন বলিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের ভোগ রসুই কালে মনে হইত আমি আর কী সেবা করি? কী করিতে পারি? সেবার ভাগ্য এই কাষ্ঠগুলির! আপনাদের নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া সেবার দ্রব্য তৈয়ারী করিতেছে! এমন ভাগ্য আমার কবে হবে, নিজেকে জ্বালানী কাঠের মত নিঃশেষ করিয়া দিয়া সেবায় বিলাইয়া দিব।"

ভোগ সাজাইতে সাজাইতে শ্রীপাদ শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীকে 'দিদি' ডাকিতেন। ডাকিয়া বলিতেন, আয় এই সব দ্রব্যে একটু মহাভাব মিশাইয়া দে। মহাভাবমিশ্রিত না হইলে তো বন্ধুহরি গ্রহণ করিবেন না।

এইরূপ মধুর কথা কত তাঁর শ্রীমুখে শুনিয়াছি। তাঁহার কথা তাঁহার ভাব এবং তাঁহার চিন্তাধারা জীবন ভরিয়া আছে।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর জীবনের দুইটি প্রধান কার্য। 'মহানাম সম্প্রদায়' নামক একটি ত্যাগী সম্প্রদায় গঠন ও "অখণ্ড মহাকীর্তন যজ্ঞ"। এই সম্প্রদায়ের সাধন-কেন্দ্রে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

"চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দোহে মিলি হয় সুমাধুর্য।
সাধুগুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য।।"

এই মিলন-মাধুর্যের আস্বাদন এই সম্প্রদায়ের মহা সাধন, এই মহা তত্ত্বের প্রচারণ এই সম্প্রদায়ের জীবনের তপস্যা। "ত্যাগই সুখ, বৈরাগ্যই ভাগ্য"—এই সম্প্রদায়ের যাত্রাপথের বর্তিকা। মহেন্দ্রজীর জীবন-সাধনার মধ্য হইতে এই সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। সম্প্রদায়ের সেবকগণ শ্রীপাদকে কী দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেই। মহানাম মহাপ্রচারণে শ্রীপাদের সর্বপ্রধান সহকারী ছিলেন শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী। তিনি 'মহানাম-মালা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার উৎসর্গে আছে—

"ধর হে মহেন ধর
প্রেম-ভক্তি নাহি মোর
প্রাণবন্ধুরে করহ অর্পণ।"

এই ভাবটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সেবকের অন্তরের কথা। ব্রজের যূথের সেবিকাগণের যূথেশ্বরীর প্রতি যে ভাব ঠিক সেইরূপ।

মহাপ্রচারণের পরিপূর্ণতা মহাকীর্তন যজ্ঞে। ১৩২২ সন হইতে ১৩২৮ পর্যন্ত মহাপ্রচারণ চলে। তৎপর ১৩২৮ সনের ১লা আশ্বিন শ্রীশ্রীপ্রভু মহা দশাশ্রয় করেন। ২রা কার্তিক হইতে মহাকীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ হয়। শ্রীমন্নবদ্বীপ দাসজীকে মহেন্দ্রজী গুরুতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহার মুখে অবগত হন যে শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন, "ত্রয়োদশ দশা এবার দেখতে পাবি। তাহার তিনটি লক্ষণ—শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব ও পূর্ণ তন্ময়তা।" এই বাণী পাইয়া শ্রীপাদ ধ্যানে অনুভব করিলেন যে, ইহা প্রভুর ত্রয়োদশ দশা। এই দশাবস্থায় তাঁহার আস্বাদ্য বস্তু মহানাম। মহানাম মহাকীর্তনের দুইটি ফল। একটি অন্তরের দিকে, অপরটি বাহিরের দিকে। মহানাম মহাকীর্তন-মাধুর্য দশাশ্রিত বন্ধুসুন্দর নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন, এই আস্বাদনের পরিপূর্ণতায় তাঁহার মহাপ্রকাশ। এইটি অন্তরের দিক্। আর বাহিরের দিক্ হইল এই যে—মহাপ্রলয়াঘাত অঙ্গে ধরিয়াই বন্ধুহরির মহাকায় এই মহামৃত্যু দশা গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকীর্তন মহাপ্রলয়ের প্রবলতাকে ব্যাহত করিবে। অন্তরের দিকে স্বমাধুর্যাস্বাদন, বাহিরের দিকে মহা প্রলয়দমন। এ যেন ভাগবতের 'প্রশমায় প্রসাদায়'। মহাপ্রলয়াঘাতকে প্রশমন করিবেন ও মহাদশাস্বাদনকে প্রসাদন করিবেন—এই কার্য মহাকীর্তন-যজ্ঞের। এই মহাযজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বরের ইচ্ছায় শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর সাধন-সামর্থ্যে আজও চলিতেছে।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

এই শাস্ত্রবাণী এই মহাযজ্ঞের মধ্যে সত্যিকার জীবন লাভ করিয়াছে। সংকীর্তনযজ্ঞে তাঁহার যজন চলিতেছে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী এই যজ্ঞের পুরোধা।

এই প্রলয় দমন ও মহাউদ্ধারণ যদি সত্য হয় (ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই) তাহা হইলে এই জগতে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দান অনন্যসাধারণ।

প্রিয় যোগিভূষণ দাদার এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তগণ শ্রীপাদ সম্বন্ধে অবগত হউন। এই মহাজীবনের অনুধ্যানে জীবন পবিত্র হইবে। প্রভু বন্ধুহরির নিকটবর্তী করিবে।

"তৎপদং দর্শিতং যেন" শ্রীগুরুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ করিয়া অবলুণ্ঠনে ধন্য হই।—জয় জগদ্বন্ধু।□

মহানাম সম্প্রদায়াচার্য
শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর আবির্ভাব শতবার্ষিকী

হরিনাম মহানাম যে সারাৎসার তত্ত্ব ইহা চন্দ্রপাত গ্রন্থে শ্রীপ্রভু নিজ হস্তেই লিখিয়াছেন। "হরি হরি হরি কও, মহানাম মহানাম।"

ব্রজরসে ভাসিতে ভাসিতে ব্রজধাম হইতে মহেন্দ্রজী আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর থাকিলেন ফরিদপুর প্রভুর সাক্ষাৎ সেবায়। তারপর নিজ স্বতন্ত্রতায় মহানাম সম্প্রদায় গঠন করিলেন। মহানাম কীর্তনকেই পথের শ্রেষ্ঠ সম্বল বলিয়া প্রচারণ চালাইলেন। সম্প্রদায়ের ধ্বজা রহিল "ত্যাগই সুখ, বৈরাগ্যই ভাগ্য।"

কৃষ্ণদাস, প্রেমদাস, উদ্ধারণ দাস, শান্তিদাস, তেজোনারায়ণ, ধর্মব্রত ও গোপীবন্ধুদাস প্রমুখ ত্যাগী যুবকগণ প্রচারণে বেড়াইলেন। উদ্ধব উপাসক প্রমুখ বালক ব্রহ্মচারিগণের মৃদঙ্গ-বাদন-পটুতায় এবং গোপীবন্ধুজীর লীলাতত্ত্ব পরিবেশনে মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইল।

কত শত মদ্যপ মহেন্দ্রজীর সংস্পর্শে শুদ্ধাচারী হইয়া নব বলীয়ান্ হইল। কত শত চৌদ্দ মাদল, ছাপ্পান্ন মাদল কীর্তনে গ্রাম দেশ পল্লী পাড়া মাতিয়া উঠিল। তপস্যার প্রভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইল। এর পুরোধা ছিলেন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী।

তাঁহার এই বিরাট্ প্রচার স্বচক্ষে দেখিয়া, তাঁহার বহু ধারায় ভাসিয়া মহানাম সম্প্রদায়ে আত্মদান করিলাম। পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন—তাঁহার সহিত নিবিড় সম্বন্ধ পাতাইয়া দিলেন যিনি তিনি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব।

তাঁহার আবির্ভাব পীঠ যশোহর জেলায় নড়াইল মহাকুমায় ফুলবদিনা গ্রাম। একশত বৎসর পূর্বে তিনি পৃথিবীর মাটিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইবে আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ; ২৯শে মে। ঐদিন হইতে এক বৎসর উৎসব হইবে।

ফুলবদিনা আবির্ভাব ভূমিতে, ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে, ঢাকা মহাপ্রকাশ মঠে, ময়মনসিংহ জগদ্বন্ধু আশ্রমে, নবদ্বীপ হরিসভায়, নবদ্বীপ মহানাম মঠে, কৃষ্ণনগর ঘূর্ণী মহেন্দ্র-বন্ধু অঙ্গনে, পুরীধামে জগদ্বন্ধু আশ্রমে, শিলিগুড়ি রাধামাধব বন্ধু আশ্রমে, ব্রজধামে বন্ধুকুঞ্জে, আরও অনেক

ভক্তগৃহে এই উৎসব হইবে। পর পর প্রকাশিত অনুষ্ঠান লিপি অনুসারে উৎসব চলিবে।

আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা মহানগরীতে চৌদ্দটি চৌদ্দমাদলে এই নগর সংকীর্তন শেষ পর্যন্ত সহস্রমাদল নগর সংকীর্তনে রূপ নেয়। বিরাট্ নগর কীর্তন হইবে। ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, মহাউদ্ধারণ মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণ করতঃ নজরুল ইসলাম সরণী (ভি. আই. পি. রোড)-এ মহানাম অঙ্গনে কীর্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

তদবধি মহানাম অঙ্গনে নব দিবস কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধুহরির লীলাকীর্তন ও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীত আস্বাদন এবং শ্রীপাদের জীবন ও অবদান লইয়া প্রসঙ্গ ও ভাষণ হইবে।

সকল ভক্তবান্ধব বৈষ্ণবগণ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া যোগদান করুন—ইহাই আন্তরিক নিবেদন

মহানামব্রতী ভক্তসজ্জনের সেবক—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

রামবাগানের কথা*

জয় জগদ্বন্ধু

▲ **"কিঞ্চিদধিক আশি বৎসর পূর্বে মহাবতারী কারুণ্যখনি শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর এই রামবাগানে শুভ পদার্পণ করেন। দারিদ্র্যের পেষণে ও সামাজিক অবহেলায় রামবাগান তখন কলিকাতার নিকৃষ্টতম পল্লী ছিল।**

শ্রীশ্রীপ্রভুর পূত পাদস্পর্শে ডোমপল্লীর নর-নারী মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। কৃষ্ণকীর্তনে অগাধ অনুরক্তি লাভ করে। ডোমপল্লী ব্রজপল্লীতে সুষমামণ্ডিত হয়। প্রভু বড় হইয়াও এত ক্ষুদ্রদের কেমন করিয়া আপন করিয়া লইয়াছিলেন তাহা ভাবনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যে স্থানটিতে তাঁহার পাদক্ষেপ তাহা এই।"

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ভক্তদেরকে বহু গ্রন্থ পড়তে নিষেধ করেছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র ছাড়া অন্য মত ও পথের গ্রন্থ পড়িলে বিশ্বাসে ব্যাঘাত জন্মে, লোক হয় ঘট-পটিয়া মূর্খ। রাম-বাগানের ভক্তগণ বেশী লেখাপড়া জানেন না। বিশ্বাসই তাদের একমাত্র সম্বল, তারা অন্তরের ধনে ধনী, অনুভব সিদ্ধ। তারা মনে মনে ভাবেন, প্রভু জগদ্বন্ধু সাধারণ মানুষ নন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু কথাটা তারা প্রমাণ করতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় না। নিজেদের ভক্তি-বিশ্বাসকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেন তারা।

একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন হরিদাস। মাঝে মাঝে তিনি প্রভুর বিষয়ে স্বপ্ন দেখেন। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন। একদিন দেখলেন, "প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যেন রামবাগানের স্বাধীন সম্রাট্।" আর

---

* *'রামবাগানের কথা' (পুস্তিকা)। শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ১৪০০ বঙ্গাব্দ। ট্রাস্ট।* ▲ প্রস্তর ফলকে লেখা।

একদিন দেখলেন, রামবাগানে এক বিরাট্ মন্দির নির্মিত হয়েছে আর তার তোরণতলে বসে আছে চম্পটী ঠাকুর। হয়ত স্বপ্নের মধ্যে কিছু সত্য আছে। হয়ত বা এ নিছক কল্পনা। এ নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাননি কোনদিন। কিন্তু আজ তাকে ভাবিয়ে তুলল। এ কি স্বপ্ন না মতিভ্রম, না কোন পুণ্যের সোনালী ফসল? তিনি যেন দেখতে পেলেন তার শিয়রের কাছে প্রভু দাঁড়িয়ে আছেন। সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের ঝিলিক, স্বর্গের অমৃত মাধুরী, স্নেহমাখা সুরে তিনি যেন বলছেন,—"ওরে আমায় বিশ্বাস কর, পরীক্ষা করিস্‌নে। পরীক্ষায় আত্মা পচিয়া যায়।" আরো বললেন, আমি দর্পণ। আমার কাছে এলেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। কারো কিছু গোপন থাকে না। আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু, আমি তোদের চির বন্ধু।"

ঘুমের ঘোরে চমকে উঠলেন হরিদাস। কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "প্রভু! আপনি আমাদের জনমের প্রভু। আমরা আর কিছু চাই না-শুধু আপনাকে চাই। তবু কিছু লোকে শাস্ত্রের দোহাই দেয়, বলে—।" কথাটি শেষ করতে পারলেন না তিনি। "শ্রীভগবানের শ্রীধরাধামের আগমনের কথা শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি কী? ইচ্ছাধীন অবতার। সব তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখনই আসার প্রয়োজন তখনই আসেন। লক্ষণে চিনবি। শক্তি প্রকাশ করলে জগৎকে জানালে সকলে জানতে পারে।" বললেন প্রভু।

তবে সন্দেহ যায় না হরিদাসের। অথবা মনের মধ্যে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, শুধু 'দার্ঢ্য লাগি' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "প্রভু, আপনার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করি। যদি মনে করেন এ জীবাধম তা জানার বা শুনার যোগ্য তবেই বলবেন।" প্রীত হলেন প্রভু। বললেন, যার যে ভাব সে তাই চায়। দেখ মানুষ এত সব চায় কিন্তু হরিনাম দেও, উদ্ধারণ চাই তা কেউ বলে না, কেউ জানতে চায় না, আমার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? শুন্, "অনাদির আদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা—এই দুই লীলায় সর্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।"

ঘুম ভেঙে গেল হরিদাসের। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পূব গগনে, নব দূর্বাদলের শীষের উপর শিশিরবিন্দু ঝিলমিল করছে মুক্তার মত, অদূরে শেঠের বাগান থেকে ভেসে আসছে কয়েকটি নাম না জানা পাখির মধুর সুর। ঠিক এই সময় নিত্য টহল সেরে চম্পটী ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন রামবাগানের হরিসভায়। বিভ্রান্তের মত হরিদাস বারান্দায় বসে আছেন। চোখে মুখে আবেগের চিহ্ন। কী যেন বলতে চান অথচ পারেন না, এমন একটি ভাব। চম্পটী ঠাকুর শুনলেন সব কথা আবিষ্ট চিত্তে, গভীর মনোযোগের সহিত।

চম্পটী ঠাকুরের একবার ইচ্ছা হ'ল কথাটি তিনি এড়িয়ে যান। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এত সব উচ্চভাবের আলোচনা শোভা পায় না। কিন্তু তার মনে হ'ল প্রভু একদিন বলেছিলেন, "জীব মাত্রই কৃষ্ণ ভক্ত। তারা কেউ ছোট নয়, সাধারণ নয়। সকলেই আমার, আমি সকলের। তোরা কিন্তু সবকেই শ্রদ্ধা করবি, ভালবাসবি।" অভিভূত হ'ল তাঁর মন। আবেগে জড়িয়ে ধরলেন হরিদাসকে। বললেন, তুমি অতি ভাগ্যবান তাই প্রভু তোমাকে বিশেষণ দিয়েছেন 'হিত' বা জগতের উপকারী। তোমার কথাগুলো জীবজগতের উপকারে

আসবে, এ আমার নিশ্চিত ধারণা।

চম্পটী ঠাকুর হরিদাসকে তার স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে প্রভুর স্বরূপ বলতে লাগলেন। যেন একটা আপন-ভোলা ভাব, যেন একটি দিব্যস্মৃতির বহিঃপ্রকাশ। শুন হরিদাস, যা বলছি মন দিয়ে শুন। পরীক্ষা করবে না, প্রভু বলেছেন। পরীক্ষায় আত্মা পচে যায়, বস্তুতে অবিশ্বাস জন্মে। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনাদির আদি, সর্বকারণের কারণ। নবদ্বীপে ভগবান্ গৌরাঙ্গসুন্দর নামেও চৈতন্য, স্বরূপেও চৈতন্য। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা একই অদ্বয়তত্ত্ব, একই লীলার দুই বৈচিত্রী। তত্ত্বতঃ ও স্বরূপতঃ রাধা ও কৃষ্ণ এক বস্তু, শুধু লীলা আস্বাদনের জন্য দুই দেহ ধারণ করেছেন। এক আত্মা, দুই দেহ ধারণ করেছেন। এক আত্মা, দুই দেহ। গৌবলীলায় ঘটেছে এই দুই দেহের একত্র মিলন। এই লীলায শ্রীগৌর, শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু।

গৌরলীলায় প্রভুর সর্বশক্তি নিত্যানন্দ। "এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বিলাইতে।" নিত্যানন্দকে যে তুষ্ট করে সে মহাপ্রভুর হয়ে যায়। "অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।" চির অনর্পিত নাম-প্রেম সেধে বিলিয়ে দিচ্ছেন জগজ্জনে, কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে। দ্বাপরে কৃষ্ণলীলায় অসুর সংহার করেছেন, কৃষ্ণলীলায় নিজে উপযাচক হয়ে প্রেম দেননি, গৌরলীলা তো অযাচিত প্রেম-ভক্তি বিতরণেরই ইতিহাস। গৌরাঙ্গসুন্দর শক্তি সঞ্চার করেছেন। আর নিত্যানন্দ হরিনাম প্রচার করেছেন। বলেছেন কৃষ্ণ নামের সীমাহীন আকাশের নীচে সকল মানুষেরই স্থান আছে। সেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয় কৃষ্ণপ্রেমী, কৃষ্ণভক্ত। গৌরলীলায় যা অসম্পূর্ণ ছিল তা পূর্ণ হল বন্ধুলীলা-মাধুরীতে। শ্রীচৈতন্যের করুণা ও উদ্ধারণ লীলার বিশিষ্টতম প্রকাশই বন্ধুলীলা। এইজন্য মরমী ভক্তদের কাছে শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের মিলিত তনু।

বলতে বলতে আবিষ্ট হয়ে গেলেন অতুল চম্পটী মহাশয়। তাঁর মনে হল কথাগুলো যেন তিনি নিজে বলেননি, তাঁর অন্তরে বসে অন্য কেউ যেন কথা বলেছেন, ভাষাগুলোও যেন অন্যের। কিন্তু কে তিনি; কে সেই জীবন-দেবতা? তিনি নিজে তো এমন স্পষ্ট করে প্রভুর তত্ত্ব অনুভব করেননি কোনদিন, অন্তরে উদ্ভাসিত হয়নি এই ধ্যানমঙ্গল। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল প্রভুর একটি কথা। "অতুল! সময়, সময়, সময়। একটা গাছ যখন বাড়ে তখন কি তোরা বুঝতে পারিস্ কতটুকু করে বাড়ছে? শেষে দশ দিন পরে দেখিস্ কত বড় হয়েছে। আমার ধর্ম ও কর্ম, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কতটুকু কী বুঝবি?" চম্পটী ঠাকুর হতবিহ্বল, হরিদাস ভাবে গদ্‌গদ, তিনকড়ি, পীতাম্বর, বুজিরাম, পরদেশিয়া প্রভৃতি যে-সকল ভক্ত প্রাতঃকীর্তন করতে হরিসভায় এসেছিলেন, তাঁরা শান্ত সমাহিত।

নবদ্বীপে কীর্তন আরম্ভ হয়েছিল শ্রীবাস অঙ্গনে। দরজা বন্ধ করে সারারাত কীর্তন চলত। বাইরের লোক থাকত বাইরে। প্রবেশের পথ পেত না, এমন কি জানত না পর্যন্ত কী কীর্তন হচ্ছে। মহাপ্রভু ভক্তদেরকে জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

তিনি আরো উপদেশ দিয়েছিলেন, ঘরে ঘরে দশ-পাঁচ-জন আত্মীয়-স্বজন মিলে হাততালি

দিয়ে হরিনাম কীর্তন করতে।

"দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ' সবে হাতে তালি দিয়া।।
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।।"

মহাপ্রভুর বাক্যের মধ্যে খুব একটা অস্পষ্টতা ছিল না; তবু কৃষ্ণ নাম জপ্য না কীর্তনীয়—এ নিয়ে তৎকালে বৈষ্ণব মহলে তর্কের ঝড় উঠেছিল।

একদল বলতেন, মহাপ্রভু কখনো ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন নি। এই নাম জপ্য। আর একদল বলতেন, হরে কৃষ্ণ নাম জপ্যও বটে, কীর্তনীয়ও বটে; নাম কীর্তনে কোন বিধি নিষেধ নেই। তর্ক এতদূর গড়িয়েছিল, যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ তর্কের মীমাংসা হয়নি এবং ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণে বলা চলে যে, তৎকালীন সময়ে আমাদের দেশে এই নাম-কীর্তনের বিশেষ প্রচলন ছিল না। সত্য বটে এই নামসংকীর্তন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যেরই সৃষ্টি তবু অস্বীকাব করে লাভ নেই, প্রথম দিকে এর প্রচলন ছিল বিশেষ ভক্তমহলে। প্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবে কৃষ্ণকীর্তনে এক নতুন আলো দেখা দিয়েছিল। তিনি ঘোষণা করলেন, "তারকব্রহ্ম হরিনামই উদ্ধারণ মন্ত্র। ইহা গুপ্ত নহে, সর্বদা প্রকাশ্য।" আরো বললেন, "সংকীর্তনেই কৃষ্ণের উদয়।" অতএব, "খোল করতালে ভাই কর নামসংকীর্তন।" "হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করবে যেন সহস্র হস্ত দূর হতেও শ্রবণ করা যায়।" তাঁর উপদেশ— "হরিনাম, কৃষ্ণনাম, নিতাই-গৌর নাম নিষ্ঠাসহ সর্বদা গ্রহণ ও প্রচার করবে। সবা' দ্বারা কীর্তন করাবে। সবা' দ্বারা কীর্তনমণ্ডলী গঠন করাবে।" প্রভুর বাণীর যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছিল কলকাতার রামবাগানের ভক্তদের মধ্যে। এই মধুর স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে ওখানকার হরিসভার গায়ে খোদিত আর একটি ফলকে—

জয় জগদ্বন্ধু হরি

"শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রথম ও প্রধান ভক্ত ছিলেন তিনকড়ি ডোম। তাকে প্রভু 'দয়াল' বলিয়া ডাকিতেন। মৃদঙ্গবিৎ হরিদাস ডোমকে প্রভু 'হিত' বলিয়া ডাকিতেন। পীতাম্বর ডোমকে প্রভু 'তাত' বলিতেন। ডোম সম্প্রদায়ের হরিকীর্তন তখন কলিকাতায় বিখ্যাত ছিল। ভয়াবহ প্লেগের সময় (বাংলা ১৩০৭ সাল) যে বিরাট শোভাযাত্রা হইয়াছিল শিশির ঘোষ প্রমুখ মহাত্মাদের নেতৃত্বে সেই কীর্তনের পুরোভাগে ছিল ডোম সম্প্রদায়। সেই কীর্তন প্রভাবে প্লেগ চিরতরে দূর হইয়াছিল। সেই অপূর্ব লীলা স্মরণে এই ফলক।"

রামবাগান হরিসভা এখন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মন্দির, যেখানে তিনি তার রাঙ্গা পা দু'খানি রেখেছিলেন, যার পুণ্য পাদস্পর্শে হাজার হাজার ডোম জেগে উঠেছিল হীনম্মন্যতার পঙ্ক-কুণ্ড

থেকে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর একটা হীন-পতিত জাতির নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। বাঙালী-মানসে নব যুগের উদ্‌গাতা।

আজ রামবাগানের সৌষ্ঠব বেড়েছে। তাদের হস্তশিল্প এখন জগদ্-বিখ্যাত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সৌজন্যে পর্ণকুটীরগুলি হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট দালান। সেখানে পদচারণা ঘটে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসী, বন্ধুসুন্দরের গণ ও পাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়ের চরণাশ্রিত ভক্ত-মোহন্তদের। আজ সেখানে নানা সভা, নানা শোভা। মর্মর প্রস্তর নির্মিত সুদৃশ্য মন্দির হয়েছে ভক্ত-সজ্জনদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। সকলই বন্ধুসুন্দরের মঙ্গলময় ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব। নগরীর এই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে আজিকার ডোম ভাই-বোনেরা কি শুনতে পায় তাদের পিতৃ-পিতামহের সেই কীর্তনের ধ্বনি, আজিকার বসন্ত বাতাসে তাদের কানে কি ভেসে আসে তাদের পূর্বপুরুষের অপূর্ব সুরলহরী? ❐

অর্ঘ্য

চিরকুমার শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ধরাধামে আবির্ভূত হইযা দুইটি তত্ত্বকথা কলি- পীড়িত জীবজগৎকে শুনাইয়াছেন—ব্রহ্মচর্য ও হরিনাম। কেবল কথা শুনান নাই, ঐ দুইটি তত্ত্বকে নিজেও লীলাজীবনে মূর্তিদান করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচর্যের জীবন্ত বিগ্রহ ও হরিনামের প্রকট প্রতিমা। তাঁহার সমগ্র জীবনের আচরণ ও মহাপ্রচারণ হইতে এই দুইটি পরম সত্যই উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে।

এই দুইটি তত্ত্ব-বস্তুর প্রচারণের জন্য তিনি দুইটি পরম ভক্তকে 'বরণ' করিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। হরিনাম প্রচারণের জন্য চম্পটী ঠাকুর ও ব্রহ্মচর্য প্রচারণের জন্য শ্রীমান্ রমেশ শর্মা। ব্রহ্মচর্যের সকল বিধিনিষেধগুলি তিনি রমেশচন্দ্র দ্বারা পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মচর্য ব্রতের যেটি অন্তর্নিহিত তত্ত্বরহস্য তাহা রমেশচন্দ্রের অন্তরে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মহাপ্রচারক করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রকে প্রভু বন্ধুসুন্দর ব্রহ্মচর্যব্রতনিষ্ঠার গূঢ় রহস্য তত্ত্ব উপলব্ধি করাইয়া দিয়া তাঁহার আদর্শে তৎকালীন তরুণ ছাত্র সমাজের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাবে জীবন সংগঠনের এক নব উদ্দীপনা জাগাইয়া দিয়াছিলেন।

* *'চিরকুমার রমেশচন্দ্র'। শ্রীনরেন্দ্রলাল বসু, প্রকাশক ঃ শ্রীমাখনলাল ধর। মহাউদ্ধারণ মিশন, ডি. রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা - ১৪।* বাংলা ১৩৭০।

রমেশচন্দ্র নিজেকে 'বিদ্যার্থী-সেবক' বলিয়া পরিচয় দিয়া আনন্দ বোধ করিতেন। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী স্কুল ও কলেজের ছাত্র তাঁহার সান্নিধ্যের বৈদ্যুতিক স্পর্শ পাইয়া তাঁহার শিক্ষার অমৃতাস্বাদন পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ও ব্রহ্মচর্যের পথে জীবন গঠন করিয়া তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছে। পরবর্তীকালে যাঁহারা দেশের শ্রেষ্ঠ সেবক, কর্মী, যুগপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই রমেশচন্দ্রের কাছে তাঁহাদের নৈতিক ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র সেবা করিতেই জানিতেন; সেবা নিতে জানিতেন না। এই জন্য তাঁহার পূজা, তাঁহার জয়ধ্বনি, তাঁহার জন্ম-জয়ন্তী কোথায়ও অনুষ্ঠিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলে তিনি তাহার অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেন। প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা মনে করিতে যে তপশ্চর্যা ও বীর্যবত্তা লাগে রমেশচন্দ্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

অনেক তপস্বী আছেন রসহীন। অনেক রসজ্ঞ আছেন তপোহীন, নৈতিক নির্মলতা হীন। নৈতিক উজ্জ্বলতা ও ভাগবতী সরসতা এই দুইয়ের মিলনে রমেশচন্দ্রের সাধনা ছিল অনুপম। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তাঁহাকে কৈশোরেব প্রথম উন্মেষ হইতে ভাগবতীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কঠোরতা শিক্ষা দিতেন। শ্রীশ্রীবন্ধুহরির শিক্ষার সার্থকতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর সুগঠিত জ্ঞানপূর্ণ জীবনকে তিনি সুন্দরতমের পায়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সমর্পিত জীবন তিনি সমাজের সেবায় উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

বহু দিন তাঁহার পাদমূলে বসিবার ভাগ্যলাভ করিয়াছি। এই মরজগতের মাটি ছাড়িয়া দিব্যলোকে চলিয়া যাইবাব কালে দীর্ঘ সময় তাঁহার পূত সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। তৎকালে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঘনঘন উচ্চারিত গভীর অনুভূতিপূর্ণ তত্ত্বগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তে শুধু এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, কঠোর তপস্যাচরণ ও নিবিড় আত্মনিবেদন— এই দুইয়ের মিলনে তাঁহার জীবন সত্য-পবিত্রতার জীবন্ত মূর্তি হইয়াছিল। নিত্য লোকে মহাযাত্রার প্রায় সাত ঘণ্টা পরে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার দেহের অত্যদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার পাদপদ্মে শেষ বারের মত মাথা ঠেকাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলাম।

রমেশচন্দ্রের কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। ইহা বেদনাদায়ক। বেদনা কেবল ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত। রমেশচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনাদর্শের বিস্মৃতি জাতীয় জীবনের মহতী বিনষ্টির পরিচায়ক। রমেশচন্দ্রের স্নেহভাজন সেবক নরেনদা তাঁহার মহাজীবনের কিঞ্চিৎ বার্তা সর্বসাধারণে পরিবেশন করিতেছেন, সংবাদটি জানিলাম রমেশচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রিয় মাখনদাদার প্রীতিপূর্ণ পত্রে। পত্রে তিনি আমাকে দুইটি কথা পাঠাইতে সস্নেহ অনুরোধ জানাইয়াছেন। কথা কিছু আসিল না। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরের পুষ্পার্ঘ্য শুধু নিবেদন করিলাম। জাতীয় জীবনের এই ঘনান্ধকারে, রমেশচন্দ্রের মহাজীবনের আলোক-বর্তিকা আমাদের ও আমাদের পরবর্তীদের জীবন-পথ উজ্জ্বল করুক। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ❐

‘পূজারী পরিচয়’

শ্রীমৎ লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী স্মরণে

করপুটে কুসুমাঞ্জলি লইয়া পূজারী স্বীয় ইষ্ট দেবতার পায়ে অর্পণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা পবিত্র দৃশ্য সংসারে আর কিছু দেখিতে পাই না। পুষ্প মাত্রেই আছে সহজ সৌন্দর্য। অনুরাগীর হাতে ভক্তি-চন্দনে চর্চিত হইয়া তাহা যখন সুন্দরতমের পদ-পল্লবে পতিত হয় তখন এক নিরুপম মাধুর্য বিগলিত হইতে থাকে।

ভক্ত পূজায় বসিয়া আমাকে ভূমিকা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। পূজার ভূমিকা তো বিশুদ্ধ অন্তর-মন্দিরে, নিষ্ঠার আসনে, অশ্রুর মুক্তাফলে, ভক্তির ডালায়, স্নেহের সূতায় গাঁথা পিরীতির মালিকায়, পঞ্চরসের পঞ্চদীপের আরতির আর্তিতে। সে ভূমিকা রচনা করিতে আমার কী ক্ষমতা আছে? কিছুই নাই। তাই মনে করিয়াছি, পূজার আয়োজন না করিয়া পূজারীর একটু পরিচয় দিয়া, নির্মাল্যটি শিরে তুলিয়া বৈষ্ণবাজ্ঞা প্রতিপালন করিব।

একটি বারো-তেরো বৎসরের বালক। কেবলমাত্র কণ্ঠে উপবীত উঠিয়াছে। পাঠশালা ছাড়িয়া স্কুলের দুয়ারে কেবল পা বাড়াইয়াছে। বালকটি একজন শিক্ষকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এ শিক্ষক মহাশয় গতানুগতিক শত-সহস্র শিক্ষকের একজন নহেন। ইঁহার কাছে যাহারাই অধ্যয়ন করিয়াছে—একটি আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ছাপ তাহারা বুকে আঁকিয়া লইয়া গিয়াছে। আজও শত শত যুবক মাণিকগঞ্জ বরুণ্ডী স্কুলের শিক্ষক—ব্রজেন্দ্র নিয়োগীর নাম করিয়া কৃতজ্ঞতায় প্রণত হয়।

সত্য সত্যই “মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য সিদ্ধি নয়।” সদা ভক্তিগদ্‌গদ সাধক বীর ঐ মহান্ শিক্ষক নিয়োগী মহাশয়ের স্নেহের স্পর্শে বালক দ্বিজেনের জীবনে ভক্তির জোয়ার আসিল। সে জোয়ার সাগর খুঁজিল। প্রভুগত-প্রাণ নিয়োগী মহাশয় ছাত্রের কানে সন্দেশ দিলেন—কহিলেন, ‘করুণাম্বুধি গৌরহরি প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর নামে ফরিদপুরে প্রকট হইয়াছেন।’ নদী ধাইল। সকল বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া নদী সাগরে মিলিল।

তারপর আরম্ভ হইল গুরু-আনুগত্যে কঠোর তপস্যা। দ্বাদশবর্ষ মৌনব্রত, প্রত্যহ ত্রিস্নান, অন্যের অলক্ষ্যে মাত্র একবার অলবণ হবিষ্যান্নাহার, মধ্যরাত্র হইতে একাসনে ধ্যানাবিষ্টতা, অষ্টকালীন স্মরণ মনন পূজার্চনা, নিয়ম করিয়া লক্ষ জপ। যেমনি ভজন তেমনি কৃপা। গুরুদত্ত নামটি যেমন “লীলাপ্রকাশ”, কৃপা করিয়া লীলাময় হৃদয়ে লীলা প্রকাশও করিয়াছেন তেমনই। পাঠক, বন্ধুগীতি-কুসুমাঞ্জলি এক বোবার গান—অল্পজ্ঞ বালকের মুখে শ্রুতি আবর্তন। তাই, শুনিবার বিষয় বটে। নয়নানন্দের পদ মনে পড়িবে।

* *‘শ্রীশ্রীবন্ধুগীতি-কুসুমাঞ্জলি’, শ্রীমৎ লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ, ১৩৫৮*

"বেদ বিদ্যা দুই, কিছু নাহি জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ করে সার।
নয়নানন্দ ভণে, সেই ত সকলি জানে
সর্ব সিদ্ধি করতলে তার।।"

বন্ধুগীতি-কুসুমাঞ্জলি পড়িতে পড়িতে কখনও মনে হইবে, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, কখনও মনে হইবে প্রেমানন্দদাসের মনঃশিক্ষা, কখনও মনে হইবে লোচনদাসের ধামালী, কখনও মনে হইবে দাশরথী রায়ের পাঁচালী, কখনও মনে হইবে আধুনিক কবিতা। ভাষার বাহনকে উপেক্ষা করিয়া আরোহী ভাব-দেবতার প্রতি দৃষ্টি করিলে ধরা পড়িবে, বস্তুতঃ ইহা সরল ভক্তের সহজ হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত আধ্যাত্মিক বেদনানুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। নূতন নূতন ভাব আছে—নূতন নূতন কথা আছে, নূতন নূতন শব্দও আছে। প্রীতির গতি পাণিনিব আনুগত্য খোঁজে নাই। ভক্তি-কৌমুদীতে যাঁদেব হৃদয়-কোষ উদ্ভাসিত—অমর-কোষ বা ব্যাকরণ-কৌমুদীর অপেক্ষা তাদের না-ই বা থাকিল! সহজ ভাব নিত্যই আনন্দের উৎস।

কুসুম কুসুমই—কীট থাকিলেও। কুসুম সঙ্গে দেবতার পায়ে লাগিয়া কীটই ধন্য। পদ্ম হউক আর পলাশ হউক, নির্মাল্য নির্মাল্যই। অধন্য জীবন ভক্তের প্রসাদী নির্মাল্য মাথায় করিয়া ধন্য করি। আমার মত নির্মাল্য গ্রহণের চিত্তবৃত্তি লইয়া যাঁরা হাত পাতিবেন তাঁরা, যাঁহার শ্রীচরণে অর্পিত এই পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার করুণাশীর্বাদে সুস্নিগ্ধ ও সুতৃপ্ত হইবেন। ভক্তের অঞ্জলি-ভরা বন্ধুগীতি-কুসুম জয়যুক্ত হউক। ❑

ভক্তাধীনতা

শ্রীগৌরকিশোর সাহা স্মরণে

"ভক্ত বিনে কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাই অনন্ত ভুবনে।।"

জ্যৈষ্ঠ মাস চলিয়া যায়। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে আম দুধ দেওয়া হয় নাই। ভক্ত গৌরকিশোরের মনে এই উদ্বেগ। রোজই ভাবেন। নানা কারণে হইয়া উঠে না। আজ ঠিক করিয়াছেন দিবেনই। বাজারে গেলেন, নিজের কাজ সারিতে বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। তরকারীর বাজারে গিয়া দেখেন খুব ভাল পটল। দাম একটু বেশী। তবু এক সের আলু, এক শের পটল ও এক সের দুধ কিনিলেন।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। গৌরকিশোর দ্রুতবেগে শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে ছুটিয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছিয়া দেখেন, কৃষ্ণদাস

'জগদ্বন্ধু বার্তা'। ৫ম ও ৬ষ্ঠ পক্ষ। মে-জুন, ১৯৭৬, দত্তপুকুর।

মধ্যাহ্ন ভোগের রান্না শেষ করিয়া বসিয়া আছেন। প্রভু দরজা খুলিতেছেন না। অন্য দিন এতক্ষণে ভোগ লাগিয়া যায়। কৃষ্ণদাস মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন, আজ আবার কী অপরাধ হইল। দরজা কেন খুলিতেছেন না। এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৌরকিশোর পৌঁছিলেন। "কৃষ্ণদা, প্রভুর ভোগ কি হইয়া গিয়াছে?"—জিজ্ঞাসা করিলেন গৌরকিশোর। কৃষ্ণদাস শির কম্পন করিয়া জানাইলেন যে, ভোগ এখনও হয় নাই।

গৌরকিশোর বলিলেন, ভালোই হইয়াছে। এইসব দ্রব্যগুলি ভোগ দিয়া দেন। আলু-পটলের রসা, পটল ভাজা ও দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া আমের সহিত দিবেন। গৌরকিশোরের আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণদাস বুঝিলেন, এই জন্যই প্রভু এতক্ষণ দরজা খোলেন নাই।

গৌরকিশোরকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণদাসজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন এত করিবার সময় কোথায়? এত সব করিতে করিতে প্রভু যদি দরজা খুলিয়া দেন তবে কী হইবে?" গৌরকিশোর বলিলেন, "আপনি সেবার দ্রব্য তৈয়ারী করুন। প্রভু তো অন্তর্যামী, সব জানেন। আমার আনা এই সামান্য দ্রব্য না হওয়া পর্যন্ত দরজা খুলিবেন না। আমি প্রভুর দুয়ারে বসিয়া থাকিলাম।" গৌরকিশোর চালিতা তলায় বসিয়া প্রভুর নাম জপ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণদাস ক্ষিপ্র হস্তে প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়া রাখিয়া, আলু-পটলের রসা রান্না ও পটল ভাজি করিলেন। আম তৈয়ারী করিয়া দুধের বাটিতে রাখিয়া ভোগ সাজাইলেন। ঠিক তখনই গৌরকিশোর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণদা! ভোগ তৈয়ারী হইয়াছে তো? প্রভু কিন্তু দরজা খুলিয়াছেন।" ভোগঘর হইতে শ্রীমন্দির পর্যন্ত জলের ছিটা দিয়া ভোগের জায়গা করিয়া, কৃষ্ণদাস তাড়াতাড়ি ভোগ মন্দিরে রাখিয়া আসিলেন।

প্রভুর খাট হইতে নামিবার শব্দ পাওয়া গেল। গলবস্ত্র গৌরকিশোর যুক্ত করে চালিতা-তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তরে আকুল নিবেদন জানাইতেছেন অন্তর্যামীর পায়ে। ভোগ অন্তে মহাপ্রসাদ বাহির করিয়া দেখা গেল আলু-পটলের রসা ও আম-দুধ প্রভু নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পটল ভাজি একখানিও থালায় নাই। কৃষ্ণদাস গৌরকিশোরকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "গৌরকিশোরদা, প্রভু ভক্তাধীন শুনিয়াছি। আজ তুমি দেখাইলে।" ❑

* বন্ধুভাগবতকথা কখনও পুরাণ হয় না। ভক্তের প্রাণে ভগবানের 'প্রাণের স্পর্শ' জাগাতে 'জগদ্বন্ধু বার্তা'য় পরিবেশিত হইল। দশ বছর আগে মহাউদ্ধারণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।—দীন বন্ধুসুন্দরানন্দ।

জয়নিতাইদেবের জীবনকথার একবিন্দু

নিত্যানন্দভাবোন্মত্তং জয়নিতাই ইতি খ্যাতম্।
সাধুশ্রেষ্ঠং ভক্তশ্রেষ্ঠং দেবেন্দ্রং বিপ্রেন্দ্রং ভজে।।

নদীয়া জেলায় দিক্‌নগর গ্রামে শ্রীপাদ জয়নিতাইর জন্মস্থান। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। নবদ্বীপ যোগনাথ শিব মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতেই ইনি

* *'জয়নিতাইদেবের ইষ্টগোষ্ঠী'। শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ, ১৩৭৪।*

নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। বাংলা ১৩৫১ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে, বেলা বারোটায় সজ্ঞানে জয়নিতাই জয় জগদ্বন্ধু স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যের পথে মহাযাত্রা করেন।

বৈষ্ণব জগতের তিনি মুকুটমণি ছিলেন। বন্ধুভক্ত-বান্ধবগণের ইনি শিরোভূষণ ছিলেন। ত্রিকালগ্রন্থে ইঁহাকে শ্রীশ্রীপ্রভু 'সাধু' আখ্যা দিয়াছেন। ইঁহার আসল নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি প্রথম যুগের গ্র্যাজুয়েট। ছাত্রজীবনের একটি অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নদীয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই সময় বি.এ. ও এম. এ. এক সময় পরীক্ষা দেওয়া যাইত। খুব মেধাবী ছাত্রেরা তাহা করিত। দেবেন্দ্রনাথ এইজন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার একজন সহপাঠীও এইরূপ ভাবে বি. এ. ও এম. এ. একত্র দিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল। দুইজনে খুব সম্প্রীতি ছিল। দু'জনে একত্র বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। পরীক্ষা হল কলিকাতায়। প্রথম পরীক্ষার দিন উক্ত সহপাঠী দেবেন্দ্রনাথের বাসায় আসিয়াছেন। দুইজনে একত্র হইয়া পরীক্ষা দিতে যাইবে—এই উদ্দেশ্যে। দেবেন্দ্রনাথ চিরকালই দীর্ঘসূত্রী। সকল কাজই অতি ধীরে করেন। পরীক্ষার হলে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতে বেশ বিলম্ব হইয়া গেল। দুইজনে যখন হলের দুয়ারে উপস্থিত হইলেন, তাহার দশ মিনিট পূর্বেই পরীক্ষা আরম্ভ বইয়া গিয়াছে।
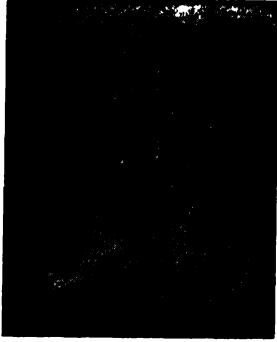
কৃষ্ণনগর কলেজের একজন অধ্যাপকই পরীক্ষার গার্ড। তিনি তাঁদের দুইজনকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিতে দিতে রাজী হইলেন না। জয়নিতাই দেবেন্দ্রনাথ বহু অনুনয় করিয়া কহিলেন, "আমাকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিতে না দেন না দিলেন। কিন্তু আমার এই সহপাঠীকে দেন। দেরীর জন্য উহার কোন দোষ নাই। দেরীর জন্য আমিই দায়ী। আমার জন্যই ওর দেরী। নিরপরাধকে ক্ষমা করুন। এই কথায় গার্ড তাহাকে প্রবেশ করিতে দিলেন, দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলেন। গার্ড এই ছেলেটিকে যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল দেবেন্দ্রকেও নিবেন। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও আর তাঁহার সন্ধান পাইলেন না।

একই সময় বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষা দিবার নিয়ম এই বৎসর পর্যন্তই ছিল। পর বৎসর উহা উঠিয়া যাইবে। এই পরীক্ষা যে দেওয়া হইল না এজন্য দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত হইলেন। তিনি দেওঘরে এক আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটা পাহাড়ে উঠিলেন। উদ্দেশ্য, সেখান হইতে পড়িয়া গিয়া জীবন শেষ করিবেন। তিনি পাহাড় হইতে নীচে পড়িলে কী ভাবে গড়াইয়া কতদূর যাইবেন ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁর হাতের একটা ঘটী তিনি নীচে ছাড়িয়া দেন। অনেক গড়াইয়া ওটি এক স্থানে গিয়া ঠেকে। ঘটীর অবস্থা দেখিয়া ঐ ভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। এই সময় কে যেন তাঁহার অন্তরে

সাড়া দিয়া বলিল, "বি. এ. এম. এ. পাশ করা অপেক্ষা অনেক বড় কাজ আছে তার জীবনে।" আত্মহত্যা করা হইল না।

প্রসঙ্গতঃ বলি, দেবেন্দ্রনাথের উক্ত সহপাঠী পরীক্ষায় খুব ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হন এবং পরবর্তী জীবনে বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হন। সারা জীবন দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ অল্প দিন পরেই শিলং শহরে একটি স্কুলে হেড্‌মাষ্টারী পদ লাভ করেন এবং মাষ্টারী করিতে করিতে বি. এ. পাশ করেন।

শিলং স্কুলে হেড্ মাষ্টার থাকাকালে ইনি লক্ষ্য করিলেন যে, বহু খাসিয়া খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিতেছে। কেন তাহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইহা বুঝিবার জন্য তিনি হিন্দুধর্মের সমগ্র শাস্ত্র-গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, দুইটি দোষে হিন্দুধর্ম দুর্বল—জাতিভেদ মানা ও তদ্ধেতু জাতীয় জীবনে সংঘশক্তির অভাব।

শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন মহাপ্রভু ঐ দোষ দূর করিয়া হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মর জাতিভেদ মানে না ও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সংকীর্তন করাইয়া সকলকে একত্র করাইয়া সংঘশক্তি বর্দ্ধনের চেষ্টা করে। শ্রীনিতাইচাঁদকে দেবেন্দ্রনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ-স্বরূপ দর্শন করেন।

নিতাইচাঁদ জাতিভেদ উঠাইয়া সমাজকে একতাবদ্ধ করিতে ও যারে তারে প্রেম দিয়া শ্রীগৌরচরণে পৌঁছাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অসীম করুণাঘন-মূর্তি শ্রীনিতাইচাঁদ দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ধ্রুবতারা হইলেন। 'জয় নিতাই' শব্দ তাঁহার রসনার সম্পদ্ হইল। তাই এখন হইতেই তাঁকে 'জয়নিতাই' বলিব। জয়নিতাই নিজে জাতিভেদ মানা একেবারেই ত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণব সমাজে যে এখনও ঐ হীনপ্রথা আছে তাহা দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইতেন। "সর্বজীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—এই বাণী তাঁহার জীবনপথে উজ্জ্বলবর্তিকা স্বরূপ ছিল। সর্বত্র গৌরকীর্তন প্রচার করিয়া তিনি জাতিকে আধ্যাত্মিক ভূমিকায় একতাবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কতিপয় খাসিয়াকে তিনি শিষ্য করিয়া শ্রীনিতাইর করুণাসিক্ত করেন। তাহাদের দ্বারা খাসিয়া সমাজকে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

জয়নিতাই বৈষ্ণবগ্রন্থে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি অক্ষর নিবিড়ভাবে ধ্যান করিয়া পাঠ করিতেন। নিতাইচাঁদের মধুর লীলাভরা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত তাঁহার কণ্ঠে ছিল। এই একটি গ্রন্থ-মাঝে মানবসমাজের সর্ববিধ মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে ইহা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। অবিরল অশ্রুধারায় ভাসিয়া তিনি ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতেন। কখনও সজ্জন সভায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। একটি দুইটি পংক্তি পাঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত।

"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।"

কবিরাজ গোস্বামীপাদের এই কথাটি তিনি ঘনঘন বলিতেন ও অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। ক্রমে এমন অবস্থা আসিল যে তিনি অধিকাংশ সময় নিতাইর লীলানুধ্যানে আবিষ্ট থাকিতেন। কেহ "জয়নিতাই" বলিয়া ডাক না দিলে সাড়া দিতেন না। ক্রমে হেড্ মাষ্টার দেবেনবাবুর নাম "জয়নিতাই" হইয়া যায় ও তাঁহার পক্ষে হেড্ মাস্টারী করা আর সম্ভব হয় না। হা নিতাই হা নিতাই বলিয়া জয়নিতাই ঘরের বাহির হইয়া পড়েন। মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট অঞ্চলে দ্বারে দ্বারে গৌরনিতাইর নাম প্রচার করিয়া নরনারীকে মাতাইয়া তুলেন। ইঁহার কতিপয় মন্ত্রশিষ্য ছিল। তন্মধ্যে 'ভক্তিসাগর' কালীহর বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রথম দর্শন লাভ করেন ইনি রাজর্ষি বনমালী রায়ের নৈহাটি সহরস্থ তাঁহার বাসাবাটীতে। প্রথম দর্শনেই ইনি মুগ্ধ হইয়া অনুভব করেন যে, ইনি তাঁহার আরাধ্য শ্রীনিতাইচাঁদের প্রকাশমূর্তি। দ্বিতীয়বার দর্শন করেন পাবনা শহরে বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাসায়। এইবার তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন যে, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শুধু নিতাইচাঁদ নহেন। তিনি নিতাইচাঁদ গোরাচাঁদের সম্মিলিত স্বরূপ। রায় রামানন্দ যেমন দর্শন করিয়াছিলেন "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" জয়নিতাইদেবও সেইরূপ বন্ধুকৃপায় দর্শন করিয়াছিলেন—

"নিতাই গৌরাঙ্গ একাঙ্গ শ্রীবন্ধুহরি।"

এই তত্ত্ব তিনি সিংহবিক্রমে প্রচার করিতেন ও মহানাম সম্প্রদায় সঙ্গে প্রচারণে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেন। মহানাম সম্প্রদায় ক্ষুদ্র জাতিভেদ মানে না ও অতি কঠোর পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করে, ইহা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যে একমাত্র গৌরনিতাইর কীর্তন দ্বারা পতিত বুনা ডোম জাতিকে উদ্ধার করিয়া দেবত্বের পদবীতে তুলিয়া দিয়াছেন— এই অপূর্ব ঘটনার মধ্যে তিনি হিন্দুজাতির তথা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের পথ দেখিতে পান। বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ কার্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। এমন তত্ত্বজ্ঞানী অথচ অমায়িক নির্ভীক প্রেমিক ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ইনি হরিবোলা চম্পটী ঠাকুর, ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ ও বড় বাবাজী রাধারমণচরণদাসজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বড়বাবাজীর সঙ্গে মিলিয়া ইনি নবদ্বীপে কুকুর-মহোৎসব করিয়াছিলেন। জয়নিতাইদেবের প্রতি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কয়েকটি মধুময় কথা তিনি প্রায়শঃ আনন্দোৎফুল্লভাবে বান্ধবগণের নিকট বলিতেন—

১। জয়নিতাইকে দেখিয়া বন্ধুসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেন আসিয়াছেন?"

জয়নিতাই বলিলেন, "আপনার দর্শনের জন্য।"

বন্ধুসুন্দর উত্তর দিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, আমায় দেখে কী হবে? এক স্থানে স্থির হয়ে বসে কাজ করতে হয়।"

জয়নিতাই কথাটির কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর নানা তত্ত্বকথা বলিতে বলিতে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বন্ধুসুন্দর বলিলেন—"আমাকে সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসী মনে করিবেন না। আমার ভিতরে ইনি আছেন।" যেখানে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন সেইখানে দেয়ালে

একখানা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, তাঁহার দিকে অঙ্গুলি দিয়াই "ইনি আছেন" কথাটি বলিলেন।

জয়নিতাই এইবার উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার ভিতর ইনি আছেন বলিয়াই তো আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" বন্ধুসুন্দর নীরব রহিলেন।

২। একদিন কথা প্রসঙ্গে জয়নিতাই বলিলেন, "নিতাইচাঁদের কি মহিমা!" অমনি শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন—"ছিঃ! অমন কথা বলিতে নাই। বলিতে হয় নিতাইচাঁদের কি মাধুরী! মহিমা শব্দটি ঐশ্বর্য-ব্যঞ্জক। নিতাইচাঁদ মাধুর্য-বিগ্রহ।" জয়নিতাই বলিতেন, তাহার মনের তলে একটা অভিমান ছিল যে, নিতাই তত্ত্ব তিনি খুব ভাল বুঝেন। প্রভুর ঐ কথায় অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল।

৩। পাবনায় দর্শনের পর — বন্ধুসুন্দর জয়নিতাইকে বলিলেন, "যখন কাহাকেও দেখিবেন তখন তাহার মুখ দেখিবেন না, চরণ দেখিবেন। কারণ মুখে মায়া আছে।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "তাই বলিয়া শচীনন্দনের মুখ দেখিবেন না, এমন কথা বলি না।" জয়নিতাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর পদ্মাবতীনন্দন?" বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "ঐ দুই মুখ এক। ঐ দুই মুখে মায়া নাই আর সর্বত্র মায়া।" বন্ধুসুন্দরকে প্রথম দর্শন করিবার সময় জয়নিতাই প্রথম চরণ না দেখিয়া বদন দেখিয়াছিলেন, ইহা যেন ভুল করিয়াছেন—এইরূপ ভাবিতে থাকাকালে প্রভু ঐ কথা বলিলেন। কথায় জয়নিতাই বুঝিলেন প্রথমে বদন দর্শন করিয়া তিনি ঠিকই করিয়াছেন। কারণ শচীনন্দন ও পদ্মাবতীনন্দন মিলিত তনুই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর।

৪। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর সকল সময় সকলকে দেখা দিতেন না। যেখানেই থাকিতেন দরজা বন্ধ রাখিতেন। একদিন জয়নিতাইকে বলিয়াছিলেন, "যতদিন গৌড় দেশে আছি আপনার অবারিত দ্বারা।" পরে একদিন জয় নিতাই গিয়া দেখেন বন্ধুসুন্দরের ঘরের দরজা বন্ধ, দরজায় মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া জয় নিতাই, জয় নিতাই বলিয়া সাড়া দিলে বন্ধুসুন্দর ভিতর হইতে বলিলেন, "আজ দুয়ার খোলা হবে না।" জয়নিতাই বলিলেন, "সেদিন না বলিলেন আমার অবারিত দ্বার, আজ আবার খোলা হবে না বলিতেছেন কেন?" বন্ধুসুন্দর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কাঠের দুয়ার কি দুয়ার!" এই কথায় আনন্দে অধীর হইয়া জয়নিতাই বলিলেন, "আপনি তো বলিয়াছেন যত দিন গৌড়দেশে আছি আপনার অবারিত দ্বার। তা, আপনি কখনও গৌড়দেশ ছাড়া হন?" মধুর স্বরে বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "আমি কি কখনও গৌড়দেশ ছাড়া হইতে পারি?"

৫। জয়নিতাই পরিণত বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কতিপয় ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী পুত্রকন্যার ইনি জনক হইয়াছিলেন। একটি পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে জয়নিতাই পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া বন্ধুসুন্দরকে বলেন, "আজ আপনাকে পুত্র সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হইতেছে"। বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় আমাকে 'ভাই' বলিয়াছেন। আপনি আমাকে 'পুত্র' বলিলেন। আপনাদের মত বৈষ্ণবের সঙ্গে কুটুম্বিতা হইলে আমার আর চিত্রগুপ্তের ভয় থাকিবে না।"

এই কথাবার্তার কয়েক দিন পর প্রভু কোনও স্থানে রওনা হইবার সময় জয়নিতাইকে

বলিলেন, "আমি যাত্রা করিতেছি—এই সময় আপনার মুখ দেখিয়া যাই। কারণ, পুত্রবানের মুখদর্শনে যাত্রা শুভ হয়।"

বন্ধুসুন্দর যে জয়নিতাইকে 'পিতা' স্বীকার করিয়াছেন এই কথায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠায় জয়নিতাই প্রভুর লীলায় পিতা দীননাথ ন্যায়রত্নের ভাবে আবিষ্ট হন। তদবধি অনেক সময়ই তিনি নিজেকে দীননাথ ন্যায়রত্ন ভাবিতেন ও সেই ভাবে বাৎসল্যে বন্ধুসুন্দরকে ভালবাসিতেন।

শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্তে বা রসসিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র ভুল ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি এক কীর্তনাসরে কীর্তনীয়া গোষ্ঠ লীলাকীর্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁর নিজের পা দুইখানি ফাঁক করিয়া রাখিলেন, যাহাতে কৃষ্ণের বক্ষে না লাগে।" এই কথা শুনামাত্র জয়নিতাই সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "চরণ দুইটি বক্ষে লাগাইয়া দেন।" তাঁহার চোখ মুখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি হইলে সখ্যে রসাভাস দোষ হয়। ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

একটি ইংরেজী নিবন্ধে আমি মহাপ্রভুকে Prophet বলিয়া লিখিয়াছিলাম। অবতারীকে প্রফেট লেখায় জয়নিতাই আমাকে মহা অপরাধী করিয়াছিলেন ও বিশেষভাবে গলবস্ত্রে দণ্ডবৎ করাইয়া ক্ষমাভিক্ষা চাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীজয়নিতাইর সঙ্গ-সান্নিধ্যলাভের ভাগ্য জীবনে বহু বার হইয়াছে। তাঁহার বাচন ভঙ্গী, গমন ভঙ্গী, প্রসাদগ্রহণ ভঙ্গী, কীর্তনে নাচিবার কান্দিবার ভঙ্গী, মালসাট মারিবার ভঙ্গী—সকলই অপূর্ব অননুকরণীয়। তাঁহার ক্রোধ করিবার ভঙ্গীও ছিল অপূর্ব। একদিন কোনও বক্তির উপর রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি অভিসম্পাত করিলাম—শ্রীহরিপুরুষ ছাড়া তোর যেন আর গতি না থাকে।" জয়নিতাইর তুলনা তিনি নিজেই। অমন আর একটি দেখি নাই, শুনি নাই, কোন গ্রন্থেও পড়ি নাই। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ হইল যোগ্যজনে মর্যাদা দান। এই মর্যাদা দানে জয়নিতাইর জুড়ি নাই। বৈষ্ণবে মর্যাদা, মহাপ্রসাদে মর্যাদা, কীর্তনে মর্যাদা, বৈষ্ণবগ্রন্থের মর্যাদা, জীবমাত্রে মর্যাদা—বস্তুমাত্রে মর্যাদা দান এমন আর দেখি নাই। একটি ঘটি সম্বন্ধেও বলিতেন, "ঘটিটি আছেন।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ প্রফুল্লরঞ্জন (P. R. Das) পাটনায় ব্যারিষ্টারী করিতেন। কিছু দিন জয়নিতাইর মত মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য তিনি কয়েক মাস তাঁহাকে পাটনা বাসায় নিজ সন্নিধানে রাখেন। ঐ সময় প্রবল শীত পড়িতেছিল।

একদিন রাত্রে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে অনেক সময় লাগিবে, কেহ কাছে বসিয়া থাকিতে গেলে তাহার খুব কষ্ট হইবে এই জন্য তিনি সবাইকে শয়ন করিতে বলিলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর আচমনের জল ইত্যাদি এবং শয়নের শয্যা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া ভক্তগণ বিশ্রামে গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিতে পাইলেন যে তিনি নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করেন নাই। একটি চেয়ারে বসিয়াই রাত্র কাটাইয়া দিয়াছেন। কেন এরূপ করিলেন জিজ্ঞাসায় জয়নিতাই বলিলেন—

"প্রসাদ পাইবার পর শুইতে গিয়া দেখি, উনি (গৃহপালিত কুকুরটিকে দেখাইয়া দিয়া) আমার বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন। ওনাকে বিরক্ত করা উচিত মনে করিলাম না।"

জয়নিতাইর পাদমূলে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখের শাস্ত্রকথা শ্রবণের ভাগ্য হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি, তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ে গাঁথা আছে। জীবনে পুঁজি হইয়া আছে। তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গনে জন্মোৎসবে দর্শনলাভের ভাগ্যও পাইয়াছি। এই ইষ্টগোষ্ঠীতে যাহা লেখা হইল স্মৃতি রোমন্থন করিয়াই। ভক্তগণ আস্বাদন করুন। জয় নিতাই! জয় জগদ্বন্ধু!! ❑

জয় জগদ্বন্ধু

'আঙ্গিনা'—ভূমিকা

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে জানেন না এমন লোক এতদ্দেশে বিরল। আবার, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে জানেন, এমন লোক এ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পদ্মাসনে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জকলেবর একখানি কিশোর তাপসমূর্তি প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজমান রহিয়া প্রতিনিয়ত বালক-বৃদ্ধ পুরুষ নারী জাতি-বর্ণ-বয়োধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করতঃ কোন্ যেন এক সম্মোহন রাজ্যে সকলকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে! তাই তাঁহাকে জানেন না এমন লোক এতদ্দেশে বিরল; আবার, সেই নিভৃত রাজ্যের নীরব দেবতা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাকূলে প্রকাশিত হইয়া ত্রিংশৎ বর্ষ ছদ্মবেশে সোনার অঙ্গটি মলিন বসনে আবরণ করতঃ সারা ভারতময় পর্যটন করিয়া অবশেষে সপ্তদশ বৎসর ফরিদপুর জেলার একটি আঁধার কুটিরে সম্পূর্ণ লোকলোচনের অন্তরালে অতিবাহিত করিয়াছেন। মানুষ তো মানুষ, চন্দ্র-সূর্য তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, এ জগতের আলো বাতাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাকে জানেন, এমন লোক এ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। গুরুগাম্ভীর্যে বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়াছে, রূপমাধুর্যে অগণিত জীব আকৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় তাঁহার পেছনে ছুটিয়াছে, গুটি কতক তাঁহাকে ধরিয়াছে, দুই একটি তাঁহাকে জানিতে চাহিয়াছে; কিন্তু বুঝিতে গিয়া সবাই বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিয়াছে।

সুদূর ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত এই ভারতের বুকে যত উন্নত-সত্তা সাধু মহাজন বা অবতার পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধু তাঁহাদের প্রত্যেক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার বৈশিষ্ট্য অলৌকিক, অনন্যসাধারণ, অভূতপূর্ব,—একথা, যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন বা শ্রীমুখের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন; আর যেখানে যিনি তাঁহার মনোরঞ্জন মূর্তি দেখিতেছেন বা মহামাধুর্যময় মহানাম আস্বাদন করিতেছেন, তিনিই অবনত মস্তকে স্বীকার করেন।

** 'আঙ্গিনা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রীশ্রীসীতানবমী (বৈশাখ ১৩৩৭) : মহানাম সম্প্রদায়, সম্পাদক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।*

মানবজাতির কল্যাণকামী অবতারপুরুষগণ সকলেই মঙ্গল-মালিকা লইয়া মর্ত্যভূমিতে উদয় হয়েন, কত দেশের হাওয়া সেই মালার গন্ধে আলা হয়, কত মানুষের গলা সেই মালা পরিয়া শান্তি লাভে শান্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করে! কিন্তু পঙ্কিল জীবস্বভাব দেখিতে না দেখিতে সব ধুইয়া ফেলিয়া কেবল স্মৃতিটি রাখিয়া দেয়। তাই অবতারীরা যখন আসেন তিনি কেবল মালাটি লইয়াই আসেন না, আগে আসেন কর্ষণকর্তা সংকর্ষণ, হল কাঁধে লইয়া; পাছে আসেন নব নটবর বাঁশীটি ধরিয়া; সমগ্র জীবের হৃদয়ভূমিকে কর্ষণ করতঃ নির্মল করিয়া দিয়া বলাই দাদা ইঙ্গিত করেন আর বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধু ঢালিয়া দিয়া মধুরাজ মধুপুর সৃজন করিয়া মধুর লীলাভিনয় করেন। হল কর্ষণ আর মধু বর্ষণ, ইহাই অবতারীর বিশেষত্ব। মহাপুরুষগণ আসেন সুগন্ধি ফুলের ডালি লইয়া বিতরণ করিতে, আর অবতারী পুরুষ আসেন অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র লইয়া এই বিশ্ব-উদ্যান তৈয়ারী করিতে—কর্ষণে ভাঙ্গিয়া বর্ষণে গড়িয়া পুরাণো জগৎখানাকে নবীন করিতে।

মহাবতারী প্রভু বন্ধু ঠিক তেমনি দু'টি বস্তু লইয়া জগতে প্রকট হইয়াছেন। এক হাতে সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্যের বজ্র হল, আর এক হাতে সুকোমল হরিনামের মধু-মাধুরী। দশদিকে জলন্ত ব্রহ্মচর্যের প্রভাকর প্রভা, তারই মধ্যে সুস্নিগ্ধ শারদ-শশীর হৃদয় জুড়ানো আভা, রবি-শশীর মিলনময় এই পুষ্পবন্তযোগে যোগেশ্বরেশ্বর মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব। তিনি শুধু দিতেই আসেন নাই, নিতেও আসিয়াছেন! উলুবনে মুক্তরাশি ছড়াইলে কী হইবে? তাই আগে তিনি গ্রহণ করিবেন সকল আগাছার বোঝা নিজ মাথায়, তারপর ভুবন জুড়িয়া ব্রহ্মচর্যের চাষ, তাহাতে উলুবন হবে বৃন্দাবন, আর সহজ সুন্দর শিশুর হবে সেখানে বাস; তারপর, মহানাম মহাকীর্তনে পরম শিশুর সঙ্গে নিখিল বিশ্বের হবে মহারাস।

পুত্রবৎসলা জননী যেমন দিবস রজনী শয়নে স্বপনে স্নেহের পুত্তলী পুত্ররত্নের মঙ্গলকর কার্যে আত্মহারা ভাবে বিনিযুক্ত থাকেন অথচ দুরন্ত শিশু স্নেহময়ীর সে অগাধ বাৎসল্যসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে না পারিয়া, সঙ্গীগণ সহ আপন মনে মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি খেলিয়া বেড়ায়, আজ পরম শান্তিদাতা প্রভুবন্ধুও তেমনি বিশ্বের কল্যাণ চিন্তায় নিজেকে ষোল আনা ডুবাইয়া দিয়া প্রতিনিয়ত অমৃতবারি সিঞ্চনে জীবন্মৃত জগৎকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আর বিষয়ান্ধ জীবকুল তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রদর্শিত সহজ সুন্দর পথ ছাড়িয়া উৎপথে ছুটাছুটি করিতেছে। জগৎ জুড়িয়া শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত না হইলে শান্তিদাতার শান্তি নাই। তাই নিজ শ্রীমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে চারিটি মহাদেশে সমান ভাবে ধর্মসংস্থাপন করিবেন, তবে জগদ্বন্ধুর লীলা শেষ হবে।

শ্রীশ্রীপ্রভু নীরবে প্রকৃতির অনুকূলে তিল তিল করিয়া বিশ্বময় আত্মশক্তির সঞ্চার করিতেছেন। তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য জীববুদ্ধির অগোচর। তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি বৃত্তান্ত রহস্যপরিপূর্ণ। পূর্বেই বলিয়াছি, "ব্রহ্মচর্য করিও, করাইও"; "নামের অভাব, হরিনাম কর" এই দুইটি সন্দেশ লইয়া তিনি ধরায় আগমন করিয়াছেন। নিজ জীবনে অতি কঠোর ভাবে আচরণ করতঃ ত্যাগধর্ম ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বহু অভিনব তথ্য জানাইয়াছেন,—তাহা শুধু ভারতের নহে, সমগ্র

মানব জাতির চিন্তার সামগ্রী। শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব, শ্রীশ্রীব্রজরস, শ্রীশ্রীনিতাইগৌরমাধুরী—অতি অপূর্ব ভাবে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

"যদি গৌর না হ'ত কেমন হ'ত কেমনে ধরিত' দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে।।"

শ্রীশ্রীঠাকুর নরহরির এই শ্রীপদের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকেও কহিতে হইবে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু যদি না আসিতেন, তবে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের সুনির্মল নাম ধর্মের অপ্রাকৃত সুষমা বিপথগামী কৈতবতপ্ত জীবের হাতে কে আর তুলিয়া দিত?

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একটুখানিক দিগ্‌দর্শন করিব। একদিন পরম ভক্ত বৈষ্ণবকুলতিলক একনিষ্ঠ নিতাই-সেবক জয়নিতাই (দেবেন্দ্রনাথ) শ্রীশ্রীবন্ধুর পাদমূলে বসিয়া নানাকথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "পরম দয়াল নিতাই চাঁদের কি মহিমা!" কথাটি শুনিবামাত্র অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে প্রভু কহিলেন, "দেবেন বাবু! অমন কথা বলিতে নাই। পরম দয়াল নিতাইচাঁদ সম্বন্ধে 'মহিমা' না বলিয়া 'মাধুরী' কথাটি ব্যবহার করিতে হয়। কারণ 'মহিমা' শব্দটিতে একটু ঐশ্বর্যের ভাব প্রকাশ পায়।" স্বরচিত শ্রীসংকীর্তন গ্রন্থে শ্রীনিতাইচাঁদের কথা লিখিয়াছেন, "অযাচিত উদ্ধারণ বাসিত সংসার।"

শ্রীশ্রীহরিকথা, শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত, শ্রীশ্রীত্রিকালগ্রন্থ, শ্রীশ্রীমতী সংকীর্তন ও শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন—এই মহাগ্রন্থ পঞ্চকে বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধা ভক্তি, ব্রজরস, গোপীভাব ও যুগল প্রেম—এই তত্ত্বপঞ্চকের মধুরিমা মন্থন করিয়া অমৃত তুলিয়া ঐ যে নিজেই শিরে লইয়া বিশ্ব বিশাবি বাহুযুগল বিস্তার করতঃ জীব-জগৎকে ডাকিতেছেন—

"ভাব রাগ ভরা, প্রেমের পসরা,
ধরি নিজ শিরে ডাকে।
অবিচারে দেয়, বিনামূলে হায়,
কেন পড়ে থাক ফাঁকে?"

আমরা ভাবিয়াছি, এই প্রখর দিবালোকে পেচকের বৃত্তি লইয়া আর ফাঁকে পড়িয়া থাকিব না। অমন মধুর ডাক শুনিয়াও এই মায়া-কোলাহলে আর বধির হইয়া ভুলিয়া থাকিব না। ঐ যে—

উদ্ধার বিধান হল এত দিনে, আয়রে কে কোথা আছিস্।
বিলম্ব কি সাজে হের ব্রজ রাজে পেয়ে, বন্ধু কেন ভুলিস্?

আমরা অনধিকারী অপরাধী জীব। আর প্রভু বন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত সেই সব মহামহাতত্ত্ব-মাধুরী-মহাপ্রসাদ রসিক ও ভাবুক ভক্তেরই চির আস্বাদনীয়। তথাপি কেন জানি না, সাধ আছে, আশা—পরম দয়াল বান্ধববৈষ্ণববৃন্দের চরণতলে গড়াগড়ি দিয়া 'আঙ্গিনা' দ্বারে সেই মহামহা-প্রসাদ রসমাধুর্যের মাধুকরী লইয়া ধন্য হইব।

বন্ধু-বান্ধব-কৃপা হি কেবলম্।

শ্রীঅঙ্গন-বার্তা

অঙ্গনদুলাল নামক একটি বালক ব্রহ্মচারী ভাই স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু, তুমি কবে-আসিবে?" উত্তরে চতুর-চূড়ামণি প্রভু বলিয়াছিলেন, "আমি আঁক ভুলিয়া গিয়াছি।"

কিন্তু হতভাগ্য জীব আমরা আঁক ভুলিতে পারি নাই। প্রতি মুহূর্তে অঙ্ক কষিতেছি। আজ দেখিলাম উনত্রিশ হাজার দুই শত প্রহর অতীত হইল।

ভাদ্র আসিয়াছিল পদ্মাব স্রোত লইয়া, আঙ্গিনার বুকে খুব নাচিয়া খেলিয়া চলিয়া গেছে। আশ্বিন আসিল দুঃখের স্রোত বহিয়া, ১লা হইতে ১৩ই—১৩ই হইতে ২রা কার্ত্তিক—এই বত্রিশ দিনে বত্রিশখানি বিষাদের চিত্র লইয়া। ২রা কার্ত্তিক সন্ধ্যায় চতুর্দশ মর্দলনে শ্রীমন্দির পরিক্রমণ হইলে। তাহার পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরে 'কাঁহা উপানন্দ' কেদার শীল তাহার প্রাণারাম প্রভুর কোলে স্থান লইলেন। দুঃখে—অতি দুঃখে দুঃখের মাস কাটিয়া গেল। শ্রীশ্রীমহানাম মহাযজ্ঞ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই দশ বৎসর মধ্যে শ্রীচম্পটি ঠাকুর, কৃষ্ণদাস মোহন্ত, দেবী সুরত কুমারী, নন্দরাজ দুঃখীবাম, জ্যেঠা গোপাল মিত্র, কানাই মিত্র, মথুরানাথ, যাদব, পুরীদাস, শান্তিদাস, তেজোনাবায়ণ, চরণদাস, অঙ্গনদুলাল, সত্যব্রত, বন্ধুকিঙ্কর ইত্যাদি করিয়া অন্যূন বিশজন বাছা বাছা ভক্তকে শ্রীশ্রীপ্রভু স্বক্রোড়ে টানিয়া লইযাছেন। জানি না, ইহার মধ্যেও কি রহস্য লুক্কায়িত আছে। আমরা কেবল আশাপথ চাহিয়া আছি—কবে মহা যজ্ঞেশ্বর মহালস শযন ছাড়িয়া মহা জাগরণে জাগিয়া উঠিবেন আর সকল রহস্যের অর্গল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহানাম যজ্ঞ!! ❒

** 'শ্রীঅঙ্গন'। ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক, ১৩৩৮) মহানাম সম্প্রদায় প্রকাশিত। সম্পাদক : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।*

প্রেমঘনমূর্তি বন্ধুসুন্দর মহাশক্তির উৎস

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী। শতবার্ষিকী কমিটি মহাজাতি সদনে তিন দিন ব্যাপী বিরাট্ ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন গত নভেম্বরে। আজ আর একটি অপূর্ব অনুষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। এই মহানগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীগণ সমবেত হইয়া 'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু' লীলাভিনয় মঞ্চস্থ করিতেছেন। ইহা পরম আনন্দের সংবাদ। অবতারী পুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু একশত বৎসর পূর্বে ধরণীর ধূলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। রহিতেন অতি সঙ্গোপনে আপনাকে আবরণ করিয়া। সতেরো বছর ছিলেন নীরবে নির্জনে অসূর্যম্পশ্য অবস্থায়। অন্তরঙ্গ জন ছাড়া তাঁহাকে কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারে নাই। আজ অভিনয় মঞ্চে শিল্পীগণ তাঁহাকে প্রকট করিবেন সর্বজন সমক্ষে। পরম দেবতার অন্তরঙ্গলীলা আমরা দর্শন করিব ইহা আনন্দের বার্তা।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন মহাতপস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আপনি আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন

** প্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভাব শতবর্ষে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু লীলাভিনয় উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা।*

ব্রহ্মচর্য। বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যই শক্তির উৎস। আগে সকলে শক্তিমান্ হও। ব্যক্তির ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে ব্রহ্মচর্যব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় আদর্শের ইহা মূলসূত্র।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন হরিনামের মূর্ত বিগ্রহ। রাধা নাম শুনিলে তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। হরিনাম শুনিলে তাঁহার অঙ্গে হরি, কৃষ্ণ, রাম নামাক্ষর ফুটিয়া উঠিত। তিনি হরিনামে আপনাকে বিকাইয়াছেন — বলিয়াছেন, "আমি হরিনামের এ ভিন্ন আর কারো নই। তোরা হরিনাম করে আমাকে তোদের সঙ্গে মিশাইয়ে নে।" তিনি হরিনামের ভিখারী হইয়া কান্দিয়া মর্ত্যের মাটি ভিজাইয়াছেন। নদীয়ার প্রেমের দেবতার নবরূপায়ণ মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে প্রভুসুন্দরের প্রেমময় স্বরূপের মধ্যে।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন ক্ষমার দেবতা। নিজ দেহে পাষণ্ড অত্যাচারীর নির্মম আঘাত সহ্য করিয়াও হাসিমুখে তিনি বলিয়াছেন, "আমি দণ্ডদাতা নহি, উদ্ধারণ বটি।" তাঁহার কারুণ্যে অপরাধীর জীবনে ভক্তির জোয়ার আসিয়াছে।

সর্বোপরি বন্ধুসুন্দর ছিলেন অবজ্ঞাত জাতির পরম আশ্রয়। সমাজে ঘৃণিত অবহেলিত অস্পৃশ্য ডোম ও বুনো জাতিকে বুকে তুলিয়া তিনি তাহাদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রজনী সর্দারের আনীত জল নিত্য পান করিতেন। কায়স্থদের আহারের পংক্তিতে বুনোরা প্রবেশ করায় তাহারা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া যায় — সেই দুঃখে তিনি তিনদিন নিরম্বু উপবাস করেন। হরিভক্ত বুনো জাতিকে তিনি মোহন্ত পদবী দিয়াছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ছিলেন পতিত কাঙ্গালের পরম সুহৃৎ। গৌরকিশোর সাহা প্রভুকে নিত্য ফলমূল ভোগ দেন। তার ছোট বোন বালবিধবা মুক্তাদাসী বলে, দাদা! প্রভু শুধু ফল খেয়ে থাকেন — অন্ন দেওয়া যায় না? গৌরকিশোর জিহ্বা কাটিয়া বলে, আমরা সাহা।

মুক্তা আঙ্গিনার কোণে দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিলেন, "মুক্তা রে ঐ মাঠের মধ্যে মায়েরা কী করে?" "মটর শাক তোলে।" "ও দিয়ে কী করে রে?" "ওমা! তাও জানেন না? রেঁধে খায়।" "আমাকে মটর শাক খেতে দিস্ তো।"

মুক্তা প্রেমভরা প্রাণে অশ্রুভরা নয়নে শাক অন্ন আর যা জুটিল রাঁধিয়া দিল। কম্পিত পদে গৌরকিশোর ভোগ লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। প্রভু বলিলেন, "গৌর, আজ মহা অন্ন এনেছ!" করুণাময় দুয়ার বন্ধ করিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন, এক-কণা প্রসাদও রহিল না। দরজা খুলিয়া গৌরকিশোর কহিয়া উঠিল — এমন দয়াল নিধি কভু দেখি নাই।

গৌরকিশোর বলিলেন, "প্রভু, গরমে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেবাবাদী হ'বার ভয়ে দরজা খুলে বাতাস দিলাম না।" প্রভু বলিলেন — "না রে, গরমে কষ্ট হয়নি। মুক্তা মিষ্টি বাতাস দিচ্ছিল।" দাদার মুখে ঐ কথা শুনিয়া মুক্তা আনন্দে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। প্রভুর ভোগ পাঠাইয়া সে তাহার গৃহস্থিত প্রভুর চিত্রপটের গায়ে বাতাস করিতেছিল।

মহাপ্রভুর মত প্রভুবন্ধুও কাহাকেও কানে মন্ত্র দেন নাই। নানা প্রকারে প্রিয়জনদের

প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রকে শক্তি দিয়া করিয়াছেন নিষ্ঠাবান চিরকুমার, চম্পটীকে শক্তি আধান করিয়া করিয়াছিলেন হরিবোলা ঠাকুর, প্রেমানন্দ ভারতীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়াছেন আমেরিকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে, কুমারটুলির এক গলিপথে টহলকীর্তন রত মহাত্মা শিশিরকুমারের শিরে গবাক্ষ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে করিয়াছেন গৌরপ্রেমী 'অমিয় নিমাই'র লীলারূপকার। বন্ধুসুন্দর হাতে হাত বুলাইয়া দিয়া নবদ্বীপ ব্রজবাসীকে করিয়াছেন অদ্বিতীয় মৃদঙ্গ বাদক। হরিকীর্তন ছড়াইয়া তিনি ডোম বুনোদের মোহন্ত করিযাছেন। বামদাস বাবাজীকে মহাশক্তি দিয়া গৌরলীলার শ্রেষ্ঠ প্রচারক করিয়াছেন, মহানাম মহাপ্রচারণে মহেন্দ্রজীকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন অযাচিত করুণা বিতরণ করিয়া। তিনি বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন ভারত উদ্ধারে মৌন-মুখের তাৎপর্য পূর্ণ ইঙ্গিত-ইসারা দিয়া। ভাগবত গ্রন্থ প্রচারে রাজর্ষি বনমালীকে ব্রতী করাইয়াছেন শ্রীমুখে আদেশবাণী দিয়া। প্রেমঘন মূর্তি প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন একটা মহাশক্তির উৎস। তাহা পাত্রে পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন অতি নীরবে নিবিড় সঙ্গোপনে। তাই ব্রজবালা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ লিখিয়াছেন 'লীলাম্বুধি' গ্রন্থে — "গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে।"

গৌরগোবিন্দ মিলিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীবন্ধুহবির মধুর লীলার কিয়দংশ আজ আপনাদিগকে মঞ্চে দর্শন করাইবেন মহানগরীর খ্যাতিমান কৃতিমান ধর্মপ্রাণ নাট্যশিল্পিগণ। এই পবিত্র কার্যের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট মহা কৃতজ্ঞ। আপনারা যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন দর্শন লালসায়, তাঁহাদিগকে জানাই আন্তরিক "সু-স্বাগতম্।" মধুর লীলা স্পর্শে সকলের জীবন মধুময় হউক। ওঁ মধু।

—মহানামব্রত ㄱ

মহাধর্ম মীমাংসা

কোন বই পড়িতে হইলে, খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই হয়, কিন্তু আমার প্রভুর কোন লেখা পড়িতে হইলে সে লেখার শিরোনাম (heading) হইতে পড়িতে হয়। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যেমন নাম ও নামী অভেদ, তাঁহার গ্রন্থের নামের সঙ্গেও তৎ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রায় তেমন ধারা একটা অভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত গ্রন্থ মধ্যে পাঁচখানি প্রধান — হরিকথা, চন্দ্রপাত, ত্রিকাল গ্রন্থ, উদ্ধারণ ও শ্রীমতী সংকীর্তন। এই প্রত্যেকটি নামকরণের মধ্যেও একটা রহস্য নিহিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে যথামতি তাহা আস্বাদন করিব। প্রথমতঃ ত্রিকাল গ্রন্থের নাম-করণ আলোচনীয়।

* *'আঙ্গিনা'। সম্পাদক ঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ২য বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা (বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩৩৮) মহানাম সম্প্রদায়, শ্রীঅঙ্গন।*

বর্তমানে বহু বান্ধব এই সকল গ্রন্থরাজি লইয়া প্রাণপণ আলোচনা ও অর্থ-নিষ্কাশনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা পরমানন্দের ও শ্লাঘার বিষয়—এই সকল ব্যাখ্যা। কারীদের মধ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিতকুলচূড়ামণি শ্রীল দামোদর লালাজীর নাম অন্যতম, তিনি শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, তা ছাড়া অনেক ভক্ত চন্দ্রপাত ও ত্রিকালের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তবে কেহই এ পর্যন্ত মুদ্রণ সম্পাদন করিয়া প্রচারে সাহস করেন নাই। 'এই ব্যাখ্যাই ঠিক কিনা' নিজ নিজ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলেই এরূপ সন্দিহান আছেন। আর সেইরূপ সন্দেহ থাকাই উচিত। ভক্তের কোন রচনার উপর টীকা-ব্যাখ্যা করা আলাদা কথা, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর লেখনীর উপর কোন ব্যাখ্যা করিবার সময় সকলেরই মনে রাখা উচিত — আমি ব্যাখ্যা করিতেছি না; ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

'ত্রিকাল গ্রন্থ' এই নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন ত্রিকালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে — এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ। এই ব্যাখ্যা বেশ সহজ, সাদাসিধে, কিন্তু সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে একটু চিন্তা করিতে হয় যে, পৃথিবীতে লক্ষ কোটি গ্রন্থ আছে, কোনও গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'গ্রন্থ' এই পদটি যুক্ত নাই। ভাগবতের নাম ভাগবত গ্রন্থ নহে, শ্রীচরিতামৃতের নাম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ নহে, হরিকথার নাম হরিকথা গ্রন্থ নহে. গ্রন্থের নামের সঙ্গে পুনরায় গ্রন্থপদ যোগ করার কি কোনও তাৎপর্য নাই? নাই বলিলে বিলক্ষণ প্রভু, বৃথাই ঐ অক্ষর দু'টি প্রয়োগ করিয়াছেন! আর আছে বলিলেই ভাবিতে হইবে।

আমরা নাই বলিতে রাজী নহি। তবে কী অর্থে ঐ পদটি দিয়াছেন তাহাই অনুধাবনীয়। প্রথমসূত্র—"ত্রিকাল ফক্কিকার" আলোচনা করিলেই 'ত্রিকাল' পদের অর্থ বাহির হইতে পারে। হইলে পরে ত্রিকাল গ্রন্থ নামকরণ রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস পাইব।

কেহ কেহ মনে করেন, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হইতে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত কালকে ত্রিকাল কহে, কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, — কারণ ত্রেতা দ্বাপর কলি — এই তিনটিকেই কেহ কাল আখ্যা দেন না — ত্রেতা কাল দ্বাপর কাল এরূপ কোথাও পাই না। যুগ শব্দের সঙ্গেই তাহারা নিত্য সম্বন্ধ। কেবল কলির সঙ্গে কাল শব্দটির মিল হওয়ার কারণ — অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, সত্য শব্দের সঙ্গে কাল শব্দের মিল থাকিলেও তাহাকে তো পরিবর্জনই করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে মানবজাতিকে ভাগ করা উচিত নহে ; তদ্রূপ ত্রেতাদি পরিবর্তনশীল অবস্থা লইয়া কাল বিভাজ্য নহে।

যুগ ও কাল যদি একার্থক বলিয়া ত্রেতাদিকে কালই ধরিয়া লই, তথাপি সত্যকে বাদ দিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না, বরং সত্যকে বাদ দেওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। কারণ চক্ষু খুলিয়া ত্রিকাল গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বড় অক্ষরে সত্যযুগ শীর্ষক বহু সূত্র পরিদৃষ্ট হয়। যে ত্রিকালের বর্ণনার জন্য গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ হইয়াছে, সেই ত্রিকালের

অর্থ যদি ত্রেতা দ্বাপর কলি হয় তবে ত্রিকাল গ্রন্থ হইতে ঐ অংশ বাদ দিতে হয়। এইরূপ বাদ দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই।

ত্রিকাল পদে ত্রেতাদি যুগ বলিয়া ফক্কিকাব অর্থে ফাঁকি বুঝিলে ত্রেতাদি কালকে মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা প্রভুর লেখনীতে তাদৃশ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। ত্রেতাদি যুগ ও তৎতৎ যুগের বর্ণনীয় বিষয় যদি মিথ্যাই হয়, তবে শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ কলিকে মিথ্যা তো বলেনই নাই, বরং 'ধন্য কলি শত ধন্য' বলিয়াছেন। "সত্য যুগে ছিলেন হরি" এই পর্যন্তই পাই কিন্তু তৎকালীন কোন বর্ণনা পাই না। 'ত্রেতায় রাম ধনুকধারী' হইতে এ পর্যন্ত পুরাণ শাস্ত্র যা কিছু পাইয়াছি সব ফাঁকি বা অসত্য বলিবার মত সাহস আমার নাই।

ত্রিকাল এই পদটির গর্ভে দুইটি শব্দ আছে। শব্দ দুইটি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সম্বন্ধ। (ত্রি বিশেষণ, কাল বিশেষ্য; ইহারা সমাসবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।) 'ফক্কিকার' আর একটি বিশেষণ। এই বিশেষণটি কাহার? আপাততঃ মনে হয়, কাল এই বিশেষ্যেরই বিশেষণ এবং সেইরূপ মনে করিয়াই ত্রেতা দ্বাপর কলি এই তিনকাল ফক্কিকার বা ফাঁকি এরূপ অর্থ করা যায়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ত্রিকাল দুইটি পদ হইলেও এক পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ফক্কিকার এই বিশেষণ কালের উপর না পড়িয়া ত্রি এই বিশেষণের উপর পড়িবে। বিশেষণ যুক্ত কোন বস্তুর নিষেধ বা গ্রহণ হইলে মুখ্যতঃ বিশেষণেরই গ্রহণ হয় বিশেষ্যের নহে। যদি বলি কীর্তনে ভাল কীর্তনীয়া ছিলেন না তবে কি বোঝা যায় যে মোটেই কীর্তনীয়া ছিলেন না, নাকি কীর্তনীয়া ছিলেন — তিনি ভাল ছিলেন না। যদি বলি, তিনখানা খোল নাই, তবে কি বুঝিব যে খোল মাত্র নাই — নাকি খোল আছে, কিন্তু সংখ্যায় তিনখানি নাই। ফক্কিকার অর্থ অসত্য হইলে তাহা দ্বারা কালের ত্রিসংখ্যাতত্ত্বের অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালের অসত্যত্ব গ্রাহ্য হয় না বরং তাহার সত্যতাই উদ্দিষ্ট হয়, যেমন তিনখানি খোল নাই বলিলে খোল আছে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না, তদ্রূপ ত্রিকাল ফক্কিকার বলিলে কাল যে ফক্কিকার নহে তাহার ত্রিত্বই ফক্কিকার ইহাই বুঝিতে হয়। যাহা হউক, এতাবতা আমরা প্রভুর সূত্র হইতেই পাইলাম—কাল ধর্মী, তাহা অসত্য নহে। তাহাতে আরোপিত ত্রিত্ব নামক যে একটি ধর্ম তাহাই ফাঁকি। এই কাল কী তাহা বুঝিতে হইবে, তাহার ত্রিত্ব কী তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎপূর্বে ফক্কিকার কথাটির তাৎপর্য জানা আবশ্যক।

'ফক্কিকা' একটি সংস্কৃত শব্দ তাহা ফাঁকি অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ শব্দটি বিশেষ্য। প্রভু বোধ হয় 'র' প্রত্যয়টি যোগ করিয়া তাহা বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ফক্কিকার অর্থ কেবল ফাঁকি বা ভ্রম বুঝিলেই কার্য উদ্ধার হইবে না। ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ ঃ বস্তুতে বস্তু ভ্রম আর অবস্তুতে বস্তু ভ্রম। একগাছি রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হইল, ইহা বস্তুতে বস্তুভ্রম। ইংরেজি শাস্ত্রে বলে Illusion। কখনও এমন হয় যে আমার চোখের সামনে কিছুই নাই তবু যেন দেখিতেছি একটা ভূত দাঁড়াইয়া আছে। ইহা অবস্তুতে বস্তুভ্রম—

ইংরেজীতে বলে Hallucination। এই যে কালের ত্রিত্ববুদ্ধি ইহা যদি ফাঁকি বা ভ্রমজ্ঞানজাত হয় তবে ইহা কোন্ জাতীয় ভ্রম। কালেতে কি একত্ব বা দ্বিত্ব কোনরূপ ধর্ম আছে যেখানে ত্রিত্বের ভ্রম হইতেছে, নাকি কোন ধর্ম নাই, অকারণ ঐরূপ একটা ভুল হইতেছে। আমরা দেখি বস্তু মাত্রেরই সংখ্যা আছে। অলীকবস্তু বাদে সর্বত্রই সংখ্যাত্ব বিরাজমান। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ একলেশ্বর", অন্যত্র বলিয়াছেন "আমি একক।" ইহা হইতে আমরা পাই পরম বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ বা তিনি স্বয়ং, তাঁহাতেও এক স্বরূপ সংখ্যা আছে। পূর্বে দেখাইয়াছি যে শ্রীশ্রীপ্রভু কালকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা হইলে সংখ্যাত্ব রূপ বস্তুধর্ম কালেতে আছেই। এখন ত্রিত্ব পদে যদি বহুত্ব লক্ষণা করি তবে কার্যতঃ কালের একত্ব সিদ্ধ হয় আর ত্রিত্বের যদি লক্ষ্যার্থ অস্বীকার করিয়া বাচ্যার্থই লই তথাপি দ্বিত্বাদির সমর্থক কোন সৎ হেতু না থাকায় ফলতঃ একত্ব সিদ্ধ হয়।

অতএব প্রভুর সূত্র হইতেই আমরা অর্থ পাইলাম যে, একত্ব সংখ্যা বিশিষ্ট কাল নামক যে একটি সদ্বস্তু তাহার যে ত্রৈবিধ্য তাহা ভ্রম বিশেষ। এস্থলে আর একটি কথা এই যে, সংখ্যার জ্ঞানটাই অপেক্ষা-বুদ্ধিজাত। এই যে আপনার হাতে দুইখানি করতাল রহিয়াছে এই দ্বিত্ব সংখ্যা ঐ করতাল জোড়াতে রহিয়াছে। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে করি এই যে করতালের দ্বিত্ব ইহা আমার হাতে থাকিলেও থাকিবে, না থাকিলেও থাকিবে। কিন্তু দর্শন যাঁহাদের দর্শন-ইন্দ্রিয় তাঁহারা সে কথা বলেন না, তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন দর্শক জানিতেছে যে এই এক হাতে একখানি করতাল আর এই আর এক হাতে একখানি করতাল–– ঠিক তখনই এখানে দুইখানি করতাল। যদি পৃথিবীতে ঐরূপ অপেক্ষা বুদ্ধি-বিশিষ্ট কোন জীব না থাকিত তবে ঐ করতালের উপর দ্বিত্ব সংখ্যা থাকিতে পারিত না।

এখন আমাদের কালেতে আমরা দুইটি সংখ্যা পাইতেছি একটি একত্ব তাহা সত্য, আর একটি ত্রিত্ব তাহা মিথ্যা। আমাকে এখন দুইজন বুদ্ধি বিশিষ্ট দর্শক স্বীকার করিতে হইবে। একজন কালকে 'এক' বলিয়া ঠিক ঠিক জানিতেছেন—আর একজন তিন বলিয়া ভুল জানিতেছেন। এখন এই দুইজন কে? আর ঐ তিনই বা কী? তবে তাহা কী? শ্রীশ্রীবন্ধু-বান্ধববর্গের করুণা সম্বল করিয়া ক্রমে আস্বাদন করিবার আশায় থাকিলাম।

* * *

ত্রিকাল পদের গর্ভে 'কাল' এই শব্দটি নিহিত আছে। এস্থলে 'ত্রি' মুখ্য না 'কাল' মুখ্য তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই বা সমাধান হয় নাই। কারণ 'কাল' বস্তুটির প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ কী তাহা আগে হৃদয়ঙ্গম না হইলে তাহার একত্ব বা ত্রিত্ব লইয়া আলোচনা করা বৃথা। অতএব সর্বপ্রথমে কাল কী বস্তু তাহাই জানিবার প্রয়াস পাইব। এই জানিবার পূর্বে আমরা কীরূপে জানি তাহাও একটু আলোচনা প্রয়োজন।

আমি জ্ঞাতা, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু আমার জ্ঞানের বিষয়। জানিবার কারণ বা উপায় ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় একাদশটি। দশটি বাহিরে একটি অন্তরে। বহির্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কীরূপে বস্তু গ্রহণ

করা যায় তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই অবগত আছি। অন্তরেন্দ্রিয় মন দ্বারা আমরা কীরূপে জানি তাহাই বক্তব্য। মনের তিনটা কাজ। মন ভাবে, অনুভব করে, আর ইচ্ছা করে। মন সারাদিন খাটে—কাজ এই তিনটি মাত্র। যেমন যাহা চক্ষে দেখি তাহা সত্যই আছে, যাহা কানে শুনি তাহাও আছে, ঠিক তেমনি যাহা অনুভব করি যাহা ভাবনা করি যাহা ইচ্ছা করি তাহারও সত্যিকার অস্তিত্ব আছে। এই কথাটিই আমার প্রতিপাদ্য। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে যাহা হাতে ধরিয়া আছি বা যাহা গায় ঠেকিতেছে তাহা অবিসংবাদিত সত্য, আর যাহার কথা মনে ভাবিতেছি বা চিন্তা করিয়া অনুভব কবিতেছি বা পাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা কাল্পনিক সত্য। সত্য হইতেও পারে, না হইতেও পারে। না হইবারই অধিক সম্ভব। আমার কথা তাহা নহে। এই বিশ্বের ক্রিয়া-কৌশল বুঝিতে হইলে বিশ্বের নিয়ন্তাকে অনুভব করিতে হইবে। ইহাতে যে কেবল বহিরিন্দ্রিযেরই একচেটিয়া অধিকার থাকিবে একথা কে বলিল? সর্বেশ্বরকে সর্বতোভাবেই জানিতে হইবে। বহিবিন্দ্রিয় কয়টা স্থানে যাইতে পারে? আমার মনে হয়, বিশ্বস্রষ্টা তাই আমাদিগকে মন দিয়াছেন। যুক্তির বাঁধানো পথে যুক্তভাবে চলিয়া মন যতদূর অগ্রসর হয় ও পথে যত কিছু দেখিতে পায় তাহা সবই সত্য। কখনও বোধ হয় বহিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতে অধিকতর সত্য।

কালের বৈশিষ্ট্য

কালকে জানিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই দশজনকে জিজ্ঞাসা কর। সকলে এক বাক্যে বলিবে আমরা কিছু জানি না। ইহা কালের প্রথম বৈশিষ্ট্য। কালের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই নাই—ইহা কালের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা চিন্তা করিয়াই কালকে বুঝিতে হইবে—ইহা কালের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রথমে দেখা যাউক, কাল বলিতে আমরা মোটামুটি একটি কি ধারণা করিয়া লই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিন—রাত আমরা কী দেখি? আমরা দেখি কেবল ঘটনা-পরম্পরা। একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা ঘটিল, তারপর আর একটা ঘটিল, তারপর আর একটা ঘটিল এইরূপ একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাধারা। সকালে উঠিলাম এই একটা ঘটনা। প্রাতঃকৃত্য করিলাম এই একটা ঘটনা। টহল কীর্তন করিলাম এই একটা ঘটনা। প্রভুর পূজা-অর্চনা করিলাম এই একটা ঘটনা। শ্রীভোগ রান্না করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবা, ভক্তগণের সেবা, অতিথি-অভ্যাগত সাধু-সজ্জনের সেবা করিলাম এই একটি ঘটনা। তারপর একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলাম—এই একটা ঘটনা ইত্যাদি। এইরূপে অহর্নিশি আমরা দেখি কেবল ঘটনা। কখনও ঘটনা ছাড়া নাই। যখন ঘুমাইলাম তখনও একটা ঘটনা। যখন মরিলাম—আমার কাছে না হউক অন্যের কাছে সেও একটা ঘটনা। কিন্তু মজা এই যে, এই প্রত্যেকটি ঘটনা কোনও না কোন কালে সংঘটিত হইতেছে। এমন কোন ঘটনা কেহ দেখে নাই যা কোন কালে ঘটিতেছে না। সকল ঘটনাই কালে হয়। কমলা লেবু একটা বস্তু। ইহার আকার গোল, রং লাল, খাইতে মধুর রসাল। আমার মন যদি খেয়াল করে তবে সে ভাবিতে পারে কমলা লেবু লম্বা লম্বা দেখিতে নীল রং খাইতে

নিমতিতো—এরূপ ভাবিতে মনের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে অথচ ইহা কোন কালে বা কোন স্থানে ঘটে নাই—ইহা মন কিছুতেই ভাবিতে পারে না।

(শ্রীশ্রীপ্রভুর দ্বিতীয় সূত্র "সাড়ে আট ক্ষণ স্থিতি"—স্থিতি অর্থ স্থানে থাকা। কাজেই স্থিতি বুঝিতে হইলে স্থানকে বোঝা চাই। ঐ সূত্রের তাৎপর্য আমরা পরে আলোচনা করিব। এস্থলে কালের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থানের বৈশিষ্ট্যও বিচার করিব। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ স্থানে ও কালে অনেকটা সাদৃশ্য আছে তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।)

কোন ঘটনা ঘটিলেই তাহা কোনও স্থানে ঘটিবে এবং কোনও কালে থাকিবে। যেমন কেহ আমাকে গঙ্গা আনিতে বলিলে আমি খালি গঙ্গা জল আনিতে পারি না। একটা কমণ্ডলু ভরিয়া আনিতে বাধ্য হই। ঠিক তেমনি কোন ঘটনাকে ভাবিতে হইলে তাহা কোন স্থানের উপরে ও কালের মধ্যে আছে এই ভাবিতেই হয়। স্থান আর কাল যেন দুইটা প্রকাণ্ড আধার—পাত্র বিশেষ। সকল ঘটনাই যেন তাহাতে ঘটিতেছে। ইহা স্থান ও কাল উভয়ের বৈশিষ্ট্য।

আধার আধেয়ের সঙ্গে স্থান-কাল ও ঘটনাকে তুলনা করিয়াছি। তাহাতে কিন্তু অনেক ভুল থাকিল। কমণ্ডলুতে গঙ্গা আছে। গঙ্গাকে তুলসী মূলে ঢালিয়া দিলাম। খালি কমণ্ডলুটা পড়িয়া থাকিল। এখন আসুন দেখি সমস্ত ঘটনাগুলিকে ফেলিয়া দিয়া খালি কালটাকে ভাবিতে পারি কিনা।

আপনার মনকে বলুন এমন একটা সময়ের কথা ভাবিতে, যে-সময় কোন ঘটনাই ঘটিতেছে না। সৃষ্টির আরম্ভেই হউক আর মহা প্রলয়ের অবসানেই হউক, এমন একটা কাল কি কখনও আছে বলিয়া ভাবা যায় যে-কালে কোনও ঘটনাই ঘটিতেছে না। আমরা ভাবি, কল্পনা মনের ধর্ম—মন বুঝি একটা যা-তা কল্পনা করিতে পারে; এইবার দেখুন তাহা পারে না। যে-কালে কোন ঘটনা নাই এমন কাল কেহ কোন কালে কল্পনাও করিতে পারে নাই। পাঠক মহাশয় ইচ্ছা হয় আমার এই বাক্যটি পুনরায় পড়ুন—"যে-কালে কোন ঘটনা নাই' এই যে ঘটনা নাই ইহাও কোনও কালে আছে, এই যে 'কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই' ইহাও কোনও কালে আছে। কারণ, ঘটনা না থাকা বা কল্পনা না করা ইহাও যে একটা ঘটনা বিশেষ তাই ইহারাও কালে আছে।" অতএব শূন্য বা খালি (empty) কোন কাল নাই।

শূন্য স্থান সম্ভব কিনা তাহা একটু প্রণিধানের বিষয়। স্থান বলিতে আমরা অনেক সময় মনে করি মাটি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাটি বা জমি কোনও স্থানে আছে। এই পৃথিবীটা স্থান নহে, ইহা কোন স্থানে আছে। কোন বস্তু আছে অথচ কোন স্থানে নাই ইহা আমরা ভাবিতে পারি না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কোন স্থান আছে, বস্তু নাই ইহা আপাততঃ ভাবিতে পারি মনে হইলেও বস্তুতঃ পারি না। পঞ্চম মহাভূত আকাশ, সব স্থানে সে থাকে। কাজেই স্থান-কালের সঙ্গে ঘটনার বা বস্তুর ঠিক আধার-আধেয় সম্বন্ধ নহে। কোনও একটা নূতন সম্বন্ধ আছে। স্থান-কাল ছাড়া কোন ঘটনা বা বস্তু জ্ঞান হয় না—বস্তু বা ঘটনা জ্ঞান ছাড়া স্থান কালের অনুভব হয় না। আমি বলিতেছি বস্তু আর ঘটনা—এই রূপ দুই না বলিলেও চলে, কারণ বস্তু আর ঘটনা প্রায় একই কথা। বস্তু হইলেই সে থাকিবে আর তাহার থাকাই একটা ঘটনা। (The mere existance is a fact.)

আজ একটি দিন। ভাবুন দেখি ইহার আগে এইরূপ কতগুলি দিন গিয়াছে। আপনি ভাবিতে ভাবিতে যতই পিছনে যান যাইতে পারিবেন। কেহই আপনাকে বাধা দিবে না। তেমনি আজকার দিনের পর এমনই আরও কতগুলি দিন হইবে আপনি ভাবিতে ভাবিতে যতই আগাইয়া যান যাইতে পারিবেন, কেহই আপনাকে বাধা দিবে না! স্থান সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। আপনি একটু খানিক স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আপনি ভাবুন আপনার সম্মুখ বা পিছনে বা পার্শ্বে বা উর্দ্ধে এইরূপ কত স্থান আছে। যত ভাবিবেন ততই ভাবিতে থাকিবেন, কোন কিছু আপনার বাধক হইবে না।

স্থানের ও কালের ইহা একটি লক্ষ্যযোগ্য বিশেষত্ব, পশ্চাতে বা সম্মুখে যে-দিকে আপনি তাহাকে মাপিতে চান স্থান বা কাল আপনার গতিকে বাধা দিবে না। এক কথায়—আপনি তাহাদের সীমা খুঁজিয়া পাইবেন না। স্থান ও কাল অসীম।

আপনার প্রতিবেশীর বাড়ী ঠিক রাখিবার জন্য আপনি মাঝখানে একটা প্রাচীর তুলিয়াছেন, কারণ বাড়ী আর প্রাচীর আলাদা বস্তু। প্রাচীর বাডীর সীমানার কারণ হয়। যে বস্তুকে সীমানা করিতে হইবে তদিতর বস্তু অর্থাৎ তাহা ছাড়া আলাদা কোন বস্তু দ্বারা তাহা করিতে হইব। এই যে আজকের এই দিনটা—এর একটা সীমানা নির্দেশ করুন দেখি। এর আগেও একটা দিন আর পরে একটা দিন। কাজেই সীমানা হইল না। যে-কোন একটা সময়কে বলিতে হইলে আপনাকে বলিতে হয় অমুক সময় হইতে অমুক সময়। সময় ছাড়া সময়কে বুঝানো যায় না; তদ্রূপ স্থান ছাড়া স্থানকে বুঝানো যায় না। ঐ আপনি একটা স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন—ঐটা কোন্ স্থান আপনাকে বলিতে হইবে অমুক স্থান হইতে অমুক দিকে অত দূরে, অমুক স্থান হইতে অমুক দিকে অত দূরে ইত্যাদি। কাজেই স্থান ছাড়া অন্য কিছু দ্বাবা স্থানকে বুঝানো যাইতেছে না। কাজেই বস্তুতঃ স্থান ও কালকে বুঝানো যায় না। কারণ, যে স্থান ও কালের দ্বারা এই স্থান ও কালের সীমা করিতেছিলেন স্থান ও কালকে বুঝাইতে আবার আর এক স্থান ও কালকে নির্দেশ করিতে হইবে; আবার তাহাকে বুঝাইতে ঐরূপ অপরকে। মোট কথা স্থান ও কালকে অন্য কিছু স্থান সীমাবদ্ধ করিয়া ধরিয়া দেওয়া যায় না। এক কথায় ইহাই স্থান ও কালের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব।

আপনি হয়ত বলিবেন আজ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী। এই তো কালকে নির্দেশ করিলাম। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন বস্তুতঃ কিছুই করা হইল না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অর্থ কী? যীশুখ্রীষ্টাব্দের জন্মদিন হইতে ১৯৩৩ বৎসর। কাজেই আপনি বলিলেন, যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছে আজ হইতে ১৯৩২ বৎসর ১ মাস ৩ দিন আগে। জ্ঞাত বস্তু দ্বারা অজ্ঞাত বস্তুকে চিনাইতে হয়। আপনি বরং বিপরীত করিলেন। আজকার দিনটাকে বরং কিছু জানি; তাহাকে বুঝাইতে গিয়া আপনি বলিলেন যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন হইতে এত বৎসর গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি যীশুখ্রীষ্টের জন্ম দিনটা কোন্ দিন। সেই দিনটার পরিচয় কী? আপনি যেন সেই দিনটাকে খুব জানেন শোনেন এইরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। আপনারই মত অন্যান্য কেহ বা নানকের, কেহ বা মহম্মদের, কেহ বা শালিবাহনের, কেহ বা হর্ষবর্দ্ধনের কেহ বা বিক্রমাদিত্যের জীবনের কোনও একটা দিনকে বিশেষভাবে জ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মনে করুন আমি ইহাদের কাহাকেও

জানি না। সত্য কথা বলিতে গেলে আমি কেন, বর্তমানে এমন কেহই বাঁচিয়া নাই যে ঐ ঐ দিনগুলির কোন একটিকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বরং আজকের দিনটাকে সকলেই দেখিতেছি। কাজেই সে অজ্ঞাত অপরিচিত কালের দ্বারা অদ্যকার কালকে চিনাইয়া কী ফল হইল? বস্তুতঃ আজকের দিন এমন একটা দিন যাহা বুঝাইয়া দিবার কোন উপায় নাই। কেবল এই দিন কেন, কালের প্রত্যেকটি ক্ষণ ও স্থানের প্রত্যেকটি বিন্দু এইরূপ অনির্দেশ্য।

যে যে বস্তু অবিচ্ছিন্ন তাহাদেরই নির্দেশ সম্ভব। স্থান ও কালের অনির্দিষ্টতার হেতু কী? স্থান ও কাল নিরবচ্ছিন্ন এইজন্যই অনির্দেশ্য।

* * *

ক্রমে কাল ও স্থানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিয়া এই কালের 'ত্রিত্ব' কী ও এই স্থানে 'স্থিতি' কীরূপ তাহাই অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব। জয় জগদ্বন্ধু।...

আমি যে অর্থে 'স্থান' শব্দ প্রয়োগ করিতেছিলাম দার্শনিকগণ 'দেশ' শব্দের দ্বারা ঐ অর্থ বুঝিয়াছেন। এই দেশ ও কালের মধ্যে বেশ একটা মাখামাখি সম্বন্ধ আছে। দেশ-কাল ও জগৎকে আধার-আধেয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। দেশ-কাল আধার। আধার মাত্রেরই ব্যাপ্তি আছে। অতএব কালের একটা ব্যাপক ভাব (duration) আছে। তাছাড়া কালের আর একটি ধর্ম এই যে, ইহা একটি নিরবিচ্ছিন্ন (Continuous) ধারার মত। কালের যে-কোন দুইটি ক্ষণ লইয়া যদি ভাবি তবে দেখিতে পাই যে তাহাদের মধ্যে অসংখ্য ক্ষণ রহিয়াছে। যত কাছাকাছি ক্ষণদ্বয়কে লই না কেন তাহাদের মাঝে ক্ষণ থাকিবেই। খালি কখনও থাকিবে না। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারার জ্ঞান অপর একটি আধার জ্ঞান-সাপেক্ষ। সেই আধার কে? দেশ সেই আধার স্থানীয়। অর্থাৎ কাল দেশেতে আছে বলিয়া সে নিরবচ্ছিন্ন ধারা হইতে পারিয়াছে। যদি কাল দেশে অবস্থিত না হইত তবে আমরা পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণ জানিতাম। একটা ধারা জ্ঞান হইত না। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার আধেয় রূপে কাল এই আধারে আছে। পুনশ্চ কাল নিজেই আধেয় রূপে দেশেতে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দেশ যাবতীয় ঘটনার আধার। একথা পূর্বে বলিয়াছি। এই আধারত্ব ব্যতীত দেশে একটা চিরস্থায়িত্ব রূপ ধর্ম আছে। এই চিরস্থায়িত্ব জ্ঞান অপর একটি আধার জ্ঞান সাপেক্ষ। কালই সেই আধার স্থানীয়। আধেয় রূপে দেশ আধার রূপ কালেতে আছে। অতএব আমরা পাইলাম যে, কাল আধার, দেশ আধেয়। আর দেশ আধার, কাল আধেয়। তাই বলিয়াছি দুইয়েতে একটা মাখামাখি সম্বন্ধ আছে। দুইটি বস্তু বিপরীত ক্রমে পরস্পর পরস্পরের আধার-আধেয় কীরূপে হইল ইহা রহস্যময়। মনে হয়—দেশ ও কাল দুইটি বস্তু নহে। দেশ-কাল নামক একটি বস্তু অথবা দেশ ও কালের অতীত একই মহাবস্তুর দুইটি বৃত্তি; তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"**কালবৃত্ত্যা তু** মায়ায়াং গুণময্যাম্ অধোক্ষজঃ।"

যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম বা পাইলাম যে, দেশ-কালের অতীত কোন বস্তু আছে। আমরা দেশ-কালের মধ্যে থাকিয়া দেশ-কালকে কিরূপ জানি আর তিনি দেশ-কালের বাহিরে থাকিয়াই বা দেশ-কালকে কীরূপে জানেন তাহা আলোচনা করিলেই স্থান (দেশ)-এর স্থিতি কী

ও কালের ত্রিত্ব এবং তাহার ফক্কিকারত্ব বা মিথ্যাত্ব কীরূপ তাহা পরিব্যক্ত হইবে। এই জগতে সূর্যের পরিস্পন্দন দ্বারা আমাদের কাল-জ্ঞান হয়। একদিন গেল বলিতে বুঝি আকাশের পূর্ব-চক্রবাল হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সূর্যের গতি হইয়াছে। এই কালকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার দ্বারা গুণ করিয়া পক্ষ মাস ও বর্ষাদি ব্যবহারযোগ্য হয়। আবার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া ঘণ্টা মিনিট দণ্ড পল ক্ষণ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্যের এই গতি কিছুই নহে। বিপরীতক্রমে গতিমান পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হয় বলিয়াই সূর্য ঐরূপ গতিমান মনে হয়। অতএব ফলে দাঁড়াইল, পৃথিবীর গতি পৃথিবীস্থ জীবের কাল জ্ঞানের হেতু। যে হেতু পৃথিবী কোন স্থিব বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া নির্দিষ্ট পথে সম বেগে পরিক্রমণ করিতেছে সেই হেতুই পৃথিবীস্থ জীবের একটি বিশিষ্ট প্রকার কালজ্ঞান হইতেছে। বলিতে কি এই ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন স্থানের কালজ্ঞানও ঠিক এক রূপ নহে। বিযুব রেখাস্থিত ব্যক্তির কালজ্ঞান মেরু-প্রদেশস্থ ব্যক্তির কালজ্ঞানের ঠিক অনুরূপ নহে। এই গেল পৃথিবীর কথা। এখন যদি পৃথিবী ছাড়িয়া আমরা গ্রহান্তরে যাই তবে সেখানে কালের জ্ঞান যে অনুরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? যেরূপ গতিতে সেই গ্রহ যেরূপ কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহার উপরে সেই গ্রহ-বাসীর কালজ্ঞান নির্ভর করে। এই গেল গ্রহ-উপগ্রহের কথা। সব ছাড়িয়া যদি সূর্যলোকে যাই তবে কী হইবে বলা কঠিন। সূর্য যদি স্থির হয় তবেই চিন্তার বিষয়। যদি আর এক মহাসূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান হয় তবে আর কোন অসুবিধা নাই। তাহার ঘূর্ণনের গতি ও পথের দ্বারাই কালজ্ঞান নিরূপিত হইবে। বিজ্ঞান বলেন এ দ্বিতীয় কথাই ঠিক। এই সূর্যের বাপ-ঠাকুরদা যে কত মহাসূর্য আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্যোতিযশাস্ত্রও ঐ কথায় সায় দিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক দর্শনশাস্ত্র কী বলে না জানা পর্যন্ত আমাদের নিবৃত্তি হইবে না।

দর্শন যাহা বলে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। আধাররূপে দেশ কালরূপ আধারেতে আছে অতএব যাহা দেশে আছে তাহা কালে থাকিবেই। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই দেশে বা স্থানে আছে। সূর্য ঐরূপে স্থানে আছে, অতএব সে কালের অধীন। সুতরাং এত মহাসূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে বাধ্য। যে মহাবস্তু দেশের অতীত তাহাই কালের অতীত হইতে পারে এবং তাহাই একমাত্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহার সত্তা অপরিণামী। তাহা একটি বই দুইটি হইতে পারে না। কাজেই উপনিষদের ভাষায় আমরা বলিতে পারি, সেই মহাবস্তু—

"শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্"

তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই অনন্ত কোটি মহাসূর্য অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পর পর তাহাদিগকে কেন্দ্র ধরিয়া যে অনন্তানন্ত কত আছে তাহা ভাষার অতীত, মনেরও অগোচর। ঋষির ভাষায় তাই আবার বলি—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তিনি অনন্তময়। এছাড়া পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে তাঁহার কালজ্ঞান কিরূপ? তিনি পরম সত্য বস্তু। অতএব কাল সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান তাহাই সত্য। আমাদের যে-জ্ঞান তাহাই ফক্কিকার। আমাদের কালের উপর ত্রিত্ব বোধ আছে। বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ কালকে আমরা এই তিনরূপে জানি।

এই ত্রি-জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া তিনি ত্রিকাল ফক্কিকার লিখিয়াছেন। তিনি অনন্তানন্তময়। তাঁর সত্য জ্ঞানে কাল এক। এই ত্রিত্ব একত্ব কথাটি কী? শ্রীত্রিকাল গ্রন্থ প্রারম্ভে এই কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এইবার তাহাই প্রণিধান করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যাহা অতীত তাহা চলিয়া গিয়াছে, শক্তিহীন মানব তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। কাজেই অতীত দিয়া মানুষ কী করিবে? ভবিষ্যৎ এখনও আসে নাই—কোন্ সাজে সে সাজিয়া আসিবে তাহা মানুষ জানে না। নিশ্চয়ই রাম শ্যাম কাহারও ইচ্ছামত সে সাজিবে না। কাজেই ভবিষ্যৎ দিয়া মানুষ কী করিবে? কবিও তাহাই গাহিয়াছেন—

"মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীবে অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর।
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হয়ো না কাতর।।"

অতএব মানুষের পক্ষে—

সময়ের সার বর্তমান।

কিন্তু বর্তমান কোথায়? হায় রে জীবের দুর্ভাগ্য! যাহাকে জীব সার বলিয়া ধরিয়া আছে দার্শনিকের চক্ষু লইয়া দেখিলে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কাহাকেও বলিলাম এখন সময় কত? সে বৈঠকখানায় গিয়া ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিয়া ৪টা দশ মিনিট পাঁচ সেকেণ্ড। কিন্তু হায়! আমি যখন বুঝিলাম এখন এই সময়—তখন ঐ সময় আছে কি? যেটাকে আমরা বর্তমানে সময় বলিয়া মনে করি তাহার স্থায়িত্ব যে কত কম তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমরা জীবকুল বিশ্বের মাঝখানে। অতি বড় মহান্ যা মহৎ তাহাও ধারণায় আসে না, আব অতি ক্ষুদ্র অণু যা তাহাও কল্পনায় আসে না। আর সারাৎসার বস্তু যা তাহা কিন্তু মহতেরও মহৎ অণুরও অণু। কাজেই সেই সত্য-স্বরূপকে জানা বোধহয় কোনদিনই জীবের ভাগ্যে হইতে পারে না। যাহা হউক দেখা যাক কালের খাঁটি স্বরূপ কী তাহা জানা যায় কিনা?

গাছ হইতে একটা ফল পড়িতেছে। আমরা বলি ফলটি পড়িতেছে। 'পড়িতেছে' এইটি বর্তমান কালবাচক ক্রিয়া। যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ঐ ক্রিয়ার বাচ্যকর্ম কোন্‌টি খুঁজিয়া পাই না। মনে করুন, গাছটি বিশ হাত উঁচু। গাছ হইতে ফলটি ৫ হাত নীচে পড়িয়াছে পর আমি বলিলাম ফলটি পড়িতেছে। যে পাঁচ হাত পড়িয়াছে তাহা তো অতীত। যে পনের হাত পড়িতে বাকী আছে তাহা তো ভবিষ্যৎ। তবে পড়িতেছে এই বর্তমান ক্রিয়ার বাচ্য কোথায়? তবে কি বর্তমান নাই? তবে জীবের উপায় কী? অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্তমানের অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

আমি বসিয়া আছি। কেহ কানের কাছে কহিল 'নারায়ণ'। আমি মনে করিলাম এই নারায়ণ শব্দটি আমি বর্তমান কালে শুনিলাম। কিন্তু গবেষণা করিলে কী পাই? আমার যে মুহূর্তে নারায়ণ শুনা হইয়া গিয়াছে সেই মুহূর্তে আমি কেবল শেষের ণ-কারটি বা তৎপরবর্তী আকারটি শুনিয়াছি। পূর্বের অক্ষরগুলি অতীত কালে শুনা হইয়া গিয়াছে। কাজেই দেখিতে পাই একটু অতীত একটু ভবিষ্যৎকে লইয়া আমাদের মন বর্তমানকে বোঝে। আমাদের ক্ষুদ্র মনের কাছে

বর্তমানকাল কী চেহারায় আসে? তাহা একার্দ্ধ অতীত একার্দ্ধ ভবিষ্যৎ। মিলনাত্মক যে সেই বর্তমান। একটু অতীত ও একটু ভবিষ্যৎ না দেখিলে আমরা বর্তমানকে দেখিতে পাইতাম না। মনে করুন, আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেকের সসীম মনের কাছে বর্তমান কালের এই চেহারা। এ সকল ব্যষ্টি মনের সমষ্টিভূত মন যিনি বা সকল মনের অতীত যিনি তার কাছে বর্তমান কীরূপ? অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের সম্মিলিত ক্ষেত্রই বর্তমান। অর্থাৎ অনন্ত মহাকালে অনাদি সৃষ্টি হইতে যাহা হইয়াছে অসীম ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহাকে তিনি একবারে দেখেন। তাহাকে বর্তমান কালই বল বা একতাপন্ন অপরিচ্ছন্ন সম্পূর্ণ কালই বল, মোট কথা অসীম কাল তাহার সত্য জ্ঞানে **এক**। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে পরিচ্ছন্ন **তিন**। তিনি যে অনন্তানন্তময় তার প্রমাণ কী? কালকে তিনি এক দেখেন। আমরা যে কীটানুকীট জীব কী নিমিত্ত? কালকে আমরা তিন বলিয়া ভুল বুঝি। এই ভুল আমাদের সকল ভুলের মূল। দিবানিশি জীব যে ত্রিবিধতাপে তাপিত তাহার হেতুটি এই ভুল। আজ পুত্রটি মরিয়া গেল বলিয়া কাঁদি কেন? কারণ ভাবি, সে অতীত হইয়া গেল। রণ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অর্জুনও তাহাই ভাবিয়াছিলেন, তাই গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছিল, দেহে জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল, যুদ্ধ করিব না বলিয়া কর্তব্যবিমূঢ়চিত্তে অধোবদনে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাই মহাকাল কর্তা যিনি তিনি দেখাইলেন—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্।।" (২/১২ গীতা) আমি তুমি এই রাজারা আগে ছিলাম না—এও নয়, পরে থাকিব না—এও নয়। অর্জুনের মোহ ভীষণ। তিনি এতেও বুঝ্ মানিলেন না। শেষে শ্রীভগবান্ 'কালোঽস্মি' বলিয়া নিজে মহাকালের স্বরূপ দেখাইলেন। বলিলেন—

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব।"

আমি মহাকাল। 'হইয়াছে'—'হইবে' এসব আমার নাই। আমি নিত্য বর্তমান। তুমি যাহাদিগকে ভবিষ্যতে মারিব ভাবিতেছ—আমাতে তাহারা মৃতই রহিয়াছে। এস দেখ—

"দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।" (১১।৩৪ গীতা)

এইবার অর্জুনের মোহ দূর হইল বটে—হইবারই কথা। মহাকালের ঐ নিত্য বর্তমান মূর্তি দেখিতে পাইলে মানুষের শোক থাকে না, দুঃখ থাকে না, ভয় থাকে না—থাকে কেবল কর্তব্য-কর্ম নিষ্পাদন। সেই কর্মে আবার বন্ধনও থাকে না। কারণ কর্তা সে কর্তা থাকে না—কর্মফল বর্তিবে কোথায়? তাই শ্রীমুখে মহামূল্য উপদেশ—

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

জীব যে নিমিত্তমাত্র—একমাত্র তিনিই যে সর্ব নিয়ন্তা ইহা ভুলিয়া গিয়াই তো জীবের নানা দুর্গতি। তাই আজ জীব-শিক্ষাগুরু মহাবতারী বন্ধুহরি গ্রন্থপ্রারম্ভে সেই কথা বলিয়া জীবের আত্যন্তিক দুঃখের হেতু ও তাহা নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিলেন।

ত্রিকাল বা কালের ত্রিত্ব সর্ব দুঃখের হেতু, আর ফক্কীকার তাহা মিথ্যা এই জ্ঞানই ঐ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মন্ত্র। (ক্রমশঃ)—মহানামব্রত ❑

বালক বন্ধুহরির অদ্ভুত পূজা

শ্রীশ্রীপ্রভুর বয়স যখন একাদশ তখন তাঁহার যজ্ঞোপবীত হয়। তারপর হইতেই তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পরায়ণ। এই ব্রহ্মচর্যের অন্তরে যে কি গভীর ব্রজরসের উৎস সেই কথাটি বলিব একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা।

যজ্ঞোপবীত হইবার পর তিনি প্রত্যহ পূজা করিতেন। গৃহে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ ছিল। এক অপূর্ব ভাবে তিনি এই বিগ্রহ পূজা করিতেন। শ্রীরাধার যত পোষাক শ্রীকৃষ্ণকে পরাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ যত পোষাক পরিতেন তাহা শ্রীরাধাকে পরাইতেন। তারপর রাধার বাঁ পাশে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইতেন। বসাইয়া দুই হাত তুলিয়া নাচিতেন, মুখে বলিতেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

এই কথা অতুল চম্পটী শুনিয়াছেন তাহার শাশুড়ী মাতা প্রভু জগদ্বন্ধুর বড় দিদি দিগম্বরী দেবীর নিকট। ঐরূপ কেন করিতেন? একদিন চম্পটী প্রভুর নিকট জানিতে চাহিয়া ছিলেন। প্রভু বলিলেন—শোনো? কী দেখিতাম — ভানুনন্দিনী নন্দলালাকে ভাবিতে ভাবিতে নন্দলালাই হইয়া গেছেন। নন্দলাল, ভানুনন্দিনীকে ভাবিতে ভাবিতে তাহাই হইয়া গিয়াছেন। তাই বাঁ পাশে বসিয়াছেন। ❑

বন্ধুসুন্দরের ত্রয়োদশ দশা

'দশম দশা' ভাবটি শ্রীশ্রীপ্রভুর আস্বাদন—

কৃষ্ণ রাধা-হারা হইয়া রাধাকে ডাকেন হরে!

রাধাও কৃষ্ণ-হারা হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন—কৃষ্ণ!

এই ডাকের মধ্যে নামটি চলিয়াছেন। ইহারই পরিণতি গোরাচাঁদ এক তনু বিরহ-সন্তাপে। বিরহের চাপে গলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দুই এক দেহ হইয়াছেন। প্রভু বাবংবাব বলিয়াছেন— "দশমী কি মনে নাই?" "বড় দুঃখে এক রে।" রাধাকৃষ্ণ গৌর হইলেন বিরহেব তাপে বিগলিত হইয়া। ইহাতে দশম দশার পরিণতি।

এই পরিণতিকালেই চন্দ্রাবলীর কর্ণে হরিনাম দিতে দিতে তিনি (চন্দ্রাবলী) নিতাই হইয়া গেলেন। দ্বাদশ দশায় প্রভু আস্বাদন এই—

গোরাচাঁদ নীলাচলে নিতাইচাঁদ খড়দহে

বিরহে নিতাই ডাকিলেন গৌরকে — "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" আর গোরাচাঁদ ডাকিলেন নিতাইকে "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই বিরহের তীব্র তাপে এই তনু একীভূত ইহাই দ্বাদশ দশার পরিণতি। এই দ্বাদশ দশার পরিণতি—প্রভু বন্ধুসুন্দর। তিনি ত্রয়োদশ দশার আস্বাদন করিতেছেন, একই কালে দশমী দশা ও দ্বাদশ দশা।

রাধার দশমী আর গোরার দ্বাদশ।
গড়িলেন সুরসিক শুক কৃষ্ণদাস।।

বন্ধুর অদ্ভুত ওই দশা ত্রয়োদশ।
মতিচ্ছন্ন পিয়ালী অশ্রুসিক্তভাব।।

বন্ধুসুন্দর একই সময় ব্রজলীলা ও গৌরলীলা আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীমুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উচ্চারিত নাম আস্বাদন, হৃদয়েব মধ্যে নিতাই-গৌরের আস্বাদন নাম উচ্চারণ। ফলে বালকত্ব, শুদ্ধমাধুর্য পূর্ণ তন্ময়তায় হন বিভোর।।

দেখিবে যেথায় কোন প্রেমমাখা প্রাণ,
জড়বৎ মূর্ছিত ভাব বিভোর
সর্ব অঙ্গ কালিযা করিছে গ্রহণ,
যেমতি কিশোরী হারায় কিশোব।।

এই দশাগুলির আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। তাহার উৎস প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর প্রদত্ত কৃপানুভূতি ও শ্রীশ্রীপ্রভুর লেখনীপ্রসূত ইঙ্গিত বাক্যগুলি।

বিরহী কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ডাকিতেছেন হরে। বিরহিণী ডাকিতেছেন কৃষ্ণ। এইরূপ ডাকাডাকির পরিণতিতে শ্রীরাধার অন্তরে কৃষ্ণ প্রবেশ করেন। বিরহ যত তীব্র, অন্তরে প্রাপ্তি তত প্রগাঢ়। গাঢ়তম মিলনময় মূর্তিই গৌর। গৌরহরি বিরহ-রসেরই অবতার। মিলনটি বিরহদ্বারে।

ঐ সময়ই শ্রীরাধাঠাকুরানীর মুখোচ্চারিত হরেকৃষ্ণ নাম মন্ত্র শ্রীচন্দ্রাবলীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে নিতাইচাঁদ করিযা ফেলিল। এক কৃষ্ণ নামী রূপে রাধার অন্তরে ও নামরূপে চন্দ্রাবলীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিতাইরূপে রূপান্তরিত করিল। নিতাই নামে—নাম প্রচারণে মত্ত হইলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু দশম দশার এই চরম আস্বাদক।

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বাদশ দশা। শ্রীগৌর আছেন নীলাচলে, শ্রীনিতাই আছেন গৌড়দেশে। বিরহী গৌরের ডাক "হরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে।" বিরহী নিতাইর ডাক "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হবে।।" ইহারই চরম পরিণতি। শ্রীশ্রীনিতাইর অন্তরভরা গৌরের প্রকাশ। অন্তরে গৌর বাহিরে নিতাই। নিতাইচাঁদের বিরহে গোরাচাঁদের দশা, কূর্ম দশা, দীর্ঘাকৃতি দশা। এই দশাশ্রিত গৌরের ধ্যানে নিতাই মাঝে গৌরের প্রবেশ। গৌরময় নিতাই। ইনিই হরিপুরুষ।

হরিপুরুষ ত্রয়োদশ দশা আস্বাদন করেন। একই সময় ব্রজলীলা ও গৌরলীলার। শ্রীমুখে ডাকেন কৃষ্ণভাবে রাধাকে হরে। রাধাভাবে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ। আর বন্ধুসুন্দরের বক্ষস্থলে হৃদয় অভ্যন্তরে নিতাই ডাকেন গোরাকে — গৌর ডাকেন নিতাইকে। প্রভুর অন্তরে (নিতাই ডাকেন গৌরকে, গৌর ডাকেন নিতাইকে) গৌরলীলা — বাহিরে কৃষ্ণলীলা। যেন শ্রীবদনে রাধাকৃষ্ণ, হৃদয়ে নিতাই-গৌর। ব্রজ হইতে রাধাকৃষ্ণ হইতে নিতাইগৌরে।

ব্রজলীলা তার স্মরণে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ, এক পাশে রাধা, দক্ষিণে চন্দ্রাবলী, রাধা পাশে ললিতা, চন্দ্রার দক্ষিণে শৈব্যা। এই আস্বাদন হইতে প্রকট গৌর-নিতাই। গৌর নিতাইর রস বুকে ভোগে। এই দুইটি আস্বাদনের স্রোত যেন যুগপৎ।

কখনও রাধাহারা কৃষ্ণময় — কখনও কৃষ্ণহারা রাধাময়। কখনও নিতাই-হারা গৌরময় —

কখনও গৌরহারা নিতাইময়। এই দুই লীলার সমকালীন আস্বাদনই ত্রয়োদশ ভাব। ইহা শুদ্ধ বালকত্ব, শুদ্ধ মাধুর্য ও পূর্ণ তন্ময়তা। পূর্ণ তন্ময়তায় তিনি রাধাকৃষ্ণ নিতাইগৌর একীভূত।

জয় শ্রীসম্পুটশায়ী ত্রয়োদশ দশা সিন্ধু ইন্দু।
জয় ছন্নপ্রাণ প্রাণের হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।।
গুরুগৌরাঙ্গ রাধাশ্যাম সাগর-সঙ্গম।
অনন্তানন্তময় প্রভুবন্ধু চির সুন্দরম্।।

ধীরে ধীরে উদ্বেগ কৃশতা মলিনতা প্রলাপ ব্যাধি দশ দশাগুলি স্পষ্ট লক্ষণ শ্রীদেহে ব্যক্ত হইতেছে। ওদিকে মহানাম কীর্তনের মহারোলে দেশ-বিদেশ গ্রাম পল্লী পাড়া মুখরিত হইতে লাগিল। ঢাকা সহরে দুইটা বিরাট্ ৫৬ মাদলে নগর কীর্তন হইয়াছে। মহানামে টলমল করিতেছে। ভক্তগণ কমলদহ রোডে নূতন আশ্রম করিবে। প্রতিষ্ঠা এই ছন্নমতিকেই করিতে হইবে। ঢাকা গেলাম। ১৭ই ভাদ্র সংবাদ আসিল প্রভু মহাভাব বিহ্বল, পালঙ্ক হইতে ভূমিতলে পতিত। সেবক ঠেকাতে পারে নাই। ছুটিয়া আসিলাম। শ্রীমুখে আহা উহু শব্দ। সকলে বলে উরু বেদনার জন্য—আমি বুঝিলাম জীবদুঃখে। কুঞ্জকে সেদিন কহিয়াছেন 'জীবের জন্য এত কষ্ট!'

পার্শ্বে বসিলাম। তিনটি কথা বলিলাম। ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন। চন্দ্রপাত বুঝিব তো? — পারবে। সূক্ষ্ম-টুক্ষ্ম বুঝি না। স্থূল দেহে 'থাকবে' তো? —থাকবো। চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম সংস্থাপন হবে তো? — 'না করে যাবার জো নাই।'

আশ্বাস পাইয়া ঢাকা সহরে চলিয়া গেলাম। দশা কালে প্রভুকে ঘিরিয়া ভানুনন্দিনীর দশম দশার বিরহ বেদনার গান শুনাইতে হইবে। কেদার কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলাম। প্রভুর রচিত গানের পর গান চলিতে লাগিল। শুনিয়া অঙ্গে কণ্টকের মত পুলক। রক্তের অক্ষরে লেখা নাম। অবিরল অশ্রু বর্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

১লা আশ্বিন ঢাকা কমলদহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে তার বার্তা আসিল প্রভুর শ্রীদেহ নিশ্চল। ছুটিয়া আসিলাম, মশারি তুলিতেই অ্যা শব্দটি করিলেন। মহাচৈতন্যময় পুরুষ জানালেন মহাদশায় স্থির আছেন। পালঙ্কের তলায় পড়িয়া রহিলাম। সহস্র কণ্ঠে মহানাম কীর্তন চলিতেছে শ্রীঅঙ্গন মুখরিত।

চন্দ্রপাতের শেষ গানের শেষে গানের শিরোনাম মহাপ্রলয়ন মহামৃত্যু ধ্যান করিতে থাকিলাম। হঠাৎ ব্যক্ত হইল—

মহাপ্রলয়াঘাত পাপতাপ রাশি, রাহু ধরা শশধরের মত।

আমার ধ্যান ভাঙ্গিল-ভারাক্রান্ত বদনে দাদা কৃষ্ণদাস স্বীয় অঙ্গে ধরি বন্ধুশশী।। রঙ্গ করে ও অধর। সকালবেলা বলিলেন প্রভু বলিয়াছিলেন — ত্রয়োদশ দশা এবার দেখবি। এই সেই মহাদশা নাম ভরসা। ১লা কার্ত্তিক কুঞ্জের হাত ধরিয়া ক্রন্দনমুখী শ্রীঅঙ্গন আসিলাম। ২রা কার্ত্তিক মহানাম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন দুই-তিন জন। দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ের সকল ব্রহ্মচারী ছুটিয়া আসিল। মহানন্দে মহানামযজ্ঞ চলিতে লাগিল। আজও চলিতেছে। সদা মনে জাগিতেছে। দেখিতেছি— দশ তিন দশার সামনে ডুবছিল বন্ধু। ❑

কলাতিয়া গ্রামের শা সাহেব

ঢাকা শহরের মাইল আটেক পশ্চিম দিকে কলাতিয়া গ্রাম। এই গ্রামবাসী নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম.এ.বি.এল. পাশ করিয়া ঢাকা কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কৃপাসান্নিধ্যে পরম ভক্তিমান ও ভাগবত শাস্ত্রবিষয়ক সুবক্তা হইয়াছেন। মহেন্দ্রজী তাঁহাকে ভাগবত শাস্ত্রবিশারদ উপাধি দিয়াছেন। তিনি মহানাম সম্প্রদায়সহ মহেন্দ্রজীকে কলাতিয়া গ্রামে লইয়া যান। কলাতিয়া কীর্তনানন্দে মাতিয়া ওঠে। জগবন্ধু ঘোষ, প্রিয়লাল ঘোষ, বোচাই ঘোষ, অশ্বিনী ঘোষ, রবি ঘোষ, রমেশ, রাধারমণ প্রমুখ সজ্জনগণ মহেন্দ্রজীর একান্ত অনুগত ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন।

কলাতিয়া গ্রামের একটি পাড়া, মুসুরীখোলা, সেখানে বাস করেন শা সাহেব। ইনি নারিন্দার শা সাহেব নামে বিখ্যাত। ঢাকা শহরের নারিন্দা অঞ্চলে একটি আশ্রমের মত বাড়ীতে ইনি অনেকসময় বাস করেন। বয়স ৭০-এর উপরে। নধরকান্তি চিত্তাকর্ষী চেহারা, ধনী বিত্তবান, শুভ্রদাড়িযুক্ত বদন, সুপুরুষ। হিন্দু-মুসলমান একবিন্দু ভেদ নাই তাহার কাছে। পরম ধার্মিক লোক। সর্বদা হাতে তবজী মালা জপ চলিত। অসংখ্য নরনারী প্রত্যহ দর্শনে আসিত। দক্ষিণ হস্ত মালায় আবদ্ধ। বামহস্তে সকলের শিরে পৃষ্ঠে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-অশান্তি যে যে কথা নিবেদন করিত শা সাহেবের একটিই ঔষধ — বলিতেন, "ধূলি নিয়া যাও।" তাহার কথামত ধূলি নিয়া গেলেই উদ্বেগ-অশান্তি দূরীভূর হইত।

বাংলা ১৩২৬ সাল, বর্ষাকাল। কলাতিয়ার প্রিয় ভক্তগণ একদিন মহেন্দ্রজীকে নিবেদন করিলেন মুসুরীখোলায় শা সাহেবকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য। মহেন্দ্রজী রাজী হইলেন। পঁচিশ-ত্রিশজন ভক্ত সঙ্গে তিনি কীর্তনসহ মুসুরীখোলা চলিলেন। ধলেশ্বরী পার হইয়া তিনি ঘনসন্নিবিষ্ট কুশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কীর্তন শা সাহেবের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। তিনি শা সাহেবকে বলিতে বলিয়াছিলেন যে তাহার নাতি কুশের বনে অপেক্ষায় আছে।

কুশের বনের মধ্যে তাহার নাতি আছে শুনিবামাত্র শা সাহেব চৌদ্দ-পনের জন লোকসহ যাত্রা করিলেন। সকলে বলিল ঐ বনে প্রবেশ করিলে কুশের তীক্ষ্ণ ধারে তাহার দেহ কাটিয়া কাটিয়া যাইবে। তিনি কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেগে ছুটিলেন। মহেন্দ্রের সন্নিধানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনের বক্ষেই অশ্রুধারা ছুটিল। শা সাহেব বলিলেন, "নাতি অনেকদিন পর মুখখানা দেখিলাম।" মহেন্দ্রজী বলিলেন, "দাদু অনেকদিন পর তোমার মুখখানি দেখিলাম।" শা সাহেব তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজ গৃহে আনিলেন ও নিজ আসন পার্শ্বে বসাইয়া গয়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহভরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, " নাতি তোমার কী চাই?" নাতি বলিলেন, "একটা জায়গা চাই, একদিন অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন করিব।"

শা সাহেব অনুবর্তীদের আদেশ করিলেন, মসজিদের সম্মুখস্থ জায়গা পরিষ্কার করিয়া দেও। চাঁদোয়া খাটাইয়া মধ্যস্থলে জগদ্বন্ধুর আসন করিয়া দেও। আদেশ পালিত হইল। সন্ধ্যায় আধিবাস-কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনকালে শা সাহেব মহেন্দ্রজীর কণ্ঠ ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিলেন। পরদিন সকাল হইতে কীর্তন আরম্ভ হইল। অখণ্ড কীর্তন পরদিন সকাল পর্যন্ত চলিল। দাদু-নাতি কখনও ছাড়াছাড়ি হইলেন না। অগণিত নরনারী এই দৃশ্য দর্শন করিল। দর্শকগণমধ্যে অধিকাংশেই

মুসলমান। তারা আনন্দে কীর্তন শুনিল। উল্লাসভরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিল, মসজিদ ঘুরিয়া কীর্তন হইল। বিরাটভাবে সারা নগর ঘুরিয়া কীর্তন হইল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক অপূর্ব দৃশ্য প্রকটিত হইল।

এই অপূর্ব ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীমান অবনী ঘোষের মুখে শুনিয়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম। বলিতে বলিতে অবনীর চক্ষু বহুবার সজল হইল। বালিল, ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, আজও অন্তরে জাজ্বল্যমান আছে। অবনী কলাতিয়ার অশ্বিনী ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শা সাহেব বিদায়কালে মহেন্দ্রজীকে বলিলেন, "নাতি, তোমাকে কী দিব?" কী দিব কী দিব বলিতে বলিতে তিনি একটি সাদাবর্ণ গাভী সদ্যপ্রসূত বাছুরীসহ মহেন্দ্রজীকে দান করিলেন। মহেন্দ্রজী উহা লইয়া আসিয়া কলাতিয়ার এক দরিদ্র ভক্তকে পালিতে দিলেন। এই ভক্তটির মিঠাইর দোকান ছিল। গাভীর দুগ্ধে তাহার অবস্থা ভাল হইয়া গেল। মিঠাইর দোকানের উন্নতি হইল। বছরখানেক পরে ঐ গাই-বাছুর আনিবার জন্য বৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী কলাতিয়া গেলেন। কিন্তু গাভীকে কিছুতেই আনিতে পারিলেন না। কিছুদুর আসিয়া গাভী এমনভাবে শুইয়া পড়িল যে তাহাকে একবিন্দুও সরাইবার সাধ্য কাহারও হইল না। শা সাহেব প্রদত্ত গাভীমাতা কলাতিয়ার ভক্তগৃহ ছাড়িয়া কিছুতেই অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। ❑

বন্ধুসুন্দরে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদন

"পঞ্চরূপ এক রূপ নাহি কিছু ভেদ
রস আস্বাদন তরে বিবিধ বিভেদ।"

একটি মধুর রসের মধ্যে পাঁচটি রসের বিদ্যমানতা আছে । তাদের নাম বলা যায় — (১) মধুর শান্ত, (২) মধুর দাস্য, (৩) মধুর সখ্য, (৪) মধুর বাৎসল্য, ও (৫) মধুর মধুর।

শ্রীবাসের দাস্য মধুরেরই দাস্য। গদাধরের সখ্য মধুরেরই সখ্য। অদ্বৈতের বাৎসল্য মধুরেরই বাৎসল্য। নিতাইএর মধুর মধুরেরই মধুর। মধুরের শান্ত স্ফুট হয় না। নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস ইঁহাদের মধ্য দিয়া গৌরসুন্দর মধুর রসটি চারিভাবে আস্বাদন করিতেছেন। মহাপ্রভু এই চারিজনের মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতেছেন মধুর রসের চারিটি বৈচিত্র্যকে। যখন গৌরসুন্দরের পৃথক্‌ভাবে আস্বাদনের স্বাদ জাগে তখনই নিতাই-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস এর মধ্য দিয়া ভোগ করেন। যখন একরূপে আস্বাদনের স্বাদ জাগে তখন একরূপ হইয়া হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে প্রকট হন।

বন্ধুসুন্দরের বক্ষে গৌরসুন্দর। দক্ষিণ অঙ্গে নিতাই সুন্দর। বামাঙ্গে গদাধর। বদনে রাধাকৃষ্ণ। বদনের দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণ, বামে রাধা। এই দুই জনের আস্বাদন 'হরে কৃষ্ণ' নামের মধ্য দিয়া। বক্ষে গৌর-গদাধর আস্বাদন নামের মধ্যে দিয়া। রাধাকৃষ্ণ - গৌরনিতাই-গৌরগদাধর এই তিনের আস্বাদন যখন একই সময় ব্যক্ত হন তখন প্রভুর বদনে ব্রজরস — বক্ষে নদীয়া রস। ❑

অভিনব কীর্তনগান

বাকচরে ভক্তবর মহিম দাসের গৃহে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আছেন। মহিম একটি তৃণাচ্ছাদিত ঘর করিয়াছেন প্রভুর জন্য। সেইটিই তাঁহার মন্দির। এখন বাকচর আসিলেই ঐখানেই থাকেন। একদিন গভীর রাতে প্রভু মহিমকে ডাক দিলেন। এক ডাকেই মহিম আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইল। প্রভু বলিলেন, "কাগজ কলম দেও।" মহিম কাগজ কলম আনিয়া দিয়া আবার নিজ ঘরে গেলেন। প্রভু একটি গান লিখিয়া ফেলিলেন। এত দ্রুত লিখিলেন যেন মনের মধ্যে গানটি তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা কাগজের গায়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

সকালবেলা টহলকীর্তন শেষ করিয়া প্রভুর ভক্তগণ মন্দির-দুয়ারে দাঁড়াইলেন। প্রভু অঙ্গুলি সংকেতে সবাইকে নিকটে ডাকিলেন। সকলেই নিকটে বসিলেন। গতরাত্রে রচিত গানটি প্রভু গোপাল মিত্র মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, সকলে মিলিয়া আস্বাদন কর। মিত্রমহাশয় খানিক আদ্যোপান্ত মনে মনে পাঠ করিয়া হরিচরণ আচার্যকে বলিলেন— "মধুমঙ্গল! তুমি সুব ঠিক করিয়া আগে গান ধর।" হরিচরণ আচার্যকে প্রভু 'মধুমঙ্গল' বলিয়া ডাকিতেন। ভক্তেরা অনেকেই "মধু" বলিত। মধুমঙ্গলেব কণ্ঠটি মধুমাখা ছিল।

মধুমঙ্গল বলিলেন—মিত্র মহাশয়, প্রভু আপনাব হাতে গান দিয়া আপনাকেই গাইতে বলিলেন। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু আমাকে বলেন নাই, বলিয়াছেন 'সকলে মিলিয়া আস্বাদন কর'। আমি তোমাকে নির্দেশ দিতেছি, তুমি সুর-তাল ঠিক করিয়া তোমার মধুকণ্ঠে গানটি আরম্ভ কর। আমরা সকলে তোমার পিছনে আছি।" মধুমঙ্গল আধ মিনিট সময় গানটা পড়িযা সুর ঠিক করিয়া লইলেন। তাহার ইচ্ছা, প্রভুকে প্রণাম করিয়া গান ধরেন। কিন্তু প্রভু বেশ একটু দূরে আছেন। ঘরের কোণে তক্তপোষের এক কোণের দিকে বসিয়া আছেন। মশারিটা ফেলানো আছে। মশারির মধ্যে বসিয়াই কথা বলিতেছেন। মশারির ফাঁক দিয়া অঙ্গচ্ছটা বাহির হওয়াতে অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে। মনে মনে প্রভুপদে প্রণত হইয়া জয় প্রভু বলিয়া মধুমঙ্গল কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

গোপাল মিত্রের দাদা কানাই মিত্র মৃদঙ্গ লইলেন। শ্রীখোলকে প্রণাম করিতেই দেখিলেন মোহন্ত সম্প্রদায়ের শ্রীমন্তের দাদা শশীকান্ত অদূরে দাঁড়াইয়া। শশীকান্ত ভাল মৃদঙ্গবিদ্। তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে মৃদঙ্গ দিয়া বলিলেন, "প্রভুর নূতন গান তুমি বাজাও। তুমি ভাগ্যবান তাই এত সকালে আসিয়াছ।"

"কাঁদে আর রা রা বলে শচীর নিমাই।
ধা বলিতে ঢলে পড়ে বুঝি রে চেতনা নাই।।
বলে, কোথা বৃন্দাবন, মুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন,
আমার, কোথা ব্রজসখা সব কোথা কমলিনী রাই।
কোথা, পিতা নন্দ রাজ, সব গোপের সমাজ,
কোথা, উপানন্দ তাত কোথা যশোমতী মাই।।
বলে, কোথা-রে শ্রীদাম, কিঙ্কিণী সুদাম,
আমার, সুবল মঙ্গ[illegible]া রে দাদা বলাই।
কোথা, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম কতদূর,

কোথা, যাবট যমুনাতট ধবলী শ্যামলী গাই।।
কোথা, গিরি গোবৰ্দ্ধন, সাধের কুসুম কানন,
আমার, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথা গেলে দেখতে পাই।
ওহে নবদ্বীপচাঁদ, আর ক'রো না বিষাদ,
জগদ্বন্ধু বলে খত লিখিলে ধার শোধিতে এলে তাই।।"

গানে যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যাইবে না। সত্য সত্যই অবর্ণনীয়। গানের পদ উচ্চারণ করিতে করিতে সকলেই অঝোরে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। কাঁচা ঘর, সকলের নয়নধারায় সত্য সত্যই কর্দমাক্ত হইয়া গেল। বাকচরের সকল শ্রেষ্ঠ গায়করা সকলেই যোগদান করিয়াছেন। সকলেরই কণ্ঠ উচ্চ ও সুমধুর। প্রত্যেকেরই অন্তর ভাবপূর্ণ। গান যখন শেষ হইল সকলেই ভাবাবিষ্ট, স্তব্ধ।

কতক্ষণ পরে মিত্র মহাশয় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "প্রভু এরূপ গান আর লিখেন নাই। একই সঙ্গে ব্রজলীলা গৌরলীলা দুই লীলার আস্বাদন। গৌরসুন্দর আর্তির মাধ্যমে ব্রজের সবকটি রসের আস্বাদন করছেন। পিতামাতাকে, সখাগণকে ও গোপীসহ রাই কমলিনীকে খুঁজিতেছেন। দুইটি লীলারসে সকলে ভরপুর। বিরহের গভীরতায় সকলে চরম ব্যাকুল। একখানি কীর্তন শেষ হইতে আড়াই ঘণ্টা লাগিল। আনন্দের চমৎকারিতার মধ্যে কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলেই তন্ময়। প্রভু ঘরের কোণে একটি ছোটো খাটে মশারি ঢাকা দিয়া বসিয়াছিলেন।

কীর্তনকালে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের যে অবস্থা পরিবর্তন তাহা প্রায় সকলেই মশারির ফাঁক দিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। সাত্ত্বিক বিকারগুলিকে প্রভু চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও বাধা মানে নাই। একটি ভক্ত একখানি তালপাখা লইয়া মশারির বাহিরে বাতাস করিতেছিলেন। প্রভুর ভাব-বিহ্বলতা দর্শনে পাখা হস্তে ভক্তটির স্তম্ভের মত অবস্থা হইতেছিল। ছোট একটি ঘরের মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশজন ভক্তসহ শ্রীশ্রীপ্রভুর যে একটি আশ্চর্য অবস্থা হইয়াছিল তাহা অনাস্বাদিতপূর্ব।

যখন সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠি উঠি ভাবিতেছেন তখন অতি ধীরে মধুমঙ্গল কহিলেন প্রভুকে শুনাইয়া মিত্র মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া। এই কীর্তন গানটির মধ্যে ব্রজের লীলা-পর্যদদের দর্শনের জন্য গৌরাঙ্গসুন্দরের তীব্র আর্তি — এইসব কথা তো কোন গ্রন্থে পাই নাই! প্রভুর নির্দেশে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ দু'টি পাঠ করি। নবদ্বীপ দাদা আসিলে কঠিন স্থানগুলি তাঁহার কাছে-বুঝিয়া লই। এই দুই গ্রন্থে গৌরহরির ঐ প্রকার আর্তির তীব্রতা দেখিতে পাই নাই। রাধাভাবে শ্রীগোবিন্দের জন্যই যত বিরহময় বেদনার কথা শ্রীচরিতামৃতে অতি নিপুণভাবে বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রিয়জন পিতা-মাতা, সখা-সখী, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, ধবলী-শ্যামলীর জন্য বিশেষ কোন আর্তি দেখি নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তো নিতাইচাঁদের কথায় ডুবিয়া গিয়া মহাপ্রভুর শেষলীলা বলিতেই পারেন নাই।

আজ ওই অপূর্ব গানটিতে যেরূপ গৌরহরির প্রাণস্পর্শী আর্তির কথা গান করিলাম সেইরূপ কোন গ্রন্থে কোথাও দেখি নাই।

মধুমঙ্গলের কথায় মিত্র মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। কেহ কিছু

বলিলেন না। প্রভু বন্ধুসুন্দরও মশারির মধ্য হইতে কিছু বলিলেন না। মধুমঙ্গল তখন নিজে নিজেই আবার বলিলেন — আমার মনে হ'ল এই সব প্রভুর নিজ অনুভবের কথা। আপনি ব্রজে গিয়া গৌরহরি ভাবাবিষ্ট হইয়া যেভাবে সদা মগ্ন থাকেন তাহারই কিঞ্চিৎ এই গানে ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে অন্য গানে লিখিয়াছেন — 'গোরা রা রা রা রা রা রা বলে, ধা বলিতে পড়ে ঢলে।" এই অবস্থা ও প্রাচীন গ্রন্থে দেখি না। রাধা বলিতে এত বিহ্বলতা প্রভুর মধ্যে দেখি, আর কোথাও দেখি নাই, শুনিও নাই।

বন্ধুসুন্দর যে খাটখানির উপর বসিয়াছিলেন তার মশারিটার পার্শ্বে একটা ফুলের মালা ছিল। প্রভু সেই মালাটাকে শ্রীহস্তে নিয়া গুটাইয়া গোল বলের মত করিয়া মধুমঙ্গলের গায়ে ছুড়িয়া দিলেন। যেন রাগ করিয়া একটা ঢিল ছুড়িলেন। সকলেই আসিয়া মালাটা স্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইল ওটা প্রভুর আশীর্বাদ। আজিকার কীর্তনের আনন্দ প্রকাশ। কেহ কেহ বুঝিল ওটা প্রভুর সম্মতিজ্ঞাপন। মধুমঙ্গল যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। এই সম্মতি জানানোই ঐ মালা ছুড়িবার তাৎপর্য। গোপাল মিত্র 'মধুমঙ্গল' হরিচরণকে বুকের মধ্যে সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন। নবকুমার আবার দুইজনকে একবারেই জড়াইয়া ধরিলেন। ❑

'ম - ম'

('মতিচ্ছন্ন' শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী)

মহেন্দ্রজীর রচিত একটি গানে আছে বন্ধুসুন্দরের তত্ত্ব বর্ণনা, 'এবার একাধারে পাঁচ ফুলের সাজি'। এই পদের অর্থ জানিতে চাহিলে বলিলেন, ঐ গানেই আছে —

"কনক কেতকী কুসুম গৌর,
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাস ঠাকুর" — ইত্যাদি।

কে কোথায় কীভাবে আছেন, দুই লীলার সম্মিলন কী করিয়া হইল জানিতে আমি আগ্রহ প্রকাশ করিলে অতি সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিলেন, পরে আমি তাঁহাকে তাঁহার কথাই কবিতা করিয়া দেখাইলাম —

"দুই গালে লালালালী
উরে গৌরহরি,
দখিণে বামে নিতাই গদাই
জড়াজড়ি ধরি।
কোরেতে শ্রীবাসচন্দ্র
সীতাপতি পাশ,
পাঁচ ফুলের সাজি হেরি
ম-ম মহোল্লাস॥"

অপর একদিন পাদমূলে বসিয়া বলিলাম, 'আমার এই কবিতার ম-ম অর্থ কিন্তু আমার নয়,

আপনার। বলিলেন, তা কী করে হ'ল? উত্তর দিলাম, 'ম-ম' অর্থ মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রের। আপনি নিজেও তো এইরূপ সংক্ষেপ করিয়া নিজ নাম লিখিয়াছেন। 'কোথায় লিখেছি বল দেখি?' জিজ্ঞাসায় বলিলাম, এই যে আপনার মধুর গান —

"আমাদের সে হলদে পাখী ধরা পড়েছে,
গম্ভীরার গুপ্ত কেলি প্রকাশ হয়েছে।
রা রা ধা ধা বুলি সেধে পাখী কত যুগ যুগ ধরি.
হেসে কেঁদে নেচে বেড়াত সোনার নদীয়া ভরি।
তাঁর লোমকূপে কোটি কোটি এবে জ্ঞান পেয়েছে,
যাঁরে চারমুখো পাঁচমুখো ব্যাধ ফাঁদে ধরতে মানল হারি,
সেই অধর রসের রসে রসিয়া আজ নিঝুমে পড়ি।
ম-ম মনুয়ার রাজা পায়ের অমিয় ঝির ঝির ঝির ঝরিছে॥"

'এইখানে ম-ম অর্থ কি মতিচ্ছন্ন নয়?' অতি আদরে আমায় বুকে টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুই গুরুমুখ"। আমি অর্থ বুঝিলাম — তিনি আমাদের গুরু, আমি তাঁহার মুখস্বরূপ। এই নতুন নামকরণে কোন গর্ব আসিল না। কারণ, জানিতাম যাহা ভাবি লিখি বলি — সবই তাঁহার শ্রীমুখের কথা। তিনি বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিলে যে কি সুখ হইত তাহা বলিবার নয়। বিশাল তাঁহার বক্ষের স্পর্শের মধ্যে যে কি একটা অমৃত ছিল তাহা যে না পাইয়াছে সে কখনও জানিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে যেমন একটা অপ্রাকৃত গন্ধ ছিল, তাহা সারা আঙ্গিনা ভরিয়া থাকিত। শ্রীগুরুদেবেরও অঙ্গে ঐরূপ একটা গন্ধ ছিল। তাহা শ্রীদেহের নিকটে গেলে অনুভব করা যাইত।

অপর এক সময় কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলাম, 'পাঁচটা ফুল তো হইল কিন্তু ফুলের সাজি বলিলেন কেন?' উত্তরে লিখিলেন, 'প্রত্যেকটির মধ্যে আবার পাঁচটি করিয়া ফুল আছে। প্রভুর শ্রীহরিকথা গ্রন্থের প্রকট রহস্য পাঠ করিতে বলিলেন। উহা পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি আমার ভাষায় একটা ছড়া লিখিয়া পাঠাইলাম —

'ললিতিকা বৃন্দা কুন্দ সহ রাই কানু।
পাঁচ মিলি নদীয়াতে হল শচীসুনু॥
লক্ষ্মী সরস্বতী মঞ্জু শৈব্যা চন্দ্রাবলী।
পাঁচে মিলি প্রেমদাতা নিত্যানন্দ বলী॥
রজঃরানী পৌর্ণমাসী প্রেমমঞ্জরী।
বনদেবী বিশাখা অদ্বৈত রূপ ধরি॥
যমুনা মুরলী ধরা মাধবী মালতী।
শ্রীবাসচন্দ্র প্রকটিত সদা শুদ্ধমতি॥

তুঙ্গবিদ্যা শ্যামা সখী শ্রীরূপমঞ্জরী।
গদাধরে প্রকটিত সঙ্গে শুকসারী।।"

আমার ছড়া কবিতায় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। 'চন্দ্রপাত-মাধুর্য বিন্দু' নামকরণ করিয়া তিনি একটি তত্ত্বগর্ভ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে আমি তাহার ভাষ্য লিখি। নিজেই নাম দেন 'মধুভাষ্য' এবং নিজেই চেষ্টা করিয়া ভক্তবর প্রমথনাথ ঘোষের প্রেসে তাঁহারই অর্থ সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। মহামৃত্যুরঙ্গ নামে আর একটি রসাল কবিতা রচনা করেন। তারও 'মধুভাষ্য' লিখি। আগ্রহ করিয়া নিজেই তাহা ছাপান। আমি তখন আমেরিকায়। অতি আদরে একখানি পঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি আমেরিকা হইতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া পাঠাই। যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁহার আদেশে "ব্রহ্মচর্য তত্ত্বজ্যোতিঃ" নাম দিয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখি। প্রকাশকালে কৃপাশীর্বাদ চাহিয়া পাঠাই। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন হইতে পত্রে সেই আশীর্বাদ পাঠান —

কৃপাশীর্বাদ

২রা আষাঢ়, ১৩৩৮

স্নেহধন।

"মণি মণি মণি ব্রহ্মচর্য্য হৃদয়মণি
এ মণি যে দেহে নাই সে প্রাণ বৃথা গণি॥" ❑

সম্পুটশায়ী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের নবগম্ভীরাস্থলী ঘূর্ণী শ্রীশ্রীমহেন্দ্র-বন্ধু অঙ্গন

বিবিধ

আচার্যের বাণী (১)

(আচার্য শ্রীমন্‌মহানামব্রতজীর সর্বজনীন উপদেশামৃত)

১। মানব জীবনের পরিপূর্ণতা মনুষ্যত্বলাভে। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পাঁচটি গুণ অর্জন করিতে হইবে। অহিংসা, অচৌর্য, শুচিতা, সংযম ও সত্য। কাহাকেও হিংসা করিবে না। কাহারও দ্রব্য চুরি করিবে না। দেহ ও মন পবিত্র রাখিবে। নৈতিক চরিত্রে সংযম থাকিবে। কার্যে ও বাক্যে কখনও অসত্যতার স্পর্শ থাকিবে না। মানুষ হিসাবে সকল মানুষের এই একটি ধর্ম—মনুষ্যত্বলাভ। এই কথাটিই প্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দর সূত্রাকারে কহিয়াছেন।

"এই মর্ম—এক ধর্ম"।

প্রত্যেকেই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মানুষ হইবে, অপরের মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক হইবে। ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সেবা।

২। মনুষ্যত্ব লাভের পর আসিবে ভাগবত-জীবন। নিখিল বিশ্বের মূলে একটি বিরাট্ শক্তি আছে। সেই শক্তি চৈতন্যময় করুণাময়। তাঁহার সঙ্গে যুক্ততায় জীবের আনন্দময়তা। সেই পরম তত্ত্ব বস্তুর সহিত যোগসূত্র রাখিয়া চলিতে হইবে। ইহার নাম ভাগবত-জীবন।

৩। ভাগবত-জীবন লাভ হইলে মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে ও মানবপ্রেমে ভরপুর হয়। এই ভূমিতে পৌছানোই জীবনের চরমতা। এই জীবন লাভ হইলে তাহার ব্রত হয় মহাউদ্ধারণ, বিশ্বের কল্যাণ সাধন। প্রভু বন্ধুসুন্দরের বাণী—

"মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা দয়া ধর্ম দান উদ্ধার বিধান।।
(সবে হরিনাম দান) (এই কল্যাণ বিধান)"

৪। সংসারে সকল কার্যই ঈশ্বরসেবা বুদ্ধিতে করিতে হয়।*জীবনের সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাই তাঁহার দান মনে করিতে হয়।

৫। জন্মহেতু মানুষে মানুষে কোন ভেদ আছে ইহা অসত্য। গুণ ও কর্মানুসারেই মানুষের শ্রেষ্ঠতা বা হীনতা। জাতিভেদ মানা ও কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করা মনুষ্যত্বনাশক কুসংস্কার।

** 'মহানাম মণিমঞ্জুষা', মহানাম সেবক সংঘ প্রকাশিত শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন প্রতিষ্ঠা স্মরণিকা। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮২ সম্পাদনা : শ্রীমদ্‌বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীর কুমাব সেনগুপ্ত, শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীঅশোক সাহা।*

৬। তোমার কথায় বা কার্যে কেহ যেন দুঃখ না পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। কাহারও কোন বেদনার কারণ হইলে তজ্জন্য নিজেকে অপরাধী জানিয়া ক্ষমার্থী হইবে। নিজেকে অপরাধী বুঝিয়াও ক্ষমাপ্রার্থী না হইলে কখনও আত্মিক উন্নতি লাভ হয় না।

৭। কোনও সম্প্রদায়ের কাহারও নিন্দা চর্চা করিবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তি একটি বিরাট্ বিশ্বযজ্ঞের অংশ সাধন করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস করিবে। একই বৃক্ষের ফুলে গন্ধ, পাতায় তিক্ততা—কিন্তু বৃক্ষ একটিই। বিভিন্নতা বিশ্বের বৈচিত্র্য। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিবে।

৮। তোমরা সকলে আমার, আমি তোমাদের সকলের—শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর এই মহাবাণী সতত স্মরণে রাখিবে।

৯। আহার-বিহারে সংযমী হইবে। পিতামাতা সত্ত্বগুণান্বিত ও ঈশ্বরোন্মুখী হইলে সুসন্তানের জন্ম হয়। সন্তান আসিবে ঘটনাচক্রে নহে; ভগবচ্চরণে কাতর প্রার্থনায়। এই কথা কখনও ভুলিবে না।

আচার্যের বাণী (২)

(আচার্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ)

১। নিখিল বিশ্বের যিনি মূল সত্তা, বেদ তাহার নাম দিয়াছেন পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গজ্যোতি তিনি শ্যামসুন্দর। স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সহিত একীভূত হইয়া তিনি গৌরসুন্দর। আনন্দশক্তি শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে একীভূত হইয়া তিনি বন্ধুসুন্দর। এই লীলামাধুর্য নিত্য আরাধনার।

২। ভজনের অঙ্গ পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত শ্রবণ, মথুরা বাস ও শ্রীমুর্তি সেবা।

(ক) সাধুসঙ্গ—স্বজাতীয় সজ্জনের সঙ্গ বিধেয়। অসৎসঙ্গ কদাপি করিবে না। যিনি ভগবদ্ভক্ত নহেন, যিনি অন্যের ক্ষতি করেন তিনি অসৎ।

(খ) কৃষ্ণসেবা—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরহরি ও শ্রীবন্ধুহরি মানুষের মধ্যে আসিয়া যে সব লীলা করিয়াছেন, মানসে তৎ তৎ চিন্তা কৃষ্ণসেবা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্মরণ-মঙ্গল, শ্রীশ্রীগৌর-স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থ এই চিন্তার সহায়ক হইবে।

(গ) ভাগবত শ্রবণ—নিত্য নিয়ম করিয়া কিছু সময় লীলাগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করা উচিত।

(ঘ) মথুরাবাস—শ্রীহরির কোন পবিত্র লীলাক্ষেত্রে রহিয়া লীলা দর্শন করিতেছ এইরূপ চিন্তা মানসে করিবে, ইহাই মানসে মথুরাবাস।

(ঙ) শ্রীমূর্তিসেবা—গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভাবনা করিবে। নিত্য স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে শুদ্ধ মনে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করিবে। শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে—প্রসাদী তুলসী বক্ষে দিয়া। প্রসাদান্ন গুরুকে নিবেদন করিয়া।

৩। **নামজপ**—সকল অবস্থায় সকল সময় জপ করা যায়। অবকাশ পাইলেই তাহা নষ্ট না করিয়া জপ করিবে। জপকালে জপ্য অক্ষরের অর্থ তাৎপর্য চিন্তা করিবে। এই অর্থ তাৎপর্য গুরুমুখে শুনিয়া লইবে। ইষ্ট কথা ভিন্ন অন্য কথাই ব্যর্থ। ব্যর্থ চিন্তা ব্যর্থ কথা পরিহার করিবে। আরাধ্য দেবতার রূপ-গুণ-লীলা চিন্তনীয়।

৪। অরুণোদয়ে শয্যাত্যাগ। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান সর্বপ্রকার ব্যাধিনাশক। শয্যাত্যাগ করিয়া প্রভুর জাগরণ মঙ্গলারতি প্রভৃতি গান করিবে অথবা আবৃত্তি করিবে। দিনে যে-কোন সময় একবার 'চন্দ্রপাত' আবৃত্তি করিবে। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ জপ-স্মরণানন্দে থাকিবে।

৫। নিত্য স্নানান্তে দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিবে। দ্বাদশ অঙ্গ নাম উচ্চারণপূর্বক শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। কণ্ঠে তুলসী ধারণে দেহ মন পবিত্র থাকে। তিলককণ্ঠী সর্বদাই অঙ্গে থাকিবে।

৬। একাদশীব্রত বৈষ্ণবমতে নিয়মিত পালনীয়। একাদশীতে অন্ন গম যব মুগ মাষ তিল এই সব বর্জনীয়। মদ্য মাংস মৎস্য তামাক সিগারেট পান পেঁয়াজ রসুন চিরবর্জনীয়।

৭। সদাচারসম্পন্ন হইবে। সকল আহার্য দ্রব্য শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া গ্রহণ করিবে। অনিবেদিত গ্রহণ নিষেধ।

৮। আরাধ্য দেবতাকে প্রত্যহ অন্নভোগ দেওয়া উচিত। অপারগ ব্যক্তি মাত্র দ্বাদশীর দিন অন্নভোগ দিবে। অন্য দিন ফলজল দিবে। জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা, বন্ধুনবমী অবশ্য পালনীয়। এসব দিন আহার-বিহারে সংযম অবলম্বন পূর্বক লীলা স্মরণে থাকা কর্তব্য।

৯। পুরুষ নারীর মেলামেশায় স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবে। মেয়েদের পুরুষসম্বন্ধে ভ্রাতৃভাব। পুরুষদের মেয়েদের সম্বন্ধে মাতৃভাব জাগ্রত রাখিবে।

১০। প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ একদিন ভক্তসম্মেলনে ইষ্টগোষ্ঠী হওয়া উচিত। মাসিক সম্মেলনে প্রত্যেক ভক্ত উপস্থিত হউক—ইহা একান্ত ভাবেই কাম্য।

১১। কয়েকটি বিশ্বাস অটুট রাখিবে—

(ক) হরিনাম মহানাম মহাশক্তিধর।

(খ) গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় সকলই সম্ভব।

(গ) এই দুঃখতাপভরা বসুন্ধরা একদিন অমৃতময় হইবেই।

(ঘ) মহাউদ্ধারণ লীলা উদ্‌যাপিত হইবেই। জগতে শান্তি আসিবেই।

(ঙ) প্রতেক মানুষের মধ্যেই নারায়ণ আছেন। সে মূলতঃ সৎ। তার অসাধুতা মায়ার আবরণ হেতু। মহৎকৃপায় ও শিক্ষায় যে-কোন প্রকারের অসাধুতা দূরীভূত হইতে পারে। ❑

আমেরিকার পত্র

ধবল-মুখ পর্বত হইতে নামিয়া আসিয়া কিছু দিন বোস্টনে কাটাই, তারপর নিউ- ইয়র্ক চলিয়া আসি। কিছু দিন হইলে একটি সমিতি হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া সেখানে যাই। এই সমিতির নাম "The National Council on Religion in Higher Education" অনুবাদ করিলে এই রূপ বলা যায়—"উচ্চ শিক্ষায় ধর্মতত্ত্ব ব্যবস্থাপক জাতীয় সঙ্ঘ।" এই সঙ্ঘের সভা হইতে গেলে 'Doctor of Philosophy' হওয়া চাই। যাঁহারা পি.- এইচ. ডি. ডিগ্রী পাইয়াছেন বা পাব পাব এইরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন কেবল তাঁহারাই ইহার সভ্য। আমি চেষ্টার ইউনিভার্সিটি ও এ্যান আরবর ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছি। ঐ সকল স্থানের অনেক অধ্যাপক উক্ত সমিতির সভ্য। তাঁহাদের দরুনই আমি ঐ সভা হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি নতুবা কোনপ্রকার চেষ্টা দ্বারা উহা সম্ভব হইয়া উঠিত না। সভাতে ৭০/৭৫ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভার অধিবেশন হইয়াছিল নিউইয়র্ক স্টেটের অন্তর্ভুক্ত কিউবা পার্ক নামক একটি ছোট শহরে। আমি নিউইয়র্ক হইতে হাডসন নদীর খেয়া পার হইয়া হোবোকেন নামক একটি স্থান হইতে ট্রেনে চাপি। নিউইয়র্ক শহর একটি দ্বীপ বিশেষ ইহার চারিদিকেই জল, দুই দিকে সমুদ্র ও অপর দুই দিকে হাডসন নদী ও ইস্ট নদী। নিউইয়র্ক হইতে কোথাও যাইতে হইলে, জল পার হইতে হয়। হাডসন নদীর উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজের অগণিত খেয়া আছে; আবার ঐ সকল নদীর নীচে বহু সংখ্যক সুড়ঙ্গও আছে। তাহাতে বাস যাতায়াত করে। হয় বাসে সুড়ঙ্গ দিয়া, নয় জাহাজে খেয়া দিয়া নদীর ওপারে যাইতে হয়। হোবোকেন হইতে বেলা ১১টায় ট্রেনে চাপিয়া প্রায় ছ'টার সময় বাথ নামক একটি স্থানে পৌঁছি। সেখান হইতে বাসযোগে আমাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। কিন্তু ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি, বাস চলিয়া গিয়াছে। ট্রেন কয় মিনিট বিলম্বে পৌঁছিবার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আমি বাস ফেল করিলাম। শুনিলাম সে রাত্রে আর বাস নাই। এই মুহূর্তে কী যে করিব ঠিক করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ট্রেন ছাড়িয়া যাইবার কয়েক নিমিট মধ্যেই স্টেশনে ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল—তখন দেখিলাম, আমি একা নই—আমার মত আরও তিনজন লোক নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আলাপে বুঝিলাম, আমরা সকলে একই স্থানে একই সভা উপলক্ষে যাইতেছি। কাজেই ৪ জন মিলিয়া এক ট্যাক্সি করিয়া চলিলাম। গন্তব্যস্থান 'কিউবা' পার্ক তখন আঠার মাইল দূরে। 'কিউবা' শব্দটার ইতিহাস-ভূগোল কিছু বলি।

কিউবা একটি হ্রদের নাম। এই নামটা ইংরেজী শব্দ নহে—এতদ্দেশীয় তথাকথিত আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ভাষা। ইউরোপ হইতে শ্বেতাঙ্গ জাতি এই দেশ আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব হইতে রক্তাঙ্গ এক জাতীয় লোক এখানে বাস করিত, তাহাদের সভ্যতা বেশ উচ্চাঙ্গের ছিল। শ্বেতাঙ্গ জাতি রক্তাঙ্গকে একরূপ তাড়াইয়া দিয়াছে বলিলেও চলে, মাঝে ক্বচিৎ দুই-চারটি দেখা যায়। আমার পরিভ্রমণকালে রক্তাঙ্গদের একটি স্কুল আমি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। এখানকার অনেক নদ-নদীর নামকরণ ঐ রক্তাঙ্গ জাতিই পূর্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিল। মানুষগুলিকে দূর করিয়া দিলেও নামগুলিকে ইহারা একেবারে দূর করিয়া দেয় নাই। 'কিউবা' আমেরিকান

** 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমেরিকার পত্র' নামে প্রকাশিত। ১২-১১-১৯৩৮'*

ইণ্ডিয়ান বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেওয়া একটি ক্ষুদ্র হ্রদের নাম। আমেরিকাতে পাঁচটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, তাহাদিগকে বলে 'গ্রেট লেক'। আমি ঐ বড় হ্রদের চারিটা দেখিয়াছি। শিকাগো শহরে আমি মিসিগন্ হ্রদের কিনারেই থাকিতাম। তাছাড়া, অণ্টারীও, ইরীও, সুপিরিয়র এই তিনটা বড় হ্রদও আমি দেখিয়াছি, কেবল হুড়ন হ্রদ এখন পর্যন্ত দেখি নাই। এই বড় হ্রদগুলি খুব কাছাকাছি। ইহার প্রত্যেকটিই অতি প্রকাণ্ড—ঠিক সমুদ্রের মত—তবে জল লবণাক্ত নহে, অতি সুস্বাদু। এই গ্রেট লেক পাঁচটি ছাড়া নিউইয়র্ক স্টেটের উত্তরাংশে ছোট ছোট আরও পাঁচটি লেক বা হ্রদ আছে, উহারা এত কাছাকাছি ও উহাদের আকৃতি এরূপ লম্বা লম্বা যে, মানচিত্রে দেখিলে উহা দিগকে পাঁচটি আঙুলের মত মনে হয়—এইজন্য উহাদিগকে 'Finger Lake' বা আঙুল হ্রদ বলে। 'কিউবা' এই আঙুল-হ্রদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি। এই 'কনিষ্ঠাঙ্গুলি' কথাটা বলিবার জন্যই ঐ সব বড় বড় হ্রদের নামের অবতারণা করিলাম—ধান ভানিতে গাজী গাহিলাম মনে করিবেন না। এই কনিষ্ঠাঙ্গুলি কিউবা হ্রদের তীর ধরিয়া আমরা ট্যাক্সিতে চলিতে লাগিলাম। কনিষ্ঠাঙ্গুলি বেশী প্রশস্ত নহে, তবে ইহার দৈর্ঘ্য মানচিত্র দেখিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা হইতে অনেক বেশী। যাহা হউক এই গেল হ্রদের ইতিহাস-ভূগোল। ঐ হ্রদের তীরে হ্রদের সঙ্গে একই নামধারী একটি কলেজ অবস্থিত। এই কিউবা কলেজেই আমাদের সভার অধিবেশন হইবে। কলেজটি বেশ বড়। যদিও ছাত্রসংখ্যা পাঁচ-ছয় শতের অধিক নহে, তথাপি আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম, দালান-কোঠা, মাঠঘাট, লাইব্রেরী, বাগান প্রভৃতিতে আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হাসাইয়া দিতে পারে। এতদ্দেশীয় হাই-স্কুলগুলি আমাদের দেশের কলেজের চেয়েও বড়। এখানকার বড় বড় কলেজগুলি আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী জাঁক-জমকপূর্ণ। এই সময় গ্রীষ্মাবকাশবশতঃ কলেজ বন্ধ ছিল। ছাত্রদের থাকিবার ঘরে আমাদের থাকার স্থান হইল। আমরা যাহাকে হোস্টেল বলি, ইহারা তাহাকে 'ডরমিটারী' বলে। ডরমিটারীতে আমরা থাকিলাম। সভা এক সপ্তাহব্যাপী চলিবে। প্রথম দিন কেবল সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হইল। এই সভার সভ্যগণ অধিকাংশই ধর্ম বা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ধর্মের অধ্যাপক কথাটা হয়ত বা বুঝিতে পারিবেন না—কারণ আমাদের দেশের স্কুল বা কলেজে ধর্মশিক্ষার কোন বিভাগ নাই। এদেশের ছেলেরা পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সানডে-স্কুলে বাইবেল পড়া আরম্ভ করে। প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে Religion বা ধর্মের একটা বিভাগ আছে। ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছাড়া এই সভায় সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকও অনেক আছেন। এদেশে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শাস্ত্রটিরও একটি বিভাগ আছে। আমাদের দেশীয় বিদ্যালয়ে উহা নাই বলিলেই চলে। Economies বা অর্থশাস্ত্রের বিভাগে সমাজ-বিভাগের একটু গন্ধ আছে মাত্র। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছি—অর্থাৎ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি আমেরিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই একটি বিভাগের জন্যই সেখানে অন্তত কুড়িজন অধ্যাপক আছেন। এদেশের জ্ঞানতৃষ্ণা ও গবেষণা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। অধ্যাপকগণ অনেকেই নিজ নিজ স্ত্রী ও ছোট ছোট পুত্র-কন্যা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এখানে এইপ্রকার সভা-সমিতি উপলক্ষে মানুষ-জন জড় হইলে একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় করিয়া দেওয়া, সভার একটি মুখ্য অঙ্গরূপে গণ্য হয়। আমাদের উৎসবে বা সভা-সমিতিতে যখন লোকজন

সমবেত হয় তখন কে কাহাকে চিনিল বা না চিনিল, তাহা বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করি না। ইহা আমাদের গুণ নহে। ইহারা সেব-সব বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আমরা সাধারণত মানুষের সঙ্গে গায় পড়িয়া আলাপ করি ও নাম জানিবার পূর্বেই দাদা বলিয়া ডাকিয়া লই। এ দেশে এমনও হয় যে, দুইজন লোক পাশাপাশি পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলেও একজন আর একজনের সঙ্গে গায় পড়িয়া আলাপ করিবে না। যদি ভাগ্যক্রমে একজন তৃতীয় পক্ষ আসিয়া একজনের কাছে আর একজনকে পরিচয় করাইয়া দেয় তবেই আলাপ আরম্ভ হইতে পারে। সে আলাপও আবার গণ্ডীবদ্ধ—অর্থাৎ যেসব বিষয় ব্যক্তিগত তাহা জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কি নাম, ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু কি চাকুরী করেন, ইহা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে হয় তারপর কত টাকা বেতন পান—এ কথা তো কোনক্রমেই জিজ্ঞাসা করা যায় না। এমতাবস্থায় যেখানে ৭০/৮০ জন লোক একত্রিত হইয়া সপ্তাহ ধরিয়া থাকিতে হইবে, সেখানে ভালভাবে জানাশুনা করাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকাই দরকার। তবে এই যে সভায় আমি গেলাম, এখানে দেখিলাম—সভ্যগণ প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভালভাবে জানে। প্রত্যেক বৎসরই ইহারা মিলিত হয়। প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে প্রথম নাম ধরিয়া ডাকে। প্রথম নাম ধরিয়া ডাকার অর্থ হইল ঘনিষ্ঠতা থাকা। আমরা যেমন কোন অপরিচিত লোককে জানিলে প্রথমে তাহাকে দাস মহাশয় বা বিশ্বাস মহাশয় বলি; তারপর ঘনিষ্ঠ হইলে—বকুবাবু বলি; তারপর আরও আত্মীয় বোধ হইলে—বকুদা বলি; এদেশেও তেমনি। আমি মিষ্টার প্রপসনকে প্রথমে মিঃ প্রপসন বলিতাম—তারপর 'কার্ল' বলিতাম—উহাই তাঁহার প্রথম নাম। তিনিও আমাকে প্রথমে 'ব্রহ্মচারী' বলিতেন, তারপর মহানাম বলিয়া ডাকিতেন। এই সভার সভ্যগণের মধ্যে এইরূপ আশাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমি বিশেষ সুখী হইলাম। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গাঢ় হইলে তাহাতে একটি অপূর্ব আনন্দ আছে। ইহা হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের জীবন নিতান্ত শোচনীয়।

এইবার সভার আলোচ্য বিষয়ের কথা কিছু লিখি। প্রথমত সভা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি দল গঠিত হইল। একদল ধর্মশাস্ত্র, একদল দর্শনশাস্ত্র, আর একদল সমাজবিজ্ঞান। আমি ধর্মশাস্ত্রদল হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কাজেই ঐ দলে থাকিয়া গেলাম—তবে দার্শনিকদলে যাইবার জন্য একটি বাসনা থাকিয়া গেল। প্রত্যহ সকালবেলা তিনদলের পৃথক পৃথক বৈঠক হইত। সন্ধ্যার পরে সকল দল একত্র হইয়া একটি সভা করিত। ধর্মের সভায় ২০/২২ জন লোক ছিলেন। আলোচ্য বিষয় হইল— "The concept of man" অনুবাদ করিলে—মানুষের তত্ত্ব—আমাদের বৈষ্ণব ভাষায় বলিলে "জীবের স্বরূপ"। ছয় দিন ধরিয়া ঐ একটি বিষয়ই আলোচনা হইল। প্রথম দিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অর্ট্রি জড়বাদ বা প্রকৃতিবাদ-এর পক্ষ হইতে মানুষের স্বরূপ কি—তাহা বলেন। তৎপর দিন এ্যান আরবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মর্গান (ইনি কিছু দিন কলিকাতায় গিয়া বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে বাস করিয়াছেন)—হিন্দুধর্মের মতে মানবের স্বরূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিন ডক্টর রাওয়েল (শ্রীমতী রাওয়েল, ইনি কিছুদিন জাপানে গিয়া কোন বৌদ্ধ মঠে বাস করিয়াছেন)—বৌদ্ধধর্ম মতে জীবের স্বরূপ কী—সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর একদিন কার্লমার্কস-এর দর্শন—যাহার উপরে তথাকথিত

সাম্যবাদ বা রুশিয়ার কম্যুনিজম স্থাপিত, তাঁহার মতে মানুষের স্বরূপ কী—তাহা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর ডগলাস আলোচনা করেন। তৎপর আর একদিন ডক্টর টিলিক নামক জনৈক জার্মান দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত (ইনি হিটলারের অত্যাচারে জার্মান ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন) খৃষ্টান-ধর্ম অনুসারে জীবের স্বরূপ কী সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক দিন সকালে তিন ঘণ্টা করিয়া ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত বৈঠক হইত। এক ঘণ্টাকাল বক্তা বক্তৃতা করিতেন ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহা লইয়া আলোচনা বাগ্‌বিতণ্ডা হইত। আমি কোনদিন বক্তা ছিলাম না। প্রত্যহই আলোচনায় যোগ দিতাম। তবে যেদিন ডক্টর মরগান হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সেই দিন তিনি আমার সম্মুখে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে খুব সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন ও সাদাসিধাভাবে বক্তৃতা করিয়া শেষে দার্শনিক দিকটা আমাকে সমাধা করিতে বলেন। আমি সংক্ষেপে বেদান্ত মতে জীবের স্বরূপ কি ও তন্মধ্যে শঙ্কর মত ও বৈষ্ণব মতের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য উল্লেখপূর্বক বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আর, প্রত্যহ সন্ধ্যায় Vesper Service বা সান্ধ্য উপাসনা হইত। দ্বিতীয় দিন ঐ উপাসনা 'কিউবা' হ্রদের তীরে উন্মুক্ত গগনতলে হইয়াছিল। ঐ উপাসনাকালে আমাকে আচার্যের আসন দেওয়া হইয়াছিল—আমি আধ ঘণ্টাকাল Sermon বা ধর্মোপদেশ দান করিয়াছিলাম। বাইবেল হইতে যীশুখৃষ্টের একটি বাণী লইয়া শুদ্ধ ভক্তিমার্গে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। আমার ব্যাখ্যায় ও উপাসনা পদ্ধতিতে উপস্থিত নরনারী প্রত্যেকেই প্রেমময় প্রভুর সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। এ কথা নিজের প্রশংসা করিবার জন্য লিখিলাম না—সকলেই ঐরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমিও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়াই লিখিলাম। আমি প্রত্যহই আলোচনায় যোগ দিতাম। আলোচনাগুলি বেশ গভীরভাবেই হইত। আমার একটি সুবিধা আছে এই যে, জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার নিজের বেশ সুস্পষ্ট অনুভব আছে ও সেই অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া দিনের পর দিন জীবন-যাপন করি। অন্যান্য অধ্যাপকগণের অনেকেরই ও বিষয়ে একটি সুপরিস্ফুট ধারণা নাই, পুঁথিগত পাণ্ডিত্য আছে। অবশ্য, আমার যে অনুভূতি তাহাই যে সত্য—এমন কোন প্রমাণ নাই—আমার নিজের কাছে নিজের মত প্রমাণ হইলেও, অতগুলি বিরুদ্ধ মতের সম্মুখে যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা স্থাপন করা নিতান্তই দুরূহ। তবে কথাটা হইতেছে এই যে, জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার যে বিশ্বাস তাহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে যেরূপ জীবন-মরণ সমস্যা, অন্য অনেক লোকের পক্ষেই সেরূপ নহে। আমি যে কেবল একটা তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি তাহাই নহে, তদনুসারে জীবন-নৌকাকেও গাঙে ভাসাইয়া দিয়াছি, এমতাবস্থায় কেহ যদি প্রমাণ করেন যে, জীবের আত্মা বলিয়া কোন দেহাতিরিক্ত বস্তু নাই—তাহা হইলে তিনি কেবল আমার বিচার বুদ্ধিটাকেই খর্ব করেন না—সমগ্র জীবনটাকেই পঙ্গু করিয়া ফেলেন। অন্যান্য অনেক লোক সম্বন্ধেই সেরূপ নহে। বিচারে হারিলে তাহাদের বুদ্ধিই হারে, জীবনের কিছু যায় আসে না—আর বিচারে জিতিলে বুদ্ধিই জেতে—জীবনটা যথাপূর্ব তথাপর রহিয়া যায়। আমার এইরূপ অবস্থা হওয়ার কিছু সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধা এই যে, একটি মতে দৃঢ় আস্থা থাকিলে বিচার করিতে সুবিধা হয় ও শক্তি পাওয়া যায়। অসুবিধা এই যে, বিচারে হারিয়া গেলে ও পরপক্ষের মত গ্রহণে রাজী হইলে লোকে বেকুব মনে করে। আমি যখন বিচারে

হারিয়া যাই তখন বেদান্ত দর্শনের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" সূত্র আওড়াইয়া নিজেকে প্রবোধ দিই। তর্ক দ্বারা কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না—পরম তত্ত্ব অপরোক্ষ অনুভূতি সাপেক্ষ—শাস্ত্রকারের এই উক্তি তখন আমাকে সান্ত্বনা দেয়। ইঁহাদের অনুভূতি নাই—আমার সে অনুভূতি আছে, এইভাবে অমূলক অভিমান পোষণ করিয়া তখন হারিয়া যাওয়ার দুঃখটাকে চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এই গেল সুবিধা ও অসুবিধার কথা। সভায় যতগুলি মত উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার সবগুলিই মোটামুটি আমার পূর্ব হইতে জানা ছিল—অন্যান্য সকলেরও ছিল। তবে অনেক নূতন নূতনভাবে আলোচনা হইয়াছিল। সে-সব লিখিতে গেলে একটা মস্ত বড় বই হইয়া যায়। এইবার সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয় সমূহের চুম্বক বলিব।

প্রকৃতিবাদ বা Naturalism-এর মতে প্রকৃতি হইতেই জগৎ ও জীব সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ বা চৈতন্যময় কোন সত্তা ইঁহারা মানেন না। চৈতন্যকে জড়সমষ্টির বিকার বা গুণ বিশেষ বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব ভাষায় বলিলে ইঁহারা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে শুধু মানেন। অন্তরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তটস্থা শক্তি বহিরঙ্গা শক্তিরই একটি পরিণামবিশেষ এবং অন্তরঙ্গা শক্তি ঐ বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির সমষ্টিময় একটি কিম্ভূত-কিমাকার কিছু—এইরূপ মনে করেন। ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, শ্রীভগবান বলিয়া একটি পৃথক সত্তাবান কিছু নাই—জগতে দৃশ্যমান যাহা কিছু—তৎসমষ্টিই তিনি বা ঐরূপ একটা কিছু। প্রকৃতি বা বহিরঙ্গা শক্তির অভিব্যক্তির ফলে চৈতন্য নামক একটা বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে—উহাই তথাকথিত আত্মা। অন্তরঙ্গা শক্তি ছাড়া বহিরঙ্গা শক্তির খামোকা অভিব্যক্তিটা যে কেন ও কীরূপে হইল, তাহাই আমি বুঝিতে পারি না—তাই ঐ মতের সঙ্গে আমার অনৈক্য। তারপর কার্ল মার্কসের জড়বাদ। তিনি বলেন যে, আমরা আত্মা বা বিবেক বা চৈতন্য বা পরলোক বা ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দগুলি দ্বারা যাহা বুঝি—সবই ভুয়া। ঐ কথাগুলির মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহাদের সকলেরই উৎপত্তি স্থান হইল মানুষের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিশেষভাবে—অর্থনৈতিক অবস্থা। আত্মা ঈশ্বর, পরকাল, বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ আছে—ইহার কারণ হইল—বিভিন্ন দেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন ও সংগ্রহ করিবার উপায় বিভিন্ন প্রকার। কৃষিপ্রধান দেশের ধর্মবোধ ও বাণিজ্যপ্রধান দেশের ধর্মবোধ ভিন্ন প্রকার। কোন দেশের সমাজ—জমিদার ও প্রজা এই দুইভাগে বিভক্ত; আবার কোন দেশের সমাজ—ধনিক ও শ্রমিক এই দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই দেশের লোকের আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি বিষয়ক মতবাদ দুই রকমের হইবে। গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের অধীনস্থ মানুষের বিবেক, বিচার ও ধর্মবুদ্ধি বিভিন্ন প্রকার। মার্কস মনে করেন যে, মানবসমাজে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সততই একটা লড়াই চলিতেছে; ঐ লড়াইয়ের মধ্যে একটা ক্রমপদ্ধতি আছে। উহার পরিবর্তন অনুসারে সমাজের ভাবধারা, চিন্তাধারা, জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে। সাদা বাঙলায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, আহার-নিদ্রার চিন্তাই মানুষের একমাত্র মুখ্য চিন্তা। ঐ চিন্তা চাকর মনিব উভয়কেই অভিভূত করিয়া আছে বটে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার রকমটা একরূপ নহে। তাই সমাজে ধনশালী ও ধনহীনের মধ্যে সতত একটা কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে—ঐ কাড়াকাড়িটার অবস্থা যখন সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়, যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, উহা কখন নরম, কখন গরম থাকে।

এই নরম-গরমের উপরেই এই দুনিয়ার জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ যা কিছু সব নির্ভর করে। ধর্মশাস্ত্র আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে যত কিছু কথা আছে, সকলই এই অর্থশাস্ত্রের লড়াই দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায় বা ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। এ সব কথা শুনিতে আমাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে আপাতত যতখানি মনে হয়—তার চেয়ে বেশী সত্য আছে এবং ঐ সত্যটুকুর উপরেই রুশিয়ার বিপ্লব ও বর্তমান সাম্যবাদ স্থাপিত। কার্ল মার্কসের পূর্বে জড়বাদ আর এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কেহ স্থাপন করিতে পারে নাই। এই মতে দূরদর্শিতা ও অদূরদর্শিতা দুইই অধিক পরিমাণে আছে, ইহা আমার বিশ্বাস। জড়বাদ ও প্রকৃতিবাদ হইতে আমার দূরত্ব অনেক। উহারা সকল প্রকার ধর্মমতেরই শত্রু। খৃষ্টীয় ধর্মমতের সৃষ্টি আমাদের সৌসাদৃশ্যে অনেক। তবে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে খৃষ্টমত নিতান্তই দ্বৈতবাদী। আমি ভেদাভেদবাদী। তাই জার্মান পণ্ডিত টিলিক মহোদয়ের সঙ্গেও আমার বাদ-বিচার অনেক হয়েছে। খৃষ্টমতে জীব-ভগবান, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় স্রষ্টা-সৃষ্ট, দুই আলাদা বস্তু। ইহা অধিকাংশে মধ্ব মতের মত। আমার মনে হয়, দুই বস্তু পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইলে দুই-এর মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধই হইতে পারে না—এমন কী এক বস্তুর অস্তিত্বও অপর বস্তু জানিতে পারে না। যদি ঈশ্বরকে জানা বা ভক্তি করা বা প্রীতি করা সম্ভব হয় তাহা হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই জাতীয় বস্তু না হইয়া উপায় নাই। টিলিক মহোদয় বলেন, বিশ্বাস দ্বারা জানিব, সেজন্য স্বরূপ-সাদৃশ্য স্বীকারের প্রয়োজন কী? কথাটা আমারও লাগে ভাল। বৈষ্ণবেরাও বিশ্বাস দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে জানিতে চায় ও ঐক্যত্মাকে ভয় করে। কিন্তু বৈষ্ণবেরা যে আবার বিশ্বাস ছাড়াইয়া গিয়া ভগবানের সঙ্গে প্রেম করিতে চাহে, প্রেমের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঢালিয়া দিতে গেলে—রাধা হইতে কৃষ্ণঠাকুরের পার্থক্য কতটুকু যে থাকে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অবশ্য অন্তরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তিকে আমিও কিছু এক মনে করি না—দুই-এর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ—ইহাই আমার মনে হয়। টিলিক মহোদয় ঐকাত্ম্যকে বড়ই ভয় করেন। আমিও উহাকে ভয় করি—কিন্তু এত ভয় করি না যে, সেজন্য দ্বৈত স্বীকার করিতে রাজী হইব। আমি বলি প্রেমের এমনি স্বভাব যে, প্রেমের মিলনে দুই বস্তু একাত্মা হইয়াও পৃথক থাকিয়া যায়। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হইয়াও দুই থাকে। খৃষ্টভক্তের মতে যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস থাকিলেই মুক্তি হয়। বৈষ্ণবের মতে বিশ্বাসের স্থান খুব বড় বটে—তবে সে বিশ্বাস লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না—ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া আপন করিতে চায়। আর মুক্তি লইয়া রাগমার্গী ভক্ত বড় একটা মাথা ঘামায় না। টিলিক মহোদয় খুব বড় পণ্ডিত—তবে বিশুদ্ধ খৃষ্টমতের পথিকও তিনি নহেন। প্রকৃতিবাদের অনেক কথা আমিও মানি অথবা বর্তমান জগতের বিজ্ঞানের জোরে বা চাপে অনেক কথা মানিতে বাধ্য হই। এ সব বিষয় লইয়া বেশ আলোচনা হইয়াছে। তবে আমি আর কিছু একা আলোচক নহি। প্রত্যেকের ভাগে সময় খুব কম। যত লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশেষ বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল। সকলেরই বলিবার মত কিছু আছে। আমার ভাগে সময় অতি অল্পই ছিল। তবে আলোচনায় আনন্দ অনেক পাইয়াছি ও অনেকে পাইয়াছে। (কিছুদিন পূর্বে উইলিয়মস টাউনে একটা Parliament of Religion বা ধর্মসভা হইয়াছিল। পাঁচটি কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী মিলিয়া উহা করিয়াছিল। সেখানে আমি

নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে ধর্মবিচারে বলিতে গেলে আমিই জয়লাভ করিয়াছিলাম। অবশ্য জয়-পরাজয়ের কোন কথা উঠে নাই, তবে সকলেই অনুভব করিয়াছিল যে, হিন্দুধর্মের জিত হইল। সেই সভার ফলে আমি Smith, Mass State, Amherst ও Mt Holyoke এই চারিটা কলেজ হইতে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পাইয়াছি।) সভার অধিবেশনের মধ্যে আমি একদিন 'Religion'-এর দল হইতে দার্শনিকদের দলে যোগ দিয়াছিলাম। সেদিন সেখানে বক্তা ছিলেন Brown University-র ডক্টর মর্ফি নামক জৈনক খ্যাতনামা দার্শনিক। বক্তৃতার বিষয় ছিল—Task of Philosopher—আমাদের ভাষায় বলিলে—'দার্শনিকের সাধনা।' এখানেও দার্শনিক মর্ফি মহাশয়ের সঙ্গে আমার বহুক্ষণ বাদবিচার হইয়াছিল। সে সব কথা লিখিতে গেলে বহু নীরস কাব্যের অবতারণা হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—তাঁহার সঙ্গে আমার মূল পার্থক্য এই যে, আমার মতে দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ সাধনাই হইল—মূলতত্ত্ব পরম বস্তুকে জানা। অধ্যাপক মহাশয় সেটি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, প্রাচীনকালের দার্শনিকগণ ঐরূপ মনে করিতেন বটে, কিন্তু আমরা এখন আধুনিকগণ মূলতত্ত্ব পরম বস্তু কোন কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করি না—যদি বা থাকে—তা হইলেও তাঁহাকে জানিবার কোন প্রকার উপায় দেখিতে পাই না। ঐ অনর্থক মূলবস্তু না খুঁজিয়া দার্শনিকের বর্তমানে অন্য প্রয়োজনীয় কার্যে মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। এই অন্য কার্য যে কী, তাহা তিনি অতি সুন্দরভাবেই দেখাইয়া দিলেন। আমি সে সবগুলিই মানিলাম বটে, কিন্তু সব কিছুকেই গৌণ বলিয়া একমাত্র পরম বস্তুর সন্ধানকেই মুখ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলাম। মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান ছাড়িয়া দিলে, দার্শনিকের সর্বপ্রকার দার্শনিকতাই বিড়ম্বনা—ইহাই আমার প্রতিপাদ্য ছিল। আমি আমার মত স্থাপন করিতে পারি নাই—তবে খণ্ডন করিতেও দিই নাই। অনেকক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল—অনেক লোক আমার পক্ষে ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত স্থাপন করা নহে। আলোচনা মাত্রেই ইহার পর্যবসান। আলোচনা দ্বারা বুদ্ধি মার্জিত হয় ও জ্ঞান পরিপক্ক হয়, এই জন্যই এই আলোচনা। বস্তুতপক্ষে এক সপ্তাহকাল ধরিয়া এইরূপ তত্ত্ববিষয় লইয়া আলোচনা হওয়াতে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এই সভার সাধারণভাবে ডাক নাম "week of work"। সত্যসত্যই ইহা এক সপ্তাহব্যাপী কর্মযোগ ও বুদ্ধিযোগ দুইই। এই সভার সভ্যদের ব্যয়সঙ্কুলানকালে একটা নূতন নিয়ম দেখিলাম। সভায় উপস্থিত হইতে সকলের সমান খরচ হয় নাই—কেহ বা অতি নিকট স্থান হইতে নিজ মোটর গাড়ীতে আসিয়াছেন—আবার কেহ- বা দেড় হাজার মাইল দূর হইতে ট্রেনে আসিয়াছেন। যাঁহার যাহা খরচ হইয়াছে, তিনি তাহা লিখিয়াছিলেন, পরে সব একুন করিয়া সকলে সমান ভাগ করিয়া লইলেন। সভ্যগণের মধ্যে এইরূপ ভাবের সখ্য ও সৌহার্দ্য দেখিয়া বেশ সুখী হইলাম।

ওখানে থাকাকালে প্রত্যহ উষায় কিউবা হ্রদে স্নান করিতাম—বহু বর্ষ বাদে এই প্রাতঃস্নান করিবার সুযোগ হইল—জলে যে কী আনন্দ পাইতাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি যখন স্নান করিতাম তখন কেহই ঘুম হইতে উঠে না। প্রত্যহ অপরাহ্ণে ইহাদের একটা কবিতাপাঠের আসর বসিত। সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কবিতা লেখেন, তাঁহারা নিজ নিজ কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। আমিও সুযোগ ছাড়িলাম না—আমার বাঙলা কবিতা অনেকগুলি পড়িয়া অনুবাদ

করিয়া শুনাইলাম। অনেকেই আনন্দ পাইলেন। ❑

মহাবতারী

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সেবায় উৎসর্গিত

মহাউদ্ধারণ মঠ

শ্রীযুক্তা সুরতকুমারী দেবী ছিলেন হরিভক্তি মহাধনে ধনী ভজনশীলা দেবী। যৌবনে বারবিলাসিনী—শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপা স্পর্শে হইয়াছিলেন ব্রজভজন পথে উত্তমা সাধিকা। তাঁহার কলিকাতা মাণিকতলাস্থ একটি ছোট বাড়ী তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সেবার্থ, নামকরণ করিয়াছিলেন মহাউদ্ধারণ মঠ।

কিঞ্চিদধিক যাট বছর যাবৎ সেখানে চলিতেছে প্রভুর সেবাপুজা, কীর্তনানন্দ, শাস্ত্রালোচনা। দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনযুক্ত একটা অসুন্দর রাস্তার পার্শ্বে ছিল বলিয়া এতদিন মঠটির কোন সৌন্দর্য বিধান করা হয় নাই। সম্প্রতি রাস্তা সুন্দর হওয়ায় আমাদের কার্য মঠটিকে মনোহারী করিয়া—কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। নীচটা উন্মুক্ত করিয়া উপরে ভক্তাবাস স্থাপন করা। প্লান হইয়াছে।

.....

যাঁহারা ইষ্টজ্ঞানে প্রভুকে পূজা করেন, যাঁহারা তাহার পতিতপাবনী আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন—সকলের কাছে আমরা ভিক্ষার্থী। আপনাদের সমবেত চেষ্টায় আগামী বর্ষার পূর্বে কাজটি সুসম্পন্ন হইতে পারে।

বিনয়াবনত

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

১৯৯৭

* *মহাউদ্ধাবণ মঠ। মঠ স্থাপনা ১৩৩২ (ইং১৯২৫) বঙ্গাব্দ। নব সংস্কাব—অক্ষয তৃতীয়া, ১৯৯৯।*

মহানাম মেলা ’৮৬ ঃ মহানামব্রত কথা

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একটা বিশ্বধর্ম সভা উপলক্ষে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে চিকাগো শহরে গিয়াছিলাম। এই সভার নাম ছিল World Fellowship of Faiths। তার চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সভার নাম ছিল Parliament of Religions—ইহাতে প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দজী গিয়া ভাষণ দিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। উক্ত Wold Fellowhip-এর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক আমন্ত্রণ পত্র পাইয়া গুরুজী শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী অনেক কৃপাশীর্বাদ শিরে দিয়া চিকাগো পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে যা কিছু বলিয়াছি, করিয়াছি পাঁচ বৎসর আট মাসকাল—সবই গুরুকৃপায়।

* *১৯৮৬-এ কল তা বিড়লা তারা মণ্ডলীর বিপরীতে ময়দানে অনুষ্ঠিত দশ দিন ব্যাপী মহানাম মেলায় প্রসঙ্গে আশীর্বাণী। স৺াপতি — ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক — শ্রীঅশোক সাহা। স্মরণিকা সম্পাদক ঃ শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীঅশোক সাহা ও শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ।*

যাঁহারা ভারতের সংস্কৃতিকে ভালবাসেন এইরূপ কতিপয় মহদ্ব্যক্তি একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন আমার চিকাগো হইতে প্রত্যাবর্তনের পঞ্চাশ বৎসর পরে। আমি যেদিন ফিরিয়া আসি হাওড়া ষ্টেশনে, কতিপয় বিশিষ্ট সংস্থার অনেক গণ্যমান্যজন আমাকে অতি আদরে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া ছিলেন। আমার অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রচেষ্টায় কতিপয় স্থানে কয়েকটি ভাল সভা হইয়াছিল। কাগজেও লেখালেখি হইয়াছিল। তখন পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বিরোধ তুঙ্গে। প্রেমধর্মের কথা, গৌর-গোবিন্দের কথা তখন কে শোনে?

আমার আমেরিকায় অবস্থান প্রায় ছয় বৎসর—বহু কাগজপত্র ছিল অনেক সজ্জন ও সংবাদপত্রের মন্তব্য ছিল—অতি সুন্দর। কলিকাতায় ও বাংলাদেশে দুই রায়টে সব নিশ্চিহ্ন, তবু সভা হইতেছে আমার কথা বলিতে।

দশদিন ব্যাপী বিরাট্ অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেখানে অনেক মহতের মুখে আত্মপ্রশংসা অনেক শুনিয়াছি। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া কবিগুরুর একটি স্তবক মন্ত্রের মত জপ করিয়াছি—

"আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে।
তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।।"

ভারতের শিবময় কথা সে দেশে কিছু বলিয়াছিলাম। পূজা শিবের—বাহক বলদের কপালেও কিছু জুটিয়া গেল। জয় জগদ্বন্ধু। জয় গুরুদেব শ্রীমহেন্দ্রজী।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী □

'পরিব্রাজকের ঝুলি' কী?

পরিব্রাজকের ঝুলি কী? একজন ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—পরিব্রাজক কে? তার জিজ্ঞাসায় বুঝিতে পারিলাম অনেকেই এই প্রবন্ধটার তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছে না,তাই আমি বাধ্য হইয়া একটু লিখিতেছি।

পরিব্রাজক আমি নিজে, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। আমি প্রায় ছয় বৎসর কাল আমেরিকায় ছিলাম। সেই সময়কার শেষের দেড় বছরের ডাইরীটা আছে, এর আগের ডাইরী কিছু নাই। যেটি আছে তাহারও পাঠ উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য লাগে। এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্ট করিয়া আমার ভ্রমণের পথটা লিখিতেছে শ্রীমান্ বিকাশকুমার রুদ্র। সকল স্থানে ২টা ৩টা, কোথাও ৪টা ৫টা ছোট বড় বক্তৃতা দিয়াছি। অনেক লোক আনন্দে শুনিয়াছে। আমার সঙ্গে কতিপয় ভক্ত চলিত। মনে করিতাম দেশে ফিরিয়া একটা বই লিখিব। তাহা আর হয় নাই। দেশ বিভাগে ফরিদপুর জেলা পড়িল পাকিস্তানে। কয়েক দিনের অসহনীয় অত্যাচারে আমরা আঙ্গিনা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হই। যখন ফিরিয়া যাই তখন গিয়া দেখি কিছুই নাই। একটু বিশিষ্ট হিন্দু পরিবার যাঁহারা, তাঁহারা প্রায় চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুদের বাঁচিয়া থাকা কঠিন। যাহাতে হিন্দু-মুসলমান একপ্রাণতায় বাঁচিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেক ঘুরিয়া অনেক বক্তৃতা করি। মানবধর্ম তার বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। আটজন

* *'মহানাম অঙ্গন'। ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (আশ্বিন ১৪০৪) 'পরিব্রাজকের ঝুলি' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি 'আমেরিকার পত্রাবলী' নামক গ্রন্থের সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।*

ব্রহ্মচারীকে পাক-সৈন্যরা নৃশংসভাবে খুন করে। আমার বইপত্র ডাইরী যাহা কিছু ছিল সব নষ্ট হইয়া যায়। প্রভুর মন্দিরের চূড়া ফাটাইয়া দেয়। সেই চূড়া এখন বিলুপ্ত। তখন আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেই বা কে, শোনেই বা কে?

তাই এতকাল পরে শ্রীমান্ বিকাশ রুদ্র আমার ডাইরী ও মুখের কথা যতটা স্মরণে আসে তাহা অবলম্বনে এই ঝুলি লিখিতেছে। ইহা মাঝে ছয়টি সংখ্যায় বন্ধ ছিল। এই সংখ্যা হইতে আবার নিয়মিত চলিবে। ❑

আমার সাহসিক প্রধাবন মধ্যে তাঁর করুণার উজ্জ্বল নিদর্শন

'নন্ কো-অপারেশন্' আন্দোলনের প্রভাবে স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। মহেন্দ্রজীর কৃপাদেশে আবার গিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। নবম ও দশম শ্রেণী পড়ি নাই, তবু ভালভাবেই পাশ করিলাম। বুঝিলাম, ইহা আদেশের শক্তি। আর পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ বৃটিশের স্কুল দাসসুলভ মনোভাব শিক্ষা দেয়, আন্দোলনে যোগ দিবার ফলেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু মহেন্দ্রজীর ইচ্ছাতে কলেজে গেলাম। তিনি আমাকে ত্যাগীর বেশ পরাইয়াই কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ত্যাগী সাজাইয়া আমাকে কলেজে পাঠাইলেন কেন? তিনি একটি মধুর উত্তর দিয়াছিলেন—"বর্তমান সময়ে সরস্বতী দেবী লক্ষ্মীর পদসেবা করেন। 'বিদ্যা অর্জন মানেই অর্থ উপার্জন'—ইহা যে সত্য নহে, ইহা তোমা দ্বারাই দেখাইব। বিদ্যা অর্জন করিলেই যে দাস-সুলভ মনোভাব জাগে, ইহা যে ঠিক নহে, তাহা তোমাকেই দেখাইতে হইবে।"

যখন ফরিদপুর কলেজ হইতে আই. এ. ও বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা পড়িতে আসি তখন কলেজের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ কামাখ্যা মিত্র মহাশয় আমাকে একখানি সার্টিফিকেট্ দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার সমস্ত অধ্যাপনা জীবনের মধ্যে একটি ছেলেকেই দেখিলাম, যে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্যই অধ্যয়ন করিতেছে।" সার্টিফিকেট্খানি মহেন্দ্রজীকে দেখাইতেই তিনি পরমানন্দে বলিলেন, "ত্যাগের বেশ পরাইয়া তোকে কলেজে পড়াইবার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আজ পূর্ণ হইল।"

কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে থাকিয়া সংস্কৃতে আমি এম. এ. পাশ করিলাম তাঁহারই ইচ্ছায়। আবার দর্শন শাস্ত্রে দুই বৎসর পড়িয়া এম. এ. পাশ করিলাম। তাঁহারই ইচ্ছায় দ্বিতীয় এম. এ.-র ফল বাহির হইবার পূর্বেই আমাকে তিনি ফরিদপুরে ডাকিলেন* বলিলেন, "আমেরিকা হইতে বিশ্বধর্মীয় সম্মেলনের এক নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। ইহাতে প্রেসিডেন্ট হারবার্ট হুবার-এর স্বাক্ষর আছে। তুমি সেইখানে প্রতিনিধি হইয়া যাইবে। শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দর-এর মিলিত তনু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর ও তাঁহার প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্মের কথা প্রচার করিবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী আছে,

** ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির শিকাগো ভাষণের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে মানবধর্ম সম্মেলন স্মরণিকা 'মহানাম লীলায়ন।' মহানাম সেবক সংঘ, আগরতলা, ১৯৯৬। সম্পাদক : শ্রীবেণুধর গোস্বামী, শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।*

'চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্মসংস্থাপন হইবে।' তোমার দ্বারা শুভ সূচনা হইবে, তুমি যাও।"

আমি জীবনে কখনও কোন বক্তৃতা করি নাই, তাহা আমিও জানিতাম, সম্প্রদায়ের সকলে জানিত, মহেন্দ্রজীও জানিতেন। তবু কেন যে আমাকে তিনি সুদূর আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতার জন্য পাঠাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমি কেন যে তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লইলাম, কোন প্রতিবাদ না করিয়া; তার কারণ এই যে, আমি দৃঢ়ভাবেই জানিতাম যে, তিনি যখন যাহা আদেশ করেন সেই আদেশের সঙ্গে এক অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সেই শক্তিসঞ্চারটা একটা বৈদ্যুতিক ধাক্কার মত অনুভবগম্য ছিল। মহেন্দ্রজী বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে চারিবার পরিক্রমা করিয়া তাঁহার আদেশ মাথায় তুলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া যাত্রা করিলাম।

তিনি নিজে টাকা স্পর্শ করিতেন না। অন্য একজন ভক্ত দ্বারা আমার হাতে যে টাকা দিলেন—তাহা আমাকে বোম্বাই সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। সেইখানে গিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলাম। আমার এম. এ. পরীক্ষায় প্রাপ্ত একটা সোনার মেডেল সঙ্গে ছিল তাহা বোম্বাইয়ের শিববাবু নামে একজন বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা নিলাম। তাহা দ্বারা ইটালী প্রদেশের জেনেভা পর্যন্ত পৌঁছাইলাম।

বোম্বাই হইতে যখন জাহাজে উঠি তখন নোট খাতাটি ভুলিয়া বাসায় ফেলিয়া যাই। ঐ নোট খাতায় বহু ঠিকানা লিখিত ছিল। আমার জানাশোনা বন্ধুবান্ধবদের যে সকল আত্মীয়-স্বজন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আছে তাঁহাদের ঠিকানা লইয়াছিলাম, পথে ঘাটে ইঁহাদের কোন সাহায্য পাইতে পারি, এই ভরসায়। ঠিকানার খাতা ফেলিয়া যাওয়ায় মনটা ক্ষণিক সময়ের জন্য উদ্বিগ্ন হইল। তখন যেন একটি দৈববাণীর মত শুনিলাম, "একটিমাত্র ঠিকানা ভরসা করিয়াই যাও।" মনটা শান্ত হইয়া গেল। মনে হইল আমাকে একমাত্র প্রভুর ঠিকানার উপরে ভরসা স্থাপন করাইবার জন্য মহেন্দ্রজী ঐ নোট-খাতা হরণ করিয়া লইয়াছেন। তারপর বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কী করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং আমেরিকায় পৌঁছাইলাম তাহা যোগিভূষণ দাদা (মহেন্দ্রজীর এক অতি প্রিয়জন) "আমেরিকার পথে মহানামব্রত" শীর্ষক একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমারই লেখা এক ডায়েরী খাতা অবলম্বনে।

আমেরিকায় পৌঁছিয়া যে কোথায় যাইব তাহা ঠিক ছিল না। মহেন্দ্রজীর কৃপাশক্তি প্রপ্সন পত্নীকে স্বপ্ন দেখাইয়া একটি পরিবার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইখানে তিন বৎসর ছিলাম, মাতা-পিতৃস্নেহে পুষ্ট হইয়া একটি পয়সাও খরচ না করিয়া। প্রপসনের পত্নীকে মাম্‌মা ডাকিতাম ও সন্তানস্নেহ পাইতাম। সেখানে অতি স্বচ্ছন্দে বাস করার সময় কবিগুরুর একটি কবিতার পংক্তি মনে জাগিত,

"পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,

পরকে করিলে ভাই।"

তাঁহার অপার কৃপাশক্তি বলেই আমেরিকার ধর্মসভায়, শত শত স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে অগণিত বক্তৃতা করিলাম, অনর্গল শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায়। ভারতের বেদ-বেদান্তের কথা স্বামী বিবেকানন্দ অতি নিপুণভাবে বজ্রকণ্ঠে সিংহবিক্রমে বলিয়া আসিয়াছেন যদিও চল্লিশ বৎসর পূর্বে, তথাপি সিংহের গর্জন তখনও বিলীন হয় নাই, শিক্ষিত সমাজের কানে ও মনে আছে।

শ্রীগুরুর নির্দেশে আমি বলিয়াছিলাম ভাগবতী কথা, কৃষ্ণকথা, গৌরকথা ও বন্ধুসুন্দরের কথা।

যাবার পথে যখন বহু বাধা-বিঘ্ন আসিয়াছিল, তখন ভাবিতাম, তাঁহার আদেশে আসিলাম, তবুও এত বাধা-বিঘ্ন কেন? সমাধান করিতে পারিতাম না। যখন বাধা-বিঘ্ন কাটিয়া গিয়াছিল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমার যে আত্মসমর্পণ, তাহা ছিল মুখের কথা, শোকের কথা। তাহা সুদৃঢ় পাকাপোক্ত করিয়াছিলেন গুরুজী, বিপদ্ আপদের মধ্য দিয়ে। বাধা বিপত্তির অন্তরালে প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা অন্তর্নিহিত থাকে। প্রায় ছয় বছর আমেরিকায় নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ছিলাম একমাত্র মহেন্দ্রজীর কৃপাসামর্থ্যে।

কৃপার প্রত্যেকটি নিদর্শনই অদ্ভুত। অভূতপূর্বও বলা যায়। আমার আমেরিকায় প্রবেশের ভিসা (Visa) ছিল ভিজিটর (visitor)-এর। তাহাকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া কিছুতেই দুই·বছরের অধিক করা চলে না। আমি ছিলাম পাঁচ বৎসর আট মাস। ইহা কীরূপে সম্ভব হইল? আমার ভিজিটর্স ভিসা পরিবর্তন করিয়া, মাইগ্রেশন অফিস তাহা স্টুডেন্টস্ ভিসা করিয়া দিয়াছিল। পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার সময় 'মাইগ্রেশন'-এর প্রধান অফিসার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আইন হইবার পর হইতে ভিসা কখনও এইরূপ বদল করা হয় নাই। রি-এন্টার (re-enter) না করিয়া কোনদিন ভিসার 'স্টেটাস্' পরিবর্তন করা যায় নাই। আপনি যে 'ভিজিটর' হইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়া 'স্টুডেন্ট' হইয়া গেলেন, ইহা একটি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম (exception)। এই ব্যতিক্রম কীরূপে হইল কেহই জানে না, আমি জানি। মহেন্দ্রজী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "তুমি পাঁচ-ছয় বছর না থাকিলে হইবে না।" তিনি আইনের কোন ঘোরপ্যাঁচ জানিতেন না, অমনিই লিখিয়াছিলেন, সত্য হইল তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতে।

ঐখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়াছিলাম। কী বিষয়ে 'থিসিস্' লিখিব? মহেন্দ্রজী আদেশ করিয়াছিলেন, "শ্রীজীব গোস্বামী বিষয়ে লিখ।" কারণ, প্রভু জগদ্বন্ধু একটি গানের পদে লিখিয়াছেন—"শ্রীজীব বন্ধু সহায়"। মহাপ্রভুর ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি শ্রীজীবের লেখনীতে সংস্থাপিত। শ্রীজীবের কথা লিখিলে বন্ধুহরি সহায় হইবেন। আমি লিখিলাম। এখানে শ্রীজীবের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যাইবে না। কোন লাইব্রেরীতে নাই। ইহার উত্তরে মহেন্দ্রজী আমাকে শ্রীজীবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ষট্সন্দর্ভ' পার্সেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীজীবের গ্রন্থ আমি কখনও পাঠ করি নাই। ঐ সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীজির সম্পাদনায় শ্রীজীবের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁহার অনুগত গোপীবন্ধুদাস

ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রভুপাদকে নিবেদন করিলেন, আমেরিকায় আমার ঐ গ্রন্থ দরকার। মহেন্দ্রজী উহা আমাকে পার্সেল করিয়া পাঠাইলেন। আমার প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় দশ-বারো খানা গ্রন্থ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস্' হইতে দুই বৎসরের জন্য ধার করিয়া আনিয়া দিয়াছিল।

মহেন্দ্রজীর কৃপাশক্তি যে কত অব্যর্থ অমোঘ তাহা বহু বার মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সব লিখিলে আর একখানি পৃথক্ গ্রন্থ হয়। তাঁহার তিরোভাবের পর আজ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিককাল মহানাম কীর্তন ও প্রচারণ বাঁচিয়া আছে, ইহা তাঁহারই করুণা শক্তির নিদর্শন।

তাঁহার প্রকটকালে নামযজ্ঞ ছিল প্রাণবন্ত। এখন প্রাণবন্ত না থাকিলেও জীবন্ত আছে. যাঁহাদের মধ্যে তিনি কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন বা করিতেছেন তাঁহারাই কীর্তনযজ্ঞকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ কৃপাশক্তিতেই আবার বিপুল ভাবে প্রাণবন্ত হইতে পারে। তাঁহার কৃপাশক্তি ও শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের কৃপাশক্তি যে অভিন্ন, জীবনপথে প্রতি মুহূর্তে তাহা অনুভব করিয়া চলি। ❑

নারায়ণগঞ্জ সনাতন ধর্মসম্মেলন

সভাপতির ভাষণ

জয় জগদ্বন্ধু হরি

"সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্"

এক সঙ্গে বলো সবে, এক সঙ্গে চলো।

সকলের মন সকলে জানহ, সকলে বাসো ভালো।

স্বাধীন বাংলাদেশের সনাতন ধর্মনিষ্ঠ ভাইবোনেরা,

আজ আমরা একত্র হইয়াছি। এরূপ ভাবে একত্রিত আমরা বহু কালের মধ্যে হই নাই। যাহাতে আমরা একত্র হইয়া একাত্ম হইয়া এক প্রাণ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি সেই জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি।

অশুভ শক্তি আমাদিগকে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। ভীষণতম আঘাতেও আমরা মরি নাই। আমাদের কৃষ্টি, ধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্যের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ দান তাহা সমূলে উৎপাটন করিবার নির্মম প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। সেই দারুণ অত্যাচারের মধ্যেও আমরা বাঁচিয়া আছি। শ্রীহরির অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছি এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ লোক। ছিলাম জিম্মি, আজ স্বাধীন নাগরিক।

আমাদিগকে নিজ মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বঙ্গ-জননী প্রবল আকর্ষণে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়া আবার স্বক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। ইহার মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই দেখিতে পাইবেন। করুণাময়ের ইচ্ছা আমরা বাঁচিব, মায়ের কোলেই বাঁচিব, তাই আজও দাঁড়াইয়া আছি।

সহস্র নৃশংস চেষ্টা ছিল একদিকে, অপর দিকে রহিয়াছে জগন্নিয়ন্তার কারুণ্য শক্তি। সেই শক্তিরই জয় হইয়াছে। আমরা যখন বাঁচিয়াছি, তখন সুন্দর ভাবেই বাঁচিব। অতীতের উজ্জ্বল আদর্শগুলিকে জীবনের পাথেয় করিয়া আত্মিক বলে বলীয়ান্ হইয়াই বাঁচিব—নূতন জীবনের ভরা যৌবনের উদ্যম উৎসাহ প্রাণ-শক্তির উৎস লইয়াই বাঁচিব।

আধমরা হইয়া বাঁচা, অন্যায় দুর্নীতির কাছে মাথা নীচু করিয়া বাঁচা, সনাতন-পথভ্রষ্ট হইয়া বাঁচা, প্রত্যহ অঙ্গচ্ছেদ হইতেছে, তবু বাতগ্রস্ত অবসাঙ্গ রোগীর মত অনুভূতিহীন হইয়া বাঁচা মরণাপেক্ষা বেদনাপূর্ণ। তাদৃশ বেদনাহত হইয়া বাঁচিব কেন? বঙ্গমাতা যখন কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, তখন তাহার যোগ্য পুত্রকন্যার মত স্বগৌরবে উজ্জ্বল হইয়া বাঁচিব।

দেহ, মন ও আত্মা এই তিন লইয়া এক একটি মানুষ। দেহের জন্য চাই অন্ন বস্ত্র। তাহা আমরা চাইব পাইব, ভোগ করিয়া স্বাস্থ্যবান হইব। মনের খোরাক চাই শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য—তাহার সুব্যবস্থা করিয়া আমরা মনকে সুস্থ সতেজ করিব। আত্মোন্নতি করিতে হইলে তাহারও খাদ্য পানীয় চাই—মৈত্রী, কারুণ্য, মানবপ্রীতি, ঈশ্বরানুরক্তি। এই তিনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতিই জাতীয় জীবনের প্রকৃত উন্নতি। আমরা প্রকৃত উন্নত হইব—ইহাই ভগবদিচ্ছা। এই জন্যই তিনি মরণের অগ্নিপরীক্ষা হইতে আমাদিগকে জীবন্ত রাখিয়াছেন।

পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের পক্ষে যাহা যাহা প্রতিকূল তাহা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা যাহা অনুকূল তাহা সযত্নে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল কথা পরস্পর একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনা করার জন্য, পরস্পরের স্নেহ-প্রীতির সংযোগে জীবনকে সুন্দরতম করিবার জন্য, আমাদেব ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনকে সুষ্ঠুরূপে নীতিধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংগঠন করিবার জন্য আজ আমরা সমবেত হইয়াছি।

মানুষকে দাঁড়াইতে হইলে একটি ভূমি লাগে। দেহটাকে দাঁড় করাইতে লাগে মাটি। মনটাকে দাঁড় করাইতে লাগে বুদ্ধি। আত্মাকে দাঁড় করাইতে লাগে শাশ্বত নীতি। একটি সমাজকে দাঁড় করাইতে লাগে ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি। ধর্ম পালন করিতে লাগে সত্য, নীতি, নির্মল বুদ্ধি ও পায়ের নীচে শক্ত মাটি।

আমাদের ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম। নামটা শাস্ত্রীয় নয়, সংস্কৃত নয়; ইহা একটি ডাক নাম (nick name) মাত্র। কী হেতু কে প্রথম এই নামে আমাদের ডাকিয়াছিল তাহা অনুসন্ধিৎসা সাপেক্ষ। এই ধর্মের শাস্ত্রীয় নাম সনাতন ধর্ম। বাহির হইতে দেখিলে এই ধর্মকে খুব জটিল মনে হইতে পারে কিন্তু ভিতরের দিক্ হইতে, নীতি বা principle এর দিক্ হইতে দেখিলে ইহা একটি সহজ সরল উদার মানবীয় ধর্ম। তিনটি মাত্র তত্ত্ব জানিলে এই ধর্মের মূল রহস্য বোধগম্য হইবে।

(১) মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে।

(২) মনুষ্যত্ব লাভের পর দেবত্ব লাভ করিতে হইবে।

(৩) দেবত্ব লাভের পথে কোন দেবমানবকে আচার্য করিয়া তাঁহার নির্দেশ ও আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে।

কথা কয়টি বিশ্লেষণ করিব। পশু পশু হইয়াই জন্মায় কিন্তু মানুষ মনুষ্যত্ব লইয়াই জন্মে না। মনুষ্যত্ব তাহাকে অর্জন করিতে হয়। ইহাকেই আমরা চলতি কথায় বলি ছেলে-মেয়েদের মানুষ করিতে হইবে।

মানুষ হওয়া অর্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা। কতিপয় মহৎ গুণে জীবনকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করা। মহাত্মা মনু বলেন, **অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, শৌচ** ও **সত্য**—এই পাঁচটি গুণের সমাবেশই কোন ব্যক্তির জীবনের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই গুণগুলি অর্জন করিলে প্রকৃত মানুষ হইব।

মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় কতগুলি মহামানব বা দেবমানব অত্যুজ্জ্বল জীবনাদর্শ লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারি মানুষ কত বড় হইতে পারে। কতখানি শক্যতা (Potentiality) মানুষ্যের মধ্যে নিহিত আছে।

দেবত্ব ঘুমাইয়া আছে মানুষের মধ্যে। বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজি, নেতাজী ইঁহাদের মধ্যে ঘুমন্ত দেবত্ব জাগ্রত হইয়াছিল। আমার আপনারও হইতে পারে। কে বলিতে পারে আপনার শিশু ছেলেটির মধ্যে হয়ত একটি বিবেকানন্দ ঘুমন্ত আছে। পারিপার্শ্বিকতা তপস্যা ও ঈশ্বরানুগ্রহে সেই ঘুমন্ত দেবতার উদ্বোধন হইতে পারে।

এই ঘুমন্ত দেবশক্তির চৈতন্য করাইতে তিনটি প্রধান রাজপথ আছে। যাঁর মধ্যে ইচ্ছা শক্তি (Will) প্রধান তিনি চলেন কর্মের পথে। যাঁর মধ্যে বুদ্ধিশক্তি (Intellect) প্রধান তিনি চলেন জ্ঞানের পথে। যাঁর মধ্যে স্নেহ-প্রীতি (Feeling) প্রধান তিনি ভক্তিপথে অগ্রসর হন। গম্য এক, কাম্য এক, পথ তিন। এই তিনও তিন নহে। কর্ম জ্ঞান ভক্তি অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত। একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না, কেবল এক একটিকে প্রধান করিয়া জোর দেওয়া মাত্র। এই সব পথে চলিতে একাকী অসহায় অবস্থায় চলা সুকঠিন। এই জন্য প্রয়োজন আচার্য বা পথপ্রদর্শক (Guide বা গুরু)। গুরুর পদাঙ্কে চলা নিরাপদ। আপনি প্রথমে মনুষ্যত্ব লাভ করুন, তারপর দেবত্ব (Godliness) লাভের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ আচার্যের মতে চলুন। এই হইল সনাতন ধর্মের Outline বা রূপরেখা।

এই রূপরেখার জ্ঞান থাকিলে আপনি আপনাকে যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন, অন্যকেও পাইবেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণকেও দেখিতে পাইবেন। যেমন খৃষ্টান অর্থ হইবে যিনি আগে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া খৃষ্টের মতে দেবভূমিতে উঠিবার জন্য চেষ্টা-পরায়ণ। বৌদ্ধ অর্থ হইবে যিনি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধের মতে সর্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণে যত্নশীল। মুসলমান অর্থ হইবে যিনি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হজরত মোহাম্মদের মতানুসারে স্বর্গভূমিতে পৌঁছিতে চেষ্টা-পরায়ণ। নূতন কোন দ্রষ্টা পুরুষ বা অবতার পুরুষ আবির্ভূত হইলে তৎ তৎ অনুবর্তিগণকেও যথাযথ স্থানে দেখিতে পাইবেন। ইহাতে শুধু সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধি দূর হইবে না, একটা বিশ্বজনীন অত্যুদার ভাবরাজ্যেরও অধিকারী হইবেন। সনাতন ধর্মের রূপরেখাটি বুঝিলেই আপনি একটা বিশ্বজনীন উদারতার ভূমিকায় স্থির হইলেন। এই জন্যই সনাতন ধর্মের সংজ্ঞা দিতে কোনও মনীষী বলিয়াছেন, মানুষের আত্মিক বিকাশের সমন্বয়ের ধর্মই সনাতন ধর্ম। কেহ

কেহ বলেন, It is a Religion of Religious Liberty। ধর্মের স্বাধীনতার ধর্মই সনাতন ধর্ম। ইহা অপৌরুষেয়। মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উদ্ভব। ইহাতে গোঁড়ামির গন্ধ নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন মানুষ আগে জঙ্গলে অসভ্য বর্বর ছিল। ক্রমে অনেক পরে জ্ঞানোদয় হইয়াছে, অবশেষে ধর্মের অনুভূতি আসিয়াছে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মত সত্য মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, অন্ধকার তমিস্রার যুগেই তৎ সঙ্গে সঙ্গেই আলোকেরও উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে মানুষ জঙ্গলে থাকিয়া হানাহানি করিয়াছে অন্যদিকে আলোর সন্ধান পাইয়া ধর্মীয় রশ্মিতে দীপ্ত হইয়াছে।

আলোকের প্রকাশ মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে। অন্ধ তমিস্রার সঙ্গে আলোকের দীপ্তির লড়াই, দৈব ভাবের সঙ্গে আসুরিকতার সংগ্রাম মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিতেছে। একই সঙ্গে ছিল হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ। রাম রাবণ সমসাময়িকই। যীশুর সমকালেই ছিল তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধকারীরা। নিত্যানন্দের পার্শেই ছিল কলসের কান্দা নিক্ষেপকারী। দেবাসুরে যুদ্ধ চলিতেছে, আজও চলিতেছে, কখনও বেশী কখনও কম। ইহার মধ্যে আমাদের সাধনা, পশুবৃত্তিকে সংহত করিয়া আসুরিক ভাবকে দূর করিয়া মনুষ্যত্বলাভ করিব। মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে দেবত্বের অধিকারী হইব।

সনাতন ধর্মীয় সকলেরই কতকগুলি বাহ্যিক আচার আচরণে সাদৃশ্য আছে। জন্মান্তরবাদ সকল হিন্দুই মানেন। যতদিন না পরমা গতি লাভ হইবে ততদিন পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে। প্রতীক অবলম্বনে দেবতার অর্চনা অর্থাৎ প্রতিমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পূজা, সকল হিন্দুই মানেন। ভক্তের ভক্তিতে মৃণ্ময় বিগ্রহ চিন্ময় হয়। হিন্দু ধর্মের অন্যান্য সাধারণ (common) অনুষ্ঠানগুলি ছয়টি গ-কার দ্বারা বলা হয়—গাভী, গঙ্গা, গয়া, গীতা, গুরু ও গোবিন্দ।

জননীর প্রতীকরূপে গাভীকে শ্রদ্ধা করা, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জানিয়া গঙ্গাকে পবিত্র নদী মনে করা, গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানে পিতৃলোকের কল্যাণে বিশ্বাস করা, শ্রীকৃষ্ণ-মুখামৃত গীতাকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা, গুরুনির্দিষ্ট মতে পথে সাধন-ভজন করা ও গোবিন্দে বিশ্বাস রাখা অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অবতারবাদে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এই বিষয়গুলিতে মতভেদ দৃষ্ট হয় না।

সর্বোপরি মনুষ্যত্ব লাভ। ইহাকে প্রথম ও প্রধান স্থান দিতে হইবে। অহিংসা, সংযম ও সত্যের অনুশীলনে জীবন সুন্দর হয়। মানুষকে মানুষ জানিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। রিপুগণকে সংযত রাখিয়া মনে মুখে কণ্ঠে এক হইয়া সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। অন্তর বাহির পবিত্র রাখিতে হইবে। তবেই হইবে মনুষ্যত্বের বিকাশ।

আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান বাধা সমাজ জীবনে—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালী করিয়া, কলিযুগে প্রভু জগদ্বন্ধু বুনো জাতির সঙ্গে একত্রে বসবাস করিয়া তাহাদিগকে মোহান্ত পদবী দিয়া এই জাতি-ভেদের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতাকে দূর করার জন্য প্রচণ্ড অভিযান চালাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর অবদান অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য অনির্বচনীয়। কিন্তু হায়! আমরা বিরাট্ হিন্দু সমাজ যে

তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি।

প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন "নরজাতি দেবত্ব"। প্রত্যেক নরের মধ্যে দেবতা বিরাজমান। ইহা অন্তরে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেকটি মানুষকে নারায়ণের মন্দির জানিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। সর্ববর্ণের উঁচু নীচু ভাঙ্গিয়া দিয়া দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া এক-আচারবান হইতে হইবে। আজ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব যে, জাতিভেদের হীনতাকে আর প্রশ্রয় দিব না। পরস্পর একত্র চলিব, একত্র বসিব, সর্বজাতি এক বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া* সমাজদেহকে সুদৃঢ় করিব।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ এক নহে। বেদে বর্ণভেদ স্বীকৃত, জাতিভেদের নামগন্ধও বেদে নাই। সত্ত্ব গুণ প্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্বযুক্ত রজোগুণী ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্র রজোগুণী বৈশ্য ও রজোমিশ্র তমোগুণী শূদ্র। ব্রাহ্মণের কার্য শম দম তপ জ্ঞান অধ্যয়ন অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়ের কার্য শৌর্য বীর্য ধৈর্য কার্যকুশলতা শাসনের প্রভুত্ব ও যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখতা। বৈশ্যের কার্য কৃষি, গো রক্ষা ও বাণিজ্য। গুণ এবং কার্যানুসারেই ভেদ। ইহা জন্মভিত্তিক নহে।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সাধক শাস্ত্রজ্ঞ সমাজের মস্তক, সে-ই Spokesman আইনের বিধান-কর্তা। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-বিশারদ, রণকৌশলী, সে সমাজের হস্ত। বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা সমাজকে বাঁচাইবে সে উরু। শূদ্র সকলের সেবা করিবে। শূদ্র Labour, সমাজের চরণ। মাথা বুদ্ধি দিবে, বলিবে কোথায় যাব—পা সেখানে নিয়া যাবে। ইহাদের মধ্যে বড় ছোট নাই।

গীতা বলিয়াছেন, 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' যার যা স্বভাবজ কাজ সে তাহা আত্মসুখার্থ মনে না করিয়া সমাজ-সেবার্থ মনে করিলে, নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম ভগবৎ-অর্চনা বুদ্ধিতে করিলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। এই উচ্চাদর্শে স্থিত থাকিলে আমাদের সমাজ সাম্যবাদের উন্নত শিখরে আরোহণ করিতে পারিত। বর্ণভেদের নীতি হইতে ভ্রষ্টতাই সমাজের মহাপরাধ। চতুরাশ্রমের শৃঙ্খলাও লুপ্ত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান সমাজের কিশোর-কিশোরীরা অনেক স্থলে ভ্রান্তপথে চলিতেছে। ধর্মকে 'ওপিয়াম্' মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিতেছে। কেহ বা প্রলোভনের মুখে জ্ঞানহারা হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিতেছে। এ বিষয় আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে ও প্রতিকারের উপায় বাহির করিতে হইবে। গৃহীকে আমাদের শাস্ত্র গৃহাশ্রমী বলিয়াছেন। গৃহও একটি প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমকে আবার আশ্রম করিতে হইবে। দেব দেবীর স্তবস্তুতি গানে, রামায়ণ-মহাভারত পাঠে, তাহার আদর্শ চরিত্রগুলিকে নিত্য আলোচনার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বার মাসের পূজা-পার্বণগুলিকে প্রাণবন্ত

** হিন্দুধর্মের ভিতরে বিবাহের যে ব্যবস্থার কথা এখানে বলা হইয়াছে তাহা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া এবং আপৎকালীন অনন্যোপায় ব্যবস্থা হিসাবে বুঝিতে হইবে। স্বজাতির মধ্যে পাত্র-পাত্রীর অভাবে অন্য ধর্মে বিবাহের দ্বারা ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রতিরোধ এই ব্যবস্থার অন্যতম কারণ। পরন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে বর্ণব্যবস্থা লুপ্তপ্রায় । যেটুকু বিদ্যমান তাহা জন্মসূত্রেই মান্যতা পায়—গুণ ও কর্মানুসারে নহে। তথাপি বর্ণসংকর সৃষ্টি আমাদের কাম্য হইতে পারে না। গুণকর্মানুসারে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি গ্রন্থকার পূর্ণ আস্থাশীল। গীতার ১/৪০-৪১ শ্লোক এবং ৩/২৪ সংখ্যক শ্লোক অনুসারে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের বিবাহ ব্যবস্থা অনুশাসিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত—বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুযায়ী সমান বর্ণের মধ্যে বিবাহই উন্নততর সমাজ গঠনে সহায়ক। শাস্ত্র ক্ষেত্রবিশেষে অনুলোম বিবাহ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছেন।—সংকলক*

করিতে হইবে, যাহাতে ছেলেমেয়েরা ধর্মের গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। মাতৃজাতির শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু মনে ভয়, পাছে তাহারা ভুলের পথে পদবিক্ষেপ করে। সীতা সতী সাবিত্রীর আদর্শে মায়েরা সংগঠিত হউন ইহাই কাম্য। মাতৃচরিত্র উজ্জ্বল না হইলে সন্তান কখনও দেবভাব লাভ করেন না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পিতামাতা সর্বত্রই মহৎ ছিলেন।

দেবত্ব লাভ করিতে হইলে দৈবীভাবের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করিতে হইবে। সেইজন্য প্রয়োজন দেবমন্দির, তীর্থস্থান ও শাস্ত্রগ্রন্থ। শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত সকল ভাষার জননী। সংস্কৃত চর্চাকে পূর্বগৌরবে স্থাপন করিতে হইবে। সংস্কৃত দৈবীবাক্। দৈবভাব উদ্বোধনে সংস্কৃত ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সারস্বত সমাজের উন্নতি বিধান, মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন, দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ, তীর্থস্থানগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা—এই সকল কার্যে নিজেরা সচেষ্ট হইব ও সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করিব। গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে সহজে যাওয়ার ব্যবস্থার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের গ্রামগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। দেবমন্দিরে পূজার্চনা তো নাই-ই, নিরাপদে বসবাস করা, পুত্রকন্যাসহ স্বস্তিতে থাকাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকার কী—সেজন্য সমবেত চিন্তার প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই দুইটি শব্দ বাংলাদেশের সংবিধান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি লঘু-গুরু ভেদ বাঙ্গালীর জীবন হইতে উঠিয়া যাউক। কিন্তু বেদনার সহিত দেখিতে পাই, এদেশী মানুষের মনস্তত্ত্বের সংবিধানে উহা তীব্রতর ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। দেশের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে বিচরণ করিলে ইহার সুস্পষ্ট বিদ্যমানতা চোখে পড়ে। ইহার মূলে রহিয়াছে ভয় ও কাপুরুষতা।

যে সম্প্রদায় নিজেকে সবল ভাবিয়া অন্যায়ভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে সেই অত্যাচারিত ও অত্যাচারী উভয়েই কাপুরুষ। একজন নিজেকে দুর্বল ভাবিয়া অন্যের অত্যাচারে মাথা নীচু করিয়া পলায়ন বৃত্তি গ্রহণ করে। অপরদিকে যে অত্যাচারী সে মনে ভাবে, কি জানি, ঐ দুর্বল ব্যক্তি যদি আবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া আমাকে মারিয়া বসেন, ইহাও কাপুরুষতার আর এক দিক্। ইহার প্রতিকার কোথায় জানি না। আলোচনা প্রয়োজন। কেবল একটি কথাই বলিব—আমরা যেন কোন অবস্থাতেই ভীরু বা কাপুরুষ না হই।

আমাদের সমাজের বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক অর্থোপার্জনের কোন পথই না পাইয়া অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করিয়া দিনে দিনে ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। তাহাদের জন্য আমরা সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইব, তাহাদের বাঁচার পথে সহায়ক হইবার জন্য। অনেক ছাত্র যোগ্যতা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিতে অপারগ হইয়া দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছে অথবা অন্য পথে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে বিদ্যার্জনের সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা দানের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একটি স্তম্ভ বলিয়া ধরা হইয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষতার

প্রধান অভিব্যক্তি হওয়া উচিত—এক ধর্মীদিগকে অপর ধর্মীদের অত্যাচার অবমাননা হইতে রক্ষা করা। এই সম্মেলন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে এই দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে যাহাতে প্রত্যেক মানুষের জীবনযাত্রা মানবোচিত হয়—স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকোচিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

সমাজ ও সরকারের প্রতি আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করিলেই আমরা দাবী দাওয়া জানাইবার ও পাইবার যোগ্যতা লাভ করিব।

বাংলাদেশবাসী সনাতন ধর্মনিষ্ঠ শিক্ষিত সমাজের নরনারী একত্রিত হইয়া ও সামগ্রিক ভাবে নিজ নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ হইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে আলোচনা করা স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম। আমরা আশা করি প্রতি বৎসর বিভিন্ন জেলায় সকলের সহানুভূতিতে আমরা এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব। প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া ইহাতে দোষ ত্রুটি অনেক থাকিবে, সকলে নিজ কার্য বোধে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন ও ভবিষ্যতেও অনুষ্ঠান যাহাতে উজ্জ্বলতর হয় সেজন্য সহায়ক হইবেন। আমাদের প্রয়োজন প্রত্যেক জেলা, থানা ও গ্রামভিত্তিক সংগঠন ও ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

আমাদের উদ্দেশ্য মানবতার ভিত্তিতে সকল মানবের কল্যাণ সাধন। রাজশক্তির সহায়তা আমাদের সর্বদাই কাম্য। তবে বাজনীতি লইয়া ক্ষমতার লড়াইর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই বা থাকিবে না। সমাজনীতি ও ধর্মনীতিই আমাদের আলোচ্য ও উপজীব্য। শ্রীশ্রীপ্রভুর করুণা শক্তিতে আমরা নিশ্চয়ই সনাতন ধর্মের গৌববে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে পারিব এবং এই প্রথম সম্মেলন আমাদের নূতন যুগের আলোক-বর্তিকা হইবে।

আমাদের বক্তব্যগুলিকে উপসংহারে আর একবার গোছাইয়া বলি— নিত্যকার জীবনে স্মরণে রাখিয়া প্রতি পদক্ষেপে কার্যে পরিণত করার জন্য বলি—

১। একটা বাংলাদেশ ভিত্তিক সনাতন ধর্ম মণ্ডল চাই, আমরা প্রত্যেকটি পরিবার প্রত্যেকটি ব্যক্তি হইব তাহার সদস্য।

২। নিত্য পূজার্চনার সঙ্গে মন্ত্রের মত জপ করিব আমরা সনাতন ধর্মবলম্বী এক জাতি। আমরা হীন জাতিভেদ মানি না, কোনরূপেই মানিব না। আহারে বিহারে পূজার অর্চনায়, বিবাহে উৎসবে আমরা কোন ক্রমেই জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিব না।

৩। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ পরিবারের সকলে মিলিয়া প্রার্থনা উপাসনা করিব। প্রতি সপ্তাহে হরিসভায় মিলিত হইব, সবাইকে ডাকিয়া লইয়া হরিকথা আলোচনা করিব—নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করিব। নিজ নিজ দুর্বলতা দূর করিব, একপ্রাণ হইয়া শক্তিশালী হইব।

৪। জীবন পথে চলিতে যাহারা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের স্নেহে আদরে হাত ধরিয়া তুলিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। আমরা দিনের পর দিন মরিব না, টলিব না, অন্যকে মরিতে দিব না, সত্য সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিব না। এই পথে আমাদের সত্য সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিব না। এই পথে আমাদের ভবিষ্যৎ

উজ্জ্বল—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

৫। আমরা আমাদের স্বদেশ বাংলাদেশকে ভালবাসিব। বাংলা ভাষাকে, বাংলার কৃষ্টিকে ভালবাসিব। মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইব।

বাঙ্গালীর সর্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঙ্গালীর প্রাণ শ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দরের—মহামানবতার আদর্শকে ধ্রুবতারা করিয়া হিংসা-বিদ্বেষশূন্য হইয়া জাতিকে গঠন করিব। করুণাময়ের করুণার হস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত আছে।

করুণাময় প্রভু বন্ধুহরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি। জয় বাংলা। জয় জগদ্বন্ধু।

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।"

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৫ ইং

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সভাপতি ❑

জয় জগদ্বন্ধু হরি — জয় গৌরহরি

নবদ্বীপ পোড়ামাতলাস্থিত শ্রীশ্রীমহানাম মঠ পরিচালিত

প্রভু জগদ্বন্ধু বিদ্যামন্দিরের

শুভ উদ্বোধনে বৈষ্ণবাচার্যপ্রবর 'ভাগবত-গঙ্গোত্রী' ড. শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর

ঃ শুভ আশীর্বাণী ঃ

প্রাচীনকালে আচার্য গুরুদেব শিষ্য-ছাত্রদের উপদেশ বাক্য বলিতেন—

"সত্য বলিবে। মিথ্যা বলিবে না। ধর্মাচরণ করিবে।
পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্যকে ঈশ্বর
মনে করিবে। ক্ষুধার্ত অতিথিকে দেবতার মত যত্ন করিবে।
শাস্ত্রপাঠ হইতে বিরত হইবে না। সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।
ভগবানে ভক্তি করিবে। তোমাদের জীবনের এই যেন আদর্শ হয়।"

এইরূপ কথা এখনকার দিনে কেহ বলে না। বলিলেও কেহ শুনে না। এই যুগের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মনের মধ্যে একটি মাত্র চাহিদা, একটা চাকুরী চাই। চাকুরীতে যদি মনুষ্যত্ব হারাই তবু চাই। দাসসুলভ মনোবৃত্তির প্রবণতা মারাত্মক। বর্তমানে আমরা মহা বিপদের সম্মুখীন। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ঊর্ধ্বগামী হই নাই। ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছি। আমরা মনুষ্যত্বহারা হইতেছি। ইহাই মহা বিপদ্-সমুদ্র। এই

** প্রভু জগদ্বন্ধু বিদ্যামন্দির (অঙ্কুর হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত)। প্রধান আচার্য ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য। প্রতিষ্ঠা - ১৯৯৪।*

ভীষণ সমুদ্র পার হইতে প্রয়োজন সুদৃঢ় অর্ণবপোতের। তাহা কোন দিক্ হইতে দৃষ্ট হইতেছে না। যাঁহারা জাতির দরদী তাঁহারা বসিয়া নাই। পার হইবার জন্য সাধ্যমত তাঁহারা কেহ নৌকা, কেহ ডিঙ্গি, কেহ ভেলা ভাসাইতেছেন। আমরা শক্তিহীন, তাই এক গাছি তৃণ ভাসাইতেছি "প্রভু জগদ্বন্ধু বিদ্যামন্দির" নামকরণ করিয়া। ইংরেজী কিংবদন্তী আছে 'নিমজ্জমান মানুষ একটা তৃণও ধরে'। বিশ-পঁচিশ জন শিশু এই তৃণগাছি ধরিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই তৃণগাছি শ্রীভগবানের কৃপায় হাতি-বাঁধা শক্ত রজ্জুতে পরিণত হইবে। আমাদের সমাজটা মানবতাহীন মত্ত হস্তীর মত হইতেছে। ঐ রজ্জু দ্বারা আমরা ঐ দিশাহারা হস্তীকে সংহত ও সুশৃঙ্খলিত করিতে পারিব। আমরা আবার কল্যাণপথে উন্নত হইয়া উঠিতে সমর্থ হইব।

আমবা ক্ষুদ্র কিন্তু আমাদের আদর্শ মহান্। আমরা চাই—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঋষি অরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মহাবিপ্লবী সূর্য সেন প্রমুখ ত্যাগী সাধকদের ধ্যানের ভারতকে বিশ্বসভায় সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে। এই চাওয়া নিশ্চয়ই সার্থকতায় পৌঁছিবে।

"আমাদের ধ্বনি হইবে ঋষি বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্।"
আমাদের সম্ভাষণ হইবে ক্ষাত্রবীর্য বীর নেতাজীর "জয় হিন্দ্।"

ইহা সুনিশ্চিত আমরা কল্যাণের পথে প্রধাবিত। সকল সজ্জনবৃন্দের আন্তরিক সহায়তায় আবার "এই মহামানবের সাগরতীরে" অচঞ্চল স্থিত হইয়া সনাতন হিন্দু সমাজ বিশ্ববাসীকে পরম মঙ্গলের মানবতার পথ প্রদর্শন করিবে—এই আশা করুণাময় পূর্ণ করিবেনই। জয় জগদ্বন্ধু।

সীতানবমী তিথি
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
ইং ১৯শে মে, ১৯৯৪

সবাব পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীর প্রত্যাশী—
আশ্রব—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
মহানাম অঙ্গন, মহানাম পল্লী
রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯ ❑

হিন্দুধর্মে নারীর স্থান

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

হিন্দুধর্মে সর্বত্রই নারীর স্থান সর্বোপরি। নারী মাতা। মায়ের স্থান সর্বোচ্চ। সংস্কৃত ভাষায় একটি ধাতু আছে 'মা', যাহার অর্থ পরিমাপ করা (to measure), আর একটি অর্থ আছে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (to conclude)। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। সর্বতোভাবে তাহাকে পরিমাপ করিয়া রাখে, এই হেতু সকল বিষয়েই পরিমাপ করার শক্তি তাহার সর্বাধিক। জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাহার যোগ্যতা সর্বোপরি।

** 'আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা', আশ্বিন ১৪০৫। সম্পাদিকা—ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘের মুখপত্র।*

হিন্দু সমাজে সর্বত্রই মায়ের স্থান বামে। অঙ্কশাস্ত্রে বামের স্থানই সর্বত্র উপরে। ১১ লিখিলে দক্ষিণের ১টি '১'-ই; বামের '১'-টি '১' নহে ১০ (দশ)। ১১১ লিখিলে সবচেয়ে বামের ১টি ১ নহে, ১০০ (একশত)। এইরূপে যতই বামে যাইবে ততই গুণ বাড়িবে। মা বামে থাকিয়া প্রকাশ করেন যে তিনি সকলের উর্ধ্বে।

লিখিত অঙ্কের গণনাকালে শাস্ত্রীয় নিয়ম "সংখ্যানাং বামা গতিঃ।" চৈতন্যচরিতামৃতে সর্বশেষে আছে—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।"

অর্থাৎ সিন্ধু-৭, অগ্নি-৩, বাণ-৫, ইন্দু-১ (শাকে—শকাব্দে)। 'সংখ্যানাং বামা গতিঃ' অর্থাৎ উল্টা করিয়া বলিলে দাঁড়ায় ১৫৩৭ শকাব্দে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে কড়ি ও কোমল আছে। কড়ি ও কোমল মিলিয়া গান। কড়ি পুরুষের প্রতীক, কোমল নারীর প্রতীক। কড়ি কর্কশ। তাহা কোমলে নামিয়া আসিয়া হয় মনোহারী। কাকের কা ডাকের আকার কড়ি—কর্কশ। কোকিল আ-কে উ করিয়া একটু কোমল সুর সংযোগ করিয়া মনোমুগ্ধ করে। কাকের ডাক এক বারের পর দুই বার শুনিলে বিরক্তি হয়। কোকিলের ডাক শতবার শুনিলেও শুনিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কোমলের স্থান যে উচ্চে বুঝা গেল।

রামায়ণ শাস্ত্রে উত্তর কাণ্ডে দেখি, রাম বলিলেন, যদিও বাল্মীকির বাক্যে সীতার বিশুদ্ধির বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই তথাপি পুনরায় জনসমাজ মধ্যে সীতার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইলে আমার আনন্দ হয়।

রামের কথা শুনিয়া আমাদের যেন বক্ষে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত হইল। ছিঃ ছিঃ! আবার অগ্নিপরীক্ষা। জনসমাজ-সম্মুখে, দুইটি যোগ্যতম পুত্রসমক্ষে! এই কথা শুনিয়া সীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সীতা তখন গেরুয়া বস্ত্রধারিণী। অধোমুখে দৃষ্টিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।" (উত্তরকাণ্ড ১১০/১৪,১৬)

আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও কখনও মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগবতী পৃথিবী আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন। (১৪)

রামচন্দ্র ভিন্ন আমি অন্য কাহাকেও জানি না, এই কথা যদি আমি সত্য বলিয়া থাকি, তবে পৃথ্বী দেবী আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। (১৬)

তখন সীতার বেদনাযুক্ত কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের সকলের চোখে জল আসে।

তখন বিদীর্ণ ভূতল হইতে পৃথিবী দেবীকে লইয়া এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। পৃথিবী দেবী সীতাকে দুই হাতে ক্রোড়ে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আবার ভূতলে চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ সাধু সাধু বলিতে থাকিলেন—সীতার জীবন ধন্য। মনে হয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—সীতা তুমি ধন্যা। আর মনে মনে যেন রামকে বলিয়াছিলেন, রাম তুমি অধন্য, কারণ সীতার মত সহধর্মিণীহারা হইলে। আমরা মনে মনে বলিলাম—রাম তুমি কি লজ্জাহীন? কোনও গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকও যোগ্য পুত্রের সামনে তাহার জননীকে চরিত্রের পরীক্ষা দিতে বলে না। তুমি লজ্জাহীন না হইলে উজ্জ্বলদেহ সংগীতজ্ঞ লব-কুশের সামনে এই কথা বলিতে না।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড শেষ হইয়া আসিল নারী ও পুরুষের শেষ উক্তি হইতে।

অঙ্কশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র ও রামায়ণশাস্ত্র দেখাইলাম—এখন মহাভারত দেখাইব।

পাণ্ডবগণ ও গোষ্ঠীর সকলে শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের কাছে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া, শান্তির বার্তা লইয়া। তখন দ্রৌপদী বীর রমণীর কণ্ঠে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণকে—

"অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন-করোদ্ধৃতঃ।
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেযু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা।।
যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ।।"

(মহাভারত, উদযোগ পর্ব, ৮২/৩৬-৩৭)

অনুবাদ—কৃষ্ণ! আপনি সন্ধির জন্য হস্তিনায় যাইয়া সকল কার্যের সময়েই দুঃশাসন করাকৃষ্ট আমার এই কেশ-কলাপ স্মরণ করিবেন। (৩৬)

কৃষ্ণ! ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে কুণ্ঠিত হইয়া যদি সন্ধির কামনাই করেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা আপন মহারথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। (৩৭)

দ্রৌপদীর এই উক্তি শুনিয়া সকলে মাথা নিচু করিয়া রহিলেন।

অন্যায়ের সঙ্গে মিতালি সকলে চাহিলেও দ্রৌপদী চাহেন না।

কৃষ্ণের যাত্রার সমারোহের যত উদ্‌যোগ দেখিলাম আমরা ভাবিয়াছিলাম—এই বুঝি কুরুপাণ্ডবের কোলাকুলি হইয়া যায়। কেননা কৃষ্ণের মত ব্যক্তিত্ব কখনও অকৃতকার্য হইতে পারে না। কিন্তু দ্রৌপদীর উক্তি শুনিয়া বুঝিলাম অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ হইবে না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ দুর্বলতার লক্ষণ। এই লক্ষণ প্রায় পুরুষদের সকলেরই ছিল কিন্তু ছিল না দ্রৌপদীর, তবে ভাবিয়া দেখুন কাহার স্থান উর্ধ্বে?

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মানুসন্ধানে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় যাইতেছেন। সংসারে যা কিছু ধন-সম্পদ্ ছিল তাহা দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব দিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পত্তি ভাগ করিয়া আমাকে যাহা দিয়া যাইবেন তাহা দ্বারা কি আমার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, তাহা হইবে না।

মৈত্রেয়ী যেন বিদ্রূপের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, যাহা ছাই-ভস্মের মতো নশ্বর বস্তু তাহা দিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া যাইতেছেন কেন? "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" মনে হয় শির অবনত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তখন ভাবিয়াছিলেন যে, আমাপেক্ষা ব্রহ্মানুসন্ধানে যাইবার অধিকারে পত্নী মৈত্রেয়ীই অধিকতর যোগ্যা।

এখন গীতা বলিব। গীতার বিভূতিযোগে কোনও বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ এবং সেই বস্তু কী তিনিই ইহা বলিতে বলিতে যখন নারীদের কথা বলিলেন তখন সাতটি বিশেষণ যুক্ত করিয়া বলিলেন। "কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।।" (১০/৩৪)

নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সকল দেবতা স্বরূপ, অর্থাৎ এই সকল আমারই বিভূতি। এই বিশেষণগুলিতেই নারীর অতি উচ্চস্থান কি প্রমাণিত হয় না?

সর্বশেষে বেদের কথা। সর্বাগ্রেই বলা উচিত ছিল। বেদের একটি শ্রেষ্ঠ সূক্ত অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট দেবীসূক্ত। এই সূক্ত জপিয়া সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজা মায়ের সাক্ষাৎ কৃপালাভ করিয়াছিল। আরও অনেক সূক্তের দ্রষ্টৃঋষি নারীর কয়েকটি উল্লেখ কবিতেছি।

(১) ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা।

(২) ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা।

(৩) ৮ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অত্রিকন্যা অপালা।

(৪) ১০ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের দেবতা অশ্বিনীদ্বয়, ঋষি কাক্ষিবানকন্যা ঘোষা।

(৫) ১০ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের ঋষি সাবিত্রী কন্যা সূর্যা প্রভৃতি।

বৈদিক যুগের নারীরা অধিষ্ঠিতা ছিলেন দেবীর আসনে। তাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন এবং সর্বগুণে গুণান্বিতা, মর্যাদাসম্পন্না ছিলেন। শৌণককৃত 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে বেদের নারী ঋষিদের তালিকায় ২৭ জন নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। বেদের যুগে যজ্ঞস্থলীতে স্ত্রীকেও বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত।

মহাভারতের নলপত্নী নারীশ্রেষ্ঠ (পরমাঙ্গনা) দময়ন্তী এবং শ্রীবৎস রাজার পত্নী চিন্তার পাতিব্রাত্য ধর্ম, ত্যাগ-তিতিক্ষা আজও ভারতীয়গণ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উন্নত উজ্জ্বল চরিত্র আজও হিন্দুরমণীদের নিকট পূজ্য ও আদর্শ স্থানীয়।

শংকরাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের শাস্ত্রবিচারে মধ্যস্থ ছিলেন উভয়ভারতী। বহু মুনি-ঋষি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই মহীয়সী নারীকে শাস্ত্রবিচারে 'রেফারি' বা মধ্যস্থ করা হইল। ইহাতে বুঝা যায় শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্না নারীর স্থান কত উর্ধ্বে ছিল।

ভারতে ইংরাজ শাসনকালে ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর তেজোদ্দীপ্ত বীরত্বময় কাহিনী ভারত-বিখ্যাত। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর তাঁহাদের দত্তক পুত্রকে ইংরাজ সরকার অস্বীকার করিয়া অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ঝাঁসী দখল করিয়াছিল। স্বরাজ্যস্থ ইংরাজ রেসিডেন্টকে রানি এক সময় তেজোদ্দীপ্ত বাক্যে বলিয়াছিলেন "মেরি ঝাঁসি নেহি দেওঙ্গে।"

সিপাহী সৈন্যগণের সহিত ইংরাজদের বেশে যোদ্ধার সাজে তাঁহার বীরত্বের ভূমিকায় সহযোদ্ধারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ-র বীরত্বগাথা ভারতীয় নারীসমাজকে উন্নত করিয়াছে।

বর্তমান কালেও সরোজিনী নাইডু-র স্থান অনেক উর্ধ্বে ছিল। দিল্লিতে একটি এশিয়ান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্বের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহাতে সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। ভারতীয় উন্নতিকামী ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যানি বেশান্ত-এর স্থান ছিল অতি উচ্চে। তাঁহার গীতার অনুবাদ সর্বজন-প্রশংসনীয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পত্নী কস্তুরীবাঈকে এবং চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহার পত্নী বাসন্তীদেবীকে নিজ নিজ অপেক্ষা অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান-সম্পন্না মনে করিতেন এবং কঠিন কঠিন সমস্যায় তাঁহাদিগের পরামর্শ লইতেন।

অন্ধ কবি মিলটন মাতৃপ্রতিকৃতি স্পর্শ করিয়া একটি বেদনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। তাহার প্রথম দুই পংক্তি—

"হায়রে মা আছ তুমি প্রতিকৃতিময়।
সতত বিদরে শোকে হেরিয়া হৃদয়।।" ইত্যাদি।

এই কবিতা বাঙালি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত হইয়াছিল। মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধাই ইহার কারণ।

দেবী সাবিত্রী চরিত্রের বলে মৃত স্বামী সত্যবান্‌কে বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহাও নারীত্বের মহিমার দৃষ্টান্ত, এই বিষয় শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজি *'Sabitri'* গ্রন্থে অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইংরাজি ভাষার চমৎকারিতা ও মাতৃত্বের চিত্তাকর্ষী গাম্ভীর্য বিরাজমান।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিলে যে-কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন ভারতীয় জীবনে নারীর স্থান কত উর্ধ্বে। ❑

বেদের সাম্যবাদ ও ভারত

প্রাচীন সাম্যবাদের ভিত্তি বেদ। ইহার মূল পরম পুরুষবাদ ও প্রেম। বেদে ধর্মের অর্থ, পুরুষ-ভিত্তিক নৈতিক শৃংখল। নিখিল বিশ্বের মূলে একজন 'পুরুষ'। পুরুষ সূক্ত বলিয়াছেন— "পুরুষ এবেদং সর্বং"—তিনি এক, ইচ্ছা করিয়া বহু হইয়াছেন। বহুর মধ্য দিয়া একই বিরাজমান। প্রত্যেক পুত্রের মধ্যে যেমন পিতার ছায়া আছে সেইরূপ নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুতে 'এক' বিদ্যমান। বিশ্বের মধ্যে একটা Organic Wholeness আছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা cosmi moral order—প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সেই এক বিরাজমান। ব্যষ্টির সর্বত্র একটা শৃংখলা আছে।

** শারদীয়া 'বার্তা' ১৩৯৪, জলপাইগুড়ি। সম্পাদক : শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।*

সেই ব্যষ্টি-শৃংখলা সমষ্টি-শৃংখলার অধীন।

প্রত্যেকটি জীব সেই এক পরম পুরুষের সন্তান বলিয়া সকলে সমান। সেই পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার অধিকার সকলের সমান। ইহা ছাড়া, বাস্তব দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে সমানতা কোথাও নাই।

বেদ বলিয়াছেন, তোমরা একই সমিতি ভুক্ত, তাহার নাম মানব সমিতি। তোমাদের মন্ত্র এক—সেই পুরুষের সহিত একত্ব অনুভব করিবার। তোমাদের চিত্ত এক হউক। একত্রে চল, একত্রে বস, একত্রে অগ্রসর হও। বেদ বলিয়াছেন, নিখিল বিশ্ব একটি বিরাট্ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে তোমার ক্ষুদ্র জীবনকে আহুতি দিয়া পূর্ণতা লাভ কর। সেই পরম পুরুষের 'সাধর্ম্য' লাভ কর, আহুতি দিবার নিজ নিজ কর্ম দ্বারা অর্চনা কর। "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (গীতা), সেবা দ্বারা একের মধ্যে বহুত্বকে মিলাইয়া দেওয়া, এই জাতির সাধনা। কবিগুরুর ভাষায়—

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্র একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল, একটি বিরাট্ হিয়া।"

বৈদিক ধর্ম কোনদিন একটা বিরাট্ রাষ্ট্র (Political State) গড়ে নাই, একটা রাজনৈতিক জাতি (Nation) গড়ে নাই; গড়িয়াছে—একটা রাষ্ট্রাতীত সামাজিক সমবায় Social Federation, গড়িয়াছে—মানবগণের একটা সামাজিক সংহতি। বেদে ধর্মের অর্থ একটা সাম্প্রদায়িক Religion নহে। বেদে ধর্মের অর্থ—মানবধর্ম। মনুর গ্রন্থের নাম 'মানবধর্মশাস্ত্র'।

সাম্প্রদায়িক Religion-এর মূল কতগুলি বিশ্বাস (creed), মানবধর্মের মূল কতিপয় নৈতিক বিধান—অহিংসা, অচৌর্য, সত্য। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে তিনটি কথা ঃ (১) ঈশ্বর আছেন বিশ্বব্যাপিয়া, (২) ত্যাগী হইয়া ভোগ কর ও (৩) পরধন লোভ করিও না। ইহাই বৈদিক ধর্মের মূল ভিত্তি। এই ধর্মকে যে মানিবে সে ক্রমোন্নতির পথে দেবত্বে উঠিবে। এই ধর্মকে যে মানিবে না সে ছুটিবে মহা ধ্বংসের পথে। বহু স্তরের, বহু প্রকৃতির, বহু জাতির বহুবিধ আচার-নিয়মযুক্ত সম্প্রদায়গুলির একটা বিচিত্র সামাজিক সংহতি গঠন করিয়াছিল বৈদিক মানবধর্ম। আবার বলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা।
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।।
হেথায় আর্য হেথায় অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।।"

এই বিরাট্ মানব সংহতি ষ্টেট নহে, একটি অখণ্ড মানবিক সমবায়। তাহার বন্ধন সূত্র ধর্ম।

তাহার ভিত্তি বেদান্তের মন্ত্র "তত্তু সমন্বয়াৎ"। বেদের পুরুষসূক্ত বলিয়াছেন একটা সমাজ-সংহতি রক্ষা করিতে চারিটি শক্তির প্রয়োজন—(১) চালক ও শিক্ষক, (২) শাসক ও রক্ষক, (৩) পোষক ও পালক, (৪) সেবক ও ধারক। এই চতুর্বিধ কর্মের উপযোগী শক্তি সমাজে আছে। তাহাকে সংহত করিতে হইবে। ☐

সাম্যবাদ ঃ প্রাচীন ও আধুনিক

বস্তুবাদীদের একটি ভদ্র নাম সাম্যবাদী। সব মানুষ সমান। সকলের সকল বিষয়ে সমান অধিকার। সমান দাবী, সমান ভোট। খুব মনোহারী কথা। তৃপ্তিদায়ক সংবাদ।

প্রাচীনকালে এদেশেও সাম্যবাদ ছিল। প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও সাম্যবাদের কথা আছে। খৃষ্টান শাস্ত্রে, ইসলাম শাস্ত্রে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে সর্বত্রই সাম্যের কথা আছে। প্রাচীন কালের সাম্যবাদ ও বস্তুবাদীদের আধুনিক সাম্যবাদ মোটেই এক কথা নহে। একই শব্দ মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

আগে বলিব প্রাচীন সাম্যবাদ কী? তারপর আধুনিক সাম্যবাদ দেখাইব। দু'য়ের পার্থক্য পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রাচীন সাম্যবাদের নীতির মূল ভিত্তি হইল ঈশ্বর, মহাপুরুষ ও শাস্ত্র। আসল কথাটার মূলে প্রেম-প্রীতি। সকলেই একজন প্রেমময় পিতার সন্তান। সকলেই ভাই ভাই, পিতার দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

কিন্তু এক পিতার সন্তান ভাই ভাই, বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই কি সমান হয়? কোথাও কোথাও পরিবারে দুই ভাই কি রূপে গুণে, স্বভাবে বিদ্যায়, দৈহিক মানসিক শক্তিতে ও যোগ্যতায় সর্বতোভাবে সমান হইতে পারে? তাহা পারে না। সুতরাং সমান কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

এই জগৎ-সংসার একটা বিরাট্ পরিবার। অসংখ্য মানুষের মধ্যে সাম্য বা সমানতা আসিবে কীরূপে? ভাই হইলেই যে সমান হইতে হইবে এমন কোন কথা নয়। ভাই ভাই বড় আছে, ছোট আছে। যোগ্য আছে, অযোগ্য আছে। দুর্বল আছে, সবল আছে। স্বাস্থ্যবান আছে, রুগ্ন আছে। তবে সকলেই পিতৃস্নেহের সমান অধিকারী। তাই, ভাইকে ভাই বলিয়াই জানিবে। ভালবাসার ধর্মে সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে।

যে বড় ভাই, সে ছোট ভাইকে স্নেহে পালন করিবে। তাহার কল্যাণের জন্য শাসন ভর্ৎসনাও করিবে। ছোট, বড় হইয়া উঠিলে, তাহাকে যোগ্য অধিকার দিবে। তখন তাহাকে সহযোগী বন্ধুর ন্যায় দেখিবে। সমর্থ ভাই অসমর্থ ভাইকে যত্নে পালন করিবে, স্নেহে রক্ষা করিবে। সর্বদা লক্ষ্য করিবে যেন দুঃখ না পায়, সুখ-স্বচ্ছন্দতায় থাকে।

ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের স্বাধীনতার লড়াই নাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আছে স্নেহ, শ্রদ্ধা-ভক্তি, আছে রক্তের টান। আছে মমতা দরদ। সুখে দুঃখে আছে সহানুভূতি সহায়তা। ভাই ভাইয়ের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। সুখ সৌভাগ্য এক ভাই অপর ভাইকে সঙ্গে লইয়া ভোগ করিবে। এক ভাইকে পিছনে ঠেলিয়া আর এক ভাই আগাইয়া যাইবে না। যে নীচে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া উপরে উঠিতে চাহিবে না।

সকল শাস্ত্র শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা মহাপুরুষগণ সাম্যের এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সকলে এক বিশ্বপিতার সন্তান। পিতার রূপের ছায়া সকলের মধ্যেই আছে। পিতার দরদ সকলের উপর সমান। এই ভিত্তিতে সবাই সমান। সংক্ষেপে, এই হইল প্রাচীন সাম্যবাদ।

এখন বস্তুবাদীদের আধুনিক সাম্যবাদের কথা বলিব। ইহার জন্মস্থান ইউরোপে। প্রথম ফরাসী দেশে। ফ্রান্সের রাজার অমানুষিক অত্যাচারে জনগণ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধরত জনগণের রণ-নিনাদ (war cry) ছিল Liberty, Equality and Fraternity–স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। ইহার বিখ্যাত নাম ফরাসী বিপ্লব। এই সময়ে ফরাসী দেশ ইউরোপে সর্বাপেক্ষা উন্নত রাষ্ট্র ছিল। উন্নত রাষ্ট্রের এই বিপ্লব প্রায় সারা ইউরোপে ছড়াইয়া গেল। সকলের মুখে শ্লোগান—স্বাধীনতা চাই, সাম্য চাই, মৈত্রী চাই। ইতিহাসবিদ্ জানেন, সে এক রোমাঞ্চকর বিপ্লব।

স্বাধীনতা, সমতা, মিত্রতা—তিনটি কথাই চিত্তগ্রাহী। মনে হয় ইহা অপেক্ষা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় কথা আর কী হইতে পারে? এই হইল আধুনিক সাম্যবাদের জন্মকথা।

এখন ইহার ব্যাখ্যান করিব। সকলেই সমান স্বাধীন। সুতরাং সকলেই সমান। যে যেভাবে যেদিকে পারে আপনার স্বার্থ অন্বেষণ করিবে। প্রাণপণ করিয়া স্বকীয় উন্নতি লাভের চেষ্টা করিবে। কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারিবে না।

সকল মানুষ সমান। সুতরাং বুদ্ধি বিবেক সমান। সমানের সঙ্গে সমান বাঁচিবে Contract করিয়া। বাঁচিবে Competition করিয়া। সমান ও স্বাধীন জনসাধারণ সমাজের সকলের কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ করিবে। জনসাধারণের বিচারের উপর কোন ঈশ্বরের, কোন শাস্ত্রের কোন মহাপুরুষের কোন প্রভুত্ব থাকিবে না। থাকিতে পারে না। মহাপুরুষদের কথা অশ্রদ্ধেয় অগ্রাহ্য। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকে থাকুক, কোন প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী। জনসাধারণের বাণী জানিব ভোটের দ্বারা। সকলের বুদ্ধি বিবেক সমান। সকলের ভোটের সমান মূল্য। সকলেরই এক ভোট। অধিকাংশ মানুষের ভোটের দ্বারা যাহা স্থির হইবে তাহার ওপরে আর কাহারো কোন কথা নাই।

Every man has the liberty to act as he likes, so long as he does not interfere with the equal liberty of others. একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ না ঘটে তজ্জন্য প্রয়োজন মৈত্রীর। এই মৈত্রী রক্ষার ভার রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র শাসন দণ্ড লইয়া দেখিবে সমানদের মধ্যে কোথাও সংঘর্ষ না ঘটে। এই হইল আধুনিক সাম্যবাদ।

প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। এই কথাটির অর্থ আর একটু বিশদ করিয়া বলি। মানুষের মধ্যে তিনটি প্রধান বৃত্তি—ভাবনা করা, বিচার করা আর কর্ম করা। এই তিন প্রকারেই সে স্বাধীন। প্রত্যেকটি বিষয় নিজ বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা ভাবনা বিচার করিবার অবাধ অধিকার। কোন্‌টি উচিত কোন্‌টি অনুচিত নিজেই বুঝিয়া চলিবার অবাধ অধিকার, আর নিজের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির জন্য নিজ ইচ্ছামত কার্য করিবার অবাধ অধিকার। ইহা হইল স্বাধীনতার ভিত্তি—ইহাই আধুনিক সাম্যবাদ।

দুই জন লোকের এইরূপ স্বাধীনতা লইয়া চলিতে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য

চুক্তি বা contract এর প্রয়োজন। সংঘর্ষ এড়াইতে যে-কোন প্রকার চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে।

স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধও একটা চুক্তি। এই চুক্তিটার কথা ষ্টেট মাত্র জানিবে। শাস্ত্র, গুরু, গুরুজন বা পুরোহিত কাহারো কোন প্রয়োজন নাই। চুক্তি ভঙ্গ করিতেও স্বাধীনতা আছে। কেবল ষ্টেট জানিলেই হইল। ষ্টেটের যে এই অধিকার তাহার ভিত্তিও একটা চুক্তি। জনসাধারণ মিলিয়া একটা ব্যক্তি বা দলকে সর্বোপরি ষ্টেট বানাইবে। সেও একটা চুক্তি। চুক্তিভঙ্গকারী ষ্টেটকে ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকারও জনগণের। প্রত্যেক স্বাধীন সমান নাগরিকরা মিলিয়াই এই জনগণ। ইহাই আধুনিক সাম্যবাদ।

আশাকরি প্রাচীন সাম্যবাদ ও আধুনিক সাম্যবাদের পার্থক্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। প্রাচীন সাম্যবাদের মূল প্রেম। কিন্তু প্রেম শব্দটা ভাববাদীদের অভিধানে আছে। আধুনিক সাম্যবাদের মূল স্বাধীনতা, স্বাধীনতাব গোড়ার কথা আমিত্ব egoism, কিন্তু প্রেম নাই। ❒

"জয়তু জগদ্বন্ধুঃ"

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মিলনীর

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ—

স্বাগতম্, সুস্বাগতম্

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সমাগত সজ্জনমণ্ডলী, ভাইভগ্নীগণ—

আপনাদিগকে আন্তরিক স্বাগত জানাইতেছি। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দবেব শুভ আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

বর্তমান সময় দেশেব বড় দুর্দিন। দুই বাংলা, ভারতবর্য, তথা মানব-সভ্যতা আজ চলিয়াছে এক দুর্যোগের মধ্য দিয়া। মানুবীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মানবতা মনুষ্যত্ব। তাহা আজ পদদলিত হইয়া নিষ্পিষ্ট হইতে চলিয়াছে, বস্তুতন্ত্রবাদ ফণা উঁচু কবিয়া উঠিতেছে। আজ ভোগবাদ ন্যায়নীতি, সত্য ও সেবাধর্মকে লাঞ্ছনা দিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিতেছে। হিংসা, স্বার্থান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, দলীয় রাজনীতি, ধ্বংসাত্মক সমাজনীতির এমন অসংযত অভ্যুত্থান ঘটিতেছে যে মানবকৃষ্টি বুঝিবা অচিরেই মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইবে। এই নিদারুণ বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে আমরা আজ একত্রিত হইয়াছি।

একদা সারা বিশ্বের মধ্যে ভারত ছিল আধ্যাত্মিকতায় গরীয়ান্। জগতের সকল সভ্য জাতি যখন ছিল অন্ধকারাবৃত তখন ভারতীয় আত্মিক সাধনার আলো উদ্ভাসিত হইত। ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা, কি আত্মিক, কি পারিবারিক—এক সময় সকল দিকেই ছিল ভারতের ঋষিসঙেঘর জ্ঞানের আলো সর্বাধিক সমুজ্জ্বল। আজ যেন তাহা নিষ্প্রভ। আমাদের এই সম্মিলনের এবং নিত্য দিনের সাধনা হইবে আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমষ্টিজীবনে সেই আলোকটি

জগদ্বন্ধুসুন্দবের আবির্ভাব শতবর্ষ স্মরণিকা', ১৯৭২-এ মহাজাতি সদনে। মহানাম সম্প্রদায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ। সম্পাদক : শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীচিন্ময় নন্দ।

দীপ্ততর করিয়া তোলা। যাহাতে আজিকার আঁধার-ঘেরা পথে আমরা পাইব পাথেয়ের সন্ধান, মৃত্যুসঙ্কুল পথে আমরা পাইব অমৃতের আস্বাদন। যাহাতে স্বরূপভ্রষ্ট আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব স্ব স্ব সনাতন স্বরূপে।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টির আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন প্রেমধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। স্বীয় আত্মিক তেজোবলে তিনি যুবকদের দিয়াছিলেন মহাশক্তির উৎস, ব্রহ্মচর্যের সন্ধান। বিপ্লবীদের দিয়াছিলেন ভারত উদ্ধারের প্রেরণা। সমাজের মধ্যে আনিয়াছিলেন সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। পতিত বুনো ডোম-বাগ্‌দীদের হৃদয়ে জ্বালাইয়াছিলেন দেবত্বের আলো, তিনি তুলিয়া লইয়াছিলেন তাহাদিগকে স্বীয় উদার বক্ষে। নীরবে মহামৌনব্রতে সপ্তদশ বৎসর গম্ভীরায় রহিয়া তিনি এক গভীর আধ্যাত্মিকতা দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। আর্য ঋষির যাহা শ্রেষ্ঠ দান তাহা তিনি ভালবাসিয়াছেন। স্বীয় আচরণের মধ্য দিয়া তাহা প্রচার করিয়াছেন। আকাশে বাতাসে অণু-পরমাণুতে সঞ্জীবনী মহানাম মহামন্ত্র সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম তিনি এই যুগে সাধারণ নরনারীর হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ"। তাঁহার আবির্ভাবের শতজয়ন্তী স্মরণে এই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন সর্বতোভাবে উপযুক্তই বটে। যাঁহারা এই পরিকল্পনা করিয়া কৃতকার্যতার পথে আনিয়াছেন, তাঁহারা প্রভুর আশীর্বাদার্হ।

আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম বুকে লইয়া এই সম্মিলনীতে সজ্জনদের আহ্বান করিতেছি— আমরা আশা করিব—যাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালবাসেন, যাঁহারা ভারতীয় আধ্যাত্মিক গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে এই সংস্কৃতির যাহা যাহা কালজয়ী শাশ্বত অবদান তাহা তুলিয়া ধরিবেন এই সভার মাধ্যমে ধ্বংসোন্মুখ এই জাতির সম্মুখে।

মহাজ্ঞানী মানবপ্রেমী পুরুষদের মহাদান হৃদয়ে ধরিয়া আমরা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইব স্বকীয় উজ্জ্বলতায়। আবার আমরা জাগ্রত হইব ঋষিযুগের আধ্যাত্মিকতায়, আবার প্রভুর মহাকল্যাণময় মহাউদ্ধারণ যুগ নামিয়া আসিবে ধরার মাঝে। আবার জীবন্মৃত সমাজ অমৃতময় হইয়া গাহিয়া উঠিবে—জয়তু ভারতবর্ষ, জয়তু কৃষ্ণদাস—জগতের জীবনিবহ, জয়তু জগজ্জীবের বন্ধু জগদ্বন্ধু।

মহানাম মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭২

জয় জগদ্বন্ধু হরি

বৈজ্ঞানিক সমস্যা

এমন এক দিন ছিল যেদিন পৃথিবীর এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের যোগাযোগ এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। তখন এক দেশের সহিত অন্য দেশের দূরত্ব

অধিকতর ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভাবে দেশের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান পৃথিবীটাকে ছোট করিয়া দিয়াছে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের যোগাযোগ সহজতর হইয়াছে—একদিকে খুবই সুবিধা হইয়াছে কিন্তু অন্য দিকে বিজ্ঞান বর্তমানে এক গুরুতর যুগ-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জড় বিজ্ঞান মানুষকে মানুষের হৃদয় হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিয়াছে। নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্ত্বেও মানুষ কিছুতেই অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। তাহার দৈনন্দিন সমস্যা দিন-দিনই বাড়িয়া চলিয়াছেন, কোন প্রকারেই শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না।

পূর্বে আমরা ঘণ্টায় ৪ মাইল হাঁটিতাম, বর্তমানে ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগেও সময়ের অভাব মিটাইতে পারিতেছি না। মানুষ সব সময় কর্মব্যস্ত, যেন তাব অবসর কিছুতেই নাই। এক দণ্ড কাহারও সহিত কথা বলার অবসর নেই। অতি নিকট আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলেও তাহার সঙ্গে দূর হতে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইতে হয়। তাহার সংবাদ নিয়ে সহানুভূতি-মূলক কথা বলাও সম্ভব হয় না।

কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন দিবাশেষে মানুষ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সকলে মিলিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলার সময় পাইত। অন্যের দুঃখে একে কত ভাবে সাহায্য করিত। কিন্তু এখন কেহ কাহারও দুঃখে নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করে না। এ এক অভিনব সমস্যা, ইহাই বর্তমান যুগসমস্যা। মানুষের মন হইতে মানুষের জন্য দরদ দূর করিয়া দিয়েছে। কত শান্তি পরিষৎ দেখা যাচ্ছে। বহু দেশের লোক একসঙ্গে বসিয়া শান্তির আলোচনা করছে, চুক্তিপত্র সহি দিতেছে কিন্তু অন্তরের সঙ্গে নয়, ভিতরে ভিতরে সকলে মরণাত্মক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করিতেছে। কেবলই ভাবিতেছে, কত অল্প সময়ে কত বেশী লোকের জীবন নাশ করা যায়। বর্তমান যুগের এই সমস্যা মানুষ মানুষকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার কারণ কী? দেশের সম্পদ্ গড়িয়াছে কত ভাবে, দেশের উন্নতি হইয়াছে কিন্তু দেশে শান্তি নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশের অবস্থা আরও খারাপ। তাহাদের দেশে হানাহানির অবস্থা আরও জটিল। পাশ্চাত্ত্য দেশেব মনীষিরা অনেক চিন্তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে New rouets to India বাহির করিতে হইবে। এবার India-র ধন-সম্পত্তি নহে তাহাদের শাশ্বত আধ্যাত্ম সম্পদের খোঁজ করিতে হইবে, নতুবা বিশ্বের মঙ্গল নেই। আমাদেরও তাই মনে হয় আধ্যাত্ম সম্পদ্ ক্ষয় হওয়ার জন্যই মানুষের মন থেকে মানুষ সরিয়া গিয়াছে। তাই এই যুগসন্ধিক্ষণে চাই নদীয়ানাগরের আদর্শ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদের ঘরের ছেলে অমিয় নিমাই-এর আদর্শ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বৎসর পূর্বে নদের গোরা বাংলার আকাশ বাতাসকে এক অপূর্ব আনন্দে ভরপুর করিয়াছিলেন। আবার সেই গোকুল-নায়ক, নদীয়া-পাবক, মুর্শিদাবাদ ইন্দুরূপে জগদ্বন্ধু নাম ধরিয়া জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারও সেই একই কথা। নামের প্রেমে মত্ত না হলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে পারিবে না। তাই আজ আমরা জগজ্জীবকে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন "হরিনাম করতে করতে আমাকে আকাশে ধূলিতে মিশিয়ে দে। তোরা হরিনাম দিয়ে আমায় রক্ষা কর। আমি হরিনামেরই, আর কারও নই।"

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কাহারও অবিদিত নাই যে, আজ এখানে যে কথা বলিতেছি বহু দূরেও সেকথা যাইতে পারে। কোন কিছুরই সময় নাই। কোন অসৎ আলোচনা বা অসৎ কাজ করিলে যেখানে সেই কাজ বা আলোচনা হয় সেখানকার আবহাওয়া বিষময় হইয়া উঠে—ইহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারেন। আবার সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনা বা শ্রীশ্রীহরিনাম হইলে যে অপার আনন্দের সৃষ্টি হয় তাও অনেকে অনুভব করিয়াছেন।

এই হরিনাম সংকীর্তন ও শ্রীশ্রীহরিকথা আলোচনা সেই স্থানের তথা জগজ্জীবের কল্যাণ হয় কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি কোন শব্দই ব্যর্থ যায় না—তার একটা প্রভাব আছেই। নদনদী চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া যখন সাগরে আসে তখন প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকে মিশিবার সুযোগ পায়। তেমনি শ্রীশ্রীহরিকথা আলোচনা দ্বারা—তাঁহার সান্নিধ্যে গেলে মানুষ মানুষের প্রতি প্রীতির ভাব আনিতে পারিবে। অন্যভাবে যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুই সম্ভব হইবে না। মৃত পিতামাতার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হলে ভাই-ভাগিনীদের প্রতি আন্তরিকতা বাড়ে। অনেকে বলেন ভগবান্ মানি না বা তাঁর কথা আলোচনাও ভাল লাগে না। এটা তার মিথ্য কথা বা নিজেকে তথাকথিত প্রগতিশীল করার চেষ্টা করা। প্রত্যেক মানুষই ভগবান্‌কে চায় অথচ মুখে বলে চাই না। সে নিজে কী বলছে নিজেই বোঝে না।

প্রত্যেক লোক নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। শুধু তাতেই সন্তুষ্ট নয় তার চেতনা যাতে থাকে তার জন্য সচেষ্ট সতত। চেতনা হলেই সন্তুষ্ট না, আনন্দও সে চায়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটাই সে চায়। সচ্চিদানন্দকে কে চায় না?

যদি কেউ বলে "আমার মা বন্ধ্যা", তার কথায় অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য কেউ কোর্টে যায় না। কারণ তার অস্তিত্বই প্রমাণ করছে তার মা বন্ধ্যা নয়। সেই রূপ যদি কেউ বলে ভগবান্ মানি না, তার কথা অযৌক্তিকতা প্রমাণের দরকার হয় না।

এইবার বলিব তাঁহার কথা ভাল লাগার কথা। বহু দিন পর বাল্যের বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার আকার-প্রকারের পরিবর্তনের জন্য প্রথমে চেনা না গেলেও আলাপ আলোচনার পর যখন জানা যায় যে সে-ই, তখন কত আনন্দ হয়। ৫ মিনিটে বন্ধুত্ব হইয়া গেল, বাইরের লোকে দেখিয়া মনে করে। কিন্তু আসলে তাহা নহে। বহু দিনের পরিচিত। তেমনি সেই আনন্দের রসঘন বস্তু আমাদের সকলের চির আপনার। তাঁহার কথা সকলের ভাল লাগে। সাময়িক সংসারের মায়ামোহে কিছুতে আবরণ পড়লেও হরিকথা কিছু সময় শুনিলেই সে আবরণ মুছিয়া যায়। ভাগবতের বক্তা বলেন, হরিকথা শোন। কিছু সময় শুনিলে ভাল লাগে না এমন লোক কমই আছে; নাই বলিলেই চলে।

Wordsworth বলেছেন—

> "Our birth is but a sleep and forgetting.
> The soul that rises with has our life-star
> Hath had elsewhere its setting."

তাঁহার কাছ থেকে আমরা এসেছি আবার তাঁর কাছেই যাই এতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কবিগুরু বলেছেন—

"ভাল নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বার বার, বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।"

এ জগৎ আমাদের প্রবাস, এই প্রবাস ছেড়ে সেই দেশের কথা কার না ভাল লাগে? Wordsworth বলেছেন—

"Our birth is nothing but the imprisonment of eternal soul into thus material encasement i.e. our body which is nothing but the prison house of that soul."

এই বৈজ্ঞানিক সমস্যার যুগে সেই আনন্দঘন বস্তুর স্মরণ না নিলে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সেই গোকুলনায়ক যশোদাগোপালের কাছে প্রার্থনা, জগজ্জীবের হৃদয়ে শ্রীরাধারূপ প্রেমের বিকাশ হোক। ❑

নবদ্বীপ বকুলতলা হাইস্কুলের শতবর্ষে শ্রীপাদের স্মৃতিফলক

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অসীম করুণার পাত্র শ্রীপাদ শ্রীমহেন্দ্রজী আমার জীবনকাণ্ডারী শ্রীগুরুদেব। তাঁহার কৃপাদেশে অমোঘ করুণা-শক্তিতে আমি সংসার ত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মচারীবেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ. পাশ করিয়া আমেরিকা গিয়া চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা মূলক নিবন্ধ দিয়া সেখান হইতে Ph.D. বিশেষণ পাইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই কথা স্মরণ করিয়া বকুলতলা হাইস্কুলের নূতন হলের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা যুক্ত করা এই ফলকটি অর্পণ করিলাম। মহাবতারী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর ও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কল্যাণময় কর্ম জয়যুক্ত হউক।

—ভক্তকৃপাভিখারী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

হরিপুরুষ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অসীম করুণার ভাণ্ডার শ্রীশ্রীপাদ মহেন্দ্রজী—ইনি মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির পূজ্য গুরুদেব। মহানামব্রতজী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে ও কৃপাশক্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইটি এম.এ. পাশ করিয়া একটি বিখ্যাত ধর্মসভায় যোগ দিতে আমেরিকা গমন করেন ও শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচার করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ লিখিয়া মহানামব্রতজী Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হয়। এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন। এই বিষয়টিও শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নাম বা তাঁহার গভীর দার্শনিকতার মর্ম পাশ্চাত্ত্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এখন পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষিত সমাজ শ্রীজীবের দার্শনিকতায় বিস্ময়ান্বিত। খ্রীষ্টান সমাজও ব্রজের প্রেমভক্তির মহিমা বার্তা পাইয়া মুগ্ধ। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ও তাঁহার কৃপাধন্য মহানামব্রতজীর পবিত্র অবদান স্মরণে নবদ্বীপ বকুলতলা হাইস্কুলের নূতন 'হল' নির্মাণকল্পে কিঞ্চিৎ আর্থিক দানসহ—এই স্মৃতিফলক অর্পিত হইল। ❑

** বকুলতলা হাইস্কুল, নবদ্বীপ, প্লাটিনাম জয়ন্তী স্মারকপত্র। সম্পাদক — শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য।*

ভদ্রলোকের ধর্ম—Religion of a Gentleman

[আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আধ্যাত্মিক আলোচনাসভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—'Whether Religion can provide an adequate Philosophy of Life for modern society"—কোনও ধর্ম আধুনিক মানবসমাজের যথার্থ জীবনাদর্শ সঞ্চার করতে পারে কিনা? এই আলোচনাসভায় খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী, ইসলাম ইত্যাদি সাতটি ধর্মমতের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্পর্কে নিজ নিজ ধর্মের দৃষ্টিতে আলোকপাত করেন। আলোচনার পঞ্চম দিনে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়াছিলেন সেটিই সভার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।]

"যে-কোনও যুগেই হউক মানবজাতির যোগ্য জীবনাদর্শ দিবার শক্তি ধর্মেরই আছে। আমার হিন্দুধর্মের সেই শক্তি প্রভূত পরিমাণে আছে। এই যুগের মানুষকে বাঁচিতে হইলে আমার ধর্মের আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার এই দাবি আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিব।"

সভার সুর ফিরিয়াছে। সবাই উৎকর্ণ। বিরাট্ জনতা কাষ্ঠবৎ মৌন রহিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। বক্তা বলিতে লাগিলেন।

—বর্তমান যুগের মানবসমাজের যথাযোগ্য জীবনাদর্শ হিন্দুধর্ম দিতে পারে কি না?—এই প্রশ্ন। উত্তর দেওয়া হইয়াছে—নিশ্চয়ই দিতে পারে। এখন এই উত্তরটি স্থাপন করিতে হইবে।

'বর্তমান যুগ' কথাটা বলিতে কী বোঝা যায় তাহা সর্বপ্রথমে আলোচনা করিতে হইবে। তারপর সেই যুগের যোগ্য জীবনাদর্শ কী তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। অবশেষে, সেই আদর্শ যে আমার ধর্মের অন্তরে বিরাজমান আছে, ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ইহাই আমার বক্তৃতার ধারা। ধারা (Procedure)-টা জানা থাকিলে আমার কথা অনুসরণ করিতে শ্রোতার কোনও অসুবিধা হইবে না, এই জন্য বলিলাম ঃ বর্তমান যুগের দুইটি বৈশিষ্ট্য—(১) যানবাহনের উন্নতি, (২) সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষিপ্রতা। Means of Transportation & Communication. এই দুইটি বিষয়ে বর্তমান যুগে বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল এই দু'টিতেই আমরা বিশেষ করিয়া পাইতেছি। পূর্বে পদব্রজে মানুষ ঘণ্টায় চারি মাইল অধিক চলিতে পারিত না। এখন এরোপ্লেনের সাহায্যে মানুষ ঘণ্টায় চারি শত মাইল চলিতে পারিতেছে। তার গতি শত গুণ বাড়িয়াছে। পূর্বে প্রাণপণ করিয়া চিৎকার করিলে দুইশত গজের অধিক দূরে মানুষ তাহার কণ্ঠধ্বনি পৌঁছাইয়া দিতে পারিত না। এখন সে ঘরে বসিয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরের গান-বাজনা কথাবার্তা রেড়িও যন্ত্র যোগে শুনিতেছে। কর্ণের শক্তি বহু গুণ বর্ধিত হইয়াছে।

যানবাহনের যন্ত্র ও সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্রের উন্নতিতে পৃথিবীটা যেন একটা ছোট স্থান হইয়া গিয়াছে। ইহাই বর্তমান যুগের বিশিষ্টতা। পৃথিবীটা হইয়া গিয়াছে ছোট। মানুষ দলে দলে ভূ-প্রদক্ষিণ করিতেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মেলামেশা, আদান-প্রদান ও সংঘর্ষ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাই বর্তমান যুগের বিশেষ লক্ষণ। এই যুগের মানবসমাজের যথাযোগ্য

** 'আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা।*

জীবনাদর্শ কী তাহাই এখন বিবেচনা করিব।

পৃথিবীটা যেন একটা ছোট স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই কথা বলিয়াছি। লোকসংঘট্ট বাড়িতেছে কিন্তু ইহা বাড়িতেছে রাজনীতি ও অর্থনীতির ভূমিকায়। অর্থাৎ ব্যবসায়ের বাজারে এবং রাজশক্তির সম্মিলন বা সংঘট্টের ব্যাপারেই মানুষে মানুষে আদানপ্রদান ও দেখাসাক্ষাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূলত পণ্য আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষকে অনুসন্ধান করিয়াছে। আর একজন আছাড় খাইতেছে কেবল অন্নবস্ত্রের অনুসন্ধানেই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তর-রাজ্যের কোনও মেলামেশা ঘটিতেছে না।

যার পাশে দশ ঘণ্টা বসিয়া গাড়িতে চলিয়াছি, যার গায়ে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতেছি, যে আমাকে দ্রুতযানে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার সুখ-দুঃখ ভোগ সংবেদনের সহিত আমার কোনও যোগাযোগ হইতেছে না। ইহা এক বিড়ম্বনা বিশেষ। জড় বিজ্ঞানের উন্নতিতে অর্থনীতির ভূমিতে মানুষের নৈকট্য হইতেছে, কিন্তু মানবনীতি বা আধ্যাত্মিক নীতির ভূমিতে দাঁড়াইয়া দেখিলে দেখা যায়—মানুষ, মানুষ হইতে দ্রুতগতিতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, শিক্ষক-ছাত্র, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী-প্রতিবেশী ইহাদের সম্পর্কগুলি ক্রমশই শিথিল হইয়া বহু দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল কারণে একদিকে পৃথিবী যেমন ক্ষুদ্রতর হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই বৃহত্তর হইতেছে। যন্ত্রের যুগের মানুষ যন্ত্র হইয়া যাইতেছে। তাহার ভিতরে যেটুকু মানবতা তাহা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইতেছে। যন্ত্র যন্ত্রের নিকটে আসিতেছে, মানব মানব হইতে দূরে সুদূরে সরিয়া যাইতেছে।

গীতার ভাষায় বলিলে—লোক-সংঘট্ট বাড়িতেছে, 'লোক-সংগ্রহ' কমিতেছে। কোনও মহত্তর মানবতার আদর্শে মানবসমাজ সংগৃহীত (organised) হইতেছে না। ইহাই হইল বর্তমান মানব-সমাজের সমস্যা। মানবসভ্যতার সমতা (balance) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদিকে সে আগাইয়া যাইতেছে, অপরদিকে সে পিছাইয়া পড়িতেছে। দুইদিকে সমানতাল রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য বর্তমান সভ্যতা নানাপ্রকার হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহে জর্জরিত।

কোনও মানুষের একটা হাত যদি মোটা হইতে থাকে, আর একটা হাত যদি সরু হইতে থাকে তাহা হইলে তাহা তাহার স্বাস্থ্যহীনতা ও অস্বাভাবিক অবস্থাই দ্যোতনা করিবে। বর্তমান মানবসমাজের অবস্থাও তদ্রূপ অস্বাভাবিক। যে অনুপাতে হাত-পা, কান, চোখ বড় হইয়াছে সেই অনুপাতে তাহার মনের সহানুভূতি, চিত্তের প্রসারতা, বুদ্ধির নির্মলতা বাড়ে নাই। বরং পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। চলচ্ছক্তি একশত গুণ বাড়িয়াছে—কিন্তু আত্মিক শক্তি এক সহস্র গুণ কমিয়াছে। এই জন্যই বর্তমান মানবসমাজের দুঃখের সীমা নাই। এখন এমন একটা জীবনাদর্শ (Philosophy of Life) চাই যাহাতে মানবসভ্যতার balance ঠিক করিয়া দিতে পারে। যাহাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল, প্রাণের মিল ও আত্মিক একত্ব স্থাপন করিয়া দিতে পারে। মানবীয় নীতির ভূমিকায় মহামানবের একটা মিলনভূমি সৃষ্টি করিতে যে পারিবে সেই হইবে adequate philosophy of modern society—বর্তমান যুগের মানবসমাজের যোগ্য দর্শন। এই বস্তুটি দিতে আমার হিন্দুধর্মের শক্তি আছে কি না—ইহাই প্রশ্ন। আমি

দেখাইব—আমার ধর্মের এই শক্তি প্রভূত পরিমাণেই আছে। অন্য অনেক ধর্মমত হইতে অত্যধিকরূপেই আছে। হিন্দুধর্মটি কী এইবার বুঝিতে হইবে। ইংরেজী ভাষায় আলোচনায় Hindu Religion কথাটা চলিতেছে। এই দুইটা শব্দের একটাও আমাদের নিজস্ব শব্দ নহে। 'হিন্দু' শব্দটি অহিন্দু শব্দ। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে হিন্দু শব্দটি পরিদৃষ্ট হয় না। অপর লোক তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া ডাকিয়াছে। তাহাদের নিজেদের নাম ছিল আর্য। বর্তমানে জার্মানিতে আর্য শব্দটা লইয়া অনেক কাণ্ডই হইতেছে। আমার মতে আর্য কথার অর্থ 'ভদ্র', ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভারতীয় আর্যদের ধর্মের নাম ছিল 'মানবধর্ম'। মনু প্রণীত গ্রন্থের নাম মানবধর্মশাস্ত্র। আপনারা ইচ্ছা করিলে এটাকে ভদ্রলোকের ধর্ম (Religion of a Gentleman) বলিতে পারেন।

তারপর, দ্বিতীয় কথা রিলিজিয়ন কথাটা লইয়া। ধর্ম শব্দের অনুবাদে রিলিজিয়ন কথাটা চলিতেছে। ইহা ঠিক নহে। কারণ ধর্ম শব্দের তাৎপর্য (connotation) ও রিলিজিয়ন শব্দের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্ম শব্দটির এক শব্দ দ্বারা কোনও অনুবাদ হয় না। দৃষ্টান্ত ধরুন, "অগ্নির ধর্ম দগ্ধ করা"—এই বাক্য ভারতবাসীর কাছে অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাহার অনুবাদে The religion of fire is to burn–কোনও ইংরেজী নহে, ফলত অর্থহীন। রিলিজিয়ন কথাটা কী তাহা পরে প্রসঙ্গক্রমে বলিব। এখন ধর্ম কথাটা কী তাহা বুঝিয়া লউন।

এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুই অপর বস্তু হইতে ভিন্ন। এই ভিন্নতার হেতু তার স্বকীয় স্বভাব (Inherent nature)। প্রত্যেক বস্তুরই একটা নিজস্ব স্বরূপ আছে। এই স্বরূপের মূলে আছে কতকগুলি গুণের সমাবেশ। যে মুখ্য গুণসমূহ (Essential Properties)-এর সমাবেশ থাকার জন্য বস্তুটি যাহা, তাহা হইয়াছে, তাহাই হইল তাহার ধর্ম। যাহা না থাকিলে সে বস্তু আর সে বস্তু থাকিবে না, (without which the thing will cease to be what it is) তাহাই হইল সেই বস্তুর ধর্ম (Innate qualities)। যেমন দগ্ধ না করিলে অগ্নি অগ্নিই নয়। দগ্ধ করা অগ্নির ধর্ম। তৃষ্ণা নিবারণ না করিলে জল জলই নয়। তৃষ্ণা নিবারণ করা জলের ধর্ম। বহ্নির বহ্নিত্ব, জলের জলত্ব কতগুলি গুণ-সমাবেশের উপর নির্ভর করে। উহাই তৎ তৎ বস্তুর ধর্ম। সংসারের সকল বস্তুরই একটা ধর্ম আছে। সূর্যের ধর্ম তাপ দেওয়া। মেঘের ধর্ম বারিবর্ষণ করা ইত্যাদি। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুরই বিশিষ্ট ধর্ম আছে।

ঠিক সেইরূপ মানবের একটা ধর্ম আছে। যাহা থাকিলে মানবকে 'মানব' বলিব। যাহা না থাকিলে বলিব না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।।"

মানুষে এবং পশুতে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবৃদ্ধি এই চারিকর্মে মানুষে ও পশুতে কিছুই তফাৎ নাই। তবু যে মানুষকে মানুষ বলি পশু বলি, না—ইহার কারণ তাহার ধর্ম। মানবে মানবত্ব ধর্ম আছে। এই ধর্ম কী? কী কী গুণ-সমাবেশ থাকিলে

মানবকে মানব বলিব?

'মানবধর্মশাস্ত্র' প্রণেতা মনু বলিয়াছেন—

"অহিংসা-সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীৎ মনুঃ।।"

মনু বলেন, ধর্মের পাঁচটি লক্ষণ। অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, সংযম ও সত্য। ইহাই মানবত্বের স্বরূপ।

অহিংসা—অহিংসা বলিতে হিংসার অভাব বুঝায়। মানুষ মানুষকে হিংসা করিবে না। একটা কুকুর একটা কুকুরকে অকারণে তাড়া করে। মানুষ তাহা করে না। সে অপরকে প্রীতি করিবে। যেরূপ ব্যবহারে তাহার নিজের যেরূপ সুখ-দুঃখের উদয় হয়—এইটুকু বুঝিয়া অপরের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। ইহাই অহিংসা ধর্ম। এই ধর্ম যে মনঃপ্রাণে পালন করে—তাহার সন্নিধানেও একজন একজনকে হিংসা করিতে পারে না। প্রকৃত অহিংস ব্যক্তির সম্মুখে ব্যাঘ্র পর্যন্ত ছাগ শিশুটিকে বধ করিবে না।

অস্তেয়—অস্তেয় শব্দের অর্থ অচৌর্য। মানুষ তাহার নিজ দাবি বা অধিকারের সীমা জানিয়া, অন্যের দাবি বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইহাই অস্তেয়। এই ধর্ম পশুতে নাই। যাহাতে আছে সে মানব। অস্তেয় ধর্ম যে পালন করিবে সে অপরের ঋণ শোধ করিবে। মানব পঞ্চবিধ ঋণ লইয়াই জন্মে। ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, নৃঋণ ও ভূতঋণ।

প্রথমত, **ঋষিঋণ :** দ্রষ্টা ঋষিদের কাছে সে ঋণী। নিত্য তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানব ঋণমুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, **দেবঋণ :** দেব বলিতে অদৃশ্য শক্তি ধারণা, যেমন জমিকর্ষণ কৃষকের কার্য, বর্ষণ তাহার অধীন নহে। কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে উহা হইবে। গৃহে নিত্য কোনও গৃহদেবতার অর্চনা দ্বারা মানব এই ঋণ স্বীকার করিবে।

তৃতীয়ত, **পিতৃঋণ :** পিতৃপিতামহগণের কাছে প্রত্যেকেই ঋণী। তাহাদের প্রীত্যর্থে তর্পণাদি দ্বারা এই ঋণের স্বীকার করা কর্তব্য।

চতুর্থত, **নৃঋণ :** প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রত্যেক মানুষ ঋণী। একটি ব্যক্তি যাবতীয় বস্তু ভোগ করে—তাহার কোনটিই তাহার একার চেষ্টা বা পরিশ্রমে সংগৃহীত নয়। একখানি বস্ত্র বা একমুষ্টি অন্নের মধ্যে শত শত লোকের পরিশ্রম রহিয়াছে। এই ঋণ শোধের জন্য গৃহে অতিথি আসিলে তাহার সেবা করা কর্তব্য।

পঞ্চমত, **ভূতঋণ :** ইতর প্রাণীদের কাছে মানবের একটা ঋণ আছে। গরু, ঘোড়া, ছাগ, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীরা নিরন্তর আমাদের অতুলনীয় সেবা করিতেছে। ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান শকুনি, গৃধিনী নিরন্তর পচা দুর্গন্ধ আহার করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার আনুকূল্য করিতেছে। এই ভূতঋণ শোধ করিবার জন্য নিত্য গৃহপালিত পশুদিগের প্রতি যত্নপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। এই পঞ্চঋণের বোধ যার আছে এবং যে প্রত্যহ কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা

করে সেই যথার্থ অস্তেয় ধর্ম পালন করে। গীতা বলিয়াছেন ঈশ্বরের দ্রব্য সকলই। তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া যে গ্রহণ করে—সেও চোর। নিবেদিত বস্তু গ্রহণেই অস্তেয় ধর্ম রক্ষিত হয়।

শৌচ—শৌচ অর্থ শুচিতা-পবিত্রতা। ইহা দুই প্রকার। আন্তর ও বাহ্য। স্নান আচমনাদি দ্বারা দেহকে পবিত্র রাখা বাহ্য শৌচ। সৎ কথা সদালোচনা দ্বারা অন্তরটাকে নির্মল রাখা—অন্তঃশৌচ। অসৎ চিন্তায় মানুষের অন্তর সত্য সত্যই মালিন্যযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, পবিত্র ভাবনা অন্তর পবিত্র রাখে।

সংযম—সংযম অর্থ সংযত রাখা—ইন্দ্রিয়ের দাস না হওয়া। মানুষের আহার্যের সারাংশ ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়। ইহাই মানবদেহের সারবস্তু। কাহারও দেহেই এই শক্তি অফুরন্ত নাই। সীমাবদ্ধ বস্তু অনিয়মে অপব্যয়িত হইলে অচিরাৎ দেহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। এই হেতু, ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া বিধিনিয়মপূর্বক এই শক্তির সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করিলে সংযম-ধর্ম রক্ষিত হয়।

এই ধর্মেরই নামান্তর ব্রহ্মচর্য ধর্ম। বর্তমানে পৃথিবীতে যত আধি-ব্যাধি, দুর্নীতি দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই এই ব্রহ্মচর্যের অভাবহেতু। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন—একমাত্র ব্রহ্মচর্য রক্ষা হইতেছে না বলিয়াই বর্তমানে মানবসভ্যতার এই দুর্দশা। যে ইন্দ্রিয়জয়ী সে বিশ্বজয়ী হইতে পারে।

সত্য—অন্তর ও বাহির এক রকম রাখার নাম সত্যধর্ম পালন। ভিতর বাহির দুই রকম হইলে জীবনটা দুই টুকরা হইয়া যায়। মানব যত অসত্য আচরণ করে তাহার জীবনটা ততই খণ্ডিত হইতে থাকে। শেষে আর নিজ সত্তাকে খুঁজিয়া পায় না। এই অবস্থায় দুঃখের অবধি থাকে না। সত্য পালনে জীবন অখণ্ড (Integral) থাকে। অখণ্ড জীবনই শক্তির উৎস। এই সংসারেও সত্যেরই জয়। আপাতদৃষ্টিতে কখনও অন্যরূপ মনে হইলেও—তাহা ঠিক নহে। অসত্য কখনও এই সংসারে দাঁড়াইতে পারে না। সে দাঁড়ায় ততক্ষণ যতক্ষণ তাহার কাছে থাকে সত্যের ধার করা পোশাক। ঐ পোশাক খুলিয়া গেলে সে উবিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডে মিথ্যার কোনও Foot hold নাই।

মানবধর্মের আদি আচার্য মনুর মতে এই অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, সংযম ও সত্য এই পাঁচটি মানবধর্মের লক্ষণ। ঐ মানবধর্ম শাশ্বত। যেখানেই মানব ছিল, আছে, থাকিবে—তাহারই এই ধর্ম। এই ধর্ম অনাদি, নিত্য সনাতন। ইহার কোনও স্থাপয়িতার প্রয়োজন নাই। এইজন্যই হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে।

মানবধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মের এই হইল ভিত্তিভূমি (foundation)। মানব মানবত্ব পাইয়া এই ভূমিতে স্থিত হইবে। যে মানবদেহী কিন্তু এখনও মানবত্ব পায় নাই তাহাকে তাহা পাইবার জন্য সর্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। মানবত্ব লাভের পর মানব আরও উর্ধ্বে উঠিবে। মানবের ভিতর দেবত্ব অব্যক্ত (potential) আছে। সেই প্রচ্ছন্ন দেবশক্তিকে বিকশিত করিতে হইবে। ইহা মানবজীবনের লক্ষ্য। ধর্মই এই লক্ষ্য সাধনে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

অব্যক্ত আত্মশক্তিকে সুব্যক্ত করত দেবত্বের মহামহিমময় শিখরে উঠিবার জন্য চেষ্টা-পরায়ণ মানবের জন্য আর্য-ঋষি তিনটি মার্গ বা পথ নির্দেশ করিয়াছেন— কর্মের পথ, জ্ঞানের

পথ ও ভক্তির পথ। এই মার্গ ত্রিবিধ হইবার কারণ এই যে, মানবের মনে প্রধানত তিনটি শক্তি ক্রিয়াপরায়ণ—ইচ্ছাশক্তি, ভাবনাশক্তি ও অনুভবশক্তি (thinking, willing & feeling)। যাহার ভিতরে ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে যাইবে কর্মের পথে। যাহার ভিতরে জানিবার ইচ্ছা প্রবল সে যাইবে জ্ঞানের পথে। যাহার ভিতরে স্নেহ প্রীতির প্রাবল্য সে যাইবে ভক্তির পথে। এই মার্গত্রয় সনাতন। ইহা কাহারও সৃষ্ট নহে। মানবের মৌলিক স্বরূপের ওপরই ইহাদের ভিত্তি। ইহাদের একটি না একটি মার্গে চলাই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি।

ঐ সকল পথে চলিতে আরম্ভ করিলে পথে পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সিদ্ধ আচার্য মহাজনগণের কৃপাশিস সম্বল করিয়া পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মার্গেই বহু আচার্য চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের ভাবধারা ও বিধিনিয়মকে—তাঁহাদের 'মত' বলে। কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি—ত্রিবিধ মার্গের যে কোনও একটিতে প্রবেশপূর্বক একটি নির্দিষ্ট মতের অনুসরণ করিবেন। ইহাতেই চরম সম্ভাব্য বা সাধ্যবস্তুর সান্নিধ্য লাভ হইবে। তিনটি কথা বলা হইয়াছে—ধর্ম, মার্গ ও মত। এই তিনটি বস্তুকে বুঝিয়া অনুধাবন করতঃ ধ্যান করিলে হিন্দুধর্মের বিরাট্ সৌধটি (structure) দর্শন করা যাইবে। আপনাকে প্রথম হইতে হইবে মানুষ। তারপর মনে করুন—জ্ঞানমার্গে গমন করিলেন। সেখানে আচার্য শঙ্করের মত ধরিলেন। অপর একজন ভক্তিমার্গে গিয়া গোস্বামী তুলসীদাসের মত ধরিলেন। অপর কেহ কর্মমার্গে গিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহের মত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ভারতীয় ঋষির কোনও আপত্তি নাই। বরং সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। কারণ ঋষি জানেন যে, বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন মার্গ ও মত গ্রহণ করিবেই। কেবল মানবধর্মের ভিত্তিভূমিতে একত্ব থাকিলেই হইল। আপনারা যাহাকে Christian Religion বলেন আমরা তাহাকে বলিব খ্রীষ্টমত। যাহা Judaism ইহুদী ধর্মকে আমরা বলিব মুশা (Moses)-এর মত। ইসলামকে আমরা বলিব হজরত মোহম্মদের মত। হিন্দুর মতে ইহার কোনটাই 'ধর্ম' নহে। ধর্ম একমাত্র মানবধর্মই, তাহা বিশ্বজনীন—বিশ্বমানবকে সে আলিঙ্গন করিতে পারিবে। হিন্দুধর্মে—ত্রিবিধ মার্গে বহু শত 'মত' আছে। আরও কত হইতেছে, হইবে। খ্রীষ্টমত, মুশামত বা হজরতের মতকে হিন্দু পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদা করে। মানবত্ব লাভ করিয়া মানুষ দেবতা হইবার জন্য যে-কোনও সিদ্ধ মহাপুরুষের 'মত'-ই গ্রহণ করুক না কেন—তাহা দ্বারা তাহার নিজের ও মানবপরিবারের কল্যাণই হইবে। আর মানবত্বের ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া মতকে ধর্মের স্থানে বসাইলে সে মত যত বড় মহান্ হউক, সকল মানবের কল্যাণ সাধনে সে অপারগ হইবে। মানবজাতির বর্তমান সমস্যার সমাধানে সে বিফলমনোরথ হইবে। কোনও দিন যদি মানবজাতির সুবুদ্ধি জাগে—তাহারা এক পরিবারের মতো বাস করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে এই হিন্দুধর্ম বা ভদ্রলোকের ধর্ম ছাড়া আর কোনও ব্যাপক ছায়াতল নাই, যেখানে সে আশ্রয় লইতে পারে।

বর্তমান সভ্যতার যে সমস্যার কথা আমি প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি সেই সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি এই ধর্মের আছে কি না এখন আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। সভ্যতা unbalanced হইয়াছে, তাহাকে balanced করিতে হইবে। লোক-সংঘট্ট বাড়িয়াছে—তাহাদিগকে 'সংগ্রহ' করিতে হইবে। মানুষ যন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সেই যন্ত্রের মধ্যে মানবপ্রীতির প্রবাহ বহাইতে

হইবে। মানবকে দেবত্বের ভূমিতে তুলিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন মহত্ত্বকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। সকল মত সকল পথকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—তবেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হইবে।

আমার ধর্মের রূপটি আপনাদের কাছে অঙ্কন করিয়া দিয়াছি। ইহা এত বড়, এত মহান্, এত উদার ও এত গভীর যে ঐ সকল সমস্যাগুলি সমাধান করিবার শক্তি ইহাতে অপর্যাপ্ত পরিমাণেই রহিয়াছে। আপনি বিচার করুন, আঘাত করুন, যে সিদ্ধান্ত আমি স্থাপন করিলাম তাহার একটা কথাও খণ্ডিত হইবার নয়। কারণ—ইহা সত্যদর্শী ঋষির গভীরতম অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সনাতন। ❒

বর্তমান জগতে ধর্ম

ধর্ম-কথার আলোচনা বর্তমান যুগে এক বিষম সমস্যা। দেশে ও সমাজের অবস্থা এমন যে ধর্ম-কথা আলোচনার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সব রকম কথার আলোচনা চলে, কেবল ধর্ম-কথা ছাড়া। তাই জীবনের মধ্যে আমরা ধর্মের জন্য কোন একটা স্থান দেখতে পাই না বা রাখতে চাই না।

স্বাস্থ্য বলুন, রাষ্ট্র বলুন, অর্থ, শিক্ষা, সমাজ, শিল্পকলা, যাত্রা, সিনেমা, খেলাধূলা, মদ, গাঁজা যা বলুন না কেন সব কিছুরই দরকার আছে; নাই কেবল ধর্মালোচনার। মানুষকে হামেশাই বলতে শুনি, ধর্ম কী দিবে? ধন-জন, বিত্ত-সম্পদ্, স্বাস্থ্য-সুখ, যশ-প্রতিষ্ঠা ধর্ম ইহাদের কোন্‌টা দিতে পারে? কোনটাই না। সবচেয়ে বড় সমস্যা অন্ন-বস্ত্রের, ধর্ম যখন তা দিতে পারে না, তখন ধর্মের আর কিছু প্রয়োজন দেখি না।

একদল মনে করেন, যে-যুগে বিজ্ঞান ছিল না, সেই যুগে মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়-ভ্রান্তি থেকে হ'ত ধর্মের জন্ম। তারা জানতো না বৃষ্টি কেন হয়, তাই বৃষ্টি-দাতা রূপে কল্পনা করেছে এক ইন্দ্র দেবতার। কলেরা কেন হয় বুঝতো না তারা, তাই তা কালীর কোপ বলে ধারণা করেছে ইহা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এ-যুগের মানুষ জেনেছে বিশ্বের সব রহস্য। ভ্রান্তি গেছে দূরে, দেবতা-স্বর্গ-নরক-আত্মা-পরমাত্মা অর্থহীন কল্পনা—একথা আজ কারও অজানা নয়।

সমাজে ধনী-দরিদ্র, বাদশা-বান্দা, উঁচু-নীচু ভেদ আছে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ হতে শূদ্র পর্যন্ত শ্রেণীগুলি ধাপে ধাপে সাজানো আছে। যারা উচ্চ শ্রেণীর, তারা চিরকাল পায়ের নীচের লোকগুলিকে নানা উপায়ে হীন অবস্থার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছেঁ। এই কার্যে ধর্ম তাদের একটা প্রধান সহায়। শ্রেণীবিভাগ সমাজের একটা অভিশাপ স্বরূপ। ধর্ম উহারই ধারক ও পোষক। কাজেই ধর্ম ভাবনা-রূপ ব্যাধি যত শীঘ্র সমাজ হতে বিতাড়িত হয়, ততই সকলের মঙ্গল। এই জাতীয় মন্তব্য সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকের মুখে শুনি। সত্যই আমাদের সামনে এক ভয়ানক জটিল প্রশ্ন—জীবনে ধর্মের কোন প্রয়োজন আছে কি নেই? এই প্রশ্নের উত্তর না

* *'বর্তমান জগতে ধর্ম' (পকেট পুস্তিকা)। ১ম সং ১৩৯৩। ট্রাস্ট।*

দিয়ে ধর্মকথা আলোচনার কোন অর্থ হয় না।

এই গেল এক দিকের বক্তব্য। অপর দিকে দেখতে পাই, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই অশান্তির আগুন জ্বলছে। অশান্তি—অনেক রকমের। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতীয়—সকল ক্ষেত্রেই বহু প্রকারের উদ্বেগ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরোধ বিদ্বেষ লেগেই আছে। পৃথিবীর সকল দেশে এইরূপ সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার একই সময়ে প্রাদুর্ভাব আর কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা হতে আরম্ভ করে বিরাট্ বিরাট্ বিশ্ব সমস্যাগুলি আজ মানব জাতির সামনে দাঁড়িয়ে যেন বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও জড়-বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে উপহাস করছে। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের অভাব অভিযোগ যেন বহু গুণ বেড়ে গেছে। মানুষের বহু গবেষণার ফল-স্বরূপ কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন দেখি মানুষেরই যুগ-যুগান্তর সাধনালব্ধ সভ্যতার ধ্বংস-সাধনে নিযুক্ত, তখন মনে হয়, এই সভ্যতার মূলে কোথাও এক ভয়ানক গলদ রয়েছে। কী সেই গলদ, কোথায় সেই গলদ, শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের তা আজ সব থেকে বড় ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত।

এই দুর্বিষহ দুরপনেয় পরিস্থিতির মধ্যে ভরসার কথা এই, কিসে মানুষের কল্যাণ হবে, এরূপ চিন্তা করার লোকও কিছু আছেন। একদিকে যেমন রণ-দামামা বেজে উঠেছে, ধ্বংসের তাণ্ডব হয়েছে শুরু, অন্যদিকে শান্তিকামী মানুষ ও প্রতিষ্ঠান কিছু দেখা যাচ্ছে, যারা চুপ করে নেই। মানব সমাজের এই অসহনীয় দুঃখপূর্ণ পরিস্থিতির মূল অনুসন্ধানে তাঁরা ব্যাপৃত ও উহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প।

বস্তুতঃ জগতের দুঃখ অশান্তি দূর করতে সর্বাগ্রে জানতে হবে, উহার প্রকৃত কারণ। রোগের চিকিৎসার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, রোগের নিদানটি নির্ধারণ অর্থাৎ diagnosis। উহা যথাযথ নির্ধারিত হলে, চিকিৎসার অর্ধেক কার্যই নিষ্পন্ন হয়। মানব-সমাজের বর্তমান দুরবস্থার কারণ বিষয়ে সকল শান্তি-প্রয়াসীদের অভিমত এক নহে। মোটামুটি তিনটি মতের প্রাধান্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সমস্যাগুলি দেখার জন্যই মতের বিভিন্নতা।

(১) শান্তিকামীদের এক দলের দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক। তারা মনে করেন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপরিচালনে জনগণের স্বাতন্ত্র্যের অভাব ও পর-রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ইত্যাদি সকল দুঃখের মূল কারণ। যতক্ষণ কোন রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠী অপর কোন রাষ্ট্রশক্তি, গোষ্ঠীর বা দলের আধিপত্যে বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততক্ষণ জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। কারণ উক্ত রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী নিজ স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই অপর পাঁচজনের উপর উৎপীড়ন করে। প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগলে নিজের বাড়ী দগ্ধীভূত হবার সম্ভাবনা। স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজন, সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অন্য বৃহত্তর শক্তির প্রাধান্য বিস্তার রোধ, গোষ্ঠী বা দলগত প্রভাব ও প্রাধান্য মুক্ত সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন।

(২) আর একদল আছেন, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে। এরা বলেন, কেবল রাষ্ট্রীয় অধিকারে সাম্য কোন কাজের কথা নয়। সমাজে অর্থ যার সে-ই প্রভুত্বের অধিকারী, সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ তার আয়ত্বে আসতে বাধ্য। বর্তমান মানব সমাজে

কারও সম্পদ্ অপর্যাপ্ত, কেউ একেবারে নিঃস্ব, কেউ কিছু মাত্র না খেটে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে পৈত্রিক সম্পদ্ বলে, আবার কেউ সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও ক্ষুধার অন্ন পায় না, মালিকের দয়ার পাত্র হয়ে জীবন কাটায়। এক দিন এই খেটে-খাওয়া মানুষের চেতনা জাগবে, এই অসাম্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াবে, সমাজের শান্তি হবে বিঘ্নিত। এই আর্থিক অসাম্য দূরীভূত না হলে সমাজে-রাষ্ট্রে শান্তি আসতে পারে না।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে স্থান আছে, যা কিছু কৃষি ও খনিজ সম্পদ্ আছে, তাতে পৃথিবীর মানুষের সমান অধিকার। মুষ্টিমেয় কয়েক জন অপর বহু জনকে বঞ্চিত করে যে ভোগ করছে বা সঞ্চয় করছে, উহা অন্যায়। এই অন্যায় যত দিন থাকবে, ততদিন স্থায়ী শান্তির আশা সুদূর পরাহত। এই মত, অর্থনৈতিক সাম্যবাদীর। ইহারা স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজন মনে করেন,—অর্থসম্পদের অসম অধিকার দূর করে সকলের মধ্যে উহার সম-বণ্টন। মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র থাকবে না। মানুষ মানুষরূপে সমান দাবিতে ও অধিকারে জগতের সম্পদ্ ভোগ করবে, তবেই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৩) এতদ্ভিন্ন এক দল আছেন, যাদের বিশ্লেষণ বা মতাদর্শ সমাজ-নৈতিক বলা চলে। তাঁরা বলেন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অসাম্য অশান্তির মূল কারণ নয়। সমাজের মধ্যে মানুষের সামাজিক অধিকারে যে ভয়ানক অসাম্য বা বিভেদ, উহা আরও বেশী মারাত্মক। রাষ্ট্রীয় কারণ নেই, অর্থের প্রাচুর্য নেই, শিক্ষা-সদ্‌গুণাদির বিচার নেই, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মাবার জন্য বৈশ্য-শূদ্র অপেক্ষা সে বড়। সাদা চামড়া জাতি যেমনই হোক, সে কালো চামড়া নিগ্রো হতে শ্রেষ্ঠ। ইহা এক অদ্ভুত প্রহসন। কোন কারণ নেই, তবু এক জন আর এক জনের উপর আধিপত্য করবে ও নানাভাবে সামাজিক অধিকার হতে অন্যকে বঞ্চিত রাখবে। চণ্ডাল গৃহে জন্মেছ বলেই তোমার হাতের জল অশুদ্ধ, আমার পাতকুয়ার জল ছুঁতে পারবে না, আমার ঘরে ঢোকার অধিকার নেই। কালো চামড়া বলে তুমি বিশেষ কোন হোটেলে ঢুকতে পারবে না, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রবেশাধিকার পাবে না। এই মিথ্যা শ্রেণীবিভাগ ও তজ্জনিত অত্যাচার যতদিন মানব সভ্যতার গাত্রে কণ্টক স্বরূপ বিদ্ধ রয়েছে, ততদিন শান্তি স্থাপনের কোন চেষ্টা ফলবতী হবে না।

শেষোক্ত এই দলকে সমাজ-নৈতিক সাম্যবাদী বলা চলে। এদের ধারণা, সামাজিক অধিকারে সকলেই সমান, বৈষম্য মানুষের সৃষ্টি এবং উহা কৃত্রিম। অপরকে পদদলিত করার অপকৌশল মাত্র। একই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই বিভেদ ও তজ্জনিত ঘৃণা-বিদ্বেষ কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাম্যে দূর হবার নয়। অথচ সমাজের এই কুষ্ঠ ব্যাধি থাকতে শান্তির কোন আশা নেই।

তিন দলের কথা বলা গেল। ইঁহারা সকলেই শান্তিকামী। কেবল দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্। সকলের মূল কথা অসাম্য (inequality) দূর করতে হবে; রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যগুলি দূর হলেই শান্তি। চিন্তা রাজ্যে এই তিন দলের কথা প্রায় একরূপ হলেও কার্যক্ষেত্রে ইঁহারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেই। এঁদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব লেগে আছে, সেজন্য নূতন অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

শান্তিকামী আমরাও। আমাদের কিছু বলার আছে। আমরা কারা, আমাদের কথা কাদের কথা—তাই আগে বলব। আমাদের কথা ভারতের নিজস্ব কথা, ভারতাত্মার বাণী। ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, কথা আছে। এতক্ষণ যে তিন দলের কথা বলা হল, উহা কোন ভারতীয়দের মুখে শোনা গেলেও কথাগুলি ভারতীয় নয়। উহাদের জন্ম পাশ্চাত্ত্য দেশে—ইউরোপ আমেরিকায়। ভারতীয় যে-সব নরনারীর মুখে এখন ঐসব কথা শোনা যায়, তাদের শিক্ষা পাশ্চাত্ত্য ভাবান্বিত। তাদের দেহ ভারতীয় জলবায়ুতে পুষ্ট হলেও, মন-বুদ্ধি ইউরোপীয় খোরাকে তুষ্ট। বর্তমান ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিরই স্বরূপ এই।

প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক যুগের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য হতে আরম্ভ করে বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, শুক, সনকাদি; আদি মধ্যযুগের কপিল, কণাদ, গৌতম বুদ্ধ; উত্তর মধ্যযুগের শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য ও পরবর্তী কবীর, তুলসীদাস, দাদু, মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ; তৎপরবর্তী শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি এবং বর্তমানকালের—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, ভাস্করানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, নিগমানন্দ, গম্ভীরানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, প্রভু জগদ্বন্ধু প্রমুখ অসংখ্য দেব-মানবের সাধনাপুষ্ট যে বিরাট্ আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহ, অনুভূতি ও সংস্কৃতি—তাহাই 'ভারতীয়' বলে আখ্যাত ও পরিচিত। আমরা এই ভারতীয় দলভুক্ত। ইঁহাদের কথাই আমাদের কথা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতিব ধারক ও বাহক আর্য ঋষিদের কথাই—ভারতের নিজস্ব কথা। বর্তমান যুগসংকটে, বিশ্বসমস্যা সমাধানে ঋষিদের কী দান, কী বক্তব্য, কী কথা—তাই বলব। কথাটা একেবারেই তুচ্ছ নয়। ইহা বহু প্রাচীন ও বহু পরীক্ষিত। প্রাচীন হলেও সাধক-পরম্পরায় ঐ ধারা আজও অম্লান, অনির্বাণ দীপশিখার মত আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আলো দান করছে। সুতরাং শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে যুগসমস্যার সমাধান মিলতেও পারে, জীবনের দুঃখ অশান্তি চিরতরে দূর হতেও পারে। যদিচ উহা অবশ্যই লাভ হবে, নিশ্চিতই মিলবে, বলে আমাদের বিশ্বাস।

ঋষিরা বলেন, ব্যাধি যার তারই চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ব্যাধি ব্যক্তির। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি ব্যক্তিরই সমষ্টি। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সমস্যা মূলতঃ ব্যক্তিজীবনের, সমষ্টিভূত ব্যক্তি-জীবনের সমস্যা। প্রথমতঃ রোগের কারণ নির্ধারণ করতে রোগীর অবস্থা বিশ্লেষণ করা দরকার। ব্যক্তির স্বরূপ জানা দরকার।

ব্যক্তির জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানতঃ দু'টি বস্তু পাই। তন্মধ্যে একটি বস্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, অপরটি সদাসর্বদা অপরিবর্তনীয়। সর্বদা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে মানুষের দেহ। যে শাশ্বত বস্তু দেহ-মধ্যে থাকায় শত পরিবর্তনের মধ্যেও ব্যক্তি আপনাকে অপরিবর্তনীয় বলে জানে, উহাই আত্মা। ঋষিরা বলেন, এই আত্মা জন্মের পূর্বেও ছিল, মৃত্যুর পরেও থাকবে। আত্মা দেহ-আশ্রয়টি যে মুহূর্তে ছেড়ে দেয়, সেই ক্ষণ হতেই দেহের বিনাশ শুরু হয়, দেহের মৃত্যু ঘটে। আত্মা স্বীকার না করলেও, এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, আমাদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা অপরিবর্তনীয় সত্তা আমাদের মধ্যে

আছে। উহা আছে বলেই শৈশব, বাল্য, কৈশোর যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে দেহের অশেষ পরিবর্তন ঘটলেও নিজের একই ব্যক্তি-সত্তা সম্বন্ধে' নিজের বা অপরের মনে কোনরূপ সংশয় উদ্রেক করে না। বাল্যের আমি আজ বার্ধক্যেও সেই আমি আছি, এই বোধ আমার নিজের ও আমার সম্বন্ধে অপরের হচ্ছে যে বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমানতা হেতু, সেই বস্তুই আত্মা। দেহ ও আত্মা এই দুই বস্তু নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনই বিদ্যমান—ইহাই ঋষির দিব্য অনুভূতি।

'আত্মা' আছে—এ কথায় অনেকে আপত্তি করতে পারেন। বিগত একশত বৎসর আমাদের দেশের উপর দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের ঘূর্ণাবর্ত প্রবলভাবে ব'য়ে গিয়েছে। ফলে জড়বাদীর সংখ্যা বেড়েছে ভয়ানক ভাবে। তারা বলেন, দেহই আছে, আত্মা নিছক কল্পনামাত্র। তাদের অনেকে মানব জীবনটা বোঝাতে ঘড়ির দৃষ্টান্ত দেন। কতকগুলি কলকব্জা ঘড়িটা চালায়। দেহও তদ্রূপ একটি যন্ত্র বিশেষ। পাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, রক্তশোধন যন্ত্র, ইত্যাদি এমন সুন্দর কৌশলে সাজানো আছে যে দেহটি সচল হয়ে আছে। ইহাদের কোনটি বিকল হলেই দেহের মৃত্যু। আত্মা স্বীকার করার কোন যুক্তিযুক্ততা নেই। এই হল জড়বাদীদের কথা।

সুখের সংবাদ এই, পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতরাই এখন দৃঢ়ভাবে এই মত খণ্ডন করেছেন। তাঁরা বলেন, দেহ একটি যন্ত্র বটে, কিন্তু ইহা এক অসাধারণ যন্ত্র। ঘড়ি বা মানুষের তৈরী কোন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয় নহে। ঘড়ির অতি ক্ষুদ্র অংশ নষ্ট হলেও ঘড়ি মেরামতের জন্য মিস্ত্রীর কাছে যেতে হয়। ঘড়ি নিজে উহা সারাতে পারে না। কিন্তু দেহের কোন অংশ কাটলে বা ভাঙ্গলে শরীর নিজেই উহা মেরামত করে নেয়। এইরূপ নিজেই নিজের বিকল অংশ মেরামত করে এমন যন্ত্র (self-repairing machine) এখনও পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয় নি। দেহ কেবল নিজেকে মেরামতই করে না, ক্ষয় রোধ করে নিজের পুষ্টির ব্যবস্থা নিজেই করে। খাদ্যবস্তুকে রক্তে পরিণত করে নিজ বল সংগ্রহ করে। কোন যন্ত্রেরই এই ক্ষমতা নেই। মেসিনে তুলা দিলে সুতা হয়, সুতা দিলে কাপড় দেয়, কিন্তু উহা হতে সে নিজে কিছুই লাভবান হতে পারে না। দেহের এই আত্মশোধন ও আত্মপোষক (self-repairing and self-sustaining) ক্ষমতা যে বস্তুর জন্য, উহাকে 'আত্মা' বলতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না। আত্মা না থাকলে দেহের নাশ বা পচন (decomposition) রোধ করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা নানা কারণে বাধ্য হয়েই জড়বাদের উপর আস্থা হারিয়েছেন। চিন্তাক্ষেত্রে যারা পশ্চাদ্‌বর্তী, তারা এখনও জড়বাদের পক্ষ নিয়ে হৈচৈ করে।

ঋষিদের কথায় আসা যাক। মানব জীবন বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল—দেহ ও আত্মা। এই দু'য়ের সমবায়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব রক্ষায় দু'য়েরই সমান দাবী ও সমান চাহিদা। তাতেই মানব জীবন, সমাজ, সভ্যতার সামঞ্জস্য রক্ষা হবে। কিন্তু জন্ম হতে মৃত্যু, সারা দিবা-রাত্র দেহের দাবী মেটাতেই সকলে ব্যস্ত। সকল কর্মই আমাদের দেহের পোষণ ও তোষণের জন্য। দোকান-বাজার লক্ষ প্রকারের দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ, সবই দেহের সুখবিধান বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। আত্মার প্রয়োজন বা আত্মার তৃপ্তির কথা কেউ ভাবি না। পত্র-পত্রিকায় হাজার প্রকার বিজ্ঞাপন, সবই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। আত্মার তৃপ্তির জন্য কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নেই কোথাও। আত্মার প্রয়োজন বিষয়ে সাধারণে অন্ধ। দৈহিক প্রয়োজনের মত ইহার প্রয়োজন

বোধের কোন অনুভব নেই।

ঋষিরা বলেন, আত্মার প্রয়োজনের বস্তু কেউ খোঁজ করে না, আত্মার তৃপ্তি-দায়ক বস্তুকে কেউ কোথাও দেখতে পান না, এই অবস্থায় শান্তিলাভের তো কোন আশাই দেখি না। তোমার ভিতরে দুইজন দাবীদার। দেহ ও আত্মা—উভয়ের দাবীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কেবল দেহের তৃপ্তি ও সুখসাধনে তো জীবনের অশেষ দুর্গতি ঘুচবে না। তোমাদের একপেশে (one-sided) আচরণে দেহটি পুষ্ট হয়ে বুর্জোয়া (bourgeois) ধনী সেজেছে, আত্মা উপেক্ষিত হয়ে সর্বহারার রূপ লাভ করেছে। তাই ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই ভয়ানক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এই বৈষম্য সকল দুঃখের কারণ। ইহা দূর করতে না পারলে শান্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ঐ বৈষম্য সৃষ্টি করবে বহু প্রকারের সমস্যা—ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-আন্তঃরাষ্ট্রীয় জীবন সমস্যা পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইবে।

মানব-জীবনে যত প্রকার অশান্তি আছে, সবেরই মূল কারণ এই দেহ ও আত্মার বৈষম্য। যত প্রকার উদ্বেগ, অশান্তি, গণ্ডগোল সবই ক্ষুধার্ত আত্মার আর্তনাদ। জাতিতে জাতিতে রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ, মালিক-শ্রমিকের লড়াই, হিন্দু-মুলসমান ও সাদা-কালোর আত্মঘাতী কলহ, সামাজিক বর্ণবিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, পারিবারিক অশান্তি, কলহ সবকিছুর মূলে আত্মার অসন্তোষ। শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে দেহে প্রকাশ পায় নানা ব্যাধি, অল্পজ্ঞ চিকিৎসক বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সাময়িক কিছু উপশম করতে সক্ষম হলেও ব্যাধি নিরাময় হয় না। উহা অন্য রূপে পুনরায় দেহে ব্যাধির প্রকোপ ঘটায়। সেইরূপ আমাদের সমাজ দেহে অশেষ প্রকার রোগ। রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা উহা প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করছেন। কখনও কখনও সাময়িক কিছু ফল পেলেও রোগের মূলোৎপাটন না হওয়ায় পুনরায় ঐ ব্যাধি অন্যরূপে সমাজদেহে প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞ বলেন, ক্ষুধাতুর আত্মাকে তৃপ্ত না করলে, উপযুক্ত খাদ্য না দিলে, ব্যাধির নিরাময় হবে না; পক্ষান্তরে আত্মার তৃপ্তিতেই হবে সর্ব ব্যাধির চিরতরে নিরাময়। ইহাই আর্যঋষিদের কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব কথা, আমাদের কথা।

এই আত্মা বস্তুটি কী? তাঁর ক্ষুধা কী, তৃষ্ণা কী, তাঁর খাদ্য-পানীয় কী?—এই সব আলোচনার নামই ধর্মালোচনা। ধর্ম আলোচনা এতদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখন বিচার করুন, মানবজীবনের এই সংকটে, বহুবিধ জটিল সমস্যার আবর্তে ধর্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। আমরা মনে করি, বর্তমান সংকটে সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য প্রয়োজন এই ধর্মালোচনার। মানবজীবনে ধর্মের স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে আমরা উত্তরটির নিকটবর্তী হয়েছি।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, মানুষ তার আত্মা কী তা না বুঝে আত্মার পুষ্টির উপকরণ সংগ্রহ না করলে কোন রাষ্ট্র, সমাজ বা জাতি ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকতে পারে না। এই অর্থে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কথাটা মনে হয় শশশৃঙ্গের মত অলীক। কোন মতবাদই শান্তি আনবে না, যদি না সাম্যবাদ আসে। কোন সাম্যবাদ কার্যকরী হবে না, যদি না আধ্যাত্মিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক সাম্যের উপলব্ধিই মানুষকে এই সত্য-দৃষ্টি দান করে যে, মানুষে মানুষে কেন, প্রতিটি জীবের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নেই।

আত্মার খাদ্য কী?

দেহের খাদ্য কী—তা আমরা জানি; উহার খাদ্যও জড়বস্তু। আত্মা 'চেতন' বস্তু, দেহধারী মাত্রই জানি বুঝি। কিন্তু আত্মার খাদ্যের কোন বোধ আমাদের নেই। আত্মা চেতন বস্তু তাঁর আস্বাদনের বস্তুও হবে চেতন। দেহ নশ্বর পরিবর্তনশীল, তার খাদ্যও সেইরূপ। আত্মা অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় বস্তু—তাঁর আস্বাদনের বস্তু নিত্য শাশ্বত। সাধারণ যুক্তিতে পাওয়া গেল, একটা অবিনশ্বর শাশ্বত চৈতন্যসত্তা আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন আছে। এই শাশ্বত চৈতন্যময় বস্তুই ভগবান্। ভগবদ্-বিষয়ক রসই তৃষ্ণার্ত আত্মার পানীয়।

'ভগবান্' আছেন একজন, একথা হয়তো অনেকে মানবেন না। কারণ, বর্তমান যুগে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের দর্শন শাস্ত্রে ভগবৎ-সত্তা যে আছে, তৎপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছে। আর্যঋষিরা (পরবর্তীকালে নৈয়ায়িকগণ ছাড়া) ভগবৎ-সত্তায় অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেননি। কেন করেননি, তার অবশ্য কিছু কারণ আছে।

ঋষিদের ভাবনা, ভগবৎ-সত্তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার বস্তু নয়। সকল জীব প্রতিনিয়ত আপন জীবন দিয়ে ভগবৎ সত্তা অনুভব করছে এবং তাহা ওতোপ্রোতভাবে জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। প্রমাণের কোন অপেক্ষা নেই। এই কথাগুলির মর্ম অনুধাবন করতে হবে। ঋষিরা কী বলতে চেয়েছেন বুঝতে হবে, জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই লাভ হবে জীবনে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। ধরুন, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঋষির আলাপ আলোচনা হচ্ছে, যেমন—

ঈশ্বর অবিশ্বাসী ঃ আমি ভগবান্ আছেন বিশ্বাস করি না, মানি না।

ঋষি ঃ আমি নিশ্চিতই জানি, আপনি মানেন।

ঈঃ অ ঃ আপনি জোর করে বললে কী হবে। আমি স্থির জানি যে, আমি ঈশ্বর মানি না বা তাঁকে চাই না।

ঋষি ঃ আপনি কী চান তা জানেন কি? প্রয়োজন ছাড়া তো কেউ কর্ম করে না। আপনি যে জীবন-যাপন করছেন, দিবা-রাত্র ছোটাছুটি করছেন, কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য?

ঈঃ অঃ আমি ছোটাছুটি করি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, অন্ন-বস্ত্রের জন্য।

ঋষি ঃ অন্ন-বস্ত্রের কী প্রয়োজন?

ঈঃ অঃ প্রয়োজন, বাঁচার জন্য। উহা না হলে তো না খেয়ে মারা যাব। মরতে চাই না, বেঁচে থাকতে চাই।

ঋষি ঃ বেশ কথা, বাঁচতে চান। কিন্তু বাঁচা অর্থে কী বোঝাতে চান?

ঈঃ অঃ বাঁচার অর্থ তেমন কিছু না, নিজের সত্তাটাকে টিকিয়ে রাখতে চাই।

ঋষি ঃ খুব ভাল কথা। মিশর দেশে মমি (Mummy) আছে, মানুষের দেহটা দু'-চার হাজার বছর টিকিয়ে রেখেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনার দেহ ঐরূপ টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থায় আপনি নিশ্চয় সম্মত হবেন না।

ঈঃ অঃ কিছুতেই না। মৃত দেহটাকে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে টিকিয়ে রাখাকে বাঁচা বলে না। বাঁচার অর্থ জীবন্ত থাকা, সচেতন থাকা।

ঋষি ঃ বেশ কথা। তাহলে সচেতন সত্তাটা থাকলেই বাঁচা হ'ল, তাই তো চান, কেমন? এখন চারিদিকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একটি লোহার খাঁচায় আপনাকে রাখলে তাতে রাজি হবেন তো?

ঈঃ অঃ কিছুতেই না।

ঋষি ঃ কেন, আপনার সচেতন সত্তা তো থাকছেই।

ঈঃ অঃ তাতে কী হল? ঐরূপ কষ্টের মধ্যে বাঁচার কোন অর্থ নেই। দুঃখ কষ্ট চাই না। তাই তো দিনরাত ছোটাছুটি করি, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটি। সুখে থাকতে চাই, আনন্দে বাঁচতে চাই।

ঋষি ঃ বেশ কথা। আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমার। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি বাঁচতে চান অর্থাৎ আপনার সচেতন সত্তাটাকে আনন্দে রাখতে চান। সত্তাটা চান, চেতনাটা চান আর আনন্দ চান। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটিই চান। সচ্চিদানন্দ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) না হলে সন্তুষ্ট হবেন না। আমিও তাঁকে চাই, ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই তাঁকে চায়। সচ্চিদানন্দই ভগবান্। আপনি জানুন আর নাই জানুন, বুঝুন আর নাই বুঝুন, সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কেই আপনি চাইছেন; খুঁজছেন, না পেলে কোন শান্তি নেই আপনার। আপনার জীবন প্রতিনিয়ত তাঁকেই চায়। সুতরাং এখন সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে মানতে বাধা কোথায়?

ঋষির কথা মানতে সত্যকার কোন বাধা আর নেই আশা করি, ভগবান্ বলে যে বস্তুর কথা আমরা বলি, তা এই সচ্চিদানন্দই। এই সচ্চিদানন্দকে চায় না, খোঁজ করে না, এমন কোন জীব নেই। যে বলে, ভগবান্ চায় না, সে ঠিক জানে না, কী সে বলছে। কেউ যদি বলে—আমার মা বন্ধ্যা অর্থাৎ কোন সন্তানের জন্ম দেননি। তবে সেটা নির্বোধের মত কথা হবে, হাসির কথা হবে। বক্তার সত্তাই প্রমাণ করছে যে তার মা পুত্রবতী, বন্ধ্যা নয়। তার ঐ অর্থহীন প্রলাপ যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করার কোন প্রয়োজনই থাকে না। ঠিক সেইরূপ যে বলে, ভগবান্ সচ্চিদানন্দ চাই না, মানি না; তার সকল চেষ্টা, সকল সত্তাই প্রমাণ করে যে, সে নিরন্তর সচ্চিদানন্দকেই চায়। তার বাক্য খণ্ডন করে, ভগবান্ আছেন, ইহার জন্য যুক্তিতর্ক প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা ঋষিরা অনুভব করেননি।

প্রত্যেক জীবের সত্তা আছে, যতটুকু হোক। চেতনাও আছে, যত সীমাবদ্ধই হোক এবং আনন্দও আছে, যৎকিঞ্চিৎ হোক। জীবনে আনন্দ মোটেই না থাকলে, কেউ বাঁচতে ইচ্ছা করতো না। (কঃ হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ) অর্থাৎ কেই বা শরীর-চেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিত (তৈত্তিরীয় শ্রুতি)।

আমরা প্রত্যেকেই একটি ছোট সচ্চিদানন্দ। একটু সত্তা, একটু চেতনা, এক বিন্দু আনন্দ আমাদের আছে। এই কারণে অর্থাৎ আমাদের সত্তা, চেতনা ও আনন্দ খুব অল্প বলে, সীমাবদ্ধ বলে, আমরা নিয়ত অতৃপ্ত। আমরা সব সময়েই চাই—অফুরন্ত সত্তা, অফুরন্ত চেতনা, অফুরন্ত আনন্দ। উহা আমি পাই কি না পাই—তা এখন আলোচ্য নয়—উহা যে নিয়তই চাইছি, ইহাতে

কোন সংশয় বা ভুল নেই।

প্রত্যেক মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, সত্তায় বা চেতনায় বা আনন্দে সীমারেখা থাকলে সে বিষাদিত হয়, বেদনার্ত হয়। সীমাকে সে সহ্য করতে পারে না। কারণ তার অন্তরাত্মা চায় অসীম সত্তা, অসীম চেতনা ও অসীম আনন্দ। এই অসীম-অনন্ত সচ্চিদানন্দই ভগবান্। তাঁর জন্যই আমাদের আত্মা তৃষ্ণাতুর।

জলের পিপাসা আপনার, এতে বোঝা যাচ্ছে জলের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে। আপনার ভিতরে বাইরে জল আছে। ভিতরে জল কম পড়ছে, এখন সেই অল্পতার দ্যোতক আপনার তৃষ্ণা। সেইরূপ আপনার অন্তরে বাইরে তাঁর বিদ্যমানতা আছে। আপনার অন্তরে অফুরন্ত সচ্চিদানন্দের ক্ষুধা। ইহাতে বোঝা যায় ঐ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে। আপনার অন্তরে ঘটেছে তাঁর অল্পতা। আপনার চাহিদা-অনুরূপ পাচ্ছেন না তাঁকে অন্তরে। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। সেজন্য আপনার জীবনে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা, অশেষ প্রকার দুঃখ। সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হলেই শান্তির অফুরন্ত প্রবাহ বইবে জীবনে। জীবনটা মনে হচ্ছে ভয়ানক সংগ্রামমুখর, প্রতি মুহূর্তেই জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) লেগে আছে, অশান্তি দুর্গতির শেষ নেই, সে-ই জীবনই সচ্চিদানন্দকে পেলে অনুভূত হবে, ঋষিদের মতে "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—বিশ্ব মধুময়, অফুরন্ত আনন্দময়। ভারতের ঋষিগণের ইহাই দিব্য অনুভূতিলব্ধ সত্য, ইহাই অন্তরের অন্তরতম বাণী।

"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" এই সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুতেই সুখ নেই।

যে-কোন প্রকারে আমাদের আত্মা যদি সচ্চিদানন্দের সম্পর্কে স্থিত হয়, তবেই সে শান্ত হয়। আত্মা শান্ত ও দেহ সুস্থ থাকিলেই ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইহা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাই বর্তমান যুগে ধর্মপ্রচার। ধর্ম-সংস্থাপনই সর্বপ্রকার কল্যাণের আকর।

জয় জগদ্বন্ধু হরি। ☐

সাধনা ও করুণা

শ্রীভগবানের সর্ব অসম্ভবতা-নিরসনী শক্তির নাম করুণা। ভগবৎকৃপায় সম্ভব নহে, এমন কোন কর্ম সংসারে নাই। এই কার্য ঈশ্বরের অনুগ্রহেও সম্ভব নহে—এমন কথা যে ব্যক্তি বলে, সেই প্রকৃত নাস্তিক। করুণা-শক্তির কাছে কোন বাধাই বাধা নহে।*

করুণা-শক্তি অন্য-নিরপেক্ষ, কোন কিছুর অপেক্ষা করিয়া কৃপা আসে না। করুণাকে আচার্যেরা পর্জন্য-ধারার সঙ্গে তুলনা করেন। বৃষ্টিধারা যেমন পড়ে উঁচু নীচু সর্বত্র, ধনী দরিদ্র পতিত-পুণ্যাত্মা সকলের দুয়ারে, কৃপাধারাও সেইরূপ সর্বপ্লাবী।

কৃপাশক্তি স্বরাট্। সকল বিবেচনাকে উপেক্ষা করিয়া 'স্বয়ং রাজতে'। করুণাশক্তি সকল

** 'উজ্জীবন' ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৩২)। শ্রীশ্রীবলরাম ধর্মসোপান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, খড়দহ। সম্পাদক : শ্রীমৎ নৃসিংহ রামানুজ দাস।*

শক্তির সম্রাজ্ঞী। উনি আসিলে সকল শক্তি সরিয়া যায়, ভাসিয়া য়ায়, পথ ছাড়িয়া দেয়। কৃপা কোন হেতুজাতা নহে, অহৈতুকী। যখন আসে কোন বাধা মানে না, নিরঙ্কুশ।

কৃপা-সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একটি জিজ্ঞাসা জাগে, কৃপা সাধন-নিরপেক্ষ কিনা। ভগবৎ-করুণা লাভ করিবার জন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে করুণা সাধন-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। যদি বলি, প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সাধনব্যর্থতা প্রসঙ্গ আসে। সাধনশীল ও সাধনহীনের কোনই পার্থক্য থাকে না!

করুণা যদি সাধন-ভজনের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না রাখে তাহা হইলে সাধনাদি করিবার কী প্রয়োজন থাকিতে পারে? যদি প্রয়োজনীয়তা না থাকে তাহা হইলে শাস্ত্র সাধন-ভজন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ উপদেশ দেন কেন? শাস্ত্রোপদেশের নিরর্থকতা স্বীকার ভয়াবহ।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্র-প্রবচন, তীক্ষ্ণ মেধা, বহু শ্রুতিজ্ঞান, ইত্যাদি কোন উপায়েই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ আপনাকে জানান, আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন—অন্যে নহে।

উক্ত শ্রুতি বাক্য হইতেও মনে হয় কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, ভজন-পূজনাদির কোনই মূল্য নাই। যদি মূল্যই নাই তাহা হইলে শাস্ত্র সাধনের জন্য সহস্র উপদেশ দিতেছেন কেন? জীবের আগ্রহ ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ—এই দুইয়ের সম্পর্কে যে সমস্যাটি, তাহার সমাধান অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সাধন-ফলে কৃপা পাওয়া যাইবে একথা ঠিক নহে; কেননা, তাহা হইলে করুণা সাধনাব অনুগত হইয়া পড়ে। তবে কি কোন সাধন-ভজন না করিয়াই কৃপা পাওয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সাধনহীন অস্মদ্দৃশ অভাজনেরা সকলেই কেন কৃপা লাভ করিতে পারি না!

শাস্ত্রের অভিমত এই —সাধনা দ্বারা কৃপা হইবে না, পক্ষান্তরে সাধনা ছাড়াও কৃপা হইবে না। সাধনা করিতেই হইবে। যদি তৎফলে তাঁহাকে নাই জানিতে পারি, তাহা হইলে সাধন আদৌ করিব কেন? তদুত্তরে শাস্ত্রের হার্দ্য এই যে, সাধন করিতে হইবে, সাধন দ্বারা যে তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি যে সাধনের অতীত বস্তু ইহা জানিবার জন্য।

সাধন-ভজন দ্বারা যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না এই তথ্যটি কাহারও কাছে শুনিয়া কিংবা গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিলে জানা হইবে না। সাধন করিয়াই উহা জানিতে হইবে। সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের মনে হয় যে সে কিছু সাধন করিতেছে (অন্য অনেকে করিতেছে না), তাহার সাধন-বলে সে ভগবান্‌কে পাইবে। এই সকল ভাবনাও একপ্রকার অহংকারজাত। উহা থাকা পর্যন্ত সাধকের সাধনায় কোন ফল ফলিবে না।

সাধন করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা আসিবে যে তাহার মনে হইবে যে তাহার সাধন-ভজন কিছুই হইতেছে না। বৃথা কার্যে জীবন যাইতেছে। ক্রমে এই ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে। কিছুই হইল না মনে করিয়া জীবনে ব্যর্থতার অনুভব ও ধিক্কার আসিবে। সাধনার ইহাই চরম ফল—সাধ্যবস্তুর দুর্লভতা ও আপন অক্ষমতার যুগপৎ অনুভব। সাধনা যত পূর্ণ হইবে, সাধক নিজেকে তত অসম্পূর্ণ মনে করিবে। দীনতাই সাধকের উর্ধ্বতার মাপকাঠি।

সাধনা ভগবান্‌কে মিলাইয়া দেয় না। তাঁহাকে মিলায় তাঁর করুণা। সাধনা সাধকের চিত্তকে এমন দৈন্য ভূমিতে লইয়া আসে যেখানে পৌঁছিয়া সে কৃপাশক্তিকে ধারণ করিতে পারে। সাধনা ও করুণার মধ্যে এই সম্পর্ক। সাধনা আপন অক্ষমতা জানাইয়া যখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তখন করুণা আসিয়া তাহাকে নাচাইয়া তোলে। সাধনা যখন সাধ্যবস্তুর দুর্লভতা জানাইয়া মূক হইয়া যায়, তখন করুণা আসিয়া তাহাকে মুখর করে।

সাধক যখন আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া পরম দৈন্যের ভূমিকায় স্থিত হয়—করুণা আসিয়া তখন তাহার সকল অযোগ্যতা ঘুচাইয়া চিরসুন্দরের মন্দিরে লইয়া যায়। আর্ত সাধক যখন আত্মভোলা হইয়া আর্তনাদ করে করুণার বরুণা তখন প্লাবন আনিয়া তাহাকে ভাসাইয়া দেয়। ভাগবতে ও ভাগবত-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অগণিত।

১। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমগ্র মহাভারত ও তদন্তর্গত ভগবদ্‌গীতা রচনা শেষ করিয়াছেন। জীবহিতার্থে পুরাণাদি প্রচার আর যাহা যাহা করণীয় সকলই করিয়াছেন। তথাপি চিত্তে শান্তি নাই। কি যেন এক পরম সুন্দর কথা অদ্যাপি বলা হয় নাই মনে করিয়া তিনি অপ্রসন্ন চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন।

এইরূপ সময় সেখানে দেবর্ষি নারদ আসিলেন, দেবর্ষির উপদেশে মহর্ষির অপূর্ণতা ঘুচিল। নারদ ব্যাসকে ভাগবততত্ত্ব দিলেন। আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান শ্রীমদ্ভাগবত এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস মানবীয় সাধনার চরমভূমি। মানুষ সাধনা করিয়া উহার উপরে আর উঠিতে পারে না। কিন্তু অত দূর উঠিয়াও চরমতম তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'কিছুই হইল না' এমন ভাবনায় ব্যর্থতার বেদনা জাগিয়া উঠে। সাধনার শিখরে উঠিয়াও অতৃপ্ততার ব্যথা।

এমন সময় আসেন দেবর্ষি। দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানের করুণার মূর্তি। মহর্ষির অপূর্ণতায় দেবর্ষি পূর্ণতা আনিলেন। মানবীয় সাধনার ব্যর্থতায় ঈশ্বরীয় করুণা আসিল। করুণা নামিয়া আসে সাধনার সামর্থ্যে নহে, সাধনার পূর্ণতায় যে ব্যর্থতার বেদনা, তাহারই কোলে।

২। নন্দদুলাল মাতা যশোদার দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। নবনীত চুরি করিয়াছেন। অপরাধী বালককে মাতা শাস্তি দিবেন রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া। গৃহে যত রজ্জু ছিল সব শেষ হইল। গোপালের কটি বেষ্টন করা যায় না। দড়ি যতই বাড়ে প্রতিবারেই দুই আঙ্গুল খাটো পড়ে।

মাতা যশোদা বাৎসল্য রসের ভক্ত। বন্ধনের চেষ্টাই তাহার রসের সাধনা। সাধনকালে মায়ের মনের ভাব এই যে আমি গোপালের মা, গোপাল আমার গর্ভজাত শিশু। যাকে গর্ভে বাঁধিয়াছি, তাকে দড়িতে বাঁধিতে পারিব না কেন! নিশ্চয়ই পারিব। এই অভিমান লইয়া যতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন—সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে।

এই ব্যর্থতা মাতাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে। কেন কি জানি উহাকে বাঁধিতে পারিব না—এই ভাবনা হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। অমনি সাধনা পূর্ণ হইয়া গেল। কৃপা আসিল। ভাগবত বলিয়াছেন "কৃপয়াসীৎ সবন্ধনে।" কৃপায় বন্ধন গ্রহণ করিলেন, সাধনায় নহে।

সাধনা আনিয়াছে সাধনোত্থ শ্রান্তি। আর পারিব না হায়! কিছুই হইল না। এই ভাবনা

মায়ের দিক্ হইতে এক অঙ্গুলি। আর ভগবানের দিক্ হইতে আসিল করুণা আর এক অঙ্গুলি। এই দুই অঙ্গুলির জন্যই বন্ধন ঠেকা ছিল। সাধনা ও করুণার এই নিরুপম সম্বন্ধ।

৩। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি পরম ভক্ত, নাম মহিম দাস। মহিম প্রভুর একান্ত আজ্ঞাবহ, উত্তম ভৃত্য। যাহা আদেশ করেন মহিম মাথায় লয়। মনে একটু অভিমান আছে আমি শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মহিম বিবাহ করিতে চায় না। এ হেতু তার পিতা ক্ষুণ্ণ। প্রভু কহিলেন "মহিম! ভ্রষ্ট বুদ্ধি হয়ে পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে নাই। বিবাহ কর। আদর্শ গৃহী হও। অকৈতবে বিষয়বৃত্তি কর।" মহিম প্রভুর আজ্ঞা শিরে লইয়াছে। বিবাহের তারিখ ঠিক। মহিম বিদায় লইতে আসিয়াছে। প্রভু বলিলেন "তোরা তো পদ্মা নদীর ওপারে যাইতেছিস্, নৌকায় না গিয়া সবাই ষ্টীমারে যাস্।"

প্রভুর নির্দেশ মত সবাই ষ্টীমারে গেলেন। বিবাহ হইয়া গেল। বরকন্যা বরযাত্রীরা ফিরিবে। মহিমের পিতা একখানি বড় নৌকা ভাড়া করিলেন। মহিম নিষেধ করিলেন। বাবা বলিলেন— "এতগুলি লোক ষ্টীমারে বেশী খরচ পড়িবে। আকাশ পরিষ্কার, প্রকাণ্ড নৌকা। ভয় কী?" মহিম বাবার সঙ্গে আর উচ্চবাচ্য কবিলেন না।

নৌকা পদ্মার মধ্যস্থলে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। চারিদিকে পরিত্রাহি রব। প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গাঘাতে মহিমের চক্ষুর সম্মুখে অন্য দুইখানি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়া গেল। মহিম আকুলকণ্ঠে "হা প্রভু! হা প্রভু!" ডাকিতে লাগিল। বাক্য অবহেলা করার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত এই অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিপৎ-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল। সাধনা-পূর্ণতায় মহিম চরণে প্রপন্ন হইয়া পড়িল।

হঠাৎ যেন কিসের এক ধাক্কায় নৌকা অল্প জল এক চড়ায় উঠিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেল। নৌকা বাড়ীর ঘাটে পৌঁছিলে মহিম সর্বাগ্রে অবতরণ করিয়া প্রভু-দর্শনে অগ্রসর হইল। সকলে নিষেধ করিল—বলিল, বিবাহের পর বরকন্যা একত্রে বাদ্যাদি করিয়া বাড়ীতে যাওয়া নিয়ম। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহিম প্রাণের দেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিল।

"কে রে মহিম! আয়।" প্রভুবন্ধুর মধুর ডাকে আকৃষ্ট হইয়া মহিম প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রণাম করিতে নীচু হইয়া প্রভুর শ্রীহস্তের দশা দেখিয়া মহিম চমকিয়া উঠিল। মহিম দেখিল প্রভুর দক্ষিণ হস্তের কব্জী হইতে কনুই পর্যন্ত একটা লাল দাগ। চামড়া যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

"প্রভু, আপনার শ্রীহস্তে কী হইল!" হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহিম। "নবনীত-কোমল অঙ্গে কিসের আঘাত লাগিল?"

"কী হয়েছে, আবার জিজ্ঞেস করছিস্"—স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রভু উত্তর করিলেন। "তোরা গোঁয়ার, কথা বললে শুনিস্‌নে, শেষে বিপদ্ এলে আর্তনাদ করিস্। তোদের নৌকোটা ডুবে যাচ্ছিল। আমায় গিয়ে টেনে তুলতে হ'ল। নৌকোর ঘসায় হাতের চামড়া উল্টে গিয়েছে।"

শ্রীমুখের কথা শুনিয়া মহিম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। করুণাময়ের কারুণ্য-সমুদ্রে চিরতরে ডুবিয়া রহিল।

কৃপা শক্তির জয় হউক। ◻

করিমগঞ্জ সনাতম ধর্ম সম্মেলন, ১৯৮৩—ভাষণ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করেছে। জীবনের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে মানব সভ্যতাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থাও বিজ্ঞান সৃষ্টি করে রেখেছে। দূরত্বের ব্যবধান কমেছে, কিন্তু মনের ব্যবধান বেড়েছে। ট্রামে-বাসে গায়ে গায়ে ধাক্কা-ধাক্কি হচ্ছে, কিন্তু মনের মিলন হচ্ছে না। যান্ত্রিক সভ্যতা মানব সমাজকে যন্ত্রের মতই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চলার Speed বেড়েছে, কিন্তু লক্ষ্য স্থির নেই। কোথায় চলেছি আমরা জানি না। মানুষ একেবারে দিশেহারা, পথভ্রষ্ট। স্কুল কলেজের সংখ্যাই বাড়ছে—শিক্ষালাভ হচ্ছে না। মানুয মানুয হয়ে জন্মায় না। মানুষকে মানুষ হতে হয়। তাই আমাদের জীবন সাধনা হচ্ছে মনুয্যত্ব লাভের সাধনা। সনাতন ধর্ম প্রতিটি মানুষকে মানুষ হওয়ার পথটিই দেখিয়ে দিচ্ছে।

ধর্ম বা ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ভ্রান্ত এবং অবাস্তব চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। আমরা ভাবি ধর্ম-কর্মের একটা বয়স আছে। আগে তো ভোগ-সুখ। তারপর বয়স হলে, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম-কর্ম করা যাবে। 'ধর্ম' সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবেই এই ধরণের মানসিকতার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম-কর্ম করতে হলেও তার একটা প্রস্তুতি চাই। নীতিশিক্ষার মাধ্যমে বাল্যকাল থেকেই জীবনটাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে হয়। জীবনের অধিক সময় দুর্নীতি ও কুনীতির মধ্যে কাটিয়ে শেষ বয়সে ধর্ম-কর্ম সম্ভব নয়। সনাতন ধর্মের ভিত্তিটাই নৈতিক। নীতিশিক্ষার মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হয় বৃহত্তর জীবনের জন্য। আহার নিদ্রা নিয়েই মানুষের জীবন নয়। এর বাইরেও একটা জীবন আছে ও লক্ষ্য আছে। জানতে হবে সেটা কী? নইলে, 'সবার উপরে মানুয সত্য' বা মানুয ঈশ্বরের 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যায়। পশুর সাথে মানুষরে কোন পার্থক্যই থাকে না।

তাই আমাদের জীবন-সাধনার প্রধান কথাই হচ্ছে মনুয্যত্ব লাভ করা। আর্য-ঋষিরা বলছেন, মানুষ হওয়ার জন্য চাই সত্য, শৌচ, সংযম, অহিংসা ও অচৌর্যের সাধনা। হিন্দুধর্মের basic structure-টাই দাঁড়িয়ে আছে এই কয়টি গুণের উপর। মানুষকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। কথাটির অর্থ ব্যাপক। সত্যাশ্রয়ী না হলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় না। সত্যরক্ষার্থে রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে বনে দিলেন; হাড়াই পণ্ডিত তাঁর একমাত্র ছেলেকে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিলেন। এ ধরণের বহু উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

শুচি পবিত্রতা মানুষের জীবন-সাধনার আরেকটি বিশেষ দিক্। কেবল বাইরের শুচিতা অভ্যাস করলেই চলবে না; ভিতরটাকেও শুচিপবিত্র রাখতে হবে। সৎ চিন্তা ও সৎ কাজের মাধ্যমে ভিতর শুচি হয়। শুচি-শুভ্র মনেই সুন্দরের সাধনা সম্ভব।

মনুষ্যত্ব লাভের আরেকটি বিশেষ উপকরণ হ'ল সংযম অভ্যাস। মানুষকে সংযমী হতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আপনার ঘোড়া আছে, ঘোড়ায় চড়েন—ভালো কথা। কিন্তু

* *'স্মরণিকা', সনাতন ধর্ম সম্মেলন, ১৯৮৩, করিমগঞ্জ।*

লাগাম টানতে জানেন তো? তা না জানলে কিন্তু ঘোড়া আপনাকে ফেলে দেবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের লাগাম টানতে শিখতে হবে। নইলে গাড়ী লাইন-চ্যুত হয়ে যাবে। জীবনটা বিড়ম্বিত হয়ে যাবে। একটু সংযমের অভাবে শত শত মানুষ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। ওরা জানে না কোথায় ব্রেক্ চাপতে হয়।

অহিংসা পরম ধর্ম। হিংসা করতে নেই। এই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীবই পরম পুরুষের সৃষ্ট। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—এ মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হবে জীবনে। আজ পৃথিবী জুড়ে যত অশান্তি, তার সবকিছুরই কারণ হচ্ছে হিংসা। হিংসায় অন্ধ হয়ে মানুষ মানুষের সর্বনাশ করছে। Wordsworth-এর লেখা মনে পড়ে—"Have I not the reason to lament, what man has made of man." মানুষ পশুর স্তরে নেমে গিয়ে জীব-জগৎকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সনাতন অহিংস নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই আজ ভারতবর্ষে এত ভাবনা। আমি ভাবছি আমি বাঙালী, আপনি ভাবছেন আপনি অসমীয়া। দ্বন্দ্বের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি কিনা, তাই আমাদের অশান্তি। আমি যদি নিজেকে বাঙালী না ভেবে ভারতীয় বলে ভাবি এবং আপনি যদি নিজেকে অসমীয়া না ভেবে ভারতীয় বলে ভাবেন, তাহলেই অশান্তি মিটে যায়। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ভূমি থেকে সরে গিয়ে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে দাঁড়াতে পারলেই জীবনে শান্তি আসবে। সম্প্রতিকালে মহাত্মা গান্ধী এই অহিংসা মন্ত্রেরই জয়গান গেয়েছেন।

'অচৌর্য' মানব জীবনের আরেকটি বিশেষ দিক্। সকল শাস্ত্রই বলছে চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন নেই। চুরি নানা ধরণের আছে। অন্যকে বঞ্চিত করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিজের কাছে রেখে দেওয়াও চুরি। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে চৌর্য-বৃত্তির perfection-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীতা বর্তমানে খুবই বেশী। দেব-মানবদের জানতে হবে। তাঁদের জীবন-চরিত ধ্যান করে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

সনাতন ধর্মের সব শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করার শিক্ষা। আচার্য-প্রদর্শিত নীতি শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করতে হবে। এটাই জীবনের প্রথম ও প্রধান কথা। মনুষ্যত্ব হয়ে গেলে অতি সহজেই দিব্যজীবনের অধিকারী হওয়া যায়। গুরু-নির্দেশিত পথই তখন একমাত্র সহায়ক। দেবত্ব লাভের জন্য সনাতন ধর্মে তিনটি মার্গের উল্লেখ আছে; যথা—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। এই তিনের সমন্বয়েই মানুষ হতে পারে দিব্যজীবনের অধিকারী।

মনুষ্যত্ব লাভের পর মানুষ দেবত্বের স্তরে উঠে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন মানুষ ক্রমবিকাশের ধারায় স্বাভাবিক নিয়মেই দেবত্ব লাভ করবে। আমরা মনে করি গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পরম প্রাপ্তি হবে। মানুষ সাধনায় উঠবে। ভগবান্ করুণায় নেমে আসবেন। তাঁর কৃপা-হস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত হবে। চিরসুন্দরের সাথে আমাদের মিলন হবে। এখানেই মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

সনাতন ধর্ম সম্মেলন সার্থক হোক্, মনুষ্যত্ব লাভের মাধ্যমে মানুষ দিব্য জীবনের অধিকারী হোক। বন্ধুসুন্দরের করুণা মন্দাকিনীধারায় প্রবাহিত হোক। জয় জগদ্বন্ধু হরি। □

২১শে এপ্রিল '৮৪ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার-স্টুডেন্ট সেন্টারে

নিখিল বাংলাদেশ দর্শন সমিতি

আয়োজিত ৬ষ্ঠ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ—

আমি আপনাদিগকে ৩টি কথা বলিব ঃ

১। দর্শনের আরম্ভ কোথায়, ২। দর্শনের শেষ কোথায় ও ৩। দর্শন শাস্ত্র জানার আমাদের প্রয়োজন কী?

১। দর্শনের আরম্ভ কোথায়? যেদিন মানুষের এই বিশ্ব জগৎটার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়-বোধ জাগিল— সেইদিন হইতে দর্শনের আরম্ভ। Felling of wonder যদি অন্তরে জাগে তখনই দার্শনিকতার সূচনা হয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ, নদী, পশুপক্ষী ও মানুষের দেহ, যেদিকে তাকানো যায় একটা আশ্চর্যত্বের বোধ অন্তরে জাগে, তখন সে দার্শনিক। ঐ বোধ যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ সে দার্শনিক হইতে পারে না। একটি ফুল, একটি পাতা, একটি ময়ূরের পুচ্ছ, একটি প্রজাপতির পালক যা দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়, ভাবে এ কি কলা কৌশল, কে সৃষ্টি করিল, কেমন করিয়া করিল—একটি প্রাণীর দেহ, একটি মানুষের দেহ, তাহা বাঁচিয়া থাকিবার কৌশল তাহার প্রাণে আসিলে আশ্চর্যত্বের অনুভূতি জাগায়। গীতা বলিয়াছেন—"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনম্," এই আশ্চর্যত্বের ভিতরই দর্শনের আরম্ভ। এই গতানুগতিক জগৎটাকে দেখিয়া যে বিস্ময়াবিষ্ট হয় সেই হয় দার্শনিক।

২। দর্শনের শেষ কোথায়?

পৃথিবীতে অনেক দর্শন আছে। গ্রীক দর্শন, ইউরোপীয় দর্শন, ইসলাম দর্শন, হিন্দু দর্শন, চীন দর্শন, বেদান্ত সাংখ্য দর্শন, জার্মান দর্শন—কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন এইরূপ শত দর্শন রহিয়াছে। দর্শনের সাধনা শেষ হয় তখন, যখন কোন দার্শনিক দেখিতে পায়—সকলগুলি দর্শনের মধ্যে একটি মহা সত্য রূপে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বের মূল দর্শন একটি। অসংখ্য প্রকার তার অভিব্যক্তি। দর্শনের ভিতর দেখি, বড় উঁচু নীচু নাই। সকল দর্শনই একটা মহা সত্যকে বহু দিক্ হইতে দেখিতেছে। দর্শনের আলোচনা করিতে করিতে সাধক যখন একত্বের জ্ঞানে পৌছিবে, তখনই বুঝিতে হইবে দর্শন শাস্ত্রের ইনি ক্রান্তদর্শী—চরম দ্রষ্টা, এখানে আপনার দার্শনিকতার সাধনার শেষ।

দু'টি কথাই বলা হইল—দর্শনের আরম্ভ ও শেষ। দর্শন পড়ার কী উদ্দেশ্য? এই বিশ্বের ভিতর আমরা বাঁচিয়া আছি। সার্থকভাবে বাঁচিতে হইলে দু'টি বস্তু লাগে—গতি ও লক্ষ্য, অর্থাৎ speed ও direction। আপনি মোটর হাঁকাইয়া চলিতেছেন, তেল পেট্রল আপনার গতি দিতেছে, কোথায় যাইবেন তা বলিয়া দিতেছে না। আপনার হাতের stearing লক্ষ্য ভূমির দিকে চালাইতেছে। stearing ধরিতে একটু ব্যতিক্রম হইলে ছিটকাইয়া ভাগাড়ে পড়িয়া যাইবেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের চলার গতিবেগ শত শত গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। আমরা ঘণ্টায় চারি মাইল চলিতে পারিতাম, এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কারে চারি শত মাইল চলিতে পারি। এমন কি দ্রুতযান রকেটে চড়িলে চার হাজার মাইলও যাইতে পারি। কিন্তু অত বেগে

** 'মহানাম অঙ্গন', ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩৯১)।*

কেন যাইব বা যাইয়া কী করিব তা কিন্তু বলিয়া দেয় না। এরোপ্লেনে উড়িয়া গিয়া বন্যা পীড়িতকে খাদ্য বিতরণ করিতে পারি কিংবা বোমা বর্ষণ করিয়া পাঁচ মিনিটে লক্ষ লোক শেষ করিয়া দিতে পারি। কী যে করিব তাহাই হইল লক্ষ্য অর্থাৎ objective বা aim। এই aim বিজ্ঞান দিতে পারে না, ইহা দেয় দর্শন। অর্থাৎ জীবনের পথে লক্ষ্য ঠিক করিয়া দেয় দর্শন। বর্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবী অশান্তিময়। তাহার কারণ সকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থাৎ দার্শনিকতাহীন। মানুষকে দর্শন শাস্ত্র শিখাইয়া দিন তাহা হইলে আর বেতালে পা পড়িবে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বৃথা ছুটাছুটি করিবে না। সংসার সুখময় হইবে।

দার্শনিকতার চরম ফল জীবন-পথে লক্ষ্যের স্থিরতা। আজিকার দিনে ইহাই মানব সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়।

জ্ঞানের সঞ্চার, ভক্তির সঞ্চারের জন্যে সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনার সহায়ক হবে এই গ্রন্থাগার। বাংলা ছিল হিন্দু ও মুসলমানের মিলনভূমি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্বে এই দুই জাতিতে ছিল সংঘাত। মহাপ্রভু মিলন ঘটালেন। সেই ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমকে প্রবাহিত করে চলছিল। তারপর এল একালে পাক শাসন। পাক সরকার পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে নষ্ট করে উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু বাঙালী মুসলমান তা মেনে নেয়নি। ওরা ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনে শহীদ হয় মাতৃভাষার জন্যে। এই গ্রন্থাগার সেই বাংলা ভাষার সংস্কৃতি ও মিলন সূচক ভূমিকার ওপর গবেষণার উদ্দেশ্যেও প্রতিষ্ঠিত। ❒

৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৭-ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

অশান্ত পৃথিবী জুড়িয়া হিংসার উন্মত্ততা, বিরুদ্ধ মত প্রচারে প্রতিবন্ধকতা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৃষ্ট ভুল বোঝা-বুঝির কলুষিত প্রেক্ষাপটে আজ বাংলাদেশের শ্যামল-শান্ত পরিবেশে প্রথিতযশা সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়া আমি গর্বিত, আনন্দিত। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী মাত্র। অখণ্ড মানব ধর্মের প্রচারে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমি আজ জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। তাই আমি হৃদয়-প্রাণ উজাড় করিয়া আপনাদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে চাই।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি আমেরিকার চিকাগো শহরে সর্বধর্ম সম্মেলন সভায়

* *'আঙ্গিনা'। ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৯৩)*

যোগদান করিয়াছিলাম। আমার গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী আমাকে অযোগ্য জানিয়াও কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সেই সময়ের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে (১৮৯৩ খৃঃ) উক্ত ধর্ম সভায় গিয়াছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্ম সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট সজ্জন হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধিকে ডাকিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তৎকালীন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক হারবার্ট হুভার বলিয়াছিলেন—"We don't want another Vivekananda walk over us," আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম—"আমি স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের জুতা খসাইবার যোগ্যও নই। বিবেকানন্দ বছর বছর জন্মায় না, তিনি ছিলেন Unique. বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে একটি সেতুবন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পার হইয়া অনেকেই আসিতেছে—আমিও তাহাদের মত একজন।"

তাঁহারা অনেকে বলিয়াছিলেন—"হিন্দু ধর্মে কোন সম্পদ্ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ oratory-র জোরে জয় কবিয়াছিলেন। আপনাদের হিন্দুধর্ম Dying Religion, আর অন্যান্য ধর্ম তাহাদিগকে convert করিয়া উদ্ধার করিতেছে।" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম—হিন্দুধর্ম হয়ত সত্যই ক্ষয়িষ্ণু, দিনের পর দিন ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু বিগত ১০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দুধর্ম চার জন world figures (বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব) জগৎকে দিয়াছে—স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী। এই ৪ জনের তুলনা সারা পৃথিবীতে নাই। এই ৪টি মহামানব সভ্যজগৎকে দান করিয়াছে হিন্দুধর্ম। সুতরাং তাহার কোন সম্পদ্ নাই—এই কথা বলিবার মত মুখ পৃথিবীর কোন মানুষের নাই।

আমি প্রভু জগদ্বন্ধুর দাস। জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু। তাঁহার মহাবাণী—"আমি সকলের, সকলে আমার। পৃথিবীর সকল লোককে তোমরা আপন করিয়া লও।" আমি শুধু ভারতের প্রতিনিধি ছিলাম না বরং সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি। এশিয়ায় ৩টি প্রধান ধর্ম—ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু ধর্ম।

যদিও বেদের মহামন্ত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবী আছেন। খৃষ্টান ধর্মে ৩ জন উপাস্য—Father, Son ও Holy Spirit.। কিন্তু ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদ অতুলনীয় আর এই ধর্মে ভ্রাতৃত্ববোধ (Brotherhood) নিরুপম। কোন মসজিদে উপাসনাকালে একজন ঝাড়ুদারের পিছনে যদি কোন বাদশাহ দাঁড়ায় কেহ তাহাকে (বাদশাহকে) এগিয়ে দেয় না বা তিনিও এগিয়ে যান না। কারণ, ঈশ্বরের চোখে সব মানুষ সমান। ইহা আর কোন ধর্মের তত্ত্বে থাকিলেও ব্যবহারে নাই। আমি শতশত সভায় খলিফা ওমরের কথা বলিয়াছি। আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী-এই ৪ জন শ্রেষ্ঠ খলিফা। মহানবী হজরত মোহাম্মদ [সঃ]-এর পরেই তাঁহাদের স্থান। তাঁহাদের মধ্যে ওমরের কথা একটু

বলি—আরবের একটি মরুভূমি পার হইয়া তিনি যাইতেছিলেন ধর্ম প্রচারে। তিনি ছিলেন উটের পিঠের উপরে আর একজন তাঁর ভৃত্য চলিতেছিল উটের লাগাম ধরিয়া। নামাজের সময় হইলে তিনি উট থেকে নামিয়া নীচে দাঁড়াইলেন ও ভৃত্যকে তাঁহার পাশে ডাকিয়া লইলেন। উভয়েই একত্রে নামাজ পড়িলেন। তারপর খলিফা ওমর ভাবিলেন—কোরানের একই সুরা দুইজনে পড়িলাম, একই ভাবে সেজদা করিলাম—আল্লাহতালাও একই ভাবে দু'জনার নামাজ কবুল করিলেন। এখন আমি আরাম করিয়া উটের পিঠে যাইব আর ভৃত্য কষ্ট করিয়া উত্তপ্ত বালুতে পায়ে ফোস্কা ফেলাইয়া লাগাম ধরিয়া যাইবে। ইহা আল্লাহতালার চোখে আমার মহাপরাধ হইবে। তিনি ভৃত্যকে উটের পিঠে উঠাইয়া দিলেন। নিজে উটের লাগাম ধরিয়া তপ্ত বালুকার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। ভৃত্য ঘোরতর আপত্তি করিল। সে বলিল আপনি কর্তা, আমি ভৃত্য। আমি কেমন করিয়া উপরে বসিব? ওমর উত্তরে বলিলেন, আমিও বান্দা, তুমিও বান্দা, কর্তা একজন মাত্র, তিনি আল্লাহ্‌তালাহ।' ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, গল্প নহে। ইহার তুলনা নাই সারা বিশ্বে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্বে আদর্শস্থানীয়।

বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম—তাহারা বলিত "বুদ্ধ ছিল নাস্তিক, ঈশ্বর মানিতেন না।"

"ঈশ্বর-শূন্য আবার ধর্ম কী?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, আপনারা বুদ্ধকে ভুল বুঝিয়াছেন। বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন না। আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার আসিলেন। তিনি রোগ নির্ণয় করিয়া একটি প্রেসক্রিপসন করিয়া দিলেন। প্রেসক্রিপসনের উপর God is good বা বিসমিল্লাহ বা শ্রীহরি সহায় কিছুই লিখিলেন না। আপনি কি বলিবেন যে ডাক্তার একজন নাস্তিক?

ডাক্তার রোগের চিকিৎসক। তিনি ঈশ্বরের কথা বলিতে আসেন নাই। বুদ্ধদেবের সময় হিন্দুধর্মের অধঃপতন হইতেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সবিশেষ কি নির্বিশেষ, সগুণ কি নির্গুণ—ইহা লইয়া চুলচেরা বিচার করিতেন আর যজ্ঞে অগণিত পশু বধ করিতেন। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা হিংসা ছাড়। মানুষকে হিংসা করিও না। পশুপক্ষীকেও হিংসা করিও না। মিথ্যা কথা ছাড়। চৌর্যবৃত্তি ছাড়। মানুষকে ভালবাস। মহামানবত্ব লাভ কর। বুদ্ধত্ব লাভ কর—এদিকে অগ্রসর হও। তারপর ভগবান, থাকিলে তাহাকে পাইবে না থাকিলে পাইবে না। যদি নৈতিক উন্নতি না হয় তাহা হইলে ঈশ্বর লইয়া তর্ক শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র।

বুদ্ধদেব ছিলেন মানবনীতি প্রচারে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিখাইতে তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নীতিরাজ্যের [Morality] চিকিৎসক। তিনি ঈশ্বর প্রচারে আসেন নাই। আমার এই কথায় অনেকের বুদ্ধ সম্বন্ধে বহু দিনের ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

আমি ঐদেশে হিন্দুর গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইয়াছিলাম—ইংরাজী অনুবাদ করিয়া—

"Let us meditate upon the adorable life of the divine vivifier. May He direct our minds.

আমি তাহাদিগকে ইসলামের পবিত্র 'আলহামদু সুরা' শুনাইয়াছিলাম ইংরেজীতে অনুবাদ

করিয়া—

"There is no God but God, the Merciful, the Compassionate, All Praise be to God, the Lord, the Maker of the Universe, of the Day of Judgement."

আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিতে এই তিন ধর্মের ও অন্যান্য ধর্মেরও মূলতত্ত্ব এক। হিন্দুধর্মের মূল কথা অহিংসা, অচৌর্য, শৌচ, সংযম ও সত্য। ইসলামধর্মের মূলকথা একেশ্বরবাদ ও নৈতিক জীবনকে উন্নীত করা। ঈশ্বর লইয়া তর্ক ত্যাগ করা। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা জীবনে উন্নীত হইয়া বুদ্ধত্ব (Enlightened State) বা মহামানবত্ব লাভ করা। আমি এশিয়ার এই তিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বলিয়াছি। তাই আমি বলিয়াছি যে আমি শুধু ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি নাই, সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি।

হিন্দুধর্মের একটি শাখা বৈষ্ণব ধর্ম। তার মধ্যে একটি শাখা গৌড়ীয় সম্প্রদায়। তারমধ্যে একটি ক্ষুদ্রশাখা মহানাম সম্প্রদায়। আমি এই শাখার একটি পত্র। আমার সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইলেও তার বাণী বিশ্বজনীন। তার মন্ত্র—"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।" তার অর্থ, হরি—যিনি তাপ হরণ করেন, দুঃখ হরণ করেন, সকল অমঙ্গল হরণ করেন ও প্রেম দিয়া মন হরণ করেন—তিনি হরি। পুরুষ অর্থ—পুরীতে যিনি শয়ন করেন। আপনার বাড়ীতে যেমন আপনি শয়ন করেন। সেইরূপ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরীতে যিনি শয়ন করেন অর্থাৎ যিনি ইহা সৃষ্টি করেন ও ভোগ করেন তিনি পুরুষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তাহার তিনি ভোক্তা। তাই তিনি পুরুষ। জগদ্বন্ধু—তিনি জগতের বন্ধু—এত বড় হইয়াও যিনি জগতের প্রতিটি জীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্বন্ধযুক্ত—তিনি জগদ্বন্ধু। তিনি মহাউদ্ধারণ অর্থাৎ তাঁহার কাজ বিশ্বমানবের উদ্ধারণ—পরম কল্যাণ সাধন। তাই আমি সকল বক্তৃতার শেষে বলিতাম—

The whole World our family, the Sky our canopy,
Nature our bed, Earth our World-mother.
All beings brothers
Hari-Purusha Jagatbandhu over our head.

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। ☐

ঢাকায় চিকাগো ভাষণের হীরক জয়ন্তীতে বাণী

৬০ বৎসর পূর্বে আমি আমেরিকায় গিয়া ৫ বৎসর ৮ মাস সেখানে বাস করিয়াছিলাম। সকলের স্নেহ ভালবাসায় ছিলাম এক আনন্দময় দেশে। শ্রীহরিপুরুষের অসীম করুণায় ও শ্রীগুরুদেবের অভাবনীয় কৃপাশক্তিতে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই ঘটনার হীরকজয়ন্তী উৎসব আপনারা করিতেছেন বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে। আজকাল প্রায় উৎসবই বহু জনসমাগমে আরম্ভ হইয়া একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোলে পর্যবসান হয়। আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রভু সেখানে নিয়াছিলেন তাহার এক বিন্দুও যদি কাহারও হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে ও

সে নবোদ্যমে জাগে তবেই উৎসব সার্থক হয়।

মহাত্মা গান্ধীজির আন্দোলনের সময় যে খদ্দর পরিধান করিতাম আজ পর্যন্ত তাহাই পরিধান করি। ৫ বৎসর ৮ মাস আমেরিকায় ছিলাম। সকল সময় ঐ খদ্দর পোষাকে থাকিতাম। ভারত হইতে খদ্দর পার্সেল করিয়া পাঠাইত। ওরা খদ্দর উচ্চারণ করে খ্যাডার আর গান্ধীকে বলে গ্যান্ডি। গ্যান্ডীর খ্যাডারপরা মানুষটিকে বহু বহু লোক চিনিত। বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল — আপনি যখন University-তে আছেন তখন আমাদের মত সিভিলিয়ান ড্রেস পরিলে ভাল হয় না? না হলে সর্বদা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি এই পোষাক এক মুহূর্ত ছাড়িতে পারি না ওটি একটি সিম্বল (Symbol) একটি প্রোটেস্ট। India-র ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে সর্বদার জন্য আমার এই পোষাক পরিতে হইবে। পোষাকের মধ্যেও যে একটি Politics আছে তাহা শুনিয়া তাহারা অবাক্ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিত। একজন আর একজনকে বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিত। কথাটি বুঝিলে খুব শ্রদ্ধাযুক্ত ভাব দেখাইত।

কখনও কোথাও আমিষ খাদ্য স্পর্শ করি নাই। যখন বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছি বহু বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি। আমার নিয়ম ছিল হোটেলে বা ইন্টারন্যাশনাল হাউসে থাকিব না। কোন Family-তে থাকিব। বাসায় রান্না ঘরে বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকিত যতদিন ব্রহ্মচারী থাকিবেন— নিম্নলিখিত দ্রব্য ঘরে আসিবে না "no fish, no meat, no eggs, no onion, no garlic" মাছ মাংস ডিম পিয়াজ রসুন বাড়ীতে বাজার হইতে আসিবে না।

ভারত হইতে তুলসী পাতা শুকাইয়া পাঠাইত। ঐ তুলসীপাতা দিয়া আমার খাদ্য নিবেদন না করিয়া কখনো খাইতাম না। নিরামিষ হোটেলে খেলেও নিবেদন করিতাম। যাহারা জানিত খাইতে বসিলেই বলিত আপনার Prayer বলুন — আমি বলিতাম The loving loved this body of mine is not mine it is an instrument made by you for serving your purpose. Let this food, thou hast brought before. develop my body, so this that it be a perfect channel for the expression of thy glory & excellence. আমার Prayer বলার সময় সকলে শির অবনত করিত ও শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিত।

"সুনীল গগন আমাদের শিরোমণি চন্দ্রাতপ মুক্ত।
নিখিল বিশ্বের নরনারী মোরা একটি পরিবারভুক্ত।
একটি মানব জাতি, মোদের শয়ন শয্যা, একই মাতার সবুজ অঙ্ক দেশে।
এক জগদ্বন্ধু বন্ধু সকলের, একত্বে পৌঁছিব শুধু ভালবেসে বেসে।।"

আমি গিয়াছিলাম জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ বার্তা প্রচারণে। মহা ও উদ্ধারণ দুইটা কথা। উদ্ধারণ অর্থ অতি নীচুতে শায়িত অবস্থা হইতে উঠিয়া দাড়ান। আমরা সাধারণ মানুষ স্বার্থান্ধ হইয়া অতি নীচুতে পড়িয়া গিয়াছি। উদ্ধারণ অর্থ আমাদের মানুষের মত উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমরা হিংসা করিব না, চুরি করিব না, নির্মল হইব। পবিত্র পথে চলিব। কখনও মিথ্যা

পথে চলিব না। সত্যই যখন জীবনের অবলম্বন হইবে তখনই অমানুষের হীন শয্যা হইতে আমরা উঠিয়া দাড়াইলাম — মানুষরূপে, সার্থক মানুষরূপে, মনুষ্যত্বের অধিকারী রূপে। এই হইল উদ্ধারণ। আর মহাউদ্ধারণ কী বলিতেছি। দৈহিক মানসিক আত্মিক সাধনার বলে আমরা যখন অনুভব করিব, আপনার আমার অন্তর-অনুভূতিতে জাগ্রত হইবে যে, পৃথিবীর সব জীব আমরা এক, এক মহাশক্তিধর পুরুষ হইতেই আসিয়াছি — আমাদের হৃদয়ে একই রক্তপ্রবাহ, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে একই বায়ু প্রবাহিত, আমাদের সকলের অন্তরে বাহিরে একই ভগবানের নিত্যসত্য সমুজ্জ্বল শক্তিকণা বিরাজিত, আমাদের জীবনের গতি ও পরিণতি একই করুণাময়ের কৃপা-সমুদ্রে, তখনই বিশ্বমানবের মহাউদ্ধাবণ তত্ত্বের উপলব্ধি। ইহাই মহাউদ্ধারণ শব্দটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

আমরা অনুভব করিব—

ঊর্ধ্বে বিশাল আকাশ আমার শিরে চন্দ্রাতপ সামিয়ানা,

নিম্নে একই ধরণী জননী সবুজ মাতৃঅঞ্চল।

একই ভ্রাতৃত্বের বাহু-বন্ধনে আমরা চির আলিঙ্গনাবদ্ধ,

একজন সর্ব নিয়ন্ত্রণ কৃপাশিস্ করে আমাদের হৃদ্দেশে বন্ধুরূপে।

তিনি ভাই বন্ধু পিতামাতা কর্তা সুহৃৎ,

তাঁহাকে সুহৃৎ বলিয়া জানিলেই শান্তি।

অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মুখোক্তি।

"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।" গীতা (৫।২৯)

"আমাকে যিনি সুহৃৎ বলিয়া জানেন তিনিই পরা শান্তি লাভ করেন।" জয় জগদ্বন্ধু।

ইং- ২১-১১-১৯৯৫ বিনয়াবত

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

শ্রীগুরুশক্তি

"শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,

বন্দ মুই সাবধান মতে।

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরম গ্রন্থ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার প্রারম্ভে উপরি-উক্ত পদটি আছে। শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম অর্থ শ্রীগুরুদেব। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবের কথা এইভাবে বলিবার

* *'অর্ঘ্য', ১৩৮১ সালে প্রকাশিত নবম ভক্তসম্মেলন স্মারক গ্রন্থ। শ্রীগুরুসংঘ, নাকতলা।*

রীতি। 'শ্রীগুরুদেব আসিয়াছেন' না বলিয়া 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম আসিয়াছেন' বলিতে হয়। সদ্ম শব্দে গৃহ বুঝায়। শ্রীগুরুদেব একখানি ভক্তির গৃহ, তাঁহার অন্তর ভরিয়া কেবল ভক্তিদেবীই বাস করেন। ভক্তিদেবীর কৃপাতেই সংসার-সাগর পার হওয়া যায় ও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করা যায়। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ-ফলে সংসার-বন্ধন ঘুচে ও কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। দুঃখী জীবের এই দুইটি বিষয়ই কাম্য। দুঃখনাশ ও প্রেমসেবা প্রাপ্তি। শ্রীগুরুর কৃপায় এই দুইই লাভ হইতে পারে। অতএব যাহা সাধ্য বস্তু তাহা শ্রীগুরুপ্রসাদে প্রাপ্তি হয়। অথচ শাস্ত্রে আছে — "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" একমাত্র আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হইলে মায়া-নদী পার হওয়া যায়। "আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।" আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ছাড়া আর কেহ ব্রজ-প্রেম দিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণকৃপা অভিন্ন — ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইলে গুরু আর কৃষ্ণ অভিন্ন হয়। ভেদবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয় এইরূপ কথা শাস্ত্রে ও সজ্জনমুখে শ্রুত হয়। "আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ" — এই শাস্ত্রবাক্যে আমাকেই আচার্য বলিয়া জানিবে এই উক্তি স্পষ্ট।

আবার "তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে জানা যায়—গুরু প্রদর্শক, শ্রীহরির পাদপদ্মই লক্ষ্য বস্তু। বস্তু এবং তাহার প্রদর্শনকারী এক হইতে পারে না। আমি আপনাকে হিমালয় দেখাইয়া দিলাম। হিমালয় এবং আমি এক হইতে পারি না। ভিন্ন হইতে হইবে।

তাহা হইলে বুঝা গেল শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণ কোনও কোন অংশে অভিন্ন, আবার কোন কোনও অংশে ভিন্ন। ভিন্নাভিন্ন ভেদাভেদই গুরু ও কৃষ্ণের সম্পর্ক। এখন বিবেচ্য, শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অংশে ভিন্ন, আর কোন্ অংশে অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণের কারণ। নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লযের হেতু। শ্রীগুরুদেবও কি তাহাই? নিশ্চয়ই নহে। গুরুদেবও যদি তাহাই হন তাহা হইলে বিশ্বের মূলে দুইজন সমশক্তি কৃষ্ণ স্বীকারে কল্পনাগৌরব ছাড়া আর কী লাভ? দুই কৃষ্ণ স্বীকারে অদ্বয়তত্ত্ব হানি হইয়া সকল সিদ্ধান্তই নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। সুতরাং হ্লাদিনী-শক্ত্যংশে রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, সর্বাংশে নহে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অভিন্ন। কারণ শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের সংকর্ষণ শক্তি। সুতরাং সংকর্ষণ-শক্ত্যংশে কৃষ্ণ বলরাম অভিন্ন, সর্বাংশে নহে।

জীব আর শ্রীকৃষ্ণও অভিন্ন। কারণ জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। সুতরাং তটস্থা-শক্ত্যংশে জীব ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, অন্য কোন অংশে বা সর্বাংশে নহে। ঠিক তদ্রূপ, শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ শক্তির মূর্তি। অনুগ্রহ-শক্ত্যংশে গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সর্বাংশে নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে অনুগ্রহশক্তিত্ব পুরস্কারে শ্রীগুরু ও গোবিন্দ অভিন্ন, তদ্ভিন্ন অন্য শক্তিত্ব পুরস্কারে ভিন্ন। অনুগ্রহশক্তি কৃপাশক্তিরই নামান্তর। যে শক্তিবলে অনুগতজনকে

আপন বলিয়া গ্রহণ করতঃ আত্মসাৎ করেন তাহাই অনুগ্রহ শক্তি। যে-শক্তিবলে তিনি 'প্রণতক্লেশনাশায়', প্রণতজনের ক্লেশ নাশ করেন, যে-শক্তিবলে তিনি হস্তন্যস্তনতাপবর্গ অর্থাৎ নত ব্যক্তির হস্তে ভক্তিরূপ অপবর্গ অর্পণ করেন তাহা অনুগ্রহ-শক্তি। শাস্ত্রে আছে —

"কৃষ্ণ গুরু ভক্ত শক্তি অবতার প্রকাশ।
এই ছয় রূপে নিত্য করেন বিলাস।।"

তাহা হইলে শ্রীগুরু হইলেন শ্রীকৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্তি। কোন্ শক্তির বিলাস? অনুগ্রহ-শক্তির বিলাস। শক্তির সঙ্গে শক্তিমানের বিলাস। গায়কের সঙ্গে গান গাহিবার শক্তি আছে। যখন সে গান গায় তখন গান গাহিবার শক্তির সঙ্গে তাহার বিলাস হয়। তখনই গায়ক সত্যিকার গায়ক।

একজন গায়কের আর দশটি গুণ থাকিতে পারে। সেই সেই গুণানুবন্ধী শক্তির সহিত বিলাসকালে সে গায়ক নহে। সে যখন নর্তক তখন গায়ক নহে। সে যখন বাদক তখন গায়ক নহে।

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ অনুগ্রহ-শক্তির সহিত বিলাস-পরায়ণ তখনই তিনি শ্রীগুরু, অন্য শক্তির সঙ্গে বিলাসকালে নহে। যখন তিনি যশোদা-দুলাল, শ্রীদাম-সখা, শ্রীরাধারমণ তখন তিনি গুরু নহেন। যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী তখন তিনি গুরু নহেন। যখন অর্জুন 'শিষ্যস্তেহহং' বলিয়া চরণে প্রপন্ন হইলেন, যখন তিনি অনুগ্রহ-শক্তিতে গলিয়া তাহার প্রতি গীতার পরম উপদেশরাশি প্রদান করিলেন, তখন তিনি গুরু হইলেন। গীতার উপদেশসকল অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকেই দিয়াছেন। এইজন্য গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ জগদ্গুরু —"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্"। অনুগ্রহশক্তির বিলাস কী? হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তাহার কার্য অনেক। বহু কার্যের মধ্যে একটি কার্য হইল ভক্তের আনন্দবিধান। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" ভক্তি বস্তুটি হ্লাদিনী-শক্তির একটি বৃত্তি-বিশেষ। ভক্তি যার আছে সে-ই ভক্ত। সুতরাং হ্লাদিনীশক্তির ভক্তাখ্য-বৃত্তির সহিত যুক্ত ব্যক্তিই ভক্ত, এই হেতু ভক্তের সুখবিধান হ্লাদিনীর একটি বিশেষ কর্ম। কেবল ভক্ত হইলেই যে তার সুখবিধান করেন তাহাই নহে, জীব যাহাতে ভক্ত হয় সে চেষ্টাও হ্লাদিনীশক্তির মধ্যে আছে।

কৃষ্ণ-বহির্মুখী জীব, কৃষ্ণ-উন্মুখী হইলে ভক্তিদেবীর কৃপা হয়। ভক্তিদেবীর কৃপাতেই ভক্ত হন। সুতরাং কাহাকেও ভক্ত করিতে হইলে তাহার কৃষ্ণ-বহির্মুখীনতা ঘুচাইতে হইবে। কাহারও বহির্মুখী বৃত্তি দূর করিয়া কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দিবার যে একটা প্রবল আবেগ, তদনুকূল যে-শক্তি তাহার নাম অনুগ্রহ-শক্তি। শ্রুতিতে আছে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"— তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, যাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহার কাছে আপন স্বরূপ ব্যক্ত করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। এই বরানুকূল্যময়ী শক্তিই অনুগ্রহ-শক্তি। অনুগ্রহ-শক্তি হ্লাদিনীর অনুগত, কিন্তু অন্যান্য অনেক শক্তির তিনি রাণী। অন্যান্য অনেক শক্তি মিলিয়া যাহা করিতে পারে, রাণী মা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন। "কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।" অন্যান্য অনেক শক্তি যাহারা কখনও কখনও পথে থাকিয়া সাধ্যলাভের পক্ষে বাধা

সৃষ্টি করে তাহারাও রাণী মা আসিতেছেন দেখিলে পথ ছাড়িয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুগ্রহ-শক্তি নামক মহাশক্তির প্রকটমূর্তিই শ্রীগুরু।

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-শক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—(১) অন্তর্যামীরূপে, (২) শাস্ত্ররূপে ও (৩) আচার্যরূপে।

(১) প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামীরূপে বিদ্যমান। ইহার পৌরাণিক নাম ক্ষীরোদশায়ী। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। ইঁহার তিন প্রকার কাজ ঃ ক) ইনি সাক্ষীরূপে দ্রষ্টারূপে সকল কিছু দেখেন, খ) কর্মানুসারে ফলভোগ করান ও গ) অনুগ্রহশক্তির প্রকাশে জীবের কর্তব্য নির্দেশ করেন বিবেকের বাণীরূপে। এই অন্তরচারী গুরু সকলের মধ্যেই বিরাজমান আছেন। ইনি 'হৃদ্দেশে' থাকিয়া বুদ্ধি প্রচোদিত করেন। ইনি বুদ্ধিযোগ দান করেন —"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

(২) শাস্ত্ররূপে তিনি জীবকে জীবনের চরম পরম সাধ্য ও সাধন তত্ত্বটি জানাইয়া দেন। জগতে কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় যাইতেছি, গন্তব্য পথে কতটুকু অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হইতেছি তাহা শাস্ত্রের নির্দেশ ও লক্ষণাদি হইতে জানিতে পারা যায়। পরমাত্মার স্বরূপ কী, জীবাত্মার স্বরূপ কী, জীবাত্মা কেমন করিয়া পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিবে— সকল কথাই শাস্ত্র জানাইয়া দিতেছেন। শাস্ত্র তিন প্রকারে জীবকে উন্মুখী করিবার চেষ্টা করেন। ভীতিদ্বারা, নীতিদ্বারা ও প্রীতিদ্বারা।

(ক) শাস্ত্র বলেন, আমাদের বিধিনিষেধ মত না চলিলে ভীষণ দুঃখ পাইবে। শাস্ত্র পুনঃ-পুনঃ জন্মমৃত্যুর ভীতি ও নরকের ভীতি প্রদর্শন করেন। ইহা অতি নিম্নস্তরের মানুষের জন্য প্রয়োজন।

(খ) একটু উন্নততর মানুষের জন্য শাস্ত্র নীতির ভিত্তিতে বলেন, মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্ব লাভ করা তোমাদের কর্তব্য। স্বধর্ম পালন করা তোমার কর্তব্য। শুধু কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য কর, অন্য কোন ফলাফলের কথা ভাবিও না। কর্তব্য পালনে আত্মপ্রসাদ আছে, জগতের কল্যাণ আছে। বিশ্বের মধ্যে যে একটি শাশ্বত নীতি, ধ্রুবা নীতি (Cosmic Law) আছে, তোমার কর্ম সেই মহান্ নীতির অনুগত হইলে, তোমার কর্তব্য পালনে বিশ্বের কল্যাণ নিহিত। নৈতিক ভিত্তিতে শাস্ত্র এই সকল নীতি উপদেশ দেন।

(গ) শাস্ত্র জানাইয়া দেন যে, শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের একটা গভীর প্রীতির সম্বন্ধ আছে। সেখানে ভীতির স্থান নাই, শুধু নৈতিক কর্তব্য পালনেও তাহার সার্থকতা নয়। ভগবান্ প্রেমের দেবতা (রসো বৈ সঃ), সৃষ্ট জীবের সহিত তাঁহার একটি প্রীতির সাবগাহী নিত্য সম্বন্ধ আছে। সেই স্বরূপ সম্বন্ধে স্থিত হইলে জীব তাহার জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা উপলব্ধি করিতে পারে। শাস্ত্র ইহা জানাইয়া দেন ও শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দেন। যে-সকল মানব সত্ত্বগুণময় ভূমিতে অবস্থিত তাহারাই শাস্ত্রের এই বাণী শুনিয়া রসাবগাহী অনুরাগের পথে অগ্রসর হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের জন্য শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহশক্তির তৃতীয় প্রকাশ আচার্যরূপে। জীবান্তর্যামী ও শাস্ত্ররূপে যেমন

তিনি নিত্যস্থিত, আচার্যরূপেও তাঁহার স্থিতি সেইরূপ নিত্য ও শাশ্বত। এই নিত্যগুরুর অপর নাম সমষ্টিগুরু। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তিরূপে তৎপার্শ্বে বিরাজমান আছেন।

সমষ্টিগুরুর অগণিত প্রকাশ ব্যষ্টিগুরুরূপে। অন্তর্যামী ও শাস্ত্ররূপ প্রকাশ হইতে আচার্যরূপে প্রকাশের একটা বিশেষত্ব আছে। অন্তর্যামীর বিবেকবাণী, শাস্ত্রের নির্দেশবাণী ও আচার্য-মুখোক্তি উপদেশবাণী মূলতঃ একই। পার্থক্য এই যে, শাস্ত্রের নির্দেশ ও অন্তর্যামীর নির্দেশের মধ্যে ঐ নির্দেশ গ্রহণ করাইবার মত প্রচেষ্টা নাই। প্রচেষ্টার মূলে থাকে অন্তরের বেদনা। বুকে বেদনা না থাকিলে গ্রহণ করাইবার জন্য প্রচেষ্টা থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের এমন একটা আধিক্য আছে যে জীবের কৃষ্ণবিমুখতারূপ দুঃখ দর্শনে তাহা দ্রবীভূত হয়। চিত্তের এই দ্রবীভূত ভাব গলিয়া যাওয়ার অবস্থাটির অন্য নাম জীবদুঃখ-কাতরতা। এই কাতরতা গুরুস্বরূপেই অভিব্যক্ত, অন্তর্যামী বা শাস্ত্ররূপে প্রকাশে নহে। অন্তর্যামী ও শাস্ত্র যথার্থবাদী, কিন্তু দরদী নহেন। গুরু যথার্থ দ্রষ্টা ও পরম দরদী। এই দরদ বা জীবদুঃখকাতরতা সমষ্টি-গুরুতে আছে পূর্ণরূপে। ব্যষ্টিগুরুর মধ্যে এই বেদনা যেখানে যত অধিক, সেখানে সমষ্টি-গুরুর তত অধিক প্রকাশ। এই জীবদুঃখকাতরতার একটা অপূর্ব প্রকাশ দেখি আমরা বুদ্ধদেবে। জীব কেন ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর কবলে কষ্ট পায় — এই ভাবনায় বেদনার্ত হইয়া তিনি দুঃখনিবারণের পথ অনুসন্ধান করেন, পরম বোধিরূপে তাহা লাভ করেন, জীবকে তাহা বিতরণ করেন। বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ সর্ব মানবীয়।

জীবদুঃখকাতরতার একটা বিশাল রূপ আমরা দেখি অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে। জীব হরিবিমুখ হইয়া কষ্ট পাইতেছে, এই জন্য তিনি গঙ্গাতটে বসিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন এবং দুঃখহারীকে আকুলভাবে আহ্বান করিয়াছেন। অদ্বৈত ভক্তিপথের আচার্য, কিন্তু সঙ্গে এই কাতরতা অধিক থাকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ শক্তির সঙ্গে অভিন্ন বা সমষ্টিগুরু। এই জন্যই ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্যকে 'হরিণাদ্বৈত' বলেন।

ব্যষ্টিগুরুর প্রকাশ অগণিত। কিসে শিষ্যের মায়া বন্ধন ঘুচিবে ও সে কৃষ্ণোন্মুখী হইয়া তাঁহার সেবাভাগ্য লাভ করিবে — এই প্রচেষ্টা যেখানেই আছে সেখানেই গুরুশক্তির অল্পবিস্তর প্রকাশ আছে বুঝিতে হইবে। বাংলা কথায় পূজনীয়জন মাত্রেই গুরুজন, ইহার হেতু এই যে, পূজনীয়জন আমার কল্যাণকামী। মায়াবন্ধনমুক্ত হইয়া কৃষ্ণোন্মুখী হওয়াই প্রকৃত কল্যাণ। এই কল্যাণ যিনি কামনা করেন বা কীরূপে পাইব তদ্বিষয়ে সহায়তা করেন তিনি নিশ্চয়ই গুরুজন। যিনি পূজনীয়জনের মধ্যে হিরণ্যকশিপুরূপে প্রকাশিত তিনি পিতা হলেও গুরুজন নহেন — তাঁহার আজ্ঞা পালনীয় নহে।

ব্যষ্টিগুরুকে শাস্ত্র 'ভক্তশ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের যত ভক্ত আছেন তার মধ্যে আমার আচার্যদেবই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয় এইরূপ ভাবনা করার রীতি আছে। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ শ্রীগুরুদেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' রূপে স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কিসে সর্বাধিক সুখ হইবে, তাহা তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় আমার গুরুদেবই জানেন সুতরাং আমার পক্ষে তাঁহার আদেশই প্রতিপালনীয়, যদি কৃষ্ণপ্রীতিবিধান আমার লক্ষ্য হয়। গুরুদেব কখনও

উপদেশ দেন, কখনও নির্দেশ দেন, কখনও আদেশ দেন। উপদেশ অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে হয় সঞ্চিত ধনের মত, নির্দেশ বিচারপূর্বক পালন করিতে হয়, আদেশ অবিচারে শিরে ধারণ করিয়া সাধনপথে চলিতে হয়।

ব্যষ্টি-গুরুর প্রকাশ জগতে অগণিত। ঠাকুর মহাশয় বলেন—"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।" যে যার গুরু সে তার জন্মজন্মের গুরু। প্রত্যেক জন্মেই গুরুর সঙ্গে মিলন হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরেও তিনি সর্বদা পার্শ্বে থাকিয়া সেবার নির্দেশ দেন। পিতামাতা স্ত্রীপুত্র সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ এক জন্মের, এক মাত্র গুরুর সঙ্গেই সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের — এরূপ নিজের জন আর নাই।

ব্যষ্টিগুরু সমষ্টিগুরুর অংশপ্রকাশ। যেমন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন সেইরূপ সমষ্টিগুরু কখনও কখনও জগতে আসেন। বুদ্ধদেব ও অদ্বৈতাচার্যের কথা বলিয়াছি। তাঁহাদিগকে সমষ্টিগুরু বলা যায়। খৃষ্টান ধর্মের গুরু যীশুখ্রীষ্ট। তাঁহারা বলেন — খৃষ্ট ছাড়া ভগবান্‌কে পাইবার আর কোন উপায নাই। কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য অনুধ্যান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা যীশুখৃষ্টকে সমষ্টিগুরু বলেন। খৃষ্টান মতে ব্যষ্টিগুরু স্বীকার করেন না। ঐ সমষ্টিগুরু যে ব্যষ্টিরূপে নানা স্থানে বহুরূপে ব্যক্ত হইতে পাবেন, তাহা মানেন না। ইসলাম ধর্মেও অনুরূপ। হজরত মহম্মদকে তাঁহাবা সমষ্টিগুরু মনে করেন। এই জন্যই তাঁহার আশ্রয় ছাড়া ঈশ্বরকে পাইবার উপায় নাই ইহা বলেন। হজবত মহম্মদ নিজে লক্ষাধিক ব্যষ্টিগুরু স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে তাঁহারা আসিয়াছেন একথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তীরা আর ব্যষ্টিগুরু স্বীকার করেন না।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীকে সদ্‌গুরুর অবতার বলা হয়। তাৎপর্য এই যে তিনি সমষ্টিগুরুর প্রকট মূর্তি। এই সম্প্রদায় ব্যষ্টিগুরুও স্বীকার করেন। ব্যষ্টিগুরু স্বীকার না করিলে যে একটা সংকীর্ণতা আসিতে পারে, এই সম্প্রদায় সেই ভয়মুক্ত। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর অনুগৃহীতেরা তাঁহাকে গুরুতত্ত্বের প্রকাশ বলেন। তাৎপর্য এই যে, তিনি সমষ্টিগুরুর বিগ্রহ। শ্রীনিগমানন্দজী নিজেও বলিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের অবতার নহেন, তবে গুরুতত্ত্বের পূর্ণতা তাঁহাতে আছে। এই সম্প্রদায়ে ব্যষ্টিগুরুর স্বীকৃতি নাই, এইরূপ মনে হয়।

শিখ সম্প্রদায় গুরু নানককে সমষ্টিগুরুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের ব্যষ্টিগুরুর স্বীকৃতিও আছে—দশম গুরু শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহে গুরুতত্ত্বের একটা অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল। ইনি কেবল শিষ্যের ব্যক্তিগত মুক্তির কথা ভাবেন নাই, সমগ্র আর্য জাতির মুক্তির চিন্তায় ইনি একটি শক্তিশালী জাতি সংগঠন করিয়াছিলেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ 'শিষ্য'। গুরুগোবিন্দের শিষ্যগণ নূতন আধ্যাত্মিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক সিংহতুল্য পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কবিগুরু সত্যই লিখিয়াছিলেন—

"দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্মম নির্ভীক।"

মানব-জীবনকে তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সমগ্র মানবজাতিগত। কোন কোন গুরুর দৃষ্টি থাকে শিষ্যবর্গের ব্যক্তিগত কল্যাণের প্রতি, আবার কাহারও বা দৃষ্টি থাকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের প্রতি, তাঁহার মধ্যে গুরুশক্তির যতটা প্রকাশ তাহার কর্মের ব্যাপকতা ও গভীরতা তত বেশী হয়। উক্ত তিন প্রকারের কল্যাণ ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। হিন্দু সমাজের কল্যাণ প্রত্যেকটি হিন্দু ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ সমগ্র হিন্দু-সমাজের উপর নির্ভর করে। আবার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন পার্শী শিখ ব্রাহ্ম আর্যসমাজী সবগুলি সমাজের উন্নতি হইলে মানব জাতির উন্নতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক দৃষ্টি না খুলিলে কোন একটা সমাজের আত্মিক কল্যাণ লাভ সুকঠিন। যিনি ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা করেন তিনি সমাজগত ও মানব-জাতিগত কল্যাণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। ব্যক্তিসমাজ ও মানবজাতির প্রকৃত মঙ্গল পরস্পর সাপেক্ষ্য। শ্রীশ্রীজগদ্গুরু সমগ্র মানবসমাজকে সেই পরম কল্যাণের পথে, চরম শ্রেয়ঃলাভের পথে পরিচালিত করুন—এই প্রার্থনা। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ❒

দশটি বাণী

১। মহাশক্তি মহামায়া পরব্রহ্মের পট্টমহিষী।
চণ্ডী বলেন, মহামায়া "হরে শক্তিঃ"।
শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন। মা মহামায়া পরব্রহ্মই।

২। মায়ের মধ্যে আছে দুটি বিরুদ্ধগুণ — তিনি করুণাময়ী, তিনি ভয়ঙ্করী। চণ্ডী বলেন — মায়ের চিত্তে কৃপা, সমরে নিষ্ঠুরতা, সুসন্তানের প্রতি কৃপাময়ী। সন্তানের অমঙ্গলকারীদের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিনি ভীষণা।

৩। গীতার যুদ্ধ বাস্তব কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে।
চণ্ডীর যুদ্ধ সাধকের অন্তরে দেবতায়-অসুরে। দৈবী ও আসুরী সম্পদের তীব্র সংঘর্ষে।

৪। মায়ের মহীয়সী মূর্তির মধ্যে সকল দেবগণের শক্তিসমূহ প্রকটিত।
মায়ের বাহু বিষ্ণু, চরণ ব্রহ্মা, বদন শিব। এক দর্শনে সবার দর্শন।

৫। সুসন্তান মায়ের কৃপা পায়। মনুষ্যত্ব লাভ করিলেই সুজন হওয়া যায়। যার মধ্যে হিংসা নাই, চুরি নাই, মিথ্যা নাই, দেহে মনে অপবিত্র নয়, চরিত্রে মালিন্য নাই সে সজ্জন, সুসন্তান, প্রকৃত মানুষ পদবাচ্য।

৬। শ্রুতির সার — গীতা। তন্ত্রের সার — চণ্ডী।
তপস্যার সার — ব্রহ্মচর্য। শ্রেষ্ঠ কার্য — নিঃস্বার্থ দান
নির্মল আনন্দ — শুদ্ধ ভালবাসা। পূর্ণতা — ভক্তি ধর্ম লাভে।

৭। জীবনের সফলতা — বিদ্যা লাভে
সমাজের সফলতা — একপ্রাণতায়
জাতির কল্যাণ — জাতিভেদ দূরীকরণে।
রাষ্ট্রের কল্যাণ — সংগঠনে।
গণতন্ত্রের কল্যাণ — ভোটভাবনা ত্যাগে, দলাদলি বর্জনে, প্রত্যেকের দেশকল্যাণ সাধন সংকল্পে।

৮। চিত্তের উদারতা — জলের মত নিম্নগামী হইয়া সমাজে যারা নীচু তাদের আপনজন করুক। সাধনসম্পদ্ অগ্নির মত ঊর্দ্ধগামী হইয়া সর্বমঙ্গলময় পরম পুরুষের পাদপদ্ম স্পর্শ করুক।

৯। উন্নতি লাভের পথ সম্বল — গুরুর আনুগত্য। প্রথম গুরু জননী জনক, দ্বিতীয় গুরু শিক্ষক অধ্যাপক, তৃতীয় গুরু—সাধুভক্ত সৎলোক, চরম গুরু — অন্তর্যামী বিবেক।

১০। যে কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছে বৃত্তের পরিধির সকল বিন্দু তার সমদূরে। নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রস্থ পরমারাধ্য পুরুষকে যে আশ্রয় করিয়াছে — সমদর্শন সম্যক্‌দর্শন তদনুরূপ আচরণ তাঁর সম্ভব। ❑

সাহিত্যরস

শ্রুতিশাস্ত্র পরব্রহ্মকে 'রস' বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" এই রসাস্বাদনে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন হয়। সাহিত্যিকেরা আর একটি রসের কথা বলিয়াছেন। সেটি হইল সাহিত্যরস। সাহিত্যিকেরা তাহাকে "ব্রহ্মানন্দ-সহোদর" বলিয়াছেন। উত্তম সাহিত্যের রস আস্বাদন ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের কাছাকাছি। এই সাহিত্যের রস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কাব্য-সাহিত্যকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা একটি জীবন্ত মানুষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সেই পুরুষটির নাম দিয়াছেন কাব্য-পুরুষ। একটি জীবন্ত মানুষের যেমন দেহ প্রাণ আত্মা বসনভূষণ অলংকার ও গতিশীলতা আছে, কাব্যপুরুষেরও তাহা আছে।

কবিরা যাহা নির্মাণ করেন তাঁহাই কাব্য সাহিত্য। যাঁহারা কাব্য নির্মাণ করেন তাঁহারা কবি। একথা বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বটে কিন্তু উপায় নাই। কবির ঠিক লক্ষণ করা যায় না। কবিত্বের প্রাক্তন বীজ বা সংস্কার নিয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি কবি। কবি তৈয়ারী করা যায় না। গেলে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে একজন কবি করিয়া যাইতে পারিতেন। কবির যে অসাধারণ চমৎকারী রচনা তাহাই কাব্য সাহিত্য।

শব্দ ও বাক্য হইল কাব্যপুরুষের দেহ। অর্থ হইল মন, রস হইল কাব্যপুরুষের আত্মা, অলংকার হইল কাব্যপুরুষের ভূষাদি। রীতি (style) হইল কাব্যপুরুষের গতিশীলতা।

শ্রীভগবানের চিৎশক্তিতে নাদের উৎপত্তি, নাদ হইতে বিন্দু বা তান। প্রণব হইতে যাবতীয় অক্ষর। ঐ অক্ষর বা অক্ষর সমষ্টি কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলে তাহাকে বলে শব্দ। তখন মনে একটি সুখোদয় হয়। মনে হয় উপেন অনেক বড় হইয়া গেল। মনে হয় আমিও সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া বড় হইয়া গেলাম। এই চমৎকারিতা হইল সাহিত্যের আত্মা স্বরূপ রস। চমৎকারীত্ব উপভোগের সময় আর কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য যেন থাকে না। অন্য কোন অনুসন্ধানও থাকে না। বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় ক্ষণকালের জন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। এমনটি হইলে বলিব যে, সাহিত্য রচনায় রস আছে। আত্মাহীন দেহ যেমন মূল্যহীন, রসহীন সাহিত্য সেই প্রকার সাহিত্য পদবাচ্য নহে। নানা হেতু সংসার ছাড়িয়া লোকে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু এইভাবে সেই কথা কেহ কহে না—এইজন্য অপূর্ব।

এক একটি শব্দে এক বা একাধিক বস্তুর সংকেত। যেমন বেল বলিলে একটি ফল বুঝায়। ইহা অজানিক সংকেত—কে কবে করিয়াছে জানা যায় না। রেল বলিলে একটি গাড়ী বুঝায় ইহা আধুনিক সঙ্কেত।

শব্দের অর্থ নির্মাণে তিনটি বৃত্তি আছে ঃ অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। যেমন গঙ্গা বলিলে গঙ্গা নদীর জল বুঝায়। কিন্তু গঙ্গাপ্রাপ্তি বলিলে গঙ্গা তীরে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে বুঝায়। প্রথমটি অভিধা, দ্বিতীয়টি লক্ষণা। ব্যঞ্জনা অর্থ শব্দের মধ্যেই থাকে না অনেক দূরে থাকে। জ্ঞান বিচার দ্বারা তাহা বাহির করিয়া আনিতে হয়। কোন বাঙ্গালী বধূকে তার গুরুদেব আশীর্বাদ করিলেন— তোমার শাঁখা-সিন্দুর অক্ষয় হউক—এই কথাটার অর্থ শাঁখা ও সিন্দুরের শব্দার্থ দ্বারা বুঝা যাইবে না। বাঙালী নারীদের জীবনের কতগুলি সংস্কার জানিয়া বুঝিতে হইবে যে গুরু যাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন সে কখনও বৈধব্য-দুঃখ ভোগ না করুক।

রসকে কাব্যপুরুষের আত্মা বলিয়াছেন। যাহা আস্বাদন করা যায় তাহাই রস। সকল আস্বাদন বস্তুই রস নয়। যে সাহিত্য আস্বাদন করিতে চমৎকারিত্ব আছে তাহাই সাহিত্যের রস। চমৎকারিত্ব বলিতে কী বুঝায়? যাহা পূর্বে কখনও আস্বাদন করা হয় নাই, এমন কোন অপূর্ব বস্তুর আস্বাদনে লোলুপের আতিশয্য হয়, সেই আতিশয্য বলিতে চিত্তের উদারতা হয়, সেই উদারতা চমৎকার। উদারতা বলিতে প্রসারতা। চিত্তটি যেন প্রসারিত হইয়া কিছুটা বড় হইয়া যায়। এই প্রসারতা যখন হয় তখন সাহিত্যের পাঠক বা শ্রোতার সুখ হইবে অহো! বা বা! কি-চমৎকার! Hear Hear! এইরূপ ধ্বনি নির্গত হয়। চমৎকারিত্তের সঙ্গে একটা সুখানুভূতি পাবে।

উপেন নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ঘর জমিজমা জমিদার মিথ্যা দেনার খাতে সব নিলাম করিয়া নিয়া তাহাকে বাড়ী ছাড়া করিলে সে সাধু হইয়া গেল একথা শুনিলে দুঃখ হবার কথা; কিন্তু কবি লিখিলেন—

"মনে ভবিলাম মোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহ গর্তে।
তাই লিখে দিলে বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।" □

ঈশ্বরের রূপ আছে কিনা?

ঈশ্বরের রূপ আছে কিনা? সন্ন্যাসীরা বলেন রূপ নাই। বৈষ্ণবরা বলেন আছে।

বেলুড়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থান, তখন সন্ন্যাসী যোগানন্দ খুব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আমরা সন্ন্যাসীটি, মূর্তির পূজা করিব কেন? ঋষিরা বলেন অনেক আগে ভগবানের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

ভগবানের ভক্তেরা পূজা করিতে চায়। রূপ না থাকিলে পূজা হইবে কীরূপে? বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে আরও বলা হয়, 'চিনি হইতে চান না, চিনি খাইতে চান।' এই সকল কথা দ্বারা ভগবানের মূর্তি আছে কিনা এই সিদ্ধান্ত করা যাইবে না। কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে শাস্ত্রদৃষ্টির করিতে হইবে। শাস্ত্রগুলির নাম বেদ উপনিষদ্ এক, গীতা-মহাভারত দুই ও বেদান্তসূত্র তিন। এই শাস্ত্রীয় কথা উল্লেখ করিতে তিনটি শাস্ত্রের নাম আছে বেদ-উপনিষদ্ শ্রুতিপ্রস্থান, বেদান্তসূত্র ন্যায়-প্রস্থান ও গীতা-মহাভারত স্মৃতিপ্রস্থান। কোন বিধি বিধান মানিয়া সত্যনির্ধারণে প্রবৃত্তি আলোচনা—তাহাকে বলে বাদ-বিচার। গীতা বলিয়াছেন 'বাদ প্রবদতামহম্।' আমাদের আদালতে যে-সব বিচার হয় তাহা শাস্ত্রীয় বাদবিচার নহে। আদালতে বিপক্ষ সপক্ষ সত্য নির্ধারণের প্রস্তাব করেন, দুই পক্ষই নানা চাতুর্যপূর্ণ বাক্যে নিজ নিজ পক্ষের সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করে। ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় ইহাই এক প্রকার জল্প বা বিতণ্ডা; বাদ-বিচার নহে। এভাবে শাস্ত্রীয় বিচার চলিবে না। সকল পক্ষেরই শেষ কাটাইয়া গেলে সত্য উদ্ধারণ। ইহার বেদ উক্ত বাদ।

অচিন্ত্যকার অনুসারে যদি আমরা পাই একরকম ঠকিয়া দৃষ্টান্ত করিয়া লই। যদি বলি ঝাউগাছে কোন ফুলফলের গন্ধ নাই। ঝাউগাছ সুদৃঢ় সুউচ্চ ও বহু পাখীর আবাসস্থল, তবে বুঝিব ঝাউগাছের কোন গুণ নাই বা আছে। একথা দুই অর্থে সত্য। শাস্ত্রে পাই ভগবানের হাত পা নাই। আবার যদি বলি তিনি হাটেন ও ধরেন। এই দুইটি কথা দুই অর্থে বলা হইয়াছে। হাত-পা নাই অর্থে আমাদের মত প্রাকৃত নশ্বর হাত-পা নাই, আর ধরেন চলেন বলিতে বুঝিব অপ্রাকৃত অনশ্বর ও নিত্য অপরিবর্তনীয় হাত পা তাঁর। বিধি অনুসারে ইহাই বুঝিব।

মহম্মদ জানিতেন যে আল্লার রূপ আছে। যে-আল্লার সঙ্গে তাঁহার নিবিড় বন্ধুত্ব, যে আল্লার সিংহাসনের তিনি অতি নিকটবর্তী হইয়াছে তাঁহার রূপ আছে। কিন্তু সেই রূপ আমাদের মত নহে। মানুষের মত নশ্বর পচনশীল পরিবর্তনশীল রূপ তাঁহার নহে। তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত চিন্ময়। এই চিন্ময় রূপের কথা মানুষকে বলিলে তাহারা তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। আবার পুতুল পূজা আরম্ভ করিবে। এই জন্য তিনি সাধারণ লোকের কাছে তাঁহাকে আকারহীন বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। যখন মানুষ তাঁহাকে প্রাকৃত জড়ীয় আকারশূন্য বুঝিতে পারিবে তখন অপ্রাকৃত রূপের কথা বলিলে লোকের বোধগম্য হইবে। যে আল্লা তাঁহাকে হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, সাদরে ডাকিয়া মহা মূল্যবান বাণী সকল শুনাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয় আকারহীন নয়। তিনি চিন্ময় আকারযুক্ত। বৈষ্ণবীয় ভাষায় চিদাকার। নিরাকারও নয়। সাকারও নয়। ❒

ধর্মপ্রসঙ্গে

ধর্ম কথাটা কঠিন। কথা আরম্ভ করাও কঠিন। যদি বলেন 'ঈশ্বর আছেন' অন্যরা বলবেন—মানি না। না মানিলে কথার ভিত্তি রচনা করা যায় না। যদি সব কথার পরেই বলা হয় 'মানি না' তবে কথা আরম্ভ করা যায় না। কিন্তু যদি বলা হয় মানুষের জীবনে দুঃখ আছে—তবে বলে মানি। যদি বলেন দুঃখ কেন? উহা কি কেহ চায়? তবে বলে—চাই না, কেহই চায় না, সকলে সুখ চায়। সুখ চায় না এমন মানুষ বিরল। মানুষ সারাজীবন কী করে? অনেক কাজ? না, একটা কাজই করে—দুঃখ দূর করার চেষ্টা। দুঃখ দূর করার চেষ্টাতেই সে নিয়ত রত। কিন্তু দুঃখ যায় না। পরিবর্তে সুখ চায় কিন্তু পায় না। একটু সুখ পায়, পরে থাকে না। ইহা চায় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখই খোঁজে। আনন্দ চায়। দুঃখ না থাকুক সুখ চাই। "দুঃখ না পাই, সুখ চাই" এ মন্ত্রই সবাই জপ করে। "দুঃখং মে মা ভূৎ, সুখং মে ভুয়াৎ"। সুখ যেন থাকে, সুখেই যেন থাকি। পাই না কেন? এ কথাগুলি কেহ মানি না বলে না। সকল মানুষেরই এক মত, এক কথা। এই সুখে থাকার চেষ্টাতেই নিয়ত রত। কী করিতে হবে? দুঃখ দূর করতে হবে। সাম্যবাদের কথা—সকলের জন্য সমান সুখ। কিন্তু উহা টিকতে পারে না। সবাই সমান—সাম্যবাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু তা কি সম্ভব? বিশ্বের যে সমস্ত দেশে সাম্যবাদের প্রচলন ছিল তাহা ভেঙ্গে গেছে। সাম্য টিকানো যায় না। যেমন রাশিয়ায় সাম্যবাদের অবসান।

শাস্ত্র বলেন—সাম্য দুই প্রকার। একটি ভিতরের অপরটি বাইরের। ভিতরের সাম্য না থাকিলে বাইরে পাওয়া যায় না। ভিতরের সাম্যবাদের অভাবেই রাশিয়ার সাম্যবাদ টিকল না।

আমাদের মধ্যে দু'টি জিনিষ—দেহ ও আত্মা। মা যে ছেলেকে ভালবাসেন, তাহা দেহকে নয়, আত্মাকে। আত্মা যে কী বস্তু তাহা কেউ দেখে না। আত্মা যে আছেন উহা বুঝা যায় যখন দেহ ছেড়ে সে চলে যায়। দেহটা ভালবাসার বস্তু নয়, আত্মাই ভালবাসার ধন। এই দেহ ও আত্মার সাম্য থাকিলেই বাইরের সকল সমান করা যায়। দেহ ও আত্মা, এই দুইটারই চাহিদা আছে। দেহের চাহিদা মিটাতেই সকলে চেষ্টাপরায়ণ। দৃশ্যমান যাবদ্‌বস্তু দেহের চাহিদা মিটাতে পারে। সে জন্য প্রয়োজনীয় বহু সম্ভার ব্যাপারে আছে। দেহের সুখের জন্যই সকলের চীৎকার। কিন্তু আত্মা যে আছে এবং তাঁরও যে একটু ক্ষুধা আছে এ বোধটুকু অনেকের নাই। আত্মার ক্ষুধা মিটাইবার বস্তু দোকানে পাওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত আত্মার খাদ্য বাজারে নাই। দেহের খোরাক মিটাইতেই বাজারের যত সম্ভার। দেহের খোরাক নিয়েই সকলে ব্যস্ত। কিন্তু ক্ষুধার্ত আত্মার সম্বন্ধে উদাসীনতাই অসাম্য। বাইরে এবং ভিতরে সাম্যতা নাই। উহাই প্রধান অসাম্য। দেহের জন্য চিন্তা বেশী করিলেও আত্মার

* আগরতলায় মহানাম সেবক সংঘ আয়োজিত ধর্মসভায় ৭-৬-১৯৯৬-এ প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ। অনুলিখন: শ্রীকুমুদরঞ্জন দেবনাথ (আগরতলা)।

জন্য অল্প-বিস্তর চিন্তা করার প্রয়োজন আছে অথচ আত্মার জন্য চিন্তার ক্ষেত্র শূন্য। আত্মার যাহা দরকার তাহার খোঁজ-খবর পর্যন্ত নাই। মানুষ যে চুরি করে, হিংসা করে, খুন করে, অন্যায় করে—তার মূল কারণ আত্মার খোরাক নাই। ক্ষুধার্ত আত্মা আর্তনাদ করছে। সারাটি জীবন আত্মা বিক্ষুব্ধ। শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাই আত্মার বিদ্রোহ। তাই ক্ষুধার্ত আত্মার খোরাক দিতে হবে। মহাপ্রভু বলেছেন—ক্ষুধার্ত আত্মার খোরাক দিতেই মানুষের হরিনাম করা দরকার। আত্মা বিদ্রোহী হলেই মানুষ অন্যায় করে। আত্মার যে খাদ্য তাহা দিলেই সাম্য। ক্ষুধার্ত আত্মার তৃপ্তি দানেই সুখ। দেহ-আত্মার সাম্য রক্ষা করাই ধর্ম। ধর্মের মধ্যেই সব পাবেন। মানব ধর্ম অবলম্বনই সকল সুখের মূল। কুকুরের স্বভাব মানুষে সাজে না। উহা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় না। আত্মার তৃপ্তি বিধানের চেষ্টাই ধর্ম। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সকল মতেই মানব ধর্ম থাকা চাই। উহা না থাকলে কোনও মতেই থাকা যায় না। পশুর ধর্মে মানব ধর্ম রক্ষা হয় না। মানুষ একে অপরকে শ্রদ্ধা করিবে কিন্তু পশু একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে জানে না। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" যিনি নিজেকে নিজে যেমন মনে করেন তিনি অপরকেও তেমন মনে করেন—এরই নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা কঠিন কিছুই নয়। শ্রদ্ধাবান্ হলেই আত্মার খোরাক দেবার যোগ্যতা অর্জিত হয়। পরমাত্মার অংশই আত্মা। পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকাই আত্মার খোরাক। ভক্তিমার্গই পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রধান উপায়। শ্রদ্ধার পরেই ভক্তির স্থান। পরমাত্মাই ভগবান্। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই আত্মা তৃপ্ত।

এই যে পরমাত্মা বা ভগবান্ অথবা ঈশ্বর তাঁহাকে না দেখিলেও নাই বলা কঠিন। যদি কেহ বলে আমার মা বন্ধ্যা—উহা যেমন মিথ্যা; তেমনি ঈশ্বর নাই বলাও মূর্খতা। আমার সত্তাই যেমন প্রমাণ করে আমার মা আছেন, তেমনি আমার সত্তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় ঈশ্বর আছেন। বিজ্ঞানের কোন গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না—ঈশ্বর নাই। যেমন মায়ের স্তনে দুধ আছে তাহা ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়া বাহির করিতে পারেন না কিন্তু একটি শিশু তাহা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারে। তেমনি ভক্তির দ্বারা ভক্ত প্রমাণ করিতে পারেন ভগবান আছেন। শুধু আছেনই নয়, ভক্তের ডাকে ভগবান্ তাঁর কাছে ছুটে আসেন। মায়ের কথাতেই বিশ্বাস করতে হয় বাবা আছেন, তেমনি ভক্তের কথায় বিশ্বাস করতে হয় ভগবান আছেন ও আসেন। ভক্তি লাভ করলেই ভগবান আসেন। তাঁর স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে ইত্যাদি প্রমাণ করা যায়। বিজ্ঞান ভালবাসা প্রমাণ করতে পারে না। ভালবাসাই জগৎ ধারণ করে আছে। ভগবান আছেন প্রমাণ করার চেষ্টা করা কুৎসিত চিন্তা। ভক্তিমান্ হলেই বুঝতে পারা যায় ভগবান্ আছেন কি নাই। যাঁরা ভগবান্‌কে ভক্তি করেন তাঁদের সঙ্গ করলেই ভক্তি লাভ হয়। বড় M.B.B.S. ডাক্তারের সঙ্গে থাকলেই ভাল ডাক্তার হওয়া যায়। তেমনি ভক্তিমানের সঙ্গই ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। যদি সঙ্গ না পাওয়া যায় তবে

তাঁদের কথা আলোচনা করলে, তাঁদের কথা শুনলে, তাঁদের লেখা বই পড়লেই তাঁদের সঙ্গ পাওয়া যায়। যদি একেবারে কোন কিছুই মানা না হয় তবে আর পাওয়ার উপায় কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ যে আছেন বা ছিলেন, তা শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করলে পাওয়া যায়। সৎ গ্রন্থ পাঠেই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি লাভ হলেই আত্মার তৃপ্তি লাভ হবে। তবেই ভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ়তা আসবে। ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে, তাঁকে ভক্তি করলে তবেই শান্তি। নিজের শান্তি থাকলেই বিশ্ব শান্তির চিন্তা করা যায়। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা

উভয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা। (নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

রাজবাড়ী ১২ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ, ১৩৪৬)

গতকল্য স্থানীয় ডান্‌লপ হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ., পি-এইচ-ডি. এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অন্তর্নিহিত বিরোধের কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ মানব জীবনকে ভিন্ন ভিন্নরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যালোচনা করিয়াছে। প্রাচ্যের আদর্শবাদ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ—সর্বজ্ঞানের আধার। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা প্রাচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৃত্তিসমূহের বাহ্যিক পরিস্ফুরণের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ মানব জীবনকে জীববিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্যমতে মানবদেহ একটি biological organism ছাড়া আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্যমতে বাহ্যিক প্রভাব-সমূহ হইতে মানব মনের বৃত্তি সমূহ সংগঠিতময় ও পরিণতি লাভ করে। পাশ্চাত্ত্য জগৎ তাই প্রাণপণে বাহির হইতে সুখ ও শান্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সমগ্র শক্তি ব্যয় করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ আজ শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার মানব সমাজে শান্তি আনয়ন করিতে পারিতেছে না। জীবনের সমস্যাসমূহ প্রত্যহ জটিলতর রূপ ধারণ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ স্বার্থপর স্বাদেশিকতাকে জন্ম দিয়াছে। তাহার ফলে আজ সাম্রাজ্যলিপ্সা, পরজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি অন্যায় সমগ্র জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং জড়বাদী দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দেশ আজ এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া বা পশ্চাৎগমন করা—উভয়ই অসম্ভব। প্রাচ্য দেশের আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই জীবনের জটিলতম সমস্যাসমূহের শুধু সমাধান মিলিতে পারে। বহু পাশ্চাত্ত্য চিন্তানায়ক

* *'আনন্দবাজার', পত্রিকা ১২-৪-১৯৩৯*

আজ এই কথা অনুধাবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা কিছু বিদেশী ও আধুনিক তাহাকেই বর্জন করিবার যে স্থবির মনোবৃত্তি এ দেশীয় কোন কোন পণ্ডিতের আছে তাহার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যে ব্যবধান তাহার সমন্বয়কে ভিত্তি করিয়া নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। এই নূতন সভ্যতার অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্ত্য জড়বাদকে কুক্ষিগত করিয়া নূতন রূপ দিবে—এই নূতন সভ্যতাই ভাবী কালের লক্ষ্যস্থল।

প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, ইহা ভারতীয় ধর্মের প্রাণবস্তু। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তির কোন পৃথক্ সত্তা নাই। তাই বিশ্বের সকল জীবের সহিত একত্বানুভূতি ও ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ—ইহাই ভারতীয় ধর্মের সার কথা। এই প্রেমধর্ম জগতে শান্তি আনয়ন করিবে। ❑

প্রেমধর্ম ও তাহার প্রভাব

ব্রহ্মচারী মহানামব্রতের বক্তৃতা

২৫শে মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতার রামবাগানের হরিজন পল্লীতে ঐ অঞ্চলের ভক্তমণ্ডলীর উদ্যোগে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়, এই সভায় স্থানীয় হরিজন নরনারীরা বিশেষভাবে যোগদান করেন। 'দেশ' সম্পাদক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির অনুরোধে ব্রহ্মচারী মহানামব্রতজী প্রেম ধর্ম সম্বন্ধে সভায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে ভগবানের নামই প্রধান অবলম্বন। এই নামের প্রভাবই হইল প্রেম জন্মানো। শ্রীভগবান্ জীবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক যে কত মধুর তাহা বুঝাইবার জন্য নিজে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া নিজের পরিচয় দেন, নাম বিতরণ করেন এবং নামের ভিতর দিয়া জীবকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। জীব নাম আশ্রয় করিয়া পরমানন্দের আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের ব্যাখ্যা করিয়া নামের মাহাত্ম্য যে কত বেশী তাহা বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলেন, এই নামকে যদি আমরা আশ্রয় করি তাহা হইলে আমাদের জীবনে যত যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে সব সমাধান হইয়া যাইবে। জাতিবর্ণগত যত বৈষম্য হিন্দুসমাজকে আজ দুর্বল করিতেছে, সে সব বৈষম্য দূর হইবে এবং আমরা জাতির সর্বস্তরের সঙ্গে সমাত্মভাবে প্রেমের সঙ্গীতে মিলিত হইতে পারিব। আমাদের জাতীয় জীবনে সংহতি দেখা দিবে, ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। ভেদ বৈষম্যই সমাজের যত অনর্থ ঘটাইতেছে, নাম সঙ্কীর্তনে এই ভেদ-বৈষম্য তিরোহিত হইবে। সমাজের সকলের সঙ্গে সব স্তরের লোকের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে। ব্রহ্মচারীজী বলেন, নামসংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম এবং এই সঙ্গীতে তিনি শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর লীলামাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। ❑

* *'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯।*

আমেরিকা প্রত্যাগত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য

বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী বহু বৎসর আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে কলেজ স্কোয়ারস্থিত থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে তিনি "হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত ব্রহ্মচারী বলেন, পাশ্চাত্ত্য দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল বিষয়ে খুব উন্নত। কিন্তু এই সব উন্নতি সত্ত্বেও একটা বস্তুর অভাব তাহারা অনুভব করিতেছে, সে বস্তু হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম, বিশেষভাবে ভক্তিধর্ম, ভগবানে আত্মনির্ভরতা ও প্রেমের ধর্মের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দূর হইতে পারে। জড়বাদের বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও এই জিনিষের অভাবে পাশ্চাত্ত্য সমাজ খাঁ-খাঁ করিতেছে। তাঁহার ফলে যিশু খ্রীষ্টের প্রেমের ধর্ম আবিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রবিবারে গির্জায় গেলেই তাঁহারা মনে করে ধর্ম ও ভগবান্ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে ভগবান্ অনুপ্রবিষ্ট আছে ইহাই ছিল আমার বার্তা। ভারতের ধর্মের বৈশিষ্ট্যও তাহাই। পাশ্চাত্ত্য দেশে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে ধারণা খুব খারাপ। 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকের প্রচারের ফলে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা দূর করিবার জন্য আমি আমার ধর্ম ও সমাজের কথা, দেব-দেবীর পূজা কেন করা হয়, কালীমূর্তি বিশ্রী কেন ইত্যাদির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি। কালীমূর্তির মধ্যে প্রকৃতির ধবংসলীলা ও ত্রিনয়নে বরাভয় রহিয়াছে—ইহা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছি।

মিশনারী সম্প্রদায় গণেশ প্রভৃতি মূর্তির কদর্য ব্যাখ্যা করিয়াছে আমি তাহা শোধরাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে গরুপূজা কেন করা হয়। আমি বলিয়াছি, গরু মাতৃত্বের প্রতীক। বহুকাল পূর্বে জাতি যখন ভ্রাম্যমাণ ছিল, তখন গরু দ্বারা সভ্যতা রক্ষিত হইয়াছে। যিশুখৃষ্টকে বলা হয় shepherd, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বলি cowherd। ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। একান্নভুক্ত পরিবারে ৫ ভাই একত্রে থাকার ব্যবস্থা আছে, এটাকে হিন্দুরা ধর্ম বলিয়া মনে করে। দুই পুরুষ তফাৎ হইলে ইউরোপীয়ানেরা একে অপরকে চিনিতে পারে না। জাতিভেদের মূলে রহিয়াছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। প্লেটো হিন্দু ধর্ম হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তির জীবনের চারি স্তর ও জাতির জীবনের চারি স্তরদ্বারা হিন্দুসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, নিগ্রোদের প্রতি আমেরিকানদের ব্যবহার তাহা অপেক্ষা ভাল নহে। এইরূপ ব্যবহার বর্ণাশ্রম। ধর্মের দোষ নহে, মানুষের দোষ। আমরা সেই দোষ শোধরাইতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু তাহাদের (পাশ্চাত্ত্যের) সে চেষ্টা নাই। হিন্দুধর্মের যুগোপযোগ্য ভাব আছে। তাহার মূল কথা অনন্ত বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ। সুতরাং সমস্ত মানব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই ধর্মের উদার মত দ্বারা সকলকে এক করা যায়। সমাজের উন্নতির পথ যখন পঙ্কিলতায় রুদ্ধ হইয়া যায় তখন নূতন অবতার আসিয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করেন। সেই জন্য হিন্দু ধর্মের মধ্যে গতিশীলতা আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম

বলে—যিশু খ্রীষ্টই একমাত্র অবতার, অন্য অবতার নাই। ইহাতে সমাজের অবনত অবস্থার পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না। হিন্দুধর্মে এমন তরলতা আছে যে, সকলে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। গ্রীস, রোম ও মিশরের সভ্যতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা এখনও বাঁচিয়া আছে। কারণ তাহার মূলে আছে,—ধর্ম, ভগবান্ ও ভক্তিবাদ। একমাত্র হিন্দুধর্ম জগৎকে সর্বজনীন ধর্ম দান করিতে পারে।

'দেশ' সম্পাদক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন ব্রহ্মচারীজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন, ব্রহ্মচারীজী আমেরিকায় গিয়া বর্তমান যুগের যে শ্রেষ্ঠ দান সেই প্রেম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধনাই হইল নাম সাধনা। নামের অর্থ হইল পরিচয়, নাম আমাদের সঙ্গে ভগবানের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের দিক্ উন্মোচিত করিয়া দেয়। ❑

---

* *'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯।*

কতিপয় ধর্মসভায় ভাষণ

ত্রিপুরায় ভাষণ

ত্রিপুরার একটি নিজস্ব ঐতিহাসিক সত্তা রয়েছে এবং তা মহাভারতের আমলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় থেকে রচিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ রাজ্যের ইতিহাসের সাথে অষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন। বহু ঐতিহাসিক গুণীজন এখানে সংবর্ধনা পেয়েছেন সে ইতিহাসকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বৈষ্ণবদেব আত্মগুণ শ্রবণ করাও পাপ। এ রাজ্যের মানুষেরা যে-ভাবে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ধারা বয়ে নিয়ে আনছেন ভারতের অন্যত্র তা বিরল। হিংসায় অশান্তিতে সমগ্র দেশ এখন উত্তাল।

এ রাজ্যে সে অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে আত্মপ্রচার না করে শ্রীজগদ্বন্ধুকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করতে ...জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে গীতাতে। ভারতের যগ-যুগ সঞ্চিত ইতিহাসের ধারা জীবনের গতিপথের আলোক বর্তিকা রয়েছে গীতাতে। অশান্ত পৃথিবীতে আজ শান্তির বারি এনে দিতে পারে ভারতের বেদ-বেদান্তবাদী ত্যাগবাদ। দর্শনের আরম্ভ বিস্ময় বোধ থেকে। যার এই বোধ নেই তিনি দার্শনিক হতে পারেন না। রৌদ্রের বা অনন্ত আকাশের যেমনি শেষ নেই, তেমনি দর্শনেরও কোন সীমা বদ্ধতা নেই। আমাদের চিত্তের মধ্যে যে বিশালতা আছে দর্শনের পথে এগুলে জয় ব্যাপ্তি আরো বেড়ে যায়।

* * *

বাংলাদেশ দর্শন সমিতিতে ভাষণ

বিজ্ঞানের এ যুগে আমরা বিজ্ঞান থেকে পাচ্ছি জীবনের গতি। বিজ্ঞান উন্নত হচ্ছে, তার সাথে তাল রেখে চলতে না পারলে ক্ষতি হবে। বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধকে রক্ষা করতে পারে দার্শনিকতা। দর্শনের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক কোন ভেদ নেই। দর্শন প্রায় ধর্মের সাথে

যুক্ত থাকে, আবার থাকেও না।

৬/৬/১৯৯২ তারিখে সংবর্ধনা সভায় ব্রহ্মচারীজির আশীর্বচন—

মানুষের জীবনে যত প্রয়োজন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন গীতা। একত্বের মূলমন্ত্র গীতা। একত্বে লীন হওয়া ভারতবর্ষের আদর্শ। দেশকে বাঁচাবার ইহাই পথ। ❏

মহাপ্রভুর অবদান

"...মহাপ্রভু যদি ঐ সময় না জন্মাইতেন তাহা হইলে বাংলার সব মানুষ মুসলমান হইয়া যাইত। সাধারণভাবে অনেক মুসলমান তাই মনে করে যে, মহাপ্রভু ইসলাম ধর্ম বিস্তারের পক্ষে ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানগণ মনে করেন বাংলা ভাষা মহাপ্রভুর দান; তাই মহাপ্রভু বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সকলের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। যাঁহারা বাংলা ভাষার ইতিহাস জানেন তাঁরা সকলেই জানেন যে বাংলা ভাষার ইতিহাসে প্রাক্‌চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্য-পরবর্তী যুগ বলিয়া দুইটি যুগ বিভাগ আছে। মহাপ্রভুর আগমনের পর বাংলা ভাষার যে বিরাট্ উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা একটি যুগ সৃষ্টি করিয়াছে। মহাপ্রভুর সঙ্গীরূপে যে-সব পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আসিলেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর জীবনী ও বাণী লইয়া বাংলাভাষায় নতুন সৃষ্টির বন্যা বহাইয়া দিলেন। বাংলা ভাষায় যে এত শক্তি আছে, আগে তাহার ধারণা ছিল না।" *এই প্রসঙ্গে ডক্টর মহানামব্রতজী-রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা ভাষাকে কীভাবে উন্নত ও বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা বলেন। ডক্টর ব্রহ্মচারী যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন তাঁহার মাতৃভাষা যে বাংলা অর্থাৎ টেগর (রবি ঠাকুর)-এর ভাষা শুধু এই পরিচয়ে তাঁহার কতখানি মর্যাদাবৃদ্ধি ও সম্মানপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করেন। এই বাংলাভাষা মহাপ্রভুর অবদান।*

তিনি বলেন, "গৌরসুন্দরের দান কী তাহা বুঝা দরকার। তাঁহার নামে কিছু উৎসব, হৈ চৈ এবং খিচুরী খাওয়া দ্বারা তাঁহার অবদান উপলব্ধি করা যায় না। বাংলার মাটিতে বাঙালী আমরা কী লইলাম, তিনি আসায় কী হইয়াছে, তিনি না আসিলে কী হইত, এসব বাঙালী জাতি ভাবে কি? মহাপ্রভুর অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম ঃ তিনি ভাব দিলেন, ভাবাদর্শ দিলেন। Idea বা Ideal ছিল না। জাতকে তিনি একটি মহাভাব দিলেন। এই ভাবের পশ্চাতে ভাষাও আসিল। ভাষা ভাবকে প্রকাশ করে। ভাবের বাহন ভাষা। ভাবের স্পর্শে ভাষায় জোয়ার আসিল। দ্বিতীয়তঃ জাতির অতি দুর্দিনে মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন এবং জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেদিন দেশ ছিল বিদেশীর বিজাতীর শাসনাধীন, সমাজ ছিল শতধা বিভক্ত — উঁচু নীচু নানা বিভাগ। মিল ছিল না মানুষে মানুষে। "বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক।" লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল কিন্তু প্রাণ জুড়াইবার মত একজনও ছিল না। খাঁ-খাঁ করছিল যেন দেশ ও জাতির প্রাণ। সে বেদনা বাজিয়াছিল অদ্বৈতাচার্যের প্রাণে। আকুল হইয়া কাঁদিয়াছিলেন তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া। প্রার্থনা করিয়াছিলেন আকুলভাবে সেই প্রাণ জুড়াইবার মানুষের আগমনের জন্য। নবদ্বীপ তখন শাস্ত্রচর্চা কেন্দ্র।

শুষ্ক জ্ঞানচর্চার প্রধান পীঠস্থানে আসিলেন প্রেমের ঠাকুর। নবদ্বীপ তখন ন্যায়ের বিতর্ক ও স্মৃতির কচকচির শ্রেষ্ঠ স্থান। সম্প্রীতির পরশ নাই — শুধু নীরস শাস্ত্রের কচকচি আর পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিতর্ক। এহেন স্থানে, এমন সময়ে আসিলেন যুগের মানুষ—প্রেমের ঠাকুর-সকলের প্রিয় — সর্বচিত্ত আকর্ষণকারী। উচ্চ-নীচ হিন্দু-মুসলমান, সর্বস্তরের সকল মানুষের প্রিয় একজন মানুষ। গৌরবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, নয়নমনোহর রূপ। ”......❑

** শিলিগুড়িতে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষণ। 'শিলিগুড়ি পত্রিকা'। সম্পাদকঃ শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার।*

যুগান্তর ভবনে জন্মাষ্টমী উৎসব

......দেশের সংস্কৃতি আজ দলাদলিতে বিপন্ন। এমন কি মানুষের মানসিকতা আজ দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তুলতে বসেছে। এ অবস্থা শোচনীয়, দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখময়। শ্রীকৃষ্ণই জীবের দুঃখ দূর করে মুক্তি দিতে আবির্ভূত হয়েছেন এই ভারতবর্ষে — নদীয়ায় চৈতন্যরূপে। দেশের বিপন্ন অবস্থায় আজ মহাপ্রভুর বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। মহাপ্রভুর বাণীই আজ পরিত্রাণের উপায়। ❑

** 'আঙ্গিনা'। ২য় বর্ষ ২য় সং (ভাদ্র. ১৩৯১)*

প্রভু জগদ্বন্ধু সেবাঙ্গনের উদ্বোধন ভাষণ

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন, "মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।" এই কল্যাণ — আত্মিক কল্যাণ ও দৈহিক কল্যাণ। আজ অশেষ প্রকারের ব্যাধিতে জগৎ বিপন্ন। একদিন এমন দিন ছিল, দৈহিক ব্যাধিতে মানুষ বড় একটা ভুগত না। আজ ব্যাধিতে জর্জরিত মানুষ। শ্রীচৈতন্য চরণামৃত খেয়ে নিরাময় হয়েছিলেন। আজ সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাব। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা অনুসারে নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবা করার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা। এই জীবসেবার মধ্যেই মানুষের অশেষ কল্যাণ লুকিয়ে আছে। ❑

** 'আঙ্গিনা'। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।*

সাম্যের বাণীই জগতের একমাত্র শান্তির পথ

বর্তমানে অন্য সব কথা মানুষ শুনতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্মকথা কেহ শুনে না। ধর্ম কেহ বিশ্বাসও করতে চায় না। কেবল চায় দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে অর্থাৎ দুঃখ জীবনে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হ'ল কেন এই দুঃখ? ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে তা বিস্তার লাভ করেছে। ব্যক্তিজীবনে দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দুঃখ একটি রোগ। এই রোগের ডায়গনসিস্ কী? তা হ'ল সাম্যের অভাব। দেহের মধ্যে দু'টি বস্তুর আস্তিত্ব পাওয়া যায় তা হ'ল দেহ ও আত্মা। দেহের পরিবর্তন হয় শৈশব, যৌবন, বৃদ্ধকালে; অথচ আত্মার কোন পরিবর্তন নেই। শৈশবে যে-নামে আমাদের সত্তার পরিচয় মৃত্যু পর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন নেই। আবার বিকিকিনির বাজারে দেহের আরাম আয়াসের বা শ্রীবৃদ্ধির নানা খাদ্য পাওয়া যায় অথচ আত্মার শ্রীবৃদ্ধির কোন খাদ্য বা

উপকরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তাই একই দেহে দুই দল সৃষ্টি হ'ল। একদিকের জন্য প্রভূত রাজভোগের আয়োজন হ'ল, অথচ অপর দিক্ অভুক্ত রয়ে গেল। জীবনক্ষেত্রে সাম্যের অভাব হয়ে গেল। এই অভুক্ত আত্মার খাদ্যই হল ধর্মকথা। সকল ধর্মেরই মূল কথা এক। পাত্র আলাদা হতে পারে, সকল পাত্রেই অমৃত রয়েছে। এই অমৃত বিতরণের দ্বার দেহ ও আত্মার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই। যুগ যুগ ধরে ভারতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছে। জগৎকে তাঁরা সাম্যের বাণী শুনিয়েছেন। ভারত আত্মার এই সাম্যের বাণীই জগতের সমগ্র শান্তির পথ। ❑

** 'দৈনিক সংবাদ', ৮ জুন, ১৯৯২। আগবতলায় ধর্মসভায় ভাষণ, টাউন হল। প্রধান অতিথি ঃ শ্রীকালিদাস দত্ত (মন্ত্রী)।*

প্রেমের সঙ্গে মৃত্যুর সংগ্রামে মৃত্যু হেরে গেছে

শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম অরবিন্দাক্ষ। সাদৃশ্য আছে যেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। কারাগারে জন্ম কৃষ্ণের। কারাগারেই দিব্য দর্শন হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পরোক্ষতঃ। শ্রীঅরবিন্দও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কোথায় যেন মিল।

ভারতবর্ষের বাণী শ্রীঅরবিন্দ। ভারতের একটি দিক্ পার্থিব, অন্যটি আধ্যাত্মিক। একটি বিজ্ঞান, অন্যটি দর্শন। শ্রীঅরবিন্দের জীবন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক। তিনটি স্বপ্ন নিয়ে স্ত্রীকে তিনি পত্র দিয়েছিলেন।

প্রথমতঃ আমার প্রয়োজনটুকু মাত্র ছাড়া আর সব অর্থ ঈশ্বরের সেবার দিতে হবে — মানুষের সেবায় দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের শৃংখলমোচন এবং শেষতঃ দেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতায় জাগ্রত না হয় তবে সেই স্বাধীনতা অর্থহীন। এই তিন স্বপ্ন ছিল তাঁর। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন জড়বাদ আর ব্রহ্মবাদকে এক করে কীভাবে জীবনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া যায়।

অশ্বপতি সাধনা করেছেন এই কথা জানতে কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব? বিজ্ঞান পারছে না বলতে। কিন্তু তপস্যায় তা জানা যায়। আমাদের ভিতরেও একটি তপস্যা আছে। আমরা unconcious, আমরা তা জানি না। শ্রীঅরবিন্দ সেই তপস্যা করেছেন। বিশ্ব তপস্যার সঙ্গে আমাকে যুক্ত করতে হবে সচেতনভাবে — এটা তিনি চেয়েছিলেন। মানুষ এতে দিব্য জীবন লাভ করবে। ভাবে তপস্যায় জীবনে পবিত্রতায় সৌন্দর্যে, পূর্ণতায় একটি ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। জীবনে এই দর্শনকে ও তপস্যাকেই শ্রীঅরবিন্দ রূপ দিয়েছিলেন। সাবিত্রী কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন।

আপনাকে আস্বাদন করার জন্য ব্রহ্মের একটা কামনা আছে। একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। পাখীর একটি পালকের দিকে, জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আনন্দময় জগৎ। এই আনন্দই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই সারা জীবন ধরে জানবার চেষ্টা করছেন আপনি। ❑

** 'আঙ্গিনা'। ১ম বর্ষ, ৩য় সংকলন (অগ্রহায়ণ ১৩৯০)। শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী, ১৫ আগস্ট, ১৯৮৩- [illegible] সদনে প্রদত্ত ভাষণ।*

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গভীরতা উপলব্ধি আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাঁর জীবন এত সুন্দর, এত বিরাট্, এত মহান্, আমরা হতভাগ্য— তাই বুঝতে পারছি না। সাক্ষাৎ নারায়ণ আমাকে আগলে রাখছেন — এই ছিল কারাগারে শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধি। ❑

'আঙ্গিনা'। ২য় বর্ষ ২য় সং (ভাদ্র ১৩৯১)

অনঙ্গমোহন হরিসভায় ভাষণ

রাধাগোবিন্দের মিলিত তনু গৌরসুন্দর আনর্পিত প্রেমধর্ম বিতরণের জন্য করুণায় অবতীর্ণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থেকে অবহেলিত পতিত সকলকেই বুকে টেনে নিয়ে মহাপ্রভু মহামন্ত্র নাম দেন। পরম পথের নব আলোকের উজ্জ্বল স্তম্ভ, প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর গৌরহরির মহিমা প্রাণের আকুতি ও নাম আস্বাদন করেছেন ও সকলকে করিয়েছেন। গৌরসুন্দর ও বন্ধুসুন্দরের জয় জয়।

বৈষ্ণবীয় সাধনার সিদ্ধপীঠ অনঙ্গমোহন হরিসভায় আমি (ডঃ ব্রহ্মচারী) পূর্বে বহুবার এসেছি, সাগ্রহে হরিকথা বলেছি আবার আজ এই স্মরণীয় ভক্ত সম্মেলনে মিলিত হয়েপরম তৃপ্তি পেলাম। ❑

* *অনঙ্গমোহন হরিসভা (স্থাপিত ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। কলকাতা - ৬। ৫৮ তম বার্ষিক মহোৎসব। ২০ বৈশাখ ১৩৯৯ (ইং ১৯৯৩)*

মানবধর্ম সম্মেলন ভাষণ

There is Various kinds of transport–আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে যেভাবে ইচ্ছা যান। যাওয়াটাই কথা, ঈশ্বরপ্রাপ্তিটিও অনেকটা সেরকম। অনেকে বলেন, ধর্ম মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অনেকে আজকাল মার্ক্সের কথা বলেন, আমি মার্ক্স পড়েছি কিঞ্চিৎ। তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মার্ক্সকে শ্রদ্ধা করা মানে এই নয় যে ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধা করব না। ... ধর্ম মানে তো যা ধারণ করে রাখে। ধর্ম মানে Thinking, faling and action। চিন্তা করা এবং আবেগকে প্রকাশ করা নিয়েই জীবন। আর ধর্ম হল এমন একটা জিনিষ যা তার চিন্তার সঙ্গে আবেগকে, আবেগের সঙ্গে কর্মকে সংযুক্ত করে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী করে। যে-গ্রন্থ এ বিষয়ে আলোকপাত করে সেটাই ধর্মগ্রন্থ। আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করা পরিপূর্ণ করার জন্যই ধর্ম। ❑

* *মানবধর্ম সম্মেলন। আগরতলা। 'দৈনিক বাংলার বাণী'; ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৮।*

ধর্ম ও মানবতা

"তোমরা সকলের, সকলে আমার তোমরা
পৃথিবীর সকলকে আপন করিয়া লও" —প্রভু জগদ্বন্ধু

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাভারতে আছে "ন মনুষ্যাৎ পরতরম্"। বাইবেলে

আছে "God made man after His own image"। কোরাণের ঘোষণা — "Man is the khalip of God on earth" সকল শাস্ত্রেই মানুষের মহত্ত্ব কীর্তিত।

এই শ্রেষ্ঠ জীবের মহান সভ্যতা আজিকার দিনে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িল কেন? কেন মানুষের প্রাণে ব্যথা দিতে মানুষের প্রাণ কম্পিত হয় না? শ্রেষ্ঠ জীব এমনভাবে ভ্রষ্ট হইল কেন? কেন বিশ্বসভ্যতা আজ ধ্বংসোন্মুখ? কেন মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা এমন সীমাহীন?

জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করেন স্রষ্টা মানুষকে হস্ত, পদ, মন, বুদ্ধি, স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। প্রাণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিলেই তাহার শান্তি। মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষ চৌর্যহীন হইবে, লোভহীন হইবে, হিংসাহীন হইবে। মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইলেই অশেষ বেদনা- সন্তাপময় অশান্তির দাবদাহনে জ্বলিয়া মরিবে।

বর্তমান সময় অধিকাংশ মানুষ মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাকে মানবতার প্রশান্ত বেদীমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার উপায় কী ? তাহা নির্দ্ধারণের জন্য আমরা ১৫-১৬-১৭ বৈশাখ আহ্বান করিতেছি দেশের জ্ঞানী, গুণী, সজ্জনগণকে। তাঁহারা সমবেতভাবে আমাদের জীবনপথ আলোকিত করুন।

জিজ্ঞাস্য একটি — মানুষকে আবার কী করিয়া মানবতার ভিত্তিতে স্থিত করানো যাইবে? আমরা আলোচনা করিব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপার আলোকে। সকলেই স্ব স্ব ইষ্ট আরাধ্যের কৃপাদৃষ্টি কোণ হইতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর — নিবেদক

৭ই বৈশাখ, ১৩৯৫ — **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**—*সভাপতি, মহানাম সম্প্রদায়*

বৃন্দাবনে কুম্ভমেলার বাণী

অমৃত শব্দের অর্থ অমরণধর্মী। সত্য সত্য জগতে একটি পরমবস্তুই আছে অমরণ ধর্মী। সেই বস্তুটি হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনি অমৃতময়। তাঁহাকে যে জানে সেও অমৃতময় হয়। তাঁহার বিষয় মনে প্রাণে আলোচনা করিলে মানুষ অমৃতময় হয়। সেই অমৃত স্বরূপকে আস্বাদন করিবার নানা উপায় আছে। একটি উপায় হইল, সজ্জনগণ একত্রিত হইয়া তাঁহার অনন্ত কথাগাথা লইয়া কিছু আলোচনা গবেষণা করা। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠা হইত। তাহারই একটি প্রতিষ্ঠান কুম্ভমেলা। একটি পৌরাণিক রহস্যময় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া এই মেলা ভারতের চারিটি তীর্থস্থানে তিন তিন বৎসহ অন্তর সমবেত হয়েন ধর্মীয় লালসাবিশিষ্ট নানা শ্রেণির লোকজন।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তটির তাৎপর্য এই যে — সকলে অমৃত বস্তুর অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে। তাহা কেহ লইয়া পালাইবার জন্য ধাবন করিতেছে।

জীবাত্মার প্রকৃত প্রয়োজন হরিপ্রেম। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি — "প্রেম প্রয়োজন"। তাহা লাভ করিতে সকলেই চাহে — জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। অভাবনীয় এক শক্তি তাহা নাগালের উর্দ্ধে লুকাইয়া রাখে। আত্মা তাঁহাকে চাহে — আশুদ্ধ দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি তাহাকে ঢাকিয়া রাখে

ভোগাবরণে। এই তাত্ত্বিক কাহিনী অবলম্বনে কুম্ভমেলার সভা।

এই সভা এক আদর্শ সভা। সভার কাহাকেও কোনও মতে আনিবার প্রচেষ্টা নাই। মত পথ ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য এক —এই সত্য সিদ্ধান্তে দৃঢ় হইয়া অমৃতময়ের কথা পরস্পর আলোচনা। প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকের সত্যানুসন্ধান। কাহারও উপর কাহারও কোন চাপ নাই। অর্থাৎ Convert করিয়া স্বমতে আনিয়া লোকবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা নাই। কেবল মহাধনের দান আছে , পার্থিব প্রতিদান প্রাপ্তির লালসা নাই। মনে হয় ধর্মচর্চার ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা উপলক্ষে এইবার একটি অতিরিক্ত মেলা বসিয়াছে শ্রীবৃন্দাবনধামে। ভগবানের সাক্ষাৎ নিত্যলীলা নিত্য প্রকট থাকায় এই ভূমি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মহাধামে কুম্ভমেলা নিশ্চয়ই একটি মহানন্দপ্রদ সংঘটনা।

যেখানে যখন কুম্ভমেলা হউক — প্রয়াগ উজ্জয়িনী, নাসিক বা হরিদ্বার, প্রত্যেক সময়ই শ্রীবৃন্দাবনে এইরূপ একটি অনুষ্ঠান হইবে — ইহা আমাদের আশা। ইহার ফল প্রকৃত জনকল্যাণ নিঃশ্রেয়স্ — ইহা শাস্ত্রবাক্য। ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

৬ই শ্রাবণ, ১৪০৫ সন

বৈষ্ণবদাসানুদাস
—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

উপদেশামৃত

১। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অন্ধকারাবৃত তখন এই ভারতের গগন ছিল বেদান্তের আলোকে সমুদ্ভাষিত। বেদান্ত ভারতীয় জাতীয় জীবনের জীবাত্মা। ভারতকে জানিতে হইলে বেদান্তকে জানিতে হইবে। জাগাইতে হইলে বেদান্তকে জাগাইতে হইবে। ভারতের সর্বনাশ করিতে হইলে বেদান্ত জ্ঞান ধ্বংস করিতে হইবে।

২। উপনিষদ্ই বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভিত্তিমূলে উপনিষদ্ই। উপনিষদ্ শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। স্মৃতি ও ন্যায়ের উপজীব্য শ্রুতি।

৩। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই শ্রুতি বলে। বেদ বা উপনিষদ্ অর্থেই শ্রুতি শব্দ গ্রহণ করেন। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দের অপর অর্থ বেদের চরম ভাগ।

৪। ব্রহ্মকে কিন্তু জানিতেই হইবে। জানিলেই সত্যে স্থিত থাকা যাইবে। না জানিলেই মহতী বিনষ্টি উপস্থিত হইবে। তাঁহাকে জানিলেই অমৃতাস্বাদন। না জানিলেই চরম বিনাশ।

৫। ব্রহ্মবস্তু অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, যাঁহার কাছে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, তাঁহার কাছেই স্বকীয় তনু ব্যক্ত করেন। কেবল মাত্র তিনিই তাঁহার সংবাদ জানিতে পারেন।

৬। বৈদিক ঋষিগণ আধ্যাত্ম যোগী ছিলেন। তাঁহারা প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম নিজজন বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের উপলব্ধিই শ্রুতি। শ্রুতি আমাদের শাস্ত্রের ভিত্তি। শ্রুতি আমাদে সংস্কৃতির মেরুদণ্ড।

৭। পরব্রহ্ম পূর্ণ, এই জগৎ পূর্ণ। পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৮। এই জগতে যাহা কিছু দৃশ্যময় সকলই পরিবর্তনশীল। যাহা কিছু সবই নশ্বর। এই নশ্বর বস্তুসমূহে জড়াইয়া রহিয়াছে একটি আপরিবর্তনীয় বস্তু, তাহার নাম ঈশ্বর।

৯। সকল অনিত্য বস্তুর বাহিরেও তিনি জড়াইয়া আছেন। ভিতরে তিনি বসবাস করিতেছেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ামক। ভিতর হইতে সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই বিশ্বাসটি দৃঢ় থাকিলে এই অস্থির জগতের মধ্যেও সুস্থির থাকা যায়।

১০। জগতের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি জীবের ভোগের জন্য। এইসব ভোগ করিবার একটি বিধি আছে। একটি কৌশল আছে। ভোগাসক্ত হইয়া ভোগ করিলে তাহার ফল হয় দুঃখ।

১১। আদর্শ জীবনযাপনের জন্য তিনটি নির্দেশ আছে — (ক) জগৎ জুড়িয়া ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস কর। (খ) ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। (গ) পরদ্রব্যে লোভ করিও না। সুন্দর জীবনের পক্ষে ইহা সুষ্ঠু নির্দেশ।

১২। পরমাত্মাকে জানিলে কীভাবে জীবন কল্যাণময় হয় তাহা বলিতেছেন। সর্বভূতে এক অদ্বিতীয় বিরাজমান (সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব) ইহা যিনি দর্শন করেন (অনুপশ্যতি) তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পাবেন না। যাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ নাই তিনি কাহারও অনিষ্টকর কার্য করিতে পারেন না।

১৪। ঈশ- শ্রুতি বলিতেছেন কেবল আত্মাতে সর্বভূত নহে। আত্মাই সার্বভূত (সার্বভূতানি আত্মৈব) ইহা যিনি অনুভব করেন তিনি একত্বদর্শী, তিনি সমদর্শী, তাঁর পক্ষে মোহই বা কি আর শোকই বা কী (কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ)? তিনি শোক ও মোহের অতীত হইয়া যান।

১৫। সমুদ্র কোথাও তরঙ্গ সঙ্কুল কোথাও নিস্তরঙ্গ—এই প্রভিন্নস্থানাপেক্ষায় সমুদ্রকে তরঙ্গ সঙ্কুল ও নিস্তরঙ্গ দুই-ই বলা চলে। তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু যখনও কোথাও বা রূপবান আবার কখনও কোথাও বা রূপহীন। এইভাবে সমাধান চলে।

১৬। সসীম বস্তুতে রূপ আছে, রূপ নাই বলা চলে না। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু ভূমা, তিনি অপরিসীম, সুতরাং তাহাতে বিরুদ্ধ বিশেষণ চলে। অসীম বস্তুতে সর্বপ্রকার বিরোধের সমাধান সম্ভব হইয়া থাকে।

১৭। তাঁহার রূপ আছে ঠিকই তবে জগতের নশ্বর বস্তুর রূপ যেমন সর্বদা পরিবর্তনশীল সেই প্রকারের রূপ ব্রহ্মের নাই। তাঁহার রূপ পরিবর্তনহীন। তাঁহার কায়া অনাদিকাল ধরিয়াই একই প্রকার রহিয়াছে। আমাদের দেহ জড় প্রকৃতির বিকার হইতে জাত। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত।

১৮। ইহকালের সুখের লালসায় ও পরকালে স্বর্গের লালসায় যে বিদ্যাই অর্জন করা যায় তাহাই অপরা, তাহাই অবিদ্যা।

পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অমৃতত্ব লাভ করার জন্য যাহাই অর্জন করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা বা প্রকৃত বিদ্যা। ❑

মহাজীবন স্মরণে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণে

'রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ'—ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের একটা বিস্ময়, যখন যে-বিষয়ে লেখনী স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই নিরুপম সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এত লেখা, লেখায় এত সৌন্দর্য—এগুলি তাঁহার অনবদ্য প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অগণিত সৃজনের মধ্যে একটি অপার্থিব সুর অনুরণিত হচ্ছে। মালিকার অগণিত পুষ্প-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি চিরন্তনী সূত্র বিরাজিত। কত সহস্র কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, নিবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনার অন্তরের অন্তস্তলে একটি অখণ্ড রাগিণী ঝংকৃত, যেটির মূলে উপনিষদের ঋষির অনুভূত শাশ্বত বাণী, শ্রুতির মহাসত্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এক সত্য, বহু সত্য, একের মধ্য দিয়া বহু ও বহুর মধ্য দিয়া একের সার্থকতা। এক সত্য শিব সুন্দর বিশ্বের শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত, আত্মাস্বাদনে তন্ময়তা প্রাপ্ত। সমগ্র রচনার ভিত্তিমূলে যে একটা উপনিষদের অনবদ্য দ্বন্দ্ব তরঙ্গ রাগিণীর ঝংকার ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

রহস্যময় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রুতির যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে তা দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে আর একজন রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন। তবে, চিঠিপত্রে, ডাইরিতে, নিবন্ধে ও বক্তৃতায় যেখানে উপনিষদের কথাগুলি স্পষ্টতর, সেই অংশগুলিকে অতি সুনিপু ভাবে সংগ্রহ করিয়া শ্রুতির মন্ত্রের সঙ্গে মেলাইয়া সাজাইয়াছেন শ্রীযুত অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পরিবেশন করিয়াছেন 'রবীন্দ্রচেনায় উপনিষৎ' গ্রন্থে। গ্রন্থখানি উপনিষদের রবীন্দ্রভাষ্য। ঋষি রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে হইলে এই গ্রন্থখানির দর্শনেই দেখিতে হইবে। এইসব অংশগুলি নানা স্থানে পড়িয়াছি। কিন্তু অন্তরে কোন ছাপ লাগে নাই। সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খলিত সংস্থাপনে এই গ্রন্থটি রসাল, চমৎকারী ও চিত্তাকর্ষী হইয়াছে, সর্বদা সঙ্গে রাখিবার মত একখানি গ্রন্থ বটে।

ইংরেজী ভাষায় এই একই ভাবাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন এই গ্রন্থকার তাঁর *'Upanisad in the eye of Rabindranath'* গ্রন্থে।

'রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ'। শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহাত্মা গান্ধীজী স্মরণে

'বাপুজী ও স্বাধীন ভারত'—অভিমত

যিনি মৃত জাতির জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার আদর্শ ভুলিয়া জাতি কোন্ দিকে গড়াইতেছে—'বাপুজী ও স্বাধীন ভারত' গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীঅমলেন্দু রায় তাহা নিপণ হস্তেই আঁকিয়াছেন। মহাত্মাজীর জীবন-বেদের সঙ্গে লেখক নিবিড়ভাবে পরিচিত। গীতার আদর্শই যে তাঁহার বিরাট্ জীবনে জীবন্ত হইয়াছে, তাহা তিনি গভীর অনুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। গান্ধীজী যে রামরাজ্যের আদর্শে ভারত গড়িতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া জড় বিজ্ঞানের মোহজালে আমরা কোন্ অতলে তলাইতেছি, গ্রন্থকারের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। আজ যাঁরা জাতির কর্ণধার, বাপুজীর নামের দোহাই দেন, তাঁরা এই গ্রন্থ পড়ুন, দেশকে কোন্ দিকে নিয়া যাইতেছেন, ভাবুন। গ্রন্থখানি আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যায়নে বৃহৎ। ❑

* *'বাপুজী ও স্বাধীন ভারত'। স্বামী প্রশান্তানন্দ সরস্বতী, সত্যানন্দ কালচারাল এণ্ড সোসাইটি, ডায়মণ্ডহারবার, ১৯৬২*

স্বামীজীর অবদান

স্বামী বিবেকানন্দের যেটি মুখ্য দান সে কথাটি বলিব দুই-তিনটি কথায়।

পাশ্চাত্ত্য জাতি মনে করিত ভারতবর্ষ এক অতি অনুন্নত সভ্যতাশূন্য দেশ। তাঁহারা শিক্ষা দিয়া এদেশকে গঠন করিবে। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় ও ইউরোপে প্রদত্ত ভাষণ শুনিয়া তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দুর হইয়া গেল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কাছে তাঁহাদের কিছু শিখিবার আছে, তাঁহারা উপলব্ধি করিল। ম্যাক্সমুলার বই লিখিলেন, *What India can teach us.* স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যের জাতিকে পূর্বমুখী করিলেন। একটা জাতির মুখ ঘুরাইলেন।

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোক মনে করিত—যাহা কিছু শিখিবার আছে পশ্চিমের কাছেই শিখিতে হইবে। "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার"— স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যে প্রদত্ত ভাষণ শুনিয়া ভারতবাসীরা আশ্বস্থ হইল। তাঁহাদের যে অনেক সম্পদ্ আছে, তাহা তাঁহারা

* *'বিবেক'। দুর্গাপুর - ৮। সম্পাদক - শ্রীস্বপনপ্রদীপ ভট্টাচার্য। জানুঃ + ফেব্রুঃ ১৯৮৮ (১ম বর্ষ)*

হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিল। কবিগুরুর "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে" কথাটার তাৎপর্য তাহারা উপলব্ধি করিল। আগে মনে করিত কবির কথা—একটি কাব্যের মিল মাত্র, স্বামীজীর বাণী শুনিয়া দেশবাসী বুঝিল আমাদেরও সম্পদ্ আছে। যাহা পাশ্চাত্য জাতিকে দান করিয়া তাহাদের সভ্যতাকে ধন্য করিয়া দিবার মত। স্বামীজী জাতিকে আত্মসম্পদ্ সম্বন্ধে সচেতন করিলেন।

ভারতের লোক আমরা বহু কাল ধরিয়া ভাবিতাম — যত তীর্থস্থান সবই উত্তর দিকে। দেবতাদের বাড়ি দেবতাত্মা হিমালয়ে। পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করিয়াছিল উত্তর মুখে। দক্ষিণ দিকে কিছু নাই। ওদিকে যমের বাড়ি। বোধ হয় ভারতভূমির উত্তর দিক্‌টা ক্রমশ উঁচু হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত। এই জন্যই উত্তরে দেবভূমি এই ভাবনা আমাদের মজ্জাগত। স্বামীজী আমাদের মুখ ফিরাইলেন উঁচু দিক্ হইতে নীচু দিকে। বলিলেন, "নীচু দিকে তাকা—দেখ্, দীনহীন পতিত, সমাজে ঘৃণিত, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, নিঃস্ব নরনারী অনাহারে, অনিদ্রায়, উপেক্ষায় নিষ্পিষ্ট—তাদের দিকে তাকা—তাদের আপনজন মনে করিয়া নে। ভাই, প্রকৃত প্রাণের ভাই জানিয়া বুকে তুলিয়া নে। সকলকে আপন করিয়া নে। এই তোদের এখন একমাত্র কর্তব্য।"

এই ভারতীয় জাতি আমাদের ছিল তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী—স্বামীজী আমাদের বলিলেন—"ঐসব দেব-দেবী এখন গঙ্গায় ফেলে দে—তোদের সম্মুখে এখন একজন দেবী—তিনি 'দেশমাতৃকা ভারত মাতা'। তার শৃঙ্খল মোচন কর। দুঃখ-দারিদ্র্য দূর কর। পঞ্চাশ বছর তোদের আর কোনও দেবতা নাই—মাতৃভূমি ছাড়া।" আমাদের সম্মুখে পুরাণের দেবদেবী বিসর্জন দিয়া তিনি এক নূতন দেবীব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। তিনি এই উপদেশ দেশবাসীকে দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—আমাদের জীবনধারার মধ্যে নূতন দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। সহস্র সহস্র যুবককে দেশের সেবায়—হীন পতিত দরিদ্র কাঙালের সেবায় আত্মনিয়োগ করাইয়া দিলেন।

সংক্ষেপে এই অবদান বুঝিলে স্বামী বিবেকানন্দকে কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা হইবে। ❑

সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্তদর্শন পরব্রহ্মের পরম স্বরূপতা স্থাপনে হেতু নির্দেশ করিয়াছেন—"তত্তু সমন্বয়াৎ", ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য বিরোধিতার সমন্বয়ে, বিপরীতমুখী প্রবণতার সমাধানে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। তিনি অণীয়ান্ তিনি মহীয়ান্, তিনি নির্গুণ তিনি গুণী তিনি নির্বিশেষ, তিনি সবিশেষ; তিনি অপাণিপাদ হইয়াও 'জবেন গ্রহীতা', তিনি দূরে থাকিয়াও অন্তিকে—এইরূপ সহস্র বিরোধের সমন্বয় যেখানে, তিনিই পরম বস্তু। গৌরপার্ষদগণ মহাপ্রভুর কৃপার মহিমা কীর্তনে বলিয়াছেন "সাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া"—শাস্ত্রের সকল বিরোধিভাবের সমন্বয় আনয়নকারী।

সমন্বয় কেবল ব্রহ্মেরই বৈশিষ্ট্য নহে, শ্রেষ্ঠ মানবতারও বিশেষত্ব সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত।

* *Vivekananda Commemoration Volume,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামানবেরা ঈশ্বরতুল্য—ইহার মূল, বিরোধের সমাধানে নিহিত। মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা মহৎ কৃপা ও স্বীয় অমোঘ তপস্যায় উজ্জ্বল হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব সমন্বয় আনিয়াছিল। তাঁহার মহত্ত্বের বীজ এই সমন্বয়ের ভিত্তিতেই অন্তর্নিহিত।

জ্ঞান ও কর্মের বিরোধিতা বৈদিকযুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানীর কর্ম নাই। জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে। উভয়ের সম্বন্ধ যেন দাহ্য-দাহক। বৈদিক সাহিত্যের দুই ভাগ : পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। পূর্ব মীমাংসা শাস্ত্রের নির্দেশ—সংসারের সকল কার্য শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে করা কর্তব্য। জগৎ কর্মময়। এখানে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য হইল কর্মেতে লাগিয়া থাকা। এক মুহূর্তও থাকা যায় না কর্মবিহীন হইয়া। নিখিল সংসার কার্যাধীন। "নমঃ কর্মেভ্যঃ" ইহা পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের বক্তব্য।

উত্তর মীমাংসার দৃষ্টি ইহার বিপরীত। এই জগৎ দুঃখময়। দুঃখের কারণ বন্ধন। বন্ধনের কারণ কার্য। জগৎ নশ্বর, জগৎ ভঙ্গুর। কার্য জীবনকে নশ্বরতার সঙ্গে যুক্ত করে। ভঙ্গুরতার সঙ্গে মিলিত করে। নশ্বর বস্তুর প্রতি আকর্ষণে জীব বিপথগামী হয়। একমাত্র কার্যহীনতাই জীবনে প্রশান্তি আনে। সকল সাধন-ভজনের লক্ষ্য কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কর্ম মিথ্যার সঙ্গী। জ্ঞান সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গী। কর্মের ফলে গতাগতি উত্থানপতন, জ্ঞানের ফল স্থিতি ও স্বরূপে অবস্থিতি। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", "ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে", আমি আমি আমার আমার এই মমত্বই মোহ। মোহ জীবকে অন্ধকূপে ফেলিয়া দেয়। জ্ঞানই আলো আনে। জীবনপথে জ্ঞানের বর্তিকাই সম্বল।

কর্মকূপে ডুবিয়া থাকাই অজ্ঞানতা। যতক্ষণ অজ্ঞানতা ততক্ষণই কর্মপ্রবণতা। "তদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" "জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর সত্য" এই তত্ত্বজ্ঞান যে মুহূর্তেই জাগিবে সেই মুহূর্তেই প্রব্রজ্যায় গমন করিবে—সংসার ত্যাগ করিয়া ছুটিবে পরম ব্রহ্মাতে লগ্ন হইবার জন্য। আর কালবিলম্ব করিবে না। পার্থিব ভোগভূমি ছাড়িয়া অপার্থিব ত্যাগভূমিতে পৌঁছিতেই জীবনের সার্থকতা। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলে আর তাহাতে লাগিয়া থাকা সম্ভব নহে। ইহা সর্প নহে রজ্জু—ইহা জানিলে আর ভয়ে আর্তনাদ করা যায় না। ব্রহ্ম জানিলে আর জগৎ থাকে না। সত্য আর মিথ্যায় মিতালী নাই। তবে নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়া যদি কর্ম করিতেই হয় তাহা হইলে করিবে কিন্তু উদ্দেশ্য থাকিবে কর্মহীনতায় পৌঁছানো। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"—ইহা হইল উত্তর-মীমাংসার একমাত্র বাণী।

এই বিপরীতমুখী চিন্তাপ্রবাহ ভারতীয় জীবনকে দুই খণ্ড করিয়াছে। তাহার ফল হইয়াছে আত্মহত্যা। এক ভাগের মানবের নিবাস উচ্চ হরিদ্বার হইতে কেদার-বদ্রী শিখর পর্যন্ত। তাহারা উত্তরমুখী। আর এক ভাগের নিবাস নিম্নে, মালভূমিতে সমভূমিতে সাগরতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দক্ষিণমুখী। উত্তরে স্বর্গ, দক্ষিণে নরক। উত্তরমুখীরা ত্যাগী, তাঁহাদের লক্ষ্য সত্যম্ শিবম্। দক্ষিণমুখীরা ভোগী, 'অনিত্যম্ অসুখং লোকে' তাহাদের জনম-মরণ-গতাগতি। তাহাদের পদে পদে বিপদ্ বিভ্রান্তি। যত শিব সুন্দর উত্তরে, যত অশিব অসুন্দর দক্ষিণে।

উত্তরমুখীদের মন্ত্র 'শিবোহহম্'। দক্ষিণমুখীদের মন্ত্র 'পাপোহহং পাপকর্মাহম্'। তাহারা বাঁচিয়া আছে—দিনগত পাপক্ষয় করিবার জন্য। উচ্চভূমিতে আত্মারাম। নীচুভূমিতে ইন্দ্রিয়ারাম। আত্মারাম আত্মবানের "কার্যং ন বিদ্যতে।" কোন কার্য নাই। ইন্দ্রিয়ারাম কর্মের পেষণে নিষ্পিষ্ট নিঃস্ব। জ্ঞান বিদ্যা, কর্ম অবিদ্যা। জ্ঞানী ধনী, কর্মী দরিদ্র। সামাজিক ধনী-দরিদ্রের ভেদের মত বর্তমান যুগের বুর্জোয়া, আর সর্বহারার ভেদের মত, মিল মালিক আর দিন-মজুরের ভেদের মত ভোগী-ত্যাগীর বিপুল ব্যবধান, দুরত্যয়।

দুই মীমাংসার এই বিরোধিতা সাংখ্যেও সমর্থিত। গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি। সৃষ্টি যতক্ষণ কর্ম ততক্ষণ। বৈষম্যই কর্মের জনক। সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি নাই, কর্ম নাই। কর্মহীন হইয়াই সাম্যে জীবাত্মা নিজেকে খুঁজিয়া পায়। সত্যানুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় সকল কর্মের বিনাশে। এই বিরোধিতার পরিণাম হইয়াছে ভীষণ। জাতীয় জীবনের সংহতি ইহাতে ব্যাহত হইয়াছে, আহত হইয়াছে, পরাভূত হইয়াছে। জগতের নশ্বরতা, কর্মের তুচ্ছতা জীবনকে করিয়াছে নীরস উদ্যমহীন। জ্ঞানের অমৃত পান করিয়া জ্ঞানী মুক্ত হইয়া নিষ্কর্মা হইয়াছে। বিষয়ের বিষ ভক্ষণে সংসারী জীব তাপে দগ্ধীভূত হইয়াছে। এই মর্মান্তিক ভেদ সমাজে অশেষ দুর্গতির জন্মদাতা হইয়াছে। এই বিরোধিতা সুদীর্ঘ কাল চলিয়াছে। ইহার সমাধানের চেষ্টাও প্রাচীন। বুদ্ধি-বিচার দ্বারা অনেক মনীষী ইহার সমাধান দেখাইয়াছেন কিন্তু বুদ্ধির সমাধান বিচারমল্লতায় পর্যাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে রূপলাভ করে নাই। রূপ দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজী ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী আর অক্লান্ত কর্মী। জগৎ-মিথ্যায় বিশ্বাসী অদ্বৈতবাদের সাধক বিবেকানন্দ গড়িয়াছেন বিরাট কর্মিদল। স্বামীজীর জীবনে, জীবনদর্শনে, আচরণে ও প্রচারণে জ্ঞান ও কর্মের অভূতপূর্ব সমন্বয় মূর্ত হইয়াছে। এই সমন্বয়ে কেবল তাঁহার নিজের জীবন মহত্ত্ব লাভ করে নাই, সমগ্র সমাজ সংহতি ও নবজীবনের নবালোকে সঞ্জীবিত হইয়াছে। কী উপায়ে স্বামীজী এই অসাধ্য সাধন করিলেন তাহার দিগ্‌দর্শন করিব।

ভারতের জাতীয় জীবনের এক অন্ধকারময় পর্বে স্বামীজীর আবির্ভাব। জ্ঞান ও কার্যের বিরোধিতা অতি প্রাচীন। কিন্তু স্বামীজীর সমকালে আর এক নবীন বিরোধিতা জন্ম লইয়াছিল। প্রাচীন বিরোধিতা সমাজকে উত্তরমুখী আর দক্ষিণমুখী করিয়াছিল। নবীন বিরোধিতা আর্য সংহতিকে ভাঙ্গিল পশ্চিমমুখী ও পূর্বমুখী দুই ভাগে। দুই টানে সংস্কৃতি খণ্ড খণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পশ্চিমা বণিক্‌বৃত্তি বৈশ্যসংঘ কোম্পানী করিয়া পূর্বভারতে অভিযান করিল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ড হইয়া গেল, বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইয়া নূতন শিক্ষার ধারা সমাজের বুকে চাপাইয়া দিল। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিতদল উদ্বুদ্ধ হইল নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। তাহারা প্রাচীন শাস্ত্র শৃঙ্খলা সমাজতত্ত্ব মানে না। তাহারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পশ্চিমের আলোতে নূতন সংস্কৃতি গড়িতে বদ্ধপরিকর। আর একদল প্রাচীন সংস্কৃতি কামড়াইয়া ধরিয়া, শুষ্ক বিধি-নিষেধের বন্ধনে নিষ্পিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাশূন্য তের পার্বণের অনুষ্ঠানে আবদ্ধ রহিল। তাহারা অচলায়তন, সমাজের ভার স্বরূপ। প্রাচীন কালের উত্তরমুখী-দক্ষিণমুখীর বিরোধিতার পটভূমিতে

আবার আসিল পশ্চিমমুখী-পূর্বমুখীর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঝড়ের মধ্যে সাগরে তুফান উঠিল তাণ্ডব নৃত্যে। মহাকালের এই তাণ্ডব নৃত্য স্বামীজী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমাজ-জীবনে বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বহাইয়াছিলেন।

পশ্চিম দৃষ্টি আর দিশাহারা সমাজের বিরোধ সমাধানে তখন ব্রাহ্মসমাজ সচেষ্ট। তাঁহাদের চেষ্টা আংশিকভাবে কৃতকার্য। ইংলণ্ডীয় ও আরবীয় সংস্কৃতির অতিপ্রভাবে বহুলাংশে অকৃতকার্য। এ হেন যুগসন্ধি স্থলে স্বামীজীর অধিষ্ঠান। তাঁহার সমন্বয় সমাধান জাতীয় জীবনের মহাসম্পদ্।

পাশ্চাত্ত্যের ব্যাবহারিক জ্ঞানের চাপে জড়বাদী বিজ্ঞানের জৌলুষে এদেশের অধিকাংশ নরনারীর বুদ্ধি হইয়াছিল বিভ্রান্ত, চক্ষু গিয়াছিল ঝলসাইয়া। এই জাতির সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যপুষ্ট সভ্যতা শূন্য পাত্র বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন কিছুই নাই, সবই নূতন করিয়া লিখিতে হইবে পশ্চিমা কালির আঁখরে। রিক্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে পশ্চিমের অবদানে। "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।"

এইরূপ আত্মমর্যাদা-বিচ্যুত জীবন্মৃত সমাজ প্রথম জাগ্রত হইল যেদিন চিকাগো সভার বিজয়-শঙ্খধ্বনি আসিয়া পৌঁছিল ভারতসাগরের কূলে। জ্ঞানবিজ্ঞান-গর্বিত যন্ত্র-সর্বস্ব পাশ্চাত্ত্যের কানে দিবার মত মন্ত্র-সম্পৎ যে এখনও আছে পূর্বের শূন্যভাণ্ডারে প্রোথিত—এই আত্মোপলব্ধি অচেতন জাতিকে প্রথম জাগাইল। জাগ্রত জাতি উৎকর্ণ হইল নব উদ্গাতার বাণী শুনিবার জন্য।

জড়বাদের পাথর-ভরা পশ্চিমী জমি চযিয়া তাহাতে আর্যঋষির আধ্যাত্মিকতার বীজ বুনিয়া দেশে ফিরিলেন স্বামীজী। জঙ্গম তীর্থরাজ। জীবন্ত ত্রিবেণী সঙ্গম। স্বীয় দৃপ্ত প্রতিভা, গভীর দেশাত্মবোধ ও সমন্বয়াচার্যের করুণার ধারা—এ তিন মিলনে স্বামীজী যেন মূর্ত প্রয়াগভূমি। প্রয়াগে প্রকৃষ্ট যজ্ঞাগ্নি জ্বলিল। নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইল। উচ্চারিত হইল উদাত্ত কণ্ঠে, বজ্র নিনাদে, বেদান্ত-কেশরীর সিংহনাদে—ব্রহ্মোপলব্ধিতেই জীবনের পূর্ণতা। ইহা শাশ্বত সত্য। এই উপলব্ধির উপায় চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধ হইবে সর্বভূতে নারায়ণ দর্শনে। নারায়ণের দর্শন চাই। শুধু দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন নয়, দর্শন হইবে বাস্তবায়িত দিব্যজীবন দ্বারা। দর্শন সার্থক হইবে সেবা দ্বারা। দেহাত্মবাদ ঘুচিবে নেতি নেতি বিচারের দ্বারা নহে, উহা দূর হইবে নরনারায়ণের সেবায় আত্মবিসর্জনে সর্বভূতে নারায়ণ—তন্মধ্যে নরে তার উজ্জ্বল প্রকাশ; আর উজ্জ্বলতম প্রকাশ শ্রীমান্ নরে নয়, শ্রীহীন নরনারীতে। দারিদ্র্য-নিপীড়িত নিঃস্ব দুঃস্থ বিপন্ন আর্ত, উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেই নারায়ণ জীবন্ত চির জাগ্রত। ইহাদের মঙ্গল সাধনে ও সেবায় আত্মসমর্পণেই চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ।

সেবা করিতে দেবতা লাগে। পুরাতন কোটি কোটি দেবতা মৃতপ্রায়। কাহারও সামর্থ্য নাই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার, মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইবার। স্বামীজী তখন ডাক দিয়া শুনাইলেন নূতন বার্তা—পঞ্চাশ বছর তোমরা ভুলিয়া যাও তোমাদের কোটি কোটি দেবতাদের কথা, বিদায় দেও সবাইকে। কেবল মাত্র আয়োজন কর একটি মাত্র পূজার। দেশমাতৃকা আমার জীবন্ত দেবতা। নিজেকে বিলাইয়া এই পূজায় বলি দাও যাহা কিছু আপনার।

আমার দেশমাতৃকা ভৌগোলিক রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক দ্বারা একত্রীভূত নয়। দেশ আমার জননী। ইহার প্রতি ধূলিকণা আমার বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী। এই দেশের মূর্খ, পতিত, হীনম্মন্য, উপেক্ষিত, নিপীড়িত, বিপুল জনতা, প্রত্যেকে আমার প্রাণের ভাই, হৃৎপিণ্ডের মাংস, ধমনীর শোণিত। দেশজননী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকলে উদ্যোগী হও তাহার মহাবোধনে। জাগাইয়া তোল প্রাণের নৈবেদ্য দানে, পশুত্বের বলিদানে। যে মাকে স্বামীজী দেখিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরবেদীতে, গুরুদত্ত দিব্যদৃষ্টিতে, আজ সেই মাকে দেখিলেন আসমুদ্র হিমাচল সর্বত্র জীবন্ত বিগ্রহ রূপে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার।" এই দেশ-মাতৃকার পূজার মণ্ডপ তুলিয়াছিলেন ঋষি বঙ্কিম। তাহাতে প্রথম পূজারী হইলেন ঋত্বিক্ বিবেকানন্দ।

স্বামীজী শুষ্কজ্ঞানকে জীবন দান করিলেন সেবাধর্মের উদ্বোধনে। ধর্মের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান কিন্তু কর্মে রূপায়িত হইয়াই তাহা প্রাণবন্ত জ্ঞান প্রাণ পাইল মানবসেবায়। আর সেবা, যাহা ছিল অপাংক্তেয় শূদ্রবৃত্তি, তাহা আসন পাইল ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবন-সাধনায়। স্বামীজী উত্তরমুখী জ্ঞানকে দক্ষিণমুখী করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীরা দলে দলে হরিদ্বার মুখে না ছুটিয়া গ্রাম গ্রামান্তর ছড়াইয়া পড়িল পতিত-পাবনীর পূত প্রবাহের মত। তাহা সমভূমিতে নিম্নভূমিতে দুঃস্থ দরিদ্রের দুয়ারে গড়াইয়া আত্মদান করিল সেবার সাগরসঙ্গমে। আনন্দমঠের সত্যানন্দ সাহিত্যের কল্পলোক ছাড়িয়া গৃহে গৃহে জীবন্ত হইল। বঙ্কিমের ধ্যানের 'সন্তানগণ' বিবেকানন্দের সাধনায় রূপ পরিগ্রহ করিল।

পশ্চিমমুখী সভ্যতাকে স্বামীজী আবার পূর্বমুখী করিলেন। অগ্নিমন্দতা বিধায় পশ্চিমা খাদ্য এদেশবাসীর স্থায়ী উদরাময়ের কারক হইয়াছিল। উহা পরিপাক করিয়া নিজ পুষ্টিবিধানের জন্য স্বামীজী আনিলেন আত্মোপলব্ধির অগ্নিমন্ত্র—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত"। জাতি জাগিল। বিভিন্নমুখী বিক্ষিপ্ত প্রবণতাকে সংহত করিয়া এক মহাপূজার ডালি সাজাইলেন স্বামীজী। তাঁহার মহাসমন্বয়ী দৃষ্টি পুনর্জীবন দিল মৃতকল্প জাতিকে। আজ আবার দুর্দিন ঘনায়িত। সমন্বয়ী দৃষ্টি ব্যাহত। পশ্চিম আজ উত্তেজিত। উত্তর আজ উপেক্ষিত। আজ আবার চাই স্বামীজীর দিব্য দিগ্‌দর্শনী। উত্তরকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করায় গঙ্গোত্তরী বিশুষ্ক। দক্ষিণমুখী ভাগীরথীর খাদ আছে স্রোত নাই। কর্মের প্রবাহ থাকিবে মহামানবের সাগরতীরে দক্ষিণুখী কিন্তু তাহার উৎস থাকিবে চিরদিনই উত্তরে। দেবতাত্মা হিমালয় ভুলিলে সুজলা সুফলা পুণ্যভূমি সাহারা হইয়া যাইবে। জ্ঞান জন্মিবে আধ্যাত্মিক্ শিকরে, ধাইবে জীব-সেবার সাগরে। বোধি আসিবে বেদ হইতে, সার্থক হইবে মানবের বেদনা-বিনাশে।

মন্ত্রহীন যন্ত্র মহাদানব। সে পিষিয়া মারিবে মানব-সভ্যতাকে। নিরেট নির্মম যন্ত্রশক্তির ব্যবহারে কেবলই হইবে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়। পশ্চিমা যান্ত্রিক দক্ষকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দিবার দায়িত্ব পূর্বাচলের পুরোহিতদের। পাশ্চাত্যের শক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের শিবের মিলন ঘটাইতে হইবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়া। এই মহাকার্য কে কবে করিবে জানি না। তবে ছুটিতে হইবে আমাদিগকে ঐ লক্ষ্যমুখে। "চরৈবেতি চরৈবেতি"। যাত্রাপথ আঁধার ঘেরা। স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়ী সাধনা এই পথে আমাদের প্রকৃষ্ট পাথেয়, প্রজ্জ্বল প্রদীপ শিখা। ❑

শ্রীঅরবিন্দের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী

'মহাজাতি সদনে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেরিত ভাষণ

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে বৃটিশরাজ দেশদ্রোহিতার মামলা করিয়া তাঁহাকে আলিপুর জেলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পুরিয়াছিল। সেই মামলায় ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন সসম্মানে জয়লাভ করিয়া একটি ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন—"এই শ্রীঅরবিন্দের অনেক পরে মানুষ তাঁহাকে জানিবে দেশপ্রেমের কবি বলিয়া, জাতীয়তার নবী বলিয়া—আর জানিবে বিশ্ব মানব-প্রেমিক বলিয়া।"

আজ আমরা দেখিতেছি দেশবন্ধুর এই বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ জন্মিযাছিলেন আমাদের এই মানুষের দেশে, কিন্তু তিনি ছিলেন মানববেশে স্বর্গের দেবতা।

গীতায় দৈব ও আসুর সম্পদের কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দ আসুর সম্পদ্‌কে পদদলিত করিয়া দৈবী সম্পদের জাজ্জ্বল্যমান বিগ্রহরূপে ছিলেন।

তাঁহার উপদেশ ছিল—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন। তাঁহাকে প্রকটিত কবাই মানবজীবনের লক্ষ্য। এই পরম লক্ষ্য ভুলিয়াই আজ আমরা দুর্দশাগ্রস্ত।

আবার জাগিবে ভারত। সময় নিকটবর্তী। শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান সত্য হইবেই। প্রভু জগদ্বন্ধুর পরিভাষায় মহাউদ্ধাবণ যুগ উদয় হইবেই। আমরা পরা শান্তিময় জীবনের সন্ধান পাইবই। সেদিন অতি নিকট। বন্দে মাতরম্। জয়তু শ্রীঅরবিন্দঃ। ১-৮-১৯৯৮ ❑

শ্রীঅরবিন্দ চর্চা

মহৎ জীবনের দুইটি ভাগ ঃ যাহা প্রত্যক্ষ—তাহা ঘটনা; যাহা অপ্রত্যক্ষ—তাহা দর্শন। অনেকে মনে করেন শ্রীঅরবিন্দের জীবন জটিল; তাহা ঠিক নহে, শ্রীঅরবিন্দের জীবন গভীব—অতি গভীর unfathomable।

তিনি জন্মেছিলেন মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। তাঁর জন্মক্ষণ সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই শুভক্ষণ। তিনি জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ। মাত্র ৭ বৎসর বয়সে পিতা কৃষ্ণধন তাঁহাকে ইংলণ্ডে ইংরেজ পরিবারে রাখিয়াছেন। ১৪ বছর ইংলণ্ডে ছাত্রজীবন। ১৮৭২ এর ১৫ আগষ্ট কলিকাতায় জন্ম।

পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ। মাতা স্বর্ণলতা, রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিন ভাই—বিনয়, মনোমোহন ও বারীন্দ্র। এক বোন সরোজিনী। মনোমোহন ইংরেজী সাহিত্যিক, বারীন্দ্র বিপ্লবী,

অরবিন্দ রাজনৈতিক, কবি, প্রেমিক, দার্শনিক, যোগী, সাধক ও সিদ্ধ ঋষি।

৫ বছরে—(দুই জন) দার্জিলিং লোরেটো কনভেন্টে পড়েন।

৭ বছর—লণ্ডন যান, ইংরাজ পরিবারে থাকেন।

১৩ বছর—লণ্ডনে সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি হন।

১৫ বছর—সেন্ট পলস হইতে বৃত্তি পাইয়া ক্যাম্ব্রিজে যান।

১৮ বছর—সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হন। কিংস কলেজে ঘোড়ায় চড়া না জানায় শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন।

I. C. S.-এর প্রতি মোহ ছিল না, তাই ঘোড়ায় চড়া শেখেন নাই।

২২ বছর বয়সে বরোদার গাইকোয়ার-এর চাকরী করেন।

৩৪ বছর পর্যন্ত চাকরী—১২ বছর। আগে প্রশাসনিক বিভাগ, পরে রাজ কলেজের অধ্যাপক। বেতন ৭৫০্। তাহা ছাড়িয়া এলেন ৫০্ বেতনে। বাংলাদেশে জাতীয় কলেজেব অধ্যক্ষ হন।

৩৪—৩৬ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাট্ বিপ্লবী। ২ কাগজ যুগান্তর ও বন্দে মাতরম্।

৩৬ বছর কালে (১৯০৮—৫ মে) গ্রেপ্তার, ১ বছর জেলে।

৩৮ বছর বয়স (১৯০৯—৪ এপ্রিল) চন্দননগর হইয়া পণ্ডীচেরী।

৭৮ বছর কালে ১৯৫০-এ মহাপ্রয়াণ।

৪০টি বছর পণ্ডীচেরী।

বয়স যখন ৭৫ বৎসব—১৯৪৭-এ তাঁর জন্মদিনে, ভারত স্বাধীন হয়।

তিন ভাগ— প্রস্তুতি—লণ্ডনে—বরোদায়।

দেশসেবা—২ বছর প্রকাশ্যে, ১ বছর জেলে, ১ বছর বক্তৃতায়। পূর্ণাঙ্গ যোগ সাধনা।

রাজনৈতিক অরবিন্দ— ...।

সাধক অরবিন্দ—অগাধ সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র রূপে।

দেশপ্রেমিক অরবিন্দ—মহাযোগী।

রাজনৈতিক নেতা।

মানবজাতির উন্নতিকল্পে ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজনে।

রামমোহন—সংস্কারক। সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

রামকৃষ্ণ—সমন্বয় সাধক।

বিবেকানন্দের—ঋষি দৃষ্টি।

ব্রহ্মবান্ধব—বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী—তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন ঃ

"অমল শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি?

ভারত মানস সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল দেখিয়াছ।

হিমশুভ্র বনে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী।
বৃহৎ ও মহৎ।
হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ—স্বধর্ম মহিমায় মহৎ।
গোটা ও ঋষি মানুষ।
বজ্রের মত ব্যক্তিগর্ভ, কমলপর্ণের মত কান্ত-পেলব।
এমন জ্ঞানাঢ্য ধ্যান-সমাহিত মানুষ ত্রিভুবন খুঁজি পাবে না—ইনি শ্রীঅরবিন্দ।"
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব। দেশপ্রেমের গুরু।
'ইন্দুপ্রকাশে' বঙ্কিমদর্শন লিখেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।
লিখিয়াছেন—"অরবিন্দ বঙ্কিমের ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ।"
পরে পত্রিকার নাম দিলেন 'বন্দে মাতরম্'।
নব ভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র।

পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য তিনি অমোঘ বীর্য সম্পন্ন মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত স্বজাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন।

বঙ্কিমের মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দ—দেশপ্রেমের মধ্যে ধর্মকে পাইয়াছিলেন।

ইহা বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ ও কৃষ্ণচরিত্রের দান। সেইকালে কংগ্রেসের রাজনীতি যাঁরা পরিচালনা করিতেন সেই শিক্ষিত সমাজ তখন বিলাতি আচার ব্যবহার অনুকরণ করাকেই গৌরবের বিষয় মনে করিত—তাবপর প্রচণ্ড আঘাত দিলেন বিবেকানন্দ।

"হে ভারত! এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী এই দাসসুলভ আচরণ—এই সম্বলে উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই কাপুরষতায় তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

বিবেকানন্দ বলিলেন—নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নহে।

বীর্যবান হও—এই বাণীর মূর্তি শ্রীঅরবিন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র দ্বারা দেশকে জীবিত করিয়া বিদেশী অনুকরণকে সর্বতোভাবে বিসর্জন দিয়া স্বদেশী মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। ১৪ বছর বিলাত বাস করিয়া আসিবার পরেও অরবিন্দের মধ্যে বিদেশীর গন্ধ ছিল না।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলিলেন—

"Work that motherland may prosper,
Suffer that motherland may rejoice",

১ বৎসর মাত্র অধ্যক্ষ, তার মধ্যে অগণিত ছাত্রকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জাতীয়তা মানস ভাববিলাস বা রাজনৈতিক আকাঙক্ষা মাত্র নয়, উহা আত্মিক উন্মাদনা, Doctrine of Resilience প্রবন্ধে।

রাজনীতির মধ্যে অনুরাগের স্থান আছে।

ইহা স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির গৌরব, মহত্ত্ব ও সুখ সম্পর্কে অনুরাগ। অপরের জন্য আত্ম বলিদানের মধ্যে আনন্দ আছে। অন্যের দুঃখ মোচনের মধ্যে আনন্দ আছে। স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য রক্তদানে আনন্দ আছে।:মৃত্যুর পর পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ আছে।

জন্মভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হবে, ভারতীয় সমুদ্র হইতে উত্থিত বাতাস, পর্বত শিখর হইতে প্রবাহিত নদী, ভারতীয় ভাষা, সঙ্গীত কবিতা ভারতীয় জীবনের পরিচিত দশা শব্দ আচার-আচরণ পোশাক পরিচ্ছদ এই গুলির মধ্যে যে আনন্দ হয় উহাই স্বদেশানুরাগের জল বা মূল।

অতীতের জন্য গৌরববোধ ও ভবিষ্যতের জন্য আশা-আকাঙক্ষা পোষণ করা—ইহাই স্বদেশানুরাগের প্রত্যক্ষ ফল।

দেশের নদী অরণ্য প্রান্তর নরনারী সবকিছুর মধ্যে জন্মভূমির বিপ্লবী সত্তাকে ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব কবিতে পারার নাম স্বদেশ প্রেম।

কারা কাহিনী

"যে-কারাগার আমাকে মানব সমাজ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে সেই দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম বাসুদেব। দেখিলাম উচ্চ প্রাচীর নয়—বাসুদেব আমাকে ঘিরিয়া আছেন।

আমার সেলের গরাদ দেখিয়া মনে হইত বাসুদেব আমাকে পাহারা দিতেছেন। আমার সেলের সম্মুখে বৃক্ষটি তাকে দেখিতাম বাসুদেব। তার ছায়া তলে আমি বসিতাম মনে হইত বাসুদেব স্নেহছায়া দিয়া আমাকে জুড়াইয়া দিতেছেন।

আমার পালঙ্ক স্বরূপ যে মোটা কম্বলটা আমাকে দেওয়া হইয়াছিল তাকাইয়া দেখিতাম ওটি বাসুদেব। কম্বল জড়াইয়া শুইয়া উপলব্ধি করিতাম শ্রীকৃষ্ণ বাহু বেষ্টনে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমানন্দের।

আদালতে বিচারককে দেখিতাম বাসুদেব, অপর পক্ষের উকীলকে দেখিতাম বাসুদেব, আমার পক্ষে চিত্তরঞ্জনকে দেখিতাম বাসুদেব। বাসুদেব আমাকে আশ্বাস দেন আমিই সব। সকলের বুদ্ধিও আমিই চালাই।" (শ্রীঅরবিন্দের রচনা)

অশ্ব (শক্তি)-পতি সাবিত্রীর শক্তিমান্ সাধক। প্রত্যেক মানব শ্রীঅরবিন্দ নিজে। সাবিত্রী সবিতা দেবতার দান! সবিতা আলোর দেবতা, বিশ্বসংসারকে আলোময় করে সবিতার বরেণ্য ভর্গ। অশ্বপতি নিঃসন্তান, তাঁর কন্যা কামনা (কন্যার মধ্যে নিজের তৎসমাকে পাওয়া), কন্যার্ জন্য সবিতার আরাধনা। বর দিলেন কন্যারূপে তোমার গৃহে জন্মিব। সাবিত্রী কন্যা হইল—জীবন আলোময় হইল, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' হইল। সাধক জ্যোতির্ময় রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইল। অন্তর বাহির আলোময়। জীবের সাধন এই আলোর জন্য। সাবিত্রীর পতি সত্য অনুসন্ধানে বনে গেলেন। প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে সত্যের সাক্ষাৎকার। সাবিত্রী সঙ্গে সত্যবানের প্রথম দেখা কাব্যাংশে অতুলনীয়; সত্যবান সাবিত্রী-সত্যবান হইলেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। "অসতো

মা সদ্গময়" প্রার্থনার ফল ফলিল। নারদ সহ সকলেই ভাবে সত্যবান টিকিবে না, পিতামাতা সকলের আপত্তি। সাবিত্রী অটল। বিবাহ হইল এক বছর। অসুস্থ। সাবিত্রী স্বামী সঙ্গে বনে গেলেন। যথা সময় মৃত্যু আসিল। সত্যবান মরিয়া গেলে মৃত্যুর দেবতা আসিলেন। সাবিত্রী মৃত্যুদেবতা যমকে বলিলেন, আমি তোমাকে স্বীকার করি না। নারী! কিসের বলে তুমি বিধাতার এই অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করিতে চাও? সাবিত্রী বলিলেন, শুধু প্রেমের বলে। মরণ অনিবার্য কিন্তু মরণ শেষ কথা নয়; চরম নহে, মৃত্যু পার হইলে অমৃতলোক। **(খসড়া রচনা)** ❑

জয় জগদ্বন্ধু

বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ একদিন তাঁহার আশ্রমে বসিয়া আছেন। আশেপাশে অন্যান্য লোকজনও আছে। নিকটবর্তী এক গ্রামের জমিদারপুত্র সুরথবাবু ঘোড়ায় চাপিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি পিপাসার্ত হইয়া ঘোড়া হইতে নীচে নামিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পিপাসার জল চাহিলেন। সুরথবাবুর সাজপোযাক ছিল এক বিলাসী বাবুর মত। তাঁহার গায়ে সুগন্ধী তৈলের গন্ধ ও বস্ত্রাদির এসেন্সের গন্ধে আশ্রম যেন ভরপুর হইল।

ব্রহ্মচারী মহারাজ সুরথবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন — "দেহখানাকে তো খুব সাজাইয়াছ! শোনামাত্র সুরথবাবু উত্তর করিলেন — "সাজাবো না? এই দেহটা ভগবানের মন্দির নয়? মন্দির সাজাব না?" উত্তর শুনিয়া বাবা চুপ করিয়া রহিলেন।" সুরথবাবু একটা খালি বারান্দায় একটা জলচৌকীতে বসিলেন। "কই জল দিলেন না?" বলিতেই একটি ভক্ত তাহার নিকট জল লইয়া আসিল। ঐ বারান্দায় তাহার পরিচিত একজন ধোপা বসিয়াছিল। সুরথবাবু হাতে জলগ্লাস লইবার পূর্বে ঐ ধোপার দিকে অতি রুক্ষ ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "যাও! নেমে দাঁড়াও।" তাহার ভাবটি এই যে, আমি ব্রাহ্মণকুমার, জল পান করিব — ইহা জানিয়াই তাহার নিজ হইতেই নামিয়া যাওয়া উচিত ছিল, আবার বলিতে হইবে কেন?

ধোপা জড়সড় হইয়া অপরাধীর মত নামিতে উদ্যত হইতেই ব্রহ্মচারীজি সুরথবাবুর দিকে তাকাইয়া খুব শান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"কেন, ওটা ভগবানের মন্দির নয়?" তাৎপর্য এই যে, তোমার দেহটি ভগবানের মন্দির বলিয়া সাজাইয়াছ, আর ঐ ধোপার দেহটি ভগবানের মন্দির নয়? ও দেহটাকে দূর দূর করিয়া

নামাইয়া দিতেছ কেন?"

"কেন, ওটা ভগবানের মন্দির নয়?" — কথাটি কানে আসামাত্র মন্ত্রবৎ কার্য হইল। সুরথবাবু ব্রহ্মচারী বাবার চরণের কাছে আসিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। বলিলেন — "বাবা! আপনি আজ আমাকে পরম জ্ঞান দিলেন। সকল দেহই যে ভগবানের দেহ ইহা কখনও ভাবি নাই। সত্যই তো যেখানে যাহাকে দেখি সকলের মধ্যেই যে ভগবান্-বিরাজমান। কথাটি এত সহজ ও মহা সত্য কিন্তু কোন দিন মনে জাগে নাই। আজ আপনি জাগাইয়া দিলেন। আপনি যথার্থ গুরুদেব। অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিলেন। আপনি আমাকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

ব্রহ্মচারী বাবা তাহাকে পরমাদরে দীক্ষা দান করিয়া আদর্শ ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বারদীতে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে শুনিয়াছি।

ব্রহ্মচারী বাবা বহু শত-সহস্র লোকের রোগ দূর করিয়া সুস্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহা গণনা নাই। একদিন দুঃখ করিয়া বলিতে ছিলেন —"সকলেই দেহের রোগ সারানোর জন্য আসে।"

"ওরে তোরা যে-জন্য আমার কাছে আসিস এবং যে-ফল পেয়ে আমাকে মহৎ বলে মনে করিস্ তা তো আমি মলমূত্রবৎ মনে করি। কই ভবব্যধির জন্য তো কাউকে আসতে দেখি না। শতবর্ষ হিমালয়ে রহিয়া যে সম্পদ্ লাভ করিয়াছি — তাহার গ্রাহক পাইলাম না।".

মনে হয় সুরথবাবুকে একজন পাইয়াছিলেন। তিনি বাবার কৃপায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন সর্ব জীবের মধ্যেই শ্রীভগবান্ বিরাজিত। এই জ্ঞান তাহাকে মহান্ করিয়াছিল। এই জ্ঞান তিনি প্রার্থনা করিয়া পান নাই। বাবা অযাচিতভাবেই দিয়াছিলেন।

বাবার জন্মস্থান বসিরহাট লাইনে স্বরূপনগরের কাছে কচুয়া গ্রামে। তাই এই কচুয়া গ্রামে পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে এই জন্মাষ্টমী দিনে বাবার নূতন মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। উদ্বোধন উৎসবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আজ আমরা সেই পবিত্র ভূমিতে সমবেত হইয়াছি। দিনটিও পরম পবিত্র। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন — কংসের কারাগারে অন্ধকারে অনাদরে অনাড়ম্বরে, কংসের রাজধানী মথুরার কেউ জানিল না যে ঐ দিন গভীর রাত্রে স্বয়ং ভগবান্ অন্ধকার কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবকী-বসুদেবের কোলে।

কংসের রাজ্যে যদি কোন সংবাদপত্র থাকিত তাহাতে ঘোষিত হইত যে গত রাত্রে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। পরদিন কংস রাজা ঘোষণা করিতেন — কেহ গুজবে কান দিবেন না। বসুদেবের একটি ছেলে হইয়াছিল, তাহাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে — এসব গুজব। সত্য কথা এই—একটি মেয়ে হইয়াছিল — আমি তাকে আছাড় দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি। এক দৈব বাণী বলিয়াছিল অষ্টম গর্ভের ছেলে আমাকে বধ করিবে। তা ছেলে না হইয়া হইল মেয়ে! দেখা গেল "দেবতা বেটারাও মিথ্যা কথা কয়।"

লোকনাথ বাবার পিতা রামকানাই ঘোষাল। মাতা কমলাদেবী। কমলাদেবীর তৃতীয় সন্তান লোকনাথ। বাবা রামকানাইর ইচ্ছা ছিল — তাঁর একটা ছেলে আজন্ম ব্রহ্মচারী হউক। অর্থাৎ পৈতা লইবার সময় যে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে — আর ত্যাগ না করিয়া চির ব্রহ্মচারীই থাকুক।

প্রথম দুই পুত্রের মায়ায় ও মায়ের অনিচ্ছায় বাবার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয় পুত্র লোকনাথ জন্মাইলে মা কমলা দেবী স্বামী রামকানাইকে বলিলেন, এই পুত্র তুমি নেও — যেমন ইচ্ছা তৈয়ারী কর। রামকানাই আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সাধক শ্রীভগবান্ গাঙ্গুলীকে সংবাদ দেন। তিনি দর্শন করিয়াই বলিলেন — এই সন্তান সাধারণ মানুষ নয়, ইনি মহাপুরুষ। লোকহিতার্থে মর্তে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁর বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

জগতের পরম কল্যাণকারী লোকনাথ বাবা জয়যুক্ত হউন।

আমরা তাঁহার অভয় পাদপদ্মে প্রণত হই। ❑

সাক্ষাৎ দর্শনের ফল

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্মরণে

জটিয়া বাবা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রভু অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশজাত। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মধর্মের সত্যতা গভীরভাবে নিজে উপলব্ধি করিয়া একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মের আচরণে ও প্রচারণে নিমগ্ন হন।

ঐ সময় ঢাকায় বহু সজ্জন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুর জাতিভেদ মানে না ও ভগবানের কোন মূর্তি আছে ইহা বিশ্বাস করে না। ভগবান্ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহার সৃষ্ট মানুষে মানুষে জাতিগত ভেদ থাকিতে পারে না। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ১৮৬২ সনে তিনি কণ্ঠের উপবীত পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আবার একনিষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নামকীর্তনে ও পূজা অর্চনাদি বৈষ্ণবীয় আচরণে তিনি সর্বতোভাবে ডুবিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি ঐ সময়ে একবার ঢাকা যান। অনেক ভক্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন ভক্তগণকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্তি পূজা করিতে আদেশ করেন। ইহাতে পূর্ববর্তী

* *'বিজয়ভেরী'। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-যোগমায়া আশ্রমের মাসিক মুখপত্র। ঘোলা, সোদপুর।*

ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণ গুরুর আচরণে বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাঁহারা কয়েকজন সজ্জন একত্রিত হইয়া গোস্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন।

তাঁহারা বলেন—"গোসাইজী, আপনি তো দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আকার নাই, মূর্তিপূজা করা পৌত্তলিকতা। ইহা হিন্দু ধর্মের একটি কুসংস্কার, কুৎসিত ব্যধিতুল্য ক্ষতিকারক। আর এখন আপনি নিজেই মূর্তিপূজা করেন ও পূজা করিতে নির্দেশ দেন। ইহাতে আমরা আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও নিজেরা কর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।"

গোস্বামী প্রভু গম্ভীরভাবে উত্তব দেন, "সত্যি বলিয়াছ, আমি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলাম ঈশ্বরের আকার থাকিতে পারে না। তখন যথেষ্ট যুক্তিতর্ক দ্বারাই তাহা স্থাপন করিয়াছিলাম এবং অসংখ্য নরনারীকে সেই উপদেশই দিয়াছিলাম। কিন্তু পরে একদিন আমার পরম সৌভাগ্যবশতঃ মদনগোপাল দর্শন দিয়াছেন। অতি উজ্জ্বল স্পষ্টভাবে দেখা দিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। যা বলিয়াছেন তা পরম সুসত্য বলিযাই আমার কাছে প্রমাণিত হইয়াছে—এখন বল দেখি, আমি কেমন করিয়া বলিব তাঁহাব মূর্তি নাই! নিজেকে তো নিজে ফাঁকি দিতে পারি না।"

আগে ভাবিতাম বিচাববুদ্ধি মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। সত্য নির্ধারণে ইহার উপর আর কারো স্থান নাই। এখন নিশ্চিত ভাবেই বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কৃপাই সর্বশ্রেষ্ঠ। একবিন্দু কৃপার কাছে কোটি বুদ্ধিমানেব বুদ্ধি দন্ততৃণতুল্য তুচ্ছ।

একবার গোস্বামীজী বহু ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী সকল ভক্তগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, "প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোন ঠাকুর-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত বিগ্রহ দর্শন করিও।" তিনি নিজে ভাববিহ্বল হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেন। জীবন ভবিয়া তিনি যাহা অন্যকে উপদেশ দিতেন তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন।

শ্রীভগবানের বিগ্রহ-না-মানা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যহ অশ্রুভরা চক্ষে বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনের এই ফল। তিনি তখন মহাপ্রভুর প্রবর্তিত কীর্তনের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি বলিতেন কীর্তন দ্বারা প্রচাবের বিশেষ সুবিধা। সুতরাং প্রচারের এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপায় জগতে এ-যাবৎ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। কীর্তনের দ্বারা মানুষের হৃদয় মন ও প্রাণে যে শুভ ক্রিয়া হয় তাহা শুধু কথা বা উপদেশে কখনও হয় না। এই জন্যই মহাপ্রভু ও গোস্বামীপাদেরা কীর্তনকে ধর্মের আচার ও প্রচারণে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গিয়াছেন। উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে কীর্তন করিবার সময় গোস্বামীপ্রভুর শিরে দীর্ঘ জটা পুলকে খাড়া হইয়া যাইত এইজন্যই তিনি জটিয়া বাবা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন—"কীর্তনে স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার সাধন হয়। চতুর্দশ ভুবনের মহামাঙ্গল্য বিধান হয়।"

বিজয়কৃষ্ণজী জয়যুক্ত হউন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন। ❑

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

শ্রীশ্রীস্বামী নিগমানন্দ মহারাজকে দর্শন করিবার ভাগ্য লাভ করি নাই। তাঁহার প্রিয়জনদের অনেককে দর্শন করিয়াছি। যথা, স্বামী সত্যানন্দ ও দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস—ইঁহারা স্বামীজীর পদাশ্রিত। ইঁহাদের দর্শন করিয়াছি। জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার বিষয় অবগত হইয়াছি। অনেক ছোটবেলায় তাঁহার একখানি জীবনী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানি অন্তরে দাগ কাটিয়াছিল। দাগ কাটার কারণ বুঝিয়াছি।

স্বামীজীর পূর্ব নাম নলিনী, পত্নীর নাম সুধাংশুবালা। স্বামী কর্মস্থলে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার নারায়ণপুরে। স্ত্রী তাঁহার স্বগ্রাম নদীয়ার কুতুবপুরে থাকিতেন। হঠাৎ একদিন স্বামী দেখিলেন টেবিলের পাশে স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। পরে বাড়ি হইতে খবর আসে, ঐদিন ঐ সময় তাঁর স্ত্রী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নলিনী বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মৃত্যুর পর আমি তাহাকে দেখিলাম কীরূপে? যাহা দেখিলাম তা অবশ্যই সুধাংশুর আত্মা হইবে। আত্মা তাহা হইলে দেখা যায়। প্রত্যক্ষের ওপর দেখা যায়। মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় থাকে? কী করিয়া তাহাকে দেখিলাম? আবার কি তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে?

এসব চিন্তায় নলিনীকান্তের মন বিচলিত হইল। আত্মা কী, কোথায় থাকে, কী প্রকারে দর্শন হইতে পারে আত্মাকে, এই ভাবনা তাঁহাকে পাইয়া বসিল, আত্মানুসন্ধান তাঁহার নিত্য ধ্যানজ্ঞানের বিষয় হইল।

ঐরূপ প্রিয়জনের মৃত্যুর ঘটনা হইতে মন অধ্যাত্মমুখী হইয়া যাওয়া—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। নলিনীকান্ত আত্মানুসন্ধানে গৃহ ছাড়িয়া ত্যাগী হইলেন। এইরূপ ঘটনায় সত্যানুসন্ধানে গৃহত্যাগ, আমার মনে দাগ কাটিয়াছিল।

প্রথমে তিনি তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার কাছে উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট তান্ত্রিক সাধন গ্রহণ করেন। সেই সাধনায় সিদ্ধ হইলে গুরু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন ঋষির কাছে পাঠাইয়া দেন। সেই গুরুর নাম সচ্চিদানন্দ পরমহংস। তাঁহার নিকট জ্ঞানমার্গে সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই গুরুদেব তাঁহাকে আরও কোন মহাত্মার কাছে পাঠাইয়া দেন। সেই মহাত্মার নাম সুমেরদাস। তাঁহার নিকট যোগশাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণের পর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। সেইসব সাধনার অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁহার তান্ত্রিকগুরু, যোগীগুরু ও জ্ঞানীগুরু গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থগুলি অতুলনীয়। ইহার ভিত্তি বইপড়া বিদ্যা নহে। বিদ্যাগুলি বাস্তবের সাধনা। জ্ঞানীগুরু তাঁহাকে প্রেমিক গুরুর সন্ধান দেন। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি মৃত পত্নীর শাশ্বত আত্মার দর্শন পান। শুধু দর্শন নয়, তাঁহাকে অতি আপন করিয়া পান। এই

---

* *'শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ'। ১৩৮৭, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিশহর।*

আত্মা তাঁহার পত্নীর আত্মা নয়, বিশ্বাত্মা। জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মায় বস্তুত কোন তফাৎ নাই। বিন্দুজল সিন্ধুজল মূলতঃ একই। আত্মতত্ত্ব তথা ব্রহ্মতত্ত্বর সঙ্গে একাত্মানুভূতিতে নলিনীকান্ত নিগমানন্দ হইলেন। বেদের গূঢ়তত্ত্ব নিগম। সেই তত্ত্বানন্দের সঙ্গে তিনি একত্বপ্রাপ্ত, এই তাঁহার গুরুদত্ত নাম।

স্বামীজী বলিয়াছেন—"দ্যাখো, আমি অবতার-টবতার নই, — সাধারণ মানুষ। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ ইত্যাদির জীবন অতিক্রম করে জন্মজন্মান্তরের সাধনার পর এজন্মে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়ার ইচ্ছায় জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে। আমাকে তোমরা সদ্‌গুরু বলে জেনে রাখো। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি—তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব, এই আমার কাজ।"

বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে একটি সংস্কৃত তত্ত্ব আছে। শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"কৃষ্ণ গুরু ভক্ত শক্তি অবতার প্রকাশ।
এই ছয় রূপে নিত্য করেন বিলাস।।"

শ্রীকৃষ্ণের এই বিলাসমূর্তির গূঢ়তত্ত্ব তিনি সমষ্টিগুরু। স্বামীজী নিজেকে এই সমষ্টি গুরুরই প্রকাশমূর্তি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন মার্গে সাধনা করিয়া নিজে অতি উচ্চস্তরের লোকগুরু হইয়াছেন সংশয় নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিভিন্ন সাধনমার্গে সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সকল মতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। পরমহংসদেবের সাধনার সঙ্গে নিগমানন্দের সাধনার কিছু পার্থক্য আছে। পরমহংসদেব তন্ত্রধারায় ভগবান্‌কে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ পাওয়ার পর তাঁহার আর সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন পথের সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিলে যে-কোন মতেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব।

স্বামী নিগমানন্দজী আত্মদর্শনরূপ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। একজনকে গুরুবরণ করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থায় নিবিষ্টভাবে তপস্যা করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আবার গুরুরই আদেশে উন্নতস্তরে উন্নততর ভূমিকায় অপর গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। জীবনপণ করিয়া সেই পথের সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়াছেন। আবার তাঁহারই নির্দেশেই তৃতীয় জনকে গুরু করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়াছেন। এইরূপ পরপর গুরুনির্দেশেই গুরু ছাড়িয়া গুর্বন্তর গ্রহণ ও সিদ্ধির পথে ক্রমশ অগ্রসরতা লাভ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত সাধনমার্গে বিরল। তন্ত্রের পথ, যোগের পথ, জ্ঞানের পথ সকল পথেরই তিনি অলিগলির সন্ধান রাখেন। কোন্ দিকে সরিলে পা ফস্‌কাইবে,, কোন্ দিকে চলিলে উর্দ্ধতর হইতে পারিবে এ সম্বন্ধে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা অসাধারণ। এইজন্য তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থ সেই পথের সাধকের সহায়ক। তাঁহার ব্রহ্মচর্য গ্রন্থখানি সকল পথের সাধকের সাধনপথের পরম সহায়ক। যে-সমস্ত পথ বা মার্গগুলি বিরোধী-ভাবাপন্ন তাহার মধ্যেও সামঞ্জস্য ঘটাইবার প্রচেষ্টা স্বামীজীর জীবনদর্শনে

এক অপূর্ব অধ্যায়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মবাদী। তাঁহার ব্রহ্ম নির্বিশেষে, নির্গুণ, নিরাকার। সাধকের লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভ। শ্রীগৌরাঙ্গ—ভাগবত গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ সগুণ, সবিশেষ, সাকার। সাধনের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বলাভ। নিত্য দাস্যপ্রাপ্তি। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। গৌরাঙ্গ মতে জগৎ ব্রহ্মের বহুলাংশে সত্য। শঙ্করের মতে জীব ব্রহ্ম অভিন্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ মতে জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই মত পরস্পর বিরোধী। স্বামী নিগমানন্দজী তাঁহার নিজ সাধকজীবনে ও সিদ্ধজীবনে এই দুই মতের মধ্যে কোথায় যেন এক নিগূঢ় সামঞ্জস্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রায়শঃ বলিতেন, "শঙ্করের মত, শ্রীগৌরাঙ্গের পথ।" তিনি বলিতেন ও জীবনে আচরণ করিতেন। শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন। যুক্তির দ্বারা নহে, জীবনের দ্বারা উক্ত দুই মতের সমন্বয় সাধন। এই মহাপুরুষের জীবনে জীবন তপস্যায় এক অভিনব অঙ্গ। যে মতে-পথে শঙ্করপন্থীও রাজী নয়, গৌরাঙ্গপন্থীও রাজী নয়, সেই মত-পথ মিলাইয়া স্বামী নিগমানন্দ চলিয়াছেন, শঙ্করকে সিঁড়ি ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে বুকে লইয়া। শঙ্করের দৃষ্টিতে নিগমানন্দজী ব্রহ্মজ্ঞ। বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে তিনি প্রেমিক পুরুষ। সর্বজনসুখায় বিশ্বজনহিতায় তাঁহার সিদ্ধজীবনে প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়োজিত। জয়তু স্বামী নিগমানন্দঃ। ❑

'পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি'

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী স্মরণে

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য সিদ্ধি নয়।" মহতের কৃপা অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, অপরিমিত। কোন কিছুরই অপেক্ষা যাঁরা রাখেন না। তবু কিঞ্চিন্মাত্রও ভক্ত্যর্ঘ্য তাঁহাদের প্রতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিবেদন করিতে পারিলে কৃতজ্ঞতার নিঃশ্বাস ফেলিয়া অধন্য জীবন যেন শতধন্য হইয়া যায়।

সেইরূপ ধন্য হইবার সৌভাগ্য এ জীবাধমকে দিতে চাহিতেছেন সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক মহোদয়। কিন্তু দিলে কী হইবে। অর্ঘ্য সাজাইবার পণ্য কোথায়? ডালি যে শূন্য! কেবল একটি দুষ্ট সাহস মনের কোণে আছে—যদি দিয়া আসিতে পারি তাঁরই পায়ে, তাঁরই বাগানের ফুল চুরি করিয়া।

কনিষ্ঠ স্নেহে যিনি আদর করেন, নিজেকে যাঁহার দাস পরিচয় দিয়া জীবাধম হইয়াও গৌরব করিয়া বেড়াই, নব গৌর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যাঁহার জীবনের "সহায়", নিয়ত ভাবাবেশ

** 'শ্রীরামদাস প্রশস্তি' (১ম খণ্ড)। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী শতবর্ষ সংকলন। সম্পাদক ঃ শ্রীসুশীলকুমার সেন। সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।*

বশতঃ "রাধিকা" উচ্চারণ করিতে অপারগ হইয়া বন্ধুসুন্দর যাঁহাকে "শারিকা" বলিয়া ডাকিতেন. নিত্যানন্দ-প্রতিম শ্রীল শ্রীরাধারমণ চরণদাস যাঁহার জীবনপথের বর্তিকাধারী, শ্রীশ্রীশচীনন্দন-শ্রীশ্রীপদ্মাবতীনন্দন যাঁহার জীবনের সর্বস্বধন—উদ্দণ্ড কীর্তনকালে যিনি সিংহশাবক, আর্তস্বরে অশ্রুবর্ষণে যিনি ক্ষুদ্র বালক, গৌড়ীয় লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে যিনি শ্রীরূপ গোস্বামী, রসতত্ত্ব আস্বাদনে যিনি একান্ত জন, ত্যাগ-তপস্যায় যিনি শ্রীসনাতন, চিরকৌমার্যে যিনি দেবব্রত ভীষ্ম—তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হই।

তাঁহার কথা কী-ই বা জানি। তাঁহার মুখেই কিছু কিছু শুনিয়াছি। কখনও কোনও আবেশে অতর্কিতভাবে তাঁহার মুখ হইতে নিজ জীবনকথা সময় সময় মিশ্রীখণ্ডের মত বাহির হইয়া পড়ে, — তাহার উপভোগ যে কত মধুর, যে করে নাই সে জানে না।

শুনিয়াছি, যখন ফরিদপুরে বাংলা স্কুলের নীচের ক্লাসেব ছাত্র, বয়স সবেমাত্র নয়-দশ বৎসর, তখন একদিন স্কুল-প্রাঙ্গণেব পার্শ্বে এক বটবৃক্ষতলে প্রেমসুধাকর প্রভু জগদ্বন্ধু- সুন্দরের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ নয়নে পড়ে, তাহাতেই জীবন-নদীতে প্রথম ভক্তির জোয়াব আসে। আজ বুঝি বা সেই জোয়ারেই বাণ ডাকিয়া প্লাবন আনিযাছে।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সঙ্গে করিয়া প্রথম শ্রীব্রজ ভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন। ত্যাগীর বেশ গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া কোন মহাশয়ের দেওয়া নাম "রামদাস" নাম রাখিয়াছিলেন। রামদাসকে ব্রজে রাখিয়া প্রভুবন্ধু যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনিও সঙ্গে আসিতে চাহিলে প্রভু ব্রজে থাকিয়া ভজন করিবার আদেশ করেন। আদেশ শুনিয়া রামদাস অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলেন "তবে থাকি।" উত্তরে দুঃখিত হইয়া প্রভুবন্ধু কহিলেন, "ছি! চাঁদে কলঙ্ক হ'ল।" 'তবে' শব্দটির মধ্যে অগত্যা আজ্ঞাপালনেব ভাব দেখিয়া ঐ কথা বলিলেন। ঐ টুকুই যার কলঙ্ক আর সবটাই যাঁর চাঁদের মত তাঁহার আদর্শ, আনুগত্য ও নিষ্ঠা যে কত মহান্ ও নির্মল তাহা বলিবার ভাযা নাই।

ব্রজের ভজনে এমনি ভাবে ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে, দিবারাত্র লীলাস্মরণে ডুবিয়াই থাকিতেন। প্রভু বন্ধুসুন্দর যখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান তখনই ছুটিয়া আসেন। কিন্তু ব্রজে গিয়া ভজনানন্দে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুমতি প্রার্থনা করেন। একদিন প্রভুবন্ধু কহিলেন, "আপন আপন খাবার জোগাড় তো পশু-পাখীরাও করিয়া থাকে, দশজনকে খাওয়াইয়া যে খায় সেই প্রকৃত মানুষ।"

কথা কয়টি মন্ত্রের মত কাজ করিল। কানে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রজে যাইবার আবেশ ঘুরিয়া গেল। নিজে ভাবিয়াছিলেন, ব্রজের ভজনানন্দী বৈষ্ণব হইবেন, কিন্তু তাঁর ভাবী জীবনের রূপটি যাঁর নখদর্পণে, তিনি জানেন যে অচিরেই তাঁহাকে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নিতাই-গৌরের গুণগান গাহিতেই হইবে। তাই তাঁহাকে শুধু আস্বাদনের কুঞ্জ হইতে টানিয়া আনিয়া বিতরণের রাজপথে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর, প্রভুবন্ধুর ঐ 'খাইয়ে খাওয়ানো' বাণীটির জীবন্ত মূর্তি শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজীর মধ্যে প্রকট দেখিতে পাইয়া রামদাস তাঁহার কৃপাপ্রবাহে সাঁতার দিলেন। বড় বাবাজী মহোদয়

তখন জয়নিতাই শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সঙ্গে অগণিত নরনারীকে নিতাই প্রেমে "মাতিয়া মাতাইতে"-ছিলেন।

রামদাসজী আরও কত মহাজনের কৃপায় পরিপুষ্ট হইয়া গুরুকৃপাতরঙ্গিণীতে হাবুড়ুবু খাইতে লাগিলেন। শিব-আচরণ জটীয়াবাবা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপাদ কৃপাদৃষ্টি করিলেন, প্রেমে ভোলা প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় প্রেমের কোলে টানিলেন, ব্রজবালা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রজমাধুরী ভোগ করাইলেন, নবদ্বীপের সিদ্ধবাবা আদরে করুণামৃত বর্ষণ করিলেন, সব কৃপার প্রবাহ মিলিয়া এক অখণ্ড সরোবর হইল যাহা হইতে অনন্তকালের জন্য অমিয়ধারায় প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সে ধারা আজও সাগর পানে ধাইতেছে। পূর্ব বাংলার প্রান্তে যেমন পদ্মা বুড়ীগঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, শীতলক্ষা সবাই মিলিয়া এক হইয়া নাচিয়া নাচিয়া বঙ্গোপসাগরে চলিয়াছে, শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের জীবনমধ্যেও তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ও শ্রীশ্রীরাধারমণের যুগলিত কৃপাপ্রবাহে জটিয়া বাবা প্রমুখ বহু মহানদীর জোয়ার মিলিয়া সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়া উদ্বেলিত ভাবে শ্রীশ্রীনিতাইপ্রেম-মহাসমুদ্রে ছুটিয়াছে। সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এ প্রেম-তটিনী এমনি ধারায় শত শত বৎসর চলিতে থাকুক, মরুভূমি প্লাবিত হউক এই তো অন্তরেব চবম কামনা।

দাদাজীবন জীবনে একটি মহান্ ব্রত লইয়াছেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেথায় যেদিন যে লীলা প্রকট করিয়াছেন বৎসরের সেই দিন সেথায় উপস্থিত হইয়া সেই রজে গড়াইয়া সেই লীলার স্মরণ করা। স্মরণে লীলা মূর্ত হয়। মূর্ত হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীগৌরপরিকরের সান্নিধ্যে আনিয়া নাচাইয়া গড়াইয়া ভাসাইয়া দেয়। এই মহাব্রত উদ্‌যাপিত হউক।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম।।"

গোরাচাঁদের এই বাণী সার্থক হউক। মহাউদ্ধারণ লীলা জয় যুক্ত হউক। ❏

শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর স্মরণে

২৪.৪.১৯৯৬

শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর ছিলেন শ্রীহরিনামের অদ্বিতীয় সাধক। এইযুগে নাম প্রচারের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমরা যাঁরা নাম ভালবাসি তাঁহাদের সকলের তিনি পথ প্রদর্শক। তাঁহার নাম ও উপদেশ ও নামের সাধনা যত প্রচার হয় ততই জগজ্জীবের কল্যাণ।

* *'শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর স্মারকগ্রন্থ'। বিরাটী মানব সম্প্রদায় প্রকাশিত (১৪০৫)।*

"শ্রীশ্রীহরিপুরুষায় নমঃ"

'বিরক্ত-পূজা'—ভূমিকা

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী প্রশস্তি

মহারাজ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ভূমিকা লিখিতে পাঠাইয়াছেন এক অভাজনের কাছে। উদ্দেশ্য, ঐ ছলে কৃপা করা। ভক্তদ্বারে কৃপার প্রবাহ আসিল মনে করিয়াই, স্বকীয় অযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়াও মাথায় তুলিয়া লইয়াছি।

গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। সবটা বুঝি নাই। শেষভাগে নাদবিন্দুর আলোচনায় প্রবেশ পথ পাই নাই। পথ খুঁজিয়াছি। প্রথমাংশ চমৎকার। পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ঠিক যেন আমাকেই বলিতেছেন। এই উপদেশগুলি এই সময় আমার নিজের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। যেন অযাচিত কৃপাবর্ষণ।

"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি"—কথাটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন শ্রীগীতায়। ব্রহ্মচর্যব্রত পালন দ্বারা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ইহা তো নিজ মুখেই বলিলেন। ব্রহ্মচর্য একটি অখণ্ড শিক্ষা। ইহাতে শরীর ব্যধিহীন হয়, মন প্রশান্ত হয়, আত্মা পরমাত্মার সন্ধানে, আস্বাদনে ডুবিয়া আনন্দময় হয়। একাধারে দৈহিক, মানসিক, আত্মিক শিক্ষা ইহা আমাদের আর্য ঋষিদের মহাদান।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু দুর্দিন ঘুচে নাই। পাশ্চাত্য রাজত্ব গিয়াছে কিন্তু মানস রাজ্য হইতে তাহাদের আধিপত্য যায় নাই। "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার"—বলিয়া পশ্চিমী গুরুপাটের দুয়ারে ধর্ণা দিতে এখনও ছুটিয়াছি সবাই, প্রাচ্যের মহাগৌরব অবদানের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই এখনও।

আধুনিকেরা নিজ বুদ্ধির গর্বে পশ্চিমী আদর্শে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া সহস্র সহস্র চিকিৎসালয়, চিকিৎসক ও পুঞ্জীভূত নব নব ঔষধে বস্তু বোঝাই করিতেছেন—মানুষের শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে উহার অংশমাত্র ব্যয় করিয়াও যদি কিশোর-কিশোরীদের জীবনে ব্রহ্মচর্যশিক্ষার প্রবর্তন করা যায় তাহা হইলে যে মানুষ কত সহজে ওজস্বী হইয়া সমাজকে সুখময় করিয়া তুলিতে পারে তাহা আমাদের জাতীয় ধুরন্ধরগণ ভাবনাতেও স্থান দেন না।

শরীরে ব্রহ্ম-শক্তি যদি স্থির থাকে, তবেই মানুষ পূর্ণ মানুষ। কৌমার বয়সে, গার্হস্থ্যজীবনে, সকল সময়ই সংযমের শুভফল অনস্বীকার্য। সমগ্র আর্য শাস্ত্র ভরিয়া ব্রহ্মচর্যের মহিমা কীর্ত্তিত আছে। ইহার প্রণালী, উদ্দেশ্য ও ফল সুদূরপ্রসারী। এই তত্ত্ব জানিয়াই প্রাচীনেরা কহিয়াছেন—যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা। ব্রহ্মশক্তিহীনতায় মানুষ পশুপর্যায়ে চলিয়া যায়। ইহার পূর্ণতায় দেবত্বে উন্নীত হয়। এই একটি তপস্যা সকল তপস্যার মূলস্থানীয়।

'বিরক্ত পূজা'। ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। মহামিলন মঠ, বরাহনগর, কলকাতা, ১৩৬৪।

বিগত শতাব্দীব শেষভাগ হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর "ব্রহ্মচর্য কর, করাও" দুই আদর্শ নিজেতে মূর্তিমান্ করিয়া অনুগতদের প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহা-উদ্ধারণ উদ্দেশ্যে হরিনাম ও ব্রহ্মচর্য এই দুইটি প্রভু বন্ধুসুন্দরের মহাদান। ব্রহ্মচর্য দ্বারা জীবনগঠন ও হরিনাম দ্বারা হরি-আস্বাদন—ইহাই জীবনের চরম প্রয়োজন।

এই দুই মহাদান লইয়া শ্রীওঙ্কারনাথজী শ্রীহরিপুরুযের মহাউদ্ধারণ করিতে চলিয়াছেন। কলিপাবন হরিনাম রোলে দেশ মাতাইয়া তুলিতেছেন। বহু পুস্তিকায় নামের মাহাত্ম্য জীবকে অবগত করাইয়া দিতেছেন। এই গ্রন্থে ব্রহ্মচর্যের জয় গাহিয়া বিরক্তগণের চিত্তে একটি মহাসম্পদের সন্ধান জাগাইতেছেন।

গ্রন্থকার শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ সাধনভাণ্ডার হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুম চয়ন করিয়া এই পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন। পূজাব পাত্র করিয়াছেন বিরক্তদিগকে—যাঁহারা বিষয়েব প্রতি বিরক্ত ও শ্রীভগবচ্চরণে অনুবক্ত তাঁহাদিগকে, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত লইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি বিরাগী ও ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজের প্রতি অনুরাগী তাঁহাদিগকে। পূজ্য ও পূজক দুই ধন্য।

সুদীর্ঘ সুতীব্র তপস্যার অতুলনীয় ফল। সেই ফল অকাতরে বিলাইয়া জগজ্জীবের সেবার ভার লইয়া যিনি নিজেই পূজার পরম পাত্র হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং পূজক সাজিয়াছেন। সুতরাং এ পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, ইহাতে আব সংশয়ের অবকাশ কোথায়। পূজারী বিরক্ত-বাবাদের পূজা করিয়া প্রীত হইতে বলিয়াছেন। মহাপূজার অর্ঘ্য মাথায লইয়া আমি জীবাধম কৃতার্থ হইয়াছি। পূজার শেষ মিষ্টি প্রসাদটুকুতেও বঞ্চিত হইব না—এই আশায় যাত্রীগণের কাছে হাত পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছি। জয় জগদ্বন্ধু। অলমিতি। ❑

শ্রীগৌর পূর্ণিমা, গৌরাব্দ ৪৭০

অমৃতময় স্তম্ভ চতুষ্টয়

শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব স্মরণে

পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলায় রাজাপুর গ্রাম। ঐ স্থানে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। লোকে তাঁকে 'বুড়া গোসাই' বলিত। গ্রামের লোকের আপদ্-বিপদে তিনি ছিলেন সহায় সম্পদ্। তাঁহার নাম উমাচরণ চক্রবর্তী। তিনি সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

'বুড়া গোসাই' উমাচরণের পত্নী সাধ্বী চিন্তামণি দেবী। কাশী বিশ্বনাথের কৃপায় চিন্তামণির গর্ভে জন্মেন এক পুত্ররত্ন। রাসপূর্ণিমার দিনে তাঁহার আবির্ভাব। পিতা উমাচরণের শাক্ত ধারা, মাতা চিন্তামণির শৈব ধারা ও রাস-রজনীর বৈষ্ণব ধারা—এই তিনধারার ত্রিবেণী সংগমে প্রকট শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন।

উপনয়নের দিন আচার্য নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য দুর্গাপ্রসন্নের কানে ব্রহ্মগায়ত্রী দান করেন। ব্রহ্মগায়ত্রী পাওয়ার পরই

গুরুদেবকে বলিলেন, "কানের কাছে অনবরত মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি।" আচার্য নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া পিতা-মাতাকে বলিলেন, "তোমার ছেলের কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইতেছে। এখনই উহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা দিতে হইবে।" সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন আচার্য বৈদিক দীক্ষার পরই দিলেন তান্ত্রিক দীক্ষা, দিলেন যথোচিত শিক্ষা। বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা-শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী মিলনের ফল দুর্গাপ্রসন্ন।

দুর্গাপ্রসন্ন এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আমার উপনয়নের দিন হইতে দশ দিন আচার্যদেব আমাকে একটি মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রের তাৎপর্য এই—সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্য সাধনাই তপস্যা। জগতে যত কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে তার মূল সত্য। সত্য অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই।" এই সত্যের সাধনায় সিদ্ধ দুর্গাপ্রসন্ন।

দুর্গাপ্রসন্নের মনে বাল্যকাল হইতেই মানুষের দুঃখ দূর করার প্রবল আর্তি জাগ্রত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের মত তিনিও ভাবিতেন কী উপায়ে সকল প্রকার দুঃখের হস্ত হইতে মানুষ নিষ্কৃতি লাভ করতঃ প্রকৃত শান্তি লাভ কবিতে পারে।

সুদুর বরিশাল জেলার রাজাপুর গ্রাম হইতে কিশোর দুর্গাপ্রসন্ন ছুটিয়া আসিলেন আসামের কোকিলামুখ স্বামী নিগমানন্দজীব শান্তি আশ্রমে। সদ্‌গুরু বলিলেন, "যদি জীবকে একান্তই নিত্য শান্তি দিতে চাও তবে নিজে প্রথমে সাধন-ভজন কর। জিতেন্দ্রিয় হও। সব বিষয়ে কামনা শূন্য হও; পরনিন্দা পরেব দোয আলোচনা সর্বতোভাবে ত্যাগ কব। কোনদিন ভুলক্রমেও কাহারও দোষারোপ করিও না। এই সব ঠিক হইলে তখন তুমি সেবার অধিকারী হইতে পারিবে। সেবার দ্বাবা মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে সক্ষম হইবে।"

আচার্যের কাছে পাইলেন সত্যশিক্ষা, সদ্‌গুরুর নিকটে পাইলেন সেবাশিক্ষা।

বরিশাল জেলায় তখন স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল উন্মাদনা। আন্দোলনের পুরোধা 'ভক্তিযোগ' লেখক দেশপ্রেমিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁহার প্রভাবে দুর্গাপ্রসন্ন লাভ করেন স্বাদেশিকতা ও জীবন নীতি। ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় জ্ঞান দুর্গাপ্রসন্নের গভীব সাধনার পরিপক্ব ফল।

দুর্গাপ্রসন্ন শ্রীগুরু-সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা। এই সঙ্ঘ-সৌধের ভিত্তিমূলে চারিটি স্তম্ভ—সত্য, সেবা, নীতি ও ধর্ম। অমৃতময এই চারি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরু-সঙ্ঘ অমরণ-ধর্মী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধনে কৃতকার্যতা লাভ করিবেই।

বৈষ্ণবীয় ভক্তিধারার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার অন্তঃসলিলা কৃপার আনুগত্যে দুর্গাপ্রসন্ন নিশ্চিতভাবেই জানিয়াছিলেন কলিযুগে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন। তাই তিনি পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন, "সত্য, সেবা, নীতি ও ধর্ম অবলম্বন করিয়া প্রতিটি কর্মের মধ্যে ইষ্ট স্মরণ, ইষ্ট মন্ত্র জপ ও তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তনের আশ্রয় নিতে হইবে।"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
জয় জগদ্বন্ধু হরি।। □

* *পরিব্রাজকাচার্য বর শ্রীশ্রীমদ্দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবে শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব স্মরণিকা 'শ্রীগুরুসংহিতা'য় প্রকাশিত। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৯১)। শ্রীগুরু সংঘ। নাকতলা।*

* * *

... একদিন এইখানে▼ বসেই তাঁকে দেখেছিলাম স্থূলদৃষ্টিতে। আজও তাকে দেখছি নিমীলিত নেত্রে। চোখ বুজে দেখাই আসল দেখা। ভারতীয় দর্শন এই চোখ বুজে দেখার সাধনাই করে চলেছে চিরকাল। পরমহংসজীর কথা শুনেছি, ডাক দিলেই "মা কালী দেখা দিতেন।" ওনার গুরুদেব স্বামী নিগমানন্দজী ছিলেন ভারতের অন্যতম সাধক; আপনাদের গুরুদেব উত্তরাধিকারী সূত্রেই সাধক—নিজের সাধনায় মহাসাধক। দুর্গা ওনার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, না উনিই দুর্গার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তা বলতে পারবো না, তবে উনি ছিলেন দু'এর সম্মিলিত রূপ।...

▼ *শ্রীগুরু সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় আশ্রম, নাকতলা, কলিকাতা - ৪৭। ১০ই ভাদ্র, বুধবার (২৭শে আগষ্ট, ১৯৭৫ সাল) ১ম সাধু ভাণ্ডারা উৎসবে।*

---

* *শ্রীগুরু সঙ্ঘের মুখপত্র 'শ্রীগুরু সঙ্ঘ' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য হইতে সংগৃহীত।*

'শ্রীগীতা'—অভিমত

'গীতাশাস্ত্রী' জগদীশচন্দ্র ঘোষ স্মরণে

গীতার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে যদি লালসা থাকে তবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা পাঠ করুন। শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ্। যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে। জগদীশচন্দ্র কেবল শ্রীগীতার আলোচনাই করেননি। এই মহাগ্রন্থ নিয়ে তিনি করেছেন জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা। আর সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

গীতার একখানি ইংরেজী সংস্করণও জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'। এই গ্রন্থে একাধারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলার সুন্দর প্রাণস্পর্শী আলোচনা করেছেন কৃষ্ণনিষ্ঠপ্রাণ গ্রন্থকার জগদীশচন্দ্র। সবই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থকে শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। বাংলা ভাষায় এইরূপ আলোচনা বিরল। কৃষ্ণানুরাগ-ভরা ব্যাখ্যানে সচ্চিদানন্দের প্রেমতত্ত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পুণ্যপুরুষ জগদীশচন্দ্র তাঁর গীতার সঙ্গেই অমর হয়ে আছেন। তাঁর কীর্তির মতই তিনিও চিরজীবী। ❑

* *'শ্রীগীতা'। জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। কলকাতা - ৭৬।*

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক বক্তৃতা-মালা

।। মহাপ্রভু ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।।

২৯, ৩০, ৩১শে জুলাই, ১৯৮৩

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ স্মারকমালা—এই বক্তৃতা। বৈষ্ণব জগতের তিনি একজন অতুলনীয় পুরুষ ছিলেন। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এত দান আর কেহ করেন নাই। বাঙালী আত্মভোলা জাতি। প্রায় তাহারা মহৎ ব্যক্তিদের ভুলিয়া যায়। বৈষ্ণব আচার্য নাথ মহাশয়ের দান যে আমরা ভুলি নাই ইহা প্রশংসনীয়। রাধাগোবিন্দ নাথের একখানি স্মারকগ্রন্থ হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে আমি ঋষি বলিয়াছি। যে ঋষির দানের কিঞ্চিৎ মাত্র এই বক্তৃতায় আলোচনা করিব।
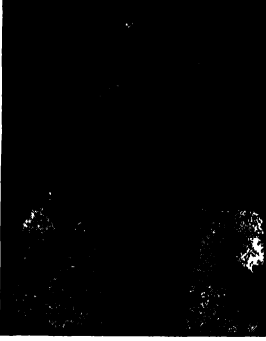
বিষয়ের নাম ঃ **"মহাপ্রভু ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"**। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ গৌড়ীয় ভক্তগণের জীবন-দর্শন। জীবন-দর্শন কথাটি কী তাহাই আগে বলিতেছি।

আমরা যে সংসারে চলি আমাদের নিকটবর্তী ব্যক্তি ও বস্তুসকল দেখিয়া শুনিয়া চলি, শুধু তাই নয়, যাহা দেখি না, তাহা লইয়া কতগুলি বিশ্বাস ও ধারণা লইয়া চলি। প্রত্যেকটি মানুষেরই একটি জীবন দর্শন আছে। প্রত্যেক জাতিরও একটি জীবন-দর্শন আছে। ব্যক্তিজীবন-দর্শন অধিকাংশই জাতীয় জীবন-দর্শন হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আর কতকাংশ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যোগ করা। একটি জাতির জীবনের বিশ্বাস ও ভাবনার যে অংশ উজ্জ্বল ও গভীর তাহাই ধর্ম। প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই একটা জীবন-দর্শন আছে। জীবনের যাত্রাপথে চলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজের জীবনদর্শন, খানিকটা তার প্রতিবেশীর জীবনাদর্শ, খানিকটা তার ও অন্য ধর্মের ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক; থাকিলেই জীবন সুন্দর ও সঙ্গতি সম্পন্ন হয়। ⌟ ___

(পরবর্তী অংশ মূল প্রবন্ধটি শ্রীমন্‌মহানামব্রতজীর 'ব্রহ্মসূত্রম্ ঃ গৌবপরভাষ্য ঃ দ্বাদশসূত্রী' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।)

মানবপ্রেমিক শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহাপ্রয়াণে শোকবার্তা *

৬.৯.১৯৯১

জয় জগদ্বন্ধু হরি

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন চট্টগ্রামের একজন ডাক্তার প্রমুখাৎ শুনিলাম, নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী আর নাই! বুকের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ধাক্কা লাগিল, তাহাতে জিহ্বা টানিয়া বলিলাম—"কবে? কী বলিতেছ! না না, কী বলিতেছ?"

** প্রয়াত নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী স্মরণে 'শ্রদ্ধার্ঘ্য'। মৌলভী বাজার, বাংলাদেশ, ১৯৯৩*

এই দুঃসংবাদ পাইবার দুইদিন পর তাঁহার লেখা একখানা পত্র পাইলাম, মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে লেখা। যেন অশ্রুসিক্ত লেখা! সারা দেশের কথা—বিশেষ করিয়া 'ভোলা'র কথা—অত্যাচারিত নরনারীর দুর্দশার কথা। এমন প্রাণভরা মানবপ্রেমিক দ্বিতীয়টি দেখি নাই আমার সুদীর্ঘ জীবনে, যেন গীতার কর্মযোগী মূর্তিমান্।

গোস্বামী সন্তান, গৌরগতপ্রাণ। তিনি আমাকে লইয়া যখন গৌর-পরিক্রমায় ছিলেন তখন ধরা পড়িয়াছে গৌর বলিতে কি অনুরাগ! মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্ততঃ বিশ বার ইংরেজের জেলে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। আচার্য বিনোবা ভাবের ও পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্তের সহকারী সেবাব্রতী। তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাইয়া আমার জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। তাঁহাকে হারাইয়া অন্তর হাহাকার করিতেছে। তাঁহার শূন্যস্থান সুদীর্ঘকাল খাঁ-খাঁ করিবে। আমরা দুর্ভাগা-বাঙালী—এমন একটা রত্নহারা হইলাম।

গৌরসুন্দরের শান্তিময় পাদপদ্মে তিনি থাকুন পরা শান্তিতে।

"সত্যং পরং ধীমহি"

'পণ্ডিত মহাশয়' শ্রীযোগী যোগীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী স্মরণে

বর্তমান যুগে ধর্ম বস্তুটি বহু কুটিল আলোচনায় জর্জরিত। ধর্মের আচার-আচরণ লইয়া বহু সমালোচনা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মতত্ত্ব কতগুলি যুক্তিতর্ক বা বিচারের বিষয় নহে। ধর্মের মূর্তি হইল ধর্মনিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য। সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধ পুরুষদের জীবন-সাধনা লইয়া অনুধ্যান করিলেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি কী তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই ধর্মহীনতার অন্ধকারময় যুগে সত্যসন্ধ মহামানবগণের জীবন-বর্তিকাই জীবের পরম সম্পদ্। নিত্যধামগত ঋষিকল্প যোগীন পণ্ডিত মহাশয়ের পুণ্য জীবনকথা আমরা একশত বৎসর পরে অনুশীলন করিতেছি তাঁহার বীর্যবন্ত তপস্যার ভাস্বর রশ্মি আজ আমাদের তমসাচ্ছন্ন জীবন-পথকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে এই আশায়। আজিকার এই পবিত্র চেষ্টায় যাঁহারা অংশীদার প্রকৃতই তাঁহারা সমাজকল্যাণব্রতী। কেবল ভোগরত দেহের প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্রের সমাধানেই মানুষ বাঁচে না, আত্মার ভোগ্য সম্পদ্ চাই-ই চাই। সেই সম্পদের উৎসের সঙ্গে নিত্য যুক্ত ছিল পুণ্যশ্লোক যোগীন পণ্ডিত মহাশয়ের পূত জীবন-স্রোতস্বিনী।
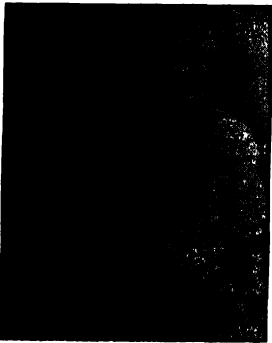
পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে প্রচুর আত্মিক সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিত মহাশয়।

তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ দুইটি—এক ঃ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্মলাভ, ও দুই ঃ মাত্র সাত বৎসর বয়সে সদ্‌গুরু দর্শন ও কৃপালাভ। পণ্ডিত মহাশয়ের পিতৃদেব ছিলেন শ্রীবৃন্দাবনবিহারীজীর মন্দিরে শাস্ত্রব্যাখ্যাতা বরণীয় ভাগবতভূষণ শ্রীনিমাইচরণ চক্রবর্তী। তাঁহার সহধর্মিণীও ছিলেন হরিভক্তিপরায়ণা পতিব্রতা সতী। এই গৃহে জন্মলাভ পূর্ব সুকৃতির দ্যোতক। দ্বিতীয়তঃ গুরুলাভ ধ্রুবের মত বয়সে অযাচিতভাবে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী স্বেচ্ছায় আসিয়া তাঁহার চিহ্নিত শিষ্যকে মাত্র সাত বৎসর বয়সে সজাগ করিয়া দেন—"ধূলোখেলা আর কতদিন খেলবি?" এই কথা বলিয়া পথিমধ্যে দীক্ষা দেন ও মন্ত্র মুখস্থ করাইয়া শক্তি সঞ্চার করেন। প্রাক্তন জন্মের পবিত্র সংস্কার প্রভূত না হইলে কি ইহা সম্ভবপর হয়!

সারাটি জীবন পণ্ডিত মহাশয় সাধনা কবিয়াছেন। সিদ্ধ হইয়াও সাধনা ছাড়েন নাই জীবনকল্যাণের জন্য। তাঁহার সাধন-জীবনে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। বিপদে আপদে সদ্‌গুরুর অতন্দ্র পাহারা ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। নবদ্বীপ হইতে টোলের পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিতে সাঁইথিয়ার হরিমণির বাড়ীতে অতিথি হন। গভীর রাত্রে বারবনিতা হরিমণি আসে তাঁহাকে ভুলাইতে। ঠিক সেইক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। তিনি আসিয়া শুধু শিষ্যকেই বক্ষা করেন নাই, ভ্রষ্টা হরিমণির জীবনেও আনেন নাটকীয় পরিবর্তন।

এই মহাসাধকের জীবনের আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গোপনীয়তা, আত্মপ্রচারে বিমুখতা। এক মহান্ তপস্বী, অথচ সামান্য স্কুল শিক্ষক। অতি নিকটবর্তীরাও অনুধাবন করিতে পারিতেন না তাঁহার অনুভূতির গভীরতা। কেহ একবিন্দু টের পাইল কি সে স্থান হইতে পলায়ন। আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কতখানি নির্লোভ হইলে ইহা সম্ভব তাহা চিন্তনীয়।

যোগীন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় শ্রীগুরুকৃপাবলে ও স্বকীয় তীব্র সাধন বলে জগজ্জননীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। হাঁ, এই যুগেও ঈশ্বর দর্শন হয়। যোগীন্দ্র পণ্ডিত এই চর্মচক্ষে নিষ্পলকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন জগৎ আলো করা মা দুর্গার অপ্রাকৃত রূপৈশ্বর্য। যিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন "যোগীন্! সারা জগজ্জোড়া আমারই রূপ।" এই দর্শন ও বাণী শ্রবণ তাঁহার জীবনের প্রথমাঙ্কে। শেষাঙ্কে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর। স্বগণে কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন সুরধুনীর তীর ধরিয়া। দোলপূর্ণিমায় নবদ্বীপ গিয়া যোগীন পণ্ডিত গভীর রাত্রে আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছেন — "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়"— এই আশার বাণী স্মরণ করিয়া, তখনই দর্শন পান পাগলকরা শচীনন্দনের কীর্তন নটন বেশ।

এই সকল কৃপা লাভের ফলে তিনি হইয়াছিলেন প্রথমে যোগী, মধ্যে মাতৃসাধক, শেষে পরম বৈষ্ণব। পরিণামে—এই তিনের এক মিলনময় সমন্বয় মূর্তি। তাঁহার চিত্তের বৃত্তিসমূহ হইয়াছিল সমাহিত। তিনি 'মা' বলিয়া ডাকিতেন জগন্মাতাকে, প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতেন গোপীজনবল্লভকে। এই মহাসমন্বয় তাঁহার বিচারলব্ধ নহে, জীবনব্যাপী তপস্যার পূর্তিতে সম্প্রাপ্ত।

তাঁহার তপস্যার কথা জনসাধারণ জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার তপস্যার ফল লাভে

উপকৃত হইযাছে অগণিত নরনারী। নিজ প্রিয় পুত্রের বিনিময়ে তিনি অপরের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও সত্য কথা।

ব্রজভাবে সাধন ও নদীয়ার ভাবে কীর্তন—ইহা তাঁহার শেষ জীবনের শেষ কথা। "আর কিছু করিতে পার বা না পার কলিযুগে ঈশ্বরের নাম কীর্তন সাধন কর"—ইহা তাঁহার চরম বাক্য। ব্রজগৌর দু'টি লীলার ভজনে তিনি ছিলেন সতত তন্ময়।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন—সম্মুখে মহাপ্রলয় বা ধ্বংসের যুগ। ইহার কবল হইতে জীবজগৎকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছেন বহু ঋষিকল্প মহামানব। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদেরই অন্যতম। মহাপ্রলয়ের আঘাতের পর আসিবে মহাউদ্ধারণ যুগ—শান্তির যুগ। যোগীন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় সেই কল্যাণযুগের একজন শ্রেষ্ঠ দিশারী। তাঁহার শতবার্ষিকী স্মরণে, পূত চরণে প্রণতিপূর্বক ঋষির ভাষায় প্রার্থনা জানাই—

"অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।।"

মহাউদ্ধাবণের দিকে, বিশ্বকল্যাণের পথে আমাদিগকে চালাইয়া লও। তোমার সমন্বয়মূর্তির আলোক দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হউক।

কৃপার্থী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

পুণ্যশ্লোক শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীজী স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ নামে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ ছেলেবেলা পড়িয়াছিলাম। গুরু-শিষ্যের সঙ্গে এত গভীর মিলনানন্দের কথা ভরা পুঁথি আর কখনও পড়ি নাই। মনে হইত যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

বালিগঞ্জে এক ভক্তগৃহে আছি। নিকটবর্তী আর এক বাসায় এক বক্তৃতা সভা হইবে। ভক্তের নাম যোগেশ ব্রহ্মচারী। তিনি কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ব্রহ্মচারী শিষ্য। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মাইল। তাঁহাকে দর্শন করিলাম ঐ স্থানে গিয়া। খুব দর্শনধারী নহেন। শুভ্র বসনাবৃত ছিপছিপে মানুষটি। হাতে একখানি ছড়ির মত দণ্ড। তাঁহার কথা যখন শুনিলাম চমৎকৃত হইয়া গেলাম। তিনি উচ্চশিক্ষিত। ফিলসফিতে M. A.। প্রায় সারা পৃথিবী বেড়াইয়াছেন। তিনি রাশিয়া গিয়া লেনিনের সঙ্গে দেখা

করিয়াছেন। লেনিনকে ভারতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। লেনিন মন্তব্য করিয়াছেন—"এত সুন্দর সোস্যালিষ্ট আপনার ধর্মের Foul Application ইণ্ডিয়াকে একেবারে অধঃপতিত করিয়াছে।" এসব কথাগুলিতে চমৎকৃত হইলাম।

তিনি 'ধর্মাঙ্কুর'—এই ছদ্মনামে বৌদ্ধদের সঙ্গে মিশিয়াছেন। 'জামির আলি'—এই ছদ্মনামে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছেন। 'যোশেফ' ছদ্মনামে খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করিয়াছেন। এক সাধুর ছদ্মবেশে তিনি সম্প্রতি নেপাল ঘুরিয়া আসিয়াছেন। মনে হইল একটি আশ্চর্য মানুষ।

তিনি একটি বিরাট্ Student Federation-এর Secretary। ঐ ছাত্র সংস্থা স্থাপিত হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের একটি বিরাট সভায় ঐ সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার পূর্ণ নাম—নিখিল ভারত বিদ্যার্থী সম্মেলন। তিনি 'Student' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন।

তিনি বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটি 'গ্রাম্য যোগাশ্রম' করিয়াছেন। ইহা ভারতের স্বাধীনতা দিবসের কিছু আগের ঘটনা। অল্প সময়ের আলাপে তাঁহার সঙ্গে হৃদ্যতা হইয়া গেল। গৈরিক পরিহিত স্বামীজী হইলে হয়ত খুব সহজে হইত না। কিন্তু সাদা কাপড় পরা ব্রহ্মচারীজী বলিয়া সহজেই একপ্রাণতা হইয়া গেল। যোগাশ্রম স্থাপিত হওয়ার অল্পকাল পরেই আমাকে ডাকিলেন। বক্তৃতা করিব—বক্তৃতার বিষয়—"ধর্মের সমন্বয়"। যোগাশ্রমের আশ্রমে সাক্ষাৎ ধর্ম সমন্বয় জীবন্ত দেখিলাম। বক্তৃতা আর কী করিব—হিন্দুশাস্ত্রে যত দেবদেবী আছেন সাধু মহাপুরুষ আছেন, সকলেই সেখানে সুশোভিত। চর্মচক্ষে দেখা যায় বহু দেবদেবী, আর ব্রহ্মচারীজী গুরুকৃপালব্ধ জ্ঞান চক্ষে দেখেন একজন। সত্যসত্যই বহুর মধ্যে একত্বের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা আমি আর দেখিনি।

তিনি একবার আমাকে তাঁহার চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য পূর্ণানন্দ স্বামীর তিরোভাবের পর। তিনি সেখানকার আচার্য বা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। সেখানে আরও কয়েকজন মনীষীর সঙ্গে পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ১৫ কিংবা ১৬ বছরের বড় হইবেন। সম্পর্কে বা ব্যবহারে সম বয়সের মত, সখ্যভাব ছিল। তিনিও গীতা চণ্ডী নিয়ে থাকায় আমিও তাই নিয়া আলোচনা করিতাম বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টতা আরও প্রবল হইয়াছিল।

ক্রমে জানিলাম তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম গুজরা নয়াপাড়া। ঐ গ্রামে আমি গিয়াছি।' কবি নবীন সেনেরও জন্মস্থান ঐ গ্রামে। আদ্যাপীঠের অন্নদা ঠাকুরের জন্মস্থানও ঐ একই গ্রামে। চট্টগ্রাম জন্মস্থান হওয়ায় তিনি বিপ্লবী সূর্য সেনের সহপাঠী ও অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তীর তিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র সংগ্রহে তিনি কয়েকবার লণ্ডনে জার্মানে গমনাগমন করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রাম্য যোগাশ্রমের লক্ষ্য ভারতীয় সাম্যবাদ—বহুত্বের মধ্যে একত্বের দর্শন। তাঁহার

** শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী জন্ম শতবর্ষ স্মরণিকা। সম্পাদক ঃ শ্রীমৎ কেশব ব্রহ্মচারী। নবদ্বীপ, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-যোগমায়া আশ্রম প্রকাশিত।*

স্বরাজ্য-সাধনার ছিল দুইটা দিক্। বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। অন্তরে সকল ইন্দ্রিয়ের অধীনতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থিতপ্রজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠালাভ। এই অন্তর-বাহিরের দ্বিমুখী সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনব্রত।

আশাকরি তাঁহার অনুবর্তিগণ এই ধারারই সম্প্রসারণ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে ভারতের স্বাধীনতা এখনও পর্যন্ত হয়নি। আত্মিক স্বাধীনতা তো এখন সুদূর পরাহত। ❑

'বাণীবিজয়'—দু'টি কথা

শ্রীজীবনবালাদেবী স্মরণে

ত্রিশ বছর পূর্বে দিল্লী শহরে কালী মন্দিরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলাম। অবস্থান করিতেছিলাম বন্ধুবর নিত্যরঞ্জন গুপ্তের বাসায় করোলবাগে। তাহার ঘরে এই বাণী-বিজয় গ্রন্থখানি প্রথমে হাতে আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঠ করিয়া ফেলিলাম। মনে হইল যেন রসের সিন্ধুতে অবগাহন করিলাম।

বন্ধুবর নিত্যরঞ্জনের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীবৃন্দাবনে ভজনে আছেন। দিল্লীর কাজ শেষ করিয়া বৃন্দাবন গেলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া হাড়াবাড়ী কুঞ্জে লেখিকা জীবনবালা দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলাম।

স্নেহে, কারুণ্যে, বিদ্যাবত্তায়, ভজন-তন্ময়তায় এমন একটি মাতৃমূর্তি আর দেখি নাই। "মা" বলিয়া ডাকিলাম। পুত্রস্নেহে আদর করিলেন। পরে বহু বার তাঁহার ভজনময় জীবনের সান্নিধ্য পাইয়াছি। যতই নিকটতর হইয়াছি ততই মুগ্ধ হইয়াছি—তাঁহার গাম্ভীর্যে ঔদার্যে ও লীলাস্বাদন মাধুর্যে।

মা জীবনের অধিকাংশ সময় নিত্যলীলা স্মরণে থাকিতেন। এখন মর্তলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন। যাইবার কালে আমাকে বলিয়াছিলেন—'বাণী-বিজয়' তুমি এত ভালবাসিয়াছ এজন্য এ গ্রন্থখানি তোমাকে দিলাম, তুমি আর একবার ছাপিও।

দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে মাতৃ-আদেশ পালিত হয় নাই। আজ সেই ভাগ্য হইল। দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভাগ্যলাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ধর্মপরায়ণ শ্রীচম্পালাল আঞ্চালিয়া মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়াছেন। তাঁর সহৃদয়তায় চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর শ্রীচরণে তাঁর ও পরিবারস্থ সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

মা যেমনটি লিখিয়াছিলেন তেমনটিই ছাপাইলাম। একটু পরিবর্দ্ধন করিলাম গ্রন্থের নামটির। নাম ছিল বাণী-বিজয়। আমি তার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছি "কবি জয়দেবের বিজয়-বাণী।"

* *'বাণীবিজয়' বা কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দমাধুরী, শ্রীমতী জীবনবালাদেবী, ২য় সং ১৩৮৭*

আশা করি ইহাতে মাধুর্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইল এরূপ কিছু নিত্যলীলাগতা মা মনে করিবেন না।

মা! তোমার গ্রন্থ তোমাকেই দিলাম, নিত্যলীলা হইতে হস্ত প্রসারণপূর্বক গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর যেন শ্রীগুরুমুখ-প্রার্থনা জীবনে সার্থক হয়।

"বন্ধু বন্ধু গীতি, কুঞ্জ-সেবা-স্মৃতি
স্ফুরুক হৃদে নিরন্তর।"

তোমার আদরের-

মহানাম। ❑

শ্রীমা আনন্দময়ী স্মরণে

অনেক ছেলেবেলাকার কথা। সাহাজাতপুরে মার কথা শুনিয়াছি। সাহাজাতপুর ঢাকা জিলার একটি গ্রাম। সেখানে একটি প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী আছে। মা কালীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। বিদ্যাকূট সাহাজাতপুরের নিকটবর্তী গ্রাম। ঐ গ্রামের একটি অল্প বয়স্কা মেয়ে প্রায় প্রত্যেকদিন আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে বসিয়া থাকিত। চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিত। তখন একটি প্রকাণ্ড সাপ আসিয়া তার মাথার উপর ফনা বিস্তার করিয়া থাকিত। ঐ সাপ কারও কোন ক্ষতি করিত না। লোকে আশপাশ দিয়া যাতায়াত করিত। মেয়েটিকে লোক বলিত সাহাজাতপুরের মা। সকলে বিশ্বাস করিত মেয়েটিই কালী মা।

মেয়েটির পিতৃমাতৃ দেওয়া নাম ছিল নির্মলা। যেমন নাম তেমন রূপ। যেমন রূপ তেমনি গুণ, তেমনি তার স্বভাব। নামটি যথাযোগ্য হইলেও ঐ নাম ঢাকা পড়িয়া গেল সাহাজাতপুর মায়ের নামে। মন্দিরে মায়ের আশেপাশে খুঁবই ভীড় জমতে লাগিল। একদিন সকালবেলা মা জগদীশ নামে একটি ছেলেকে নিজের বা হাতখানি বাহির করিয়া দেখাইছিল। সে দেখিল হাতখানা ভাঙ্গা, দুই টুকরো। সে জিজ্ঞাসা করিল, মা! এ কেমন করিয়া হইল? মা বলিল, সিদ্ধেশ্বরী মাকে আগে জিজ্ঞাসা করিয়া আস। সকলে আসিয়া দেখিল মার হাতখানি ভাঙ্গা। মায়ের গায়ে সোনাঁর অলঙ্কার ছিল। সকলেই দেখিল সোনার অলঙ্কার একখানিও নাই। মায়ের হাতখানি ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার বাহির করিয়া নিয়াছে। গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া দেখিতে লাগিল। কালীমার হাত যে স্থানে ভাঙ্গা নির্মলা মার হাতও সেই স্থানে ভাঙ্গা। চুরি হইয়াছে রাত্রি কালে। নির্মলা মা রাত্রি কালে মন্দিরে থাকিত না। বাড়ী গিয়া থাকিত। সকলের বিশ্বাস হইল সিদ্ধেশ্বরী মা আর সাহাজাতপুরের নির্মলা মা একই—অভিন্ন। ক্রমে মায়ের নাম ও ভক্ত সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

এরই মধ্যে মায়ের বিবাহও হইয়া গিয়াছে পাড়ার লোকের সনির্বন্ধ অনুরোধে। সকলে বলিয়াছে এই মেয়েটিকে বিবাহ দিলেই তার স্বভাব পরিবর্তন হইবে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বলিলেন, বিবাহ হইলেই স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। ব্রাহ্মণের নাম রমণীমোহন আচার্য। রমণীমোহন বলিলেন,

এই কন্যা তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয়। নির্মলা স্বামীকে নূতন নামকরণ করিয়া ডাকিল ভোলানাথ। যেন ভাবে-সাবে বুঝাইলেন তিনিই কালী মা। দুই দিন পর সামস্পর্শ। পশ্চিমবঙ্গে বলে বৌ-ভাত। ঐ দিন ভাল ভাল রান্না হয়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব খাইতে আসিলে বৌ নিজে পরিবেশন করে। ঐ দিন শত শত লোক লাইন ধরিয়া খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় নূতন বৌ একহাতে অন্নের থালা, অপর হাতে হাতা নিয়ে পরিবেশন করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ বৌ-এর মাথার ঘোমটা পড়িয়া গেল। পূজনীয় লোকদের সামনে নূতন বৌ-এর মাথার ঘোমটা পড়িয়া যাওয়া গর্হিত ব্যাপার। তাঁহার বগলের নীচ হইতে আধখানা হাত বাহির করিয়া দ্রুত ঘোমটা ঠিক করিয়া দিয়া হাতখানি লুকাইয়া ফেলিল। যাহারা এই দৃশ্য দেখিল তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিল। আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছি। শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। এখনও বিশ্বাস করি।

ছেলেবেলা হইতেই মাকে দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটে নাই। অনেক বৎসর পর দেখা হয়। তার মধ্যে মায়ের অলৌকিক কাহিনী অপূর্ব ভাব-স্বভাবের কথা দিক্- বিদিক্ ছড়াইয়া গিয়াছে। তখন আর তিনি সাহাজাতপুরের মা নাই। তখন তিনি আনন্দময়ী মা। এই নাম কে রাখিয়াছেন ঠিক জানি না। অপূর্ব নাম। এবার মা খড়্গমুণ্ডধারী নন। তিনি আনন্দময়ী। তিনি তখন দিব্য দ্রষ্টা।

ফরিদপুর শহরে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে আমরা তখন ব্রহ্মচারী। সেখানে দিবারাত্র নামকীর্তন হয়। আমরা নাম কীর্তন করি ও ভিক্ষার দ্বারা সেবা করি। ফরিদপুর শহরে বীরচন্দ্র সেন নামে একজন নামকরা উকিল ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গন আসিতেন। একদিন তিনি তাঁহার মেয়েকে সাথে নিয়া আঙ্গিনায় আসেন। মেয়েকে দেখিলে মনে হয় খুবই ভক্তিমতী। দীনেশ সেন তার কন্যাকে আনন্দময়ীর শিষ্য বলে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কন্যা আমাদিগকে বলিল, তাঁর গুরু-মা আনন্দময়ী এই মাঘ মাসে একমাস প্রয়াগে কল্পবাস করিবেন। মায়ের ইচ্ছা এই সময় আমাদের দেশের নানান স্তরের সাধু-সন্ন্যাসীরা মায়ের কাছে বাস করিয়া মায়ের নামকীর্তন করেন। কল্পবাসের সময় দিনগুলি যেন সাধু-সন্ন্যাসী সাথে অবস্থান করিতে থাকেন ইহাই মায়ের ইচ্ছা। আমরা পাঁচ-ছয়জন রাজী হইলাম। এক ভয়, প্রয়াগে তখন ভীষণ শীত। আর এক চিন্তা আমাদের ভাড়া।

উকিল বাবুর কন্যা বলিলেন, সেই চিন্তা আপনাদের করিতে হইবে না। প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব। তাহাই হইল। রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমাদের পাথেয় ও কয়েকটি মোটা-মোটা কম্বল আসিল। আমরা যথা সময়ে রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে আরো অনেক যাত্রী। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড মাঠ। অনেক ভক্ত-সজ্জনের সমাগম। ত্রিপল দিয়ে অনেক ঘর তৈয়ারী করা আছে। আমাদের কোন ঘর তৈয়ার করতে হইল না। তার মধ্যে আমাদিগকে একটা ঘরে থাকিতে দিলেন। আমরা ঘরের মধ্যে জগদ্বন্ধুর আসন পাতিলাম। আমাদের সনে খোল করতাল ছিল। সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে লাগিলাম। তখন শীত একটু কম। তাই মধ্যাহ্ন হইতে বিকাল পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম কত সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে নিজ নিজ ইষ্ট মূর্তি বসাইয়া পূজার্চনা করিতেছে। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। অনেক ভক্তেরও সমাগম হইয়াছে। তাদেরও অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। এত হিন্দুস্থানী ভক্ত মায়েদের সমাগম দেখিয়া অবাক লাগিল।

ইহারা মায়ের ডাকে বা স্বেচ্ছায় কল্পবাস করিতে আসিল। প্রবল শীত ছাড়া পারিপার্শিক অবস্থা দেখিয়া খুবই ভাল লাগিল।

এখন সকলেরই ইচ্ছা মায়ের দর্শন করে করিব। মায়ের থাকিবার স্থান আমাদের নিকটেই। আমাদের মুখামুখী হইতে পাঁচ-সাত মিনিট দূরে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যারতির সময় শুনিলাম মা আসিয়াছেন, — দেখিলাম মা দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। মা দাঁড়াইয়া প্রভু জগদ্বন্ধুর আরতি দর্শন করিতেছেন। মা অপলক নেত্রে আরতি দেখিতেন। অপলক মানে সত্যি সত্যিই অপলক। একেঁবারেই পলক হীন ভাবে তাকাইয়া থাকিতেন। আরতি শেষ হইলে আমরা প্রণাম করিতে গেলে হাত জোড় করিয়া বাবা বাবা অভিবাদন জানাইলেন। ❑

মায়ের বাণী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মায়ের বাণীচর্চা

"হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

মানব জীবনের লক্ষ্য শ্রীহরিব চরণ প্রাপ্তি। পশু আর মানুষ এইখানে তফাৎ। পশুর জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, নিজের জীবনের সামান্য সুখ ছাড়া।

পশুর জীবন কত সীমাবদ্ধ। তাহার দেহের সুখ, আহার ও বংশ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুযের জীবন কত বড়। কত আশা আকাঙক্ষা উচ্চাভিলায পূর্ণ মানবের জীবন। সেই অভিলায সমূহের শ্রেষ্ঠ হইল পূর্ণতা প্রাপ্তি। পূর্ণতা লাভ আর শ্রীহরির চরণ লাভ একই কথা।

শ্রীহরিচরণ প্রাপ্তি খুব সহজ কথা নহে, তবু সকলেরই সকল প্রচেষ্টা, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে একই বস্তুর প্রতি। তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁহারা শ্রীহরিচরণ লাভ বা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সাধনা করিয়াছেন। অন্যান্য যুগে সাধনপদ্ধতি ছিল কঠোর কঠিন। অল্পায়ু কলিহত জীবের পক্ষে সাধন সহজ ও সরল। শাস্ত্র বলেন "কলৌ তৎ হরিকীর্তনাৎ।"

কলিযুগের মানুযের সেই লক্ষ্যবস্তু মিলিবে হরিকীর্তন দ্বারা। হরিকীর্তন দুই প্রকার ঃ হরি-কথা কীর্তন ও হরিনাম কীর্তন। প্রাচীন যুগে হরিকথা কীর্তনের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীশুকদেব। হরিনাম কীর্তনের সর্ব প্রধান আচার্য শ্রীনারদ। শুকদেবের ধারাকে বলে বৈয়াসকী কীর্ত্তন। বৈয়াসকী কীর্তনকারী হরির কথা বলেন ভাযণ দ্বারা। নারদীয় কীর্তনকারী হরিকথা প্রকাশ করেন বীণা প্রভৃতি সুরযন্ত্র দ্বারা। সুতরাং দেখা গেল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায় হইল হরিকথা। তাই তো মায়ের বাণী—

"হরিকথাই কথা।"

এই হইল পরম সত্য তত্ত্বটিকে অন্বয়মুখে বলা ; আবার ব্যাতিরেকমুখে বলিতেন —

"আর সব বৃথা ব্যথা।"

হরিকথা ছাড়া আব যে-কোন প্রসঙ্গই করেন না কেন তাহা নিরর্থক। ঢেকীতে ধান ভাঙ্গিয়া চাল তৈয়ারী হয়। ধান না দিয়া কেহ যদি তুষ দিয়া ভানতে থাকে তবে তাহা যেমন পণ্ড শ্রম, হরিকথা ছাড়া আন কথায় কালক্ষেপ কেবল পণ্ডশ্রম — তাহা বৃথা।

শুধু বৃথা না বলিয়া আর একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন— ব্যথা। মানুষ সুখ খুঁজে, কিন্তু পায় না। পায় কেবলই দুঃখ জ্বালা তাপ ব্যথা। এই ব্যথায় মানুষ নিয়ত জর্জরিত। এই ব্যথা দূর করিতে প্রত্যেক মানুষ প্রতিনিয়ত যত্নবান। কিন্তু কিসে যে ব্যথা দূর হইবে তাহা জানে না, তাই ব্যথা ঘুচে না।

ব্যথার কারণ হইল অনিত্য বিষয়ে আসক্তি। শ্রীহরিই একমাত্র নিত্য বস্তু আর সকল বস্তুই অবস্তু, অনিত্য বস্তু। এই সকল অনিত্য বস্তুর প্রতি চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে পরিণাম শুধু দুঃখ, তারা ব্যথা। সুতরাং দুঃখের মূল কারণ হইল অসার বিষয়ে, হবিকথা ভিন্ন অন্য কথায় মগ্ন হইয়া থাকা। তাই বলা হইয়াছে হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা শুধু বৃথা নয়, সকল ব্যথার মূলীভূত হেতু।

আমরা যদি সর্বদা হরিকথা হইতে অন্য বিষযে মন যুক্ত না করি ও একমাত্র হরি বিষয়ে ডুবিয়া থাকি তাহা হইলে জীবন সার্থক হয়, আনন্দের আগার হয়।

হরি বলিতে বুঝায় যিনি সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন ও প্রেম দিয়া মন হরণ করেন।

"হরি শব্দের বহু অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন।।"

সকল অমঙ্গল চিরতরে দূর করিয়া দিবার মত অসীম শক্তি হরির আছে। হরিকথারও আছে। হরি আর হরিকথা অভিন্ন।

হরির আর একটি কথা হইল প্রেমদান। বিশ্বজীবকে নিজের জন করিয়া লইতে পারে। এই প্রেম দান করেন হরি। হরিকথার মহাশক্তিতে জীব প্রেমলাভে ধন্য হয়। হরি শুধু প্রেম দেন না। মন যাহাতে চঞ্চল হইয়া অন্য দিকে যাইতে না পারে সেইজন্য যাহাকে প্রেম দেন তাহার মনটিও হরণ করিয়া আপন করিয়া লন। মনটা যদি হরির হইয়া গেল তবে আর ইতর বস্তুর স্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট হইবে কে?

হরি এত দয়ালু ও হরিকথা এত মহা সামর্থ্যবান যে তার বলে মনঃপ্রাণ হরির হইয়া যায়। প্রেমধন লাভে বিশ্বজীব আপন হইয়া যায় আর সর্ববিধ অমঙ্গল চিরতরে বিদূরিত হয়।

এই হরিকথায় সর্বদা মাতিয়া থাকা ও অন্য সকলকে মাতাইয়া রাখাই মা আনন্দময়ীর সমগ্র জীবনের সাধনা। মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখ পাইতাম। মা বাবা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিয়া দিতেন। মায়ের আনন্দময়ী নাম সার্থক। জয় গৌর। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'মাতৃকৃপা হি কেবলম্'—সম্পর্কে
(মাতৃকৃপাধন্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রশস্তি)

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় লিখিত 'মাতৃকৃপা হি কেবলম্' গ্রন্থখানি নয়নগোচর হইল। ঠিক গ্রন্থ নহে, ভক্ত-সাধকের নিজ জীবনে অনুভূত অভিজ্ঞতার নিখুঁত অভিব্যক্তি। কোথাও যেন ছেদ নাই, বিরতি নাই, নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারার মত। মাঝে মাঝে শিরোনামের বার্তাও নাই। নির্বাধ স্রোতের মত চলিয়াছে অভিজ্ঞতার অনুভূতির নির্যাস প্রস্রবণ।

লেখকের ধারণা ঐকান্তিকী, ভক্তিপ্রবাহ বিশুদ্ধ, জীবনার্ঘ্য কৃপাপূত। বর্ণনার প্রাঞ্জলতা ও তৎসহ অনুভূতির গভীরতা পাঠককেও ডুবাইয়া দেয়, কখনও বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলায় "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে"। অখণ্ডানন্দজীর স্নেহদৃষ্টি, পুলিনের সঙ্গে ব্রজে শ্রীবঙ্কুবিহারীর অপূর্ব দর্শন, প্রসাদী মাল্য লাভ, বিষ্ণুপুরের কালী মন্দিরের "ঢাকার কালী" মা আনন্দময়ীর করুণামাখা চাহনি প্রাপ্তি—কত পরীক্ষা, কত তপস্যা, কত আর্তি, অবশেষে বাঞ্ছিত দীক্ষা লাভ। এসব কাহিনী নয়, হোমানলের মত পবিত্র শিক্ষা—পাঠকের চিত্তকেও ভাস্বর করিয়া তোলে। তারপর মায়ের কত নির্দেশ, কত উপদেশ, কত আদেশ শিরোধারণ করিয়া, সর্বপ্রকারে অহংশূন্য হইয়া মন্দিরে মন্দিরে পূজা, চণ্ডীপাঠ, তীর্থদর্শন, কীর্তন-নর্তন, ভাবাবেগে মূর্চ্ছা—প্রত্যেকটি কার্যে মায়ের করুণাধারার স্পর্শ লাভ—এক একটি নিরুপম চিত্র পাঠককে মুগ্ধ করে।

মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে নিভৃতে মিলন—লেখক যার নাম দিয়াছেন 'প্রাইভেট', তাহা স্মরণ করিতে পাঠকেরও মনে হয় যেন কোমল মাতৃ-অঙ্কের আদরে ডুবিয়া গিয়াছে। তারপর ভক্তসাধক সঙ্গে কেদার-বদ্রী দর্শন, সঙ্গে কানাই ও রামদাসের অযাচিত যত্নপূর্ণ সেবা—সকলই মায়ের অসীম করুণার নিদর্শন।

সুদুর্গম পাহাড়ী পথে ধ্বংসের ধাক্কায় অতলস্পর্শী গহ্বরে পতন ও অক্ষত দেহে রক্ষা—মনে হয় একেবারেই অলৌকিক।

মাতৃকৃপা যেন তাকে সর্বদা বর্মের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে—এই অনুভব প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবনপথে কল্যাণদ পাথেয়। সাধক ব্রহ্মচারীজী মাতৃভক্ত অথচ কৃষ্ণগতপ্রাণ। ইহা এক অপূর্ব সমন্বয়। মায়ের কোলে কৃষ্ণগোপাল ইহা তাহার নিত্য ধ্যানের ধন। এই দ্বন্দ্বের যুগে তাঁহার এই দান তাহাকে 'ভূরিদা' পদবাচ্য করিল। দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া নিয়ত ভজন-কুশলে থাকিয়া আরও দান করুন মাতৃকরুণাসম্পদ্—এই প্রার্থনা করি শ্রীহরির পাদপদ্মে।

---

* *'মাতৃকৃপা হি কেবলম্'। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণকুটীর, হিজুলী, রাণাঘাট।*

মায়ের কৃপা এ জীবাধমও পাইয়াছে। তবে কৃষ্ণানন্দ পাইয়াছেন সিন্ধু, আমি এক বিন্দু। পরিমাণে ভেদ কিন্তু আস্বাদনে সিন্ধু বিন্দু একই।

মহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, কলিকাতা -৫৯
ভাদ্র, ১৩৯০

কৃপাসিক্ত
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

প্রাণপ্রিয় শ্রীজীবনকৃষ্ণদা স্মরণে

অতি অল্প বয়সে জীবনকৃষ্ণদা আসিয়াছিলেন ফরিদপুর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গনে। জীবনকৃষ্ণদার পিতৃপরিচয় বেশী কিছু জানি না। দাদার পরিচয় দিব। দাদার পরিচয় দেওয়া বড় কিছু দোষের নহে, বরং গৌরবের। শ্রীমুকুন্দকে দিয়া নরহরির পরিচয় শ্লাঘনীয় নয় কি?

জীবনকৃষ্ণদার দাদা শ্রীনরেশ চট্টোপাধ্যায়। দাদা যশোহর জেলার একটি হাইস্কুলের খ্যাতিমান হেড মাস্টার ছিলেন। সব ছাড়িয়া ছুটিয়া আসেন ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে। শ্রীপ্রভুর দর্শন সৌভাগ্য হইবার পর সেবাভাগ্য লাভ করেন। দাদার পদাঙ্ক অনুসরণেই আসেন জীবনদা। নরেশদার শেষ জীবনের নাম হয় সমাধিপ্রকাশ। তাঁহার লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ আছে। একটি ছোট গ্রন্থ 'শুদ্ধা মাধুরী'। সেই গ্রন্থটি হইতে একটুখানি উদ্ধৃতি দিলেই নরেশদা কিরূপ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

'শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম ভাগবত উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।" (১১/২৯/১০) "আমার ভক্ত সাধুগণের আশ্রিত পুণ্য দেশ আশ্রয় করিবে।"

"'আঙ্গিনা' বা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের 'শ্রীঅঙ্গন' ভক্তসাধুসেবিত এইরূপ একটি পুণ্য দেশ, সুতরাং জীবনের ইহা আশ্রয়রূপে অবলম্বনীয়। আঙ্গিনার কথা একটু বলি—

'আঙ্গিনা' সাধনার একটি নৈমিষারণ্য, সর্বাহুতিরূপ বৈরাগ্যের একটি যজ্ঞস্থলী, শুদ্ধা মাধুরীর একটি কেলিকুঞ্জ লীলাস্থলী। তাহার নবঘনশ্যাম চালিতা-ছায়ায় মরমমোহন মুরছায় আঁধার গেহ জিনি কনকলাবণী কায়ায় যে 'মুগ্ধ মাধুরী' ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আঙ্গিনার গগন পবন বন উপবন আমোদিয়াই কত শত শত উনমত ভকত-ভ্রমর ভোর করিয়া চলিয়াছে। শূন্য বনের কোল হইতে পুণ্য আঙ্গিনা ফুটিয়া উঠিল কাহার গরবে? বন্ধুবিনোদিনী আঙ্গিনার কমকণ্ঠে

* *'শ্রীমৎ জীবনকৃষ্ণদাস বাবাজীর শুভ জন্মশতবার্ষিকী স্মরণিকা', ১৪০৫-০৬। শ্রীশ্রীসমাধি মন্দির, বরাহনগর।*

ওই যে রাগিণী কলিতা হইয়া উঠিতেছে—"তোমারি গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" আঙ্গিনা-গরব বন্ধুবিনোদের অমিয়-কথা মরম-বাণী লীলা-লাবণী। তাঁহার লীলা-লাবণ্য-ধাম শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে কত রূপেই না মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, কত ভাবেই না গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, কত অজস্র ফোয়ারাতেই না স্ফুরিত হইয়া লুটাইতেছে, কত মন্দাকিনী ধারাতেই না নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছে! মহেনদা প্রমুখ বন্ধুবিনোদ-কণ্ঠে বিদ্যাপতির সুরে ওই যে আঙ্গিনা-নাগর পিরীতি-বারতা ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে ফুটিতে বিভোর হইয়া বলিতেছে—

"সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?।
বন্ধু পিরীতির, অনুভব বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
কত হুঁ অবধি হাম, বন্ধু নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
কত না মাধুরী পরাণে রাখনু,
পরাণ ন জুড়ান গেল।।
বচন অমিয় রস, কত কত শুনলু,
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঙায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেলি।।"

আমা হেন অভাজন সেই "নিতুই নব নব" পিরীতি অভিনব, মাধুরী অভিনব, কী হবে? শ্রীধরের ন্যায় থোড়-কলা-মূলা দিয়াই আমার ভোগরাগ নৈবেদ্য নিবেদন করা ছাড়া আর যে গত্যন্তর নাই।...শ্রীধরের থোড়-কলা-মূলায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সমাধি শ্রীহীন, সে আশা সে ভরসা আদৌ করে না এবং করিতেও চাহে না। সে তাহার ভালবাসার বিনিময়ে বন্ধুবিনোদের তৃপ্তি বিনোদন করিতেও পারিবে না...।

বন্ধুমাধুরী গৌরমাধুরী কৃষ্ণমাধুরীর মধুর কথাগাঁথা বলিতে ভালবাসি তাই বলিতেছি। ভক্ত-ভ্রমরগণের তাহা যে শ্রুতিসুখকর, 'শ্রবণমঙ্গল', 'হৃৎকর্ণরসায়ণ' হইবে সে আশা-ভরসা সে কামনা-বাসনা নাই।'"

এই কথা কয়টির উপরেই পাঠ করিয়াই রসজ্ঞ পাঠক নরেশ চট্টোপাধ্যায় (সমাধিপ্রকাশ)-এর অন্তরটি জানিতে পারিবেন।

নরেশদার তৃতীয় কনিষ্ঠ জীবনকৃষ্ণদা। জীবনকৃষ্ণদা যখন শ্রীঅঙ্গনে আসেন তখন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর দশাশ্রয়ে। শ্রীঅঙ্গনে প্রেমদাসজী, গোপীদাসজী, উদ্ধারণদাসজী প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবগণের প্রবল স্নেহভাজন হইয়াছিলেন অতি অল্পকাল মধ্যেই। তাঁহার মাতৃদত্ত নাম ময়না, প্রথমে ঐ নামেই পরিচিত হইলেন। তাহার পর কীর্তন কালে তাঁহার অশ্রু কম্পন ভাবদশা দর্শন করিয়া সম্প্রদায়াচার্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী নাম রাখেন 'ভাবলহর'। শ্রীঅঙ্গনের সকলেরই তিনি প্রীতি ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন।

দীক্ষা লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। তখন শ্রীঅঙ্গনে যাঁহারা ছিলেন কেহ দীক্ষা দিতেন না।

ময়না রামদাস বাবাজীর নাম শুনিয়াছিলেন। একবার কোন কীর্তন বাসরে তাঁহার দর্শন-ভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে রাধিকা গুপ্তকে রামদাস করিয়াছেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। রাম বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ। রামদাস সর্বদা নিতাইভাবে বিভোর। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল রাধিকা গুপ্ত। তাঁহার জীবন নিতাইময় হইয়াছিল প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপাস্পর্শে ও শিক্ষায়।

ময়না রামদাস বাবাজীর অনুসরণে চলিলেন। নবদ্বীপ যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন। শুধু দর্শন নহে তাঁহার অসীম কৃপাভাজন হইলেন।

ময়না সঙ্কল্প করিয়াছিল বাবাজী মহারাজ যাচিয়া দীক্ষা না দিলে তিনি দীক্ষা চাহিবেন না। বাবাজী মহাশয়ের কৃপাসান্নিধ্যে অনেক বছর থাকিবার পর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাগ্রহণের পরমুহূর্ত পর হইতেই তিনি চারদিন প্রায় বাহ্যজ্ঞান-হীন ছিলেন। বাবাজী মহাশয় নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে সেবা করিয়াছিলেন। এই ভাগ্য আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। নাম রাখিয়াছিলেন জীবনকৃষ্ণ। কৃষ্ণই যাঁহার জীবন অথবা জীবনই যাঁহার কৃষ্ণময়। গুরুকৃপায় জীবনকৃষ্ণদা প্রায় আর একটি রামদাস হইয়া উঠিয়াছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক 'সিপাইকা ঘোড়া'।

রামদাস বাবাজীর অগণিত ভক্ত। তাহার মধ্যে তিনজন সর্বপ্রধান রজনীদাস, গৌরাঙ্গদাস ও জীবনকৃষ্ণ। অগ্রবর্তী দুইজনার পরেই শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থান হইয়াছিল। জীবনকৃষ্ণ প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বাবাজী মহারাজের সঙ্গসান্নিধ্যে ও প্রীতিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনটি সম্পূর্ণ গুরুময় হইয়াছিল।

অনেক লোক জীবনকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনি যখন নানা স্থানে ঘুরিয়া কীর্তন প্রচার করিতেন তখন অনেক সজ্জন তাঁহাকে খুব দৃঢ়ভাবে ধরিতেন দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য। গুরু-সান্নিধ্যে গুরু প্রকট কালে গুরু-আসনে বসা অন্যায় এইজন্য তিনি প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করিতেন। একদিন সংকোচ ত্যাগ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"ভক্তগণ দীক্ষা চায়, তাহাদের কী বলিব?" বাবাজী মহাশয় যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি।

বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ভরতের রাজত্ব করা জান তো? শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে তবে তিনি রাজত্ব করতেন। এ পথটি হচ্ছে তাই। গুরুত্বের অভিমান ছেড়ে মন্ত্র দিতে হবে। ঐ যে কথা আছে—'তোমারি গরবে গরবিনী হাম'। তোমার কৃপায় আমার সব কিছু। এইরূপ নিরভিমান না হয়ে গুরু হলে পতন হয়ে যাবে। গুরুর ধর্ম গৌরব-আত্ম-শ্লাঘা বর্জিত।"

গুরুদেবের এই বাক্য কয়টিকে ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির লক্ষে রাখিয়া জীবনদা গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সন্তানেরা বহু। তাঁহার একজন শিষ্যা আমাকে শ্রদ্ধা করেন। তাহাকে দেখিলেই আমার মুখে আসে জীবন, জীবনকে ভাবিলেই ভাবি শ্রীরাম রাধারমণ। তাহার সঙ্গে মনে জাগে বাবাজী মহাশয়ের শেষ বিদায় কালে হাহাকার যুক্ত কথাটি—"হা বন্ধুসুন্দর!" এই শেষ উচ্চারিত কথাটি তাঁহার প্রিয়জনেরা কীরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন তাহা

ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

শ্রীরামদাস বাবাজী বলিতেন, তাঁহার কুষ্ঠিতে আছে "বন্ধু সহায়"। তাঁহার জীবনে বন্ধুসুন্দর ছিলেন পরম সহায়। আমার কুষ্ঠিতে সেইরূপ কিছু না থাকিলেও আমি বাবাজী মহাশয়কে আমার ভজন-পথের একজন শ্রেষ্ঠ সহায় মনে করি। একদিন অনেক কথার মধ্যে আমাকে বলিয়া ছিলেন "মহানাম! হেডমাষ্টার একজনই। তৈয়ার করিল এক জনে, ভোগ করিতে দিল আর একজনে।" বাবাজী মহাশয়কে আমি 'দাদা' বলিতাম, তিনি 'মহানাম ভাই' বলিতেন। তাই হিসাব করিয়া দেখিলাম, জীবনকৃষ্ণ আমার 'ভাইর ব্যাটা।' বাপকে বেটা। তবুও সেইরূপ কোনদিন ভাবি নাই। ভাই ভাই-ই ছিলাম। কখনও কাকা বলিয়া ফেলিতেন। আমি ছিলাম তাঁহার শ্রদ্ধেয় ভাই। তিনি ছিলেন আমার প্রাণের ভাই। তাঁহার বিরহ-বেদনা অন্তরে জাগরুক রয়।

জয় জগদ্বন্ধু হরি।। ❑

'শ্রীগুরুরচনা সংগ্রহ'—অভিমত

শ্রীমৎ বৈষ্ণবচরণদাস বাবাজী প্রশস্তি

'শ্রীগুরু-রচনা সংগ্রহ'—একখানি সুন্দর ছোটগ্রন্থ। এক ভক্ত আমার হাতে দিল আস্বাদন করিবার জন্য। পাঠ করিয়া আনন্দাপ্লুত হইলাম। রচনাগুলি শ্রীবৈষ্ণবচরণদাসজীর। তিনি বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের পরম অনুগৃহীত শিষ্য।

শ্রীবাবাজী মহাশয়ের শিষ্যবর্গের হৃদয়ে গুরুনিষ্ঠা অতি গভীর, তন্মধ্যে বৈষ্ণবচরণদাসজীর গুরু-অনুরাগ নিবিড়তম। তাঁহার জীবনে শ্রীগুরুসেবা ছাড়া যেন আর কোন কাজই ছিল না। যখন যেখানে যাহা ঘটিত সকলই তিনি ইচ্ছাময় শ্রীগুরুর করুণার অভিব্যক্তি রূপে দেখিতেন। সুখদ বিষয় তো বটেই, অতি দুঃখদায়ক ঘটনাকেও তিনি শ্রীগুরুর কৃপার দান মনে করিতে পারিতেন। দৈহিক বা মানসিক অতি গুরুতর আঘাতকেও তিনি নিশ্চিতভাবে মনে করিতেন কৃপাময় গুরুদেব তাহার বিপথগামী চিত্তকে আঘাত দ্বারা শিক্ষা দিলেন। জীবনে যাহা কিছু ঘটনা সবই করুণাঘন শ্রীগুরুর কারুণ্যের প্রকাশ, এইমত অনুভব-সামর্থ্য তাঁহার ছিল। ইহা উচ্চস্তরের ভক্তের লক্ষণ। অতি সুদৃঢ়ভাবে তিনি হৃদয়ে অনুভব করিতেন যে তাঁহার চলার পথে প্রতি মুহূর্ত তাহাকে পবিত্র পথে তাঁহার অভিলষিত পথে প্রতি পদক্ষেপে তিনি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সত্তাটি সর্বতোভাবে শ্রীগুরুর হস্তে সমর্পিত। ঠাকুর মন্দিরে গভীর ভাবে ধ্যানাবিষ্টই থাকুন অথবা কোন অন্ধকার

** 'শ্রীগুরু-রচনা সংগ্রহ' (২য় সংগ্রহ)। ১৪০০। শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবচরণদাস বাবাজী (পঞ্চতীর্থ)-এর ষষ্ঠ সংবাৎসরিক তিরোভাব তিথি। শ্রীশ্রীভাগবত নিবাস, বরাহনগর (শ্রীপাঠবাড়ী)।*

প্রকোষ্ঠে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনই করুন, সকল কর্মকেই একান্তভাবে শ্রীগুরুসেবা বলিয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে জানিতেন। এই জন্য শ্রীবৈষ্ণবচরণের জীবনটি আদর্শ বৈষ্ণবতার বিগ্রহ-স্বরূপ ছিল। আজ তিনি চোখের অন্তরালে। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতাম বা লেখা পড়িতাম তখন যেরূপ ভাবিতাম আজও তাহাই ভাবি।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ যখন হঠাৎ আড়ালে লুকাইলেন তখন তাঁহার বিরহ-বেদনা সহ্য করা সকলের পক্ষেই নিদারুণ কষ্টদায়ক হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণদাসজীর গুরু-বিরহ-বেদনার অনুভূতি ছিল ঠিক ব্রজ-বিরহীদের অনুরূপ। সে বিরহের তীব্রতার ভাষা দেওয়া যায় না। প্রতি বৎসর তাঁহার তিরোভাব দিবসে তিনি যে কীরূপ ব্যাকুল হইতেন তাহা কিঞ্চিৎ তাঁহার লেখনীতে পরিব্যক্ত।

তিনি অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করিতেন অপরোক্ষানুভূতিতে, দর্শন করিতেন তাঁহার শ্রীগুরুবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দের করুণাধারার প্রকট মূর্তি। তিনি শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের সঙ্গমাধুর্যে ব্রজানন্দে নিমজ্জিত থাকিতেন (ব্রজানন্দে নিমজ্জিতং বন্ধুসুন্দরসঙ্গতম্) আবার শ্রীরাধারমণ-কৃপাস্নাত হইয়া তিনি নদীয়া নীলাচল লীলামধুরিমার সমুদ্রে ডুবুরী হইয়াছিলেন। এই দুইটি ধারার মিলিত মূর্তি হইয়া তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-বিনয়-ভূষায় বিভূষিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেন। বিরহাশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত করিয়া সংকীর্তনপদ্মে মধুব্রতের মত ভাববিহ্বল হইয়া থাকিতেন। শ্রীগুরুদেবের এই অসংখ্যাত গুণোপেত মূর্তি নিয়ত বৈষ্ণবচরণের চিত্তপটে সংযুক্ত হইয়া রহিত। সত্য সত্যই শ্রীবাবাজী মহাশয়ের লীলাকীর্তন ছিল পাষাণ-হৃদয়দ্রাবি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণভজন কী প্রকারে হইবে তাহা শ্রীবৈষ্ণবচরণ এই গ্রন্থে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগুরু সাক্ষাৎ হরি হইলেও তাঁহাকে কী ভাব লইয়া পূজার্চনা করিতে হইবে তাহা শ্রীল দাস গোস্বামীর "মুকুন্দপ্রেষ্ঠ" ও শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই ঐরূপ আচরণ করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিজে যোগ্য পুরুষ হইয়াও কখনও তিনি ঈশ্বরাসনে বসেন নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণবচরণ শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের নাম করিয়াছেন। ইহা না করিলেই ভাল হইত। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কাহাকেও শিষ্য করেন নাই। কোন শিষ্য তাঁহাকে ঈশ্বরের আসনে বসায় নাই। তিনি নিজ পরিচয় দিয়াছেন—'হরিপুরুষ'। শ্রীহরির আসনেই চিরবিরাজমান ছিলেন—আছেন। বাবাজী মহারজের মত সুযোগ্য ব্যক্তির একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও প্রভুবন্ধু হরি তাঁহাকে শিষ্য করেন নাই। শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লইতে ইঙ্গিত করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন চিরকাল রামদাসজী সেই পত্র পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেন। মহাপ্রভু যেমন কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, প্রভু হরিও সেইরূপ। ইহা ভগবত্তার লক্ষণ। বন্ধুসুন্দর কোথাও দীক্ষা গ্রহণও করেন নাই। এরূপ একটি পুরুষ জগতে সুদুর্লভ।

এই গ্রন্থে বৈষ্ণবচরণ একটি অভিনব সংবাদ দিয়াছেন—মন্ত্র ও মন্ত্রদাতা অভিন্ন। এ কথাটা নূতন। পূর্বে শুনি নাই। শ্রীবাবাজী মহারাজ একদিন কীর্তন শেষে নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন 'মন্ত্র ও মন্ত্রদাতা অভিন্ন'। কথাটি শুনিয়া অবধি ভক্তবর অনেক চিন্তা করিয়াছেন অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন নিশ্চয়ই শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যাইবে। গুরু-মুখ-বাক্য কখনও ভুল হইবে না। হঠাৎ

তিনি আবিষ্কার করিলেন শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভে'। যেখানে শ্রীগুরুতত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"যো মন্ত্রঃ সঃ গুরুঃ সাক্ষাৎ" যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, সাক্ষাৎ গুরু। এই কথাটি পাইয়া বৈষ্ণবচরণ উল্লসিত হইলেন। হইবারই কথা। গুরুবাক্যে কিঞ্চিৎ সংশয় জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। 'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ' মন্ত্রদাতা ও মন্ত্র এক। প্রত্যেক ভক্তেরই এটি প্রণিধানযোগ্য কথা। গ্রন্থখানির মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে। সর্বাধিক যে-বিষয়টি চিত্তমুগ্ধ করে সেটি হইল—বৈষ্ণবচরণের গুরুনিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা ভক্তমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয়।

গ্রন্থখানি পাঠে সকলেই আনন্দ পাইবেন। হৃদয়ে গুরু-ভক্তিরসের আস্বাদন হইবে।

জয় গৌর। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসজী স্মরণে

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসজী নিত্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সাধক জীবনে তিনি মহাসম্পদ্ লাভ করিয়াছিলেন। তাহা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন লেখনী মাধ্যমে, পরবর্তীদের জন্য। তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মরণিকা।

অতি অল্প বয়সে তাঁহার হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হয়। সংসার ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করেন। তারপর শ্রীগুরুর কৃপাপুষ্ট অঙ্গুলি হেলনে অন্তরে প্রবল লালসা জাগে—শাস্ত্রজ্ঞ হইবার।

গ্রাম্য পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যা; বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী পুঁথিখানাও কখনও খুলেন নাই। তিনি ত্যাগী জীবনের যাবতীয় সাধন-ভজন, ধ্যান-পূজা, জপ-সেবাদি নিত্য কর্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরু-কৃপাসিক্ত বিদ্যানুরাগ বলে, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, তর্কতীর্থ ও বৈষ্ণববেদান্তানুগ ভক্তিতীর্থ হইয়া ছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় গভর্ণমেন্ট পরীক্ষায় উজ্জ্বলভাবে উত্তীর্ণ হওয়া—ইহা শুধু বিস্ময়কর নহে, গুরুনিষ্ঠা ও শাস্ত্রনিষ্ঠার অনন্য-সাধারণ পরম আদর্শ।

অশেষ গুণে ভূষিত হইয়াও বৈষ্ণবোচিত পরম দৈন্যবিনয়ে গুরুদত্ত বৈষ্ণবচরণদাস নামটি সার্থক করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার বাহ্যিক পরিচয় ছিল অতি সহজ সাধারণ, কিন্তু আন্তর পরিচয় ছিল নিবিড়। আমাকে তিনি 'কাকা' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেব নামাচার্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় নিবিড় স্নেহে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া। বাবাজী মহাশয় মহাশক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শক্তির মূল উৎস যে কোথায়, সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবৈষ্ণবচরণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহা জানিয়া অতি বাস্তবরূপে তাহা অনুভব করিতেন। তাই বলিতেন ও লিখিয়াছেন, "বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু প্রভু জগদ্বন্ধু এবং শ্রীরাধারমণ দীক্ষাগুরু।" কথাটা কিন্তু আরও একটু গভীর। সাধারণতঃ লোকে আগে দীক্ষাগুরু করে, পরে শিক্ষাগুরু করে। বাবাজী মহাশয়ের বেলা একটু বিপরীত। শিক্ষাগুরুই তাকে নিখুঁত ভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন—তিনি দীক্ষা দিতেন না বলিয়া ঐ কার্যের জন্য অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিজ

শ্রীমুখের উক্তি—"তৈয়ারী করলো একজন, ভোগ করলো আর একজন।"

গুরুকরুণালব্ধ দিব্য অনুভূতি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবচরণ তাহা জানিতেন বলিয়া তাঁহার 'কাকা' ডাকের মধ্যে গতানুগতিক অনুকরণ ছিল না, অনুভবীর মত নিবিড় স্নিগ্ধতা ছিল। তাহা আমাকে মুগ্ধ করিত।

শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে ও 'পরমার্থ কথা' নামক তাঁহার লিখিত গ্রন্থে কতিপয় সুচিন্তিত নিবন্ধে তাঁহার অতি সুনিপুণ শাস্ত্র-রহস্য-উদ্‌ঘাটন সামর্থ্য দর্শন করিয়া আমি তাঁহার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট ছিলাম। আজ নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইলেও সেই স্নেহ অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁহার মত রত্ন হারাইয়া আজ বেদনাপূর্ণ প্রাণে এই কথা কয়টি লিখিলাম। শ্রীগুরু-আনুগত্যে তাঁহার দিব্য স্বরূপ স্বামিনীর দাসীর দাসিত্বাভিমানে কুঞ্জসেবায় জয়যুক্ত থাকুক। জয় জগদ্বন্ধু হরি। ❑

'সুগম সাধন পন্থা'—অভিমত

দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শিবানন্দ সরস্বতী প্রশস্তি

... মনের আনন্দে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি। মনে হইল, জীবন ভরিয়া পড়িবার মত গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নামে দণ্ডিস্বামী বিশেষণ দেখিয়া মনে হইয়াছিল গ্রন্থে জ্ঞানযোগ রাজযোগের কথা বিশেষভাবে আছে। কিন্তু পরা ভক্তির সাগর-সঙ্গমে গ্রন্থের পরিণতি দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।

গ্রন্থে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। নাম ও নামীর অভিন্নতার তত্ত্ব অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। মঙ্গলময় হরিনাম সঙ্কীর্তনের কথা প্রাণের ভাষায় কথিত হইয়াছে। সাধন-পথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সমূহ সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। কল্যাণময় কথা প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষায় পরম চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বামিজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার কৃপায় বহু পথভ্রষ্ট নরনারী শান্তি-রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি তাঁহার সাধনলব্ধ পরম সম্পদ্। পরা ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনরহস্যে গ্রন্থে অনুপ্রবেশ সত্যসত্যই চমৎকারী। জ্ঞানপথের পথিকদের ভক্তি-সমুদ্রে অবগাহন দৃশ্য বড়ই জীবন-রসায়ন। তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ "ক্রন্দনে আনন্দ" পাঠ করিলে পাষণ্ডের নয়নও সিক্ত হইয়া উঠে। লেখার মধ্যে লেখককে জীবন্ত দেখা যায়। যাঁহারা সাধন-পথের পথিক এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা পরম উপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইবেন। সার্থকতপা স্বামিজীর করুণাশীষে সাধন-সরণি সুগম হইয়া উঠিবে। ❑

---

* *'সুগম সাধন পন্থা' (৪র্থ খণ্ড)। শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক : শ্রীঅনিলকুমার মাইতি। ছোটবাজার, মেদিনীপুর। ১ম সং ১৩৬৪।*

'ভক্তি-মাধুরী'—ভূমিকা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন প্রশস্তি

গ্রন্থখানির নাম 'ভক্তি-মাধুরী'। ভক্তির যে নিরুপম মধুরিমা তাহার প্রকাশক, গ্রন্থকার শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, সুবিখ্যাত 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। সুদীর্ঘকাল অতুলনীয় সুযোগ্যতার সহিত ঐ পত্রিকার সম্পাদকের পদ অলংকৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থকাব এই গ্রন্থের লেখক নহেন, কথক, কথার যাদুকর; কথা বলিয়াছেন অতি সহজভাবে। ঘরোয়া পরিবেশে কথাগুলি প্রসঙ্গতঃ বলা। কোন ধারাবাহিকতা নাই। ভক্ত সঙ্গে, শিষ্য সঙ্গে আলোচনার মধ্যে কথাগুলির আবির্ভাব। উপস্থিত মত অন্তর হইতে উৎসারিত মধুর কথাগুলি প্রিয়জনেরা ধরিয়া রাখিযাছেন। রাখিয়াছেন ঐতিহাসিকের মত দিন তারিখ দিয়া। যদিও দিন তারিখের সঙ্গে কথাগুলির অন্তর্যোগ নাই। দেশ-কালাতীত সত্য কথার সহজ অভিব্যক্তি। গুরু-মুখ-পদ্ম-বাক্য শিষ্যবর্গ ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিত্য স্মরণের জন্য।

আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে তিনি গুরু-বুদ্ধি করিতেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কাহাকেও আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দেন নাই। তাই লিখিলাম, গুরুবুদ্ধি করিতেন। প্রভু বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন, "গুরু-অভিপ্রেত কার্যকে গুরুদীক্ষা বলে।" শ্রীবঙ্কিম সেন বন্ধুসুন্দরের অভিপ্রেত কার্যই করিতেন। এই অর্থে ঐ পরিভাষায় তাঁহাকে বন্ধুসুন্দরের নিকট দীক্ষিত বলা যায়।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরেব শ্রেষ্ঠ অনুবর্তীগণের মধ্যে আমার আচার্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী অন্যতম। তিনি শ্রীবঙ্কিম সেনকে উল্লাসভবে "বঙ্কিমদা বঙ্কিমদা" বলিয়া ডাকিয়া বক্ষে চাপিয়া রাখিতেন অতি গভীরভাবে। তখন উভয়ের মুখই রাঙা হইয়া যাইত, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আচার্যদেব দিব্যচক্ষে বঙ্কিমদার স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে একটি উপাধি বা উপনাম দিয়াছিলেন—"ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী।"

ভক্তিরাজ্যের যত ভারতী বা ভক্তিমাখা কৃষ্ণকথা তাহার তিনি ছিলেন ভাগীরথী—ভগীরথ আনীত বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা সুরধুনী। ভক্তিরসধারার যে প্রবাহ তাহা হইতে উৎসারিত সেটা অগণিত জনকল্যাণকামী গঙ্গাপ্রবাহ। উপাধিটির মধ্যে বঙ্কিমদার স্বরূপানুবন্ধী পরিচিতি পরিস্ফুট।

সত্য-সত্যই বঙ্কিমদা ছিলেন ভক্তি-গঙ্গোত্তরী-সঞ্জাত সুনির্মল গঙ্গাধারাতুল্য। নিকটে গেলেই ঐ পূত ধারায় সিক্ত হইয়া আসিতাম। একটা সম্পদ্ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ শীতল হইয়া ফিরিতাম।

বঙ্কিমদার জীবনে চির আরাধ্য সম্পত্তি ছিল—সত্য-শিব-সুন্দর। এই তিনে মজিয়া ডুবিয়া অপরকে ডুবাইতে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। এই ভক্তি-মাধুরী গ্রন্থটির তিনটি অধ্যায়। অধ্যায়গুলির নামকরণ শুনুন—অতি অভিনব—আদর, নজর, নির্ভর।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, সত্যের প্রতি আদর। বঙ্কিমদাকে দেখিয়াছি যেখানে যে বিষয়কে

সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই গোটা হৃদয় দিয়া আদর করিয়াছেন। ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা ভাবনার স্থান ছিল না তাঁর উদার হৃদয়ে। সত্যের প্রতি আদর ছিল তাঁর জীবন-সাধনার মূল মন্ত্র।

সত্যকে আদর করিতে করিতেই নজর পড়ে—শিবস্বরূপের দিকে। সত্যকে আদর করার বাস্তব ফল ইহার মঙ্গলের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি। যাহা অমঙ্গল, অসুন্দর, অন্যায় তার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে না। যদি দৃষ্টি পড়ে তবে তা পূত হইয়া যাইবে মঙ্গল দৃষ্টির সামর্থ্যে। তা প্রথমে সত্যের প্রতি আদর, দ্বিতীয়ে শিবস্বরূপে নজর।

এই শিবস্বরূপ তাঁহার কাছে শ্রীগুরুদেব। গুরুকে তিনি ব্যক্তি হিসাবে দেখিতেন, তত্ত্ব হিসাবেও দেখিতেন। পুরাতত্ত্বকে তিনি বলিতেন, ঈশ্বরতত্ত্বের অনুবাদ। পুরাতত্ত্বে নজর স্থির হইলেই ঘটিবে সুন্দরের আবির্ভাব। সুন্দরের সন্ধান পাইলেই সমগ্র জীবনের নির্ভরতা আসিবে তাহার উপর। এই নির্ভর-জীবনই মধুময়। সমর্পিত জীবনই আনন্দধ্বনি।

বঙ্কিমদা ছিলেন সত্য-শিব-সুন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ পূজারী—একজন একনিষ্ঠ সাধক। তিনি ছিলেন একজন কল্যাণধর্মী পুরোহিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন ছিল তাঁর জীবনের তপস্যা।

ট্রাম-দুর্ঘটনার পর যখন হাসপাতালে গেলেন তখন তিনি হইয়া গেলেন একজন নতুন মানুষ। আঘাতটাকে লইলেন মহা-আশীর্বাদরূপে। ঐ কৃপাশীর্বাদের কথা সর্বদাই মনে অনুভব করিতেন ও মুখে উচ্চারণ করিতেন। সর্বদাই যেন করুণার স্রোতে ভাসিতেন। যখন যে-কথা বলিতেন সকলই মানব-সমাজের প্রত্যেক নর-নারীর হিতসাধক। প্রত্যেকটি কথাই ছিল—অভিনব অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। ভূমার সন্ধান পাওয়ার ফলে হৃদয় ছিল বিরাট্।

একদিন 'হৃদয়' শব্দের অর্থ বলিয়াছিলেন—"হৃ—হরণ করে, দ—দান করে, ও য়—লয় করে।" বঙ্কিমদার ঐরূপ হৃদয়ই ছিল। তাঁর সান্নিধ্যে গেলে স্নেহধারায় মন হরণ করিতেন, বাক্যামৃত সঙ্গে নিজেকে দান করিয়া বিলাইয়া দিতেন ও চির দিনের জন্য আপনজন করিয়া অন্তরের মধ্যে লয় করিয়া লইতেন।

শ্রীহরিনামের অর্থ বলিতে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমদা বলিতেন, এই তত্ত্ব হৃদয়ে জাগ্রত না হইলে হৃদয়ের পরিস্ফূর্তি হয় না। এই পরিস্ফূর্তি যখনই হইবে তখন ভাবরাজ্যে যাইব, ভাবরাজ্যে গেলে আর অভাববোধ থাকিবে না। এই সকল সুন্দর অনুভূতির কথা বলিয়া বলিয়া বঙ্কিমদা উপসংহারে বলিতেন, "এ সব কেবল বুলি আওড়ানো নয় রে—দেখা।"

বঙ্কিমদা বলিতেন—"ভারতের ধর্ম হইল প্রত্যক্ষতা। আমাকে সাক্ষাৎ ভাবে গুরুরূপে যেমন ধরিয়া আছেন, তেমন করিয়া তাঁকেও ধরা চাই। শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের খোরাক পাওয়া চাই তাঁর কাছে থেকে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদানেই তাঁকে পাওয়া, দান ছাড়া তাঁর কোন কাজ নাই। দানই যজ্ঞ, যজ্ঞই সংকীর্তন।"

বঙ্কিমদার স্বভাব ছিল দশজনের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। এই স্বভাবটা বাল্যবেলাই পাইয়াছিলেন নিজের বাবার কাছে। বাবার কথা নিজমুখে বলিতেন—"আমার বাবা বলতেন দশটা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলে-মেয়েদের মিশিয়ে দিলে আমার ছেলে যে কোন্‌টা বার

করতে পারব না। তখন হব প্রকৃত বাবা।.সন্তান জন্ম দিলেই বাবা হয় না, পিতৃত্ব অর্জন করতে হয়।" কি সুন্দর কথাই না শিখিয়াছিলেন বাবার কাছে। সারা জীবনেই ছিল ইহার প্রতিফলন। যোগ্য পিতামাতার ঘরেই যোগ্য সন্তান জন্মিয়াছিলেন। দাদা বলিতেন, "আমার মা-বাবা অন্য ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইতেন, আমার খোঁজ নেওয়ার সময় পাইতেন না। ছেলেবেলায় এর আম, ওর জাম, অন্যের কাঁঠাল—এই খাইয়াই কাটিত।"

আর একটা বাল্যবেলার কথা বঙ্কিমদা বলিতেন, "আমরা যাকে ছোট জাত বলি, তারা আমাকে বেশী আদর করিত। এমন কি শ্বশুরবাড়ী গিয়াও তাদের বাড়ী অপেক্ষা নিকটবর্তী তথাকথিত ছোটজাতদের আদর-যত্ন বেশী পাইয়াছি, বেশী নিয়াছি। গ্রামের মধ্যে আমাকে খাওয়ানোর জন্য একটা competition লাগিয়া যাইত। আজ এ বাড়ী, কাল ও বাড়ী হইতে নেমন্তন্ন আসিত। অথচ এরাই সামাজিক দৃষ্টিতে ছিল ছোট। আমি তাদের বড় করিয়া দেখিতাম। আজও দেখি। নিতাইচাঁদের দয়ায় দেখি।"

প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন, নিতাইচাঁদের মত দয়াল জগতে হয় নাই, হবে না— "এমন দয়াল নিধি কভু দেখি নাই।" নিতাই শুধু শ্রীগৌরাঙ্গকে নিয়াই মাতিয়া থাকেন নাই। জীবের দিকে আকুল হইয়া চাহিয়া কাঁদিতেন। আচণ্ডালে কোল দিয়া হরিবোল বলিয়া কাঁদিতেন। আমি নিতাইচাঁদকে সামনে রাখিয়া চলি। জগদ্বন্ধুসুন্দরের নির্দেশ, প্রত্যেক জীবকে নিতাই স্বরূপে দেখ, তাই দেখার চেষ্টা জীবন ভরিয়া করিয়াছি।

গুরুকরণ সম্বন্ধে দাদার শত শত সুন্দর কথা আছে। একটা কথা বলিতেন—গুরু করার দরুণ শিষ্যের লাভ এই যে, গুরুতে ভগবানের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মিলে; সত্যি সত্যিই তিনি নিজ গুরুতে শ্রীভগবানের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

বঙ্কিমদার জীবনে এমন একটা সময় গিয়াছে যখন তিনি সর্বদা ভাবে তন্ময় থাকিতেন। জ্ঞান থাকিত না। পা-কাটার পরে এই অবস্থাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ভাবে তাঁহার শরীর লাল হইয়া যাইত, কালো হইয়া যাইত। কখনও কখনও এমন ঘাম হইত যে পাখা তো দূরের কথা, জামা-কাপড় ভিজিয়া জায়গা পর্যন্ত ভিজিয়া যাইত। এটা ভাব-তন্ময় অবস্থা, তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। বাহিরে যখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতেন, তখনও বোঝা যাইত কোথায় যেন কোন রাজ্যে হরিপুরুষের লীলাস্বাদনে তন্ময় আছেন।

বঙ্কিমদার কথা, তাঁর বক্তৃতা শুনিতে চিরদিনই ভালবাসিতাম। তার চাইতেও বেশী ভালবাসিতেন তিনি আমার কথা শুনিতে। একদিন এক বাসায় ছোট্ট একটি আসরে দু'জনে উপস্থিত ছিলাম। কয়েক মিনিট ঠেলাঠেলি করিলাম, আমি বলিলাম—আপনি বলেন, আমরা শুনি। দাদা বলিলেন—না, আপনি বলেন, আমরা শুনি। শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হইলেন। আমি বলিলাম, তিনি শুনিলেন। শোনার পর একটু বলিলেন—তার সবটাই আমার বলার প্রশংসা। *কিন্তু আমি অন্তরে অন্তরে ঠিক জানিতাম যে, দাদার শোনার মধ্যে একটা গভীর তন্ময়তা ছিল।* তা আমার নাই; কোনও দিন হবে কিনা তাও জানি না। তাঁর হরিকথা বলা শোনা দুইই ছিল নিরুপম।

তাঁহাকে হারাইয়া একটা সম্পদ্ হারাইয়াছি। শুধু আমি নয়, সহস্র সহস্র নরনারী। কৃষ্ণকথা,

বিশেষতঃ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা তিনি যেমন সুন্দর করিয়া বলিতেন তেমনটি আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহার কারণ তাঁর নিবিড় অনুভব। গোপীবন্ধুদাস বিরচিত 'বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী'র অষ্টম খণ্ডের ভূমিকায় বঙ্কিমদা লিখিয়াছেন—"গৌর-নিত্যানন্দে মিলিত 'রসরাজ মহাভাব দুহুঁ একরূপ'-এ ডুব দেওয়া স্বরূপতত্ত্বটাই হরিপুরুষ। এই তত্ত্বটি ফরিদপুর ধামে গোয়াল-চামটের শ্রীঅঙ্গনে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরে প্রমূর্ত। ধ্বংসোন্মুখ জীব-জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণবিরহিণী রাধারাণীর পরমার্তি সংবেদনে গোয়ালচামটের শ্রীঅঙ্গনে এই লীলার তারুণ্য, কারুণ্য ও লাবণ্যে পারস্পরিক নিত্য এবং অবিনাভাবে মহাভাবে প্রভাব প্রকটিত। নাম করিবার জন্য, নাম শুনাইবার জন্য মহামৃত্যুদশা বরণ করিয়া জীবের প্রতি মমাত্মসম্বন্ধে 'জীব নিস্তারিব' এই ঈশ্বর-স্বভাবের প্রকাশ এবং বিলাস ঘটিল। 'হা কীট পতন'—এই মন্ত্রমূলে জীব উদ্ধারে বিশ্বার্তিহারী হরির বেদনা মধ্যমা, পশ্যন্তি এবং পরা স্তরে নিত্য এবং ব্যক্তরূপে সাড়া দিল। নামের বৈখরী স্তর এই লীলায় বিলুপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরলীলার সম্মিলিত পৌরুষবীর্যে ভগবত্তাসার মাধুর্যের পরিপূর্তি এই লীলায়। 'নাম ভিন্ন কলিকালে নাহি আর ধর্ম'—এই লীলায় এই সত্য প্রমূর্ত, নিত্য এবং ব্যক্ত। পতিত, তাপিত, অধম কলির জীবের পক্ষে এই লীলা একমাত্র আশ্রয়।" কী সুন্দর, কী গভীর তত্ত্বানুভূতি। এমনটি আর দেখি নাই—শুনি নাই।

তাঁর বিরহব্যথা সর্বদা অনুভব করি। তাঁর এক প্রিয় ভক্ত রাইমোহন তার পরমা ভক্তিমতী অন্ধ পত্নী লইয়া মাঝে মাঝে আসে। যখন আসে তখন বঙ্কিমদার বিরহ-বেদনা তীব্রতর হয়। বিরহ-দুঃখের মধ্যে এইটুকুই সুখ যে, তাঁর মধুক্ষরা কথাগুলির কিয়দংশ তাঁর সন্তানরা—ভাইবোনেরা ধরিয়া রাখিয়াছে ও মুদ্রিত করিয়া ভক্ত-সজ্জনের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তাঁদের দেওয়া 'ভক্তি-মাধুরী' গ্রন্থটি হাতে পাইয়া বুকে ধরিয়া তপ্ত জীবন যেন তৃপ্ত হইল।

ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথীর জয় হউক। তার মধুক্ষরা বাণীর জয় হউক। জয় হউক, তাঁর সন্তান ভাইবোনদের। 'জয় জগদ্বন্ধু হরি।'

—দাদার স্নেহাপ্লুত
ব্রহ্মচারী মহানামব্রত ❑

জয় জগদ্বন্ধু হরি

সিন্ধুতে শিশিরবিন্দু

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম পুরুষ, পুরুষোত্তম। তিনি অসমোর্দ্ধ* অদ্বিতীয়, অতুলনীয় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিপুরুষ। তাঁহার সমগ্র জীবনটাই শিক্ষা-উপদেশ পরিপূর্ণ। তাঁহার অসংখ্য কার্যাবলীর মাধ্যমে একটা অখণ্ড সত্যের অনন্তমুখী প্রকাশ।

তাঁহার শ্রীমুখের মহাবাণী মহাভারত গ্রন্থে সর্বত্র ছড়ানো। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ শ্রীগীতায়। এসব অল্পবিস্তর সকলের পরিজ্ঞাত। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে লীলা সংবরণের

* *'শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ'—ভূমিকা। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ১ম সংস্করণ ১৩৯৩*

প্রাক্কালে অতিপ্রিয় শ্রীমান্ উদ্ধবকে যে নিরুপম উপদেশ সমূহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই বিশেষভাবে অবগত নহেন।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় ভরিয়া শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া যে অমৃতোপম উপদেশ বাক্য সমূহ উচ্চারণ করিযাছিলেন তাহা শ্রীগ্রন্থোক্ত মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখা, নিজস্ব অনুধ্যানসহ প্রকাশ করিলেন। অনুরূপ গ্রন্থ আর একখানিও বাজারে নাই। ইহা অমূল্য রত্ন।

এই রত্ন বিতরণের অধিকার শিশিরকুমারের সর্বাতিশায়ী রূপেই বিদ্যমান। তিনি একজন ভাগবত তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ। যাঁহাবা বর্তমানে আমাদের সম্মুখে জীবনধারণ করিয়া বিরাজিত এইরূপ ভাগবত-রসিকগণের মধ্যে তিনি একটি জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। সর্বোপরি তিনি ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর অসীম করুণায় শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের তত্ত্ববেত্তা। এই ভূরিদা দাতার বহু দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া যে সকল মহাদান আমরা পাইতেছি তাহা রত্নখণ্ড সদৃশ। তিনি আজ জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে, কিন্তু মহাদানের স্রোত অক্ষুণ্ণ। সুদর্শন-দাতার দান—তাই চির ভাস্বর। আমরা অবনতশিরে সাদরে গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ— এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের লীলা জীবনে চন্দ্র-সূর্যের মত দেদীপ্যমান। ইহাদের মধ্যে বিচারমূলক তুলনা চলে না। তথাপি, ধৃষ্টতা হইবে জানিয়াও একটু একবিন্দু প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ গীতা, একটু সীমাবদ্ধ — দেশ কাল পাত্র ও উদ্দেশ্য দ্বারা। দেশ কুরুক্ষেত্র, কাল রণভূমিতে সমরোন্মুখী উদ্যত শস্ত্র দুই সেনাবাহিনীর মধ্যবর্তী অত্যল্প সময়, পাত্র—সেনানী দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিষাদিত চিত্ত তৃতীয় পাণ্ডব। উদ্দেশ্য একটি বিশেষ কার্যসাধন — সখাকে স্বচ্ছ করিয়া স্বকীয় কর্তব্যে সম্যক্‌ভাবে সংস্থাপন।

শ্রীকৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে এই সীমাবদ্ধতা নাই। সীমাবদ্ধতা অনেক সময় বস্তুকে সুন্দর করে। সাগর হইতে হ্রদ কোন কোন অংশে সুন্দর। পুরীর মহাসাগর বিরাট্, কিন্তু চিল্কা হ্রদটি সুন্দর। সসীমতা হেতু গীতা সুন্দর। অসীমতা হেতু উদ্ধব সংবাদ আকাশের মত বিপুল।

উদ্ধব সংবাদে বক্তার কি কিছু উদ্দেশ্য নাই? আছে, সেটি বিরাট্, এই কলহময় জগতে কী উপায়ে চিত্তের সাম্য রক্ষা করিয়া মানব জাতি শান্তিতে বাস করিতে পারে — তাহার নির্দেশ দেওয়া কলিহত জীবমাত্রকে। 'উদ্ধব সংবাদ' একটা সোনার পাহাড় — বিশাল, বিস্ময়কর ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'ভগবদ্‌গীতা' মানস সরোবর সীমার মধ্যে সৌন্দর্যাধার, মাধুর্যপুটিত।

'গীতা' শ্রীকৃষ্ণের জীবন-মধ্যাহ্নের ওজস্বী উদাত্ত বাণী। 'উদ্ধব সংবাদ' শ্রীকৃষ্ণের পরিণত পরিপক্ক জীবনের প্রফুল্ল প্রশান্ত প্রাণ-নিঙ্‌ড়ানো শেষ কথা। শ্রোতা অর্জুন ধীরোদ্ধত নায়ক। শ্রোতা উদ্ধব ধীর-শান্ত নায়ক। অর্জুন আত্মীয় বধ-ভাবনায় বিষাদিত। উদ্ধব—প্রিয়তমের ভাবী বিরহ-ভাবনায় ব্যথাকুল।

এই তুলনামূলক কিঞ্চিৎ বিচার করিলাম, এই জন্য বিচারাতীত পুরুষ গীতার বক্তা আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাঁর একটি বিশিষ্ট উক্তি উচ্চারণ করিয়া বিন্দু কথা শেষ করি—

"ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্।" ভাঃ ১১/১৪/১২

যে-ব্যক্তি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আমি যার অন্তরে বিরাজিত তাহার যে সুখ, আমা-বিনা অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির তাদৃশ সুখানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়?

ভক্ত-পদাশ্রিত — **দাস মহানামব্রত** □

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ মহাসঙ্গমে

স্বামিজী! [শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ]

"নমো নারায়ণায়" জানিবেন।

আপনার প্রীতির দান 'আকাশ শরীর' পাঠ করিয়াছি। আগরতলা আসার পর আপনার প্রিয় শিষ্য শ্রীঅমলেন্দু রায় (বর্তমানে শ্রীমৎ স্বামী প্রশান্তানন্দ সরস্বতী মহারাজ) - প্রদত্ত আপনার শিক্ষাষ্টক ও ভাগবতোত্তম গ্রন্থটি পাঠ করিলাম। আপনার প্রত্যেকটি গ্রন্থ মধুর, হৃদয়ের গভীর অনুভূতি হইতে উৎসারিত, তাই প্রাণ স্পর্শ করে।

বেদে গুরুতত্ত্ব বিশেষ কিছু নাই এইরূপ একটা ধারণা ছিল। আপনার গুরুতত্ত্ব আলোচনা বেদভিত্তিক; নূতন আলোর সন্ধান পাইলাম। এই সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার যুগে আপনি যে উদার দৃষ্টিতে গুরুতত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছেন তাহা শুধু প্রশংসার্হ নহে, কল্যাণদ।

'প্রবচন' সব খণ্ডই পাইয়াছি—সবই অমৃতের ভাণ্ড। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিবার ভাষা পাই না। আপনাদের গুরুদত্ত দুইটি নামই সার্থক। সত্য অনুসন্ধিৎসা ও অনির্বাণ দীপশিখার সমুজ্জ্বল প্রভা গ্রন্থের প্রত্যেকটি নিবন্ধে দেদীপ্যমান। শ্রীঅনির্বাণজীর জ্ঞানের গভীরতা অগাধ, পরিধি সীমাহীন—হতবাক্ হইয়া চাহিয়া রই। এম. এ. ক্লাসে বেদ পড়িয়াছিলাম, কিছুই বুঝি নাই। সায়ণভাষ্য পড়িয়া মনে হইত তিনিও বুঝেন নাই। এখন মনে হয় সহস্র বৎসর বেদ অপেক্ষা করিতেছিল—সদ্‌গুরুর কৃপাস্নাত এক নিগম-অন্তেবাসীর নিকট আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য। শ্রীঅনির্বাণজীর সঙ্গে বাহিরের পরিচয় নাই বলিলেই হয় কিন্তু অন্তরে তাঁর সঙ্গে একাকার হইয়া আছি। অনির্বাণ-যুগে জন্মিয়াছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতি কবে প্রবচনের আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া স্বরূপে স্থিত হইবে তাই ভাবি। প্রবচনের বক্তা-শ্রোতার নিকট সত্যনিষ্ঠা ও জাজ্বল্যমান হোমাগ্নিশিখা

* *'সত্যানন্দ গ্রন্থদীপিকা'। শ্রীগুরুপদ মণ্ডল, ১৩৮৮। সত্যানন্দ কালচারাল সোসাইটি, ডায়মণ্ড হারবার।*

কামনা করি।

বর্তমানে আগরতলায় আছি। পাঠ-বক্তৃতা করি। অবকাশে শ্রীঅনির্বাণের বেদমীমাংসা ২য় খণ্ডে ডুবিয়া থাকি। আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেই—৩রা ফেব্রুয়ারী ('৭৪) বিকালবেলা নবদ্বীপ মহানাম মঠে গৌরসভায় সভাপতিত্ব করিবেন। আশা করি ভজনকুশলে আছেন।

ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

স্মরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায় স্মরণে

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী গ্রন্থে একস্থানে জগজ্জননী বলছেন অশ্বপতিকে — যখন অশ্বপতি ছুটতে ছুটতে হয়রান —

"There is no rest for the eombodied soul...
Till he has found himself he cannot pause....
Leave not the light to die the ages bore.
Help still humanity's blind and suffering life.
Assent to thy high self, create endure.
Cease not free knowledge, let thy toil be vast."

শ্রীঅরবিন্দের এই গভীর উক্তিগুলি শ্রীদিলীপকুমার কবিতায় অনুবাদ করেছেন—

''পারে না লভিতে দেহী বিশ্রাম দুরভিসারে তার,
যতদিন আপনাকে না জানে সে — পারে না থামিতে।
যুগে যুগে পৃথিবীকে যে আলো দিয়েছে দিশা — তুমি
দিও না নিভিতে তারে। অন্ধ আর্ত জীব, তুমি হও
সাথী তব উত্তুঙ্গ আত্মার। করো সৃষ্টি, দুঃখ সহি।
নিরন্তর জ্ঞানের পথে কর্ম তব হোক মহীয়ান্।"

শ্রীদিলীপকুমার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই আত্মজ্ঞানকে আমাদের শাস্ত্রে নাম দেওয়া হয়েছে আত্মদীপ, কারণ এই জ্ঞান আলোর মতোই সত্যকে প্রকাশ করে, জীবনকে দেখতে শেখায়। এমন সম্পদ্ আর কী হতে পারে? কিন্তু এ ধনে ধনী হতে হলে চাই প্রেমস্নিগ্ধ ধ্যান ও প্রাণোদ্বুদ্ধ স্বাধীনচিন্তা।'

দিলীপকুমারের জীবনে ধ্যান ছিল প্রেমস্নিগ্ধ। আর সকল লেখার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ছিল

* *'শ্রীদিলীপকুমার রায় 'স্মরণিকা'। সম্পাদক : অধ্যাপক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী। ১৩৭২*

প্রাণ উদ্বুদ্ধকারী বীর্যমন্ত্র। তিনি ছিলেন চিন্তায় সর্বদা আত্মতন্ত্র, তাঁর ধ্যানে ছিল প্রেম-প্রীতির ঘন স্নিগ্ধতা। তার পরিচয় পেয়েছি আমি তার লিখিত ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকায় — আমার লিখিত *গৌরকথা* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

দিলীপকুমারের কৃপাপাত্রী শিষ্যা শ্রীইন্দিরার একটি কবিতা গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন — আমি তা লিখে দিয়েছিলাম তা ওই গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হয়ে আছে। তিনি আমাকে তাঁর একটি কবিতার অংশ বিশেষ তুলে দিয়েছিলেন—

"প্রেমী না মাগে মুকতি-শকতি মাগে আন না মাগে।
ভোগ না মাগে মোক্ষ না মাগে, মাগে না নির্বাণ।
ভালবাসা যে সে চায় না শক্তি মুক্তি মহিমা মান।
ভোগ নয় নয় মোক্ষ চায় না নির্বাণেরও সে দান।"

এই লেখা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখা পড়ে হঠাৎ আমি অন্তরে অনুভব করেছিলাম যে ইন্দিরার আসল সত্তা ব্রজগোপীর। এই যুগে মীরাবাঈ ছাড়া আর কেউ এরকম কথা লিখতে পারে না। তাই আমি দিলীপকুমারকে একটা বিশেষণ দিয়েছিলাম — 'মীরারূপী ইন্দিরার দিশারী।' এই যুগে মীরাবাঈ ছাড়া গোপীভাবের সাধিকা আর কাহাকেও দেখি না। গানে তিনি ছিলেন তাঁর পিতৃদেবতুল্য গন্ধর্বলোকবিহারী। দিলীপকুমারের স্থান আমার মনের মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল।

অনেকদিন ব্যবধানে একদিন একটা ঘটনায় আমি জেনেছিলাম তাঁর মনের মধ্যে আমার একটু স্থান আছে। ঢাকা জেলার একজন সাধনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন দীক্ষার জন্য। তিনি তাঁকে আমার নাম বলে আমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলাম। তাঁর মনের মধ্যেও যে আমি আছি ভাবনায় আনন্দোদয় হয়েছিল।

আমার 'উদ্ধব সন্দেশ' নামক একটি গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলাম :

"প্রেমিক রসিক কবি দিজেন্দ্রলালের আত্মজ / ঋষিবর্য শ্রীঅরবিন্দের মানসজ / সংগীতে গন্ধর্বলোকে বিহারী / গোপীমাধুর্যাবগাহী / ভাগবতী কথার ডুবুরি / নিত্যজনে গীতি স্ফুরণে / প্রেমোন্মত্ত বাঁশরীর আকর্ষণে আত্মভোলা বাউরী / মীরারূপী ইন্দিরার দিশারী / সত্যসন্ধ সুহৃদ্বর / স্বনামধন্য রায় শ্রীদিল্লীপকুমার / করকমলে প্রীতি উপহার/ গুণমুক্ত স্নেহলুব্ধ / ব্রহ্মচারী মহানামব্রত।"

মহাউদ্ধারণ মঠ
কলিকাতা - ৫৯
রথযাত্রা, ১৩৭২ সন

দিলীপকুমারের একটি কথা নিত্যই মনে করি—'Pain is your private affair, share your joy with all'.

বেদনা তোমার নিজস্ব, নিজেই ভোগ কর।
আনন্দ আনন্দময়ের দান, বিশ্বজীবে সঙ্গী কর।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

নেপালরাজ মহারাজ চক্রবর্তী বীরেন্দ্রবীর বিক্রম সহদেব প্রশস্তি

নেপাল প্রদেশেব জনগণের অমিত প্রীতিভাজন আজ নবপঞ্চাধিক ঊনবিংশতম খ্রীষ্টীয় অব্দে ঊনত্রিংশৎ দিবসে অশেয সন্মানাস্পদ শতশ্রী সমন্বিত **বীরেন্দ্রবিক্রম সহদেব** মহোদয়ের জন্মদিবসীয় উৎসবানন্দদিনে বাংলাদেশের সন্ত মহামণ্ডল তাঁহার অপার মহিমা প্রজ্বলকবণ মানসে তাঁহাকে 'রাজর্ষি' উপনামে অলঙ্কৃত কবিয়া কৃতার্থতা অনুভব করিলেন। বঙ্গদেশীয় ঢাকা মহানগরস্থ ধর্মবাজিক বৌদ্ধ-বিহারে মহাসমারোহপূর্ণ আসরে ভবদীয় পুণ্যজন্মদিবসীয় অনুষ্ঠান লগ্নে, আমরা বাংলাদেশবাসী সন্ত মহামণ্ডলের সভ্যবৃন্দ।
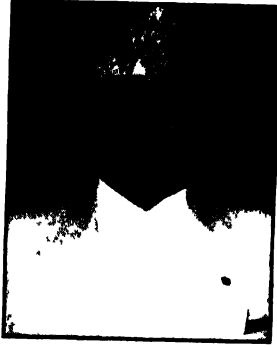
আমরা নেপাল প্রদেশের জনগণের অমিত প্রীতিভাজন মহারাজ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীল বীরেন্দ্র **বীরবিক্রম সহদেব মহোদয়কে** 'রাজর্ষি' এই উপনামে ভূষিত করিয়া নিজেরাই কৃতার্থতা অনুভব করিলাম। সর্বেশ্বর শ্রীহরি ও আমার আশীর্বাদ পুষ্ট সুদীর্ঘ কালব্যাপী মহোজ্জ্বল জীবন যাপনে সমৃদ্ধিমান করুন। এই আন্তরিক কামনা নিবেদন করিতেছে। বাংলাদেশবাসীর পক্ষে—

মহাপ্রকাশ মঠ
ঢাকা

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সভাপতি, বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডল

नेपालराज-संवर्द्धनम्

भो महाभागा: !

अद्य अत्रा बंगदेशीय ढाकानगरीस्थिते धर्मराजिक-बौद्धबिहारे
महासमारोहपूर्णायां महत्यां सभायां भवतां पवित्रे
पंञ्चाशत्क्रमे जन्मदिबसीये अनुष्ठानावसरे
बांलादेश-सन्त-महामण्डलस्य सज्यानां पक्षे
नेपालदेशीयस्यासंज्यजनानां प्रभूतप्रीतिभाजनं
महाराज-चक्रवर्त्ति-श्रीश्रीवीरेन्द्र
वीर-विक्रम-सहदेव-महोदयं भवन्तं

মহাজীবন স্মরণে

'রাজর্ষি:'

ইতি সমাজ্ঞয়া অলংকৃত্য
কৃতকৃত্যো ভবামি
শ্রীবৎস-গঙ্গাধরৌ শ্রীহরি-হরৌ ভবন্তং
চিরং দৈবাশীর্বাদপুষ্ট
মহোজ্জ্বল-জীবনযাপনে সমৃদ্ধিমন্তং কুরুতামিতি।

বিতারিখ: ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দয়স্য ঊনত্রিংশত্তম: দিবস:, শুক্রবাসর:। ❑

শিবানন্দ দীর্ঘজীবী হোক

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী শিবানন্দ গিরি স্মরণে

এই আশ্রমে আগে অনেকবার এসেছি। ও (শিবানন্দ মহারাজ) আমায় বড় ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। শাপভ্রষ্ট দেবতা ছিল। ছোট বড়, নরনারী, দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সকলের আদরের জন। ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় করতে এসেছিল সে। এত অল্পদিনে হারাবো ভাবতে পারিনি। আকস্মিক কী যেন একটা হয়ে গেল। তাঁর গান, কণ্ঠ, কীর্তন, কথা ইতিহাস হয়ে রইল। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমস্ত ভারতে। সমস্ত সম্প্রদায় তাঁর গুণে মুগ্ধ। এক অপূর্ব বস্তু দিয়েছিলেন ভগবান্ আমাদের। কেন যে নিয়ে নিলেন! আমার সঙ্গে তাঁর এক গভীর সম্বন্ধ ছিল, নিগূঢ় সম্বন্ধ। তাঁর ভালবাসা ভোলবার নয়।

আমার লেখা 'উদ্ধব সন্দেশ' তাঁর গাওয়ার গুণে এক সম্পদ্ হয়ে গেল, এক ক্ল্যাসিক্যাল গ্রন্থ হয়ে গেল। আমার লেখাকে গানে সুরে কীর্তনে জীবন্ত করে তুলতেন। অবাক্ হয়ে যেতাম তাঁর মুখে শুনে—আমি এ রকম লিখেছি! "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম, রাম হরে হরে।।"—এই ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষরে এক অদ্ভুত লীলা ডুবে আছে, বৃন্দাবনের মাধুর্য আছে, সেটা শিবানন্দজী টেনে বার করেছেন। রাধা ডাকছেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ ডাকছেন রাধাকে। রাধারাণী একবার লুকিয়ে পড়ছেন। কৃষ্ণ ডাকছেন—হরে। আবার কৃষ্ণ লুকাচ্ছেন, রাধারাণী ডাকছেন—কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ দু'জনে লুকিয়ে পড়ছেন, আবার মিলিত হচ্ছেন। গৌরসুন্দরের মধ্যে দু'জনের বিলাস হচ্ছে। রাম—হচ্ছে মিলন, রমণ। নামাক্ষরে

* *'পাঁচসিকে পাঁচ আনা', শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ গিরি প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা। আনন্দ আশ্রম, অভেদানন্দ রোড, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৪। সম্পাদক : শ্রীসমীর ভট্টাচার্য। ১০ জুলাই ১৯৮৮-তে আনন্দ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।*

এমন লীলা জীবন্ত হয়ে আছে তাঁর মুখে না শুনলে বুঝতে পারতাম না! এসব জিনিস কথা দিয়ে, লেখা দিয়ে বোঝার নয়, অনুভবের বস্তু। আমি লিখেছি **'গোপীমন্ত্র-মাধুরী'**, কিন্তু শিবানন্দজীর মুখে শুনে বেশী আস্বাদন হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর কণ্ঠ আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কৃষ্ণের চারিটি রূপ এই যোল নামে মাখামাখি হয়ে আছে। নামের মধ্যে যে লীলা আছে, যে মাধুর্য আছে সেটা তিনি গানের সুরে মধুর করে তুলতেন। আপনারাও তাঁর মুখে 'গোপীমন্ত্র-মাধুরী'র মাধুর্য শুনেছেন, আপনারা ধন্য। শুধু শোনা নয়, আস্বাদনে নিমজ্জিত হতে হবে, তবে এর মাধুর্য বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাস নিয়ে কখন কী বলেছিলাম মনে নেই। তাঁর 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকাতে আমার বক্তব্য তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পড়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। কাহিনীর ভেতর এক গভীর বেদান্ত দর্শন ছিল। আমার ভেতর থেকে তিনি টেনে বার করে নিয়েছেন। তাঁর অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি ছিল মানুষের ভেতরের গুণ টেনে বার করা। আর একটা গুণ—সত্যানুসন্ধান। যেখানে সত্য আছে গভীরভাবে দেখা। বিশাল বিরাট্ হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন। সত্যিই বিশ্বনাথের সন্তান। বিশ্বনাথের কোলে এসেছিলেন, আবার বিশ্বনাথ কোলে নিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সন্তানরা তাঁর স্মৃতিটুকু কাজটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন খুবই আনন্দের কথা।

আজকের সভার প্রথম গানটা (যে-ভালবাসা তোমারে ভুলায় সে-ভালবাসায় ভুলায়ো না, যে-সুখ লভিলে তোমারে ভুলিব, সে সুখসাগরে ডুবায়ো না) শিবানন্দজীর মুখে শুনতে অদ্ভুত ভাল লাগতো। গানটি এমন অন্তর দিয়ে গাইতেন, কথাগুলো মূর্ত হয়ে উঠতো। সব কিছুকে জীবন্ত করে তোলা তাঁর বড় গুণ। আপনারা ভাবছেন তাঁকে হারিয়েছেন। না, তাঁর কৃপাধারায় আজও আপনারা সঞ্জীবিত হচ্ছেন। শাস্ত্র বলে, গুরুর মৃত্যু হয় না। গুরু মানুষ নয়। শ্রীকৃষ্ণের যেমন অনেক বিলাস, গুরু একটা বিলাস। এসব কথা বলা সহজ, বোঝা কঠিন। আপনাদের হৃদয়ে তাঁর উদারতা মূর্ত হোক, যেটা তাঁর হৃদয়ের বিরাট্ ঐশ্বর্য ছিল। তাঁর এইসব গুণ এবং ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হয় না। তাঁর নামটাও সার্থক। জগতের কল্যাণ করতেই তাঁর আনন্দ। আপনাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সার্থক। 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব তাঁর বক্তব্য। অসাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি। পড়ে অবাক্ লাগে। এত অল্প বয়সে চলে গেলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, এমন রত্ন পেয়েও হারালাম। তাঁর কথা বলতে গেলে বড় কষ্ট হয়, বড় বেদনা লাগে। ভগবানের এক লীলা-পরিকর এসেছিলেন। ভগবানের চরণে শান্তিতে থাক। আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে, কর্মের মধ্যে তাঁকে জীবন্ত করে রাখুন। যে-প্রতিভা একজনের মধ্যে ছিল, আজ তা আপনাদের সবার মধ্যে থাক। কোন উৎসব হলে তাঁর বিরহ-বেদনা বড় জেগে উঠে। আমি ডাকলেই তিনি ছুটে আসতেন।

আজকে এই আশ্রমে আপনারা এমন সুন্দর পরিবেশ তৈরী করেছেন, শিবানন্দ যদি থাকতো আনন্দে উল্লাস করতো। আপনাদেরও কি আনন্দ হতো। গুরুর ইচ্ছা, আদেশ, উপদেশ আপনাদের ভেতর মূর্ত হয়ে থাক। ভগবান্ তাঁর প্রেম নিষ্ঠা ভক্তি সবার মধ্যে উজ্জ্বল করে

রাখুন। জয় ভক্তবৃন্দের জয়। জয় শিবানন্দের জয়। শিবানন্দ বেঁচে থাক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কোন একটা কাগজে লিখেছিল—"C. R. Das is dead. Long live C. R. Das". আমিও আজ তাই বলি—Long live Shivananda. ❑

ডাঃ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু বিখ্যাত থানা। উক্ত থানান্তর্গত মঠপাড়া গ্রামের ডাঃ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয় ৮৭ বছর বয়সে নিত্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসে তাঁর গভীর প্রবেশ ছিল। বক্তৃতায় আবৃত্তিতে তিনি সর্বজনের মনোরঞ্জনকারী ছিলেন। তাঁর বিয়োগ-বেদনায় সকলেই সন্তপ্ত। তাঁর পূত আত্মা অমরলোকে পরা শান্তিতে থাকুন—এই প্রার্থনা করি।

২৫/০৭/১৯৯৫ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

মহানাম অঙ্গন

[১] *'স্মৃতি'। ডাঃ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি পরিষদ্। পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬।*

পঞ্চদীপ

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় স্মরণে

বীর বিপ্লবী ছিলেন মতিলাল কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় পবিত্র সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পূজারী, যাহা বিপ্লবীরা প্রায়শঃ হয় না। একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের মত তিনি ভারত-জননীর আরতি করিয়াছেন পঞ্চপ্রদীপে— কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সেবা ও সাধনা এই তাঁর পঞ্চদীপ। এই পাঁচটিকে একত্রীকৃত করিয়াছিলেন তিনি একটি শক্ত ভিত্তিতে—তাহার নাম্ সত্য। তিনি বলিতেন, সত্যই ব্রহ্ম। সত্যভ্রষ্ট হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। জীবনে তিনি সত্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি ছিলেন সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসী একজন অনন্য সাধারণ তপস্বী।

তাঁহার পঞ্চদীপ আজও জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাঁহারই সত্যে প্রতিষ্ঠিত সংঘ। আজও এ জাতির অন্ধকারময় দুর্দিনে একটি সুদীপ্ত শিখা সঙ্ঘপিতা—জয়তু মতিলালঃ।

ইং ৯/৩/১৯৯১ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

* *'সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা' (১৯৪১-১৯৯১), প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার।*

শ্রীমৎ হরিদাস ব্রহ্মচারী স্মরণে

জয় জগদ্বন্ধু

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন

রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯

শ্রীধামের পক্ষে জগন্মঙ্গল-এর পত্রে জানিলাম শ্রীমান্ হরিদাস প্রভুব পাদপদ্মে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া সকলেই মর্মাহত। শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজীব "আজ্ঞাবহ" হইয়া ধামের সেবার ব্যাবহারিক যে অভাব—তাহা মিটাইয়া দিয়া গিয়াছে হরিদাস অক্লান্ত খাটিয়া। শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদাজীবন যখন শ্রীধাম ফরিদপুর হইতে শ্রীধামের আকর্ষণে চলিয়া আসেন—চিন্ময় শ্রীশ্রীজন্মভূমিতে তখন তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন সত্য সত্য অনাহারে অনিদ্রায় সেবকেরা কিভাবে "যজ্ঞ" চালায়। সেই দুঃখ মনে হয়, তাঁহার প্রাণের মধ্যে ছিল—তাই ধামের সেবায় আসিয়া এমন একটি মহাকার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন যাহাতে সেবকগণ দু'মুঠা অন্নপ্রসাদ পাইয়া নিশ্চিন্তে যজ্ঞে ব্রতী থাকিতে পারে। তাই সেই দিক্‌টি সুন্দব করিয়া গিয়াছেন মনে হয একনিষ্ঠ সেবক শ্রীহরিদাসকে তৈয়ারী করিয়া। ধন্য হরিদাস! জীবন ভবিয়া গুরুসেবা কবিয়া নিত্যধামে সেই সেবাতেই চলিয়া গেল। শ্রীকুঞ্জদাস দাদাজীবনের পাদপদ্মে তাঁহাব স্থান চিব স্থিব থাকুক। ভক্ত-ভগবানের জয় হউক। ভক্ত-ভগবানেব শুদ্ধ দাসত্বের জয হউক। জয হরিদাস, জয় চিন্ময় শ্রীধাম।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ ঐ দাস্যার্থী
16.5.1998 **মহানামব্রত দাস**

'শ্রীঅভয়জীর ডায়েরী'—শুভেচ্ছাবাণী

জয় জগদ্বন্ধু হরি

মা আনন্দময়ীর কথা দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমাদের পরম প্রিয় শ্রীঅভয়জী।

কথাগুলি মধুমাখা। আস্বাদনে ধন্য হবেন। একটি গ্রন্থে দু'জনের স্মরণ।

মুগ্ধ — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মহানাম অঙ্গন

১৮-১২-১৯৯৮

'শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে অভয়জীর ডায়েরী'। শ্রীঅভয়। ৭৯তম জন্মোৎসব, ১৪০৫। পরমার্থ কীর্তনসভা। বাঘাযতীন, কলকাতা - ৯২

भक्तावतार श्रीहनुमानप्रसादजी

'श्रीहनुमानप्रसाद'-इस नामके माथ मेरा विगत पंचास वर्षोंका परिचय है। महाशक्ति और निरूपम भक्ति-इन दोनों के मिलन-मूर्ति महावीर श्रीहनुमानजी थे। उनके अपरिमित प्रसादसे प्राप्त श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजीका जीवन था। नामके साथ जीवनधाराकी ऐसी ऐकान्तिक एकात्मताका होना अति दुर्लभ है। प्रसादजीका प्रसाद प्राप्तकर उनके उद्देश्य एक अञ्जलि पुष्प अर्पण करके हम भी धन्य होते हैं!
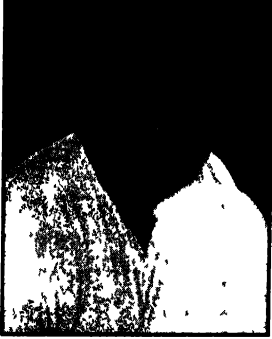
सन् १९३३ से ३८ तक अर्थात् पाँच वर्प तक मैं अमेरिका के शिकागो नगर में वहाँ के विश्वविद्यालय के साथ सज़्बद्धित था। उसी समय 'दि फिलॉसफी ऑव श्रीजीव गोस्वामी' नामक एक अंग्रेजी लेख मैने पोद्दारजीके पास भेजा था। उन्होंने उसे अपने 'कल्याण-कल्पतरु' की एक प्रतिलिपि भेज कर वे अनुगृहीत करते रहे।

शिकागो नगरमें डा॰ हरमन हिल नामक एक विशिष्ट जर्मन महापुरुपके साथ मेरा परिचय हुआ। वे उस समय वहाँ मेडिकल ऐसोसिएशनके प्रेसिडेंट थे। वे जैसे विद्वान् थे, वैसे ही धनी और सहृदय व्यक्ति थे। वे रविवारको गिरजाघर नहीं जाते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने वतलाया कि उनके पिताका उनके साथ सद्व्यवहार न था। इस कारण वे भगवान्का 'आवर फादर इन हेवेन'—'हे स्वर्गीय पिता' कदापि नहीं कह पाते थे। उनका मन कहता कि भगवान् यदि उनके पिताके समान है तो उनको न पुकारना ही ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप भगवान्को पिता न कहकर 'माता' कह सकते हैं अथवा 'बन्धु' कह सकते हैं, या परम प्रिय संतानके रूपमें उनकी भावना कर सकते हैं, श्रीभगवान्के साथ इस प्रकारके सज़्बन्ध भी हो सकते हैं—यह जानकर वे मुग्ध हो गये इस विषयमें और जानकारी प्राप्त करने के लिये उन्होंने ग्रन्थ देखना चाहा तो मैंने उनको 'कल्याण-कल्पतरु' पढ़ने के लिये दिया।

अविरल धारामें अश्रुपात करते हुए वे नित्य 'कल्याण-कल्पतरु' पढ़ने लगे। श्रीहनुमानप्रसादजी के लेखोंको पढ़कर वे कहते थे-'ऐसे मधुर लेख मैंने जीवन में नहीं पढ़े थे।' क्रमशः वे परम वैष्णव बन गये। हरिनामकी माला उनके कण्ठमें और करमें सुशोभित होने लगी। उनके इस अपूर्व परिवर्तनके चरण-स्पर्श से और हरिकीर्तनकी हुंकार से कलियुगने अपने निर्दिष्ट कालके पूर्व ही विदा ले ली है। फलतः 'युग-सन्धि' आसन्न है। इस समय अनेक प्रकारके उलट-फेर तथा धार्मिक और नैतिक ग्लानि सर्वत्र दिख रही है। युग-संधि के प्रबल धक्के में प्राचीन संस्कृतिके चूर्ण-विचूर्ण हो जानेके कारण एक जातिको अपमृत्यु घटित हो सकती है। जिनको जातिकी चिन्ता है, वे सर्वतो भावेन जातिके जीवनकी रक्षा करनेका प्रयत्न करते है।'

इस महान् दुर्योग के समय जातिकी रक्षाके लिये आवश्यकता है कि जो प्राचीन संस्कृतिके अवदान हैं, उनको फिर नये युगके नये आलोक में सर्वजनग्राह्य रूपमें उपस्थित करना। इस

* *'भाइजी पवन स्मरण स्वरूप' चिन्तन। ागधामाधव सेवा संस्थान, गीरखपुर। प्रधान सज्पादक: म: म: ड. गीपीनाथ कविराज, 20208 संवत्।*

कार्यमें जो महान् पुरुष प्रवृज़ हुए, उनमें श्रीहनुमानप्रसादजीका नाम उज्ज्वल अक्षरों में देदीप्यमान है।

श्रीहनुमानप्रसादजी जीवनभर निष्ठापूर्वक इसी एक कार्य में व्रती थे कि भारतकी प्राचीन संस्कृतिमें जो अविनश्वर सज़्पद् है, उसे वर्तमान वैज्ञानिक युग के आलोकमें साधारण नर-नारीके अनुभव-योग्य बनाकर जातिके सामने अभिनव भाव और भाषामें समृद्धिमान् करके उपस्थित किया जाय।

वेद, उपनिषद्, स्मृति, गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, तन्त्रशास्त्र, योगशास्त्र, वेदान्त सांज़्य आदि षड् दर्शन, तुलसीदास आदि संतोंके महाग्रन्थ, श्रीचैतन्य-चरितामृत आदि गौड़ीय सज़्प्रदायके ग्रन्थ-समूहका स्वयं अति गज्भीर अध्ययन करके श्रीहनुमानप्रसादजीने उनके भीतर वहुत अच्छा प्रवेश प्राप्त किया था। इन सब ग्रन्थोंको साधारण नर-नारीके ग्रहण करने योग्य प्राञ्जल भाषामें रूपान्तरित करवाकर तथा इन्हें लाखों-लाखोंकी संज्यामें प्रकाशित कर घर-घर नाम मात्र मूल्यमें को में पहुँचाया।

इस महाव्रतके साधनके लिये उन्होने गीताप्रेसके कार्यका विस्तार किया। हिंदी और अंग्रेजीमें दो मासिक पत्रिकाओंका अति सुन्दर ढंग से प्रकाशन एवं संचालन करनेके अतिरिज्त उन्होंने अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ प्रकाशित कर भाषाको समृद्ध बनाया। स्वल्प मूल्य में भारतीय आध्यात्मिक सज़्पद्को कोटि-कोटि जनोंके हाथों में पहुँचाया। सारे जीवनभर वे इस विराट् कल्याणकारी कार्य में व्रती रहे। किन्तु कैसा आश्चर्य है कि तनिक भी लौकिक लाभकी वासना उनके पवित्र जीवनको स्पर्श न कर सकी।

केवल ग्रन्थ और पत्र-पत्रिकाके प्रचार द्वारा ही उन्होंने आर्य-संस्कृति में नवजागरण लाने की चेष्टा नहीं की, परन्तु अपने जीवको कठोर तपस्या और निरुपम शास्त्रनुमोदित आचार तथा नित्य-नैमिज़िक आचरण के द्वारा उन्होंने कोटि-कोटि नर-नारियोंके हृदयमें भज्ति-धर्मकी जीवन्त मूर्ज़िके रूपमें आसन प्राप्त किया था। उनकी चाल-ढाल, कथा-वार्ता, मधुर मुस्कान-शान्त नेत्रोंकी सुस्निग्ध दृष्टि, प्रत्येक गतिविधिके द्वारा व्रज-प्रेम की एक अपार्थिव धारा प्रवाहित होती थी। थोड़े समयके लिये भी जो उनके सान्निध्य में आया और जो भी उनका भाषण सुन लेता था, उनके भीतरकी इस आकर्षण शज्तिका उस पर जादू चल जाता था। वातचीत और क्रिया-कलापमें, लेखनी और प्रत्येक पदक्षेप में, आचरण और प्रचार में, इस प्रकार का 'सव्यसाची' इस युग में सुदुर्लभ है।

इस युग-संधि-कालमें वे थे भज़्तावतार। आध्यात्मिक भाव-सज्पद् और भाषा-सज़्पद्-इन दोनोंके वितरणमें वे 'भूरिद' थे। इन भूरिद महापुरुषके महादानसे मातृभूमि धन्य हो गयी। उनके 'श्रीराधामाधव-चिन्तन' नामक श्रीग्रन्थके साथ यह नगण्य जीव अपनेको युज़्त कर पाया, इससे यह अपनेको कृतार्थ समझता है।

श्रीपोद्दारजी ने जिस प्रकार इस महाजातिकी सेवामें अपनेको पूर्णतः समर्पण कर दिया था, उसकी स्मृतिको हृदयमें जाग्रत् रखकर हम प्रबलतर उत्साह के साथ आर्य-संस्कृतिकी आध्यात्मिक सज़्पद्को अपने प्रतिदिनके जीवनमें प्रतिष्ठित कर सकें, तभी हम उनके प्रति भज़्तिपूर्वक चन्दन-पुष्पाञ्जलि समर्पित कर सकेंगे। जयतु भज़्तावतार श्रीश्रीहनुमानप्रसादजी! ❑

ভূমিকা ও শুভেচ্ছাবাণী

ঝালকাঠী হরিজন বস্তি দর্শন

ড. শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী, এম. এ. (ডবল), পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্-এর ঝালকাঠী (বরিশাল) সুইপার কলোনীতে শুভপদার্পণ উপলক্ষে পরিদর্শন খাতায় লিখিত—

জয় জগদ্বন্ধু

ঝালকাঠী হরিজন বস্তি দর্শন করিলাম। ইহাকে এখন আর বস্তি বলা সঙ্গত নয়। যে গৃহে বসিলাম তাহা শ্রদ্ধাস্পদ নাগরিকদের মতই। বাংলাদেশ সরকারী প্রচেষ্টায় এই উন্নয়ন প্রশংসনীয়। কাজ এখনো অনেক বাকী, আশা করি সুসম্পন্ন হইবে।

গৃহের ও আসবাবাদির সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন—সামাজিক উজ্জ্বলতা বিধান। শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, উচ্চচিন্তা, জীবনের পবিত্রতা—এই সকলের সুন্দরতা বিধান করিতে হইবে। মানুষে মানুষে ব্যাবহারিক ও মানবিক ব্যবধান দূর হইয়া যাইবে। প্রভু জগদ্বন্ধুর বাণী—"পৃথিবীতে একটি জাতি—তার নাম মানবজাতি।" আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মানবজাতির যোগ্যরূপে পরিণত হইব—ইহাই সভ্যতার লক্ষ্য।

নিজ সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতি বিধান শ্রীমান্ শুকদেব ডোমের জীবনের ধ্যান। শ্রীমান্ শুকদেব ও সহদেব ও তাদের পরিবারের সকলকে—আশীর্বাদ করি, প্রভু তাদের কল্যাণ করুন। তাদের সমাজ মানবতার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হউক—এই কামনা। জয় জগদ্বন্ধু।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৯৩/১৫ই মে ১৯৮৬ স্বাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিকীর্তনাবলী'—ভূমিকা

জয় জগদ্বন্ধু হরি

"পরামৃতসরোবরোদিত-সরোজসদ্রোচিসম্।
স্মরামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্।।"

'শ্রীশ্রীহরিভক্তি-কীর্তনাবলী' নামক একখানি মধুমাখা পদ-পদাবলী সমৃদ্ধ শ্রীগ্রন্থ হাতে পাইবার সৌভাগ্য হইল। বৈষ্ণবাজ্ঞা—ভূমিকা লিখিতে হইবে। ভূমিকা রচনা হইবে না। কিঞ্চিৎ ভাবের অভিব্যক্তি হইবে।

কী লিখিব! এইরূপ একখানি কীর্তন-রত্নপূর্ণ সম্পুট ইতঃপূর্বে কখনও দর্শন করি নাই। সঙ্কলয়িতার স্বচ্ছ দৃষ্টির ঔদার্য, অনুভবের গাম্ভীর্য ও ভাবপ্রকাশের ব্যাপকতা—এক কথায়

অতুলনীয়।

ইহাতে কী না পাইলাম—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচন, নরোত্তম, দেবকীনন্দন, যদুনন্দন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পর্যন্ত। আবার রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, বিশ্বরূপ, ভুলুয়া বাবা, চিত্তরঞ্জন, লালন ফকির, দীনেশ ভট্টাচার্য, মাতৃভক্ত শ্রীঅভয়জী পর্যন্ত শত শত রস-নিষ্ণাত ভক্তসজ্জনের আস্বাদ্যমান ছন্দোবদ্ধ পদকদম্ব তাঁহাদের হৃৎকমল হইতে মধুকরের মত মাধুকরী করিয়া একটি 'মৌচাক' নির্মাণ করিয়াছেন। রসে ভরপুর, ভোগে ফুরায় না।

গ্রন্থখানি গুরুগতপ্রাণ একজন পরমভক্তের জীবনাঞ্জলি উপহার পরম করুণ আচার্যদেবের পাদমূলে। সঙ্গে একটি ছোট প্রার্থনা—

"বুঝেছি প্রভু মায়ারই সংসারে,
সুখের আশায় মিছে মরি ঘুরে,
শান্তি রয়েছে যে তোমারি চরণে,
লহ গো মনঃপ্রাণ হে গুরু ভগবান্।।"

দৈন্যে, বিনয়ে, নম্র নিবেদনে, গুম্ফন-চাতুর্যে গ্রন্থখানি হইয়াছে পরম উপাদেয়। নিত্য ভজনশীল সাধকের কণ্ঠহারের মধ্যমণি। মাদৃশ অভাজন জীবেরও জীবনের বন্ধুর পথে একটি প্রাণহরা পাথেয়।

মধুচক্রের মধু সংগ্রহকারী বা সঙ্কলয়িতার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র। তাঁর পরিচয় তিনি শ্রীগুরুপদাশ্রিত—ইহাই যথেষ্ট। তাঁহার আরাধ্য আচার্যদেবের নাম শ্রীশীতলচরণদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁহার পরিচয় তিনি শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের গুরুভাই। রামদাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন নাম-সাধনার মহাসাধক, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় ভজন-সাম্রাজ্যের সম্রাট্। তাঁর জুড়ি নাই, একচ্ছত্রী।

শ্রীগুরুদেব যাহা সমস্ত জীবন দিয়া ভালবাসিতেন, তাহা দ্বারাই গুরুসেবা সুষ্ঠু সুন্দর সমীচীন। বাবাজী মহারাজের অশ্রুসিক্ত আখর শীতলচরণ জীবন ভরিয়া শুনিয়াছেন। এখন মর-জীবনের খেলা শেষ করিয়া নিত্য লীলাজীবনে প্রবেশ করিয়াও স্নেহানুগত শিষ্য ক্ষিতীশচন্দ্রের দেওয়া এ গ্রন্থসাগরে বাবাজী মহারাজের আখর-তরঙ্গে পরমামৃত আস্বাদনে রহিবেন। বাবাজী মহারাজের—"আখর" সম্বন্ধে আর দু'টি কথা বলি। ঐ সব আখর কেবল নয়নজলে সিক্ত নয়, গভীর অনুভূতি-নিষিক্ত সুগভীর লীলাসমুদ্রের তলদেশ হইতে তুলিত তত্ত্বরত্নের পেটারা। সুধাকণ্ঠে ঐ সব রসভাব-সম্পুটিত আখর শুনিবার ভাগ্য পাইয়াছি। রোমাঞ্চ-কম্পের ঝটিকায় বিচ্ছুরিত সেই অশ্রুধারার শীকরকণার সংস্পর্শও ভাগ্যে মিলিয়াছে।

ভূমিকা ও শুভেচ্ছাবাণী

একদিন নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"এত মনোহরা কথা কোথায় পান?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বন্ধু সহায়"। শুনিয়াছি নিত্যলীলায় প্রবেশ কালেও আর্তকণ্ঠে "বন্ধুসুন্দর" বলিয়া প্রাণস্পর্শী ডাক ডাকিয়াছিলেন। আর একদিন পোস্তার রাণীমার বাড়ী কীর্তনে "বন্ধুসুন্দর" আখর শুনিয়াছিলাম—

"ঐ যে নিতাই জড়িত গৌর মূরতি।
নিতাই গৌর একাকৃতি।
(কেউ ধরে ফেলে পাছে) (বাদী পক্ষ তো নিকটেই আছে)"

কীর্তনান্তে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "এই অভিনব আখর কী ভাবিয়া দিলেন?" আমাকে লইয়া একটি ছোট ঘরে উঠিয়া গেলেন। কিছু সময় নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি কিছু কল্পনা করিয়া বলি না। যা দেখাইয়াছেন, দেখিয়াছি, তাই বলি।" দ্বাদশ গুরুর চিত্রপটের মধ্যে বন্ধুসুন্দর ছিলেন সর্বাগ্রে। তাঁর দিকে অঙ্গুলি হেলনে ইঙ্গিত করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সেই নিতাইপ্রেমের পাগল কৃপাসিদ্ধ রামদাস বাবাজীর গুরুভ্রাতা শ্রীশীতলচরণদাস বাবাজী। বাবাজী মহাবাজ তাঁর কণ্ঠমাধুর্য—আখর মাধুর্য কাহাকেও দিয়া যান নাই। নোয়াখালির প্রিয় সীতানাথকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন; কীর্তনে সাত্ত্বিক বিকার ছিটে-ফোঁটা অনেককে দিয়াছেন ; শ্রীশীতলচরণকে মুক্ত হস্তেই দিয়াছিলেন। তাঁহার ভজনময় ভাবদেহে কম্পাশ্রুপুলক দীপ্তভাবে বিকশিত হইত। নিরন্তর ভজনে লীলারসে ডুবিয়া যাইতেন।

শ্রীশীতলচরণাশ্রয়শীতল তুমি ক্ষিতীশচন্দ্র। গুরুকৃপায় যাহা পাইয়াছ—নিজস্ব সম্পদ্ তাহা নিজে ভোগ কর। যাহা দান করিলে, ভূরিদা হইয়া যাহা বিতরণ করিলে—স্তবস্তুতি নিরুপম চিত্রপট সম্বলিত এই শ্রীহরিভক্তি-কীর্তনাবলী যুগ যুগান্ত রহিবে। রহিবে আমরণ ধন্য হইয়া, সাধক ভক্তের চিত্তপ্রাঙ্গণে নাচিয়া বেড়াইবে।

তোমার জনক-জননী পুণ্যশ্লোক গোপীনাথ-প্রিয়বালার ধন্যবাদ দিয়া জয় দেই। তোমার শিরে শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরের করুণাশীর্বাদ অর্পণ করি।

লীলাপিপাসুগণের
দাস্যভিক্ষু
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

মহাউদ্ধারণ মঠ
কলিকাতা - ৫৪
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
ইং ১৭/১১/১৯৮২

* *'শ্রীশ্রীহরিভক্তি-কীর্তনাবলী'। ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা, ১৩৯০, (সল্টলেক।)* ❑

'নদের নিমাই মোদের নিমাই'—রোমন্থন

জয় জগদ্বন্ধু হরি

পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী আমার পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া মুগ্ধ ছিলাম। তিনি যে অকস্মাৎ নিত্যধামে চলিয়া যাইবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই। তাঁহার বিরহে অন্তর বেদনাতুর।

তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও লেখা দুইই ছিল চিত্তাকর্ষী। তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিয়া আমার মতামত দিয়াছি। এখন হাতে আসিয়াছে 'নদের নিমাই মোদের নিমাই'। গ্রন্থের নামটিই মধুময়। মদীয়তা-তদীয়তাময় প্রেমের মিলন। এই গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় দর্শন করিয়াছি। তিনি গ্রন্থ ছাপা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা পরিতাপের। তাঁহার যোগ্য ছেলেরা সমাপ্ত করিতেছে।

প্রাচীন আচার্যদের সংস্কৃত স্তবাদির পদ্যানুবাদে তিনি সুদক্ষ। তাঁহার অনুবাদ-মাধুর্য কখনও মূলকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছে। "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ধ্রুপদযুক্ত মধুসূদনাষ্টক, শ্রীবিশ্বনাথের বিখ্যাত 'গুরুদেবাষ্টক', আচার্যপ্রভু বিরচিত 'যড়্গোস্বাম্যষ্টক', 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক', 'শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক', শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকৃত 'শ্রীশচীসূন্বষ্টক', শ্রীগৌরমুখপদ্মবিনিঃসৃত 'জগন্নাথাষ্টক', বিখ্যাত 'শিক্ষাষ্টক'—প্রভৃতি অষ্টকগুলির মধুর ব্যাখ্যামূলক পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া ভাবের তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছি। তাঁহার নিজস্ব "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন্দনা" আস্বাদন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া আছি। 'চরণারবিন্দে বৃন্দে প্রণাম'—বলিতে বলিতে এত মধুর লাগে যে "রসনা ছাড়িতে নারে।"

গ্রন্থের ওপরে প্রচ্ছদপটটি তাঁহার নিজ ধ্যান-প্রসূত অভিনব ভাবব্যঞ্জক। যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাই চিরসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর আত্মার গৌরপদে শান্তি কামনা করি। তাঁহার সুন্দর গ্রন্থ সমূহের বহুল প্রচার কামনা করি।

বিরহ-বেদনা-বিহ্বল

১৩ই বৈশাখ, ১৩৯৪ **দাস—মহানামব্রত** ❑

* *'নদের নিমাই মোদের নিমাই'। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথা কুঞ্জ, যশড়া-চাকদহ।*

'শ্রীগীতাজ্ঞানসূর্যালোক'—প্রোৎসাহ আশীর্বাদ

'শ্রীগীতা-জ্ঞান-সূর্যালোক' গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলাম। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থাকার বইটি লিখিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে বলিয়া আনন্দ হইতেছে। অল্প সময়ে যুবক-যুবতীরা গীতাগ্রন্থের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে ও নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিবার জন্য উৎসাহ উদ্যম লাভ করিবে। ইহা ছাড়া বর্তমান সময়ে মানব সমাজের যথার্থ শান্তি লাভের আর পথ নাই।

৩১.১.১৯৯৯ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

* *'শ্রীগীতাজ্ঞান-সূর্যালোক' (১৮শ অধ্যায়)। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ১৪০৬। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল, হরিদ্বার। শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীকে উৎসর্গীকৃত।*

ভূরিদা

এক প্রকার পোকা আছে তাহার নাম তৈলপায়িকা। গ্রাম দেশে বলে তেলেপোকা। ঐ পোকাগুলি থাকে অন্ধকার ঢাকা আবর্জনাভরা ভাঙ্গা ঘরের কোণায়। ঐ পোকার কাছে যদি কেহ ধনী লোকের শ্বেতপাথরের তৈয়ারী বাড়ির ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করে তবে তাহা তার কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

সেইরূপ যাহারা সর্বদা বিষয়াসক্ত কুৎসিত কাজে নিবিষ্ট, হীনতা যুক্ত, তাহাদের কাছে যদি কেহ পরমানন্দময়, প্রেম ভক্তির মাধুর্য রাজ্যের কথা বলে তবে তাহাও সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্টতর আনন্দের বস্তু নিকটে থাকিলেও অনধিকারীর তাহা ভোগ্য হয় না। পরম সুখ আস্বাদনের বৃত্তি থাকিলেই তাহা দ্বারা পরমানন্দ উপভোগ করা যায়।

জীব মাত্রের পরম আস্বাদনেব বস্তু হইতেছে নির্মল আনন্দ। ঐ আনন্দ আস্বাদনের যে যোগ্যতা তাহার নাম ভক্তি। ভক্তি জীব মাত্রেরই নিত্যধর্ম।

'শ্রীশ্রীরাধাদামোদর কীর্তন সমাজ' একটি ভূরিদা সংস্থা। বিগত ১৩৬৫ সালে তার জন্ম। আগামী ১৩৯০ সালে তার ২৫ বৎসরের রজত জয়ন্তী। পর বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর। প্রাক্ গৌর জন্ম জয়ন্তী স্মরণে উক্ত সংঘ রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান করিবে। ইহার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি।

ঐ সংস্থাকে ভূরিদা আখ্যা দিবার কারণ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বিবৃত করিতেছি। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইহাদের কার্য ছিল একটি, একটিই মাত্র। সর্বত্র হরিনাম, হরিকথা, শ্রীহরির রূপলীলা মাধুর্য প্রচার করা। এই মহাপ্রচারণ বা মহাকীর্তন তাহারা কোথায় কোথায় করিয়াছেন? কত দেবালয়ে, ধর্মস্থানে বহু হরিসভায়, গৃহীভক্তদের গৃহে শত শত ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ মায়াপুর, মাহেশ, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে মধুর বৃন্দাবনে, পুরী, বৈদ্যনাথ ধামে, সাধুভক্ত সজ্জনের পুণ্যময় পরিবেশে। ইহাদের মধুমাখা কীর্তন পরিবেশনে বহির্মুখ উন্মুখ হইয়াছে, জড় বস্তুতে আসক্তচিত্ত শাশ্বত আনন্দঘন বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিষয়াসক্ত গোবিন্দগতপ্রাণ হইয়াছে। এই জন্য বলিয়াছি সংস্থাটি ভূরিদা। এই ভূরিদা কীর্তন সমাজের মহাদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করুক। বর্তমান যুগের বহির্মুখ যুবক-যুবতীগণকে ইহা বিশ্বকল্যাণমুখী ভক্তি-ধর্মের প্লাবনে ধন্য করিবে ইহা আমাদের আশা, ভরসা ও নিত্য হরিপাদপদ্মে আকুল প্রার্থনার ভাষা।

"জয়তু শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-কীর্তনসমাজ।
জয়তু গৌরসুন্দর বিশ্বরাজাধিরাজ।
জয়তু ভক্তবৃন্দ, ভূরিদা হোক তাঁদের কাজ।।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।
রঘুনাথপুর, কলিকাতা-৫৯

শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

** শ্রীরাধাদামোদর কীর্তন-সমাজ, শ্রীরামক্ষেত্র। রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা, ১৩৯০। ৪২, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭।*

'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'—ভূমিকা

মানুষ নামক কতগুলি জীব আমরা। বাস করি ধরণীর পৃষ্ঠে। থাকিতে চাই সুখে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সুখ মিলে না। ঘুরি সুখের আশায়, শান্তির লালসায়। চাই স্বচ্ছন্দে থাকিতে, স্বকীয় ছন্দের তালে চলিতে। তাহা হয় না। নিজের তালে নিজের ছন্দে চলিতে পারি না। পদে পদেই আসে অন্যের বাধা।

সীমাই বাধা। সসীমতাই আবদ্ধতা। চৌদ্দ পোয়া দেহটা সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়াধীন মনটা সীমাবদ্ধ। কর্মাধীন সংসারটা সীমাবদ্ধ। মায়াধীন জীবনটা সীমাবদ্ধ। তাই ছন্দপাত হয় প্রতি পদক্ষেপে। স্বচ্ছন্দে চলা হয় না। সসীমতায় বাধা অনেক। ক্ষুদ্রতায় বিপত্তি বহু।

যে বস্তু সীমাহীন তাহাই পরম সুখস্বরূপ। যিনি অসীম, স্বকীয় ছন্দে তিনিই নৃত্যপর নিত্যকাল। যিনি স্বরাট্ যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই ভূমা, তিনিই ভগবান্। আমাদের সকল কামনার তিনি কাম্য। সকল সাধনার তিনিই সাধ্য। এই সাধ্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হইতেই হইবে। না হওয়া পর্যন্ত গতাগতির বিরতি নাই।

একমাত্র পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই জীবনে প্রশান্তি আসে। তাই বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ছাড়ে নাই মানুষ পূর্ণতাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা। কারণ, একমাত্র এই প্রচেষ্টাতেই জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু, শুধু চেষ্টায় পূর্ণতা মিলিবার নয়। চেষ্টার পরিপূর্তি চাই কৃপায়। প্রচেষ্টায় ইষ্টলাভ প্রসাদে। জীবের প্রয়াসের সঙ্গে যদি না আসে ঈশ্বরের প্রসাদ, জীবের আগ্রহের সঙ্গে যদি না আসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তবে পৌঁছিতে পারে না জীব সেই পরম সাধ্যবস্তুতে। জীবের সাধনা পূর্ণ হয় ভগবানের করুণায়। তপস্যায় মানুষ উঠে কিন্তু পৌঁছিতে পারে না লক্ষ্যে। লক্ষ্য নামিয়া আসেন অশেষ অনুকম্পায়। তখন মিলন ঘটে।

যাইতে পারে না ক্ষুদ্র জীব তাঁহার কাছে। তাই নামিয়া আসেন ভূমা-পুরুষ তার সান্নিধ্যে। করুণাঘন পূর্ণ পুরুষ আসেন অপূর্ণ জগতের মধ্যে। অসীমের পূতস্পর্শে পবিত্র হয় সসীম ধরণী। ইহার নাম অবতার। পঙ্কিল জীবজগৎকে উজ্জ্বল করিতে করুণার ভাস্কর অবতরণ করেন। তাঁহার ভাস্বরতায় নশ্বরতা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে শাশ্বত মহিমায়।

ইহা এক অঘটন। তবু ঘটিয়াছে ইহা কয়েক বার। সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন পুরাণ-শাস্ত্রকার। শ্রীরামচন্দ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে পুরাণ-পুরুষ আসিয়াছিলেন শঙ্কিত জীবগণকে শান্তির সন্ধান দিতে, পূর্ণতার আদর্শ দেখাইয়া শিখাইয়া অপূর্ণকে স্বর্গীয় আলোকে প্রোজ্জ্বল করিতে। মানুষের সমাজ ও জীবন সমৃদ্ধতর হইয়াছিল তাঁহাদের অবতরণে। ধন্য হইয়াছিল তাঁহাদের প্রচারণে ও মহা-বিতরণে।

সেই সব পুরাণের কথা যেন পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। অবিশ্বাসের মেঘ জীবের অন্তরাকাশে ঘনায়িত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার রাজ্যবিস্তারে মানুষ হইতে মনুষ্যত্ব দূরে চলিয়া গিয়াছিল। একজন পূর্ণ পুরুষের মহা-প্রকাশের জন্য সমগ্র মানবসমাজ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। সকলের বেদনা বুকে লইয়া সকলের অশ্রুধারা সুরধুনীতে ঢালিয়াছিলেন শান্তিপুরের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ব্যথাহত মানবসংহতির নিদারুণ আকুতি আকর্ষণ করিয়াছিল প্রেমপুরুষোত্তমকে নবদ্বীপের

** 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'। সুধা সেন। ১৩৮৬ (২য় সং)*

বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণতলে। অপূর্ণ জীবের সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছিল তাঁহার অমিত প্রসাদে। কৃপার প্লাবনে তিনি ডুবাইয়াছিলেন বিশ্বমানবকে তথা বাংলার নরনারীকে।

'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'; সকলের অন্তর-নিঙ্ড়ানো আর্তির মূর্তি প্রকট হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। ভূমা আসিয়াছিলেন ভূমিকে কৃতার্থ করিতে। গোলোকের পূর্ণতা অবতরণ করিয়াছিল মর্ত্যের অপূর্ণতাকে আলিঙ্গন করিতে। অমৃতময় আসিয়াছিলেন মৃত্যু-ঘেরা জীবনিবহকে পরামৃতের সন্ধান দিতে। হইয়াছিল অসীমে-সসীমে মাখামাখি, নবদ্বীপের রাজপথে। যাহা হয় নাই কখনও।

বিশ্বমানবকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিবার মত এ এক কাহিনী বটে। ছন্দহীন ছন্নছাড়া মানবকুলের মধ্যে আনন্দ-লাল নন্দদুলাল ছন্দদুলাল হইয়া মনোহর নৃত্যছন্দে নাচিয়া গিয়াছেন। আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সেই মহা নর্তকের নটনলীলার কাহিনী কত সুধী সাধুসজ্জন গাহিয়াছেন। যাঁর যেমন সামর্থ্য বলিয়াছেন। কত কথা বলা হইয়াছে। কত অ-বলা আছে। যতটুকু বলা হইয়াছে তাহাও অন্তর দিয়া বুঝা হয় নাই। যেটুকু বুঝা হইয়াছে তাহাও জীবন দিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"জয় নবদ্বীপ, ভারত প্রদীপ।"

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রদীপ জ্বলিয়াছিল নবদ্বীপে। সেই দীপটিকে তুলিয়া ধরিতে আমরা পারি নাই। আজ মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনার দিনে নদীয়ার অপ্রাকৃত প্রেম-প্রদীপটির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সমধিক। ভক্তিরূপ স্নেহসম্পদ্ যাঁহাদের প্রচুর, ঐ রসবর্তিকা তুলিয়া ধরিবার অধিকার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত।

এই গ্রন্থে আছে সেই প্রেমঘনবিগ্রহের অকৈতব কাহিনী, অনবদ্য ভাষায়। লেখিকা কুমিল্লার সুধা সেন। তাঁহাকে চিনি। অনেকেই চিনেন। ঘরের বধূ, সন্তানের জননী, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সমাজসেবিকা, সুধাকণ্ঠী গায়িকা; সবচেয়ে বড় পরিচয় গৌরপ্রেমে প্রাণগলা। উচ্চশিক্ষা সার্থক হইয়াছে নদীয়ার মানবদরদীকে ভালবাসিয়া।

গৌরপ্রীতিতে নয়নের নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে। লেখনীতে নবীনতা আসিয়াছে। ভাষায় সরসতা ফুটিয়াছে। প্রাণস্পর্শ করিবার মত দক্ষতা দেখা দিয়াছে। এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে সর্বপূর্ণতার প্রতিমূর্তি নদীয়া-বিনোদিয়ার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের সংবাদ।

এতদিন 'উদ্বোধনের' পাঠকেরা নিবন্ধাকারে পাঠ করিয়াছেন। আজ গ্রন্থাকারে সকলে পাইয়া উদ্বুদ্ধ হউন। অপূর্ণ জীব, অন্ধ সমাজ নদীয়ার আলোতে নবীন প্রেরণা লাভ করুক'। আমি জীবাধম এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। ঐ সুধা-লেখনী হইতে আরও কত পাইব এই আশায় লোলুপ দৃষ্টি পাতিয়া রহিয়াছি। জয় গৌর হরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

(**ডক্টর শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

এম. এ, পি-এইচ. ডি (চিকাগো), ডি. লিট্.)

'সিদ্ধান্ত-স্যমন্তকঃ'— প্রাক্‌কথন

জীবের জীবনের লক্ষ্য সাধ্য বস্তুর লাভ। লাভের উপায় ভজন। ভজনে প্রয়োজন দৃঢ় নিষ্ঠার। নিষ্ঠা দৃঢ় হয় আরাধ্য বস্তুতে শ্রদ্ধার গভীরতায়। সংশয়লেশশূন্য শ্রদ্ধা যত গভীর হইবে, নিষ্ঠার দৃঢ়তা তত বর্দ্ধিত হইবে।

কলির জীবের আরাধ্য বস্তু ব্রজেশতনয় শ্রীশ্যামসুন্দর ও অভিন্নতত্ত্ব রাধালিঙ্গিত শ্যাম শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীশ্যামসুন্দরের ভগবত্তা, মাধুর্যবত্তা ও চিন্ময়-স্বরূপতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও অনুভূতি যতই নিবিড় হইবে, ভজনে আনন্দ ততই উচ্ছসিত হইবে।

শ্রীগৌর-গোবিন্দের ভগবত্তা ও শ্রীদেহের চিন্ময়-স্বরূপতা সম্বন্ধে এখনও বহু বিজ্ঞ জনের সংশয় পরিদৃষ্ট হয়। সংশয়ের ভাষা শুনিলে প্রবর্তকের অন্তর দুর্বল হয়। দুর্বলতা ভজনপথের প্রবল অন্তরায় হয়। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

সংশয়-নিরসন-পূর্বক যিনি আলো বিতরণ করেন, তিনি অশেষ কল্যাণকারী। 'সিদ্ধান্ত-স্যমন্তকে'র কিরণমালা বহু সন্দেহের অন্ধকার বিনাশ কবিতে সমর্থ। 'স্যমন্তক' কতকাংশ পাঠ করিয়াছি। কিরণমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছি। সকলের চিত্ত উদ্ভাসিত হউক। অন্ধকার নিরস্ত হউক।

"নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

শিলং

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, ১৩৭২ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

২০-৮-১৯৬৫

* 'সিদ্ধান্ত-সামন্তকঃ'। শ্রীহবিনাবাযণ দেববায।

'প্রশ্নোত্তরে থিয়োসফি'—প্রশস্তি

"প্রশ্নোত্তরে থিযোসফি" গ্রন্থখানি (দুইখণ্ড) পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। গ্রন্থখানি পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্মরণে সমর্পিত। সমর্পণের ভাবভাষা প্রাণস্পর্শী।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্বে। এই সোসাইটির উদ্দেশ্যগুলি মহৎ। পৃথিবীর মানুষকে যখন জড়বাদ গ্রাস করিতেছে প্রায় সেই সময় প্রাচীন ঋষিদের নির্দেশে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির সদস্যরা ব্রহ্মবিদ্যার বাণী প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ করিয়াছেন। জর্জ অরুণ্ডেল, সি. জিনরাজদাস ও এন. শ্রীরাম প্রভৃতির উদ্যম-উৎসাহের পর গত কয়েক দশক যেন সোসাইটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আবার নব উৎসাহে জাগরণ দেখিয়া প্রাণে আনন্দ লাগিতেছে।

'Isis Unveild' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থলেখিকা গুরুকৃপাসিদ্ধা ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট এই সোসাইটির সংস্থাপক। পৃথিবীর সকল ধর্মগুলির মূলতত্ত্বের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া

* 'প্রশ্নোত্তরে থিয়োসফি'। শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য। বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, ৪/৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ১২

বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মহদুদ্দেশ্যে এই সোসাইটির আবির্ভাব। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হইলে ভারতে ইহার প্রচুর প্রসার, প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। উদার-হৃদয় হিন্দু জ্ঞানীগুণীরা সোসাইটিকে আপন করিয়া লয়। যে সকল ধর্ম মনে করে একমাত্র তাহাদের মতাদর্শেই মানবের কল্যাণ নিহিত—তাঁহারা সোসাইটিকে একটি নূতন ধর্ম মনে করিয়া সন্দেহের দৃষ্টিতে পরিহাস করে। হিন্দু মনীষিগণ থিয়োসফির মধ্যে তাঁহাদের প্রস্থানত্রয়ের কথাই দেখিতে পান। ধর্মের গোঁড়ামি বিশ্বভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে।

স্নেহাস্পদ্ শ্রীমান্ বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে, কল্যাণকর হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি তিনি অতি সহজ ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকেরা উপকৃত হইবেন বলিয়া আমার ধারণা। আমি শ্রীমান্ বীরেনকে একটি কথা বলিব—যখন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জড়বাদ পাশ্চাত্ত্য দেশে যতটা প্রবলাকার ছিল এদেশে ততটা ছিল না। বস্তুবাদ এখন সর্বকার্যে সর্বাধিক ক্ষতিশীল হইয়াছে। এখন সোসাইটির দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুবাদ কঠোরভাবে খণ্ডন আবশ্যক। বস্তুবাদ খণ্ডিত না হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা' দাঁড়াইবে কোথায়? বস্তুবাদ অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, অকল্যাণকর; ইহা থিয়োসফির ভিত্তিভূমি হইতে যেন দেখাইয়া দেন বিভ্রান্ত নরনারীকে, তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞ রহিব। এই বিষয়ে "মাষ্টার"-দের করুণা ভিক্ষা করুন, আমরাও করিব।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৪/৭/১৯৮৭ ❑

আশীর্বাণী

বসিরহাট মহকুমার 'শ্রীশ্রীহরিনাম সেবা সমিতি' শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্মরণে প্রতি বৎসর একখানি 'স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশ করেন, ইহা আনন্দের সংবাদ।

সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর মহাদান স্মরণ করাও এক প্রকার ভজন। মহাপ্রভু আমাদিগকে কয়েকটি অতি সহজ সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন করিলে জীবনে মঙ্গল আসিবেই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"দশে পাঁচে মিলি' নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥"

ঘরে দশ-পাঁচজন একত্রে বস, মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি। অন্য ঠাকুর ঘরের দরকার নাই—নিজ নিজ ঘরের দুয়ারে বস। কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন নাই। হাতে তালি দিয়া নাম কর। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ১৫/২০ মিনিট এই কার্যটি করুন। মহাপ্রভুর কৃপা পাবেন। সন্তান-সন্ততির চরিত্র নির্মল হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্য সুন্দর হইবে। মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে।

* *'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত দুইতম আবির্ভাব প্রকাশন স্মারক গ্রন্থ'। বসিরহাট মহাকুমা, শ্রীশ্রীহরিনাম সেবা সমিতি, ইং ১৯৮৮/বাং১৩৯৪*

কিন্তু হায় হায়, কয়টি পরিবার এই নির্দেশ প্রতিপালন করে! আমরা রাশি রাশি কথা বলিতে পারি, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করিতে রাজী হই না। মহাপ্রভুর আর একটি সহজ উপদেশ—

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

জীব মাত্রকেই সম্মান দিবে—কেন দিবে? তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে—ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া। বড়-ছোট, আপন-পর, উঁচু-নীচু সকলেই সম্মানের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়-মন্দিরে বিবাজমান আছেন, তাই আদেশটি যিনি জীবনে পালন করেন তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ করেন।

সেবা সমিতির সেবকবৃন্দের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাই—উপরোক্ত দুইটি উপদেশ নিজের জীবনে পালন করুন ও অন্যকে পালন করিতে উৎসাহিত করুন। তাহা হইলে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দবের প্রকৃত সেবা হইবে।

আপনাদের সকল কর্ম জীবকল্যাণে নিয়োজিত হউক।

২৪শে পৌষ, ১৩৯৪
মহানাম অঙ্গন
কলিকাতা - ৫৯

সকলের স্নেহ-প্রীতি-প্রার্থী—
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'জয় জগদ্বন্ধু' 'জয় গৌর'

আশীর্বাণী

নববর্ষ ১৩৭৭।

অশান্ত জগৎকে শান্ত করিতে গৌরহরি আসিয়াছিলেন ধরণীর ধূলিতে। আজ জীবনিবহ কেবল শান্তি-হারাই নহে, সভ্যতাও হারাইতে বসিয়াছে। এই বেদনাদায়ক অবস্থার প্রতিকার করিবে কে?

গৌরসভা, হাঁ গৌরসভা, যেখানে গৌড়ীয় সভ্যতা বিকশিত হইবে। যেখানে নদীয়ার বর্তিকায় মানব-সমাজ সত্যকার শান্তির সন্ধান পাইবে।

চন্দননগরের রাজনৈতিক ঐতিহ্য স্মরণীয়। এই কর্ষিত ভূমিতে আজ পারমার্থিক বীজ উপ্ত হইল। গৌরসভার উদ্বোধন হইল। গৌরগণের করুণা বর্ষণে এই গৌড়োদ্যান সুরভিত হউক।

গৌরসভার সভাজনেরা তত্ত্বকথার আস্বাদন তো করিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে অভাজনদের টানিয়া তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টাও ছাড়িবেন না। দিগ্‌ভ্রান্ত যুবকদের 'গৌড়োদয়ে'র 'তমোনুদৌ'-যুগলের সন্ধান দিবেন।

'জয় নবদ্বীপ, ভারত প্রদীপ'—প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের বাণী। ভোগবাদের ঝঞ্ঝাবাতে সে প্রদীপ কম্পমান। সদাচারের স্বচ্ছ কাঁচের আবরণে তাহাকে রক্ষা করুন। প্রচারণের নিষ্ঠাময়

* *'শ্রীশ্রীগৌরসভা', গোপালাঙ্গন, সুরপাড়া, চন্দননগর, বাং ১৩৭৮/ইং১৯৭১।*

দণ্ডের সাহায্যে তাহাকে আকাশে তুলিয়া ধরুন। যাহাতে দিগ্‌দিগন্তে আলোকপাত হয়, 'জয় গৌর' ধ্বনিতে ধরা মুখরিত হয়। জয় গৌর, জয় জগদ্বন্ধু।

স্বাঃ অভাজন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

আশীর্বাণী

সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই দ্বিতীয়বারের মত সবাই সম্মিলিত হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনে বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও একটি পাপে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি। সেই পাপ—জাতিভেদ, মানুষকে অস্পৃশ্য ভাবা—আপন ভাইকে ছোট জাত বলিয়া মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রাখা।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—সমকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি—আমরা অখণ্ড জাতি হইব। আমাদের ক্ষুদ্রতা চিরতরে ঘুচাইব। প্রভু জগদ্বন্ধু বুনো জাতিকে বুকে তুলিয়া ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে একাকার হইয়াছিলেন। আমরা দুই কোটি লোক সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া একপ্রাণ হইব। আমাদের দেবস্থলীগুলিকে জীবন্ত করিয়া নিজেদের অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত দেবত্বকে জাগ্রত করিব। প্রতি জীবে দিব সম্মান, জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

আপনারা প্রতিনিধি স্থানীয় বন্ধুগণ আপনাদের জেলায় উপজেলায় গ্রাম গ্রামাঞ্চলে আমাদের শুভ সংকল্প বার্তা এই স্মরণিকা পুস্তকের মাধ্যমে পৌঁছাইয়া দিন। নিজেরা সংহত হউন, সংঘবদ্ধ হউন। জাতীয় জীবনের হীনতা পাপকে চিরতরে দূর করিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রেরণায় আমরা যেন মেঘমুক্ত বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠি। এই কেন্দ্র হইতে প্রাণশক্তি আহরণ করিয়া আমরা "অখণ্ড ধর্ম মহামণ্ডল"-এর সার্থক অংশীদার হই। আমাদের রাষ্ট্র দেখুক আমরা মানবতার অধিকারী আদর্শ নাগরিক। করুণাময় প্রভু দেখুন আমরা তাঁহার অমোঘ কৃপাশীষ পাইবার যোগ্য জন।

সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলন '৯৭ বাংলা স্মরণিকা পুস্তক গৃহে গৃহে বিরাজিত থাকুক।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

(মহামণ্ডলেশ্বর, বাংলাদেশ সন্তমহামণ্ডল) ❑

** 'স্মরণিকা', '৯৭ (বিশেষ প্রকাশনা) বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডল, ঢাকা মহাপ্রকাশ মঠ।*

আসাম সংস্কৃত সমিতি—শুভেচ্ছা বাণী

প্রাচীনৈর্মনীষিভিস্তু সংস্কৃতং দেবভাষা ইত্যুক্তম্। সংস্কৃতং নাম দৈবীবাগন্বাখ্যাতা মনীষিভিঃ (দণ্ডিকৃতে কাব্যাদর্শে)। যদিয়ং নৈবাতিশয়োক্তিরিতি তু বর্ণমালায়া আলোচনেনৈব স্ফুটীভবেৎ।

** 'অসম-সংস্কৃত-সমিতেঃ পঞ্চত্রিংশৎ সমাবর্তনোৎসবস্য স্মরণিকা'। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দঃ করিমগঞ্জ-নগরতঃ।*

স্বরো ব্যঞ্জনং চেতি বর্ণমালায়াং স্পষ্টতো বিভক্তে। উচ্চারণক্রমেণ ব্যঞ্জনানি ইত্থং সুসজ্জিতানি—কণ্ঠ্যং তালব্যং মূর্ধন্যং দন্ত্যম্ ঔষ্ঠ্য-চেতি। পৃথিব্যাম্ অন্যত্র কুত্রাপি এবং বিন্যাসো নোপলভ্যতে বস্তুতস্তু মনুষ্যকৃতিরিয়ং নৈব ভবিতুমলম্! অতো সমঞ্জসমিদং যদুচ্যতে, ইয়ং দৈবী বাগিতি।

অস্যাং ভাষায়াং ব্যাকরণস্য বৈচিত্র্যমপি অপূর্বম্—সন্ধিগতং শব্দবিভক্তিগতং ক্রিয়া বিভক্তিগতং কারক-সমাস-কৃৎ-তদ্ধিতগতং ধাতুগতং ছন্দোগতং চ। সুমহান্ খলু শব্দ সম্ভারোঽয়ম্—শব্দ ব্রহ্ম ইতি যদুক্তম্। সর্বম্ অপি এতদ্ অতুলম্। একতো বাণভট্টস্য দুরূহং গদ্যকাব্যম্। অন্যতশ্চ জয়দেবস্য সুললিতং গীতিকাব্যম্ কালিদাসস্য রসসমৃদ্ধঃ কাব্যসম্ভারশ্চ। রসশাস্ত্রস্য ধ্বনেশ্চ আলোচনমপি সৌন্দর্যেণ মাধুর্যেণ লালিত্যেন, পাণ্ডিত্যেন চ সর্বস্যৈব বিস্ময়মাদধাতি। তন্ত্রসাহিত্যে বীজমন্ত্রাদেঃ বিচারঃ সূত্রসাহিত্যে সুগভীরতত্ত্বানাং বিমর্শনমপি সর্বমেব সংস্কৃতসাহিত্যস্য অনন্যত্বং সর্বথা ঘোষয়তি।

সা চেয়ং সংস্কৃতভাষা ভারতে প্রচলিতানাং ভাষাণাং প্রায়েণ সর্বাসামেব জনয়িত্রী পালয়িত্রী। খল্বপি বৈদেশিকা বিদগ্ধাস্তাবৎ সংস্কৃতস্য সম্পৎসম্ভারমুপলভ্য তৎ প্রশংসায়াং মুখরা আসতে। প্রায়েণ সর্বত্র বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়েষ্বপি সংস্কৃতস্য পাঠনং প্রবর্তিতম্। বেদমন্ত্রাঃ উপনিষদো, গীতা চণ্ডী—এতেষাং গ্রন্থাণা-মুচ্চারণত এব মানসং শুধ্যতি। এতদুপলভ্য বৈদেশিকা মনুষ্যাঃ সহস্রশঃ স্বাধ্যায়ে রমন্তে।

সংস্কৃতভাষা ভারতীয়া সংস্কৃতিশ্চেতি দ্বয়ং প্রায়েণ একার্থবোধকম্। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞো জনস্তু ভারতীয়সংস্কৃতের্মর্মোদ্‌ঘাটনে নৈব সমর্থঃ। ভারতীয়জাতের্যদিয়ং সাম্প্রতিকী অবনতিঃ তস্যাঃ মুখ্যমেকং কারণং খলু সংস্কৃতস্য পঠন-পাঠনয়োবনীহা। অস্মিন্ বিষয়ে বৈদেশিকাঃ শাসকা যাবন্মাত্রং চক্রুস্তাবন্মাত্রমপি রাষ্ট্রমস্মাকং কর্তুং ন যততে। ইদং সংস্কৃতভাষণং প্রতি ঔদাস্যং সর্বথা অযুক্তম্। ইদমেকং মহৎ পাপাচরণমিতি বক্তুং যুজ্যতে।

অস্মাভিস্তু অসমপ্রদেশে সংস্কৃত বোর্ড ইত্যস্য শুভে সমাবর্তনোৎসবে সংস্কৃতভাষায়াং যঃ স্মরণিকা-প্রকাশে উদ্যমঃ সোঽয়ং সর্বান্তঃ করণেন অভিনন্দ্যতে। ভবতাং দৃষ্টান্তস্তু ভারতে প্রদেশান্তরেষ্বপি অনুসরণীয়ঃ। সংস্কৃতং পুনরপি সমুজ্জ্বলীভূয় ভারতীয়ানাং সংস্কৃতিমপি উজ্জীবয়তু—জনন্যাঃ ভারত্যাশ্চরণয়োঃ এতৎ প্রার্থয়ামহে। ভবতাং প্রচেষ্টায়াং সাফল্যমপি কাময়ামহে ইত্যলম্।

আশ্রবস্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারিণঃ। ❑

আশীর্বাণী

জয় জগদ্বন্ধু

গোসাইজী বলিয়াছেন—

"যেদিন দিনান্তে অন্ততঃ একবার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া একটি প্রণাম করিতে পারি—সে দিন আমার ভাল যায়।"

** শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুজীর সার্ধ শততম আবির্ভাব মহোৎসব শ্রদ্ধাঞ্জলি।*

কি সুন্দর কথা—"প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া একটি প্রণাম।"

তাঁকে প্রত্যক্ষ করা কি অত সহজ? হ্যাঁ সহজ—তিনিই বলিয়াছেন—এই যে শোভা দেখিতেছ, চন্দ্রের আলোক, পুষ্পের সৌরভ, এ সকল তাঁহারই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার শোভা দর্শন কর।

"পুষ্পের সৌরভে, পতিপ্রাণা পত্নী।র অন্তরের পবিত্রতায়
বালকের হাস্য বদনের মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন কর।"

গীতাও তাহাই বলিয়াছেন্—

"যদ্-যদ্-বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।" ১০/৪১

বিশ্বে যাহা কিছু শ্রীসম্পন্ন সে সকল আমারই তেজের একটি অংশ মাত্র জানিবে—এই মধুময় বাণী সম্বল কবিয়া পথ চলিলে আমাদের জীবন মধুময় হইবে।

জয়তু বিজয়কৃষ্ণঃ।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

জয় জগদ্বন্ধু

শুভেচ্ছা বাণী

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সঙ্গে একাঙ্গে একীভূত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্র রূপে প্রকটিত। শ্রীগৌরচন্দ্র, আনন্দশক্তি শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে একাঙ্গে একীভূত হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর রূপে প্রকটিত। তাঁহার শুভ আবির্ভাব তিথি বৈশাখী বন্ধুনবমী।

সেই শুভ দিনের স্মরণে আমাদের উৎসবানুষ্ঠান। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন "মনের স্মরণ প্রাণ"। অনিত্য বস্তুর স্মরণে মন অনিত্য বিষয়মুখী হয়। নিত্য বস্তুর স্মরণে মন নিত্যলীলামুখী হয়।

শ্রীহরির প্রকটাপ্রকট লীলা নিত্য। শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের ভাষায়—

"এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।"

উৎসবের অনুষ্ঠান হরিনাম কীর্তন, ভাগবৎ শাস্ত্রানুশীলন ও ভক্তসজ্জনের সেবা। কীর্তনে দুঃখ বিনাশ হয়, শাস্ত্রানুশীলন আনন্দের উৎসব। "সেবা বিনা সাধ্যবস্তু কভু নাহি পায়।" কীর্তনে, শাস্ত্রচর্চায়, সেবায় আমাদের জীবন সার্থক হউক। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হউক।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব স্মরণোৎসব, মহানাম সেবক সংঘ, দুর্গাপুর, বঙ্গাব্দ ১৩৯৫।*

আশীর্বাণী

জয় জগদ্বন্ধু হরি

'মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু', নাটকটি মঞ্চস্থ হইতেছে।' শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলাকথাযুক্ত চার-পাঁচখানি নাটক হইয়াছে—শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, পতিতপাবন বন্ধুসুন্দর, সুরতকুমারী উদ্ধার, রজনী উদ্ধার ইত্যাদি। এবারের এই নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার লেখক, নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রিগণ সকলে শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণাশ্রিত। এই লীলার অভিনয় ইহাদের সাধনাঙ্গ তুল্য। আরাধ্য দেবতার লীলা চিন্তন নিত্য ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ। এই অভিনয় যাঁহারা দর্শন করিবেন তাঁহারাও সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করিতেছি এইভাবে ভাবিত হইয়া দেখিলে তাহা ভজনাঙ্গ হইবে ও গভীরতর আনন্দের আস্বাদন হইবে। ভগবল্লীলা যোগমায়ার আবরণে হয়। যোগমায়াদেবীর কৃপায় অভিনেতা-অভিনেতৃ ও শ্রোতৃসকলের হৃদয়ে বন্ধুলীলার স্ফুরণ হউক, ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে অন্তরের প্রার্থনা। জয় জগদ্বন্ধু। ❑

** 'মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু' নাটক। মহানাম সেবক সংঘ, কাশী-বিশ্বনাথ মঞ্চ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১।*

জয় জগদ্বন্ধু

শুভাশীর্বাদ

দক্ষিণ কলিকাতার ভক্তবৃন্দ প্রভুর উৎসব করিতেছে। আনন্দের কথা। গত বছরের আগের বছর এইরূপ একটি উৎসব ওরা করিয়াছিল। একটা 'স্যুভেনির' হইবে, আমাকে একটা শুভেচ্ছা লিখিতে হইবে।

শুধু শুভেচ্ছা কেন—ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আদরপূর্ণ অভিলাষ জানাইতেছি—তোমরা এ জাতীয় উৎসব ঘনঘন কর। আসল কথা উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ঠিক থাকে। ধর্মীয় উৎসবের একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে—নিজেদের ও অপরের আত্মিক উন্নতি। এমন সব অনুষ্ঠান হবে ও বক্তৃতা-ভাষণাদি হবে যাহাতে আমাদের মনঃপ্রাণ কিছু সময়ের জন্যও শ্রীভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। গতানুগতিক জীবনযাত্রা হইতে মনটাকে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখী করিতে পারি।

একটি গরুর চারিটা হাত পা-ই লাগে তাহার দেহটা বহিতে। দেহটা এখান হইতে ওখানে চলে দেহের খাদ্যের জন্য। মানুষের দেহটা বহন করিতে দুই পা-ই পারে। হাত দু'খানি তার মুক্ত হইয়াছে। এই মুক্ত হাত দিয়া গরুর মত দেহের খাদ্য অনুসন্ধান করিবে না। আত্মার খাদ্য খুঁজিবে, নিজে ভোগ করিবে, অপরকে ভোগ করাইবে। গীতা বলিয়াছেন, যে নিজের জন্য রান্না করিয়া খায় সে পাপ খায়। যে যজ্ঞ করিয়া দশজনকে দিয়া অবশেষ খায় সে অমৃত খায়।

এই উৎসবানুষ্ঠানে আমরা অমৃতের অনুসন্ধান করিব। নিজের জন্য ও অপর বন্ধু-বান্ধব

দশজনের জন্য। আত্মার খাদ্যই অমৃত। সত্তাকে অমৃতময়ের সন্ধান মিলায়।

প্রভু বন্ধুসুন্দর যে অমৃত লইয়া আসিয়াছেন তাহা তোমরা আস্বাদন কর—সকলকে বিলাও।

শুভার্থী—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

* *'বন্ধুস্মরণিকা'। মহানাম সেবক সংঘ, দঃ কলিকাতা, আগমনী স্মরণোৎসব, ১৯৯৩।*

অন্তরের কথা

গোলোকবিহারী ভূলোকে অবতরণ করিয়াছিলেন—মানুষের দেশে মানুষের বেশে, নামিয়াছিলেন—পাঁচশত বৎসর পূর্বে। ইহা একটা সংবাদ। সুসংবাদ—গভীর তত্ত্বপূর্ণ সুসংবাদ। এই বিরাট্ সংবাদের মধ্যে বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব উৎসব ও ধর্ম সম্মিলন। পাঁচশত বর্ষ ধরিয়া যে প্রেম-ভক্তির ধারা প্রবাহিত তাহারই মধ্যে একটি রসের তরঙ্গ। একই লক্ষ্য একই উদ্দেশ্য একই সংবেদন। গৌরসমুদ্রের এক অভিনব তরঙ্গ বন্ধুসুন্দরের লীলাবৈচিত্র্য। এই মাধুর্যে সকলে নিমজ্জমান থাকুক। একপ্রাণতায় সম্মিলন সার্থক হউক। এই অন্তরের প্রার্থনা।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
১২.৮.৮৬ ❑

* *'বন্ধুলীলায়ন'। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ১১৬তম আবির্ভাব স্মরণে, ১৯৮৬। সপ্তম বর্ষ। বার্ণপুর।*

জয় জগদ্বন্ধু হরি

'বিজয় ভেরী'—শুভেচ্ছা বাণী

জটিয়া-বাবা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণদেবের কল্যাণময়ী উপদেশবাণী বিশ্বের নরনারীর সমীপে প্রচারার্থে 'বিজয়-ভেরী'র প্রকাশ।

জাতীয় জীবনের এই মহা দুর্দিনে 'বিজয়-ভেরী' আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। উপযুক্ত সময়ে এই দেবপুরুষের মহাবাণী সম্পদ্ বিতরণে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। 'ভেরীর' আওয়াজ ভবভয়ে ভীত জীবনিবহের অমঙ্গল রাশি দূর করুক।

মহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯

সতত শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
২০ ভাদ্র, ১৩৯৪ ❑

* *'বিজয় ভেরী'। মহালয়া, ১৩৯৪, আবির্ভাব সংখ্যা।*

‘শ্রীঅঙ্গন’ পত্রিকা—বাণী

‘শ্রীঅঙ্গন’ নামকরণ করিয়া একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। যদি নিজ পায়ে দাঁড়াইতে পারে তবে ‘মাসিক’-এ পরিণত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

“জয় নবদ্বীপ, ভারত-প্রদীপ।”

ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের—প্রদীপ স্বরূপ নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। মানব সংস্কৃতি জড়বাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে নদীয়ায় যে প্রেমধর্মের আলোক জ্বলিয়াছিল তাহাই একমাত্র অবলম্বন।

আর দুই বৎসর পর মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পূর্ণ হইবে। বাংলাদেশে সেই পঞ্চশত বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ‘শ্রীঅঙ্গন’ পত্রিকা প্রয়াসী।

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন—“আমি সকলের, সকলে আমার”—এই বাণী অন্তরে রাখিয়া ‘শ্রীঅঙ্গন’ পত্রিকার কাজ হইবে সনাতন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী সকল ধর্মের যাহা সারকথা, যাহা জগৎ-কল্যাণকর কথা—তাহা আলোচনা করিয়া সকলের মধ্যে একতা আনয়নের চেষ্টা।

এই কার্যে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সহায়ক হইবেন—ইহাই আমার সাধ। ভক্ত শিষ্য যাঁহারা আছেন প্রত্যেকেই গ্রাহক হইয়া ও নানা ভাবে প্রচারণের সহায়ক হইয়া প্রভুর আশীর্বাদ ভাজন হইবেন।

বন্ধুসুন্দরের উদার পতাকাতলে সকলে আসুন। শ্রীঅঙ্গন পত্রিকায় কোন সংকীর্ণতা বা অনুদারতার স্থান নাই। আমাদের অন্তরে সর্বদা জাগ্রত বন্ধুসুন্দরের একটি মহাবাণী—

“মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।”

শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। —মহানামব্রত ব্রহ্মচারী □

* *‘শ্রীঅঙ্গন’। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)। মহাপ্রকাশ মঠ, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

অমরপল্লী হরিসভা—শুভেচ্ছাবাণী

জয় জগদ্বন্ধু হরি

পল্লীর নামটি সুন্দর। কাজ-কর্মও সুন্দর। খুব উদ্যোগে হরিসভা স্থাপন পল্লীবাসীদের ভক্তি পথে উন্মুখ করিতেছেন, বিশিষ্ট নাগরিকেরা মিলিয়া।

সমাজের এই দুর্দিনে ভক্তিধর্মের প্রসারতা ছাড়া রক্ষা পাবার আর গত্যন্তর নাই। ভক্তি-ধর্মকে পুষ্টি করে হরিনাম, হরিকথা, হরিসম্বন্ধী যাবতীয় অনুশীলন। হরিসভা এই কার্যের দায়িত্ব নিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণকর সকল প্রচেষ্টা তাৎপর্যমণ্ডিত। হরিসভা অর্থ হইল হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা। যে সভার সভ্যগণের সংস্পর্শে আসিলে হৃদয়ে সহজ ভাবেই হরিভক্তি জাগ্রত হইবে। অমরপল্লী হরিসভা সার্থক নামা হউক। হরিভক্তি লাভ করিয়া সকলে অমরত্বের

আস্বাদন লাভ করুক। সকলকে আশীর্বাদ করি—সকলে ভক্তিধনে ধনী হউন।

মহানাম অঙ্গন,
রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯

সতত শুভানুধ্যায়ী—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**
ইং ২৩/১২/১৯৮৮ □

** তৃতীয় বাৎসরিক উৎসব স্মরণিকা, ১৩৯৫। অমরপল্লী হরিসভা। ৬৮, যশোহর রোড, দমদম, কলিকাতা - ৭৪।*

শুভেচ্ছা বাণী

পাবনা জেলায় উল্লাপাড়া চাঁদপুরের জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর শ্রীঅঙ্গন রজে গড়াগড়ি দিবার ভাগ্য পূর্বে পাইয়াছি। আজ দানবীয় অত্যাচারে চিন্ময় বিগ্রহ অপ্রকট। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে শ্রীচিত্রবিগ্রহ ধ্যানে—দমদম পুণ্যতীর্থে ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া যে মঙ্গলানুষ্ঠান করিতেছেন তাহা আমার প্রাণের সম্পদ্। অনিবার্য-কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলেও মানসে সর্বদাই তাহাদের উদ্যম উৎসাহ আনন্দোল্লাসের সহিত একত্বানুভব করিতেছি। এই বেদনার উৎসব মাধুর্যমণ্ডিত হউক—শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি।

মহাউদ্ধারণ মঠ
কলিকাতা - ৫৪
৩০শে এপ্রিল, ১৯৭২

বৈষ্ণবভক্তকৃপার্থী
—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী □

** শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর বাৎসরিক উৎসব স্মারক পুস্তিকা, ১৯৭২*

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের বাণী

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের স্মরণে আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা। যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রমী সাধারণ নর-নারীর দারিদ্র্যই মহাবিপদ্, ঐশ্বর্যই মহা সম্পদ্। জীবন মাত্রই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহা সম্পদ্ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।

যাঁহারা যোগী সাধনাই তাঁহাদের সমর, বিষয়-বন্ধনই তাঁহাদের মহা বিপদ্, মুক্তিলাভই মহা সম্পদ্। জগজ্জননীর অর্চনায় যে যোগী সাধন-সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তিসুখে ডুবিয়া থাকেন।

মহিষাসুরমর্দিণী মধু-কৈটভ দৈত্য-সংহারিণী মহাশক্তি মহামায়ার পাদস্পর্শে সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হউক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর শান্তি বর্ষিত হউক এই নিবেদন মায়ের শ্রীচরণে।

ইং ৯/৩/১৯৯১

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী □

** 'সনাতন (অপরাজিতা)' শারদীয়া পূজাবার্ষিকী ১৪০১, মহাপ্রকাশ মঠ, ঢাকা।*

'সনাতন'—বাণী

যখন যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ এইরূপে উৎপীড়িত হইবে তখন তখনই আবির্ভূত হইয়া শত্রু নাশ করিয়া শান্তি আনয়ন করিব। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অনুরূপ বাণী বলিয়াছেন—যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুগণের রক্ষণ, দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। "সম্ভবামি যুগে যুগে।" উভয় বাণীতেই বুঝা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী দুর্গা উভয়েরই দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত জীবগণের জন্য দয়া আছে। আমাদের দুঃখ তাঁহাদের প্রাণে লাগে। ডাকিলে শোনেন। প্রয়োজন বোধ করিলে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন। অনুগ্রহ করিয়া দুঃখ দূর করেন।

মহিষাসুরমর্দিণী মধুকৈটভ দৈত্য-সংহারিণী মহাশক্তি মহামায়ার পাদস্পর্শে সমগ্র বিশ্বে শান্তি নামিয়া আসুক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর শান্তি বর্ষিত হউক এই নিবেদন মায়ের শ্রীচরণে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'সনাতন।' প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, ঢাকা, বিশেষ সংকলন, ১৪০০*

শুভেচ্ছা বার্তা

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বরিশাল জেলায় অশ্বিনীকুমার দত্তের দেশে, তা ভাবিয়া অন্তরে গর্ব আছে। কিন্তু লোকে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় সেই ফরিদপুরের, আজ ষাট বছর যাবৎ। কলেজ জীবন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। সন্ন্যাস জীবন ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলাধামে।

কয়েক বছর পাশ্চাত্ত্য দেশে ছিলাম, নিত্য ধ্যান করি আমি ফরিদপুরের। পল্লীকবি জসিম্উদ্দীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল কলেজ জীবন হইতে। ফরিদপুরের শত সহস্র সজ্জন সঙ্গে প্রীতিস্নেহের বন্ধনে বদ্ধ আছি। ফরিদপুরের ইন্দুদা, কামিনীবাবু, সতীশবাবু আপন জন ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু, অধ্যাপক সত্যবাবু, অবনীবাবু প্রমুখ সকলের অসীম স্নেহ প্রীতির কথা জীবনের সম্পদ্। কংগ্রেস কর্মী যদুবাবু, জমিদার লাল মিঞা, মোহন মিঞা সকলেই ভালবাসিতেন।

ফরিদপুর সম্মিলনীর সদস্যারা আমাকে তাঁদের লোক মনে করেন ভাবিয়া গর্বানুভব করি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। অন্তরাত্মা তাঁদের সঙ্গে থাকিবে। আগামীকাল বৎসরের প্রথম দিন। ফরিদপুরের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে ফরিদপুরের নরনারীর মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় জগদ্বন্ধু।

আপনাদেরই একজন—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

* ***'স্মারক গ্রন্থ', ১৯৮০-'৮১। 'ফরিদপুর সম্মিলনী'।***

বাণী

ব্যাংকার্স পূজা পরিষদ্ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও "জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী" পূজা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে যাবার জন্যেই আমাদের পূজা পার্বণ ও অর্চনা। এ জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের। এ জ্ঞান সত্ত্ব গুণান্বিত জ্ঞান। দেবী সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি বীণারূপিণী বাগ্‌দেবী ও সর্বশুক্লা। জ্ঞান অন্বেষণে যারা রত তাদের হতে হবে দেহ-মনঃ-প্রাণে শুচি-শুভ্র। শুভ্রতা মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করে, সকল রকম সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

পূজার্থী ও বিদ্যানুরাগী সকলের অন্তরেই মায়ের আশীর্বাদে বিদ্যা-শুভ্রতা প্রতিভাত হোক—এই প্রার্থনা রইল।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'পলাশ' শারদীয়া স্মরণিকা। ব্যাঙ্কার্স পূজা পরিষৎ, বাংলাদেশ, '৯৪।*

'শ্রীহট্টপ্রদীপ'—আশীর্বাণী

শ্রীহট্ট জেলার আর এক নাম শ্রীভূমি। কেন যে এই ভূমির সঙ্গে শ্রী যুক্ত করা হ'ল তার সাম্প্রতিক কারণ অনেকেরই জানা আছে। শ্রীসন্তদাসজী, শ্রীবিপিন পাল, ডঃ সতীশ রায় (হরিদাস নামানন্দ) প্রমুখ মহাত্মাদের ইহা জন্মভূমি।

পাঁচ শত বৎসর পূর্বেও যে এই ভূমি কত গৌরবের ছিল তাহা অনেকেরই পরিজ্ঞাত নহে। কলিপাবনাবতারী মহাপ্রভুর পিতামাতৃ-জন্মভূমি এই ভূমিতে। শ্রীগৌরহরির পার্ষদ শ্রেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত ও শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্মস্থান এই ভূমিতে। সর্বোপরি গৌর-আনা ঠাকুর 'হরিণাদ্বৈতাৎ' অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব ভূমিও এই শ্রীহট্টের পবিত্র মাটিতে।

'শ্রীহট্ট-প্রদীপ' গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার উক্ত পঞ্চ প্রদীপের পরিচয় ও লীলা কাহিনী প্রকাশ করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন।

'শ্রীহট্ট-প্রদীপ' গ্রন্থ ভক্তজনের চিত্ত আলোকিত করুক, গৌর স্মরণে সকল নর-নারীর প্রাণ উল্লাসযুক্ত করুন।

জয় গৌরহরি, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

মহানামব্রত

(ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী)

* *'শ্রীহট্টপ্রদীপ'। শ্রীবিজিতকুমার দে, মদনমোহন কলেজ, শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ, ১৩৮৯। প্রকাশিকা : শ্রীমতী সুজাতা দে। প্রকাশিকা - সুজাতা দে।*

শ্রীহরিপুরুষো জয়তি

'সনাতন সন্দেশ'—শুভেচ্ছা

একটি নূতন ত্রৈমাসিক ধর্মীয় পত্রিকা হইতেছে—নামটি সুন্দর 'সনাতন সন্দেশ'। শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে প্রার্থনা করি চির পুরাতন সনাতন বার্তা নূতন সন্দেশের রূপ ধরিয়া সকলের মুখে ও মনঃপ্রাণে নব মাধুর্যের আস্বাদন দিয়া দীর্ঘকাল জীবনধারণ করুন। বর্তমানে অতৃপ্ত সমাজকে পরাশান্তি, তৃপ্তির সুধা-দানে সঞ্জীবিত রাখুন।

শুভানুধ্যায়ী—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

---

* ***'সনাতন সন্দেশ'***। *ত্রৈমাসিক/প্রথম বর্ষ, উদ্বোধন পর্ব/গুরুপূর্ণিমা ১৪০৪। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী, সনাতন ধর্ম সেবাশ্রম, নিবাধুই, দত্তপুকুর। সম্পাদকঃ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (হরিমঙ্গল)।*

'সীতাকুণ্ড-সম্মিলনী'—বাণী

কবিগুরুর সোনার বাংলায় সাহিত্য সম্রাট-বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা-সুফলা মলয়জ-শীতলা পুণ্যভূমিতে সাধুসন্তমণ্ডলী সমবেত। তাঁহারা আজ অতি নিবিড় এক-প্রাণতায় সম্মিলিত। মিলনভূমি শোভাময়ী চট্টলায় শ্রীচন্দ্রশেখরের পাদদেশে পূত সীতাকুণ্ডে। উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গল, দেশের কল্যাণ, সহস্রধা বিভক্ত বিধ্বস্ত বাঙ্গালী জাতির শাশ্বত ঐতিহ্যকে পুনঃ সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপন।

যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা। তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ মহতী প্রচেষ্টায়, আত্মিক সংকল্পে কোন কার্য অসিদ্ধ থাকিতে পারে না। এই মহাসম্মিলনে নিশ্চয়ই মূর্ত হইয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী। জানাইয়া দিয়াছেন, যেমন দিয়াছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে—

"ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বম্।"

দেবাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মারই জয় "যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্।" ধিক্ শত ধিক্ মূঢ় পাশবিক শক্তিকে। শুদ্ধসত্ত্বময়ী ব্রহ্মা শক্তিরই জয়জয়াকার। যাহা পাপ যাহা অশিব তাহা চির অপহৃত। যাহা সত্যম্ সুন্দরম্ তাহারই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। সংশয়াতীতভাবে জাগ্রত হইবে চিরন্তনী মঙ্গলময়ী মহাশক্তি।

আপনাদের যাবতীয় শিব-সংকল্পে সঙ্গে আছি মানসে। বার্দ্ধক্য জনিত দৈহিক দূরত্ব হেতু কৃত অপরাধ ক্ষন্তব্যমিত্যলম্।'

সতত কৃপাভিখারী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

---

* *'বিপন্ন'। বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডল, ইং ১৯৯১/বাং ১৩৯৮।*

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদ্, চট্টগ্রাম, বিগত বছরগুলির মতো এবারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপন করিতেছেন। ইহা অতীব আনন্দের কথা।

মানুষ দুঃখী-দুঃখী জীব। অশেষ দুঃখে জীবন ভরা তার। এমন মানুষটি জগতে নাই যে কখনও করে নাই কোন দুঃখ ভোগ। দুঃখ-কাতর জীব নিরন্তরই করে সুখাভিলায। "সুখং মে ভূয়াদ্, দুঃখং মে মা ভূৎ"—উপনিষদের এই মন্ত্রই হইল বিশ্বের সকল মানুষের জপমালা।

সুখ চায় মানুষ, দুঃখী বলিয়াই তো, সুখ যে মানুষ একেবারেই পায় না তাহা নহে। মাঝে মাঝে পায় ক্ষণিক সুখ। সাময়িক সুখ টেঁকে না। সেই নশ্বর সুখে হয় না কাহারও পরিতৃপ্তি। মানুষ খোঁজে অন্তরে অন্তরে সেই সুখ—যে সুখ নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত, অনাবিল। যে সুখ দুঃখ-সংস্পর্শবর্জিত, নিত্য নিরতিশয়, আত্যন্তিক, সেই সুখেরই নামান্তর ব্রহ্মানন্দ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ যাহা কামনা করে তাহা ব্রহ্মবস্তুই। নিত্যকাল প্রতিক্ষণে শ্রীভগবান্‌কেই খুঁজিয়া বেড়ায় প্রতিটি জীব। মানুষ অনুসন্ধান করে তাঁহাকে, কিন্তু জানে না পথের সন্ধান।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদের ক্রিয়াকাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মাধ্যমে ও তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণের নিরিখে সে পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য ব্রতী হউক। তাঁহাদের কর্মপ্রয়াস সার্থক হয়ে উঠুক।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী □

'স্মরণিকা'। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদ্, ১৯৯২, চট্টগ্রাম।

জয় জগদ্বন্ধু

'শ্রীশ্রীচণ্ডী রহস্যলীলা'—শুভেচ্ছাবাণী

শক্তি-সাধক আচার্য মুক্তিচৈতন্য করাঙ্কিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী-রহস্যলীলা' গ্রন্থখানি পাইয়াছি। অনেকখানি পড়িয়াছি ও প্রবেশ করিতে পারিয়াছি বলিলে মিথ্যা অহংকার প্রকাশ করা হইবে। শ্রেষ্ঠ তন্ত্রসাধকের পাদমূলে নিয়ত বাস করিয়া যাঁহারা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কঠিন পথে নিয়ত চলাফেরা করেন—এই গ্রন্থ তাঁহাদের জন্যই। গ্রন্থে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের যে প্রবল চেষ্টা তাহা লক্ষ্যণীয়। পাঠ করিতে করিতে হিন্দুশাস্ত্রে যে একটি অত্যাশ্চর্য রহস্য লুক্কায়িত আছে—ইহা অনুভবে আসিবে। সাধারণ নরনারী, এখনকার দিনের অবিশ্বাসী নরনারীর জীবনে কল্যাণ আসিবে।

মুক্তি-চৈতন্য সমাজের যে মহান্ উদ্দেশ্য "সংকীর্ণ দল, গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িকতা হতে মুক্ত করা"—ঐ উদ্দেশ্য অতি মহান্। আমরা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় যদি ঐ উদ্দেশ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেশে স্বর্ণযুগ আসিবে। অলমিতি। জয় জগদ্বন্ধু।

আর্যশাস্ত্রানুরত সেবক—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** □

---

* *'শ্রীশ্রীচণ্ডী-রহস্যলীলা', (বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ/মহিষাসুরমর্দিনী) শ্রীমুক্তিচৈতন্য দাস সম্পাদিত।*

জয় জগদ্বন্ধু

শুভেচ্ছা বাণী

প্রীতিভাজনেষু শ্রীকানাইলাল—

তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়াছি। পাঠ করিয়াছি। অসুস্থতাবশতঃ হাওড়া আসা হইল না। দেখা হইলে সাক্ষাৎ ভাবেই কথা বলিতে পারিতাম। তোমার পত্র 'কালী কৃষ্ণ' সম্বন্ধে, কালী কৃষ্ণের শক্তি, সৃজনী, পালনী ও সংহারিণী শক্তি। শক্তি আর শক্তিমান্ ভিন্ন নয়। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি একই, পৃথক্ করা যায় না। তবে কেহ যদি বলে আমার চলচ্ছক্তি দর্শনশক্তি সব শক্তি আমাকে সেবা করে—তবে তা বলার। শক্তিমানের সেবা শক্তি করে—এই অর্থ লইয়া কেহ কালীকে কৃষ্ণদাসী বলে। বাস্তবিক শক্তি এবং শক্তিমান্ পৃথক্ করাই যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'কালী তুমি মৃত্যুরূপা, সুখ বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।' কৃষ্ণকে কালীর ছায়া বলিয়াছেন। দাসী বলা আর ছায়া বলা—দুই-ই অনুদার, দুই-ই সাম্প্রদায়িক ভাষা। শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"যা দুর্গা সৈব কৃষ্ণঃ। যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা।" ইহা উদার দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে চলিবে।

মহানাম অঙ্গন — ভবদীয়—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯ — ১/৮

* *'গুরুকৃপাধারা' (কবিতামালা) প্রথম খণ্ড। শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ. আন্দুল. মৌড়ী. ১৩৯২।*

শ্রীগুরু-আশীর্বাদ

একটি কবিতাগ্রন্থ—'গুরুকৃপাধারা' (২য়) হাতে আসিল। গ্রন্থণ করিয়াছেন শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ। কবিতাগুলি সুন্দর প্রাণস্পর্শী, গুরু-কৃপায় ভরপুর সাধকের অনুভূতিপূর্ণ, নিজ মর্মস্থল হইতে উৎসারিত। এগুলি মনঃপ্রাণ দিয়া আস্বাদন করা ছাড়া, কিছু মন্তব্য করা ধৃষ্টতা।

অতি বিশাল সাগরের মত তার হৃদয় উদার, একটি ছোট্ট 'ধর্ম' কবিতায় লিখিয়াছেন—

"যাতে জগৎ আছে ধৃত, অবস্থিতি যার সর্বত্র,
প্রকৃতই ধর্ম তিনি হন।
তাঁরে পেতে বহু পথ, বিশ্বে আছে বহু মত,
শুধু তারে লাভের কারণ।।"

এই ঔদার্য নিরুপম। কবির নিন্দা-প্রশংসায় সমদৃষ্টি, তাই উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"নিন্দা কুৎসা অপমান যে যা দিবে মোরে।
শ্রদ্ধাসহ তাহা আমি নেব শিরোপরে।।"

কবি অহংকারহীন, সবই গুরুদেব করান এই অনুভব তাঁর প্রাণভরা—তাই লিখিয়াছেন ঃ

* *'গুরুকৃপাধারা (২য় খণ্ড)'। শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ।*

"করুণা রূপেতে ফুটি গুরুকৃপা
করিয়া আপন হারা,
ফুটায়েছে তিনি ফুল-জলরূপে
এই গুরুকৃপাধারা।"

লেখক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন—এটি পূর্বে পড়ি নাই—অতি চমৎকারী—

"বাঁশী কহে মোর কিছু নাহিক গৌরব।
কেবল 'ফু'য়ের জোরে মোর কলরব।।
'ফু' কহিল আমি মিছে শুধু হাওয়াখানি।
যে-জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি।।" পৃঃ ১৭

কবি লেখক কানাইলাল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি ভিক্ষা চাহিয়াছেন আরাধ্য দেবতার নিকট—

"এই ভিক্ষা মাগি আমি   যেভাবে যখন থাকি।
তুমিই আমার তাই   সদা যেন মনে রাখি।।" পৃঃ ১৯

কবি কানাইলালের বিশ্ব জগতের প্রতি যে দৃষ্টি, তাহা অতি উচ্চস্তরের বৈষ্ণবোচিত—

"শ্রীকৃষ্ণই মহাসিন্ধু স্বীয় শক্তি লয়ে।
আনন্দ লীলাতে নিত্য আছেন মগ্ন হয়ে।।" পৃঃ ১০১

কবি অতি সাধারণ মাদৃশ নরনারীর জন্য স্বর্গ নরকের সংজ্ঞা দিয়াছেন সরল ভাষায়—

"প্রেম-প্রীতি হৃদয়ে যার
সংসারটাই স্বর্গ তার।।
হিংসা দ্বেষ হৃদয়ে যার।
এ সংসারই নরক তার।।" পৃঃ ১০৫।

কানাইলালের লেখায় মর্ম-ভেদী বেদনা আছে, উদ্বেলিত চেতনা আছে, যারা পরশ-পাথর খোঁজে তাদের জন্য টুকরা টুকরা রত্নখণ্ড ছড়ানো আছে। সর্বোপরি কবির কবিত্ব আছে।

কাব্যে যে সৌন্দর্য আছে তাঁহার উৎস অনুসন্ধানে পাইলাম—তিনি একটি ভাবনায় বিভাবিত—তাঁহার জীবন-যন্ত্রটিকে অবলম্বন করিয়া তার প্রাণের দেবতা কিঞ্চিৎ মধুপান করিতেছেন, তাঁহার এই ভাবনার মধুর সূত্রধারা পাইয়াছেন বিশ্বকবির বিশ্ববিখ্যাত সকল ভক্তসাধকের একটি প্রাণ-নিঙড়ানো কবিতায়। কবিতার প্রথম স্তবক তিনি উদ্ধৃতি দিয়াছেন ২২১ পৃষ্ঠায়—

"হে মোর দেবতা
ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহ
করিবারে পান।...
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

অলমিতি—
জয় জগদ্বন্ধু
একবিন্দু লুটে তৃপ্ত
দাস—শ্রীমহানামব্রত।

জয় জগদ্বন্ধু হরি

অভিমত

"গুরু-কৃপা-ধারা" গুরুকৃপায় প্রবাহিত ধারা নদীতে পরিণত হইয়া সাগর অভিমুখে চলিয়াছে। লেখনীরূপে লেখক কানাই—ব্রজের কানাইর শ্রীচরণে যে করুণার উদ্বেলিত সাগর তাহাতেই ধারার চরম বিশ্রাম।

যে কবিতাটি পড়ি সেইটিই মধুমাখা। গুরুকৃপায় স্নাত হইয়া কানাই মধুময় ঠাকুরের মধু সন্ধানে ছুটিতে ছুটিতে আস্বাদন পাইয়াছেন, নিকুঞ্জের মধুচক্রের। ঐ আস্বাদনে ভরপুর হও। আন্ চিন্তা ভুলিয়া যাও। আরও লেখ। ভূরিদা হও—প্রভুপদে এই প্রার্থনা করি।

আশীর্বাদক—
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ঝুলনযাত্রা, হরিবাসর, শ্রাবণ, ১৩৯৪
মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর।
কলিকাতা - ৫৯

* *'গুরু-কৃপা-ধারা' (কবিতামালা) তৃতীয় খণ্ড। ১৩৯৪। শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ।*

দিগ্‌দর্শন

শ্রীযুত প্রিয়নাথ শিকদার রচিত একটি ছোট কবিতা গ্রন্থ "ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি" পাঠ করিলাম।

লেখকের হৃদয় ভক্তিপ্রেম পবিত্র প্রবাহ আকারে স্থিত তাহা অনেক স্থলে উপচাইয়া উঠিয়া মাধুর্যাধান করিয়াছে। কতিপয় ভাব ও বর্ণনা অতি মৌলিক ও প্রাণস্পর্শী।

ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিধারা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য চলে না। ইহা আস্বাদনের সামগ্রী। কৃষ্ণ-কৃপায় ইহার হৃদয় পরিশুদ্ধ। কবিতাগুলি মধুরিমাস্নাত। পাঠ করিতে চিত্তে নির্মলানন্দ অনুভূত হয়।

মহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯
২২/৮/'৮৭

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

* *'ভক্তি-গীতি কুসুমাঞ্জলি' (সঙ্গীত কাকলি)। সংকলক : শ্রীপ্রিয়নাথ শিকদার, ঠাকুরনগর।*

আশীর্বাণী

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ্ বর্তমান বৎসর (১৯৭৯) 'শিশু বর্ষ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ভারত সরকারও উহা গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক নানাবিধ উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে শিশুদের কথা ক'জন ভাবে; কেহ কেহ কিছু ভাবেন, কিন্তু প্রায়শঃ সেই ভাবনা ভাবনা রাজ্যেই থাকিয়া যায়। কার্যে রূপ পায় না।

শিশুরা যে জাতির ভবিষ্যৎ এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। শিশুর উন্নতির চেষ্টা করিতেই হইবে। কেবল দেহের স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র নহে, সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক যদি শিশুমনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে।

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে গভীরভাবে ধ্যান করিয়াছেন ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সেবাবুদ্ধি লইয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমি সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি যে তাঁহার এই ভাবনাগুলি আমাদের দুর্গত জীবনে বাস্তবায়িত হউক। সত্য তত্ত্বগুলি একবার শিশুচিত্তে অঙ্কিত হইলে, ভাবীসমাজে ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িকতা আর থাকিতে পারিবে না।

আত্মিক উন্নতিই সর্ববিধ উন্নতির মূল—ইহাই একদিন ছিল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের অভিমত। আমরা যেন তাহা ভুলিয়া না যাই।

স্বাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'শিশুদেব জন্য ধর্মীয় শিক্ষা'। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব সিঁথি, দমদম, ১৯৭৯।*

আশীর্বাণী

ভক্তবর শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ লিখিত 'চণ্ডীকথিকা' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। লেখকের লেখা যাহা পড়ি সবই সুন্দর। শাস্ত্রপাঠ ব্যাখ্যাও মাধুর্য-মণ্ডিত। এই গ্রন্থে মায়ের কথা অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল ও রসাল ভাষায় কথিত হইয়াছে। ছোট বড় নরনারী সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবে।

চণ্ডী তন্ত্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অগণিত তন্ত্র গ্রন্থের নির্যাস চণ্ডী। নিখিল বিশ্ব মধ্যে একটি নিরুপম মাতৃত্ব আছে। চণ্ডীতে তাহার রূপায়ণ।

মায়ের স্বরূপটি অদ্ভুত। 'চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুরতা'—মা মমতাময়ী, মা নির্মম। এই দুই বিরোধী গুণের সমন্বয় মানব জীবনকে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যশালী করে। চণ্ডীপাঠে মানুষ কর্মক্ষম ও সুন্দর হয়।

চণ্ডী কেবল দুর্গোৎসবের তিন দিনই পাঠ্য নয়। প্রতিটি দিন ইহার পঠন পাঠন প্রয়োজন। মূল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বলিয়া অনেকেরই অসুবিধা হয়। এই কথিকা এত মধুর ও প্রাণাকর্ষী যে সপ্তশতীর সুগভীর তত্ত্ব ও মনোহারী তথ্য সমূহে সকলের প্রবেশপথ সুগম হইবে।

* *শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে 'মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও চণ্ড-মুণ্ড-মর্দনলীলা-লহরী।' রচনা ও সম্পাদনা : শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ। বার্ণপুর, ১৯৭৫।*

বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃ মাতৃভক্ত। বাঙ্গালীর জন্মভূমি বঙ্গভূমি, ভারতভূমি, বিশ্বভূমি, সকলই তাদের মা। মায়ের ডাকে বাঙ্গালীর প্রাণ সরস হয়, কর্মোদ্যম জাগে।

এই গ্রন্থের আস্বাদনে আমরা হইব কর্মকুশল, আমাদের জীবন হইবে মাধুর্যময়। চট্টরাজ, উত্তম কাজ করিয়াছেন। আপনার গ্রন্থ আমাদিগকে উত্তম করিবে।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু বিহার
আপকার গার্ডেনস্, আসানসোল।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
১৮.৮.১৯৭৫ ❑

জয় জগদ্বন্ধু হরি

শুভেচ্ছা

গৌরপদপঙ্কজমধুপ পূর্ণদা—

মধুব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাঁহার কথা স্বতঃই মধুস্রাবী। গৌরাভিন্ন শ্রীআচার্য প্রভুর ধারা আপনার বুকে প্রবাহিত। ভজনে ভাবনায় আপনি গৌরময়—তাই এত মধুমাখা আপনার গৌরগীতি আলেখ্য। পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

এই অশান্তিময় যুগে তাপদগ্ধ জীবকুলের জীবনে পরা শান্তির উৎস একমাত্র গৌরমধুরিমার আস্বাদন। এই গ্রন্থমাধুর্যে নরনারীর জীবন প্রবাহ মধুর সাগর অভিমুখে প্রধাবিত হউক। সকলে শান্তি লাভ করুক। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অন্তরের এই কামনা।

।। জয় গৌর।।   ।। জয় জগদ্বন্ধু।।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর
কলিকাতা - ৫৯
১৩ই আশ্বিন, ১৩৯২ (ইং ৩০-৯-১৯৮৫)

বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
মহানামব্রতদাস ❑

** শ্রীগৌরাঙ্গগীতি-আলেখ্য। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টরাজ, বার্ণপুর, ১৪০২।*

জয় জগদ্বন্ধু

দু'টি কথা

পুরীধামের জগন্নাথদেব ও টোটা গোপীনাথজীউর সেবাইত নিত্যধামগত শ্রীপাদ রঙ্গনাথদেব গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে বিখ্যাত সাধক পুরুষ ছিলেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সজ্জনগণ অনেকেই তাঁহাকে চিনেন। পূজ্যপাদ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ করিবার ভাগ্য ঘটাইয়া দেন। পরিচয় অবধি গোস্বামিজী আমাকে অতীব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মাঝে মাঝে কৃপাপত্র দিতেন। তাঁহার শেষ পত্রখানি এখনও আমার হাতে আছে। তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। পত্রে একথা পরিষ্কার যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহার প্রণীত 'টোটাগোপীনাথ-

** 'শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথ মন্দির কথামৃত', শ্রীরঙ্গনাথদেব গোস্বামী, টোটা গোপীনাথ মন্দির, পুরী, ১৩৭২ (২য় সং)।*

কথামৃত' গ্রন্থখানি আমি ছাপাইয়া দেই এবং উহার উপস্বত্ব শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবায় ব্যয়িত হয়। তাঁহার এই শুভেচ্ছাকে আমি বৈষ্ণবাজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা সম্বল করিয়া এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের প্রাণধন শ্রীশ্রীটোটা-গোপীনাথ। স্বভাবতঃই তাঁহার কথা ভক্তজনশ্রবণরসায়ন। আশা করি ভক্তগণ এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মাধুর্যাস্বাদন করিবেন ও শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবার আনুকুল্য করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা
১৩৭২ সাল

বৈষ্ণবদাসানুদাস
মহানামব্রত ❑

* * * *

উৎসর্গপত্র

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথ জীউর সেবাইত প্রভুপাদ শ্রীরঙ্গনাথদেব গোস্বামিজীর করকমলেষু,

শ্রীপাদ!

আপনার কৃপা আজ্ঞা পালন করাইলেন কিন্তু নিজে লুকাইয়া
গেলেন নিত্যলোকে, এ দুঃখ বুকে রহিল চিরতবে।
আজ নিত্যধাম হইতে আপনার সিদ্ধদেহের
চিন্ময় বাহু প্রসারণপূর্বক আমার পুষ্পাঞ্জলি
গ্রহণ করুন। আপনার আরাধ্য দেবতা
শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর পাদপদ্মে
অর্পণ করুন। মানসে দর্শন
প্রয়াসী রহিব।

আপনার স্নেহপুষ্ট
মহানামব্রতদাস ❑

অভিমত

'শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য-বিজয়কৃষ্ণ' নামক একটি গ্রন্থ পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি আয়তনে ছোট কিন্তু বিষয়বস্তু অতীব গম্ভীর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বেদ বেদান্ত উপনিষদ্, গীতা ভাগবত সকল গ্রন্থের মধ্যে একটি চিরন্তন সুর আছে। সেই সুরটি হইল সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সাম্য ও সমন্বয়ের। বহু উদ্ধৃতি দিয়া তিনি ইহা অতি সুন্দরভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

** শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিজয়কৃষ্ণ যোগাশ্রম। শ্রীকার্ত্তিক বসাক। নবদ্বীপ। ১৯৬২*

তারপর অতি সুনিপুণভাবে তিনটি মহাজীবনের আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর। ইঁহাদের মহাবাণী ও লীলাজীবনের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থকার পরিস্ফুট করিয়াছেন যে ঐ একই সুরলহরী, যাহা সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে সুব্যক্ত। তাহাই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত ঐ তিনটি অনবদ্য জীবনের মধ্যে। নিজ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া ইহারা একই শিক্ষা দিয়াছেন নিখিল জীব-জগৎকে। সে শিক্ষা সাম্যের, একতার, একপ্রাণতার, একাত্মতার। সে শিক্ষা সমন্বয়ের, বৈষম্যের নয় অভিন্নত্বের, ভেদভিন্নতার নয়।

বর্তমান সময় বিষমতায় বিচ্ছিন্নতায় সমগ্র মানব সমাজ সহস্রধা বিভক্ত। ইহাকে একটি পরমোদার সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে না পারিলে মানব সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। এই গ্রন্থটির পতিপাদ্য সত্য সকলে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিলেই বিশ্বের পরম কল্যাণ।

এই হেতু গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বৈষ্ণব-দাস্যভিখারী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

মহানাম অঙ্গন,
কলিকাতা - ৫৯
তাং ২৪/৯/১৯৮৫

আশীর্বচন

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"

হরিই গুরু গুরুই হরি—লোকে বলে শাস্ত্রেও বলে। কিন্তু বস্তুতঃ গুরুই হইতেছেন হরির প্রিয়তম, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামদাস বাজাজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীসুশীলকুমার স্বকীয় গুরুস্বরূপটি প্রকট করিয়াছেন। "চরিত্রায়ণ ও চিত্রায়ণ" গ্রন্থখানি প্রাণস্পর্শী উপাদেয়। বাবাজী মহারাজ ছিলেন গুরুশক্তিতে শক্তিমান। কৈশোরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অসীম কৃপানুগত্যে ব্রজবাস ও ব্রজভজনরসে নিমজ্জমানতা। আস্বাদ্য সম্পদ্ মানবে বিতরণ করিতে বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে বাংলাদেশে আনিয়া শ্রীরাধারমণ চরণদাসবাবাজী মহারাজের শ্রীকরে সমর্পণ করেন। বন্ধুকৃপায় রসাস্বাদন ও রাধারমণ কৃপায় বিতরণ সামর্থ্য—সেই সব মধুময় কথা "চরিত্রায়ণ ও চিত্রায়ণে শ্রীল রামদাস" এই গ্রন্থে শ্রীমান্ সুশীলকুমারের নিপুণতা শ্লাঘনীয়।

লীলামধুরিমা বিতরণে বাবাজী মহাশয় গৌড়মণ্ডল ও উৎকলে প্লাবন আনিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ আবার তাহা স্মরণ পথে আনিবে। "মনের স্মরণ প্রাণ" স্মরণে ভক্তবৃন্দ পুনঃ প্রাণবন্ত হইবে।

শুভানুধ্যায়ী—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'চরিত্রায়ণ ও চিত্রায়ণে শ্রীল রামদাস', সুশীলকুমার সেন, ১৩৯৫।*

জয়তু বন্ধুহরিঃ

শুভেচ্ছা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবনলীলা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নদীয়া লীলার মত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ লীলাও নিত্য শাশ্বত, জীবের ধ্যানের সম্পদ্ ইহা দর্শন করিতে হইবে সাক্ষাৎ লীলাবুদ্ধিতে, সমাহিত চিত্তে।

এই লীলা দর্শনের ফলে আমাদের মনঃপ্রাণ হইবে সত্ত্বগুণময় ও জীবন হইবে ঈশ্বরোন্মুখী। নিত্যলীলা জয়যুক্ত হউক। লীলাব দর্শকবৃন্দও জযযুক্ত হউন।

মহানাম সেবক সংঘ, **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

আসানসোল, আগষ্ট, ১৯৭৭

[১] *'মহানাম সেবক সংঘ স্মরণিকা'। আসানসোল-বার্ণপুব, ১৯৭৭।*

শুভেচ্ছা বাণী

মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দবের অমৃতময় লীলাকথা অনেক ভক্ত মহাজন গদ্যে পদ্যে ও গানে প্রকাশ কবিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী (বন্ধুকথা), শ্রীপাদ মহেন্দ্রেজী (জগদ্গুরু), শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী (মহানাম মালা), গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী (বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী, ১০ খণ্ড), মহেন্দ্র কাব্যতীর্থ (বন্ধুবার্তা) ও লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর (বন্ধুলীলা-সুধানিধি, ৩ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী সংগীতে এই বন্ধুলীলা সংকীর্তন প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থে বন্ধুসুন্দরের চারিটি লীলার বর্ণনা আছে। আবির্ভাব লীলা, রজনী উদ্ধার লীলা, সুরতকুমারী উদ্ধার ও হরিসভায় বন্ধুহরি।

লীলা কথাগুলি তথ্যভিত্তিক সুলিখিত। সুরে-তালে মহাজনী পদাবলী কীর্তনের পর্যায়ে উন্নীত। রমেশচন্দ্র একাধারে সুলেখক ও মধুকণ্ঠ, রাঢ়দেশী কীর্তনীয়া। তাঁহার লিখিত পদগুলি যখন তাহার মুখে শুনিয়াছি তখন মনঃপ্রাণ বিগলিত হইয়াছে। যিঁনি নিবিষ্টমনে শুনিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন।

এই বন্ধুলীলা কীর্তন সর্বত্র ভক্তমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করুক—প্রভু পাদপদ্মে এই আন্তরিক প্রার্থনা।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা কীর্তন'। শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ১৪০১।*

জয় জগদ্বন্ধু হরি

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথি বৈশাখী সীতানবমী বাংলাদেশের পঞ্জিকা 'শ্রীশ্রীবন্ধুনবমী' বলিয়া লিখে।

এই উপলক্ষে আসানসোল-বার্ণপুরের মহানাম সেবক সঙ্ঘ একখানি স্মারক গ্রন্থ করিতেছেন। স্মারক গ্রন্থে থাকিবে মধুব্রহ্মের মধুময় লীলা স্মরণ। লীলার স্মরণই সাধক জীবনের জীবাতু। শ্রীহরি ধরাধামে আসিয়া এমন মধুময় লীলা করেন। যাহা শ্রবণ করিলেই চিত্ত তদ্ভাবান্বিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তন্মাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ‌ ‌ ‌ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"

জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই লীলায় আসেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন 'সাধন স্মরণ লীলা' লীলা স্মরণই জীবের সাধন। লীলাকথার যত আলোচনা হয়, যত আস্বাদন হয় ততই জীবের কল্যাণ। এই কল্যাণময় স্মরণিকা ভক্তসজ্জনের গৃহে গৃহে বিরজিত থাকিয়া অপার্থিব মঙ্গলাধান করুক। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

** 'বন্ধুলীলায়ন', ১৯৮০। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু আবির্ভাব স্মবণোৎসব কমিটি, বার্ণপুর।*

'গীতামঞ্জরী'—শুভেচ্ছা বাণী

প্রীতিভাজন ডাঃ শ্রীবিষ্ণুপদ!

'গীতা-মঞ্জরী' আপনার শ্রীগীতার পদ্যানুবাদ গ্রন্থটি হাতে পাইলাম, সাদরে পাঠ করিলাম। আনন্দিত হইলাম। আপনি শুধু দৈহিক চিকিৎসক নহেন, আত্মিক চিকিৎসকও বটে। সুদূর ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী হইয়াও বাংলাভাষীদের ভুলেন নাই, ইহা শ্লাঘনীয়।

'গীতা-মঞ্জরী' সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল, সাবলীল। সহজেই অর্থজ্ঞান জন্মে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরের বাণী হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থরত্ন গৃহে গৃহে সমাদৃত হইলে অশেষ কল্যাণকর হইবে।

আপনাকে, আপনার সহধর্মিণী মঞ্জুদেবীকে, পুত্রদ্বয় দীপাঞ্জন ও নীলাঞ্জনকে জানাই আন্তরিক আশীর্বাদ।

গীতাগ্রন্থের জ্ঞানসিদ্ধ আপনাদের জীবনপথে উজ্জ্বল বর্তিকারূপে বিরাজমান থাকুক।

মহানাম অঙ্গন,
রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯

সতত শুভানুধ্যায়ী—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা, ১৪০১ ❑

'গীতা মঞ্জরী' পদ্যানুবাদ। ডাঃ বিষ্ণুপদ হালদার, বিবেকানন্দ মঠ, ব্যারাকপুর।

'ভারতীয় সংহতি...'—শুভেচ্ছা বাণী

'স্বামীজী অনুধ্যানে জাতীয় সংহতি'—আপনার লিখিত অতুলনীয় গ্রন্থখানি হাতে পাইয়া, এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়াছি। আপনার বিশ্লেষণ অনবদ্য, আপনার অনুধ্যান সুগভীর। আপনি পুণ্যশ্লোক স্বামীজীর সার্থক ব্যাখ্যাতা। স্বামীজী দিশাহারা জাতির দিশারী—আপনার মৌলিক আলোচনার আলোকে, তাহা সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ...স্বামীজীর আশীর্বাদপূত আপনার লেখনী থামাইবেন না। মর্মস্পর্শী প্রেরণা দিয়া অচলায়তন (ভারত)-কে উদ্বুদ্ধ করুন। ❑

* *'ভারতীয় সংহতি, বিশ্বসংহতি ও বিশ্বশান্তি' (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুধ্যান), শ্রীমণীন্দ্রনাথ আচার্য, ১৯৮৭, কলকাতা - ৮৭।*

'শ্রুতিধারা'—অভিমত

শুকদেব-জয়দেব-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীনিবাস-বিশ্বনাথে যে স্তবমাধুর্যের গঙ্গোত্তরী রামকৃষ্ণ-সাগরসঙ্গমে—তাহাতে গভীরে অবগাহনে শুচি, স্নাত, পূত হইলাম। কি স্নিগ্ধ, সান্দ্র; অনবদ্য! কবিরাজ গোস্বামীর পরেও চিত্তে যে ভ্রান্তি জাগিত—সে ভ্রান্তির চরম নিরসন রামকৃষ্ণদাসজীর অবদানে। গ্রন্থরত্ন কণ্ঠহার করিলাম। রসিক, ভাবুক ও আস্বাদক কেহই পরাঙ্মুখ থাকিবেন না—এই আশাবন্ধ অন্তরে।

* *'শ্রুতিধারা' (২য় সং)। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস, মিলনগড, হুগলী। ১৩৮৩।*

জয় জগদ্বন্ধু

'করুণাময়ী মা অন্নপূর্ণা'—অভিমত

শ্রীসুকুমার—সুন্দর কুমার!
আপনার যেমন নামটি তেমন বইটি লিখেছেন
সুন্দর অতি সুন্দর
পড়তে লাগলো ভালো অতি ভালো
যাঁর কথা লিখেছেন তিনি তো
মায়ের সঙ্গে একাকার উজ্জ্বল আলো
মাকে বলিবেন
তাঁর অনেক ভক্ত মধ্যে আমিও
একজন স্নেহ-ভিখারী

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

মহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯
২. ১০. ১৯৯৬

* *'করুণাময়ী মা অন্নপূর্ণা' (৩য় খণ্ড)। শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৬। সুজন পাবলিকেশন, হুগলী।*

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এসেছিলেন ধরায় ৫০০ বছর আগে। তাঁর নাম-গুণ-লীলা নিয়ে আস্বাদন করে জগৎময় ছড়াতে জগদ্বন্ধুর আগমন।

আপনাদের সকলের মনঃপ্রাণ গৌরময় বন্ধুময়। সকলে সর্বদা গৌর নাম স্মরণ করুন। জয় গৌর—জয় জগদ্বন্ধু অভিন্ন স্বরূপ।

আপনাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হোক। জয় জগদ্বন্ধু।

২/৭/১৯৮৫ **গুরুদেব** ☐

* *'আঙ্গিনা' । ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৯২)।*

জয় জগদ্বন্ধু

কলকাতা নাগরিক সংবর্ধনা—আশীর্বাণী

মুখোপাধ্যায় বা মুখ্য উপাধ্যায় শ্রীরমারঞ্জন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন সকলের জন্য একটি আশীর্বাদবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে কারণ, বার্ধক্যে আমার কণ্ঠ ক্ষীণ।

বৈষ্ণব-আচার্যেরা বলেন—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"। আমরা সকলেই একজন পরম পুরুষের দাস্যে স্থিত। সুতরাং সকলেই সমান। আশীর্বাদ জানাইবার অধিকার কোথায়? তবে মনে হয় উপস্থিত সকলের অপেক্ষা বয়সে বড় আছি। বয়সটা ঘটনাচক্রে পাওয়া। ইহার কোন বিশেষ দান নেই। বয়সটা বহু অভিজ্ঞতা ভরা একটি ভাঙ্গা পেটরার বোঝা বহন করে মাত্র।

সুরেন্দ্রনাথ বা 'সা-রে-ণ্ডা-র-নট্'-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল প্রবাহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তারপর তিরিশ বছর ব্যাপী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দাম আন্দোলনের ফলস্বরূপ ভারত-ভঙ্গও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখন দুর্নীতির পথে ভারতবর্ষের সবেগে প্রধাবনও ভগ্নচিত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অক্ষমের মত অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া গত্যন্তর খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আশীর্বাদ করিতে পারি না। কিন্তু আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে পারি সকলের জন্য। যিনি নিখিল বিশ্বের পরম কল্যাণময় প্রভু, সেই পরমপুরুষের শ্রীচরণকমলে। অতি কাতরভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া করুণ কণ্ঠে বলি—হে প্রভু! যখন তুমি আমাদের মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ তখন শুদ্ধ মনুষ্যত্বে স্থিত কর। প্রত্যেক মানবকে ভাইবোনকে মনুষ্যত্বের মহাধর্মে সমুন্নত কর। সকলের চিত্তক্ষেত্র আকাশের মত উদার কর যেন সকলে সকলকে বুকে তুলিয়া ভালবাসিতে শেখে। সকলের হৃদয়ে সুপ্ত বৈদিক অখণ্ডতা ও অভে
দানুভূতি প্রাণবন্ত কর। "মা বিদ্বিষাবহৈ", "সর্বে সুখিনঃ সন্তু", "স্বস্তি নঃ বৃহস্পতির্দধাতু"। জয়
j।

মহানাম অঙ্গন **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ☐
১৯/৯/১৯৯৮

* *কলকাতা নাগরিক সংবর্ধনায় (নজরুল মঞ্চ, দঃ কলকাতা) প্রদত্ত বাণী।*

জয় জগদ্বন্ধু হরি

রাজধানী শহর আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য

মানবধর্ম সম্মেলনে আশীর্বাণী

আগরতলাবাসী-সজ্জনবৃন্দ-করকমলেষু,

গত বৎসর মানবধর্মকে ভিত্তি করিয়া আগরতলায় অভূতপূর্ব সংকীর্তন শোভাযাত্রা ও উৎসব হইয়াছিল। শোভাযাত্রাটি সর্বজনের আনন্দদায়ক হইয়াছিল। এই হেতু বলা যায় আশাতীতভাবে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই সকলের ইচ্ছা ঐরূপ একটি অনুষ্ঠান এবারও হউক। আমার ইচ্ছাও একান্তভাবে তাহাই। শুনিয়াছি ব্যয়ভার ও শ্রম লাঘবের জন্য উৎসব ছোট আকার হইবে। যদি অনুষ্ঠানটি প্রতি বৎসর করিবার সাধ থাকে তাহা হইলে ছোট করাই যুক্তিযুক্ত।

ধর্ম সংগঠিত হইলেই শক্তিশালী হয়। নিজ নিজ সাধনপথে স্থিত থাকিয়া অপরের সঙ্গে একপ্রাণতায় অগ্রসর হওয়ার সামর্থ একমাত্র হিন্দু ধর্মেরই আছে। মানবধর্ম শব্দটি কবিগুরুর বা আমার তৈয়ারী নয়। মনুর লিখিত সুপ্রাচীন গ্রন্থটির নাম 'মানবধর্মশাস্ত্র'। মানবধর্ম যত সুগঠিত হইবে ততই বিশ্বমানবের মহাকল্যাণ।

তাং ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ নিবেদক—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন

রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯

'ভক্তপ্রসঙ্গ'—ভূমিকা

নারায়ণীদেবী এখন অমৃতলোকে। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঘটিল না। তাঁহার অন্তরের পরিচয়ও জানিতাম—বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধীয় তাঁহার সুগভীর আলোচনাপূর্ণ নিবন্ধে। তাঁহার অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থ সম্বন্ধে সদ্য পরিচয় ঘটিল। সেগুলি পড়িয়া চমৎকৃত হইলাম একথা ভাবিয়া যে, ভক্তজীবনের তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ শাস্ত্রসমূহে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতেন।

সম্প্রতি-কতিপয় ভক্তজীবনের কথা সম্বলিত 'ভক্ত-প্রসঙ্গ'—গ্রন্থখানি দর্শন করিলাম। আমার দায়িত্ব ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়া দেওয়া।

'শ্রীচৈতন্য অনুস্মৃতি'—নিবন্ধে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। দুই-এর অমিল ও মিল দেখাইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারা জীবন ভরিয়া মা কালীর ভজনা করিলেও শেষকালে অদ্বৈতভাব লাভের

* *'ভক্তপ্রসঙ্গ', নারায়ণীদেবী। প্রকাশিকা : শ্রীমতী হেমলতা দাস। শ্রীনিগমানন্দ মন্দির। সাঁতরাপুর রোড, ভুবনেশ্বর* - ২। ১৩৯৭।

জন্য জ্ঞান-অসি সহায়ে মাকে দু'খানা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রায়ই বলিতেন—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচল বেঁধে তারপর যা কিছু করগে"—এই ঐকান্তিক জ্ঞাননিষ্ঠা মহাপ্রভুর জীবনে নাই। মহাপ্রভু চিরকালই শুষ্কজ্ঞান-বিরোধী। মহাপ্রভুর জীবনের মূল সুর—মধুরভাব সহায়ে প্রেমভক্তি লাভ। তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাই।

কামিনী-কাঞ্চন বর্জন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। বিষয়ের সঙ্গ পরিহার এবং নারীসঙ্গ বর্জনের দিক্ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোরতা মহাপ্রভুব অনুরূপ। উভয়েই ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং কামিনী-কাঞ্চন পরিহারের উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজেদের জীবনে তাহা রূপায়িত করিয়াছেন। পরম ভক্ত প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভু বিষয়ী বলিয়াই নির্মমের মত প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। উভয়েরই অন্তরেব গভীবতা ও অন্তরের পবিত্রতা একই প্রকার।

এই নিবন্ধে নারায়ণীদেবী একটি সুন্দর নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—জ্ঞানী আর ভক্তে কোনই পার্থক্য নাই। যাঁরা ভক্ত তাঁদের ভিতরটা জ্ঞানে ভরা। যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের অন্তরটা ভক্তিতে ভরা। ঠাকুরের একটি দৃষ্টান্ত আছে 'হাতীর দুই রকম দাঁত। এক জোড়া বাইরে দেখানোর জন্য আর বাকী সব ভিতরে খাওয়ার জন্য।' হাতীর দুইরকম দাঁতের দৃষ্টান্ত দিয়া নারায়ণীদেবী বলিয়াছেন, হাতীর মত সাধুদেরও দুই পাটী দাঁত। কাহারও জ্ঞান বাহিরে, ভক্তি ভিতরে। কাহারও ভক্তি বাহিরে, জ্ঞান ভিতরে। ঠাকুরের বাহিরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তির প্রবাহ। মহাপ্রভুর বাহিরে ভক্তির প্লাবন, অন্তরে জ্ঞানের গম্ভীর হিমশিখর।

'ভক্তবীর'—এই নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তাঁহার বিশেষণ দিয়াছেন 'ভক্ত-বীর'— একটি আশ্চর্য বিশেষণ। সকলেই তাঁহাকে জানে 'জ্ঞান-বীর।' তাঁহার কথা মনে হইলে আচার্য শঙ্করের কথা মনে আসে। তাঁহার 'বেদান্ত-কেশরী' উপনাম সার্থক। স্বামীজী পরমভক্ত—এই তথ্যটি স্থাপন করিতে নারায়ণীদেবী স্বামীজীর প্রতি একটি নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

নারায়ণীদেবীর চারিটি যুক্তি—(১) তাঁহার প্রাণের দেবতা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছে—'নরেন ভক্ত', নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন। (২) গীতা বলিয়াছেন 'চতুর্বিধ সুকৃতি' আমাকে ভজনা করে—তন্মধ্যে জ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী 'এক ভক্তি'—জ্ঞানী আমার আত্মার সমান। জ্ঞানী সর্বদা যুক্ত-আত্মা। স্বামী বিবেকানন্দ এই স্তরের ভক্ত। (৩) বৈষ্ণব মহাজন শ্রীজীব গোস্বামী উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন—"প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্ত উত্তমো মতঃ। শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।।" ইহার প্রত্যেকটি কথা তথ্য ও যুক্তির দ্বারা নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে স্বামীজী এই স্তরের ভক্ত। (৪) স্বামীজী প্রায়শঃ দু'টি গান গাহিতেন। যাহা গাহিতেন তাহা অন্তর দিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন ঠাকুর স্বয়ং।

(ক) "মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
কেন ভ্রম অকারণে।"

(খ) "যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।"

গানের এই ভাষা ও ভাব উত্তম ভক্ত ছাড়া উৎসারিত হইতে পারে না। বাস্তবিকই প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল স্বামী বিবেকানন্দকে নূতন করিয়া দেখিলাম। ভক্তির আবরণে স্বামীজী ছিলেন বৈদান্তিক-শিরোমণি। শ্রীমতী ম্যাকলয়েডকে স্বামীজীর লিখিত একটি চিঠিতে আছে— "গুরু নেতা আচার্য বিবেকানন্দ মারা গেছে, পড়ে আছে শুধু আগেকার সেই বালক, প্রভুর সেই শিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।"

এই ভাষাটি কি ভক্তোত্তম সাধকের নয়?

নারায়ণীদেবীর অপর একটি প্রবন্ধ **'শ্রীশ্রীবলরাম'**। শাস্ত্র বলিয়াছেন—বলরাম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—কৃষ্ণের কায়ব্যূহ। কৃষ্ণের তিনি প্রকাশমূর্তি—ভগবান্‌ই। কবি জয়দেব তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যে স্তব করিয়াছেন। নারায়ণীদেবী বলিয়াছেন তিনি ভগবান্ হইলেও ভগবানের সেবা-বিগ্রহ। উত্তমভক্তের মত তাঁহার কার্য কৃষ্ণের সুখবিধান। ভাগবতের লীলাতে ইহা যতটা পরিব্যক্ত হয়নি; যতটা হইয়াছেন বলরাম যখন নিজেই সেবার বিগ্রহ হইয়া আসিলেন নিত্যানন্দ রূপে। তখন দেখা গেল নিতাইরূপ বলরাম গৌরসেবা ছাড়া কিছু জানেন না। নিতাই ছিলেন গৌরময়।

নিতাই জপয়ে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নিতাইর মুখে নাহি আর অন্য।।

নিতাই ভক্ত-গোষ্ঠীর শিরোরত্ন। সেবাবিগ্রহ-নিত্যানন্দের প্রেম-সেবা যে কত মধুময়, নারায়ণীদেবী তাঁহার প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। সবই শাস্ত্রের কথা। পাঠ করিলে পাঠকের মনে হইবে অনেক অভিনব মাধুর্যময় তত্ত্ব—তাঁহার অধিগত হইয়াছেন।

'ভক্ত প্রসঙ্গ'র চতুর্থ নিবন্ধ **'ভক্তোত্তম সনাতন'**। গৃহাশ্রমে সনাতন ছিলেন বাদশা হোসেন শাহের মন্ত্রী। তিনি ছিলে ব্রাহ্মণ কুমার। চাকুরী করিতেন অব্রাহ্মণের এবং সর্বদা ভাবিতেন আমি নীচজাতি, নীচসঙ্গী, পতিত অধম। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের কাছে সনাতন প্রশ্ন করিয়াছিলেন— 'কে আমি?' তীব্র দৈন্যে তিনি যে নিজের পরিচয় হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সনাতন ভিতরে বাহিরে দ্বন্দ্ব লইয়া কী করিয়া তিনি অহিন্দুর মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিবেন ইহা জানিতেই তিনি মহাপ্রভুর উপদেশ প্রার্থী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু পত্রে উপদেশ দিয়াছিলেন— "সংসারে থাকিবে ভ্রষ্টা মেয়ের মত—পাছে তাহাদের মনঃচাঞ্চল্য ধরা পড়ে এই জন্য পরপুরুষাসক্তা কুলস্ত্রী গৃহ-কর্মে বেশী করিয়া মনোযোগ দেয়—অথচ মনে মনে সে তন্ময় থাকে প্রিয়জনের চিন্তায়।" এই পত্র পড়িয়া সনাতন বুঝিলেন সদ্বৈদ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন।

একদিন শুভ প্রভাতে সংবাদ পাইলেন—সন্ন্যাসী গৌরহরি রামকেলী গ্রামের দিকে আসিতেছেন। রামকেলী গ্রামেই সনাতনের বাস। হোসেন শাহ প্রধানমন্ত্রী সনাতনকে নিভৃতে প্রশ্ন করেন—'দবীরখাস, বলিতে পার সন্ন্যাসীটি কে? যিনি লক্ষাধিক লোক লইয়া আমার রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছেন। রাজ-চরিত্র অভিজ্ঞ সনাতন পাল্টা প্রশ্ন করেন—আপনি রাজা, হিন্দুরা বিষ্ণু অংশ মনে করে রাজাকে। আপনি বলুন দেখি—'কী মনে হয় আপনার? কে এই সন্ন্যাসী?' শেষে তিনি বলিলেন—

"শোন মোর মনে ইহা লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর এই নাহিক সংশয়।।"

বাদশার উক্তিতে সনাতন চমৎকৃত হইলেন। গভীর রাত্রে দুই ভাই সাধারণ বেশে আসিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দের পায়ে ধরিলেন—প্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়া দেবার জন্য। নিত্যানন্দ বলিলেন,—এসো, প্রভু সারাদিন তোমাদেব প্রতীক্ষায় আছেন। প্রভু তাদের আশা-পথ চেয়ে আছেন জেনে সনাতনের আনন্দ যত হ'ল তার চেয়ে ক্ষোভ হল অনেক বেশী। আমার প্রারব্ধ এমনি যে তিনি আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন তবু আমার বিষয় বাসনা ঘুঁচে না। নিজেকে খুব বিষয়াসক্ত বাসনার দাস মনে করিতেন। সনাতনের আর্তিতে মন ভরে যায়।

মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্র সনাতনের মনে হ'ল মনেব মানুষকে দেখতে পেয়েছেন তিনি। দণ্ডবৎ করে সনাতন বললেন—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপধারী চ কশ্চন।
পরিহারোঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।।"

"হে পুরুষোত্তম, আমার মত পাপাত্মা, আমাব মত অপরাধী আর কে আছে? এত পাপ আমার যে সে জন্য দীনতা কবতেও আমার লজ্জা। পাপে যদি লজ্জাই আছে, তবে পাপ করলাম কী করে? এই ভেবে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেও সাহস হয় না। কিন্তু তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা ছাড়া আমার যে গতি নাই।" সনাতন বললেন—"তোমার সামনে আর যা বলব তাই মিথ্যা হবে, কেবল একটি পরম সত্য কথা আমি বলতে পারি। নাথ, আমায় যদি তুমি দয়া না কর, তবে জগতে তোমার দয়ার পাত্র দুর্লভ। আমার মত এমন দয়ার পাত্র তুমি আর পাবে না।"

সনাতন গোস্বামীর প্রবল দৈন্য ছিল তা আমরা সকলেই জানি। নারায়ণী দেবী তাহাকে এত অনবদ্য ভাষায় বর্ণিয়া তুলিয়াছেন যে পড়িতে আরম্ভ করিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন বলিয়াই এত বড় দৈন্যের খনি হইতে পারিয়াছিলেন। "উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করি মানে।"—মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যের জীবন্ত বিগ্রহ সনাতন গোস্বামীপাদ। তিনি ছিলেন নিখিল ভক্তমণ্ডলীর শিরোভূষণ। কিন্তু নিজেকে ভাবিতেন সকলের পদলগ্ন ধূলির একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণ।

নারায়ণীদেবীর অপর নিবন্ধ **'অজামিল কথা'**। অজামিলের কথা আমরা সকলেই জানি। এই জানি যে মহাপাপী অজামিল মৃত্যু সময় নিজ পুত্রকে নারায়ণ নামে ডাকিয়াছিল বলিয়া যমদূতকে পরাস্ত করিয়া বিষ্ণুদূত তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নামের এত মহিমা—হেলায় শ্রদ্ধায় নামাভাসেই মুক্তি হয়—এই কথা বলিয়া পাঠক-পণ্ডিতরাও তৃপ্তি লাভ করেন। সাধারণ নর-নারীও উল্লসিত হয়। কাহিনীটি মোটেই এইরূপ নয়। ভাগবতশাস্ত্র অবলম্বনে নারায়ণীদেবী আমাদের তাহাই উপহার দিয়াছেন।

কান্যকুব্জে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ, স্বভাব ছিল সংযত সুশীল। এক কথায় আদর্শপুরুষ। তাঁহার পত্নী ছিলেন সতী-স্বভাবা। সহধর্মিণীকে লইয়া ঋষি নির্দিষ্ট সদাচারের পথে ব্রহ্মলক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু প্রারব্ধ এমন ভয়ানক, এহেন

জ্ঞানীলোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। এক প্রতিবেশীর কুৎসিত কামময় দৃশ্য দর্শন করেন। দুর্দমনীয় মনকে কোনরকমে ফেরাতে পারলেন না। কুৎসিত বিষয়ের ধ্যানের পরে তিনি স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন। সাধুচরিত্র অজামিল হইয়া উঠিলেন এক কু-ক্রিয়াসক্ত ব্যাভিচারী। দুষ্টা সংসর্গে অজামিলও দ্রুত অধঃপতনে নামিয়া গেল। এক দাসীর গর্ভে তাহার বহু সন্তান জন্মিল। তাঁহার ছোট শিশুর নাম ছিল নারায়ণ। ৮৮ বৎসর বয়সে সেই অজামিলও শিশুর মায়ায় বাঁধা পড়েছিলেন। অজামিলও পাপে তলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুত্র নারায়ণ নামের সূত্র ধরে ঠাকুর আবার তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন। মৃত্যু সময় ভগবানকে আরাধনার জন্য পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন। অজামিল দেখিলেন তিন জন যমদূতের বিপরীত দিকে চার জন বিষ্ণুদূত। বিষ্ণুদূত বলছে—"হউক না পুত্র-বুদ্ধিতে তথাপি নারায়ণ নাম উচ্চারণের ফলে নারায়ণ যমদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন।" তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকাইয়া দেখেন এক কোণে শয্যায় পড়ে আছেন তিনি। সে ভাবিল—"ও, কত নীচে আমি পাপাত্মা, কত ঊর্দ্ধে মঙ্গল বিধান নারায়ণ নাম।"

ক্রমে বৈরাগ্য আসিলে গঙ্গাতীরে যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যত দ্রুত অধঃপতনের পথে নামিয়া ছিলেন তত দ্রুত উচ্চদিকে অগ্রসর হইলেন। তারপরে যখন মৃত্যু আসিল তখন তিন-চারজন দেবপুরুষকে আবার দেখিলেন। মৃত্যুর পর অজামিলও আগের মত ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিলেন।

অজামিলের দেহত্যাগ গঙ্গাতীরে। মুক্তিলাভ ভক্তিযোগে। নামের উচ্চারণ ইহার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্বরূপ। এইরূপ দৃষ্টান্ত নিখিল শাস্ত্রে এই একটিই আছে।

নারায়ণী দেবীর আর একটি প্রবন্ধ—'**মহাভিক্ষু ও মহাস্থবির**'—বিষয় বিদ্যানুরাগ। রত্নাকর দস্যু যেমন নারদের কৃপায় বাল্মিকী হইয়াছিলেন, অহিংসক নামক এক ব্রাহ্মণকুমার পরবর্তীকালে দস্যু অঙ্গুলিমাল বুদ্ধদেবের কৃপায় অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের পুরোহিত-পুত্র অহিংসক—অঙ্গুলিমাল। দস্যু অঙ্গুলিমাল শত শত পুরুষ নারী হত্যা করিয়াছেন বিনা দোষে শুধু বিদ্যালাভের জন্য। দস্যু অঙ্গুলিমালের নাম রাজ্য-বিখ্যাত ছিল। রাজা প্রসেনজিৎ তাহাকে পাইলে শিরশ্ছেদ করিবেন বলিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। অঙ্গুলিমাল পলাতক হইল। অঙ্গুলিমাল এক বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। সেই বনের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবও যাইতেছিলেন। বুদ্ধদেবকে দেখিয়া অঙ্গুলিমাল তাঁহাকে ধরিবেন বলিয়া ছুটিলেন। বুদ্ধদেব ধীরপদে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। অঙ্গুলিমাল প্রাণপণ দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। অনেকটা নিকটবর্তী হইয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনাকে আমি ধরিতে পারিতেছি না কেন?' বুদ্ধদেব বলিলেন, 'আমি মুক্ত তুমি বদ্ধ। তাই আমাকে ধরিতে পারিতেছ না।' দস্যুর কাতর প্রার্থনা আন্তরিক ছিল। তাই বুদ্ধ তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষুব্রত দিলেন—সে তপস্যা করিয়া অর্হতত্ত্ব লাভ করিল।

শত শত নরঘাতী দস্যু রত্নাকর যেমন বাল্মিকী হওয়ার পর ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ পাখীর একটিকে বধ করিতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, নরঘাতক অঙ্গুলিমালও একদিন এক গর্ভবতী মহিলার প্রসব ব্যাধির আর্তনাদে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কীভাবে তিনি সেই বেদনা দূর করিয়াছিলেন তাহা এক অলৌকিক ব্যাপার। নারায়ণীদেবী মধুর প্রাঞ্জল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ণনায় বুদ্ধগ্রন্থের এই কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন।

গ্রন্থের পরবর্তী নিবন্ধ **'ভক্ত টিনান'**-এর কাহিনী। টিনানের বাড়ী দক্ষিণ দেশে। শিবপুরম্ মন্দিরের পাশেই। টিনান ব্যাধের ছেলে। বাল্যকাল হইতেই পশুবধ তাহার কার্য। একদিন এক বন্য বরাহের পিছনে ছুটিয়া টিনান গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলে। বনমধ্যে কপালেশ্বর শিবমন্দিরের বিগ্রহ দেখিয়া কেন জানি কোন পূর্ব জন্মের কর্মফলে সে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। টিনান প্রত্যহ যাইত কপালেশ্বর দর্শনে। দর্শন করিয়া তাঁহার মনঃপ্রাণ আনন্দে নাচিত। একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল ভোগ নিবেদন করে। পশুর কাঁচা মাংস ছাড়া টিনানের আর কোন পূজোপকরণ ছিল না। সে প্রত্যহ তাহা দিয়া ভোগ দিত। পূজারীরা পূজা করিয়া চলিয়া গেলে নির্জন মন্দিরে গিয়া সে এ কাজ কবিত। পূজারী ঠাকুররা মন্দিরে রক্তের ছিঁটা দেখিয়া গোপনে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহারা টিনানকে একদিন ধরিয়া ফেলে। কাঁচা মাংস ভোগ দিয়া টিনান তখন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে। পাড়ার লোক আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্‌যোগ করে। তাহার দুইটা অপরাধ। (১) অস্পৃশ্য হইয়া মন্দিরে ঢুকিয়াছে ও (২) কাঁচা মাংস দিয়া মন্দিরে ভোগ লাগায়। সবাই যখন টিনানকে বধোদ্যত তখন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। পাথরের বিগ্রহের চক্ষু ফাটিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। টিনান তখন তাহার নিজের চক্ষু উৎপাটন করিল। ঠাকুরের অঙ্গে লাগাইতে গেল। নিজে অন্ধ রহিয়া যথাস্থানে চক্ষু লাগাইতে পারিতেছিল না। ঠাকুর তখন তাহার হাত হইতে চক্ষু নিয়া যথাস্থানে লাগাইলেন। তাঁহার রক্তপড়া বন্ধ হইল। টিনানের ভক্তি ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখিয়া জনমণ্ডলী বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া গেল। কত বড় ভক্তিমান সাধক তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিল।

বহু শতাব্দী পূর্বের এই কাহিনী। আজও সেই শিবমন্দির আছে—পাশে টিনানের বিগ্রহও আছে। অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে আজও সেখানে কাঁচা মাংস দিয়া ভোগ দেয়। কাহিনীটি চমৎকার। নারায়ণীদেবীর বর্ণনা-চাতুর্যে যেন আরও প্রাণস্পর্শী হয়েছে।

এই সব কাহিনীর বর্ণনে নারায়ণীদেবীর হৃদয়স্থ শুদ্ধা-ভক্তির একটি আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা অনবদ্য। ভূমিকা লিখিলাম না। গঙ্গাজল দিয়াই মা গঙ্গার অর্চনা করিলাম। ❑

আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন করুণাঘন অবতার। সমাজে হীন, পতিত, অত্যাচারিত উৎপীড়িত মানবকে অশেষ কারুণ্যে কোলে তুলিয়া লইয়া মহামানবতার জন্য তিনি আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।"
"সর্বজীবে নিতাইয়ের স্বরূপ দেখো।"

এই সকল মহাবাণী তাঁহার লীলাজীবনের মধ্যে মূর্তিলাভ করিয়াছিল।

তিনি ছিলেন হরিনামের মূর্ত বিগ্রহ। পতিত জীবের উদ্ধারের অস্ত্র ছিল তাঁহার হরিনাম সংকীর্তন। জীবের দুর্দিন দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন—

* *মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু 'স্মারক পুস্তিকা', ১৩৮৮। মহানাম সেবক সংঘ, হাওড়া - ৩।*

"হরিনাম লও ভাই,
আর অন্য গতি নাই।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই)। (হরিনাম প্রচার কর)।"

তিনি হরিনামে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"আমি হরি নামেব
এ ভিন্ন আর কারো নই।"

"মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু" লীলাভিনয়ে—শ্রীশ্রীপ্রভুর জীবনী ও বাণীকে মূর্তি দেবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা দর্শনে মানব-সমাজের মহাকল্যাণ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

হাওড়ার মহানাম সেবক সংঘেব এই উদ্যোগ সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

শুভেচ্ছা

শ্রীশ্রীমহেন্দ্র-বন্ধু অঙ্গনের ভক্তবৃন্দ মিলিয়া পুস্তিকাকারে একটি উপহার 'বন্ধুলীলায়ন' বাহির করিতেছে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে। ইহা আনন্দের কথা। অন্তর সৌন্দর্যে পুস্তিকাটি ইন্দ্রিয়গ্রাহী হউক এই শুভেচ্ছা জানাই।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'বন্ধুলীলায়ন', ১৪০০। শ্রীশ্রীমহেন্দ্র-বন্ধু অঙ্গন। ঘূর্ণী, নদীয়া।*

জয় গৌর হরি। জয় জগদ্বন্ধু হবি

মহানাম সম্প্রদায়
পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর
৪ঠা পৌষ, ১৩৭৪

মুখবন্ধ*

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। শ্রীগ্রন্থ ও গ্রন্থ প্রতিপাদ্য দেব ভগবান্ শ্রীহরি অভিন্ন। এই গ্রন্থ কেহ কাহাকেও পড়াইতে পারে না। ইনি স্বয়ং কৃপা করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাহারো অন্তরে বিকাশ প্রাপ্ত হন।

* ***'শ্রীমদ্ভাগবতম্, কৈবল্যামৃতবর্ষিণী (রাস পঞ্চাধ্যায়)'। শ্রীরণজিৎকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী। কৈবল্য ভবন, রামগড়, মেদিনীপুর, ১৩৭৪।***

তথাপি লৌকিক একটা গুরু-শিষ্য প্রণালী আছে। মেদিনীপুর জেলার রামগড় ষ্টেটের রাজা শ্রীমান্ রণজিৎকিশোর মাদৃশ অভাজনকে শিক্ষাগুরু বুদ্ধিতে অশেষ শ্রদ্ধা করে। আমি তাহাকে কী বা শিখাইয়াছি। তবু সে একলব্যের মত আমাতে গুরুনিষ্ঠা রখিয়া শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছে—শ্রীশ্রীরাই-কালাচাঁদের অনুগ্রহে।

তাহার উপর শ্রীগ্রন্থের কৃপা হইয়াছে। সে এখন প্রভু-করুণায় ভাগবতীয় জীবন লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাহার অধিকার জন্মিয়াছে। শাস্ত্রতাৎপর্য বিশ্লেষণে সে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। একথা বলিতে আমার অন্তরে আনন্দ হইতেছে।

কলিতাপতপ্ত দুর্দৈব গ্রস্ত বর্তমান মানব সমাজকে শান্তির পথ দেখাইতে পারে—একমাত্র ভাগবত ধর্ম, ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। জগৎ-কল্যাণব্রতী শ্রীমান্ রণজিৎকিশোর সজ্জন-সভায় ভাগবতী কথা (প্রচার) বিতরণ করিয়া জীবনেব সার্থকতা লাভ করুক—এই আশীর্বাদ করি। তাঁহার শিরে শ্রীহরিপুরুযেব কৃপাশীয অজস্র ধারে বর্ষিত হউক। জয় জগদ্বন্ধু হরি।।

শুভানুধ্যায়ী—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

সুধার ধারা

একটা ছাপাখানার প্রুফ। কতগুলি কবিতা। আদ্যন্ত নাই। ভূমিকা দিতে হবে। কার এ কবিতা! এত মর্মস্পর্শী! আমার বন্ধুসুন্দরকে এত ভালবাসে কার প্রাণ! কি আকুল প্রার্থনা করিয়াছে দ্বিতীয় গানটিতে—

"প্রভু! আবার ফিরে এস বলে কাঁদে বড় মন
প্রভু, কাঁদে বড় মন,
আবার, তেমনি করে মোহন রূপে দাও হে দরশন
আমি শুনেছি যেমন।"

কে গো তুমি? কোথায় শুনিলে সেই মোহন রূপের কথা। পত্রে জানিলাম। বুঝিলাম। চিনিলাম। সুধার ধারাই বটে।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মর্মী ভক্তগণের অন্যতম ছিলেন ডাক্তার সুধন্যকুমার সরকার। বাড়ী ছিল ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহাকুমায়। ডাক্তারী করিতেন রেঙ্গুনে। ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পাঠদ্দশায় স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে যখন বন্ধুহরির পাদমূলে সদ্যতোলা ফুলটির মত নিজ জীবনটি অর্পণ করিয়াছিলেন শ্রীমান্ সুধন্যকুমার তখন হইতেই জীবন-দেবতা তাঁহাকে ডাকিতেন— 'সুধা'। বড় আদরের ডাক বটে। কেবল যে আদরেরই তা নয়। তাঁহার শুদ্ধা ভক্তির মধ্যে কিছু

* *'গীতিমাধুরী'। শ্রীমতী ছবিরানী বিশ্বাস। বহরমপুর। ১ম সং ১৩৭২।*

সুধার আস্বাদন ভোগ করিতেন রসলুব্ধ ব্রজনায়ক বন্ধুহরি। সেই 'সুধা'র দুহিতা। নাম ছবিরাণী। বাস করে মুর্শিদাবাদে পতিগৃহে, 'বুকভরা মধু' গৃহবধূ। কিন্তু সুধার ধারাটি বেশ অক্ষুণ্ণই আছে। বন্ধুহরির রূপের কথা, হাঁ; মোহন রূপের কথা শুনেছে বটে ধন্য পিতার মুখ হইতে। তাই লিখেছে "শুনেছি যেমন"। দুহিতা শব্দটির মধ্যে দুহ্ ধাতুটি লুকানো আছে। তাই পিতৃদত্ত সুধাসম্পদ্ দোহনে যে পটুতা আছে তাহা লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা হরিকে ভালবাসিতে চাই কত না কারণে। ধন জন বিত্ত ঐশ্বর্য স্বর্গ মোক্ষ যা কিছু চাই হরি দিবেন এই আশায়। ছবির ভালবাসার কারণটি বড় অভিনব (১০)—

"মোর দুঃখ স্মরি যুগে যুগে হরি
কেঁদে গেছ দিবানিশি।
আমি আজ বুঝে তায় এই অবেলায়
আঁখি জলে শুধু ভাসি।"

যুগে যুগে তুমি আসিয়াছ। আসিয়া কাঁদিয়াছ। দ্বাপরের হরির কথা ছবি লিখিয়াছে (৫)—

"সেই বৃন্দাবনের বাঁশের বাঁশী
কানে আমার পশে আসি
তাই তুচ্ছ মনে হয় আজি
সব ভুবনের সুখ,
মোর মনে যে জাগছে সদাই
শ্যামের শ্যামল মুখ।"

আবার হরি আসিয়াছিলেন শচীমার কোলে। নদীয়ার মাটি ভিজিয়াছিল তাঁর নয়নের জলে। রূপের ঢেউ লাগিয়াছিল নদীয়া-নাগরীর হৃদয়-কূলে। তার ছোঁয়াচ ছবিও পাইয়াছে (২০)

"আমায় ঘরের বাহির করলো নদের গোরা গো
ঘরের বাহির করলো নদের গোরা।
ও তাঁর কিবা রূপের ঝলমলানি যেন চাঁদের ঘরা
ঘরের বাহির করলো নদের গোরা।"

আবার সেদিন আসিয়াছিলেন হরি। জীবের জন্য জগদ্বন্ধুরূপে। কাঁদিয়াছেন আকুল কণ্ঠে। দীর্ঘ নিশ্বাসে বলিয়াছেন "জীবের জন্য এত কষ্ট!" ছবি তাঁকে চিনিয়াছে। বড় উজ্জ্বল অনুভূতি ১৯ সংখ্যক গানটি। সবটা দিলাম না, পাঠক পাঠ করিবেন—

"এবার সবে মিলি বন্ধুহরি জগদ্বন্ধু ধন,
ঘোর কলিতে উদ্ধারিতে ধরায় আগমন।"

সেই পরম ধনকে চিনিয়াও যে ভজি না এই তো বড় দুঃখ। সকলেরই এই বেদনা। ছবির সুন্দর ভাষায় (১৯৮)—

"(ভাইরে) মানুষ হয়ে এ সংসারে
আসি কৃষ্ণ ভজিবারে
এসে ভজনের পথ ভাবি আপদ্
(শুধু) বিপথ পানে মনটি ধায়।"

সকলেরই তো এই দশা। এখন উপায় কী? উপায় একটি। শুধু কান্না। এই যে কান্নার গান (৩)—

"আবার, কবে তোমায় নিবিড় করে
বাসবো ভাল হরি।"

লেখিকা ছবি গায়িকাও। লেখনীব লালিত্যের মত কণ্ঠেও মাধুর্য আছে। পড়িতে পড়িতে বোঝা যায় গাইতে গাইতে লিখিযাছে। গায়কেব যে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছবি তাহা করিয়াছে (১১) আমরাও করি।

"যেন তব স্তুতি গান হ'য়ে নিতি
ঝরে এ কণ্ঠে বিভু।"

ছবি প্রাণ ভরিয়া লেখ, আরও লেখ। কণ্ঠ খুলিয়া গাও, আরও গাও। কানায় কানায় ভরিয়া ঝরিয়া উপছিয়া পড়ুক। সুধাব উৎস উদ্বেলিত হউক তোমার সঙ্গীতে লিখনীতে, জীবন বিপনিতে। জয় জগদ্বন্ধু।

"অবাক্ হয়ে শুনি
কেবল শুনি।"

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

জয় জগদ্বন্ধু হরি

শুভেচ্ছা বাণী

সাহিত্য-গগনে অনেক পত্রিকা-ঘুড়ী উড়িতেছে। আর একখানি উড়িল। যদি যেমন নাম 'দিব্যজগৎ' তেমন কাজ হয় নিশ্চয়ই বাঁচিবে। যদি অদিব্য জগতের খবরের বাহুল্য হয় তবে আয়ুষ্কাল বেশী হবে না।

প্রার্থনা করি। 'দিব্যজগৎ' দীর্ঘস্থায়ী হউক। মানব সমাজকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইতে সমর্থ হউক।

৫/২/১৯৯৭ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑**

'দিব্যজগৎ'। সম্পাদক ঃ অংশুমান রায়। উদ্বোধনী প্রকাশন, কল্পতরু সংখ্যা, জানুঃ ১৯৯৭। বি ই. ব্লক, সল্টলেক,

আশীর্বাণী

আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ বার্তা প্রচারণে। উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ দুইটি কথা।

উদ্ধারণ অর্থ পশুত্বের ভূমিকা হইতে মনুষ্যত্বের ভূমিতে উত্তরণ।

মহাউদ্ধারণ অর্থ—মনুষ্যত্বের ভূমি হইতে দেবত্বের ভূমিতে উন্নয়ন। আত্মার ঊর্দ্ধগতি ও প্রসারণ।

মানুষ যখন ঈশ্বরের সমান ধর্ম (Godliness) পায়, তখন সে সর্বোৎকৃষ্ট। মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট করাই প্রভু জগদ্বন্ধুর মহাউদ্ধারণ ব্রত।

আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় আগরতলা শহরে হীরক জয়ন্তী উৎসবে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দবের মহাউদ্ধারণ ব্রত উদ্‌যাপিত হউক।

শুভার্থী—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

* *'মহানাম লীলাযন।' স্মাবকপত্র, চিকাগো ভাষণেব হীবক জযন্তী উদ্‌যাপন পবিষৎ। আগবতলা, ১৯৯৬। সম্পাদক ঃ শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীমৎ বন্ধুগৌবব ব্রহ্মচাবী ও শ্রীবেণুধব গোস্বামী।*

উজ্জ্বল বর্তিকা

মহামান্য গান্ধীজী দিল্লীতে ভাংগী কলোনীতে থাকিতেন। তাহার বহু পূর্বে ব্রাহ্মণকুমার ব্রহ্মচারী মহাবতারী জগদ্বন্ধু হরি কলিকাতা রামবাগান ডোম পল্লীতে বাস করিতেন। শুধু বাস করিতেন না, ডোমদের অন্তরে যে দেবত্ব ঘুমাইয়া আছে তাহা জাগাইয়া তুলিতেন আপনার কারুণ্য শক্তিতে। তিনকড়ি ডোম ও হরিদাস ডোম দিব্য জীবন পাইয়াছিল প্রভুবন্ধুর কৃপা-সান্নিধ্যে। সেই সকল লীলা আজিকার দুর্দিনে জাতীয় জীবন-পথে উজ্জ্বল-বর্তিকা। সেই বর্তিকা ধরিয়া তুলুক শ্রীশ্রীরামবাগান-প্রভুজগদ্বন্ধু মন্দির। তাহার মুখপত্র মহাউদ্ধারণ বুলেটিন জীবকে মহাউদ্ধারণের পথ দেখাইয়া জয়যুক্ত হউক। ❑

* *'মহাউদ্ধাবণ' বুলেটিন। বামবাগান, কলকাতা।*

স্তুতিধারায় উষাবগাহন*

'স্তুতিধারা' পাঠ করিলাম। শুকদেব-জয়দেব-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীনিবাস-বিশ্বনাথে যে স্তব-মাধুর্যের গঙ্গোত্তরী রামকৃষ্ণ-সাগর-সঙ্গমে—তাহাতে গভীরে অবগাহনে শুচি স্নাত পূত হইলাম। কি স্নিগ্ধ, সান্দ্র, অনবদ্য।

কবিরাজ গোস্বামীর পরেও চিত্তে ভ্রান্তি জাগিত—সংস্কৃত-জননীর বক্ষমধুরিমা বহনে বুঝি বা বঙ্গদুহিতা অক্ষমা, সে ভ্রান্তির চরম নিরসন রামকৃষ্ণদাসজীর অবদানে।

পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যপূর্ণ লেখনীর মধ্যে যদি থাকে কারুণ্যের অমৃতময়ীর ঝরণা তবে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটি।

আজ উষায় সুকৃতিলভ্য ফেলালব লাভে মাদৃশ অকৃতির জীবন-মরুতেও বহিতেছে রসতটিনীর তরঙ্গমালা। গ্রন্থরত্ন কণ্ঠহার করিলাম। রসিক ভাবুক আস্বাদক—কেহই-পরাঙ্মুখ থাকিবেন না—এই আশাবন্ধ অন্তরে।

জন্মাষ্টমী, ১৩৭১ — মুগ্ধ—
তিনসুকিয়া, আসাম — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'স্তুতিধাবা'। শ্রীবামকৃষ্ণ দাস। প্রকাশক—শ্রীগৌবগোবিন্দ দাস আদি ৪ জন। শাস্ত্রী বাটি, পোঃ মিলনগড, হুগলী। আগষ্ট, ১৯৬৪ (বাং ১৩৭১)।*

জয় জগদ্বন্ধু হবি

আশীর্বাদ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চৌধুবী, সভাপতি,

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি স্মবণে স্মরণিকা হবে—আমার কাছে চাহিয়াছেন আশীর্বাদ।

স্মরণিকা সারদা রামকৃষ্ণ স্বামিজীর তো থাকিবেই। কয়েক মাস ধরিয়া 'বর্তমান'-এ প্রকাশ হইয়াছিল—মিশনের দ্বাদশ জন প্রধান আচার্যের কথা—তাঁহাদের কথা এক স্থানে দিবেন। অভিনয়ে দেখেছিলাম বামাক্ষেপা ও ঠাকুরের মুখে শাস্ত্রকথা; একজন শিল্পীর মুখে দু'জনার কণ্ঠ— সেইটি আবার দিবেন সহজবোধ্য করিয়া। ঠাকুরেব কাছে প্রার্থনা জানাই, স্মারক গ্রন্থটি হউক সুখাবহ, কল্যাণাবহ, আনন্দ বার্তাবহ।

চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম — ..... মহানামব্রত ❑
রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯

আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু
ধর্ম সম্মেলন সমিতি

প্রতি বছরের মত এবারও তোমরা আনন্দোল্লাসে মাতিয়া প্রভুর জন্মোৎসব ও ধর্ম সম্মেলন করিবে। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে। তোমরা পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও পরম আনন্দে ও উৎসাহে অগ্রসর হইবে। প্রভুর কৃপাশক্তি তোমাদের

* *'বন্ধুলীলায়ন' (৪র্থ বর্ষ)। বার্ণপুব, হরিপুরুষাব্দ ১১৩*

সঙ্গে সতত ক্রীড়াশীল আছে ও থাকিবে। নবীন উদ্যমে জগৎ কল্যাণকর কর্মে অগ্রসর হও। সর্বত্র জয়ী হও। জয় জগদ্বন্ধু।

শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

শুভেচ্ছা বাণী

জয় জগদ্বন্ধু। জয় গৌর হরি

খানপুর শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রমের প্রচেষ্টায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর ভাব বাণী আদর্শ প্রচার ও অনুশীলন করার জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা। 'স্থায়ী' শব্দটি প্রাণে আনন্দ দিল।

আমরা হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী। গত দুই বৎসরে মহাপ্রভুর উৎসব সহস্রাধিক হইয়াছে। কোথাও স্থায়ী পরিকল্পনার কোন অভ্যাস দেখি নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার স্থায়ীরূপ পাইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইবে। একটি শিক্ষার উল্লেখ করি, এই একটি শিক্ষার স্থায়ী রূপায়ণ যদি গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে হয় তাহা হইলে গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজমান থাকিবে—

"দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ গিয়া হাতে তালি দিয়া।।" (চৈ. চ.)

আপনাদের প্রচেষ্টায় এই মহাকল্যাণ বাণীর স্থায়ী অনুশীলন জীবন্ত হউক। এই প্রার্থনা জানাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণারবিন্দে।

গৌরগতজনগণের সেবক—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**। ❑

** খানপুর শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম।*

বিজয়ার বাণী

দেবী দুর্গাকে সাধারণতঃ সবাই জানতেন মহিষাসুরমর্দিণী। দেবীর নিষ্ঠুর রূপের সঙ্গেই পরিচয় এখানে। কিন্তু তিনদিন সন্তানের কাছে করুণাময়ী দেবী দুর্গার আগমনে জীব জগৎ জানতে পারল মাতৃরূপ—মায়ের করুণার রূপ, স্নেহের রূপ। তিনদিন পরে মায়ের বিসর্জন হয়—এটা সবাই হয়ত মনে করে। কিন্তু না, মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তির বিসর্জন হয়, মায়ের সত্তার বিসর্জন নেই—চিন্ময়ী সত্তার বিসর্জন নেই। চিরদিন আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিসর্জনের পরেই বিজয়া। এই বিজয়া আমাদের এই ভাবনাতেই উদ্বুদ্ধ করে যেন, আমরা সবাই এক মায়ের সন্তান। আমাদের মধ্যে স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে, যেহেতু আমরা একই মায়ের সন্তান। তবেই বিজয়া সার্থক। বেদনা ভুলে বেদনা উত্তীর্ণ প্রীতিই বিজয়ার কথা।

শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ফরিদপুরে বিগত ১৩৭৮ সনের ৭ই বৈশাখে নির্মমভাবে নিহত আটজন ত্যাগী ব্রহ্মচারীর স্মরণে

লাঞ্ছিত মানবতা

সারা বিশ্বময় চলিতেছে এক মহা দুর্দিন। সীমাহীন দুঃখে কষ্টে নরনারী জর্জরিত। ইহার মূল কারণ, সর্বত্র ব্যাপকভাবে মানবতার অবমাননা। আজ হইতে ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে, ১৩৭৮ সনের ৭ই বৈশাখ মানবতা ধর্মের উপর পড়িয়াছিল একটা নিদারুণ আঘাত। যার স্মৃতি আজও হৃদয় বিদারক। ঘটিয়াছিল এই বাংলাদেশেব বুকে ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গনে। জানেন সকলেই শ্রীঅঙ্গনে বিরামহীন কীর্তন ভজন চলিতেছে দীর্ঘকাল যাবৎ। এই কীর্তনে রত ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন আটজন ত্যাগীভক্ত শহীদের মৃত্যুবরণ করে, মনুষ্যত্বহীন নৃশংস হানাদারদের বিভীষিকাপূর্ণ নির্মম আঘাতে।

ক্ষিতিবন্ধু, কীর্তনব্রত, নিদানবন্ধু, গৌরবন্ধু, বন্ধুদাস, রবি, অন্ধ কানাই ও চিরবন্ধু এই আটজন শান্ত, নিরীহ, নিষ্কলুষ তপস্বীর বক্ষোপরে দানবের হাতের বন্দুকের গুলি, যখন তারা ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। তাহাদের পূত বক্ষ-শোণিত রঞ্জিত হয় শ্রীঅঙ্গনের পবিত্র ধূলি। মানবতার উপর এমন নিদারুণ আঘাতের নজির নাই বিশ্বের ইতিহাসে। ধূসর সন্ধ্যার সেই মর্মান্তিক ঘটনা স্মবণে আসিলে আমাদের সন্ন্যাসীদের দেহে জাগে শিহরণ, স্তব্ধ হয় হৃদয়ের স্পন্দন। আমরা মনে কবি মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের ইহা একটি পাঁজরভাঙ্গা প্রতীক।

এই প্রতীক বুকে লইয়া আমরা আগামী ৭ই বৈশাখ ২১-৪-১৯৯৭ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় করিব মানবীয় পাতকের প্রায়শ্চিত্ত আর করিব অশ্রুসিক্ত রক্তরাঙা অষ্ট শহীদের স্মৃতিতর্পণ, আর করিব বিশ্ব মানবতা পূজায় অর্ঘ্যদান।

প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে আমরা বলিব — হে বিশ্বের প্রভু! এমন পাপ যেন মানব সভ্যতা আর না করে, তর্পণের আসনে বসিয়া বলিব — হে শহীদ সন্ন্যাসীগণ! আপনারা শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানান আমাদের চিত্ত যেন শুদ্ধ হয়। মনুষ্যত্ব ধর্মে যেন স্থিত হইতে পারি। আমরা সাংবাদিক বন্ধুগণের সহায়তা প্রার্থী। আপনারা আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া মানবধর্মের জয় ঘোষণা করি। সকলের শান্তি সকলে কামনা করি এবং এই প্রসঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি মহাবাণী স্মরণ করি — "তোমরা সকলের, সকলে আমার। তোমরা পৃথিবীর সকলকে আপন করিয়া লও।" ❑

** শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে নির্মিত অষ্টশহীদ বেদী উদ্বোধনেব প্রচাবপত্র।*
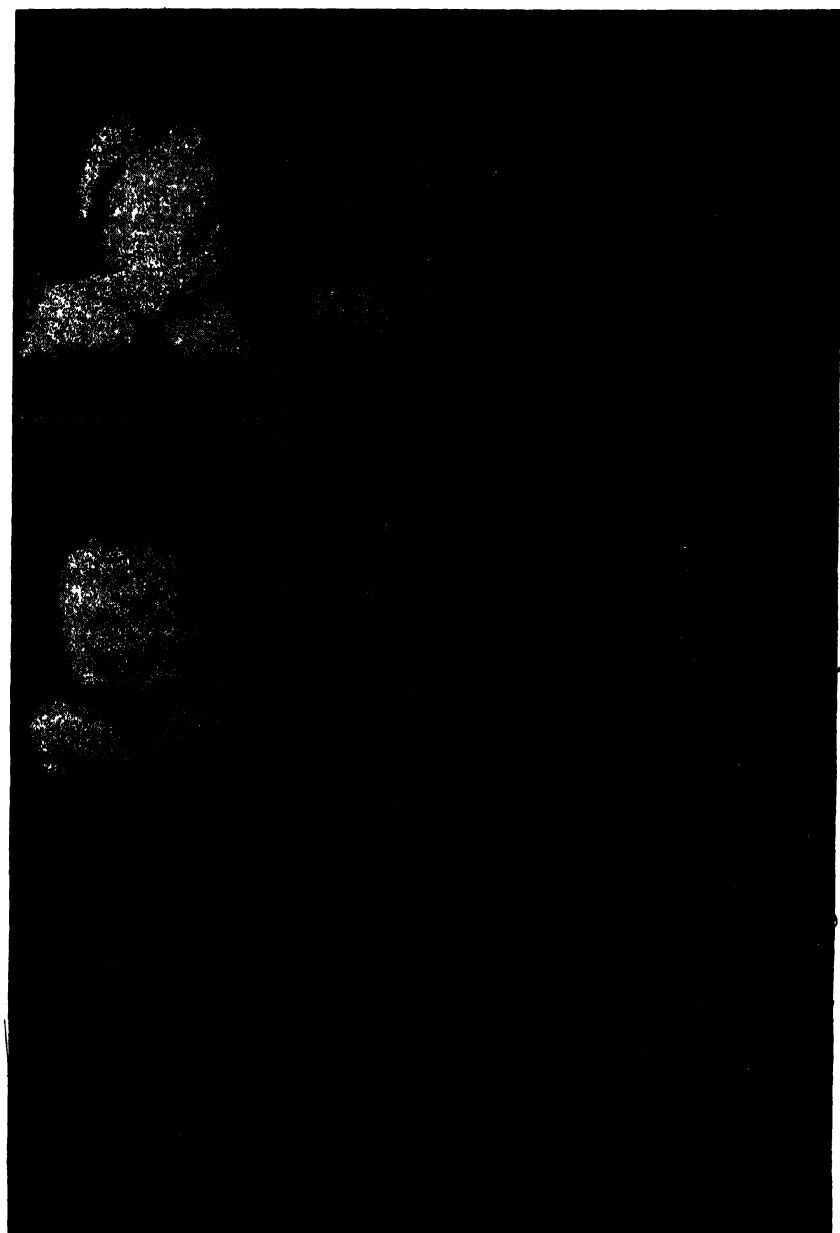
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ফরিদপুরে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক
কীর্তনরত অবস্থায় অষ্টশহীদ ব্রহ্মচারী। (৭ই বৈশাখ, ১৩৭৮)
কীর্তনব্রত, কানাইবন্ধু, চিরবন্ধু, গৌরবন্ধু, রবিদাস, ক্ষিতিবন্ধু, নিদানবন্ধু ও বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

অন্তরঙ্গের অনুভূতি

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলার সঙ্গী বরেণ্য ভক্তগণের মধ্যে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী অন্যতম। দীর্ঘকাল তিনি শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে সেবায় কাটাইয়াছেন, দীর্ঘকাল দেশে বিদেশে উন্মাদ মতিচ্ছন্নের মত ছুটিয়া নব অবতারীর আগমনী গাহিয়া কাটাইয়াছেন। 'জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু', 'মহানাম', 'করুণা-কণিকা', 'ঝুমঝুমি' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে গদ্যে ও পদ্যে তিনি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলাগুণ-তত্ত্বকথা স্বীয় অনুভূতির নিরুপম ভাষায় প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আজ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ যে অবিরাম মহানাম কীর্তন চলিতেছে—মহেন্দ্রজীই ইহার প্রধান প্রবর্তক। মহানাম-সম্প্রদায় নামক ত্যাগী গোষ্ঠীর ইনিই সংগঠক।
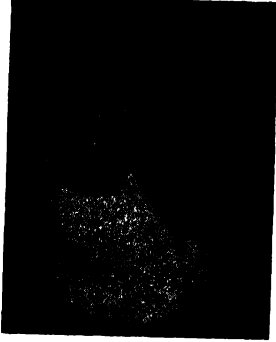
মহেন্দ্রজী অতি বাল্য বয়সে বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে ব্রজের পথে পথে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সেখান হইতে কীভাবে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তাঁহাকে পরম কৃপাকর্ষণে টানিয়া আনিয়া শ্রীচরণে চিরদাস করিয়া রাখেন—সে কাহিনী প্রেমযোগ তৃতীয় খণ্ডে (৫৬-৬৩ পৃষ্ঠা) পূজ্যপাদ যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে' নিবন্ধটি উক্ত গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কী অনুভূতি ছিল এবং কী ভাবে তিনি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কুঞ্জস্মৃতি, উত্থানারতি, জাগরণ, মঙ্গলারতি, প্রভাতী, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি সর্বকালীন স্মরণানন্দে জগদ্বন্ধুময় হইয়া রহিতেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিতে পারিবেন। অন্তরঙ্গ ভক্তের অনুভূতি ও আস্বাদনই সাধক ভক্তের জীবাতু।

এই গ্রন্থের গদ্য ভাগ 'জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু' ও পদ্যাংশ 'মহানাম-গীতিগ্রন্থ' হইতে গৃহীত। এই উভয় গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও গাম্ভীর্যে মহীয়ান্ এই গ্রন্থ ভক্তগণের প্রাণে তৃপ্তি আনিবে।

দাস মহানামব্রত

---

* *'বন্ধু কে'? শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। মহানাম সম্প্রদায়। মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা - ৫৪। ৪র্থ সং - ১৩৭৭*

'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব'—আশীর্বচন

ভগবান্ আসেন। ভূমিতে নামেন ভূমা পুরুষ। কেন? গীতা বলেন 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'। কুন্তীদেবী বলিয়াছেন—

"ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন।।"—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৮/৩৫

অজ্ঞান কাম-কর্ম দ্বারা নিষ্পেষিত মানবকে স্মরণ-মননযোগ্য লীলা প্রকাশ দ্বারা ভবকূপ হইতে উদ্ধারের জন্য তিনি আসেন।

শ্রীশুকদেব বলেন—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।" ভাঃ ১০/৩৩/৩৬

জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আসেন। আসিয়া এমন ক্রীড়া করেন যাহা শ্রবণ করিয়া জীবন তৎপর হয়, ভগবৎপরায়ণ হয়।

শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত লিখিয়াছেন—

'When He Who is beauty and love and bliss shows a little portion of Himself on earth enclosed in human form the weary eyes of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistibly attracted to Him. Devotion spontaneously springs up."

প্রেমঘন মাধুর্যঘন পরম দেবতা যখন মানুষের সাজে আসিয়া নিজেকে ব্যক্ত করেন তখন মানুষের নিদ্রিত নয়ন নূতন আলোর ডাকে জাগিয়া উঠে, বেদনায় সঙ্কুচিত জীবন নূতন আশায় উদ্যমে বিশ্বজনীনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। তাঁর আকর্ষণে নিকটবর্তী হয়। হৃদয়ের সহজ প্রীতি শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠে।

তিনি আসেন। তাতে জীবন ধন্য হয়। সূর্য পৃথিবীর প্রাণ। কিন্তু সূর্য যদি নিজ মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকাশিত হন তাহা হইলে পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সূর্য বায়ুমণ্ডল দ্বারা নিজ তেজ প্রশমিত করিয়া দর্শনীয়রূপে আমাদের গোচরীভূত হন। ভগবানের প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে তিনি যোগমায়া দ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া না আসিলে কেহই তাঁহার অনাবৃত বদনপানে চাহিতে পারে না। সংবৃতির জন্যই সূর্যের উপকারিতা। যোগমায়ার আবরণের জন্যই ভগবানের মাধুর্যবত্তা।

গুরুদেব শ্রীপাদ্ মহেন্দ্রজী লিখিয়াছে—

"এসেছে সে এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কী আছে?
দিয়ে·সব আপনটুকু, শির লোটায়ে পড় সে চরণের কাছে।"

বন্ধুসুন্দর আসিয়াছেন। ব্রজের ধন, নদীয়ার চাঁদ জগদ্বন্ধুরূপে আসিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বকথা শ্রীমান্ যতিবিনোদ লিখিয়াছেন এই গ্রন্থে। আমি পাঠ করিয়াছি।

** 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব'। শ্রীযতিবিনোদ দাস। ১ম সংস্করণ, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, ঢাকা। ১৩৮২*

তত্ত্বকথা—ভগবানের তত্ত্বকথা—অবতারের রহস্যকথা লেখা যায় না। উহা স্ফুরণ হয়। মেঘের উদয় না হইলে বৃষ্টি হইতে পারে না। কৃপাশক্তির উদয় না হইলে অবতারের লীলাতত্ত্বের রহস্য ব্যক্ত করা যায় না। যখন অবতাবী ধরায় অবতরণ করিয়া ধরা দেন, তখন তাঁহার কৃপাশক্তিও নামিয়া আসেন। অজস্রধারায় বর্ষিত হয় জীবের শিরে। অফুরন্ত করুণা শক্তির ভাণ্ডার লইয়া আসিয়াছেন শ্রীশ্রীবন্ধুহরি। সেই করুণাস্পর্শে বহু লৌহ সুবর্ণ হইয়াছে। বাগ্‌দীরা মোহন্ত হইয়াছে। ডোমেরা দেবত্ব লাভ করিয়াছে।

সেই করুণা শক্তিরই প্রবাহে ভাসিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে শ্রীমান্ যতিবিনোদ দাস— রংপুর সদরের একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট। অফুরন্ত কর্মের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনা—অহৈতুকী কৃপার ফল। জগতে যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয় যে শক্তিবলে তাহার নাম কৃপাশক্তি। সর্ব সম্ভবতা নিরসনী শক্তি কৃপা।

এই গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজের চিত্তবিনোদন করতঃ বন্ধুসুন্দরের প্রতি উন্মুখ করুক। শ্রীমানের প্রতি বন্ধুহরির এই করুণাধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক। তার লেখনীর ও কণ্ঠের শক্তি অকুণ্ঠ হউক।

জয় জগদ্বন্ধু হরি।

শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর, — শুভানুধ্যায়ী

সীতানবমী তিথি, ১৩৭৭ বাং সন — **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।** ❑

(প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ৯৯তম আবির্ভাব তিথি।)

আশীর্বচন

শাস্ত্রাক্ষরের কৃপা না হইলে শাস্ত্রকথা ভাষায় প্রকটিত হয় না। শ্রীমান্ নন্দগোপালের চিদাকাশে কৃপা দেবীর পাদবিন্যাস ঘটিয়াছে। গ্রন্থটি শুধু প্রবেশিকাই হয় নাই, আস্বাদিকায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাঠে পাঠকের চিত্তে লৌল্য জাগিলেই সে ধন্য—জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'রাসলীলা প্রবেশিকা'। শ্রীনন্দগোপাল সাহা, ট্রাস্ট, ১৯৯৫।*

কৃপাশীর্বাদ

স্নেহের নিতাই,

তোমার লেখা "শ্রীশ্রীপ্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম" গৃহে গৃহে আদৃত হইতেছে। চতুর্দশ পদাবলী, চৌত্রিশ পদাবলী ও পরিকরবৃন্দের বন্দনা ভক্তগণের কণ্ঠহার হউক—এই আশীর্বাদ করি। নিজে নিত্য ভজনে ইহা পাঠ করিয়া আস্বাদন করিও তবেই অন্যেও করিবে।

প্রভুর কৃপায় তোমার হৃদয় মন ভক্তিরসে ভরপুর হউক। 'জয় জগদ্বন্ধু'।

শুভানুধ্যায়ী—**গুরুদেব** ❑

* *'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও পরিকরবৃন্দের বন্দনা।' সংকলনে ঃ শ্রীনিতাইচরণ বিশ্বাস। ১ম সং ১৩৮৪। ট্রাস্ট।*

‘শ্রীশ্রীহরিকথা’—নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেমন নিরন্তর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-মাধুর্যে ডুবিয়া থাকিতেন, অভিন্ন তনু মহাউদ্ধারণ অবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও তেমনি প্রতিনিয়ত “চৈতন্যলীলামৃতপুর” ও “কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর” এই দোঁহার মিলনে যে “সুমাধুর্য” তাহাতে নিমজ্জিত রহিয়া গভীর আস্বাদনের নবনবায়মান আনন্দে তন্ময় থাকিতেন।

“অর্দ্ধবাহ্য” দশায় শ্রীগৌরসুন্দর “প্রলাপ” কহিতেন। তাহাতে তাঁহার অন্তরের আস্বাদনের কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া পড়িত। শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিজীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া লীলাড়ুবুরী সুরসিক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিচরণ তাঁহার কিয়দংশ ভক্তগণকে “ভেট” দিয়েছেন, মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বুঝি বা কলিহত জীবের প্রতি পরম করুণাপরবশ হইয়াই আপনার আস্বাদন আপনিই জীবের দুয়ারে ভেট লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্তর্দশায় রহিতেন স্বানুভাবে পূর্ণ তন্ময়। অর্দ্ধবাহ্য দশায় শ্রীকরে লেখনী ধরিতেন। সেই অপ্রাকৃত লেখনী-মুখে গঙ্গোত্তরী ধারার মত নিত্য শুদ্ধ ভ্রমপ্রমাদশূন্য ছন্দোময় লীলাপ্রবাহ তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিত। ঐ স্রোতো-ধারারই ঘনীভূত প্রকট রূপ “শ্রীশ্রীহরিকথা” গ্রন্থ।

এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু চারি বার “গৌর-রূপ” আস্বাদন করিয়াছেন। এক বার “চৈতন্য প্রচারণ” দর্শন করিয়াছেন। “নিতাই প্রচারণ” ও “উদ্ধারণ” নাম দিয়া দুই বার নিতাইচাঁদের মাধুর্যে ডুবিয়াছেন। আর একবার “উদ্ধারণ” নাম দিয়া সর্ব গৌরপরিকরের প্রচারণ প্রচার করিয়াছেন। একটি “সুবল মিলনে” গৌর গৌরীদাসের মিলন-মাধুরী ভোগ করিয়াছেন। সর্ব সমেত নয় বার নদীয়ালীলারসে রসিত হইয়াছেন।

‘প্রার্থনা’ ও “দৈন্যবোধিকা” দ্বারে সাত ব্যর প্রাণের আকুলতা ও জীবদুঃখ-কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই বার “কৃষ্ণ-রূপ” দুইটি “পূর্বরাগ” এবং “কুণ্ডমিলন” প্রাবৃট্ মিলন” প্রভৃতি মিলন চারি বার আস্বাদন করিয়াছেন, “রাস, অলস, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্‌গার, গোষ্ঠ, গোপীগোষ্ঠ, ফিরা গোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, বংশীবিনয়, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মান” প্রভৃতি দশ-বারোটি বিষয় এক এক বার আস্বাদন করিয়াছেন। “রাখালি” ও “বটুক্রীড়া” চারি বার ও “সুবল মিলন” চারি খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। লীলাস্থলী “যমুনা” দুই বার, “কল্যাণকুণ্ড” নাম দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড একবার ও একবার নিভৃত নিকুঞ্জ দর্শনানন্দে ডুবিয়াছেন। “বিরহ” ও “দশমদশা”-র স্মরণে নিদারুণ বেদনায় পাঁচ বার কাঁদিয়াছেন। শেষে দুই লীলার অখণ্ড মিলনময় “প্রকট রহস্য” শীর্ষক কবিতায় অপূর্ব অপ্রকাশিত পূর্ব মহাতত্ত্বমাধুরী আস্বাদন করিয়া যেন ঐ তীব্র মনোব্যথায় একটু সান্ত্বনা পাইয়াছেন।

এই সকল লীলাকথা প্রায় তিনশত পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। দুইখানি ফুল্‌সকাপ হাফ সাইজের বড় খাতায় উহা শ্রীহস্তে লিখিত ছিল। প্রথম খাতাখানিতে একশ বারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত ও দ্বিতীয় খাত খানিতে এক'শ তেরো পৃষ্ঠা হইতে দুই'শ সাতানব্বই পৃষ্টা নিজ হস্তে পৃষ্ঠার

* ‘শ্রীশ্রীহরিকথা’। প্রভু জগদ্বন্ধু। মহানাম সম্প্রদায়। ১ম সং ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

নিম্নে অঙ্ক দিয়াছেন।

প্রথম খাতাখানি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। দ্বিতীয় খাতাখানি শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম প্রিয় সেবক শ্রীল নবদ্বীপদাসজী বিংশতি বৎসরের অধিক কাল বুকে ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। বাংলা ১৩২৮ সনে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে মহানাম মহাকীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তিনি যোগ্যপাত্র জানিয়া ঐ শ্রীখাতা শ্রীমৎ মহেন্দ্রজীর করে অর্পণ করেন। মহেন্দ্রজী উহা পাইয়া পরমানন্দে মগ্ন হন এবং ঐ শ্রীহস্তাক্ষর ঠিক ঐ ভাবেই ফটো করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে ভক্তবৃন্দের তথা জগদ্‌বাসীর করে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী বর্তমান নিত্যধামে নিত্যলীলায় স্থিত। তিনি তাঁহার ঐ শুভেচ্ছার বীজ যাঁহাদের মধে নিহিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই রাজসংস্করণ প্রকাশ করিলেন। এই অপূর্ব সামগ্রী দর্শনে নিত্যধামে তাঁহার নিত্যদেহে পুলকোদয় হইবে এবং অন্যান্য অপ্রকট ও প্রকট সকল ভক্তবৃন্দের হৃদয়েই আনন্দোল্লাস উপস্থিত হইবে, প্রকাশকগণের মানসে ইহাই আশা। পরম সেব্যধন বন্ধু ও বান্ধবগণের সেবায় এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা হউক, ইহাই প্রকাশকগণের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীগ্রন্থের প্রত্যেকটি গানেই বহু স্তবক আছে। প্রত্যেক স্তবকের বামে নিজেই অঙ্ক দিয়াছেন। এক একটি অঙ্ক দুইবার, কোথাও বা তিনবার করিয়াও দেওয়া আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে বহু সুর তাল ও অন্যান্য যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। শেষে (দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার) অঙ্ক দিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা অধিকাংশই (সর্বত্র অর্থবোধ সুগম না হইলেও) সুখপাঠ্য। ভক্তগণ ঐ সুর তাল অনুস্বার বিসর্গ বাদ দিয়াই পাঠ ও কীর্তন করিয়া থাকেন। তাহাতে লীলা আস্বাদনে কিছু বাদ পড়িল বা ক্রম ভঙ্গ হইল এইরূপ মনে হয় না। যে অংশ বাদ থাকে, জানি না কোনও দিন করিবার সৌভাগ্য দিবেন কিনা। "আমিই বুঝাইব" ইহা শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের মহাবাণী।

বাংলা ১৩০৬ সনের পৌষমাসে গ্রন্থের শেষ গান রচনা করেন। ভক্তবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের আগ্রহে ১৩০৭ সনে ঢাকা আদর্শ প্রেসে উহা প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩২৩ সনের বৈশাখ মাসে পরমার্চনীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের চেষ্টায় ও যত্নে উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। ১৩৪১ সনের শেষভাগে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতা মোহন প্রেসের বিশেষ আনুকূল্যে এই শ্রীগ্রন্থের তৃতীয়বার মুদ্রণ হয়। এই সংস্করণের মুখবন্ধে ভগবত্তত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিত একটি উপাদেয় গ্রন্থ-সমালোচনা ও আস্বাদন ছিল (তাহা তুলিয়া লইয়া শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের অঙ্গীভূত করা হইল)। এইবার ১৩৬০ সালের আশ্বিনে শ্রীগ্রন্থের চতুর্থ মুদ্রণ হইল। মুদ্রণকার্য উক্ত মোহন প্রেসেই সম্পন্ন হয়। প্রেসের অধ্যক্ষ মুদ্রণব্যয় গ্রহণ করেন নাই। ব্লক সকল তৈয়ারীর জন্য ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পনীর (১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) অধ্যক্ষ দ্রব্যাদির মূল্য ব্যতীত কিছুই লাভ গ্রহণ করেন নাই। ব্লকের শুদ্ধ (নেট) খরচ এক হাজার টাকা একজন মহাপ্রাণ ভক্ত শ্রীযুক্ত রণজিৎ লাহিড়ী মহোদয় দান করিয়াছেন। কাগজ ও অন্যান্য ব্যয় ভিক্ষালব্ধ। পূর্বে শ্রীগ্রন্থ ছিল ১৬৯ পৃষ্ঠা। এইবার উহা ২৪৮ পৃষ্ঠা হইল। কারণ পূর্বে যাহা

এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্তাক্ষরে তাহা কখনও দুই, কখনও তিন পৃষ্ঠা হইয়াছে। প্রথম খাতাখানি, যাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাহা পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থদৃষ্টে ৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে। ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত শ্রীহস্তাক্ষর অবিকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। "মহাউচ্চারণ" ও "প্রভুর বারটি নাম" যে দুইটি শ্রীহস্তলিপি গ্রন্থারম্ভে থাকিল, তাহা শ্রীহরিকথার অঙ্গীভূত নহে। রত্ন, রত্নের ভাণ্ডে রাখা হইল মাত্র।

শ্রীশ্রীহরিপুরুষের সুদুর্লভ শ্রীহস্তাক্ষর ও স্বানুভাবানন্দে নিরুপম আস্বাদন-বৈচিত্র্যময় শ্রীগ্রন্থ কলিহত জীবের গৃহে স্থান লাভ করিয়া তাহাদিগের গৃহ ও মনঃপ্রাণ পবিত্র করুক।

১৩৬০ বঙ্গাব্দ
১লা আশ্বিন
হরিপুরুষাব্দ—৮৩

দাস মহানামব্রত
শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর। ❑

'সংকীর্তন পদাবলী'—নিবেদন

"বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, গোপীভাব, কৃষ্ণরস,
যুগল প্রেম ইহার উপরে আর কিছু নাই।"—বন্ধুবাণী
"গান মধ্যে কোন্ গান জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী যেই গীতের মর্ম।।"—রায় রামানন্দ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পদ-পদাবলী কাব্যজগতে নূতন বস্তু নহে। বাংলার বৈষ্ণব-কবিকুলের প্রাণ-নিংড়ানো শুদ্ধ মধুরিমায় যে চির পুরাতন রসোন্মাদনা নিত্য নবায়মান, শ্রীশ্রীপ্রভুর পদে তাহারই মূর্চ্ছনা। ব্রজবনের যে নির্মল পিরীতি-প্রবাহে বাংলার নিমাই-নিতাই হাবুডুবু খাইয়া "অমিয়া মথিয়া" বিস্তার করিয়াছেন—ফরিদপুরের আঁধার কুটিরে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাহারই অতলস্পর্শী তলদেশে নিমজ্জমান। স্বয়ং আস্বাদনকারী পদ বাঁধিয়াছেন, তাই ইহার মাধুর্য নিরুপম। শ্রীশ্রীপ্রভুর লিখনী হইতে লেখা বাহির হইত যেন হর-জটা হইতে সুরধুনী ধারা। নিরবচ্ছিন্ন মহাভাবাবিষ্ট সে মহামানস সরোবর হইতে নিখুঁত নিটোল পদকদম্ব স্বতঃ উৎসারিত হইত। চিন্তা নাই এতটুকু কাটাকুটি সংযোজন বিয়োজন সংশোধন নাই। নির্মল নির্দোষ গীতলহরী হরিদ্বারের গঙ্গাধারার মত তরতর বহিয়া চলিত। আশেপাশে যারা থাকিত সবাই ভিজিত—আজও ভিজে, চিরকালই ভিজিবে। চিরসন্তপ্ত এ সাহারায় শস্য ফলাইতেই ইহার আবির্ভাব। চির পুরাতনের এ আবির্ভাব নিত্য নব নব।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সকল পদ পূজ্যপাদ দাদা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পদাবলী-কীর্তন নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংস্করণে আমার কৃতিত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। সংগৃহীত বস্তুকেই মাত্র লীলার ক্রমানুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করা হইল।

মধু-ব্রহ্মের মধু-লেখনী জয়যুক্ত হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'সংকীর্তন পদাবলী।' প্রভু জগদ্বন্ধু, মহানাম সম্প্রদায়। মহাউদ্ধারণ মঠ। ৩য় সং ১৩৬৯।

'ধবলমুখে ভারতীয় সন্ন্যাসী'—আশীর্বাণী

অর্দ্ধশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। বছর ছয়েক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিয়াছিলাম। চার বছর ছিলাম চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থিসিস্ লেখা নিয়া। তার পর প্রায় দু'বছর ভাষণ দিয়া বেড়াইয়াছি দুইটা সংস্থার আয়োজনে। চিকাগো শহরটা যুক্তরাষ্ট্রের মাঝামাঝি স্থানে। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া পশ্চিমে প্রশান্ত তীরে কেলিফোর্নিয়া স্টেট পর্যন্ত ও আবার অন্য পথ ধরিয়া চিকাগো ফিরিয়া পূর্ব দিকে আটলান্টিক তীরস্থ নিউইয়র্ক প্রভৃতি কতিপয় স্টেটে বেড়াইয়া নিউইয়র্ক ফিরি। মাঝে একবার উত্তর কানাডায় ও একবার দক্ষিণে চে'াস পর্যন্ত যাই। আলোচ্য বিষয় মানবধর্ম, গীতা ভাগবতের ধর্ম—এশিয়ার বিভিন্ন ধর্ম খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে কেমন যেন একটা মানসিক ক্লান্তি আসে। বিশ্রামের জন্য একটা নির্জন স্থানের কথা ভাবিতেছিলাম.। এক বন্ধু উপদেশ দিলেন নিউ জার্সি স্টেটে white face নামক একটা পাহাড়ে যাইতে। এদিক্ ওদিক্ বিশেষ কোন বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যেন সেখানে চলিয়া গেলাম। সাত-আট দিন থাকিলাম। রাত্রে একাই। দিনে বহু নরনারী আসিত। নূতন লোক, আমার পরিচিত অপরিচিত, আমার জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত বহু বান্ধব। আমার শয্যা ছিল পাহাড়ের গাত্র, আহার্য ছিল আকাশ বৃত্তি। তবে উপবাস করিতে হয় নাই। আমি পড়িতাম, করতাল বাজাইয়া গাইতাম। প্রভুর পূজা করিতাম। পদ্য-গদ্য হিজি-বিজি লিখিতাম। জঙ্গলে পশুপাখী সাপের খেলা দেখিতাম—আকাশে প্রকৃতির খেলা দেখিতাম। আরাধ্য দেবতার নৈকট্য অনুভব করিতাম।

স্নেহাস্পদ্ শ্রীমান্ চিদানন্দকে ঐ ক'দিনের কাহিনী নিবন্ধাকারে লিখিতে বলিয়াছিলাম। আমার ডাইরী, চিঠিপত্র ও স্মৃতিতে যা ছিল তাকে দিয়াছিলাম। সে নিবন্ধ না লিখিয়া উপাখ্যান লিখিয়াছে। সত্যভিত্তিক উপাখ্যান বলা চলে। Proper name-গুলি না দিয়া কাল্পনিক নাম দিয়াছে। উপাখ্যানটি আমার মনের মত হইয়াছে। অনেক স্থান তার মানসরঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। তবে মহাকবির ভাষায় নারদের কথা মনে করিয়াছি "ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" কবি বাল্মীকির মনের অযোধ্যা আসল "আযোধ্যার চেয়ে সত্য"। আমার পরম বন্ধু কালীদার-উচ্ছ্বসিত বাক্যে আমি ছাপাইতে নির্দেশ দিয়াছি। অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতদের মতে সাহিত্যে কল্যাণের চেয়ে আনন্দের দাম বেশী। এই পুস্তিকাটি পাঠ করে কী কল্যাণ লাভ হবে জানি না, তবে আনন্দলাভ হবে। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'ধবলমুখে ভারতীয় সন্ন্যাসী'। শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী। ১৯৯২, ট্রাস্ট।*

জয় জগদ্বন্ধু

শুভেচ্ছাবাণী

কিঞ্চিদধিক ষাট বছর পূর্বে আমেরিকা গিয়াছিলাম। গিয়াছিলাম শ্রীগুরুর কৃপাশক্তিতে।

* *'পাশ্চাত্যে প্রচারণে মহানামব্রত'। শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী। ট্রাস্ট, ১৯৯৬।*

ছিলাম প্রায় ছয় বছর তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতে। যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাঁহার অমোঘ প্রেরণায়। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অসীম করুণার ভাণ্ডার ছিলেন শ্রীগুরুদেব শ্রীমহেন্দ্রজী। তাঁহাকে অনেকেই চিনেন না; আমিও চিনি নাই। শুধু পাইয়াছিলাম বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত একটা কৃপার স্পর্শ আর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম একটা অপ্রাকৃত ভালবাসার অনাবিল অফুরন্ত উৎস।

এই যন্ত্রটা দ্বারা পাশ্চাত্ত্যে যাহা করাইয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজও অন্তরে জাগরূক। শ্রীমান্ চিদানন্দ কাছে থাকিয়া সেই স্মৃতির থলে হইতে কিছু কিছু কথা-কাহিনী বাহির করিয়া নিয়াছে। তার স্বাভাবিক কাব্যিক-প্রতিভা দ্বারা তাহা রূপায়ণ করিয়া এই বইখানা লিখিয়াছে। আমাকে পড়াইয়াছে। দর্পণের গঠন-সৌকর্যে বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব মনোহারী হয় দেখিলাম।

আমাকে যারা ভালবাসে এমন দুই-তিন জনের কিছু সুন্দর লেখা অগ্রলেখ রূপে স্থাপন করিয়া—বইখানা সে ছাপাইতেছে। আমার কাছে আশীর্বাদ চায়—আমি আশীর্বাদ করি—যারা এই বই পড়িবে তারা যেন তাদের জীবন-পথের কিছু মূল্যবান পাথেয় ইহা হইতে গ্রহণ করিতে পারে।

২৫/৪/১৯৯৬ — শুভার্থী—
শ্রীমহানাম অঙ্গন — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑
রঘুনাথপুর, কলকাতা-৫৯

জয় জগদ্বন্ধু

আশীর্বাণী

আমার একজন প্রিয় শিষ্য ভজন-পূজন-মালা লিখিয়াছে। আমাকে যাহা যাহা করিতে দেখিত, সে তাহারই অনুসরণ-অনুকরণ করিত। সেই নিত্য অনুশীলিত নিজ ভজন হইতে তার এই সংকলন। আমি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। গ্রন্থ-দর্পণে যেন আমাকেই দেখিলাম। যে নিজ ভজনে ইহার অনুসরণ করিবে, সে-ই দেখিবে। জয় জগদ্বন্ধু।

মাঘ, ১৩৮৯ বাং — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'ভজন-পূজন মালা।' শ্রীকুমুদরঞ্জন দেবনাথ (আগরতলা), ১ম সং ১৩৮৯। ট্রাস্ট।*

'কালাচাঁদ গীতা'—নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের 'কথামৃত' গ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডই পড়িলাম। পড়িয়া মনে হইল—মানব সমাজের কল্যাণার্থ এমন গ্রন্থ আর নাই। তারপর একদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পড়িলাম। ভাবিলাম—কথামৃত হইতেও এই গ্রন্থ মধুর; কারণ, কথামৃতে রসপ্রস্থানের আলোচনা নাই বলিলেই হয়। হৃদয়ের শুদ্ধ প্রেমভক্তি দ্বারা

* *'কালাচাঁদ গীতা'। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস। ট্রাস্ট সংস্করণ, ১৯৯৯। সম্পাদনা : ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ট্রাস্ট।*

ভগবান্‌কে কত আপনজন করিয়া লওয়া যায় তাহা বিস্তারিত চৈতন্য-চরিতামৃতে পাইলাম। ভাবিলাম, কী মধুময় গ্রন্থ! আবার একদিন কবিরাজ গোস্বামীর কথা ভাবনায় মনটা ছোট হইয়া গেল। ভাবিলাম, বৃন্দাবনের এত ভালবাসার কথা বলিয়াছেন, তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌরপ্রেমের কথা কোথাও একটি পঙ্‌ক্তিও বলেন নাই। ইহা যেন সাধারণ মানুষের মত এক দ্বেষদূষিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কি শ্রীরাধারাণীর মত অসহ্য বিরহ-সাগরে ডুবিয়া দিনরাত ছটফট করিয়া কাঁদেন নাই? যদি রাধা-বিরহের কথা ভাবিলে কৃষ্ণ-অনুরাগের কথা জাগে, তাহা হইলে কি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিরহের কথা ভাবিলে গৌরপ্রেমে ভরপুর হইয়া যাইবে না? যাঁহার হৃদয়ে গৌরপ্রেম জাগে তাঁহার আর পাইবার কী বাকী থাকে? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কিছুই লিখিলেন না কেন? 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের উপর আমার যে গভীর ভালবাসা ছিল তার উপর যেন রেখাপাত হইল।

আর একদিন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'শ্রীঅমিয় -নিমাই-চরিত' পাঠ করিয়া অসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলাম। মহাত্মা শিশিরকুমার মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-যাত্রার পরবর্তী মধুর লীলাসকল যেমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের গার্হস্থ্যলীলাও তেমনি মাধুরীমণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ওই দুই লীলা তো একই লীলার এপিঠ ও-পিঠ। ব্রজ-নাগরীর কৃষ্ণানুরাগ ও নদীয়া নাগরীর গৌর-অনুরাগে কি ভিন্নতা আছে? নন্দ-যশোদার কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যপ্রেমে ও শচী-জগন্নাথের গৌরের বাৎসল্য প্রেমের কি তর-তমতা আছে? যশোদার অশ্রুধারা ও শচীমায়ের অশ্রুধারায় কি পার্থক্য আছে? যশোদা মা জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা বা দ্বারকায় ভাল আছেন ও সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে আছেন। তার বিপরীত, শচীমা জানিতেন, তার নিমাই কোন্ সুদূর দাক্ষিণাত্যের বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া একাকী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিহ্বল হইয়া ছুটিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রামের কোন স্থান নাই; পিপাসায় এক গ্লাস জল তুলিয়া দিবার মতও একজন লোক নাই। এই কথা ভাবিতেই শচীমাতা একেবারে শিহরিয়া উঠিতেন। সেই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহের কথা বা বেদনায় তরঙ্গায়িত-প্রবল সন্তাপের কথা কেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রাণ ভরিয়া লিখিলেন না?

আধুনিক কালের গৌরকথার শ্রেষ্ঠ লেখক ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীকৃষ্ণদাসজীর অনুকরণে তাঁহার গ্রন্থেও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা লিখিলেন না।

যিনি কাব্যে উপেক্ষিতা (অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও উর্মিলা)-দের জন্য কত দুঃখ করিয়াছেন সেই বিশ্বকবিও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা এক পঙ্‌ক্তিও লেখেন নাই। জোড়াসাঁকো হইতে নবদ্বীপ আর কত দূর। নবদ্বীপের এক বিন্দু বিরহ-দাবানলের তাপও কি জোড়াসাঁকোর কবির গায়ে লাগে নাই?

মহাত্মা শিশিরকুমারের 'শ্রীকালাচাঁদ-গীতা' নামক গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। মনে হইয়াছে—এমন মধুময় গ্রন্থ বিশ্বে আর নাই। শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত লেখার পর শ্রীকালাচাঁদ-গীতার ন্যায় আর একটি গ্রন্থ করিলেন কেন? তার কারণ বোধ হয় অতি নিগূঢ়। আমার অনুধাবন করিবার

যোগ্যতা নাই। এই গ্রন্থটি যিনি পড়িবেন তিনিই বুঝিবেন ভক্ত-ভগবানের কথা, সাধকের সাধনার কথা, অনুরাগিণীর অনুরাগের কথা যে সহজ সরল ও প্রাণবন্ত করিয়া বলা যায় তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।

যতবার শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন জীবের জন্য, তন্মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপতত্ত্ব সর্বাধিক কঠিন ও গভীরভাবে মাধুর্যপূর্ণ। সেই পরম বস্তুটিকে বাংলাদেশের সকল নরনারীর হৃদয়ের ধন, ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া যিনি তাঁহার অসীম করুণা-কথা সকল মানুষের হৃদয়মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। শিশিরকুমার সর্বতোভাবে গৌরগতপ্রাণ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বাঙালীর সর্বজনহৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁহার করাঙ্কিত 'শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত' গ্রন্থ ধন্য। তাঁহারই এই দ্বিতীয় লেখা 'শ্রীকালাচাঁদ-গীতা' ধন্যাতিধন্য। গৌরসুন্দরকে যে অলৌকিক সুকৌশলে তিনি জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এক অলিখিত ইতিহাস। গৌরসুন্দর যে কেবল পরম পণ্ডিত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি মানবদেহের হৃদয়-মন্দিরের সৌন্দর্য-মাধুর্যের দেবতা। পাঁচশত বৎসর হইয়া গেল এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের 'হা গৌর! প্রাণ গৌর!' বলিতে বক্ষ ভিজিয়া যায়। তিনি যে অতুলনীয় কার্য সাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার মত সমাধিস্থ আত্মস্থ অনুভবী সাহিত্যিক বিরল। ভক্ত ভগবানে ভালবাসার গভীরতর মাখামাখি সম্বন্ধ এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাই না—যেমনটি তাঁহার লেখনীতে পাই। গৌরসুন্দর ছিলেন তাঁহার জীবনের সর্বাধিক আপনজন, পরম করুণাময় সুনির্মল ভালবাসার বিগ্রহ। তিনি তাঁহার সুনিপুণ পরিবেশনায় বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ের অন্তস্তলে গৌরসুন্দরকে শুধু আরাধ্য হিসেবে নহে, অন্তরের অন্তরতম করিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। তিনি নিজে কত বড় ভক্ত ছিলেন নিজেও জানিতেন না। তাঁহার গৌরপ্রেম সাগর-গম্ভীর। তাই বলিয়াছি—শিশিরকুমারের প্রচেষ্টার কৃতকর্তা অতুলনীয়। জয় গৌর। জয় জগদ্বন্ধু।

১লা বৈশাখ, ১৪০৬ সন। — বৈষ্ণবপদরজঃ প্রার্থী
শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন — দাস—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑
রঘুনাথপুর, কলিকাতা-৫৯

'প্রেমযোগ (১ম)'—দু'টি কথা

যেমন গৌরলীলায় কবিরাজ গোস্বামী বলিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বুঝায়, সেইরূপ বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ লীলায় কবিরাজ মশায় বলিলে যোগেন্দ্র কবিরাজকে বুঝায়। ইনি একজন কবিরাজ, সত্যসত্যই চিকিৎসক ছিলেন। কোনও বিদ্যা ছিল না। কোনও কবিরাজের সঙ্গে কিছুদিন থাকিয়া "কবিরত্ন" উপাধি পাইয়া ফরিদপুর জেলায় রাজবাড়ী নামক স্থানে ব্যবসায় করিতেন। বিদ্যা না থাকিলেও হাত-যশ ছিল, বহু রোগী নিরাময় করিয়া ভাল অর্থ

** 'প্রেমযোগ' (১ম খণ্ড)। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার। ১ম সং ১৩২০। শ্রীঅঙ্গন। ২য় সং, ১৩৯৯, ট্রাস্ট।*

উপার্জন করিতেন।

ভগবান্ মানিতেন না, কৃষ্ণলীলাকে একটা অসমাজিক কুৎসিত ব্যাপার মনে ভাবিতেন। কৃষ্ণভজনকারীদের অতি অসুন্দর গালি দিতেন। হৃদয় ভক্তিশূন্য মরুভূমির মত ছিল। হঠাৎ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপার বাতাস গায়ে লাগে। সে বাতাসে তাঁহার সকল দোষ উড়িয়া যায়। পরা জ্ঞানের উদয় হয়। 'প্রেমযোগ' নামক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা একখানি গ্রন্থ লিখিয়া ফেলেন, প্রায় আবিষ্ট অবস্থায়। যাঁহার মধ্যস্থতায় প্রভুর কৃপার পরিধির মধ্যে আসেন, তিনি শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। তাঁর নিষেধ ছিল বলিয়া নাম প্রকাশ করেন নাই। কেবল এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"অজ্ঞাত কুলশীল ছিন্ন কন্থাধারী চিরকুমার ব্রহ্মচারী একটি ত্যাগী-ভক্ত বৃন্দাবনের বনে বনে আপন মনে পাগলের মত কত কি বলিয়া হাসিত, কান্দিত, নাচিত; গাহিত, কখনও হরি হরি বলিয়া রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চীৎকার করিয়া নিবিড় বনে ছুটিত। পাগলকে দেখিতেও পাগল, কাজেও পাগল, এ স্বভাবসিদ্ধ পাগল। যখন কৈশোর সমাগমে আমরা কামিনী-কাঞ্চনের মোহ-মদিরায় পাগল হইয়া সংসার-গাবদে ঢুকিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ পাগলের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তখন "এ" হরি হরি করিয়া পাগল হইয়া সংসার হইতে ছুটিয়া শ্রীহবির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল, ঐ অপরিচিত অজ্ঞাত-কুলশীল প্রেমের পাগল এখন আমাদের পরিচিত। এ পাগল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার আপনার করিয়া লইয়াছে। আমরা তাঁহাকে চাই বা না চাই, সে কখনও আমাদিগকে ভুলে না, ছাড়ে না। এ পাগল আজকাল সংক্রামক ব্যাধিতে অনেককে পাগল করিবার জোগাড় করিয়াছে।"

এ পাগলের নাম মহেন্দ্র। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু হরি তাহাকে বৃন্দাবন হইতে কৃপাকর্ষণে টানিয়া আনিয়া আপনার অন্তবঙ্গ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ধন্য ভক্তবৎসল শ্রীহরি।

এই মহেন্দ্রজীব কৃপাতেই তাঁহার প্রভু বন্ধুর দর্শন-স্পর্শন ভাগ্যে ঘটে এবং সেই হইতেই অপূর্ব গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। গ্রন্থরচনার মূলে যে কৃপাশক্তি তাহা কবিরাজ মহাশয় লাভ করিয়াছেন শ্রীশ্রীমহেন্দ্রজীর মাধ্যমে। তাই গ্রন্থখানি ছাপাইয়া লিখিলেন ঃ "প্রকাশক—শ্রীমহেন্দ্রজী।" বস্তুতঃ অন্তরে প্রকাশ করা ছাড়া বাহিরে গ্রন্থমুদ্রণে কোন সহায়তা তিনি করেন নাই।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন এই প্রেমযোগ গ্রন্থ পাই। সব কাজ ফেলিয়া অভিভাবকের ভয়ে এক মাঠের মধ্যে ঝোপের আড়ালে গিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া এই গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করি। এই গ্রন্থের প্রভাবে সংসার ছাড়িয়া প্রভু জগদ্বন্ধু হরির চরণ পাশে ছুটিয়া আসি। প্রায় শত মাইল পথ পদব্রজে। এই গ্রন্থের কাছে কৃতজ্ঞ তৎকালে বহু শত ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় ৭৭ বছর পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া—সেই কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিবার ভাগ্য লাভ করিলাম।

তিন খণ্ড একেবারে না ছাপাইয়া প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশ করা হইল। পাঠক ভক্তদের আগ্রহ বুঝিতে পারিলে দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইতে ইচ্ছা রহিল।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'প্রেমযোগ (২য়)'—প্রাক্-কথন

চারি বৎসর পূর্বে প্রেমযোগ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'দু'টি কথা' ভূমিকার শেষে বলিয়াছিলাম—এই গ্রন্থ "তিনখণ্ড একবারে না ছাপাইয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হইল। পাঠক ভক্তগণের আগ্রহ বুঝিতে পারিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইতে ইচ্ছা রহিল।"

প্রথম খণ্ড যিনিই পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন অতি মধুর। লীলারসের প্রাণস্পর্শী আস্বাদন। তাই পাঠকবর্গের আগ্রহেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থলেখক শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে আমি দর্শনভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমাকে গভীরভাবে স্নেহ করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বটিকে লেখনী দিয়া ফুটানো কঠিন। ব্রজ-গৌর-লীলারসে ডুবিয়া মজিয়া একেবারে "তন্মনস্কাঃ তদালাপাঃ" এই ভাগবতীয় বাক্যের মূর্তি স্বরূপ হইয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষির "অন্যা বাচো রিমুঞ্চথ" উপদেশের যেন একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে বিরাজিত ছিলেন।

আবেশে প্রকাশিত এই গ্রন্থকে আশী বছর পরে আবার ছাপাইয়া ভক্ত-সজ্জনের হাতে দিতেছি জানিয়া নিশ্চয়ই নিত্যলোক হইতে তিনি তাঁহার নীরব ভাষায় আমাদেব ওপর করুণাসিক্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন—তিনি আশীর্বাদ-ধনে ধনী হইবেন। অলমিতি। জয় জগদ্বন্ধু।

বৈশাখী সীতানবমী, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ —মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

---

* *'প্রেমযোগ' (২য় খণ্ড)। কবিবাজ শ্রীযোগেন্দ্র সবকাব। সম্পাদক ঃ ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ট্রাস্ট। ১ম সং ১৩২৩।*

'প্রভু জগদ্বন্ধু'— দু'টি কথা

বাল ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু মহানাম সম্প্রদায়ের অন্যতম সেবক। তাহার জন্মস্থান শ্রীঅঙ্গনের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রাম। ঐ গ্রাম কবি জসিমউদ্দিনের জন্মস্থান। বাল্যবেলা হইতেই জসিমউদ্দিনের সাহচর্যে পল্লীকবিতা লেখা আরম্ভ করেন। কৈশোর বয়সে মহানাম সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। তারপর আধ্যাত্মিক জীবন গুরুকরুণাতেই পরিপুষ্ট। গুরু শ্রীমহেন্দ্রজীর কৃপায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কতিপয় গ্রন্থ ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তাহার লিখিত পাণ্ডুলিপি, এমনকি মুদ্রিত পুস্তকগুলিও ধ্বংস হইয়া যায়। পরিমলবন্ধুও অপরিণত বয়সেই শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে শান্তিলাভ করেন।

যখন নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অত্যাচারিত অগণিত নরনারী দিশাহারা হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল তখন ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু কণ্ঠে একখানি শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীমূর্তি দোলাইয়া হাতে করতাল বাজাইয়া অবিশ্রাম মহানাম গাহিয়া নোয়াখালীর সদর রাস্তায় অলিতে গলিতে

* *'প্রভু জগদ্বন্ধু'। শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু ব্রহ্মচারী। রাজ সংস্করণ, ১৩৯১। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। ভূমিকা ঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪১)।*

কীর্তন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস ও নির্ভীকতা দর্শনে অনেক বিপন্ন মানুষের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছিল।

তাঁহার এই "প্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থখানিতে তিনি অতিসুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে বন্ধুসুন্দরের মধুর লীলাকথা কীর্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বনামধন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। পরিমল আমার পরম স্নেহের পাত্র ছিল। তাহার পবিত্র আত্মা শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে পরম আনন্দে থাকুক—এই কামনা করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রণালয়ে পাঠাইলাম। কিছুদিন পূর্বে গ্রন্থখানি বাংলাদেশে মুদ্রিত হইয়া ভক্তগণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছে। এখানেও হইবে আশা করি। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'উপমা মহানামব্রতস্য'—প্রাক্-কথন

'উপমা কালিদাসস্য' ইত্যাদি শ্লোকখানি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহলে না জানেন, এমন কেহ নাই। কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবিদের তুলনা করিয়া, কবি কালিদাসের বিশেষত্বের গৌরব যে উপমার সুষ্ঠু প্রয়োগে—এই কথা শ্লোকে ব্যক্ত।

মহাকবি তাঁহার রঘুবংশ গ্রন্থখানি আরম্ভ করিয়াছেন একটি উপমা দ্বারা—"বাগর্থাবিব।" বাক্য এবং অর্থের মত সতত সংযুক্ত জগতের আদি জনক-জননী—হরপার্বতীকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ। প্রণাম করার উদ্দেশ্য কী? 'বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।' সাহিত্য রচনায় বাক্যের অর্থের যেন প্রতিপত্তি জন্মে, এই জন্য। তারপর চলিয়াছে প্রায় প্রতি শ্লোকেই উপমার সম্ভার।

সেই "উপমা কালিদাসস্য" কথাটির অনুকরণে বা অনুসরণে শ্রীমান্ নন্দের এই দুই খণ্ড গ্রন্থ। লেখক আমার সমালোচক বা critic নহে। প্রিয় শিষ্য, ভক্তোচিত বিনয়, করুণা প্রার্থনায় নম্রতায় ভরপুর হইয়াই গ্রন্থ লিখিয়াছে—তবু ইহা আমার লিখিত গ্রন্থগুলির একখানি উত্তর critique হইয়াছে। criticism নাই, শুধু comprehension আর উল্লাসময় appreciation।

লিখিয়া ফেলিলাম "আমার লিখিত" গ্রন্থগুলির—কথাটা অহংকারে লিখিলাম। আমি লিখি না—কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ভাষায় "আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন।" কবি কালিদাসের মধুর উপমার ভাষায়—"সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" কবির উপমাটি একটু বিস্তার করিয়া বলি।

মণির মালা গ্রন্থণ করিতে দুইজন লোক লাগে। মণি খুব কঠিন বস্তু। একজন লাগে মণির মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিতে, দ্বিতীয় জন কেবল ছিদ্রমধ্যে সূতা পরায়। লোকে দ্বিতীয় জনের প্রতি অঙ্গুলি দিয়া বলে—এই মালাখানি ইনি গাঁথিয়াছেন। বস্তুতঃ দ্বিতীয় জন বিশেষ কিছু করে নাই, তবু, নামটা তারই। আসল পরিশ্রমের কাজ করিয়াছেন, যিনি ছিদ্র করিয়াছেন। উপমাটি প্রয়োগ

* *'উপমা মহানামব্রতস্য' (১ম ২য় খণ্ড) নন্দগোপাল সাহা, ট্রাস্ট। গুরুপূর্ণিমা, ১৯৯১*

করিয়া কবি মনের কথা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রঘুবংশের মত একখানি গ্রন্থ রচনায় আমি সম্পূর্ণ সামর্থ্যহীন,—বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার মত, আমার প্রয়াস দেখিয়া সজ্জনেরা উপহাস করিবে—তবু লিখিতেছি কোন্ সাহসে, কোন্ ভরসায়? ভরসা এই যে, পুণ্যশ্লোক রঘুরাজার পবিত্র বংশের মহিমা কীর্তনে সুপ্রশস্ত পথ করিয়া দিয়াছেন আদি কবি বাল্মিকী রামায়ণে। ছিদ্র করা মণির মধ্যে সূত্র পরানোতে আমার কাজ পর্যাপ্ত। ইহাই কবি কালিদাসের কথা।

আমার লিখিত গ্রন্থগুলির প্রকাশও সেইমত—ভাবিয়া-চিন্তিয়া লেখা নয়। একটা ভাব আসিল; সময় অসময় নাই, হয়ত রাত্র এক ঘুমের পর। আলো জ্বালিয়া লিখিতে বসিলাম। লিখিতে লিখিতে ঘুম আসিল, কিন্তু লেখা চলিল। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইল, জড়াইয়া গেল। পরদিন সকালবেলা নিজ লেখার পাঠ উদ্ধার করিতে অনেক খাটিতে হইল। এমন সুষ্ঠু লাগিল যে কোন একটা অক্ষরও বদলাইতে ইচ্ছা হইল না। এরূপ লেখা অনেক।

লিখিত পংক্তিগুলি ছিদ্রকরা মণিমালায় সূত্র পরানোর মত। ছিদ্রটি করিলেন কে? গুরু আর গোবিন্দ। একজন পরম প্রেমাতুর ভক্ত ছিলেন শ্রীগুরুদেব। তিনি নিজ পরিচয় দিতে একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

"গোকুল বসতি, কৃষ্ণ পতি,
আভিরী রূপসী আমি।
বৃষভানুনন্দিনী, কিশোরী ভামিনী
ভালবাসিত দিবা যামিনী।।"

শ্রীগুরুমুখে দিনের পর দিন শ্রুত কথা গাথা আমার পুঁজি। তারপর আরাধ্য দেবতা শ্রীহরিপুষের করুণামাখা প্রণোদন, গায়ত্রীর ভাষায় "প্রচোদয়াৎ" সুতরাং লেখক কে? বিচার করুন।

আমার নামে চলতি গ্রন্থগুলি অনেক সময় অতি ভালো লাগে, কখনও বিস্ময়ও লাগে। আজ নন্দগোপালের এই উপমাপঞ্জীর সঞ্চয়ন—দুই খণ্ড সবটাই পাঠ করিলাম। পাঠে শুধু সুখোদয় হয় নাই, Joy of Self-realisation -এর অনির্বচনীয় আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

গ্রন্থ দু'খানিতে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা ভালো বাসেন, তাঁহারা শুধু উপকৃত হইবেন না, উল্লসিত হইবেন। তাঁহাদেরও মনে হইবে, কি যেন কী একটা অভাবনীয় উপলব্ধি হইল। বস্তুতঃ আমার লেখা নয় বলিয়াই শ্লাঘা করিলাম।

পুষ্প সঞ্চয়নকারী 'মালী', প্রেমভক্তিধনে ধনী হউক। তাহার অনুশীলন যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছিতে সহায়ক উহক।

কৃপাশ্রিত—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

‘চন্দ্রপাত’—নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতের জন্য রাখিয়া যান নাই নিজ শ্রীহস্তলিখিত বিশেষ কোন গ্রন্থ। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন স্বরূপ। তিনি এবার লীলায় আসিয়া শ্রীকরে লেখনী ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিযাছেন অনেক কথা। শ্রীকরে লেখনী-প্রসূত অবদান জগজ্জীবের পরম আদরের ও ধ্যানের সম্পদ্।

শ্রীকরাঙ্কিত গ্রন্থ-সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সূত্রময় ও ছন্দোময়। সূত্রময় গ্রন্থ ‘শ্রীত্রিকালগ্রন্থ’। ছন্দোময় গ্রন্থ ‘সংকীর্তন-পদামৃত’, ‘পদাবলী’, ‘হরিকথা’ ও ‘চন্দ্রপাত’। বর্ণনীয় বিষয়দৃষ্টে শ্রীগ্রন্থসমূহকে আবার তিনভাগ করা চলে—শ্রীশ্রীব্রজলীলা, শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীশ্রীমহাউদ্ধারণ বন্ধুলীলা। শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থ বিশেষভাবে লীলাবিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলার আস্বাদনে পূর্ণ। এই আস্বাদনের চরম পরিণতি শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থে।

তরল ইক্ষুরস গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তম হইতে হইতে শেষে মিশ্রিতে পরিণত হয়। বন্ধুসুন্দরের লীলাস্বাদনের ভাষাও সেইরূপ বিষয়ের গভীরতমতায় ভূলোক ছাড়িয়া গোলোকের অপ্রাকৃত রূপে পৌঁছিয়াছে। চন্দ্রপাতের কী যে দেবভাষা বুঝিবার উপায় নাই। রসের পান চলে চুমুকে, কিন্তু মিশ্রির আস্বাদন চুষণে। অন্যান্য গ্রন্থ আস্বাদনে বিদ্যাবত্তা ও সাধনার কিছু উপযোগিতা আছে, কিন্তু চন্দ্রপাত অনুভব করিতে শুধু ‘কৃপা হি কেবলম্।’

চন্দ্রপাতে গান আছে মাত্র পাঁচটি। প্রথম গানটিতে ব্রজলীলার সহিত মহাউদ্ধারণ লীলার সম্পর্ক, দ্বিতীয় গানটিতে গৌরলীলার সহিত বন্ধুলীলার সম্বন্ধ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গানে শ্রীশ্রীমহাউদ্ধারণ স্বকীয়-লীলাব আবির্ভাব-রহস্য, তত্ত্ব ও ভাবমাধুর্য বর্ণিত আছে। পঞ্চম গান মহাউদ্ধারণচন্দ্রের মহাদশাশ্রয়ের সংবাদ দিয়াছেন—এইরূপ মনে হয়।

শ্রীত্রিকালগ্রন্থে নিজেই “চন্দ্রপাতকে কীর্তন কহে” লিখিয়াছেন। আবার তৃতীয় গানের প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তিকে ‘মহাকীর্তন’ কহিয়াছেন। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে[১] শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাদশাশ্রিত শ্রীদেহ ঘিরিয়া আজ সাইত্রিশ[২] বৎসর যাবৎ অবিশ্রাম ঐ মহাকীর্তন খোলকরতালে গীত হইতেছেন। এই মহাকীর্তন যজ্ঞে সুমেধাগণ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিতেছেন।

“হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন।।
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)”

হরিশব্দবাচ্য পুরুষ যিনি, তিনিই জগদ্বন্ধু। জগতে মহাউদ্ধারণ তাঁহার কার্য বা লীলা। তিনি

১. বর্তমানে শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাদশাশ্রিত শ্রীদেহ কৃষ্ণনগর ঘূর্ণী স্থিত শ্রীশ্রীমহেন্দ্র-বন্ধু অঙ্গনে নব গম্ভীরা গৃহে সম্পুটে শায়িত আছেন। সেখানে ১৯৯০ খ্রী. হইতে অহর্নিশি অবিরাম মহানাম মহাকীর্তন গীত হইতেছেন।

২. বর্তমানে এই মহাকীর্তন যজ্ঞ ৯০ বৎসর চলিতেছে।

** ‘চন্দ্রপাত’। প্রভু জগদ্বন্ধু। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ। ১ম সংস্করণ ১৩৫৮।*

চারিহস্ত বিগ্রহ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু। চন্দ্রের সুধা ও গাভীর অশ্রু অবলম্বনে তিনি জগতে প্রকটিত। কীট বা বদ্ধ জীবের পতন হেতু তিনি ব্যথাতুর। তিনিই একমাত্র প্রভু, প্রভুর প্রভু। তাঁহার মাধুর্য অনন্ত, ঐশ্বর্যও অনন্ত। কীট-জীবের বেদনা ঘুচাইতে অনন্তানন্তময় মহাপ্রভু চাঁদের সুধায় অঙ্গ গড়িয়া জগদ্বন্ধুরূপে জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। মহাকীর্তনের এইমত তাৎপর্য কিঞ্চিৎ অনুভব করি।

এই মাধুর্যময় পঙ্ক্তি ত্রয়ের 'মহাকীর্তন' সংজ্ঞা নিজ শ্রীহস্তেই দিয়াছেন। ত্রিকালগ্রন্থে যে নাম তিনটিকে 'মহানাম' পদবাচ্য করিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, সেই নামত্রয় এই পঙ্ক্তি ত্রয়ের উপক্রমেই বিদ্যমান থাকায় মহাকীর্তন ও মহানামেব মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই মহাকীর্তন বহু রাগ-রাগিণীতে গীত হন। নিজেই ইহাকে "চল্লিশ রাগ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রপাত সকল ভক্তগণেরই কণ্ঠহার। অর্থবোধ হউক বা না হউক, মন্ত্রের মত সকলে নিত্য আবৃত্তি করেন। মন্ত্রের মত বহু ব্যাপারে ইহার শক্তিও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই মন্ত্রগ্রন্থ লইয়া ভক্তগণ ধ্যান করেন। আমার যোগ্যতা নাই, ধ্যান কবি না, করিতে পারি না; যাঁহারা সত্যিকার ধ্যান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নাম করিতে হয সর্বাগ্রে শ্রীযুত অমূল্যভূষণ মল্লিক দাদাজীবনের। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর মনন করিয়া তিনি ত্রিকালগ্রন্থ ও চন্দ্রপাতের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীশ্রীবন্ধুনবমী, ১৩৬৫ — **দাস মহানামব্রত**।

'প্রেমের বাণী'—ভূমিকা

মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাবাণী-সমূহ সত্যসত্যই প্রেমের বাণী। এমন দরদ দেওয়া কথা জগতে সুদুর্লভ। ত্রিলোক-শিক্ষাগুরু ত্রিকালের আচার্য রূপে যে-সকল কল্যাণময় উপদেশরাশি বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই কারুণ্য-রস-সিক্ত। কখনও, অনুগতজনের বেদনায় ব্যথিত হইয়া শ্রীমুখ-পদ্ম-বিগলিত অমৃতবাণী বর্ষণে তাঁহাদিগকে পরা তৃপ্তি দান করিয়াছেন, কখনও নিখিল জীবনিবহের ভগবদ্‌বৈমুখ্য তজ্জনিত সন্তাপ দর্শনে আপনি সন্তাপিত হইয়া কল্যাণময়ী শ্রীলেখনী ধারণ করতঃ প্রেমোজ্জ্বল উপদেশ-চন্দ্রিকায় বিশ্বজনের পরা শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। কতশত উপদেশ—কীর্তন গীতিকায়, কতশত উপদেশ—ব্যক্তিগত লিপিকায়, কতশত উপদেশ তত্ত্ব-খনি সূত্রময় ত্রিকালগ্রন্থে। প্রত্যেকটি কথারই অন্তস্তলে শ্রীশ্রীপ্রভুর সমুদ্র-গম্ভীর হৃদয়ের নির্মল স্নেহ-ধারা প্রবহমান। তাই বলিয়াছি, প্রভুবন্ধুর বাণী সত্যসত্যই "প্রেমের বাণী।"

কীর্তন-গ্রন্থ "শ্রীহরিকথা" শ্রীগ্রন্থের অঙ্গীভূত দুই-একটি উপদেশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

* *'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রেমের বাণী।' দাস—মহানামব্রত সম্পাদিত। মহানাম সম্প্রদায়। শ্রীঅঙ্গন, ১৩৬০।*

(১) আসন্ন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের সংবাদ।

(২) ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষাকল্পে হরিনাম গ্রহণের উপদেশ।

প্রলয়বার্তাটি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী-স্বরূপ। উহা জগতে বর্তমান দুরবস্থারই জ্ঞাপক মনে হয়। বাণীর মর্ম এই যে, জগদ্ব্যাপী ভীষণ ধ্বংসের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ঘোর কলির অবসান। যুগসন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে মানবসভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ হইবে। চারিদিকে ভয়, কলির তাণ্ডব নৃত্য। মানবসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান-সকল পদদলিত হইবে। মানবসমাজে নরনারীর ঘোরতর দুর্দিন দেখা দিবে।

এই মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ও পরম দয়াল শ্রীশ্রীপ্রভু নির্দেশ করিয়াছেন—

"হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)"—হরিকথা

শ্রীপ্রভুর সর্বজনীন উপদেশরাশির সার চুম্বক চারিটি কথায় প্রকাশ করা চলে।

১। ব্রহ্মচর্য পালন, ২। শরণাগতি গ্রহণ, ৩। হরিনাম সংকীর্তন ও ৪। ব্রজের ভজন।

ব্রহ্মচর্যব্রত পালনেব দ্বারা বীর্যশক্তি স্থির হইলে দেহ মন সতেজ ও শক্তিমান্ হয়। ক্ষয়োন্মুখ জাতির ইহা ছাড়া প্রকৃত শক্তি সঞ্চয়ের আর কোন উপায় নাই।

ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণে মিথ্যা অহঙ্কাব দূরীভূত হয়। আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শরণাগতির পথে আত্মদানে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়।

উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে ভজনের এক সাম্যক্ষেত্রে মিলিত হইবার কীর্তন ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা হিন্দুধর্মে দৃষ্ট হয় না। জাতি সংগঠনের ইহা অমোঘ অস্ত্র।

ব্রজের রাগাত্মিকা রাজ্যের অনুগত ভজনে নন্দনন্দনের বিলাসমাধুরী আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেম-মধু আস্বাদিত হয়। সাধ্য বস্তুর ইহাই চরম। সাধন রাজ্যের ইহাই পরম পরাকাষ্ঠা।

"ওজঃ শক্তির সংরক্ষণ করতঃ মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়া হরিনামাশ্রয়ে ব্রজানুগত্যে ভজন ও ঐকান্তিক শরণাগতি লইয়া সর্বজীবে নিতাইর স্বরূপানুভবে অহিংসায় সিংহবিক্রমে বিচরণ"—ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর শিক্ষার সারমর্ম। আপনি আচরণ করিয়া ইহাই তিনি সর্বজীবের জন্য প্রচার করিয়াছেন।

ইহার নাম ভাগবতীয় সাধনা। ভাগবতীয় সাধনাই ভারতীয় ঋষি সঙ্ঘের চরম আবিষ্কার। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রেমের বাণীর মধ্যে সেই আবিষ্কার পূর্ণতমতা লাভ করিয়াছে। বহু ত্যাগের ফলে, ভারতবর্ষ আজ তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাইয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল-ছেদন, স্বাধীনতার গৌণ অঙ্গ মাত্র। বিরাট্ জাতীয় ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভূমিকায় জাতির সংগঠনই, স্বাধীনতার মুখ্য অঙ্গ। ভারতীয় জাতিকে আর্যগৌরবে সংগঠিত করিতে হইলে ভাগবতীয় সাধনাই পরম ও চরম আশ্রয়ণীয়। "প্রেমের বাণীতে" তাঁহারই নির্দেশ।

শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম নির্দেশ অনুযায়ী জাতির কল্যাণমূলক সংগঠন কার্য গৃহ-পরিবারের

প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে। ভূমি হইতে ভিত্তি গাঁথিতে হইবে। যথা—

"আত্মশুচিতে বপু রক্ষা,
বপুরক্ষায় গৃহ শুচি,
গৃহ শুচিতে গ্রাম শুচি,
গ্রাম শুচিতে দেশ শুচি,
দেশ শুচিতে জগৎ শুচি,
জগৎ শুচিতে চৌদ্দ ভুবন শুচি,
ইতি উদ্ধারণ। তথাহি মহাউদ্ধারণ।"

আমরা ভুল করিয়া আগে বড় বড় সমস্যার দিকে দৃষ্টি করি। প্রত্যেক নাগরিকের "আত্মশুচি" অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার দিক্‌টা উপেক্ষা করি। কাজেই কোন কার্যে কৃতকার্যতা আসে না। প্রত্যেকটি ইষ্টক পাকা হইলেই ইমারত সুদৃঢ় হইতে পারে।

শ্রীশ্রীপ্রভুর আদর্শে জীবন সংগঠন একমাত্র তাঁহার কৃপাশক্তির প্রেরণাতেই সম্ভব হইতে পারে। জগতের এই ভয়াবহ দুর্দিনে জগজ্জীবের উপর তাঁহার সেই অযাচিত অমোঘ কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

শ্রীঅঙ্গন — **মহানামব্রত** ❑
শ্রীশ্রীমাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬০

জয় জগদ্বন্ধু

শুভেচ্ছা বাণী

ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুত ব্রজভূষণ চক্রবর্তী মহোদয়ের করাঙ্কিত 'শ্রীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীতি' পাঠ করিলাম। মধুময় কথা, ভক্তের মধুস্রাবী লেখনী, তাই এত মধুবর্ষী।

জগতের মহা দুর্দিনে গোবিন্দের মধুময় লীলাকথা যতই আস্বাদিত হয় ততই মঙ্গল। "যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—শ্রবণমঙ্গল লীলাকথা শ্রবণগোচর হইলেই চিত্ত কৃষ্ণানুশ্রয়ী হয়। অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবিত হইলেই বিষয়-কামনা বিদূরিত হয়। মধুময় লীলাস্বাদনে জীবকুলের কুবিষয় কামনা দূর হউক। কৃষ্ণকামনা জাগ্রত হউক। মধুব্রহ্মের মধুলীলা জয়যুক্ত হউক। ভূরিদা ভক্তের সাধনা সার্থক হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

শ্রীশ্রীহরিবাসর, ১২ আষাঢ় ১৩৮০ — **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑
মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা

** 'শ্রীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীতি'। শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)। প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী গৌরী দেবী। ৩৪ কিউ, সুরেন সরকার রোড। কলিকাতা - ১০। বঙ্গাব্দ ১৩৮০।*

বিগত ১৩৩৭ সনের
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ জন্মোৎসব বিবরণী

অহিংসা, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত আদর্শ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের 'শুভ জন্মোৎসব' বিগত ১৩৩৭ সালের ২৪শে বৈশাখ সীতা নবমী তিথি হইতে ৩১শে বৈশাখ পর্যন্ত ৬৪ প্রহর ব্যাপী জগন্মঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রসঙ্গাদি দ্বারা ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ জন্মোৎসব শ্রীঅঙ্গনের সেবকবৃন্দ কর্তৃক জনসাধারণের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইত। গত ১৩৩৬ সনের শেষভাগে স্থানীয় জনসাধারণ ও শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবকগণ সমবেত হইয়া জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান পূর্বক উৎসব কমিটি গঠন করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন। উৎসবের অতি অল্পকাল পূর্বে কমিটি কার্যভার গ্রহণ করিয়া উৎসবটিকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন ;

তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

উৎসবে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। কমিটির বহু প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা উহার সহিত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্ব সম্প্রদায় সমন্বয়ে উৎসবে যোগদান পূর্বক সুশৃঙ্খলার সহিত উৎসবটি পরিচালিত করিয়াছেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, উৎসব কমিটি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। আগামী উৎসবেও সর্ব সাধারণের এইরূপ উৎসাহ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কমিটি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন না।

আলোচ্য বৎসরের উৎসব কার্য সম্পাদনে যে-কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আগামী বৎসরে উৎসব কার্যারম্ভের পূর্বে তৎসম্বন্ধে সহৃদয় মহোদয়গণ কেহ কমিটিকে অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে, কমিটি ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বিগত উৎসব কার্যে ফরিদপুর মিউনিসিপালিটি ও বোর্ড হইতে উৎসব কমিটি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য কমিটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উৎসব কার্য তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, যুবকগণ স্বেচ্ছাসেবক রূপে যথেষ্ট কার্য তৎপরতা দেখাইয়াছেন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত সমাগত মহোদয়গণের পাদুকা, যষ্ঠি, ছত্র, দ্বিচক্রযান ইত্যাদি রক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবিকাগণ মহিলা ও বালকবৃন্দের শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফরিদপুরের সুবিখ্যাত দত্ত ব্রাদার্স তাঁহাদের স্বর্ণ কুটীর দ্বিতল বাড়ী উৎসব কার্যের জন্য

** 'আঙ্গিনা'।২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩৮)। সম্পাদক : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, মহানাম সম্প্রদায়, শ্রীঅঙ্গন।*

ব্যবহার করিতে দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কমিটি কার্য বিভাগ করিয়া যাঁহাদের প্রতি যেরূপ কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা আগ্রহের সহিত কার্য নির্বাহ করিয়াছেন।

ফরিদপুরের শান্তি সমিতি উৎসবের কয়েক দিবস অবিরাম পরিশ্রম সহকারে রন্ধন ও প্রসাদ বিতরণ কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই তাঁহারা এই কঠোর কার্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়।

অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রম সহকারে সহর ও সহরতলী এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থান হইতে উৎসবের অর্থ ও তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কার্যে মহিলাগণের মধ্য হইতেও আমরা যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহিলা কর্মী কুমারী শান্তিদেবী ও শ্রীযুক্তা ইন্দুদেবী প্রমুখ মহোদয়াগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎসবের ভাব-বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব সাধারণ উৎসবটি ৫৬ প্রহর স্থানে ৬৪ প্রহর রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎসবের শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী। ভাগবতভূষণ মহোদয়ের শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ, শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কতীর্থ ও ভক্তিসাগর শ্রীযুক্ত কালিহর বসু মহোদয়গণ ভাগবত বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাণাধিক গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য, শ্রীযুক্ত সতীশ মহান্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন মহান্ত, শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় টেপাখোলা ও স্থানীয় অন্যান্য কীর্তন সম্প্রদায় ৬৪ প্রহর ব্যাপী সুললিত পদকীর্তন ও নাম গানে শ্রোতৃবৃন্দকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উৎসব কমিটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজ অনিবার্য কারণে এই উৎসবে যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। কমিটি আশা করেন, আগামী বৎসর তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও স্থান সমূহ হইতে মহোৎসবের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে—

(১) টেপাখোলাবাসী, ইঁহারা ২ দিনের মহোৎসবের ব্যয় বহন করিতেছেন।

(২) শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র তহবিলদার (হাটকৃষ্ণপুর) ১ দিন।

(৩) ফরিদপুর গোয়ালচামটবাসীগণ ১ দিন।

(৪) ফরিদপুর চক বাজার চাউল পট্টি ও অন্যান্য দোকানদারগণ ২ দিন।

(৫) কলিকাতা, রেঙ্গুন, ঢাকা, চন্দননগর, পাবনা, কাশী, এলাহাবাদ, কৃষ্ণপুর, গোয়ালন্দ, মুর্শিদাবাদ, বোয়ালমারী, পাংশা, খানখানাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে মহোৎসব বাবদ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ... ❑

‘চেতনার আরোহিণী’—পত্রপ্রবন্ধে অভিব্যক্তি

জয় জগদ্বন্ধু হরি

পরম প্রীত্যাষ্পদ
শ্রীগোবিন্দগোপাল, .

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন
২৯শে মার্চ', ১৯৯৫

আপনার ‘চেতনার আরোহিণী’ পুস্তিকাটি পাইয়াছি। আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু গাম্ভীর্যে অতলান্ত। প্রথমে “নানা দৃষ্টিতে সৃষ্টি” এই প্রবন্ধটি পড়িলাম। পাঁচটি দৃষ্টির আলোচনা করিয়াছেন বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, যোগ ও বেদান্ত।

“কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টি” নাসদীয় ঋষির এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছেন। প্রথমে বৈদিক দৃষ্টি। অগ্নি ও সোমের ব্যাখ্যানটি উপাদেয় হইয়াছে। দ্বিতীয় তান্ত্রিক দৃষ্টি। বাক্ ও অর্থের সম্পর্ক-সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া আকৃতি-প্রকৃতিতে পৌঁছাইয়াছেন। গ্রীক দার্শনিকদের form ও matter-এর মধ্যে যে একটা দুরপনেয় প্রতিরোধ আছে তাহার কোন সমাধান হয় নাই। প্রকৃতির বিরামহীন প্রয়াসকে কালিদাসের উমার তপস্যার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন কিন্তু এখানে কোন সমাধানে আসেন নাই। তন্ত্রের পরিভাষা ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

তাহার পর বৈষ্ণব দৃষ্টিতে আসিয়াছেন। আশ্রয় তত্ত্ব ও বিষয় তত্ত্বের বিচার অতি সুন্দর। আশ্রয়, বিষয়ের ধ্যানে আত্মহারা। বিষয়ের কাছে আশ্রয়ের শর্তহীন সমর্পণ। ফলে প্রেমের পূর্ণিমাতে বাসর উল্লাস। আত্মদানে বিষয় এসে আশ্রয়ের বুক জুড়িয়া বসিয়াছে; কেবল তাহাই নহে, আশ্রয়ের কাছে বিষয় ‘মুঞ্চ ময়ি মানমণিদানম্’ ভিক্ষা করিতেছেন। আর একটু আগাইয়া গেলে ‘ত্বমসি মম ভব জলধিরত্নম্, দেহি পদপল্লবম্’। বিষয় আশ্রয়ের দুয়ারে। এই সমাধান চমৎকার—‘শ্যামাৎ শবলম্।’

তাহার পর যোগ দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। যোগদৃষ্টিতে বলিয়াছেন ঐ একই প্রয়াস, কেমন করিয়া ধ্যেয় বিষয়কে চিত্তের আশ্রয়ে স্থাপন করা যায়। যোগ কেবল আশ্রয় বা আধারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। চিত্ত-দর্পণের মত নিজেকে স্বচ্ছ করিয়া বিষয়ের নিখুঁত আকৃতিটি নিজের মধ্যে ফুটাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পারিতেছেন না। কোন সময় একটু পারিলেও একটা মারাত্মক ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে। কারণ, চিত্তের যত কার্য সকলই চেষ্টার দ্বারা। সুতরাং ব্যুত্থান অনিবার্য। তাই বিস্মৃতির আশঙ্কা। সুতরাং সমাধান হয় নাই।

সমাধান না পাইয়া আবার বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে সমাধান খুঁজিয়াছেন। যেখানে চেষ্টার বিরামে হারানোর ভয় নাই। যেখানে গরজ বিষয়েরই। বিষয় আসিয়া জোর করিয়া চিত্ত দখল করিয়াছে। শ্রুতির “যমেবৈষ বৃণুতে”—এই বরণেই তত্ত্বের পূর্ণতা। আশ্রয় নিজেকে সঁপিয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া পাইয়াছেন। এ তো বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতেই আবার ফিরিলেন। সমাধান পাওয়ার কথা সেইখানেই যেইখানে বিষয় আসিয়া আশ্রয়কে সাধাসাধি করিতেছে।

এইখানে আবার পার্বতীর দৃষ্টান্ত না দিলেই ভাল হইত। তপস্যার তাপে রিক্ত উমার দুয়ারে শিব ধরা দিয়াছেন বটে কিন্তু আত্মদান তো করেন নাই। উমার সৌন্দর্য শিব পূর্ণ করিয়াছেন

** ‘চেতনার আরোহিণী’, ‘মহামহোপাধ্যায়’ ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত এই গ্রন্থটি পাঠান্তে লিখিত পত্রপ্রবন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতি*

কিন্তু "জুড়িয়া বসেন নাই। ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া বিরাজ করেন নাই।" কালিদাস কুমারসম্ভব এইখানে শেষ করিলে হয়তো ভাল করিতেন। তাহার পরবর্তী অধ্যায়গুলি প্রায় অপাঠ্য।

তাহার পর বেদান্তের দৃষ্টির কথা লিখিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তের আশ্রয়-বিষয়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তে তো আশ্রয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। আশ্রয় একটি ভ্রান্ত বস্তু। জগৎ অধ্যস্ত হইয়াছে অজ্ঞান হইতে। অজ্ঞানের আবরণ-বিক্ষেপের মধ্যে আপনি সমাধান খুঁজিয়াছেন। ইহাতে কিরূপে সমাধান হইবে বুঝি না। আবরণ-বিক্ষেপ তো কৃত্রিম; ইহা সাংখ্যের প্রকৃতির রজঃ আর তমোগুণের নামান্তর। তমোগুণই আবরণ, রজোগুণই বিক্ষেপ। না, আপনি কী মনে করেন? সাংখ্যের প্রকৃতির পরিণামের পিছনে তবু পুরুষের একটু ঈক্ষণ আছে কিন্তু আবরণ-বিক্ষেপের প্রবর্তক তো ব্রহ্ম নয়। অজ্ঞানতা ব্রহ্মে থাকুক, ব্রহ্মকে আবরণ করুক, কিন্তু আবরণ-বিক্ষেপের প্রবর্তক তো ব্রহ্ম নয়। শুধু আবরণ-বিক্ষেপে সৃষ্টি সমাধান খুঁজিলে কেমনে পাইবেন? শেষকালে অনির্বচনীয়তার কথা তুলিয়াছেন। তাহাতে সমাধান কই? সেইখানে দেবতারাও নির্বাক্, আপনিও নির্বাক্ হইয়াছেন। সমাধান মিলে নাই।

অদ্বৈত বেদান্ত বিশ্ব প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া প্রপঞ্চকে একরূপ উড়াইয়া দিয়াছেন। Sankar had tried to explain the Phenomenon but explained it away। ব্রহ্মকে খুব স্বচ্ছ নির্মল রাখিতে গেলে বিশ্বের ব্যাখ্যান বাতিল হইয়া যায়। তিনি অশব্দ, অরূপ, অব্যয়, যা কিছু হউন কাজ কোন রকমে চলিতে পারে, কিন্তু 'অশক্তি' হইলে কাজ একেবারেই অচল। শঙ্কর বিশুদ্ধ নির্বিকল্পের মর্যাদা এমন ভাবেই রক্ষা করিয়াছেন যে বিশ্ব উদ্ভবের বিকল্পতা সর্বতোভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্কর শেষ কালে আগমের 'শ্রীযন্ত্রে' ফিরিয়াছেন কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। আগম শাস্ত্রেও বাহ্য জগৎ আভাষ বা ভাণমাত্র। নির্বিকল্প ও বিকল্পে একটি সন্ধিবিন্দুর খোঁজ যদি দিতেন হয়তো কিছু সমাধান মিলিত। আপনি শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের ছাত্র। তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ের আলোচনা আপনি ভালোই জানেন, সেই দিক্ দিয়া গেলেন না কেন?

আর একটি প্রসঙ্গান্তর বিষয় একটু বলিব। গ্রীক দার্শনিকদের দোহাই দিয়া আপনি এক জায়গায় circular motion-এর মহিমা গাহিয়াছেন। circular motion হইল Divine কিন্তু সাধক যতক্ষণ অন্নময় ও প্রাণময় মধ্যে আছেন ততক্ষণই। কিন্তু সাধক যখন ঊর্দ্ধমুখী অগ্নির প্রভাবে ঊর্ধ্বমুখে চলিতে থাকে ভূলোক দ্যুলোক ছাড়াইয়া যখন মহঃ তপঃ ও সত্যে পৌঁছায় তখন তাহার গতি ঋজু সরল rectilinear অথবা প্রকৃত সত্য বলিলে circulation ও rectilinear-এর মিলনে মিলনাত্মক spiral সত্যে যখন পৌঁছায়—মধ্যমা পশ্যন্তী ছাড়াইয়া যখন পরায় পৌঁছায় তখন সে স্থির, তখন সে গতিহীন। লীলাবাদী বৈষ্ণবগণ গতিহীনেরও গতি স্বীকার করেন। গতিহীন অচল স্থানু যাঁহারা তাঁহারও গতি স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন—

"অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।"
"রাধা-প্রেমা বিভু বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।।"

এই বর্দ্ধন circular নহে spiral-ও নহে। একেবারে সহজ সরল ঋজু। নিয়ত ঊর্দ্ধমুখী।

বেদান্তের জ্ঞানের স্বরূপ প্রবন্ধটিও পড়িয়াছি। বেদান্ত বলিতে আপনি শংকর বেদান্তই ধরিয়া লইয়াছেন। রামানুজ হইতে বলদেব পর্যন্ত আর একটি যে শংকর-বিরোধী ধারা আছে তাহাকে বেমালুম উপেক্ষা করিলেন কেন?

"ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" এই শ্রুতি উদ্ধৃত্ত করিয়া আপনি মুক্তির উপায় একমাত্র জ্ঞানই এইরূপ বলিয়াছেন। সকল পণ্ডিতেবাই জানেন বিদ্ ধাতুর অনেক অর্থ। অনেকার্থের মধ্যে 'লাভ করা' একটি অর্থ। এই অর্থ ধরিলে যাহা বলিযাছেন তাহা বলা যায় না। লাভ করা অর্থ সর্বতোভাবে পাওয়া। তাহার মধ্যে ভক্তি প্রীতি অনুভূতিও অন্তর্ভুক্ত। আত্মিক জ্ঞানের আলোচনায় বলিয়াছেন, ভুল কখনও একটু একটু করিয়া ভাঙ্গে না। ভাঙিলে এক চোটেই সমগ্র ভুলটা ভাঙে। একথাও খুব যথার্থ নহে। যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হয় বাঁচিয়া আছেন না হয় বাঁচিয়া নাই। ইহার একটি সত্য, একটি ভুল। এই ভুলটি অর্ধশতাব্দীর মধ্যেও কাটিল না। এই দৃষ্টান্ত হয়তো খুব ভাল হইল না। আপনি দিবাকরের অরুণালোকে তমিস্রা-র অপসরণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আপনি অন্য নিবন্ধে দেখাইয়াছেন আগে অশ্বিনীদ্বয় আসিয়া অন্ধকার দূর করা আরম্ভ করেন। তাহার পর উষা আসে, সবিতা আসে, তাহার পর ভগ, তাহার পর পূষা, তাহার পর সূর্য। ইহাতেও এক চোটের দৃষ্টান্ত হইল না, ক্রমিকতাই থাকিল।

শ্রুতি জ্ঞানলাভের প্রসঙ্গে আমাদিগকে জাগাইয়া বলিতেছেন, শ্রেষ্ঠ বরেণ্যদের কাছে যাও। বরেণ্যদের কাছে যাওয়া একটি কাজ। তাঁহাদের উপদেশ শুনিলেই অনেক সময় ভুল ভাঙ্গে না। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দিই, ইহা আপনার মনের মত নাও হইতে পারে। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একজন উন্নত সত্তা অনুসন্ধিৎসু সাধক ছিলেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথের পিতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ বরেণ্য মনীষী। তাঁহাব কাছে যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ সত্য সন্ধান পাইয়াছেন মনে করিয়া উপবীত ত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘ দিন ব্রাহ্মধর্মে যজন-যাজন প্রচারণে নিমগ্ন ছিলেন। পরে আবার তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া উপবীত ধারণ করিয়া অন্য পথের দিকে ধাবমান হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বরেণ্যের কাছে যাইয়াও সত্যের সন্ধান পাইলেন না।

'যমেবৈষ বৃণুতে' মন্ত্রের ভক্তিবাদীরা যে ব্যাখ্যা করেন তাহা জীব-ব্রহ্ম অভেদবাদী শংকর বলিতে পারেন না। ইহা আপনিও বলিয়াছেন। 'ধাতুপ্রসাদাৎ' বাক্যের অর্থেও শংকর বিধাতার প্রসাদ বলিতে পারেন না, ইহাও বলিয়াছেন কিন্তু উপাদানের স্বচ্ছতা বা নির্মলতা বিধান কি কর্মসাধ্য নহে? 'যমেবৈষ' মন্ত্রের ভক্তিবাদীরা অর্থ করেন সাধন কর্ম করিতে করিতে যখন ভক্ত দেখে কর্মের দ্বারা পাইবার উপায় নাই তখন তাহার মধ্যে একটি ভজনোত্থ ক্লান্তি আসে, হায় হায়! আমার চেষ্টায় কিছু হইল না—এই জাতীয় ক্লান্তি জাগিলেই কৃপা আসে। আপনি বলিয়াছেন ভক্তিবাদী ও শংকর উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ছাড়া আর কোন বৈষম্য নাই। আমার মনে হয় তারতম্য আছে। শংকরের অখণ্ড ও ভক্তদের অখণ্ড এক কথা নয়। ভাগবতের অদ্বয় জ্ঞান ও শংকরের অদ্বৈত এক কথা নয়। শংকর ব্রহ্মে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ মানেন নাই। ভক্তরাও তাহা মানেন নাই। কিন্তু ভাগবতীয় ভক্তরা সকলেই ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ মানিয়াছেন। একটি বৃক্ষের মূল কাণ্ড শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল তাহা বৃক্ষের স্বগত ভেদ। এগুলি লইয়াই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। এগুলি বাদ দিয়া অর্থাৎ স্বগত ভেদশূন্য একটি বস্তু, তাহা কিম্ভূত বস্তু, ভক্তরা

বুঝিতে চাহে না। শংকর ব্রহ্মের স্বগত ভেদ মানেন। সুতরাং ভাগবতীয় ভক্ত ও শংকরের স্বরূপের অখণ্ডতা সম্বন্ধে ঐকমত্য পাওয়া গেল না। তাহার পর আপনি বলিয়াছেন তাহার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। "কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নহে" এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু প্রেমের উদয় হইতে চিত্ত শুদ্ধতা। ভক্তিবাদীরা আদৌ শ্রদ্ধা, অতঃপর সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও ভাব এই সাতটি কক্ষার পরে ততঃ 'প্রেমাভ্যুদয়ম্' বলিয়াছেন। তিনি যে সাধ্য নহেন বলিয়াছেন—ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন প্রেম পাইবে তখন মনে হইবে উহা আমার মধ্যেই ছিল। তাহার এই প্রেম পাইবার পরেও চরমে পৌঁছাইতে আরও কক্ষা আছে। স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাব—এইগুলি স্বতঃপ্রকাশ নহে, ক্রম-প্রকাশ। প্রেম, কর্ম সংস্পর্শশূন্য ভক্তরা ইহা কখনও মনে করেন না। শ্রোতব্যের পর মন্তব্যের কথা শ্রুতিই বলিয়াছেন। এই মননও একটি কর্ম নয় কি? জ্ঞান-অজ্ঞান দিবা-রাত্রির মত পরস্পর বিরোধী একথা ঠিক কিনা বিচার্য। বেদ দিবা ও রাত্রিকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় দেখিয়াছেন। অন্ধকার বিলয়ের মধ্যে ক্রমিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তবু উপনিষদের জ্যোতির প্রকাশ ক্রমিক নয় বলিয়াছেন। ক্রমিকতার মধ্যে অতৃপ্তি আছে বলিয়াছেন। অতৃপ্তির মূলে যে সর্বদাই অজ্ঞান ভক্তিবাদীগণ তাহা মানেন না। পূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরেও শ্রীরাধার চিত্তে একটি অতৃপ্তি আছে। যেন পাওয়া হইল না, সেবা হইল না, দেখা হইল না। এই অতৃপ্তি অজ্ঞানতা নহে, পরিপূর্ণতার মধ্যেই ইহার জন্ম। "তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে কোটি গুণ।" বৈষ্ণবগণের সে তৃষ্ণা অজ্ঞানতা নহে। পূর্ণ প্রাপ্তির পরেও এই অপ্রাপ্তির বেদনা তীব্র হইতে পারে। ইহা রসজ্ঞদের অনুভববেদ্য।

বাচস্পতি প্রভৃতি শংকর অনুগতেরাও শঙ্করের জ্ঞানকে ঠিক বোঝেন নাই একথা বলিয়াছেন। শংকর নিজেও নিজেকে বুঝিয়াছেন কিনা ইহা সংশয় হয়। "তস্মান্ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্"—এই কথাটি বিচার্য। শংকরের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে না পরে? ভাষ্যগুলির রচনা, ভারতের চারিটি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনা, প্রত্যেক মঠে শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এইগুলি সংসারিত্ব নহে? ভক্তিবাদীদের একটি 'কৃষ্ণের সংসার' কথা আছে। যদি সেই অর্থে আসেন তাহা হইলে আপত্তির কিছু নাই। অন্য সম্বন্ধে যাহাই হউক অদ্বৈত-সিদ্ধিতে মধুসূদন শঙ্করের কর্মজ্ঞান তত্ত্বকে সর্বতোভাবেই বুঝিয়াছেন ইহা আমরা মনে করি। তিনি আবার "কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বম্ অহং ন জানে" এই কথা লিখিলেন কেন?

আমার মনে হয় শংকর যে পরম স্বরূপে স্বগত ভেদ স্বীকার করেন নাই ইহাতে তাহার পরম বস্তুকে নিঃশক্তিক বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ভাবনায় তিনি একটা Pure Abstract ভূমিতে কর্মস্পর্শ শূন্য ব্রহ্মকে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। শংকরের পরমতত্ত্ব ভূমি অচল, স্থানু, একটি static সত্তা। বৈষ্ণবদের পরমতত্ত্ব static নহে, নিত্য dynamic। তাহা হইলে পূর্ণতম পুরুষোত্তমের মধ্যেও কর্ম ক্রিয়ার বিদ্যমানতা আছে। এই ক্রিয়াকে তাহারা অপ্রাকৃত লীলা বলেন।

এই সকল বিচারের বেলায় একটা কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, মূল সংহিতায় কোথাও জ্ঞান ও কর্মের ভেদ সৃষ্টি দেখা যায় না। ঋষিরা বোধি ভূমিকায় যে সত্য দর্শন করিয়াছেন

সেইখানে জ্ঞান-কর্ম সর্বতোভাবেই এক। পববর্তীকালে যখন বিচারের ভূমিতে আসিয়াছেন তখন জ্ঞান ও কর্মের ভেদ দৃষ্টি কবিয়াছে বিচার। একটি শুদ্ধ জ্ঞান-ভূমিকায় ব্রহ্মতত্ত্বের দর্শন যুক্তিবাদিপ্রবর শঙ্করের পক্ষেই সম্ভব। বিশুদ্ধ বোধিতে প্রাপ্ত যে পূর্ণ অনুভূতি সেইস্থানে সর্বদাই জ্ঞান কর্ম একাকাব। গীতা বোধ হয় এই জ্ঞানীকে 'এক ভক্তি' বলিয়াছেন।

তিনি Static না Dynamic আগে স্থাপন করিতে হইবে। তিনি static হইলেই একটা উত্তুঙ্গ ভূমিতে একটি স্বয়ং প্রকাশ কর্মস্পর্শহীন জ্ঞানের সিংহাসন থাকিতে পারে। আর যদি তিনি অনন্তকালই শক্তিমান Dynamic Personality হন তাহা হইলে উত্তুঙ্গতম নিঃসঙ্গভূমি মানিবার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ থাকেন।

আপনাব "রাস বজনীব কূলে" পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি শুধু দার্শনিকই নহেন মরমীয়াও বটে। আপনার বাস-বজনীর প্রবন্ধ পুনঃপুনঃ পড়িলে উল্লাস বৃদ্ধি হয়। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে সম্বোধন কবিযা জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন—

"সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এ প্রেম ছবি।
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান,
বিবহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান।
বাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?"

মনে হয় ইহা আপনার—"আজ যিনি স্বপনচারিণী" তাহার নির্মল গভীর সান্নিধ্যের ফল? ভুল বলিলাম?

আপনার 'রাস' প্রবন্ধ শৃণ্বস্তুতে পূর্বেও পড়িয়াছি, খুব ভাল লাগিয়াছে। যদিও একটি জায়গায় কিছু বলিবার ছিল। আমাব লিখিত রাস আপনায় পাঠাইলাম—অবসর হইলে চক্ষু বুলাইবেন। আপনার রাসেব কূলের ভাষা ও ভাব কণ্ঠস্থ ও অন্তরস্থ করিবার সাধ হয়।

আপনার শেষ প্রবন্ধ ঋক্‌বেদেব দেবতা নিবন্ধে শ্রীঅনির্বাণকে জীবন্ত দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় আপনি অনির্বাণ হইয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, আপনার বইটির ছাপা ও 'মেক-আপ' সুন্দর। কিন্তু দপ্তরির কাজ দুঃখদায়ক। তাহাকে ডাকাইয়া সমঝাইয়া দিবেন। ৫৮ পৃষ্ঠার পরে ৬৩/৬৪ পৃষ্ঠা। তাহার পরে ৬১/৬২। এইরূপ হইল কেন? অন্ততঃ আমি যে বইখানি পাইয়াছি তাহার এই অবস্থা। এই মত কয়খানি হইয়াছে কে জানে।

ইহা আপনার গ্রন্থের opinion নহে। হঠাৎ যা মনে হইল লিখিয়া ফেলিলাম। কোন দোষ লইবেন না। আপনার গ্রন্থটির opinion কোন্ কোন্ ব্যক্তি দিল জানিতে ইচ্ছা হয়। কারণ এই গ্রন্থের সমঝদার পাঠক পশ্চিমবঙ্গে কয়জন আছেন জানিতে কৌতূহল হয়। জয় জগদ্বন্ধু।

ভবদীয়
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

P. S : জ্ঞানী শঙ্কর সর্বতোভাবে যোগ্য হইয়াও আর্যদের অপরোক্ষানুভূতিতে কাব্যধর্মী

সংহিতার উপর কোন আলোকপাত কোথাও করেন নাই। কোথাও কোন কোটেশন দেন নাই। ইহার কারণ কী? মনে হয়, বেদমন্ত্র যজ্ঞে প্রয়োগ হয়। যজ্ঞ বিশেষ কর্ম এই জন্য। শঙ্করের কর্মের উপর এক প্রবল বিতৃষ্ণা আছে। অথবা শঙ্কর উপনিষদেই ডুবিয়া গিয়াছিলেন, বেদমন্ত্র আস্বাদনের সময় পান নাই। উপনিষৎ-শিরোমণি ঈশ উপনিষদ্—"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা" মন্ত্র একশ বছর কর্ম করিয়াই কাটাইতে বলিয়াছেন। একমাত্র ঈশ শ্রুতি উপনিষদ্ ও বেদও। এত বড় কর্মী হইয়াও শঙ্কর কর্ম সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ। তাই বলিয়াছি শঙ্কর নিজেকে নিজেই চেনেন নাই। বিরাট কর্মী স্বামী বিবেকানন্দ কট্টর শঙ্করপন্থী। শেষকালে দিশাহারা স্বামিজী Practical Vedanta নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শঙ্কর বেদান্ত কিছুমাত্র Practical নহে, সাংঘাতিকভাবে Abstract, তার আশ্রয়ে কর্ম অচল। ❑

'জয় জগদ্বন্ধু হরি'

'সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ'—মুখবন্ধ

শ্রীগুরুকৃপাধনে ধনী শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামিজী-লিখিত 'সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ' গ্রন্থখানি হাতে আসিল। সঙ্গে আসিল একটি নির্দেশ—ভূমিকা লিখিতে হইবে। হাতে সাধুসঙ্গ গ্রন্থ, সাধুর নির্দেশ লঙঘন করি কী প্রকারে?

গ্রন্থটি খুব বড় নয়। এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিলাম। মনে হইল গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গে ধন্য হইলাম। সাধুগ্রন্থও সাধু। সাধুসঙ্গে অনেকদিন বাস করিলে হয়তো বা তাঁহার কোন দোষত্রুটি চক্ষে পড়িয়া যাইতে পারে, দোষ না থাকিলে অসাধুজনের দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে।

"মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণ হি বিগুণ করি মানে।"

সজ্জনের দোষদর্শনে অপরাধের সৃষ্টি হয়। সাধু-গ্রন্থসঙ্গে এই বিপদের আশঙ্কা নাই।

গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক মহাত্মার সঙ্গলাভ হইল ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তুলসীদাসজী, কবীর মহারাজ, আচার্য শঙ্কর — ইঁহাদের সঙ্গ হইল। শঙ্করের মণিরত্নমালার মধুর প্রশ্নোত্তরমালা আস্বাদন করিলাম, কি সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী! পাঠ করিলে মনে লালসা জাগে চিরদিনের মত অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গেই জীবন কাটাই। সুতরাং গ্রন্থখানি লিখিবার যে উদ্দেশ্য তাহা সার্থক।

শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে উদ্ধবকে বলিতেছেন সৎসঙ্গের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে—

শুন উদ্ধব, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রজগোপীদের কথা বলি ঃ

* *'সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ'। স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, ডায়মণ্ডহারবার।*

"রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়।।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ।।

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।।

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ।।" ভাঃ ১১/১২/১০-১৩

অক্রূর যখন দাদা বলাইকে এবং আমাকে মথুরায় লইয়া আসিল তখন গোপীদের অবস্থা কীরূপ হইয়াছিল শোন।

গোপীরা আমা অপেক্ষা জগতে আর কোন সুখের বস্তু আছে বলিয়া জানে না। আমার বিরহে তাদের দুঃখ তীব্রতম। তারা ময্যনুরক্তচিত্তা। তাদের সঙ্গে যখন আমার রাসরজনীতে মিলন হইল, তখন এক রজনীর সঙ্গে সহস্র রজনী একত্র হইয়াছিল তবু গোপীদের মনে হইল অতগুলি রজনী যেন এক ক্ষণার্দ্ধ সময়ের মত চলিয়া গেল। তাঁরা যখন আমাকে হারাইল তখন একটি রাত্র এক কল্পকালের মত তাদের মনে হইত।

গভীর প্রেমে গোপীগণ আমার প্রতি সমাহিতচিত্তা হইয়াছিল। নদীর জল যেরূপ সমুদ্রে গিয়া প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ প্রেমাতিশয্যে তাহারা গিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সমাধি অবস্থায় যোগিগণ যেরূপ নাম ও রূপ হারাইয়া ফেলে, গোপীগণও সেইরূপ নিজ নিজ দেহজ্ঞান হারাইয়াছিল, ইহকাল-পরকাল ভাবনা হারাইয়াছিল।

গোপীগণের অন্তরভরা ছিল আমাকে পাইবাব তীব্র সংকল্প কিন্তু তাহারা আমার স্বরূপ জানিত না। তাহারা আমাকে উপপতিরূপে ভালবাসিত। তথাপি শত সহস্র অবলা পরিণামে পরব্রহ্মস্বরূপ যে আমি, আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল হইয়াছিল কিসের ফলে তাহা অনেকেই জানে না। সকলই সৎসঙ্গের ফলে—'সঙ্গাৎ'। তাঁরা ছিল 'সৎসঙ্গেতর-বলরহিতাঃ।' সৎসঙ্গ ছাড়া তাদের আর কোন বলই ছিল না।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে রাগমার্গের ভজনের পরমতম মূর্তি-স্বরূপিণী যাহারা, তাহাদেরও ঐ গভীর প্রেমযুক্ততার হেতু সাধুসঙ্গ।

গোপীগণের মধ্যে দুইভাগ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। নিত্যসিদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণানুরাগের ঘনীভূত বিগ্রহ। যাঁহারা সাধনসিদ্ধা তাঁহারা সাধন করিয়া ঐ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সাধন কী? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ অনুরাগ যোগ-তপস্যা-ধ্যান-পূজায় কিছুতেই লাভ হয় না। ঐ বস্তু ছোঁয়াচে রোগের মত। যাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগ জাগিয়াছে তাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্য ছাড়া ঐ বস্তু লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সঙ্গ নিকট-বর্তিতা দ্বারাও হয়, ধ্যান-ভাবনা দ্বারা মানসসান্নিধ্যলাভেও হয়।

সুতরাং রাগমার্গের সাধকের প্রথমাংশে সাধুসঙ্গই প্রধান। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ" সাধুসঙ্গের ফলেই হয় ভজনে প্রবৃত্তি। ভজন করিতে করিতে গোপীদেহ লাভ হয় — ব্রজে জন্ম হয়। নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গসান্নিধ্য অত্যাবশ্যক। তাদের সঙ্গবশতঃই কৃষ্ণানুরাগ গাঢ় হয়। তখনই বংশীর ডাক শুনিয়া রাসস্থলীতে অভিসার করিবার যোগ্য হয়। সুতরাং রাগমার্গের সাধনার এই নিগূঢ়তম অবস্থাতেও সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গোপীভাবরূপ পরাগতি লাভও যে সাধুসঙ্গের ফল ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি।

এই দর্শনের ফলে জীবের হৃদয় হইতে সর্বপ্রকার মালিন্য দূর হয়। সাধুজনের অঙ্গসঙ্গেও দৈহিক মানসিক আত্মিক সর্বপ্রকার মলিনতা চিরতরে বিদূরিত হয়।

যমলার্জুন হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত নলকুবের মণিগ্রীব দুই ভাই স্তব করিয়া কহিয়াছেন—

"দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্।"

—আমাদের নয়নের সার্থকতা হউক ভগবত্তনুস্বরূপ সজ্জনের দর্শনে। সাধুগণের দেহ ভাগবতীতনু। যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁহার সান্নিধ্য পাইলেই জীব কৃতার্থ হয়।

এইসকল গ্রন্থে গ্রন্থকার অতি সুন্দর করিয়াই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে সকলে ধন্য হউন। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

সজ্জন-সঙ্গার্থী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

কবিসন্ন্যাসী শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত স্মরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই ধরণীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন পাঁচশত বছর পূর্বে। এই লীলানুস্মরণে দেশে বিদেশে সর্বত্র উৎসবায়োজন। উৎসব সার্থক হইবে না যদি ইহার ফলে আমাদের জীবন গৌরময় না হইয়া উঠে। গৌরসুন্দরের মানবপ্রেম গৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেম ইহার বিন্দু স্পর্শ যদি আমাদের জীবনে অনুভূত হয় তবেই উৎসব হবে সাফল্যমণ্ডিত।

দেবীনিবাসে প্রবীণ মহামিলন কেন্দ্রে ভক্তবর কালীকিঙ্কর মহোদয়ের স্মরণ হইতে যাইতেছে। তাহা সুন্দর বিকাশে প্রকাশে সকলেরে গৌর-মাধুর্য স্নাত করুক। সকলের মনঃপ্রাণ সভাস্থল জয় গৌর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ও মুখরিত হউক। ❑

জ্ঞানভাস্কর অধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যর প্রতি শোকাঞ্জলি

পত্রে বিভূতিবাবুর দারুণ অসুস্থতার সংবাদ পাইয়াই রাণাকে পত্র দিয়া ঢাকা হইয়া চট্টগ্রাম রওনা করিয়া দিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য—বিভূতিবাবুকে কলিকাতা আনিয়া কোন নার্সিং হোমে রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

* *'শোকাঞ্জলি'। ১৯৮৬, চট্টগ্রাম।*

রাণা ঢাকা পৌঁছিয়াই সংবাদ পায়—তিনি চলিয়া গিয়াছেন। পরে এক লোক সংবাদ দেয়, চট্টগ্রাম হইতেও সংবাদ পাই।

ভ্রাতৃশোকের মত নিদারুণ আঘাত লাগে। চট্টগ্রাম—সমগ্র বাংলাদেশ একটি মহারত্ন হারাইল। একজন সাধক, পণ্ডিত, বক্তা, পরম সুহৃদ্ হারাইলাম। কী যে কষ্ট হইল তাহা লিখিতে পারি না।

বিভূতিবাবু চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের সম্পদ্।

শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহার পরম মহান্ আত্মাকে পরম শান্তিতে রাখুন। জয় জগদ্বন্ধু।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

বাণী

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে মা কালীর নতুন মন্দির নির্মিত হইয়া 'মা' অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। এতদুপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

মা কালী সর্বত্র বিরাজিত আছেন, তবুও ভক্ত কোন বিশেষ স্থানে তাঁর সান্নিধ্য ও সেখানে তাঁর সেবা-পূজা করতে চায়। তাই মন্দিরের প্রয়োজন, যেখানে সকলে মিলিয়া তাঁর সেবা-পূজা'র জন্যে সমবেত হইতে পারিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যেখানে ভক্তেরা আমার নাম গুণগান করে, আমি সেখানেই অবস্থান করি।

মা কালী নবনির্মিত মন্দিরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলের কল্যাণ বিধান করুন, এই প্রার্থনা করি। স্মরণিকা প্রকাশের শুভ উদ্যোগের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ❑

** 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীবাড়ী স্মরণিকা', বাংলাদেশ। ১৯৯৮*

'বন্ধুবার্তা'—বন্ধুলীলার দিগ্‌দর্শন

রসঘন বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাঁহার পরম মাধুর্যময় লীলার প্রথম ভাগে কতিপয় বৎসর পাবনা সহরে অবস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় বুড়োশিব হারান ক্ষেপার সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। সে এক নিরুপম মিলন। বাহ্যতঃ পরম পবিত্রতার সঙ্গে চরম অনাচারের মিলন। যে প্রভু কাহারও বাতাস গায়ে লাগান না, স্পর্শ করেন না, তিনিই শুইয়া আছেন বুড়োশিবের মলমূত্রলিপ্ত দুর্গন্ধময় শতছিন্ন অতি মলিন কাঁথার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বিকার অবস্থায়, পরমানন্দে তাঁহার কণ্ঠটি বাহু বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া সুদীর্ঘকাল একইভাবে আছেন। মুখে মুখ ঠেকাইয়া অস্ফুট ভাষায় কত কি মধুর আলাপ চলিতেছে।

ক্ষ্যাপা বুড়ো শিবের অন্তরে এমন একটি মাধুর্যপূর্ণ হরিপ্রেম রস ছিল, তাঁহার মুখে এমন

** 'বন্ধুবার্তা'। দাস—মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। ২য় সং ১৩৬১। মহানাম সম্প্রদায়। শ্রীঅঙ্গন। (১ম সংস্করণ, ১৩৩২)*

একটি পরমামৃতময় হরিনাম সুধা ছিল, যাহার সুনিবিড় আস্বাদনানুভূতির কাছে বাহিরের অনাচার বা আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সেখানে উপেক্ষিত।

হরিভক্তের হৃদয়-কমল হইতে হরিরস মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীহরিপুরুষের যে কি প্রবল আকর্ষণ ছিল,—বুড়ো শিবের সঙ্গে মিলনে তাহার পরম রূপটি প্রকটিত। পাবনায় থাকাকালীন দেখা গিয়াছে, হরিসংকীর্তনের ধ্বনি শ্রবণগত হইলেই হরিনামের প্রভু তথায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ভাবে উধাও হইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন, কোন বাধাই মানেন নাই। কীর্তনে নামমধ্যে একেবারেই ডুবিয়া যাইতেন। আস্বাদনের চমৎকারিতায় 'রাধা' নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; কেবল রসরাজের রসের অঙ্গ মহাভাবাবেশে হেলিত দুলিত।

কিন্তু, এত ডুবিয়াও আস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে, এরূপ কখনও মনে করিতেন না। দেখিলে সব সময়ই বুঝা যাইত যে, একটি প্রবল তৃষ্ণা, হরিনামের জন্য একটি অনির্বচনীয় অতৃপ্তির মর্মান্তিক বেদনা নিয়ত লাগিয়াই আছে। ইহাই স্বয়ং নামীর নামবিরহ। এই নামাস্বাদন ও নাম-বিরহ নিরন্তরই দেখা যাইত। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে কোটিগুণ।"

পাবনায় বালকদল শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালনে ও হরিকীর্তনে মাতিয়া উঠিলে তাহাদের অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া প্রভুর শ্রীদেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। সে আঘাতে প্রভু হতচেতন হইয়া পড়েন। ইহাকে লীলায় মহাপ্রলয়ের অভিব্যক্তি বলা চলে। আবার এত অত্যাচারের পরও সেই পাবনায় পুনঃপুনঃ গমন করেন, অকুতোভয় বিচরণ করেন। বহু জন কর্তৃক বহু ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও অত্যাচারকারীদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তাহাদের মহা অপরাধকেও গ্রহণ না করিয়া অন্তরের সহিত করিয়াছেন। মহাউদ্ধারণের করুণা প্রস্রবণের এক কল্যাণময় অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলায় প্রধানতঃ মহাভাবের উক্ত চারিটি বিলাস দৃষ্ট হয়। হরিনাম-আস্বাদন, হরিনাম-বিরহ, মহাপ্রলয়, মহাউদ্ধারণ। এই বিলাস চতুষ্টয় আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাত হইলেও ইহারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত বা অখণ্ড। ইহাদের মূলে আছে নামীর সঙ্গে নামের ক্রীড়া-বৈচিত্র্য।

শ্রীহরিপুরুষের হরিনাম-আস্বাদন। শ্রীহরি স্বয়ং যখন শ্রীহরিনাম করেন, হরিকথা বলেন, শোনেন, লিখেন, তখন যে অনির্বচনীয় মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হয়, নিখিল বিশ্বে তাহা নিরুপম। এই নিরুপম আস্বাদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে লাগিয়া থাকে একটি নির্মমভাবের প্রাণঘাতী অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিরই পরম বিকাশ হরিনাম-বিরহে।

এই বিরহেরই প্রকাশ রাধাশ্যাম-মিলিত তনু শ্রীগৌরের, "মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে কর মতি, দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু" এই বিলাপে। এই বিরহেরই অভিব্যক্তি নামঘনবিগ্রহ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের "হায়! হায়! কেউ হরিনাম করে না"!—এই বুকফাটা আর্তিতে।

বিরহের দশম দশায় মৃত্যু। তদপেক্ষাও তীব্রতম অবস্থায় মহাবিরহে মহামৃত্যু। এই "মহামৃত্যু মহাপ্রলয়ন"। মহাপ্রলয়ের "মহতী বিনষ্টির" প্রতিপোষকই মহাসৃষ্টি। "যদি সৃষ্টি রাখ ভাই, হরিনাম প্রচার কর।" কোটিকণ্ঠে হরিনামই মহাউদ্ধারণ। নামবিরহ ও নামাস্বাদনের ব্যাপক অভিব্যক্তিই মহাপ্রলয়ন ও মহাউদ্ধারণ। অতএব উক্ত চারি বিলাসই অখণ্ড। এই অখণ্ডতার প্রকাশ "হরিনাম—প্রভু জগদ্বন্ধু" এই পরিচয়ে। এই অখণ্ডতার পূর্ণতম বিলাস পঞ্চমবর্ষীয়

শিশুভাবে, এই শিশুভাবের পূর্ণতন্ময়তায়—আত্মনিমজ্জনে।

মুণ্ডিত মস্তক, প্রশান্ত বদন, লক্ষ্যহীন ঢলঢল দৃষ্টি, মৃদু মধুর হাসি, উন্মুক্ত সুবলিত দেহ, কাঁচা সোনার বর্ণ, সুদীর্ঘ সুকোমল আরক্তিম করচরণ, ফুলের পাঁপড়ির মত সুনির্মল নখরাজি, আধ আধ ভাষা, অনির্বচনীয় ভাব-ভঙ্গী, কখনও ভক্তের কাঁধে দোলায়, কখনও টানা গাড়িতে, কখনও পদ্মানদীর মাঝে নৌকায় উপবিষ্ট—চতুর্দিকে মধুকরের মত ভক্তকুল, তাঁহাদের কণ্ঠে মহানাম, নয়নে সে রূপমাধুর্যের আস্বাদন। ইহাই হরিনামের মূর্ত বিগ্রহ, "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাষে"—বাণীর প্রকট প্রতিমা। মিলন-বিরহ, মহাপ্রলয়ন-মহাউদ্ধারণ-সম্মিলিত মূর্ত মাধুর্য 'সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী' মোহন মাদনের নিবিড়-ঘন অভিব্যক্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের 'বার্তা' আস্বাদন করুন। জয় জগদ্বন্ধু।

শ্রীঅঙ্গন, দাস—**মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬১

'প্রভু জগদ্বন্ধুবাণী'—ভূমিকা

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দবের উপদেশরাশি পরম কল্যাণপ্রদ। পাবনা জেলার হরি রায়কে শ্রীশ্রীপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ণাঙ্গ। একজন লোকেব জীবনে যাহা জানা ও করা দরকার, সবই আছে তাহাতে। উপদেশগুলি কবিতায় বলিয়াছেন কৃষ্ণকিঙ্কর দাদা। শ্রীশ্রীপ্রভুসুন্দর, ভক্ত সুন্দর, তাঁর হাতের গ্রন্থণও সুন্দব। চির-সুন্দরের এই মধুর উপদেশও যুগের দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সুন্দর করুক। জয় জগদ্বন্ধু।

জঙ্গিপুর, **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

২৭শে বৈশাখ ১৩৭১ সাল।

* *'প্রভু জগদ্বন্ধুবাণী' (পকেট সাইজ)। শ্রীকৃষ্ণকিংকব সাহা। জঙ্গীপুব।*

নববর্ষের বাণী

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বহুমতের সংঘট্টে মানবসভ্যতা আজ বিষাক্ত বিপন্ন মুমুর্ষু। প্রতিকাবের একটি মাত্র পথ — মনুষ্যত্বের মূলভূমিতে স্থিত হওয়া। মানবতাকে দৃঢ়ভাবে ধরা।

সহস্র পথ মতের মূলে আছে একটি সাধারণ বিশ্বজনীন ভিত্তি — মনুষ্যত্ব। সবাইকে সেই সুদৃঢ় ভূমিকায় দাঁড়াইতে হইবে।

"আমি সকলের, সকলে আমার। তোমরা মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের নরনারীকে আপন্ করিয়া লও।" জগদ্বন্ধুসুন্দরের এই মহাবাণী মহা সত্য।

নববর্ষে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ আবির্ভাব স্মরণে বিশ্ববিবেকের দুয়ারে এই আবেদন।

আমরা মানুষ। মানুষ মাত্র। আমাদের তাই এই ভাবনার ভিত্তিতে শান্তিময়ের দান — শান্তি [illegible] আসুক আমাদের জীবনে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'দশামাধুরী ও চক্ষুদান'—নিবেদন

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কৃপাপ্রেরণায় বন্ধুগোবিন্দ দাসজী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার আজ নিত্যধামে শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবায় আছেন। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু রসের খনি। তাই এতদিন পরে আবার প্রকাশ করিবার ভাগ্য পাইলাম। শ্রীশ্রীপ্রভুর ত্রয়োদশ দশায় যাঁহারা বিশ্বাসী, এই গ্রন্থ তাঁহাদের কণ্ঠহারতুল্য। জয় জগদ্বন্ধু।

দীন—

ফরিদপুর, শ্রীঅঙ্গন **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** ❑

রথযাত্রা, ৫ই আষাঢ়, সন ১৩৭৩

* *'দশামাধুরী ও চক্ষুদান।' শ্রীবঁন্ধুগোবিন্দ দাস। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। মহানাম সম্প্রদায়। শ্রীঅঙ্গন। ২য় সং ১৩৭৩।*

'মর্ত্যেষু অমৃত'—ভূমিকা

বৈদিক বাঙ্ময়ে আলোছায়াভরা সান্ধ্যসরণিতে দুই পার্শ্বে দুইটি আলোকস্তম্ভ দিলেন শ্রীমান্ অমলেশ ভট্টাচার্য অল্পদিনের ব্যবধানে। বৎসর পূর্বে পাইয়াছিলাম বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, আজ পাইলাম বেদের মন্ত্র ও সাধনা। একটি যেন যাস্কের নিরুক্ত আর একটি শৌণকের বৃহদ্দেবতা।

এই গ্রন্থে আছে সাত জন ঋষির কথা। পরাশর গৌতম কুৎস দীর্ঘতমা গৃৎসমদ বিশ্বামিত্র ও বামদেব। ইঁহারা প্রত্যেকেই অপৌরুষেয় মন্ত্রের সুনিপুণ সত্যদ্রষ্টা, আর আছে কয়টি উজ্জ্বলতম সূক্ত অবলম্বনে নূতন আলোকসম্পাত-জ্ঞানসূক্ত, ব্রহ্মণস্পতি সূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত ও পুরুষ সূক্ত। প্রত্যেকটিই সুগভীর তত্ত্বগর্ভ ক্রমোর্ধ্বগামী পথের দিশারী।

দুর্দশার প্রান্ত প্রাপ্ত এ যুগের বাঙালী জাতি যে এই সব গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এমন আশা আর পোষণ করি না। তবে আমরা মুষ্টিমেয় মানব যারা নিত্য দিবা উষাকালে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' বলিয়া শুদ্ধ হইয়া শ্রীবেদগ্রন্থে একবার মাথা ছোঁয়াই ও প্রবেশ করিবার অক্ষমতায় বিষাদিত হই, তাহারা এই 'মর্ত্যেষু অমৃত' বার্তা গ্রন্থটি শিরে তুলিয়া লইবে। 'মধেবা ন মক্ষার' মত বিমুগ্ধ হইয়া দুই হাত তুলিয়া বলিবে — আরো আলো চাই। তাঁহারা তারস্বরে উচ্চারিবে ঋষি কশ্যপের ভাষায়—

"যত্রানন্দশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।

কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।" (ঋ. ৯/১১৩/১১)

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

---

* *'মর্ত্যেষু অমৃত'। শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, ১৯৯৫। আর্যভারতী, সি ৫/৮, করুণাময়ী আবাসন। সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১।*

'উদ্ধারণ'—ভূমিকা

পতিতের উন্নয়নের নাম উদ্ধারণ। ভোগগর্তে পতিত জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমের তটভূমিতে তুলিয়া লওয়াই উদ্ধারণ। সর্বজীবে এই মহাভাগ্য দান মহাউদ্ধারণ। ইহা প্রভু বন্ধু সুন্দরের নিজস্ব পরিভাষা।

প্রেমময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর হৃদয়খানি জীবের প্রতি করুণায় ভরা। সর্বজীবকে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণপদে সমর্পণ করাই তাঁহার সাধনা। উদ্ধারণ কার্য সেই মহা-করুণারই মহাপ্রকাশ রূপ। তাই শ্রীহরিকথা গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন, "রাই তুমি উদ্ধারণ"।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির নাম রাখিয়াছেন 'উদ্ধারণ'। গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'উদ্ধারণ ও দশমী' শিরোনামায় যে সঙ্কেত রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্মোদ্‌ঘাটন করিবার সামর্থ্য মাদৃশ জীবাধমকে দেন নাই। কোনদিন দিবেন কিনা, দাতাই জানেন।

এই ছোট গ্রন্থখানি প্রভু তারকনাথ নামক একজন চিহ্নিত ভক্তকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তারকনাথের কথা শেষভাগে কিঞ্চিৎ লিখিলাম। গ্রন্থখানির মধ্যেও তারকনাথকে কিন্তু স্বয়ং প্রভুই লিখিয়াছেন—"তারক, তোমার সর্ব শরীর হাস্য করে।" ভক্তের প্রতি ভগবানের কী মধুর কথা! মনে হয় ভগবান্ যেন ভক্তকে আস্বাদন করিতেছেন।

প্রিয়ভক্তকে নিষেধ করিয়াছেন নিজ প্রভুকে পরীক্ষা করিতে। "একমাত্র সেবাইত" বলিয়া গৌরব দিয়াছেন। নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি লিখিয়া চাহিদা আবদার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বন্ধুসুন্দরের ভক্ত-বাৎসল্য ও শিশু-সারল্য নিখুঁতভাবে সুপরিস্ফুট।

গ্রন্থখানির মধ্যে কয়েকটি তত্ত্বরহস্যময় বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কোন্ ভাবাবেশে ইহা লিখিয়াছেন তাহা মর্মীভক্তের ধ্যানের সামগ্রী।

নিখিল বিশ্বসত্তাকে দুইভাগ করিয়াছেন তিনি নিজেও ফক্কীকার। নিত্যবস্তু আর অনিত্য বস্তু। মায়াবশ, অমৃতময় আর মৃত্যুময়।

প্রভু নিজের অবস্থা লিখিয়াছেন 'মৃত্যুঘেরা'। মৃত্যুময় জগতের মধ্যে অমৃত স্বরূপ নামিয়া আসিয়াছেন। সত্যস্বরূপ "ফক্কীকারের প্রতিপাল্য" হইয়াছেন। কলিহত জীবের পাপভার নিজ অঙ্গে লইয়া তিনি তাহাদের মৃত্যুবেদনা দিয়া নিজেকে ঘিরিয়াছেন।

মুক্ত বৃষের মত নিজেকে নিজে 'নির্দোষী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিজে সর্ব বাধামুক্ত, তথাপি স্বেচ্ছায় পরমকরুণায় জীবের ব্যথা নিজাঙ্গে গ্রহণ করিয়া চির অমৃতময় হইয়াও 'মৃত্যুঘেরা' হইয়াছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা ঘুচাইয়া মৃত্যুগ্রস্ত জীবকে অমৃতের আস্বাদন দিতে এই মহাবতারণ।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের নিজ স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি মহাবাণী এই গ্রন্থে অভিনব। "আমাকে শিশু কহে" "আমার বয়ঃ পাঁচ বৎসর" "আমি সকলের ছোট" "আমাকে হীন কহে" "আমি হরিনাম মহানাম নামমাত্র।"

নিত্য শিশুভাবটি প্রভু বন্ধুসুন্দরের পরম স্বরূপ। মনে হয় এই লীলায় এইটিই অনন্যসাধারণ অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব। চন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাসে।" আর

** 'উদ্ধারণ'। প্রভু জগদ্বন্ধু। ১ম সংস্করণ, মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ। কলকাতা।*

এই 'উদ্ধারণ' নামক গ্রন্থটিতে নিজেকে পঞ্চম বর্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই লেখাটি চন্দ্রপাত গ্রন্থের পূর্ববর্তী। চন্দ্রপাতে যাহা হইবে এ গ্রন্থরত্নে তাহারই পূর্বাভায।

লৌকিক লীলায় বয়ঃক্রম যাহাই হউক না কেন, কালাতীত পুরুষ নিত্যকালই কালগতির ঊর্ধ্বে বিরাজিত। ব্রজলীলায় পুরুষোত্তম শ্যামসুন্দর যেমন নিত্যকিশোর, মহাউদ্ধারণ লীলায় শ্রীহরিপুরুষ বন্ধুসুন্দর সেইরূপ নিত্যশিশু। মহাভাব-দশাসিন্ধুর মহাগাম্ভীর্যের ইহা এক নিরুপম লক্ষণ।

শ্রুতির ভাষায় ব্রহ্মপুরুষ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" তিনি সকল বড়র বড়, আবার সকল ছোটোর ছোট, একই কালে এই বিরুদ্ধতা। লীলারসময় শ্রীহরিপুরুষ তাই সকলের ছোট। সর্বাতিশায়ী বড়ত্ব আছে বলিয়াই এই ছোটত্ব।

শ্রীপাদ জয়নিতাই দেব শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর দর্শনার্থ উপস্থিত হইলে অতি সহজভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, আমায় দেখে কী হবে!" এই দীনতা অপূর্ব। কিসের জন্য. এই দৈন্য! নিজেকেই নিজে হারাইয়াছেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাই পরম নৈরাশ্যে নিজেকে নিজে সর্বাপেক্ষা হীন ভাবিতেছেন। পরম মহদ্ বস্তুর এই হীনতা-বোধ উদ্ধারণ লীলার প্রসূতি। ইহাতে মাধুর্যের চমৎকারিতা সুব্যক্ত।

এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে একটি মহামহিমান্বিত বাণী—"আমি হরিনাম মহানাম নামমাত্র।" 'প্রভু জগদ্বন্ধু' শ্রীহরিনামের প্রকটমূর্তি এই কথা শ্রীহস্তে ত্রিকালগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" এই সূত্রে। হরিনাম অর্থাৎ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।"

এই মহামন্ত্রাক্ষরের ঘনীভূত প্রতিমা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। এই গ্রন্থের "আমি হরিনাম" ও ত্রিকাল গ্রন্থের "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" একই সংবাদ। এই গ্রন্থে "আমি হরিনাম" কথাটির পর আবার "মহানাম নামমাত্র" লিখিয়াছেন। এই বার্তাটুকু আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। শুধু এই কথাটির জন্যই এই অল্পায়তন গ্রন্থরত্ন বন্ধুভক্তগণের কণ্ঠহার হইবার দাবী করিতে পারে।

ত্রিকালগ্রন্থে 'মহানাম' বস্তুটির স্বরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহাতে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে সেই হেতু তিনটি অবয়বকে পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। মহানামের আদি বা প্রথমনাম 'জগদ্বন্ধু'। মধ্যনাম 'পুরুষ'। শেষনাম 'হরি'। সুতরাং "জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি" ইহাই মহানাম। শ্রীলেখনী মাধ্যমে ইহাই নিঃসংশয়িত বিঘোষণা।

নামের ঘনীভূত মূর্তি "নামী" আবার নামীর বাঙ্ময়ীমূর্তি "মহানাম" দুগ্ধের নির্যাস ছানা। ছানার ঘনমূর্তি সন্দেশ কী মধুর!!!

লৌকিকে বাচ্য আর বাচক আলাদা বস্তু। সন্দেশ বস্তুটির মিষ্টত্ব সন্দেশ এই শব্দে নাই। সীমিত বস্তু সম্বন্ধেই এই সকল নিয়ম খাটিবে কিন্তু অসীমে খাটিবে না। যিনি অনন্তানন্তময় তাহাতে নাম ও নামী সর্বতোভাবেই ভেদরহিত। সন্দেশ সন্দেশ শব্দটি সহস্রবার বলিলেও জিহ্বায় বিন্দুমাত্র সন্দেশের মিষ্টত্বের অনুভূতি হইবে না। কিন্তু নাম মহানাম সহস্রবার উচ্চারিত হইলে

মহামাঙ্গল্যের উদয় হইবে। নামী শ্রীহরিতে যে পরম মধুরিমা আছে, নামে তাহার আস্বাদন হইবে।

ত্রিকাল গ্রন্থেও লিখিয়াছেন, "হরি শব্দ উচ্চারণ হরিপুরুষ উদয়" হরি শব্দ উচ্চারণমাত্র হরি শব্দবাচ্য পুরুষবরের শব্দব্রহ্মময়ী মূর্তি সমুত্থিত হন। তারপর পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ মূর্তিতে পরম প্রাণ প্রতিষ্ঠান হয়। নাম সাধকের সম্মুখে নামবিগ্রহ নামী প্রত্যক্ষ হন।

"বাচি বস্তুন্যপি সমান রসস্থিতিঃ।" বাক্যেতে বস্তুতে সমান রসের স্থিতি—যদি লক্ষ্যবস্তু অনন্তানন্তময় হন। নাম নামীর অভিন্নতার, নাম মহানাম ও বন্ধুসুন্দরের অভিন্নতার এই মাধুর্যময় বাণী জয়যুক্ত হউক। এই সকল মহাবাণীর বাহক এই গ্রন্থমণি সকল ভক্তগণের শিরোমণি হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'সংকীর্তন পদামৃত'—মুখবন্ধ

এই অমৃতময় সংকীর্তনেব পদসমূহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর স্বানুভাবানন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর বয়স তখন সবে মাত্র পঞ্চদশ। একদিন শুভক্ষণে শ্রীহস্তে লিখনী লইয়া প্রথম গান বাঁধিলেন। একটি আবাহন গীতিকায় সপরিকর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে আবাহন করিলেন—

"এস এস নবদ্বীপরায়, দীনজন ডাকছে হে তোমায়।
আমি ভবঘোরে, ঘুরে' ঘুরে' আচ্ছন্ন মোহ-মায়ায়।।
তুমি সংকীর্তনেশ্বর, তুমি নদে' সুধাকর,
এবার বিতরি' করুণা-সুধা রক্ষ চরাচর,
প্রভু তুমি বিনে, এ দুর্দিনে, অন্ধকার সমুদয়।।
কোথা নিতাই গুণধর, কোথা প্রাণ গদাধর,
রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর,
ল'য়ে এ সকলে, কুতূহলে, গৌর এস গো ত্বরায়।।
ওহে শচীর দুলাল, তুমি পরম দয়াল,
ত্বরায় এসে' ঘুচাও দাসের সংসার-জঞ্জাল,
দাসে দয়া কর, গুণাকর, বিকাশি' বিমল-কায়।।
আমি জ্ঞান-গতিহীন, ভক্তি-ভজন-বিহীন,
গ্রহ-কোপানলে দেহ, দিনে দিনে ক্ষীণ,
ভেসে' নয়নজলে, বন্ধু বলে, রেখ গৌর রাঙ্গা পায়।।"

পঞ্চ দশ বর্ষ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত শ্রীশ্রীপ্রভুর গ্রন্থ রচনার কাল। তৎপর ত্রিংশৎ বৎসর হইতে সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত প্রভু বন্ধু অতি কঠোর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্বক অসূর্যম্পশ্য

* *'সংকীর্তন পদামৃত', প্রভু জগদ্বন্ধু। ১ম সংস্করণ ১৩৪৭। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা।*

ভাবে মহাগম্ভীরায় সংগোপনে ছিলেন। ঐ সময় আর গান রচনা করেন নাই। সূত্রগ্রন্থ 'ত্রিকাল' ও গীতিগ্রন্থ 'চন্দ্রপাত' ও 'হরিকথা' মৌন হইবার অব্যবহিত পূর্বের রচনা। উক্ত গ্রন্থত্রয় (ত্রিকাল, চন্দ্রপাত, হরিকথা) স্বয়ং প্রভু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যথাযথ বিন্যাস করিয়া গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রায় দুইশত গান, যখন যে-ভাবে প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, সেইভাবে রচনা করতঃ প্রিয় অনুবর্তীগণকে খোল-করতালে আস্বাদন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

বাকচর শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান কালীন একদিন প্রত্যুষে শ্রীশ্রীপ্রভু "জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান" এই প্রভাতী গানখানি রচনা করিয়া প্রিয় ভক্ত নবদ্বীপ দাসকে শিষ দিয়া সুর শিখাইয়া দিলেন ও হাতে তালি দিয়া তাল শিখাইয়া দিলেন। তৎপর নগর পরিভ্রমণ করিয়া টহল কীর্তন করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ শিরোধার্য করতঃ সুরসিক কীর্তনীয়া নবদ্বীপ দাস নগর ভ্রমণ করিয়া বহু ভক্ত সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ কীর্তনে এমন অভাবনীয় ভাবের উল্লাস হইতে লাগিল যে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত করতঃ গানটিকে একবার দুইবার করিয়া পঞ্চবিংশতি বার গাওয়াইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর পদ মধুময়। যতই মন্থন করা যায় ততই মধু উঠে। রসজ্ঞ চতুর ভক্তগণ প্রেমভক্তির মন্থন দণ্ডে খোল করতাল রজ্জু আকর্ষণ করতঃ সে অপার্থিব অমিয় তুলিয়া আস্বাদন করেন। আর "মাতিয়ে মাতাই রে, মাতিয়ে মাতাই রে" বলিতে বলিতে সে অমৃত অকাতরে ছড়াইয়া বিলাইয়া সবাইকে মাতোয়ারা করিয়া তোলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত অধিকাংশ গানের সঙ্গে ঐরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস যুক্ত আছে। ঐ ভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অবস্থায় রচিত গানগুলি ইতিপূর্বে বহুভাবে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের পরম ভক্তি-ভাজন প্রভু-গত-প্রাণ দাদা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায় অতুলনীয়। এই সংস্করণে যোগ বিয়োগ কিছুই নাই। পূর্বে সংগৃহীত শ্রীমতি সংকীর্তন, শ্রীনাম সংকীর্তন ও বিবিধ সঙ্গীতের সমগ্র পদরাজি এইবারে একটি গ্রন্থে 'সংকীর্তন পদামৃত' নামে একটি নিত্য ভজনানুকূল নূতন পর্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়া পরিবেশিত হইতেছে। এই নিরুপম পদকদম্বে যাঁহার অমৃতময়ী মহাভাবের মূর্চ্ছনা, সেই স্বয়ং প্রভুই এই গ্রন্থের নিত্য প্রকাশক। বস্তুতঃ তিনি ছাড়া আর কেই বা এই অমূল্য ভাবসম্পদ্ প্রকাশের অধিকারী হইতে পারেন? তবে ব্যাবহারিক ভাবে গ্রন্থের প্রকাশ কার্য যখন যাঁহাকে ভাগ্য দিয়া করান, তখন তিনিই করেন। এই সংস্করণের যিনি ব্যাবহারিক প্রকাশক, তিনি ক'দিন পূর্বে একখানি স্নেহ-লিপিকায় তাঁহার মনের এই কথা এ জীবাধমকে এইরূপ লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—

"প্রিয় মহানাম,

ভূমিকায় কোথাও যেন আমার নাম না
থাকে, এই সমস্ত গ্রন্থে প্রভুর চিন্তাধারা
প্রবাহিত, ঐ প্রবাহ স্বতঃসিদ্ধ। কাহারও
দানের উপর নির্ভর করে না।"

পূজ্যপাদ দাদা আমার প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ নিজজন। তাই একটি পরম গভীর সত্যের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। প্রভুর গ্রন্থে "প্রভুর চিন্তাধারা প্রবাহিত! ঐ প্রবাহ স্বতঃসিদ্ধ"—এ অতি

নিগূঢ় সত্যকথা। সকল সুকবিদের রচনাই তাঁহাদের নিজ নিজ চিন্তাপ্রসূত, কিন্তু সকল কবিদের চিন্তারই যে একটা ধারা আছে তাহা নহে। কোন কোন কবির রচনা বদ্ধ ডোবার মত,—প্রবাহ নাই। কোন কোন কবির বচনা পুকুর সবোবর আদি, হয় তো বা ক্ষুদ্র হ্রদের মত,—স্রোত খেলে না। প্রভুর রচনা একটি বেগবতী তটিনীর মত। তাহাতে যে অবগাহন করে দুর্দাম বেগ তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রভুর রচনা জীবন্ত গতিমান। তাহা যাহাকে স্পর্শ করেন, তাহাকে নাচাইতে নাচাইতে ছুটাইয়া দেয়।

"ঐ শ্যামবায়—
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় রে।"
"ঐ গোবাবায়—
নিতাই সনে কীর্তনে কৃষ্ণগুণ গায় মা।"
"ঐ বসময়—
কিশোরী সনে বসিয়ে হেসে কথা কয় মা।"

পদগুলি কি প্রাণবন্ত! প্রভু আমাব আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—ঐ যে দেখ! শ্যামনাগর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে!! প্রভুর ঐ অঙ্গুলি সঙ্কেত যে ভাগ্যবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে অমনি, "কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, চরণে নূপুর বাজে, রাশি রাশি রাকাশশী নখে শোভা পায বে" দেখিতে দেখিতে হেলিয়া দুলিয়া. সেই নিত্য রূপের উজান যমুনায় ভাসিয়া চলে।

সুধীর তত্ত্বজ্ঞ কবিদেব রচনায় ঐ প্রকার চিন্তার সজীব প্রবাহ দেখা যায়, কিন্তু হইলে কী হইবে, সে প্রবাহ অনেক সময়ই স্বতঃসিদ্ধ নহে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি মলিনা। ভাবে যদি প্রাকৃত মালিন্য থাকে, তাহা হইলে ভাবনা স্বচ্ছ হয় না, প্রবাহ নির্মল হয় না. স্রোতের গভীরতম প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না। মলিনতাবর্জিত প্রাকৃত-ভাব-গন্ধহীন শুদ্ধ সত্ত্বময় যে প্রবাহ তাহাই স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীশ্রীপ্রভুর চিন্তা প্রবাহ সেইরূপ। হরিদ্বারের গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাধারার মত নির্মল, স্ফটিকবৎ! কবিতা যখন নিখিল জীব-নিবহের জীবনের অন্তস্তলের খবর আনিয়া দেয় তখনই তাহা স্বতঃসিদ্ধ হয়। মর্মের গভীরতম দেশের বার্তা চিন্ময় রাজ্যেরই। উহা শাশ্বত ও স্বতঃসিদ্ধ।

"গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম।।" চৈঃ চঃ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরিমাময় যে প্রেমকেলি উহা নিত্য অফুরন্ত নিরবচ্ছিন্ন। জীবমাত্রের বুকের তলে ঐ প্রেমের হিল্লোল চিরস্পন্দিত। উহা সর্বত্র স্বতঃসিদ্ধ। ঐ "অকৈতব জাম্বুনদ হেম" প্রেমাবর্তের ঘন রসই শ্রীশ্রীপ্রভুর সুধাময়ী লেখনীর অগ্রে সতত তরঙ্গায়িত।

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই পদকদম্ব কেবল স্বতঃসিদ্ধ নহে, স্বতঃস্ফূর্তও বটে। স্বসংবেদ্য অনুভবই স্বতঃস্ফূর্ত। আমার সত্তার অনুভব আমার কাছে, তোমার সত্তার অনুভব তোমার কাছে, স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল বিলাসের রসানুভূতি যাঁহার স্বসংবেদ্য দশা, তাঁহার কাছেই উহা স্বতঃস্ফূর্ত। নীলাচলে গম্ভীরায় "রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি" গোরাশশী ঐ আপন লীলার স্বতঃস্ফূর্তিতেই স্ফূর্তিময় ছিলেন। আত্মারাম প্রভু বন্ধুসুন্দর "স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" গৌরগোবিন্দ লীলারস-সাগরে

ভাসিয়া চলিয়াছেন। সেই আস্বাদনের ছিটে ফোঁটা মাত্র জীবের ভাগ্যবলে নিজ লিখনীতে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

রাত্রি অবসান প্রায়। প্রভু বন্ধু আমার ডাকিতেছেন, "জাগ গোরা গুণমণি যামিনী প্রভাত হল, প্রিয় সনে একাসনে কত নিদ্রা যাবে বল" গৌর গদাধর জাগিল। গৌরচন্দ্রের চন্দ্রিকায় পথ দেখিতে দেখিতে প্রভু বন্ধু নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। "জাগ-জীবনকিশোরী বিভাবরী পোহাইল।" প্রাণস্পর্শী ডাকে ভানুদুলালীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাধাগোবিন্দের কুঞ্জভঙ্গ হইল। "জাগ জাগ নগরবাসী" বলিয়া প্রভুবন্ধু নগর ঘুরিয়া নগরবাসী নরনারীকে প্রেমের লীলা দর্শন কবিয়া ধন্য হইতে ডাকিলেন। "কপট শঠ কুটিল কুজন" জীবের অভিমানে আঘাত করিয়া ডাকিলেন। সবাইকে পরাশান্তি লাভের উপায় "গোপী গোপাল গীতি প্রাতঃপূজন কৃতি" করিতে উপদেশ দিলেন। নগরের পথে "গঙ্গানীবে গৌরচন্দ্রের উযাবগাহন" প্রত্যক্ষ করিয়া পুনঃ নন্দালয়ে প্রবেশ করিলেন। "দে মা দে মা যশোদে" গাহিয়া কানাইকে গোচারণে লইতে আসিলেন। বটুগণকে যশোমতী মায়ের পায়ে ধরিয়া সাধিতে শিখাইয়া দিলেন, "বন্ধু ভণে বটুগণে ধরগে পায়ে।" "যাবি কি কাননে রে ভাই" বলিয়া জীবন কানাইকে মৃদু মধুর ভৎর্সনা করতঃ প্রাণ-গোপালকে গোঠের সাজে সাজাইয়া মাঠে লইয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নকালে শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ। নবদ্বীপময় নগর কীর্তনে মাতিয়া "সাঙ্গোপাঙ্গ প্রিয়সঙ্গে"—"গৌড় গঙ্গন গোরাশশীকে" আবাহন করতঃ "পক্কান্ন ওদন তক্র, ফল ও জল, আদরে উদর ভবে" ভোজন করাইয়া দিলেন।

রাঙ্গা ভানু পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। মায়ের কথা মনে পড়িয়াছে। "আয়রে জীবন কানাই আয় ঘরে যাই। পথপানে চেয়ে বুঝি আছে যশোমতী মাই।" গোষ্ঠ হইতে ধবলী শ্যামলী-সহ ভাই কানাইকে বারংবার ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ঘরে চলিলেন। "ঐ আসে রসময়" বলিয়া তর্জনী সঙ্কেতে সবাইকে ডাকিয়া রসময়েব সে রসে-ভবা অঙ্গ-ভঙ্গী ও খঞ্জন গমন দেখাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গোধূলি হিল্লোলে "সুরধুনী পুলিনে গৌরচন্দ্রের আরতি" হইয়া গেল। ভক্তবৃন্দ আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে ফিরিলেন। পথে "নবদ্বীপ তোরণে" আবার আরতির তুমুল রোল উঠিল। অঙ্গনে আসিয়া গৌর-গদাধর "অষ্টাপদ সিংহাসনে" উপবেশন করিলেন। স্বরূপ অপরূপ পঞ্চ দীপ লইলেন, অদ্বৈত "আচার্য অনিবার্য দুর্জয় লম্ফন" করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ রোল তুলিলেন, মুরারি ছত্র ধরিলেন। "প্রিয়গণ মগন" হইয়া "ঘন হরিবোল" ধ্বনি করিলেন। ভারতী ভাসিয়া গেলেন। প্রভুবন্ধু ডুবিয়া রহিলেন।

ওদিকে গোধূলিতে গোকুলে "গোপ গোপীকুল গোপাল আরাত্রিক" রসে মগন হইয়া আছেন। রাখালগণ "আবা আবা" ধ্বনি করিতেছেন। "মাতা যশোমতী স্নেহাপ্লুতা" হইয়া পঞ্চ দীপে গোপালের চন্দ্রবদন দর্শন করিলেন। পিতা নন্দরাজ 'হরষিত' হইয়া স্নেহের দুলালের মুখচুম্বন করতঃ 'তিরপিত' হইলেন। বাৎসল্য রসে ডগমগ "মুগধ বন্ধু বন নয়ন রে"। তারপর কেলী কদম্বতলে আরতি হইল। রাস মণ্ডলে আরতি হইল। যোগমায়ার সুকৌশলে একই কালে কত কত রঙ্গমঞ্চে কত কত লীলাভিনয় হইল! নীরব নিশীথিনী 'নমিতা' হইলেন। প্রভু বন্ধু

"তোরণ তলে" দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

গভীর রাতে নবদ্বীপময় নিশীথ কীর্তন। জগাই মাধাই উদ্ধার। "রে রে মাধাই", "বল হরিবোল মাধাই" "হারে জগাই মাধাই" বলিয়া নিত্যানন্দ হরিদাসের সঙ্গে প্রভু বন্ধু জগাই-মাধাইকে ডাকিয়া ডাকিয়া হরিনাম লওয়াইতে লাগিলেন।

"হরিনামে পাপ তনু হবে রে শীতল।
(কত শীতল হবি রে)".

ওদিকে "কুসুম কাননে বাঁশরী বাজিল", "যমুনা পুলিনে মুরলী ধ্বনিল" প্রভু বন্ধু ছুটিয়া চলিলেন, "নিধুবনে একাসনে যুগল রতন" দর্শন করিলেন। তারপর—দু'টি রসের পুতুল নিত্য লীলাবিগ্রহ "উরসে উরস বদনে বদন" দিয়া অলসে অবশে ঘুমাইয়া পড়িল। "শ্যাম অঙ্গে রাই রেখেছে চরণ" এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে 'দ্বারে জগদ্বন্ধু কোটাল" হইয়া বসিয়া রহিলেন। বুঝি জগজ্জীবকে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশের অধিকার দিতে এসেছেন, তাই দ্বারে কোটাল রহিলেন। এই প্রকার প্রভু বন্ধু অষ্টকালীন শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-রসে ওতঃপ্রোতভাবে ডুবিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু যখন ব্রজধাম স্মরণ করিয়াছেন, তখন "যশোদাদুলাল নন্দলাল"-কে ভাবিতে ভাবিতে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র লীলাস্থলী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। যাবট-যমুনাতট, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন, বংশীবট-কেশীঘাট-কেলীকদম্ব, ধবলী-শ্যামলী কেলী, মাধবী-মালতী, সুবল-মধুমঙ্গল, রোহিণীনন্দন-বাম, দাম-বসুদাম-শ্রীদাম-সুদাম, ললিতা-বিশাখা-চিত্রা, সে "রূপের বাজারে" সবাইকেই দেখিযাছেন। আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া সবাইকেই ডাকিয়াছেন। সবার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সবাব ভাবে ভাবিত হইয়া একাকার হইয়া রহিয়াছেন।

যখন শ্রীগৌরপরিকব স্মরণে আবিষ্ট হইয়াছেন, তখন সে চিন্তামণি গৌড়মণ্ডল ভূমির সবাইকেই আপ্যায়ন করিযাছেন। প্রেমদাতা নিত্যানন্দ, প্রিয় গদাধর, সীতানাথ অদ্বৈত, শ্রীবাস শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস গৌরীদাস হরিদাস সূর্যদাস বক্রেশ্বর দামোদর মুরারি নরহরি রামাই নন্দাই জগাই মাধাই মুকুন্দ শিবানন্দ রামানন্দ ভবানন্দ রামচন্দ্র অষ্ট কবিরাজ অষ্ট ব্রহ্মচারী ছয় চক্রবর্তী ষড় গোস্বামী দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মোহান্ত—অসংখ্য নক্ষত্র বেষ্টিত গৌরাঙ্গ। বিধুর মুখারবিন্দ দর্শনে "পি পি পি পিয়াসী অতি অতি তৃষ্ণ" হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। এমনই ভাবে নাম ধরিয়া, এমনই ভাবে আদর করিয়া, এমনই ভাবে প্রাণ উঘারিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের পরিকরগণকে কে কবে কাহাকে ডাকিতে শুনিয়াছে?

প্রভু আমার প্রার্থনা করিয়াছেন—

"বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজ গোপীর পদরজঃ আভরণে।।
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে, সখীসনে অভিসারে,
এসে কিশোরী আমাকে দলিতেন শ্রীচরণে।।
হাতে বাঁশী কালশশী, নিকুঞ্জ কাননে পশি,
সুখে রহিতেন বসি' মমোপরে প্যারীসনে।।

ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম, ঘামিতেন অবিরাম,
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে।।
বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে,
সাজা'ব হৃদয় ভরে' হেরিব প্রেম নয়নে।।"

আহা! কি স্নিগ্ধ! কি কমনীয়!! কি প্রাণস্পর্শী লালসা!!! এ প্রার্থনার পদ অতুলনীয়। প্রভুর রচনা সুকুমার, সুললিত, প্রসাদ ও ঔদার্যগুণ বিশিষ্ট। প্রাণকে গলাইয়া দেয়, হৃদয়কে ছাড়াইয়া দেয়, অন্তরাত্মাকে লীলারসের তরঙ্গে দোলনা দিয়া দেয়। রচনার অলঙ্কারগুলি রসের উপকারক। যেখানে যেটি খাটিবে সেখানে সেটি। যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের তো কথাই নাই, রূপক, উপমা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, বিরোধাভাস প্রভৃতি অর্থালঙ্কার সকল অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে পদের জীবনাধায়ক যে ভক্তিরস, তাহাকে সৌন্দর্য ও মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়া আস্বাদনের চমৎকারিতা ফলাইয়া দিয়াছে।

এ বস্তু পরম প্রসাদ। এ প্রসাদের গন্ধে হৃদ্‌রোগ দূর হয়, স্পর্শে "সর্বদুঃখানাং হানি" হয়, আস্বাদনে জীবন লীলানিকুঞ্জের রস-প্লাবনে ভরপুর হয়। এ যাঁর কথা, তাঁরই হাতে গাঁথা তাই এত মধুর। রসলোলুপ ভক্ত শুদ্ধ হৃদয় লইয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ডুবিয়া পড়ুন। আস্বাদনে বিভোর হইবেন। ঐ যে পথ প্রদর্শক 'গুরুবন্ধু' আপনার আগে ভাসিয়া চলিয়াছেন—

"রাধা-প্রেম-বন্যার জলে
বন্ধু সাঁতারিয়ে চলে"
ঐ প্রেম সিন্ধুর একবিন্দুর কাঙ্গাল—

মহাউদ্ধারণ মঠ
রাস পূর্ণিমা, ১৩৪৭
হরিপুরুষাব্দ ৭০

দাস মহানামব্রত ❑

'হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু'—ভূমিকা

বইটির নাম হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু। হরি শব্দটি প্রাচীন। "আদ্যো হরিঃ।" একেবারে আদিতে যিনি তিনি হরি। পুরুষ শব্দটিও প্রাচীন। ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্ত একটি বিখ্যাত সূক্ত। ইহা প্রাচীন সূক্ত। এই দুইটির সমাসবদ্ধ রূপ হরিপুরুষ। কথাটা আধুনিক। এইরূপ সমাসবদ্ধ রূপ পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

সমাসবদ্ধ 'হরিপুরুষ' শব্দটির ব্যাখ্যা নানা প্রকার করা চলে।

হরির পুরুষ —হরিকর্তৃক প্রেরিত পুরুষ। যেমন রাজপুরুষ। রাজা স্বয়ং উপস্থিত হইতে

* *'হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু'। শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, ট্রাস্ট, ১৯৯৪*

পারেন নাই তাই যোগ্য একজন পুরুষকে পাঠাইয়াছেন। তিনি রাজপুরুষ। সেইরূপ হরিপুরুষ হরির প্রেরিত যোগ্য পুরুষ। হরির সকল কার্য হরির পরিবর্তে করিতে সর্বপ্রকারে যোগ্য হরিপুরুষ।

হরিপুরুষ—হরি শব্দ বাচ্য পুরুষ। 'হরি' এই শব্দটি অনেক শোনা হইয়াছে কিন্তু এই শব্দের বাচ্য কে তাহা জানা যায় নাই। ভক্তেরা গানে বলে 'সত্য যুগে ছিলেন হরি' তিনি কোথায় ছিলেন, কীরূপ তাঁহার রূপগুণ, কীরূপ তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি তাহা কেহই জানে না। কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই হরি শব্দেরই বাচ্য পুরুষ যিনি তিনি হরিপুরুষ।

হরি-অভিন্ন পুরুষ হরিপুরুষ। হরিও যিনি পুরুষও তিনি। যেমন হরিহর শব্দ। যিনি হরি তিনিই হর এই অভিন্ন ভাবনায় হরিহর শব্দ। হরিতে আর হরতে কোনও পার্থক্য নাই। শুধু শব্দ মাত্র ভেদ। সেইরূপ যিনি হরি তিনিই পুরুষ এই অভেদে হরিপুরুষ শব্দ।

এই অভিন্নতা কীরূপ তাহা বিশদ করা যাইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্ত একটি বিখ্যাত সূক্ত। তাহাতে বলা আছে 'পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্' অর্থাৎ যাহা কিছু বিশ্বসংসারে আছে, ছিল ও ভবিষ্যতে থাকিবে সবই পুরুষ। এই সূক্ত অনুসারে পুরুষ শব্দে পরব্রহ্মকেই বোঝায়। কারণ উপনিষদে পরব্রহ্মের লক্ষণ দেওয়া আছে এইরূপ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম ইতি শ্রুতে।" এই কথা বেদান্তসূত্রে সংক্ষেপে আছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এই বিশ্বসংসারে জন্ম-স্থিতি-লয় যাহা হইতে হয় তিনি পরব্রহ্ম। সুতরাং বোঝা যায় যে, পরব্রহ্মকেই পুরুষ শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে। সুতরাং হরি অভিন্ন পুরুষ হরিপুরুষ এই বাক্য হইতে পারে।

পৌরাণিক যুগে আর একটি সুন্দরতর অর্থে পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরী অর্থ দুইটি। একটি, মানুষের দেহ পুরী। আরেকটি, এই বিরাট বিশ্ব-সংসার-পুরী। এই বিশ্ব-সংসার-পুরীর মধ্যে শয়নকারী যিনি তিনি পুরুষ। যিনি শয্যায় শয়ন করেন তিনি শয্যাখানির শুধু মালিক নহেন, ভোক্তাও বটেন। যদি দেখা যায় একটি গৃহমধ্যে একটি পালঙ্ক—তদুপরি শয্যা, তোষক, বালিশ সুসজ্জিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে শয্যাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। লেপের জন্য লেপ নয়, বালিশের জন্য বালিশ নয়। কেহ নিশ্চয়ই এখানে শয়ন করেন। তিনি শুধু শয়নকারী নহেন, তিনি ইহার ভোক্তা ও আস্বাদক।

আমাদের দেহপুরীতেও যাহা কিছু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-সৌন্দর্যের ভোগ, সকলেরই তিনি ভোক্তা। তিনি আস্বাদক। বিশ্বকবির ভাষায়—"হে মোর দেবতা, ভরিয়া আমার এ দেহ-প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।" আমার সত্তা না থাকিলে তাঁহার সব কিছুরই তিনি ভোক্তা। সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে যিনি বিরাজমান তিনি নিখিল জীবের জীবনের দেহান্তর্যামী আর নিখিল বিশ্বের অন্তর্যামী একই পুরুষ। ব্যষ্টি-সমষ্টি সকলের তিনি স্রষ্টা ও আস্বাদক। পুরুষ শব্দের এই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য। হরি শব্দের অর্থ হরণকারী। পাপ তাপ দুঃখ জ্বালা সবই তিনি হরণ করেন। হরণ করিয়া দূর করিয়া দিয়া শান্তি দান করেন।

আমার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহাকে প্রাকৃত আমি ঢাকিয়া রাখিয়াছে, অপ্রাকৃত আমিকে আবরণ করিয়াছে জড়ীয় আমি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "পাকা আমিকে কাঁচা আমি ঢাকিয়া

রাখিয়াছে।" এই আবরণ যিনি মোচনকারী তিনি হরি। সকল আবরণ হরণ করিয়া প্রেম দিয়া মনটাকেও হরণ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "হরি শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম। সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।।" ঐ জড়ীয় আবরণই মূল অমঙ্গল। এই আবরণের মালিন্য দূর করিয়া আমাকে তাঁহার ভোগযোগ্য করিয়া ভোগ করেন যিনি, তিনিই হরি। এই ব্যাখ্যায় হরি শব্দ ও পুরুষ শব্দের অভিন্নতা ব্যক্ত হইল। সুতরাং যিনি হরি, তিনিই পুরুষ, এই অভেদ অর্থে হরিপুরুষ ব্যাখ্যা হইতে পারে।

হরিপুরুষের সঙ্গে জগদ্বন্ধুর সম্পর্ক কী? প্রভু জগদ্বন্ধু নিজে লিখিয়াছেন, 'হরিপুরুষের প্রকাশ নাম জগদ্বন্ধু।'

তাই এই গ্রন্থখানার নাম হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। গ্রন্থখানার লেখকের নাম অমলেশ ভট্টাচার্য। ইঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্প দিনের। 'শৃণ্বন্তু' একটি মাসিক পত্রিকা। ইহা শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত সম্প্রদায়ের। ঐ পত্রিকার তিনি সম্পাদক। ঐ পত্রিকায় 'মহাভারতের কথা' ধারাবাহিক বাহির হইতেছিল। পড়িয়া খুবই আনন্দ পাইতেছিলাম। যখন লেখা পড়িয়া খুব আনন্দ পাইতেছি তাহা জানাইয়া দিলাম। পত্র পাইয়া তিনি আমার সাথে দেখা করিলেন। আমাদের সৌহার্দ্য জন্মিল। তাঁহাকে বলিলাম, রামায়ণ সম্বন্ধে লিখুন। তিনি রামায়ণ সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকায়। খুব ভাল লাগিল সে লেখাও।

একদিন তাঁহাকে বলিলাম, আপনি প্রভু জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে বই লিখুন। তিনি রাজী হইলেন। আমার হাতে যে সব বই ছিল তাহা তাঁহাকে দিলাম। তিনি আমার ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মহানাম অঙ্গন'-এ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখাটি আমার বেশ মনোমতন হইতেছিল। প্রভু বিষয়ে আমিও লিখিয়াছি। গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীর সাথে মিলিয়া 'বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী' দশ খণ্ড লিখিয়াছি। কিন্তু আমার নিজের লেখাতে আমি তৃপ্ত নই। আমি লিখিতে বসিলেই বিদ্যাসাগরীয় ভাষা আসে। আধুনিক ভাষা আসে না। সেই জন্য আধুনিক ভাষায় একখানি প্রভুর গ্রন্থ হোক এইরূপ ইচ্ছা ছিল। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি লেখা আরম্ভ করিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়াই পরলোকগমন করেন। তৎপরই অমলেশবাবুকে বলা।

তাঁহার লেখা প্রায় শেষ। এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইবে। তিনি আমাকে ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ভূমিকা কী লিখিব,—বলি যে, বইখানা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। পড়ার সময় মনে হইয়াছে প্রভুবন্ধুর লীলাস্থানগুলি ও পাত্রপাত্রী সব যেন তাঁর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। তিনি নিজেই একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—ডাহাপাড়া, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, পাবনা, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন যে সকল স্থানে বন্ধুসুন্দর লীলা করিয়াছেন সেসব লীলার স্থানগুলি আমার চোখের সামনে ভাসে। যাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছেন—অতুল চম্পটী, জয়-নিতাই, রণজিৎ লাহিড়ী, রমেশ চক্রবর্তী, প্রমুখ লীলাসঙ্গীদেরও যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

এইরূপ হইলেই লীলাগ্রন্থ লেখা সার্থক হয়। এই সময় অমলেশবাবুর লেখা 'বেদমন্ত্র-মঞ্জরী' নামে গ্রন্থ আমার হাতে আসিল। গ্রন্থখানি যেন একখানা বৈদিক অভিধান। প্রাচীনকালে যাস্ক এই রকম অভিধান লিখিয়াছিলেন। তদবধি আর এরূপ গ্রন্থ দেখি নাই। বইখানি পড়িয়া বুঝিলাম

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার গ্রন্থরাজির কৃপায় অমলেশবাবুর এই গ্রন্থ লেখার শক্তি। কোনও মহাপুরুষের কৃপাস্নাত হইলেই আর একজন অবতার পুরুষের লীলাগ্রন্থ লেখার যোগ্যতা হয়। আর একদিন তাঁহার মুখে এক সভায় প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা শুনিতেছিলাম। প্রভুর রহস্যময় কথাগুলির তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। যেমন, গাভীর অশ্রু, চন্দ্রের সুধা, সাড়ে-তিন মন চাঁদের সুধা, অশোক বৃক্ষের কুঁড়ির অগ্রভাগ—এই সকল গভীর দ্যোতনাপূর্ণ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাঁহার প্রবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইল গভীর বেদচর্চার এই ফল। মনে ভাবিলাম অমলেশবাবু প্রভুর কৃপামৃত পান করিয়াছেন। তাই আমি নিশ্চিন্ত গ্রন্থখানি ভক্তদের ও সজ্জনদের আনন্দদায়ক হইবেই।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু' নাটক—মুখবন্ধ

এই যুগ যেমন এক দিকে ধর্ম-বিমুখতার যুগ, অপর দিকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবতার-পুরুষের লীলাজীবন লইয়া ব্যাপক ভাবে আলোচনার যুগ। কয়েক খণ্ড ভারতের সাধক, ভারতের সাধিকা, বাংলার সাধক, রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের বিপুল প্রচার চলিতেছে এই যুগে।

মহাপুরুষের জীবনী লইয়া নাটক রচনা ও তাহা শ্রবণেচ্ছু অগণিত নরনারীর সমাবেশ এই যুগের যেন একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীপ্রভুর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসবকালে বিরাট্ সভা-সমিতি হইয়াছে। নবদ্বীপধামে মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তবু অন্তরে সাধ ছিল তাঁহার অলৌকিক লীলা-জীবন অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হউক। আমার পরম বন্ধু সজ্জন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ শ্রীশ্রীভোলাগিরি প্রভৃতি বহু নাটক ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা ভাটপাড়ার শ্রী-

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য রচিত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী

স্টার থিয়েটার—১২ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার ১৯৭২, দিবা ১/৩০

উদ্বোধক—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী,

সঙ্গীত পরিচালনা—কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক—অনিল বসু (স্টার),

নির্দেশনা—অপূর্ব মিত্র (চলচ্চিত্র পরিচালক)।

***অভিনয়ে ঃ** অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় / গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / অমরেশ দাস / শৈলেন মুখোপাধ্যায় / অরুণ মুখোপাধ্যায় / মণি শ্রীমাণী / জহর রায় / অজিত চট্টোপাধ্যায় / ঠাকুরদাস মিত্র / সিদ্ধেশ্বর দাস / ইন্দ্রজিৎ (রঙ মহল) / বলাই মুখোপাধ্যায় / কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় / সুনীত মুখোপাধ্যায় / মুকুল সরকার / গৌরীশঙ্কর / রাজকুমার বসু / হরিদাস চট্টোপাধ্যায় / তপন গাঙ্গুলী / বিনয় চক্রবর্তী / সুস্থির রায়চৌধুরী / হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং মলিনা দেবী / শিপ্রা মিত্র / রাজলক্ষ্মী (ছোট), ইন্দিরা দে / উমা দত্ত / মেনকা দেবী প্রভৃতি।*

'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু' নাটক। রচনাঃ শ্রীগোপী ভট্টাচার্য, প্রকাশক ঃ শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।

গোপী ভট্টাচার্য আমার সেই অন্তরে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পুরীধামে বাসকালে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া এই নাটক রচনা করেন। নাটকটি স্টার, রঙমহল, একাদেমী ও দেশপ্রিয় পার্ক গীতা জয়ন্তী মঞ্চে একাধিকবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, শ্যাম লাহা, মলিনা দেবী, শিপ্রা মিত্র, মেনকা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট) প্রমুখ খ্যাতিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন। কলিকাতার বাহিরে বার্ণপুর ভারতী ভবন, প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ, রামরাজাতলা, হাওড়া, ইছাপুর এ. টি. এস. মঞ্চ, নবদ্বীপ রাধাবাজার, ব্যারাকপুর ভোলাগিরি আশ্রম প্রাঙ্গণ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়। পুনঃপুনঃ রসিক শ্রোতৃবর্গের আস্বাদনে নাটকখানি যে রসোত্তীর্ণ ইহা প্রমাণিত হয়। যাঁরা ভক্ত তাঁরা তো আত্মহারা হন। যাঁরা ভক্ত নন তাঁরাও বিমুগ্ধ হইয়া আস্বাদন করেন।

নাটক ঠিক ইতিহাস নহে। ইতিহাসের দৃষ্টি ঘটনার দিকে। নাটকের দৃষ্টি ঘটনার রস-বৈচিত্র্যের দিকে। রসের দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর লীলামাধুর্য যাঁহারা আস্বাদন-লোলুপ তাঁহারা এই নাটকে অনেক সম্পদ্ পাইবেন। আমি নিজে এই নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি বহুবার এবং প্রতিবারই ভাবাবিষ্ট হইয়াছি। অভিনয় শেষে শ্রোতৃবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও শুনিয়াছি। এই নাটক একটি সাত্ত্বিক ভাব সমৃদ্ধ এবং সর্বসাধারণের হৃদয় স্পর্শকারী ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। গোপী ভট্টাচার্য রচিত নাটক 'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু' ভবিষ্যতে ধ্রুপদী নাট্য সাহিত্যে পরিণত হইবে এই আশা আমি করি।

পরিশেষে বলি, যত রসিক সজ্জন যত প্রকারে বন্ধুহরির লীলার মধুরতা আস্বাদন করিবেন ততই আনন্দ। ততই জগতের কল্যাণ। কল্যাণময় কথা দিকে দিকে প্রচারিত হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

সীতা নবমী, ১৩৯৯

প্রাচী শুধু সিনেমা হল নয়—একটি সমাজসেবা

'প্রাচী' পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হইল—এই মর্মে পত্র পাইলাম। বাংলাপ্রীতির জাজ্বল্যমান মূর্তি প্রাচী—বাংলা ভাটার এই দুর্দিনে যে সুদৃঢ় স্তম্ভের মতো—এই ভাষাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহা শুধু সম্মানীয় নহে, আমাদের সকলের জীবনপথে আদর্শ স্থানীয়। দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি প্রাণস্পর্শী দরদ ও অর্থদান অতুলনীয়।

'প্রাচী'র ক্রমোন্নতি হউক, জয়যুক্ত হউক। আমরা তাহার শতবর্ষপূর্ণতা দেখিব সাদর উল্লাসে সশ্রদ্ধচিত্তে। ❑

* *'দেশ কাল' পাক্ষিক সংবাদপত্র। ১৬-৩১ আগষ্ট, ১৯৯৮ 'দৃষ্টিপাত' ক্রোড়পত্র। প্রাচী সিনেমা কর্ণধার : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।*

'মধুর গৌরাঙ্গচরিত' (১ম)—ভূমিকা

'মধুর গৌরাঙ্গচরিত' (প্রথম খণ্ড) পাঠ করিলাম। প্রথম খণ্ডে আবির্ভাব লীলা হইতে গয়াধাম হইতে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন লীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মধু-ব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের মধুমাখা লীলা অতি মধুময় সরল সুন্দর ভাষায় গ্রন্থকার শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অমূল্য ধন দান করিয়াছেন।

ভক্তের কৃপাপুষ্ট লেখনী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—তিন মহাগ্রন্থের মাধুর্য একত্র করিয়া সম্পুটিত করিয়া এই মধুর চরিত প্রকট করিয়াছেন। পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কখনও নয়নজলে ভাসিয়াছি।

বাকী খণ্ডগুলি আস্বাদনের তীব্র লালসা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে। আশাকরি কৃপাসিদ্ধ ভক্তের তরঙ্গময় আস্বাদন প্রবাহ অন্ত্যলীলার সমুদ্র-মোহনায় পৌঁছিবেই।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

---

* *'মধুর গৌরাঙ্গ-চরিত' (১ম খণ্ড), শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দে, কলিকাতা-৪৯। ১ম সং, ১৯৮১।*

'মধুর গৌরাঙ্গচরিত' (মধ্য)—ভূমিকা

জয় জগদ্বন্ধু

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন

'মধুর গৌরাঙ্গচরিত' গ্রন্থখানির নাম। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "চৈতন্যলীলা অমৃতপুর"। লেখক অমৃতের বিশেষণ দিয়াছেন 'মধুর'।

'মধুমাখা অমৃত'—কি চমৎকার! ভক্তকবি ভাষা-হারা হইয়া বলিয়াছেন 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।'

এই শ্রীগ্রন্থের আদিখণ্ড পাঠ করিয়া অনুভব প্রকাশ করিয়াছিলাম। আবার মধ্যখণ্ড পাইলাম। আশায় ছিলাম— পূর্ণ হইল। অন্ত্যখণ্ড দর্শনের আকুতি রহিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে মনে হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিশ্রুত কীর্তি গ্রন্থরত্নই আস্বাদন করিতেছি। মনে হয় শ্রীগৌরহরির নিকটতম কোন প্রিয় পার্ষদের লেখনী।

আধুনিক কবিরা প্রায়শঃ চৌদ্দ অক্ষরী পয়ারকে সেকেলে বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন। বর্তমান কালেও এই পয়ারের মধ্যেও যে এত মধুরস সম্পুটিত করা যায়, তাহা এই 'মধুর গৌরাঙ্গচরিত' খানি পাঠ করিলে বিস্ময়ের সহিত বিশ্বাস করিতে হয়।

জয়যুক্ত হউক শ্রীঅমূল্যের লেখনী। ইনি নিরলসভাবে সিঞ্চন করিতেছেন ভক্তহৃদয়ে শ্রীগৌরলীলা-রসধারা—পাঠে আমরা হইতেছি আত্মহারা।

তাং ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৬
শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন,
রঘুনাথপুর, কলিকাতা-৫৯

গৌরগতগণের করুণালোলুপ
দাস মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

---

* *'মধুর গৌরাঙ্গ-চরিত' (মধ্য খণ্ড)—অমূল্যচন্দ্র দে।*

‘তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব’—ভূমিকা

জয় জগদ্বন্ধু

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহোদয় স্বরচিত ‘তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব’ গ্রন্থখানি উপহার স্বরূপ পাইয়া শিরে ধারণ করতঃ ধন্য হইলাম। লেখার এমনই মাধুর্য যে একাসনে প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছিলাম।

মায়ের দুলাল সুধার্ণব বিদ্যার্ণবের মধুময় জীবন-কাহিনী, অগাধ পাণ্ডিত্য, নিরুপম ভক্তি ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী এই অন্ধকার যুগে উজ্জ্বল বর্তিকা। ভারতীয় আইনের অধ্যাপক তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি উড্রফ ইউলসন সাহেব শ্রীশিবচন্দ্রের করুণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে পর্যন্ত তন্ত্রের আলো জ্বালাইয়াছিলেন। ইহা একটি চিরস্মরণীয় সংবাদ।

এই গ্রন্থরত্ন মধ্যে যে-সকল তথ্য, তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ করিলাম তাহা নিরুপম। এজন্য চির ঋণী রহিব। একা আমি নই, বাঙালী সমাজ। আমাদের শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যময় সত্যগুলি বিদ্যার্ণবের জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। পুনরায় ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইলে আজিকার আধ্যাত্মিক-দেউলিয়া এই জাতির জীবনে আসিতে পারে নবজাগরণে জোয়ার। ঈশ্বরানুগ্রহে যদি সেদিন কোনও দিন আসে তবেই হইবে এই গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়ন।

বিনীত—

১৯৭৩ **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** □

* *‘তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব’। শ্রীবসন্তকুমাব পাল। ১৯৭৩*

সনাতন পত্রিকার লক্ষ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজজীবনের উজ্জ্বলতা বিধান এবং যে পবিত্র পথে চলিয়া গিয়াছেন গৌতম বুদ্ধদেব, জৈন মহাবীর গুরু নানক, প্রভু নিত্যানন্দ, রাজা রামমোহন, ঠাকুর পরমহংসদেব, স্বামী স্বরূপানন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মা আনন্দময়ী, শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী—সেই সত্য ও মঙ্গলের পথে—মহাউদ্ধারণের পথে চলিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান সকলকে জানানো আমাদের লক্ষ্য।

* *‘সনাতন’ বিশেষ সংকলন, ’৯৯ (৮৯তম গুরুজীর জন্মজয়ন্তী), ঢাকা।*

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

জয় জগদ্বন্ধু হরি

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ধরায় অবতরণের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি নিকটবর্তী। পঞ্চ শতাব্দীর পূর্ণতা স্মরণে মহানাম অঙ্গনের মন্দির প্রতিষ্ঠা উদ্‌যাপনে মনে জাগে শ্রীগৌরহরির একটি মধুর লীলা।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মের বক্ত্রারবিন্দঃ।

মামালোক্য স্মিতসুবদনো বসে গোপালমূর্তিঃ।।"

জগন্নাথের শ্রীমন্দির চূড়ার অগ্রভাগে এক বালগোপাল মূর্তি চেয়ে আছে—আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন—ডাকছেন

এই শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারণ করতে করতে তীব্রবেগে ছুটছেন শ্রীগৌরসুন্দর আঠার নালা হ'তে শ্রীমন্দির মুখে।

এ' লীলার গূঢ় তাৎপর্য—

রাধাময় শ্রীকৃষ্ণ—গৌরহরি
দারুময় শ্রীকৃষ্ণ—জগন্নাথ
হাস্যময় শ্রীকৃষ্ণ—বালগোপাল
নিজ আকর্ষণে নিজে ছুটছেন অভিসারে
সবেগে নিজাভিমুখে কত ব্যথাভরা বুকে
এ যে গৌরলীলার গূঢ়তত্ত্ব অভিব্যক্ত।
চূড়াগ্রে বালগোপাল দর্শন করুন
আর এই মধুর লীলা স্মরণ করুন।"

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যলীলা ❑

মহানাম নাট্যসংস্থার ২য় নিবেদন
'নব গৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দর' — মহরৎ অনুষ্ঠানে আশীর্বাণী

লীলাকে অভিনয় করা বহু প্রাচীন ধারা। যাঁরা লীলাভিনয় করতেন, তাঁরা সাক্ষাৎ মনে করেই করতেন। বৃন্দাবনে রাসে ছোট ছেলেমেয়েরা রাধা সাজে, কৃষ্ণ সাজে। অভিনয় কালে অভিনেতাদের গুরুদেবও থাকেন। তারা গুরুকে গড় করে প্রণাম করেন। দর্শকরা অভিনয়কালে মনে করতেন সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করছি। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র কাঁদছেন। একটি লোক মঞ্চে বলছেন, 'আপনারা গোলমাল করবেন না, ভাগবান কাঁদছেন।' এতে এত গভীর আবেদন ও অনুভূতি ছিল যে প্রত্যেকটি লোক স্তব্ধ হয়ে গেল। বয়স্ক লোক নিয়ে অভিনয় করিয়েছেন — রামদাসজী। সেটা নদের নিমাই। তাঁর সঙ্গে বসে আমিও দেখেছি লীলাভিনয়। এ বই প্রায় বিশ বছর সফলতার সাথে হয়েছিল। ভগবানকে লীলামঞ্চে আনা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। খ্রীষ্টান মঞ্চে দেখা যায় না। যীশু রঙ্গমঞ্চে আসেন না। মহম্মদকেও আনা হয় না। লীলাকে সাক্ষাৎ দেখি, নিছক অভিনয় দেখি না। যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের যাঁরা শ্রবণ করেন তাঁরা রসাস্বাদন করেন। যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদেরও চরিত্র স্টাডি দরকার। নাটকে শ্রোতৃ-মনোরঞ্জনই বড় কথা

নয় — শ্রোতার মনে লীলার আবেদনটি জাগানোটাই মূল কথা। এটাকে মনে রেখেই নাটক লেখা, অভিনয় করা ও পরিচালনা করা দরকার। তাই যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের ঐ চরিত্র ধ্যান করা দরকার। ❑

** 'আঙ্গিনা'। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 'নবগৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দর'। রচনা ঃ শ্রীমান পথিক, পরিচালনা ঃ শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী। পরিবেশনা ঃ মহানাম নাট্যসংস্থা।*

শিকাগো ভাষণের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় ৩য় মানবধর্ম সম্মেলনে আশীর্বাণী

আগরতলাবাসী সজ্জনবৃন্দ করকমলেযু —

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অপার করুণায় রাজধানী আগরতলায় প্রতি বৎসর যে বিরাট নগরকীর্তন হয়, তাহা বিশ্বজীবের পরম কল্যাণ আধায়ক। উত্তরোত্তর আগ্রহ উৎসাহ ভক্তসংখ্যা বর্দ্ধিত হউক — ইহা একান্তভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা। সংকীর্তনপিতা শ্রীশ্রীনিতাই-গোরাচাঁদ চির জয়যুক্ত হউন।

তাং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ — ভক্তপাদরজঃ প্রার্থী

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন — সতত সেবাব্রতী

রঘুনাথপুর, কলিকাতা - ৫৯ — **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**

'দৈনিক সংবাদ', ক্রোড়পত্র, পৃ.৫, আগরতলা, ২৫ ২ ১৯৯৯

শুভেচ্ছাবাণী

শিষ্য লিখিয়াছেন শ্রীগুরুদেবের মহত্ত্বের কথা। গুরুদেবের গুরুদেব নামসাধক শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ। এই গ্রন্থের কোন সমালোচনা চলে না। এমন সুন্দর পুরুষের ভজন ধারায় সবই সুন্দর। আস্বাদন করিতে হইবে আনুগত্যে। তবেই মধুক্ষরা মনে হইবে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

জয়তু বন্ধুহরিঃ

'বিশ্বধর্ম'—নিবেদন

কবিরাজ যোগেন্দ্রকুমার ছিলেন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অন্যতম। প্রথম জীবনে তিনি স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তি না থাকায় জীবন ছিল রসহীন। ভগবানের লীলায় বিশ্বাস ছিল না। কাহারও গৃহে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিলে উপহাস করিতেন।

পর জীবনে আসিল ভক্তির প্লাবন। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম কৃপার সমুদ্রে অবগাহন করিয়া কবিরাজ মহাশয় খাঁটি সোনা হইয়া গেলেন। একপ্রকার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় 'প্রেমযোগ' নামক সাত-আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিরাট গ্রন্থে প্রেমতত্ত্ব, ব্রজতত্ত্ব,

গৌরকথা ও বন্ধুকথা অতি সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। এতদ্ভিন্ন "বন্ধুতত্ত্ব-চন্দ্রিকা" "নবযুগের সাধনা" প্রভৃতি গ্রন্থরাজি তাঁহার গভীর, রসানুভূতির সাক্ষ্য বহন করে।

বাংলা ১৩২৮ সনের আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীপ্রভু মহাদশা গ্রহণ করিলে যখন তিনি প্রাণের দেবতার বিরহে হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিয়া এই বিশ্বধর্ম রচনায় ব্রতী করেন। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে মহীয়ান্। পাঠে বিশ্বজীব ধন্য হইবে এই আশায় সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর পরে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট যোগেন্দ্রকুমারের পূত আত্মা তৃপ্তিলাভ করুন। বিশ্বে নব অবতারীর প্রেমধর্ম স্থাপিত হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, ১৩৬৫

কৃপাপ্রার্থী দাস—
মহানামব্রত ❑

* 'বিশ্বধর্ম'। কবিরাজ যোগেন্দ্র কুমার সরকার। মহানাম সম্প্রদায়। মহাউদ্ধারণ মঠ।

'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম'—দু'টি কথা

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অনন্ত করুণার প্রস্রবন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর স্বরূপে মূর্তিমন্ত। কৃপা-সমুদ্রে সদা নিমজ্জমান থাকিয়া তিনি যে মধুবর্ষী পদগুলি রচনা করিয়াছেন তাহা তুলনাহীন।

গানগুলি মুদ্রিত হইল যাট্ বৎসব পরে বটে, কিন্তু অগণিত ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে গানগুলি চিরপ্রাণবন্ত হইয়া রহিয়াছে। ভোগারাত্রিক প্রতিদিন সহস্র সহস্র গৃহে গীত হয়। প্রভাতী জাগরণী প্রতিগৃহে প্রতিদিন আস্বাদিত হয়। "জয় সুন্দর, লীলারসময়", "জয় জগদ্বন্ধু, হরি কৃপাসিন্ধু", প্রভৃতি কতিপয় গান মন্ত্রের মত উচ্চারিত হয়। প্রতি ভক্তগৃহে বিরাজিত "বন্ধু কে?" গ্রন্থটিও এই গ্রন্থের কতিপয় গান লইয়া গ্রন্থিত।

"বনের রাখাল সুন্দর কানাই", "চির শান্তিসায়রে সিনান করিবি," "যে দিকেতে চাই সেদিকে বন্ধু", "মধুর নিশি ভাবহ বসি, "একাধারে ভাই পূর্ণলীলা' প্রভৃতি গানগুলি সৌন্দর্যে মাধুর্যে অনবদ্য। বন্ধুপদাশ্রিতগণের নিত্যস্মরণীয়—অতি স্বাদু পরম জীবাতু।

শ্রীপাদের অপ্রাকৃত এই পদসমূহ সকলের কণ্ঠহার হউক।। স্বকীয় উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে থাকুক। নানাস্থানে ছড়ানো কতিপয় গান যুক্ত করিয়া পুষ্পস্তবকটি পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ব্রজগৌর মিলিতস্বরূপ বন্ধুহরি জয়যুক্ত হউন। মহানাম সম্প্রদায়াচার্যবর্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী জয়যুক্ত হউন।

দাস—মহানামব্রত

* 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম'। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। ২য় সং ১৩৮৩

'লীলা-স্মরণিকা'—গ্রন্থ পরিচয়

এই গ্রন্থখানি কতিপয় গানের সমষ্টি। গানগুলি সবগুলিই কীর্তনযোগ্য কীর্তনীয়ার। মহানাম সম্প্রদায়ের সেবকগণের বিশেষভাবে আস্বাদনীয়।

এই গ্রন্থটিতে আছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের লীলা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের লীলা ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলাকথা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনন্ত লীলা। তন্মধ্যে রথযাত্রার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত যে-সব লীলা তাহাই আছে। রাঘব পণ্ডিতের ঝালি-সমর্পণ, গুণ্ডিচামার্জন, রথাগ্রে কীর্তন, জগন্নাথের আগে শ্রীরাধারাণীর ভাবে গৌরসুন্দরের আক্ষেপ অনুরাগ কীর্তন, টোটাগোপীনাথে নিতাই-গৌর-গদাধর তিন প্রভুর মধুর ভোজনলীলা ইত্যাদি অনেক লীলা স্মরণ আছে। ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথের সময় পুরীধামে গিয়া এইসব গানগুলি পরমানন্দে আস্বাদন করেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিতাইগৌরের বহু লীলামাধুর্য স্মরণাত্মক গান, স্বয়ং প্রভুর লেখনীপ্রসূত গান অনেক আছে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী কুঞ্জদাসজীর রচিত আস্বাদনীয় শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর রূপলাবণ্য লীলা সম্বন্ধে অনেক পদ পদাবলী আছে।

এই গ্রন্থে আব একটি নূতন বিযয়, বৈষ্ণবীয় ভাযায় তাকে বলে শোচক কীর্তন। যে সকল অধিকারী ভক্তবৃন্দ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিযাছেন, তাঁহাদের তিরোভাব তিথিতে তাঁহাদের রূপ-গুণ লীলা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়া সকলকে আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করা হয়।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের বাল্যবেলার পালনকারিণী মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী দিগম্বরীদেবীর শোচক কীর্তন আছে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, কুঞ্জদাসজী, গোপীবন্ধুদাসজী ও প্রেমদাসজীর শোচক আছে।

আমার লেখা একটি ছোট গ্রন্থ আছে 'বন্ধুস্মরণমঙ্গল'। উহাতে সমগ্র প্রভুর লীলা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বর্ণিত আছে, অনেক ভক্ত কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্য পাঠ করেন। উহাতে আখর যোগ করিয়া কীর্তন করিবার সাধ জাগিয়াছিল কীর্তনীয়া শ্রীপাদ গোপীবন্ধুদাসজীর। তাঁহার নিজের আস্বাদিত আখর সংযুক্ত করিয়া সেই স্মরণমঙ্গল গ্রন্থখানি এই গ্রন্থ সঙ্গে যুক্ত করা আছে।

এই গ্রন্থখানি রসের আকর। নিত্য পাঠে আনন্দ, কীর্তন করিতে আনন্দ, কীর্তন শ্রবণে ততোধিক উল্লাসময় সুখের উৎস। গ্রন্থখানি ভক্তগণের কণ্ঠহার হউক। জয় জগদ্বন্ধু।

সম্পাদক—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'লীলাস্মরণিকা'। সংকলন ও সম্পাদনা ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ১ম সং ১৯৮৫। ট্রাস্ট।*

'বন্ধুকরুণাকণিকা'—এক বিন্দু

"বন্ধু-করুণা-কণিকা" সত্য সত্যই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অপরিসীম করুণা-সমুদ্রের একটি মধুময়ী বিন্দু বা কণিকা। বাল্যে আমাদের জীবনের উপর এই কণিকার প্রভাব ছিল গভীর ও দূরপ্রসারী। কৈশোরের প্রথম উন্মেষকালে এই গ্রন্থরত্ন হাতে না আসিলে জীবনস্রোত কোন্

ধারায় বহিয়া যাইত কে জানে?

এ কথা কেবল আমার একার নহে। আমাদের মত বহু বাল্যকৈশোরের সঙ্গমে পথহারাজনকে গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ফরিদপুর আঙ্গিনার রজে আনিয়া ফেলিয়াছিল এই করুণা-কণিকা। ইহা দিনের পর দিন দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই কণিকার বিতরণকারী মহেনদাকে দর্শন করিবার পূর্বেই আমরা অনেকে ভালবাসিয়াছিলাম শুধু এই ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যস্থতায়। মহেনদার ব্যক্তিত্বে যে মাদকতা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মনে হয় তাহা তাঁহার এই 'কণিকা'তেও নিহিত আছে। একথা অনেকটা সত্য যে, বর্তমান কালের সবুজ দল চল্লিশ বৎসর পূর্বের মত ধর্মলোলুপ নহে। তাহারা যতটা ধর্মপ্রবণ, তদপেক্ষা বহুলাংশে অধিক রাজনীতি প্রবণ। তথাপি এই গ্রন্থের মহিমা আজও অক্ষুণ্ণ। এই বিশ্বাসে বহুকাল পরে ইহার প্রকাশ কার্যে ব্রতী হইলাম। এই গ্রন্থে-বন্ধু-কৃপা-মহাসিন্ধুর বিন্দু যেন জীবন্তভাবে প্রকট। ইহার মাধ্যমে গ্রন্থকারের শ্রীবন্ধু-অনুরাগের অপরিহার্য ছোঁয়াচ সকলেই অনুভব করুন, এই প্রার্থনা বন্ধুপদে। জয় জগদ্বন্ধু।.

জয় মহেন্দ্রজী।

দাস—মহানামব্রত ❑

"প্রাণারাম দাদার স্মৃতিমন্দিব"
শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন
ফরিদপুর, ১৩৬৫

* *'বন্ধুস্মরণ কণিকা'। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। শ্রীঅঙ্গন, মহানাম সম্প্রদায়। ১৯৯৩, দঃ কলকাতা।*

জয় জগদ্বন্ধু

শুভাশীর্বাদ

মহানাম সেবক সংঘ দক্ষিণ কলিকাতার শাখা প্রতিবছরই প্রভু জগদ্বন্ধুর করুণা স্মরণে উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। উৎসবে আমি একবার যোগ দিয়াছিলাম, বেশ আনন্দ হইয়াছিল।

উৎসব লোকে কেন করে, উদ্দেশ্য কী, জানিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করা উদ্যোগী মনের কর্তব্য। উৎসবের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের কথা-গাথা আলোচনার মাধ্যমে নির্মল আনন্দের উপভোগ, প্রতিবেশী প্রিয় সজ্জনবৃন্দ লইয়া। উৎসবের জীবনী শক্তি হইবে উদ্যোক্তাগণের একপ্রাণতা, আনন্দের নির্মলতা রক্ষা। শ্রীশ্রীপ্রভুর করুণায়—দক্ষিণ কলিকাতার ভক্ত-সজ্জনবৃন্দের এই অনুষ্ঠান সুন্দর ও সফল হউক। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহানামের জয়-জয়কারে পূর্ণ হউক সকলের অন্তর ও বাহির।

শুভানুধ্যায়ী—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ❑

* *'বন্ধুস্মরণিকা'। ১৯৯৩, দঃ কলকাতা, মহানাম সেবক সংঘ।*

'দুই মহাকাব্য'—অভিমত

জয় জগদ্বন্ধু

শ্রীমান শ্যামল,

আশীর্বাদ নাও। তোমার 'মহাভারতের খোঁজে' ধারাবাহিক নিবন্ধ 'দিব্য দর্শনে' আমি পড়িয়াছি। সবটা পড়া হয় নাই, অনেকটা পড়িয়াছি। আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, তাই তোমাকে রামায়ণও লিখিতে বলিয়াছিলাম। রামায়ণ মহাভারত একত্র করিয়া বই আকারে বাহির করার সংকল্প লইয়াছ। এই বইয়ের চাহিদা হইবে। যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহাদের কল্যাণ হইবে। এই দুর্দিনে সভ্যতার একটি জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে—ইহা নবযুগের শুভলক্ষণ। সকল মালিন্য, ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভারতের সত্য সভ্যতা যাহাতে আবার জাগে সেই উদ্দেশ্যে তোমার আমার সকলের একান্ত চেষ্টা এখন কাম্য। তোমার বই সকলের মঙ্গল-বিধায়ক হউক। মানুষ ভারতকে প্রকৃত ভালবাসিতে শিখুক। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'—আবার জাগিবে। প্রভু জগদ্বন্ধুর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইবেই। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—

"এতদ্বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আ যত্তে ঘোযামুত্তরা যুগানি।"

—এইবাণী উত্তরযুগে ঘোষিত হইবেই।

প্রভুর আশীর্বাদ জানিবে।

শুভানুধ্যায়ী
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ❑

* *'দুই মহাকাব্য'। শ্যামল দত্তচৌধুরী।*

'শক্তিভাবনা'—আশীর্বাণী

অধ্যাপক ড. কামাখ্যাচরণ রায়ের লেখা 'শক্তিভাবনা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিলাম।

বাংলাদেশে বৈষ্ণব অপেক্ষা শক্তির সংখ্যা বেশী। কিন্তু শক্তি তত্ত্বের আলোচনার গ্রন্থাদি বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোচনার অপেক্ষা অনেক কম। বৈষ্ণব-সজ্জনেরা শক্তিতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। কিন্তু শক্তিবাদের দশমহাবিদ্যার বিশেষ কোন তাত্ত্বিক আলোচনার গ্রন্থ নাই বলিলেই চলে। কালীমাতার পূজা দেশভরা। কিন্তু কালীতত্ত্বটি যে কী, এ-বিষয়ে পূজকদের শতকরা নববই জনই অজ্ঞ। ইহা অতীব বেদনাদায়ক। তত্ত্বজ্ঞানহীন পূজকের পুতুলপূজা বলিয়া নিন্দা করাকে অযুক্তিকর মনে করি না। হিন্দুদের পুতুলপূজক বলিয়া নিন্দাকে অপনোদন করিতে হইলে শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রয়োজন।

অধ্যাপক কামাখ্যাচরণ 'শক্তিভাবনা' গ্রন্থে চণ্ডীর দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি শক্তিগণের যে গভীর আলোচনা করিয়াছেন তাহা শুধু প্রশংসনীয়ই নহে, বিশেষভাবে হিন্দু নর-নারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। শ্রীকামাখ্যা চরণ তাঁহার গ্রন্থে কালী, তারা ও ষোড়শীকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ

বলিয়াছেন—ইহা অভিনব সংবাদ। এই তত্ত্বগুলি স্থাপিত হইলে বেদান্তের সঙ্গে চণ্ডীতত্ত্বের এক মহাসামঞ্জস্য হইয়া যাইবে।

দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকের অঙ্গেব সাজসজ্জা অলঙ্কারাদি অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যেকটি বিষয়ের অতি চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অসুরের সঙ্গে মায়ের যুদ্ধের সম্মুখীন রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ধূম্রলোচন ও চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতির আসুরিকস্বরূপ কী, তাহাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের প্রথম চরিত, মধ্য চবিত, উত্তর চরিতের বিশদ আলোচনা করিয়া যুদ্ধেব মধ্যেও যে গভীর তত্ত্ব সন্নিহিত আছে তাহা শাস্ত্রীয় আলোকের ও শাস্ত্রীয় বিচারের তীক্ষ্ণতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমানে সমাজ জীবনে নৈতিক যুদ্ধময় ভূমিকায চণ্ডী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

আদ্যাশক্তিব কৃপায় তাঁহার গ্রন্থেব সুষ্ঠু প্রচার কামনা করি। মাতৃকৃপায় তিনি বলীয়ান হউন। পথভ্রষ্ট যুবকযুবতীবা সত্যোন্মুখী হউক।

জয় জগদ্বন্ধু হবি।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।[1]

[1] *'শক্তি-ভাবনা'। অধ্যাপক ড কামাখ্যাচবণ বায, কল্যাণী। মাঘীপূর্ণিমা ১৪০৫।*

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ড

ইংরাজী রচনা বিভাগ

SHREE MAHANAMBRATA PRABANDHABALI (II)

ENGLISH SECTION

The *Vedas*–Its Significance and Authority

The *Vedas* are the revelation of the Absolute Being, *Brahman*. He has twofold aspects–*Para Brahman* and *Shabda Brahman*. *Para Brahman* is the uncaused cause of the Universe, whereas *Shabda Brahman* is the eternal and original fountain-head of all words and concepts. *Shabda Brahman* aspect may be compared with the Logos theory of the Greek culture. This theory was later inherited by the Christian *Bible* and is to be found at the beginning of the Gospel of St. John in the *New Testament* : "In the beginning was the Word and the Word was with God, and the Word was God."

Greek and Christian Logos (in English as Word) and Vedic *Shabda Brahman* are one and identical concepts, expressed differently. In the *Upanishads*, *Brahman* is aimed at by the term *AKASA*, almost the same as Ether of the Physical Science. *Akasa* is the abode of countless vibrations (*spandana*) which is the source and sustainer of *Shabdas* and words. The *Vedas* are identical with eternal *Shabda*. Four *Vedas* are the different manifestations in different time and space continuum.

In all matters whatsoever of the Hindu life, the *Vedas* are the highest authority. The authoritativeness of the *Vedas* is absolute and independent. There are two other sources of knowledge, Perception and Inference. They are relational and dependent, and the information of the 'sensible' world only is brought by them. The knowledge of the super-sensible spiritual world is carried by the Vedas alone.

One who longs to realise anything of *Para Brahman* must seek shelter in the *Shabda Brahman*. One knows nothing of the Absolute *Brahman* unless the *Vedas* reveal the same to him. When the people elsewhere in the world were steeped in the darkness of ignorance, the serene light of the *Vedas* shone brightly in India. The *Vedas* are the most monumental and oldest work in human civilization. The *Vedas* are the digest of all branches of knowledge. The sanskrit root *"Vid"* from which the word *Veda* is derived, means "to know". In the eyes of the Hindus the *Vedas* are the highest of all knowledge. The hymns are not compilations but inspired revelations. The hymns of the *Vedas* were not originally written down but were handed down from preceptor to disciple and hence the name *Shruti*. The *Vedas* contain the germ of the whole of the later development of Indian religion and philosophy and also shed light upon the evolution of the mankind throughout the centuries. Let us try to realise the greatness and profundity of the *Vedas*. ❒

'Veda Bharati', Veda Parisad, C. R. Park, New Delhi, August, 1997

THE *VEDAS* AND THE *TANTRAS*

The Indian Culture, as a composite whole, is based on two mighty authorities of unassailable significance – the *Vedas* and the *Tantras* – *Nigama* and *Agama*, as they are otherwise designated, both connotating the same meaning – the ultimate source of truth.

Vedas constitute the fountainhead of spiritual knowledge. and Tantras the storehouse of ritual precepts. *Tantrik* rituals have deep ontological meaning, metaphysical significance and emotional element which touch one's heart and transform one's being.

All human activities, to be meaningful and real, must be based on well-established principles. In the *Vedas* is revealed the eternal and universal laws of spitit and in Tantras, the procedure of Action is pre-eminently dealt with.

The word *"Veda"* literally means knowledge. The *Vedas* consist of compilation of the words of knowledge and wisdom. They are considered as *Apaurusheya*, literally, without any *"purusha"* or person being the author thereof. It is universally believed by all Hindus that the Vedic conclusions about the conception and nature of God and His relation to man and the universe were eternal and immutable truths, arrived at not by mere exercise of mental powers of the sages but through communion with God Almighty.

Vedas tell us what to know and why. *Tantras*, which are also believed to be of divine origin, inform us what to do and how. The former constitute philosophical and the latter scientific outlook of the ancient seers of India.

To make our social life alive and significant, the relation between truths of philosophy and our daily life must be intimately co-ordinated. *Vedas* give us ultimate truth which is the truth of Spirit and in the light of that Spirit our daily life has to be refined; and here Tantras show the ways through mantras sacrifices, rituals, worship and devotion. The *Vedas* aim at metaphysical doctrine whereas Tantras bring forth scientific methodology to actualise the underlying principles and the two together, supplementing each other constituted the philosophy of life for the people of India at large.

SYNTHESIS

Vedas and their essence *Vedanta* may be called philosophy and *Tantras* the sciences of the ancient Hindu Seers and this civilisation is essentially the outcome of their synthesis. Both philosophy and science endeavour to determine the inner nature of reality. Vedanta philosophy starts with the thinking self. *Tantras* begin with the objects of thought. *"Atmanam Biddhi"*—"know thyself"–sums up the essence of Vedantic teachings. Within man is the Spirit

which is the centre of everything. Though scientific in their outlook *Tantras* also developed a philosophy of their own. In the Western World today there is an attempt towards the Unity of Sciences and look-out for a philosophy thereof, which may be named philosophy of the sciences. *Tantras* tried to develop a metaphysics in similar fashion. The Supreme Reality of *Vedanta* is Brahman the Absolute, that of *Tantras* is *Sakti*, the Primordial Energy.

Brahman is unknowable, unapproachable, inactive, timeless static reality. It is formless undifferentiated and transcends all our experiences. *Sakti* of Tantras is the matrix, the Mother of all that exist in the Universe. *Sakti* is ever active dynamic reality and is the source of creative, preservative and culminative principle and power of the cosmic process. *Sakti* is an all-conscious personality having unfathomable love *(Kripa)* for the creatures and the Creation. Unlike *Brahman* of *Vedanta*, *Maha Sakti* is a knowing, loving and understanding person. If *Brahman* is a Static transcendental finality, *Sakti* is a dynamic immanent reality. They are supplementary and that is why Sakti has been called the *"Patta Mahisi"*–an intimate consort of the Absolute Brahman. This synthesis of Brahman and Maha Sakti of One-in many and Many-in-one is the key note of Indian culture as a whole.

Two illustrious books, small in size but great in significance, the *Gita* and the *Chandi* epitomise the essentials of the *Vedic* and *Tantric* schools of thinking. The main subject matter of the *Chandi* is ostensible three great warfares. In the foreground of the *Gita* stands also a battle field. The war is between the mortal beings on the soil of the earth.

The wars of the *Chandi* on the other hand are waged between the Debas and *Ashuras* existing in the mental and moral plane. All human wars are indeed deeply rooted in a moral and psychical plane.

The *Devas* of the *Vedas* also stand for higher mental faculties. *Surya* stands for Cosmic Intelligence. *Agni* and *Soma* symbolise Cosmic will and feeling. Liiwise the *Devas* of the *Tantras*, particularly those who pay yearly visit to us, the mortals, with the Divine Mother Herself in the months of Aswin are also symbolic. *Kartik* stands for struggle and

for success. Lakshmi and Saraswati symbolise wealth and wisdom. Ashuras stand for passion and carnal desires.

Let us welcome the Divine Mother, the Consort of *Siva*, the Absolute, with her family the Gods of struggle and success the Goddesses of wealth and wisdom in order to destroy the demonic elements in us and in our society at large. ❑

Message

Mahauddharan Math
59, Manicktala Main Road
Calcutta - 700054

26th June, 1982

"I am glad to learn that the annual celebration of the *Veda Parishad* is going to be held in the first week of July next. Only the other day it took its birth before my humble presence and that within this short time it has appreciably gained vitality and manifested happy indication of future prospect is certainly a fact due to the grace of the Lord Almighty.

The *Veda* is undeniably the perennial source of all knowledge that ever existed or should come to be. Deviation from the Vedic path is the root cause of our national decay and downfall. And if again the lost wealth is revalued and installed in the citadel of our heart, our culture will shine like a beacon for the rest of World, heading towards abject materialism borrowed and swallowed from the Western Civilisation.

Let the Parishad help us and our brothers and sisters to embrace Vedic Idealism and regain our lost spirituality." ❑

* *'Veda Parishad', Chittaranjan Park, New Delhi, 1982*

METHODOLOGY

Vedanta Philosophy & Indian Idealism

Idealism is a term of European philosophy. If I have to use it in connection with Indian thought, it is necessary that I re-define it or in other words, I want to say what I mean by the term Idealism when I intend to use it as alternative of *Vedanta* philosophy.

By idealism I mean that view of philosophy which holds that the highest values of human life are inseparable from what is truly real. The most supreme value, according to Indian Idealism is one and the only one having threefold manifestation – *Sat-Chit-Anandam* i.e. Existence, Consciousness and Bliss or as expressed differently in some Upanishads – *Satyam-Shivam-Sundaram* i.e. Truth, Goodness and Beautiful. They are really one, and the ultimate reality is nothing but this. This doctrine has been set forth in the *Upanishads* in very broad and flexible terms. The *Vedanta* is the essence of all *Upanishads*. It is

* *Excerpt from Mahanambrata Brahmachariji's notebook, Chicago, before submission of thesis to Chicago University, in between 1934-37*

therefore idealism par excellence.

The great realistic systems of Hindu Thought, however, are by no means in any serious disagreement with the fundamental standpoint of *Vedanta*. They are rather supplementary, preparing, as they do, a solid ground on which the great edifice of the *Vedanta* philosophy is being built. *Vedanta* teaches that the universe has a meaning – it has a value. It is the ideal values that constitute the dynamic creative power of the cosmic order. The universe is a great system of ends, having the highest value living in it as its operative force. It is that one – the Supreme Person, who is expressing Himself in and through this manifoldness of experiences and in Him all these diversities are transmuted. In the light of the great purpose of Him, the entire universe becomes interpretable. *"Darsana"* – which is the word for philosophy in Sanskrit language, means a "Vision" of that ultimate Reality and a philosopher is one who has through contemplation, attained what might be called the spiritual dimension of his self.

Here, I intend to discuss simply the methodology of the *Vedanta* philosophy. By methodology, I mean, means of knowing, instrument of investigating. I want to ask and answer what is it that Vedantists hold to be the tool of discovery of the ultimate truths of metaphysics.

The spirit of a system of thought is realized, I believe, when its methodology is adequately understood. This method, I would like to consider in the light of European thought by way of contrast and comparison so that it becomes intelligible to the students of western philosophy. Philosophy, as I have already said, is a matter of insight, an art of discovery, to a Hindu, rather than a speculative system of thought and this discovery is to be achieved by *Aparoksha-anubhuti* – non-mediate creative intuition. This kind of intuition gives us such an overwhelming vision of reality as possesses unquestionable certainty but lacks adequate expressions in the form of subject-predicate, and therefore takes recourse to myths and symbols. It is "creative" because in it the mind unites itself with the object and grasps it in its fullest manifestation. It is non-mediate, because in it the mind becomes aware of the "Real" in its very intimate individuality. It is a power of the human soul, which is much more interior than intellect. Soul attains it when she is free from the

influence of the speculative thoughts and past impressions. For this human soul requires prolonged training. Thus the "tending" of self and the Study of Philosophy culminate in the attainment of identical goal, namely "Vision of the Infinite".

This thorough emphasis on the contemplative intuition and the declaration of the utter helplessness of discursive thinking are the distinctiveness of Indian Idealism, which marks it off from the major part of European thought that lays great stress on mechanical science and logical analysis.

Pythagoreans used to hold that mathematics can give them some clue to metaphysical realm. Socrates believed that every real must have a definable form. Plato said that even God geometrizes. For Aristotle, man is pre-eminently a rational animal. To Descartes clearness and distinctness are the criteria of truth. Logical and mathematical relationships are fundamental in his system of universal concepts of reason. Spinoza utilizes geometrical method even in his Ethics. Leibniz, who is the father of modern symbolic logic maintained that human knowledge is confused whereas, divine knowledge is clean and that ideal can be reached through something analogous to logic and mathematics. Kant was seeking for a priority synthetic judgment. He was trying hard to make philosophy as demonstrative and accurate as the empirical sciences. And to crown all, Hegel gave royal throne to logic. To him logic is no mere theory of thought but an account of the actual process of the reality. Rational is real and real is rational. Logic, for Hegel is the life of reality, which is therefore essentially knowable in logical way. All present day realists of Europe and America are worshippers of logic and scientific method.

Whereas, for the Upanishadic Seers, *Anubhava* or integral experience is the highest kind of knowing, for Sankara, *Tattwa-Jnana* or intuitive insight is the only real apprehension. For Ramanuja, *Brahma-sakshatkara* – the vision of reality is not logical knowledge or sensuous perception. For the Buddhists, neither *Sajnana* – sense perception, nor *Vijnana* – discursive reasoning, but *Prajna* – creative insight is the only way to apprehend ultimate truth. Patanjali, Kapila, Buddha all talk about the futility of speculative reasoning in the realm of Metaphysics. *Samadhi*, *Kaivalya*, *Nirvana*, all point

towards this contemplative way of knowing the supra-physical reality. Says Manu –

"Pratyakshyenanumitya ba yastupayo na budhyate
Ebang vidanti vedena tasmaat Vedasya vedata".

"Veda is veda, and authoritative only because it embodies the experiences of the Seers, such experiences, as, are not attainable by sensation or reflection".

The keynote of Indian Idealism is this. Man has a soul. Soul can attain everlasting Beatitude, and that is the greatest thing of life to attain. That Beatitude is the essence of the Ultimate Reality. Philosophy is that which shows the way. But the way is such that you cannot think through it; you have to live by it. And that living consists in contemplative feeling.

Now, let us see exactly what it is that they meant by intuitive feeling (anubhava). There are, undoubtedly different ways by which we come in contact with the reality in and about us. First of all, we know things by *"Pratyakhsa"* – sense perception. Everyone understands it. Sense perception is immediate. To fancy that there is an idea intervening led us to idea-ism and Solipsism. Vedanta philosophy never committed such fallacy. Secondly, we know by logical analysis. By this process we clarify and classify our knowledge, but do not add an iota to its content any more than we add anything to the nature of space by studying geometry. We combine and re-combine what we already have from the Sense Perception. That this logical thinking is a method of discovery is again a fallacy which underlies European rationalism to which again Vedantic Idealism is not committed. That is why Hindu thinkers call this kind of knowledge – *"Anu-miti"*, meaning "measuring" i.e. measuring or generalizing after the context has been already received. They sometimes call it *"Vijnana"* which means modified knowledge, indicating that the function of logical thought lies in synthesizing what is already given. This power however is mind's own power. Now then, there is a third kind of knowledge called *"Aparokshanubhuti"* – non-mediate intuitive feeling which is the highest possible kind of knowledge, because it gives us overwhelming certainty due to its non-mediateness and unlike sensation it is integral and synthetic. It has the merits of both previous kinds of knowledge but has defects of none. Clearness of logical thought and directness of perception find their ideal

unification in this kind of apprehension. And for this reason it is considered to be the best means for the understanding of the ultimate reality which is the object of all philosophical investigation – so says Vedantic Idealist.

It will now be interesting if you look once more at the European philosophers and single out how many of them realized and utilized the significance of this creative knowing. We will find out that some of them simply utilized it without realizing its value. For, there is no doubt about the fact that all great thinkers make use of this knowledge whether consciously or unconsciously, because no genuine discovery or creation is possible without it.

Socrates used to hold the view that the deepest convictions of life do not come from observed facts or thinking but from axioms and intuitions. For Plato, true knowledge is "Reminiscence". It is the memory of direct vision. The idea of Good which is like the Sun, the source and cause of all existence, does, to Plato, come not from without nor from reason but from Dialectic which is the soul's talking to itself. It is won and felt and not derived or handed down. Aristotle, though a great naturalist had still platonic inheritance with him. He talks about active reason in few broken words in which the nous creates its own object. In his ethics too he conceives of contemplative life as the highest, which he thinks similar to divine life – thinking of thought – somewhat like Plato's Dialectic – the creative intuition. First principles come, to Aristotle as well as to Plato, through the intuition of the nous. The famous ontological argument of Anselm is an announcement of intuition. It is defective if taken as a logical inference. "Cogito ergo Sum" of Descartes is no syllogism, but a statement of self-intuition, on which his whole structure is built, whether he knew it or not. Spinoza, in his ethics speaks very clearly of intuitive knowledge. Knowing things as does God, from within, by direct revelation, by immediate union with the thing itself – is to him the highest grade of knowing. Highest possible peace of mind, Spinoza believes, arises from this type of apprehension.

To Kant, reason is the highest faculty, but he finds that metaphysical truths are not open to reason. He left them practical reason, in a very precarious position – as postulates of moral consciousness. We are asked to

work as if they exist. Kant talked of three ideas of reason - Soul, World as a whole and God. But unfortunately he failed to see that these are not empty principles or fanciful postulates but necessary truths and back-bone of the entire structure of experience. He was doubtful about the capacity of human mind that it can soar beyond the categories of understanding and see the underlying unity as it is, - a capacity which he seems to attribute to God but denies to man, though he himself had it.

Hegel, though in many places talks against intuition, nevertheless makes use of it just the same, as I have said, no great thinker can help it. To Hegel all reality is a single organism. Reality to him is a process, in and through which the absolute spirit attains fullest concreteness. One wants to ask him, how does he arrive at this conclusion. Not by dialectic of course. For, Hegelian dialectic is a purely abstract and logical process. No one can ever reach concrete unity through this dialectic method. Only when that unity is won by some other process, one can think of its implication and significance by the logical method. Hegel's system is an announcement of great intuitive insight, but not a result of Pan-logism, though he hardly realized it. According to Bergson, reality is Duration and hence intuition and not intellect is the proper organ to grasp it in its totality. For Bradley, reality, in which all differences are transmuted is something to be "Felt" and not "Known" in conceptual thought.

Croce distinguishes intuitive knowledge from logical knowing and all artistic and aesthetic apprehensions are to him, active creation of Intuition. Prof. Whitehead's essential emphasis on Feeling is well known. Prof. Whitehead defines religion as "what the individual does with his own Solitariness". He thus points out that there are such things as independent and unique functioning of human mind that possess an autonomous character and brings the deepest truth of life. Prof. Hartshorne asserts that it is the "feeling of feeling" and nothing but this adequately explains the ultimate nature of our experience. Feeling of feeling is, if I understand it, the intuitive and immediate response of the whole self to grasp the integral reality as such.

Thus we see that the Intuitive insight of which Indian Idealist talked about is not at all unknown to Western thinkers. It is a matter of emphasis

only. The Vedantists made sole use of it and built their entire structure upon it, whereas most of the European thinkers incidentally valued it and made casual comments on it. Few of them, however, like Plotinus, and ''ᵇᵉʳ mystics of the same type, made thorough use of it. Indian system prescribes elaborate rules for the preparatory training of the soul.

This intuition should not be confused with imagination. In intuition there is a real that controls our apprehension, whereas in imagination, we simply re-arrange the concepts we already have and make fanciful or even useful combination. In creative intuition we discover a reality as much as we do in common perception. So, like perceptual knowledge it is objectively determined. Unlike imagination, intuition does not alter the nature and character of the reality apprehended.

This intuition is not intellect. Intellect gives us piecemeal view of the reality in accordance with our practical need, but, does not bring a vision of the integral whole in its concreteness as does intuition. Intellectual knowledge is always fragmentary and so stands in need of logical tests and empirical verification whereas intuitive knowing bears its own witness. It is an existence aware of itself, because in it the gulf between subject and object disappears. All dichotomies between reason and sense, thought and reality, action and apprehension recognizes thin underlying unity. It is both active and passive. It is the first hand direct knowledge whereas, sense perception is superficial and intellectual knowledge is symbolical.

Last of all, it is not instinct. So far as directness and spontaneity are concerned it is very similar to instinct. But the most characteristic difference between them lies in the fact that instinct is confused and irrational whereas intuition is fully conscious, more so than our scientific knowledge. There is sort of unity between subject and object in the instinctive level too, which is lost as we grow intellectually. In the supra-logical intuitive state we regain it. The integrity of child and the wisdom of wise are both combined in it. Not inertia or indifference but light and freedom are its issues.

This intuition or *Anubhuti* is a simple act of mental vision. The great illustration of such knowledge is, according to Hindu idealist, the knowledge of self, we become aware of our self, immediately by a sort of identity with

it. Self knowledge and self existence are inseparable. It is the only true and direct knowledge we possess. It is neither logical nor sensuous, but it underlies all our experiences. It is apprehended immediately and not constructed conceptually. We cannot prove it because it is the foundation of all proofs and the first principle of all natural and moral sciences. Here, if anywhere, we know the reality in its essence. So, to the Hindu Idealist, as it is to Schopenhauer and Fichte, and all mystics, the knowledge of true self is recognized to be the key to the entire realm of metaphysical truth. All judgments of value – all deepest experiences of life are based on the true knowledge of the self. Knowledge of self is therefore, the door to the temple of God. Because the great divine universal Self reveals Himself, not until one's own inner self is apprehended. This inner self is the organ, that human being possesses for God, so says Hindu Philosophy.

Thus, the search for the true knowledge of self (Atma-Jnana) became the starting point of the Indian Idealism. This constitutes therefore, the methodology of Vedantic thought.

Vedanta is written in Sutras or short aphorisms. It is compiled by Vadarayana. Scholars are of the opinion that it was composed in the period between 500 to 200 B.C. It is the essence of the Vedas & Upanishads which are at least 1000 years earlier. The teaching used to be handed down from mouth to ear through line of teachers and disciples. In course of time, due to the hugeness of the contents and reduced capacity of the retentive faculty of human being as also various other reason, the scholars stood in need of written commentary. Different interpreters gave different slant to it, which is more or less due to their personal experiences – both intuitive and environmental. Thus came into existence five different systems of one and the same teaching. The names of the systems and their respective exponents are as follows.

1. Absolute Monism *(Advaita)*.........	by Sankara..........	8th century
2. Modified Monism *(Vishistadvaita)*...	by Ramanuja...	11th century
3. Dualism *(Dvaita)*....................	by Madhava......	13th century
4. Pure Monism *(Suddhadvaita)*......	by Vallaba.........	15th century
5. Diversity-in-unity-and-identity......	by Sri Jiva.........	16th century
(Achintya-Bheda-Abheda)	& by Baladeva......	18th century ❑

Message of Dr. Mahanamabrata Brahmachari, The pioneer of the Religion of Humanity delivered on the happy occasio of Durgapuja Festival

The mundane existence of human being is replete with strife, struggle and miseries. Abject conflict amongst manifold religious and political factions has turned our mundane existence into a poisonous spot. Human beings, once maker of civilization are now heading toward annihilation.

The way out of a solution lies in the fact of our unification on the foundation of Humanity *(Manava-Dharma)*.

Let us declare to the weary world that our oneness is real and God-given, our factions are spurious and man-made.

The very consciousness of our unison must bring down Divine peace, our sanctified birthright on the sullied soil of this planet called Earth. Thus spake Prabhu Jagadbadhu, the Friend of the Universe.

Today, when barbarous acts have outraged the conscience of mankind and a threat of total annihilation is hovering upon us, we fervently pray to the Divine Mother, Durga for succour to save us from the tyranny and turmoil of national and international life of a confused world-order. ❑

The significance of Krishna Jayanti

Sri Krishna Jayanti is the celebration of the anniversary of an event that stands out for centuries as the centre of the cultural and spiritual life of *Bharatvarsha*. It brought to us one of the greatest revelations of God to mankind. For the realisation of the significance of this Divine Jayanti we must approach carefully and meditate so that we may know how this event that took place some fifty centuries ago concerns us and throws light on the socio-political and ethico-religious domain of thinking even in these days.

The confusions of the world today make a vicious circle. Man created his environment and then environment reacts unwholesomely upon him. Mankind is terribly heading towards a great annihilation by committing licentious suicide. Heart- rending cry for peace and poise is heard from all corners of this bewildered world. We have most pitifully entangled ourselves to all the worldly objects around us which are finite, transient and trifle. We have forgotten to look up to the Supreme that is sacred and singular, to tune with the infinite that is sublime and significant. And that is why we so woefully sigh and so sorely suffer.

To-day is the day of Divine descent. Today the infinite sanctified this mundane existence of finitude. The living emblem of goodness touched the polluted soil of this earth and consecrated it and opened for us the vista of love, righteousness and essential moral value. Today we must learn how to tune with the most high and do away with all meanness of heart which is a menace of human civilization. True excellence of life is never actualised unless we endeavour to realise our deepest spiritual nature through the comprehension of our eternal relationship with God. And for that we have to dive deep into the Godly life and universal teachings of Sri Krishna in the Gita.

We may be living at one of the greatest turning points of world history. In order to create a new world order of truth and goodness we have to look at the great world teachers and Sri Krishna, being the sweetest and best of all, stands out as a singular personality of all-round perfection. ❑

The Message of *Janmastami*

Every year *Janmastami* comes heralding a great message of Lord Krishna to the peor˙ ı..ınbourine, a shallow single headed drum with jingles, is played, the Zodiac signs turn, *Janmastami* is celebrated. It disappears, leaving behind a message of piety and truth to the humans.

Man is a bundle of actions and reactions. In his life's journey he realises how small he is,what a poor helpless creature he is. How many times he feels completely helpless. With this feeling a spiritual desire grows in his mind. He seeks someone else's presence for help. Virtually He is great whom he seeks. He who is full and compact, He who is the source of strength and abode of all homeless. Actually man seeks God. Truth, in fact, is the religion. In sense or out of sense, knowingly or unknowingly everybody searches for truth. But he does not find that. Many try to find God in prayers.It is not easy to find God. In the illusion of sleep, in the illusion of imagination of man God appears sometimes. But does not stay long. He disappears.Only what remains for man is disappointment.

At the doors of the embarrassed people of the world, Janmastami has its message. The *Krishnastami* of this *Bhadra* announces that, oh man, whom you are looking for, you didn't find. He is coming to find you with his arms stretched to embrace you.You turn towards Him, to find Him.

How one will run towards God, that has been described in scriptures. But how God rushes to the door of man is the untold message of Janmastami.

* *'The Bangladesh Observer', Daily News paper, Dhaca. Aug. 10, 1993, Shraban 26, 1400 B.S.*

...Janmastami reveals that today the difference between God and man has been sunk.

Today, is the day of enemy-free *Krishnastami* and the night of downpour. At the cell of Mathura jail *Bhagawan* came down brightening the lap of an imprisoned and anxious spouse. The ever unknown God extends His kindness and beholds the man in grace.

Not only that unbelievable turned into believable. Totally turned into human being, the sharer of human misery has understood his own share of love.It is an invaluable resource. It is such event to remember. Who is the messenger of these events? They say, no event rarer than this day did happen in this world. He who is the saviour of birth of the world has stepped into the earth. He who is just like the life of the world, the creature of the world has seen Him, welcomed Him, and reciprocated offering of love, in the container of heart, He has won the hearts of man. How many stories about His appearance and disappearance has been known? The best story is the story of the two songs—by standing over the world stage He has sung. One He has sung playing with the flute and the other He has sung in Holy Gita. One is from *Braja* (wandering in forest) another is in the battle of *Kuru-Pandavas*. Today is the day of listening to those songs.

In human life there are two fields–one is the field of battle, another is the field of pleasure. Everyone in the world is fighting day and night for existence. Numerous obstacles, miseries and poverty are opposing his way. Fighting with these oppositions man tries to survive. This one is like *kurukshetra* we are familiar with.

This is must. But battle is not the objective of life. Freedom from fight is objective of battle. Then mind wants to go there, where the gentle breeze blows like the breeze over river bank *'Kalindi'*. Finding dear one's happiness he gets celestial pleasure. If there was no humour and pleasure in this world, waving of lights before an image of God of love, sacrifice for love would be meaningless. Nobody would breathe and would cherish desire to live.

Being a birthless, born on this day of Janmastami, has two acts to play. One is vast Kurukshetra, the other Brindabon. The shadow of the field of the *Lila- Purushottoma* is in our short period of life. The performance of *PurnaBrahma* is the backdrop of our life. So at the stage of our mortal life there are two fields–there is struggle in open field and enjoyment and pleasure on the other. To run in these two fields the song of that great singer is of greatest need. The beauty of that song is not explainable in words. Heart is perceptible. The message what is inside the song is to be caught hold of.

The message in the song of Gita is fight not for your narrow interest but for collective interest of man. Not for expecting the result, submit all result to me. Fight always remembering me. Do not feel pride in exercising your authority. You

submit your whole being to me and be a plaything in my hand. What I make you to do, do it. Do not fear, you submit the burden of your life to me, I shall bear it. I shall save you from the mortal world. The moral message in Gita is this capital of support. No word greater than this has been sounded in the history of man. Thereafter, is the word of ***Banshori*** flute. But there is no word but only tune in it. The fountain of songs of thousands of infantry forces emanates. There is no verse in that song. Only there is untold movement of anxiety, flood of language of tune makes waves of sound of life. Man, what resource are there in the kingdom of your life the best is your blameless love.As I have given you eyes to see, ears to listen, I have given you love for making myself your own. I am a begger of your love. Remaining hidden in the heart as your sons and daughters, husbands and wives and all dear ones, secretly I myself enjoy your love. I am the dearest to you. Love is inside me, you can understand that. So as the realm of pleasure, you get the splash of sorrow. I also have come down in the prison of your sorrow, you carried me at the home of Nanda Ghosh. My beauty lies in the expanse of blue sky. My colour is in the darkness of the sky . My figure is in the green expanse of nature. My expression is in the blue waters of the sea. I am all beauty. I am always the verdant splendour image of sweetness, I am evergreen. Love me and become beautiful, I've come to your door. Open it and come out.

In the heart of the flute is my life's message. And it is the message of Janmastami. Let this Message enter the ears through the ages, the pleasure of what has been invited in the emotional flute are modulations of voice in music. Awake at your hearts.(He who is the image of God of these modulations he is the Nagor gallant of Nadia). With the tune of his *Harikirtan* we listen to the tune of (*Brajakunja*) celebrating life, the great composer of that song, for the grace of that Sree *Bandhu Sundar* listening to the message of Janmastami, let the creature awake. Let the Banshari flute triumph. The Significance of Janmastami. Joy Jagatbandhu. ❑

* *Dr. Mahanambrata's script has been rendrered into English by Naren Paul.*

The significance of Janmastami

Today is Janmastami, the birth anniversary of Lord Krishna and beginning of Krishnabda. This day 5211 years back an act of incarnation took place and god descended in human form on the land to establish virtue, piety and honesty. He was born in the lap of Deboki and Basudeva in the gloom of a prison cell of a tyrant king named Kansa at a moment of torrential rain inundating the earth all

* *The Bangladesh Observer, Dhaca, August 29, 1994.*

around. He lived for 125 years and it was divided into four parts–Vrindabon, Mathura, Kurukshetra and Dwarka. Krishna spent his boyhood in Vrindabon, teenage and adolescence in Mathura and from twenties until death he passed his eventful years in Dwarka and Kurukshetra and played a significant role in the battle which broke out between Pandavas and Kurus (the perpetrators of tyranny and injustice).

Krishna has 108 names and each name implies a separate identity. Besides in the description of the Geeta the holy scripture, he has been titled as "Purusottama", He the eminent and excellent human being. Bhagabot, the holy book, describes him 'as a mysterious' human. Mahaprabhu Chaitanya Deva mentioned him as "Sachhidananda", other scholars described him as "Jagatguru"

The later title is popular and is very easy to recognise him. The function of guru is to show people the path of emancipation and prosperity. Guru does this in two ways–by offering advice to his disciples and by practising rites in his own life. The solemn promise of a guru is human welfare and that was the aim of life of Lord Krishna. In Brindabon forest he has shown the heart's affection by which a kith and kin may be loved. God may also be loved. God may be a close relation. This wisdom and learning were unseen and unstunted before. By his love and care he established love for all humans. The other name of this love is God's benevolence towards mankind. In Mathura front he crushed infamous Kangsha, reconstructed the devastated kingdom of Mathura and rehabilitated those who fled for fear of Kangsha. It may be termed as the norm of society. Sree Geeta teaches us lessons from the battles of Kurukshetra. Advising anxious Arjuna as well as for the decent and peaceful living for human beings was the aim of His life. The lessons offered for men and women have been preserved for centuries.That is the virtue of the Vedas. It shines by its own lights of glory.

He taught politics to the people of Dwarka. The intention of Lord Krishna was to set up a welfare state. He was under many threats. His attempts for reconstruction were severely threatened by Jarasandha, the demon of that time. He attacked Mathura frequently. On reaching Dwarka, Krishna freed the state from disturbance and made it a welfare state. People know about his love for truth and religion in Brindabon and *Geetadharma* in Kurukshetra. Many may not know about the flurry of incidents in Dwarka. Dwarka was the kingdom of Lord Krishna. They had their education, health and above all good character. Men and women were civilised. Greed and injustice could not touch them. There was no destitute person there. The word "thief" was only in the pages of dictionary. The cabinet consisted of 10 veteran persons selected by a group of people from eight sections of the Jadu clan. Saint Sandipani was the professor and patron organiser of the state of *Abantipuram*. He himself was the Prime Minister. Veteran *Ugrasena* was the king. Krishna was like a public servant who

carried out their orders. Although a scholar, he was unambitious. Without any reason he did not kill anyone. He killed Kangsha to release Ugrasena, the old father of Kangsha, from the prison and enthroned him again. By killing Jarasandha he returned the throne to Shahadeva. When Krishna was in Mathura he was quite like Ramchandra. When he was in Dwarka, he was a state organiser like Arjuna.And again when he was in *Kurukshetra*, he was calm and liberal like Yudhisthira, the eldest brother of Pandavas. When he was in *Vrindaban* he was the god of love and attraction of all eyes and mind.

The Supreme Sanctifies the Soil[1]
The Advent of the Lord

It happened some fifty centuries ago, the Supreme One descended and dwelt with us on this mundane plane. Infinite met finite and consecrated it.

About the end of Dwapara Yuga certain arrogant kings like Kansa and others were ruling the earth. The mother earth was groaning under the unbearable weight of sin..She was crying piteously, her face flooded with tears. Brahma, the creative power, took her to the Lord of the Universe and prayed to Him for her.

In the course of prayer a message was received to the effect that Hari, the most perfect one, would manifest Himself in person in the lap of Vasudeva-Devaki to dispel the darkness of sin. The deities and the holy men received the news and were wistfully waiting for the holy advent.

So did it come to pass, Vasudeva, a scion of Yadava family, was wedded to Devaki and the delightful marriage procession was passing through the capital city of Mathura. The Prince Kansa, brother of Devaki, had in his hand the rein of the steed of the chariot of the newly married couple. Mysterious are the ways of God. As the procession was joyfully approaching, a voice from the cloud announced to Kansa in so many distinct words that the eighth child of Devaki would be his slayer. As soon as the prediction reached his ears, the impatient and imposter Kansa seized a sword by one hand and his sister by her braid by another and was ready to take her life.

Vasudeva. the great, pleaded in a conciliating and consoling tone to Kansa and made him desist from killing a sister on condition that Vasudeva would put in Kansa's hand all the sons of Devaki as soon as they would be born.

Vasudeva kept his promise and so did Kansa in cool head killed every son

[1] *Amrita Bazar Patrika, August 10, 1955*

of them, six altogether. Nothing, the honest could not endure; nothing, the wicked would not do. Kansa imprisoned Vasudeva, Devaki and even his own father Ugrasena, who disliked his son's arrogance. Kansa took up the reins of the government in his own defiled hand and suffering of the people knew no bounds.

Immaculate Conception

God is not conditioned like mortal beings. He is not subject to a body of flesh and blood. His is a body of pure intelligence and spiritual essence. This eternal body He exhibited in the mind of Vasudeva with all power and glory. Imbued as he was with the glorious presence of the Lord, Vasudeva appeared inaccessible to all persons.

Then through spiritual initiation, Vasudeva transferred the Lord's essence to Devaki, who suavely bore in her mind the divine life and light. Lord's power never suffers diminution. Though omnipresent He reveals Himself in limited personality for the sake of His 'Lila' with devotees. So strangely enough, Devaki's heart became the dwelling place of the Great One in Whom all the Universe dwells. But, alas! she was not a source of delight to the people of the world at large as it should have been, since, she was imprisoned like a flame under cover.

Kansa beheld Devaki illuminating the palace with the lustre of her person. He muttered to himself "Certainly Hari is present in her womb. For, never before was she as brilliant as now!"

The auspicious moment

The auspicious moment of the Lord's descent was nearing. Every aspect of the world was favourable. The four corners of the earth were peaceful. The stars shone unobscured. The powerful planets favourably occupied high positions in the zodiac. The rivulets ran with gentle murmuring. Pools bedecked with smiling lilies. The trees and creepers decorated themselves with clusters of flowers. Bees were humming sweetly, birds were singing joyously, the wind was blowing fragrantly, the fire of sacrifice burst into flames lustrously.

At midnight in the thickest darkness on the eighth day of the waning moon in the month of Bhadra, the Lord of the Universe revealed Himself in His divinely exalted form like the full moon in the eastern horizon. The bards showered praises the Gods showered flowers. The devotees offered obeisance. The whole world rejoiced.

The divine form

The Lord of radiant charm appeared like the rain-bearing cloud. He was clothed in golden cloth of lightning brightness. His eyes of compassion were

like blooming lotus. He had four arms bearing club of justice, wheel of creation, lotus of beatitude and conch-shell of eternal logos. He had Srivatsa, on his breast. The heavenly jewel, Kaustubha, graced by His neck shone brightly. His curly locks of hair dazzled due to invaluable gems of the crown and ear-rings.

The embodiment of beauty and excellence, Lord Krishna appeared illuminating the prison-house with a flood of lustre of His person. Thus He sanctified the soil of this planet and the great Vasudeva beheld Him as an emblem of purity and perfection. He bowed down with reverence mingled with loving awe.

Thus came He in olden days and He does come to us even in these days. Let us, with all humility, make our cordial obeisance to the Almighty One and propagate the message of His all-loving goodness. Victory to Lord Krishna and goodwill to all mankind. ❑

Lord Chaitanya and Problems of the age

It was as far back as five hundred years ago. A Man of an Age–the Love Incarnate, came down on earth among us on the lap of Mother Bengal, on the bank of the Holy river Ganges–in Navadwip, then maddened with the chanting of the holy name of the Lord in bright full-moon eve of the month of Faiguna in the joyous courtyard of Sri Sachi-Jagannatha.

Exquisitely handsome was His form, excellence unparalleled and sweetness indescribable. There was not a single person in that Age who was not attracted towards Him. He wiped out all the poverty of the soul of the society. He removed all the pains of humiliation of all. He staved off complexities of various problems. He raised innumerable men and women to a great plane of equality, those were men and women who had been oppressed by the curse of social inequalities. He called these troubled, wretched souls and showed them the path of light to lead them to joyful peace.

We will again try to search out the solution for the most painful problem rising in the human society presently. And for that purpose, we will look to the lotus feet of the Lord Sri Krishna Chaitanya, the Deity of that great Age. First of all, we will try to understand what is present Age and what is its problem. Thereafter, in the darkness of pain, the moonlight–splendour of the grace of Sri Gouranga Mahaprabhu will be shown as the best and dearest path to our life's journey.

By the term modern or present age we primarily understand the scientific

* *Amrita Bazar Patrika March 26, 1966.*

age. In this (modern) age, there has been enormous improvement of material science. By means of various researches new truths have been revealed. Those truths have found expressions in different kinds of machineries used in the practical life. These machineries are being widely used for the purpose of attainment of materialistic pleasure and happiness. As a result, there has occurred an unthinkable change in the society.

The truths of scientific discoveries are being employed in various fields of life. Among them, in two fields at least they attract our attention. The change is especially marvellous in respect of transportation and communication in particular. Previously, a man could not travel, say more than four miles in an hour but in modern times he can travel seven hundred miles per hour in an aircraft Previously, a man could not hear the voice, even with a great effort, say, at a distance of three hundred cubits or so. But today, with the help of wireless instrument (viz. radio etc.) he can enjoy the music played at a distance of three thousand miles, staying at his own house. By the grace of science, distant man is becoming nearer. Events far away are spreading influence in the daily life of human being. The world, as if, has become smaller in dimension. Foreigners, far away, are, as if becoming close neighbours. It is an astonishing gift of the present-day material science. We understand this present age in terms of the scientific age.

But, at the same time science has created a strange problem with this vast change. It is true, that science has made the distant a near one, but at the same time it is a fatal truth that the very same science has placed near ones at a far distance place. It is strange that the very same science has borne fruits in two diametrically opposite directions. In this, man does not know or recognize his very neighbour. He does not, very often, care to keep any information whatsover as regards his kindreds, relations, friends and his own parents even. In talks and behaviours, there is a cover of unnaturalness. One behaves hypocritically towards another. Natural exchange of thought has, so to say, been a story of the past. Through the use of the medium of instruments in almost all actions, man has turned himself into a machine. Everybody is afraid and alert as to when the instruments will clash with each other and the heaps of gunpowder will blow out!

Machine-civilisation has given rise to congregation of a multitude. Man travels shoulder to shoulder together in the crowd. Man is pressing another man. Millions of men all around, but alas, every individual is, as if, completely helpless and lone in it, he is burdened by his own burden. The same science which has brought the distant near, has itself turned the near ones distant. Crowd has swelled indeed but intercommunion among the mass has, as if bade adieu for ever. Man is having touch with or pushing each other but there is no concordance of hearts. Intercourse among them is constantly going on but not

even for a single moment one embraces the other heartily. Man is gaining mastery over intellect and machinery with a view to increasing the function of hands and feet and eyes and ears but has forgotten the path of devotion to take the poor contracted soul to vastness.

In this age, bodily hunger of man has increased but the hunger of Soul has been dying. Heaping up of sensual objects is increasing the beauty of thousands and thousands of shopping centres but the great qualities of soul, now in a decaying state, is converting the human civilisation to a Sahara desert; and this is the problem of the modern age. This is the biggest question of the modern Age as to how this human difference will vanish? Relation between man and man has been like lifeless machines thrusting and pressing against each other. This strange inconsistency has created an endless restlessness. Wherein lies the solution of this inconsistency, is the basic question of this age. Man is seeking a reply to this question either knowingly or unknowingly. Thousands of gatherings and meetings are being held and dissolved days after days. But the answer to the basic question is still not forthcoming. We will now go back five hundred years ago and make a search for an answer to this question.

At the end of the Muslim rule, there was political discord but there was no dearth of wealth and pelf. Enough of Art, Music and Literary and Spiritual pursuit was there. Navadwip was the centre of studies. Hundreds of centre of Sanskrit studies were there and thousands of students gathered from different directions and countries for threadbare discussion and judgment over Logic. The bank of the Ganges was humming with dry discussion of the New System of Logic (then just introduced there). In spite of so many things one 'real man' was wanting. There was no cordial mixing of a person with another. A huge gulf was created by the invulnerable wall of casteism and orthodox circle of untouchability. The scholars were well aware of the significance of the traits of universal pervasion *(Vyapti laksana)* but they could not perceive the mental anguish of others in their own lives. One was eloquent in uttering "This entire universe is Brahman or the Supreme Soul–*Sarvam Khalvidam Brahma*" but at the same time he walked very cautiously lest he might be impured by mere touch of somebody (i.e. so called untouchable). In discussions and deliberation, Brahman, the Supreme Soul was *Ekarasa* or one-rasa only but in practice the society was torn to millions of pieces.

What evil the researches on material science have now done to the society was exactly done in that age by the fruitless deliberations through absolutely dry knowledge. Life was without any flavour or charm but in the discussions and deliberations were reflected the discernments of 'rasa'. There was treasure in spiritual literature but there was no feeling in one's heart for another. In books, there were commentaries after commentaries but there was no human

benevolence in one's heart. As, in the present days, there is poverty in the human heart in spite of enormity of machinery, in that age, there was spiritual poverty even in the midst of vast erudition. Seeing the agony of the nation the poet of *Mithila*, out of sympathy, wrote down with aching in heart:

"Alas so many great scholars, guess of human
sentiments, but I do not find any body having a
feeling for them with sympathy and love".

Says Vidyapati, hardly any body can have a single person in a million, in whose company, one's heart can really attain peace. There is no dearth of scholars throughout the country, but, alas, there is hardly any place where one's heart can find peace.

There is hardly any person who can feel the agony of human heart, Chandidas, the poet of the Nation said with anguish of heart torn asunder–

"Hark, oh ye men : Man is above all, And there is none greater than him."

The whole nation was, as if, restless for having a man of heart, for a friend who could quench the thirst of heart. The heart of all people was weeping with agony for a sympathetic friend. A great soul, *Kamalaksa Misra* of Sylhet was feeling the pain of the society in the core of his heart and prayed to his heart's Lord with all his sincerity. He wept and called Him, "Come, oh Lord! Be pleased to pour down the nectar of your mercy on the desert-like dry society". By his lamenting call, the Man of heart really came down to the dust of earth. The men of dust quenched the thirst of their lives by getting the loving soul in the form of human being.

Even this day we have got to look to a great embodiment of equanimity, illustrative of an age as far back as four centuries, before we want to search for the solution of the problem of the present age. He came down to Nadia, indeed, but he was of whole Bengal, of whole India, and indeed of the entire human race.

Has any body, in any age come across anywhere, anytime any such person whom everybody down to the lowest social rank has loved as his own man? The king and the subject, rich and poor, Brahmin (the highest in Indian Casteism) and Pariah, scholars and illiterate men and women, high or low–in a word, everybody, has attained everlasting peace, standing in the cool shade of His personality in whom everybody has found his own self in its true perspective and finding and knowing himself, he has learnt to know others.

"Where was such joy and amusement?
That Brahmins and Pariahs are embracing one another?"

In this pitch-dark problem of modern age, we have got to walk along in the light of lamp of love in the hand of that idol of Nadia. With a view to getting a solution to the great problems of today, one has got to hear patiently again the message of Nadia lying in the debris of various confusing vociferations.

That great message of Nadia can be expressed by uttering a single word only. That word is–Love. For want of this one thing alone, the whole universe has become a void. Just as a palace cannot be built up by continuously placing a brick over a brick, so also the human civilisation cannot be built up by growing huge stock of enjoyable goods and by the grinding of material instruments.

So, the Eternal Person, the Great Teacher of the universe, Lord Sri **Krishna Chaitanya (Gour Hari)** has made the entire human race hear an eternal message, through **Sri Sanatan Goswami**. That secret message is only 'Love, that's what is required". Without love, human civilisation is but a farce. The Present day science has been out to convert the human culture to that sort of mockery, just as the fire offering, without the presence of Lord Siva turned to Daksayajna (as we find from Puranas). So also, the civilisation, bereft of Love is like a lunatic asylum, suffering from the menace of war. A man may be much efficient but if there is no sense of final beautitude, the whole life's sacrifice becomes topsy-turvy and all efforts become useless and in vain. Inspite of endless efficiency of scientific researches and power of production, the human culture bereft of love and affection is like a handful of dry sand of desert. Real human love does not grow all of a sudden. Nor does it grow through thousands of lectures and millions of meetings and conferences. The Heart does not soften by any outward show.

As appeasement of hunger is the result of filling the stomach with edibles,so human love is the essential fulfilment of Divine Love. The human unity is not possible by any artificial means. Love between man and man can only be well established, once the cordial relationship is grown with the God dwelling within. Love of Krishna (the Supreme Lord) and the universal love are but two extremes of one and the same straight line. The complete manifestation of the universe of these two ends is surely Mahaprabhu Sri Gour Sundar (the Great Lord Sri Krishna Chaitanya). Deep Divine Love and world-inundating human love have been unified in the Divine Body of Sri Gouranga. If the society, devastated by the problems of the modern age, seeks for light of the great unification, then it has to get it only at the moon-like feet of that deity of Nadia. In the beginning of the present century the love incarnate Sri Sri Prabhu Jagatbandhusundar together with his devotees, has proclaimed this great message at the doors of the wretched creatures of the world. Let us not ignore that. Let us not forget that only to that person who has been enriched by obtaining wealth of love by the touch of mercy of Sri Gour Sundar–

> "This world has been full of Bliss, and the realm of Brahma
> and that of the king of Gods Indra appear insignificant."

Let a single glance of mercy of Sri Gour Sundar, the endless ocean of Mercy, be our great asset, in our disarrayed life with a view to rendering the world full of bliss setting aside the magnificence of 'Brahma' and Indra, the king of gods. ❑

MAHAPRABHU AND VEDANTA PHILOSOPHY

The philosophical thinking of the ancient Hindu seers are of manifold types. A collection of a few of them are to be found in the well known book named *Sarbadarshan Sangraha* written by Madhabacharya.
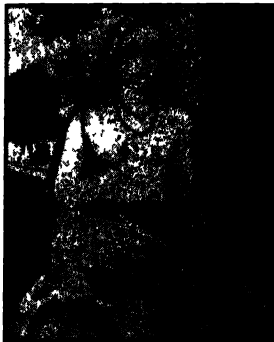
Six types of them are termed *Sadadarshan* and are regarded to be systematic and well organised. They are coupled in three groups : *Naya-Vaishasika, Sankhya-Patanjal* and *Purva-Uttar Mimansa. Uttar Mimansa* otherwise called *Vedanta* ranks the highest amongst them.

Vedanta, the Indian Philosophy par excellence, is the cream of all Hindu speculations. Its excellence lies in its universality of subject matter and profundity of insights. Vedantic literatures are the richest and most sublime of all metaphysical ideologies ever conceived by human brain.

All Vedantists are monotheists or rather non-dualist. One all-absorbing Reality called *Brahman* stands out singular and supreme in the Vedanta. They, however, differ basically when the questions concerning the relationship between Brahman and creation and between Brahman and individual-self arise.

There are mainly two angles of approach towards the Reality, one of knowledge and other of Devotion. The path of knowledge aims at knowing perfectly through identity, whereas the path of devotion leads to the service of Reality through dedication.

The Vedantist of the path of knowledge are called *Jnanins*. Whereas those of the path of devotion are called *Bhaktas*. Amongst the *Jnanins* Sankaracharya stands out as the highest figure, and Maha Prabhu Sri Krishna Chaitannya may be regarded as the Prince in the realm of *Bhaktas*.

Sankara wrote elaborate and magnificent commentaries on *Vedanta Sutra* and *Upanisads* whereas Maha Prabhu penned not a single phrase on the subject. Nevertheless his pregnant utterances to the devotees and his meaningful life of deeply poignant significance are living commentaries of the ancient shastras of the great seers.

The main reason, responsible for the difference between the *Jnanins and Bhaktas* hinges around one very essential point of view : whether process is compatible with absolute Reality or not. **Maha Prabhu answers in the positive whereas Sankara does otherwise.** The point at issue should be

Bharitya Sanskriti Sammelan, 1971 (Shri Shri Prabhu Birth Centenary Souvenir)
Editors : Shri Chaitanyamay Nanda & Shri Debiprasad Ghosh.

understood clearly and the reason having opposite attitudes should be appreciated cogently. Both the groups *Jnanins* and *Bhaktas*, uphold the view that the Reality is the reality of perfection. Now, the question is whether perfection and action are coherent or incoherent.

Does Reality sustain Process? Sankara thinks it does not because it cannot. Since action entails motion, which necessarily implies imperfection. Hence action and therefore any process is incompatible with Reality of perfection. Reality is therefore essentially static and processless. No function of any *Sakti* whatsoever is possible in *Brahman*. *Brahman* is *nihsaktic*. This is the contention of Sankara. Mahaprabhu on the other hand maintains that Reality is not static. Process is not incoherent with perfection. In spite of perfection Reality is eternity-in-motion. He is evergrowing, ever-renewing himself, and realising Himself through His limitless existence. This realisation implies self consciousness. Full consciousness of His fathomless existence does for eternity result in profound blissfulness. The process in Reality is delightful activity in *Brahman*. It is called *Lila*. *Lila* consists in the process of spiritual ongoing which is not only consistent with reality, but indispensable for His absolute Being, that is dynamic and never ending. *Brahman* as Maha Prabhu envisages, is a dynamic personality. He is an Impersonal-personality, a super-personality, the only *Purusha*, Sri Krishna. Sri Krishna is the source and eternal abode of unbounded *Sakti*, which is as real as He Himself is. Sakti is Krishna's Sakti and hence dependent on Him. *Shakti* and *Saktiman* being indentical they are one and indivisible. **Creation means the manifestation of his *Sakti* and therefore real.**

Sankara thinks of *Sakti* very differently. He maintains that *Sakti* can by no means be any, essential aspect of non-dual—Absolute. *Brahman* is according to Sankara, identical with all existence. **Hence, *Sakti* can not have any existence whatsoever.** But process in the universe is so palpable and undeniable that Sakti does claim existence. Finding no way out Sankara regards Sakti as *Maya*, which is neither existent nor non-existent. The processless *Brahman* of Sankar can never be a creator. Creation is therefore attributed to *Maya* which is tantamount in declaring that creation is the fabrication of *Maya* or nescience. The manifested manifoldness is the falsification of *Brahman* or mis-reading of the underlying Reality.

The Static Reality of Sankara is bound to be impersonal and hence no individual self can have genuine personality. The feeling of our having personality is false. It is more phenomenal. In reality a person is one and identical with *Brahman*, ultimately when a person realises his oneness with the supreme Reality the sense of his false personality disappears for good. Emancipation according to Sankar consists in the annihilation of the limiting

personality and in the realisation of the eternal identity, with the static Reality. This must follow even as the corolla of the main enunciation of the process Reality *Nihsaktic Brahman.*

Maha Prabhu acceding, as He does, the presence of process in the Reality, which is the source and abode of all *Saktis*, recognise three types of *Saktis* in Him. They are *Antaranga* i.e., internal or subjective, *Bahiranga* or external or objective and *Tatastha* or intermediary.

The subjective *Sakti* is identical with Sri Krishna. The sweetness and charm of his eternal *Lila* are being enacted and occasionally staged in this mortal plane by dint of his subjective energy. **The personified embodiment of this delightful *Sakti* is Sri Radha, the Reflex-self of Sri Krishna.**

The objective *Sakti* is the agent, responsible for the manifestation of this vast panorama called universe, it is the transformation of the creative energy of Brahman working objectively. Unlike a potter who creates a pot out of clay, Brahman creates the universe out of His own self even as a spider spins its web without manufacturing thread from outside. *Brahman* is not only the shape-given but also the ingredients, the material cause of the universe. Due to this fact He is the component parts and indwelling spirit at the same time. The energy involved in this huge workshop is the *Bahiranga* or objective Sakti of *Sri Krishna.*

The *Tatastha Sakti*, intermediate energy, is in fact the *Jiva Sakti*. All the individual selves are indeed conscious particles of one all absorbing Reality. Their relationship resembles a wide-spread fire and a tiny spark of the glorious Sun and an atomic light particle. Every Jiva is an eternal partner of His Lila-life.

Jiva or individual self is called intermediary *Sakti* because he stands on the crossroad. He may turn his back from Krishna, dive into the labyrinth of Changeableness of the objective world and as a result suffer from untold misery, or he may proceed towards Krishna and His subjective *Saktis* and join the love-life of His eternal sport and enjoy the happiness of highest kind.

The method of attaining highest beautitude in life is different for *Jnanins* and *Bhaktas*. For Sankara, knowledge is the path and it entails no process, nothing is to be done. No action can bring about supreme good. Knowledge means the knowledge of indentity with the Reality. One must constantly meditate on his identity with *Brahman* and it will result in realisation. There is no stage and gradual stepping. The attainment of identity is no attainment at all. It is to discover what one really is. Emancipation means finding ones true self. This is the contention of the *Jnanins*.

Devotional path consists in service, worship, contemplation and dedication. By total self-commitment to the will of Krishna, the devotee

gradually approaches his goal, which finds its manifestation in all-giving love for God and dedicating service for mankind.

In some respects, the devotee is similar to *Brahman* and in other respects he is different. In essence, they are same, both are *sat-chit* and *ananda*. But *Brahman* is a conflagration whereas Jiva is a tiny spark, Brahman is an ocean where *Jiva* is a drop of water. This relationship is called *Vedaveda* identity, identity-in-difference.

In conclusion, one more word of great importance may be said. Non-dualism, dualism and the many other such seers are theories. But *bheda-bhed* of Maha Prabhu is not only a theory but an embodied truth in the person of Maha Prabhu. In Him Radha and Krishna are united and they have become one entity. An embrace in incomprehensible love has obliterated their differences and made their unification complete in one personality. This exemplifies identity. But again in Him Radha is longing for Krishna and Krishna for Radha. Their craving for each other is heart-rending and deeply afflictive. This shows the presence of difference. So the theory of identity in difference has become living personality. The unification of opposites is illogical. The fact is therefore supra-logical or better mystical. The word *achintya* means some thing that surpasses understanding and hence inexplicable of mystical. *Achintya bheda-bhed* signifies mystical identity-in-difference.

The modern scientists recognise process correctly but fail to see the underlying truth that upholds the process. Sankaracharya of old, rightly hangs on the august Reality but fails to see the process that makes Reality concrete and living.

Maha Prabhu brings about a synthesis in the recognition of the Reality in process and the process in the Reality. This synthesis will throw a flash of light on the Indian culture in its true perspective. This is why PRABHU JAGADBANDHU, an embodiment of this synthesis, upholds MAHA PRABHU as the light house to illuminate the characteristic features of Indian thought throughout the centuries. ❑

Goudiya Vaisnavism and Christianity
A Comparative Study

Vaisnava religion is fundamentally a cult of devotion, holding the Almighty God as the dearest of the dear. Christianity is also of the same genre, a doctrine of love for God. The similarity and dissimilarity of these two religious orders are discussed in this article.

As regards similarity, it may be observed first that the object of adoration in both is not the One that is attributeless or formless. The Supreme Being, the object of adoration, is a person with attributes (personal God). Both Krisna and Jesus are living Gods. In any other religion the object of worship is not so closely related with the worshipper. Vasudeva-Daivaki-Krisna or Joseph-Mary-Jesus, the Trinity is fundamentally the one. Daivaki is revered as being the mother of Krisna. But in the west, particularly in Catholic religion, Mary, the mother of Jesus, is held with far greater respect and dignity. There has not been introduced the separate worship of Daivaki, But the worship of Mary has been established fairly well in Catholic Churches.
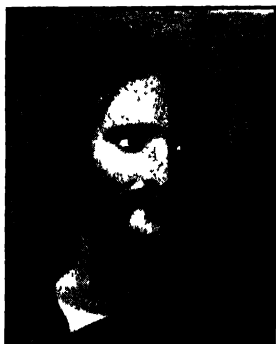
In the eyes of some people, this particular thought has received greater appreciation and publicity in subsequent years.

But it is a misconception of the holy descending of Krisna. Krisna, the supreme lord – not the representative of the supreme of the Universe, was not born in the usual process of union between men and women. The Supreme Power in His own will, inducted His creative energy into the soul of Basudeva. Basudeva became energised with infinite divine energy. He, in turn, instilled the energy in the mind of Daivaki (*Bhagavatam*, Part X, Ch. II, Sloka (Verse 16-18). This is a concept, unthinkable and unimaginable. The holy scripture *Bhagavatam* upholds this mysterious divine thought. Srikrisna appeared in human shape in the lap of Daivaki like a full bloom moon.

Even then, 'Jesus in the lap of Mary' received greater publicity; while such pictures of Krisna the God-head, did not receive that much of publicity in the global context. Perhaps Sri Chaitanya Mahaprabhu and His main followers (Six Goswamis) did not attach that much of importance to that aspect of Krisna's manifestation; while 'Holy Gospels' focussed and highlighted Jesus as 'Son of God' frequently and portrayed Jesus in the lap of Holy Mother. This might be the reason behind so high adoration of Mary. The position, status and beauty of 'Daivaki-Krisna' is in no way less significant than that of 'Mary-Jesus'.

There is a famous painting of little Jesus on the lap of mother Mary by the renowned painter Rhaffel. The painting got much appreciation and was most charming. But this has not gained wide acceptance among the people. On the other hand, Krisna on the lap of affectionate mother Jashoda has been accepted far and wide, revered and worshipped at every home of Bengal as

well as India. The filial affection and piety associated with *Gopala*, the little Krisna, and Jashoda, the mother drew reverent eyes everywhere and this was spread widely through its description in the *Bhagavatam*. The remembrance meditation, worship and enjoyment of celestial sports of little Krisna have got wide recognition in the hearts of Indians, especially the mothers, as a religious practice. On account of this, the filial affection in Vaisnava religion has got no parallel.

In Bible, there is no religious practice concerning the relation between Mary and Jesus. But in the *Bhagavatam*, the filial sports of Krisna and Jashoda have become established as a superb religious practice. This has been accepted all over India because of its description and recognition in the scripture. But there is no such topic of Jesus in the Bible. In consequence, it fails to gain general acceptance. Though, during Christmas a tree is set up and relevant songs and recitation are arranged to be performed. Though it is a religious rite of masses, it has not the strength of recognition in the scripture.

In both the religions the worship, eulogy, music and praise have been accepted as established religious practice. But there is a fundamental difference, the Christians utter the praises of God to Jesus who is to send those to God. Here, Jesus simply acts as a middle-man or mediator. He carries the words, praises of devotees to God. But in Vaisnava religion the devotees express their mind or desires of heart directly to the Supreme Being, Krisna. He is not a mediator. Krisna is Himself the God. Christians think of Jesus not as God but His representative, the Son of God.

Jesus is called the Saviour as being a mediator or intermediary person. No Christian will think of Krisna, Chaitanya, Buddha or Nanak as Saviour. None but Jesus can act as Saviour to them. The Hindus may pay homage to Jesus as Saviour. To a Non-Christian this may seem narrowness or bigotry. But if the inner significance of the word 'Saviour' is understood, there may seem no reason to think it bigotry. The inner significance of 'Saviour' may be stated as follows :

It is believers of known to all Bible that there is Eden Garden in Heaven. God created there the first man and woman–Adam and Eve. There they lived in perfect bliss and celestial happiness. But at the intrigue of Satan they ate the fruit of the Tree of knowledge, though forbidden by God. In consequence, the sense of right and wrong, good and evil grew in them. Thereafter when God came to them to bestow blessings and called them, they replied that they could not come out of their cell as they were naked. God asked them, "How

do you know that you are naked? Then you have taken the fruit of the forbidden tree, the tree of knowledge. You have disobeyed me." God then cursed them and ordered them to go to the mortal plane, to earn bread by the sweat of hard labour and to procreate children. Thus Adam and Eve fell from the Paradise. There then emerged an unbridgeable rift between God and Man.

A long time thereafter the kind and merciful God thought of the miseries and untold sufferings of mankind. He sent His son Jesus to men to alleviate their sufferings and distress. Thus Jesus came to men, loved them and sacrificed His life at the altar of crucification for the sake of mankind in order to save them. Jesus became a bridge between God and man. Man got an opportunity to reach God again following the ideal set by Jesus. Jesus is thus to act as Saviour. No great personality or prophet is destined to perform this sort of service. So, they can not be the Saviour in the eyes of any Christian.

Jesus propagated the religion of love. Love is also the fundamental basis of Vaisnava religion. But there is a gulf of difference between the ideal of love set by these two religions. In the religion of love of Jesus there is the love for humanity and that is common for all beings, having neither the depth nor the diversity of Vaisnava religion. In Vaisnava religion there exists, besides common love for all, the characteristic love prevalent in family situation such as affection between mother and son, father and son, love between bosom friends, between husband and wife, lover and lady-love, master and servant. Subsequently, the deep passionate love of several mystic devotees held the Almighty Krishna intimate lover, bosom friend and the pleasure as such. There is no place for such passionate love in the Bible. In the Hindu scripture Bhagavatam such passionate love towards Lord Krisna is held as the highest ideal.

Jesus is regarded as an incarnation of Pardon. He forgave His executioners saying,–Oh Lord, they know not what they do. Be so kind as to extend your forgiveness to them. Such an instance of pardon is unparallel and can rarely be found before the advent of Nityananda Mahaprabhu. In the Bhagavatam it is found that large number of demons went to heaven on being killed by Krisna. Even a hunter who caused Krisna's passing away from earth with the shooting of a poisoned arrow on Him was more than pardoned. Seeing him repentent and sorrowful Krisna told him that he had done well and that at His will. At the behest of Krisna he got his celestial abode in Heaven. Sishupal committed misdeeds against Krisna who promised to Sishupal's mother to pardon his hundred crimes which when exceeded hundred was killed by Krishna. Before death he uttered the name of Krisna and as a result he went

to celestial abode. These are instances of His magnanimity which are numerous as can be found in the Bhagavatam and the Mahabharata.

In Christian religion there is a ritual called Eucharist or Mass. In performing this ritual in the Church, bread and Vine-juice are offered to God and sacred hymns and verses from the scriptures are sung. Those bread and Vine-juice are taken by devotees as oblation. The bread and vine-juice are considered as flesh and blood of Jesus. The devotees used to take those for nourishment of their flesh and blood and for attaining nearness to God. In Vaisnava religion offerings to God are taken by devotees for purification of body and soul and for attaining intense devotion to God.

Srikrisna descended in Mathura and performed his amorous sports with bosom friends, affectionate parents and sweet-hearts in Vrindavan. Those places are regarded as sanctum, the people living there, the trees-creepers-shrubs-bowers and even dust are held as holy and most sacred to a Vaisnava devotee. A Vaisnava saint aspires to visit and reside at such holy places as the highest ideal of life and a means to obtain devout love for Krisna. Such holiness and greatness attached to a place can not be thought of in Christianity. An ardent devotee of Krisna can feel His presence in these places and visualise His amorous sports even today.

When Srikrisna appeared in this mortal plane and spread His amorous sports in Vrindavan, His appearance was most pleasing to all the eyes. Parents of other boys used to love Him more than their own sons. His play-mates used to love Him more than their own brothers. The ladies used to love Him more than their own consorts. When He was out of sight all of them felt heart-rending sorrows. Not only human beings but also the cows with calves, the deer with hind, the peacock with peahen, all other animals, trees-creepers-bowers groves, tanks and river in Vrindavan, all are animated in their love of Krisna. When Krisna used to play on His flute under a 'Kadamba' tree, human beings came there running, animals and birds came close and stared at His face; the river Yamuna reversed its tides. When Krisna used to return from pasture with His companions and calves after the whole day, all men and women, boys and girls, young and old stood on both sides of the road to fondle, caress or cast a glance at Him. Even Gods and Goddesses of heaven longed His sight and association.

Vaisnava devotees have a longing at heart to live in Holy Vrindavana. They keep always alive the sports of Krisna in their remembrance and rub the holy dust of His sporting ground. We, the common people are spiritually ignorant and devoid of conviction of Divine sports, so we can not view and enjoy the sports of Krisna which the ardent devotees always aspire after. The greatest of Christian mystic saints can not think of any sanctum like Vrindavan or Mathura.

The ardent love that enables a devotee to view His celestial sports can be had with deep respect, constant religious exercise, such as remembrance of holy sports of Gopi and Krisna being subservient to '*Gopis*' and lastly the mercy of the sporting Lord. '*Namajapa*' and '*Nama-Kirtan*', i.e. repeating and singing of Holy name of Krisna will always be helpful for a worshipper.

At the initial stage there may come some set-back with harmful effect on physical, mental and spiritual plane which have to overcome with relentless, untiring and resolute religious exercises. There may come in the way greed for material possession, lust for sensual enjoyment and all these can be dispelled on the attainment of '*Prema*' (the highest form of love), the intense love for Krisna through religions exercises. There are several stages in the process of religious exercise before attainment of Prema, such as respect for Krisna, love of association of devotees, spiritual exercise, avoidance of harmful effects, devoutness for God, intense love for God and Prema, the passionate love for Krisna.

Such a stage-wise development in the path of '*Sadhana*' or religious exercise can nowhere be found in Christian religion. Some reflection of intense love for God can be seen in the lives of mystic Christian Saints.

This particular thought has received great appreciation and publicity in subsequent years. ❑

The Philosophy of Shri Baladeva Vidya Bhushana

Shri Baladeva Vidyabhushana

[Monads or Jivas according to Baladeva]

Baladeva, following the vaishnava tradition, holds that every individual is a monad or spiritual atom. Its essence is pure consciousness. They are innumerable in number and atomic in size. They become fettered (বন্দিদশা) by the bonds of the world through the power of *Maya*, which makes them forget their real identity. Baladeva regards monad *(Jiva)* as the manifestation of God's

---

Sri Baladeva Vidyabhushana was a prominent Goudiya Vaisanava Acharya (Religious teacher) of the 18th Century who is famous for his commentary titled ***'Shri Govinda Bhashya'*** *on the* ***Vedanta Sutra or Brahma-Sutra*** *according to the theology expounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu also known as "Achintya-Bhedabheda-Tattwa".*

* এশিয়াটিক সোসাইটির অভিধানের জন্য লিখিত (অপ্রকাশিত)।

energy–*jiva-shakti.*

In order to come out of this fettered condition he must worship god with ardent love. Every person who is in bondage should strive for salvation. A sound moral life is a preliminary for salvation. Baladeva contends that *Bhakti* is the best way for the attainment of salvation. *Kama* or sensual desire is sharply distinguished from *prema* or spiritual love for the Lord. *Prem* is the essence of pure *bhakti* or devotion. However, salvation is a negative concept. It means cessation of miseries owing to bondage. To have divine joy is the summum bonum (পরমার্থ) of a monad's life. When the sun rises it gives light and does not have to make extra effort to dispel darkness. So it is, contends Baladeva says, when the divine sun of love rises in the heart, all the bondage of darkness and ignorance drop off. Dedicate your whole heart, Baladeva tells us, your whole life to the loving Lord Sri Krishna and lose yourself into the sea of Prema or sweet love, you need not ponder for salvation any more.

Baladeva's theory of knowledge

Baladeva accepts three sources of knowledge - percepts, inference and scriptural testimony. Authoritativeness of Vedas are accepted. The Vedas are regarded as apauruseya (অপৌরুষেয়), that is say, uncreated (স্বয়ম্ভু) by any personal author and that is the reason of Vedas authoritative character. Baladeva maintains the intrinsic validity of all perceptions as such. He dispels every theory which regards our knowledge as a mere appearance as that Sankarites do. Even the elements of false perception are not false.

Shri Jiba Goswami

They are, Baladeva holds, facts of experience. For some reason or other fail find to take a full view of the object. The theory of unreality means that there is something which we mistake for another thing. It never means that there is nothing real at all.

Baladeva upholds, like all other Vaishnava thinkers, that there can be no knowledge without a knower and a known. To speak of knowledge, as Sakaracharya does, independent of knowing subject and known object, is meaningless. Subject and object must exist to make a genuine knowledge. The world is not an unreality. The relation between the knower and the known is direct and immediate. The ways of knowing–perception, inference etc. are so called simply because they are instrumental in producing knowldge.

Reality, according to Baladeva, is of two kinds-independent (*swatantra, স্বতন্ত্র)* and dependent (*paratantra, পরতন্ত্র*). God- the Absolute, the Supreme being is independent reality and all other entities such as created beings (*Jiva*) and other world and all other objects are dependent.

Prakriti-World order

The term Prakriti is a technical term of *Sankhya* Philosophy. It means nature and the process of its evolution. *Sankhya* does not acknowledge Supreme Being and concedes nature as independent whereas Vendantists proclaim that the supreme being is the Brahman and nature is totally dependent on Him. So far as causality is concerned, Vaishnava upholds the *parinamvada.* Baladeva accepts the vaishnava tradition. He writes in *Govindya Bhashya–*

"*Prakriti* is the equilibrium state of the three stuffs Satwa-Rajah and Tamah." It is conscious creative power, fertilized by being glanced at by the Lord. She is mother of the Universe. The process of evolution started when the state of equilibrium was disturbed. In order to become many He transformed but at the same time, He preserved his integrity intact. Baladeva indentified Maya with Prakriti which is set in motion by His mere sight (*ikshana, ঈক্ষণ*)

God–The Absolute

God, the absolute *(Para Brahma)* is the only Being and His existence is a necessity. He is called *Swarat* (স্বরাট), that is to say, He exists as a truly perfect being like a Supreme Sovereign. All existences, actual or possible, are ultimately His existence.

According to Baladeva, contingent beings are neither illusory, as Shankar contends, nor adjectival, as Ramanuja would have it. They are expressions, due to the fullness of eternal power of God. The Supreme Being overflows and that constitutes the contingent existences. They represent His radiating and creative power.

Shankar makes a difference between Absolute *(Brahman)* and God *(Ishwar)* Absolute is *nirguna* beyond all qualities and creations. God *(Iswar)* as *Saguna* (সগুন) and He is the creator. Baladeva makes no such difference. To him God is Absolute. He is both *nirguna* and *saguna*. He is *saguna* because He is qualified by all auspicious qualities. He is all-pervading, all-knowledge and omnipresent. But at the same time *nirguna* i.e. He is free from sattwa, rajah and tamah-guna that are natural and changeable. He is the only knower and same time knowledge. He exists and makes others exist and at the same time He is pure existence. He is conscious and makes other conscious.

He is delightful and makes other delightful and at the same time He is the embodiment of Delight. He is one but His emanations (*bibhuti* বিভূতি) are many. He is infinite yet He is known by devotion. He is embodiment of Law and justice yet He is very loving towards His devotees. He is unchangeable, yet material and efficient cause of the Universe.

Man

Though God is One He has many aspects. Though He is indivisible He become the object of knowledge and devotion. Man, it is said lives in and with God always. His very innermost being is the divine within. He dwells within every man as the inner controller. As the allegory of the *Upanishad* has it : "Two birds of beautiful plumage resort to the same tree. They are eternal friends. One of them eats the fruit and enjoy while the other is the on looker and giver of illumination.

Baladeva declares that man lives with God and hears Him speak every moment of his life. It is due to bondage of ignorance (avidya) that he cannot see the Lord clearly. Bondage falls off when the man turns his face towards god and direct vision of the Lord takes place.

Vaishnava religion has boldly declared that God has bound Himself to man and in that consists the greatest glory of human existence. This is the most important reason of the incarnation of God-head.

Incarnation

The Supreme Being does manifest on this mundane plane. The eternal archetypal truths become the facts of history. When the Lord incarnates the two realms of existence cross each other. the two histories, divine and cosmic intermingle. The incarnate Lord is both man and God. The main significance of the point that He is both man and God lies in the fact that an incarnation of the Lord has two aspects. One is a descent, the birth of God in humanity, the other is an ascent, the birth of man into the God-head, man rising into the divine nature and consciousness.

The theory of Grace

The final turning of the devotee's face towards the Lord is believed to be utterly dependent on His grace. Baladeva writes that "if the Lord had not the quality of showing special grace then all His other attributes, however great, would not have been attractive to mankind and would not have evoked devotion and love towards Him." The concept of grace however, introduces certain problems which has been keenly felt and delicately resolved by Vishwanath Chakraborty, the Guru of Baladeva. ❑

Lord Gouranga : His Personality & Gospel

If religion means the art of attaining God, the greatest artist, whose personality of pure excellence sanctified the soil of Bengal some 470 years ago, was Lord Gouranga of Nadia.

It was the month of *Falgoon*, when the out-going winter of chilly slumber made room for the incoming spring of vital spontaneity. The bright sun had just sunk in the western horizon, the full moon rose to exhibit her eternal glory. 'An eclipse took place to make the occasion holier; the chanting of the name of God filled the banks of the Ganges. The people, as it were, unknowingly declared the advent of Him whose name they uttered. Lord Gouranga, the great architect of human life, made His appearance in the lap of mother Sachidevi, the loving consort of Pandit Jagannath Misra of Nabadwip.

Nabadwip, situated on the banks of the river Bhagirathi, was not the metropolis of Bengal nor was it any emporium of business, but was famed far above as the city of learning. To acquire knowledge was the only end of human life, so did they believe. The entire energy of the city was channeled towards the creation of men of learning. Lord Gouranga appeared in the atmosphere of supreme literary activity to show the world that the end of all knowledge lies in the attainment of God.

Both the personality and message of the Lord were singularly attractive. Loveliness incarnated in His very person. He was as yellow as a guinea, and as fresh as a rose. His looks were purifying, touch soothing, his voice was like a flute's melody. His eyes were as clear as crystal, feet looked like lotus and his hands reached knee-joints.

He was firm as a rock but gentle as a flower. He was sober as a judge but cheerful as a lark. He was brave as a lion but graceful as a swan. He was dutiful as a bee, playful as a butterfly but fixed as the stars. He was happy as a sovereign but bereaved as a maiden forlorn by her lover. All finest qualities, even contradictory virtues, were somehow transmuted and did co-inhere in his graceful personality. The essence of his gospel lies in the exemplification of the truth that man's communion with God is a possibility and that can be done not by austerity or mortification of flesh, nor by dry intellectualism, but by pure love, un assuming domestic type of heart's affection.

God, taught the Lord, was not only a light or Force, but an everyday companion of man, in whom all the longings of human heart found their fulfilment. We human beings are domestically related to one another as father and son, brother and brother, wife and husband and friend and friend. God has made man a sociable being having these four-fold attraction–paternal, fraternal, friendly and conjugal love. One can direct all these kinds of love towards God and regard Him as one of the nearest and dearest relations.

Lord Krishna came down in Vrindabon, with his divine family to teach us how he should be loved. There was doubt in the minds of many brainy ones whether Krishna was a real or a creation of poetic genius. Lord Gouranga, the overwhelming reality, who illumined the history by his glorious life and light, exhibited the love of Krishna so profoundly and sweetly as was never done before. Thereby Krishna was made as real as he himself was. The eternal pursuit of man for God and of God for man found exquisite harmony in the all embracing personality of the Lord.

On this day of His auspicious advent let us sing eulogy and adore His greatness so that we, the mortal beings, may cultivate divine love that was of Him and give expression to it in our deed and everyday behaviour with our fellow men. ☐

Lord Gauranga : The Prince Of Peace

Some four centuries ago, in an age of sham scholasticism when the whole society was groaning under mundane splendour and abject pride of pedigree onc ı andit devotee of Santipur felt the pangs of suffering humanity and a prayer yelled up from the very depth of his soul for the descent of one who would bring about an inundation of spirituality to soothe the burning heart of man and it was responded to.

On the full-moon day of the month of Falgoon, Divine love, holding as it does, the key to the mystery of existence, assumed human shape and lived and moved about with us, as one of our dearest and nearest ones.

To purify the world of dry intellectualism, religious narrowness and injurious materialism and to lead the cavalcade of spiritualism across the soil of civilisation, He appeared in the metropolis of Nabadwip, where over-emphasis on hair-splitting logical controversy and pride of power and genealogy were rampant.

Blazing Divinity

Nimai Pandit of Nadia, a scholar of renowned erudition, later blossomed into Gauranga Mahaprabhu, as it were to bring home the fact that dazzling success in the field of intellect was utterly futile unless true freedom of spirit was attained in profound co-operation with the will of God in self-effacing love.

The resplendent personality of the Prince of Nadia is a beacon light erected on an eminence of sacrificing love on the shore of time to guide the misdirected humanity of the distracted world.

* *Amrita Bazar Patrika, March 16, 195*

The charm and beauty of His blissful personality was so attractive and elevating that men, women, boys, girls, even birds and beasts would keep gazing at Him with eyes of longing desire and thirst and receive therefrom such joy as dispelled all miseries.

Mere touch of His blazing divinity brought about tremendous transformation in the lives of worst villains and miscreants like Jagai Madhai and Chapalgopal and then their spiritual regeneration was exemplary.

Philosophy Of Love

His profound analysis of the scriptural truths and solving thereby the philosophical riddles and perplexing anomalies of man's daily living, made the great intellectual giants of his time, like Sarbabhouma and Prakasananda bow down and sit at His holy feet to drink deep nectar of His spiritual discourses that were extremely logical but supremely devotional.

He preached and lived a philosophy of love and His life and teaching revealed the truth that the perennial problems that torment humanity were basically spiritual in character. God's love is the only foundation on which genuine peace and lasting prosperity can stand strong.

Unfathomable love for God, that was His, exhibited self-love of absolute Brahman of the Upanisads, who though one in essence, became two for an eternal process of self-expression–Krishna, the everlasting Being and Radha–the ceaseless Becoming. In the person of Sri Gouranga the two attained a mystical identity delighting in the fullest fluorescence of conjugal Beautitude.

Compassion For All

Consequential to His love realisation, His spontaneous compassion for humanity bespoke of an integral view of the cosmic unity. So many factors are there to divide man from man–age and intellect, caste and creed, power and pelf, pedigree and academic degree and what not. The all-embracing compassion of the Lord Gouranga knew no frontier of any sort or discrimination in any shape. *Pratap Rudra,* a monarch of sovereign power and *Jharu Thakur,* a street sweeper, *Roy Ramananda,* a philosopher and *Vasudeva,* a leper were equal recipient of His loving commiseration.

The mercy-seat on which He was located was sublime and though ranked highest possible, was universally accessible. His mercy sanctified a new-born babe named *Puridas* and a four-year-old girl named *Narayani. Achyutananda,* a youngster was blessed by His consecrating kindliness. A vigorous youth of princely status, *Raghunathdas,* diving deep, as he did in the ocean of His mercy, relinquished like a handful of sand, his home of palatial opulence and a wife of celestial charm.

The Clarion Call

His kindness to an offender and his forgiving disposition were remarkably unconditional. *Amogha, son-in-law of Pandit Sarbabhouma*, though guilty of cruel jealousy was glorified by His wholesome affection, while he was waiting in his sickbed for the last moment to come.

The great Prince of Peace still stands out with singular brightness in the horizon of our civilisation and when we are inclined to attach enormous empha-sis to the material side of our life, His great example reminds us of the real truth that man's essential treasure of supreme importance is significantly constituted by the spiritual aspect of his being and by that alone.

One-sided development of man and science today are tending to defeat the very purpose and mission of human civilisation. It is high time therefore that we should listen to the clarion call of Nadia.

Peace in the truest sense of the term is no affair of plan and engineering. It is pre-eminently a spiritual property and must well up from the depth of human heart. Activities, tarnished by a secular motive are highly harmful and the most beneficial and edifying force to mould and build man's culture must come from God almighty.

Man's *Sadhana*, according to Sri Gouranga, consists in his ardent love for the sweet Name of Krishna (*Namey-ruchi*) and cordiality for all created beings (*jibey-daya*). And man's endeavour to reach out for God is always supplemented by the benign grace continuous line.

Karuna of the All-merciful The path of supreme devotion (*Para-Bhakti*) is the most excellent vista to look through for pure joy and tranquillity even in these days of scientific dazzlement.

May the Lord of Nadia, the Prince of Peace, the pillar of neverending light, propagate his unsolicited *Kripa* in and through our life and existence, social, moral, national and international. Jai Gour. ❑

Sri Gour Hari–The Dancing Hero of Nadia

The holy Ganges originating as she does from the Gangottri in the Himalayas and coursing a long way across the plains, attains her goal in meeting the sea at Sagar Island. Almost in the same manner, the tidal wave of the ideal virtues of the Upanisads, having a long cultural course throughout the centuries reaches a harmonious integration and a delightful culmination in the loving personality of Sri Gour Hari, the dancing hero of Nadia.

Like a tangent touching a circle, he sanctified the soil of Bengal some five

[1] *Amrita Bazar Patrika on 26.3.1956*

hundred years ago. In His sweet personality, he embodied the ideal values of the Vedic Rishis-Truth, Goodness and Beauty. In His loving self and self-giving love all the supreme virtues found a harmonious abode.

A system of esoteric concepts, a philosophy of life, a mysticism that constitutes the very foundation of spiritual idealism of this land called Bharat-Varsha found an integral manifestation in the towering personality of the prince of Nadia.

The words, Divine Love, assumed a form in Him. The philosophy of love of the Bengal School of Vaishnavism is nothing more than an interpretation– a reading of his divine life, His earnest quest and universal conquest. Love of God, He maintained is the summun bonum of man's existence. Human love is a shadow (avash), a partial manifestation, an imperfect imitation of God's love. Nothing under the Sun that is perishable has any lasting significance whatsoever but for the sake of God's love. The very figure of Sri Gour Hari is nothing but love incarnate and joy embodied.

The great message of the Srutis was again reiterated. Godhead is the only object of supreme and unconditional value. All other objects of the world, He contends, have derived values as vehicles or path-ways to divine glory. Life, to him, is no less than a great festival to which all are invited to share the joy of self-dedication unto the will of God.

God-centred life

In the charming disposition of the Lord Gour Hari, human history witnessed a God-centred life, a life of passionate love for God, and humanity. "Not for the husband's sake is husband dear but for the sake of God," is the profoundest insight of the Vedic Seers. This deepest truth was translated into a genuine life history in the personality of Sri Gour Hari.

During his earlier days Sri Gouranga was a scholar of uncommon erudition. In order to demonstrate,as it were, the fact that the end of all knowledge should culminate in love, He became in later days, a sannyasin of great holiness and humility. He gave up his home and society, not to escape the social bonds. He was not one who became mendicant because he suffered a ship-wreck in life. With unparallel, self-control and monumental self sacrifice, he dedicated himself fully and suffered tremendously for the highest good of the humanity. In order to purify man from egoism, to redeem society from fanaticism, to help the growth and purification of human soul in realising God he relinquished all possession, properties and prestige that were his in Nadia. The state of the then society was utterly barren, full of lifeless scholasticism and lacking in cordial and sympathetic

feeling for others. Instead, there prevailed caste-dissension and mutual hatred. It was a dismal picture, men and women were languishing heavily and longing wistfully for a soothing shower and it did come in the person of Gour Hari, the greatest hero of history, who without arms and ammunition, conquered one and all by His all embracing arms with universal compassion. In a peculiar fashion his profound compassion found an outlet in and through his chanting dance and alluring vocal melody in singing the sweet and holy name of Sri Hari. The highest conception reached in the Vedic hymns was that of one Reality (ekam sat). That Anandam is the absolute reality is the ultimate finding of the *Upanishads. Ananda* is active enjoyment and its essence lies in self-expression. For an eternal process of self-expression the one Reality desired *(akamayata),* and became two *(dwedha apatayat)*–the enjoyer and enjoyed beloved-Radha and Krishna. They are one in spirit (ekatma)–the enjoyer and enjoyed, two in Forms (dehabhedam). The ocean of never-ending enjoyment of the two is the source of all that is blissful in the Universe. In the highest person of Sri Gouranga, the two, Radha and Krishna, attained a mystical identity in thrilling ecstasy of the most supreme type. In Him the self enjoyment (atma-rati) of the absolute Being reached its climatic height and a point of perfection. Lord Gouranga is a lively emblem of identity-in-difference, a meta-physical reality in flesh and blood, to dwell on earth.

Philosophy of Prema

To view Him again, from the standpoint of the world process, we dive deep into His own philosophy of Prema. This world is not, so the seers tell, sufficient for itself. It comes from Krishna the *Ananda-Brahma* and it must seek its final rest in Him. Through-out the process of the world, one with insight, sees a gradual progress towards infinitisation of finite. Life is concealed in nature and when it develops, the end of natural course is fulfilled. Consciousness is concealed in life and when it is liberated life's destiny is reached. The objective of consciousness is fulfilled when Intelligence emerges. And the truth of Intelligence is attained when it is absorbed in the highest intuition of beatitude– the *Ananda* Brahma. *Herein lies the perfection of all* feelings. It is the *Prema-Bhakti–the Prayojana Tattwa* as propounded by Sri Gour Hari.

The end of man's spiritual life is reached when he attains Krishna in Prem or love infinite. This is the essence of the life and teachings of Sri Gouranga.

The Dancing Hero

The above process of infinitisation finds expression in the form of a battle in the life of an individual. Struggles for existence, contradictions, paradoxes of life are the signs of defeat. Whereas, harmony, delight and peace are the marks

in victory. The attainment of Krishna, the love Infinite is the state of ultimate conquest. The greatest of all conquerors of history, stands out the singular man, Sri Gour Hari, the hero of Nadia, whose military acquisitions consist in dancing, singing, longing and loving Krishna. The cosmic rythim of Rasa Lila was manifest in this celestial Dance. His singing was an out pouring of His innermost realisation. His longing was the eternal thirst of Radha. His loving meant complete self commitment in the abyss of sweetness, Sri Krishna, the *Madhu-Brahman* of the Vedas.

Radha, to repeat, is the eternal urge in the cosmic process to reach out for *Ananda-ghana*, Krishna. In Radha, the eternal yearning is made corporeal. In the personality of Lord Gouranga, Radha pines for Krishna, Her eyes thirst for imperishable beauty of Sri Krishna, Her ears yearn for the unsurpassing melody of His flute. In Radha's quest for Krishna, the eternal self-contemplation of the absolute Being is revealed in its supreme excellence. In the very fact of Radha's attaining Krishna the great process of infinitisation finds its ultimate goal and Sri Gouranga is the end of that cosmic evolution.

Spiritual Dynamic

Lord Gouranga is Krishna, embosomed by Radha in perpetual ecstasy.

Upon my flowery breast
Wholly for him and save him for none
There did I give sweet rest
To my beloved one.

Radha in Sri Gouranga, is in the state of complete unity with Krishna. Herein the enormous process of cosmic evolution finds its fulfilment. Hereby the ultimate conquest of love eternal is fully manifest.

But baffling all logical thinking, Radha, even in that stage of ultimate oneness retains her distinctive and most characteristic features, namely, unfathomable love and unquenchable thirst for Krishna. Her eager quest for the beloved continue to remain as keen and earnest as ever. Overwhelmingly. Supra-logical (achintya) must this mystic acme of unity-in-diversity (*bhedabheda*) be! The joy of seeking and the felicity of attainment are somehow transmuted in one reality which is static and dynamic at the same time. Such is Lord Gouranga, the divine love incarnate, the dancing hero of universal conquest, majestic dynamo of profound spirituality.

In these days of abject secularism and cultural crisis we need this hero of dynamic love and his message of universal love more than ever before. May the effulgence of His beaming face while dancing dispel our dreary darkness and the message of His universal compassion empower us to live fully and love Creator in all created beings. ❑

The universal Message of Nadia

If religion means the art of significant living, the greatest artist of human civilisation appeared on this mortal plane in the charming person of Lord Gouranga, some five centuries ago, today, on the bank of the holy Ganges as she winded her course washing the feet of Nabadwip, the largest centre of learning of the then India.

A great message of universal excellence and profound spiritual significance was delivered by Him for the world at large for all time to come. The suffering humanity did listen to His message, and welcomed the Messenger, and from Him came the magnetic touch and teaching, the uplifting power and precepts, and therein they found the long-looked-for peace and poise of mind which was utterly lost due to over intellectualism, sham scholasticism, and hollow pride of caste and pedigree.

Call of The Age

Today, again, due to overworldliness, man's meanness and materialistic glare, we, the entire human race, have lost happiness and harmony of life and in order to regain the same, have tried in vain all economic and political theories and resources. Not even a tiny ray of hope has come from any direction. Heart-quaking cries from all quarters have burdened the atmosphere. And now, if mental poise, social happiness and spiritual tranquillity is to be reobtained, we must by all means, lend our ears to the message of Nadia once again.

Divine Personality

The beauty and novelty of the Lord's message consists in the realisation of the following spiritual facts :

God is a living reality and not a mere intellectual concept. He is a dynamic personality and not a mere unity of natural laws and forces. He is an embodiment of ideal virtues–Truth, Beauty and Love. He is not only a mighty personality of reverence and awe but an endearing object of human affection and fondness.

For ages man has sought God, for, he needs perfection. Today, God reached out for man in order to hold him within the clasp of His all-embracing arms, His unbounded affection for humanity quickened Him to leave His celestial abode and descend on this mundane plane in order to put down social disorder and establish the kingdom of justice and love.

The suffering man has indeed the need of a beneficent God and he knowingly or unknowingly treasures a craving for Him, but the Lord of Nadia manifested in His own divine self a passionate longing for bewildered mankind and He tried desperately to reach them and hold them within the embrace of His soothing arms.

' *Amrita Bazar Patrika*

He walked from door to door, wept for the shortcomings of his human children for their sins and sufferings. His enamouring eyes not only shed but sprinkled tears like a spray and bathed with divine ambrosia all who encircled His sweet personality.

Love For Fellowmen

The Lord declared that the genuineness of man's love for God must be known by its manifestation in love for one's fellowmen. To see all in God and God in all is the essence of His universal teachings. Social love is a corollary of divine love. Unless a man loves Divinity, he cannot by any means possess true love for his people. And this is true inversely too. As long as one does not appreciate and share the happiness and miseries of another person, he has certainly not developed what is called love of God in his heart.

The Holy Name

This love one can cultivate by the process of chanting the hallowed name of Hari in unison with musical instruments and inner devotion. The enormous potentiality of the Holy Name of Sri Krishna, declared by Sree Gour Hari, consists in dispelling all darkness of ignorance from one's heart and in awakening the dormant longing of man for God. In this darkest age, called Kali, the Holy Name of Sri Hari embodies in it all the capacities of various means and methods of God-finding. Not to speak of the animate creatures like ourselves, who possess tongues to utter and ears to hear the name, but even the inanimate objects like stocks and stones mysteriously benefited when Holy Name is uttered at the top of one's voice–the ethereal vibrations that are created by the dynamo of the Holy Name in the atmosphere, disseminate sin-killing light and soul-lifting delight for all creatures.

The message of Nadia is a beacon to the civilised world, so says the Lord Jagadbandhu. May the bewildered and bewailing nations of the earth find, in the light of Nadia, the peaceful path of universal fraternity and love. ❑

The Divine Descent–Its Meaning & Message

Even as a rivulet incessantly winds its course towards the sea, so does the imperfect nature of the creation tend to perfection and moves upward to reach the most high. Limitedness of the created beings manifests a longing for the limitlessness of the Ultimate. The partial nature of the mundane existence constantly endeavours to attain the fullness of integrality. The inner urge of the cosmic order to reach out for the highest truth fundamentally accounts for the

[1] *Amrita Bazar Patrika. March 2, 1961*

gradual development in the evolutionary process of the natural phenomena.

Supplementing this upward surge of the created order, there exists another downward current, a spiritual revelation, a surprise visitation of the supernatural unchanging Being on the level of changeableness–such is the solemn affirmation of the great seers of the ages who were actually blessed with the joy of inner realisation.

Man's attempt to attain the nearness of the Almighty is fulfilled by His advent on earth. The physical and social environment of ours, which is characterised by smallness and mortality is thus sanctified by the august appearance of the supramundane reality, whose essence consists in universality and immortality.

Human greatness lies in the attainment of divinity. Divine greatness likewise finds its fullest expressions in assuming human form and sharing human sociability. Not very often does such an event take place but when it actually occurs in this temporal and spatial order, it is inherently felt and firmly believed as one of singular importance and exemplary influence. It is indeed humanly impossible to furnish sufficient grounds and rational explanation for such a great event as the descent of Divinity, by mere analysis of natural factors.

The Lord's Birth

Such an extramundane uncommon event of unfathomable significance did happen on the space-time continuum of this little planet called earth. Some five centuries ago today, here in the province of Bengal in the district of Nadia on the bank of the holy river Ganges, in the evening of the full-moon day of the month Falgoon, when the lunar eclipse occured, the Supreme Reality descended as a divine child, an embodiment of brilliance and excellence, the beloved Nemai, in the embracing arms of a couple of most pure and spiritual living–Jagannath Misra and Sachi Devi, originally of Sylhet district but then permanently residing in Nabadwip.

Nemai grew to be Sri Krishna Chaitannya when the fullest expression of his sweet and delightful personality became ostensively manifest. The message of abiding importance and universal import, so sweetly pronounced by His graceful self before the bewildered humanity, may be epitomised in a few words.

Lord's Message

God is not an idea or ideal value or natural force, but a reality and actual personality. He is all-pervading Truth–Brahman, indwelling spirit–Paramatman, and most loving of infinite charm and grandeur–Bhagaban, who is attainable by love of purely domestic nature.

The capacity to love Him is a possession treasured in the heart of each and every person-man, woman, adult, infant, Brahmin and non-Brahmin all. To comprehend the flow of divine love is a privilege attributed equally to one and

all without any distinction whatsoever. Man's "*Sadhana*" makes him God-like. God's '*Karuna*' makes Him man-like. Human feeling in God makes him more sweet and delightful. Sri Krishna is the best & highest translation of the Brahman who is absolute and beyond words to express.

Complete dedication of one's total self to the lotus-feet of Sri Krishna does bring about a vital reorientation and spiritual regeneration in one's inner carrier of living process and thereby enables him to have the direct vision of the love-life of Sri Krishna, called *Lila*.

Kirtan or Community *Kirtan* prayer, that consists in chanting in unison the enchanting Name of Sri Hari, accompanied by musical instruments, "*Khol*" and "*Karatal*", is the most potent and pleasant technique so to say, in bringing down the benign blessings of the Lord on earth and to enjoy the same individually and collectively.

May the Universal Lord of divine love unify us all in the midst of our social diversities. As a piece of thread inside integrates the blooming blossoms in a beautiful wreath to adorn the deity on a pedestal, so, may the clarion call of the Lord of Nadia unify us all in harmony and concord to bow down before the altar of humanity and adore the god-men of supreme beatitude. *Jai Gour, Jai Jagadbondhu Hari.* ❑

The Divinity And The Devotee

Divinity is the essence of the Divine Being. Pre-eminently He is the personification of Infinite Consiousness. The Divinity, for the actualisation of His limitless excellence, does possess an endless tendency to reach finitude and in the process, multi-fariousness of cosmic existence comes into being. And herein lies the meaning of creation, the mystery of Divine Incarnation.

A devotee, in the true sense of the term, is an embodiment of devotion. He is a finite being, having an atomic consciousness *(Chit-Kana)*. He does, for the realisation of his genuinely distinctive nature, manifest an inner urge to reach out for Infinity. And herein is contained the rationale of man's struggle for existence and all other achievements that go to make human civilisation. The upward swelling of the finite is sanctified by the downward surcharge of infinite Blessedness and thus the upward ascent of a devotee is supplemented by the downward descent of the Divinity and therein the supreme beatitude is realised in the closed communion of the devotee and Divinity. This communion is an amazing unification, where in the distinctiveness of the components, God and

* *Amrita Bazar Patrika, March 13, 1960*

man, is neither merged nor lost but remains transmuted. The sublime excellence of unity-in-duality is a perennial source of unfathomable delight.

Summum Bonum

The ultimate stage of realisation is an ideal of supreme summum bonum. This ideality became a space-time reality and revealed in unique personality. On this planet, He came down and lived and dwelt with us, some five centuries ago, metaphysical truth became an historical event in Nabadwip in the district of Nadia the cultural metropolis of the then India.

An embodiment of the highest Vedantic thought, appreared on this mundane plane. In the charming personality of Sri Gouranga the prince of the realm of Indian spirituality. In his singular form a spiritual couple resides in a state of esctatic joy. And that was the unique individualilty of Sri Gouranga. Where, two currents of cosmic creativity one of ascension and the other of alighting found a passionate harmony a blessed poise that synthesised all anomlies if living.

If religion means the art of living, then the greatest artist of the world appeared as the darling Sachee the dancing hero of Bengal. His tenderness of heart was fascinating and his compassion profound. His deep feeling for suffering humanity made him an indigent medicant. His innermost longing for Srikrishna made him cry like a child.

Love For Krishna

His graciousness towards the depressed and downtrodden was exemplary. His pity and devotional attachment for Krishna was fathomless. Himself being Krishna his mercy and love for man was all-embracing but at the same time his yearning for God was woefully heart-breaking like that of a forlorn bride deserted by her lifeconsort.

Here is a longing of one who is eternally longed for a goal-finding search of one who is expressly the ideal perfection. The unparallel union of the divine and the devotee. This unity-in-duality made the love-life of Sri Gouranga, a charming illustration of God-consciousness and Bhakta-consciousness harmoniously synthesised. He is the gateway as well as the destination of all seekers, the means and the end of all endeavour, the process and the perfection of all creative order.

Voice Musical

It is indeed a significant event of history that the path of attaining God-head was sketched and trodden by God himself. For the suffering world at large, He made the announcement at the top of his musical voice. Let us listen.

Serenity of mind, purity of heart and sincerity of love plus the chanting of the hallowed name Hari, in unison, constitute the highway to reach God and to bring about spiritual regeneration of our individual and social life. Standing, as

we do, on the cross-roads of civilisation, we must, in order to widen and brighten our moral and spiritual outlook, turn our ear to the clarion call of Gour Hari the greatest architect of human life and culture. Jai Gour Hari. Jai Bandhu Hari. ❑

SHRI KRISHNA CHAITANYA–THE FOUNTAIN HEAD OF LOVE DIVINE

Divine Love, a mere mental concept became living and corporeal and dwelt with us on this plane of mortals, in the most charming personality of Sri Krishna Chaitanya who did conquer the hearts of men not by arms and artilleries but by his unfathomable love for God and his sincerest affection and compassion for His children.

His love for his devotees was profoundly passionate and extra ordinarily exemplary. One very highly significant narration, that of the wonderful demise of the saint Haridas Thakur of sacred memory, let us cite to illustrate the depth of the Lord's affection for his devotees.

Haridas Thakur

Once Gobindadas the personal attendant of the Lord went to the devotee Haridas Thakur with holy food of Sri Jagannath, as he used to do everyday. He saw Haridas lying on the ground and chanting slowly the hallowed name of Sri Hari.

"Rise up and take food". said Gobinda. "No, I should not", replied Haridas" since I have not as yet been able to complete my prescribed Japa I shall therefore have resolved to go without food today. But nevertheless I must not show disregard to the holy 'prosad'. With these words he bowed down and took a particle of 'prosad' to eat. On another occasion the lord himself came to visit Haridas as very often he used to.

"Are you well"? asked the Lord.

"Physically alright but am undone spiritually" was the reply from Haridas.

"What disease are you suffering from?" inquired the Lord. "My failure in chanting the prescribed number of the holy name gives me a great deal of pain" answered Haridas.

"You are pretty old Haridas" said the loving Lord." make the number less. You are a liberated soul and need not be anxious for prayer. You are an incarnate of the holy name so do lessen your number of Japa."

"Listen please to my humble prayer." entreated Haridas. "I am a pitiful sinner. I am totally unfit to be touched and even seen by your Lordship. It is nothing but your holy grace that has dragged me out of hell to the height of highest heaven.

Unfulfilled Prayer

One prayer of mine is still unfulfilled, one that I treasure in the innermost

core of my heart. My inner man tells me that you will soon cease to dwell on earth, with us, the mortals. I, therefore, pray unto you not to show me the unbearable event of your passing away. Do allow me to die before you. I shall, while dying, hold your lotus feet on my bosom, gaze at your moonlike face with my eyes and let the holy name dance on my lips and thus pass away from this mundane existence. This is the ardent desire of my heart and soul".

Haridas uttered these words with tears in his eyes, and the great Lord replied with his voice choked "You are joy of my Life. Does it behove you to pass away leaving me behind".

"Thousands of devotees serve you, selflessly and they are like so many jewels on my head. I am a tiny insect, compared to their Himalayan grandeur. Please grant me my heart's longing" mused Haridas very grievously.

The Lord became grave and departed for the day. Came He again on the next day with all His retinue of singular brillance. "How are you" inquired the Lord. "As thy mercy has pleased to keep me" replied Haridas.

At the bidding of the Lord all commenced *kirtan*. Pandit Sarbavouma, Saint Swarupa, and the great Ramananda, all began to sing and dance around Haridas. Joy increased and all gaped in wonder.

Glorious Demise

The Lord sat before Haridas and the latter fixed his eyes like two bees on the lotus face of the Lord. His holy feet, he embraced tightly with his bosom. With eyes wistful, he drank the sweet nectar of the Lord's countenance. Overflow of tears rolled copiously along his dazzling cheeks and the great soul breathed him last with his loving name "Sri Krishna Chaitannya" on his guileless lips.

Thus passed away Thakur Haridas, like a master of Yogins and all who had the fortune to witness this voluntary embracing of death, could not help remembering the great demise of the celebrated Bhisma, who while leaving his mortal coil, beseeched the Lord Krishna and beheld his sweet person of loveliness and majesty. The devotees shouted the sacred name of Hari and the Lord was over-whelmed with joy and divine ecstasy.

Taking on His loving arms the dead body of the devotee, the Lord danced in the yard. The holy corpse was taken to the beach of the sea and bathed therein.

"Holy is the sea from today" declared the Lord. The Bhaktas drank the holy water sanctified by the touch of the feet of Haridas.

Last Rites

A grave was dug in sand and the body was laid by the Lord Himself as He chanted the hallowed name of Hari. The Lord went round the grave of Haridas with all vaishnavas. They then came to the Lion-gate of Jagannath. The whole earth was filled with the sound and resound of the Kirtan of the devotees. The Lord entered Ananda Bazar, and begged the holy Mahaprosad from the grocers

saying. "Give me prosad, please, for, I shall celebrate in honour of Haridas. They all offered holy food unto the Lord. He made the Vaishnabs sit in rows and with four other persons helping, Himself served the food to them all. The food was served, but they did not eat, since the Lord had not yet taken his food. At the instigation of Swarupa the Lord partook of his food and all the Vaishabas took their Mohaprosad.

With deep feeling the Lord spoke eloquently as it were with five mouths. "Sri Krishna is greatly merciful. He gave me the company of Haridas who has parted us. When Haridas desired to part with me, I could not keep him and he expired precisely the way he wanted to. Haridas was the jewel on the head of the mother earth. He has gone and she has been without her jewel".

From this pathetically illustrious narration of the wonderful demise of Sri Haridas, one can appreciably realize how profoundly affectionate was the Lord towards his devotees. Behold! how he fulfilled the earnest longing of the devotee, grant him his benignant sight and soothing touch while passing, dance with his corpse in his own arms, covered it with sand by his own hand, beg Prosad for the holy festivity in his honour and sang his praise so eloquently.

Indeed Sri Haridas Thakur embraced death voluntarily in order to enjoy after demise all blessings of the great Lord Sri Krishna Chaitanya. ❑

FOREWORD

One veteran professor of a renowned college of Assam. Sri Sukhendu Dutta, has endeavoured to study the deeply meditative aspect of the divine life and teaching of Prabhu Jagadbandhu in this short compendium.

I have gone through the pages of this brochure with delight and appreciation that it deserves. The innermost significance of the adorable descent of Sree Hari on this mundane plane can never be brought to man's logical understanding. It does require grace of the Merciful One. The profound cause that makes the Highest intermingle with the meanest has found beautiful elucidation in Sri Chaitanya Charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj, the reverend author. The Supreme Being Hari, peculiarly, possesses an eternal desire to realize the sweetness of His own benign Personality through His near and dear ones– the main theme of the theological thinking of Goudia Vaishnaba Philosophy.

Following very strictly the sanctified footprints of Sri Krishnadas Goswamiji, Professor Dutta has tried to make explicit of the incarnation of Lord Jagadbandhu. He is, I feel, not unsuccessful in this praiseworthy attempt. I pray to Lord to shower his blessings on this devoted writer. ❑

* *LORD JAGADBANDHU, Prof. Sukhendu Sekhar Dutta, Trust. Dec. 25, 1994.*

PUBLISHER'S PREFACE

We are very happy to present the 2nd edition of this book after 51 years of its first publication. In fact, it was long due to the waiting public. But, the author, Late Navadwip Chandra Ghosh, M. A., B. L., Advocate, Patna, had meanwhile died and this edition could not have seen the light of the day even now but for the financial assistance of his worthy sons to whom we offer our grateful thanks.

In spite of sincere co-operation of the printers and best efforts of the proof-readers we could not avoid some errors still creeping in unnoticed. I request, the reader will kindly overlook them as usual.

MAHANAMBRATA BRAHMACHARI

Mahauddharan Math,
Rashapurnima, 10th November, '73

* *'Life & teachings of Sri Sri Prabhu Jagadbandhu', Nabadwip Chandra Ghosh (1973, 2nd Ed.)*

Message

To enjoy the beauty of a flower one may pluck it by fingers and then look, but an artistic oil-painting should be placed at reasonable distance for its aesthetic appreciation. Similarly, for the estimation of majestic personalities of divine excellence, certain temporal distance is necessary. The significance of Sri Krishna was realised after four millenniums when Lord Gouranga appeared on earth.

Just a century ago Sri Sri Prabhu Jagadbandhu came down on this mundane plane. To-day we are aspiring to have an estimation of His unique personality and uncommon power. His grace can make it possible. In a group-picture of thirty religious Reformers of India we see His portrait, which was taken when He was in His teens,seated cross-legged and casting a benign look. He is charmingly attractive and surprisingly lovable. But mysteriously unapprehensible is the great spiritual power that He did exert on this planet when He passed seventeen years in a secluded thatched cottage observing a vow of profound silence. We dare not probe into the unfathomable tranquility of His Alone-ness. Prabhu Jagadbandhu was an emblem of Truth, Beauty and Goodness. His was a cosmic spirit and universal mind. He loved humanity and shed tears for the downtrodden. He foresaw a cultural catastrophe and advised us to have our stand on the strong foot-hold of spiritual ground. He loved India and all that is sublime in

'Prabhu Jagadbandhu Centenary souvenir', 1971, Bharatiya Sanskriti Sammelan.

our cultural heritage. He desired that we should appreciate our spiritual wealth from the standpoint of divine love and universal fraternity as expounded by Sri Krishna Chaitannya. His was a religion of man based on humanitarian consideration. He despised every thing that segregated man from man. He preached a religion of love based on piety and profound devoutness.

To his followers He once said, "you belong to all and all are mine", meaning thereby that our life is meant for all mankind and each and every being of human society is His own dear ones.

Befitting this all embracing idealism of His, our humble endeavour aims at holding a cultural convention representing different schools of Indian thoughts and compiling this Souvenir, which is a symposium comprehending various phases of our cultural heritage beginning from the Rishis of Upanisad and ending with the Rishi of Life Divine. We are aware of the fact that it is by no means an exhaustive treatise. So many important aspects have been left out due to lack of time and space. Let us judge the book from what it presents and not criticise for what it fails to, our heart-felt thankfulness to all who contributed. May this volume help us deepen our love for Indian spiritual culture. Sri Jagadbandhu, the Friend of the universe help us, so that we may exert ourselves to hasten Maha-Uddharan yagna : emancipation from bondage and descent of divine life for all. Let us take a vow on this auspicious moment : We shall learn to love all that is exalted and lofty in Indian civilization and to adore Sri Krishna who is the Soul of India. We shall learn to embrace all mankind as our dear ones and eschew all meanness and fanaticism. This is the essence of Prabhu's teachings. May we actualise His loving mandate in our every day living. In the language of the ancient Rishis let us pray :

From changeable lead us to unchangeable, From obscurity lead us to luminosity, From annihilation lead us to Immortality, Peace and Bliss to All.

Jai Jagat Bondhu Hari ❑

An Appreciation

[In memory of Shrimad Bhakti Hridaya Bon Maharaj]

Vedanta is the cream of Hindu speculation throughout the centuries. There are two methods of approach towards the Reality of Vedanta. One, of knowledge—*Jnana* and the other of devotion—*Bhakti*. The former aims at knowing Brahman perfectly through identity, whereas the latter leads to the service of God-head through dedication.

* *My Lectures in England & Germany. Dr. Swami Bhakti Hriday Bon Maharaj, Bhajan Kutir, Vrindaban, U. P. 1984.*

Amongst the seekers of *Jnana marga*, who follows the path of knowledge, Acharya Sankara stands out as the greatest figure, and Mahaprabhu Krishna Chaitanya may be called the Prince of the path of love and dedications.
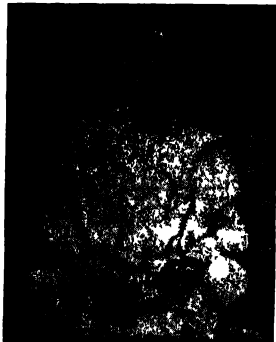
Sankaracharya, the greatest philosopher of India is wellknown all over the philosopical world. Whereas Sri Krishna Chaitanya Mâha Prabhu is almost unknown to the English-speaking people of the western civilization. Prof. Radha Krishnan and S. N. Das Gupta have written volumes on Indian philosophy but a very few pages is devoted to describe Chaitanya's Movement.

Srimad Bhakti Hridaya Bon may be regarded as the first man, a pioneer who presented before the western people, the sublimity of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Bon Maharaj was not only a speculative thinker but had a saintly personality.

I am proud to tell you that he was a personal friend of mine. I recognised in him, a person who could speak with authority. And this was due to profound grace of his celebrated Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati who had transcendental feeling about Lila of Sri Krishna Chaitanya.

The subject such as philosophy and personality of Sri Krishna Chaitanya, Divine Love, concept of Finite self etc. are of supreme importance for the realization of the Gaudiya philosophy. These subjects are dealt and presented with unparalleled devotion and profound understanding.

May the lectures of Bon Maharaj receive cordial recognition of the English-speaking public of East and West as well–I pray to my beloved Lord with earnestness. ❑

MY COMMENTS

In memory of Maa Anandamoyee Shrimat Krishnananda Brahmachari. The book *"Matri Kripa hi Kewalam"* written by Shrimat Krishnananda Brahmachari came for my perusal. It would have been better to call it a picture- sque experience of a spiritual research scholar. It does not fall under any conventional class of books. The description flows on unremittingly like the incessant flow of the

* *'Matri Kripahi Kewalam' by Shrimat Krishnananda Brahmachari, Krishna Kutir, Hijuli, Ranaghati 1390.*

Ganges. It is as if the perennial spring rich in spiritual understanding of the writer smoothly glides down its course without interception. The sincerity of its presentation and purity of devotion are graced by a spirit of calm resignation. The depth of perception expressed in a lucid style overwhelms the reader and even carries them in its flow. He was born in the district of Murshidabad (West Bengal) in the house of a sacred and highly devoted family. The cherished initiation came through many rigorous ordeals- such as-deep privation and wistful craving and after winning the affection of Akhandanandaji;-in company with Pulin the gaining of wonderful vision of Shri Bankubehari; and His sacred garland and also the gaining of sweet look of the 'Kali of Dhaka'- Ma Anandamayee had looked upon him with pitiful eyes in the temple of Vishnupur. These episodes are not imaginative stories. They inspire the readers with sacred teachings and illumine their souls with the glow of sacred fire. From after his initiation, at the instance of the Mother and in compliance with Her order, his performance of puja and Chandipatha in different temples, his wandering through many sacred places and abandoning his self in Kirtana dances and at times his collapses in spiritual fainting fits-all these were possible by the grace of the Mother and moves the readers' heart. The reader will feel as if he himself is being caressed by the Mother when he recalls the writer's secluded visit to the Mother which he has called 'Private'. His visit of Kedar-Badri in company with a devoted ascetic, the unwarranted and devotional service of Kanai and Ramdas all are examples of the unbounded piety of the Mother. It seems to be quite supernatural to have escaped unhurt from the abysmal gorge into which he had been thrown by a landslide on a precipitous hill. The passage through the way of this world will be safe and smooth if every man perceives that he is armoured around by the kindness of the Mother. The ascetic Brahmachariji is a follower of the Matricult, but at the sametime he is devoted to krishna also. It is thus an unparalleted synthesis. Krishna-Gopal at the breast of the Mother is the concept of his meditation, which in this age of strife and torn earned him the title 'Bhurida'. I wish pray at the lotus feet of Shri Hari that he may attain long life and propagate the blessings of the Mother by ceaseless singing of hymn in Her praise and glory. This humble being has also been blessed with the grace of the Mother. Though Krishnananda was blessed with an ocean of Her divine grace and I received only an iota of it, we savoured nevertheless the same.

Mahanam Angan
Raghunathpur, Calcutta-59
Bhadra, 1390.

Blessed
Mahanambrata Brahmachari

JAI JAGADBANDHU

ADDRESS BY

THE CHAIRMAN OF THE RECEPTION COMMITTEE

BHARATIYA SANSKRITI SAMMELAN

Honourable President, Gentlemen, Brothers & Sisters!

I extend my hearty welcome to you. I cordially invite you to the Indian Cultural Assembly to be held on the occasion of the Advent Centenary Celebration of Lord Jagadbandhu Sundar.

At the moment our country is passing through a very critical time. The two Bengals, India and the human civilization are passing now through a very catastrophic period. The best treasure of human civilization is humanity which is being trampled–the serpent of materialism is raising its venomous hood. It appears today as if stale materialism is putting into ridicule–Justice, Truth and Religion. Envy, selfishness, communalism, political partisanship, violent anti-social activities are rampant everywhere and it seems that human civilization is heading towards a terrible disaster. We have assembled to-day to see through the situation and devise out ways and means as to how to save humanity from this awful calamity.

At one time spiritually India occupied a supreme position. All the civilised nations of the world were then inspired by the spiritual achievements of India. Now it is our sacred duty and heritage to light up the candle of Indian culture and civilization once again so that it may shine brightly and guide the world. The beacon of Indian civilization, which was lit by the deep wisdom of Indian Rishis, used to guide people in their social, moral, political, spiritual and domestic aspects of life. The light of the candle has now become dim. It is the objective of this assembly, and it should be the aim of everybody living, that all our efforts and spiritual activities should be directed towards lightening this candle in our personal and social lives so that we may find our way in darkening blindness and may attain deathlessness in the world of mortals by realising our true selves.

Prince of Love, Lord Jagadbandhu Sundar was the perfect emblem of Indian culture and spiritualism. He was divine Piety incarnate. By His own spiritual power He indicated to the youngmen that secret of all power lies in control of senses (Brahmacharyya). The revolutionary partriots received vigorous inspiration from Him for political liberation of this country. He discouraged social disparity and preached the doctrine of equality and universal fraternity. He stretched His loving arms to the down-trodden people of the society who were looked down upon by the so-called higher classes. He raised their moral standard of living and soothed their suffering by benign influences. He remained in absolute seclusion and perfect silence in a thatched cottage "Gambhira" deeply absorbed in divine self-contemplation continuously

for a period of seventeen years–His self-realisation infused profound spirituality in the hearts of the people at large all over the country. He loved the ideals preached by the Indian Rishis. He himself lived up to those sublime ideals and preached them. He spiritualized the atmosphere and infused immense power by "Mahanam Mahamantra". He upheld the banner of divine love in recent times, and inculcated the same spirit among the common people. This doctrine of Universal Love was originally propagated by Lord Gouranga. Convening of an Indian Cultural Assembly on the auspices Advent Centenary Celebration of Lord Jagadbandhu Sundar is therefore most befitting to the occasion. Those who are instrumental in planning and actualising the holding of this assembly deserve the blessings of the Lord.

With the Lord's feet in our hearts we cordially invite you to this assembly. We very much hope that you, who love Indian culture and are proud of India's spiritual glory, will present before this audience from your own angle of vision, the most fundamental and immortal elements of Indian culture and spiritualism, at this very critical period, so that the nation may resettle itself in its original spiritual glory which the wisdom of the Rishis propagated centuries ago.

Certainly we must rise again from this slumber of abject worldly-mindedness, we must stand again on our true and genuine spirituality. We must drink the nectar of immortality and rejuvenate this half-dead human society : Victory to Bharatvarsa, Victory to the people of the world at large, Victory to the Friend of all people–JAGADBANDHU. ❑

FOREWARD

In memory of Shrimat Bankim Chandra Sen

Bankim Chandra Sen is a name held in great reverence and loving remembrance by his countrymen. Though he was widely known as an eminent journalist being associated with the reputed newspaper, Ananda Bazar Patrika and subsequently being the editor of weekly 'Desh', he was at heart a patriot and ardent devotee of God. During the time he joined the Ananda Bazar Patrika he already earned fame as a man of letters, writing a very lucid Bengali. Journalism at that time was not worth-paying as a profession. He took it up with the only purpose in mind to serve his country and to help arousing national awareness to the miseries of foreign dependence. His respect was boundless towards those who tried to liberate the country through armed rebellion and suffered life-imprisonment or death. This was only an aspect of his great personality.

'Life faching Deth', Shri Bankim Chandra Sen, 1995.

His real greatness lies in his sincere love and unfailing regard to Indian Spiritual-Cultural heritages which made him an ardent pursuer of truth and extensive reader of scriptures, Upanisads, Gita and Bhagabatam. We have heard him quoting incessantly from scriptures. He was a fluent speaker on spiritual subjects having profound knowledge and full of exuberance with religious fervour. At heart he was a real saint and a faithful guide to many seekers of spiritual truth.
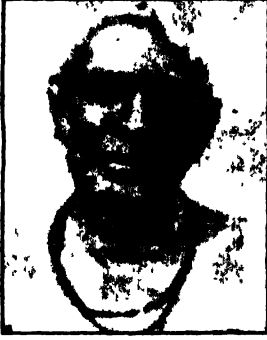
His professional activities and many public engagements and encounters could not deter him from his spiritual pursuits. The culmination of his spiritual attainment, realisation of the Divine Being, the highest grace of the Lord dawned on him all on a sudden and at a time when he reached almost on the brink of death. He met with a fatal accident while getting down from a tram car near his Ananda Bazar Patrika Office. He did not lose his consciousness and could see and feel all that had happened and was happening. I state below the situation in his own words :

"Surprisingly, I realized very little what befell me unexpectedly. The wheels of the tram car rolled over my right foot severing practically all the toes from it. At this stage, I was carried over to some distance by the speed of the tram car before it came to a standstill. (Life facing death by Sri Bankimchandra Sen.... Page 5).

"An old woman from the nearby shop of fried-foodgrains who came to the spot crying, in a twinkling of an eye, took me in her lap, expressing her deep sorrow over the matter. At that stage, I began to console her though the separated parts of my leg were then under the wheels of the tram car. Practically, I did not feel much pain in such a severe accident. I felt that somebody had twisted my right leg with some great pressure." When his office colleagues arrived and saw him in that situation, "they were surprised that though the part of my right leg was severed under the wheel of the tram car I felt no serious pain, though heavy quantities of blood flowed out in streams, nor did I fall senseless at that stage". (Page-6).

In fact, at the moment he reached a stage where he was absolutely fearless, painless and sorrowless. Not only that, his mind, his whole being was filled with celestial bliss and he could realize all worldly happenings, its sorrows and joys were nothing but sport of the Divine Being. That is the state of a God-realized soul or Sthitaprajna of the Bhagabat Gita. A stream of nectar flows within him. His state is quite unfathomable to worldly mind.

Though it is not at all possible to give an account of one's spritual realization, revered Mr. Sen tried to express his realizations, spiritual expriences in his book written in Bengali, "Jeewan Mrityur Sandhisthale." He states his visions and realization as clearly as practicable in the following lines :

"The moment I fell down from the tram car, I saw the waves of light around me. In the twinkling of an eye, a wonderful flood of light dazzled the whole area around me and by the touch of that light my body and mind spread out like a blooming lotus". (Page-9).

"Practically speaking, it was not the thing what I experienced on the day of accident. The light was not impersonal. It was very rich in colour. Sweet scents wafted out of the flash of light and more surprisingly it was really forming the shape of a living figure incarnating before my very eyes and simultaneously hearing the sweet sound of the name of the Lord. So far as I could glance, I visualized that everybody was chanting the name of the Lord and that the sweet melody of chanting kirtan was expanding itself with wanderful grace. Moreover, the sound was pouring into my ears from all corners in the rhythmic tone of chanting rhythm signalling that there was nothing to be worried about". (P-11)... "I plunged myself into the waves of the sound chanting the name of the Lord, and the overflowing trance overflowed my mind, intelligence and pride. I plunged myself into that ocean of beauty and there I completely lost my body-consciousness. It occurred to me that my body was not really mine. It also seemed to me that my body, mind and intelligence had been tied up with Him in beauty, in enjoyable fragrance or Rasa and in colour and in scent and with that ever-rhythmic delightful divine sport or Lila of the Lord. At such a stage, it seemed to me that the physical detachment of my right foot was nothing but a playful thing, which was very interesting. I watched as a silent spectator while someone was playing with my life and body. (P-11).......... The outer world was also there but not in the same form as I had been generally used to (P-11) .... At that time, it was difficult for me to differentiate between the inward smile and the outward service of people that gathered around me. That non-dual manifestation of the spiritual sport of delight pervaded my whole body and mind to make me aware of the Absolute Being or the Impersonal It. Under its impact, I totally forgot my physical pain" (P-11-12).

It appears to be needless to quote any more. What is most significant and evident that he got the vision of Ishwara in the luminous figure within the waves of all-pervading stream of celestial light. I sincerely believe that he had vision of ultimate Reality which placed him above all sorrows and sufferings of the mundane plane. His state of mind can be best read in verse-22, Chapter VI of the Bhagbat Gita, as—

"Having obtained that (the Supreme Being) he does not reckon any other gain as greater and remaining in that he is not slightly moved even by the greater sorrow".

The accident seems to be a boon in disguise. It brought him in the realm of constant realisation of God.

In the pages of this book, "Life Facing Death", which is an English rendering of his original Bengali Book, "Jeewan Mrityur Sandhisthale", we come across the glimpses of his realization of God since the moment of the memorable accident in which a portion of the right leg suffered amputation. This brought a complete change in his life which was full of spiritual fervour. We can experience that fervour from a reading of the book which will no doubt be beneficial to any seeker of truth and pursuer of highest spiritual goal.

My acquaintance with him (revered Bankim Sen) was so close that it grew into true and intimate friendship. We held each other with great adoration. He liked very much to listen to my religious discourses. He had profound regards towards my spiritual master Sripad Mahendraji whose company exerted a great spiritual influence on him. Mahendraji loved him much and bestowed on him the title—"Bhakti-Bharati-Bhagirathi" which in my estimation was most appropriate. Devotion to God (Bhakti) and Goddess of knowledge (Bharati) were found to be ever-flowing in his disposition and discourses like a running stream (Bhagirathi). If his utterances and writings were a pointer, he shared the same religious views with me. He believed and revered Prabhu Jagadbandhu as an incarnation of Sri Krishna and Sri Gouranga. He visited several times Sri Angan, Faridpur where Prabhu Jagadbandhu spent in utter seclusion about seventeen years in later part of His Divine existence and was said to have received His blessing.

The English rendering of expressions of spiritual realization and revelation is indeed a very difficult task. But that has been done exceedingly well and it has, perhaps, been possible due to ardent devotion of the translator, Sri Rai Mohon Acharya, a disciple of revered Bankim Sen. Moreover, the renowned Prof. Arun Ganguly of David Hare Tarining College looked through the manuscript very kindly on his own initiative. I consider it a favour to be asked to write a 'foreward' for this book. This revives in me his loving memory and brings an opportunity to express my deep regard and pay homage to that great Soul. In conclusion, I hope that the book will be received with enthusiasm by those for whom it was translated into English.

Mahanam Angan
Kolkata -59

Mahanambrata Brahmachari ❑

FOREWORD
(In memory Swami Bholananda Giri Maharaj)

I deem it a proud privilege indeed to have been given the opportunity to write the Foreword to this learned poetical work in Sanskrit entitled Sri Sri Bholananda Giri Gouravam by the erudite Pali and Sanskrit scholar, Dr. Rabindranath Das Shastri, formerly Principal and founder Assistant Secretary, Ramthakur Degree College, Tripura and at present Principal, Tripura Government Sanskrit College, Agartala. Dr. Das Shastri has chosen a good subject for his poetical plot because Swami Sri Sri Bholananda Giri is one of the living saints of modern India. It is surely necessary that the Sanskrit Literature should not remain confined to ancient tops alone but it should also deal current matters of great importance and here the purpose has been well served by this work.

It is very happy circumstances that the first authentic poetical work in Sanskrit on the life and Philosophy of Swami Bholananda Giri Maharaj has come from the celebrated pen of an orientalist Dr. Rabindranath Das.

Swami Bholananda Giri's life, specially his divine feats of yoga and meditation have been laid bare in all its resplendent glory in this publication. The poet has done an excellent service to the disciples, devotees and the like by bringing forth to light some of the slokas in stotra-form also. The book is really a specimen of creative art.

This Kavya is a worthy addition to modern creative literature in Sanskrit by a very competent author and renowned oriental researcher, and it is bound, I think, to be recieved well by all Sanskrit-loving people of the world. ❑

'শ্রীশ্রীভোলানন্দ-গিরিগৌরবম্।' অধ্যক্ষ ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী। তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা। ১৯৮৩ খ্রীঃ।

Humanism in the religion of Buddha

LORD BUDDHA is called the Light of Asia. Today He is the Light of the whole world. He proclaimed the royal law of love. (অহিংসা পরমো ধর্ম) And the position of Ahimsa is love. Thou shall not hurt any living being is to say in other words thou shall love mankind, all living creatures. The sublime teachings of the Lord Buddha is the essence of right consciousness.

Buddha looked upon the moral law as the Supreme guide of life. He did not like the idea of basing the validity of moral Law on Vedic authority, as did the Hindu *Rishis* of the *Upanisad*. He did not utter a single word about *Iswar* or *Brahma*. He observed utter silence about the existence or non-existence of God. He believed that metaphysies is unable to solve the problems of life.

Problems of Buddha is nothing but the miseries of actual human life. How to ameliorate this factual sorrows and sufferings of human life is the most pertinent question before the Lord Buddha. Buddha abandoned all mysticism in metaphysic and this He did for Love of human life. This is humanism par excellence. By sufferings of men, Buddha understands the suffering of birth, old age and death. And to get rid of all these sufferings is to attain *Nirvan*, the only objective of human life. *Nirvan* or salvation is attainable not by unspeakable feeling of oneness with some unknown, unknowledgeable and incomprehensible reality called *Brahman* of the Upanisadic seers. It is to be attained by right life, right feeling, right behaving with all fellow beings even lower creatures. Buddhists are the pioneers in opening hospitality not only for human beings but for the animals also.

According to Buddha, the world of Experience does not require a God for its explanation. He denied the existence of God. He undermines the authority of the *Vedas*. It is the task of Buddha to provide a firm foundation for morality of human life. The root of morality, according to the Lord, is rooted in the very constituent of the universe. That a man must be moral is the essential burden of Buddha's teaching. All Spiritual and material attempts of the Lord Buddha aimed at shifting the centre of religion from the worship of God to the service of mankind. And nothing else but this service is the core of Humanism. *Nirvan*, or Salvation of which Buddha spoke depends on the perfection of character and not by devotion to any God or *Brahman*, as the Vaidic seers would have it.

In Buddhist religion, virtue consists in conduct rather than worship. They speak of five-fold conduct as essential to build character.

1) Innocence (*Ahimsa*)
2) Charity (*Dana*)
3) Non-stealing (*Asteya*)
4) Truth and Chastity in word and thought and deed
5) Renunciation of all worldly interests.

Buddha often spoke of *Punya* and *Papa*. But they have no relation to

any supernatural power.

Punya consists in what leads to peace of mind. *Papa* is what ties man down to worldly concerns such as covetousness, anger, conceit. There are various ways of stating *Punya*.

1) Giving food to the hungry

2) Giving water to the thirsty. Giving cloth to the poor, shelter to the destitute.

Himsa (হিংসা) is one of the severest *sin (পাপ)*। It means infliction of suffering to any creature. The *Brahmins* at that time were mainly engaged in sacrificial rites and an essential part of sacrifice was killing of animals. Kind-hearted Buddha revolted against that inhuman practice. He felt very keenly the pangs of dumb animals. He did away with all kinds of Brahmical sacrifices.

Though the Lord did not utter a single word for the reality of God yet, being a true humanist he never disliked the people who believed in God. He never praised his own religion and decry the religion of other. Appreciation of all religions, beliefs is a characteristic feather of Buddha's humanism. One edict of Ashoka says–There should be no praising of one's own sect and decrying of other's sects; but on the contrary a rendering of honour to other sects for whatever cause honour may be due to them."

Love, the essence of Virtues is the most sublime principle in the teaching of the Lord. His ethical humanism of universalism will continue to attract the people of the world for all time to come. It was Buddha's mission to extend the blessings of salvation to all mankind. "Go, ye o *Bhiksus*, for the benefit of the many, for the welfare of mankind, out of compassion for the world. Preach the doctrine which is glorious in the beginning, glorious in the middle and glorious in the end." ❑

Teachings of Vaishnabacharya

1) It is true that man wants God; it is equally true that God also wants man. Man is anxious to get God; God is all the more anxious to get the love of His devotee. This is the message of *"Bhagavata"*.

2) The love of God is known as divine-love and the love for human being is known as love for mankind The two are very closely connected with each other.

3) The easiest and best way of devotion is to hear and chant the name and glory of the Lord. One is instantly inclined to worship Lord Krishna once he hears his message of love.

4) The name of our religion is *"Sanatana Dharma"* (The Eternal Religion). This is based on simple humanitarianism. Development of soul is its

main function.

5) The greatest reward of life is to have contact with God. This is possible with a pure character and sincere adoration.

6) By the grace of Lord Krishna and with blessings from the 'Guru' everything is possible.

7) In this dark age chanting the name of Lord Hari is the great *'Yajna'* (oblation). It will bring crops in the fields and provide all material requirements.

8) The goal of human life is to achieve humanity. In order to achieve it one must acquire five qualities–non-violence, honesty, purity, self-discipline and truth. The only religion of man is Humanity. Everyone must become a perfect human being by acquring human qualities and should also help others to reach the stage of perfection. This is the best service to mankind.

9) The next stage of humanity is the divine-life. A super-power exists in the matter of running the entire universe. That 'Power' is fully-conscious and always merciful. The union with that 'Power' is the source of bliss of all creatures. We should constantly remain in touch with that 'Power' ultimately that would lead us to divine-life.

10) Once one gets the taste of divine-life, then he is in love with God, as well as in love with His creatures. This is the climax of human-life. Once he attains it, then universal welfare becomes the mission of his life.

11) Do all work as service to the Lord. Happiness and misery, all facets of life, should be treated as the gifts of God.

12) Never differentiate between man and man on the basis of birth. The yardstick of one's greatness is his qualities and his 'performance' in the present-life.

13) Never hurt anyone by your words or deeds. Nor should you do anything which may cause a loss to others. Beg pardon whenever you become a source of suffering to others.

14) Never speak ill of other religion or community. You should realise that every religion and every follower of different faith are part and parcel of the 'Universal programme' of activity.

15) One should practice austerity both in food and material enjoyment. A good child can be expected only from good and pious parents. We should never forget that the birth of a child is the result of sincere-prayer of the parents and not a gift of the nature.

16) The 'Ego' vanishes with surrender to the lotus-feet of the Lord. Then a sea of bliss emerges from it and self-identity is thereby revealed.

17) A storm is inevitable in a sea. Never lose heart in times of distress and danger, then ceaselessly pray to *'Prabhu'* (the Master). He will surely rescue you.

18) A tree can not survive if its root is cut. Similarly a Nation can never survive if its old tradition is wiped out. The Nation is apt to die if it is separated from its old cultural heritage.

19) The so-called education in schools and colleges which we usually impart to our children—is actually meaningless in the path of devotion and divine-life.

20) Always remember the great saying of Prabhu Jagatbandhu—"I am Your and You all are mine".

CONTRIBUTIONS OF SWAMI VIVEKANANDA

From ancient times, we, Indians have our faces directed to the North. It is Swami Vivekananda who turned our faces to the South. The people of European countries are self-conceited and confined to the West. It is again Swami Vivekananda who has turned their faces to the East. In other words oriented them. These are two great contributions of Swami Vivekananda. Let me elucidate them giving details in brief.

The Northern region of India is on a high level. It is gradually higher and higher and the Himalayan range is the highest. This material altitude has somehow bungled with the spiritual altitude and created a clumsy confusion. The Himalayas are the abode of Gods and Goddesses. The abode of Shiva, the abode of Indra, all such abodes are situated therein. The Pandavas ascended the heaven from the northern direction. When they reached the gate of heaven, the God Indra came down with his chariot to welcome them. On way of pilgrimage, we generally think of Hardwar, Kashi, Vrindaban—the gate of either Hara or Hari. After reaching the gate, you advance inside, proceed farther towards the North, you get Kedarnath, Badrinath, Yamunottari and Gangottari. Here at Gangottari, the Goddess

* *National leaders on Swami Vivekananda Vivekananda Math, Barrackpore, Swami Nityanandaji, June 23, 1996.*

Ganga who remained so long confined in the sacred water-pot (*kamandalu*) of the God Brahma, clasped the matted hair of Lord Hara and descended at Hardwar. Saints and hermits, all from Kashi, Uttarkashi gradually settle down in the Uttarapath. Last days of their lives they wish to spend at Kashi (Baranasi) and after death to obtain their much-sought-after salvation. That is why I have said we are all facing towards North.

When the North stands for the higher region, let me take the South to be the symbol of the lower region. The South has actually a downward slope. The abode of the God of Death (*Yama*) is in the South; the limitless dreadful ocean is in the South. The Southern region is densely covered with jungles and forests. It abounds in *Rakshasas*, *Yakshas*, bears and non-aryans.

In the words of Kaviguru—

> They are low-born,
> Deprived of sacred hymns,
>
> Stopped at temple gates,
> By traders in worship
> Their grievance is voiced–
> 'outcast am I—
> Driven out of the line'

The gates of temples are closed for them. They are pariah of the South. As our faces are fashioned to the North, the South being at our backside, remained unnoticed by us. Swami Vivekananda has beckoned us to make an about-turn. He has then commanded—Turn to the South, behold the down-trodden. There they lie fallen, hated, outcast, ignored. But know that they are Gods, in reality. Gods are not in the higher region of The North. You can find them in plenty in the lower region of the South. Look at them. Think how you can lift them up. Work strenuously, even at the risk of your lives so that these helpless people may be elevated to the level of humanity. Give food to the hungry, shelters to the homeless, serve medicine to the diseased, show the right path to the bewildered and in their services make a sacrifice of your own pleasures and interests.

To chant sacred hymns into the ears of a person to ensure his obtaining salvation is rather an easy task. As a matter of fact, almost all saints and holy preachers do that practice. But to enthuse, by imparting mantra of awaking and rising, a whole nation to the services of humanity, after diverting them from their selfish hankering for salvation and heaven, is certainly a more

arduous task. Swamiji did not come to this world to increase the number of his disciples. He has reoriented the entire nation to the service of humanity, withdrawing them from their pursuit after heaven with eyes gazing to the North. The nation has, by and large, responded to this clarion call of Swamiji. This is his contribution—undoubtedly an exemplary contribution.

The people of the West are self-concerned and egoist. Whatsoever light has been imparted by civilisation has to be found in the West. "The West has of late opened its door." In science and literature, wealth and prosperity, industries and arts, practically in all fields, the West has excelled. Due to this reason Europeans are generally arrogant and the British are to the maximum degree. They assume that if any great performance in the world has to be achieved, it is the British whom God ordains for the purpose. They claim that they have favoured developed, and under-favoured developed nations, Asia and Africa have been favoured with donations and charities. India was enveloped in stark darkness and the British have brought light there. The half-naked bodies of the Indian multitude have been covered with clothes sent from Manchester. Everywhere they have lighted the light of civilisation and of education and they have been continuing to do so. In America, among the different nations, the British has the highest rent. It is they who are eventually the "first settlers". The English are the proud parents of the American nation. With the light of civilisation in their hands the British posed to be luminous in the whole world. "Even the Sun-God, out of fright, does not set in the British Empire." Such was the extent of arrogance the West was inflated to.

On hearing one lecture delivered by Swami Vivekananda, pouring forth from a voice as grave and loud as the sound to be made by blowing of a conchshell, the Westerners became dumbfounded, and discovered that the East, too, has such excellent wisdom hidden there. The speech was so amazing! Max Muller began to translate the Vedas, wrote out a book, "*What India can teach us.*" A group of orientalist made an appearance there. To facilitate research the Western scholars founded Royal Asian Society. The Western, otherwise arrogant, bent down their heads and meekly submitted to be learners. 'Sir John Woodroff fell prostrate at the feet of Pandit Shivachandra Vidyarnava. got initiation from him and eventually turned out to be the world-famous scholar in the science of Tantra. If you would like to search straightway the root of all these, you will find it to lie in the potential spiritual seeds as sown by the 'Cyclonic Hindoo Monk' Swami

Vivekananda in the materialistic soil of Europe and America.

So far about these two far-reaching and outstanding great contributions of Swami Vivekananda. Now, I may intend to refer to another of his outstanding contributions before I conclude. Swamiji exhorted us–'Withdraw your million gods and goddesses and keep them in your cupboards for the next fifty years. And in their places, install Mother India, the concrete goddess and serve her. Know that she is not a conglomeration of some hills and mountains, rivers and streams, plants and creepers. The Mother is a living entity. She is my ever-living Mother.' In a deep and loud tone he said to the Indian youth—

"Thou doth never forget—the low-born, the illiterate, the poor, the ignorant, the cobbler, the sweeper are your blood. They are your brothers. Oh, the valiant, gather courage in both hands, say with pride—I am Indian, Indians are my brothers. Say again—the illiterate Indian, the poor Indian, the pariah Indian, they are all my brothers. Covering your loins with a piece of cloth, proclaim with pride—Indians are my brothers, Indians are my life, gods and goddesses of Indians are my God; Indian society is my cradle, the grove of my youth and the last resort of my old age. Oh, brothers, say again-Indian soil is my heaven. Indians' welfare is my welfare. And chant day and night—Oh God Gourinath, oh the World Mother, bestow humanity upon me. Drive out all my weakness, all my cowardice, make me a man."

What a heart-vibrating message!! The first two contributions of Swamiji are to be accepted by means of intellect and reason. But this third grand contribution is acceptable only through realisation of the heart. Hardly one among a million possesses a heart which is enriched with such realisation. So, among the millions of Vivekananda-devotees almost none of us had held this great message of Swamiji, comparable only to a Vedic hymn, high up in our hearts and adopted this seriously as the motto of our lives. Even partially had we done so, there would not have arisen such a distressful situation we are now stepped in.

What is our present predicament? After dismembering limbs of Swamiji's Mother India, we are unabashedly flying the flag of fake freedom. We have murdered democracy, left only is party politics. By tampering down democracy, we are worshipping party politics. More over, we have been worshipping idols of Ganpati Ganesh in millions of our homes. What a hell we have made of heaven on the earth? We have defiled the sacred soil of India with the blood of our brothers. One patriot poet once said—"Again

shall India occupy the highest seat in the comity of nations." Alas, for the sinful deeds committed by us, we have been hurled from the loftiest seat down to the lowest seat. On the other hand opportunist forces—the Kangsas, the Ravanas have viciously polluted the atmosphere of great cities, rendering it awfully dangerous. We are now on the brink of a great disaster and helplessly gasping like exhausted animals. Had anybody of us paid due attention to this clarion call of Swamiji, we would not have to confront such a pitiable situation.

How unfortunate are we, the citizens of India—would we not pause for a moment and think? Is this the ultimate consequence of so much intense movement, agitation and confrontation with the ruling British power after inhuman tortures suffered behind the bars by thousands of patriots in the freedom struggle, of the martyrdom of hundreds of Benoy, Badal, Dinesh and Surya Sen, and of the most painful self-sacrifice of the indomitable *Kshatriya*—like valour of Netaji Subhas? Have all these gone in vain? Shall so many self-sacrifices end into nothingness? Shall we agree to this? No.

Come on! Let's make a solemn declaration. In the words of the rebel poet, let us affirm—"Ever high will I hold my head". The head of our Mother India shall remain high for ever. We will again place her on the most exalted position. This Mother of ours has been sanctified by the wisdom, sacrifice and penance of Gandhi, Chittaranjan, Aravinda, Rabindranath and Vivekandnda. We will again adorn her Head with the crown of glory. We do hereby vow to do that. We are heirs to countless patriots and saints who have renounced their own interests and pleasures. Their blessings are upon us. We will again install our Mother, not in pandals but in the core of our hearts. We will set up her image, made not of clay but of crystal consciousness. We will adorn her with garlands of reverence moistened with tears of unalloyed love for her. We will chant hymns in a chorus of eighty crores of voices. In a deep and loud tone, vibrated with the sense of unity and equality, we will chant that hallowed hymn which the Saint Bankim obtained in meditation, that hymn which shivered the heart of the mighty British forces during Bengal Partition days, that hymn which is unfailing means to bring about national unity. It is not merely a ritualistic hymn. It is a dynamic hymn fully compact with energies. It is 'Vande Mataram'—heart's homage to Mother India.

Jai Swami Vivekanda, Vedanta-Keshari ❑

Bhagabat Gita -- Message

Dr Mahanambrata Brahmachari
M A Ph D D LITT
President Mahanam Sampradaya
Phone 59 4466

All correspondence to
SRI SRI MAHANAM ANGAN,
RAGHUNATHPUR, V I P ROAD, CALCUTTA-700 059

MAHAUDDHARAN MATH 59 Manicktala Main Road Cal 54
MAHANAM MATH Nabadwip Nadia
MAHENDRA BANDHU ANGAN Ghurni Krishnanagar Nadia
MAHAPRAKASH MATH 42/2 Hatkhola Road Dhaka 3
SRI ANGAN DHAM P O Sri Angan Faridpur

Sri R S Gupta, an urdu-speaking gentleman of ripe age and sharp intellect came to me to show his own writing, a genuine translation of "***Srimad Bhagawat Gita***" in verse The Gita, being the epitome of the Hindu scriptures, there exists many such translations of the book, but none I came across in such type of verses The rhythm, metre and choice of words are so beautiful and lucid that it seems Lord Himself has spoken these words I feel sure that the production of such an elegent work is not humanly possible without direct grace of the Lord This graceful translation of the "**Bhagawat Gita**", I comment to all English - Knowing Bhakatas of God to appreciably realise the spirit of the book as found in original Sanskrit, which is known to the seers as *Daibi vak* – Divine language

Mahanambrata Brahmachari ❑
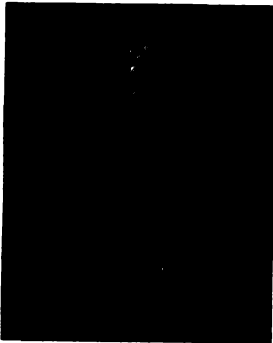
Madhyacharya
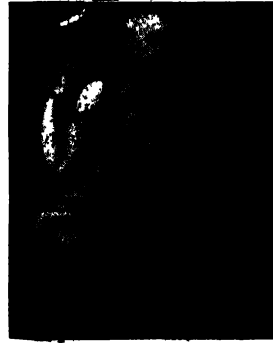
Ramanujacharya

‘শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী’—স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি

● *স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং সভাপতি, ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদ্—*

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির অগণিত গুণমুগ্ধ অনুরাগীর মধ্যে আমিও নিজেকে একজন বলে মনে করি। ...

প্রীতিভাজন বন্ধুগৌরবের সৌজন্যে পূজ্যপাদ মহারাজজীর অনেক গ্রন্থ ভাষণ এবং প্রবন্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। তার মধ্যে সম্প্রতি আমার হাতে যে গ্রন্থটি এসেছে সেটি হ'ল ‘শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী’ (১ম খণ্ড)। এর মধ্যে অনেক প্রবন্ধই আমার আগে পড়া ছিল। সেগুলি গ্রন্থবদ্ধ হওয়ায় তাঁর মননঋদ্ধতা, তাঁর চিন্তার মৌলিকতা, তাঁর মনীষার দীপ্তি, তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিধি এবং সর্বোপরি তাঁব উপলব্ধির গভীরতার এখন পাঠক সাধারণ পরিচয় পাবেন। এই প্রবন্ধগুলি যেমন তাঁর জীবনের অনুভূতির রসে রাঙানো, তেমনি মানুষের অন্তরে নূতন চেতনার প্রদীপ জ্বালানোর ক্ষমতাবাহী। আমরা গ্রন্থটির পরবর্তী খণ্ডের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকলাম। প্রকাশককে ধন্যবাদ—অসাধারণ মুদ্রণ কুশলতা সমৃদ্ধ এমন একটি সুন্দর গ্রন্থকে স্বল্পমূল্যে মানুষের কাছে তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন।

* *শ্রীমাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য শ্রীদীনেশচন্দ্র গোস্বামী, ভাগবত-ভূষণ, সেবাইত, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীবৃন্দাবন ধাম—*

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে পরম ভক্তিমান্ প্রেমাস্পদ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা পরায়ণ শ্রীনাম ও ধামের প্রতি আস্থবান শ্রীমহানামব্রতজী মহারাজ যে অপূর্ব ভাব প্রকট করেছেন তাহা সমস্ত ভাগবত-ভক্তের অনুকরণীয়।

* *মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, ভারতের জাতীয় গবেষণাচার্য মহামহোপাধ্যায় ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী মহোদয়ের গ্রন্থবন্দনা—*

ওঁ “বিশাল-বিশ্বস্য বিধানবীজং বরং-বরেণ্যং বিধিবিষ্ণু-সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে।।”
জগতাং বান্ধবং সৌম্যং শ্রীচৈতন্যস্বরূপকম্।
নমামি সততং ভক্ত্যা শ্রীজগদ্বন্ধুনামকম্।।
মহানামব্রতং বন্দে ব্রহ্মচারি-কুলোত্তমম্।
শ্রীমন্তং ধীমন্তং চৈব প্রজ্ঞান-ভক্তি-ভাস্করম্।।

বর্তমান বিশ্বের এক অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব ‘মহামহোপাধ্যায়’ ‘ভাগবত-গঙ্গোত্তরী’ ড. শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। “বাগ্ বৈ ব্রহ্ম” তাঁর মস্তিষ্কে এবং দেবী সরস্বতী তাঁর রসনাগ্রে ও লেখনীতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্মরণীয় প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর সিংহগর্জনে বিশ্ব প্রকম্পিত হয়েছিল। তার ৪০ বৎসর পরে সেই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে চিকাগোতে এই মহানামব্রতজীর ভাষণ-মাধুর্যে বিশ্বের বিদগ্ধচেতনা পরিপ্লাবিত হ'ল। ১৯৪৭ সনে বরিশাল ধর্ম-রক্ষিণী সভায় তাঁর মাধুর্যময় যুক্তিনিষ্ঠ ভাষণামৃতে পরিষিক্ত হয়ে ধন্য হই। সেই দিন

থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত ছিল আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। ভাষণে যেমন তিনি অদ্বিতীয়, রচনায়ও তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁব সঙ্গে শতাধিক সভায় আমি ভাষণ দিয়েছি। তিনি আমাকে ছাড়া যেতে চাইতেন না। আমি বলতাম, তাঁর এই ভাষণগুলি যদি লিপিবদ্ধ হয় তাহলে জগতের স্থায়ী কল্যাণ হবে, উত্তরসুরী সমৃদ্ধ হবে। তিনি বলতেন, "আমার তো বিবেকানন্দের গুড্‌উইনের মতো কেউ নেই।" অনেক পরে শ্রীমদ্‌বন্ধুগৌরব তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রচনাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশনে প্রবৃত্ত। বেদ-বেদান্ত হতে ইদানীন্তন বিষয় পর্যন্ত, দর্শন হতে বিজ্ঞান—সর্ব বিষয়েই তাঁর রচনা মধুর হতেও মধুর। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর রচনা অনবদ্য। এই রচনাবলীতে তিনি যেন বাঙ্‌ময় মূর্তিতে বিরজিত। সম্পাদক অবহিত চিত্তে তাঁর সর্বপ্রকার রচনা বিধৃত করেছেন। বলতে হয়—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
ভুবনমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ।।"

মহাত্মা মহানামব্রতজী সেই "ভূরিদ জনঃ"। প্রকাশের সাধনার জন্য শ্রীমদ্‌বন্ধুগৌরবও তাই। শাশ্বত ভারতের সামগ্রিক রূপ এই রচনাবলীতে সমুজ্জ্বল। পাঠকেরা স্বাধ্যায় করুন, অন্যান্যদের করান। কালিদাসের ভাষায় বলি—এই অনবদ্য রচনা— "প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় সর্বদা"।

(কিংকর শাশ্বতানন্দ, আচার্য—অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়)

● *শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেদ-অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—*

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী দেশের এক উজ্জ্বল কৃতী সন্তান ও বরেণ্য এক ব্যক্তিত্ব। নানা সময়ে নানা মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন এবং সেগুলি পূর্বে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু এ-যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বাইরেও তাঁর নানা রচনা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। সৌভাগ্যের কথা, আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ্ ছাত্র শ্রীমান্ বন্ধুগৌরব সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে সেইসব ছড়িয়ে থাকা রত্নগুলির কিছু কিছু উদ্ধার করে এনে 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধবলী' নাম দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন। আগ্রহী পাঠকেরা এর জন্য নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীজীর সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য বলেই মনে করি। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখা গিয়েছে প্রয়াত এই সাধকের জীবনে। তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, কত স্বচ্ছন্দ তাঁর ভাষার গতি, কত মধুর ও সুন্দর তাঁর বলার ভঙ্গী। যে-বিষয় পণ্ডিতেরও দুর্বোধ্য, যা অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিও পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দিতে না পেরে নিজেরাই ভাষার জালে জড়িয়ে পড়েন, তা সহজতম উদাহরণ দিয়ে বোঝানো মহানামব্রতজীর কাছে যেন স্বল্পতম আয়াসেরও কোন ব্যাপার নয়। এই বিষয়ে এক সহজাত গুণের যে তিনি অধিকারী ছিলেন তা আর বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই সহজ সরল মাধুর্য-মণ্ডিত ও রসোজ্জ্বল। সম্প্রতি যে নূতন রচনাসমূহ প্রকাশিত হ'ল সেগুলির মধ্যেও তাই এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটার কথা নয়। তাঁর রচনায় আমি আগেই মুগ্ধ ছিলাম, এখনও মুগ্ধ।

আবিষ্কৃত ও সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্য, বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীজগদ্বন্ধু, বিশ্বধর্মসভায় যোগদানের জন্য মহানামব্রতজীর আমেরিকা-যাত্রা, মা আনন্দময়ী-শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন সাধক-সাধিকা ও মনীষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, শালগ্রাম পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। কোন রচনাই কিছুটা পড়ে উঠে পড়ার মতো নয়, শেষ হলেও মনে হয় এখানেই এখনই এত দ্রুত কেন শেষ হল? বেশ তো মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। এই যে পাঠকের মনের মধ্যে তৃষ্ণা জাগাবার ক্ষমতা তা লক্ষ লেখকের মধ্যে কত জনের থাকে? জিজ্ঞাসু পাঠকেরা এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অবশ্যই অনেক অ-জানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পাবেন বলেই মনে করি। এছাড়া গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে দৃষ্টিনন্দন বেশ কিছু আলোকচিত্রও যা আকর্ষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।

পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে সম্পাদক শ্রীমান্ বন্ধুগৌরব প্রবন্ধগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করে দিয়েছেন সূচীপত্রের মধ্যে। যে-ভূমিকাটি শ্রীমান্ সম্পাদক লিখেছেন তাও আমাকে খুশী করেছে। আমি চাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিতে তাঁর জীবন যেন ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যেন হয়ে ওঠে সুন্দরতর ও আনন্দঘন। বেদের ভাষায় বলতে গেলে বলব তাঁর জীবন যেন হয়ে ওঠে 'বর্ধমানং স্বে দমে'। প্রতিষ্ঠানের তিনি যেন যোগ্য থেকে যোগ্যতর উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠেন।

● ***শ্রীমৎ কিংকর সামানন্দজি, দর্শন অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও গভঃ সংস্কৃত কলেজ—***

।। শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী আজ একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর দিব্য জীবন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের শাশ্বত অধ্যাত্ম-গৌরবকে জীবনে বরণ করে নিয়েছেন। পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য-শিরোমণি মহানামব্রতজী জগদুদ্ধারণব্রত উদ্‌যাপনের মুখ্য হোতা। প্রাণপুরুষ। এই কলিযুগে তিনি একটি অধ্যাত্ম বিপ্লবের সূচনা করেছেন, যার লক্ষ্য হ'ল মানব নির্মাণ। মানব জাতিকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেবার প্রয়োজনে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। এর দ্বারা তিনি স্বাধ্যায়রূপ অনন্য সাধনার শিক্ষাও আমাদের দিয়েছেন।

শ্রীভগবান্‌ও তাঁর সৃষ্টির মর্যাদা রক্ষা করেন, তাই স্থূললীলা ও নিত্যলীলার মেল-বন্ধনেই পাওয়া যায় পূর্ণতা। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি—সকলেই এই সত্যের উন্মোচন করে লেখনীধারণ করেছিলেন। মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষের শ্রীবিগ্রহের মতোই মহিমাময় তাঁদের বাঙ্ময় বিগ্রহ। কারণ কথাও মানুষের একটি রূপ।

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—এগুলিও শ্রীভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ। তার সেবা করে কৃতার্থ হবার জন্যও লাগে অধিকার। এ যুগের মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে চঞ্চল। দুঃখী। এদের প্রতি করুণাবশতঃ শাস্ত্রদৃষ্টিহীন মানুষকে শাস্ত্র তথা শ্রীভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ দর্শন করানোর জন্য মহানামব্রতজী যে জ্ঞান-প্রেম সত্রের অখণ্ড আয়োজন করেছেন তারই নবতম উন্মেষ হল তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন প্রকাশ।

সম্প্রতি এই গ্রন্থের আশু প্রকাশ্য দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিটি দেখার সুযোগ হয়েছিল, সে-সূত্রে আরও দু'একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আচার্য মহানামব্রতজী যে শুধু সারস্বত সন্ন্যাসী ছিলেন—এমন তো নয়, তিনি যুগের মানুষের কাছে প্রেম-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহও ছিলেন।

আমরা জানি শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহটি হ'ল 'শ্রীগুরু'। শ্রীগুরুদেবের দেহটি ঈশ্বরের লীলাবিগ্রহ। মানুষীতনু আশ্রয় করে শ্রীভগবানই ভক্তের প্রতি কারুণ্যবশতঃ গুরুবিগ্রহে প্রকাশিত হন। গুরুমুখে ঈশ্বরই কথা বলেন! শাস্ত্র ও গুরুই সমাজকে শাসন করেন। আমাদের কায়মনোবাক্যে কোথাও যদি কোন অসঙ্গতি আসে, গুরু তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন করে আমাদের ছন্দে ফিরিয়ে দেন। শ্রীগুরুবিগ্রহ মহানামব্রতজী একজন লোকশিক্ষক। তাই তিনি যথাসময়ে ক্ষেত্র-বিশেষে বহুরূপে ধরা দিয়েছেন। কখনও বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমের মতো কোমল তাঁর মাতৃহৃদয়! একথা কে-না জানে? দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সেই চরিত্রের বেশ বর্ণময় বিচ্ছুরণ ঘটেছে। সমকালীন পণ্ডিত মূর্দ্ধন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাবলীলভাবে শাস্ত্রে পরিপ্রশ্ন ও মনন করেছিলেন তিনি এমনই অসাধারণ কিছু দলিলও এখানে নথিভুক্ত হয়েছে; যা আগামীদিনে গবেষকের মহৎ উপকার সাধন করবে বলে আমি মনে করি। যেমন মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'চেতনার আরোহিণী' গ্রন্থের বিষয়ে একটি অসাধারণ মতামত আমাদের প্রাপ্তি হ'ল এবং সেই সূত্রেই অদ্বৈত বেদান্ত বিষয়ে মহানামব্রতজী কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যার উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব বর্তমানে বেদান্তীদের ওপর বর্তেছে বলে মনে করি। যেমন তিনি বলেছেন—শংকরের মত অমূর্ত। অতএব অমূর্তের আধারে ব্যাবহারিক বেদান্ত সম্ভব হয় কী করে?

এরপর 'কেশব কাশ্মিরী শীর্ষক রচনায়ও অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে তিনি বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন, যার আধার হ'ল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবমাননা। যা বৈষ্ণবাচার্য পরমভাগবত মহানামব্রতজী একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। সঙ্গত কারণে তিনি নানা যুক্তি ও শাস্ত্রোদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের রাজ্যে বিশিষ্ট অবদান যাঁদের আছে, তাঁদের ভাবনা, কর্ম ও রীতির সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগও এই গ্রন্থটি করে দিয়েছে। অনেক অল্পালোকিত বা অনালোকিত অধ্যাত্ম তথা মননজগতের ইতিহাসেরও ঝাঁকি দর্শনের সুযোগ আমরা এখানে পেয়েছি। এমনই একটি নিবন্ধ হ'ল—'শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব'। এটি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে সংশয়ীর ভাবনার প্রত্যুত্তর। বিষয়গুলি আমাদের নতুন করে ভাবায়। দায়িত্ব সচেতনও করে তোলে।

পরমবৈষ্ণবের লেখনীতে তন্ত্রতত্ত্ব কত মসৃণ এবং উপাদেয় হতে পারে তার প্রমাণও এই গ্রন্থেই পাওয়া যাচ্ছে। আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হ'ল শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের 'বিরক্ত পূজা' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীশ্রীমহানামব্রতজীর নিবেদন! বিশেষতঃ সাধুদের জীবনদর্শন ও আচরণের

অনিবার্য সহায়ক এই গ্রন্থের সূত্রে আচার্যদেবের গভীর মনন—সোনায় সোহাগা হয়ে হাতের কাছে এসেছে। এমনই অসংখ্য বিষয় ছড়িয়ে রয়েছে এই বই-এর প্রতি পাতায়। কৌতূহলী জনের কত যে উপকার হ'ল, তা বলার ভাষা আমার নেই।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী, প্রথমখণ্ডে আমরা একসঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোকিত হয়েছি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অল্প পরিচিত বা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অপরিচিত মহানাম-মনন-মহাপ্রসাদ পরিবেশন করে মহানাম সঙ্ঘের বর্তমান আচার্য শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারীজী এবং সঙ্ঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজী এ যুগের মানুষের মহৎ উপকার সাধন করেছেন। এই মহাগ্রন্থের বিশেষ প্রাপ্তি হ'ল বেদান্ত, ভাগবত ও তন্ত্রের বৈষ্ণব-অবলোকন।

জ্ঞান-গঙ্গোত্রী আচার্যদেব যা বলে গেছেন, যা শিখিয়েছেন, তার রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টাও মাদৃশ অভাজনের বাতুলতা। মূল্যায়ন তো দূরের কথা, তাঁর কথাগুলি স্পর্শ করে পবিত্র থাকতে চেষ্টা করি। তাঁর শব্দ মননে বড় আনন্দ হয়। সেটুকুই চাই। এই গ্রন্থের বাকি খণ্ডগুলি যথাকালে প্রকাশিত হয়ে জগতের কল্যাণ করুক এই প্রার্থনা করি। মনে রাখি গ্রন্থ স্বয়ং গুরু। সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষকে আবার অভিনন্দিত করি। শ্রদ্ধাও জানাই। জয় জগদ্বন্ধু। জয় মহানামব্রতজী।

● ***শ্রীমৎ ভদ্রচারু দাস, সম্পাদক, মায়াপুর বিকাশ সংঘ, ইসকন, মায়াপুর—***

পরমপূজ্য বৈষ্ণবাচার্য ড. শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি বৈষ্ণব জগতে নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্ট প্রতিভা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সারস্বত সাধনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে গিয়েও বিদ্বৎ মণ্ডলীর কাছে বৈষ্ণব দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার প্রচারেও তিনি অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর রচনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মঞ্জুল এবং সর্বজনবোধ্য। তাঁর অনুগামীগণও ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা তাঁর শিক্ষা এবং আদর্শকে জনসমাজে তুলে ধরেছেন, কেবল বৈষ্ণবগণই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর পারমার্থিক অবদানের কথা চিরতরে মনে রাখবেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগৌরবদাস ব্রহ্মচারীজির সংকলিত শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী পাঠ করবার সুযোগ আমি লাভ করেছি। তিনি অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন ও শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। জনসাধারণের বৈষ্ণব ধর্মের উপর যে ভ্রান্ত এবং অসম্পূর্ণ ধারণা রয়েছে এই গ্রন্থ তাঁদের সন্দেহ নিরসন করবে। ইনি একাধারে একজন বৈষ্ণব সাধক, সাহিত্যিক, কবি, প্রচারক এবং দার্শনিক। উনার শ্রীচরণে আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

● ***শ্রীমৎ মাধবানন্দ দাস, সম্পাদক, 'শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর' পত্রিকা, শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম—***

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির স্বহস্ত লিখিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংকলনটি পড়ে শুধু আনন্দ লাভ নয়, নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। কারণ এই গ্রন্থে পরা তত্ত্ববস্তুর যে সারগর্ভ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা অন্য কুত্রাপি আশা করা যায় না। এতাদৃশ সাবলীল ভাষায় সর্বজন উপযোগী আলোচনা পড়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। আমার

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ বৈষ্ণবচরণ দাসজী পূজ্যপাদ মহানামব্রতজীর অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও আদরণীয় ছিলেন। সেইসূত্রে আমি বহুবার তাঁব দর্শন পেয়েছি এবং একাধিকবার উনার শ্রীমুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনে সমৃদ্ধ হয়েছি। আজ তাঁর লিখিত 'প্রবন্ধাবলী' পাঠ করে তিনি কত উচ্চস্তরের প্রজ্ঞাঘনমূর্তি ছিলেন ভাবিয়া বিস্মিত হই। বিদ্বৎ সমাজে তথা বৈষ্ণব জগতে এবংবিধ মহাজন বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী পাঠ কবে মানবজাতি আত্যন্তিক কল্যাণলাভে ধন্য হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

● *অধ্যাপক ড. প্রভাসচন্দ্র ধর, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়—*

সাহিত্য কর্মের শরীর দৃষ্টে তাদেরকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। ছন্দোবদ্ধ রচনাকে পদ্য ও স্বাভাবিক সাবলীল রচন্যকে গদ্য বলা হয়। বিষয়বস্তু দেখেও সাহিত্য কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাকে কবিতা ও বুদ্ধি ও যুক্তিপূর্ণ রচনাকে গদ্য বলা হয়। William Wordsworth বলেছেন, 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings". তবে এসব তত্ত্বকথা; বাস্তবের উত্তাপে গলে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। Alexander Pope-এ Essay on Criticism একটি ছন্দায়িত বচনা। আচার্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী দুর্ঘটনায় পড়ে কোনমতে বেঁচে গেলে সেই অভিজ্ঞতা সবস ছন্দায়িত রচনায় বর্ণনা করেন। নাম-না-জানা একজন বলেছেন, 'প্রবন্ধ বলতে বোঝায় গদ্যবচনা যাতে লেখক সরাসরি আপনার চিন্তাভাবনাকে যুক্তবদ্ধ করে প্রকাশ কবেন।' এই এক-বাক্য সংজ্ঞাটিতে আলোচ্য প্রবন্ধাবলীব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

শ্রীমৎ মহানামব্রত-ব্রহ্মচারীজী একজন অতি উচ্চশিক্ষিত, বৈষ্ণব, বাগ্মীপুরুষ ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার অধিকাংশই ধর্ম, অধ্যাত্ম, শাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ক ছিল। আমার মত দীন জনের মতে তাঁর বক্তৃতা ছিল মুখনিঃসৃত ও তাঁর লেখা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা যুক্ত গ্রন্থরাজি ও প্রবন্ধাবলী লেখনীনিঃসৃত। এছাড়া এই দুইয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। বছরের পর বছর ধরে বক্তৃতা করে তিনি যে লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন, তেমনি লেখনী ধরে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখি অগণিত পাঠককে মুগ্ধ করার ব্যবস্থা করেও রেখে গেছেন। বক্তৃতা তাৎক্ষণিক ও সমবেত নিকটস্থ শ্রোতৃবৃন্দের জন্য; লেখা স্থান ও কালের ব্যবধান জয়ী, দূরের ও অনাগত কালের পাঠকদের জন্য, তাদের প্রাপ্তি ও তৃপ্তির জন্য। 'প্রবন্ধাবলী'তে পাঠক তাঁর অনুপম বক্তৃতামালাই পড়তে পান। তফাৎ কেবল এই সে বক্তৃতা শ্রবণগোচর হতো, লেখা নয়নগোচর হয়। আচার্যজীর চিন্তাভাবনা তাঁর অন্তরস্থ জ্ঞান ও ভক্তির রসে জারিত হয়ে প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিকে একত্র করে সংকলন করে সংকলক সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমরা প্রার্থনা করি তিনি এই ভাবে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে বাংলা ধর্ম সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করতে থাকুন।

● ***পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্মা, বেদ অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—***

ভারত-স্বাধীনোত্তর কালে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে পরম বৈষ্ণবাচার্য শ্রীব্রহ্মচারীজি বৈদিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরোপম রূপে বিশ্ববন্দিত। তাঁর রচিত শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থমণি অবলোকন করে পরম প্রীত হলাম। এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসু জনের জ্ঞানার্জনে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার। ইহা মৃত্যুর নিষেধাত্মক তথা অমৃত লাভের সোপান স্বরূপ। এই রহস্যের বিবরণ তো ওপরে ওপরে অনেক দেখা যায়। কিন্তু ইহার মার্মিক তত্ত্বান্বেষণ বঙ্গ-ভাষাতে এরূপ প্রস্তুতিকরণ সর্বথা অভিনব তথ্যবিমণ্ডিত। এই গ্রন্থরত্নে সর্বাধিক উপলব্ধি হ'ল নিখিল বৈদিক স্রোতে বিকীর্ণ সামগ্রীর কেবল সঙ্কলনাত্মক নহে; কিন্তু তিনি একবাক্যতা সিদ্ধ করেছেন। ইহা হ'ল—একটি মহান্ স্বয়ং বাচিক ধর্মগ্রন্থ। ... উক্ত প্রবন্ধাবলীর পরিচিন্তন বঙ্গভাষা-ভাষীগণের জন্য পরম গৌরবময়ী।... আচার্য ড. শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির বেদবিশ্লেষণ এবং বেদপ্রতিপাদ্য গ্রন্থস্থ অন্যান্য প্রবন্ধগুলি যুক্তিযুক্ত ও বেদসম্মত ব্যাখ্যা হওয়ায় সর্বথা স্বীকরণীয় ও প্রশংসনীয়। আমার পূর্ণ বিশ্বাস—এই বেদরহস্য উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যাতা শ্রীমহারাজজীর বৈদিক লৌকিক পরিচিন্তন শাস্ত্রাধ্যয়নের একটি নূতন অধ্যায়রূপে স্থান পাবে এবং উত্তরকালে সমানান্তর অধ্যয়নের প্রেরণা দেবে।

অন্তে নিত্যধামগত লীলাপ্রবিষ্ট তপোনিষ্ঠ সর্বত্যাগী বিদ্বদ্বরেণ্য বিশাল বিভূতি শ্রীল শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের মহা লেখনশক্তিকে শ্রদ্ধাতিশয় নিবেদন করি এবং তাঁর রচনার অমরত্ব কামনা করি।

● ***ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীমৎ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, আগরতলা***

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিকৃত 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটি অতিসুন্দর মনোরম আকর্ষণীয়। খুবই ভক্তিমূলক কথা এখানে বিস্তৃত আলোচিত। বৈষ্ণব আচার্যগণ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত—"ভক্তি বিনা মোরে কেহ নাহি পাউ।" "ভক্তি বিনা জীবের না হয় কল্যাণ।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা উপদেশ। তাই বলছেন, মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ গোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ-সনাতনাদি ষড়-গোস্বামীগণকে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করবার জন্য উপদেশ করেছেন। মহানামজীর এই ভক্তিতত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থটি তাই আমাদের পরশ আদরণীয় এবং সকল বৈষ্ণবগণেরই প্রাণসর্বস্ব। এই গ্রন্থে রয়েছে শব্দব্রহ্ম ভগবানের অমৃত উপদেশ। সকলেই যেন এই গ্রন্থ অনুশীলন করে অমৃতলোকে ভগবানের পাদপদ্মের অমৃতসেবা লাভের সৌভাগ্য লাভ করে মানব জীবন ধন্য করেন, আদর্শ জীবন লাভ করে কৃতার্থ করেন।

● ***ড. বৃন্দাবনবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা, মোহন্ত, শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর—***

ড. শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি মহারাজের ঐতিহাসিক জীবনশৃংখলায় বর্তমান প্রবন্ধাবলীর সংকলনও এক অনবদ্য সংযোজন। পরম ভাগবত বৈষ্ণবকুলতিলকের লেখনীর ফসল বেদবেদান্ত

উপনিষদ্ গীতা তন্ত্র পুরাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও জগদ্বন্ধুসুন্দরের দর্শনের অনলস প্রবচনে ও সরস লেখনে রত্নাকরের রত্ন ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের গৌরবময় ইতিহাসের পাতায় এই অনন্যসুন্দর আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাগবত-গঙ্গোত্রীর অতুলনীয় অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

● ড. *ব্রজগোপাল রায়, আগরতলা, প্রাক্তন মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার—*

ড. শ্রীমহানামব্রত জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন পরিষৎ কলকাতা থেকে প্রকাশিত বন্ধুগৌবব ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্তৃক সংকলিত 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড)' গ্রন্থটি জিজ্ঞাসু পাঠকমহলে এক অমূল্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাঁর অসংখ্য লেখায়, ভাষণে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় আমাদের জন্য যে সম্পদ্ দিয়ে গেছেন তা চিরকাল আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অম্লান হয়ে থাকবে। এ সবের বাইরেও তিনি বিভিন্ন স্থানে বহু বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন এবং উপদেশ নির্দেশাদি দিয়েছেন। সেসব বিষয়গুলোও আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হওয়া দরকার। বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজী এ বিষয়টি নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে যে গ্রন্থটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন তাতে পাঠক মাত্রই যে আলোকিত এবং পুলকিত হবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থটিতে বেদ-বেদান্ত ও দর্শন বিষয়ে ৯টি প্রবন্ধ, তন্ত্র ও মাতৃসাধনা বিষয়ে ৬টি প্রবন্ধ, রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে ৩১টি প্রবন্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে ১৪টি প্রবন্ধ, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, পরিকর ও বন্ধুবাণী ব্যাখ্যা নিয়ে ৬২টি প্রবন্ধ, বিবিধ বিষয়ে ১০টি প্রবন্ধ এবং মহাজীবন স্মরণে ৩৭টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রতিটি লেখা ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর জ্ঞান সমুদ্র থেকে উঠে আসা উজ্জ্বল মণিরত্নের মতই আপন আপন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। ড. ব্রহ্মচারীজী স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁর চিত্ত পরম-পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত। তিনি যখন যে কথা বলেন মনে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রতিটি কথা বিশেষ অর্থবহ, প্রতিটি কথা পাঠককুলকে ভাবায় এবং এক কাঙ্ক্ষিত লোকের দিকে নিয়ে চলে। তাঁর 'গীতাধ্যান', 'চণ্ডীচিন্তা', বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন, হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুর জীবন রহস্য বর্ণন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা যে ভাবে বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে নেই কোন জটিলতা। সহজ কথাকে সহজভাবে বলে পাঠক মাত্রকেই সঙ্গে নিয়ে চলায় অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত এসব লেখায়। এখানে তিনি কেবল বক্তা নন, পথপ্রদর্শকও বটেন।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী আমাদের নতুন কথা শুনাবার জন্য এসেছিলেন গৌরলীলা বন্ধুলীলার মূল ধারা থেকে। তিনি নিজে অমৃত রসধারায় অভিস্নাত। জ্ঞানের জগতে তাঁর যা কিছু সঞ্চয় সবই তিনি অকাতরে বিলিয়ে গিয়েছেন সর্বজনের হিতে। সে অমৃতকণাগুলো কুড়িয়ে এনে জগতের দিশাহীন অন্ধ পথিকদের সঠিক পথের সন্ধান দেবার কাজ যত বেশি হয় ততই মঙ্গল। আমরা মহানামব্রত প্রবন্ধাবলী - ২য় খণ্ডের প্রকাশের অপেক্ষায় আছি।

● *শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, অধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বেদান্ত মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—*

পরম শ্রদ্ধেয় ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সূত্রে বাহক ও সংরক্ষক। তাঁর চেতনায় চিন্তায় ও মননে বক্তৃতায় প্রবন্ধ বিশ্লেষণে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচারধারা সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত। আমার বাল্যকাল থেকে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁর 'গীতাধ্যান' গ্রন্থটি আমাকে পরমার্থ পথের সন্ধান দিয়েছে। সুদূর অন্তঃপাতি গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করেও 'গীতাধ্যান'-এর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকের ব্যাখ্যানে পরমানন্দে আপ্লুত হয়ে সংসার ত্যাগ করে শ্রীনবদ্বীপ ধামের পথে পথে বিচরণ করতে করতে উপস্থিত হই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে শ্রীচরণে। তাঁর অবদান আমার জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনা। অনেকে তাঁর লেখনীব সঙ্গে অন্যের তুলনা করেন। আমি বলি—তাঁর তুলনা—তিনিই—অতুলনীয়। শ্রীমান্ বন্ধুগৌবব ব্রহ্মচারীর সংকলিত 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম)' আদ্যন্ত অনুশীলন কবে এই উপলব্ধি হয়েছে।

● *শ্রীমৎ শান্তিময় গোস্বামী, পাঠক, শ্রীশ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভু 'মন্দির, শ্রীধাম নবদ্বীপ—*

শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি ছিলেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবাদপ্রতিম ভাগবত পাঠক। তাঁর 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থখানি এক কথায় অতুলনীয়। বৈষ্ণব-জগতের কাছে প্রার্থনা কবি—এই গ্রন্থ পাঠ করলে অবশ্যই তাঁরা এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভে সমৃদ্ধ হবেন।

● *শ্রীমৎ গুরুবন্ধু দাস, শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর—*

ফুলটি কোথায় সবচেয়ে বেশি মানায়? দেবতার শ্রীচরণে। আর সেই ফুল দিয়ে যদি মালা গেঁথে দেবতাকে পরানো যায়, তবে কি সুন্দরই দেখায়। সহজাত সুন্দর সুগন্ধি ফুল যেন শ্রীবিগ্রহর স্পর্শে আরো মনোহর হয়ে ওঠে। কিন্তু মালা তো এমনি এমনি হয় না; প্রথমে ফুলগুলি তুলে এক যায়গায় করতে হবে, তারপর একটি একটি করে সুতোর মধ্যে পরিয়ে তবে হবে মালা। প্রিয় বন্ধু বন্ধুগৌরব সেই ভারটি নিয়েছে। শুধু তাই নয়, মালাটি আবার দেবতার প্রসাদী করে ভক্তগণের গলায় পরাচ্ছে; শ্রীপাদ রামদাস বাবাজীর কথায় "যেন শকতি জাগায়ে দিল, মালা-চন্দন পরানোর ছলে....।" শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী মহারাজ এই দুই জনই জগৎ-সংসারে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপার দান। ব্রহ্মচারী মহারাজের এক-একটি লেখা যেন এক-একটি সুগন্ধী ফুল। সেই লেখারূপ ফুলের মালার তুলনা হয় না। নিজ শ্রীমুখের কথা—"আমার লেখার মধ্যেই আমারে পাইবা।" সবার কাছে ব্রহ্মচারী মহারাজকে পৌঁছে দিয়ে বন্ধুগৌরব বন্ধুর কাজ করেছে।

● *শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, বেদ ও রামায়ণ-মহাভারত বিষয়ক বহু গ্রন্থকার—*

ভাগবত-গঙ্গোত্রী শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হ'ল। ভাগবত-কণ্ঠ ভগবানের বাণী হয়ে পাঠকের সামনে হাজির। এই অমৃত নির্ঝর বাংলার পাঠক-সমাজের কাছে পরম আশীর্বাদের মতো। স্বর্গের দেবতারা যেমনভাবে কথা বলেন মহানামব্রত-র রচনাও তাই।

এর মাধুর্য অমৃত-নিঃস্যন্দী কথা একত্রে পাঠকরা পেয়ে ধন্য হলেন। আর এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে যে পরিশ্রম যে যত্ন যে ভক্তি প্রয়োজন এবং সর্বোপরি যে অধিকারের প্রয়োজন তা পরমভক্ত বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীর মধ্যে বিরাজমান। তার কাছে বাঙালি পাঠক সকৃতজ্ঞচিত্তে চিরঋণী থাকবেন। ভক্তিরসে আপ্লুত এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে গুরুকৃপায়। গুরুসেবায় তদ্‌গতচিত্ত বন্ধুগৌরবের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই।...

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী বাঙালিকে এক অক্ষয় গৌরবে বিধৃত করেছে। বেদ-বেদান্ত-দর্শন, তন্ত্র-মাতৃসাধনা, রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব দর্শন সবেতেই যেন তাঁর সাধনার শক্তিস্পর্শ। তিনি গ্রন্থ রচনা করেননি, ভাবসঞ্চার করেছেন। মুদ্রিত অক্ষরগুলি তাঁর কণ্ঠস্বর। কথ্যবস্তুকে ভাবঘন আনন্দের অমৃত-রসধারায় পরিণত করে অযাচিত দাক্ষিণ্যে বিতরণ করেছেন। তাঁর শ্রবণ-মঙ্গল যে-কোনও প্রবন্ধ পাঠ করার সময় মনে হবে আমরা পাঠ করছি না, তিনি যেন আমাদের অন্তরে এসে তাঁর আনন্দের আসনে বসে মৃদুমধুর ধ্বনিগুঞ্জন কীর্তন করছেন। তাঁর শ্রীচরণে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

● *উদ্বোধন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র)—*

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর লেখা আলোচ্য প্রবন্ধ সঙ্কলনটি পাঠান্তে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত না হয়ে থাকা যায় না এবং তারপরও সেই রেশ হৃদয়কে ছুঁয়ে থাকে প্রার্থিত লোকের অনুসন্ধিৎসায়।...

গ্রন্থটি বৈচিত্র্যপূর্ণ আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, প্রকাশের সরলতায় প্রবন্ধগুলি শুধু ভক্ত-অনুরাগীকে নয়, সকল শ্রেণির পাঠককে অপার আনন্দ দেবে, সহায়তা করবে শাশ্বত ভারতকে জানতে। প্রতিটি লেখায় মিশে আছে ব্রহ্মচারীজির অনুভূত সত্য, যা পাঠকদেরও কাঙ্ক্ষিত সত্যের সন্ধান' দেবে।

গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ 'মহাজীবন স্মরণে'। লেখক অবলীলাক্রমে কয়েকটি কথাতে একটি তুলির আচড়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁদের অনবদ্য জীবন চিত্র। গ্রন্থটির অন্যতম সম্পদ্ সঙ্কলক বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রম এবং রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ভূমিকা', সুবোধ চৌধুরীর 'প্রাক্‌কথন' ও সুধীর চক্রবর্তীর 'কথামুখ'।

● ***অধ্যাপিকা ড. ইরা ঘোষাল, বাংলা বিভাগীয় প্রাক্তন প্রধান, টি.এম. ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়—***

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী পাঠে অভিভূত হয়েছি। বৈষ্ণবাচার্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী যথার্থই ভারতবর্ষের সর্বাত্মক ঐক্যবদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতীক। ভারতবর্ষের সনাতন সত্য যেন গ্রন্থটিতে মূর্ত যা অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সনাতন গ্রন্থগুলি আলোচনা করে তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে অমৃতলোকের পথ দেখিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ বর্তমানকালে অজস্র বিভেদ ও বিচ্ছিন্ন সমাজে মিলনাত্মক জীবনাকাঙ্ক্ষার এক অনন্য দলিল।

শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলীতে বিষয় এবং ভাব যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাতে বাঙালীচিত্তে অধ্যাত্ম সাধনার নতুন উপলব্ধি অনুভূত হয়েছে। গভীর আত্মিক পরিতৃপ্তিও লাভ করা সম্ভব

হয়েছে।

শ্রীবন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী গ্রন্থটিতে বৈষ্ণবাচার্য মহানামব্রতজীর রচিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত করে বৈষ্ণব সাহিত্য ধর্ম ও দর্শন যথাযথ অধিগত করার আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের গভীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির পরিচায়ক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্র যেন গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবন্ধুগৌরবের এই প্রচেষ্টা যথার্থই গৌরবের। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

● ***শ্রীঅজিতকুমার নায়ক, প্রাক্তন বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট—***

শাস্ত্রে আছে তীর্থভ্রমণ বা শাস্ত্রপাঠের ফল কালে কালে হয় কিন্তু সাধুদর্শনের ফল হয় তৎক্ষণাৎ। এই রকম একজন সার্থকনামা মহাসাধক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী। বিংশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের এক বিস্ময়কর মূর্তি। বৈদগ্ধ্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভক্তি ও প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েকবার তাঁর সান্নিধ্য—কিছু সময়ের জন্য সঙ্গ করার। ধন্য হয়েছিলাম।

আমাদের দেশের সত্যানুসন্ধানী ঋষিরা অনুভব করেছিলেন অধ্যাত্ম সাধনাই সত্য উপলব্ধির একমাত্র পথ। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু দূর সেই পথে যাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণ সত্যে পৌঁছানো যায় না। মহানামব্রতজীর জীবন-কাহিনী ও তাঁর রচনাবলী এই প্রথম বিজ্ঞান-চেতনার যুগেও সেই সত্যসন্ধানের নিঃসন্দেহে একটি দিক্-নির্ণায়ক। এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও কথার কথা নয়। তাঁর সুযুক্তিপূর্ণ বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' এবং অন্যান্য রচনাবলী বিশেষ করে গীতাভাষ্য ও বিদেশে প্রদত্ত অভিভাষণগুলি ভারতের শাশ্বত বাণীকে যুগোপযোগী আধুনিক মোড়কে পরিবেশন করে পাশ্চাত্ত্যের সন্দেহাকুল সন্দিগ্ধ মনে এক নতুন সত্যের পথ দেখিয়েছে। ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা কালের গতিতে এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই প্রচলিত ধর্ম যখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে চোরাগলিতে প্রবেশ করে, তখন এই সব মহাপুরুষ আসেন ভারতভূমিতে—যাঁরা তাঁদের জীবন ও বাণী দিয়ে মানুষকে চালিত করেন—সঠিক ধর্মের রাজপথে। বাস্তবিকই মহানামব্রতজী ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক; ভারত-পথিক বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে বৈদিক শাস্ত্র মন্থন করে শাশ্বত আত্মার আবরণ উন্মোচন করেছেন। আর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন সেই আত্মার চিরকল্যাণময়ী চিন্ময়ী ভাগবতী রূপ।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমন্‌মহানামব্রতজীর পুণ্য জন্মশত বর্ষ উদ্‌যাপন পরিষৎ এবং ব্যক্তিগত ভাবে সংকলক বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহানামব্রতজীর প্রবন্ধ সংকলনে যে প্রচেষ্টা করছেন তার জন্য আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই, অভিনন্দিত করি।

● ***শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সংঘ—***

শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সম্পাদিত 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থখানি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই গ্রন্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাব আনার জন্য বিশেষ উপযোগী এবং কার্যকরী হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি এই মহৎ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

● *ড. প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ, অবঃ সংস্কৃত অধ্যাপক, চন্দননগর সরকারী কলেজ—*

সনাতন বেদ বেদান্ত উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ধর্মশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদির সূক্ষ্ম তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় মহামহোপাধ্যায় ড. শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি তাঁর নিবন্ধাবলীতে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা এককথায় তুলনাহীন। আচার আচরণে, জ্ঞান ও বিদ্যার স্ফুরণে, চরিত্র ও জীবন গঠনে মহানামব্রতজীর অমৃতস্নাত লেখাগুলি পথিকেব পরম পাথেয়। তাঁর এই অসামান্য প্রবন্ধাবলী ক্ষুধার্ত ও তৃষিত পাঠকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে ব্রহ্মচারীজির রচনা ও গ্রন্থগুলি দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের মত উপযোগী হবে। 'উপমা কালিদাসস্য' আমরা জানতাম। এখন জানলাম 'উপমা মহানামব্রতস্য'। পাণ্ডিত্যের খনি, সাধক-শিরোমণি ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি সকলের নয়নের মণি হয়ে আছেন। তাঁর রচিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুরভিত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে মাল্যাকারে গ্রথিত করেছেন আমাদেরই গৌরবাস্পদ বন্ধুগৌরব। এজন্য তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বাংলার ও ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে যদি একজন করেও স্মরণীয় ও বরণীয় এই সর্বশাস্ত্রনিষ্ণাত সাধক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচাবীজির পাণ্ডিত্যে ভরা ও সকলের মন জয় করা কালজয়ী প্রবন্ধাবলী ও গ্রন্থগুলি নিত্য পাঠ করেন তবে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীজি সত্য সাধনা ও আরাধনার জয়পতাকা বহন করে এনেছিলেন। প্রেমে ভরা সকল মন আলো করা অতুলনীয় ও অননুকরণীয় তাঁব দিব্য জীবন। তাই তাঁকে স্মরণ করি বরণ করি আনত চিত্তে। তাঁর সম্পর্কে শেষ করি এই বলে—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎ সুখ-সাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।।"

● *প্রভুপাদ শ্রীমৎ নিশীথ গোস্বামী, ধামেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দির, শ্রীধাম নবদ্বীপ—*

শ্রদ্ধেয় ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচাবীজীর রচিত এই গ্রন্থে যে অনন্যসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয় বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। গ্রন্থ রচনা কালে যথেষ্ঠ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সাধন-ভজন ও পাণ্ডিত্যবিহীন মাদৃশ জীবাধমদের কথা তিনি ভুলে যান নি, বরঞ্চ আমাদের মত মানুষের যাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, সেইভাবেই তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। তাই সেই প্রয়াত প্রযত আত্মা ব্রহ্মচারীজির উদ্দেশ্যে অকপট কৃতজ্ঞতা-অঞ্জলি নিবেদন করা ছাড়া আর আমাদের প্রদেয় কিছু নেই। প্রশান্ত সাগরের তীরে অবস্থান করে তার গভীরতার পরিমাণ যেরূপ সম্ভব নয়, সেইরূপ আমার মত সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বিচার-বিশ্লেষণমুখে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সে প্রযত আত্মার অকৃপণ হস্তে বর্ষিত আশীর্বাদই কামনা করি।

● *প্রভুপাদ শ্রীমৎ স্বরূপদামোদর গোস্বামী, শ্রী শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীনবদ্বীপধাম—*

'ভাগবত-গঙ্গোত্রী' ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী'র শ্রীপাঠে আমাদের মন এক অমৃত-লোকের অনুভূতির অনুভব করায়। এই গ্রন্থ আরও বেশী প্রচার ও প্রসার লাভ

করিলে দ্বন্দ্বের পৃথিবী আনন্দ-ধারায় স্নাত হবে। শ্রীপাঠকালে এই গ্রন্থের রসাস্বাদনে মনে হইয়াছে গ্রন্থটি যেন সর্বশাস্ত্র-প্রপূর্তি। তাই রবি কবির ভাষায় বলিতে হয় "তোমার কীর্তিতেই তুমি অমর।"

রাজা মহানামব্রত ব্রহ্মচারী—সুরলোকে যখন শংখধ্বনি ঘোষিত হয়, নরলোকে যখন দুন্দুভি বাজে তখন মনে হয়—"রাজার রাজ্য জলবিম্ব কভু জাগে কভু হয় লীন। ভূ-রাজ্য বিহীন রাজা মনোরাজ্যে রাজ চিরদিন।"

- *প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিষ্ণুপ্রসাদ গোস্বামী, ধামেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দির, শ্রীধাম নবদ্বীপ—*

"নবদ্বীপময়ী নমি জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা। যাঁর আরাধ্য গৌর জীবনপরিত্রাতা।।"

প্রাকৃত জগতে জগদ্বন্ধুসুন্দরের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শ্রীমন্‌মহানামব্রতজী গৌর-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য ও শক্তিতত্ত্ব তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি এবং ভগবদ্ভক্তিপথে অগ্রসরে পাথেয় লাভ করিয়াছি।

- *শ্রীমৎ বিষ্ণুদাস বাবাজী, মোহন্ত, শ্রীশ্রীসমাজবাড়ী আশ্রম, শ্রীধাম নবদ্বীপ—*

অপূর্ব এই শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী। এমনটি হয় নাই, আর হবার নয়। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের কৃপাতেই ইহা প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বন্ধুসুন্দরে সাক্ষাৎ কৃপাধন্য। জগতের কল্যাণের জন্যই তিনি তাঁহার এই রচনাসম্পদ্ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ও কৃপাপ্রার্থী।

- *শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সরস্বতী, সভাপতি, শ্রীগুরুসংঘ —*

বৈষ্ণবাচার্য পরমপূজ্য শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির রচিত 'প্রবন্ধাবলী' একটি অমূল্য গ্রন্থরূপে ধর্মপিপাসুগণের কাছে আদৃত হয়েছে। এই গ্রন্থ সংসারীদের ধর্মাচরণে এবং ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সনাতন ধর্ম, দর্শন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং বৈষ্ণবদর্শন, আমার আচার্যদেব শ্রীগুরুসংঘ-প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্যবর শ্রীশ্রীমদ্দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব ও অন্যান্য ভাগবতপুরুষদের স্মরণে এবং বিভিন্ন শিরোনামায় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত রচনাগুলি বর্ণনাতীত। সংকলক হিসাবে বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজীর প্রয়াসও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। শ্রীমন্‌মহানামব্রতজীর রাতুল চরণে আমার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

- *অধ্যাপিকা রমা চৌধুরী, (অবঃ) স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন, বড়িষা—*

বইটি পড়ে মনে হ'ল জ্ঞানের সমুদ্রে যেন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার গুরুদেব শ্রীঅনির্বাণকে তাঁর গুরুভ্রাতারা 'জ্ঞানভাস্কর' এই উপাধি দিয়েছিলেন। মহানামজীকে আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমন কিছু একটি উপাধি দিতে ইচ্ছা করি। 'জ্ঞান-দিবাকর' কথাটি আমার মনের মত লাগছে—সুতরাং এইটিই তাঁকে আমি দিলাম। এর দ্বিতীয় খণ্ড হবে—খুব আশার কথা। মর্তবাসী এর মুদ্রণে উৎসবের আনন্দ অনুভব করবেন। "মধু বাতা ঋতায়তে।"

● ***'সময় অসময়', মাসিক ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, ইছাপুর—***

এমন একটি গ্রন্থ প্রাপ্তি হ'ল যেটির সূচিপত্ররূপ সিংহদ্বারেব মধ্যে দিয়ে সামান্য প্রবেশ করেই মনে হ'ল যেন এক সুবৃহৎ দেবালয়ের মধ্যে এসে পড়েছি যার নির্মাণের উপাদান মূলতঃ অনুভব সিদ্ধভাব ও রসনিষিক্ত ভাষা। যেখানে গর্ভগৃহে মূলদেবতা রূপে বিরাজিত আছেন 'বন্ধাগোপালবেশম্' শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে রয়েছেন তাঁরই অভিন্ন দেবদেবীরূপ বহুপ্রকাশ তথা অবতার, ঈশ্বরকোটি ও যোগসিদ্ধ মহামানব-মানবীগণ। আর সেই মহানাম মন্দিরে পৌরোহিত্য করছেন আচার্য শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

বরণীয় এই লেখকের গীতাধ্যান, চণ্ডীচিন্তা, উপনিষদ্ ভাবনা, বেদ-বেদান্ত, গৌরকথা আদি অসামান্য গ্রন্থসমূহের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় সূত্রে একবাক্যে বলা যায় যে সেই গ্রন্থমালারই অমৃত নির্যাস- ধারা অভিনব ঐকতানে প্রকটিত হয়েছে এই 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলীতে।' শ্রীমৎ মহানামব্রতজির মননশীলতা, রচনাশৈলীর মাধুর্য ঐশ্বর্য, গভীবতা ও ব্যাপকতা তাঁর প্রবন্ধগুলি থেকে বিষয়গতভাবে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখে আলোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে সেইগুলির ভিত্তিতে কীরকম অনুভব সিদ্ধ প্রত্যয় বিদ্যমান আছে।

....দেবত্বের আদর্শে বরিষ্ঠ তপস্বী লোকশিক্ষক শ্রীমৎ মহানামব্রতজির এই প্রবন্ধাবলী জিজ্ঞাসু নবনারীকে পাথেয় রূপে যেমন সহায়তা করবে তেমনই তত্ত্ববেত্তাজনেদেরও দেবে আধ্যাত্মিক আস্বাদনের এক মহাভাণ্ডার।

সামগ্রিকভাবে এমন একটি জ্যোতির্ময় গ্রন্থের সংকলক-সম্পাদক রূপে শ্রীবন্ধুগৌরব একটি গৌরবান্বিত মহৎ কর্ম সাধিত করেছেন। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দ জানাই। —*শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য*

● ***মহামহোপাধ্যায় ড. রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা গভঃ সংস্কৃত কলেজ—***

ভাগিনী নিবেদিতা একসময় (১৮৯৯) জগজ্জয়ী সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনুভব করেছিলেন—তিনি 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিদ্যুৎ ঝলক।' আর এরূপ দেবত্বের আত্যন্তিক মহাশক্তির ঐশ্বরিক ঝলক ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এক অনন্য মহামানবের ধ্যান-ধারণা, জন্মসিদ্ধ-বৈরাগ্য-বিভূতি ও প্রজ্ঞাপ্রাখর্যের মাধুর্যমণ্ডিত উৎকর্ষে— তিনি হচ্ছেন আমাদের পরমারাধ্য মহামনীষী, মহামহোপাধ্যায় ভারত-শিরোমণি বৈষ্ণবাচার্য ডঃ শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজজী।

তাঁর বাচস্পতিসুলভ বাক্‌কুসুমাঞ্জলি শ্রবণ ও 'মহতো মহীয়ান্' সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি সুদীর্ঘ কাল ধরে।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর অজস্র সহস্রধারায় প্রবাহিত প্রতিভার সাক্ষাৎ নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হৃদালোকে উদ্‌ভাসিত শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড)' বিষয়ানুসারে বিন্যাস করে সুশোভন কলেবরে প্রকাশ করে মহানাম সেবক সংঘের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী তথা সংকলক প্রীতিভাজন শ্রীল বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সর্বজনের কল্যাণ সাধন করেছেন বলে জানাচ্ছি হার্দিক অভিনন্দন।

* ***শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—***

পূজনীয়প্রবর স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর জ্ঞান-গরিমায় মণ্ডিত 'প্রবন্ধাবলী', জ্ঞানের গভীরতায় রচনা ভাবগম্ভীর অনুপম মনীষার পরিচায়ক।

প্রবন্ধসমূহ ভাষার মাধুর্যে প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী সাবনীল গতিতে প্রকাশমান। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তৎসহ মানব-মনীষীগণের মহাজীবন স্মরণ—তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের সম্মান ও সমাদর ভাবনা আমাদের নিকট তাহা আদর্শরূপে প্রতিভাত; জীবন-চলন্তিকার পথে পাথেয় স্বরূপ।

* ***শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী, নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীজির ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীনবদ্বীপধাম—***

বর্তমান সময়ে অসুর প্রকৃতির লোকই জগতে সংখ্যা গরিষ্ঠ। জগদ্ব্যাপী আধ্যাত্মিকভাব বন্ধনের এক অভূতপূর্ব শিথিলতা—আত্মধর্মের এক মহাগ্লানি উপস্থিত।
ভারতীয় আর্য ঋষিগণের সন্তানদের এ সময়ে নিজ নিজ কার্যভার বুঝে নিতে হবে; যাতে আধ্যাত্মিক ধর্মাকাশে ধর্ম- মেঘের সঞ্চার সহজ ও সম্ভব হতে পারে। সম্পাদক মহাশয়ের কর্তব্যবোধের পরিচয় পেয়ে আনন্দলাভ করলাম।
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এক বিশিষ্ট সর্বজনবিদিত ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও ভক্তিভাবালুতা এককথায় অসাধারণ। যে-কোন বিষয়কেই আপন অনুভবের ছোঁয়ায় সরস করে বহু নিরস-শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তি-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছেন এই বরেণ্য পুরুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভক্তিরসাভিষিক্ত প্রবচন সকল একত্র সংকলিত করে 'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য সম্পাদক বন্ধুগৌরবজি সকলের ধন্যবাদার্হ হলেন। শ্রীশ্রীগৌররায় হরি তাঁর মঙ্গল করুন।

● ***শ্রীমৎ গদাধরপ্রাণ দাস, শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ কুঞ্জ, শ্রীমায়াপুর—***

'শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী' পড়ে ধন্য হলাম। তাঁর লেখা খুব প্রাঞ্জল, সর্বজনবোধ্য ও গভীর রসে পরিপূর্ণ। তিনি সংকীর্ণচেতা বৈষ্ণব নন। তাঁর হৃদয়টি ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত— প্রকৃত মহাপুরুষ, আদর্শ বৈষ্ণব। সকলকে সম্মান দিয়েছেন। মহাজীবন প্রসঙ্গে অধ্যায়টিই তাঁর প্রমাণ। সমকালীন প্রায় সব মহাপুরুষ ও গুণীজনের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা। বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সম্প্রদায়-সর্বস্বতার যুগে তাঁর এই প্রবন্ধাবলী আমাদের দিশা দেখাবে।

● ***শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য, সম্পাদক, শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির ট্রাষ্ট—***

পরম শ্রদ্ধেয় সর্বজ্ঞান ও ভক্তির আকর বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথমখণ্ডটি হাতে পেয়ে গভীর আনন্দ পেয়েছি। নানা দুরূহ বিষয়ে ব্রহ্মচারীজির স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং সরস বিবরণ পাটককে মুগ্ধ করে। আজকের দিনে বাংলার চরম চিন্তা-সংকটের দিনে তাঁর দিব্য লেখনী-নিঃসৃত অমৃতবাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছক— ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা। পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।